৮ম বর্ষ] ৩০শে ক ক শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 16th November, 1940 [১ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

'দেশের' নববর্ষ—

নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্র রিয়া 'দেশ' অষ্টম বর্ষে পদার্প করিল। যুদ্ধের বাজা গেজ প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্যতা তো আছেই, তাহা ছাড়া রহিয়া মাথার উপরে আইনের উপর আইনের উদ্যত খড়্গ। শ সংবাদপত্রের জীবন অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় মধ্যে প্রাণ শবের জীবন। সরকারী শত শাসনে অবরুদ্ধ এবং কুণ্ঠি জীবনে এ দেশের সংবাদপত্র, বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদ বাদপত্রের প্রাণশক্তি পিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। বাঙলা দে অবস্থা, সংবাদপত্রের জীবন বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর ণে অধিকতর সঙ্কটাপন্ন। গত কয়েক বৎসরে এ দেশের য়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির উপর প্রযুক্ত সরকারী নীতির লোচনা করিলে, এ সত্য বিশেষভাবেই সুস্পষ্ট হইয়া প । বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের এই স ঙ্কুল জীবনযাত্রার কথা অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহা ক আমাদের নূতন করিয়া বিশে কিছু বলিবার নাই। রা আমাদের অবস্থা বুঝিয়াই আমাদের দোষ-ত্রুটি র্জনা করিয়া লইতেছেন এবং আমাদের বড় আশা আনন্দের কথা এই যে, আমাদের অন্তরের ব্যথা ং বেদনা ও আবেগ যথেষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইব অবসর না পাইলেও, তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতি এব দয়তা 'দেশ' উত্তরোত্তর অধিকভাবে লাভ করিতেছে। র্তমান কাগজের এই মহার্ঘতার দিনেও কাগজ, ছাপ ত্রসজ্জা প্রভৃতির উন্নতি-সাধন করিয়া আমরাও যথাশ দেশবাসীর সেবা করিতে চেষ্টা করিতেছি। বাঙলা দেশে ষ্ঠ মনীষী সন্তানগণের চিন্তা-সাধনায় সমুজ্জ্বল অবদ উপচার আহরণ করিয়া আমরা এই সেবাকে সার্থক ক বার জন্য ব্যগ্র আছি। বিঘ্ন-বিপদ আসিবে জানি এবং জা বাদী সংবাদপত্রের সেবা করিতে হইলে তাহা জানিয়া শুনিয়াই এ পথে পা দিতে হয়। ভয়চকিতের ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া নির্বিঘ্নতা এবং নিরাপত্তার জন্য সদা সতর্ক স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এ ব্রতে ব্রতী হওয়া চলে না। 'দেশ' সঙ্কটসঙ্কুল জীবনকে স্বীকার করিয়া লইয়াই নিজের আদর্শ অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং করিবে। দেশবাসীর সেবার প্রেরণাই 'দেশের' প্রাণশক্তি; বাহিরের বাধাবিঘ্ন যতই বাড়ুক এই প্রাণশক্তি পিষ্ট হইবে না বরং ঐকান্তিক অর্ঘ্য নিবেদনের ব্যাকুলতাই বাড়িবে। দেশবাসিগণ যেভাবে 'দেশ'কে স্নেহ করিতেছেন, নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। দেশবাসীর সেই স্নেহ এবং উত্তরোত্তর প্রবর্ধমান অনুকম্পাই আমাদের যাত্রাপথের একমাত্র সম্বল।

সংবাদপত্রের সঙ্কটে মহাত্মাজী—

সংবাদপত্রের কণ্ঠ নিরোধক সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীর সম্ভ্রমপূর্ণ প্রতিবাদস্বরূপে মহাত্মাজী 'হরিজন' প্রকাশ বন্ধ রাখিলেন। 'হরিজন' পত্রের একটি সংখ্যা প্রকাশ করিয়া গত সপ্তাহে মহাত্মাজী পাঠকদের নিকট বিদায় নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'হরিজন' প্রকাশ বন্ধ হওয়াতে শুধু যে ভারতের ক্ষতি হইল ইহা নয়, সমগ্র জগতের ক্ষতি হইল। মহাত্মাজীর উদার অন্তরের গভীর এবং গূঢ় অনুধ্যানের অবদানরাজীতে 'হরিজন' চিন্তাশীল জগতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছিল। মহাত্মাজীর রাজনীতিক মতের সহিত আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকিলেও, তাঁহার সুস্থ এবং স্বচ্ছ চিন্তাশীলতার এই অবদান যে বর্তমান জগতে অতুলনীয় ছিল, ইহা আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিব এবং সেই অবদান হইতে বঞ্চিত হইয়া শুধু

আমরাই নহি, ভারতের বাহিরের চিন্তাশীল সমাজ দুঃখিত হইবেন। কিন্তু ইহার ফলে একটা কাজ হইবে, তাহা এই যে, এ দেশের লোকেদের যে কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হয়, জগতের লোকে তাহা বুঝিবে। তাঁহারা বুঝিবে যে, মহাত্মাজীর ন্যায় একজন বিশ্বপ্রেমিক, যিনি মনেপ্রাণেও অপরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না এবং ব্রিটিশ জাতির প্রতি প্রেমেই যাঁহার অন্তরে প্রগাঢ়, ভারতের আকাশতলে তাঁহার কণ্ঠও আজ অবরুদ্ধ; প্রাণ খুলিয়া নিজের কথা বলিবার শক্তি তাঁহার ন্যায় একজন অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিরও নাই। এই ব্যাপার হইতেই বাহিরের লোকে ভারতের জনমতের গতি-প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় কিছু পাইবে; বুঝিবে, ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যে কথা বাহিরে জাহির করা হয়, তাহার মূল্য কতটা। মহাত্মাজীর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দিল্লীতে সেদিন সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে গৃহীত সরকারী নীতির প্রতিবাদের প্রস্তাব অবস্থাকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই প্রতিবাদের তীব্রতা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধোদ্যমের বিরুদ্ধতা সহায়ক লেখা বা সংবাদ বন্ধ করিবার এই বিশেষ বিধানটি প্রত্যাহার করিলেই যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষিত হইবে, আমরা ইহা মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী বিধান-সমূহেই সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, নূতন বিধানটি জারী না করিলেও বিশেষ কিছু রেহাই ছিল না। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে যদি সত্যই মর্যাদা দান করিতে হয়, তাহা হইলে সরকারের নীতির সমগ্রভাবে পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। বাধ্যতার পরিবর্তে সহযোগিতা এবং পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসকে স্থান দিতে হইবে।

পরলোকে মিঃ চেম্বারলেন—

গত ৯ই নভেম্বর মিঃ চেম্বারলেন পরলোকগমন করিয়াছেন। মিঃ চেম্বারলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; ভারত সম্বন্ধে তাঁহার নীতির বিশিষ্টতা কিছুই আমাদের লক্ষ্য করিবার মত হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতার দাবী তাঁহার সময়ে সমভাবেই উপেক্ষিত হইয়াছে, সুস্পষ্ট কোন কথা ভারতবাসীরা তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতসচিবের মুখ হইতে পায় নাই। মিঃ চেম্বারলেন খাঁটি সংরক্ষণশীল ছিলেন। সাম্রাজ্য স্বার্থ সম্পর্কিত নিরাপত্তাকেই তিনি বরাবর বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতার মূলেও ছিল এই অতিরিক্ত সাবধানীর মনোভাব। ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসীদিগকে তুষ্ট রাখিবার নীতিই তিনি বরাবর ধরিয়া ছিলেন, মিউনিকের চুক্তির পরিণতি ঘটে তাহা হইতে। মিঃ চেম্বারলেন পরে তাঁহার এই ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দেশ রক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেন, কিন্তু দেশের লোকের যে আস্থা তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির ফলে হারাইয়াছিলেন, তাহা আর পান নাই। মিঃ চেম্বারলেনের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা হইল রুশিয়ার ব্যাপারে। ধনিক স্বার্থের একান্ত ভীতি তাঁহার অন্তরে ছিল এবং ইহার সোভিয়েটকে তিনি শত্রু ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিতে দে পারেন নাই। সোভিয়েটকে বিশিষ্ট করিয়াও তিনি জা বন্ধুত্ব লাভ করা ভা মনে করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রনীতির অনিষ্টকর খতা ঘটে এইখান হইতেই। চেম্বারলেনের সোভিয়েটবিরোধী সেই নীতির প্র আজও লোপ পায় নাই বর্তমানে ব্রিটিশ গভ সোভিয়েটের সখ্য কামনা করিলেও, সোভিয়েট গভ তাঁহাদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিতেছে; যদি চে লেনের নীতি বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘকে ভিত্তি করিয়া সোভি সখ্যসূত্রে ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসীদের পররাজ্য-গ্রাস বিরুদ্ধে দাঁড়াইত, তাহা হইলে জগতের আন্তজ অবস্থা হয়ত অন্য আকার ধারণ করিত। আবিসিনিয়া, বেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নাৎসী ফ্যাসিস্টদের ক্ষুধা বাড়ি উঠিয়াছে, তাহাতে সায় যে মিঃ চেম্বারলেনের রাজনৈতিক জীবনের শোচনীয় ব্য হেতুভূত বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দান করিবে।

মাদ্রাজে ছাত্র দলন—

দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তরুণদের উপর, স্বাধী প্রেরণা তাহাদের অন্তরে যদি স্থান পায় তবে তাহারা ভবিষ্যতে নিজেদের দেশকে বিপন্ন করিতে পারে, ইহা করিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা ছাত্রসমাজের পক্ষে রাজ বিভীষিকা করিয়া তে যত্নবান হয়। এ দেশেও রীতি চলিয়া আসিতেছে বাঙলা দেশে থাকিয়া এ স বহু অভিজ্ঞতাই আমার আছে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতিতে যোগদান পরিত্যাগ ক জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সকল বাক ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহারা এই আদেশ দিয়াছেন যে, ভবি যেসব ছাত্র রাজনীতি আন্দোলনে যোগদান ক দলবদ্ধভাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দণ্ডাদে প্রতিবাদস্বরূপ ক্ষেত্রে কলেজে অনুপস্থিত থাকিবে ত সরকারী চাকরি পাইবে না। মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট ব কর্তৃপক্ষদিগকে এই অপরাধ যেসব ছেলে ভবি করিবে, তাহাদের নামের তালিকা দাখিল করিতে ত দিয়াছেন। এই হুকুম অনুসারে কলেজের অধ্য প্রকৃতপক্ষে করিতে হইবে গোয়েন্দাগিরি। স্ব প্রেমের প্রেরণা ছেলেরা পায়, অন্য শিক্ষার তাহা একটা সর্ব প্রধান অঙ্গ বলিয়া হয়; কিন্তু এই দেশে তাহাই গুরুতর অপরাধ ব গণ্য হইয়া থাকে। বাসীদিগকে দায়িত্বশীল শা পদ্ধতি দেওয়া হইবে তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতেছে, এই সব বড় কথা বলার সঙ্গে ছাত্রদের হইতে স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা লুপ্ত করিবার জন্য এই যে পীড়ন নীতি ইহার সঙ্গতি কোথায়? ভাব বা আদর্শ নীতির দ্বারা চাপা যায় না—মাদ্রাজ সরকারের এই দমন তরুণদের অন্তরে দেশ প্রেমকে উদ্দীপিত করিবারই তুমি

হবে এই আদেশ জারি করার ফলে কিভাবে প্রতিকূলভাবে—সরকারী সতর্কতার লাভের অঙ্ক হিসাবে দাঁড়াইবে এই দিক হইতে।

চীন ও ভারত—

চীনের জাতীয়বাদী গভর্নমেণ্টের বিশিষ্ট প্রতিনিধি এবং চীনা সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্তা মাননীয় তাই-চি-তোয়া কিছুদিন হইল ভারতে আগমন করিয়াছেন। কলিকাতাবাসীদের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন সেদিন তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমি; অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনের বহু পণ্ডিত এবং মনস্বী পুরুষ তৈর্থিক বেশে এই ভারতে আগমন করিয়াছেন। এইভাবে ভারতের সংস্কৃতির সহিত চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মাননীয় তাই-চি-তোয়ার ভারত পরিদর্শনের ফলেও সেইভাবে ভারত ও চীন এই উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বর্ধিত হইবে। মাননীয় তাই-চি-তোয়া ভারতে বৌদ্ধ তীর্থসমূহ পরিদর্শন করিবেন। বিগত সোমবার তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মার্শাল চিয়াং কাইসেকের স্বহস্ত লিখিত একখানা চিঠিও কবিকে প্রদান করেন। চীনের প্রেসিডেণ্ট ঐ চিঠিতে ভারতবাসী ও চীনাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা যাহাতে বর্ধিত হইতে পারে তজ্জন্য উপদেশ চাহিয়াছেন। ভারতবাসীরা পরাধীন, আজ চীনও নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। এই সূত্রে ভারত ও চীনাদের মধ্যে সমবেদনার একটা সূত্র দৃঢ় হইয়াছে। চীনের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধির এই ভারত পরিদর্শনের ফলে রাষ্ট্রনীতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উভয় দেশের মধ্যে নিবিড়তর হইবে। আমরা এই মহামান্য অতিথিকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

অযৌক্তিক আবদার—

বাঙলা দেশে নূতন কর বৃদ্ধির দুইটি বিল কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। কর দুইটি বসিবে, একটি দোকানের মাল বিক্রীর টাকার উপর, অপরটি মোটর স্পিরিট বিক্রয়ের উপর। এই ধরনের দুইটি কর যে বসিবে, এমন কথা আমরা কিছুদিন হইতেই শুনিতেছিলাম, কিন্তু এত সকালেই যে এ সম্বন্ধে গেজেট হইয়া যাইবে, আমরা ইহা ধারণা করিতে পারি নাই। দেশের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে যেরূপ, তাহাতে এই নূতন কর বৃদ্ধির চাপে দেশের যে কয়েকটি ব্যবসা-বাণিজ্য এ পর্যন্ত কোনরূপে টিকিয়া আছে, সেগুলিও টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। দোকানে মাল বিক্রয়ের টাকার উপর যে ট্যাক্স দোকানীকে বহন করিতে হইবে, প্রকৃতপক্ষে তাহার চাপ পড়িবে নিরীহ খরিদ্দারদের উপর। ইহার ফলে বিক্রয় কমিয়া যাইবে এবং স্বভাবত বিক্রয় না থাকিলে ব্যবসাও বন্ধ হইয়া যাইবে। মাল বিক্রেতাদের উপর এই ট্যাক্স বসিবে। অবশ্য সকল বিক্রয়ের উপরই ট্যাক্স বসিবে না, নির্দিষ্ট একটা আয়ের উপর বসিবে। কিন্তু এস্থলে ক্রেতা-বিক্রেতা লইয়া একটা বিভ্রাট ঘটিবে। এ দেশের ছোট ছোট দোকানীরা বড় আড়তদারদের নিকট হইতে মালপত্র খরিদ করিয়া থাকেন এবং তাহাই বিক্রয় করেন, সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার ট্যাক্স ছোট দোকানীদের উপরই পড়িবে। এই সব ছোট দোকানীরা যদি আইন অনুসারে নিজেদের ব্যবসা রেজিস্টারী করিয়া লন এবং বিক্রেতার আইনগত বাধ্যবাধকতা নিজে গ্রহণ করেন, তবে তেমন ক্ষেত্রেই বড় আড়তদারদের নিকট হইতে তাঁহারা রেহাই পাইবেন; কিন্তু অধিকাংশ ছোট দোকানীরাই খাতাপত্র রাখিয়া সরকারী কর্মচারীদের তদারকের সঙ্কট নিজেরা পোহাইবার চেয়ে বড় আড়তদারদের নিকট হইতে বেশী দামে মাল কেনাই শ্রেয় মনে করিবেন। ইহার ফলে দোকানের বিক্রী কমিয়া যাইবে এবং ব্যবসা অনেককে গুটাইয়া লইতে হইবে। মোটর স্পিরিট বিক্রয়ের উপর কর বৃদ্ধিতেও বাঙলা দেশের অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের নিদারুণ ক্ষতি হইবে। মোটরযানের যে সব ব্যবসা দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং কলিকাতা শহরে এ দেশের লোকের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, রেল এবং ট্রামের প্রতিযোগিতায় সেগুলিকে পস্তাইতে হইবে। বাঙলা দেশের বাণিজ্য সচিবের এই অবদান দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলোৎপাটনে সাহায্য করিবে। আমাদিগকে শুনান হইয়াছে যে, গভর্নমেণ্ট দেশের গঠনমূলক উন্নতি সাধনের যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এই নূতন কর না বসাইলে সেগুলি অপূর্ণ থাকিয়া যায়; সুতরাং দেশের উন্নতি সাধনের মহাপ্রাণতারই প্রেরণায় এ কাজ করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা সবিনয়ে বাঙলার সচিববর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে, নূতন কর বৃদ্ধির আয়ের কতটা এ পর্যন্ত দেশের প্রকৃত গঠনমূলক কার্যে সার্থক হইয়াছে, তাঁহারা দেখাইতে পারেন কি? প্রতিশ্রুতির বড় বড় কথা আমরা খুবই শুনিয়াছি, তেমন ধাপ্পাবাজিতে দেশের লোক কিছুতেই এমন অযৌক্তিক কর বৃদ্ধির সমর্থন করিতে পারিবে না।

সিন্ধুতে অরাজকতা—

সিন্ধুর অরাজকতা এখনও বন্ধ হয় নাই। হিন্দু বধের আন্দোলন এখনও চলিতেছে। সিন্ধু প্রদেশের পুলিশের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৩৯ সাল, এই এক বৎসরেই ঐ প্রদেশে ৪১ জন খুন হয়। এই খুনের মধ্যে হিন্দু কতজন বুঝা যায় না, তবে রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক কারণই এই সব খুনের মূল কারণ; সাম্প্রদায়িকতাই মূল কারণ, সোজাসুজি এই কথাটা বলিলেই বোধ হয় সত্যের মর্যাদা অধিক রক্ষিত হইত। সরকারী রিপোর্টের এই স্বীকৃতিতেই সাধারণে বুঝিতে পারিবেন খুন হইয়াছে কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী। সিন্ধু সরকার দুঃখ করিয়াছেন যে, এই সব অপরাধের প্রতিরোধ করা কিংবা অপরাধীদিগকে বাহির করার জন্য জমিদারগণ সহযোগিতা করেন না। এই উক্তির অর্থ সোজাভাবে বুঝিলেই ধারণা করা যাইবে অবস্থা কেমন গুরুতর, সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া

কিরূপ ব্যাপক। এই ভয়াবহ সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ করাচী গিয়াছিলেন। মৌলানা সাহেব সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছেন—সিন্ধুর ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল যদি পরিষদের ভিতরে থাকিয়া কোন কাজ না করিতে পারে, তাহা হইলে পরিষদ হইতে বাহিরে আসিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাহাদের উচিত গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করা। মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন—"সিন্ধুর কংগ্রেস কর্মীদের বর্তমানে একমাত্র কর্তব্য যাহাতে এই বিভীষিকার অবসান হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা, যদি তাঁহারা তাহা নষ্ট করিতে পারেন তাহা হইলে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের অবসর গ্রহণ করাই কর্তব্য।" সিন্ধু পরিষদের কংগ্রেসী দল পরিষদে থাকিয়া কাজ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু কাজ যে করিতে পারিতেছেন না, ইহার কারণ কি? আমরা বলিব, অনেকাংশে ওআর্কিং কমিটিই এজন্য দায়ী। সিন্ধুর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্স কংগ্রেসী দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, কংগ্রেসী দলও সেজন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু মৌলানা আজাদ সে প্রস্তাবে অসম্মত হন। মিঃ আল্লাবক্সের ন্যায় একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান যদি বর্তমানে সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই সিন্ধুর এই অরাজকতা এমনভাবে মাথা তুলিতে পারিত না। সিন্ধুতে যাহারা এই সব কুকাণ্ড করিতেছে, মিলনের মধুর কথায় তাহাদিগকে শান্ত করা যাইবে না, এমন বর্বরতা দমিত হইবে কঠোর দণ্ডের বিভীষিকা জাগাইয়া, এই সমস্যা সমাধানের সম্পর্কে সেই সত্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রভাবে তাঁহারা যেন এই বাস্তব বিবেচনায় ভুল না করেন।

ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ওআর্কিং কমিটির ছাড়পত্র পাইয়া অনেক দিন পরে কংগ্রেসী সদস্যগণ দরবারে বার দিয়াছেন। শুনিতেছি বড়লাট বাহাদুর পরিষদে যে বক্তৃতা করিবেন তাহাতে তিনি শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন। কি কংগ্রেস, কি হিন্দু মহাসভা, কি মুসলিম লীগ কেহই শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের ধোঁকাবাজিতে সন্তুষ্ট নহেন, সুতরাং শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের দ্বারা ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান হইবে না। বড়লাট যদি ইহা বুঝিয়া থাকেন ভাল কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিক অচল অবস্থার প্রকৃত সমাধানের আন্তরিকতা কর্তাদের জাগিবে কি? বিলাতী কাগজে দেখা যাইতেছে যে, মিঃ আমেরির স্থলে লর্ড হ্যালিফাক্স ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা আছে। "ডেলি হেরাল্ড" বলিয়াছেন, ভারতের জনমত এই নিয়োগকে সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করিবে, আশা করা যায়। এমন আশা তো আমাদিগকে কত দিন হইতেই দেখান হয়। মিঃ আমেরিও যখন ভারত সচিব নিযুক্ত হন, তখনও আমাদিগকে আশা দিয়া বলা হইয়াছিল, [illegible] নূতন শাসন-সংস্কার আইন প্রবর্তনকালে চার্চিল বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, আর চার্চিলের তৎকালীন ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্প্রসারণের বিরোধী নীতির [illegible] বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যিনি, সেই মিঃ আমেরি যখন ভারত সচিব হইতেছেন তখন ভারতবাসীদের আর [illegible] নাই, এবার তাহাদের চতুর্বর্গ সিদ্ধ হইবে; কিন্তু আশা ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেস সর্বতোভাবে সহ[যোগ] করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, ব্রিটিশ রাজনীতিক[দের] কিঞ্চিৎমাত্র দূরদর্শিতা থাকিত, তবে তাঁহারা কংগ্রে[সের] প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিতেন, ভারতবাসীরা চায় [illegible] ব্যক্তির উপর সেই যে কাজ তাহা নির্ভর করে না ইহা দেখিয়াছি; সুতরাং ব্যক্তির গুণগরিমা শুনিয়া আমরা [illegible] যাইব না। ভারতের সমস্যার যদি সত্যই সমাধান করা রাজনীতিকগণ বর্তমানে প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা [হইলে] কাজে ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকার করিয়া ল[ইতে] [illegible]

অতিরিক্ত রাজস্ব বিল—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অতিরিক্ত রাজস্ব বিল আলোচনা চলিতেছে। অর্থসচিব যুদ্ধের জন্য দেশবা[সীকে] ত্যাগ স্বীকার করিতে আহবান করিয়াছেন এবং নূ[তন কর] বৃদ্ধির যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন সেই দিক হইতে। পূর্বে বলিয়াছি, নূতন কর বৃদ্ধির যে কয়েকটি [illegible] হইয়াছে, ভারতের কোনটিই বর্তমান অবস্থায় দেশ[বাসীর] পক্ষে বহন করা সহজ নয়। আয়করের উপর শতকর[া] [illegible] টাকা হারে সুহরচার্জে মধ্যবিত্ত আয়ের লোকদের গুরুত[র ক্ষতি] পড়িবে এবং সব চেয়ে ক্ষতি হইবে দেশের ব্যবসা বাণি[জ্যের]। ডাকমাসুল বাড়ানতে গরীবদের বাড়িবে অসুবিধা, পোস্টের হার বাড়ানোতেও গরীবদের ক্ষতি হইবে [illegible] এই সব ট্যাক্স বাড়াইবার সঙ্গে সরকারের স্বেচ্ছায় কমাইবার দিকে আগে নজর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু [illegible] কমিবে দূরস্থান, যুদ্ধের বাজারে বাড়িয়াই চলি[য়াছে]। যুদ্ধের জন্য যে নূতন কার্য বিভাগ খোলা হই[য়াছে] সেগুলিতে বড় বড় পদে যত চাকুরিয়া অধিকাংশই ইংরেজ ইঁহারা এক হাজার টাকা হইতে মাসিক পাঁচ হাজার [টাকা] পকেটে পুরিতেছেন। ভারতের গরীবদের ঘাড়ে ক[রভার] চাপাইবার আগে, উচিত ছিল না কি এই সব হুজু[রদের] মাহিয়ানা কিছু কম লইয়া নিজেদের ত্যাগের পথ দে[খান]; কিন্তু অর্থসচিবের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে নাই, এক [illegible] যাইতে না যাইতেই করভার পীড়িত ভারতের গরী[বদের] উপরই তিনি বোঝা চাপাইতে ব্যস্ত। এই নীতির [illegible] নিহিত দায়িত্ব কর্তাদিগকে উপলব্ধি করান যাইবে [না], কারণ রাজস্ব বিল ভোটে নাকচ হইলেও যথারীতি বড়ল[াটের] অতিরিক্ত ক্ষমতার জোরে বলবৎ হইবে; এমন অবস্থায় বি[লের] আকারে পরিষদে ব্যবস্থাটা না তুলিয়া সোজাসুজি সরব[রাহ] হুকুমে চালাইয়া দিলে অন্তত এমনি প্রহসনের সৃষ্টি হইত [না]।

পূর্ব ও পশ্চিমে যুদ্ধের গতি

যুদ্ধের গতি নূতন মোড় ফিরিবে, এইরূপ মনে হইতেছে। ইংলণ্ডের দিকে জার্মানির আক্রমণের প্রচণ্ডতা হ্রাস পাইয়াছে এবং শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এমনটা যে ঘটিবে, ইহা অনেকটা অনুমান করা গিয়াছিল। ঐ দিকে জার্মানির ডুবোজাহাজের উপদ্রব আবার কিছু বাড়িয়াছে, ইহাই হইল বিশেষত্ব। জার্মানি ডুবোজাহাজের জোরে ইংরেজের পক্ষে আটলাণ্টিকের পথ বিপজ্জনক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ক্ষিপ্র বেগে ইংলণ্ডের উপর পড়িয়া ইংরেজকে বিপর্যস্ত করিবে, এ আশা জার্মানি এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছে বলিলেই হয়। জার্মানি বুঝিয়াছে যে, যুদ্ধ দীর্ঘকালের জন্য চালাইতেই হইবে এবং যুদ্ধ যতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া উঠিবে, অবস্থা ততই জার্মানির পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িবে, ইহাও জার্মানির না জানা ছিল তাহা নয়; এই দিক হইতে জার্মানির সমরসম্পর্কিত মূল নীতির সুস্পষ্ট একটা ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া কাটাইবার জন্য ঝোঁকা আসিয়া পড়িয়াছে বলকানের দিকে এবং সেই নীতিরই পরিণতি ইতালি কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ। মতলবটা পূর্ব হইতেই অবশ্য বাঁধা ছিল এবং মতলব বাঁধা থাকিলে ছলও বাহির হইয়া পড়ে। গত তিন মাস হইতেই মুসোলিনি গ্রীসের সঙ্গে লড়াই বাধাইবার জন্য ছল খুঁজিতেছিলেন। গত অগস্ট মাসে ইতালি এই অভিযোগ করে যে, গ্রীকেরা ইতালীয় একজন আলবেনিয়ান প্রজাকে তাহাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যে খুন করিয়াছে। ইতালি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া একখানা গ্রীক ক্রুজারে টর্পেডো মারে এবং দুইখানা গ্রীক ডেস্ট্রয়ারের উপর তোপ দাগে। এই ব্যাপারের পর হইতেই আলবেনিয়ার মধ্যে ইতালি সেনা সমাবেশ করিতে থাকে। ইহার পরই বাধে লড়াই। লড়াইয়ের কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ইতালি বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রীসের সৈন্যশক্তি সামান্য, এবং সেই সেনাদল আধুনিক উন্নতধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নয়; ইহা সত্ত্বেও ইতালি গ্রীসের মধ্যে খুব বেশী আগাইয়া যাইতে পারে নাই বরং কয়েকটি স্থানে হটিয়া যাইতেই বাধ্য হইয়াছে। মুসোলিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের হুমকি দেখাইলেই গ্রীস তাঁহার পদানত হইয়া পড়িবে, কিন্তু গ্রীস তাহা হয় নাই। ইংরেজের নৌশক্তির জোরেই যে গ্রীসকে এই ক্ষেত্রে অনেকটা সাহস দিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতালি গ্রীসের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই একটু চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় এইজন্য আবিসিনিয়ার লড়াইয়ের নামকরা যোদ্ধা জেনারেল বাদোগ্লিওকে আলবেনিয়ায় পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং ইতালির সমরসচিব মার্শাল সিয়ানো জার্মানিতে গিয়া রিবেনট্রপের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে জার্মানি প্রত্যক্ষভাবে গ্রীসের লড়াইতে আসিয়া পড়িতে পারে, এবং ইহা নিশ্চিত যে, আজ হউক, আর দুইদিন পরেই হউক, ইংরেজ সেনা যখন গ্রীসের সাহায্যের জন্য গিয়াছে, তখন জার্মানি তাহার পূর্বাভিমুখী নীতি যাহাতে বিপর্যস্ত না হইয়া পড়ে, সেজন্য গ্রীসে সেনা পাঠাইতে বাধ্য হইবে। যুগোস্লাভিয়ার ভিতর দিয়া পথ করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে বলিয়া মনে হয় এবং জার্মানি ও ইতালির এই সংকল্পের সঙ্গে সায় দিতে না পারার জন্য যুগোস্লাভিয়ার সমরসচিব নেদিচকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বলা বাহুল্য ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ প্রভাব, বিশেষভাবে মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক এবং তুরস্কে ইংরেজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে গ্রীসের সাহায্যার্থ

গ্রীসে গাল্‌ফ অব করিন্থ-এর নিকটবর্তী পাত্রাস নগরীর শান্তিপূর্ণ দৃশ্য

ইংরেজের অগ্রসর হওয়া অনিবার্য হইয়া পড়ে। গত ১৯৩৯ সালে ইতালি যখন আলবেনিয়া দখল করে, তখনই ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ভাবী অবস্থার একটু অনুমান করিয়াছিলেন। মিঃ চেম্বারলেন [illegible] ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আলবেনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আগায় নাই কেহই, কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন গ্রীসকে ঐ সময় এই আশ্বাস দান করেন যে, গ্রীসের স্বাধীনতা যদি সত্যই আতঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ইংরেজ গ্রীসকে স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করিবে; আজ সামরিক অবস্থার প্রয়োজন সেই প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব দান করিয়াছে।

সুদান আক্রমণ করিয়া সুদান সীমান্তের ক্যাসালা গাল্লাবাট নামে দুইটি ঘাঁটি দখল করে। ক্যাসালা এরি সীমানায় মিশরের রাজধানী খার্তুমের বিপরীত অবস্থিত; গাল্লাবাট ইহার প্রায় দুইশত মাইল আবিসিনিয়ার সীমানার উপর অবস্থিত। এই দুইটি ইতালির অধিকারে যাওয়াতে ইতালি সুদানের ঢুকিতে পারে, এই ভয় হইয়াছিল। ইহার পর ইংরেজ এবং ভারতীয় সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়; কি হইল সুদানের ব্রিটিশ বাহিনী ভারতীয় সেনা আকস্মিকভাবে হানা দিয়া গাল্লাবাট পুনরায় অ
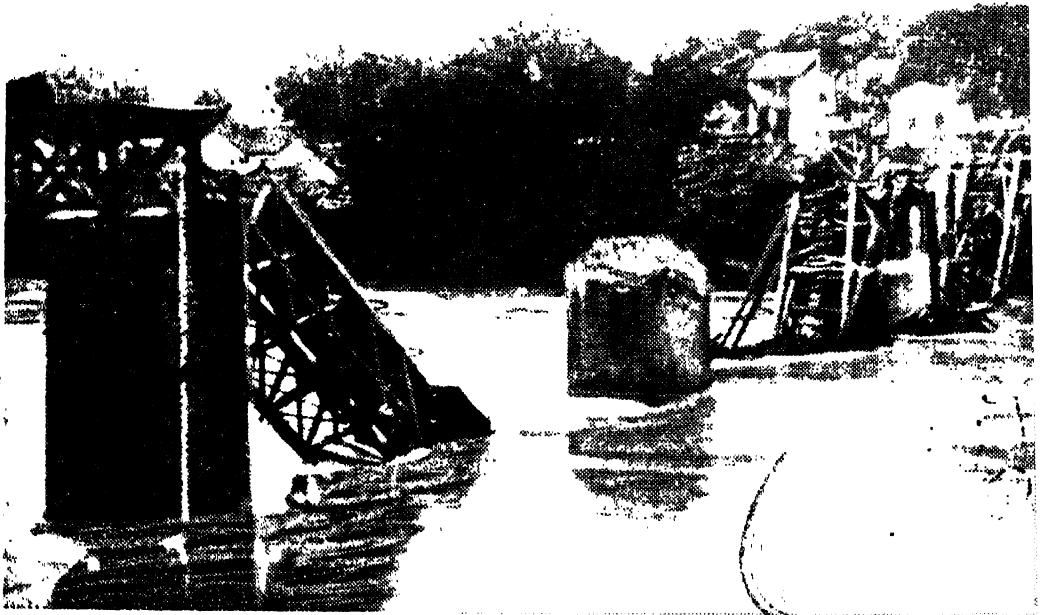
জাপানের অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইশেক্-এর নির্দেশে চীন ও ফরাসী ইন্দো চীনের সীমান্তস্থিত লোহার পুল ভ ফেলা হইয়াছে

মিশর এখনও ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই; কিন্তু মিশর এবং সুদান উভয় সীমান্তেই, একদিকে লিবিয়া অন্যদিকে আবিসিনিয়া ও সোমালিল্যান্ড হইতে ইতালির সেনাদলের সঙ্গে খুচরা গোছের কিছু লড়াই চলিতেছে। অচিরেই এই দিকে লড়াইতে জোর বাঁধিবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন এবং সেই লড়াইতে জার্মানির সেনা ও উড়োজাহাজ ইতালির সঙ্গে যোগ দিলে উভয় পক্ষেই লড়াইয়ে জোর বাধিত; কিন্তু স্পেনের সর্বময় কর্তা জেনারেল ফ্রাঙ্কো, ভিসি গভর্নমেণ্ট বা অন্য কথায় বর্তমান ফরাসী গভর্নমেণ্টের অধ্যক্ষ পেতাঁ ও মন্ত্রী লাভালের সঙ্গে হিটলারের পরামর্শের ফলটা হিটলারের অনুকূলে এখনও তেমনভাবে জমিয়া উঠে নাই বলিয়াই নাকি এই বাধা। এই বাধা দূর করিবার জন্য [illegible] বিশেষ সুবিধা দিবার প্রলোভন খুবই দেখান হইতেছে। ইতালি যুদ্ধে নামিবার কিছু দিন পরে

করিয়াছে। প্রায় ৪৫ মিনিটকাল লড়ইয়ের পর ই সেনাদল পরাস্ত হয় এবং অনেক ইতালীয় সেনা ইংরে হাতে বন্দী হইয়াছে। ইতালি এই জায়গাটা পুনরায় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা হইয়াছে। ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড ছাড়া সমর-সীম অন্যত্র শত্রুপক্ষের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংঘষ প্রথম। এই সংবাদেই বুঝা যায় যে, মিশর সীমান্তে ই বাহিনী এখনও শক্তিশালী নয়। জার্মানির প্রত্যক্ষ ছাড়া তার এই দুর্বলতা এই সীমান্তে দূর হইবার প্রকৃত আধুনিক যুদ্ধনীতিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আবি এবং আলবেনিয়ায় ছাড়া অন্য কোথায়ও ইতালি এ উল্লেখযোগ্য কেরামতি দেখাইতে পারে নাই।

হিন্দু-চীন দখল করিয়া জাপান নূতন চাল চ

বলিয়া মনে করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, জার্মানি, ইতালি এবং জাপান—এই ত্রিশক্তি সন্ধির চাপে আন্তর্জাতিক জগতে সে সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার উদ্যম সফল হয় নাই। বরং সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই ঘটনার গতি ঘুরিয়াছে দেখা যাইতেছে। ইংরেজ চীন-ব্রহ্ম পথ খুলিয়া গিয়াছে, আমেরিকা এবং রুশিয়া দুই শক্তিই চীনা সাধারণতন্ত্রীদিগকে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিবার মত ক্ষমতা জাপানের নাই। চীনের লড়াইয়ের অবস্থা এই সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। চীনা সাধারণতন্ত্রীদের প্রধান ঘাঁটি কোয়াংসি প্রদেশ হইতে জাপানীরা এক রকম বিতাড়িত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। দীর্ঘ দিন সংগ্রামের পর চীনা সাধারণতন্ত্রীরা কোয়াংসি

আমেরিকার নূতন নির্বাচনের ফল সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহা নিশ্চিত। রুজভেল্ট এবং উইলকির ঘোষিত নীতির মধ্যে তেমন পার্থক্য না থাকিলেও ভিতরে ভিতরে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ ছিল। কিন্তু রুজভেল্টের পুনর্নির্বাচনে সে সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না। বোধ হয়, এই সন্দেহটা না রাখার দিকে আমেরিকার জনসাধারণের মতিগতিই রুজভেল্টের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে সাহায্য করিয়াছে এবং চিরাচরিত মার্কিনী প্রথা অতিক্রম করিয়া তিনি তৃতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে ৮ বৎসরের অধিক অন্য কেহই মার্কিন মুল্লুকে রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধারত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। বাস্তব রাজনীতির দিক বিবেচনা করিয়া
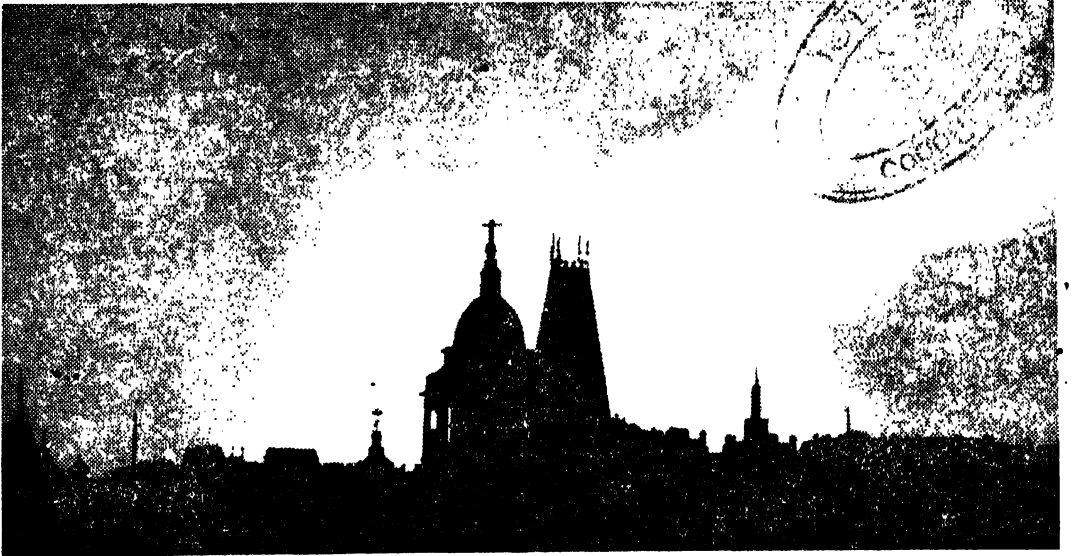
বহ্নি-আলোকে লণ্ডন সহর। সম্মুখে সেণ্ট পলস্ গীর্জার দৃশ্য

প্রদেশের রাজধানী ন্যানিং শহর অধিকার করিয়াছে, শুধু তাহাই নহে—চীনা সাধারণতন্ত্রীরা এখন সমুদ্রের উপকূলভাগ পর্যন্ত আসিয়া জাপানীদের সঙ্গে লড়াই চালাইতেছে। সাধারণতন্ত্রীরা সাংহাইয়ের বার মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের গরিলা বাহিনী সাংহাইয়ের উপকণ্ঠভাগে জাপানীদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। চীনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সব খবর আমরা পাই না; প্রবল জাপ শক্তির বিরুদ্ধে কৃষক দলকে লইয়া গঠিত চীনা সাধারণতন্ত্রী এই সংগ্রামে জগতের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবাসীরা আগাগোড়া চীনা সাধারণতন্ত্রীদের সাফল্য কামনা করিয়াছে এবং পরাধীন হইলেও ভারত নৈতিকভাবে চীনাদিগকে সমর্থন করিয়াছে। সুদীর্ঘ সংগ্রামে অবসন্ন না হইয়া চীনা সাধারণতন্ত্রী দল আজও তাহাদের ঘাঁটি বজায় রাখিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, জাপানী জঙ্গী কসরৎ কাবু করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে ভারতবাসীরা বিশেষভাবে আনন্দ বোধ করিবে।

মার্কিনবাসী রাজনীতি ক্ষেত্রে অপরীক্ষিত উইলকির চেয়ে সুপরীক্ষিত রুজভেল্টকেই বাছিয়া লইয়াছে। এমন একটা বিপর্যয়কর সংকটকালে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিবার সাহস তাহারা করে নাই। এই জন্যই মার্কিনের টাকাওয়ালা লোকদের জোর এবং সংবাদপত্র মহলের সমর্থনলাভ সত্ত্বেও উইলকিকে পরাজিত হইতে হইয়াছে। জার্মানি রুজভেল্টের নির্বাচনের আগাগোড়া বিরুদ্ধতা করিয়াছে এবং উইলকিকে সমর্থন করিয়াছে। উইলকি জার্মান বংশীয় বলিয়া যে এই সমর্থন বা তাঁহার উপর ভরসা জার্মানির বিশেষ ছিল, ইহা মনে হয় না, তবে জার্মানি মার্কিন রাষ্ট্রনীতিকে নিশ্চয়তার ক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহার এই বিশ্বাস ছিল যে, তাহা হইলে মার্কিন রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সে চাতুর্য ফলাইবার অন্তত একটা ক্ষেত্র হয়ত পাইবে। কিন্তু নির্বাচনে অসংশয়িত উত্তর মিলিয়াছে, সে উত্তর ইংরেজের পক্ষে সুনিশ্চিতভাবে অনুকূল। অতঃপর আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগদান করুক বা না

করুক, সমরসম্ভার প্রভৃতি তোড়জোড়ে ইংরেজকে সাহায্য করিবার উপর জোর দিবে। ইহা বুঝিয়াই আটলাণ্টিক সাগরের দিকে জার্মানি তার উড়োজাহাজ এবং ডুবোজাহাজের তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইংরেজের জাহাজ যাহাতে আমেরিকা হইতে মাল লইয়া না আসিতে পারে, ইহাই উদ্দেশ্য। আটলাণ্টিক সাগরের বিস্তৃত উপকূলভাগে জার্মানির এই বিমান আক্রমণে বাধা দেওয়া ইংরেজের পক্ষে কঠিন। ফ্রান্স কিংবা জার্মানি হইতে ইংলণ্ডে উড়োজাহাজের আক্রমণে বাধা দিবার পক্ষে রক্ষাব্যবস্থা অনেকটা সীমাবদ্ধ; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা নয়। ব্রিটিশ বিমানবহরের উপর ইহাতে নূতন দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে এবং সম্ভবত ইংরেজ আয়র্লণ্ডে উড়োজাহাজের ঘাঁটি করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাধা হইতেছে ডি ভেলেরার নীতি। ডি ভেলেরা সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতার উপর জোর দিতেছেন। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এমন ক্ষেত্রে ডি ভেলেরার উপর চাপ দিয়া আয়র্লণ্ডে একটা অনর্থ বাধান সমীচীন বোধ করিবেন বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং তাঁহারা আলস্টারেই সম্ভবত বিমান-বহরের ঘাঁটি বসাইতে চেষ্টা করিবেন। অপর পক্ষে ব্রিটিশ জাহাজকে আমেরিকায় গিয়া মালের চালান লইতে হইবে, মার্কিনী আইনে এই যে বিধান আছে, তাহার পরিবর্তন সাধন করিয়া আমেরিকার জাহাজ যাহাতে ইংলণ্ডে আসিয়া মাল দিয়া যাইতে পারে, এমন ব্যবস্থা করিবার জন্য রুজভেল্ট উদ্যোগী হইতে পারেন এবং তাহার ফলে আমেরিকা ঘনিষ্ঠতরভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতেছেন যে, আমেরিকার ব্রিটিশ সাহায্যের নীতি ক্রমে পরিপূর্তি লাভ করিয়া আগামী বসন্তকালে জার্মানির সঙ্গে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে গিয়া দাঁড়াইবে। মোটের উপর, ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকা যদি যুদ্ধে নামে জার্মানির বিরুদ্ধেই নামিবে, জাপানের বিরুদ্ধে নয়। রুশিয়া যেমন অনিশ্চিত আছে, যুদ্ধের গতি স্থূলতর রকমে নূতন আকার ধারণ না করা পর্যন্ত তাহাই থাকিবে এবং যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিয়া রুশিয়া চাতুর্যপূর্ণ উপায়ে নিজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে। রুশিয়ার পক্ষে যুদ্ধের এই স্থূলতর বিপর্যয় যদি আসে বলকানের দিক হইতেই আসিবে এবং তুরস্ককে জড়াইয়া ফেলিবে কি না বলা যায় না।

অনন্যশরণ

শ্রীনীরদবরণ (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম)

হে পূর্ণ, আনন্দময়, রাত্রি দিন রহি তব পাশে;
তব হাসি, তোমার করুণামাখা আঁখির আবেশ
আনে কোন্ ভাষাহারা জগতের প্রদীপ্ত আভাসে!
তব কথা জীবনের ছন্দোহীন পথক্লান্তি মাঝে
সংগোপনে রেখে যায় অনাহত কল্লোলের রেশ
তার ধ্বনি হৃদিতলে নির্ঝরের মন্দ্রসম বাজে।

কিন্তু তবু আশা না পুরায়, কতবার মনে হয়
ধরণীর কেন্দ্রমাঝে আমার প্রাণের মন্দাকিনী
এখনও সচলা; তাই সত্য মিথ্যা—মিলিত প্রণয়
রচে দীপ্ত মায়াস্তূপে মসীময় আবরণে ঢাকা;
চিহ্ন তার প'ড়ে থাকে—যেন কোন্ বিষাদরূপিণী
মূর্তির ললাটপ্রান্তে সিন্দুরের শেষ স্মৃতি আঁকা।

যবে আত্মবিদ্রোহের বহ্নিময় দুর্দম অশনি
ভাঙে স্বপ্ন-কারাগার; চেতনার মুক্তিপ্রস্রবণ
খুঁজে ফিরে আপনার প্রকাশের দুর্লভ সরণী
দুর্ভেদ্য প্রাকার হ'তে উন্মুক্ত সাগরে, যেথা নাই
কালের কুটিলাবর্তে নিষ্পেষিত জীবন মরণ,
অসীম তন্দ্রার মাঝে জাগরণ কম্পিত সদাই।

তোমার জাগ্রত অগ্নি সঞ্চারিত প্রতি ধমনীতে;
তাই তো তোমার পানে জ্বলে শুভ্র প্রাণের প্রদীপ,
তার ঊর্ধ্ব শিখা আনে বিনশ্বর এই অবনীতে
অমৃত পিপাসা; বার বার নামি' এই ধরাতলে
সৃষ্টির অন্তর অর্ঘ, ওগো সর্ব জীবন অধিপ
স্বহস্তে তুলিয়া ধর বৃন্তসম নিশার উৎপলে।

হায়, তবু প্রশ্ন জাগে, কেন দ্বিধা, সংগ্রামের ছায়া
পর্বতের অন্তরালে লুক্কায়িত অশরীরী সম
চকিতে আচ্ছন্ন করে অপার্থিব সংবিতের কায়া,
আমার সুষুপ্তি লগ্ন অন্তরের ঊষার বেলায়,
যেথা শুধু নিশান্তের অকলঙ্ক তারকা-মরম
কাঁপে ধীরে কালহীন অম্বরের শান্ত মেখলায়।

এ প্রশ্নের তৃপ্তি নাই, নাই তার আদি অন্ত সীমা;
আঁধার প্রচ্ছদপটে আবরিত সুনীল সরসী
যেমন বিম্বিত করে নক্ষত্রের নিস্তব্ধ মহিমা,
তেমনি হে আলোর ভ্রমর, তোমার গুঞ্জন রবে
হৃদয়ের সুপ্তোত্থিত পূর্ণিমার শ্বেত পদ্ম-শশী
উদ্ভাসে মানসলোকে অপরূপ আত্মার বৈভবে।

কিন্তু এ যে প্রথম সোপান শুধু, তার চন্দ্রভাতি
দেখায় আকাশপারে অতীন্দ্রিয় বিশাল জগতে,
অক্ষয় আনন্দ যেথা মৃত্যুহীন জীবনের সাথী;
বিশ্বের উপরে বিশ্ব, আবরণ পরে আবরণ,
সপ্তভানু দীপ্যমান—অনাদির চিন্ময় সম্পদে,
সেথা অধিষ্ঠান তব ত্রিলোকের অনন্যশরণ।

সেথা হ'তে এলে কি এ ভূমিতলে, হে যুগের তৃষা?
নিখিল আপ্লুত তব আনন্দের সৌররস লভি';
খুলিল দুয়ার; যেন আচম্বিতে প্রলয়ের নিশা
সংবরিল রুদ্ররূপ, সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশিনী ক্ষুধা;
ধীরে ধীরে মুক্ত হ'ল ত্রিদিবের নিরঞ্জন রবি,
তার হেম মর্মপুটে আপনারে সঁপিল বসুধা।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[৭]

ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়া যাইবার পর অমল নিশ্চিন্ত হইয়া কামরার ভিতর দিকটায় দৃষ্টিপাত করিল। আর দুটিমাত্র আরোহী ছিল, তাহাদের একজন মারোয়াড়ী, সারা বেঞ্চ জুড়িয়া বিছানা পাতিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছে। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণই ইহারা অর্থ চিন্তা করে বলিয়া ঘুমাই-বার অবসর পায় না। সেইটা পুষাইয়া লয় ট্রেনে। যেখান হইতেই উঠুক এবং যতটুকুই যাক না কেন গাড়িতে উঠিলেই ঘুমাইতে শুরু করে। আর একটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ভোরবেলা উঠিয়াই একটি পকেট গীতা পাঠ করিয়া প্রাতঃকৃত্য বোধ করি সারিয়া লইলেন। এইবার বেঞ্চির নীচে হইতে তামাকের সরঞ্জাম বাহির হইল। ভদ্রলোকের দীর্ঘ দেহ, রং হয়তো এককালে গৌরবর্ণই ছিল, এখন পুড়িয়া গিয়াছে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তাহার অধিকাংশই পাকা; পরনে উকিলদের মত চোগা চাপকান। অমল মনে মনে ভাবিল যে হয়তো ভদ্রলোক উকিলই হইবেন।

কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে দিতে সহসা মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি দেখছেন, তামাক খাচ্ছি তাই? বড়ই বদ অভ্যাস হয়ে গেছে, বিড়ি সিগারেটে আর চলে না।"

তার স্মিত প্রসন্ন মুখে হুঁকার মুখে কলিকাটি বসাইয়া দুই-চারিটি টান দিয়া কহিলেন, "কত দূরে যাবে বাবা তুমি? তুমিই বলি, তুমি আমার নাতির বয়েসী।"

অমল কহিল, "আজ্ঞে টিকিট কেটেছি তো দিল্লির, তার পর এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছই, কে জানে।"

ভদ্রলোক মুখ হইতে হুঁকাটা নামাইয়া একবার অমলের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, তার পর কহিলেন, "বাড়ি থেকে পালিয়ে আসছ বুঝি বাবা? কিন্তু এ পথ তো ভাল নয়, ওতে শুধু কষ্ট পাওয়াই সার হয়।"

অমল লজ্জিতভাবে কহিল, "আজ্ঞে এখন পালিয়ে আসছি না, এসেছি অনেক দিন আগে, সেই থেকেই পথে আছি।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া তামাক টানিবার পর পুনশ্চ কহিলেন, "দিল্লিতে যাচ্ছ কাজকর্মের চেষ্টায় কি?"

অমল ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "হাঁ।"

"সুবিধে হবে?"

"কি ক'রে বলব বলুন। তবে শুনেছি অনেক বাঙালী আছেন, হয়তো কিছু হ'লেও হ'তে পারে।"

"কিচ্ছু হবে না। এ কি মারোয়াড়ী পেয়েছ যে মারোয়াড়ী দেখলেই একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবে? তা ছাড়া তোমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে হ'লেও বরং কথা ছিল, তবু বাঙাল-দের আশ্রয় পেতে, ওদের ওই গুণটা আছে।"

আরও কিছুক্ষণ তামাক টানিবার পর কহিলেন, "আর ওদের দোষটা-ই বা কি। কত বাঙালীর ছেলে যে নিত্য এইভাবে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। সকলেরই আবদার চাকরি ক'রে দাও, নিদেন ভাল টিউশনি দাও। ব্যাবসা কেউ করবে না; যদি বা ধ'রে বেঁধে ব্যাবসাতে নামিয়ে দেওয়া হ'ল, তো কিছু দিন থেকে, পাঁচজনকে ডুবিয়ে, বাঙালীর মুখ পুড়িয়ে একদিন ডুব মারবে।

"তুমি জান না বাবা, কিন্তু আমি জানি, সকাল-সন্ধ্যেয়, অফিসে প্রত্যহ কত বাঙালীর ছেলেকে তাড়াতে হয়। তার উপর দুপুরবেলায় মেয়েদের কাছেও তাদের আবেদন-নিবেদন আছে। কারুর পথ খরচা হারিয়ে গেছে, কেউ বা বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, কেউ বা রুগ্ন স্বামীর ওষুধ-পথ্যের জন্য বেরিয়ে পড়েছে ভদ্রভাবে ভিক্ষে করতে! তার পরেও আর কি ক'রে সহানুভূতি থাকে লোকের বল?"

অমল রীতিমত দমিয়া গেল। শুষ্কমুখে একবার মনে মনে স্মরণ করিয়া দেখিল তাহার সামান্য কয়েকটি টাকা মাত্র সম্বল। এই সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করিয়া দূরে বিদেশে কত দিন চলিবে কে জানে। তাহার পর?

অনেক ক্ষণ ভাবিয়াও যখন কোনও হদিস পাওয়া গেল না, তখন সে জোর করিয়া প্রসঙ্গান্তরে যাইবার চেষ্টা করিল। প্রশ্ন করিল, "আপনি কি করেন?"

ততক্ষণে তাঁহার তামাক খাওয়া শেষ হইয়াছে। তিনি কলিকার ছাইটা ফেলিয়া দিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিলেন, তাহার পর অল্প কিছুক্ষণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "জুচ্চুরি।"

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে তাহার মুখের ভাবটা কি-রূপ হওয়া উচিত, অর্থাৎ কথাটা পরিহাস কিংবা তাহার প্রশ্নের ধৃষ্টতার জন্য তিরস্কার, কিংবা সত্য, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত অমল হাসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তিনিই বাঁচাইলেন, কহিলেন, "এতে তোমার অপ্রতিভ হবার কিছুই নেই বাবা সত্যিই আমার পেশা জুচ্চুরি।"

অমল কহিল, "তার মানে?"

তিনি যেন একটু করুণভাবে হাসিলেন, কহিলেন, "ষোল বছর বয়স থেকে ওই পথই ধরেছি, আর ছাড়তে পারি নি। টাকা আসে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তাও কম নয় বাবা। কিন্তু এখন উপায় কি। যে জাল নিজে বুনেছি, তার মধ্যে নিজেই এমনভাবে জড়িয়ে গেছি যে আর বেরবার উপায় নেই। আমার বাবা ছিলেন নাম করা উকিল, দাদাও তাই হলেন, কিন্তু আমি গেলুম অন্য পথে। মায়ের অত্যধিক আদরে পড়াশুনো হ'ল না বটে, কিন্তু তাই ব'লে আহাম্মক ছিলুম না, শুরু করলুম লোকজনকে ঠকাতে। মাকে আর ভাইকে দিয়ে শুরু করলুম; তার পর বাইরের লোককে।"

কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, "বছর ত্রিশেক বয়সের সময়, তখন আমি দাদারই মুহুরীগিরি করি, আইনেও একটু একটু দখল হয়েছে। একদিন দাদার এক মফস্বলের কেস এল।

মোটা টাকা, কিন্তু দাদা বললেন, 'লিখে দে, আমি যেতে পারব না অন্য কাজ আছে।' আমি দাদাকে কিছু না ব'লে চ'লে গেলুম, দাদারই পোশাকে আর দাদারই নাম লেখা এক পুরনো ব্যাগ নিয়ে। কেস করলুম। শুধু তাই নয় মক্কেলের মামলা জিতলুম! মোটা টাকা নিয়ে ফিরছি এমন সময় যে পক্ষ হেরেছে তারা কোথা থেকে খবর পেয়ে পুলিসে খবর দিলে। ধরা প'ড়ে একেবারে শ্রীঘর!"

উপন্যাসের মত এই বিচিত্র কাহিনী অমল রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, "তার পর?"

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "বছরে দুজন ক'রে কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া হয় মিশনারী সাহেবদের অনুরোধে। অর্থাৎ কেউ পাপের জন্য সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্বর্গীয় প্রভু'র শরণাপন্ন হ'তে চায় এমন কোনও লোক দেখে তাঁরা অনুরোধ করলে সরকার খ্রীষ্টধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেন। সে খবরটা আমি জানতুম। কিছু দিন ধ'রে এমন নিটোল অভিনয় শুরু করলুম যে মাস ছয়েক যেতে না যেতে আলেকজান্ডার বিভাস রায় জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। বলা বাহুল্য ঘরে স্ত্রী ছিল, পুত্রকন্যাও দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাঁরা আর আমার সঙ্গে ঘর করতে রাজী হলেন না। আমারও শাপে বর হ'ল, এক খ্রীষ্টানী বিধবার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ ক'রে বুড়ীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক হয়ে বসলুম। তার পরও যে সৎপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার চেষ্টা করি নি তা নয়, কিন্তু হ'ল না। তিন-চার রকম ব্যবসা করতে গেলুম কিছুই হ'ল না, শাশুড়ী ঠাকরুনের যে কটি টাকা ছিল, সেই কটিই শুধু গেল। তখন আবার জুচ্চুরি ধরলুম। খুলেছি দেশে একটা ইস্কুল, সমস্ত রকম শিল্প ও সাধারণ লেখাপড়া শেখাবার জন্য। এখন কাজ শুধু তারই নাম ক'রে সাহেবসুবোদের কাছ থেকে মোটা চাঁদা আদায় করা।"

অমল এতক্ষণ পরে কথা কহিল, প্রশ্ন করিল, "চাঁদা পাচ্ছেন?"

"পাচ্ছি বই কি। দেখ ব্যপু, নিজের জন্য ভিক্ষে করতে গেলে মাথা হেঁট ক'রে যেতে হয়, সেখানে মেলেও কচু। কিন্তু পরের জন্য ভিক্ষে করতে নিজের তো কোনও লজ্জাই নেই, বরং যে দিতে না পারে, সেই লজ্জিত হয়। বেশ আছি, আমি রেক্টর আর আমার স্ত্রী লেডি সুপারিনটেন্ডেন্ট। মোটা মাইনে দুজনের নামে। চীফ জাস্টিস ম্যাকগ্রেগর সাহেব বলতেন, পরোপকারের নামে জুচ্চুরি করাও ভাল; তবু, যারা দেয় তাদের উপকার হয়।"

ভদ্রলোক আবার তামাক ধরাইলেন। তার পর পাঁচটা এ-কথা সে-কথা কহিবার পর কহিলেন, "তুমি লেখাপড়া কত দূর শিখেছ বাবা?"

অমল একটু লজ্জিতভাবে কহিল, "ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম, তার পর আর অর্থাভাবে পড়া হয় নি। তবে দিনকতক দুপুরবেলা ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ইংরেজী সাহিত্য আর ইতিহাস একটু আধটু নাড়াচাড়া করেছিলুম।"

ভদ্রলোক সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "ইংরেজী চিঠি পড়তে বা জবাব লিখতে পারবে? অবশ্যি আমি বলে দেব।"

অমল কহিল, "কেন পারব না; প্রেসিরাইটিং আর ড্রাফটিং দুটোই আমি শিখছিলুম যে।"

বাস। তুমি এক কাজ কর। দিল্লিতে আমি মাসখানেক থাকব। হোটেলে একটা বড় ঘর নিয়েই থাকব। ইচ্ছেই ছিল ওখানে গিয়ে চাকর আর সেক্রেটারি রাখব এক মাসের জন্যে; মিছিমিছি দেশ থেকে নিয়ে এলে খরচা বাড়ত, তা তুমিই ওই সেক্রেটারির কাজটা নাও না। কাজ আমার সামান্য, ওটা শুধু লোক দেখানো রাখা, অথচ এক মাস তোমার খাবার আর থাকবার ভাবনা থাকবে না, সেই এক মাসে তুমি কাজকর্ম খুঁজে নিতে পারবে। দেখ, রাজী আছ?"

"রাজী," অমল কহিল, "তা হ'লে তো আমি বেঁচে যাই।"

বিভাসবাবু খুশী হইয়া কহিলেন, "তা হলে ওই কথাই থাক। একটা চাকর শুধু খুঁজে নেওয়ার মামলা, তা চাকর ঢের পাব, কি বল?"

একটু থামিয়া কহিলেন, "এখানে এই অবস্থা দেখছ, তামাক নিজেই সেজে খাচ্ছি আর যাচ্ছি থার্ড ক্লাসে, দিল্লিতে পেঁছে কিন্তু চিনতেই পারবে না। ওই যে দেখছ আমার ট্রাঙ্ক, ওতে যা পোশাক আছে তা আধা দামে বেচলেও তোমার এক বছরের খরচ চলে যাবে। ওটা চাই, বুঝলে? ভেক না হলে ভিক্ষে মেলে না। সোনার বোতাম আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে যারা চার পয়সা চাঁদা নিতে আসে, তাদের ফিরতে হয় না কারও কাছ থেকেই।"

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, ততই ভুবনবাবুদের কথা মনে পড়িয়া অমলের মন খারাপ হইতে লাগিল। শুধু নিরাপদ আশ্রয় নয়, একটু স্নেহও সেখানে পাইয়াছিল বই কি। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞের মত তাঁহাদের ছাড়িয়া আসা বোধ হয় উচিত হইল না। এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। শুধু কি তাহাই! আবার এই যে সে অকূলে ভাসিল, এ ভাসার শেষ যে কবে হইবে কোথায় হইবে তারই বা ঠিক কি। স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া বেড়ানো জীবন ভাল লাগে না।

বিভাসবাবু মোগলসরাইএ খাবার কিনিলেন, শুধু তাঁহার মত নয়, অমলের মতও। আশ্চর্য তাঁহার দৃষ্টি, খাইতে খাইতে কহিলেন, "মন খারাপ লাগছে, না? বাড়ির জন্যে না এখন যেখান থেকে আসছ তাঁদের জন্যে?"

লজ্জিতভাবে হাসিয়া অমল কহিল, "দুইই বোধ হয়।"

বিভাসবাবু কহিলেন, "উঁহু, ওটা ভাল নয়। এ পৃথিবীর মুসাফিরিতে পিছনের দিকে ফিরে কখনও চাইবে না, বুঝলে? তা হ'লেই দুঃখ পেতে হবে। মহাভারত পড়েছ তো? যুধিষ্ঠিরের যাত্রা মনে আছে? তিনি পিছনে ফিরে চান নি ব'লেই নিরাপদে ও নির্বঘ্নে স্বর্গে গিয়ে

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চিকাগোর পথে

[ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি]

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

এতগুলি লোক সঙ্গে নিয়ে হোটেলে যেতেই ম্যানেজার মশায় অবাক হয়েছেন ব'লে মনে হ'ল। একটা কালো লোক, তার পিছনে এত শ্বেতকায় এল কেন? বাস্তবিকই আশ্চর্যের কথা। আমি তো ফাদার ডিভাইন নই, অথবা ভারতের অকালটিস্ট বা স্পিরিচুয়্যালিস্টও নই যে আমার পিছনে পিছনে লোক ঘুরবে! যাঁরা আমার সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই বেকার। বেকার প্রধানত দুই রকমের। প্রথম হ'ল তারা যারা কাজ পেলেই কাজে লেগে যায়; তা, মনিব তাদের উপর যেরকমই ব্যবহার করুক না কেন। তারা চায় শুধু কাজ এবং আপন পরিবারের ভরণপোষণ। দ্বিতীয় প্রকারের বেকারও আবার দু'রকম। এক হ'ল তারা যারা কাজ পেলেও করতে চায় না; আলস্যই তাদের সমস্যা। আর হ'ল তারা যারা কাজ করতে সকল সময়েই রাজী, কিন্তু প্রবল ও বিচিত্র আত্মসম্মানবোধই তাদের বাধা। তারা মরবে তবু কাজ করবে না। তারা বলে, কাজ (jobs) যখন nationalised হবে তখন তারা কাজ করবে, তার পূর্বে নয়। অর্থাৎ মনিবতন্ত্র থাকবে না, সভার পরিচালনায় কাজ চলবে। সে কি সহজ কথা? এই শেষের মতের লোকগুলিই আমার সঙ্গে হোটেলে এসেছিলেন।

তাদের কথা শুনে আমার মনে দুঃখ হয়েছিল! আমি এ জীবনে অনেক মনিবের অধীনে কাজ করেছি। ভাল ক'রেই জানি মনিব-ভৃত্য সম্বন্ধ জিনিসটা কি। মনিব-ভৃত্য সম্বন্ধ আমাদের দেশের লোককে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই, সকলেই মর্মে মর্মে বোঝে; যদিও মুখ ফুটে বলতে চায় না। যা হ'ক এরূপ মনিব-ভৃত্য সম্বন্ধ উঠিয়ে দিয়ে সভার মারফতে কাজ করা সহজ কথা নয়। কথায় কথায় ফোর্ডের কারখানার কথা উঠল। ফোর্ডের কারখানায় যারা চাকরি করেন তাদের মাইনে বেশ ভাল, তবুও মনিব-ভৃত্য সম্বন্ধ তো রয়েছে, এই হ'ল তাদের কথা। আমি আর কি বলব, আমি একজন হিন্দু মাত্র, আমার মধ্যে মনিব-ভৃত্যের সম্বন্ধের দুঃখের অনুভূতি হয়তো তেমন নেই, যেমন আমেরিকানদের আছে। তারা আমাকে মনিব-ভৃত্য সম্বন্ধের ব্যাপারটা রাত্রি চারটে পর্যন্ত বোঝাল, তার পর বিদায় নিলে।

আমাদের সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের লোকের ধারণা কি তা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। তার জবাব আমি অনেককে অনেক ভাবেই দিয়েছি, তবে অনেক কথা ভাল ক'রে এখনও বলা যেতে পারে না। যারা দক্ষিণেশ্বরের নূতন মন্দির দেখে আমেরিকানদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁরা নিতান্তই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছেন। আমেরিকার লোক আমাদের মোটেই পছন্দ করে না। তবে এক শ্রেণীর লোক আমাদের সম্বন্ধে আজকাল বেশ সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করে ব'লে মনে হয়; তারা হ'ল বেকার। সেই বেকার দলের সংখ্যা প্রত্যেক দিনই বাড়ছে। তাদের সংবাদপত্র আছে, তাদের উদ্দীপনা, তাদের প্রচার, তাদের কাজের শৃঙ্খলা, সবই আছে। কখন যে এই বেকারের দল মেজরিটি পেয়ে প্রেসিডেণ্ট ঠিক ক'রে বসে তার ঠিক নেই। তবে এদের কাজের নমুনা, মনের ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা দেখলে মনে হয় ওরা পিছিয়ে নেই, এগিয়েই চলেছে। আমেরিকার এমন নগর নেই, এমন কারখানা নেই, এমন পল্টন নেই, যেখানে এই দলের লোক না আছে। অথচ মজা এই, এরা বেকার। অনেক সময় এরা কাজ করে, তথাপি বেকার ব'লে পরিচিত। বড়ই আশ্চর্যের কথা বটে।

হোটেলের চারিপার্শ্বের অবস্থা অনুধাবন ক'রে দেখলে মনে হয় এখানে কারও ঘুম আসতে পারে না। আমার কি ক'রে যে সেখানে ক ঘণ্টা ঘুম হ'ল তা নিজেই বুঝতে পারি নি। প্রাতে দশটার মধ্যেই নিদ্রার অবসান হ'ল। ইচ্ছা হ'ল একবার হিন্দুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখনই মনে হ'ল তার চেয়ে হিন্দুদের সঙ্গে না মিশে মনের আনন্দে কোথাও গিয়ে নূতন লোকের সঙ্গে ভাব করি। শেষে জাতীয় ভাবেরই জয় হ'ল। লাফিয়েট স্ট্রীটের সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। আমেরিকার স্ট্রীট বের করা অতি সহজ ব্যাপার। প্রত্যেকটি স্ট্রীট সোজা। ইউরোপ এবং এসিয়ার রাস্তার সঙ্গে আমেরিকার রাস্তার মোটেই মিল নেই। এদের রাস্তা নির্মাণ করবার পদ্ধতি দেখে এদের মনের একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

লাফিয়েট স্ট্রীটে এসেই দেখা হ'ল মিস্টার হাসিমের সঙ্গে। হাসিম পূর্বে অশিক্ষিত ছিলেন, আমেরিকায় গিয়ে লেখাপড়া শিখেছেন। তাঁর হৃদয়ে অদম্য শক্তি, কাজে অসাধারণ পটুতা, দেশভক্তি তাঁর প্রবল। দেশের জন্য আত্মবলিদানে তিনি সদাই প্রস্তুত। লোকটি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং থাকবার জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত—নাগকে একটা কুঠরি ভাড়া করে দিতে বললেন। তিনি পনর মিনিটের মধ্যে আমার জন্য ঘর ঠিক ক'রে দিয়ে বললেন, "settle up yourself then we will have talk"। আমি তাকে বাধা দিয়ে দুজনকেই বললাম, "চলুন আমার রুমেই গিয়ে বসি; সেখানে বিশ্রামও হবে কথাও হবে।"

কংগ্রেস স্ট্রীটে আমার জন্য ঘর ভাড়া করা হয়েছিল। বাড়ির মালিক হাঙ্গেরিয়ান। কথা হ'ল অনেক। নাগ হলেন একজন বেকার। তিনি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনও কাজ করতে রাজী না হওয়া দলের লোক। হাসিম হলেন গোঁড়া ন্যাশনালিস্ট, ভারত ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। উভয়ের মধ্যে যদিও মতের মিল নেই তবুও ঝগড়াও নেই। বিদেশে আবার আমাদের পলিটিক্স কিসের? এই কথাটির দ্বারা অনেক সময় প্রবাসীরা অনেক অনর্থের হাত থেকে রক্ষা পান। অবশ্য বিশেষ বিশেষ কারণে এদের মধ্যে পিস্তলবাজিও অনেক সময় চ'লে থাকে।

দুপুরে আমরা আমাদের দেশের লোকের দ্বারা পরিচালিত রেস্তোরাঁতে খেয়ে এলাম। খাদ্যের সুন্দর বন্দোবস্ত দেখলে অবাক হ'তে হয়। ডাল পাওয়া যায় না ব'লে আমেরিকান পীচ দিয়ে ডাল তৈরী করা হয়। হলুদের বদলে স্পেন থেকে একরকম হলদে গুঁড়ো আনিয়ে তাই ব্যবহার করা হয়। আমেরিকাতে যে লঙ্কা পাওয়া যায় তা মিষ্টি। কিন্তু কাঁচা লঙ্কার গন্ধ তাতে আছে, সেই গন্ধ পাবার জন্য মিষ্টি লঙ্কার সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে তরকারিতে দেওয়া হয়। তবুও ভারতীয় তরকারি খাওয়া চাই। মাঝে মাঝে আমেরিকার ধনী নিগ্রোরা এবং সাদা নিগ্রো'রাও 'হিন্দু কারি'র আস্বাদ নিয়ে যান। ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে তার 'কারি' আর 'শাড়ি' কম উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতীয় প্রথায় বাইরে কোথাও হাতে ক'রে খেতে দেওয়া হয় না। যদি হাতে খেতে হয় তবে ভিতরে ব'সে খেতে হবে, বাইরে ব'সে খেতে হ'লেই কাঁটা চামচ ব্যবহার করতে হবে।

দুপুরবেলা খাবার সময় আমার আগমনে হিন্দুদের মধ্যে এক সাড়া প'ড়ে গেল। সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের ডাকা হ'ল। তাদের সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। কিন্তু আমাকে হিন্দুরা পূর্বেই বলেছিলেন যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিষয়ে কথা বলতে হবে। কি বলতে হবে? না, "out and out you should be a nationalist."। তাই হ'ল; যাঁরাই এলেন, শুধু হিন্দুস্থান ও হিন্দু ছাড়া আর কোনও বিষয়ে কিছু বললাম না। 'হিন্দু' শব্দটা

ব্যবহার করতে অনেক মুসলমান প্রাণে ব্যথা পেয়ে থাকে তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তা বললে কি হবে, উপায় নেই; ইণ্ডিয়ান বললে তারা আবার Red Indian সমঝে ব'সে থাকবে। ন্যাশন্যালিজম আজকালকার দিনে পুরনো কথা। আমি ন্যাসনেলিস্ট হয়ে একটি সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু দেব (ত্রিপুরা) আমাকে সেই আলাপে সাহায্য করেছিলেন।

"আপনি বলছেন, জাতে আপনি হিন্দু, দেশ হিন্দুস্থান যাকে ইংরেজীতে লেখা হয় India। আপনাদের দেশের সকল লোকই যে স্বাধীনতা চায় সে কিরূপ স্বাধীনতা?"

"এই ধ'রে নিন কানাডার মত Dominion Status"।

"এতে কি আপনাদের দেশের লোক সুখী হবে, না হ'তে পারে? রাজা, নবাব, জমিদার এসব কি রাখতে চান? এতে কি real state owner-এর সংখ্যা বাড়বে না? গরিবের সর্বনাশ হবে না? এতে কি সাদা পুঁজিবাদীদের জায়গায় কাল ('brown') পুঁজিবাদীদের বসানো হবে না?"

"তা হ'ক মশায়, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।"

"এই ধ'রে নিন হরিজন, দরিদ্র এরা কি উন্নতি লাভ করতে পারবে? এরা কি এদেশের নিগ্রোদের মত শিক্ষিত হয়েও, ধনী হয়েও সমাজের উচ্চ স্তরের লোকের সঙ্গে মিশতে পারবে? এরা কি মানুষ ব'লে গণ্য হবে?"

"হ'ক না হ'ক বয়ে গেল, আমাদের স্বাধীনতা হ'লেই হ'ল।"

"এই ধরুন মুসলিম লীগ, হিন্দুসভা, এরা কি স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ভার ভাল ক'রে নিতে পারবে? মহাত্মা গান্ধী কেন তবে সুভাষকে তাড়িয়ে দিলেন? কংগ্রেস তো ব্রাউন পুঁজিবাদের একটা ধামাধরা প্রতিষ্ঠান মাত্র, এরা কি এই Dominion Status নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে?"

"খুব, খুব"।

লোকটি অনেক ক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর বললে, "এই রকম বিদ্যা নিয়ে পৃথিবী পর্যটন আপনার উচিত হয় নি। এখন আসি। যদিও আমি হার্স্ট'এর সংবাদ পত্রে লিখি, তবুও আপনার সংবাদ ছাপব না। লোকটি বিদায় নিলে। 'টাইমস' নামক সংবাদপত্র আমার সম্বন্ধে কিছুই ছাপে নি। শ্রীযুক্ত দেবকে বলেছিলাম, "মশায়, যা বলতে বলেছিলেন তাই বলেছি, তারই ফলে হার্স্ট-এর কাগজ কিছুই ছাপতে চাইল না"। দেব বললেন, "Forget it"।

মনে ছিল আশা

(১০ পৃষ্ঠার পর)

পৌঁছলেন, বাকী সকলের পতন হ'ল। এই দেখছ তোমার জন্য খাবার কিনলুম, তোমাকে আশ্রয় দেব বললুম, কিন্তু এই মুহূর্তে রেলে কলিশন হয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় আর আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে তোমার জন্য একটুও দুঃখিত হব না, নিজের জন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেব।"

অমল কথাটা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া বিভাসবাবু হাসিলেন মাত্র। প্রশান্ত মুখে তাঁহার লজ্জা বা দুঃখের স্থান মাত্র নাই, কহিলেন, "দুঃখ পাবে বাবা তুমি। ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়েছ তখন পথকেই তোমার আপন ব'লে চিনে নিতে হবে— পথে তো আত্মীয় নেই!"

(ক্রমশ)

চলো

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

চলো হেঁটে যাই জ্যোৎস্নায় ছাওয়া জনহীন রাজপথে,
ছোট গৃহকোণে এখনো কি কাজ বাকী?
গভীর রাতের যে ছায়া পড়েছে রামগিরি পর্বতে,
আমি শুধু তারি বার্তা বহিব নাকি।

২

আষাঢ়ের মেঘ ভেসে গেছে কবে শ্রাবণের বুক দিয়ে,
লক্ষ্য রেখেছ কিছু?
আপন কাজের গভীর জ্বালের গরম প্রেরণা নিয়ে—
ফিরিবে না মোটে পিছু?

৩

হে পরমা, আমি একা ভাবি তাই নির্জন রাত্রিতে,
তোমার জীবনে সময় আসিবে কবে;
আমার সমুখে যে-পথ ছড়ানো ভরে নি তা যাত্রীতে,
মেঘ সন্ধ্যায় কবে তা মুখর হবে।

৪

বড় সাধ যায় চলো হেঁটে যাই জীবনের রাজপথে
মরু মেরু হীন তেপান্তরের পার,
চলো দেখে আসি কি ছায়া পড়েছে রামগিরি পর্বতে,
থাক্ না পিছনে ধু ধু মরু সাহারার।

[১]

স্থির হয়ে গেল, চাকরিটা কিছু নয়। আর কিছু ঠিক হ'ল না।

কথা হচ্ছিল চার বন্ধুতে, একটা মেসের নাতিপ্রসর ঘরে ব'সে। দুখানা তক্তাপোশ, দুজোড়া তথাকথিত টেবিল চেয়ার, দেওয়ালে টাঙানো দুটো ব্র্যাকেট, মেঝের উপর চা-এর সরঞ্জাম, তক্তাপোশের তলায় ময়লা ধুতি জামা, সাত জোড়া জুতো এবং অপরিমিত জঞ্জাল ছিল সে ঘরের আসবাব।

একখানা তক্তাপোশের উপর চরম আলস্যের সঙ্গে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল বাঁড়ুজ্যে। তার পিতৃদত্ত নাম হর্যক্ষ-বিক্ষোভ। তার চর্বিবহুল পুরুষ্টু চেহারায় হর্যক্ষের বিক্ষোভ না হয়ে লোভ হওয়ারই ষোল আনা সম্ভাবনা এই ইঙ্গিত ক'রে কেউ কেউ তাকে হর্যক্ষলোভন নাম দেবার চেষ্টা করেছিল। আবার কেউ বা তার চর্বিচাপা চোখের দিকে ইঙ্গিত ক'রে তাকে দু-এক দিন কুৎকুতাক্ষ ব'লে ডাকবার প্রয়াস করেছিল। এসব চেষ্টায় মাঝে মাঝে শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা হয় ব'লেও কতকটা, আর ওই দুষ্প্রাপ্য নামটা উচ্চারণ করার অসুবিধাতেও কতকটা, সর্বসম্মতিক্রমে তার বন্ধুরা ওটা বর্জন ক'রে তার বংশগত নামেই তাকে সম্ভাষণ করত। শুয়ে থাকবার দিকেই বাঁড়ুজ্যের বেশী পক্ষপাত; বলতে, দাঁড়াতে, চাই কি হাঁটতেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু দৌড়তে তাকে কেউ কোনও দিন দেখে নি।

শ্রীবিলাস অপর তক্তাপোশের উপর খাড়া হয়ে ব'সে ছিল। ছিপছিপে গৌরবর্ণ ছোকরা। সে বসে কম, বেশীর ভাগ ছুটেই বেড়ায়। সব বিষয়েই তার একটা সুস্পষ্ট মত আছে, এবং সে মত প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে না। যদিও তার সাময়িক মতগুলো কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং প্রায়ই হঠাৎ উলটে যায়, তবু যখন যে মতটা থাকে তার স্বপক্ষে সে তর্কে সর্বদা প্রস্তুত এবং প্রয়োজন স্থলে তর্কের "সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো" ব্যবহার করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না।

তৃতীয় বন্ধুটি, নিখিলেশ, এ ঘরের আংশিক মালিক। সুপুরুষ সে, কিন্তু নিরতিশয় অপরিচ্ছন্ন। তার ঘরও যেমন, দেহখানিও তেমনি—অত্যন্ত অগোছালো। 'ঘরে বাইরে' প'ড়ে তার বাপ তার নাম দিয়েছিলেন নিখিলেশ, কিন্তু তার চরিত্র ও চেহারার ঝোঁক সন্দীপের দিকেই বেশী। তার যখন যে ঝোঁক হবে সেটা করাই চাই তার, আর তক্ষণই। আর ঝোঁক, কি কথায় কি কাজে, তার জীবনের প্রতি মুহূর্তের সহচর। শ্রীবিলাসের মত তারও মতামত গভীর বিচার বা গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তার মত বজ্রকঠোর, কখনও বদলায় না তার চেহারা। কাজে ও মতে তার খুব বেশী সামঞ্জস্য নেই, তাই জীবনের বেশীর ভাগটা কাটে তার কথা ও কাজের এই বিরোধ মীমাংসা করবার যুক্তির অন্বেষণে।

প্রমোদ একটা চেয়ারে ব'সে, পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে একখানা খাতার উপর পেনসিল দিয়ে অযথা আঁচড় কাটছিল। প্রমোদের হাতে কাগজ পেনসিল বা কলম নেই এমন মুহূর্ত কল্পনা করা যায় না, কেননা সে হবু-সাহিত্যিক, বেজায় লেখে, আর যখন লেখে না তখন সে কাগজের উপর সুধু আঁচড় কাটে। প্রমোদ কবি, কল্পনা বিলাসী, অথচ গুণ্ডার মত শক্তিমান; অ্যাডভেঞ্চারের কল্পনায় ভরপুর আর তার সন্ধানে যে কোনও পাগলামি সে মাঝে মাঝে ক'রে থাকে। খুব নিদারুণ কোনও হুজুক বা বিপরীত রকম সাহসের কাজ সামনে পেলে প্রমোদ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সাইকেলে ঢাকা যাবার সংকল্প ক'রে সে অনেক-দূর গিয়েছিল। একবার সার্কাসের দলে মিশে বাঘের খাঁচায় ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। আর এখন হাতে কোনও কাজ নেই ব'লে সে দমদমায় গিয়ে এয়ারোপ্লেন ওড়ানো শিখছে।

এরা সবাই এম এ পরীক্ষা দিয়ে এখন ধীরে সুস্থে বিচার করছে, ততঃ কিম্?

যখন সবাই বললে 'চাকরি কিছু নয়, তখন বাঁড়ুজ্যে একটা হাই তুলে বললে, "যা বললে, ও টক ফল খাবার অযোগ্য! মুসলমান, নমশূদ্র প্রভৃতি নিতান্ত মূর্খ যারা তারাই ওতে রস পায়।"

শ্রীবিলাস বললে, "কী, টক ফল! এতে সুধু এই প্রমাণ হচ্ছে যে, দাসত্বটা তোমার কতদূর মজ্জাগত। জান তো আমাদের ঋষিরা ব'লে গেছেন, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্ধং কৃষিকর্মণি, তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।"

পরম নির্লিপ্তভাবে বাঁড়ুজ্যে বললে, "কোনও ঋষি ও কথা বলেন নি, এবং কথাটা আগাগোড়া ভুল।"

"ভুল! কিসে ভুল?" নিখিলেশ গর্জন ক'রে উঠল।

বাঁড়ুজ্যে বললে, "প্রথমত ব্যাকরণের ভুল, বস্ ধাতু পরস্মৈপদী, 'বসতে' হয় না।"

"ওঃ! ব্যাকরণের কচ্‌কচি" ব'লে শ্রীবিলাস হো হো ক'রে হেসে উঠল।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বাঁড়ুজ্যে বললে, "দ্বিতীয়ত লক্ষ্মী পেঁচার পিঠে বাস করতে পারেন, পদ্মে থাকতে পারেন, চাই কি সাগরেও ডুব মেরে থাকতে পারেন, কিন্তু বাণিজ্যে—কখনও নয়, আর কৃষিকর্মে একেবারেই নৈব চ।"

"একথা কোন্ ঋষি বলছেন?" প্রমোদ জিজ্ঞাসা করল।

"আপাতত আমি, শ্রীহর্যক্ষ—"

"থাম, সর্বসম্মতিক্রমে ও নাম বাতিল, ওটা আর মুখে এনো না। কিন্তু এত বড় স্পর্ধা তোমার, যে, এতদিনকার পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করতে সাহস কর—কে তুমি?" নিখিলেশ বললে।

"আমি, আমি ঘরপোড়া গরু।"

"তুমি মুখপোড়া বাঁদর"; শ্রীবিলাস বললে।

বেশ গম্ভীরভাবে অনেকটা বিবেচনা ক'রে বাঁড়ুজ্যে বললে, "তাও বলতে পার, কেননা, মুখ পোড়া যাবার পর হনুমান আর কোনও দিন ল্যাজে আগুন বাঁধতে উৎসাহ দেখিয়েছেন ব'লে ইতিহাসে বলে না।"

"কিন্তু তোমার ল্যাজে আগুন এখনও জ্বলছে"—শ্রীবিলাস আরম্ভ করলে। তাকে বাধা দিয়ে প্রমোদ হঠাৎ উঠে বললে, "থাম, এ কথাটায় একটা উপন্যাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তোমার বক্তব্য বোধ হয় এই যে, তুমি ব্যাবসা ক'রে ঠেকে শিখেছ। সেই অপূর্ব কাহিনীটি ব'লে ফেল দিকিনি।"

শ্রীবিলাস বললে, "আমি কিন্তু আগে থেকেই ব'লে রাখছি যে, সে কথা আমি বিশ্বাস করব না।"

নিখিলেশ বললে, "আমিও না।"

প্রমোদ সায় দিয়ে বললে, "অবশ্যই নয়। বাঁড়ুজ্যের এরকম উপাখ্যান চিরদিনই অসত্য, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণে রসাল হয়। আমি রসের পূজারী, সত্যের পিপাসা আমার নেই, ব'লে যাও।"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "বিশ্বাস না করবার কোনও হেতু নেই, কেননা তার পাথুরে প্রমাণ আমি দিতে পারি। ম্যাট্রিক পাস ক'রে আমি আগরায় গিয়েছিলাম জান?"

প্রমোদ বললে, "হাঁ, সে কথা বার বার বলতে বলতে তুমি হয়তো নিজেই তা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ। আমরা সেটা অবিশ্বাস করি। আর এই উপলক্ষে আবার যদি তাজমহলের বর্ণনা শোনাতে চাও তো লেগে যাও।"

"তাজমহলেরই কথা বলব, কিন্তু শাজাহানের তৈরী তাজমহল নয়। আগরার পথের ধারে এখনও বহু শিল্পী ব'সে রোজ ছোট বড় অনেকগুলো তাজমহল তৈরি ক'রে থাকে, সে খবর বোধ হয় তোমরা শুনে থাকবে।"

নিখিলেশ বললে, "বাজে কথা ফের বলবে তো চড় খাবে। তোমার বাণিজ্যবার্তা বলতে চাও, বলতে পার, কিন্তু ও আগরার ফক্কুড়ি চলবে না।"

বাধা অগ্রাহ্য ক'রে বাঁড়ুজ্যে ব'লে গেল, "আমি তখন তোমাদেরই মত বিশ্বাস করতাম, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। তাই সঙ্গে যা কিছু ছিল ঝেড়ে ঝুড়ে এক শ টাকার এই তাজমহল কিনে আনলাম—তা থেকে বিস্তর লাভ করব ব'লে। পথে অর্ধেক গেল ভেঙে; যা রইল তার অর্ধেক সবাই লুটে নিলে। বাকী সিকি বেচলাম ধারে, তার এক পয়সাও আদায় হ'ল না।"

প্রমোদ বললে, "এতে শ্রীবিলাসের কথাই প্রমাণিত হ'ল।"

সবাই একটু বিস্মিত হয়ে প্রমোদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

প্রমোদ বললে, "বাণিজ্য কথাটার মানে জান?"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "অভিধান বলে—"

বাধা দিয়ে প্রমোদ বললে, "অভিধান যা বলে না, সেইটাই এর আসল মানে। বাণিজ্যটা এক্ষেত্রে করেছিল তারাই যারা সোজা লুটে নিয়ে গেল কিংবা দাম দেবে ব'লে নিয়ে দিলে না। এইটেই আসল বাণিজ্য, অর্থাৎ পরের ধন ছলে বলে লুটে নেওয়া। তাতেই লক্ষ্মী—Quoderat demonstrandum"।

বাঁড়ুজ্যে হেসে বললে, "হার মানলাম, I stand corrected"।

বলা বাহুল্য প্রমোদের এ রসিকতা নিখিলেশ বা শ্রীবিলাসের পছন্দ হ'ল না। নিখিলেশ বেশ তীব্রস্বরে বললে, "গুরুতর বিষয় নিয়ে ছ্যাবলামো করাটা অতি খেলো রসিকতা। আমাদের সামনে যে সমস্যা সেটা জীবন মরণের কথা, বিচারের কথা, ছ্যাবলামির নয়।"

শ্রীবিলাস বললে, "যাকে বাণিজ্য ব'লে দম্ভ করছ বাঁড়ুজ্যে, তার খাঁটী নাম হচ্ছে বেকুবি। তুমি যদি আস্ত গাধা না হ'তে তবে ওই তাজমহল বেচে একটা প্রকাণ্ড সমৃদ্ধির পত্তন করতে পারতে। সামান্য ফিরিওয়ালা হয়ে আরম্ভ ক'রেও লোকে এমনি ক'রে ক্রোড়পতি হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত একটা দুটো নয়, হাজার হাজার বর্তমান।"

"হাজার হাজার না হ'ক দু-দশটা আছে", বাঁড়ুজ্যে স্বীকার করল, "কিন্তু যে সব প্রক্রিয়ায় তারা ক্রোড়পতি হয়েছে তার নমুনা দেখতে চাও তো সেটা সত্যি মাল বেচা কেনার কারবারে দেখতে পাবে না, দেখ গে ফাটকার বাজারে, শেয়ারের বাজারে। বড় বড় গালভরা নাম দিয়ে সেখানে যে উপায়ে লক্ষ্মীকে বাঁধা হয় সাদা বাঙলায় তার নাম বাণিজ্য অর্থাৎ পরের ধন গ্যাঁড়া দেওয়া, জুয়া খেলা—"

নিখিলেশ অর্থবিদ্যায় এম-এ ফার্স্ট ক্লাস হবার আশা রাখে। সে উষ্মার সঙ্গে বললে, "খুব ইকনমিক্স পড়েছ বাঁড়ুজ্যে। Futures market আর জুয়ো খেলা এক হয়ে গেল। জান? এই Futures market আধুনিক ব্যাবসার একটা অপরিহার্য অঙ্গ, এ ছাড়া বিশ্বজোড়া ব্যাবসা চলতে পারে না। ওর মূল সূত্র হ'ল—"

প্রমোদ বাধা দিয়ে বললে, "ইকনমিক্সের লেকচার শোনাতে চাও, ছাত্র খুঁজে বের কর গে। বাবা, ছ ছ বচ্ছর প্রফেসারের লেকচার শুনে ঘুমিয়েছি, আজ জেগে জেগে তোমার লেকচার শুনব, মনেও স্থান দিও না।"

নিখিলেশ বললে, "কিন্তু জিনিসটা বোঝা দরকার—"

শ্রীবিলাস বললে, "কোনও দরকার নেই, কেননা বাঁড়ুজ্যে যা বললে তা তার সব কথার মতই ছাঁকা মিথ্যে। যে সব লোক ব্যাবসায় বড়লোক হয়েছে তারা সবাই ফটকার বাজারে বড়লোক হয় নি।"

"ফটকার কথাটা সুধু একটা দৃষ্টান্ত, ওর জাতভাই অনেক রকমের আছে, কিন্তু সবারই গোড়ার কথা ল্যাঁড়া দেওয়া।" বাঁড়ুজ্যে বললে।

নিখিলেশ চেঁচিয়ে উঠল, "Shut up! তুমি কিছু জান না।"

বাড়ুজ্যে নির্লিপ্তভাবে বললে, "ঠিক বলেছ, কিন্তু আমি সক্রেটিসের মত এইটুকু জানি যে আমি জানি না। তুমি তাও জান না।"

নিখিলেশ উগ্র হয়ে উঠল। এর পর তর্কটা হ'ল একটা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

কিছুক্ষণ দ্বৈরথ সমর চলবার পর যখন নিখিলেশ খুব জোর ক'রে বললে যে, ব্যাবসা ছাড়া, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' তখন সংস্কৃতের এম এ শ্রীবিলাস হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল। "দেখ ঋষিবাক্য নিয়ে অমন ভেঙিও না। ব্যাবসা ব্যাবসা ক'রে খেপে উঠেছে; ব্যবসায় হবে কি? মানলাম হবে টাকা। কিন্তু টাকাই কি সব? অর্থই কি অনর্থ নয়? আসল আমরা চাই কি? পরমার্থ। অর্থ তোমাকে পরমার্থের পথে নেবে না। এতগুলো লেখাপড়া শিখে শেষে আমরাও কি বাজে লোকের মত সুধু অর্থ নিয়েই মেতে থাকব, পরমার্থের কথা একদম ভুলে?"

বাঁড়ুজ্যে যেন এ কথায় হকচকিয়ে গেল। একটু সামলে সে বললে, "লাখ কথার এক কথা বলেছ ভাই। অতএব আমাদের একমাত্র কর্তব্য এই, অর্থের সাধনায় পদাঘাত ক'রে কৌপীন প'রে বেরিয়ে পড়া। অর্থটা পাবার কোনও পথই যেখানে নেই, সেখানে তাকে অবহেলা করাই একমাত্র পথ।"

শ্রীবিলাস নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বললে, "তোমার কাছে এটা তামাশার কথা হ'তে পারে। কিন্তু, ওরে অন্ধ, দেখছ না কি এই অর্থের সাধনায় পৃথিবী কোন্ সর্বনাশের দিকে ঝুঁকে চলেছে? আজকে যে সমরানল জ্বলে উঠেছে ইউরোপে, এ কি সুধু তারই জন্যে নয়?"

প্রমোদ বললে, "আর এই বাঙলা দেশেই দেখ না, মুসলমান আর তফসিলীরা সব চাকরিগুলো কেড়ে নেবার জন্য কোমর বেঁধেছে, চাষীরা খাজনা দিতে চায় না, মজুরেরা কোনও কাজ না করে মাইনেটা আঠার আনা ক'রে নিতে চায়, এ সবই তো সেই অনর্থকর অর্থের টানে। এই দুর্ভাবনা ঘুচে গেলে কি সুখেই আমরা থাকতে পারতাম, ভেবে দেখ।"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "অর্থাৎ এই দুনিয়ায় যদি আর সবাই সুধু ত্যাগ ধর্মের সাধনা করত, আর আমরা কটি প্রাণী তাদের ত্যাগ করবার সুযোগ দেবার জন্য সুধু তাদের সেবা ও দান গ্রহণ করতে থাকতাম! ঠিক বলেছ ভায়া, এমন হ'লে ত্যাগ ধর্মের মত জিনিসই নেই।"

শ্রীবিলাস ক্রমেই চটে যাচ্ছিল। তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় সে ত্যাগের ও সেবার প্রশস্তি গেয়ে গেল, বললে যে, লেখা-পড়া শিখে নিঃশেষে লক্ষ্মীর সাধনার চিন্তা করে তারাই, যারা নিঃশেষে লক্ষ্মীছাড়া। এবং পরিশেষে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করলে যে, অর্থের চিন্তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে সে পরমার্থের সাধনা আর দেশের সেবা করবে।

নিখিলেশ ঠিক তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলে যে চাকরি বা ওকালতি সে করবে না, করবে ব্যাবসা। চাই কি একটা মনিহারী দোকানও করতে পারে।

প্রমোদ বললে যে, কলালক্ষ্মীই তার একমাত্র আরাধ্য।

বাঁড়ুজ্যে বললে, "কিন্তু তাঁর সেবায় যদি কাঁচকলা বই কিছু না জোটে?"

প্রমোদ তাই তার কথায় একটা উপাধি যোগ করে বললে, "যতক্ষণ তিনি কাঁচকলা না খাওয়াচ্ছেন।"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "যখন কোনও কিছু স্থির করা গেল না তখন আপাতত নিদ্রাই আমার সাধনা। বাইশ বছর বয়স হ'ল, কি হুড়োয় এত দিন কাটল। সে হুড়ো যখন মিটেছে, তখন আপাতত যতদিন পারি, শুয়ে বাঁচব।

এর পর বন্ধুরা মফস্বলে যে যার দেশে ছিটকে পড়ল।

(ক্রমশ)

ছবি দেখা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ছাপা ছবি

পূর্বে এই প্রবন্ধে ছবি আঁকার নানা রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এবার ছাপা ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ছাপা ছবি অর্থাৎ পুস্তকে তিন রঙা বা এক রঙা, অথবা রাস্তায় যে সব বিজ্ঞাপনী চিত্র (Publicity art) দেখা যায়, সে সকল চিত্র আমার আলোচনার বিষয় নহে। এ সকল চিত্রের মূল্য রহিয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে; এ সকল চিত্রের প্রয়োজনীয়তা যাহাই থাকুক, শিল্পীর হাতে আঁকা মূল চিত্রের ন্যায় সম্মান কখনও পায় না। এ সকল ছাপা চিত্র ভাল হইলেও, তার মূল্যের একটা সীমা আছে; কিন্তু হাতে আঁকা শিল্পীর চিত্র, যাহাতে তাহার সহি রহিয়াছে, সে চিত্রের মূল্যের কোনও সীমা নাই। কোনও মাস্টার বা ওস্তাদ শিল্পীর চিত্র সম্বন্ধে বলা যায়, "A thing of beauty is a joy for ever." রসিকজন যাহা হইতে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বলিতেছিলাম ছাপা ছবি সম্বন্ধে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে graphic art। এচিং, উডকাট, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। আমাদের দেশে অধুনা এই সকল চিত্রের চল হইতেছে। ইউরোপে চীনে জাপানে graphic arts এর প্রচলন। শিল্পীর নিজের হাতে পরিকল্পনা করা, খোদাই করিয়া অল্পসংখ্যক ছাপা ছবি মূল চিত্রের ন্যায়ই সম্মান লাভ করিয়া থাকে। কোনও বিশেষ একটি তৈলচিত্র বা জল-রং ছবি শিল্পী শুধু একখানাই করিয়া থাকেন, তার দ্বিতীয় প্রতিলিপি তিনি করেন না। সে চিত্র শুধু একজন সমঝদারই অধিকার করিতে পারেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি ওই চিত্র পাইতে পারেন না। এচিং উডকাটের সুবিধা এই যে, শিল্পীর এক পরিকল্পনার বহু প্রতিলিপি হইতে পারে; এবং প্রতি চিত্রে তাহার সহি থাকার দরুন, মূল চিত্রের ন্যায়ই মর্যাদা লাভ করে। বহু প্রতিলিপি লওয়া সম্ভব হইলেও যে বহু প্রতিলিপি লওয়া হয় তাহা নহে, কারণ বহু প্রতিলিপি লইলে তাহার মূল্য কমিয়া আসে। আর একটা কারণেও বহু প্রতিলিপি লওয়া হয় না; অল্পসংখ্যক ছাপা যেমন ভাল উঠিবে, অধিকসংখ্যক লইলে তেমন হইত না, ছাপার সৌকুমার্য কমিয়া আসিবে। ১৫।২০টা হইতে হয়তো ৫০টা পর্যন্ত ছাপা লওয়া যাইতে পারে।

লিথোগ্রাফ পুরীর মন্দির শিল্পী—যদুমণি প্রহরাজ

আশ্চর্য, আমাদের দেশে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে কোনও রকমের graphic arts প্রচলিত ছিল না।। ইউরোপীয়দের নিকট হইতে আমরা এ বিদ্যা শিখিয়াছি। উডকাটের ছাপা আমরা আমাদের বস্ত্রশিল্পে দেখিতে পাই। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে এ শিল্পের প্রচলন ছিল।

এই সকল বস্ত্র calico cloth নামে খ্যাত। বহু লক্ষ টাকার ক্যালিকো এক সময় ইউরোপে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত। এসকল ছাপার কাজে অতি সুন্দর পরিকল্পনা দেখা যায়। লতা, পাতা, পশুপক্ষী প্রভৃতির মণ্ডন শিল্পী অতিশয় নিপুণতা সহকারে করিয়াছে। শিল্পীরা যে রকম দক্ষতার সঙ্গে কাপড়ের ছাপা কাজ করিয়াছে, ইচ্ছা করিলে, কাগজে নিশ্চয়ই ছবিও সেরকম করিতে পারিত, কিন্তু সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি যায় নাই। পটুয়ারা নিজেরাই চিত্রের বহু প্রতিলিপির চাহিদা নিজেরাই হাতে আঁকিয়া মিটাইয়াছে। তীর্থযাত্রীদের স্মারক চিহ্নস্বরূপ তীর্থ হইতে দেবদেবীর চিত্র লওয়ার রেওয়াজ আছে। পুরীতে এবং কালীঘাটে এই শ্রেণীর তাগিদ মিটাইবার জন্যই পটুয়াদের সৃষ্টি। পটুয়াদের পরিবারে সকলেই চিত্র কর্ম জানে এবং এক চিত্রের বহু লিপি প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়া থাকে।

উডকাট্ প্রত্যাবর্তন আধুনিক ফরাসী

মূলশিল্পী হয়তো কেউ আছেন, কোনও নূতন পরিকল্পনা করিলে, পরিবারের অন্যান্য তার নকল করিয়া থাকে এবং বংশ পরম্পরায় এই নকলের কাজ চলিতে থাকে। এক চিত্রের বহু লিপি প্রস্তুত করা কতকটা ছাপার কাজেরই শামিল।

Graphic artsএর এই কয় বিষয়ে আমি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।—(১) রাবিং (rubbing), (২) উডকাট, (৩) উড এনগ্রেভিং, (৪) এচিং, (৫) লিথোগ্রাফ।

রাবিং

রাবিং চিত্রের বাংলা প্রতিশব্দ কি হইবে জানি না, এর অর্থ হইল ঘষা। এই শ্রেণীর চিত্র কেবলমাত্র চীনদেশেই হইয়া থাকে; পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এই শ্রেণীর চিত্র দেখা যায় না। ছাপাতে দেখা যায়, কালোর উপর শাদা কাজ। খুব ছোট আকারের ছবি ইহাতে হয় না। মাঝারি আকার হইতে খুব বড় চিত্র হইয়া থাকে। প্রমাণ আকার (লাইফ সাইজ) এমন কি তাহা অপেক্ষাও বড় মানুষের মূর্তি রাবিংএ হইয়া থাকে। তীর্থস্থানে পাথরের স্থায়ী ব্লক আছে; তীর্থযাত্রীরা স্মারক চিহ্নরূপে এই সকল ছাপা ছবি সংগ্রহ করিয়া থাকে। চিত্রের বিষয় বৌদ্ধ সাধু, দেবদেবী, পাহাড়, ঝরনা, গাছ, পশুপক্ষি প্রভৃতি এবং নানা দৃশ্যচিত্র। অনেক সময় চীনা অক্ষরে শুধু মন্ত্র লেখা থাকে। চীনাদের তুলি চালনায় যে ক্যালিগ্রাফি বা লিপি কুশলতা দেখা যায়, রাবিংএ তা পাওয়া যায়। উডকাট বা এনগ্রেভিংএর ব্লক, আঁকা অংশ হয় ছাপাখানার হরফের মত উঁচু। হরফ বা উডকাট যখন ছাপা হয় উঁচু অংশে লাগে কালী এবং সেই অংশই কাগজে ওঠে। রাবিং ইহার বিপরীত। পাথরের পাটায় ছবিটা গর্ত করিয়া খোদাই করা, ছাপার সময় এগুলি ওঠে শাদা, যেন কালো কাগজে শাদা কালি দিয়া ছবি আঁকা।

ছাপিবার প্রথা।—সকল প্রকার ছাপার উড ব্লকে, এচিংএর তামার পাতে, লিথোগ্রাফের পাথরে কালি লাগাইতে হয়, কিন্তু রাবিংএ পাথরের পাটায় কালি লাগায় না, লাগায় কাগজে। কাগজ damp করিয়া পাথরের পাটার উপর রাখিতে হয়। তৈল মেশানো ভুসা কালি নেকড়ার পোটলায় লইয়া কাগজের উপর চাপিয়া চাপিয়া লাগানো হয়, পাথরের সংস্পর্শে যেখানে কাগজ আছে, সেখানে শুধু কালি লাগে। পাথরের কাটা অংশে কালি লাগে না, শাদা থাকে।

উডকাট ও উড এনগ্রেভিং

উডকাট—কাঠের উপর ছবি আঁকিয়া ছুরি না নরুন জাতীয় যন্ত্রে কাটিতে হয়; পাতলা কাগজে ছবি প্রথম আঁকিয়া তাহা কাঠের উপর আঠা দিয়া আঁটিয়া দিলে, তাহাও কাটা চলে। যে কাঠে আঁশ কম, সে কাঠ এ কাজের উপযুক্ত। জাপানের চেরি কাঠ খুব ভাল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায় গাম্ভার কাঠ, বীরভুম জেলায় পাওয়া যায় চাকুন্দে কাঠ। এই দুই দেশী কাঠে উডকাট হইতে পারে। কাটা হইলে রবারের রোলার দ্বারা কালি লাগাইতে হয়। ছাপার কালি (Printer's ink) ব্যবহার্য। কালি লাগানো হইলে তার উপর কাগজ রাখিয়া মসৃণ বস্তু দ্বারা ঘষিতে হয়। কাগজটা প্রথমে ভিজাইয়া (damp) লওয়ার প্রয়োজন। সব কাগজ এ কাজের উপযোগী নহে, জাপানী হাতে তৈরী কাগজ (hand made paper) এ কাজের পক্ষে ভাল। ভারতীয় কাগজের মধ্যে নেপালে প্রস্তুত হাতে তৈরী কাগজ শ্রেষ্ঠ।

উড এনগ্রেভিং উডকাটে ব্যবহার করা হয় তক্তা, অর্থাৎ যাহাতে গাছের আঁশ লম্বালম্বিভাবে থাকে। উড এনগ্রেভিংএর গাছের আঁশ থাকে খাড়াভাবে, অর্থাৎ এগুলি তৈয়ার হয় গাছের গুঁড়ি আড়ভাবে কাটিয়া। এনগ্রেভিংএ খুব সরু কাজ হইতে পারে। উডকাটে হয় শাদা কাগজের উপর কালো লাইন, উড এনগ্রেভিংএ হইতে পারে কালো ক্ষেত্রের

উপর শাদা সরু লাইনের কাজ। কাটিবার যন্ত্রেরও কিছু পার্থক্য আছে, যন্ত্রের নাম বুলি (bully) সরু মোটা, একসঙ্গে অনেক লাইন টানা প্রভৃতির জন্য ভিন্ন রকমের বুলি আছে।

হাফটোন ব্লক আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে উড-ব্লকের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। অধুনা সাধারণ পুস্তকের জন্য উড-ব্লকের চাহিদা না থাকিলেও উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক চিত্রাঙ্কনের জন্য উড-ব্লকের চাহিদা আছে।

কাঠের ব্লক হইতে ছাপা ছবির নাম যেরকম উডকাট বা উড এনগ্রেভিং তেমনি লিনোলিয়ম খোদাই করিয়া যে ছবি ছাপা হয়, তাহাকে বলে লিনোকাট। ঘরের মেঝেতে রবার জমানো এক রকম ম্যাটিং যে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে লিনোলিয়ম বলে। লিনোকাটের প্রথা ঠিক উডকাটের মত, তবে ইহার কাজ হয় একটু মোটা ধরনের; রবারের উপর খুব সূক্ষ্ম কাজ করা চলে না। তাহাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু নাই, আর্টের বিভিন্ন প্রথার বিভিন্ন রস আছে। মোটা শাদা কালোর কাজে নিশ্চয়ই এর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। উডকাট বা উড এনগ্রেভিং হইতে লিনোকাট তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

রঙিন উডকাট

রঙিন উডকাটের উৎকর্ষ হইয়াছে চীনে এবং জাপানে জাপানের উটামারো, হিরোসিগে, হোকুসাই প্রভৃতি শিল্পীর রঙিন উডকাটের খ্যাতি ইউরোপেও যথেষ্ট আছে। আজকাল গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীতে জাপানী ধরণের রঙিন উডকাটের চর্চা হইতেছে।

একখানা রঙিন ছবির প্রতিলিপি করিতে দশ বারখানা ব্লক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ চল্লিশখানা পর্যন্ত তৈয়ার করিতে হয়। আলাদা আলাদা রংএর জন্য আলাদা ব্লক তৈয়ার করিতে হয়। এমন কি এক রংএর বিভিন্ন শেডের কাজের জন্যও আলাদা ব্লক তৈয়ার করিবার দরকার হয়। বিভিন্ন ব্লক পর পর একই কাগজে ছাপা হইলে ছবি সম্পূর্ণ হইল। জাপানে ব্লকে রং লাগায় চওড়া তুলি (ফ্ল্যাট ব্রাশ) দ্বারা, জল-রং ব্যবহার করা হয়। গুঁড়া রংএর সঙ্গে আঠা মিশাইয়া তুলি দ্বারা ব্লকে রং লাগানো হয়। বিলাতী প্রথায়

এচিং শিল্পী সেরিয়ন (ফরাসী)

উডকাট্ প্রাচীন জার্মান ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ

জল-রং ব্যবহার করা হয় না, রোলার দ্বারা ব্লকে তেল রং লাগানো হয়।

উটামারো জাপানে 'লোকশিল্প' (flok art) স্কুলের প্রবর্তন করেন। তাঁর এবং তাঁর অনুসরণকারীদের রঙিন উডকাট জাপানে জনপ্রিয় হইয়াছিল। অসচ্ছল অবস্থার লোকেরাও সামান্য মূল্যে এ সব চিত্র ক্রয় করিয়া গৃহসজ্জা করিতে পারিত।

জাপানের রঙিন উডকাট পৃথিবীর চিত্রকলার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমেরিকার হুইসলার, ওলন্দাজ শিল্পী ভ্যানগখ, ফ্রান্সের ইম্প্রেসনিস্টরা তাহাদের চিত্রের জন্য জাপানী উডকাটের কাছে ঋণী।

আমাদের বাঙলার নব্য চিত্রকলাতেও জাপানী রঙিন উডকাটের প্রভাব বিদ্যমান। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ওআশ প্রথায় রংএর খেলায় যে একটি রহস্যাবৃত ভাব আছে তাহা অনেক সময় জাপানী আর্টের প্রভাব বলিয়া বর্ণিত হয়। জাপানী চিত্র অপেক্ষা জাপানী রঙিন উডকাটের বাঙলার চিত্রে প্রভাবই অধিক বর্তিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

লিথোগ্রাফ

রাস্তায় যেসব বিজ্ঞাপনী চিত্র দেখা যায় এবং হিন্দুদের ঘরে যেসব দেবদেবীর চিত্র, রবিবর্মার চিত্র দেখা যায়, সেসব লিথোগ্রাফ। লিথো পাথর (litho stone) হইতে এসব ছাপা হয়; লিথোগ্রাফের সুবিধা এই যে ইহা হইতে বহু সহস্র ছাপ গ্রহণ করা যায়। লিথো পাথরে চর্বিযুক্ত পেনসিল দ্বারা আঁকিতে হয়। তার পর গঁদ (arabic gum) এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্রবণে (solution) পাথর ধুইয়া etch বা ক্ষয় করিয়া লইতে হয়। এই লিথো পাথরের গুণ হইল, যেখানে চর্বির সংস্পর্শ আছে, কালির রোলার পাথরের উপর চালাইলে শুধু সেখানেই কালি ধরিবে। কাজেই লিথো পেনসিল দিয়া যাহা আঁকা হইয়াছে, তাহাই শুধু রোলারের কালির সংস্পর্শে আসিবে।

উডব্লক আর্টিস্ট নিজের হাতেই ছাপিতে পারে, প্রেসের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু লিথোগ্রাফের জন্য প্রেসের প্রয়োজন হয়।

(শেষাংশ ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আট বৎসর পূর্বে এম এ পাস করিলে কি হইবে, সত্যবানটা ছিল একের নম্বর গেঁয়ো। লেখাপড়া শিখিয়া এতবড় হস্তীমূর্খ যে মানুষ কি করিয়া হইতে পারে তাহা তাহার পিসীমা মহালক্ষ্মী দেবী কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। সে না করিল একটা ভাল চাকরি, না করিল একটা বড় ঘরে বিবাহ। পিতা স্বর্গত ভাগ্যবান মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, তিনিই ছোট বেলায় ছেলেটার মাথা খাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সত্যবান যে কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে বাস করিবে, রোজগারের চেষ্টা না করিয়া পৈতৃক সামান্য জমিজমার আয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বিনা বেতনে ছেলে পড়াইবে, এ অপরাধ সম্পূর্ণ তাহার নিজের নয়; যে পিতা বাল্যে তাহাকে অর্থের চেয়ে ধর্মকে বড় বলিয়া বিবেচনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ দোষ তাঁরও। যাহা হউক গ্রামের সকলে তাহার আশা ভরসা ছাড়িয়া দিলেও পিসীমা ছাড়েন নাই। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া স্থানীয় জমিদার বাড়িতে একটি দশ টাকা বেতনের ছেলে পড়ানোর কাজে সম্প্রতি তাহাকে লাগাইয়াছেন এবং এক জ্ঞাতি ভ্রাতার ঘটকালিতে একটা বড়ঘরে সম্বন্ধও স্থির করিয়াছেন। রায়বাহাদুর সদলে পাত্র দেখিতে আসিলেন।

সত্যকথা বলিতে কি পাত্রটিকে কোনও দিক দিয়াই সুপাত্র বলা যায় না। ভাগ্যবানের পুত্র সত্যবান সত্যকথাই বলিল, বলিল বয়স বত্রিশ পার হইয়াছে। রং ময়লা, ঈষৎ টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। খাঁড়ার মত নাক এবং বলিষ্ঠ শরীর থাকিলে কি হইবে, সে শরীরে লাবণ্যের বাহুল্য নাই। মোটের উপর তাহাকে প্রিয়দর্শন বলিয়া ভুল করিবার কোনও পথ ছিল না। মাথাভাঙ্গা গ্রামের এক প্রান্তে মান্ধাতার আমলের একখানি ভাঙা মাটির ঘরে ছেঁড়া তালপাতার চাটাই পাতিয়া সত্যবান অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিল; অর্থাৎ কয়েক ঘটি এঁদো পুকুরের জল দিয়া তাঁহাদের পায়ের কাদা ধোয়াইয়া দিল। নিতান্ত কন্যাদায় না হইলে এমন লোকের বাড়ি মানুষ সহজে আসে না। মনে মনে ঘটকের মস্তক চর্বণ করিতে করিতে রায়বাহাদুর একথা সেকথার পর প্রশ্ন করিলেন, "বাড়িতে সম্পত্তি কি আছে?"

"আজ্ঞে একটি শালগ্রাম, সাতটি শিব, পাঁচটি বিধবা, একুশটি বেরাল আর তিনখানি কড়িকাঠ।"

রায়বাহাদুর অবাক হইয়া বলিলেন, "তামাশা করছ আমার সঙ্গে?"

সত্যবান বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে না, সত্যি কথাই বলছি। শালগ্রামটি পৈতৃক, বিধবাগুলি পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় পক্ষ থেকেই এসেছেন। শিবগুলি, বেরালগুলি আর কড়িকাঠগুলি আমার স্বোপার্জিত।"

দরজার আড়ালে পিসীমা কাশিলেন। রায়বাহাদুর অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "বুঝলুম না।"

অতএব সত্যবান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, "একবার গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলেন, তাঁর বাড়িতে ছিলেন বাণেশ্বর। বেচারার নিত্যসেবা বন্ধ হয় দেখে আমি তাঁকে ঘরে নিয়ে আসি। তার পর থেকে যার বাড়িতেই পুজোর অসুবিধে হয়, অর্থাৎ ছেলে শহরে চাকরি করে বা শহুরে মেয়ে বিয়ে করে, সেই একটি শিবলিঙ্গ দান করে এই অভাগা সাতু মুখুজ্যেকে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি একটা, গাঁয়ের মধ্যে সবাই চিনে নিয়েছে। বেরালগুলোও তাই। কোথায় কার বাড়ি হাঁড়ি খেতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে গেছে, কোথাও অন্ন জোটে না, এল মুখুজ্যে-বাড়ি। তা ছাড়া পাড়াপড়শী কারও মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল; তার আদরের বেরাল, কে তাকে যত্ন করে? দিয়ে আয় সতুর পিসীকে! কারও বউ ম'রে গেল, আবার বিয়ে করল। প্রথম পক্ষের পোষা বেরালকে দ্বিতীয় পক্ষ ভাত দিতে চায় না, দিয়ে আয় সাতুর বাড়ি! সাতটা এসেছিল বাচ্চা বিইয়ে বিইয়ে একুশটা হয়েছে। দুটি বেলা নিজেদের ভাত জুটুক আর না জুটুক ওদের যোগাতেই হবে। না হলেই কেঁদে কেঁদে মরবে। পিসীমা বলেন, "বেরাল কাঁদলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। তা বাবা আমার যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন তা ঐ শিব, বিধবা আর বেরালেই খেলে।"

রায়বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন, "আর কড়িকাঠের কথা কি বলছিলে?"

সত্যবান বলিল, "আজ্ঞে না, ওদের জন্যে কোনও খরচ নেই। চালা ঘরে বাস করি, দু দিন অন্তর চাল ফুটো হয়ে জল পড়ে। বেরালগুলো হবিষ্যি খেয়ে খেয়ে বোষ্টম মেরে গেছে কিনা, ইঁদুর দেখলে পালায়। সারা রাত মাথার উপর কটর কটর; ঘুম হয় না ভাল। তাই মনের ঘেন্নায় সেবার অরন্ধনের দিন ভাতই খেলুম না। মহাজনের কাছে গেলুম টাকা ধার চাইতে। বললুম, 'হাজার দুই টাকা ধার দাও, একটা পাকা ঘর তুলি'। তার বয়ে গেছে ধার দিতে। দিলে তো নাই, উলটে দু'টো শক্ত শক্ত কথা শোনালে। বললে, 'বাবার শ্রাদ্ধের সময় যে পঞ্চাশ টাকা ধার করিছিলে তার এক পয়সা তো শোধ দাও নি আজও। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে তিন শ বাইশ টাকা সাত আনা সাড়ে তিন পয়সা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে দাও তো ভাল, না দাও তো জমি ক্রোক ক'রে চাল কেটে উঠিয়ে দেবো'। বুঝুন ব্যাপার! সে মহা অর্থপিশাচ লোক। এক তরফা ডিক্রী করে বসে আছে। আমার তো তখুনি মাথায় বজ্রাঘাত! কি করি? হাতে পায়ে ধরে ছ মাস সময় নিলুম। তার পর গেলাম অনন্তর বাড়ি। অনন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু, মদ খাবার জন্যে পৈতৃক বাড়িটার দরজা জানালা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেচে দিচ্ছে শুনেছিলুম, তাকেই গিয়ে ধরলুম। বললুম, "তুমি তো ভেঙেই ফেলছ, আমাকে দিনকতক থাকতে দাও।" সে বললে, "এখন আর উপায় নেই। বাড়ির ইঁট কাঠ সব আগাম বায়না নিয়ে বেচে রেখেছি, যে যার জিনিস এই মাসের মধ্যেই নিয়ে যাবে। কেবল মাঝের ঘরের ছাদের কড়ি তিনখানার বায়না হয় নি এখনও, চাও তো নিতে পার।" অনেক দর কষাকষির পর এক বোতল মদেতেই রফা হ'ল শেষ পর্যন্ত; দেশী নয়, বিলিতী। তিনখানা কড়ি খুলিয়ে বাড়ি আনতে তেইশ টাকা তের আনা লেগে গেল। কিন্তু ঠকি নি আমি; সেকেলে জিনিস, মজবুত কি! যেন লোহা।"

রায়বাহাদুর বললেন, "কড়ি যে কিনলে, লাগাবে কোথায়?

ঘরের চাল তো ইঁদুরে কাটছে, আর মহাজনও বাকীটুকু কেটে দেবে শুনছি!"

সত্যবান লজ্জিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, তখন সেটা মনে হয় নি। সস্তায় পেলুম, কিনে ফেললুম। এখন ভাবছি কেনা যখন হয়েই গেছে, তখন যা হয় ক'রে একটা পাকা বাড়ি তুলতেই হবে কোনও রকমে। দেখাই যাক। চাবুক যখন হয়েছে, তখন কি আর ঘোড়ার জন্যে আটকাবে? তা ছাড়া পিসীমা বলছিলেন, আপনি যদি দয়া ক'রে এ বাড়িতে মেয়েই দেন তা হলে কি আর তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা না ক'রে দেবেন?" নেপথ্যে পিসীমা কাশিলেন, "হুম"।

"আমার দিক থেকে কিছু তো আপত্তি করবার নেই বাবাজী তবে বাড়িতে ব'লে দেখি।"

তার পর সকলে সদলে গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যবান গদগদ হইয়া বলিল, "পিসীমা কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন। একটু মিষ্টিমুখ না ক'রে গেলে দুঃখ করবেন।"

রায়বাহাদুরের পারিষদবর্গ এ উহার মুখ তাকাইল, রায়-বাহাদুর বলিলেন, "তার জন্যে কি আটকাচ্ছে বাবাজী? সে আর এক দিন হবে এখন। আজ ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, আজ আর বসবার সময় নেই। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে ব'লো।" এই হাঘরের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করিতে তাঁহার বোধ হয় প্রবৃত্তি হইল না। সত্যবানের পিসীমা পান পাঠাইয়া দিলেন, তাহারই একটি আলগোছে দুই আঙুলে ধরিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। সত্যবান প্রথমে রায়বাহাদুরের এবং তৎপরে তাঁহার আত্মীয় ও পারিষদবর্গের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল। তার পর সকলের প্রত্যুদ্গমন করিয়া বাড়িতে ঢুকিতেই পিসীমা তাহাকে লইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তোর কি জ্ঞানগম্যি দিন দিন বাড়ছে? ভদ্দর লোকের সঙ্গে ঐরকম ক'রে কথা কয়? আর বাইরের লোকের কাছে যে ওই রকম ঘরের কথা সব বললি, ওরা আর কখনও এ মুখো হবে ভেবেছিস? না বাপু, তোমাকে নিয়ে আর আমি পারি না। এ রকম অবুঝপনা করলে আমার সাধ্যি নয় তোমার জন্যে কিছু করা। দেবেনকে ধ'রে কত কষ্টে সম্বন্ধটি করলুম,—আর তুমি বাঁদরামি করে—"

সত্যবান বিব্রতভাবে বলিল, "কি আবার বাঁদরামি করলুম? ভদ্রলোক প্রশ্ন করলে তার উত্তরও দেব না? সত্যি কথা যা তাই বলেছি; দু দিন বাদে তো সবই জানতে পারত, তখন বলত, জোচ্চোর। আর লাখ কথার কমে যে বিয়ে হয় না সে তো জানই।"

পিসীমা বলিলেন, "লাখ কথা মানে কি যত নিজের কুচ্ছো? বিয়ের বাজারে অমন ক'রে সব কথা গোড়ায় ফাঁস করে মানুষ? পাকা বাড়ি নেই কেন? বলবি আমাদের বংশে সহ্য হয় না তাই বাপঠাকুরদা দিব্যি দিয়ে গেছেন। আর শিব নিয়ে আর বেরাল নিয়ে ওই সব ন্যাকামি না করলে চলছিল না? খুব পৌরুষ হল! যদি বলতেই হ'ত তো বলতে পারতে বাড়িতে বার মাসে তের পার্বণ, সাতটি শিবলিঙ্গের নিত্য সেবা হয়। আর ইঁদুরের উৎপাতে ঘরের খাটপালঙ্ক বিছানাপত্র কাপড়চোপড় গোলার ধান সব নষ্ট হয় ব'লে এগুশটা বেরালই পুষতে হয়েছে। ভাবত না জানি কতবড় গেরস্ত! একবার বিয়ে দিলে আর তো ফিরিয়ে নিতে পারত না? দেখ্ বাপু, ঘরে যদি খাস পুঁটি মাছ আর পুঁই শাক, তো লোকের কাছে বলবি ভেটকি মাছের কালিয়া আর ছানার পায়েস! তবে লোকে মানবে, তবে বড় ঘরে বিয়ে হবে। পুরুষ মানুষ পেটে মুখে এক হ'লে, তাকে সামনে লোকে ভালোমানুষ বলে বটে কিন্তু আড়ালে বলে গাড়ল। তোমাকেও ওরা এখন তাই বলতে বলতে যাচ্ছে।" পিসীমা ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। বলাবাহুল্য, পিসীমার শিক্ষা সত্যবান বাল্যে পায় নাই।

তিন দিন পরে কালকাতা হইতে রায়বাহাদুরের পত্র আসিল। সব দিক বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে অন্যত্র চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। ছেলেটি শিক্ষিত, সরল, বিনয়ী সেদিক দিয়া আপত্তির কিছু ছিল না, কিন্তু মেয়েদের মত নাই। চিঠির ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট। সত্যবান কি জানি কেন, বড় আঘাত পাইল।

[২]

পাড়ার লোক টিটকারি দিল। বন্ধুবান্ধব দুই চারিজন যাহারা ছিল, তাহারা পরামর্শ দিল, "দেখ ভাই, যদি সংসারে মানুষের মত মানুষ হয়ে পাঁচ জনের মধ্যে বাস করতে চাও তবে ওসব ভণ্ডামি ছাড়। ধম্মপথে থেকে তো অনেক ঐশ্বয্যি ভোগ করেছ এতকাল, এইবার দিনকতক অধম্মপথে গিয়ে একটু মুখ বদল ক'রে নাও। শেষকালে যমরাজা যখন জিগগেস করবে, "কি করেছিস এত দিন?" তখন বলবে কি? না করলে চুরি-ডাকাতি, না করলে তিথি-ধম্ম! তোমার মতন মেদামারা গোবেচারা লোকের স্বগ্গেও ঠাঁই নেই, নরকেও ঠাঁই নেই। শেষকালে যখন চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে হিসেব খুঁজে পাবে না, যখন যমদূতেরা দূরে দূরে ক'রে তাড়িয়ে বার করবে, তখন যাবে কোথায়? তাই বলছি এখনও সময় থাকতে সাবধান হও। দুদিক খুইও না।"

এই ধরনের সদুপদেশ সত্যবান ইতিপূর্বে বহুবার শুনিয়াছিল কিন্তু এতদিন গ্রাহ্য করে নাই। বিশেষত এইবারের অপমানটার পর কথাটা তাহার মনে ধরিল। সত্যই তো, কেন সে চিরদিন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া এমনভাবে সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছে? সে মূর্খ নয়, ভীরু নয়, অলস নয়। তাহার একমাত্র অপরাধ সে মিথ্যাকথা বলিতে পারে না, মিথ্যাচার অভ্যাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু তহার ফলে নিজের মনে সে যতই আত্মপ্রসাদ অনুভব করুক না কেন, সংসারে সকলের কাছে চিরদিন অবহেলাই পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু আর নয়, এইবার সে পূর্বজীবনের সমস্ত বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সংসারের হাটে নিজের ন্যায্য প্রাপ্য ছলে বলে কৌশলে, যে কোনও উপায়ে হউক আদায় না করিয়া ছাড়িবে না।

সামান্য কিছু ধান-জমি ছিল, তাহার আয়ে বৃদ্ধা পিসীমা কোন রকমে তাঁহার পোষ্যবর্গের হবিষ্যান্ন যোগাইতেন। দিন নিতান্ত না গেলে নয় তাই যাইত, বৎসরের শেষে কিছু করিয়া দেনা বাড়িত। সত্যবান স্থির করিল আয় বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে খরচ কমাইবার দিকে তাহাকে মন দিতে হইবে। দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া যে কয়জন ছিলেন, তাঁহাদের অন্য কোথাও স্থান জোটেনা বলিয়াই ছিলেন। সত্যবান তাঁহাদিগকে পরনিন্দার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া একটু আধটু সুতা কাটা ধরাইল। শিবগুলির পূজায় অযত্ন আরম্ভ হইল, নূতন বিরাল বাড়িতে আসা বন্ধ হইল এবং পুরাতন বিরালগুলিকে কি করিয়া তাড়ানো যায় সত্যবান তাহারই ফন্দি আঁটিতে আরম্ভ করিল। যেদেশে মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে আছে, সে দেশে বিরালের জন্য এক কাঁড়ি করিয়া ভাত খরচ করা সে অনুচিত বোধ করিল। কিন্তু উপায় কি? পিসীমা বলেন তাহারা কিছুই খায় না, পাতের এঁটো কাঁটা খাইয়াই থাকে। কাঁটা বা মৎস্যজাতীয় কোনও বস্তু বিধবাদের পাতে আসা লোকত ধর্মত সম্ভব নয় এবং স্বয়ং তাঁহাদের পাতে কোনও দিন সে কিছু উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিতে দেখে নাই। কিন্তু পিসীমার সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাঁহাকে লুকাইয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে বিদায় করাও সোজা কথা নয়। সত্যবান হিসাব করিয়া দেখিল, বিড়ালগুলাকে তিন ক্রোশ দূরে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিতে যে পরিশ্রম হইবে এবং লোক জানাজানির যে সম্ভাবনা থাকিবে, বাড়ির কাছে রাতারাতি রেল স্টেশনে গিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিলে তাহার চেয়ে খরচ কিছু বেশী পড়িতে পারে

কিন্তু লোক জানাজানির সেরূপ ভয় মোটেই থাকবে না। স্টেশনমাস্টার তাহার বিশেষ বন্ধু, লোকটিও খুব চাপা, একমাত্র হিন্দুস্থানী সিগন্যালম্যান, পাচক এবং কুলী রামস্বরূপও তাহার খুব বিশ্বাসী। ইহাদের কাছ হইতে কথা বাহির হইবে না। এখন প্রয়োজন কিছু অর্থের এবং একটা সুযোগের।

কথায় বলে খলের সুযোগের অভাব হয় না। এবার বহু দিন পরে কি একটা যোগ উপলক্ষে পিসীমা এবং তাঁহার সঙ্গিনীর দল সত্যবানকে কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিবার জন্য ধরিলেন। সত্যবান কিছুতেই রাজী হইল না, জমিদার বাড়ির চাকরি, তিন-চারদিন কামাই করিলে চাকরি থাকিবে না, এই সমস্ত অজুহাত দেখাইয়া পাড়ার অন্য কয়েকটি কলিকাতা যাত্রী মেয়ের সঙ্গে নিজের বাড়ির দলটিকে জুটাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। পিসীমা অনেক দুঃখে কষ্টে ইহলোকে যাহা কিছু এতদিনে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা নিঃশেষ করিয়া পরলোকের পাথেয় সঞ্চয়ে চলিলেন এবং সত্যবান বহু সাধনায় পরলোকের যেটুকু কাজ করিয়াছিল তাহা নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ইহলোকের উন্নতির চেষ্টায় নূতন করিয়া লাগিল; সেইদিনই বৈকালে পাইকার ডাকিয়া সে জামগাছটার সমস্ত জাম বেচিয়া দিল। স্টেশনের মাল গুদামে একটা পুরাতন প্যাকিং বাক্স বহুদিন হইতে পড়িয়াছিল, মাস্টারবাবুর কাছ হইতে সেটি আট আনায় কিনিয়া সত্যবান সন্ধ্যার অন্ধকারে রামস্বরূপকে দিয়া বাড়িতে আনাইয়া লইল। পেরেক ও হাতুড়ি অবশ্য স্টেশনমাস্টারই দিলেন। পিসীমা সত্যবানের জন্য একবাটি দুধ ভাঁড়ার ঘরে ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সত্যবান তাহা ভাগ করিয়া তিনটা থালায় ঢালিল। বিরালগুলাকে ডাকিতে হইল না, তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া থালা ঘিরিয়া বসিয়া চুকচুক করিয়া চুমুক দিতে আরম্ভ করিল। সত্যবান প্যাকিংবাক্সের মাথার দিকে দুইখানা কাঠ সরাইয়া অল্প ফাঁক করিয়াছিল, এক-একটা বিরালের ঘাড় ধরিয়া তুলিল আর টুপ টুপ করিয়া সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিল।

শেষের কয়টা আর ঢোকে না, কেবল বাহির হইয়া পড়ে। যাহা হউক টিপিয়া টুপিয়া বাক্স নাড়াইয়া ঝাঁকানি দিয়া সব কয়টাকেই কোন রকমে সেই বাক্সে পুরিয়া সে ফাঁকটার মাঝামাঝি একটা কাঠের সরু তক্তা এমনভাবে আঁটিয়া দিল যাহাতে কোনও বিরাল বাহির হইতে না পারে, অথচ নিঃশ্বাস লইবার হাওয়া ভিতরে যায়। তাহার কাজ শেষ হইলে রামস্বরূপ সেই গুরুভার বাক্সটি মাথায় করিয়া যখন স্টেশনে লইয়া গেল তখন রাত্রি প্রায় আটটা। মাস্টারবাবু বলিলেন, "মাল তো আনলেন, যাবে কোথা তা তো বললেন না?" তাও তো বটে। সত্যবান বলিল, "সে ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে? তবে আপনারা রয়েছেন কি করতে? দেখুন না টাইম টেবুল, বেশ একটা স্বাস্থ্যকর স্থান, যেখান থেকে আর ফিরে না আসে অথচ না খেয়ে মরেও না যায়। পিসীমার বড় যত্নের বেরাল মাস্টারমশাই! পিসীমা বলেন, 'কিছু খায় না'। না খেয়ে খেয়ে কি রকম মোটা হয়েছে দেখছেন?"

বাক্সের মধ্যে তখন শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহার কাছে যায় কার সাধ্য। মাস্টারবাবু বলিলেন, "তাই তো, বড় ভাবনায় পড়লুম আপনার জন্যে। তা ট্রেন ভাড়া কত খরচ করতে পারবেন?" সত্যবান পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া বলিল, "উপস্থিত আমার যথাসর্ব্বস্ব—অর্থাৎ নগদ এক টাকা বার আনা। অবশ্য এর মধ্যে থেকে আট আনা রামস্বরূপকে দিতে হবে।" মাস্টারবাবু বলিলেন, "তবে তো খুব খরচ করবেন। তা ওটাও নাই করলেন, 'টু পে' (to pay) ক'রে দিই না?"

"তবে তো বেঁচে যাই।"

"কিন্তু যদি ফেরত দেয়?"

সত্যবান বলিল, "তা দেয় দেবে, ইতিমধ্যে আমি আরও কিছু ধার ধোর ক'রে রাখছি, ফেরত আসে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় ছেড়ে দিয়ে আসব।"

মাস্টারবাবু বলিলেন, "তা তো হ'ল, কিন্তু মাল যাচ্ছে কোথায়?"

সত্যবান টাইম টেবলখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া প্রথম যে নামটা চোখে পড়িল তাহাই বলিল। বলিল, "যাবে মনোহরপুর।"

যমদূতেরা দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে বার ক'রবে......

"কার কাছে যাবে? কার নামে রসিদ হবে?"

"তবেই সেরেছেন!" সত্যবান বলিল, "মনোহরপুরে আপনার চেনাশোনা কেউ নেই?"

মাস্টারবাবু সদ্যবিবাহিত, ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরে মশাই, আমার শ্বশুরবাড়ী হ'ল মনোহরপুর। আমার শালা সেখানে হুজুরিমল চুনচুনিয়ার গদির ক্যাশিয়ার। এই সাত দিন আগেও তার চিঠি পেয়েছি।"

সত্যবান বলিল, "তবে তো ঠিকই হয়েছে। তাঁর নামে পাঠিয়ে দিন, না হয় হুজুরিমলের নামে।"

মাস্টারবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে হয় না। সে খাওয়াতে পারবে না, আর মনিবের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তারও চাকরি যাবে, আমারও চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।"

সত্যবান অসহায়ভাবে বলিল, "তা হ'লে ওই হুজুরিমলের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেউ থাকে তো তার নাম বলুন। অথবা কোনও বোষ্টম গোছের বোকা বড়লোক, যে কৃষ্ণের জীব ব'লে খাওয়াবে ফেরত পাঠাবে না।"

মাস্টারবাবু হঠাৎ টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "হয়েছে! ওখানে শ্যামশংকর চাটুজ্যে আছে, আড়তদার। অজমুখ্যু, ধর্ম্ম ধর্ম্ম বাই। রাজ্যের লোক তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। ট্রেন দেখেছে দূর থেকে, কখনও চড়ে নি। তার কাছেই পাঠানো যাক।"

স্টেশনমাস্টার তাড়াতাড়ি রসিদ লিখিয়া ফেলিলেন। রাম-স্বরূপ বাক্সে লেবেল আঁটিল এবং ঝুলাইল। সত্যবান কলমের
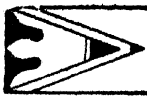
পিছন দিক দিয়া বড় বড় অক্ষরে নাম ঠিকানা লিখিল, তাহার সঙ্গে লিখিয়া দিল, 'লাইভ স্টক, উইথ কেয়ার'। স্টেশনে আলাপ থাকার অনেক সুবিধা। সেই রাত্রেই দশটার ট্রেনে মাল চালান হইয়া গেল। সত্যবান রসিদটা খামে ভরিয়া স্টেশনের ডাকবাক্সে ফেলিয়া যখন বাড়ি ফিরিল তখন রাত প্রায় বারটা। জীবনের প্রথম অপরাধ, মনটা তাহার ভাল ছিল না।

[৩]

স্টেশনে মাল আসিয়া পড়িয়া আছে, অথচ রসিদ আসে নাই, এরূপ ব্যাপার বড় বেশী হয় না। এক বাক্স বিরাল লইয়া মনোহরপুর স্টেশনের মালবাবু বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। সারা দিন তাঁহার সমস্ত কাজ কর্ম পণ্ড হইবার দাখিল। তাহার অফিসের মউতাত নষ্ট হইয়া গেল, দ্বিপ্রহরের নিদ্রা নষ্ট হইয়া গেল, রাত্রের স্বপ্ন নষ্ট হইয়া গেল। তিনি পরদিন বিরক্ত হইয়া একজন কুলী দিয়া শ্যামশংকরবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

শ্যামশংকরবাবু বৈষ্ণব মানুষ। রাধাগোবিন্দের পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া একটু জলযোগে বসিবেন এমন সময় স্টেশনের কুলীর হাঁকডাকে ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। জলযোগ আর হইল না, মাল আসিয়াছে, ডেমারেজ লাগিবে শুনিয়া তিনি পিরানের উপর একখানা চাদর জড়াইয়া কুলীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। একমাত্র মেয়ে নন্দরাণী বলিল, "বাবা, একটু মুখে জল দিয়ে গেলে হ'ত না?" শ্যামশংকর বলিলেন, "না, মা, ফিরে এসে খাব। তুই বরং একবার গোয়াল ঘর থেকে মাধবকে ডেকে দে। বল্, স্টেশনে মাল এসেছে, আমি ছাড়াতে যাচ্ছি। সে যেন এক্ষুনি আসে।"

শ্যামশংকরকে দেখিয়া মালবাবু যেন অকূলে কূল পাইলেন। বলিলেন, "কোথায় ছিলেন মশাই এত দিন? মাল এসে পড়ে আছে, সেদিকে হুঁশ নেই? লোকসানটা কি আমার হবে?" শ্যামশংকরবাবু অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "এখন তো কিছু আসবার কথা ছিল না। রসিদও পাই নি এখনও। কে পাঠালে, কি মাল, কিছুই জানি না।" মালবাবু বলিলেন, "আপনি বণ্ড সই করে এখন মাল নিয়ে যান, রসিদ এলে পাঠিয়ে দিলেই হবে। আপনি করবেন লাভ, আমরা মরব চিৎকার শুনে!"

অগত্যা শ্যামশংকরবাবু সই করিয়া মাল ডেলিভারি লইলেন। মাধবের মাথায় বাক্স তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে হুজুরিমলবাবু দুই আঙ্গুলে নাক চাপিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "হামার চালটা আসিয়ে গেছে বাবুসাব? কি শ্যামবাবু, ওতে কি লিয়ে এলেন? সাঁপ? ঘিউকে লিয়ে? ঘিউকা বেবসা আপনেভি ধ'রেছেন নাকি? কিছু নেই আজকাল বাবুজী।"

বাক্সের মধ্যে আওয়াজটা সত্যই সাপের গর্জনের মত শোনাইতেছিল। দুই দিন চিৎকার করিয়া করিয়া বিরালগুলাও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, আর পারে না। অ্যাঁও ম্যাও, মিয়াও, ওঁয়াও প্রভৃতি বিচিত্র শব্দের পরিবর্তে শুধু রহিয়া রহিয়া ফোঁসফাঁস করিতেছে।

আপদ বিদায়ের ভরসায় মালবাবু একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে কি ঘিয়ের ব্যাবসাতে কেউ টক্কর দিতে পারে শেঠজী? উনি বেরাল আনিয়াছেন, নোতুন ব্যাবসা চালু করবেন।"

হুজুরিমল বলিলেন, "বেরাল? বিল্লি? বিল্লি ভি বিকবে নাকি? তা আপনার দেশে তো বিল্লি আছে না, হামার গদিতে কত চাল যে মুষাতে কাটছে, তার কিছু করতে পারছি না। কত বিল্লি আনাইলেন বাবুজী? কত ক'রে বিকবে? শিকারী বিল্লি আছে তো?"

শ্যামশংকর বোকার মত চুপ করিয়া দুইজনের মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন, বলিলেন, "ঠাট্টা করছেন?"

হুজুরিমল বলিলেন, "ঠাট্টা না বাবুজী, সত্যি আমি কিনব। চারঠো লিব, সব সে বড়িয়া চারঠো, যা দাম লাগে। মাহিনেমে শও রোপেয়ার চালডাল আমার লোকসান করছে বাবুজি, পাঁচ-দশ টাকা না হয় আপনি খাবেন।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "একটা তিন টাকা ক'রে পড়বে।"

হুজুরিমল একটু চমকাইলেন। এত দাম হইবে তিনি বোধ হয় আশা করেন নাই। বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা। আপনি হামার দোকানের সামনে মাল খোলিয়ে দেন, আমি বাছিয়ে লি। আর টাকা—এই নিন বার টাকা।"

ইণ্ডেম্নিটি বণ্ড দরুন খরচ এবং মালের ভাড়া উঠিয়া প্রায় দশ টাকা হাতে আসিয়াছে। শ্যামশংকরবাবু মাধবকে বলিলেন, "যা, বাবুর সঙ্গে গিয়ে বাছাই করে চারটে বেরাল ওঁকে দে। আমি বাসা থেকে ঘুরে আসছি।" মালবাবু বলিলেন, "আমার কমিশনটা ভুলবেন না শ্যামবাবু, আর রসিদ এলেই পাঠিয়ে দেবেন।" তার পর নিজের মনে বলিলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই বেরালের ব্যাবসাই করব না কি শেষ পর্যন্ত, অ্যাঁ? একটা বেরাল তিন টাকা? তিন টাকায় যে একটা পাঠা হয়! সেবারে সেই হাবরেরা এসে রাজ্যের বেরালগুলো মেরে খেয়ে দিয়ে যে কি বিপদ করেছে, ইঁদুরের জ্বালায় উচ্ছন্ন গেল দেশটা। তার পর নিজমনেই বলিলেন, কিছু আদায় করতে হবে, নিদেন পক্ষে একটা বেরাল। রাত্রে ঘুমোবার জো নেই।"

মনোহরপুর বড় শহর, বাজারও ছোট নয়। সেইদিন হুজুরিমলের দেখাদেখি বাজারে অনেকেই শিকারী বিরাল কিনিল। শ্যামশংকরবাবুর খরচ বাদে লাভ দাঁড়াইল তেষট্টি টাকা।

[৪]

পিসীমা বাড়ি আসিয়া বিরাল দেখিতে না পাইয়া প্রথমত খুব চেঁচামেচি করিলেন, তার পর দিন কতক মুখ ভার করিয়া কাটাইলেন, তার পর ভুলিয়া গেলেন। সত্যবান অম্লানবদনে বলিল, কয়দিন না খাইতে পাইয়া সেগুলো কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অষ্টমী বুড়ীমা বলিলেন, পিসীমার গৃহত্যাগের পরদিন বিরালগুলোকে ভাত দিতে আসিয়া তিনি একটারও টিকি দেখিতে পান নাই। সনাতনের ছোট ছেলে সেদিন সন্ধ্যাবেলা পেয়ারা গাছে উঠিয়াছিল—সে সত্যবানকে নিরিবিলি পাইয়া বলিল, "সাতু দা, সেই বাক্স? বলব?"

সত্যবান বলিল, "তা হ'লে শুধু পেয়ারা নয়, ওই গাছসুদ্ধ জাম তোরা খেয়েছিস ব'লে দেব। তোর বাবাকে ব'লে এমন মার খাওয়াব যে—"

এমন সময় পিসীমাকে আসিতে দেখিয়া দুইজনে দুইদিকে সরিয়া পড়িতেছিল। পিসীমা ডাকিলেন, "শোন্"। সত্যবান কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, "এ মাসের মাইনে পেয়েছিস? আমার হাত খালি।"

সত্যবান ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "এখনও তো পাই নি, দু-এক দিনের মধ্যে পাব। তা খরচ কিছু না কমালে তো চলে না আর!"

পিসীমা বলিলেন, "কাকে কমাব, আর কোন্টা কমাব? তার চেয়ে তুমি আয় বাড়াবার চেষ্টা একটু করলে ভাল হয় না? পুরুষমানুষ একটু উপার্জনের চেষ্টা না করে চিরকাল ঘরে ব'সে থাকাটা কি ভাল?"

সত্যবান বলিল, "তুমিই তো ছাড়তে চাও না পিসীমা। না হ'লে উপার্জন করতে আজই বেরতুম। এ অবস্থা আমারই কি খুব ভাল লাগে?"

সত্যবান আর একবার মনস্থির করিল, সে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় যাইবে। সেইদিন বৈকালের ডাকে সত্যবান একখানি চিঠি পাইল। অপরিচিত মেয়েলী হাতের লেখা। চিঠিটি এই—

মনোহরপুর,
৩।৮।১৩৪৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি কে তাহা জানি না, আপনার সহিত আমার বাবার কিজন্য শত্রুতা হইয়াছে তাহাও জানি না। তিনি অন্ততঃ আপনাকে চেনেন না, জ্ঞানতঃ তাঁহার দ্বারা আপনার কোনও ক্ষতি হয় নাই। তিনি নিতান্ত ভালমানুষ বলিয়া অনেকে তাঁহাকে ঠকায়, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। তাঁহার সহিত বিদ্রূপ করিতে কেহ সাহস করে না। আপনি তাঁহাকে এক বাক্স বিড়াল পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্রূপ করা ভিন্ন উহার অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে না। যাহা হউক উহা হইতে আমাদের কোনও ক্ষতি হয় নাই, উপরন্তু কিছু লাভ হইয়াছে। লাভের সমস্ত টাকাই বাবা আপনাকে পাঠাইতে চান, আমি অর্ধেক পাঠাইবার পক্ষপাতী। কারণ কোনও সদুদ্দেশ্যে আপনি এ কাজ করেন নাই। মোট লাভের পরিমাণ তেষট্টি টাকা। কি করিব জানাইবেন। টাকাটা ডাকে পাঠানো হইবে, না আপনি নিজে আসিয়া লইয়া যাইবেন? নমস্কার জানিবেন।

বিনীতা
শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী

পুঃ আমার বাবার নাম শ্রীশ্যামশংকর চট্টোপাধ্যায়।

মাথাভাঙা,
৬।৮।১৩৪৫

সত্যবান প্রথমত অবাক হইয়া গেল, তার পর অনেকক্ষণ ভাবিয়া কয়েকখানা কাগজ নষ্ট করিয়া নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়া ডাকে দিল।

মাননীয়াসু,

আগামী রবিবার বৈকালে অর্ধেক টাকা আমি নিজে গিয়া লইব, বাকী অর্ধেক আপনারা রাখিবেন। আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। নিরুপায় হইয়া আপনাদের কষ্ট দিয়াছি। সাক্ষাতে সমস্ত জানাইব। আমার নমস্কার জানিবেন এবং আপনার পিতাঠাকুরকে দিবেন।

বিনীত
শ্রীসত্যবান মুখোপাধ্যায়

সেদিন রাত্রি একটা পর্যন্ত সত্যবান বসিয়া বসিয়া ভাবিল, শিবগুলিকে কোথায় চালান করিলে উচিত মূল্য পাওয়া যায়? পরদিন সে জমিদার বাড়ি গিয়া তিন দিন ছুটি চাহিল। বলিল, বাড়ির একটা বিশেষ কাজে তাহাকে মনোহরপুর যাইতে হইবে। সত্যবান সহজে ছুটি লয় না, সুতরাং ছুটি মিলিল, পূর্ব মাসের মাহিনাও মিলিল। সে গাড়িভাড়ার টাকাটা এবং মাস্টারবাবুর পান খাইবার জন্য দুই টাকা এবং রামস্বরূপের বকশিশ বাবদ এক টাকা রাখিয়া বাকী টাকাটা পিসীমার হাতে দিয়া যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিল। দাড়ি কামাইয়া টেরি কাটিয়া ধোপদস্ত কাপড়জামা পরিয়া সে পিসীমার এবং অন্যান্য গুরুজনদিগের পায়ের ধুলা লইল। পিসীমা সঙ্গে পুঁটলি বাঁধিয়া খাবার এবং কুঁজা ভরিয়া জল দিলেন। পথের বিপদ সম্বন্ধে তাহাকে বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন। সত্যবান আট বৎসর হইল কলেজ ছাড়িয়াছে, সেই হইতে সে গ্রামের বাহিরে পা দেয় নাই। বাহির হইবার সময় সে বাড়িতে বলিয়া গেল, একটা ভাল কাজের সন্ধান পাইয়াছে, তাহারই তদ্বিরে যাইতেছে। মাস্টারবাবু শ্বশুরবাড়ির জন্য চিঠি এবং মিষ্টান্ন দিলেন, মিষ্টান্নের টাকা দুইটা অবশ্য সত্যবানেরই দেওয়া।

[৫]

ভোরবেলা মনোহরপুরে নামিয়া প্রথমত সত্যবান মাস্টারবাবুর শালার বাসায় গেল। সেখানে কাজ সারিয়া এবং কিছু মিষ্টিমুখ করিয়া সে যখন সন্ধান করিতে করিতে শ্যামশংকরবাবুর বাড়িতে গিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় নয়টা। শ্যামশংকরবাবু অবশ্য বাড়ি ছিলেন না, তিনি না থাকিলেও যত্নের ত্রুটি হইল না। চাকর বৈঠকখানা ঘর খুলিয়া দিল, হাত পা ধুইবার জন্য জল দিল, ঝি আসিয়া একথালা ফলমূল ও খাবার রাখিয়া গেল। সত্যবান এতটা অভ্যর্থনার জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না। অপ্রতিভভাবে একটা ক্ষীর-পুলিতে কামড় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কখন ফিরবেন?"

দাসী বলিল, "তেনার ফিরতে দেরি আছে। আপনি বুঝি আণ্ডা দিদিমণির মাস্টার?"

সত্যবান কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া আর একবার ক্ষীরপুলিতে কামড় দিল এবং মাথা তুলিয়াই বিষম খাইল। বাড়ির ভিতর দিকের দরজাটা খুলিয়া একটি দোহারা গড়নের সুন্দরী মেয়ে তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। সে সেদিকে চাহিতেই তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া মেয়েটি সরিয়া গেল, পরক্ষণেই দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে সোজা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনার চিঠি আমরা একটু আগে পেয়েছি। রাস্তায় কোনও কষ্ট হয় নি? আমি তো ট্রেনের সময় জানি না, বাবাকে বলেছিলাম স্টেশনে একজন লোক পাঠাতে। যায় নি বোধ হয় কেউ? বাবার বড় ভোলা মন।"

সত্যবান দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথা নীচু করিয়া রসমাখা হাতটা সতদূর সম্ভব অপর হাতটার কাছাকাছি আনিয়া বলিল, "না, না, সেজন্য কি হয়েছে? আপনাদের বাড়ি স্টেশন থেকে এমন কিছু দূরও নয়। এক ক্রোশও হবে না বোধ হয়।"

মেয়েটি বলিল, "যাই, আপনার স্নানের ব্যবস্থা করিগে। হ্যাঁ, আপনি মাছ খান তো? আমাদের বাড়ি কিন্তু মাছের পাট নেই।"

সত্যবান বলিল, "আমারও ও জিনিসটার প্রতি বিশেষ লোভ নেই। বহুদিন তো না খেয়ে চালাচ্ছি। পেলে অবশ্য খাই না এমন কথা বলব না।"

মেয়েটি নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, "ভালই হয়েছে।" যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা মাস্টারমশাই, আমি তিন মাসে ম্যাট্রিক দিতে পারব না?"

সত্যবান ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিল, "নিশ্চয় পারবে।"

মেয়েটি প্রশ্ন করিল, "পাস করতে পারব?"

সত্যবান এইবার একটু দ্বিধাভরে বলিল, "নিশ্চয়।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম নন্দরাণী। আমি এতদিন স্কুলে পড়ছিলুম, বড় হয়ে গেছি বলে বাবাকে লোকে নিন্দে করে, তাই বাবা ছাড়িয়ে নিয়েছেন এ বছর। দেখুন দিকি কি বিপদ! ভাল করতে কেউ নেই, মন্দ করতে সবাই আছে। এই বছরটা হলে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারতুম।"

সত্যবান বলিল, "তাতে কি হয়েছে? প্রাইভেট দেবে। পাস করা নিয়ে তো কথা, সে হয়ে যাবে এক রকম করে।"

মেয়েটি চলিয়া গেল। সত্যবান জল খাইয়া দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে চাহিয়া দেখিল, ৮ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার। তাহার আসিবার কথা ১০ অগ্রহায়ণ, রবিবার। আজ যাঁহার আসিবার কথা তিনি হয়তো এখনি আসিয়া পড়িবেন।

এক মুহূর্তে সমস্ত ছলনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহার পর আর এ বাড়িতে মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না। সত্যবান বার বার নিজেকে ধিক্কার দিল, কেন তাহার সত্য কথা বলিবার সাহস হইল না? কেন সে ভুল ভাঙিয়া বলিয়া দিল না যে, সে সত্যবান, বিরালের টাকা লইতে আসিয়াছে? কিছুক্ষণ চিন্তিতমনে বাগানে পায়চারি করিয়া সে ফটকের বাহির হইয়া পড়িল। মালীকে বলিল, "আমি একটু ঘুরে আসছি। দিদিমণিকে বলো ঘণ্টা দুই দেরি হবে।" একবার ভাবিল দরকার নাই বিরাল বিক্রয়ের টাকায়, শাস্ত্রে বলে, 'যঃ পলায়তি স জীবতি' আবার ভাবিল, নাঃ, যখন নামিয়াছি, তখন শেষ দেখিয়া ছাড়িব।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই সত্যবান স্টেশনের পথ ধরিল। লোকটা কোন্ দিক হইতে আসিবে? নিশ্চয় কলিকাতার দিক

হইতে। কলিকাতার গাড়িও তো প্রায় এক ঘণ্টা হইল চলিয়া গিয়াছে। তাহার তো এতক্ষণে বাড়ি পেঁছানো উচিত ছিল। সত্যবান একটা গলির মোড় ফিরিতেই দেখিল একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক গলদঘর্ম হইয়া এক হাতে একটা সুটকেস এবং ঘাড়ের উপর একটি ছোট বিছানা লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন। দেখিয়া দয়া হয়। সত্যবান বলিল, "আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি কি?"

ভদ্রলোক বিগলিত হইয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! আপনি মশাই এই একমাত্র ভদ্রলোক যে আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। সব বেটা খালি হাসে, আমি বেচারা যে এদিকে মরি, সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। হ্যাঁ মশাই, মোটা কি আমি ইচ্ছে করে হয়েছি? মোটা হওয়াটা কি অপরাধ?"

"আজ্ঞে সে কি কথা?" সত্যবান বলিল, "আপনাদের দেখলে তবু এখনও একটু আশা হয়। ফড়িংএর মত ল্যাংলেঙে প্যাংপেঙে চেহারা আমি দু চক্ষে দেখতি পারি না।" সে আগন্তুকের হাত হইতে সুটকেসটি নিজের হাতে লইল। ভদ্রলোক বলিলেন, "যাক একটা মানুষের মত মানুষ দেখলুম এতদিনে। হ্যাঁ মশাই, এও তো দেখছি শহর। আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে আসছি ছোট্ট একটি গ্রাম ধু ধু করছে মাঠ। চিরকাল কলকাতায় থেকে থেকে"—

সত্যবান বলিল, "আপনি বুঝি গ্রাম খুব ভালবাসেন? তা হলে চলুন না আমাদের গ্রামে যাবেন?"

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই যেন নিবিয়া গেলেন। মুখখানি ম্লান করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সে আর হয় না। আমি ভদ্রলোকের কাছে কথা দিয়েছি, তিন মাসে তাঁর মেয়েকে ম্যাট্রিক দিইয়ে দেব। সত্যি মশাই, আমি কল্পনা করতে পারি নি এমন নোংরা জায়গায় আসছি। তা হ'লে কলকাতার তিন তিনটে বাঁধা টিউসনি, মাসে পঁচাত্তর টাকা ছেড়ে এখানে আসি চল্লিশ টাকায়! শ্যামশংকরবাবু লিখলেন—"

সত্যবান বলিল, "ওঃ, তাই বলুন। আপনিই তা হ'লে আমার অন্ন মারতে এসেছেন!"

ভদ্রলোক মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "আপনি কি তাঁর মেয়েকে পড়াচ্ছিলেন নাকি? আমি তো"—

সত্যবান বলিল, "সাত বচ্ছর ধরে গাধাপিটে ঘোড়া করলুম, এখন সওয়ার হবার জন্য ডাক পড়ল আপনার। হ্যাঁ মশাই, লেখাপড়া কি কেউ গিলিয়ে দিতে পারে?"

ভদ্রলোক সায় দিয়া বলিলেন, "তা কি আর পারে? মেয়েটি বুঝি খুব বোকা?"

"একদম আকাট। নিজেই বুঝবেন। নিতান্ত অন্নাভাব, তাই পড়েছিলুম এতকাল। তা, ওঁরা যখন আমার মুখ চাইলেন না, তখন আমি আর কেন ভাবি? কিন্তু মেয়েকে যদি পাস করাতে না পারেন তা হ'লে আপনাকে আর প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে না। একে বড় লোক, তায় গোঁয়ার। এ অঞ্চলে উনিই পুলিস, উনিই ম্যাজিস্ট্রেট।"

ভদ্রলোক শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কি বিপদেই পড়া গেল? মারধর করবে নাকি?"

সত্যবান বলিল, "যখন হাই তুলবে তখন তুড়ি দিতে হবে। আমি একবার ভুলে গেছলুম, বরকন্দাজ দিয়ে কান ধরিয়ে সদর রাস্তায় ঘোড়দৌড় করিয়েছিল। সেই থেকে মশাই এমন ভয় ধ'রে গেছে যে, নিজে হাই তুললে নিজে কখনও তুড়ি দিতে ভুলি না। সারারাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুড়ি দিই।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "কলকাতার নেক্সট ট্রেনটা কখন বলতে পারেন? আমি মশাই একলা মানুষ, অত তুড়ি ফুড়ির ধার ধারি না। কলকাতায় ছেলেদের গার্জেনরা ছাড়বে না, জোর করে এসেছি। গিয়ে তাদের বলব, শরীর খারাপ করেছে, ফিরে এসেছি, রাখবে তো রাখ আবার। লুফে নেবে মশাই! কি দরকার আমার বড়লোকের খোশামোদি করবার?"

সত্যবান বলিল, "নিতান্তই যখন থাকবেন না, তখন আমি আর বাধা দিই কেন? চলুন, আপনাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসি। আপনি একটা কুলী নিলে পারতেন কিন্তু।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "কুলী কি মশাই, রিক্‌শা নিয়েছিলুম?" তার পর হাসিয়া বলিলেন, "শরীর তো নয়, একখানি বপু! রিকশা মাঝ পথেই পেনসন নিলে। অগত্যা তার মালিককে কিছু দণ্ড দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আসছি। মহাপাপ মশাই, মহাপাপ। সাত-জন্ম পাপ করলে মানুষ মোটা হয়।"

সত্যবান বলিল, "দেখুন, আমার গ্রামে একটা সামান্য চাকরি খালি আছে, মাইনে মাত্র দশ টাকা। তার মনিব ভাল গ্রামটিও বেশ ছবির মত। আর থাকবার ভাবনা নেই, আমার বাড়ি আছে, পিসীমা আছেন। খুব ভাল রাঁধতে পারেন। বলেন তো আপনার হাতে একটা চিঠি দিয়ে দিই জমিদারের নামে, আর একটা পিসীমার নামে।"

ভদ্রলোক চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, "না, কলকাতাতেই ফিরে যাই। তবে যদি কখনও সুযোগ হয় আপনার ওখানে বেড়িয়ে আসব। অবশ্য আপনার এই অফারটার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব চিরদিন। হ্যাঁ দেখুন, যদি রিটায়ার করি কখনও আপনাকে খবর দেব, আমার হাতে কিছু না কিছু ভাল ছেলে সব সময়ে থাকে। পড়িয়েও আনন্দ, আর পয়সাও এখানকার চেয়ে বেশী পাবেন।"

কথা বলিতে বলিতে দুজন স্টেশনে আসিয়া পেঁছিলেন। সত্যবান বলিল, "দেখুন, আপনি কিন্তু শ্যামশংকরবাবুকে কিছু লিখবেন না। আমি তাঁর নামে কিছু বলেছি শুনলে, তিনি আমাকে আস্ত রাখবেন না। ভদ্রলোক কৃপার দৃষ্টিতে সত্যবানের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কতদূর পড়াশোনা করেছেন?"

সত্যবান বলিল, "সে আর বললেন না। এম-এ পর্যন্ত।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমি বি-এ পাস করে পঁচাত্তর টাকা কামাই, আর আপনি এখানে লাথি ঝাঁটা খেয়ে প'ড়ে আছেন চল্লিশ টাকায়? আচ্ছা, শিগগিরই খবর দেব আপনাকে, দু-চারটে ভাল টিউসনি পেলেই মাসে এক শ টাকা আপনার হেসে খেলে থাকবে। গোবর্ধন মুখুজ্যে কারও উপকার কখনও ভোলে না।"

সত্যবান ভদ্রলোককে টিকেট কাটিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিল। ভদ্রলোক কোলাকুলি করিয়া হ্যাণ্ডশেক করিয়া সজলচক্ষে কলিকাতাগামী ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন। যতক্ষণ না গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইল ভদ্রলোক ততক্ষণ জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া রুমাল উড়াইলেন। ট্রেন দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে সত্যবান ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

স্টেশনের দরজার কাছে সিঁড়িতে এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?" সত্যবান একবার ইতস্তত করিল, তার পর বলিল, "যাব উপস্থিত শ্যামশংকরবাবুর বাড়ি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "নমস্কার। আমিই শ্যামশংকর চাটুজ্যে। আসুন তবে আমার সঙ্গে।"

সত্যবান বলিল, "আমি চিঠি দিয়েছিলুম। আমার নাম সত্যবান মুখোপাধ্যায়।" বলিতে বলিতে সত্যবান আবেগ ভরে বৃদ্ধের পদধূলি লইল। অন্তত এটুকুর মধ্যে তাহার কোনও ছলনা ছিল না।

বৃদ্ধ খুশী হইয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক বাবা, সুখী হও।

বড় খুশী হলাম তোমার ব্যবহারে। তা তোমার মোটঘাট কিছু নেই?"

সত্যবান বলিল, "মোটঘাট আনবার মত কিছু ছিল না, তাই আনি নি। আমি খুবই গরিব। আমার প্রয়োজনও খুবই অল্প।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বেশ বেশ, বিলাসের পক্ষপাতী আমিও নই। তা রাস্তায় কোনও কষ্ট হয় নি? আমি ঠিক সময়ে না এলে

দেখে দয়া হোলো......

তোমাকে একটু মুশকিলে পড়তে হত। আমাদের বাড়ী একদম শহরের বাইরে, অনেকটা রাস্তা। শহরটা বড় নোংরা বলে আমার মেয়ের পছন্দ হয় না। আমরা একটু ফাঁকার পক্ষপাতী। আমার অবশ্য কাজে কর্মে সারা দিন শহরেই কাটে। তার পর কিছু দূর চলিয়া বলিলেন, "আজ কিন্তু ঠিক সময়ে ধরেছি তোমাকে! আমার মেয়ে নন্দরাণী, বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আমাকে বলে দিয়েছিল, 'বাবা মাস্টার মশাই আসবেন, স্টেশনে যেন লোক থাকে।' তা, এই দুপুর রোদ্দুরে ভাত খাবার সময় কাকে পাঠাই বলতো? কর্মচারীরাও তো মানুষ! তাই ভাবলুম নিজেই একটু এগিয়ে নিয়ে আসি তাতে আবার কত বাধা। আমার খাজাঞ্চী বিশ্বেশ্বর বললে, 'কলকাতার গাড়ি তিনটের আগে আসবে না, আপনি বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করুন, আমরা কেউ যাব এখন।' আমি বলি, বাপু হে, আমি বাড়ি যাব, আর তোমরা ভুলে ব'সে থাকবে; মাঝ থেকে ভদ্রলোকের ছেলে রোদে রোদে ঘুরে হয়রান হবে, তাতে আমি নেই। আর ট্রেন আসা যাওয়ার টাইমের কথা যা বলছ, ওকে কোনও বিশ্বাস নেই বাবাজী। ও হ'ল কলের কারবার, ওর তো মানুষের মত বুদ্ধি নেই যে ভেবে চিন্তে ঘড়ি ধরে চলবে? ও দু ঘণ্টা আগে এলেও আসতে পারে, দু ঘণ্টা পরে এলেও আসতে পারে। যা ভেবেছি তাই। এই তো এখন সবে বারোটা, ট্রেন গেল তো বেরিয়ে?"

সত্যবান মনে মনে নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিতেছিল। এই শিশুর মত সরলপ্রাণ বৃদ্ধকে এইমাত্র একজন অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তির নিকট কি পিশাচরূপেই না সে চিত্রিত করিয়াছে। সে বলিল, "আপনার সত্যি একটু ভুল হয়েছে, এটা দক্ষিণ থেকে এল না, এটা উত্তর থেকে গেল।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "তবেই বোঝ! সাধে কি বলেছি, কলের কারবার? কিছু বিশ্বাস নেই বাবাজী, ও কখন উত্তর থেকে আসে, কখন দক্ষিণ থেকে আসে কিছু বলবার জো নেই।"

সত্যবান আর তর্ক করিল না। বলিল, "আমি আপনার কাছে একটা গুরুতর অপরাধ করেছি, আর তার চেয়ে গুরুতর একটা ভুল আপনারা করছেন। আমি সমস্ত কথা খুলে বলতে চাই আপনার কাছে। সব শুনে যদি ক্ষমা করেন।"

বৃদ্ধ চলিতে চলিতে বাঁ হাত দিয়া তাহার কাঁধটা চাপিয়া ধরিলেন, "এই তুমি আবার পাগলামি আরম্ভ করলে। অপরাধী আমরা সবাই, কে কাকে ক্ষমা করবে হে বাপু? ক্ষমা করবার মালিক সেই উনি। অপরাধ করে থাক, ওঁর কাছে ক্ষমা চাও।"

তার পর খানিকক্ষণ দুইজনে নিঃশব্দে পথ চলিলেন। অবশেষে শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "ছোটবেলায় লেখাপড়া কিছু করি নি, পড়াশোনায় তেমন মাথা ছিল না। সামান্য বুদ্ধির জোরে যা হয় করে এ যাত্রাটা ত'রে গেলুম। সন্তানের মধ্যে আমাদের ওই এক নন্দরাণী, ওই ছেলে, ওই মেয়ে। ওকে আমার হাতে দিয়ে গিন্নী আমায় শেষ অনুরোধ করে গেছেন, "আমার বিদ্বান জামাই করবার ইচ্ছা ছিল। দেখে যেতে পারলুম না। তুমি দেখো, যেন আমার এই সাধটি পূর্ণ হয়।' মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোও তাঁরই আগ্রহে, আমারও যে আপত্তি ছিল তেমন, তা নয়। তবে বড় মেয়ে, ইস্কলের গাড়ি নেই এদেশে, পায়ে হেঁটে হেঁটে যায়, লোকে পাঁচ কথা বলে। তাই দু মাস হল ছাড়িয়ে নিয়েছি। বলি, দুত্তোর, কার জন্যে টাকা করছি, ওরই তো সব। ওর যখন লেখাপড়ার এত আগ্রহ তখন মাসে চল্লিশ টাকা না হয় গেলই। তা' বাবাজী, তোমায় দেখে আমার ভরসা হচ্ছে টাকাটা আমার সার্থক হবে।"

বৃদ্ধের অনেক কষ্টের উপার্জন, সত্যবান সমস্ত বুঝিল। বলিল, "আপনারা কিন্তু আমাকে ভুল করছেন। আপনি যা ভাবছেন, আমি তা নই। আমি প্রতারক।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা। বাবাজী তুমি ভাগবত পড়েছ?"

এমন সময় তাঁহারা বাড়ির দরজায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কথার উত্তর শুনিবার সময় হইল না, বৃদ্ধ দ্রুতপদে বাগানে ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "রাণী, দেখে যা, কে এসেছেন।"

বৈঠকখানার দরজা খোলাই ছিল, নন্দরাণী বোধ হয় অপেক্ষা করিতেছিল; দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবা, তোমার কি কাণ্ড! এই রোদে এতখানি বেলা করলে কেন বল তো?"

"বেশ করেছি! কাকে এনেছি আগে দেখ! আচ্ছা বাবাজী, আমার মা-টিকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে বল তো?"

সত্যবান বলিতে যাইতেছিল, "ভারী সুন্দর!" ঘুরাইয়া বলিল, "খুব বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়।"

শ্যামশংকরবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "মেয়েকে আমি বি-এ পাস করাব, যা খরচ লাগে। কি বল মাস্টার? তুমি কতদূর পড়াতে পারবে?"

সত্যবান বলিল, "তা বি-এ পর্যন্ত পারব বোধ হয়। তার পর এম-এ, পি-আর-এসের জন্য আর মাস্টার লাগবে না ও নিজেই পারবে।"

নন্দরাণী তাহার কপট গাম্ভীর্য বুঝিল, মেয়েটি সরলা হইলেও বুদ্ধিমতী; বলিল, "একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। দু বছর বাদে কোথায় কার বাড়ি হাঁড়ি ঠেলতে পাঠিয়ে দেবে তার ঠিক নেই, পি-আর-এস দেওয়াবে!"

শ্যামশংকরবাবু এবং সত্যবান দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

নন্দরাণী বলিল, "কখন থেকে আপনার জল দিয়ে রেখেছে, কোথায় গেছলেন বলুন তো?"

সত্যবান বলিল, "স্টেশনে।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "আমি তো স্টেশন থেকে ওকে নিয়ে আসছি। তোর কথা রাখবার জন্য এই রোদ্দুরে এত পথ হাঁটলুম, তবু তুই আমায় দেখতে পারিস না। খালি বলিস, আমার ভোলা মন। জিজ্ঞেস কর্, ওকে স্টেশন থেকে ঠিক সময়ে গিয়ে নিয়ে এসেছি কি না।"

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল, "তুমি গেছলে আমার কথা রাখবার জন্যে, আর উনি গেছলেন এই রোদ্দুরে এত পথ ফিরে তোমার কথা রাখবার জন্যে। তবেই বোঝ, উনি তোমার কি রকম ভক্ত!" বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল, "অতি ভক্তি কিন্তু চোরের লক্ষণ, মাস্টারমশাই।"

শ্যামশংকরবাবু হতভম্বের মত একবার কন্যার এবং একবার সত্যবানের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোরা কি বলছিস, কিছু বুঝতে পারছি না যে বাবাজী তুমি কি ইতি-পূর্বে বাড়িতে এসেছিলে নাকি? আবার ফিরে স্টেশনে গেছলে? ট্রেন তবে কি আজও আগে এসেছিল? আমি তিন ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে রইলুম তবু সময়ে পোঁছতে পারলুম না?"

নন্দরাণী বলিল, "তোমাকে যেতে বলেছিলুম সকালের ট্রেন দেখতে, তুমি বিকেলের ট্রেনের তিন ঘণ্টা আগে গেলে কি হবে? নাও চল ভাত তরকারি সব শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেল।"

[৬]

যত বেলা যায়, সত্যবান ততই ডুবিয়া যায়। ভাবিয়া ভাবিয়া সে আর কূলকিনারা পায় না। অবশ্য নন্দরাণী খুব মন দিয়া লেখাপড়া করিতেছে, একেবারে প্রথমভাগের সুবোধ ছেলের মত। কিন্তু সত্যবানের মনে শান্তি নাই। সেদিন খাইতে বসিয়া ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলিবার পূর্বেই একটা সাদা বিরাল কোথা হইতে লাফাইয়া আসিয়া তাহার কোলে চড়িয়া বসিল। নন্দরাণী বলিল, "ওমা, আস্পর্ধা দেখ! নেমে আয় বলছি, নেমে আয়।" সে বিরালটাকে পাখার বাঁট দিয়া খোঁচা দিল, লেজ ধরিয়া টানিল, বিরাল নড়িল না। শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "এই দেখ খাঁটী মানুষকে পশু-পক্ষীতেও চিনতে পারে। আমি এত ডাকি তবু আমার কাছে আসে না, আর তোমার কাছে না ডাকতেই গিয়ে কোল-জুড়ে বসেছে!" নন্দরাণী বিরালের লেজ ছাড়িয়া দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, সত্যবান লজ্জায় মরিয়া গেল। বিরালটা তাহারই পার্সেলের ভগ্নাবশেষ, একটা পা খোঁড়া বলিয়া কেহ দাম দিয়া লয় নাই, নন্দরাণী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। সে সত্যবানকে চিনিতে পারিয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলা ছাত্রীকে পড়াইতে বসিয়া তাহার পূর্বের পঠিত বিষয়ের পরীক্ষা লইতে লইতে হঠাৎ সত্যবান জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি তখন হাসলে কেন?"

নন্দরাণী মৃদুস্বরে বলিল, "কখন?"

"সেই খেতে বসে।"

নন্দরাণী বলিল, "বাবার কথা শুনে। বনের পশুপাখিও খাঁটী মানুষে চিনতে পারে কেবল মানুষই পারে না। কিন্তু কেউই কি পারে না মাস্টারমশাই?"

"তার মানে?"

"বুঝে নিন।"

সত্যবান বলিল, "আমার একটা কথা তোমার কাছে বলবার আছে। তোমার বাবার কাছে বলতে গিয়েছিলুম, তিনি কানেই তুললেন না। কিন্তু তোমাকে শুনতেই হবে।"

"না শুনিয়ে যদি আপনার ভাত হজম না হয়, তা হলে বলুন। অবশ্য না বললেও আমি জানি।"

"কি জানো?"

"আপনি কে, কেন এসেছেন, কি চান। আপনার বেরালের সমস্ত টাকাই আপনার সুটকেসে রেখে দিয়েছি। কি জন্যে পাঠিয়েছিলেন, সেইটে কেবল শোনা হয় নি।"

সত্যবান কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সামনে খোলা বইটার দিকে চাহিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। তার পর চোখ তুলিয়া বলিল, "আমি প্রতারক, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমি প্রতারণা করবার মতলব নিয়ে আসি নি। তোমাকে দেখে আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। তোমার শিক্ষক এসেছিলেন, তাঁকে মিথ্যা কথা বলে ফিরিয়ে দিলুম। তার পর আবার তোমার বাবাকে দেখে নূতন করে সব ঘুলিয়ে গেল। তার কাছে নাম বললুম, তিনি বুঝলেন না! প্রতারণা করেছি স্বীকার করলুম, তিনি শুনতে চাইলেন না; অহেতুক স্নেহ দিয়ে আমায় ভাসিয়ে দিলেন। তোমার কাছে ক্ষমা পেলে হয় তো শান্তি পেতুম। তুমি আমার ছাত্রী, বয়সেও অনেক ছোট, তবু তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।"

নন্দরাণী বলিল, "আপনি কি যে করেন। বেরাল পাঠানোর গল্পটা তো বললেন না?"

সত্যবান বলিল, "আমাদের বাড়িতে অন্নাভাব, অথচ পিসীমার দয়ার শরীর, এক পাল বেরাল পুষে বসেছিলেন। বলে কয়ে কিছুতে কিছু হল না, তাই চুপি চুপি একদিন রেলে তুলে দিলুম চালান।"

নন্দরাণী বলিল, "কিন্তু বাবার ওপর দয়া হল কেন?"

সত্যবান বলিল, "শুনলুম উনি সাধু প্রকৃতির লোক, ওঁর নামে পাঠালুম, ফিরিয়ে দেবেন না, বা কৃষ্ণের জীবগুলো না খেয়ে মরবে না এই আশায়।"

নন্দরাণী বলিল, "বাবা আমার কিরকম ব্যাবসাদার বলুন তো? বেরাল বেচেও টাকা করতে পারেন। আপনি পারতেন?"

সত্যবান বলিল, "তা পারতুম না সত্যি। তা সব বেরালের দাম পেলুম, একটার তো পেলুম না।"

নন্দরাণী সপ্রতিভভাবে বলিল, "ওটা আমার ফাউ।"

সত্যবান মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, ফাউ-এর দিন চলে গেছে। দাম না দিতে পার তো ভাড়া লাগবে।"

নন্দরাণী বলিল, "কত ভাড়া?"

সত্যবান আবেগভরে গর্দভের মত একটা কি বলিতে যাইতে-ছিল, নন্দরাণী তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখুন, কি সুন্দর চাঁদ উঠছে!"

সত্যবান চুপ করিয়া গেল। তার পর কিছুক্ষণ ইংরেজী এবং অঙ্কের আলোচনার পর নন্দরাণী বলিল, "বাবার দোকান থেকে ফেরবার সময় হল, আমি যাই। একটা তরকারি অন্তত নিজের হাতে না রাঁধলে বাবার খাওয়া হয় না। আপনার কাপড় চারখানা আনিয়ে রেখেছি বেরালের টাকা থেকে, জামার মাপটা কাল দিয়ে আসবেন।"

সত্যবান বলিল, "তুমি এত বেশী ভাব পরের জন্যে?"

নন্দরাণী বলিল, "আর আপনি এত বেশী বকেন নিজের খেয়ালে? কতক্ষণ পড়িয়েছেন আর কতক্ষণ গল্প করেছেন বলুন তো।"

সত্যবান বলিল, "ওটা আমার ফাউ।"

[৭]

গোবর্ধন মুখোপাধ্যায় সত্যই সত্যবানকে ভুলেন নাই। সাত দিন পরে তাঁহার চিঠি পাওয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন, দুইটি বি-এ ক্লাসের ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াইলে আশি টাকা মিলিবে। একজন দিবে পঁয়তাল্লিশ, একজন দিবে পঁয়ত্রিশ। সত্যবান যেন পত্রপাঠ চলিয়া আসে।

কলিকাতায় থাকিতে এম-এ পরীক্ষার পূর্বে সত্যবান অর্থ-কষ্টে পড়িয়া কিছুদিন ছাত্র পড়াইয়া ছিল। ছাত্রটি বড়লোকের ছেলে, সুতরাং নিজে কিছুই করিত না। সত্যবান তাহার হোম-টাস্ক করিয়া দিত, অঙ্ক কষিয়া দিত, তাহাকে রিডিং পড়িয়া শুনাইত। সে বসিয়া বসিয়া নখ খুঁটিত, আঙুল মটকাইত, গা চুলকাইত এবং হাই তুলিত। সত্যবান যদি প্রশ্ন করিত তাহা হইলেই বিপদ। হয়তো সত্যবান বলিল, "বল, এরুডিশন মানে পাণ্ডিত্য।" ছাত্র সায় দিয়া বলিল, "হুঁ!" সত্যবান বলিল,

"আগাল মানে কুৎসিত।" ছাত্র বলিল, "হ্যাঁ।" সত্যবান বলিল, "ইন্‌স্পেকশন মানে কি?" ছাত্র বলিল, "দেখুন না খাতায়, আপনিই তো কি লিখে দিয়েছেন।"

বেশী রাগ করিলে ছাত্র অবাধ্যতা এবং অসভ্যতা করিবে, অভিভাবক অর্থাৎ কর্তাবাবু বা জেঠাইমা কোনও প্রতিকার করিবেন না। সত্যবানের অর্থের প্রয়োজন ছিল, তাই কোনও রকমে সব সহ্য করিত। কিন্তু এম-এ পরীক্ষা শেষ হইবার পর সেও অধৈর্য হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিন ছাত্রকে 'পরাঙ্মুখ' বানান জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যবানের চাকরিটি গেল। ছাত্র চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছেন, পরাঙ্মুখ? পরাঙ্মুখ মানে আপনি জানেন না? হেঁ হেঁ হেঁ!" সত্যবান কঠোর স্বরে বলিল, "না, পরাঙ্মুখ মানে আমি জানি না! তোমাকে বলতে হবে, বল।"

সহসা অকাল জলদোদয়ের ন্যায় ছাত্রের জেঠাইমা মালা জপিতে জপিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁ মাস্টার, ও কি কথা? তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে, ভদ্দরলোকের বাড়ি চাকরি করতে এসেছ, তোমার হাতে আমরা বিশ্বাস করে ছেলে দিয়েছি আর তুমি কি না ঐসব অকথা কুকথা শিখিয়ে ওর মাথাটি খাচ্ছ? ওর বাপ পিতামোর রক্তে কুকথা নেই, ওর মুখ দিয়ে সে কথা বেরুবে না, তাই আবার জবরদস্তি? উঠে আয় ভোঁদা, উঠে আয় বলছি এক্ষুনি! মাস্টারের কাছে খুব বিদ্যে শিখেছ, আর শিখে দরকার নেই! জন্ম জন্ম মুখ্যু হয়ে ঘরে থাক, কাজ নেই আমার অমন বিদ্যানে। যাও মাস্টার, তুমি বৈঠকখানায় যাও। আমি সরকারকে বলে দিচ্ছি, তোমার মাইনে দিয়ে দেবে হিসেব করে।"

সত্যবান কর্তাবাবুর কাছে এবং সরকার মহাশয়ের কাছে একবার ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, যে কথাটা সে শিখাইতেছিল সেটা 'পোড়ার মুখ' নয়, 'পরাঙ্মুখ'। কিন্তু কোনও ফল হইল না। বাড়ির মধ্যে জেঠাইমার অখণ্ড প্রতাপ। শেষে 'দুত্তোর' বলিয়া সে কলিকাতা ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসিয়াছিল, এতকাল আর নড়ে নাই। সুতরাং এত দিন পরে একেবারে আশি টাকা আয়ের কাজ পাইয়া তাহার মত দরিদ্রের আনন্দিত হইবার কথা, কিন্তু সে মোটেই আনন্দিত হইতে পারিল না। কেন পারিল না, নিজের মনে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সত্যবান চিন্তিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে চোরাবালির উপর দিয়া চলিয়াছে, স্বপ্নচালিতের মত। যে কোনও মুহূর্তে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইতে পারে, সেও অতল পাতালের অমেয় অন্ধকারে তলাইয়া যাইতে পারে। কিসের আশা? যতই সাদাসিধাভাবে থাকুন, ইঁহারা বড়লোক। তাহাকে দরিদ্র বলিয়া একটু দয়া করেন, এই বই তো না? সেই দয়ার উপর নির্ভর করার চেয়ে আরও বেশী আয়ের কাজে নিজের আর্থিক উন্নতি করিতে পারিলে নিজেরও ভবিষ্যতের কাজ হয়, আত্মীয় এবং পোষ্যবর্গেরও উপকার হয়। অনেক ভাবিয়া সত্যবান মনস্থির করিল।

সন্ধ্যার সময় নন্দরাণী পড়িতে আসিলে বলিল, "আজ একখানা চিঠি এসেছে। কলকাতা থেকে একটি বন্ধু কাজের সন্ধান দিয়েছেন। আশি টাকা পাওয়া যাবে, যাব কি না ভাবছি।" বলিতে বলিতে চিঠির যে অংশটাতে টাকার উল্লেখ ছিল, সেইখানটা দেখাইল।

নন্দরাণীর মুখ গম্ভীর হইল। সে বলিল, "যাওয়াই তো উচিত। বেশী পেলে কে কমে পড়ে থাকে? বিশেষ আপনি দেখছিলেন আপনাদের অভাবের সংসার।"

সত্যবান এতটা তত্ত্বকথা বোধ হয় আশা করে নাই। বিষণ্ণমুখে বলিল, "কিন্তু তোমার পড়ার বড় ক্ষতি হবে। নিত্যি নতুন লোক বদলালে—"

নন্দরাণী বলিল, "তা একটু হবে হয় তো। কিন্তু কি আর করছি। আপনি না হয় গিয়ে চেনাশোনা কাউকে পাঠিয়ে দেবেন, যে আপনার মত পড়াতে পারবে; কিন্তু আপনার মত গল্প করবে না।"

সত্যবান গুম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বীজ গণিতের কয়েকটা নিয়মকানুন বুঝাইল, তার পর বলিল, "সেবার বেরাল পাঠিয়েছিলুম, এবার মাস্টার পাঠাব। তার পর?"

নন্দরাণী বলিল, "এর পর বাড়তি মাইনের টাকাটা পাঠাবেন, সেটা তো আপনার পাবার ইচ্ছে নেই, আমার কথাতেই।"

সত্যবান বলিল, "সে কথা সত্যি! তোমরা আটকালে আমার যাওয়া হয় না; ন্যায়ত ধর্মত না আটকালেও যাওয়া উচিত হয় না। তবু যাব। আচ্ছা, বাড়তি টাকাটা পাঠালে তুমি নেবে? কি কিনবে? শাড়ি?"

নন্দরাণী গভীর লজ্জায় মুখ লাল করিয়া বলিল, "জানি নে, যান! আপনি বড় বাজে বকেন!" বলিয়া সে দ্রুতপদে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। সত্যবান মনে মনে হাসিল।

সেদিন রাত্রে আহারের পর সত্য শ্যামশংকরবাবুকে কলিকাতায় চাকরির কথা বলিল। ভদ্রলোক চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বল কি বাবা, এই সেদিন এলে, এর মধ্যে আমাদের ছেড়ে যাবে? আসতে না আসতেই? আমি ওদিকে কত রকম মতলব ভাঁজছি!"

সত্যবান বলিল, "এ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত আপনিই বিবেচনা ক'রে বলুন। আপনি আমার পিতৃতুল্য।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "তোমার দিক থেকে বিবেচনা করলে অবশ্য যাওয়াই উচিত। তার পর খানিক ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোমার মাইনে আমি যদি আশি টাকা ক'রে দিই?"

সত্যবান কোনও জবাব দিবার পূর্বেই নন্দরাণী বলিল, "কেন তুমি অবস্থার বাইরে যাচ্ছ বাবা? ভারি তো আমার পড়া, তার জন্যে আশি টাকা ক'রে খরচ করতে হবে না তোমাকে। আর উনি যখন যাওয়া স্থির করেছেন, তখন এখানে আশি টাকা পেলেই কি উনি থাকবেন? ক'লকাতায় কত সুখ-সুবিধে। আচ্ছা মাস্টার মশাই, কাল যাবার আগে দেখা করে যাবেন। চল বাবা, অনেক রাত হয়ে গেছে।"

সত্যবান কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহিরের ঘরের দিকে যাইতেছিল, নন্দরাণী পিতাকে শোয়াইয়া আসিয়া বলিল, "এখনও শুতে যান নি? কি ভাবছেন অত? বাবার কাছে চাকরি নিতে দিই নি ব'লে আমার উপর রাগ হয়েছে? সেটা কি ভাল হ'ত?"

সত্যবান বলিল, "ভাবছি, তোমাকে চিনতে পারলুম না!"

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল, "মহা চিন্তার কথা বটে! দুপুর রাত্রে এ সমস্যার সমাধান না হ'লে চলে কি করে? যান এখন শুয়ে পড়ুন, কাল ভোরে উঠতে হবে। আটটার ট্রেনে গেলে বেলাবেলি পেঁছিতে পারবেন।"

সত্যবান চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নন্দরাণী বলিল, "এ তো ভাল বিপদে পড়া গেল দেখছি! বলছি তো চেনবার অনেক সময় পাবেন, এখন যান।"

সত্যবান বলিল, "সময় পাব?"

নন্দরাণী মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেটা আপনার বরাত, আর আমার হাতযশ। নাঃ, ভেবেছিলাম আপনি বুদ্ধিমান্। দেখছি আমার বাবার চেয়েও বোকা।"

[৮]

দুই সপ্তাহ পরে সত্যবান শ্যামশংকরবাবুকে পত্র দিয়াছে। দুই বেলা প্রাইভেট টিউইশন করিয়া সে যে আশি টাকা

পাইতেছিল, তাহার উপর সম্প্রতি ষাট টাকা বেতনে একটা স্কুলের চাকরি সে পাইয়াছে। উপস্থিত মাসিক এক শত টাকা করিয়া দেনা শোধ করিবে, কুড়ি টাকা পিসীমাকে পাঠাইবে এবং কুড়ি টাকায় নিজের মেসের খরচ চালাইবে। নন্দরাণীর জন্য একটি ভাল শিক্ষকের সন্ধান করিতেছে, সুবিধামত অল্প বেতনে রাজী হয়, এরূপ ভাল ছেলে পাইলেই পাঠাইবে। উত্তরে শ্যামশংকর-বাবু লিখিলেন, "তোমার উন্নতির সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দিত। নন্দরাণী আর যার তার কাছে পড়িতে চায় না। সে নিজে-নিজেই পড়িতেছে। তুমি সময় পাইলে তাহাকে চিঠিতে কিছু কিছু উপদেশ দিও।"

ইহার পর হইতে উভয় পক্ষেরই চিঠিপত্র কিছু ঘন ঘন চলিতে লাগিল। সত্যবান দুই চারিখানা 'মেড্ ইজি' এবং 'ইন ওআন মান্থ' নোটের বইও পাঠাইল। পড়াশোনা কতদূর কি হইল বলা শক্ত; কিন্তু নন্দরাণী তিন মাস পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দিল। সেই উপলক্ষে শ্যামশংকরবাবু সকন্যা তাঁহার বাল্যবন্ধু রায় বাহাদুর রাধাচরণ বাবুর বাড়ি গিয়া উঠিলেন। পরীক্ষার কয়দিন সত্যবান নিয়মিত নন্দরাণীকে পড়াইতে যাইত এবং পরীক্ষার মধ্যে টিফিনের সময় শ্যামশংকরবাবুর সঙ্গে খাবার লইয়া হাজির থাকিত। এজন্য তাহাকে নিজের স্কুলের এবং প্রাইভেট ছাত্রদের দুই-এক ঘণ্টা ক্ষতি করিতে হইত, কিন্তু পূর্বের কঠোর ধর্ম-জ্ঞান কমিয়া যাওয়ায় বিবেকে বাধিত না। তাহার কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলে ও ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে অবিদিত ছিল না, তাই কেহ কিছু বলিতেন না। জানিতেন, সে ঠিক যথাসময়ে পোষাইয়া দিবে।"

পরীক্ষার শেষ দিনে 'হল' হইতে বাহির হইয়া নন্দরাণী বলিল, "আজ কিন্তু মাস্টার মশাই আমাদের খাওয়াতে হবে, আর ট্যাক্সি ক'রে কলকাতা শহর বেড়িয়ে আনতে হবে। তার পর রাত্রে সিনেমা।" পরক্ষণেই সত্যবানের পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা তো দোকানের খাবার খান না, কেবল আমি।"

সত্যবান হাসিয়া বলিল, "কি খাবে?"

"এক পয়সার নকুলদানা।"

"আর?"

"দু পয়সার আলুকাবুলি।"

"আর? ব'লে যাও।"

"আর চার পয়সার কট্‌কটি বিস্কুট!"

সত্যবান হাসিয়া বলিল, "গরীব ব'লে দয়া করতে হবে না। ওর চেয়ে বেশী খাওয়াবার সাধ্য আমার আছে।"

নন্দরাণী বলিল, "তবে মুখ অমন ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছল কেন? আপনি ভারী কেপ্পন!"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "জানে আমি ওই সব কুপথ্য কিনে দেব না, তাই তোমার কাছে বায়না হচ্ছে। সাত পয়সাতেই ভোজের ফর্দ দিয়ে দিলে! কিন্তু যাই বল, মেয়ে আমার খুব হিসেবী। ছেলেবেলায় বাগানে পয়সা পুঁতে রাখত গাছ বেরবে ব'লে।"

নন্দরাণী লজ্জিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "হ্যা, রাখত। না মাস্টার মশাই বাবার সব বাজে কথা। তাহ'লে আমাকে খাওয়াচ্ছেন কি না বলুন?"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "খাওয়াও হে বাবাজী, রোজগার করছ, খাওয়াও। তবে ওই অখাদ্যগুলো বেশী খাওয়া ভাল নয়। ওতে শরীর খারাপ করে। আমি বলি, যা করবে কর, শরীরটা বাঁচিয়ে কর। শাস্ত্রে নাকি বলেছে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। ঠিক কথা।"

নন্দরাণী এইবার প্রতিশোধ লইল। বলিল, "ওর মানেটা কি হ'ল বাবা?"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "অর্থাৎ কিনা শরীরটা হচ্ছে ধর্মসাধনের খলু।"

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল, "খলু কাকে বলে বাবা?"

শ্যামশংকরবাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "জানি নে যা! কি খাবি, খেয়ে নে। বাড়ি ফিরে একটু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমো সকাল সকাল। কাল বাড়ি ফিরতে হবে। সেখানে কদিন কি হচ্ছে কে জানে।"

নন্দরাণী বলিল, "এত দূরে থেকে এলুম, কলকাতা শহরটা একবার দেখে যাব না বাবা?"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "আশ্চয্যি মেয়ে! কোথায় এতদিন খাটলি খুটলি, সাত দেশ সাত নদী পার হ'য়ে এলি, একটু হাত-পা ছড়িয়ে জিরবি, তা না ট্যাং ট্যাং ক'রে শহর দেখতে যেতে হবে? কি আছে দেখবার? ক'টা বড় বড় বাড়ি, আর ক'টা খাড়া খাড়া রাস্তা। রাস্তায় বেরতে হয় প্রাণ হাতে ক'রে, রাত্রে ঘুম হয় না আওয়াজের জ্বালায়। দুত্তোর নিকুচি করেছে কলকাতার!"

যাহাই হউক, ঠিক হইল পরদিন একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শ্যামশংকর এবং নন্দরাণীকে লইয়া সত্যবান শহর দেখিতে বাহির হইবে। কালীঘাট হইতে বাগবাজার, পরেশনাথের বাগান হইতে হাওড়ার পুল পর্যন্ত কিছুই বাদ যাইবে না। সত্যবান বাসায় ফিরিয়া মনিব্যাগে দেখিল তিপ্পান্ন টাকা বার আনা আছে। এক দিনের নবাবির পক্ষে যথেষ্ট, পর দিনের চিন্তা পরদিন করা যাইবে।

[৯]

পরদিন প্রভাতে এক অভাবনীয় সুসংবাদ আসিল। সত্যবান কিছুদিন যাবৎ 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়া'র 'ক্রসওআর্ড' সমস্যা পূরণ করিয়া পাঠাইতেছিল। কোনও বারে কিছু পাইত না, কোনও বারে তিন-চার টাকা পাইত। সেদিন সংবাদ আসিল, সর্বৈব নির্ভুল সমাধানের জন্য সে দশ হাজার টাকার একখানি চেক, একটি কোড্যাক ক্যামেরা এবং একটি হাতঘড়ি পাইবে। সত্যবান আবার দিনের বেলা স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন তাহার সহিত দেখা হইতেই নন্দরাণী বলিল, "দেখবেন, ফেটে যাবেন না যেন।"

সত্যবান বলিল, "ফাটবার লক্ষণটা কোথায় দেখলে? বেশী মোটা হয়ে যাচ্ছি নাকি।"

নন্দরাণী বলিল, "না না, বাইরে নয়, কি একটা হয়েছে যেন ভিতরে। হুটপাট করছে, বেশীক্ষণ চাপা থাকবে না। কথায় বলে আহ্লাদে আটখানা সেই রকম ভাবটা দেখছি কি না! কি হ'ল বলুন তো?"

সত্যবান বলিল, "দশ হাজার টাকা পেয়েছি, 'ক্রসওআর্ড' পাজ্‌লে।"

নন্দরাণী কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, বোধ হয় যেন মনে মনে কাহাকে প্রণাম করিল। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "হবে না, আমি রাধাগোবিন্দের কাছে প্রতি দিন প্রার্থনা করেছি। ভগবান চিরদিন কাউকে দুঃখ দেন না।"

সত্যবান অবাক হইয়া বলিল, "তুমি রোজ আমার জন্যে প্রার্থনা করতে?"

নন্দরাণী বলিল, "কেন অপরাধ হয়েছে?"

সত্যবান পুলকিত হইয়া বলিল, "তা হ'লে টাকাটা তোমারই প্রাপ্য বল? কি কিনবে, শাড়ি না গাড়ি?"

নন্দরাণী বলিল, "বাড়ি। এই রকম মার্বেল পাথরের মেঝে দেওয়া।"

সত্যবান বলিল, "তার পর? হাঁড়ি আর বেড়ি?"

নন্দরাণী বলিল, "কেবল বাজে কথা, যান!" বলিয়া পলাইল।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামশংকরবাবু ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "পাগলী গেল কোথায়? এখনি তো আবার তোমাদের সঙ্গে শহর ঘুরতে বেরতে হবে? আর পারি নে বাবা! আচ্ছা সত্যবান, তুমিই তো ওকে ঘুরিয়ে আনতে পার। তুমি একটা জোয়ান ছোকরা থাকতে আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন বল তো?"

সত্যবান বলিল, "আমার সঙ্গে একা যাওয়াটা কি ঠিক হয়। আমি নিঃসম্পর্কীয়।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "অবাক করলে! তুমি আমার পুত্র-স্থানীয়। তোমাকে আমি কি চক্ষে দেখি—"

সত্যবান বলিল, "সেই ভরসাতেই আজ একটা স্পর্ধা করতে সাহস করছি। অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "অত ভণিতার প্রয়োজন কি বাবাজী, খুলেই ব'ল না। নন্দরাণীকে পছন্দ হয়েছে? বিয়ে করতে চাও? ওহে বাপু, তোমরা আমাকে যতটা বোকা ঠাওরাও ততটা বোকা আমি নই। ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না, সব বুঝি। তবে শোন মাস্টারদের যতগুলো দরখাস্ত এসেছিল তার মধ্যে বেছে বেছে পালটি ঘর দেখে লোক নিলুম। তা, মেয়ের মুখে শুনলুম, তুমি সেটিকে বিদেয় ক'রে নিজে ঢুকেছ। তখনি বুঝেছি, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। তা, দেখলুম, তুমিও পালটি ঘর, সুপাত্র, হুজুরিমলের ক্যাশিয়ারের ভগ্নীপতিকে চিঠি লিখেছিলাম, সেও তোমার খুব প্রশংসা করেছে। আর জানইতো অর্থ দিয়ে আমি মানুষকে বিচার করি না। আমিও একদিন দরিদ্র ছিলাম। নিজের চেষ্টায় যা সঞ্চয় করেছি, তাতে তোমাদের দু পুরুষ ব'সে খেলে চ'লে যাবে। তবে হ্যাঁ, পুরুষ-মানুষ রোজগার করা ভাল। কিন্তু বাবাজী, বুড়োবয়সে তো আমি মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারব না! বিয়ের পর তোমার চাকরিটা—তা হবে শখের, ছাড়লে ছাড়তে পারবে, রাখলে রাখতে পারবে, কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচব? তুমি কি ঘরজামাই থাকতে রাজী আছ?"

সত্যবান বলিল, "আমি হয়তো রাজী হতুম, কিন্তু আপনার মেয়ে তাতে সুখী হবে না জেনেই রাজী হ'তে পারছি না। আপনি হয়তো বলবেন, আমার পরিবার প্রতিপালনের যোগ্যতা নেই, সে ক্ষেত্রে আমি একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। আজ খবর এসেছে, আমি 'ক্রসওআর্ড পাজ্‌লে' দশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছি।"

বৃদ্ধের বিষণ্ণ মুখ সহসা আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "বল কি হে, দশ হাজার টাকা! আমার যে সারা বছরে দশ হাজার টাকা লাভ হয় না। তুমি এক কথায় পেয়ে গেলে? ক্রসওআর্ডটা কি জিনিস?"

সত্যবান বুঝাইয়া দিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহ'লে তো আর তোমাকে গরিব বলা চলে না। ওরে ও রাণী, রাণী!"

বৃদ্ধের চীৎকারে নন্দরাণী ছুটিয়া আসিল। যত তাড়াতাড়ি আসিল, তাহাতে বোধ হইল, কাছেই কোথাও বোধ হয় সে এই ডাকটির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "শুনেছিস, সত্যবান আমাদের দশ হাজার টাকা পেয়েছে। ও টাকাটা নিয়ে কি করবে ভাবছ সত্যবান?"

সত্যবান বলিল, "ভাবছি কলকাতায় একখানা বাড়ি কিনব।"

নন্দরাণী ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোর বর ঘরজামাই থাকলে তো তোর অপমান হবে, তোর বাপ ঘরশ্বশুর থাকলে তোর অপমান হবে না তো?"

নন্দরাণী মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "জেঠামশাই বলছিলেন যে, এই বাড়িটা বেচবেন। অনেক টাকা দেনা হ'য়ে গেছে ও'দের। তা' তোমরা দুজনে মিলে কিনতে পার না? সদর অন্দর দুটো ভাগ হ'য়ে সমানই তো আছে। ভিতর বাড়িতে পিসীমারা রইলেন, বা'র বাড়িতে তোমরা রইলে, আর আমিও যখন খুশি যেতে-আসতে পারব।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "দেখ, মেয়ের বুদ্ধি! এক মুহূর্তের মধ্যে সব জল করে দিলে। ওহে রাধা, ও রাধা, শোন, এ দিকে।"

বৈঠকখানার বাম পাশে একটি ছোট ঘর ই'হাদের বসিবার জন্য এবং নন্দরাণীর পড়ার জন্য ছাড়া ছিল। রায় বাহাদুর পাশের ঘরেই অর্থাৎ বৈঠকখানায় ছিলেন। উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি হে অত হাঁকাহাঁকি কিসের?"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "তোমরা নাকি বাড়িটা বেচে দিচ্ছ?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "দিচ্ছি আর কোথা থেকে? ষাট হাজার টাকার বাড়ি, দায়ে প'ড়ে বেচছি ব'লে, কেউ পনের হাজার, ষোল হাজারের বেশী উঠতে চায় না। বিশ হাজার পেলে ছেড়ে দিই।"

নন্দরাণী ইত্যবসরে সরিয়া পড়িল।

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "আমার তো অত টাকা নগদ হাতে নেই। তবে ইনি সত্যবান বাবাজী আমার ভাবী জামাই—ইনি দশ হাজার আর আমি দশ হাজার দিয়ে বিশ হাজার পুরো করে দিতে পারি। তা দেখ, তুমি যদি অন্য কোথাও বেশী দাম পাও, তা হ'লে চেষ্টা কর। না হ'লে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই বলা রইল।"

রায় বাহাদুর উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বাঁচালে ভাই! বিশ হাজার হ'লে আমার দেনাটা মেটে, আমি কুঁড়ে ঘরে শাক ভাত খাই সেও ভাল, অপমান আর সহ্য হয় না।"

তারপর সত্যবান নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলো লইলে বলিলেন, "চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন? কোথায় দেখেছি না?"

সত্যবান বলিল, "আপনি আমাদের বাড়িতে গেছলেন মাথাভাঙায়। আমার নাম শ্রীসত্যবান মুখোপাধ্যায়।"

রায় বাহাদুরের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। বলিলেন, "ওঃ, তোমার সঙ্গে বুঝি রাণীর বিয়ে স্থির হয়েছে? বেশ বেশ, বড় সুখী হলুম। তা বাবাজী, তোমার তো তখন অবস্থা তেমন—"

শ্যামশংকর বলিলেন, "বিলক্ষণ! দেশে জমি জায়গা, কল-কাতায় দেড় শ' টাকা মাইনের চাকরি, এম-এ পাস, সোনার চাঁদ ছেলে। এইবার নিজে কলকাতায় বাড়ি কিনছে। আমিও ভাবছি, বুড়ো বয়সে দু দিন একটু মেয়ে জামাইয়ের সেবা খাই। চিরকালটা তো খাটলুম, আর কিসের জন্যে? তবে চলতি কারবারটা, বাবাজীকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতুম। তা লোক আমার যে ক'টি আছে সব বিশ্বাসী। তা হ'লে ওই কথাই রইল, তুমি একটা ভাল দিন দেখে রেজেস্টারির ব্যবস্থা কর বাবাজী, তুমিও টাকাটার ব্যবস্থা কর, আমিও দেশে গিয়ে টাকা পাঠাবার ববস্থা করি। তাহলে রাধা তোমার জামাই পছন্দ হয়েছে?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "নিশ্চয়! অতি সুপাত্র! তা বাবাজী, আমার মেয়েটির তো কোনও ব্যবস্থা এখনও ক'রতে পারি নি, তোমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একটি দেখে শুনে দাও না।"

সত্যবান বিনীতভাবে বলিল, "যে আজ্ঞে, সন্ধান রাখব।"

শ্যামশংকরবাবু বলিলেন, "যাক বাবা, বাঁচলুম। তাহ'লে একবার পাঁজিটা আনাও রাধা, একেবারে দিনটা দেখে রাখি।" তার পর রায় বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন, "না ভাই, এখন থাক। তোমার মেয়ের একটা ব্যবস্থা হ'ক তার পর একসঙ্গে দুই বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। আর ততদিন তোমরা

এই বাড়িতেই থাকবে, ইতিমধ্যে ব্যবস্থা ক'রে ভাল বাসাবাড়ি সস্তায় পেলে তখন উঠে গেলেই চলবে। কোন চিন্তা নেই, আমার জামাইয়ের মন খুব উচু'। ওই ছেলেকে তুমি অপছন্দ করেছিলে রাধা? কি করবে বল, আমার মেয়ের বরাতে আছে, তোমার সাধ্য কি তাকে ছিনিয়ে নাও।"

রায় বাহাদুর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যা বলেছ। চল, এক দান পাশায় বসা যাক।"

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নন্দরাণী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বিন্দুমাত্র সাজগোজ করে নাই, যেমন ছিল তেমনি আছে। সত্যবান বলিল, "বেড়াতে যাবে না? বেলা বেড়ে যাচ্ছে যে।"

নন্দরাণী বলিল, "ছিঃ লোকে কি বলবে।"

সত্যবান বলিল, "লজ্জাবতী লতা!"

নন্দরাণী একবার চারিদিক চাহিল, তার পর দ্রুতপদে আসিয়া সত্যবানের পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিল। সত্যবান নীরবে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিল, "ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর।"

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল, "কি আশীর্বাদের ছিরি! মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ কি জান? স্বামীর ভালবাসা।"

সত্যবান বলিল, "ওটা তো ফাউ! আসল হচ্ছে টাকা।"

নন্দরাণী বলিল, "তাই বুঝি! তা হ'লে তুমি আমার বাবার টাকা দেখে আমাকে ভালবেসেছিলে বল? আর আমি তোমার টাকার পাহাড় দেখে ভুলে গিয়েছিলাম?"

সত্যবান বলিল—"তা যদি বল, তা হ'লে সবের মূলে আছে পিসীমার বেরাল। বেরালের বদলে বউ পেলুম, তাক ডুমাডুম ডুম।"

নন্দরাণী বলিল, "যাও তুমি ভারী অসভ্য!"

ছবি দেখা

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

লিথো পাথরে নানারকমের textureএর কাজ করা যাইতে পারে; লাইনের কাজ, দানাদার (granular) কাজ প্রভৃতি নানারকমের কাজ বাহির করা যায়, এসব রকমারি কাজ নির্ভর করে পাথরের উপরিভাগের তারতম্যের উপর। লিথো পাথর মসৃণ পাথর দিয়া ঘষিলে হইবে দানা দানা। দুই পাথরে দুই ভিন্ন পদ্ধতির কাজ হইবে।

এচিং

এচিং করিতে হয় তামা বা দস্তার পাতে, সরু ছুচের ন্যায় যন্ত্রে আঁচড় কাটিয়া। এচিংএর লাইন কপার প্লেটে হয় নীচু—উডকের ঠিক উলটা। এচিং শব্দের অর্থ হইল, যাহা etch বা ক্ষয় করিয়া করা হয়। তামার পাতে আগাগোড়া দুই পিঠে মোম (wax) মাখাইয়া তাহার উপর এচিং নিড্ল (কোনও ছুঁচলো লোহা) দিয়া আঁকিতে হয়, তাহাতে মোমটা কাটিয়া গিয়া তামার পাত বাহির হয়। তার পর পাতটিকে ডুবাইয়া রাখা হয় নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্রবণে। লাইনের গভীরতা অনুসারে ডুবাইয়া রাখার সময় নির্দিষ্ট করা আছে। ছুঁচের আঁচড়ে যেখানে মোমের আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানই অ্যাসিডে খাইবে, অন্যত্র মোমের আবরণ ভেদ করিয়া তামার পাতে অ্যাসিড লাগিবে না। এর পর উত্তাপ দিয়া মোমের আবরণ দূর করিতে হয়। তার পর কালি মাখানো এবং ছাপার পালা। মোম না মাখাইয়া সোজাসুজি পাতের উপর আঁচড় কাটিয়াও ছবি করা যায়। এরূপ কাজকে বলা হয় ড্রাই পয়েণ্ট (dry point)। কিন্তু দুই প্রকারের কাজই সাধারণত এচিং বলিয়া পরিচিত। ড্রাই পয়েণ্ট এবং এচিং এই দুই প্রকার চিত্রের কাজের তারতম্য আছে। এচিংএ পাই শুদ্ধ সূক্ষ্ম লাইনের কাজ। ড্রাই পয়েণ্ট সরু লাইনের কাজ এবং তুলির টানের মত মোটা কাজও পাওয়া যায়। কালি লাগাইবার কৌশলের জন্য তুলির ওআশের মত শেড লাইট হইতে পারে। কালি মাখানো এবং ছাপার কাজ কঠিন। চামড়ার পাতে কালি লাগাইয়া মাখাইতে হয় এচিংএর পাতে। তারপর হাতের চেটো দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কালি তুলিয়া ফেলিতে হয়। লাইন কাটা গর্তে কালি শুধু লাগিয়া থাকে; প্রেসে রোলারের গুরুতর চাপে তার ছাপ ওঠে।

এচিংএর সূক্ষ্ম রেখাচিত্র কবিত্বময়। সাদা কালোর সুষমা, রেখার ছন্দ মনে যে রসানুভূতি জাগায় তাহা ঠিক অন্য কাজে পাওয়া যায় না। প্রতিকৃতি অঙ্কন, পশুপক্ষীর চিত্র, দৃশ্য চিত্র সব বিষয়েরই উপযুক্ত মাধ্যম (medium) এচিং।

ফটোগ্রাফারের বিপদ

আমেরিকার এক ফটোগ্রাফারের ছবি তোলার সখ ছিল অদ্ভুত। সারা দিন নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে কেবলই ছবি তোলা পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর কিনারায়। পছন্দ মত ছবির জন্যে অনেক সময় তাঁকে অপেক্ষায় থাকতে হ'ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লক্ষ্য বস্তুর সন্ধান পেলেই গোপনীয় আস্তানা থেকে ক্লিক্ করে একটু শব্দ তার পরেই মহা আনন্দে শিকারকে সচকিত করে ফটোগ্রাফার আবির্ভাব হত। শিকারের জন্য ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা, বন্য পশু পক্ষীর সন্তান বাৎসল্য, প্রকৃতি-রাজ্যের মনোরম দৃশ্য তাঁর ক্যামেরার লেন্সে চমৎকারভাবে ধরা দিয়েছিল। বাজারে একজন খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নামও ছিল। এরকম একজন ফটোগ্রাফারকে একবার মহা মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। অনেক সন্ধান ক'রে তবে তিনি সে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। ব্যাপারটা এই : মনের মত ছবির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি একটা নদীর ধারে এসে পড়েছেন। নদীর পাশেই খানিকটা ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের উপর দাঁড়িয়ে একজন শ্বেতাঙ্গী তরুণী, যোদ্ধার বেশ; 'চাঁদমারী' অভ্যাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তরুণী লক্ষ্যস্থান স্থির ক'রে ধনুকে শর যোজনা করতে যাবেন, এমন সময় ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা 'ক্লিক' করে উঠল। তার পর মহা আনন্দে ক্যামেরা নিয়ে ছুটলেন ডার্করুমে। যথা-সময়ে ছবি তৈরি করলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য তরুণীর চোখে যে চশমা ছিল, তার কাচের উপর গোল সাদা কাল চিহ্ন এল কোথা থেকে? এমন চমৎকার ছবিটা একেবারে মাটি হ'য়ে যাওয়াতে ভদ্রলোক ত মুসড়ে পড়লেন। কোথা থেকে দুটো ক্ষতচিহ্ন এসে ঢুকলো, এ সমস্যা নিয়ে ফটোগ্রাফার চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে রইলেন। ফটো তোলার দোষে যে চিহ্ন আসে নি, সে বিষয়ে খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার নিশ্চিন্ত ছিলেন। অনেক ভেবে ছবিটা বার বার পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখলেন, চিহ্ন দুটো স্পষ্ট, দ্বিতীয় বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার ছুটলেন সেই মাঠের দিকে। সেখানে সামনের চাঁদমারি বোর্ডের সাদা কাল গোল গোল চিহ্নগুলো এতক্ষণের

মিস্ বেটি বোন দাঁত দিয়ে পেন্সিল কামড়ে কাগজের উপর লিখছে। মিস্ বোনের বয়স ১৫ বৎসর। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ায় হাত দিয়ে কোন কাজই করা তার চলে না। হাতের অভাবে পা দিয়েও অনেককে লিখতে দেখা গেছে। এভাবে লিখতে লিখতে লেখা শেষে হাতের লেখার মত স্পষ্ট আর খুব তাড়াতাড়ি হয়।

সমস্যার সমাধান করলে। গোল কাল লক্ষ্যবস্তুর উপর তরুণী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে থাকার সময় চশমার কাচে তার প্রতিচ্ছবি এমনভাবে পড়েছিল যে, সুচতুর ফটোগ্রাফারের চোখও সেটা ধরতে পারে নি।

খুদে উইলি

উইলি সত্যিই খুদে নয়। লোকে তার ওই নাম দিয়েছে। উইলির শরীরের ওজন ৫১১ পাউণ্ড, লম্বায় ৮ ফিট ৭ ইঞ্চি, বয়স মাত্র ১৭। উইলিই যেন কেমন ধরনের হ'য়ে গেছে তা না হ'লে তার মা-বাপ, ভাই-বোনের শরীর সাধারণ মানুষের মতন। নয় বছর বয়স পর্যন্ত উইলি বেশ সাধারণ-ভাবে বেড়েছে। সব থেকে দুঃখের বিষয় হ'ল, ১১ বছর বয়সেই তাকে বাধ্য হ'য়ে স্কুল ছাড়তে হয়। কোন স্কুলই তার শরীরের উপযোগী ডেস্ক দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারলে না। উইলির জুতোর সাইজ হ'ল ২২ ইঞ্চি; ২৪টা বড় আপেল বেশ স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে রাখা যায়। উইলি এক-হাতের মুঠিতে এক ডজন ডিম ধরতে পারে, আর সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ খায়, তার চারগুণ খেয়ে হজম করতে পারে।

মানুষেরই প্রতিচ্ছবি

ছবিটিতে যে দীর্ঘ নাসিকাযুক্ত একটি মেয়ের মুখ দেখছেন, সেটি আসলে ঐ সুশ্রী মেয়েটিরই প্রতিচ্ছবি। যে সব আর্শি অল্পদামী, সে সব আর্শিতে কারও মুখ ভাল প্রতিফলিত হয় না, এমন বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় যে, আর্শিতে মুখ দেখতে রীতিমত ভয় পায়। এই ছবিটি তোলা হয় বোস্টন গার্ডেনের এক প্রদর্শনীর গৃহে। ধাতুতে পালিস লাগিয়ে সেটাকে ঝকঝকে ক'রে তুললে তাতে সকলেরই মুখ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ধাতুনির্মিত বস্তুটির আকারের উপর প্রতিচ্ছবির স্পষ্টতা নির্ভর করে। একটু ভিন্ন ধরনের হ'লেই মুখের প্রতিচ্ছবি এক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এ ক্ষেত্রেও ঘটনাটি ঐরূপ হয়েছে। ছেলেরা এই ধরনের ধাতুর উপর মুখ দেখে আমোদ পেতে পারে, কিন্তু মেয়েরা কি তা পারে! এ মেয়েটি কিন্তু হাসিমুখে ফটোগ্রাফারকে ছবি তোলার সুযোগ দিয়েছিল।

মুখ দেখা

সাহিত্য-সংবাদ

দিল্লী বেঙ্গলী এসোসিয়েশন

দিল্লী বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রবন্ধ, গল্প, নাটক প্রতিযোগিতার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার ফলাফল নীচে দেওয়া হইল।

(ক) গল্প—(১) 'দান'—শ্রীসারদারঞ্জন সর্বজ্ঞ, শিলং।
(২) 'পথের প্রান্তে'—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ত্রিপুরা।
(খ) **প্রবন্ধ**—(১) 'বাঙলার শিল্প'—শ্রীমনোরঞ্জন নন্দী, নয়াদিল্লী।
(২) 'বাঙলার বাহিরে বাঙালীর সমস্যা ও তাহার প্রতীকার'—শ্রীকমলচন্দ্র সরকার, নয়াদিল্লী।
(গ) **নাটক**—(১) 'ধরিত্রী'—শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, কলিকাতা।
(২) 'রতি ও মদন'—শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

উপন্যাস ও ভ্রমণ ইত্যাদিতে কোনরূপ পুরস্কারযোগ্য রচনা পাওয়া যায় নাই। আগামী বড়দিনের বন্ধে দিল্লী বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় পুরস্কারগুলি বিতরিত হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প, প্রবন্ধ ও নাটকগুলি ক্রমান্বয়ে দিল্লী হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'রাজপথে' প্রকাশিত হইবে।—বিজয় চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, বেঙ্গলী এসোসিয়েশন, দিল্লী।

শান্তিনিকেতনে রচনা প্রতিযোগিতা

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের স্মৃতি রক্ষার্থে শান্তিনিকেতন সাহিত্যিকার উদ্যোগে একটি বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতাটি কেবল মাত্র কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। রচনার বিষয়—"সি এফ এণ্ড্রুজ চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ ধারা", প্রবন্ধটি তিনভাগে বিভক্ত থাকিবে—(ক) ধর্মনিষ্ঠা ও উদারতা, (খ) নিয়মনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা, (গ) এণ্ড্রুজ ও মানবতা। রচনা পৌঁছিবার শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪০। যিনি রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে ১০৲ টাকা মূল্যের রবীন্দ্রনাথের বই দেওয়া হইবে। এতৎসম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে ডাকটিকিট সহ যুগ্ম সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখিতে হইবে। রচনাদিও যুগ্ম সম্পাদকের ঠিকানাতেই প্রেরিতব্য।

যুগ্ম সম্পাদক—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শান্তি কুণ্ডু। সাহিত্যিকা, পোঃ শান্তিনিকেতন, জিঃ বীরভূম।

রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতা

সালখিয়া স্টুডেণ্টস লাইব্রেরির পরিচালনায় অষ্টম বার্ষিক রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতা হইবে। রচনা প্রভৃতি ২৫ নভেম্বরের মধ্যে ৩৫৪, জি টি রোড, সালখিয়া পোঃ (হাওড়া), এই ঠিকানায় উক্ত লাইব্রেরির সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

রচনা।—(১) 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার পক্ষে বাংলা ভাষার উপ-যোগিতা'। সাধারণের জন্য। ১ম পুরস্কার—বসুমতী মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্যপদক; ২য় পুরস্কার—পুস্তক। (২) 'ভারতের উন্নতি সাধনে ছাত্রদের কর্তব্য'। স্কুলের ছাত্রদের জন্য। ১ম পুরস্কার—বসন্তকুমারী মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্যপদক; ২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক। (৩) 'শরৎসাহিত্যে নারী'। স্কুল কলেজের ছাত্রী ও মহিলাদের জন্য। ১ম পুরস্কার—কৃষ্ণদাস মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ; ২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক।

গল্প।—ছাত্রদের পাঠোপযোগী একটি ছোট গল্প। ১ম পুরস্কার—রায় অতুলচন্দ্র মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি রৌপ্যপদক; ২য় পুরস্কার—পুস্তক।
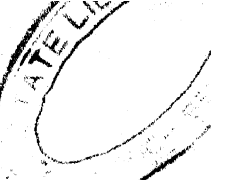
অভিনেত্রীর বিবাহ

জনৈকা চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর বিবাহের গুজব শুনিয়া শুনাইয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রগুলি বচেতন মনের অবস্থার যে পরিচয় দিয়াছে, তাহা বল লজ্জাকর নহে, মর্মান্তিক। অভিনেত্রীর বিবাহ কেবারে অভিনব ব্যাপার এমন নহে। উচ্ছ্বাসটা যে কেবল ই দিক হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে, এমনও নহে। অভিনেত্রী হল পাইয়া মহিলা হইতে যাইতেছে, এই নালিশও যে আছে। কিন্তু সমাজ ও বাহিরের মধ্যে এই যে একটা কাল্পনিক সূক্ষ্ম সীমা আছে, নেতৃত্বহীন সমাজ সেই বাহিরের ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামায় নাই। শান্তি-শৃঙ্খলার অপহ্নবে বড় জোর রাস্ট্র সেখানে গিয়াছে অথবা চিকিৎসকেরা ভীড় করিয়াছে। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের এই অংশে যাহা কিছু ঘটুক, তাহা 'সামাজিক মহলে' অচল। সামাজিক মহল বলিতে আজকাল এক বিবাহ। তাহারও রূপ বদলাইয়াছে। প্যাট্রিয়ার্কাল ও ফিউডাল সমাজের একান্নবর্তী পরিবারে

ওয়ালটেয়ার সমুদ্র-শৈকতে কানন। নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র "অভিনেত্রী"তে ইহাকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে।

াধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাও বলা চলে না। তবে এই ন্তা রসিকতা ও কোলাহলের কারণটা কি? দাম্পত্য ও মাজ-জীবনে অভিনেত্রীর প্রতিষ্ঠা? বস্তুত, কোন একটা র্বব্যাপী উত্তর দেওয়া সহসা শক্ত। সমাজের দিক হইতে ই কথা বলা চলে যে, অভিনেত্রী-শ্রেণী সম্বন্ধে সমাজ-ণ্ডিতেরা উন্নাসিক হইলেও, সমাজের একাংশে ইহাদের থান আছে। তার্কিকেরা বলিবেন, সমাজের অভ্যন্তরে নহে, মাজের বাহিরে। বিতর্ক না তুলিয়া এই অন্তর বাহিরকে নিয়াও বলা চলে যে, সমাজের অভ্যন্তরের কোন মানুষ হিরের এই বিশেষ শ্রেণীটির সহিত যোগাযোগ স্থাপন রিলে, সে সমাজচ্যুত হয় না। ফলে, সমাজ এই বাহিরটাকে নিয়া লয়। মানিয়া লওয়ার মধ্যে একটা প্রয়োজনবোধ যে বিবাহপদ্ধতি ও বিবাহ-সম্পর্ক ছিল, তাহা বহুলাংশে শিথিল হইয়াছে। একমাত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনের উপরই বিবাহের বা স্ত্রীসহবাসের মূল শিকড় প্রোথিত রহিয়াছে। বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানে তাহারও কদর কমিয়াছে। এই মালিক ও মজুরের শহরে 'সমাজে' সামাজিক গ্রন্থিগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অভিনেত্রীর বিবাহ অভিনব কিছু নহে। কিন্তু তাহা লইয়া অপরের পক্ষে নিরর্থক হৈ চৈ করা সুস্থ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে। স্বাধীন চিন্তার অভাবে আমাদের মানসিক রুচি কত নীচে নামিয়াছে, ইহা তাহাই স্পষ্ট করিয়া তোলে মাত্র।

ছায়ালোকের ঢাকঢোল

ধরমতলার মোড়ে টালিগঞ্জের ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলাম। চোখে পড়িল—যুদ্ধের প্রচার বিভাগের প্রাচীর চিত্র। দেওয়ালের ভিতর হইতে 'হিতুদা'র (হিটলার সাহেবের) পেটেণ্ট গোঁফ ও একজোড়া কান কী শুনিতে চেষ্টা করিতেছে!

উপরে বড় বড় হরফে লেখা—'WALLS HAVE EARS—দেওয়ালেরও কান আছে।'

ট্রামে উঠিয়া চিত্রখানার ছবি ভাবিতে ভাবিতে ট্রামের গায় মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। নিত্যকার বদ্-অভ্যাস!

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম—কে যেন কানে কানে বলিতেছে—

"কোথায় চলিয়াছ?"

"স্টুডিও।"

"কেন?"

"খবর সংগ্রহ করিতে।"

"আমি দিতে পারি। গত দশ বৎসর ধরিয়া অনেক শুনিয়াছি।"

"বল কি!"

"হাঁ হে ছোকরা। লোকে জানে শুধু—'walls have ears'; কিন্তু আমরা (দেওয়ালেরা) যে কথা বলিতেও জানি—তা' কি বিশ্বাস ক'র?"

nothing is impossible in this world.—জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। উৎসাহিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম—

"নূতন খবর কিছু দিতে পার?"

"একাধিক! কিষান্ মুভিটোনের নূতন ছবির কি নামকরণ হইয়াছে, জানো?"

"না। ব'ল।"

"মায়ের প্রাণ।' বাঙলার সমাজ-চিত্র। কাহিনী রচনা করিয়াছেন, সিন্ধী সেক্সপিয়র শ্রীযুত কে এস দরিয়ানী। পরিচালনা করিবেন আসামী রাজকুমার যশস্বী পরিচালক শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া।"

"শ্রেষ্ঠাংশে কাহাকে দেখা যাইবে?"

একটা কাষ্ঠহাসি শোনা গেল। কাঠের দেওয়ালের হাসি কি না! হাসি থামিলে উত্তর পাইলাম—

"বোধ হয় কোনো কট্‌কী উড়ে! পুরাতন আগ্রাউলীটি নায়িকা হইবেন না তো!" 'হা! হা! হা!'

দেওয়াল রসিকতাও করিতে জানে দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিবার আগেই হাসিটা থামিয়া গেল। পুনরায় প্রশ্ন শুনিলাম—

"......বাঙলা ছবি বলিয়া যে সব ছবি লইয়া তোমরা মাতামাতি করো—তাহার ক'খানা বাঙলার ছবি?"

কথাটা চিন্তা করিয়া দেখিবার মত। চিন্তা করিয়া দেখিবার চেষ্টাও করিতেছিলাম। কিন্তু কালীঘাট ট্রাম ডিপোয় ট্রাম দাঁড়াইতেই নজরে আসিল—'ঠিকাদারে'র প্রাচীর-চিত্র। খাসা আঁকিয়াছে।

—জীবন গাঙ্গুলীর মাথায় নেপালী টুপি। হাতে ছোরা। কাহিনীও শুনিতেছি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের।

...হঠাৎ আবার সেই ট্রামকাষ্ঠের কাষ্ঠহাসি! চিন্তাধারা ছিন্ন হইয়া গেল; জিজ্ঞাসিলাম—

"কি হইল?"

"শুনিয়াছ? শ্রীযুক্ত বাবু বাবুলাল চৌখানী প্রচারকার্যের জন্য একটি পঞ্চরত্ন (নবরত্ন নহে) সভা করিয়াছেন?"

"Cinema Times'এ দেখিয়াছি বটে!"

"সেই 'পঞ্চরত্ন' 'ঠিকাদার'।

বাজারে বাহির হইবার পূর্ব হইতেই প্রচার করিতেছেন—ছবিখানি 'বৎসরের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ চিত্র!' দর্শকমণ্ডলী ও তোমাদের Bengal Film Journalists Association নিশ্চয়ই এইজন্য বাবুলালজীর 'পঞ্চরত্ন সভাকে' বৎসরের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ 'প্রচার-সভা' স্বীকার করিয়া পাঁচটি মেডেল দিবে!"

এবার আমি হাসিয়া উঠিলাম। হাঁ—কাঠের দেওয়াল রসিক বটে।

ট্রাম আসিয়া টালিগঞ্জ ডিপোয় ঢুকিল। আর সময় নাই। বাঁক ঘুরিলেই নাবিতে হইবে। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলাম—

"নিউ থিয়েটার্সের সংবাদ কিছু রাখ?"

"যৎকিঞ্চিৎ। মনে হয়, তথায় একটা আমূল পরিবর্তন হইবে।"

ট্রাম টারমিনাসে আসিয়া দাঁড়াইল। বাধ্য হইয়া নামিয়া পড়িলাম। বেলা প্রায় আড়াইটা। পথ জন-বিরল। বাবুরাম ঘোষ রোড ধরিয়া যাইতে যাইতে 'ছোট কুঠির' দেওয়াল ডাক দিয়া বলিল—

"ট্রামে নিউ থিয়েটার্সের যে খবর শুনিয়াছ, তাহা সাধারণের জন্য। এই পথ ধরিয়া উহার কর্মকর্তারা যাতায়াত করেন—তাঁহাদের দেওয়া খবর শুনিয়া যাও।"

কাজেই দাঁড়াইতে হইল।

"সরকার সাহেব এখনও কি করিবেন স্থির করেন নাই; অথবা করিয়া থাকিলেও কেহ জানে না। তবে হালে একখানা বাঙলা ছবি শুরু হইবে। বাঙলাখানা পরিচালনা করিবেন, শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র।

স্টুডিওতে পেঁছিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। 'পরিচয়' 'নর্তকী'র স্যুটিং চলিয়াছে। একদল ঝুঁটিবাঁধা মদ্রদেশীয় ঘোরাফেরা করিতেছেন। অফিসের সামনে গণ্ডাকয়েক ষণ্ডামার্কা মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া সিনেমা-অপ্সরীদের অগ্রাহ্য করিয়া এধার-ওধার আনাগোনা করিতেছে।

মিঃ সরকারের ঘরের পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার সাথে সাথেই আবার সেই 'দেওয়াল-বাণী' শোনা গেল—

"অতি গোপনীয় আলোচনা চলিতেছে, কান খাড়া করিয়া শোন।"

"সব শুনিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে। শুধু এইটুকু শুনিয়া রাখ, 'সরকার' সাহেব এইবার এমন কিছু করিবেন, যাহাতে নিউ থিয়েটার্সের পূর্ব গৌরব পুনরায় ফিরিয়া আসে। তিনি এইবার দৃঢ়সংকল্প।"

দেওয়াল-দাদা! তোমার কানে ঝুলাইও হীরকের কর্ণাভরণ! গোঁফে মাখাইও নুরজাহানী আতর।

চলচ্চিত্র-জগৎ আজ মিঃ সরকারের মুখ চাহিয়া আছে। Personal sentiments বা স্নেহ, মায়া-মমতাগুলি একটু কমাইতে পারিলে—আদর্শ প্রডিউসার হইবার যোগ্যতা একমাত্র তাঁহারই আছে।

—নবীন

বাঙলার ক্রিকেট মরসুম

বাঙলার ক্রিকেট খেলার মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বারেও বাঙলার সকল শহরে ক্রিকেট খেলার বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতি শনি ও রবিবার দিন সকল বিশিষ্ট ক্লাবের মাঠেই ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত কোন খেলায় কোন বাঙালী খেলোয়াড়কে অতি উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। শীঘ্র যে কোন খেলোয়াড় খুব কৃতিত্বপূর্ণ খেলা প্রদর্শন করিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। মরসুম আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতে খেলোয়াড়গণ যে উন্নততর নৈপুণ্য অর্জনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই তাহার প্রমাণ ইহা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমরা প্রতি বৎসর বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের দৃষ্টি এই বিষয় আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। কেন যে হয় না, তাহা আমরা এই পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের খেলোয়াড়গণ মরসুমের সূচনা হইতে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য দর্শন করিয়া জনমত সৃষ্টি করার ফলেই যে পেণ্টাকুলার খেলার সময় কোন না কোন দলে স্থান করিতে সক্ষম হন, ইহা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেও বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের চেতনা সঞ্চার হয় নাই। অথচ এই খেলার সময় বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়গণের তালিকা যখন প্রকাশিত হয়, তখন বাঙালী খেলোয়াড়কে স্থান দেওয়া হইল না বলিয়া অনেকেই অনুযোগ করিয়া থাকেন। এই বৎসরের মরসুমের সূচনা হইতে বাঙালী খেলোয়াড়গণ যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে পেণ্টাঙ্গুলার খেলার সময় কোন দলেই যে কাহারও স্থান হইবে না, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এই বৎসরের মরসুমের সূচনা হইতে বোম্বাইতে কয়েকটি খেলায় কয়েকজন খেলোয়াড় যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সমকক্ষতা করিবার মত কোন বাঙালী খেলোয়াড়ই যে বর্তমানে নাই ইহা আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি। বিশিষ্টতা অর্জন করিতে হইলে কৃতিত্ব প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকা চাই ইহা বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের ভুলিলে চলিবে না।

বাঙলা ক্রিকেট দলের ভ্রমণ

গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে বেঙ্গল জিমখানা একটি ক্রিকেট দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দল ১৫ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে রওনা হইবে। এলাহাবাদ, আমেদাবাদ ও বরোদায় তিনটি খেলায় যোগদান করিয়া ২৯শে নভেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। বেঙ্গল জিমখানার এই ব্যবস্থার কথা প্রকাশিত হওয়ায় বাঙলার অনেক বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় নানারূপ মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই ভ্রমণ ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। অনর্থক অর্থ ব্যয় ছাড়া বাঙলার খেলোয়াড়গণ ভ্রমণের দ্বারা বিশেষ লাভবান হইবেন না। তাহা ছাড়া ৩০শে নভেম্বর হইতে জামসেদপুরে বিহার দলের সহিত বাঙলা দলের যে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইবে তাহাতে এই ভ্রমণকারী দলের নির্বাচিত অনেক খেলোয়াড়কেই খেলিতে হইবে। ২৯শে কলিকাতায় ফিরিয়া সেই দিনই খেলোয়াড়গণকে জামসেদপুর অভিমুখে রওনা হইতে হইবে ও পরদিন হইতে তিন দিনব্যাপী খেলায় যোগদান করিতে হইবে। বিশ্রাম না লাভ করায় খেলোয়াড়গণ স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। ইহাতে বাঙলার সুনাম রক্ষা হওয়া একরূপ কঠিন হইয়া পড়িবে। যুদ্ধের জন্য ইউরোপীয় কোন খেলোয়াড়ই বাঙলা দলকে রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় সাহায্য করিতে পারিবেন না। ফলে বাঙালী ও স্থানীয় ভারতীয় খেলোয়াড়গণের উপরই নির্ভর করিয়া বাঙলা দলকে রণজি প্রতিযোগিতার ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। গত বৎসর বাঙলা দল রণজি প্রতিযোগিতায় কোনরূপ সুবিধা করিতে পারে নাই। এই বৎসরও যদি খেলার ফলাফল শোচনীয় হয়, তবে বাঙলার ক্রিকেট দল ১৯৩৮ সালে রণজি ক্রিকেট বিজয়ী হইয়া যে সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে ক্ষুন্ন করা হইবে। বিহার দল গত বৎসর অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছে। বাঙলা দল ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সহজে বিজয়ী হইবে বলিয়া যদি মনে করে, তবে খুবই ভুল করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণের কাহাকেও এই ভ্রমণে প্রেরণ করা উচিত হইবে না। ভ্রমণের দ্বারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন হইবে, তাহা রণজি প্রতিযোগিতার সময় বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে ইহা বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণ বলিতেছেন। কিন্তু এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ ভ্রমণের তিনটি স্থানের মধ্যে দুইটি স্থানে বাঙলার ভ্রমণকারী খেলোয়াড়গণ ভারতের নামজাদা কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলিবার সৌভাগ্য যে লাভ করিবেন না ইহা জোর করিয়া বলা চলে। তাহাই যদি হয়, তবে খেলোয়াড়গণ উন্নততর নৈপুণ্য লাভের সুযোগ পাইবেন কি করিয়া? ইহা ছাড়া অর্থের দিক বিবেচনা করিলে বাঙলারই ক্ষতি। আমেদাবাদ এসোসিয়েশন ভ্রমণের বাবত মাত্র ৫০০৲ টাকা দিবেন। বেঙ্গল জিমখানাকে ১০০০৲ টাকার উপর ব্যয় করিতে হইবে। অর্থ ব্যয় হইবে অথচ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবিধা যখন নাই, তখন অর্থ ব্যয় বৃথা হইবে না কি? এই ভ্রমণ ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া যদি বেঙ্গল জিমখানা ঐ অর্থ ব্যয়ে ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে কলিকাতায় আনাইয়া বেঙ্গল জিমখানা দলের সহিত কয়েকটি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে দর্শকগণও আনন্দ পাইতেন, বাঙ্গলার উৎসাহী খেলোয়াড়গণও উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াকৌশল দেখিয়া কিছু শিক্ষা করিতে পারিতেন।

বেঙ্গল জিমখানার নির্বাচিত দলের ভ্রমণ তালিকা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। খেলোয়াড় নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভ্রমণ বন্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত, তবে খুবই বুদ্ধিমানের কার্য হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণ এইরূপ ভ্রমণ ব্যবস্থা করিবার পূর্বে ফলাফল সম্বন্ধে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

নিম্নে ভ্রমণ তালিকা ও নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল :—

১৭ই ও ১৮ই নভেম্বর এলাহাবাদে যুক্ত প্রদেশ একাদশের সহিত খেলিবে। ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে নভেম্বর আমেদাবাদে গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের সহিত খেলিবে। ২৬শে ও

২৭শে নভেম্বর বরোদায় বরোদা একাদশ দলের সহিত খেলিবে। ২৯শে নভেম্বর সকালে কলিকাতায় পেঁছিবেন।

খেলোয়াড়গণ :—

(১) কার্ত্তিক বসু (অধিনায়ক) (স্পোর্টিং ইউনিয়ন).
(২) জে এন ব্যানার্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৩) নির্মল চ্যাটার্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৪) এস গাঙ্গুলী (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৫) এস ব্যানার্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৬) কে রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৭) এস মিত্র (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৮) সুশীল বসু (এরিয়ান্স ক্লাব)
(৯) কে ভট্টাচার্য (এরিয়ান্স ক্লাব)
(১০) কে রামচন্দ্র (কালীঘাট ক্লাব)
(১১) এস দত্ত (কালীঘাট ক্লাব)
(১২) টি ভট্টাচার্য (মোহনবাগান)
(১৩) এ জব্বর (মহমেডান স্পোর্টিং)
(১৪) এ দেব (মোহনবাগান)
(১৫) এ জামান (মহমেডান স্পোর্টিং)

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল খেলোয়াড়গণের আসিবার কথা ছিল, তাহার মধ্যে সকলে এখনও আসেন নাই। তাঁহারা যে প্রতিযোগিতার সময় আসিবেন তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী দল চারিটি যেরূপ শক্তিশালী হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল সেরূপ হইবে না। ইউরোপীয় দলে বোম্বাইর ল্যাংটন, জেমস ও হিল নামক তিনজন পেশাদার খেলোয়াড়ের যে খেলিবার কথা ছিল তাঁহারা এখনও আসিয়া পেঁছান নাই। ইউরোপীয় দল স্থানীয় দলসমূহ হইতে বাছাই করা হইবে বলিয়া মনে হয়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দলের নির্বাচন কার্য শেষ হইয়াছে। স্থানীয় খেলোয়াড়গণকে লইয়াই ইহা গঠিত হইয়াছে। মুসলিম দল গঠিত হয় নাই। স্থানীয় খেলোয়াড়গণই এই দলে বেশী খেলিবেন। বাহিরের দুই একজন স্থান পাইতে পারেন। হিন্দু দল গঠন লইয়া বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই দল নির্বাচনের জন্য এই পর্যন্ত অনেকগুলি বাছাই খেলা বা ট্রায়াল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের যে কয়েকজন খেলোয়াড় এই সকল বাছাই খেলায় খেলিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই নির্বাচিত দলে স্থান পাইবেন না বলিয়া ধারণা। তাঁহাদের অধিকাংশই নাম-ডাক অনুযায়ী খেলিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া স্থানীয় খেলোয়াড়গণও স্বাভাবিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অন্যান্য দল অপেক্ষা হিন্দু দল যে কম শক্তিসম্পন্ন হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বোম্বাই হইতে খেলোয়াড়গণের মধ্যে একমাত্র বুচি স্থান পাইবেন বলিয়া মনে হয়। হিন্দু দলের ফরোয়ার্ড লাইনে এই পর্যন্ত যতগুলি খেলোয়াড় খেলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও উক্ত দায়িত্বপূর্ণ স্থানে খেলাইবার উপযুক্ত দেখা গেল না। লক্ষ্মীনারায়ণ হয়তো শেষ পর্যন্ত এই স্থানে খেলিবেন। এস গুই, বুচি, এস নন্দী ফরোয়ার্ড দলে স্থান পাইবেন। হাফব্যাকে, সেণ্টারহাফ হিসাবে এস পরামাণিক খেলিতে পাইবেন বলিয়া আশা হয়। প্রেমলাল সম্পূর্ণ অচল। অপর দুইটি হাফে অজিত নন্দী ও জয়রামকে খেলাইলে ভাল হয়। ব্যাকদ্বয়ের স্থান রাখাল মজুমদার ও পরিতোষ চক্রবর্তীর দ্বারা পূরণ করা হইবে বলিয়া ধারণা। তবে এই নির্বাচন দলের শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি করিবে না। ইহারা উভয়ে লেফ্‌ট ব্যাকে খেলিতে অভ্যস্ত এবং সেইজন্য কেহই রাইট ব্যাকে সুবিধা করিতে পারিতেছে না। ইহাদের একজনকে বদলাইয়া অপর কোন খেলোয়াড়কে রাইট ব্যাকে লইলে নির্বাচন কমিটি ভালই করিবেন। কে দত্ত গোলে খেলিবেন, ইহাই সকলের দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁহার ক্রীড়াকৌশল অন্যান্য গোলরক্ষক অপেক্ষা খুব নিম্নস্তরের না হইলেও তাঁহার খেলার মধ্যে নিজের উপর আস্থা নাই, ইহা খুব পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। নির্বাচকমণ্ডলী ইহা বিবেচনা করিয়া যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে একথা ঠিক হিন্দুদল খুব শক্তিশালী হইবে না। অনেক ক্রীড়ামোদী হিন্দুদলকে মুসলিম দলের সহিত ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখিবেন বলিয়া যে দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা হয়তো সম্ভব হইবে না। নিম্নে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল। এই নির্বাচিত দল ১৬ই নভেম্বর হিন্দুদলের বিরুদ্ধে খেলিবে।

জার্ডিন (কাষ্টমস), সি হজেস (কাষ্টমস), এফ আর্ল (রেঞ্জার্স), জে থালস (পুলিশ), জে লামসডেন (রেঞ্জার্স), এ জর্ডন (এরিয়ান্স), জে রেণ্টন (কাষ্টমস), পি ডি মেলো (পুলিশ), আর লামসডেন (রেঞ্জার্স), মায়ার্স (পুলিশ), জে হুইটবার্ন (রেঞ্জার্স)।

অতিরিক্ত :—জি লামসডেন (রেঞ্জার্স), জি কার্ভে (ই বি আর), জে গ্যালীবার্ডী (বি এন আর), এফ মিলস (রেঞ্জার্স), জে মিলস (অর্ডিন্যান্স), আর ফিণ্ডলে (রেঞ্জার্স)।

পুস্তক পরিচয়

[illegible]মজলি :—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় [illegible] সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই [illegible]।

নামের মত সমস্ত বইখানিতেই বেশ নূতনত্ব আছে। গল্পের [illegible]iousnessকে ব্যাহত হতে না দিয়েও হাস্যরসের উৎস প্রতি ছত্রে [illegible] প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে। বইটির প্রধান চরিত্র ষষ্ঠীচরণ। অতি [illegible]ংকার লোক, সরল, নির্ভীক ও সৎসাহসী। কিন্তু কথাবার্তা বেশ [illegible]কটু অদ্ভুত রকমের। মজলিসে তাঁর উদয়ে সমঝদাররা উচ্ছ্বসিত [illegible]য়ে ওঠেন কথা শোনবার জন্যে। চরিত্রগুলি এক একটি বিশেষ [illegible]শেষ টাইপ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। নলিনীর চরিত্র বেশ চমৎকার। [illegible]ষ্ঠী বইটির সব জায়গাতেই তার নিজের অভিনব ভাষাতেই কথা বলে গেছে, কিন্তু কোথাও তার ভাষার নূতনত্ব পীড়াদায়ক হয় নি; লেখকেরও [illegible]ইখানেই বৈশিষ্ট্য। বইটির ছাপা ও বাঁধাই বেশ ঝরঝরে।

সাধু সংগ :—প্রভুপাদ হরগোবিন্দ শুকুল বিরচিত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। গড়বেতা, মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

গৌরাংগ, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি গান এই বইতে আছে। গানগুলি স্বর্গীয় শুকুল মহাশয়ের রচিত। লেখক একজন উচ্চস্তরের সাধক এবং ভক্ত ছিলেন, গানগুলি সবই গভীর ভাবপূর্ণ।

দুর্যোগের ডাক :—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ দাস। সরস্বতী লাইব্রেরি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কাব্য গ্রন্থ। কবিতাগুলি ভাল। লেখক এককালে রাজবন্দী ছিলেন, লেখায় প্রায় সর্বত্র বন্দীমনের আকুলতার ছায়া। যেখানেই বেদনার কথা সেখানেই সুরটি আন্তরিক। কতকগুলি কবিতা তো বস্তুর মত "স্বদেশী"। বইটিতে মুদ্রণ প্রমাদ ও কিছু কিছু ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে। বইটি আদৃত হইলে সুখী হইব।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য অথবা অদৃষ্টবাদ :—শ্রীভবানীনাথ সেন প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

আলোচ্য পুস্তিকায় লেখকের পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা অদৃষ্ট মানেন তাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন আর যাঁহারা অদৃষ্টে মানেন না তাঁহারাও নিজস্ব মতবাদের অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে যথেষ্ট তথ্য পাইবেন।

কেয়া ।—মাসিক পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮, তারক প্রামাণিক রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

এই পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়া প্রীতি লাভ করিলাম। এই সংখ্যায় শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও বনফুল প্রমুখ লেখকদের লেখা আছে। আমরা এই নূতন পত্রিকাটির ক্রমোন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

ঘরের লক্ষ্মী—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রকাশক—শংকরানন্দ ঠাকুর, ৫৯, আহিরীটোলা, কলিকাতা, বাণীভবন। দাম এক টাকা।

লেখিকা সাহিত্য জগতে সুপরিচিতা। ঘরের লক্ষ্মী পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বাংলার ঘরের লক্ষ্মীর বিশিষ্ট কান্তিটুকু 'ঘরের লক্ষ্মী'কে মাধুর্যমণ্ডিত করিয়াছে। বাংলার ঘরে প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে, বঙ্গপল্লীর প্রতি প্রকৃত সেবার অবদানের ভিতর দিয়া লেখিকা পল্লীর সেই প্রাণরসকে বিগ্রহরূপে দিয়াছেন। তাঁহার এই পূজা সার্থক হউক। উপহার দিবার পক্ষে সত্যই একখানা ভাল বই। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ মনোমুগ্ধকর। প্রকাশক বাণীভবন এজন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

নতুন পত্র :—২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৭। সম্পাদক—অমূল্য চট্টোপাধ্যায়, দাম ছয় আনা।

কাগজের সৌষ্ঠবে একটা 'যাহা হউক কিছু' অভিনবত্ব আরোপের প্রচেষ্টা আছে। লেখাগুলির মধ্যেও তেমনি একটা ভাণ আছে। 'সাম্প্রতিক সাহিত্যে' সম্পাদক স্বয়ং রাবীন্দ্রিক ভাষার অনুকরণে অনেক ভাল কথারই অবতারণা করিয়াছেন। কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিদ্বেষের উষ্ণ আঁচে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কিছুই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পার্ক' গল্পটি সম্ভাবনায় ও চিত্রাংকনে চমৎকার। অনুদিত ও মৌলিক কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। মাণিকবাবুর 'ভাঙা ঘর' যথারীতি বিস্ময় ও আকস্মিকতায় পরিপুষ্ট। আরও যে কয়েকটি প্রবন্ধ ও গল্প আছে, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে একটা স্বাধীন স্ফূর্তির সদিচ্ছা আছে, কিন্তু দানা বাঁধিতে পারে নাই। নতুন দৃষ্টির দাবী যাহারা করে, তাহাদের বক্তব্য হওয়া উচিত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ; প্রাচীন যুক্তির ভিত্তি টলাইতে হইলে অতি আধুনিকতার ন্যাকামি ও পাকামি বর্জন না করিতে পারিলে প্রতিক্রিয়ার তোড়ে অন্ধ বিদ্রোহের বিপরীত দিক হইতে একেবারে অন্ধ আত্ম সমর্পণের খপ্পরে পড়িতে হইবে। বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিক ক্রমবিকাশে এই ঐতিহাসিক সত্য তথ্যের হদিস পাওয়া যাইবে।

ক্রান্তি :—সংকলন গ্রন্থ। ঢাকা জেলা প্রগতি লেখকসঙ্ঘ, নতুন সাহিত্য ভবন, দাম আট আনা।

ঢাকা পূর্ববংগে যত বড়ই হউক, আধুনিক কলিকাতার চক্ষে মফঃস্বল, অতএব পশ্চাদ্বর্তী। কিন্তু 'কল্লোলের' যুগে ঢাকার বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের কল্যাণেই 'প্রগতি' কথাটার সর্বাধিক প্রচার হয়। সেই হইতে প্রগতি কথাটার সহিত যৌনাচ্ছন্ন ভাব জড়াইয়া আছে। ঐ প্রগতিপন্থীরা বিশেষ কোন একটা দৃষ্টিকোণ হইতে কোন কিছু দেন নাই। বর্তমান প্রগতি সংঘ এরূপ শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিশেষ একটা দৃষ্টিকোণ হইতে 'প্রগতি' শব্দটার সুসংগত অর্থ তাঁহারা দিবেন। সংকলিত লেখাগুলি পড়িবার পর আমাদের সে ভরসা সামান্য হইলেও, জাগিয়াছে। কবিতা সম্পদ ইহার প্রথম। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে যাঁহাদের নালিশ যে, তাঁহারা এই শ্রেণীর কবিতা বুঝেন না, তাঁহাদিগকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়াই এই কবিতাগুলি উপস্থাপিত করিতে আমাদের সংকোচ নাই। তাহার পর ইহার প্রবন্ধ সম্পদ। ভূমিকাটিতে সংঘের প্রতিপাদ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। সেদিক হইতে গ্রন্থখানিকে অভিনন্দিত করিবার কারণ আছে। রণেশকুমার দাশগুপ্তের 'নতুন দৃষ্টিতে উপন্যাস' এবং অচ্যুত গোস্বামীর 'বাংলা কাব্যের গতি' প্রবন্ধ দুটির উপজীব্য লইয়া সকলের মতৈক্য হইবে, এরূপ আশাও করি না, প্রয়োজনও বোধ করি না। কিন্তু এই দুইটিই উল্লেখযোগ্য। এ কথা আজ নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, যে প্রগতিবাদীরা রাবীন্দ্রিক যুগের মৃত্যু ঘোষণা করিয়া শরৎচন্দ্রের চামড়া লইয়া ডুগডুগি বাজাইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিলুপ্তিও আসন্ন। আপাত দিনের সুসমঞ্জস প্রগতিশীল সাহিত্যই তাহাদের পরাভব ঘোষণা করিবে। এই সংকলন গ্রন্থে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

ক্রন্দসী :—শ্রীআশালতা সিংহ, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য দেড় টাকা।

ক্রন্দসী একটী পল্লীজীবনের চিত্র। আমাদের দেশের মেয়েদের মূক, অবরুদ্ধ ও ক্লেশের কথা লেখিকা বেশ চমৎকারভাবে লিখেছেন। সংগে সংগে দেখিয়েছেন একদিকে পল্লীর সেই চির পরিচিত মানুষগুলিকে—যাদের জীবনে খাওয়া আর ঘুমানো এবং শুধু পরচর্চা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই—আর একদিকে একটি শিক্ষিত পরিবারের জীবন। লেখিকা অবশ্য এই দুটি তুলনা হিসাবে দেখান নি। এই পরিবারটির কতখানি সহানুভূতি রয়েছে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসীদের উপর আর এই কুসংস্কারকে মুছে ফেলবার তাঁর কত আগ্রহ ও প্রচেষ্টা।

পরিবারটির কর্তা কুমুদনাথ একাল ও সেকালের সার্থক সমন্বয়। সেকালের অযথা কুসংস্কার নেই আবার একালের গতিবেগ আছে। তাঁর নবপরিণীত পুত্র ও পুত্রবধূর জীবনে দেখা যায় 'আজকের দিনে মানুষ নিছক প্রেমচর্চা ক'রে তৃপ্ত থাকতে পারে না। চারিদিকে কত সমস্যা, কত অশান্তি, পরাধীনতার কী ক্রন্দন!' লেখিকার ভাষা বেশ ভাল। বইখানির বাঁধাই ও ছাপা বেশ ঝরঝরে।

৮ম বর্ষ । ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 23rd November, 1940. | ২ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সত্যাগ্রহের নূতন গতি—

পূর্বে শুনিয়াছিলাম, যাঁহারা শুদ্ধ অহিংসা এবং চরকায় একান্ত বিশ্বাসী, মহাত্মাজী শুধু তাঁহাদিগকেই সত্যাগ্রহের অধিকার দিবেন এবং সে অধিকারও দেওয়া হইবে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিবার পর। শ্রীবিনোবা ভাবে এবং ব্রহ্মদত্ত এই অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার চাপে সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া কারাবরণ করিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কঠোরহৃদয় অজ্ঞাতনামা নিভৃতচারীর অধ্যাত্ম-রসের অবদানে গলিল না, তাঁহারা উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখিলেন। ব্যাপক সত্যাগ্রহের মহাত্মাজী ঘোরতর বিরোধী; কিন্তু ক্রমে সত্যাগ্রহের সূক্ষ্ম স্তর ছাড়িয়া স্থূল স্তরে প্রভাব বিস্তার তিনি প্রয়োজন বোধ করিলেন। এই নূতন নীতি প্রবর্তনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বন্দী হইয়াছেন, ব্রিজলাল বিয়ানী জেলে গিয়াছেন। বারশত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া সত্যাগ্রহীদের একটি তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এই তালিকায় রকাধারীই শুধু নাই, প্রকৃতপক্ষে দুই-একজন ছাড়া খুব কম থলাকই তেমন আছেন, আছেন কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সদস্যগণ, ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রি-মণ্ডলীরর আমলে যাঁহারা মন্ত্রী ছিলেন তাঁহারা, আর আছেন প্রাদেশি আএবং কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহের কংগ্রেসী সদস্য-গণ। আ ী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অর্থাৎ এক সপ্তাহ বড় জোর, এ ভা সপ্তাহের মধ্যেই এই বারশত বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ পরে নায়কগণ সত্যাগ্রহ করিবেন। আমরা জানি, সরকা লড়া বস্থা রহিয়াছে সোজা—জেলের দুয়ার খোলাই আছে র অন্তু বিভিন্ন প্রদেশের এই সব জননায়ককে জেলে পুরিছে। সমস্যার সমাধান হইবে? পণ্ডিত জওহরলালের গ্রেপ্তারেই প্রতিক্রিয়া সামান্য নহে, সরকার তাহা না বুঝি এমন নয়। এই সব জননায়কদের গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়াও রুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। দেশের লোকের মনে রাজনীতিক বোধ যদি একেবারে জাগ্রত না থাকিত, তবে তাহা সম্ভব হইত; কিন্তু দেশের লোকে এই সব লোককে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, ইঁহাদের সঙ্গে বিরাট জন-সাধারণের মনের একটা একান্ত যোগ রহিয়াছে। ইঁহারা জেলে গেলেও জনসাধারণের প্রাণে সেজন্য একটা আলোড়ন উঠিবেই এবং কর্মেও তাহা প্রতিফলিত হইতে চাহিবে। মানুষ তাহার স্বভাবধর্ম হইতে মুক্ত নহে। আবার গান্ধী-বড়লাট আলোচনার কথা শুনিতেছি; কিন্তু ব্রিটিশ রাজ-নীতিকদের শুভবুদ্ধি সত্বর উদয় হইবে, আমাদের এমন ভরসা নাই, তাঁহারা যদি এখনও ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবীকে স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলে সত্যাগ্রহের প্রতিক্রিয়া তাঁহারা এড়াইতে পারেন। দমননীতির প্রয়োগে তাহা সম্ভব হইবে না, কোন দেশেই হয় নাই।

মীমাংসার আশা—

বড়লাট কেন্দ্রীয় আইন সভার যুক্ত অধিবেশনে যে বক্তৃতা করিবেন, তাহাতে ভারতের বর্তমান সমস্যার একটা আপোষ মীমাংসা হইবে, এমন আশা অনেকে করিতেছিলেন, কিন্তু আমরা তেমন আশা করি নাই। মহাত্মাজীর সঙ্গে বড়লাটের পুনরায় পত্রালাপ এবং সে আলাপের সাফল্যের সম্ভাবনাও আমাদিগকে উৎসাহিত করে নাই; কারণ এ সব আলাপ-আলোচনা মনের আশা মিটাইয়া সকল দিক হইতে এতটা বেশী রকমে হইয়া গিয়াছে যে, মনস্তাত্ত্বিক নূতন উপলব্ধি লাভের অবসর কোন আকস্মিকতায় এত সত্বর দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। সাংবাদিকদের এই সম্বন্ধে গবেষণাকে আমরা মূল্য দান করিয়া উঠিতে পারি নাই। পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে সত্বরই একটা বড় আলো-

চনা উঠিবে এবং সেই আলোচনায় ভূতপূর্ব ভারত সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন ব্রিটিশ বিমান বাহিনীতে চাকুরী লওয়াতে যোগদান করিতে না পারায় 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রের আক্ষেপকেও আমরা কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান করি না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মতিগতি ষোল আনাই বুঝিয়া লওয়া গিয়াছে। ভারতের ভাগ্য তাহাদের উপর নির্ভর করে নাই এবং করিবেও না। ভারতবাসীদিগকে নিজেদের ভাগ্য গঠন করিতে হইবে, নিজেদের সাধনায়, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে এবং দুঃখ কষ্ট বরণের ভিতর দিয়া। স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও কৃপা করিয়া দেয় নাই, দিতেও পারে না। অপরের উদারতায় একান্ত বিশ্বাসীদের এই সত্যে এতদিন বিশ্বাস ছিল না, আশা করি বড়লাটের বক্তৃতার পর তাঁহাদেরও সে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে।

বাঙলার হিন্দুর অবস্থা—

কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে স্যার মন্মথনাথ মুখুজ্যে বাঙলার হিন্দুদের অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'হিন্দু সর্বদাই ত্রস্ত, ভীত ও লাঞ্ছিত হইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। দুঃস্থ শ্রেণীর লোকের দুঃখ দূর করিবার নামে এমন সব আইনের ও পন্থার ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে মধ্যশ্রেণীর হিন্দুর সর্বপ্রকার অনিষ্ট ঘটিবে—এ শ্রেণীটির একেবারে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এমন সব বিধি-বিধান প্রবর্তিত হইতেছে, যাহা হিন্দুদিগকে ক্রমশ খর্ব ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষার আয়তনগুলিতে ক্রমশ ইসলামীয় ধর্মানুরূপ শিক্ষা প্রবেশ করিতেছে, বাঙলা ভাষার অবয়ব ও জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এমন পাঠ্যপুস্তক রচিত হইতেছে যাহাতে বাঙলা ভাষাকে বিকৃত করিয়া দিয়া উর্দু বা ফারসী ভাষার কথা মিশ্রিত করা হইতেছে। সম্প্রতি শিক্ষা সম্বন্ধে একটি আইন করা হইতেছে যাহার ফলে শিক্ষাও সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে অব্যাহতি পাইবে না। হিন্দুর পক্ষে আজ কোনও চাকুরী পাওয়া একরকম অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। চাকুরী দেওয়া হইতেছে যোগ্যতার হিসাবে নয়—ধর্মের হিসাবে। পদোন্নতি সম্বন্ধে এমনই ব্যবস্থা হইতেছে যে তাহার ফলে কোনও কোনও বিভাগে মুসলমান সম্প্রদায় শতকরা ৭০টি ও হিন্দু বাকী ৩০টির মধ্যে মাত্র কতকগুলি পাইবে, শুধু তাহাই নহে, কোন কোন বিভাগে যাহাদিগকে বর্ণহিন্দু বলা হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ ৮।১০ বৎসর মধ্যে একটিও চাকুরী পাইবে না।

স্যার মন্মথনাথ বাঙলার হিন্দুর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। বাঙলার হিন্দুসমাজ জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তার আদর্শ ভারতে জাগাইয়াছে এই বাঙলাদেশের হিন্দুরাই। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা বাঙলার হিন্দু কোনদিনই চালিত হয় নাই। মুসলমান ধর্মের প্রতিও জাতীয়তাবাদী হিন্দুর কোনরূপ অশ্রদ্ধার ভাব নাই। কিন্তু ধর্মের নামে অধর্ম ও ভেদবুদ্ধিকে বাড়াইয়া বাঙলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসার ভাবকে যেভাবে বৃদ্ধি করা হইতেছে ইহাতে দেশের সর্বনাশ হইতে বসিয়াছে। বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং পুণা চুক্তিই বাঙলার এই অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতিকে উচ্ছেদ এবং সেই অনিষ্টকর নীতিতে প্রশ্রয় পাইয়া বাঙলার যে মন্ত্রি-মণ্ডল বাঙলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং তাহার ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন বাঙলার সেই মন্ত্রি-মণ্ডলকে অপসারিত করিবার জন্য শুধু বাঙলার হিন্দু নয়, বাঙলাদেশের কল্যাণকামী সকলকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। কৃষ্ণনগর সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সভাপতি উভয়েই বাঙলার এই বর্তমান অবস্থার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করিয়াছেন। কংগ্রেস বাঙলার সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে ঔদাসীন্যের নীতি অবলম্বন করিয়াছে, বাঙলার প্রতি অবিচার করিয়াছে—একথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সার্বজনীন ভিত্তি। স্বাধীনতা যতদিন না পাওয়া যাইবে, ততদিন বিদেশীয় ভেদনীতির বিষের জ্বালা দেশের মর্মস্থলকে অভিভূত করিয়া রাখিতে থাকিবেই; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রভাব বা প্রতিপত্তি যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু করার অর্থই বাঙলার হিন্দু সমাজের আদর্শ এবং স্বার্থের প্রতিকূল কার্য করা। আজ প্রথম প্রয়োজন, বাঙলার হিন্দুদের সংহতিবদ্ধ হওয়া এবং সেই সংহতির প্রভাবে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিয়া বাঙলার সম্বন্ধে কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের যে ঔদাসীন্য আছে তাহা দূর করা। বাঙলার হিন্দু জাতীয়তা-বাদের যে দীপশিখা ভারতে জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, কংগ্রেস তাহারই বিগ্রহ রূপ। কংগ্রেস কোন একটা বিষয়ে ভুল করিলেও বাঙালী কংগ্রেস ছাড়িতে পারে না, কংগ্রেসের সেই ত্রুটি বা ভুলের সংশোধন করিতে হইবে এই বাঙালীরই এবং সুখের বিষয়, বাঙালীর সেই সংকল্পবুদ্ধি সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কর্তাভজাগিরির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বাঙালী কংগ্রেসী আন্দোলনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে—এই পথই বাঙালীর অভীষ্টসিদ্ধির পথ এবং সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ—যে বিষজ্বালায় বাঙালী জ্বলিতেছে সেই বিষ উৎখাত করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

শাসনতন্ত্রের ব্যর্থতা—

বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ আমাদের সিকি পয়সারও নাই। এই শাসনতন্ত্রের মহিমা কীর্তন যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কথার উত্তরে আমরা এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, তাঁহারা শাসনতন্ত্রগত যে গণতান্ত্রিকতার দোহাই দেন, বাঙলাদেশে সে গণতান্ত্রিকতার গন্ধ মাত্রও নাই। বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল, একদিকে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহ দল অপরদিকে হীন স্বার্থপরতন্ত্র জোটবাঁধা সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের সমর্থনে পরিচালিত হইতেছে। এইভাবে গঠিত যে মন্ত্রিমণ্ডল সে মন্ত্রিমণ্ডল কখনই গণতান্ত্রিক হইতে পারে না—আর গণতান্ত্রিক পরিভাষা না হয় বাদই দেওয়া

গেল, দেশের লোকের স্বার্থের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে না। বিদেশীর স্বার্থসেবাকে লেজুড়ে বাঁধিয়া চলা ছাড়া যাঁহাদের গতি নাই, কথায় কেল্লা ফতে তাঁহারা যতই করুন, কাজের বেলায় দেশের অনিষ্টই তাঁহাদের দ্বারা হইবে। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের কাজের খতিয়ান করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ছেঁদো কথায় বিবেচনার অভাবে যাহারা অভিভূত, হক মন্ত্রিমণ্ডলের কেরামতি শুধু তাহারাই দেখে। বাঙলাদেশের শুধু হিন্দুরাই যে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের বিরোধী এমন নয়, দেশের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অনপেক্ষভাবে বিচারপরায়ণ মুসলমান সমাজও এই মন্ত্রিমণ্ডলের বিরোধী। বাঙলার জাতীয়তাবাদী হিন্দু এবং মুসলমান সমভাবেই চাহে এই মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্তন; কিন্তু বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্যাঁচ বাঙলার উপর এমনভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে যে, এই শাসনতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতে বাঙলাদেশে প্রকৃত জনমতানুকূল মন্ত্রিমণ্ডল গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রগত বিতর্কের মুখে তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর পার্লামেন্টের সদস্যদিগকে অভয়বাণী শুনাইয়া বলিয়াছিলেন, এই শাসনতন্ত্র এমনভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, বাঙলা এবং পাঞ্জাবে এই শাসনতন্ত্র বর্তমান থাকিতে কিছুতেই জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব ঘটিতে পারিবে না। আজ কর্তাদের সেই পরিকল্পনাই হক মন্ত্রিমণ্ডলের ভিতর দিয়া পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলাদেশ হইতে বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রত্যাহারের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং যে প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে, এইদিক হইতে আমরাও সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি। এই ধোঁকার টাটি ভাঙিয়া যায় যত সত্বর, ততই ভাল।

হক সাহেবের ওয়াজ—

যুক্তপ্রদেশ মুসলিম ছাত্র সম্মেলন নামে এলাহাবাদে সেদিন একটা সভা হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রচারে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের উদ্যোগেই ছাত্রসমাজের নামে এই অভিনয়; অভিনেতার প্রধান ভূমিকাটি বাঙলার প্রধান মন্ত্রীকে দেওয়াতে আসর জমাইবার সুবিধাও হইয়াছিল যথেষ্ট। হক সাহেব এই সভায় তাঁহার স্বাভাবিক বীর রসের বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন,—"আমাদের মনের মত করিয়া যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হয়, তাহা হইলে আমরা ভিন্ন গোঠ ধরিব।" হক সাহেব সুর সপ্তমে চড়াইয়া বলেন,—"সাম্প্রদায়িকতা জিনিসটা কিছু থাকা চাই, এ ভাবটি পবিত্র, আগে নিজের ঘর দেখিতে হইবে, তার পরে পরের চিন্তা। মানুষের প্রকৃতিই হইল ইহাই। শুধু লড়াইয়ের জন্যই যে সাম্প্রদায়িকতা দরকার, এমন নয়, দরকার আছে সাম্প্রদায়িকতার, আত্মরক্ষার জন্য দরকার আছে। আমাদের উপর হিন্দুরা প্রভুত্ব করিবে, আমরা ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করিব না। শতকরা ৯০ জন মুসলমান নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য দাঁড়াইবে। কিছুই আমাদের নিজেদের জন্য নয়, সবই ইসলামের জন্য।" সাম্প্রদায়িকতার পবিত্র ভাব যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত কল্যাণের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত, আমাদের আপত্তির কোন কারণ ছিল না; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই মহিমা কীর্তনের ফলে অন্য সমাজের উপর উৎপীড়নের অন্ধ আবেগ যে জাগিয়া উঠে, ইহাই ভয়ের কথা এবং সাম্প্রদায়িকতার সুখ্যাতির মধ্যে অন্য সমাজ, বিশেষভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের ফলে কি দাঁড়ায়, সিন্ধুতে আমরা তাহার প্রকটলীলা দেখিতেছি। হক সাহেব বলিয়াছেন, অন্য সমাজের সংস্রব বর্জন করা, পৃথক্ হওয়ার মতিগতি মুসলমানদের নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, মুসলিম লীগের বড় আদরের পাকিস্থান পরিকল্পনাটা তবে কি? যোগ্যতা ছাড়িয়া ধর্মের দোহাইতে চাকুরীর ভাগ-বাঁটোয়ারা, জোর করিয়া বেখাপ্পা রকমে এবং উদ্ভট উপায়ে বাঙলা শব্দের পরিবর্তে উর্দুভাষা ঢুকাইবার উদ্যম, এ সব কোন্ শুভ প্রয়োজনে?

যুদ্ধের নূতন পরিণতি—

ইতালির কেরামতি কত বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। আলবেনিয়া বা আবিসিনিয়ার কাছে তাহার জারিজুরি খাটে, কিন্তু ইংরেজের সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রীসের সঙ্গে একা আঁটিয়া উঠিবার ক্ষমতা ইতালির নাই। ইতালি গ্রীসকে কাবু করিতে পারে তো নাই-ই, পক্ষান্তরে গ্রীস সৈনাদল আলবেনিয়ার ভিতর ঢুকিয়া কোরিজা শহর দখল করিয়াছে। কোরিজা পতনের ফলে স্যালোনিকার দিকে ইতালির অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হইল। ইহার অনিবার্য পরিণতি হিটলারের ভূমধ্যসাগরের দিকে চাপ দিবার নীতির ব্যর্থতা আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম। এরূপ সংকটে জার্মানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহার ইতালিকে রক্ষার জন্য আগাইতে হইবে। সেই অবস্থা দেখা দিয়াছে। জার্মানির সেনাদল বুলগেরিয়ার ভিতর দিয়া গ্রীসের দিকে অগ্রসর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই ব্যাপারে বলকানের রাজনীতিক ক্ষেত্রে নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ রুষিয়ার সঙ্গে কোন একটা ব্যবস্থা না করিতে পারিলে জার্মানি এই উদ্যমে অবতীর্ণ হইতে পারিত না। দানিয়ুব বৈঠকের ভিতরের কথা এতদিন জানা যায় নাই, এইবার ঘটনাচক্রের গতির ভিতর দিয়া তাহা উন্মুক্ত হইবে। রুষিয়া জার্মানির এই উদ্যমে যদি সায় দেয়, তাহা হইলে তুরস্ক কি করিবে? ভূমধ্যসাগরের দিকে জার্মানি ও ইতালির সমবেত শক্তির প্রভাব বিস্তার তুরস্কের পক্ষে যে বিপদজনক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। বলকানের ব্যাপারে দ্বিধাপূর্ণ নীতি ধরিয়া থাকিবার দিন এবার শেষ হইল বুঝা যাইতেছে এবং এই ব্যাপার হইতে পূর্ব ইউরোপ অথবা পশ্চিম এসিয়ার দিকে যুদ্ধের নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইল।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যলাভ—

রবীন্দ্রনাথ পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এই সংবাদে সকলে আনন্দ লাভ করিবেন। একটু স্বাস্থ্যলাভের পরই তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অশীতিবর্ষ বয়সে এবং রুগ্ন দেহে রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য কর্মশক্তি সকলকে বিস্মিত করিবে। কবি দীর্ঘকাল বঙ্গবাণীর সাধনা করিতে থাকুন, আমাদের ইহাই কামনা।

রাজবন্দীদের অবস্থা—

বহু দিন পরে আইনসভায় রাজবন্দীদের কথা সেদিন আবার উঠে। শ্রীযুত এন এম যোশী এই প্রস্তাব করেন যে, ভারতরক্ষা আইন অনুসারে যাঁহাদিগকে রাজবন্দীস্বরূপে রাখা হইয়াছে, অন্তরীণে আবদ্ধ করা হইয়াছে কিংবা বহিষ্কৃত করা হইয়াছে, তাঁহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করা হউক। শ্রীযুত যোশী যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় ভারতরক্ষা আইন অনুসারে তিন হাজার লোক বন্দীদশায় দিনযাপন করিতেছে। এই সংখ্যা কতদূর ঠিক আমরা জানি না; তবে ইহা সত্য যে, বন্দীদের সংখ্যা উক্তসংখ্যার বেশী ছাড়া কম হইবে না। শ্রীযুত যোশী যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন, সরকারী সূত্রেই তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বিভিন্ন আইন-সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াও সরকারের তরফ হইতে ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, এই যে সব বন্দী, বলা বাহুল্য ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। এই ধরণের বিধি-ব্যবস্থার অনুগ্রহে রাজবন্দীর আতিথ্যভোগের সৌভাগ্য বাঙালীরই বেশী হইয়াছে। এই সব বন্দীদের অভাব অভিযোগ কিরূপ, সংবাদপত্র পাঠকগণ সে সব অবগত আছেন। বিনা বিচারে আটক রাখিবার নীতির মূলে ন্যায়ের দিক হইতে কোন যুক্তি নাই; কিন্তু সে সব যুক্তি এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তিন আইনের বিধানে এইসব বন্দীদের নিজেদের এবং তাঁহাদের পরিবারের দায়িত্ব ভারত গভর্নমেণ্টের উপর আছে; কিন্তু সে দায়িত্ব পালনের অপেক্ষা লঙ্ঘনই অধিকতর প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কোনরূপ কমিটি কমিশনের দ্বারা এইসব বন্দীদের অভাব অভিযোগের কতদূর প্রতিকার হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বিনা বিচারে এই শ্রেণীর আটকের নীতি দেশের শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয় বলিয়া আমরা মনে করি না, বরং ইহাতে দেশে অসন্তোষের ভাবই বাড়ে। কর্তাদের মধ্যে এই সুবুদ্ধি দেখা দিবে যে অবস্থায়, আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

ভারতের অদূরে সংগ্রাম—

হিন্দু চীনের ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্যামের লড়াই বাধিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর শ্যাম হিন্দু চীনের কতকটা অঞ্চল নিজের বলিয়া দাবী করে; কিন্তু হিন্দু-চীনের কর্তৃপক্ষ সে দাবী মানিতে অস্বীকৃত হন; ইহার ফলেই এই ব্যাপার। জাপানে এই খবর রটিয়াছে যে, ইংরেজ এবং আমেরিকা শ্যামের উপর চাপ দিয়া শ্যামকে এই যুদ্ধে নামাইয়াছে হিন্দু-চীনের উপর জাপানের প্রভাবকে খর্ব করিবার মতলবে। এই সংবাদের প্রতিবাদ হইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে জাপানের মতিগতিটা বুঝা যাইতেছে। জাপান হিন্দু-চীনে সৈন্য নামাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। সেদিন চট্টগ্রামে বক্তৃতাকালে বাঙলার গভর্নর এই সীমান্তের সমস্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"সমগ্র জগৎ জুড়িয়া আজ তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব ভূখণ্ডে লড়াই ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে এখনও যুদ্ধের মধ্যে জড়াইয়া না পড়িলেও একথা যেন সকলে বিস্মৃত না হন যে, হিন্দু-চীন চট্টগ্রাম হইতে বেশী দূর নয়, চট্টগ্রাম হইতে বেনারেসের দূরত্ব যতখানি, হিন্দু-চীনও চট্টগ্রাম হইতে তত দূরে। গভর্নর বাহাদুর এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই বিপদে জগতের স্বাধীনতাকামীদের সহযোগিতা বিপদ কাটাইবার একমাত্র পথ এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক তেমন স্বাধীনতাকামী। ভারতের এই লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামীদের কামনা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কতটা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন লাট বাহাদুর সেকথা বলেন নাই; কিন্তু সেই প্রশ্নই বর্তমান ভারতের প্রধান প্রশ্ন।

রাজস্ব বিল নাকচ—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মাত্র দুই ভোটের জোরে রাজস্ব বিল অগ্রাহ্য হইয়াছে। মুসলিম লীগের সদস্যগণের বক্তৃতার সুর হইতে প্রথমত মনে করা গিয়াছিল যে, তাঁহারা বোধ হয় এইবার বুক বাঁধিয়া বিলের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু লীগের সদস্য পুরুষেরা আর যাহাই হউন চতুর ব্যক্তি। তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া স্পষ্টভাবে সরকারের বিরুদ্ধতাও করিলেন না, পক্ষান্তরে একটু অভিমানের ভাব দেখাইয়া সরকারী অনুকম্পা আকর্ষণের উপলক্ষ লাভ করিলেন। লীগের এই নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের জয় হইয়াছে, এই জয়ের বাস্তব মূল্য ভারতের গরীব প্রজাদের পক্ষে তেমন কিছু অবশ্য নাই; কারণ বড়লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতার জোরে বিল আইনে পরিণত হইবে এবং কর ব্যবস্থা বলবৎ হইবে; কিন্তু যুদ্ধজর্জনিত আন্তর্জাতিক এই আলোড়নের মুখে ভারতের বাহিরে কংগ্রেসের এই জয় ভারতের জনমতকে প্রতিধ্বনিত করিবে।

ভাঙ্গা বাড়ি

শ্রীমণীন্দ্রকুমার দত্ত

ছোট একটা পোড়ো বাড়ি। বড় শালবনটার মধ্যে কোনো রকমে দু'তিনটে মেটে দেওয়ালে আঁকড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। গরু চরাতে চরাতে রাখালরা হয়তো কালেভদ্রে এখানে আসে; তামাকের ধোঁয়ায়—খোস-গল্পে, নয়তো নাক ডাকিয়ে দুপুরটা কাটিয়ে ফের চলে যায় গরুবাছুর জড়ো ক'রে গাঁয়ের দিকে।

ছোট ছোট ঝোপড়া জামগাছে ঢেকে ফেলা একটা শুকনো ডোবা—ঠিক পাশেই। নিরিবিলি দিন কাটাবার ইচ্ছে হলে প্রায়ই গিয়ে বসতুম সেখানে। বৈঁচি ও জঙ্গলি করমচার ঝোপ শত শত উঁইঢিপির মাঝখানে সর্বগ্রাসী বল্মীকের আক্রমণ অগ্রাহ্য ক'রে এখানে সেখানে বেড়ে উঠেছে। কয়েকটা মহুয়া একটা বনজুঁই সুগন্ধে মাতিয়ে রেখেছে স্থানটাকে। ভোমরাগুলোর গুঞ্জনতান সারাদিন ধ'রে চলেছে তাদের ঘিরে। বেশ লাগত জায়গাটা। স্কুলের পড়াশোনার হাঙ্গামা এড়াবার সুযোগ পেলেই ছাত্র-জাতির অপাঠ্য নিষিদ্ধ পুস্তক নিয়ে চ'লে আসতুম এখানে।

পাঠ্যপুস্তকের বোঝায় কখনো মগজভারী করেছে এমন অপবাদ আমায় কেউ দিতেও সাহস করেনি। দেশবিদেশের রঙবেরঙের রঙীন গল্প, রঙের রামধনু ঠিকরে পড়ে তার লহরে লহরে। অগুনতি তাদের পথ। পাঠকদের মনগুলো তারা যখন যে পথে খুশি টেনে নিয়ে নেচে বেড়ায়। আমার মনটাও তাদের পাল্লায় প'ড়ে ফ্রান্স, ইংলন্ড, সুইটজারল্যান্ড, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, আফ্রিকাময় ঘুরে বেড়াত। ভুলে যেতাম—কালোমাটির বুকে বসে কালো অক্ষরের পথ বেয়ে আমি চলেছি।

সেদিনও 'সেকভ'এর একটি ছোট্ট গল্প পড়ছিলুম। রাশিয়ার পাইনবনের এক কাঠুরিয়া ছিল তার নায়ক। বনের মালিকান্ কোনো তন্বী বিধবা কাউন্টেসের মন কি করে জয় করা যায়—কাঠুরিয়া কাঠ কাট্‌তে কাট্‌তে ভাবছে তাই। আমার বনের শালগাছগুলোকেই তার বনের পাইনের সার ভেবে নিতে মন কোন আপত্তি করছিল না। গল্প পড়া শেষ হ'লে চোখের দু'ফোঁটা অশ্রুর তাগিদে বই বন্ধ করলুম। আবেশ কাটবার পর খেয়াল হ'ল—রোদ পড়ে গিয়েছে, এখন ফিরতে হবে। নয়তো পলাতক ছেলের খোঁজে মাস্টার হাকিমরা ভালছেলের পেয়াদা দিয়ে শমন পাঠাবে।

উঠি উঠি ক'রে আলস্যজড়িত দেহটাকে সটান করবার চেষ্টায় আছি, এমন সময় নজরে পড়ল—আধময়লা ধুতি, মেটে দেহ কে একজন এদিকে আসছে।

লোকটা নিকটে এলো। লালমাটির সড়কের ধারে জমিদার কান্তিবাবু জনহিতার্থে পুকুর প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সব পশ্চিমা মেটেল এনেছেন—মনে হ'ল এ তাদেরই একজন। একে ছোটলোক তাড়িখোর মেটেল তায় ভরসন্ধ্যায় গভীর বনের গোপন কোণে। নিশ্চয় কোনো রহস্য এর মাঝে আছে—মনটা কৌতূহলী হ'য়ে উঠল। একটু লুকিয়ে অপেক্ষা করলে নিশ্চয় কোনো গ্রাম্য অভিসারিকার আবির্ভাবও দেখতে পাওয়া যাবে।

ভাঙ্গা দেওয়ালের আড় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু আমাকে নিরাশ ক'রে সে একাই ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল, শেষ ঘরটার পিছনের পাঁচিলের পাশে। যেখানে প্রদীপ দেবার খাঁচ সেখানে কি যেন কতগুলো রাখল। তারপর মহুয়া তেলে ভরা একটি মেটে বাতি জ্বালিয়ে কাকে যে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রল, বুঝলুম না।

বনের সবুজিমা তখন আঁধারের আলিঙ্গনে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু তার অন্তরে জ্বলছে একটি ক্ষুদ্র প্রদীপের শিখা। তারই আলোতে দেখতে পেলুম—লোকটা ভাঙা ভিতের খানিকটা ধুলো কপালে মাথায় মেখে ধীরপদে বেরিয়ে আস্‌ছে। সামান্য একটা মজুর সে। তবু যেন মনে হ'ল তার মুখে দেখ্‌তে পেলাম আত্মসমাহিত কবির গাম্ভীর্য।

একটু আগে আমার মন এরই সম্বন্ধেই কু-ধারণাই করতে গিয়েছিল; সে কথা ভেবে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে পড়লুম, ভাবলুম—আড়ালেই থাকি। লোকটা পাশ কাটিয়ে চ'লে যাক। কিন্তু কবিত্বহীন দিন-মজুরের পক্ষে ভাঙ্গা পোড়ো মেটে বাড়ির মাটির প্রতি এত ভক্তি, কেন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। তার সত্যিকারের কারণ জানবার কৌতূহল সামলাতে পারলুম না। পাশ দিয়ে যেতেই ডাক দিলুম। আচম্‌কা ডাক শুনে সে ভূত ভেবে সত্রাসে কেঁপে লাফিয়ে উঠ্‌লো। পরমুহূর্তেই ভীতিভাবের তাল সামলিয়ে ফিরে তাকিয়ে যখন বুঝল মানুষ তখন ঘামছাড়া হাসি হেসে বল্‌ল—'বাবুজি মৈঁ ডর গিয়া থা। সাঁজ বহু গিয়া—তবুভি য়হাঁ বৈঠে হ্যায়? ক্যা ঐসী আঁধারিয়ামে কিতাবকা দানা আপকো পাকড় লিয়া?'

আমি তাদের না চিনলেও তারা আমায় চিনতো। কেননা প্রায়ই দেখ্‌তে পেত উস্কুখুস্কু পাগলাটে গোছের একটা লোক এই একই যায়গাতে চুপচাপ একরাশ বই নিয়ে অকাজে সময় নষ্ট করে।

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করলুম, "তুই হঠাৎ এ জঙ্গলে—এ অসময়ে যে? বাড়ির ভিতর ওটি কি করলি?

"কুছ সন্দ্ না আছে বাবু—ওঠো পূজা আছে।" বিষণ্ণ ছলছল হাসিভরা তার মুখ।

"পূজো! এটা কি মন্দির যে পুজো দিতে এসেছিস্?"

সে দৃঢ়তার সঙ্গে তার কথাকে প্রতিষ্ঠিত করে বলল, "হ্যাঁ বাবুজী। ঔর কিসিকা নহি হোবে তো হামারে লিয়ে তো ইয়েহি মন্দর হ্যায়"।

জবাব না দিয়ে আরও কিছু জানবার আশায় তার দিকে উৎসুক মুখে তাকালুম। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি বুঝতে পেরে সে বলে চল্‌লো—

"করিবন্ বিশ বরষ হলো, হমলোগ ইহাঁ রাস্তা মেরামতি করতে অয়ছিল। বহোৎ রোজ থেকেছিল। আমি তখন দোতিন বরষকা লেড়কা ছিলে। সাথ ছিলে মাজী ঔর পিতাজী।"

বেচারার চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল গড়াচ্ছিল। তাই তার পুরাতন শোককে আর আলোড়িত না করবার ইচ্ছায়

(শেষাংশ ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রলিপি'*

নীলিমা দেবী

আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাবধারার ওপর যে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করে আছেন, তার তুলনামূলক একটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো কালে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট-গল্প লেখক, নাট্যকার, সমালোচক, প্রবন্ধ রচয়িতাঃ এক কথায় রসশিল্পের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যাকে তাঁর প্রতিভা সমৃদ্ধ করেনি।

"চিত্রলিপিতে" তিনি আজ উপস্থিত হয়েছেন এক নতুন বেশে—চিত্রকরের রূপ ধরে। কিন্তু তাঁর "চিত্রলিপির" পাতাগুলি উল্টিয়ে এই কথাই মনে হয় যে, তাঁর এ নতুন বেশও কবি রবীন্দ্রনাথেরই রূপান্তর মাত্র। এতে তিনি কবিতাই পরিবেশন করেছেন রেখাছন্দের ভিতর দিয়ে। কাজেই, শুধু শিল্প-সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর চিত্রগুলি বিচার করা সম্ভব নয়—আবার শুধু শিল্প-সৌকর্যের প্রচলিত মাপকাঠিতে ফেলেও তাদের বিশ্লেষণ হ'তে পারে না। কবি যখন তুলি হাতে নিয়ে ছবি আঁকতে বসেন—বিশেষ করে সে কবি যদি রবীন্দ্রনাথ হন—তখন সে ছবি হয় কবিতাই—ছবি নয়।

রবীন্দ্রনাথের সহস্র সহস্র কবিতা যে ভাবের মোহজালে বেঁধে রেখেছে আমাদের অন্তরলোক—তাঁর "চিত্রলিপির" সমালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, সে মোহের অঞ্জন শুধু আমাদের অন্তরেই নয়, চোখেও আছে লেগে। কারণ, যে ভাবব্যঞ্জনা তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে নানা চিত্রে, তাই আবার তাঁর "চিত্রলিপির" মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তোলে কবিত্বের কান্তরস।

এ কৌশল অদ্বিতীয় এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্পেই দেখা গেল প্রথম। এ শিল্পীর তুলিকাকে বাহন করে অভিব্যক্তি পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কবিত্বশক্তি—সে শক্তিই আবার হার মানিয়েছে শিল্প-সমালোচকের বুদ্ধিকে, পেরিয়ে গেছে আর্টের মাপাজোকা সীমানা।

"চিত্রলিপির" প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, অনেক সময় লোকে তাঁর ছবির অর্থ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করে—কিন্তু তিনি থাকেন নীরব—যেমন নীরব তাঁর ছবি। তিনি বলেন তাঁর ছবি আছে কেবল আত্মবিকাশ করার জন্য, মানে বোঝাবার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্র রূপতান্ত্রিক—বস্তুতান্ত্রিক নয়—সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু সেই

'সে' পুস্তকের 'পাল্লারাম'

প্রত্যেকটি চিত্র-রূপকেরও অর্থসূচক এক একটি কবিতা কবি নিজেই তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। "চিত্রলিপিতে" সন্নিবিষ্ট ঐ কবিতাগুচ্ছের সার্থকতা আছে চিত্রের জুড়ি হিসেবেই সে কথা মন বিশ্বাস করতে চায় না। এ খণ্ড কবিতাগুলির মূল্য নিশ্চয়ই ছবির পরিচিতি হিসেবে নয়—রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিব্যক্তি হিসেবে। কারণ, প্রত্যেকটি আলেখ্য আপনাতে সম্পূর্ণ—তার জন্য পরিচিতির প্রয়োজন হয় না,

একটি মুখ

প্রতিকৃতি

কবিতাতেও নয়। তাদের আছে রঙ ও রেখারই নিজস্ব বিশিষ্ট গঠন ও গুণ—এর বেশি কিছু প্রয়োজন তাদের নেই। তারা কেবল ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতিরই বাইরে নয়, অন্য কোনো শিল্পীরই ছোঁয়াচ তাদের গায়ে লাগেনি। কাজেই, তাদের অর্থ আছে সেইখানে যেখানে তারা তাদের রূপকাঠি দিয়ে ছুঁয়ে দেয় আমাদের অন্তর্জ্ঞানীয়-লোকের সুপ্ত বীণা, আর সে বীণায় জেগে ওঠে কান্তরসের ঝংকার। ধরা যাক্ সেই ছবিখানি যার রহস্য বোঝাতে গিয়ে কবি লিখেছেনঃ

"পথে পথে অরণ্যে পর্বতে
চলিতে চলিতে হয় দেখা,
বিস্মৃতির পটভূমিকায়
স্মৃতি কিছু রেখে যায় রেখা।"

এ ছবি হঠাৎ দেখে মনে জাগে ছোটবেলায় শোনা রূপকথার সেই বনে বিতাড়িত দুয়োরাণীর করুণ স্মৃতি; আবার খানিকক্ষণ সে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় মর্মরমুখরিত গভীর অরণ্যে আলোছায়ার লুকোচুরির এমন রূপছন্দ সৃষ্টি করলে কে?

'চিত্রলিপি'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির অঙ্কিত আঠারোখানি ছবি আঠারোটি বাঙলা ও ইংরাজি লেখনের কবির স্বহস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, কবির ভূমিকা সহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত। সাধারণ সংস্করণ ৪।।০ টাকা, রাজ সংস্করণ নির্দিষ্ট সংখ্যক কবির স্বাক্ষরিত ১০্ টাকা।

চন্দ্রগ্রহণ

সুবোধ ঘোষ

ডোমেদের প্রধান গাঁওবুড়ো এলাচি ডোম। যৌবনের জলুস উবে গেছে কবে, জীবনের ধার গেছে ক্ষয়ে; পরমায়ুর প্রান্তে এসে ঠেকেছে আজ। জরা আর ভীমরতির পাকে প'ড়ে ধুকধুক করছে শুধু। যাই যাই করেও যেন আর যেতে চায় না।

মোরগের ডাকের সঙ্গে এলাচির ঘুম ভাঙে। জেগে উঠেই পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকে—টুকিয়া, ওরে টুকিয়া, শিগগির ভাত দে।

—এক লাথি মেরে সব গলাবাজি বন্ধ করে দেব বুড়ো। শুধু খাই আর খাই। নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খা না।

টুকিয়াও ঘুম ছেড়ে রাগে গরগর করে বেরিয়ে যায়। গাঁওবুড়ো এলাচি তার অষ্টাবক্র গ্রন্থিল দেহভার তুলে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। কঞ্চি দিয়ে গা চুলকোয়। মাথাটা ঘড়ির কাঁটার মত প্রতি সেকেণ্ডে ঠক ঠক করে কাঁপে। গাল দেয় টুকিয়াকে, গাল দেয়—টুকিয়ার মৃতা মাকে, যার চরিত্র নাকি কোনও কলিয়ারির সাহেবের কাছে বাঁধা ছিল। —নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বেজন্মা, নইলে বুড়ো বাপকে এত অবহেলা!

এলাচির গালাগালি আর অভিশাপের প্রবাহ অবিরল ধারায় গড়িয়ে চলে দুপুর পর্যন্ত। শ্রান্তিতে ঘুণধরা হাড়টা ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসে। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খায়।

এমনি সময় ঘরে ফিরে আসে টুকিয়া। বুড়োর সমুখে ঠেলে দেয় এক থাল ভাত আর এক হাঁড়ি তাড়ি বা মদ। বুড়ো জুত ক'রে উঠে বসে। বিশীর্ণ ঘাড়টা সারসের মত ঝুঁকিয়ে অনুভব করে—এক হাঁড়ি তরল প্রাণের গন্ধ। এই জন্যেই তার বেঁচে থাকা।

—জিতা রহো বেটী! বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্বাদ করে। —তুই আছিস বলেই তোর বুড়ো বাপটা বেঁচে আছে। বুড়ো ডুকরে কেঁদে ফেলে। —আর তোর মা। অমন বউ দেবতারও হয় নারে টুকিয়া! বুড়ো ভাতের থালা সামনে টেনে নেয়।

দু তিন মুঠো ভাত গিলে ক্লান্ত ঘোড়ার মত তাড়ির হাঁড়িতে ঠোঁট নামিয়ে দেয়। ঢকঢক ক'রে খেয়ে ফেলে। থেমে নিয়ে তামাক টানে।

তাড়ি ভেজা নোংরা দাড়িতে মাছি উড়ে এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ঠাণ্ডা ভাতের থালার গা বেয়ে চড়ে পিঁপড়ের সারি। বুড়ো বুঁদ হয়ে ঝিমোয়। তার সাদা ভুরু দুটো চোখের কোটরের ওপর পর্দার মত ঝুলে পড়ে।

এত দীনতা এলাচির সংসারে আজই দেখা দিয়েছে, চিরটা কাল এমন ছিল না। সেণ্ট্রাল জেলের জহ্লাদ এলাচি—মাইনে ছিল ভাল, উপরি আয়ও মন্দ হ'ত না। সব চেয়ে মোটা দক্ষিণা আদায় হ'ত ফাঁসির আসামীর মায়েদের কাছে।

মায়েরা বলত—দোহাই বাবা জমাদার! টানা-হ্যাঁচড়া মারধর ক'রে ছেলেটাকে শেষ সময়ে আর কষ্ট দিস্ নি বাবা!

—তা একটু করতে হবে বৈকি। সহজে কি আর কেউ তক্তায় উঠতে চায় মায়িজী।

—না রে বাবা জমাদার। নে, বিশটা টাকা রাখ, এই রুপোটা নে। কিন্তু কথা রাখিস্।

এলাচি খুশী হ'য়ে আশ্বাস দিত। —বেশ, বেশ, দড়িটা না হয় চর্বিতে ভিজিয়ে নেব ভাল করে, যাতে গলার চামটাম ছ'ড়ে না যায়। তবে আগে দুটো টাকা দাও আমার মেয়েকে, মেঠাই খেতে।

এ-সব অনেকদিন আগের কথা। টুকিয়া তখন দু বছরের মা-মরা শিশু।

ভাত আর তাড়ি। এই সামান্য অন্নপানটুকু গাঁওবুড়ো হিসাবে তার প্রাপ্য দক্ষিণা। কিন্তু সেই বা আর শ্রদ্ধা ক'রে খুশী মনে দেয়। ডোম গৃহস্থদের দ্বার হ'তে দ্বারে ঘুরে—অনুনয় ক'রে, চোখ রাঙিয়ে, ঝগড়া ক'রে টুকিয়া আদায় ক'রে আনে গাঁওবুড়ার এই সম্মানী।

ভিক্ষাজীবী ডোম মেয়েরাও টুকিয়াকে অনুকম্পার চোখে দেখে। তাদের বরাতেও ডালরুটি জোটে। টুকিয়া সম্মানী যা পায়—তারাও দেখে লজ্জা পায়।

সমবয়সী ভিখিরী মেয়েরা ঠাট্টা ক'রে বলে—বুড়োকে এবার একটি জামাই আনতে বল্ না টুকিয়া। তা হ'লেই তো তোর এ মেহন্নতের জ্বালা দূর হয়।

টুকিয়া তাদের গালে ঠোনা মেরে জানিয়ে দেয়—বুড়োর দেওয়া জামাই আমি নেব কেন? আমার বর বাছব আমি।

টুকিয়া চলে গেলে ভিখিরী মেয়েরা আলোচনা করে। তারাও সে কথাটা শুনেছে। টুকিয়া জাতের বাইরে কার সঙ্গে ফেঁসেছে। পঞ্চের বৈঠকে এর নিষ্পত্তি হবে। টুকিয়াকে শাস্তি পেতে হবে।

গাঁয়ের সবারই চোখে টুকিয়া সুন্দর। পরবের দিনে খোলা মাঠে নৃত্যপরা টুকিয়ার তনুরুচি আড্ডার চোখে চোখে কুহকবাষ্প বুলিয়ে দেয়। বয়োবৃদ্ধেরাও আপসোস করে—ভাল নাচ্‌নী হ'ত মেয়েটা, চাল-চলন যদি একটু নরম-সরম হ'ত। সব মাটি করেছে ওর ঐ রুদ্র স্বভাব—কনকধুতরার মত। দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকাই যায়।

নতুন এক জোয়ান এসেছে এ গাঁয়ে। মঙ্গল তার নাম। গাঁয়ের ওঝা দিয়েছে তাকে আশ্রয়। কিন্তু ধরা পড়ে গেল মঙ্গল। আসলে সে ডোম নয়—মুণ্ডা জংলী। তার ওপর আরও খবর পাওয়া গেছে—সে ডাইনীর ছেলে। দেশ ছেড়ে এসে রয়েছে ডোম সেজে। চাকরি জোটাবার ফন্দিতে।

এ হঠকারিতার যথোচিত শাস্তি পেতে হ'ল মঙ্গলকে। ডোমেরা নিদারুণভাবে পিটিয়ে তাকে গাঁয়ের বার ক'রে দিল। ডাইনীর ছেলে গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে তুক্ ক'রে রেখে গেল গাঁয়ের সেরা জিনিসটি—যুবক-ডোমের কামনার ধন ওই টুকিয়াকে। এ ব্যাপারে সমস্ত গাঁ জুড়ে যে বিক্ষোভের ঝড় উঠল, তার জের আজও মেটে নি, মিটছেও না।

গাঁয়ের উত্তর সীমানা নালার কোলে এক ফালি জঙ্গল। মঙ্গল মুণ্ডা সেইখানে কুঁড়ে বেঁধে নিল—একটি বড় পলাশের নীচে। সমস্ত দিন গুল্‌তি নিয়ে পাখী আর কাঠবিড়ালী মারে। সূর্য ডুবলেই সিঁদুরে আলো-ছড়ানো ক্ষেত আর মেঠো পথের দিকে তার অস্থির দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। প্রতীক্ষায় ছটফট করে যতক্ষণ না টুকিয়া ভাত নিয়ে পৌঁছয়।

নড়বার নাম নেই; মঙ্গল মুণ্ডা একটি দুষ্টগ্রহের মত ঝুলে রইল ডোম গাঁয়ের দিগন্তে। কুকুর-মারা ঠ্যাঙা হাতে ডোমেরা ক'দিন রইল তাকে তাকে। বাগে পেলে এক বাড়িতে তার প্রণয়কলাপ আর ইহলীলা একই সঙ্গে ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু বেটা জংলী বড় জবরদস্ত, তার ওপর সর্বদা খোঁপায় ঝোলানো এক গোছা বিষ মাখানো তীর। উড়ন্ত সাপের মত অলক্ষ্যে কখন কাকে এসে ছোবল দেয় কে জানে। কাজেই সংঘর্ষটা তেমন জমে উঠল না। ওঝার বহুদিনের মন্তরবন্দী অশরীরী পিশাচটাও জংলীকে ঘায়েল করতে পারল না।

প্রতিবেশীরা দলে দলে এসে বুড়ো এলাচিকে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—গাঁওবুড়া, হয় মেয়ের বিয়ে দাও, নয় মেয়েকে সামলাও। নইলে তোমাকে জাতে রাখা আর সম্ভব হবে না। আমাদের অন্য গাঁওবুড়ো দেখতে হবে।

প্রতিবেশীদের হাত ধ'রে সকাতরে বুড়ো বলে—কেন বেরাদার, তোমরা এত চটেছ কেন? কি করেছে মেয়েটা?

—রাত বেরাতে মঙ্গলের সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে। ওকে ভাত পেঁছিয়, সলা-পরামর্শ দেয়, সমস্ত পণ্ড বিগড়ে উঠেছে এ-সব কুকাণ্ড দেখে। জাতের বাইরে...... ছি ছি।

পঞ্চের গুপ্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হ'ল—মঙ্গলকে জব্দ কর। টুকিয়া ওকে ভাত পেঁছতে পারবে না। গাঁওবুড়োকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, এর ব্যতিক্রম হ'লে তারা একজোটে সম্মানী দেওয়া বন্ধ করবে।

গাঁওবুড়ো এলাচিও ক্ষেপে গেছে। গেল গেল, সব গেল। বন্ধ হ'ল তার ভাত আর মদ। ওঝার হাত ধ'রে মিনতি করে বলে—সবুর কর দোস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে। বুড়াকে পেটে মের না বেরাদার। ধর্ম ভুলে যেও না।

প্রত্যুত্তরে ওঝা আশ্বাস দিয়ে জানায়—সে ধর্মজ্ঞান আমাদের আছে। কিন্তু বেটিকে বুঝিয়ে দাও, জংলী শালা যেন মোটা না হ'তে থাকে আমাদেরই ভাত মেরে।

টুকিয়া, শোন্ বেটী! এলাচি আদর করে ডাকল। পঞ্চের সভা এল বলে। তোর বর বাছাই হবে সেদিন। ওঝার ছেলের সঙ্গেই ঠিক করেছি। পঞ্চের সামনে গিয়ে কবুল করে নিবি। বুঝলি?

টুকিয়া সংক্ষেপে জানিয়ে দিল—সে আমি পারব না।

—কি পারব না? বুড়ো দারোগাই মেজাজে গলার স্বর এক পর্দা চড়াল।

—কি আবার রে বুড়া? যেন জানিস না কিছু? আমি মঙ্গলকে কথা দিয়েছি।

—কি? মঙ্গল? জাতের বাইরে? হুঁসিয়ার হো যাও হারামজাদী! নইলে এই বেত দিয়ে ফাঁসিয়ে ঘাড়টা একেবারে মুচড়ে দেব।

নিমীলিত চক্ষু, বুড়োর মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে ধ'রে টুকিয়া বলল,—এই দেখ, হেই বুড়া। এই করবি তুই।

বুড়ো অবশ হাতে তার দুপাশে হাতড়ে দেখলে—চেলাকাঠ, লাঠি বা ইট-পাটকেল। ততক্ষণে টুকিয়া ঘরের বাইরে।

সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ঘুরেছে মঙ্গল। গেরুয়া ধুলোয় শরীর গেছে ছেয়ে। মাটিতে একেবারে লুটিয়ে শুয়ে সে টুকিয়ার কথাগুলো গিলছিল।

সামনে পলাশের একটা নীচু ডাল ধ'রে টুকিয়া হেলে দুলে ব'কে চলেছে।

—কাল থেকে তোর ভাত বন্ধ।

—বেশ, জঙ্গলের ডুমুর খাব।

—হাঁ, তাই খাবি।

—বলছি তো খাব। রোজ ডুমুর খাব। কিন্তু একদিন এসে দেখবি আমি আর মঙ্গল নই। ভালুক হয়ে ঝুলছি ডুমুরের ডালে। এই রোঁয়া, এই নখ, এই থাবা......।

মঙ্গলের অভিমানের প্রলাপ থামিয়ে দিল টুকিয়া। পায়ের চেটো দিয়ে মঙ্গলের ধুলো ছাওয়া পিঠটা আস্তে আস্তে ঘ'ষে দিয়ে বলল—বড় ঘাবড়ে গিয়েছিস্, না রে মঙ্গল? ভয় কি তোর? আমি রয়েছি। তবে তোকে কাজ করতে হবে।

চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গলার স্বর নামিয়ে টুকিয়া বলল,—রোজ রাত্তিরে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। বল রাজি আছিস্?

—হাঁ।

—মাঠে মাঠে যাবি। খবরদার সড়ক ছুঁসনা যেন। লোহার পুলটা পেরিয়ে দেখবি কুলের বাগিচা। পেছনের ঘোরান ভেঙে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়বি। বেছে বেছে লাক্ষার গুটিভরা এক বোঝা ডাঁটা নিয়ে আয়। ....মারোয়াড়ী ঠিক করেছি। এক এক বোঝা পাঁচ পাঁচ টাকা।

মাঝরাত্রে মঙ্গল ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার রক্তমাখা দেহটা পলাশতলায় কাটাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল। পিঠে বল্লমের খোঁচা-লাগা একটা সুগভীর ক্ষত। —দারোয়ানে ঘিরেছিল রে টুকিয়া। উঃ, কোন মতে পালিয়ে এসেছি।

চালে ভুল হয়েছে। টুকিয়া ভাবনায় ডুবে রইল কতক্ষণ। এ পথে চলবে না রোজগার; প্রতিপদে মরণ, মার আর জেল। জংলীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর সে হ'তে পারবে না।

নতুন রোজগারের হদিস দিল টুকিয়া। —রিজার্ভ জঙ্গল থেকে মরা জানোয়ারের হাড় কুড়িয়ে নিয়ে শহরে গিয়ে বেচে আয়।

ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে অরণ্যের জঠর হাতড়ে বেড়াল মঙ্গল। একটা পুরনো উইঢিবি খুঁড়ে বা'র করল গোটা চারেক পাহাড়ী চেমনার মেরুদণ্ড। মরা কেঁদগাছের ঝোপে পেল দুঝাড় হরিণের শিং। স্রোতের ধারে বালিতে আধ-পোঁতা নীলগাইএর পাঁজরাও পেল একটা।

হাড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে জঙ্গলের গাছের ভীড় ঠেলে খোলা জমিতে পা দিতেই মঙ্গলের একেবারে মুখের উপর এসে ঠেকল একটা ফেনসিক্ত ঘোড়ার মুখ। অশ্বারূঢ় জঙ্গল দারোগা।

—লাইসেন্স?

হতভম্ব মঙ্গল হাড়ের প্রকাণ্ড বোঝাটা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি রে শ্বশুরকা নাতি? তোর বাপের জঙ্গল এটা?

মঙ্গলকে সদরে চালান করা হ'ল। সপ্তাহ পরে খবর এল—কয়েদ, এক বছরের জন্য।

মঙ্গলের কুঁড়ের খুঁটি ধরে টুকিয়া কাঁদল।—বড় বেইজ্জৎ হলো বেচারা। আর হয়তো আসবে না। বয়েই গেল তাতে। ডোমগাঁয়ে কি আর জোয়ান নেই—সূর্য, বংশী, বিদেশী...।

মঙ্গল মুণ্ডা জেলে। ডোমগাঁয়ের প্রজ্বলিত সামাজিক উষ্মা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। টুকিয়ার পাণিপ্রার্থী ডোমমহলে সুপ্ত ভরসা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। সাপ সরে গেছে মালও ছেড়ে। অনেকগুলো হাত এগিয়ে এল একসঙ্গে।

এল ওঝার ছেলে সূর্য ডোম। হাসপাতালের টি বি ওআর্ডের মেথর। গাঁওবুড়ার পা টিপে দিয়ে নিবেদন করলো—বাবা, এইবার ব্যাপারটা চুকে যাক্। আর দেরী নয়।

এল মশান মজুর বিদেশী ডোম। মড়ার লেপতোশকের তুলো আর নেবানো-চিতের কাঠকয়লা বেচে পয়সা জমেছে কিছু। ঘরে বসে রেজ্‌কি-ভরা পেতলের ঘটি ক'টার দিকে তাকায় আর একটি গৃহলক্ষ্মীর জন্যে মন আনচান করে। বুড়োকে এক বোতল বিলিতী মদ প্রণামী দিল। —এইবার টুকিয়ার সঙ্গে মন্তর পড়ে হাত মিলিয়ে দাও বাবা।

ময়নাঘরের দারোয়ান বংশী ডোম এল। কত কাঁচ ছেলেমেয়ে, মাগী-মরদ, ইংরেজ, বাঙালীর লাস পার হয়েছে তার হাত দিয়ে। বেওয়ারিশ লাসের গা থেকে খুলে নেওয়া হাঁসুলি, চুড়ি, তাগা, হার—কত সামগ্রী! তার তামার গাগ্‌রিটা প্রায় ভরে এল। সটান বুড়োর পা জড়িয়ে ধরে বিয়ের প্রস্তাব জানাল। —একটু তাড়াতাড়ি কর বাবা।

বুড়ো এলাচিও মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছে যে তার বার্ধক্যের

একমাত্র নির্ভর একজন সুযোগ্য জামাই। নইলে, মদের অভাবে তার সম্মুখের এই এমন সরস পৃথিবীটা শুকিয়ে গুড়ো হয়ে যাবে। কাউকেই হাতছাড়া করতে চায় না বুড়ো। সবাইকে সাগ্রহে আশ্বাস দেয়—সবুর সবুর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঙ্গলের মুক্তির দিন এল এগিয়ে। ডোমগাঁয়ের প্রসুপ্ত বিক্ষোভ আবার শত শিখায় জ্বলে উঠল। পঞ্চের বড় বৈঠক হবে—চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে এইবার।

এলাচির যুক্তি বুদ্ধি যেটুকু ছিল তাও এল ঘোলা হয়ে। চোখের সামনে জাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে মেয়েটা। তাও কি না আবার একটা জংলী শেয়ালের সঙ্গে। হায় পরমাত্মা! কোন কাজেই আসবে না। গাঁওবুড়োর আসন এবার সত্যই টলে উঠল।

নেশায় আজকাল আর সে আমেজ আসে না। মাথায় কেমন জ্বালা ধরে। —ভেজাল মেরেছে শালারা সব! জল মিশিয়েছে। বুড়ো মদের ভাঁড় লাথি মেরে হঠিয়ে দেয়।

আগামী পঞ্চের বৈঠকেই হবে তার মৃত্যু। গত্যন্তর নেই। ঘরে একটা চণ্ডা মেয়ে আর বাইরে ক্ষমাহীন পঞ্চ।

এলাচির মনে পড়লো হিজুরে কাশী ডোমের পরামর্শটা। —হাঁ, কাশী কথাটা মন্দ বলে নি।

—টুকিয়া, টুকিয়া, টুকিয়া। বুড়ো গলা চিরে ডেকে ডেকে কেঁদে ফেলল। —জাত ছাড়বি তুই?

—হাঁ।

—আমি খাব কি?

—তা আমি কি জানি। মরিস না কেন?

—অবুঝ হোস্ না বেটী। যদি জাতই ছাড়বি তো জংলীটার জন্যে কেন?

—কার জন্যে ছাড়ি বল্‌তো?

—কাশী একটা খবর দিচ্ছিল। শুনবি? বুড়ো যথাসাধ্য তার গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বলল—বানার্জি ডাক্তারের বাড়ী কাজ করবি? টাকা পয়সা ভালই পাবি। সামান্য ঝাড়ু টাড়ু দিতে হবে।

—ওসব আমি পারব না বুড়ো। মঙ্গলের ছেলে রয়েছে আমার পেটে।

আহত নেকড়ের মত বুড়ো বিশ্রী চীৎকার ছাড়ল—কি? কি বল্‌লি রে ধর্মহারা মেয়ে?

এবার টুকিয়া হেসেই ফেলল।—নে বুড়া, খুব হয়েছে, থাম্ এবার। যত মদ খাবি, যত ভাত তামাকু খাবি সব দেব। তোর আর পঞ্চকে অত ভয় করতে হবে না। কিছু ভাবতে হবে না তোকে। ওদের জবাব দিয়ে দে।

—জিতা রহো বেটী। ধর্মে ঠিক থাক বেটী। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্বাদ করে। অবসন্ন বুড়ো ক্রমে ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে আসে। টুকিয়া এক টুকরো চট পাকিয়ে এলাচির মাথার তলায় গুঁজে দেয়। গামছা দিয়ে বুড়োর গা মুছে, হাত পায়ের আঙুলগুলো টেনে টেনে বাজিয়ে দেয়। —ঘুমো বুড়ো ঘুমো। দুটো ভাত আর মদ। এই তো? এইটুকু যদি না করতে পারি তবে আমি ডোমিন নই।

টুকিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। তার চেতনা ছাপিয়ে জেগে ওঠে পুরা মানবীর মাতৃতান্ত্রিক দর্প।

গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে টুকিয়া মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। আজই তো তার খালাস হবার কথা।

সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। ধানকাটা ক্ষেত ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির উড়ে চলেছে। আহা! পশালতলার কুঁড়েটা একেবারে ধসে গেছে।

মোরাবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে গুল্‌তি ছুড়ছে কে? হাঁ, সেই তো?

—আর বসে বসে গুল্‌তি ছুড়লে চলবে না। রোজগার করবি তো কর্। নইলে আমার আশা ছাড়।

এতদিন অদেখার পর এই রূঢ় সম্ভাষণ। মঙ্গল টুকিয়ার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো।

—আচ্ছা, ভাবিস্ না। কাল আমার সঙ্গে শহরে যাবি। হাসপাতালে পাংখা কুলির দরকার।

সদর শহর জংলীর মুখে শব্দ নেই। সব ঝঞ্ঝাট টুকিয়াকেই ভুগতে হ'ল।—যা, ঐ যে বাবুটি বসে আছে দোকানে, তাকে গিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে বল্। এমনি করে আদাব জানাবি।

টুকিয়া সবই শাসিয়ে শিখিয়ে দেয়, মঙ্গল এগিয়ে যায় আর বিমুখ হয়ে ফিরে আসে। —অপদার্থ জংলী কোথাকার! আয় আমার সঙ্গে।

—বাবুজী! ঠোঁট দুটো পাতলা হাসিতে রাঙিয়ে নিয়ে, কালো চোখের তারা নাচিয়ে বাবুটির প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে টুকিয়া বলে —বাবুজী! একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

লেখা দরখাস্তটা নিয়ে টুকিয়া মঙ্গলের হাতে দিল। —এই নে, এবার হাসপাতালে চল্।

হাসপাতালের কেরানীবাবুর সামনে দরখাস্তটা সঁপে দিয়ে মঙ্গল দাঁড়াল।

—অ্যাঁ মুণ্ডা? তোম্ মুণ্ডা হায়?

—হুজুর।

—যাও থানামে সার্টিফিকেট লে আও। আচ্ছা দাঁড়াও।

টেলিফোনের চোঙটা তুলে নিয়ে কেরানীবাবু ডাকলেন—হ্যালো সাব-ইনস্পেক্টর। একবার রেজিস্টারটা দেখুন তো। নাম মঙ্গল মুণ্ডা—কোন ব্যাড ক্যারেক্টর কি না।

—ওরে বাবা! এ যে দেখছি সর্বগুণাধার নরোত্তম। সি ক্লাস দাগী। সব-ইনস্পেক্টরের প্রত্যুত্তর এল।—বাঘ ভালুকের মতিগতি তবু বোঝা যায় মশাই, কিন্তু এসব জংলী ফংলী...।

ফোন নামিয়ে কেরানীবাবু বললেন,—এই মঙ্গল মুণ্ডা, কেটে পড় বাবা। তোম্ দাগী হায়। নোকরি নেহি হোগা।

মঙ্গলের বর্বর মস্তিষ্কে বোধগম্য হলো না কিছু। টেলিফোনের চোঙটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে তার সমস্ত শরীর রিম ঝিম করে উঠল। প্রেতের ভোঁতা মুখের মত ঐ বস্তুটা এখনি এক ফুঁয়ে তার চোখের সব আলোটুকু বুঝি নিবিয়ে দেবে।

অন্তরালবর্তিনী টুকিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনল। আচম্‌কা এসে রুদ্রমূর্তিতে মঙ্গলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। —চল্ বনবিড়ালের বেটা। তোকে আর চাকরি করতে হবে না।

নিঃশঙ্গিনীর প্রত্যেকটি অভিযান নিদারুণ নিষ্ফলতায় একে একে লুটিয়ে পড়ছে ধুলোয়। টুকিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে গুম হয়ে বসে রইল।

মঙ্গল হঠাৎ টুকিয়ার হাত ধরে বলে উঠল,—এবার আমায় ছাড় টুকিয়া। তুই আর কাউকে বিয়ে কর্। যাবার আগে তোদের ওঝা আর ঐ কেরানীবাবুটাকে বিঁধে দিয়ে সরে পড়ি।

—না, তোকে যেতে হবে না কোথাও। চল্ ঘরে, একটা কথা আছে।

বুড়ো এলাচি সগর্বে ও সহুংকারে পঞ্চের হুকুম প্রত্যাখ্যান

করেছে। গাঁওবুড়োর পদ সে পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। সেও তার মেয়ের ওপর পঞ্চের কোন নির্দেশ চলবে না।

ওঝা শাসিয়ে গেছে—এবার ভূত লেলিয়ে তোদের বুকের কল্জে চুরি করাব।

বুড়ো বেঁচেছে। খুশী হয়ে কন্যারত্নকে আশীর্বাদ করে আর দিনরাত স্বচ্ছ সুগন্ধি মদ খায়। কোথা থেকে কেমন করে আসে, সে খবরে তার তিলমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

টুকিয়া আর মঙ্গলের ব্যস্ত সংসারযাত্রা শুরু হয়েছে এদিকে। ভোরে উঠেই মঙ্গল একবোঝা দাঁতন মাথায় নিয়ে শহরে যায়। অত বড় জোয়ানের ঘাড়টাও দাঁতনের ভারে বেঁকে যায়। এর একটু রহস্যও আছে। বোঝার ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকে কমপক্ষে দশটি বোতল মদ—বাড়িতে লুকিয়ে চোলাই করা। শহরের একটা আড্ডায় এগুলির গতি করে মঙ্গল ট্যাঁক ভারী করে ফিরে আসে।

সিকি আধুলি টাকা। মঙ্গল জীবনে এই প্রথম নিজ হাতে রুপো ছুঁয়ে দেখলো। অপূর্ব এর স্পর্শবাদ, এ এক ধাতুময়ী মায়া। একটা নতুন নেশা। জংলীও আজকাল গোলাপী গেঞ্জী গায় দেয়। টুকিয়া সাবান দিয়ে গা ধোয় আর চুমকি বসানো কালো শাড়ী পরে।

চন্দ্রগ্রহণের দিন। আজ সন্ধ্যে থেকেই ডোমগাঁ প্রায় জনশূন্য। সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে শহরে। গ্রহণ লাগলেই গৃহস্থদের ঘরে ঘরে তারা দান কুড়িয়ে ফিরবে।

রাত্রিবেলা বুড়ো এলাচিকে খাইয়ে শুইয়ে টুকিয়া মঙ্গলের ঘরে এল। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসল—ভাত মাংস মদ। চোলান মদের জালাটা আর গোটা কয়েক খালি বোতোল সুমুখে রাখা। আগামী কালের পণ্যসম্ভার আজ রাত্রেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

পাহাড়ী ঝর্নার মত খল খল করে হেসে টুকিয়া মঙ্গলের মাথাটা জড়িয়ে ধরে। একান্তভাবে তারই দাক্ষিণ্যের ওপর যাদের নির্ভর এমন দুজনকে যে আজ দুর্গতির হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ভাঙা সংসারকে সে আবার নিজের মহিমায় জুড়ে দিয়েছে। বুড়া সুখী, মঙ্গল সুখী, সে সুখী; আরও একজন —সেও আজ তার রক্তের অন্ধকারে সুখসুপ্ত।

মঙ্গল বলে—মাঝে মাঝে আমার ভয় করে রে টুকিয়া। কখন আবার ধরা পড়ে যাই। বাঁচাবি তো?

—হাঁ রে হাঁ, বাঁচাব।

—তা তুই পারিস। তুই যাদু জানিস টুকিয়া। মঙ্গলের মনের মেঘ কেটে যায় ও হাসতে থাকে।

মঙ্গল মুন্ডা হাজির হায়! ঘরের বাইরে দরজার কাছেই কনেস্টবলের গলার হাঁক শোনা গেল। মঙ্গলের চোখ থেকে মুহূর্তের পূর্বের নির্ভরতার আভাটুকু গেল নিভে। টুকিয়া মুখে আঙুল ছুঁইয়ে ইশারায় মঙ্গলকে জানিয়ে দিল—চুপ!

দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়ালো টুকিয়া। নেশায় পা বেসামাল। বিস্রস্ত শাড়ীটাকে একটু গুছিয়ে জড়িয়ে নিয়ে দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। কপাটের শেকলটা দিল তুলে।

গ্রহণের অন্ধকারে ছেয়ে রয়েছে পৃথিবী, বাইরের কিছু স্পষ্ট ঠাহর হয় না। টুকিয়া ডাকলো—কে?

—সাতার নম্বরের বদমাস মঙ্গল মুন্ডার ঘর এইটা না?

—হাঁ।

—তুই কে? একজন কনেস্টবল এগিয়ে এসে টুকিয়ার মুখের ওপর লণ্ঠনটা তুলে ধরলো।

—আমি মঙ্গলের জরু।

—মঙ্গলকে বাইরে আসতে বল।

—সে তো ঘরে নেই, শিকারে গেছে।

—বেশ, তা হ'লে তুই সরে যা। ঘরের ভিতরটা একবার দেখে রিপোর্ট লিখে নি।

—ঘরের ভিতর কেন যাবি সিপাহিজী; আমি বলছি, তোরা তাই লিখে নে।

—ও, বুঝেছি। একজন কনস্টেবল টুকিয়ার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে উদ্যত হলো।

টুকিয়া বললো—দাঁড়া সিপাহীজী, একটা কথা আছে। কনস্টেবলটা টুকিয়ার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল।

—এঃ, নেশাতে যে একেবারে গলে রয়েছ গো। অপর কনস্টেবলটাও এগিয়ে এল।

চালার খুঁটোতে বিলোল দেহভার হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল টুকিয়া। ঠোঁটে সুক্ষ্ম শ্লেষলিখা দুর্বোধ্য হাসির একটু ছায়া। বললো—বড় মেহেরবান আপনি সিপাহীজী। গরীবকে একটা বিড়ি খাওয়ান দেখি।

মন্দবিন্যস্ত শাড়ীর বিশ্লথ অঞ্চলে হঠাৎ একসঙ্গে দুটো প্রলুব্ধ হাতের ক্রুর আকর্ষণ। টুকিয়া অনুভব করলো শুধু। প্রতিরোধের দুরাশায় তার অবশ হাতটা মাত্র চমকে গিয়ে স্থির হয়ে রইল।

ঘরের ভেতর একটা শব্দ। পাথুরে মেজেতে ঠোকর-লাগা শানিত টাঙির হিংস্র নিক্কণ!

টুকিয়া অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে কনেস্টবল দুজনের হাত দুটো ধরে বললো—শীগ্গির চলো এখান থেকে।

শান্ত রাত্রির বাতাসে শহরের দিক থেকে ভেসে আসছে ভিক্ষার্থী ডোমেদের কলরব। গ্রহণকা দান! গ্রহণকা দান!

গ্রহণ ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। আবার চাঁদের মুখ খুলেছে। চারদিকে ফুটে উঠেছে নূতন শুক্লিমার স্ফূর্তি।

একদল বনশুয়োর নামলো আলুর ক্ষেতের ওপর। হুঁস হলো টুকিয়ার। তাড়াতাড়ি নালার জলে স্নান সেরে ক্ষেতের আল ধরে ঘরের দিকে চললো।

ভেজা কাপড়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেখলো মঙ্গল অঘোরে ঘুমচ্ছে। টুকিয়া ঠেলে ঠেলে তার ঘুম ভাঙালো।

অজন্তা গিরি মন্দিরে

অধ্যাপক - শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অজন্তার নাম যে কতকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, আর কত দেশীয় ও বিদেশীয় লোকের বিরচিত গ্রন্থে ও ভ্রমণ-কাহিনীতেই না অজন্তার কথা পড়িয়াছি, কিন্তু সেই অজন্তা এতকাল দেখিতে পাই নাই বলিয়া মনের মধ্যে একটা অভাব ও আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছিলাম। বহুকাল পরে আমার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে।

আমরা আওরঙ্গাবাদের পথে অজন্তা দেখিতে গিয়াছিলাম। আওরঙ্গাবাদ হইতে অজন্তার দূরত্ব ৬৯ মাইল অন্তত ধরমশালা হইতে তাহাই। আমরা পূরণচাঁদ নামক একটি ধরমশালায় ছিলাম। এই ধরমশালাটি স্টেশনের কাছে এবং চলাফেরার পক্ষে এবং থাকিবার পক্ষে স্থানটি বিশেষ সুবিধাজনক। ১০ নভেম্বর, ১৯৩৯ সাল, রাত্রিতেই অজন্তা যাইবার জন্য ষোল টাকা ভাড়ায় একটি ট্যাক্সি ঠিক করিয়াছিলাম। কথা ছিল, বেলা আটটার মধ্যে ট্যাক্সি আসিয়া পৌঁছিবে। যত আগে রওনা হওয়া যায়, ততই দেখিবার পক্ষে এবং ফিরিয়া আসিবার পক্ষে সুবিধা হয়। তাই শুক্রবার রাত্রিতে তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, যেন পরদিন খুব ভোরে উঠিতে পারি।

১১ নভেম্বর।—শনিবার। রাত্রি তো একরকম কাটিয়া গেল। কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা তো সকালে উঠিয়াই স্নান ও জলযোগ সারিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। আর আমাদের অন্নদাতা ধরমশালার নিকটবর্তী রাজারাম রাজপুতও পথের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। আমাদের ধরমশালারই একদল বেলা আটটার সময় অজন্তা রওনা হইয়া গেলেন, আর আমাদের ট্যাক্সি তখনও আসিল না। সেজন্য অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। রাজারাম বলিল, তাহার সঙ্গে ট্যাক্সিওয়ালার বাতচিত হইয়াছে, কাজেই সে কখনও না আসিয়া পারে না। কোথাও যাইব বলিয়া স্থির করার পরে যদি সেখানে যাওয়ার কোনও বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে মনে একটা অবসাদ আসে। আমি যে পথে ট্যাক্সি আসিবে সে দিকে অনেকটা হাঁটিয়া চলিলাম, যদি ট্যাক্সির সন্ধান মেলে, কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি! যখন নয়টা বাজিয়া গেল, তখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলাম, ভাবিলাম, আর যাওয়া হইবে না, ট্যাক্সি মিলিবে না। অজন্তা দেখিবার আশা এখানেই শেষ হইল, এমনই দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন একটু আনমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন সহসা ট্যাক্সির ভেঁপু শুনিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা প্রায় বেলা ১০টার সময় আসিয়াছিল। তাহাকে এত দেরি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, তাহার তো কোনও কসুর নাই, তাহার তো সাড়ে নয়টার সময়েই আসিবার কথা ছিল। এদিকে দশটা যে বাজিয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া আর তর্ক করিলাম না। কেননা অজন্তা যাইবার বাসগুলিও একে একে চলিয়া গিয়াছিল। তারপর এ সময়ে ইলোরা ও অজন্তা দেখিবার যাত্রিসংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে, ট্যাক্সি ইত্যাদি পাওয়া অনেক সময়ই দুর্ঘট হইয়া ওঠে এবং ইহারাও সুযোগ পাইয়া যা-তা একটা ভাড়া চাহিয়া বসে।

আমরা এইবার অজন্তা রওনা হইলাম। শহরের পথে গাড়ি চলিল। ধরমশালা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে আওরঙ্গাবাদ শহর বা সিটি। শহরটির পথঘাট নোংরা, উঁচু-নীচু। বর্তমান সভ্যতার যা কিছু প্রয়োজনীয় সমুদয়ই এখানে আছে। তবু মেয়েরা বোধ হয় আগেরই মত গাগরি লইয়া ইঁদারার পাশে জটলা করিতেছে, ফেরিওয়ালা জিনিসপত্র লইয়া হাঁকডাক করিতেছে। মুসলমান ভদ্রলোকেরা বেশ সুসজ্জিত হইয়া পথ চলিয়াছেন। রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। একটা প্রাচীন মস্‌জিদের উচ্চ গম্বুজের আড়াল দিয়া দূরে পাহাড়ের রৌদ্র-ঝলমল সবুজ শ্রী এক অপরূপ মায়াজালের সৃষ্টি করিয়াছে।

রাস্তার দুই দিকে আবর্জনা ও জঞ্জাল। তবে যে পথেই চল না কেন, খানিক পরেই উন্মুক্ত বিশাল মাঠের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হইবে। এখানকার প্রায় সব বাড়িঘর ও শহরের চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা, সেকালের রীতি অনুযায়ী fortified। কিন্তু এখন প্রাচীর ভাঙিয়াছে, তোরণ ধ্বংসপ্রায়—এমনি অবস্থা।

ক্রমে শহরের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। গাড়ি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলিয়াছে। পথের দুই দিকে অনেক দূর পর্যন্ত সমাধির পর সমাধি দেখিলাম। কোনওটি এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোনওটি ভূমিসাৎ হইয়াছে, কোনওটি বা তাহার বুকের পাঁজর ফেলিয়া একেবারে বিলীন হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে।

গাড়ি চলিতেছে। আমরা দেখিতেছিলাম পথের দুই ধারে ছোট ছোট পল্লী, খোলা মাঠ—কোথাও ফসল ফলিয়াছে, কোথাও মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে। কয়েক মাইল পথ চলিবার পর দুই দিকে অতি দূরে দূরে দেখা যাইতেছিল ছোট ছোট পাহাড়। আর মাঠের পর মাঠে জোয়ার ইত্যাদির ফসল।

আওরঙ্গাবাদ এগ্রিকালচার ফার্ম-এর তত্ত্বাবধানে অনেক স্থলেই আফ্রিকার তুলার চাষ হইতে দেখিলাম। পথটি সুন্দর। নিজাম স্টেট্‌স আওরঙ্গাবাদ হইতে অজন্তা যাইবার এই পথটির প্রতি বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন বলিয়া পথটি বস্তুতঃই অতি সুন্দর। আমাদের পথে অনেক নদী পড়িল। বিশাল সমতলা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পার্বত্য নদীগুলি সব বহিয়া চলিয়াছে। জল স্বচ্ছ, শীতল ও সুমিষ্ট। আমরা নদীর জল পান করিয়া যেমন তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, তেমনি নদীর বক্র গতিভঙ্গিমা লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়াছি, না জানি কোথায় এই নদীর শেষ।

অজন্তা উনিশ নম্বর গুহা-চৈত্য

আমাদের আগেও যেমন গাড়ি চলিতেছিল, তেমনি পিছন হইতেও অনেক গাড়ি আসিতেছিল, আবার অনেকে অজন্তা দেখিয়াও ফিরিতেছিলেন।

আমার কাছে এই পথের পূর্ণা নদীটিকে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। এপথে পূর্ণাই বড় নদী। পথে একটি পল্লীর পাশে আমাদের গাড়ির এঞ্জিনকে ঠান্ডা করিবার জন্য জল ঢালিতে কতকটা সময় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তার পর কত গ্রাম, কত আঁকাবাঁকা পল্লীপথ আশেপাশে রাখিয়া আমরা প্রাচীরবেষ্টিত উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত অজন্তা গ্রামে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। অজন্তা গ্রামের তোরণদ্বার পার হইয়া আমরা একটি উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। এই পাহাড়ের উচ্চ পথটি হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। যোজনের পর যোজন বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র, কোথায় কোন্ সুদূর প্রান্তে গিয়া দূর চক্রবাল রেখার সহিত মিশিয়াছে। সবুজ গাছের পর সবুজ গাছ, কে যেন সবুজের এক বিরাট ওড়না মেলিয়া রাখিয়া তাহাতে দোলা দিতেছে। আর পাহাড়গুলি সব দল বাঁধিয়া যেন অসীমের পথে যাত্রা শুরু করিয়াছে। কার্তিকের প্রদীপ্ত সূর্য, নীল আকাশ হইতে আলোকের ঝরনাধারা ফেলিয়া যেন প্রকৃতির বুকে আলোকের প্লাবন আনিয়া দিয়াছে।

উঁচু পাহাড়ের পথ হইতে আবার নামিতে লাগিলাম। আমি পথে বার বার আমাদের ট্যাক্সি চালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আর কত দূর? দুই একটি পাহাড়কে তো অজন্তা বলিয়া ভুলই করিয়া বসিয়াছিলাম। তারপর নীচে নামিয়া চারিদিকের পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা অপরিচিত পথ দিয়া একটি বাঁক ফিরিতেই আমাদের চির ঈপ্সিত, চির সুন্দর অজন্তা গিরির পদতলে অবস্থিত একটি সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কল্যানীয়া প্রতিভা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "হাঁ বাবা, তবে সত্য সত্যই শেষে আমরা অজন্তায় এলাম।" আমি দক্ষিণে ও বামে, উত্তরে ও পূর্বের সবুজ তরু শ্রেণী শোভিত পাহাড়ের শোভা দেখিতে দেখিতে বলিলাম, "হাঁ মা, বিধাতার কৃপায় অজন্তা আসিলাম।"

অজন্তা পাহাড়ে আসিবার সময় আমাদের চোখে ফরদাপুরের ডাকবাংলো এবং গভর্নমেণ্ট হাউসটি চোখে পড়িয়াছিল। যাঁহারা কয়েক দিন এখানে থাকিয়া ধীরে সুস্থে অজন্তার গিরিমন্দিরগুলি দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ডাকবাংলোতে অবস্থান করাই ভাল। গভর্নমেণ্ট গেস্ট হাউসে থাকিতে হইলে পূর্বাহ্ণে নিজাম স্টেটের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরকে পত্র লিখিতে হয়। ঠিকানা— দি ডিরেক্টর অব আরকিঅলজি, নিজামস ডোমিনিয়নস, হায়দরাবাদ। ডিরেক্টরের অনুমতিপত্র পূর্বে সংগ্রহ না করিলে গভর্নমেণ্ট গেস্ট হাউসে থাকা যায় না।

অজন্তা গিরিমন্দির যে পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত সেই পাহাড়টি এমনি ভাবে চারিদিকের পর্বত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত যে সহসা সেই পর্বতটি দৃষ্টিপথেই পতিত হয় না। দূর হইতেই পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিয়া পর্বতের পদতলে মিলাইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের নীচেটা বেশ সমতল করা হইয়াছে। তাহার এক পাশে মোটর ট্যাক্সি, মোটর বাস্, গরুর গাড়ি প্রভৃতি রাখিবার যায়গা আছে। এখানে দাঁড়াইলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি অজন্তা পাহাড়ের সব কয়টি গুহাই দেখা যায়, আর দেখা যায় দূরে পাহাড়ের গা হইতে ঝরঝর শব্দ করিতে করিতে কেমন একটি জলপ্রপাত অজন্তা পাহাড়ের গা হইতে ঝরিয়া পড়িয়া পদতলবাহিনী নদীর বুকে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতা ভারতবাসীকে চা পানের দিকে এমনি ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে যে, এই অজন্তার পাদমূলেও একটি চাএর দোকান রহিয়াছে। এখানে চা জল পান বিস্কুট চুরুট সিগারেট সবই মেলে।

অজন্তা গিরির পাদমূল হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলি সুগঠিত, প্রশস্ত এবং ধাপগুলি তেমন উঁচু না হওয়ায় উঠিবার পক্ষে বেশ সহজ ও সুবিধাজনক।
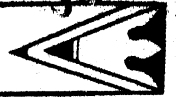
সিঁড়ির সংখ্যা প্রায় ১১৫টি হইবে। দুই-একটি কম বেশী হইতে পারে।

আমরা অল্প একটু বিশ্রাম করিয়া উপরে উঠিলাম। এইখানে নাগপুরের প্রবাসী কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল। কেহ উকিল, কেহ বা সরকারী কাজ

অজন্তার চিত্র

করেন। সকলে ছুটি উপলক্ষে দল বাঁধিয়া অজন্তা দেখিতে আসিয়াছেন। অজন্তা পাহাড়টির গায়ে একপ্রকার বিবর্ণ খড়ের গাছ রহিয়াছে। সেগুলি শুকাইয়া বোধ হয় বিবর্ণ হইয়াছে। উজ্জ্বল সবুজবর্ণের চিহ্ন একেবারেই নাই।

আমরা সিঁড়ি বাহিয়া মিনিট কুড়ির মধ্যেই উপরে উঠিলাম। পাহাড়ের গা কাটিয়া গুহাগুলির পাশ দিয়া বেশ প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। পাহাড়ের ঢালু দিকে রেলিং রহিয়াছে, কাজেই শিশুরা পর্যন্ত নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। যাত্রিগণের দেখিবার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া বর্তমান সময়ে গুহাগুলি এক, দুই, নম্বর করিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। অজন্তা গুহার কথা শতবর্ষ পূর্বেও লোকের অজ্ঞাত ছিল। স্যার জেমস্ আলেকজাণ্ডার নামে একজন সাহেব রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধে অজন্তার গিরিমন্দিরের চিত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৮১৯ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজ সৈন্য বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী (officer) অজন্তা গিরিমন্দির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্যার জেমসের অজন্তা সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর ১৮৩৬ সালের বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালেও অজন্তার সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। লেফটেনাণ্ট ব্রেক ১৮৩৯ সালে "Bombay Courier" নামক পত্রে অজন্তার গিরিমন্দিরসমূহের বর্ণনা করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ জেমস্ ফার্গুসেন সাহেব অজন্তা গিরিমন্দিরগুলি দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অজন্তার গিরিমন্দিরগুলি সম্বন্ধে এবং অন্যান্য ভারতীয় গিরিগুহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 'Rock but Temples of India' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তাঁহার এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে পর অজন্তা ও ভারতের গিরিমন্দির সম্পর্কে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ফার্গুসেন সাহেবের বইখানি বাহির হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণের দৃষ্টি এদিকে ধাবিত হয় এবং তাঁহারা মাদ্রাজ সৈন্য বিভাগের মেজর গিলকে গুহা চিত্রাবলীর প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার ভার দিলেন। গিল সাহেব বিশেষ যত্ন ও শ্রমসহকারে মাত্র পাঁচটি প্রাচীর চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে ক্রিস্ট্যাল প্যালেস একজিবিশনএ প্রদর্শিত এই চিত্র পাঁচখানি আগুন লাগিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমতী স্পীয়ার লিখিত 'Life in India' নামক গ্রন্থে মেজর গিলের অদ্ভুত চিত্র কয়খানির উড্‌কাট বা কাঠ খোদাই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাই আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গ্রিফিথস তাঁহার স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে দশ বৎসর কাল অনবরত কঠোর পরিশ্রম করিয়া ১২৫ খানা চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত এই চিত্রগুলি সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়মএ প্রেরিত হইয়াছিল। এই চিত্র হইতেও প্রায় ৮৭ খানি চিত্র অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। তাঁহার অঙ্কিত ৫৬ খানি চিত্র ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় বিভাগে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বাকী যে ছবিগুলি রক্ষা পাইয়াছিল সেই সব চিত্র সংযোজিত করিয়া গ্রিফিথ্‌স সাহেব ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে The paintings in the Bhuddist caves at Ajanta নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার পর ১৯১১ খৃস্টাব্দে লেডি হেরিংহাম এবং তাঁহার সহকর্মিগণ—এই দলে ভারতীয় চিত্রকররাও ছিলেন—সকলে মিলিয়া অজন্তা গিরিমন্দিরের বহু চিত্রের প্রতিলিপি করিয়াছিলেন। সেইসব চিত্রাবলী লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ামেও সুরক্ষিত আছে। লেডি হেরিংহাম, তৎপ্রণীত Ajanta Frescoes নামক গ্রন্থে সে সমুদয় চিত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সমুদয় প্রতিলিপি ব্যতীত আরও অনেকে সময়ে সময়ে অজন্তা গিরিমন্দিরের চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান কলিকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুল দে, সৈয়দ আহমদ্, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শিল্পিগণের নাম স্মরণীয়। মুকুল দের অঙ্কিত চিত্রাবলী বোম্বাইএর শ্রীযুক্ত Kallianji Curuniseyর নিকট আছে।

(ক্রমশ)

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[২]

দু বছর পর আবার তাদের দেখা।

প্রথমে প্রমোদ হঠাৎ কলকাতার রাস্তায় দেখতে পেলে নিখিলেশকে। প্রমোদ বললে, "এই যে! কি ভায়া, তোমার মনিহারী দোকান খুলেছ কোথায়?"

দু বছর আগের সে তর্কের কথাটা নিখিলেশ ভুলেই গিয়েছিল। এদের যে বয়েস তাতে এমন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এ বয়সে যখন যে প্রশ্নটা সামনে আসে সে সম্বন্ধে যুবকেরা আলোচনা করে, যেন সেটা জীবন মরণের সমস্যা। মহাযুদ্ধের কারণ বা ভবিষ্যৎ আলোচনাই হ'ক, দেশের প্রগতি বা অধোগতির কথাই হ'ক, আর সেদিনকার বাজারে বেগুন বা চিংড়ি মাছের ঠিক কি দাম সে প্রশ্নই হ'ক, সবই তারা আলোচনা করে নিদারুণ আগ্রহ সহকারে। সে প্রশ্ন সম্বন্ধে দ্রুত মত গঠন এবং বিরুদ্ধবাদীকে পর্যুদস্ত ক'রে সে মত প্রতিষ্ঠা তাদের স্বাস্থ্য ও জীবনের ভবিষ্যতের জন্য যেন অপরিহার্য। কিন্তু তর্ক মিটে গেলে সে প্রশ্নের প্রায়ই আর প্রয়োজন থাকে না, আর দুদশ দিনে সে কথা এরা ভুলেও যায়।

কথাটা প্রমোদ মনে করিয়ে দিলে নিখিলেশ বললে, "ও, সেই কথা। হাঁ তা—মনিহারী দোকানের কল্পনা ছাড়ি নি একেবারে, কিন্তু ভাবছি, এদিকে পরিষ্কার হয়ে তার পর ওসব ভাবা যাবে।"

নিখিলেশের ময়লা বেশ আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে চেয়ে প্রমোদ বললে, "হাঁ তা পরিষ্কার হওয়ার দরকার তোমার আছে বই কি; কিন্তু সে তো সহজ কথা, সের খানেক ঢাকাই সাবান দিয়ে ঘণ্টা দুই পরিশ্রম আর একটা ক্ষুর নিয়ে আধ ঘণ্টা টানাটানি করলেই—"

"আরে দূর বেকুব! সে পরিষ্কারের কথা বলছি নে। এদিকে একেবারে নিঝঞ্ঝাট হয়ে তার পর জীবন সংগ্রামে নামব তাই—"

"এদিকে মানে কোন দিকে?"

"ঘরের দিকে। এত দিন দুটো ঝঞ্ঝাট ছিল। ইস্কুল কলেজের হাঙ্গামা চুকিয়ে দেওয়া গেছে। সংসারের কাজগুলো শেষ ক'রে নেব ভাবছি।"

"সংসারের কাজ শেষ করবে? বেঁচে থাকতেই? আকাশকুসুম দেখছ নাকি?"

"না না, মানে একটা কাজ এখন হাতের গোড়ায় আছে সেটা শেষ করব—ওর নাম কি বলে—বিয়েটা।"

প্রমোদ চমকে উঠে বললে, "বিয়েটাকে বলছ শেষ? ও যে ঝঞ্ঝাটের সুধু আরম্ভ। জীবনসমুদ্রে সাঁতার কাটতে নামবার আগে, ঠাউরেছ গলায় বিশ মনী পাথর বেঁধে নেবে?"

"হাঁ, তা—তা, মিথ্যে বল নি, কিন্তু ওর আর এক দিকও আছে। যতদিন বিয়ে না হচ্ছে ততদিন দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বিশ ঘণ্টা ও নিয়ে নানা দুশ্চিন্তা হবেই। মেয়ের বাপ মা-রা ঝুলোঝুলি করবেন, মা বোনেরা চব্বিশ ঘণ্টা এই নিয়েই মাথা ঘামাবেন, আর আমারও আজ এটা কাল সেটা দশ রকম খেয়াল গজাতে থাকবে। তার চেয়ে একবার নাক মুখ বুজে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ওটা সেরে ফেললে জন্মের মত নিশ্চিন্ত।"

"নিশ্চিন্ত! না চিন্তার কাঁটা গাছকে সার দিয়ে বোনা। রোজ যাতে নতুন নতুন বিষমাখা কাঁটা বেরিয়ে হাত পা ছড়িয়ে হাঁ ক'রে তোমায় গিলতে থাকবে। প্রথম, একটার জায়গায় দুটো পেট চালাতে হবে। তার পর দেখতে দেখতে তিনটে, চারটে—arithmetical progressionএ বেড়ে যাবে। মেয়ের বিয়ে, ডাক্তারের খরচা সেসব কথা নাই তুললাম। এর নাম নিশ্চিন্ত হওয়া! পাগল হয়েছ তুমি!"

একটু চুপ ক'রে থেকে নিখিলেশ বললে, "পাগলও বোধ হয় একটু হয়েছি।"

"তাই বল। প্রেমে পড়েছ, মরেছ। তা বেশ। হাঁ সে ভাগাড়টা কোথায় জুটিয়েছ?"

স্পষ্ট অসন্তোষের সঙ্গে নিখিলেশ বললে, "ভাগাড়! হুঁ! দেখতে যদি তাকে একবার তো অমন একটা কদর্য উপমা দিতে তোমার জিব জড়িয়ে যেত।"

"থুড়ি ভাই থুড়ি! বেশ কড়া রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি। যদি বাধা না থাকে একটু বিস্তারিত খবর জানতে বলনা। মেয়েটি কার?"

"জানি না, মানে এখনও ঠিক জানি না।"

"Splendid! আর মেয়েটি? তাকেও বোধ হয় চেন না, হয়তো স্বপ্নে বা চিত্রে দেখেছ, কেমন?"

ভ্রূকুটি ক'রে নিখিলেশ বললে, "না হে না, অত কল্পনা-বিলাসী আমি নই। মেয়েটিকে দেখেছি; সুধু দেখেছি নয়, তার সাথে কথা কয়েছি, আর—চোখে চোখে অনেক কথাই হয়েছে যা মুখে বলবার দরকার হয় নি।"

"ও বুঝেছি, একদিন হঠাৎ পথে চলতে চলতে দেখতে পেলে তিনি সারা পথ রূপের ঢেউ তুলে পঞ্চাশ মাইল বেগে মোটরে চ'ড়ে চলছেন। তুমি বললে 'বাঃ', তিনি তোমার দিকে চেয়ে, খুব সম্ভব পাশে যিনি ব'সে ছিলেন তাঁকেই চেঁচিয়ে বলছিলেন, 'আ হা! নেকামি করবার আর জায়গা পাও নি।' কেমন?"

"যাও, ওসব ভাঁড়ামি ভাল লাগে না। প্রাণের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাশায় সুধু রাগই হয়।"

"আবার থুড়ি। এইবার আমি একদম চুপ করলাম, তোমার কথা তুমি ব'লে যাও।"

"বলবার বিশেষ কিছু নেই। ওকে দেখেছিলাম প্রথম দিন পার্কে, তার পর একদিন দেখলাম লেকে। সেদিন তার সঙ্গে ছিল ছোট্ট একটা মেয়ে। মেয়েটা বেলুন কেনবার জন্য বায়না নিয়েছিল, ও বলছিল পয়সা নেই। আমি অমনি ছুটে গিয়ে তিনটে বেলুন আর এক বাক্স চকোলেট ছোট মেয়েটাকে দিলাম।"

"তাতে তিনি ঠাস ক'রে তোমার গালে দুটো চড় লাগিয়ে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন?"

"মোটেই না। তাতে তার মুখ চোখে এমন একটা রঙিন আভা এল যার মত মনোরম কিছু জগতে হ'তে পারে না। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে এমন একটা তীব্র আনন্দ প্রকাশ ক'রে ফেললে যে, আমার হৃদয় তাথেই তাথেই ক'রে নৃত্য ক'রে উঠল। আমি তার পর তার সঙ্গে কথা কইলাম। খানিকটা দূর তার সঙ্গে হেঁটে বেড়ালাম। তার পর সে মৃদু হাস্যে সমস্ত মুখ আলোকিত ক'রে বললে, 'এখন পালাই'। 'যাচ্ছি, যাই, চললাম,' এসব বাজে কথা নয়,—'পালাই'! সব কথাই তার এমনি কাব্যময়।"

"বুঝলাম। আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু থেমে গেলে কেন? চল না, বেড়াতে বেড়াতেই শুনব সব।"

নিখিলেশ সেইখানে এসে একটা লাইট পোস্টের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বললে, "না ভাই, আমি আর যাব না, এখানেই আমি থাকব।"

"এখানে, এই পথের মাঝখানে? এখানে তোমার কি কাজ?"

"আছে ভাই, তুমি যাও এখন, পরে দেখা হবে।"

"কিন্তু তুমিই বা থামলে কেন, আর আমিই বা যাব কেন? ব্যাপারখানা খুলেই বল না।"

"না, না,—বলব, পরে বলব, এখন নয়, এখন তুমি যাও," ব'লে নিখিলেশ প্রমোদকে রীতিমত ঠেলতে লাগল।

"উঁহু, পাদমেকং ন গচ্ছামি। তোমার মানসিক অবস্থা সুস্থ মনে হচ্ছে না, তোমাকে একলা ফেলে যাওয়া বন্ধুত্বের—"

"একমাত্র কর্তব্য। যাও, যাও বলছি—দেখছ না আসছে!" বলতে বলতে নিখিলেশ হঠাৎ স্থির হয়ে সারা চোখ মুখ একটা স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত ক'রে ঠিক ফোটো তোলবার মত ক'রে দাঁড়িয়ে গেল।

তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে প্রমোদ দেখতে পেলে একটি মেয়ে অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

ছোটখাটো মেয়েটি, দেখে মনে হয় না চোদ্দর বেশী বয়স। রূপ তার আছে, আর সে রূপ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। চলছে সে এমনভাবে যেন চেষ্টা করে সে রূপের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে সকল পুরুষকে ধাক্কা মেরে বলছে—দেখ্, ওরে দেখ্!

নিখিলেশকে দেখে সে ফিক ক'রে হেসে ফেললে। তার পর সে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একটা নৃত্য তুলে ছুটে চলল। প্রমোদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে নিখিলেশ তার পিছু গিয়ে ঢুকল একটা দোকানে।

প্রমোদ সে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে চেয়ে দেখলে। মেয়েটি দোকানদারের সঙ্গে কত কথা কইলে, বারে বারে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিখিলেশ ছবির মত এক মুখ হাসি নিয়ে সুধু হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। মেয়েটি কিনলে, টফি, চকোলেট, রিবন, সেফটিপিন আর একটা ক্রীম। নিখিলেশও দোকানে তার অস্তিত্বের সাফাই স্বরূপে তিন গজ রিবন কিনে ফেললে।

মেয়েটির জিনিসপত্র যখন বাঁধা হচ্ছে তখন নিখিলেশ তার রিবনের গোছা তার ভিতর দিলে। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

দোকান থেকে বেরিয়ে নিখিলেশ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ লেকে যাবেন না?"

মেয়েটি বললে, "না আজ সিনেমায় যাচ্ছি।" বলে ছুটতে ছুটতে, যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল।

পরে জানা গেছে যে প্রায় বিকেলে মেয়েটি এই দোকানে কিছু না কিছু কিনতে আসে। সেই সন্ধান পেয়ে আজ হপ্তা দুই থেকে নিখিলেশ সারা বিকেল রোজ তার প্রতীক্ষায় এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে তার যে কৌতূহলই থাকুক, তা মেটাবার জন্য প্রমোদ আজ অপেক্ষা করল না, সে বেগে পথ চলতে লাগল—নিশ্চয়ই তার নিজের কোনও জরুরী প্রয়োজনে। কিন্তু গেল সে, মেয়েটি যে পথ দিয়ে গেল ঠিক সেই পথেই।

মেয়েটির নাম যখন সবাই জানতেই পারবেন তখন এখানেই বলে রাখলে কোনও হানি নেই যে তার নাম প্রহেলিকা।

[৩]

সারা বিকেল ও সন্ধ্যা প্রমোদ বিনা প্রয়োজনে লক্ষ্যহীন-ভাবে ভবানীপুর ও বালিগঞ্জের নানা পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।—থামল সে বার বার শুধু এক-একটা ছবিঘরের সামনে। প্রত্যেক সিনেমার সামনে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

যখন হেঁটে হেঁটে শ্রান্ত হয়ে সে নিজের এবং জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হল, তখন সে দেখতে পেলে যে সে এসে পড়েছে সাদার্ন অ্যাভিনিউএর একটা অপেক্ষাকৃত জন-বিরল স্থানে, আর তার সামনে আছে একটা ছোট্ট দোকান, তার নাম 'সরোবর রেস্টুরাণ্ট'। তার মাঝখানে একখানা ছোট টেবিলে বসে একটা লোক চা খাচ্ছে আর পাশে একটা লোহার উননে আর একজন একটা অমলেট ভাজছে। প্রমোদের মনে হল, এক পেয়ালা চা খেলে মন্দ হয় না।

দোকানে ঢুকে টেবিলে বসে সে চাএর হুকুম করল। একটু পরেই সে শুনতে পেল—

"প্রমোদ যে! কলকাতায় কবে এলে? কি করছ? কলালক্ষ্মীর কাঁচকলা প্রসাদ সাধনা না আর কিছু?"

চেয়ে দেখলে একটু আড়ালে ইজিচেয়ারে অর্ধশয়নে বাঁড়ুজ্যে।

সে অযথা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে, "বাঁড়ুজ্যে যে। তুমি এখানে?"

"আর কি করি ভাই! তোমরা সবাই বললে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তাই বাণিজ্যই করছি।"

"বেশ বেশ, তা বাণিজ্য চলছে ভাল? লাভ হচ্ছে দোকানে?"

হেসে বাঁড়ুজ্যে বললে, "বাণিজ্য বেশ চলছে, কিন্তু দোকানে লাভ হচ্ছে না।"

"তবে আর বেশ চলছে কি করে?"

"বেশ চলছে বাণিজ্য, দোকান নয়। বুঝতে পারছ না নিশ্চয়ই। কথাটা খুলে বলি। ভাবছ এটা আমার দোকান? তা নয়। দোকান পটলার, আমি তার উপর বাণিজ্য করে সুধু দু পয়সা রোজগার করছি। এ দোকানের টাকা দিয়েছে আমাদের পটলা; চেন তো তাকে?

সে একটা চাকরি পেয়েছে, দশটা থেকে সাতটা পর্যন্ত কাজ, মাইনে পঁচিশ টাকা। কিন্তু প্রসপেক্ট আছে। সে বলে সরকারী চাকরি, এতে একবার ঢুকতে পারলে কোথায় গিয়ে যে এর শেষ তার ঠিকানা নেই। আজ যাকে দেখছ চাপরাসী কি কেরানী, পঁচিশ বছর পরে কেবল প্রমোশন পেয়ে পেয়ে দেখবে তার মাইনে হয়েছে দু হাজার টাকা, কলকাতায় তিন-খানা বাড়ি কিনে বসে আছে। আপাতত অবিশ্যি তার বরাদ্দ প্রতি দু বছরে পাঁচ টাকা করে বৃদ্ধি, কিন্তু তবু এই প্রসপেক্ট সে ছাড়তে পারলে না। চাকরি পাবার আগে সে এ দোকানটা খুলেছিল। চাকরি পেতে সে আমাকে এখানে বসিয়ে গেল। বেশ ভাল ব্যবস্থা; টাকা তার, লোকসান হয় তার, কাজ করে ওই চক্রবর্তী, আমি সুধু বসে থাকি। মাসে পঁচিশ টাকা পাই, মাইনের টাকা পেলেই পটলা সেটা আমাকে দিয়ে যায়। আর খাওয়া দাওয়া যা খুশি খেলেই হল। আর যদি কোনও মতে লাভ দাঁড়ায়, তারও ভাগ পাব। আমার এটা খাঁটি বাণিজ্য, অর্থাৎ পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাওয়া সে বেশ চলছে। দোকান পটলার, সেটা তেমন ভাল চলছে না।"

তার নিজের কথা বলে বাঁড়ুজ্যে বললে, "সে থাক গে, তুমি কি করছ?"

"এখন কাঁচকলাই, কিন্তু প্রসপেক্ট আছে। 'বিবিবক্তার' সম্পাদক মশায় আমার একখানা উপন্যাস ছাপবেন বলে ন মাস হল আশ্বাস দিচ্ছেন, অবশ্য বিনা পারিশ্রমিক। তা ছাড়া ভাবছি, একটা মনিহারী দোকান করব।"

"মনিহারী!—সে তো তোমার নয়, নিখিলেশের—"

"সে এখন মনোহারী চালাচ্ছে, আমিই মনিহারী করব ঠিক করেছি। খাসা ব্যবসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, টফি চকোলেট রিবন সেফটি পিন ক্রীম (একয়টা নাম প্রমোদ সেই বিকেল থেকে অনবরতই আবৃত্তি করছিল), আর ধর, এই পাউডার স্নো তরল আলতা দাঁতের পেস্ট চিঠির কাগজ কালি কলম পেন্সিল কত কিছু রাখা যাবে যার খদ্দের হবেই। কত রকম লোক আসবে, জানাজানি হবে রাজ্যের লোকের সঙ্গে।"

এমনি করে নানা ছন্দে এমন প্রবলভাবে প্রমোদ মনিহারী দোকানের পক্ষে ওকালতি করতে লাগল, আর তার ভিতর ক্রমে এতখানি কবিত্ব ছড়িয়ে দিলে যে বাঁড়ুজ্যে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যে কোনও কথা কইলে না তাতে প্রমোদের কোনও অসুবিধা হল না, বরং বিনা বাধায় সে তার বক্তব্য ফলাও করে প্রকাশ করতে লাগল, আর কথা বলতে বলতে মনিহারী দোকানের আরও নূতন নূতন রস ও মাধুর্য আবিষ্কার করে তা তার কবির ভাষায় প্রকাশ করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর যখন সে নিতান্তই থেমে গেল, তখন বাঁড়ুজ্যে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বললে, "ও বাবা! কাগজ পেন্সিল ছুঁচ সুতো বিক্রির ব্যবসাতে যে এত কাব্য আছে কে জানত।"

"সুধু কাগজ পেন্সিল নয়, টফি চকোলেট রিবন সেফটি-পিন ক্রীম,—" এ ফর্দটা তার সুধু মুখস্থ হয় নি, একেবারে এতটা ঠোঁটস্থ হয়েছিল যে সামান্য নাড়া পেলেই সবটা একে-বারে পার্বত্য নির্ঝরের মত ঝরঝর করে বেরিয়ে আসছিল।

বাঁড়ুজ্যে চোখ আধখানা বুজে বললে, "টফি রিবন ক্রীম—"

"চকোলেট সেফটিপিন" প্রমোদ যোগ করে দিলে।

"হাঁ হাঁ চকোলেট সেফটিপিন—ভুলে যাচ্ছিলাম—এক কথায় রমনীরঞ্জনের কারবার, এতে রস থাকবার কথা বটে।"

'ঠাকুরঘরে কে?', এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই ঠাকুরঘরে যে কলা খাচ্ছে সে শোনে যেন কলা খাওয়ার বিষয়েই প্রশ্ন হচ্ছে, তাই সে নিজের কথায় ধরা পড়ে যায়। প্রমোদের তেমনি মনে হল যে, বাঁড়ুজ্যে এ কথা বলে ইঙ্গিত করছে যে এ মনিহারী দোকানের হঠাৎ সংকল্প কোনও নারীর মনোহরণের আয়োজন। সে তাই বলে বসল, "কি যে বল! রমণীরঞ্জনের কথা আসে কিসে? তুমি যে ভাবছ মেয়েদের আকর্ষণ করবার জন্য এ কারবার সে কথা একেবারে অমূলক।"

বাঁড়ুজ্যে এবার উঠে বসল। স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "এতক্ষণে বুঝলাম, আগে ভাবি নি। জানতে পারি কি, কোন্ সৌভাগ্যবতীর রঞ্জনের জন্য এ আয়োজন?"

প্রমোদ বললে, "Bosh!" কিন্তু তার মুখ চোখের ভাবটা অযথা বিব্রত হয়ে উঠল।

ক্রমে কথাটা প্রকাশ করতেই হল। প্রহেলিকাকে দেখবার পর প্রমোদ তার পিছু নিয়ে তার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। সে দেখতে পেলে যে, প্রহেলিকা যে দোকান থেকে রোজ ওইসব জিনিস নেয় সেটা তার বাড়ি থেকে কতকটা দূরে। অমনি তার মনে হল যে ঠিক তার বাড়ির কাছ বরাবর যদি ওই টফি চকোলেট ইত্যাদির একটা দোকান খোলা যায়, তবে প্রহেলিকা রোজ অত দূর না গিয়ে সেই নতুন দোকানেই যাবে।

তখনই সে সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে নিকটবর্তী একটা বাড়ির মালিকের সঙ্গে তার একটা ঘর ভাড়া করবার জন্য কথাবার্তা কয়ে গেল, আর সিনেমার সন্ধানে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে হিসাব করতে লাগল আসবাব আর মালে কত টাকা লাগবে। বাঁড়ুজ্যে সব কথা শুনে বললে, "তা হলে তোমার কাছে কথাটার অন্য মানে দাঁড়াচ্ছে। যে লক্ষ্মী তোমার বাণিজ্যে বাস করবেন বলে ঠাউরেছ তিনি স্বর্ণময়ী, রত্নময়ী বা মৃণ্ময়ী নন, একেবারে রক্তমাংসময়ী।"

প্রমোদ বললে, "কথাটা মনে হচ্ছে বটে অসম্ভব, কিন্তু হতেও তো পারে। কি বল?"

নিদ্রাহারা

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

দিন মন্দ কাটছিল না। শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে বিশ মাইল দূরে এ জায়গাটি; নাম মাটিগাড়া। শনি মঙ্গলবারে হাট বসে, আশপাশের গ্রাম থেকে সেদিন বহু জন সমাগম হয়। সারাটা দিন এবং সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থানটা কর্মকোলাহলে মুখর থাকে। আমারও এ দুটো দিন কাজের চাপ বড় বেড়ে যায়। বাকী কটা দিন কাজ কম থাকে, সকালে সন্ধ্যায় দু-চারটা বুনোপাখির কলরব ছাড়া মানুষের সাড়া শব্দ বড় একটা কানে আসে না। এখানে তহসিলদারের কাজ করছি আজ চার বছর।

বন্ধু এসেছেন পরশু। তাই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রে কখন বাড়িমুখো হব সেই ভাবনা। এখানে লোকজনের বসতি বড় বিরল, শুধু হাটবারে যা দু-দশ জনের মুখ দেখা যায়। না হয় মুষ্টিমেয় সেই পাহাড়ী প্রতিবেশী নিয়েই দিন কাটে। রাত্রিদিন বন্ধুহীন কাটছিল, এমন সময় ঘরে বন্ধুবরকে পেয়ে কাজে যাবার আগেই বাড়ি ফেরবার কথা ভাবছিলাম।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারলে ফিরে খানিকক্ষণ বন্ধুর সাথে গল্পগুজব করা যাবে, তাই বাড়ির ভিতর চা-এর তাগাদা দিতে এলাম।

—কই তোমার হ'ল? আর কত দেরি করবে?

একটু হেসে অমিয়া উত্তর করলে আমি তো কতক্ষণ হ'ল এ পাট নিয়ে ব'সে আছি, কিন্তু তোমার বন্ধুটি কি ফিরেছেন যে এখন চাএর জল চড়াব?

—কেন ও ঘরে নেই? ঘুম থেকে উঠে কোথাও গেছে নাকি?

—ঘুম দু চোখে থাকলে তো ঘুম থেকে উঠবেন। এ কদিন ধ'রে দেখছি সারারাত ঘুমন না। কাঠের মেজে, উনি জুতো প'রে রাতভর পাইচারি করেন, আমাদের এঘর অবধি সে শব্দ আসে।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম—সত্যি নাকি? কই, আমি তো কোনও রাতে শুনি নি।

—তুমি আর শুনবে কি ক'রে! তোমার কি শুয়ে পড়লে কখনও দুচোখ খোলা থাকে! বাড়িতে ডাকাতি হ'লেও বোধ হয় তোমার ঘুম ভাঙ্গবে না। ভদ্রলোক সারা রাত ধ'রে পাইচারি করেন, আমারও আর দু চোখে পাতা পড়ে না, খোকাকে বুকে ক'রে প'ড়ে থাকি। তার পর চারটে বাজলেই তোমার বন্ধু আর ঘরে থাকেন না, বেরিয়ে পড়েন। এ তো রোজই দেখছি। দেখে এস দেখি তিনি ফিরেছেন কি না।

ঘরে এসে দেখি বন্ধু জামা খুলছেন, বললাম—কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

—না ভাই, এই এখানেই ফাঁকা মাঠে একটু বেড়িয়ে এলাম।

—আচ্ছা, তুমি একটু জিরিয়ে নাও, আমি চা তৈরি করতে ব'লে আসি।

ভেতরে এসে অমিয়াকে বললাম ও বোধ হয় সারাটা দিন একলা প'ড়ে প'ড়ে ঘুময়, রাত্রে আর ঘুম আসবে কোত্থেকে?

—না গো না, দিনেও একটু ঘুময় না। একটা সুটকেস ভরতি বই এনেছেন, দিনে তাই ব'সে ব'সে পড়েন। আচ্ছা, তোমার বন্ধুর কি হয়েছে, একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না।

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল এ সব বিষয়ে মনোযোগ দেবার মত আর সময় নেই। বললাম—বড়লোকের ছেলে, হয়তো খাওয়া শোওয়ার কষ্ট হচ্ছে তাই ঘুমুতে পারছে না; না হয় বাপ-মায়ের সঙ্গে রগারাগি ক'রে এসেছে। যা হয় একটা কিছু অসুবিধা হচ্ছে। নাও এখন চটপট চা-টা তৈরি ক'রে ফেল, বেলা আবার বেড়ে গেল।

রাতে খাওয়ার পর দুজনে দুখানা ইজিচেয়ার পেতে কাঠের বারান্দায় বসেছি। সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝে মাঝে শালগাছে ভরা। হাটবারে এ জায়গাটা জুড়েই হাট বসে; আজ জনপ্রাণিহীন, চারিদিক নিস্তব্ধ। শালগাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে আমাদের পায়ের উপর পড়েছে। নিঃশব্দে প্যাকেটটি আমার হাতে এগিয়ে দিলেন। সেটা হাতে নিয়ে আমি বললাম—আচ্ছা, একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে? অন্তত তোমার কাছ থেকে তা আশা করতে পারি।

—কি বল না, আমার মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস নেই।

—তোমার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

—সে কথা তুমি কেমন ক'রে ঠিক করলে?

—যা করেই জানি না কেন, অস্বীকারের আর উপায় নেই।

—অস্বীকার করব কেন। সত্যই বলছি, তোমার এখানে থাকতে আমার এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না।

তবে অমিয়া যে বলছিল তুমি এ কয়রাত্রি একটুও ঘুমতে পার নি, সারারাত ঘরময় পাইচারি ক'রে কাটাও, সে কি মিথ্যে?

—ভুল বুঝো না ভাই। তোমার এখানে বেশ আছি। ঘুমের কথা তুলো না, শুধু তিন রাত্রি ঘুমই নি ব'লে তোমরা আশ্চর্য হয়ে গেছ, ছ মাসের মধ্যে দিনেরাতে ঘুম কাকে বলে আমি জানি না, একদম ভুলে গেছি। চোখের পাতা বুজলেই দেখি, রাঙা চেলী পরা বউ, সারা গায়ে নতুন গয়না ঝলমল করছে, মুখময় চন্দনের পত্রলেখা, আমার পাশে অঘোরে ঘুময়। তার পর সে চন্দনচিহ্ন মুছে যায়, গয়নাগুলি এ'টে ধরে, ভিজে এলোচুলের রাশ মুখ বুক ভাসিয়ে একাকার ক'রে ফেলে, সে দেহখানা ক্রমশ ফুলতে ফুলতে আমাকে দেওয়াল ঠাসা করতে আসে—আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, আর ঘুমতে পারি না, ঘুম ভেঙে যায়।

* * * * * *

চম্পক বিলের জমিদার-বাড়ি আজ মহা ধুমধাম। জমিদার রাজেন্দ্র রায়ের একমাত্র পুত্র মলয়ের বিবাহ, কুঞ্জনগরের বৃন্দাবন চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে। এ তল্লাটে চম্পক বিলের জমিদারদের খুব দাপট এবং বংশও ওদের বনেদী। চম্পক বিলটি আঁকাবাঁকা পথে প্রায় দশ মাইল জায়গা জুড়ে

আছে, আর তার এপারে ওপারে সব জমিরই মালিক রাজেন্দ্র রায়। আর এরই জন্য এর নাম চম্পক বিলের জমিদারি।

রাজেন্দ্র রায় যেমন রাশভারী তেমনি কৃপণ। কিন্তু সহসা তাঁর যেন একটা বিরাট পরিবর্তন এল। যে গাম্ভীর্যের ও কার্পণ্যের রাশ তিনি এতদিন পরম সন্তর্পণে ধ'রে রেখেছিলেন, আজ পুত্র বিবাহের প্রবল আনন্দ ধারায় সে যেন কোথায় ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

নায়েব নবীন পাত্র কাঁচুমাচু মুখ ক'রে হাত কচলাচ্ছিল।

—কি হে নবীন, অমন করছ কেন? কি বলবে বল না হে।

—আজ্ঞে, ছোটবাবুর কলকাতা থেকে যে সব বন্ধুরা এসেছেন, তাঁরা বলছিলেন—

—কি বলছিলেন?

—বলছিলেন আর কি যে চম্পক বিল দিয়ে যখন বজরা ক'রে বর কনে বাড়ি যাবে তখন সারা পথ বাজি পুড়বে। তবেই তো দশখানা গাঁ জানতে পারবে যে চম্পক বিলের জমিদার বাড়ির বিয়ে।

তামাকের নলে দুটো টান দিয়ে রাজেন্দ্র রায় বললেন—তা বেশ তো। কত খরচ পড়বে, নবীন?

তা ওনারা বলছেন কম ক'রে দু হাজার টাকা তো বটেই।

কম ক'রে কেন? বেশী ক'রেই বাজি পুড়বে। চার হাজার টাকা বাজির জন্যে ধ'রে দিও, বুঝলে?

দীর্ঘকাল চম্পক বিলের জমিদারিতে কাজ ক'রে আসছে নবীন পাত্র কিন্তু এমন কথা কখনও শোনে নি। আশ্চর্য হয়ে বলে—বলেন কি হুজুর, চার-চার হাজার টাকা বাজিতেই পুড়বে?

হ্যাঁ হ্যাঁ নবীন, তাই হবে। আমার একমাত্র সন্তান মলয়, তার বিয়ে, আমার জীবনের এই প্রথম ও শেষ কাজ। কারও মনে আমি ক্ষোভ রাখতে চাই না। সকলের এ দু দিনের আনন্দ আমার মলয় ও বউমার জীবনে যেন চিরস্থায়ী হয়।

পর্দার ওপাশে দুখানা আলতা পরা রাঙা পা দেখা গেল। সচকিত হয়ে নবীন বললে—হুজুর, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

—কে বড় বউ? এস না, এখানে নবীন ছাড়া কেউ নেই, এস।

দেখ তো কী যে বিপদে পড়েছি! তুমি তো বললে ওই কটার মধ্যে একটা হার পছন্দ করতে বউমার মুখ দেখার জন্য। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে আমি কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা রাখি তা-ই ঠিক করতে পাচ্ছি না। এ দুটোর ডিজাইনই আমার চোখে বড় ভাল ঠেকছে।

—এ আর কি বড় বিপদ, বড়বউ? পছন্দ যখন হয়েছে তখন দুটো হারই রেখে দাও।

বড়বউ এটাকে নিছক রসিকতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারলেন না, উত্তর করলেন—কি যে বল কিছু বুঝি না। এত দামী হীরে বসানো হার, দুটো রাখতে যাব কেন?

—রাখলুমই বা, তাতে ক্ষতি কি? নিজের ছেলের বউকে দেবে, দুটো হার দেওয়ার জন্য টাকা তো আর ঘর থেকে চ'লে যাচ্ছে না। তা ছাড়া এ সময় যদি খুশিমত খরচা না করি, তা হ'লে সময় সুযোগ আর কবে হবে?

স্বামীর এমন পরিণতি দেখে গিন্নীর মুখ আনন্দে ভেসে গেল। মনে মনে ভাবলেন, এবার বুঝি মরা গাঙে বান এসেছে।

এত বড় জমিদার বাড়ি, অথচ আজ বোধ হয় তিল ধারণেরও জায়গা নেই। বাড়ি ভ'রে আত্মীয় বান্ধবে গমগম করছে। দূরে দেশ থেকে যে সব আত্মীয়েরা এসেছেন তাঁরা এক-এক খানা ঘর দখল ক'রে আছেন। সদর দরজার দুপাশ থেকে সানাই ক্ষণে ক্ষণে মন ভোলানো সুরে হৃদয় আকুল ক'রে তুলছে।

এত গণ্ডগোল হইচই মলয়ের ভাল লাগে না। সে চিরদিন একটু শান্তিপ্রিয়। চারিদিকের কর্মব্যস্ততার বিপুল স্রোতে সে যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিল; চিলে কোঠায় নিরালায় ব'সে নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছিলো।

আত্মীয় বান্ধবের এই আনন্দ-কোলাহল দু দিন বাদে না হ'ক দশ দিন বাদে থেমে যাবে। তখন এই বিরাট বাড়িখানা শুধু একটি নববধূর চুড়ির রুনুঝুনু শব্দে মুখরিত হবে, একটি রূপবতী বধূ রাঙন ডুরে শাড়ি প'রে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াবে। যৌবনের আগমন দিন থেকে প্রতিদিন তিল তিল ক'রে যে মানসীকে সে রূপ দিয়েছে, এবার সে মূর্তিময়ী হয়ে গৃহলক্ষ্মীরূপে তাদের ঘর আলো করবে। মলয়কে কি এক মুহূর্ত আর স্থির হয় বসতে দেবে?

পা টিপে টিপে পিছন থেকে এসে হয়তো চোখ টিপে ধ'রে বলবে—নিরালায় ব'সে কার কথা ভাবছ গো?

মলয় উত্তর দেবে কানের কাছে মুখ এনে—তোমারই কথা।

অভিমানে মুখ ভার ক'রে বধূ বলবে—তাই বুঝি আমায় একলা ফেলে—

—খোকা, ও খোকা! ব'সে ব'সে কি অত ভাবছিস বল্‌ তো? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম। উঠে আয়, গায়ে হলুদের লগ্ন যে বয়ে যাচ্ছে।

মলয়ের দূর সম্পর্কের এক পিসীমা যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে, বললেন—বউএর আমাদের যত সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! আজ বাদে মলয় কাল বউ নিয়ে আসবে, এখনও বল কিনা 'খোকা'? কেন নাম ধ'রে ডাকতে পার না বউ?

—বিয়ে ক'রে খোকা বউ আনবে, তাই ব'লে আমার কাছেও কি ও বড় হয়ে গেছে দিদি? বউমা তো আমার মেয়ের মতই, তার কাছে ওকে খোকা ব'লে ডাকব তাতে আবার লজ্জা কি। আমার মেয়ে নেই, বউমা এসে আমার সে অভাব পূর্ণ করবে।

চম্পক বিলের জমিদার বাড়ির বাঁধানো ঘাট থেকে বিবাহের বজরাগুলি ছেড়ে দিল। চম্পক বিল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই কুঞ্জনগরের আরম্ভ, কাজেই সারা পথটা নৌকোতেই যেতে হবে।

রৌদ্রধারা ঝলমল করে চম্পক বিলের বুকে। মাকে প্রণাম ক'রে মলয় বজরায় উঠল। পদ্মের দল ভেঙে সারি

মাটির কাগজ

সভ্য মানুষের পক্ষে কাগজ না হলে চলে না। বিজ্ঞানীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে বাজার সরকারের চিরকুট পর্যন্ত আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি পাদক্ষেপে কাগজের প্রয়োজন। কাগজ না থাকলে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠা সম্ভব হ'ত না। এমন নিত্য প্রয়োজনীয় কাগজ যুদ্ধের দরুণ ইদানীং দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হয়, আমাদের চাহিদার তুলনায় তা যৎসামান্য। সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা তো আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশের কথা স্বতন্ত্র। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির উদ্যোগে মাটি থেকে কাগজ প্রস্তুত করবার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মাটি থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা রকমের সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হচ্ছে। বাক্স প্যাকেট প্রভৃতিও ঐ কাগজে প্রস্তুত করা যায়। কাগজ প্রস্তুত করবার জন্য কাঠের মণ্ডের অভাব আর এখন থেকে প্রতিবন্ধক নয়; সংবাদপত্রাদির জন্য যে কাগজ প্রস্তুত হয়েছে, তা দেখতে যেমন সুন্দর, কাজেও তেমনি মজবুত। মাটি থেকে প্রস্তুত কাগজে ছাপা ঝর ঝরে হয়, হাফটোন ব্লক চমৎকার উঠে, জল লাগলে এ কাগজ ভিজে যায় না, জল টেনেও নেয় না। সাধারণ কাগজের চেয়ে মাটির কাগজ দেখতেও মসৃণ; পুরান হলে রংয়ের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না; সুতরাং স্থায়ী রেকর্ড রাখবার কাজে এই কাগজের প্রয়োজন যথেষ্ট রয়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ছাকুনির কাজে এই কাগজ নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। বৈদ্যুতিক কলকব্জা, রেডিও, এ্যারোপ্লেন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত মাইকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বর্তমানে মাটি থেকে প্রস্তুত মোটা কাগজকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাইকার অবস্থায় এনে মাইকার পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে; ফলে কোনরূপ অসুবিধা দেখা যায় নি।

আঙ্গুলের ছাপ

যারা নিরক্ষর, তাদের কাছ থেকে প্রমাণস্বরূপে সইয়ের পরিবর্তে আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এরূপ ব্যবস্থার প্রচলন আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরে গবেষণা ক'রে বলেছেন, মানুষ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকলেও আঙ্গুলের নীচের রেখার পরিবর্তন দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় সব মানুষেরই আঙ্গুলের ছাপ বুঝি এক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের আঙ্গুলের রেখার পরিবর্তন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বা যাঁরা আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষায় বিশারদ, তাঁদের খালি চোখেও ধরা পড়ে। সব দেশেরই সরকারী বিভাগে খোঁজ করলে আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে কিভাবে কত জটিল হত্যাকাণ্ডের নির্ভুল বিচার করা হয়েছে, তার সংবাদ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করেই পরীক্ষকের সহসা কোন মীমাংসায় আসেন না। নির্ভুল বিচারের জন তাঁরা আঙ্গুলের ছাপকে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করেছেন এবং সহজভাবে যাতে সমস্যার সমাধান করা যায় তার সর্ববিধ পন্থা আবিষ্কার করেছেন।

কালি দিয়ে হাতের ছাপ নেওয়াতে অনেক অসুবিধা আছে। সম্প্রতি ফটো তুলে হাতের ছাপ রেখে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এরূপ ব্যবস্থায় কোনরূপ মতভেদ বা সন্দেহজনক অবস্থায় খুব কম সময়েই পড়তে হয়। ফটোতে আঙ্গুলের প্রতিটি রেখা খুব স্পষ্ট উঠে।

জিরাফের পিঠে বেড়ান

হাতী বড় হ'লেও তার পিঠে চ'ড়ে বেশ বেড়ান যায়। কিন্তু জিরাফের পিঠে চ'ড়ে বেড়ানর অসুবিধা অনেক। প্রথমত, জিরাফের লম্বা গলা দেখেই রীতিমত ভয় করে, তার উপর পিঠের গঠন এমন ঢালু যে, আরাম করে বসে

জিরাফের পিঠে চড়ে বেড়ান

বেড়ান চলে না। হাতী, ঘোড়া, গরুকে যেমন পোষ মানান যায় জিরাফকে সেভাবে পারা যায় না। খুব কদাচিৎ এরা পোষ মানে। ছবিতে যে জিরাফটিকে দেখছেন তার নাম বাকসেট। বাসস্থান সুদান। বাকসেটকে ছোট অবস্থা থেকে পোষ মানান হয়েছে। এখন সে বেশ বড় হয়েছে। লম্বায় বেড়েছে ১৪ ফিট। বাড়ির ছেলেরা এই পোষা জিরাফের পিঠে চ'ড়ে দিব্বি বেড়িয়ে বেড়ায়। জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক সুদানে বেড়াতে গিয়ে এই জিরাফের ছবি তুলে এনেছেন। তিনি লিখেছেন, যখন জিরাফটিকে হাতে ক'রে খাবার দিচ্ছিলাম, তখন লক্ষ্য করলাম, জিরাফের চোখ দু'টি

বিষাদে পূর্ণ হয়ে আসছে। আমার দেওয়া খাবার খেতে খেতে তার চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা আমার হাতে পড়তে লাগল।'

কাচের উপর সোনার গিলটি

কাচের গহনার উপর আজকাল সোনার গিলটি করবার সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। মেয়েরাও এই ধরণের সোনার গহনা দেখে সহজে আসল ব্যাপার বুঝতে পারে না। এই নকল গহনা শরীরের উপর কোন দাগ বা অন্য কোন ক্ষতি করে না।

আমাদের দেশে অনেক রকম নকল গহনার আমদানী হলেও আমরা যার কথা বলছি, তার এখনও আবির্ভাব হয় নি। বিলাতী কাগজে দেখলাম, নকলের মধ্যে এই গিলটি গহনাই নাকি সর্বশ্রেষ্ঠ।

ছেলেদের হবি

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনেক রকমের হবি আছে। আমরা ভাবি, কোন কিছুর হবি বুঝি কেবল ছোট ছেলে-মেয়েদেরই। সন্ধান নিলে অনেক বুড়ো-বুড়ীদেরও পাওয়া যাবে। একবার মাথায় সখ ঢুকলে সহজে ছাড়া যায় না; বুড়ো বয়স পর্যন্ত থেকে যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ডাক-টিকিট, চকোলেটের ভেতরের ছবি, দেশলাইয়ের বিচিত্র খোল, খ্যাতনামা লোকের হাতের লেখা এমনি আরও কত জিনিষ সংগ্রহের সখ নিয়ে পৃথিবীর ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সকলেই মেতে আছে। সখ মিটাতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে, এমন কি, হত্যাকাণ্ডের মধ্যে শেষ মীমাংসা হয়েছে, আদালতের সাহায্য নিতে হয়েছে।

ছেলেদের সখে উৎসাহ দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, হার্ট-ফোর্ডের ক্যাপিটেল সিটি লাম্বার কোং ছোট ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রতি শুক্রবার প্রচুর পরিমাণে বিনামূল্যে কাঠ সরবরাহ করে। শহর এবং চারিপাশের ছেলেমেয়েরা দলে দলে কারখানায় হাজির হয়, আর সামর্থমত কাঠের গাড়িতে ক'রে কাঠ বোঝাই ক'রে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কাঠের খেলনা তৈরী করে। কারখানায় ভিতরের বাজে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে কোন বিপদ্‌জনক স্থানে না গিয়ে পড়ে, অথবা যাতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য কোম্পানি থেকে একটি নিয়মপত্র তৈরী করা আছে। সেই কাগজের উপর সই লাগিয়ে কারখানার মধ্যে ঢুকতে এবং বেরতে হয়। কাগজের উপর সমস্ত কারখানাটার নক্সা আঁকা আছে। রাস্তা হারিয়ে যাবার অথবা অন্য কোন বিপদ্‌জনক স্থানে গিয়ে পড়ার কোন ভয় নেই। কাগজের একপাশে ছেলেমেয়েদের জন্যে কতকগুলি নিয়ম ছাপা আছে, সেগুলি পালন করা তাদের একান্ত আবশ্যক। ছেলেদের উৎসাহিত করতে কোম্পানি থেকে মূল্যবান পুরস্কার দেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিনেমা অথবা ফুটবলের মাঠে টিকিট কাটতে গিয়ে আমরা যেভাবে শরীর ক্ষতবিক্ষত করি, এখানের ছেলেমেয়ে-দের ভীড় তার থেকে চতুর্গুণ বেশী হ'য়েও কোন দুর্ঘটনার সৃষ্টি করে না। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ছে[লেদের] কাজে নিয়মানুবর্তিতা দেখে বিশেষ খুশী হয়েছেন, তাঁদের সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

খুদে উইলি দুটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করছে। উইলির শরীরের ওজ[ন] ৫১১ পাউণ্ড, লম্বায় ৮ ফিট ৭ ইঞ্চি, বয়স মাত্র ১৭। উইলির জুতোর সাইজ ২২ ইঞ্চি

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

দিল্লিতে পৌঁছিয়া বিভাসবাবু হাঁক-ডাক করিয়া কুলি ডাকিলেন। কুলির সঙ্গে হোটেলের প্রতিনিধিরা চারিদিক হইতে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। তিনি কিন্তু কোনরূপ ইতস্তত না করিয়া একটা হোটেলকে বাছিয়া লইলেন এবং দৈনিক চার টাকা ভাড়ায় একটা ঘর লইবেন জানাইলেন। ট্যাক্সিতে চাপিয়া হোটেলে যাইতে যাইতে পক্ষপাতের কারণটা খুলিয়া বলিলেন, প্রথম যখন দিল্লিতে আসি, তখন এই ব্যাটারা ভয়ানক ঠকিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল। আমিও তার পরের বছর এসে এদের প্রায় দেড়শ' টাকার বিল ক'রে সরে পড়েছিলুম। সেইজন্যেই এবার যাচ্ছি আবার—বেচারাদের কিছু পাওয়া উচিত নয় কি?

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু এবার যদি সেবারের টাকা চেয়ে বসে?

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিভাসবাবু কহিলেন, তারপর বছর সাতেক কেটেছে, সে এতদিনে তামাদি হ'য়ে গেছে!

দিল্লির সর্বপ্রধান বাজার চাঁদনী চকের উপরেই হোটেল। রাস্তার দিকে বাথরুম শুদ্ধ প্রকাণ্ড একটা ঘর বিভাসবাবুকে দেওয়া হইল। তাহারই মধ্যে দুটি খাট, একটিতে বিভাসবাবু থাকিবেন ও একটি অমলের। আলো, পাখা শুদ্ধ দৈনিক চার টাকা ভাড়া—আহারাদি স্বতন্ত্র।

বিভাসবাবু স্নানের পর যখন পোষাকের বাক্স খুলিলেন তখন অমল রীতিমত বিস্মিত হইল। বহুমূল্যে শালের চোগা-চাপকান, দামী সাহেব বাড়ির শুট হইতে আরম্ভ করিয়া গরদের ধুতি-পাঞ্জাবী পর্যন্ত সবই তাহাতে ছিল। ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট কোনও ধারণা নাই সত্য কথা, কিন্তু সেগুলির মূল্য যে কম নয় একথাটা সেদিকে একবার মাত্র চাহিলেই বোঝা যায়।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া একটা সাহেবি পোষাক পরিলেন। তারপর কতকগুলি ছাপানো আবেদনপত্র বাহির করিয়া ছোট্ট একটি চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ভরিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আবেদনপত্র বিশেষ কিছুই নয়, বিভাসবাবুর স্কুল যেখানে, সেখানে একটি গির্জা প্রস্তুত করা বিশেষ দরকার এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে মাত্র।

ঘণ্টা হিসাবে একটা গাড়ী ঠিক করিয়া বিভাসবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, তুমি এখন ঘণ্টা দু-তিন বিশ্রাম কর নয়ত ঘুরে ফিরে শহরটা দেখে এস; আমি সেই বেলা একটা নাগাদ ফিরব।

অমল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্যন্ত নামিয়া আসিল। এবং বিস্ময়ে দেখিল যে তিনি গাড়িতে বসিয়া পকেট হইতে পূর্বদিনকার গীতাটি বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে পড়িতে চলিলেন, গির্জা নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে!

ইহার পরও অমলের বিশেষ কোনও কাজ রহিল না। কোনদিন হয়ত কোথাও চিঠি লিখিয়া পাঠাইবার দরকার হইলে কিম্বা একই সময়ে দুই জায়গায় 'ইনটারভিউ' থাকিলে বিভাসবাবু অমলকে ডাকিতেন; নচেৎ সে সমস্ত সময়টা নিজের ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু একমাস সময় দ্রুত শেষ হইয়া আসিল, অমলের কোনও উপায়ই হইল না।

ম্যাট্রিক-পাশ বাঙালী যুবককে সরকারী অফিসে চাকুরী দেওয়া সাধ্যাতীত, এই কথাই সবিনয়ে সকলে জানাইলেন। অনেকেই পরামর্শ দিলেন, ব্যবসা কর। কিন্তু তাহার মূলধন কোথা হইতে আসিবে এ সন্ধান কেহই দিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন যে, তাঁহারা অল্প-সল্প মূলধন দিয়াও বহুলোককে সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁহাদের ঠকাইয়াছে, সুতরাং—ইত্যাদি! নিউ দিল্লির জনহীন, মরুভূমি তুল্য রাজপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অমল প্রথম বুঝিল কেন তাহার বাবা সামান্য পঁচিশ টাকা বেতনে সারা জীবন কাটাইয়া দিলেন, তবু বড়-কিছু করিবার চেষ্টা করিলেন না।

শেষ পর্যন্ত সে ট্যুইশনের চেষ্টা দেখিল, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। প্রায় প্রত্যেক কেরাণীর গৃহেই দুই-একজন বেকার যুবক আছে যাহারা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স ও ছেলে পড়ানোর দ্বারা সিনেমার খরচা চালাইতে চায়। হয়ত গান জানা থাকিলে (তা হউক্ না কেন তৃতীয় শ্রেণীর রেকর্ডের বেসুরা পুনরাবৃত্তি) হয়ত সুবিধা হইত, কিন্তু সে কথা ভাবিয়া ফল কি?

অমল মনস্থির করিবার পূর্বেই কিন্তু বিভাসবাবুর ফিরিবার সময় হইল। তিনি কোনও দিনই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ফলটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। যাত্রার আগের দিন রাত্রে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হোটেল-ওয়ালাদের বলে দিয়েছি যে আমার সেক্রেটারী আরও দু-চার দিন এখানে থাকবেন, দৈনিক এক টাকায় একটা ঘর দেখে দেবে তাঁকে। এক সপ্তাহের ভাড়া বলে সাতটা টাকাও দিয়েছি, বলেছি বাকী কিছুদিন পরে মনি-অর্ডার ক'রে পাঠাব। সুতরাং মাসখানেক তুমি আরও সময় পাবে; তার আগে তোমাকে এরা উত্যক্ত করবে না। আমার ঠিকানা দিও না, তবে যদি তার মধ্যে কিছু সুবিধা না হয় একদিন স'রে পড়। মালপত্র ত নেই বিশেষ, কোনও অসুবিধা হবে না! ......না, না, ওসব উচিত-অনুচিতের কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, যা বললুম মনে রেখো। আর এই সাহেবটা অনেকদিন ধরে ঘোরাচ্ছে, যদি ডোনেশন কিছু সত্যিই দেয় ত ওটা আদায় করে নিতে পার, ওটা তোমারই রইল।

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, যদি কোনদিকে কিছু না হয়, আর, আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়ত আমার কাছে যেতে পার, মাস্টারী একটা দিতে পারব। থাকবার বাসা পাবে

আর খাবার মত যৎসামান্য কিছু পাবে। মাইনে আমি দিই না—লিখিয়ে নিই বটে ত্রিশ চল্লিশ টাকা! যাক্—

অমল কথা কহিল না, সে এই একমাসেও মানুষটিকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। লোকটির কথা-বার্তায় এবং কোন কোন কার্যে ঘোরতর পাষন্ড বলিয়াই বোধ হয়—অথচ তাহাকে যে তিনি দয়াই করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই! শুধু তাহাকেই নয়, রাস্তার ভিখারীদের কখনও বিমুখ করেন নাই, সে নিজেই তাহার সাক্ষী আছে। এই একমাসে লোকটা কি অজস্র মিথ্যা কথাই না বলিয়াছে, কতরকম মিথ্যা বলিয়া, কতরকম মুখোস পরিয়া লোকটা অজস্র অর্থ লুটিয়াছে, তাহার বোধ করি হিসাব-নিকাশ নাই; কোন-রকম ন্যায় অন্যায়ের বোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু অমলের মনে হইল, কোথায় ইহার কিছু একটা গোলমাল আছে, যাহা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে এখনও—

যাক্ গে সে সব কথা—

বহুদিনের হতাশায় অমলের মন যেন কেমন পাথর হইয়া গিয়াছে, কোন কথাই সে তলাইয়া ভাবিতে পারে না, অধিকাংশ সময় সে ভাবেই না কোন কিছু, মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অলস স্বপ্নের জাল বুনিয়া যায়। বাল্য-কালের কথা এলোমেলোভাবে মনে পড়ে, জীবনে যে সব আশা ছিল, সেই সব স্বপ্নের কথা মনে হয়—এই মাত্র।

দিল্লিতে আর কিছু সুরাহা হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা সে বুঝিয়াছে, কিন্তু তবু কিই বা করিবে? অভ্যাসের বশে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় বাহির হয় কোনও কোনও দিন কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করে চাকুরী কিম্বা ট্যুইশনের আবেদন জানায়, কোনওদিন এমনই লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন আশা নাই, আশংকাও যেন সে ছাড়িয়া দিয়াছে—

হোটেলের বিল বাড়িতে লাগিল। থাকা এবং খাওয়া—সে বিভাসবাবুর পরামর্শ অনুসারে খাওয়াটাও হোটেলেই চালাইত, দুই টাকার কম হয় না। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ পড়িতে হোটেলওয়ালারা কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িল; তখনও অমল ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই কি করিবে, সেই মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই সহসা এক কান্ড করিয়া বসিল। ভুবনবাবুর দরুন যে টাকাগুলি কাছে ছিল তাহার বিশেষ কিছু খরচা হয় নাই, তাহারই মধ্য হইতে পনরটি টাকা হোটেলের অফিসে জমা দিয়া জানাইল যে দেশে জরুরী চিঠি দিয়াছে টাকার জন্য, দুই-একদিনের মধ্যেই আসিয়া যাইবে। আরও কিছুদিন সময় পাওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু টাকাটা জমা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। এখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা হইল না, আর কোথাও যাইবার পথও যে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল, এই সহজ সত্যটা সে উপলব্ধি করিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল।

সর্বনাশের সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া তাহার মনের জড়তা অনেকখানি কাটিয়া গেল। তারপর সাতটা দিন সে পুনরায় দিল্লির প্রতিটি গলি চাষিয়া ফেলিল। যা হোক্ কিছু কাজ চাই, যত সামান্যই হউক্। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া সপ্তম দিনের দিন যখন সে দুইটি গোটা পাঁচ ছয়টাকা হিসাবের ছেলেপড়ানোর কাজ সংগ্রহ করিতে পারিল তখন হোটেলওয়ালারা রীতিমত রূঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কাজ একটি টিমারপুর ও একটি নিউ দিল্লিতে, অর্থাৎ সকালে বিকালে হাঁটিয়া যাইতেই শুধু ঘন্টা তিনচার সময় বাজে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি ছিল না যদি একমাস আরও কোথাও কাটাইবার উপায় থাকিত। হোটেলওয়ালারা থাকিতে দিবে না, অথচ আর কোথাও বাসা করিয়া থাকিয়া একমাস কাটাইবার মত পয়সা কোথায় হাতে? এক মাসের পর মাহিনা আদায় হইবে, হয়ত আরও দুই চারিদিন পরে। তাহা ছাড়া হোটেলের টাকা মারিয়া দিল্লিতেই যদি সে বাসা লইয়া থাকে, একদিন না একদিন হোটেলওয়ালাদের চোখে পড়িবেই, তাহার পরের অবস্থাটা কল্পনা করিয়া সে ঘামিয়া উঠিল। ভুবনবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া আসা তাহার পক্ষে কতদূর মূর্খতার কাজ হইয়াছে, তাহা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

সেদিন সে অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরিল। ইচ্ছা ছিল যে সকলের অলক্ষ্যে সে কোনমতে ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া থাকিবে, 'আহারাদির নামও করিবে না; কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই ম্যানেজার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিলেন। বোধ করি তাহার অপেক্ষায় এই বাহিরেই কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন, অগত্যা অমলকে আলো জ্বালিতে হইল। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিলেন, কেঁও বাবজী, তারকা জবাব মিলা?

অমল তাহার আগের দিনই বলিয়াছিল যে সে মনিবের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছে, সুতরাং সে ঢোঁক গিলিয়া জবাব দিল, নেহি. ফিন্ কাল এক্ঠো ভেজেঙ্গে—

ম্যানেজারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, কহিলেন, হামকো পাত্তা লিখ্ দিজিয়ে, হাম খুদ্ ভেজ দেঙ্গে কাল—

অমলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে কহিল, আচ্ছা কাল লিখ্ দেঙ্গে!

কিন্তু ম্যানেজার নাছোড়-বান্দা। তিনি কহিলেন, আজ লিখ্ দেনেমে কেয়া হরজা হ্যায়? লিজিয়ে পিন্সিল, কাগজ-ভি হ্যায় হামারা পাস।

বিভাসবাবুর অনুরোধ অমলের মনে পড়িল। যে লোকটা দুদিনের জন্যও তাহার উপকার করিয়াছে, তাহার অপকার করা কিছুতেই উচিত হইবে না। বরং তাহাতে যদি নিজেকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়ত সে-ও ভাল। সে কাগজটা টানিয়া লইয়া মরিয়াভাবে যে ঠিকানাটা পেন্সিলের ডগায় বাহির হইল তাহাই লিখিয়া দিল, তাহার পর ম্যানেজার বিদায় লইলে আলো নিভাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুমের কল্পনা সেদিন একেবারেই দুরাশা। ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া এইমাত্র সে যে মিথ্যা ঠিকানাটি লিখিয়া

দিল, তাহার জবাবদিহি করিবার সময় আসিবে সন্ধ্যার পূর্বেই, যখন হোটেলওয়ালাদের টেলিগ্রামখানি ফিরিয়া আসিবে। তাহার পরে যে লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইবে, সে কথা সে ভাবিতেই পারিল না। হয়ত বা পুলিসেই দিবে। এতদিন যে তাহারা সহ্য করিয়াছে এবং এখনও নিজেদের খরচে তার পাঠাইতে চাহিতেছে, সে শুধু বিভাস-বাবু সম্প্রতি অনেকগুলি টাকা দিয়া গিয়াছেন, সেই কথাটা মনে করিয়াই। কিন্তু তাহার পর? অতি দ্রুত জেল ও হাতকড়ার একটা অস্পষ্ট ছবি তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল। সে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে না পারিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

কাল মধ্যাহ্নের পূর্বেই তাহাকে পলাইতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক। কিন্তু কোন উপায়ের কথাই তাহার মনে পড়িল না। পকেটে কয়েক আনা মাত্র পয়সা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কোথায়ও যাওয়া ত দূরের কথা দুইদিনের বেশী খোরাকী চলে না। যতদিন সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন অবস্থায় তাহাকে কোনদিন পড়িতে হয় নাই।

ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও পথ, কোনও রাস্তা খোলা নাই, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করিতে হইবে—

কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত সে দুই এক পা অগ্রসর হইল। তাহার পাশের ঘরের দুইখানি ঘর পরেই বড় একটা চার টাকাওয়ালা ঘর, সেই ঘরে কোথাকার ছোক্‌রা রাজা আসিয়াছেন আজ দুইদিন, এ সংবাদ সে পূর্বেই পাইয়াছিল। অকস্মাৎ সেই ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ঘরের বারান্দার দিকের এবং ভিতরের দিকের দুটি দরজাই খোলা। নেয়ারের খাটে রাজা বাহাদুর ঘুমাইতেছেন, ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। ঘরে সামান্য যে আলোর আভাষ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার অস্পষ্টতার মধ্যেও পরিষ্কার তাহার নজরে পড়িল রাজাবাহাদুরের কোটটা দুয়ারের পাশেই আনলাতে টাঙানো এবং তাহার বুক পকেটে মনিব্যাগের মত কি একটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আছে।

সহসা অমলের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল; তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। যে চিন্তা তখনও তাহার মাথায় আসে নাই, শুধু মনের মধ্যে আকার ধারণ করিতেছে মাত্র, তাহারই ইঙ্গিতে সে মূর্ছাতুর হইয়া উঠিল। একথা যে কোনওদিন তাহার মনে আসিতে পারে, ইহা সে মুহূর্ত কয়েক পূর্বেও বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং হয়ত দুঃস্বপ্নের মত কয়েক মুহূর্ত পরেও অবিশ্বাস্য হইয়া থাকিবে, কিন্তু এই ক্ষণটিতে অকস্মাৎ সেই অতি হীন প্রবৃত্তিই মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত বিবেক ছাড়াইয়া একটা চিন্তা মনের মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিল যে, আত্মহত্যা ছাড়া আর এই একটিমাত্র পথই খোলা আছে।

মানুষের নিজের জীবনরক্ষায় যে দুর্নিবার ইচ্ছা মানুষের সহজাত, সেই ইচ্ছারই জয় হইল এবং কি করিয়া কোন্ যুক্তিতে তাহার আজীবন শিক্ষা এবং জীবনের বহু পূর্বেকার সঞ্চিত পূর্বপুরুষদের সংস্কারকে সে ঐ অতি অল্পক্ষণ সময়ের মধ্যে জয় করিয়া সত্যসত্যই রাজাবাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল নিঃশব্দ, তস্করগতিতে তাহা আজও তাহার কাছে অবোধ্য হইয়া আছে; তবে সত্যসত্যই সে সেই জামাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের আবহাওয়ায় প্রচুর মদের গন্ধ মদ্যপ গৃহ-স্বামীর গভীর নিদ্রার কথা জানাইয়া দিল। কিন্তু তবু অমলের বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়িতেছিল, হাত কাঁপিতেছিল থর থর করিয়া, সে কোনমতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে একতাড়া নূতন নোট খস্ খস্ করিয়া উঠিল। সে আন্দাজে খান তিন-চার নোট বাহির করিয়া লইয়া মনিব্যাগটা আবার বন্ধ করিয়া জামার পকেটে রাখিয়া দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

সেখান হইতে নিজের ঘরে পেঁাছিতে মনে হইল যেন এক যুগ সময় লাগিল। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নোট ক'খানা হাতের মধ্যে মুঠা করিয়াই সে বিছানায় অর্ধমূর্ছিতভাবে শুইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

নিউ সিনেমায়—'মুসাফির'
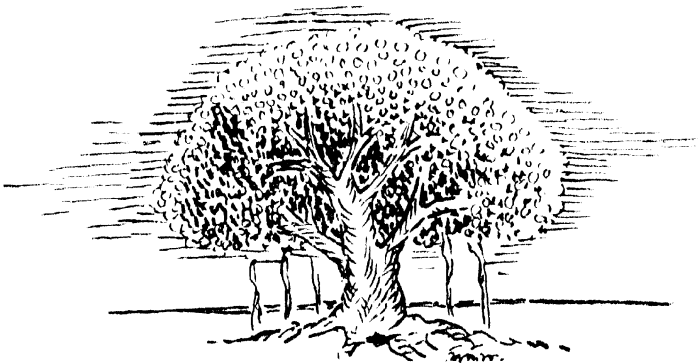
শ্রীরঞ্জিৎ মুভিটোনের চিত্র। পরিচালক—চতুর্ভুজ এ দোশী। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন চার্লি, খুরসিদ, বাসন্তী, ঈশ্বরলাল প্রভৃতি।

এক যে ছিল রাজা। রাজা অরবিন্দকুমার। সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। বিলাতে খুশীমতো চলাফেরার বাধা ছিল না, এখানে নিয়মকানুন, কায়দাদুরস্তের গণ্ডী পার হইবার জো নাই। কোন্ পোষাক পরিতে হইবে, কোন্ পথ দিয়া কিভাবে চলিতে হইবে এবং যে পথ দিয়া রাজকুমারী আসিতেছেন, সে পথে তাহার সহিত কিভাবে কথা বলিতে হইবে, দেওয়ানজী তাহার নির্দেশ দেন—রাজাকে তাহা মানিয়া চলিতে হয়। অরবিন্দকুমার এই যান্ত্রিক জীবনে হাঁপাইয়া উঠিলেন এবং গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। মুসাফিরের জীবন আরম্ভ হইল। সঙ্গে টাকাকড়ি যাহা ছিল, তাহা এক 'বন্ধু'কে দিয়া ফকির হইলেন। এক কিষাণ পরিবারে দৈবক্রমে আশ্রয় লইলেন। কিষাণ কন্যার সহিত প্রণয় জন্মিল। কিষাণ কন্যার পাণিপ্রার্থী ছিল বনোয়ারী। ইতিমধ্যে অরবিন্দ এক মেলায় মিথ্যা চুরির অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হইলেন। কিষাণ কন্যা রাধার সাহায্যে মুক্তি পাইলেন। বনোয়ারীর বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইল। বনোয়ারী কিষাণ কন্যা রাধার নিকট কারণ জানিতে চাহিলে, রাধা জনশ্রুতি সমর্থন করিল। অরবিন্দকুমারের পথপ্রাপ্ত বন্ধু সোভাগ রাজার বিপুল অর্থ পাইয়া গুজব রটাইয়া দিল যে, এক লাখপতি প্রকৃত প্রেম খুঁজিয়া ফিরিতেছেন, সেজন্য পুরস্কারস্বরূপ পাঁচ লাখ টাকা দিতে রাজী আছেন। বনোয়ারী বুঝিল রাধার লক্ষ্যটা টাকা—অরবিন্দ নহে। এই আলোচনা শুনিয়া অরবিন্দ সেই গৃহ ও গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। পুলিশ তখন 'ল্যাংড়া লাখপতিকে' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দুনিয়ার যত খোঁড়া একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া উঠিল। সোভাগের কপালে দুর্ভোগ্য দেখা দিল। বনোয়ারীর হাতে মার খাইয়া অরবিন্দ শাসাইয়াছিলেন, তাহাকে তিনি চিনাইয়া দিবেন। রাস্তাঘাটে নিজেকে অরবিন্দকুমার বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল, কেহ চেনে না। সোভাগ চিনিল—কিন্তু উভয়েরই হাজতবাস হইল। কিষাণ কন্যার অভিসার শুরু হইল, দূতী সোনি। এই সোনির বুদ্ধিচাতুর্যে দেওয়ানজী প্রকৃত ঘটনা জানিলেন এবং অরবিন্দকুমার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাধা রাণী হইল।

ইহাই গল্প বা কাহিনী। এই অসম্ভব ও গ্রন্থিহীন 'সিনারিও'টির জন্য ভাবিয়া পাইতেছি না, কাহাকে দায়ী করিব—লেখক, পরিচালক অথবা সম্পাদক?

অরবিন্দকুমার বিলাত-ফেরৎ। সেখানে যাহা খুশী করিয়াছেন। বিলাত গেলে চক্ষু খোলে এবং বুদ্ধি ধারালো হয় জানিতাম। অবশ্য রাজার বুদ্ধি সম্বন্ধে মেরি করেলী তাঁর 'টেম্পোরাল পাওয়ার' ও হল কেইন তাঁর 'ইটরনাল সিটি'তে বড় ভাল ইঙ্গিত করেন নাই এবং তাঁহারাও বুদ্ধিমান রাজাকে রাজপ্রাসাদ ছাড়াইয়াছেন। কিন্তু মুসাফির লেখকের কল্যাণে বিলাত-ফেরৎ রাজার যে হাল হইয়াছে, তাহা অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, লেখক, পরিচালক অথবা সম্পাদক কাহারও জেলখানা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরূপ ধারণাই নাই। জেলখানা যে স্টুডিও নহে, এ কথা বোধ হয় তাঁহারা জানেন না। মনুষ্যচরিত্র ও অবস্থিতি সম্বন্ধে এতখানি অজ্ঞতা লইয়া না যায় গল্প লেখা, না করা যায় সিনারিওর পরিচালনা। তাই যে গল্প শ্লেষাত্মক হইতে চাহিয়াছিল, তাহা অক্ষম ব্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে। সেজন্য নায়কের ভূমিকায় চার্লির অতি-অভিনয় অনেকাংশে দায়ী।

চার্লি চরিত্রটির উদ্দেশ্য ছিল গতানুগতিক নিয়মাবদ্ধ রাজকীয় আচরণের উপর শ্লেষ। সাধারণের দৃষ্টিতে চার্লির চেহারা রাজকীয় নহে, এরূপ ভূমিকায় অভিনেতা হিসাবে তাঁহার দাঁতগুলি মস্ত অন্তরায়। তাহাও চলিত। কিন্তু রাজার ভূমিকাটিকে প্রথম হইতেই তিনি যেন একটি ক্লাউনের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আগাগোড়া তাহারই সূত্র টানিয়া চলিয়াছেন; অথচ ইহারই মধ্যে ব্যর্থতা, ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব ও সর্বোপরি "মনের মত মানুষ" খুঁজিবার যে কঠিন প্রয়াস তাঁহার অভিনয়ে অকস্মাৎ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা রীতিমত বেসুরো ঠেকে। এই রসবোধের অভাব ও রসভঙ্গের দরুণ অরবিন্দকুমার একটি 'চরিত্র'রূপে দানা বাঁধিতে পারে নাই। রাজকীয় আবহাওয়ায় অস্থির হইয়া যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে বা "তাঁহার হৃদয়ই কেবল চাহে", এমন দয়িতার সন্ধানে যে বাহির হয়, তাহার মনকে সুস্থ ও বলিষ্ঠই বলিতে হয়। রাজৈশ্বর্যের পর গ্রামৈশ্বর্যের আকর্ষণ আছে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন মানাইয়া লইতে অসীম ক্ষমতার প্রয়োজন এবং যে অনায়াসে টাকাকড়ি দরিদ্র বন্ধুর জন্য উৎসর্গ করিতে পারে, সে দুর্বলচেতা নহে। কিন্তু এই সবল মানুষটি যখন নিতান্ত অক্ষমের মতো বনোয়ারীকে শাসাইয়া নাগরিকদের কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া এবং পরিশেষে পাগলের মতো রাজকর্মচারীদের কাছে আপনাকে অরবিন্দ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল, তখন সকল রস শুকাইয়া করুণ রসের অবতারণা করে। রাজত্ব পাইয়া আত্মস্থাপনার প্রতিষ্ঠাটি অদ্ভুত ঠেকে। চার্লি যদি লেখক ও পরিচালককে যথাযথ মানিয়া চলিয়া থাকেন, তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই; কিন্তু আমাদের সেরূপ মনে হয় না। অভিনয়ের গড়পড়তা টানিতে গেলে চার্লি আতিশয্যের দোষে ব্যর্থ হইয়াছেন। খাপছাড়া ঘটনা সমাবেশও ইহার জন্য দায়ী। ঘটনা যেন গল্পের পরিপুষ্টির জন্য আসে নাই, আসিয়াছে পরিচালনার জন্য। তাই গল্প গ্রন্থিহীন। অরবিন্দকুমার চরিত্রহীন। নতুবা চার্লির স্বচ্ছন্দগতি ও আচরণ অভিনয় জগতে বড় বেশী নাই।

রাধার ভূমিকায় খুরশীদের অভিনয় মন্দ হয় নাই, কিন্তু আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে সোনির ভূমিকায় বাসন্তীর অভিনয়। চঞ্চল প্রজাপতির মতো তাহার মধুচ্ছন্দ ও সহজভঙ্গি। সমস্ত চিত্রটিতে সোনির ভূমিকাটিই একটি রিলিফ—অথচ আখ্যানের দিক হইতে ইহার প্রয়োজন ও ব্যাপ্তি সামানাই। এই সুকণ্ঠী কেবল যে রাধা ও কিষাণের মধ্যে দূতিয়ালি করিয়াছে এমন নহে, দর্শক ও চিত্রের মধ্যেও একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রাখিয়া চলিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলি অরবিন্দ বা কিষাণের চরিত্র স্ফুরণের জন্য মাত্র, অভিনয়ও অনুল্লেখযোগ্য।

চিত্রটি পরিচালনার দোষে দুষ্ট হইয়াছে। গ্রামের চিত্রগুলি ভাল, কিন্তু কিষাণ কন্যারা কি পোষাকী কাপড়ে গৃহস্থালী করে? এবং সাহেবী পোষাক পরা কোন ব্যক্তি নবাগত হইলে, পশ্চিমের গ্রাম্য মেয়েরাই সর্বপ্রথম সহজ আহ্বান জানায় কি না, আমাদের পক্ষে বলা শক্ত। কেননা, চিত্রটির আগাগোড়া একটা বিস্ময়কর প্রস্তুতি ও সচকিতভাব চোখে পড়ে। যেখানে ভিড় জমাইতে হইবে, সেখানে যেন উইঙসের পাশে সকলেই ভিড় জমাইবার জন্যে তৈয়ারী—হুইসিল শুনিলেই ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। সোনি যতবার গান গাহিতে শুরু করিয়াছে, ততবারই এরূপ ঘটিয়াছে। বিশৃঙ্খল ঘটনা সমাবেশের মতোই এই ভিড়গুলি ঠেলিয়া আনা হইয়াছে।

চরিত্রগুলির রিলিফ যেমন সোনি, এই বাঙ্ময় চিত্রের রিলিফ তেমনি সংগীত-গুলি। সুরশিল্পী জ্ঞান দত্তকে ধন্যবাদ, গানগুলি কেবল যে সুগীত হইয়াছে এমন নহে, সুরগুলিও সুমিস্ট হইয়াছে। নৃত্যশিক্ষায় শিব দত্তকেও তাঁহার প্রাপ্য কৃতিত্ব দিতে আমাদের কুণ্ঠা নাই। কিন্তু চিত্রকে অপেরায় পরিণত করিবার এই যে ঝোঁক, তাহা বিপজ্জনক; কেননা, যে কোন ছলে ও ফাঁকে সংগীত দিতে গিয়া আখ্যানভাগ দুর্বল হইয়া পড়ে। শ্রোতাকে আকৃষ্ট করিবার এই ব্যাবসায়ী বুদ্ধি না ছাড়িলে, শিল্প ও কলা হিসাবে চিত্রোন্নতি অসম্ভব।

সম্পাদনার প্রশংসা করা কষ্ট, অনেক জায়গায়ই কাঁচি ছাঁটাই সম্ভব; কোন কোন জায়গায় দৃশ্যের নিরর্থক দৈর্ঘ্যে ক্লান্তি আসে। চিত্রগ্রহণ সর্বত্র সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয় নাই। গ্রাম্য বালিকাদের সমবেত নৃত্যের উন্মোচনটি চমৎকার হইয়াছে। শব্দগ্রহণে অসঙ্গতি কম। কিন্তু সেটিং ও সাজসজ্জা অনেক স্থলেই রুক্ষ ও অমসৃণ ঠেকে।

তবুও বলিতে হয়, এ চিত্র জনপ্রিয় হইবে; বাঙালী সমাজে আদৃত না হইলেও "দেহাৎ" অঞ্চলে ইহা আকর্ষণের বস্তু হইবে সন্দেহ নাই। অন্তত অত্যন্ত প্রচলিত সস্তা প্রেমাভিনয়ের চিত্র হইতে যে এখানি অনেকাংশে পৃথক দ্বিধাহীনচিত্তে একথা বলা চলে।

ওয়াদিয়া মুভিটোনের 'রাজনর্তকী' দ্বিভাষিক চিত্রে সাধনা বসু ও তাঁহার দলবল।

উপন্যাস ও চিত্রনাট্য

"The story of the film is a sad one", অতি দুঃখেই কোন এক বিখ্যাত সমালোচক এই কথা কয়টি লিখিয়াছেন। লিখিবার কারণও যে তাঁর অনেক!

* * * * *

ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের কেহ কেহ আজকাল বেশ একটু গরমসুরে চলচ্চিত্রের পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারদের আক্রমণ সুরু করিয়াছেন। অভিযোগ—এই অর্বাচীন সিনেমা টেকনিসিয়ানরা লেখকদের মানসীদের নাককান কাটিয়া সুর্পনখা সাজাইয়া ছবি করিতেছেন। আপন মানসীদের পরের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়াই তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাইতে হবে?

* * * * *

জবাবে পরিচালক ও চিত্রনাট্যকাররা কৈফিয়ৎ দেন—যদি তাই মনে কর—মানসীদের নিজের ঘরেই রাখো!

প্রডিউসার তাহাতে বাধা দিয়া বলেন—রঙ্গমঞ্চের, সহস্র রজনী সুগৌরবে 'অভিনীত' নাটক এবং 'এতো এতো সংস্করণ হয়েছে এমন উপন্যাস—সেরা লিখিয়ের সেরা লেখা—ছবির জন্য না কিনে কি পারা যায়? ছবি বাজারে বেরুলে অর্দ্ধেক বুকিং তো হয়—লেখকদের নাম শুনে!

* * * * *

যেমন নাটকের উপন্যাসের—তেমনি চলচ্চিত্রেরও প্রধান ভিত্তি গল্প। চলচ্চিত্রের গল্পকে সাজান চলচ্চিত্র নাট্যকার। পরিচালনা করেন পরিচালক। যে কোন ছোট বড় গল্প উপন্যাস নাটককেই তাঁহারা চলচ্চিত্র নাট্যের আকারে আনিতে বাধ্য।

* * * * *

এই অবস্থায় তাঁহাদের উপায় কি? তাঁহারা যদি অতি ভাল নাটক উপন্যাসকেও ছবির জন্য সাজাইতে গিয়া দেখেন—সেগুলো যত ভালই হোক—পিছনে ছবি নাই। যদি দেখেন সারাটা বই-ই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণী সংলাপে ও ব্যাখ্যায় ভরাট! বইখানা হুবহু অবলম্বন (adoptation)এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রূপান্তরিত (re-write) না করিলে ছবি তুলিবার উপযুক্ত হইতেছে না!

* * * * *

যখন কোনো বই উপন্যাস হইতে নাটকে পরিণত হয় তখন

কি গল্পকেও অনেক সময়ে পরিবর্তন করিতে হয় না? এমন কি ঔপন্যাসিক যখন নিজের উপন্যাসকেই নিজে নাটকে সাজান—তখনও কি হুবহু এক গল্প রাখিতে পারেন?

বিসর্জন—রাজর্ষী; প্রায়শ্চিত্ত—বৌঠাকুরাণীর হাট; দত্তা—বিজয়া!—হুবহু মিল আছে কি?

* * * * * *

না। টেকনিকের ও গল্পের রূপান্তর ঘটিয়াছে। তবে চলচ্চিত্রকার যদি প্রয়োজনবোধে কোন উপন্যাসের অথবা নাটকের রূপান্তর ঘটান তাহা লইয়া 'গেল রাজ্য গেল মান' বলিয়া আকাশ ফাটাইবার কি প্রয়োজন আছে?

উপন্যাসের অভিব্যক্তি ও নাটকের অভিব্যক্তি যেমন এক ধরণের নয়, তেমনি চলচ্চিত্রের অভিব্যক্তির ধরণও সম্পূর্ণ আলাদা।

* * * * * *

যে গল্পটি উপন্যাসে অথবা নাটকে জমিয়াছে সেটি যে ছবিতেও জমিবে তাহা হলপ করিয়া বলা চলে না; আর উপন্যাসে অথবা নাটকে যে ভাবে প্রকাশ করায় কাহিনী জমিয়াছে বলিয়া আমরা উৎফুল্ল হইয়া উঠি, সেইভাবে চলচ্চিত্র প্রকাশ করিলে তাহার দফা তো রফা হইবে।

উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সাথে নাটকের বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই এক হয় না। তেমনি অনেক সময় চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর সাথে উপন্যাস বা নাটকের বিষয়বস্তুর মিল নাও থাকিতে পারে এমন অনেক গল্প আছে যা শুধু চলচ্চিত্রেই সুপরিস্ফুট হয়।

* * * * * *

ষ্টেজের জন্য যদি বিশেষভাবে নাটক লেখা চলিতে পারে তবে চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষভাবে চলচ্চিত্র নাট্যের উপযোগী গল্প লেখাও চলিতে পারে!

* * * * * *

ভাল নাট্যকার—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাল ঔপন্যাসিক নহেন। তেমনি ভাল ঔপন্যাসিকের পক্ষে ভাল চলচ্চিত্র নাটক লিখিয়ে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী!

"It requires a distinctly different type of mind, entirely free of literary traditions, possessing the vision of a painter, and the constructive and methodical ability of an architect, a mind that responds to *rhythm*, and is able to weave images into a rhythmic whole—a cultured mind but not, primarily, a literary one."

তবে তথাকথিত ঔপন্যাসিক অথবা নাট্যকারদের দ্বারা বড়জোর ছবির সংলাপ হয়তো লেখানো চলিতে পারে। অবশ্য তাহার জন্য ছবির সংলাপ ও উপন্যাস নাটকের সংলাপের পার্থক্যটুকু তাঁহাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

—জনৈক টেক্‌নিশিয়ান।

গ্লোবে নৃত্যগীতানুষ্ঠান

আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর, বুধবার রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময় গ্লোব থিয়েটারে বীরভূম জেলায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাতে কাননবালা, সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, পাহাড়ী, শচীন দেববর্মণ, মিস জাহানারা বেগম কজ্জন, মলিনা প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পিগণের গান এবং শ্রীমতী লীলা দেশাই ও অন্যান্য নৃত্য-শিল্পীদের নৃত্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাননবালাকে সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে এবং নিউ থিয়েটার্সের অর্কেষ্ট্রা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

আসনের মূল্যঃ—১০্, ৫্, ৩্, ২্ এবং ১্ টাকা। চিত্রা, নিউ সিনেমা ও পূর্ণ থিয়েটারে অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাইবে।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়

গত ১৫ই নভেম্বর, শুক্রবার ষ্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে শ্যামপুকুর সান্ধ্য মিলনীর সভ্যবৃন্দ কর্তৃক 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকখানি অভিনীত হইয়াছে। বভ্রুবাহন, ইরা, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। অপরাপর অভিনেতাদের সুঅভিনয়ও নাটকখানির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। মিলনীর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে অভিনয়টি সফল হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

স্বয়ম্বরচরিতম্—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত। মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। মূল্য দেড় টাকা।

একখানি ছোট গল্পের বই। গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সবগুলিই ছোট এবং অধিকসংখ্যকই গল্প—যদিও ছোট গল্পের সংজ্ঞার সেই সংকীর্ণতাটা বর্তমান সাহিত্য বিচারে প্রায় অচল হতে চলেছে। মানুষের বেশীর ভাগই তারা সমাজের নিম্নস্থ মানুষ—সহজ ও স্পষ্ট কতকগুলি অনুভূতি নিয়ে এই গল্পগুলি লেখা এবং কে না জানে যে, ঘটনার চেয়ে অনুভূতিটাই ছোট গল্পের প্রাণ। এই সারল্য গল্পের ভাষাতেও প্রকাশমান—যার জন্য, বলতে বাধা নেই, ভাষাটা মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুর্বল ও নিস্তেজ বলে মনে হয়েছে। সবচেয়ে প্রশংসা করবার যা তা হচ্ছে লেখকের দৃষ্টিশক্তি। তা যেমন বিস্তৃত, তেমনি অন্তঃপ্রেরিত। কত লোককে যে তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং কাউকেই যে কাছে পেয়ে এড়িয়ে যান নি, দৃষ্টির সেই বদান্যতা আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। প্রায় সবগুলি চরিত্রই জীবিত এবং সবচেয়ে আরামের, মোটেই আমাদের অপরিচিত নয়। পারঘাটার মোটর বাস ষ্ট্যাণ্ডটা চোখের উপরে যেন আঁকা আছে। মোট কথা, গজেন্দ্রবাবু যে এত ভাল লেখেন তার বিচিত্র পরিচয় পেয়ে আনন্দিত ও আশান্বিত হলাম

মহারাজের কথা—স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্টীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ স্বামী অভেদানন্দ তর্ক বা কথোপকথনচ্ছলে শিষ্য বা উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা বা মীমাংসা করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই অনুলিপি। শ্রীম—কথিত 'রামকৃষ্ণ কথামৃত', শরচ্চন্দ্র, গ্রথিত 'স্বামিশিষ্য সংবাদ', কুলদানন্দের 'সদ্‌গুরু প্রসঙ্গ' কেবল যে শিষ্যদের আকৃষ্ট করিয়াছে এমন নহে, এই শ্রেণীর গ্রন্থের সাহিত্য ও ইতিহাস হিসাবেও একটা বিশেষ স্থান আছে। কোন প্রতিষ্ঠান একটা বিশেষ আদর্শের প্রতীক; প্রথমে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিলেও ইহার একটা সমষ্টিরূপ বিকশিত হইতে থাকে এবং সেই প্রতিষ্ঠান বিশেষ একটা যুগের চিহ্ন স্বরূপ ঐতিহাসিককে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। যিনি এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার কার্যকলাপ ও আচরণের ইতিহাসই যুগবাণী। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানির সম্পাদক ইহার এরূপ কোন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক মূল্যের জন্য ব্যস্ত নহেন। তিনি স্বয়ং অভেদানন্দজীর একজন গুণমুগ্ধ শিষ্য। স্বভাবতই তিনি মনে করেন, যে-বাণী তাঁহার জীবনপথ আলোকিত করিয়াছে, তাহা অপরের ক্ষেত্রেও আলোর আশীর্বাণী লইয়া আসুক। আমরা তাঁহার 'অবতরণিকা' এবং বিষয়বস্তুর সমাবেশ পারিপাট্যে এই দরদ, নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসুর পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কুসংস্কার-মুক্ত স্বামীজীর দর্শনতত্ত্বের এই সহজ ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট নির্দেশ জিজ্ঞাসুর পক্ষে দুর্লভ সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ছাপা ও বাঁধাই রুচিসম্মত।

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৪ই তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে প্রায় এক মাস বাকী, কিন্তু এখন হইতেই এই প্রতিযোগিতা লইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রীড়ামোদিগণ নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন্ দলে কে খেলিবেন এবং কোন্ দলের কে অধিনায়ক হইবেন, ইহাই হইল তাঁহাদের আলোচনার বিষয়; কারণ এই প্রতিযোগিতায় কোন দলে অংশ গ্রহণের অধিকার লাভ অর্থে ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় বিশিষ্টতা অর্জন করা। সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভিন্ন দল নির্বাচিত হইয়া থাকে, কিছুদিন পূর্বে এজন্য কেহ কেহ এইরূপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে বলিয়া তীব্রভাবে মন্তব্য করেন। ফলে অনেক ক্রীড়ামোদীর ধারণা হয়, হয়তো বা এই প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু বর্তমানে সেইরূপ আশংকা করিবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা এই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তীব্র মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বর্তমানে স্বীকার করিয়াছেন যে, এইরূপ ক্রীড়ানুষ্ঠানের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

এই বৎসরের খেলার তালিকা

এই বৎসরের প্রতিযোগিতার তালিকা নিম্নরূপে গঠিত হইয়াছে:—

হিন্দু দল প্রথমেই অবশিষ্ট দলের সহিত খেলিবে। এই দুই দলের বিজয়ীর সহিত ইউরোপীয় দলের খেলা হইবে। যে দল বিজয়ী হইবে, তাহারাই ফাইন্যালে খেলিবে। অপরদিকে সেমি ফাইন্যালে মুসলীম দলের সহিত পাশী দল খেলিবে এবং উভয় দলের বিজয়ী ফাইন্যালে খেলিবে। ফাইন্যাল খেলা বড়দিনের ছুটির সময় অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতা যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন ইহার নাম ছিল ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতা। তখন এই প্রতিযোগিতায় হিন্দু, পাশী ও ইউরোপীয়ান দল খেলিত। তাহারপর কয়েক বৎসর পরে মুসলীম দল ইহাতে যোগদান করে। তখন ইহার নাম হয় কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা। এই কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ভারতীয় ক্রিশ্চিয়ান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়গণকে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা হয়। ফলে উক্ত দুই সম্প্রদায় কর্তৃক গঠিত দলের নাম দেওয়া হয় অবশিষ্ট দল এবং প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্তন করিয়া পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা করা হয়। সুতরাং এই পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা গত তিন বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বৎসর চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান হইবে। এই পর্যন্ত কোন্ কোন্ দল এই পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান পাইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৯৩৭-৩৮ সালে মুসলীম দল
১৯৩৮-৩৯ সালে মুসলীম দল
১৯৩৯-৪০ সালে হিন্দু দল

এই বৎসরের প্রতিযোগিতা

এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলিবেন, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে অধিকাংশ ক্রীড়ামোদীর ধারণা যে, এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় সকল দলেই অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় খেলিবেন। প্রবীণ, অভিজ্ঞ নামজাদা অনেক খেলোয়াড়কেই খেলিতে দেখা যাইবে না। হিন্দু দলের প্রবীণ খেলোয়াড় মেজর সি কে নাইডু খেলিবেন না। কারণ তিনি এই বৎসর কোন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলায় যোগদান করেন নাই। তবে তিনি যে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদও এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু যতদূর অনুমান হয়, তিনি খেলিবেন না। মুসলীম দলেও উজীর আলী বা নাজির আলী খেলিবেন না। পাশী দলেও অনুরূপ প্রবীণ খেলোয়াড় কাহাকেও খেলিতে দেখা যাইবে না। প্রবীণ, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতায় যোগদান না করিলেও, এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে অভাব হইবে, তাহা মনে হয় না। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, বরোদা প্রভৃতি স্থানের অনেক তরুণ খেলোয়াড় সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে উক্তরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ হইয়াছে। তবে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের মাঠের অবস্থা যেরূপ তাহাতে কোন দল খুব অধিক রাণ তুলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাটসম্যানদের অপেক্ষা বোলারগণই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন।

হিন্দু দল

হিন্দু দলের অধিনায়ক অধ্যাপক দেওধর হইবেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তিনি এই বৎসর যে কয়েকটি খেলায় যোগদান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশতেই শতাধিক রাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে তিনি ২৪৬ রাণ করিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বিশিষ্ট খেলায় যোগদান করিবার মত তাঁহার সামর্থ আছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু দলে অমর সিংহের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। তাঁহার স্থান পূরণ করিবার মত কোন খেলোয়াড়ই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। হিন্দু দলে ঠিক কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলিবেন বলা কঠিন, তবে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে হিন্দু দল নির্বাচিত হইবে বলিয়া মনে হয়:— অধ্যাপক দেওধর, বিজয় মার্চেণ্ট, বিনু মানকড়, অমরনাথ, সি এস নাইডু, ডি ডি হিন্দেলকার, সি ভি ভাণ্ডারকার, এস ডব্লিউ সোহনী, কে এম রঙ্গনেকার, পৃথিরাজ, এইচ অধিকারী, ডি আর পুরী, এস ব্যানার্জি, নওমল, শান্তিলাল গান্ধী।

মুসলীম

মুসলীম দলের অধিনায়ক কে হইবেন বলা কঠিন। তবে এস এম কাদ্রি ও জাহাঙ্গীর খাঁর মধ্যে একজন হইবেন বলিয়া ধারণা। এই দল বেশ শক্তিশালী হইবে। অনেক তরুণ খেলোয়াড়কে খেলিতে দেখা যাইবে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে মুসলীম দল নির্বাচিত হইবে বলিয়া মনে হয়। এস এম কাদ্রি, মুস্তাক আলী, জাহাঙ্গীর খাঁ, সৈয়দ আমেদ, আফতাব আমেদ, এম সালাউদ্দিন, ইউ চিপ্পা, এ এ হাকিম, কে সি ইব্রাহিম, আব্দুল খলিল (মানভাদার), ওয়াই শেখ, আমীর ইলাহি, উযাক আমেদ, মহম্মদ নিশার, নাথুদা ও এস হেফাতুল্লা।

পাশী দল

পাশী দল শক্তিশালী করিয়া গঠনের চেষ্টা হইতেছে। গত বৎসর এই দল হিন্দু দলকে অল্পের জন্য পরাজিত করিতে পারে নাই। পি ই পালিয়া অথবা বি ই কাপাদিয়া এই দলের অধিনায়ক হইবেন। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে দল গঠিত হইতে পারে:—ই বি আইবরা, এম জে মোবেদ, জে এন ভায়া, কে কে তারাপোর, পি ই পালিয়া, এস এম পলসিটিয়া, এইচ প্রিণ্টার, জে লইয়ার, কে মেহেরমজী ও কে এম বাহাদুর।

ইউরোপীয় দল

ইউরোপীয় দল কোন্ কোন্ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হইবে ইহা বলা খুবই কঠিন। যুদ্ধের জন্য সকল ইউরোপীয়ানই একরূপ ব্যস্ত। জে ই টিউ, ভাণ্ডারগাট ও লংফিল্ডের নাম অধিনায়ক তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে লংফিল্ডের অধিনায়ক হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ ইতিপূর্বে তিনি কয়েকবার এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণের এই দলে খেলিবার সম্ভাবনা আছে:—ক্যাপ্টেন আর এ্যাসলী, আর এ ডেনী, আর সি সামারহেজ, সি ব্রাউন, টি সি লংফিল্ড প্রভৃতি।

অবশিষ্ট দল

অবশিষ্ট দল কিরূপভাবে গঠিত হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। পি ডি মেলো এই দলের অধিনায়কত্ব করিবেন না, ইহা একরূপ ঠিক। এইচ হ্যারিসকে এই দলের অধিনায়কত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সম্ভবত তিনি অধিনায়ক হইবেন। এই দলে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণের খেলিবার সম্ভাবনা আছে:—ই আলেকজেণ্ডার, ই শ, এম কোহেন, ভি এস হাজারী, পি ভাস্কর, এ সি পেরেরা, ও গনশেলভ, পি ডি সার্কা, জয়বিক্রম, সি রিচার্ডস প্রভৃতি।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে চারিটি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যে সকল প্রদেশের খেলা অনুষ্ঠিত হইতে দেরি, তাহারা সকলেই, বাঙলা প্রদেশ ছাড়া, নিজ নিজ প্রদেশের সম্মান রক্ষার জন্য সাধ্যমত শক্তিশালী দল গঠন করিয়া অনুশীলন খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। বাঙলা প্রদেশের দল যে কবে নির্বাচিত হইবে এবং কবে যে অনুশীলন খেলা হইবে, তাহার কোনই ঠিক নাই। বাঙলা প্রদেশের ক্রিকেট পরিচালকগণ ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি না করার ফলেই যে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এই পর্যন্ত যে চারিটি খেলার শেষ মীমাংসা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র দলের খেলাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই খেলায় বহু নূতন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই খেলায় যে সকল নূতন রেকর্ড হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) মহারাষ্ট্র দল প্রথম ইনিংসে ৬৭৫ রাণ করে। ইতিপূর্বে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কোন দল এক ইনিংসে এত অধিক রাণ করিতে পারে নাই। ১৯৩৯ সালে মহারাষ্ট্র দলই বরোদার বিরুদ্ধে ৬৫১ রাণ করিয়া রেকর্ড করিয়াছিল।

(২) দুই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হইতে সাড়ে চারিদিন লাগিয়াছে। ইতিপূর্বে ভারতীয় কোন খেলায় দুইটি দলের প্রথম ইনিংস শেষ হইতে এত অধিক সময় লাগে নাই। অষ্ট্রেলিয়া বা ইংল্যাণ্ডেও এইরূপ কোন খেলায় হইয়াছে কি না সন্দেহ।

(৩) দুই দলের প্রথম ইনিংসে মোট ১৩২৫ রাণ হইয়াছে। ইহাও নূতন ভারতীয় রেকর্ড।

(৪) বোম্বাই দল এই খেলায় মাত্র ২৫ রাণে মহারাষ্ট্র দলের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু পরাজয় বরণের মধ্যেও তাঁহারা নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দলের ৬৭৫ রাণের বিরুদ্ধে খেলা আরম্ভ করিয়া ৬৫০ রাণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই।

খেলোয়াড়গণের কৃতিত্ব

বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র দলের খেলায় কয়েকজন খেলোয়া ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে নাম করিতে হয় বোম্বাই দলের রঙ্গনেকার। ইনি খেলার তৃতী দিনে খেলা আরম্ভ করিয়া পঞ্চম দিনে ২০২ রাণ করিবার প আউট হন। খারাপ মাঠে পরাজয়ের মুখে এইরূপ অধিক রা করা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি ৩৬৫ মিনিট খেলি ২২টি বাউণ্ডারী করেন। ইহার পরেই প্রবীণ খেলোয়া অধ্যাপক দেওধরের নাম করিতে হয়। ইনি ৫০ বৎসর বয়ে বোম্বাই দলের বোলারদের অপদস্থ করিয়া ২৪৬ রাণ করিয়াছেন এত অধিক বয়সে এইরূপ অধিক রাণ সংগ্রহ করা কৃতিত্বে পরিচায়ক। ইহার পর তরুণ খেলোয়াড় সোহনীর নাম উল্লেখ যোগ্য। এই খেলোয়াড়টি মহারাষ্ট্র দলের প্রথমে খেলিয়া ১২০ রাণ করিয়াছেন। সর্বশেষে এই খেলায় ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শ করিয়াছেন বোম্বাই দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট ১০৯ রাণ করিয়া। একটি খেলায় এতগুলি শতাধিক ও দ্বিশতাধিক রাণ রণজি প্রতিযোগিতার কোন খেলায় অনুষ্ঠিত হয় নাই। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংস:—৬৭৫ রাণ (অধ্যাপক দেওধর ২৪৬ সোহনী ১২০, ভাণ্ডারকার ৯১, হাজারী ৭৬, ঊষাক আমেদ ৫৪ হাকিম ১৫৩ রাণে ৩টি, হাভেওয়ালা ১৩৭ রাণে ৩টি, ইব্রাহিম ৪৭ রাণে ১টি, মার্চেণ্ট ৫২ রাণে ১টি, রঙ্গনেকার ৫৮ রাণে ১টি উইকেট পান)

বোম্বাই প্রথম ইনিংস:—৬৫০ রাণ (কেনী ৬৭, মার্চেণ্ট ১০৯, রঙ্গনেকার ২০২, ইব্রাহিম ৬১, কাদ্রি ৪৫, খোট ৫৫, নায়েক ৩৪; পট্টবর্ধন ৭২ রাণে ২টি, সোহনী ১৩৯ রাণে ২টি, হাজারী ১৩২ রাণে ৩টি, সারভাতে ১৫৪ রাণে ২টি মোহনী ৯ রাণে ১টি উইকেট পান।)

(মহারাষ্ট্র দল খেলায় ২৫ রাণে বিজয়ী হয়।)

নবনগর বনাম পশ্চিম ভারত রাজ্য দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এই খেলায় পশ্চিম ভারত রাজ্য দল দুই উইকেটে নবনগর দলকে পরাজিত করিয়াছে। কোন দলই উচ্চাঙ্গের খেলা খেলিতে পারে নাই। খেলার ফলাফল:—

নবনগর প্রথম ইনিংস:—১১৭ রাণ (কোলা ৩৫, ব্যানার্জি ১৩; নেহালচাঁদ ৩৮ রাণে ৭টি উইকেট পান)

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল প্রথম ইনিংস:—৫৭ রাণ (এস ব্যানার্জি ২৬ রাণে ৫টি, বিনু মানকড় ১৮ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

নবনগর দ্বিতীয় ইনিংস:—১৪০ রাণ (আকবর খাঁ ৩০ রাণে ৩টি, নেহালচাঁদ ৪৬ রাণে ৩টি ও পৃথিরাজ ৩৬ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল দ্বিতীয় ইনিংস:—৮ উইকেটে ২০৫ রাণ। (পৃথিরাজ ৫৩, ঠাকুর সাহেব ৪২; মুবারক আলী ৮৬ রাণে ৪টি, এস ব্যানার্জি ৪২ রাণে ২টি ও ওঝা ১৫ রাণে ২টি উইকেট পান।)

(পশ্চিম ভারত রাজ্য দল দুই উইকেটে বিজয়ী।)

দক্ষিণ পাঞ্জাব বনাম দিল্লী

দক্ষিণ পাঞ্জাব দল এই খেলায় এক ইনিংস ও ৫৮ রাণে বিজয়ী হইয়াছে। দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের পক্ষে অমরনাথ ১০৫ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আমীর ইলাহি ও পাতিয়ালা মহারাজার বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়।
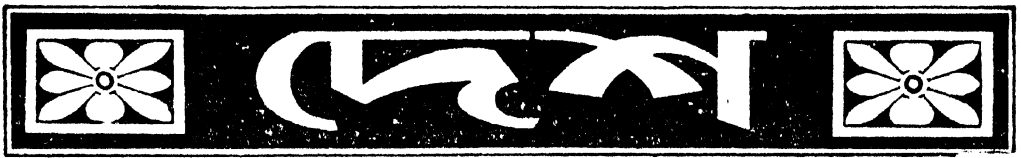
৮ম বর্ষ । ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 30th November, 1940. [৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মারাত্মক উক্তি—

বিলাতের পার্লামেণ্টে এবং পার্লামেণ্টের বাহিরে ইংরেজী ভাষাভাষীদের একটি সভায় ভারত সচিব আমেরি সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, সে বক্তৃতার সমালোচনা করা ধৈর্যে আমাদের কুলাইতেছে না। ভারত সচিবের বক্তৃতা শুধু আপত্তিকর বলিলে তাহার ঠিক মূল্য দেওয়া হয় না; সে বক্তৃতা আপত্তিকর, উত্তেজক, অনিষ্টকর এবং মারাত্মক। ভারতবাসীরা গণতন্ত্র লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, ইংরেজীওয়ালাদিগকে এই উক্তি শুনাইয়া আমেরি সাহেব আপ্যায়িত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের উপর সমস্ত অপরাধ চাপাইয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেস এখনই পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, এইজন্য আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লীতে গৃহীত প্রস্তাবে প্রকৃত প্রস্তাবে এখনই পূর্ণ স্বাধীনতা চায় নাই, চাহিয়াছিল কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টে দায়িত্বশীলতার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেটি হইবে না। কর্তারা খুঁটি ধরিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের যুক্তি বড় অপূর্ব! আমেরিসাহেব বলিতেছেন, "কংগ্রেস যাহা চাহিয়াছিল, তাহা মানিয়া লইলে প্রদেশসমূহে যেসব মন্ত্রীরা কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্তৃত্বেরই আবার প্রতিষ্ঠা ঘটে; তাহার অর্থ শুধু বিনাসর্তে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়াই নয়, কংগ্রেস-শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, অন্য কথায় কংগ্রেসী ধারায় পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।" কর্তাদের খোঁচা লাগে কোথায়, ভারত সচিবের এই উক্তি হইতেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। গণতন্ত্র ভাল, সবই ভাল, কিন্তু কংগ্রেস যদি গণতন্ত্র চাহে, তবে সে গণতন্ত্রের অধিকার ভারতবাসীদিগকে দেওয়া হইবে না। অন্য কথায়, ভারতবাসীদের প্রকৃত কোন রাজনীতিক অধিকার আমরা দিব না, ইহাই হইল ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অন্তরের কথা। কংগ্রেসের উপর দোষ চাপাইয়া নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম রাখিবার এই কৌশলটি ভারত সচিবের বক্তৃতায় স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস যে বড় অপরাধী, ইহা নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে পরিস্ফুট করিবার কৌশলও তাঁহাদের জানা আছে। মুসলিম লীগের দলকে তোয়াজ করাই হইল এই কৌশল। ভারত সচিব নিজে আগু বাড়াইয়া বলিয়াছেন—"কোন মুসলমান নেতাই এইরূপ অবস্থায় শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন না।" আমেরিসাহেবের কানে কানে এই কথাটি বলিয়া দিল কে? তিনি কিভাবে স্থির করিয়া লইলেন যে, মুসলিম লীগের মার্কামারা মুসলমান ছাড়া গোটা ভারতে আর মুসলান নেতা নাই। কংগ্রেসের যিনি সভাপতি, তিনি নিজে একজন মুসলমান, ভারত সচিব কি তাহা অবগত নহেন? ভারতের বহুসংখ্যক মুসলমান নেতা যে জিন্নাসাহেবের ধ্বজাধারী নহেন, বিভিন্ন স্থানের আজাদ মুসলিম সম্মেলন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত হইতেও কি আমেরি সাহেব সে জ্ঞান লাভ করেন নাই? চোখ বুজিয়া থাকিলেই সূর্যকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা জানি, আমেরিসাহেবও জানেন সবই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের দাবীকে বড় করিয়া দেখা, জিন্নার দলের পিঠ চাপড়ান, ইহাই হইতেছে তাঁহার বক্তৃতার সবচেয়ে মারাত্মকতা। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সংরক্ষণশীল, উদার-নীতিক, শ্রমজীবী সকল দলের মাতব্বরদের মতিগতিই আমরা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছি। ইঁহাদের কাহার মহিমা কত বেশী, বুঝিয়া উঠা কঠিন; কিন্তু নির্লজ্জতা

এবং ধৃষ্টতায় আমেরিসাহেবের বক্তৃতা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

জিন্নার জিগীর—

ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ লোকের মত কংগ্রেসের মত, কিন্তু মুসলিম লীগ কংগ্রেসের বিরোধী; সুতরাং সকলের মুরুব্বী আমরা, আমরা কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইতে পারি না, ইহার ফলে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন না চলে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা না পায়, দোষ পরম উদার ইংরাজ রাজনীতিকদের নহে, দোষ কংগ্রেসের। কারণ, কেন কংগ্রেস মুসলিম লীগ-ওয়ালাদের দাবী মানিয়া লয় না, ভারত সচিবের বক্তৃতার ইহাই হইতেছে নির্গলিতার্থ; এমন বক্তৃতা যে জিন্না সাহেবের বুকে জোর বাড়াইবে ইহা বলাই বাহুল্য। জিন্না সাহেব এই জোর জাহির করিয়াছেন গত ২০শে নভেম্বর দিল্লীর মুসলমান ছাত্র সঙ্ঘের বক্তৃতায়। তিনি কংগ্রেসকে শাসাইয়া বলিয়াছেন, পাকিস্থানই মুসলমানদের চরম ও পরম কাম্য। ভারতবর্ষকে ভাগ বাঁটোয়ারা না করিয়া আমরা ছাড়িব না; কংগ্রেস যদি এখনও মুসলমানদিগকে ভারতের এক-চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী না হয়, তবে পরে আরও বেশী দিতে হইবে। আমরা বুঝি, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন থাকিত, তবে এই জিন্নাই জিগীরের পরিণতি দাঁড়াইত কি? কিন্তু জিন্না সাহেব জানেন যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্বাধীনে, এবং ব্রিটিশ প্রভুদের জোরেই তাঁহার জোর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পিঠচাপড়ানী পাইয়া জিন্না সাহেব যতই জিগীর ছাড়ুন না কেন, ভারতের স্বাধীনতাকে তিনি দীর্ঘ দিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসিবে, জনাব জিন্নার প্রভু সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগ্রহের জোরে নয়, ভারতের স্বাধীনতাকামীদের সাধনারই প্রভাবে এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, ভারতের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করিবে ভারতের স্বাধীনতাকামী, আত্মোৎসর্গকারী যে সব সন্তান তাহারা ভারতের অঙ্গচ্ছেদকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের অনুগ্রহের বা অনুকম্পার মোহ বিদ্যমান থাকিতেছে, জিন্না সাহেবের জিগীরের জোর ততদিনই। কিন্তু সে মোহ কাটিতে আর বেশী দেরী নাই, জিন্না সাহেব যেন এ সত্য বিস্মৃত না হন।

ভাওয়ালের মামলার যবনিকাপাত—

গত ৯ই অগ্রহায়ণ, সোমবার হাইকোর্ট হইতে ভাওয়ালের মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদত্ত হইয়াছে। হাইকোর্টে বিচারপতি-ত্রয়ের মতভেদে যে গোলযোগ দেখা দিয়াছিল তাহার মীমাংসা হইয়াছে। রাণী বিভাবতীর আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই মামলার সঙ্গে যে বৈচিত্র্য এবং রহস্য জড়িত ছিল তাহাতে পৃথিবীর ইতিহাস এই মামলাকে একটি অভূতপূর্ব বিশেষত্ব দান করিবে। এদেশের ধনী দরিদ্র সর্বশ্রেণীর মধ্যে এই মামলার সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং বিচারের ফলাফল আইনের দিক হইতে যাহাই ঘটুক, একথা বলা বাহুল্য যে, এদেশের জনসাধারণের মত ছিল কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পক্ষে। ইহার কারণ কি? মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, অত্যাচারিত, নির্যাতিত এবং বঞ্চিত বলিয়া লোকের ধারণা হয় যাহার সম্বন্ধে সমষ্টি মানবের সহানুভূতি স্বভাবতই তাহার দিকে থাকে এবং তাহার প্রতিষ্ঠার অনুকূল-ভাবে ঘটনাচক্রের মোড় ফিরে, মানুষ ইহাই চায়। ব্যবহারিক সত্য এবং বিষয়ের রূঢ় বিচারকেও উপেক্ষা করিয়া মানুষের অন্তরে ন্যায়পর এমন একটা প্রবৃত্তি সর্বত্র কাজ করিতেছে। একদিন যিনি ছিলেন প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী, ঘটনাচক্রের গতিতে তিনি হইয়াছিলেন পথের ভিখারী। এই অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কতকগুলি এমন কারণ থাকে যেজন্য মানুষের সহানুভূতি বঞ্চিতের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জনসাধারণ চায় সুবিচার, চায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। ভাওয়ালের মামলায় জনসাধারণের সন্তুষ্টি সেই দিক হইতে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভাওয়ালের মামলার ভিতর দিয়া নির্যাতিত এবং বঞ্চিতের প্রতি এ দেশে সকল শ্রেণীর নর-নারীর অন্তর্নিহিত সদাশয়তা এবং সহানুভূতির যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, সামাজিক এবং রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ন্যায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সেই আগ্রহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে কবে, আমরা সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি।

গ্রামোন্নতির স্বরূপ—

বাঙলা সরকার তাঁহাদের গ্রামোন্নতি পরিকল্পনার প্রশস্তি গাহিয়া সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামোন্নতির কাজ ধীরভাবে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এই ইস্তাহারের মতেও এই অগ্রগতিতে একটু "কিন্তু" আছে। ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃষ্টি বাদলার জন্য কোন কোন জেলায় গ্রামোন্নতির কাজ যতটা ব্যাপকভাবে হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। এই ধরনের সব ইস্তাহার পড়িয়াই যাহারা খুশি, তাহাদের দুঃখ কর্তাদের কৃপায় কোন-দিনই এদেশে নাই; কিন্তু কাজের হিসাব লইতে গেলেই মুস্কিল। ইস্তাহারে বড় বড় কথা পাওয়া যায় বরাবরই; কিন্তু কাজের হিসাব কষিতে গেলে কিছুই দাঁড়ায় না। বর্তমান ইস্তাহারেও সেই বিশেষত্ব বজায় আছে। এত বড় বাঙলা মুল্লুকে সরকারী গ্রামোন্নতি পরিকল্পনার মধ্যে দুই-চারটি পুকুর খোঁড়া, দুই-একটি রাস্তা বাঁধা, জঙ্গল পরিষ্কার, দুই-একটি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং কোথাও

থাও দিন কয়েকের জন্য কয়েক হাত জমির কচুরিপানা পরিষ্কার করা ছাড়া বাঙলাদেশ জুড়িয়া ব্যাপক কোন শৃঙ্খলিত কর্মতালিকা লইয়া ধরা-বাঁধা কাজের পরিচয় কিছু পাওয়া গেল না। আর যে উপায়ে কাজ হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কাজ হইবারও উপায় নাই। এই ধরনের কর্মতালিকা সফল করিতে হইলে বাস্তবিক স্বদেশপ্রেমিক ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী দরকার; কিন্তু সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার উদ্যোক্তা যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গে এই শ্রেণীর কর্মীদের অন্তরের যোগ বিরল; জো-হুজুর এবং নামকেওয়াস্তের দলই তাঁহাদের আশ্রয় এবং অবলম্বন। দেশের জনপ্রিয় নেতাদের সঙ্গে সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার যতদিন পর্যন্ত যোগ না হইবে, ততদিন পর্যন্ত পরিকল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু কল্পনাতেই পর্যবসিত থাকিবে। নির্ভীকচেতা, স্বাধীনতাপ্রিয় দেশসেবক কর্মীদের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের আন্তরিকতার আবহাওয়া এদেশে এখনও আসে নাই। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর মতিগতি ইহার জন্য অনেকটা দায়ী; কিন্তু মূলত দায়ী সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এবং জনমতানুকূল শাসনতন্ত্রের অভাব।

ভারতের শিল্পবাণিজ্য ও যুদ্ধ—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলেন, "এই যুদ্ধের কুফল যতই থাকুক না কেন, যুদ্ধ এই প্রশ্নটিকে বড় করিয়া তুলিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে যদি জাতি হিসাবে দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে এতদিন পর্যন্ত শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে অসহায়ত্ব এবং পরমুখাপেক্ষিতা ছিল, তাহা দূর করিতে হইবে। ভাতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি গভর্নমেণ্টের উপেক্ষা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। যুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিতকাল পরে যে শিল্প-বাণিজ্য কমিশন বসে, সেই কমিশন শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে ভারতবর্ষ যাহাতে স্বাবলম্বী হয়, সেজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেন; কিন্তু ঐ সমস্ত সুপারিশ রিপোর্ট-বহির বিরাট কলেবরের মধ্যেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে আমাদের দেশের বিপুল বয়ন শিল্প এবং অন্যান্য কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য সকল রকমে চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে এতটা দুর্বল না হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এদেশ প্রধান শক্তিস্বরূপ হইত। আমি আশা করি, কর্তারা কিঞ্চিৎ দেরীতে হইলেও এই সত্যকে সম্প্রতি উপলব্ধি করিয়াছেন।" আচার্য রায় যে আশা করিয়াছেন, কর্তারা কতটা সে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এ বিষয়ে এখনও আমাদের সন্দেহ আছে। 'পূর্ব সাম্রাজ্য সম্মেলনের' সিদ্ধান্ত হইতে আমাদের তো ধারণা ইহাই হইয়াছে যে, ভারতবর্ষকে এখনও সাম্রাজ্যের জল বহিবার এবং কাঠ কাটিবার কাজেই লাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষ থাকিবে কাঁচা-মাল যোগাইবার দেশ এবং ভারতবর্ষের কাঁচামাল হইতে শিল্প-বাণিজ্যে টাকা খাটাইয়া বড় হইবে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ; ভারতের নানাদিক হইতে অযোগ্যতার অছিলায় এই নীতিকে কার্যকর করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। আচার্য রায়ের সতর্কবাণী কর্তাদের ভুল ভাঙ্গিতে সাহায্য করিবে কি?

সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতা—

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হইয়াছে গত ২৫শে নবেম্বর তাহার শুনানীর দিন ছিল; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার জন্য মামলা ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতুবী রাখিতে হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র বর্তমানে প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ আছেন। ঐ জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যিনি তাঁহার মত এই যে, সুভাষচন্দ্রের অসুখ এত বেশী যে, জেলের মধ্যেও মামলায় হাজিরা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। সুভাষচন্দ্রের অসুখ কি ধরনের আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি; কিন্তু জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেশের লোকের মনে দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের উচিত এ সম্বন্ধে সঠিক খবর প্রকাশ করিয়া দেশের লোকের উদ্বেগ দূর করা এবং যদি সত্যই সুভাষচন্দ্রের অসুখ গুরুতর হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার যাহাতে সুচিকিৎসা হয় সেজন্য অবিলম্বে জেল হাজত হইতে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁহাকে আসিতে দেওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ে গোয়েন্দার ভয়—

ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আগ্রা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে গভীর সূক্ষ্ম কথা না থাকিলেও সময়োচিত কাজের কথা আছে। সম্প্রতি মাদ্রাজ প্রদেশের গভর্নমেণ্ট ছাত্রদের উপর যে কড়া নিষেধবিধি জারী করিয়াছেন, সেই বিষয়ের নিন্দা করিয়া মুখুজ্যে মহাশয় বলেন, শিক্ষকদিগকে ছাত্রদের কর্মতৎপরতার সম্বন্ধে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইবে, এই যে ব্যবস্থা—ইহার নিন্দা করিবার মত ভাষা আমার নাই। বিদ্যায়তনের পবিত্র ক্ষেত্রকে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে পরিবর্তিত করিবার এই যে উদ্যম, ইহা ভারতের মনুষ্যত্বকে পিষ্ট করিয়া মারিবারই পথ। মুখুজ্যে মহাশয় বলেন, ছাত্র সমাজের অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং পবিত্র রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের ছাত্রেরাই স্বদেশ প্রেমের ভাবকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তরুণ বয়সই উৎসাহ এবং উদ্যম অন্তরে সাড়া দিবার কাল। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই মানুষ সব বড় কাজ করিতে পারে। এই জোর তরুণদের মধ্যেই স্বাভাবিক। মুখুজ্যে মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠ করিলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি যে পিটুনী ব্যবস্থা জারী হইয়াছে, পাঠকেরা তাহার কঠোরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দিল্লী প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির সভাপতি

মিঃ ফারুকীর এম-এ খেতাব বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সংঘীর বি-এ খেতাব কাটা গিয়াছে। ইঁহাদের অপরাধ এই যে, ইঁহারা মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট ছাত্রদের উপর যে পিটুনী ব্যবস্থা জারী করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুইজন ভদ্রলোক স্থানীয় সরকারের কোন নিষেধবিধি অমান্য করেন নাই বা বে-আইনী কিছু করেন নাই। সুতরাং ইঁহারা অপরাধী হইলেন কি হিসাবে বুঝাও দুষ্কর; কিন্তু ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক উপরওয়ালা বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারস্বরূপে স্বয়ং এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন; সুতরাং আমাদিগকে এই সত্যকে স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে যে, ভারতের ব্যবস্থা সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা; কারণ ভারত পরাধীন।

ছাত্রসমাজের প্রতি সদুপদেশ—

উপদেষ্টার অভাব নাই এদেশে, বিশেষত ছাত্র সমাজের প্রতি 'শান্ত হও, শিষ্ট হও' এমন উপদেশ দিতে অনেকেই ওস্তাদ। ডাক্তার এম আর জয়াকর সেদিন আমেদাবাদের ছাত্রদিগকে একপ্রস্থ ঐ শ্রেণীর অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। জয়াকর সাহেব বলেন,—'ভারতবর্ষ সত্বরই স্বাধীনতা পাইবে এবং ভারতের শাসনাধিকার তোমাদের হাতে আসিবে, এমন সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে।' কিন্তু সবুরে মেওয়া ফলে, তোমরা অসহিষ্ণু হইও না। মতবিরোধের জন্য অসহিষ্ণুতা, দেশী কি বিদেশী কোন গভর্নমেণ্টই বরদাস্ত করিতে পারেন না। জয়াকর সাহেব এই উপদেশ ছাত্রদের কাছে না দিয়া মোসলেম লীগওয়ালাদের কাছে দিলে তাহার একটা মূল্য বরং থাকিত; কিন্তু ছাত্রদের কাছে ইহা অবান্তর। মতবিরোধ বলিতে যদি সকলের সকল মতে সায় দেওয়াই হয়, তবে বড় কঠিন কথা। ছাত্রদের মনে এতটা ঘুণ ধরে নাই যে, প্রকারান্তরে এই জো-হুজুরী মনোবৃত্তি তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক হইবে। যে সব কাজ দেশের পক্ষে অনিষ্টকর, যে সব মত জাতির পক্ষে অবমাননাকর তাহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘতভাবে প্রতিবাদ করিবার অধিকারও ছাত্রদের নাই, এমন মত যাঁহাদের, সেই সব অতিবুদ্ধিমানরা ছাত্রদের মুরুব্বিয়ানা হইতে যতদূরে থাকেন ততই ভাল। কারণ এই সব মুরুব্বিরা ছাত্রদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া ফেলেন। অথচ ছাত্র সমাজের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের উপর দেশের যত আশা, যত ভরসা; এই জন্য এই শ্রেণীর মুরুব্বিদিগকে আমরা সবচেয়ে ভয়ের চোখে দেখি।

সিন্ধুর সমস্যা—

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সিন্ধু প্রদেশে গিয়া সেখানকার বিভিন্ন দলের ভিতর একটা মীমাংসা করিয়া দিয়া আসিয়াছেন এবং এই মীমাংসার সূত্রে সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত ও পরিচালিত হইবে। খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সের দল এবং বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী বন্দে আলীর দলের মধ্যে যে মতভেদ ছিল, মৌলানা স তাহা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মীর আলী শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার স্থলে গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা প্রধান মন্ত্রী হইবেন। f পরিষদের সকল দল এখন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করি কংগ্রেসী দল, হিন্দু দল এমন কি লীগ দল পর্যন্ত। f মুসলিম লীগওয়ালারা নীরবে থাকিবেন, এমন ভরসা মৌলানা আজাদের চেষ্টায় সিন্ধুতে মুসলিম লী মহিমা লুপ্ত হইবে, হিন্দু-মুসলমানে মিলন হইবে, অসহ্য। তাই, মৌলানা সাহেব করাচী ত্যাগ করিবার স সঙ্গে মুসলিম লীগ দলের নেতা স্যার আবদুল্লা হা ফতোয়া জারী করিয়া বলিয়াছেন, এখনই কিছু হয় ন লীগওয়ালারা অবসন্ন হইও না। ১০ই ডিসেম্বর সিন্ধু মুসলিম মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বয়ং জিন্নাসা আসিতেছেন; সুতরাং সিন্ধুর উপর হইতে দুর্দৈ কালো মেঘ যে ষোল আনা কাটিয়া গিয়াছে, ইহা মনে ক কঠিন।

কথা ও কাজ—

বিলাতের কমন্স সভায় ইউনিয়নিস্ট দলের সদস্য f রবার্ট কেরী সেদিন বক্তৃতায় বলেন, ভারতবর্ষ যদি আমাদে সঙ্গে থাকে তবে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। পূর্ব জগতে অর্থনীতিক কর্তৃত্ব করিবে ভারতবর্ষ, জাপান নয়। এই যুদ্ধ আমাদিগকে এমনভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে ভারতের সে অর্থনীতিক কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত হয়। ভারতবর্ষ অর্থনীতি উন্নতির জন্য যে সব চেষ্টা করিবে আমাদের উচিত সেগুলি সব সমর্থন করা। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের একটি কারণ হইল এই যে, আমরা রাজনীতিকদের কথাই শুনি; বোম্বাই কলিকাতা, মাদ্রাজের ব্যবসায়ীদের কথা কিংবা কৃষক অথব কারখানার ওস্তাদেরা তাঁহাদের দেশের উন্নতি সাধনের জন্য যে সব কাজ করিতেছেন, সেগুলির বিশেষ কোন খোঁজ রাখি না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কেরী সাহেবের এই উদ্বেগে আমরা ভারতের কালা আদমীরা পরম কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু এই সব বড় বড় কথা বলিবার সময় নিজেদের বিবেকের দিকে যদি একবার তাকাইয়া তাঁহারা কথা বলেন, তবে ভাল হয়। ভারতবর্ষের নেতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতে ত্রুটি কিছুই করেন নাই; কিন্তু কেরী সাহেবের জ্ঞাতি গোষ্ঠীরাই বরবর নিজেদের স্বার্থের দায়ে ভারতের আর্থিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধতা করিয়াছে এবং এখনও যথাসাধ্য করিতে ছাড়িতেছে না। এবং ইহাও সত্য যে, শুধু মুখের কথায় এই স্বার্থদুষ্ট দৃষ্টি তাহারা পরিত্যাগ করিবে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হিসাবের খাতা নয়, রাজনীতিক স্বাধীনতার প্রেরণায় জাগ্রত ভারতের জনমত ব্রিটিশ স্বার্থবাহদের এই দৃষ্টি ছাড়াইতে সমর্থ হইবে এবং ভারতের অর্থনীতিক কর্তৃত্ব তাহার পরের কথা।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু *

'হিন্দু সমাজের ব্যাধি' এই নামে শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় 'দেশে' ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলির কিছু সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' এই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সরকার মহাশয়ের লেখাগুলি চিন্তাশীল সমাজে বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হয়। তাঁহার লেখাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। লেখাগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে যে সেগুলি লেখক সরকার মহাশয়ের সুদীর্ঘ চিন্তার ফল, এবং সুদীর্ঘ চিন্তা এবং অনুধ্যানের ফল বলিয়াই সরকার মহাশয়ের লেখাগুলির মধ্যে গভীরতা এবং বিষয়ানুপ্রবেশের সুষ্ঠুতা ও বিনিশ্চয়তা এমন সরল এবং প্রাঞ্জলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সরকার মহাশয় হিন্দু সমাজের বর্তমান সমস্যাগুলি সোজাসুজি ধরিয়া দেখাইয়াছেন এবং আবেগ উচ্ছ্বাস এড়াইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সেগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিষয়ানুপ্রবেশে দৃষ্টির তীক্ষ্যতা এবং বর্তমান হিন্দু সমাজের সমস্যাসমূহের মর্ম গ্রহণের সুনিশ্চয়তা সরকার মহাশয়ের বক্তব্য বিষয়ে একটা সচ্ছন্দতা দিয়াছে, তাঁহার লেখার ইহাই হইল বিশিষ্টতা।

সরকার মহাশয়ের মতে বাঙলার বর্তমান হিন্দু সমাজ ক্ষয়িষ্ণু; এ সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ক্ষয়ের কারণ কি, ব্যাধির আক্রমণ হইয়াছে কোন্ কোন্ দিক হইতে এবং কিভাবে সরকার মহাশয় বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন এবং ক্ষয় রোধ করিবার উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দু সমাজের এই ক্ষয়কে রোধ করিতে হইলে অস্পৃশ্যতা বর্জন, জাতিভেদের কঠোরতা ও সংকীর্ণতা নিবারণ এবং অসবর্ণ বিবাহ, হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে বিধবা বিবাহের সম্প্রসারণ এই সব বিশেষভাবে আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, 'সর্বাগ্রে হিন্দু-সমাজের নিম্নজাতির ক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে।'

হিন্দু সমাজের নিম্নজাতির সংখ্যা ক্রমে কিভাবে হ্রাস পাইতেছে সরকার মহাশয় হিসাবপত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য তথাকথিত এই যে নিম্নজাতি, ইহারাই বাঙলার হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। বাঙলার হিন্দু সমাজ যেদিন সজীব এবং সবল ছিল, ছিল ইহাদেরই জোরে। ইহারাই সমাজকে অন্ন দিয়া পোষণ করিয়াছে, বাহু বীর্যে রক্ষা করিয়াছে। সরকার মহাশয় ইহাদের প্রতি উচ্চশ্রেণীর উদাসীনতার নিন্দা করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের জন্য সত্যকার দরদ যাহাদের অন্তরে আছে, তাঁহারা এজন্য বেদনা অনুভব না করিয়া পারেন না।

নিম্নজাতির প্রতি এই যে উপেক্ষা, হিন্দু সমাজের ব্যাধির বীজ রহিয়াছে এইখানে। এই ব্যাধিকে উৎখাত করিবার জন্য মহাপ্রাণ পুরুষ বাঙলাদেশে আবির্ভূত না হইয়াছিলেন এমন নয়। সরকার মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, মহাপ্রভু এই অনাচারের বিরুদ্ধে এক নম্বরের একজন বিদ্রোহী। তাঁহারই ভাবে প্রভাবিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাঙলার হিন্দু সমাজে একটা বিপুল আলোড়ন উপস্থিত করেন। তাঁহার সংগঠনী শক্তি বাঙলার হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের পথ হইতে কি পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিল, সে ইতিহাস এ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। কিন্তু পরাধীন দেশে সমাজ স্বাভাবিক পথে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পায় না। প্রবল প্রাণশক্তিও পরাধীনতার আবহাওয়ার বিষময় প্রভাবে সংকীর্ণতা এবং অনুদারতার গ্লানিতে পিষ্ট হইয়া পড়ে। বাঙলার অবস্থাও তাহাই হইয়াছে এবং এই বিংশ শতাব্দীর আলোকে জগতের এত সমাজতত্ত্ব বুঝিয়াও আমাদের শিক্ষিত সমাজ ঘরের এই সমস্যার গুরুত্ব যে যথেষ্টভাবে উপলব্ধি করিতেছেন না, ইহাও সেই পরাধীনতারই অনিষ্টকর প্রভাবে। বাঙলার হিন্দুর আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি একান্তই উপরভাসা রকমের, হিন্দু সমাজের বিপুল জনসাধারণের সঙ্গে প্রাণের যোগ তাহার নাই বলিলেই চলে। সরকার মহাশয় 'রাষ্ট্র ও সমাজ', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে এই অপ্রিয় সত্যের প্রতি বাঙলার হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাঙলার হিন্দু সমাজ সরকার মহাশয়ের কথাগুলি ভাবুন, বুঝুন ইহাই আমরা চাই।

শুধু পাণ্ডিত্যের কর্ম নয়, আবশ্যক প্রাণের দরদের, জাতির দুর্দশার প্রতি প্রগাঢ় এবং গভীর অনুভূতির; তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দুর আজ এই জিনিষের অভাব ঘটিয়াছে। সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, সর্বাগ্রে সমাজ-বৈপ্লবিক মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই যে সমাজ বৈপ্লবিক মনোভাব, ইহাকে একান্ত করিয়া তুলিতে পারে শুধু জাতির দুঃখ-দুর্দশার গভীর অনুভূতি। এই অনুভূতি বাঙলা দেশে একজনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, তিনি হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বাঙলা দেশের হিন্দু সমাজের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করিতে হইলে আবশ্যক স্বামীজীর ন্যায় তেজস্বী, প্রাণবান এবং শক্ত মানুষের। শুধু বচনসর্বস্ব রাজনীতিকতার দ্বারা একাজ হইবে না। বীর্যবান মানুষ গড়িয়া উঠে প্রেমের বলে, বাঙলার হিন্দু সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে জাতির প্রতি এই প্রগাঢ় প্রেম সূক্ষ্ম নিষ্ক্রিয় দার্শনিকতার দুর্বলতায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

গ্রন্থকার বাঙলার হিন্দুকে সূক্ষ্ম দার্শনিকতার বিলাস ছাড়িয়া বীর্যময় কর্মজীবনের পথে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'এই বিংশ শতাব্দীতে যে সব শিক্ষিত হিন্দু সনাতনী আর্য সাজিয়া প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীর বা নৈমিষারণ্যের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদের সূক্ষ্ম ভণ্ডামি ও ভাববিলাস ত্যাগ করিয়া আমরা আত্মস্থ হইতে অনুরোধ করি। বৈদিক যুগ বা বৌদ্ধ যুগের জয়গান করিয়া বিংশ শতাব্দীর এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না।"

প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরে বা নৈমিষারণ্যে যে সুধু নিষ্ক্রিয় ভাববিলাসতাই প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা এ কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি, সরস্বতী নদীর তীরে এবং নৈমিষারণ্য হইতে যে সাধনা প্রসূত হয়, সে সাধনা নিষ্ক্রিয় ছিল না, তাহা জাতিকে ভাঙ্গিয়াছে, গড়িয়াছে, সনাতনী অচলায়তন গাঁথিয়া জাতির জীবনী-শক্তিকে পিষ্ট করে নাই। আজ সনাতনী পন্থার দোহাই যাঁহারা দিতেছেন তাঁহারা তাহাই করিতেছেন। ইঁহাদের ধর্মধ্বজিতা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, নহিলে সত্যই জাতি বাঁচিবে না। সমাজ একটা জীবন্ত বস্তু, যুগোচিত পরিবর্তন এবং সংস্কারের ভিতর দিয়া তাহা শক্তিশালী হইয়া উঠে, এ সত্যকে অস্বীকার করা জাতির মৃত্যুর পথ, বাঁচিবার পথ নয়। হিন্দু ধর্মের সনাতনত্ব কোন একটা প্রথা বা দেশাচারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাতে নয়, যুগোচিত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রসারনশীল যে প্রাণশক্তি হিন্দু সমাজের আছে তাহাই হইল তাহার সনাতনত্ব। যুগোচিত পরিবর্তনশীলতাকে অস্বীকার করিলে হিন্দু ধর্মের সনাতনত্বকেই অস্বীকার করা হয়।

সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—'হিন্দু সমাজের আজ যে শোচনীয় দুর্গতি, তাহাতে আমূল সংস্কার বা পুনর্গঠন না করিলে বর্তমান যুগে এই প্রাচীন সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব।' আমরাও বলি, ভাঙ্গিতে হইবে, পুতু পুতু করিবার অবসর নাই, জীর্ণতা এবং অনুদারতার বিষজীবাণু বাঙালী হিন্দুর জীবনে যেখানে

যেখানে ঢুকিয়াছে, নির্মমভাবে সেগুলিকে উৎখাত করিতে হইবে। কিন্তু শুধু উপদেশের জোরেই এ কাজ হয় না, যদি না থাকে প্রাণের টান। বাঙলার হিন্দু আজ মরিতে বসিয়াছে, একদিকে পরাধীনতা ও পরবশ্যতার প্রবল চাপ অপরদিকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সংকীর্ণতা এবং আত্মানুসন্ধিৎসার অভাব—এই উভয় সংকট হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? সরকার মহাশয় অন্তরের আকুলতা দিয়া দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—'কোথায় সেই নেতা ও কর্মীর দল? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহাদিগকেই আজ পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।'

আমরাও এই আহ্বানেরই অনুমোদন করিতেছি এবং আশা করি, 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র এই আহ্বান বাঙলার ঘরে ঘরে পেঁছিয়া বাঙালী হিন্দু সমাজের সর্বত্র একটা সাড়া জাগাইবে। বাঙালী হিন্দু নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে একটু চিন্তা করিবে এবং বর্তমান দুর্দশার প্রতীকারের পথ খুঁজিবে। সরকার মহাশয় বাঙলার হিন্দু সমাজকে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ভাবাইয়াছেন, চিন্তিত করিয়াছেন এবং তাঁহার গভীর অনুচিন্তার ফলে অগ্রগতির পথের দিকে আলোকসম্পাত করিয়াছেন, এজন্য তিনি বাঙালী হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ।

***ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তক পরিচয়

সুই সাইডঃ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। সারস্বত-মন্দির, ১, রমেশ মিত্র রোড হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

'সুই সাইড' কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি উপভোগ্য এবং একটু নূতনত্ব আছে। বই খানিতে একাধারে যেমন সিরিয়াস গল্প আছে, অপর দিকে কয়েকটি গল্পের স্থানে স্থানে লেখক চমৎকার হাস্য-রসের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন; 'মেক-আপ্' অশ্বমেধ এবং 'টর্পেডো' সেই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। লেখার ভাষাও বেশ ভাল। পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবার দাবী বইখানির যথেষ্ট আছে।

আগামীকাল—নীতিশচন্দ্র মজুমদার, ছায়াপথ পাব্লিশিং হাউস, ৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা মাত্র।

নাটিকাখানির এক পৃষ্ঠা ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর। কিন্তু ভূমিকার সূচনায় মজুমদার পরিবারের গুণগান করিয়াছেন এবং পরিশেষে নীতিশচন্দ্র সমস্যাকে সরস ও কলাসম্মতরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া প্রশংসালিপি দিয়াছেন; আমরা তাঁহার এই গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। কোন বক্তব্য নাটকের বাহ্যিক আকারে সাজাইতে চেষ্টা করিলেই তাহা নাটক হয় বা রঙ্গমঞ্চে জমে এরূপ ধারণা আমাদের নাই। "নাট্যকার" আসন্ন ডাইভোর্স বা দেশমুখের বিবাহবিচ্ছেদ বিলে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন সে অনুভূতি এক, আর তাহাকে রসোত্তীর্ণ করা এক। নীতিশবাবুর বক্তব্য এতই অস্পষ্ট যে, সাহিত্যে তাহা রূপায়িত ও রসাশ্রিত করা শক্ত। কোন একটি চরিত্রই চরিত্র হিসাবে উৎরায় নাই। কিন্তু এই নাটক ও সিনারিওর দুর্ভিক্ষের দেশে এই প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করিতেও বাধে। সেদিক হইতে আমরা নীতিশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ শিল্পচাতুর্যের অপেক্ষায় রহিলাম।

শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত। মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী, ২৫নং বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে দক্ষিণ ভারতে শ্রীবৈষ্ণবগণ প্রেমভক্তির যে প্লাবন বহাইয়াছিলেন, সেই সব নারায়ণ-পরায়ণ দ্রাবিড় বৈষ্ণবাচার্যের সাধনা এবং সাধনতত্ত্বের পরিচয় বাঙালীর খুব কমই আছে। ভাগবতে এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা প্রসঙ্গত ইঁহাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'শ্রীবৈষ্ণব' গ্রন্থে বাঙলার ভক্তসমাজকে দাক্ষিণাত্যের দিব্যোন্মাদ আলোয়ারগণ এবং শ্রীবৈষ্ণবদের পুণ্য জীবনকথার আস্বাদ দান করিয়াছেন। এ পুস্তক পাঠ করিলে চিত্ত পবিত্র এবং ভগবদপ্রেমে আপ্লুত হয়। গ্রন্থকার প্রধানত ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতেই ভক্তচরিতগুলির অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু অনুবাদ হইলেও গ্রন্থকারের সুদীর্ঘ জীবনের সুগভীর অধ্যাত্ম সাধনাসঞ্জাত অনুভূতি চরিত্রগুলিকে সরস, উজ্জ্বল এবং সুমধুর করিয়াছে। লেখকের অন্তরের আবেগ উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে ভক্ত গুণানুকীর্তনের ছন্দের সংস্পর্শে। পাঠকের অন্তরেও এ পুস্তক পড়িলে সে ছন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সমালোচক এই পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকারের সম্বন্ধে অনাহূত রকমে যে বক্রোক্তি করিয়াছেন, নিজেরা বইখানা পাঠ করিয়া দেখিয়া আমরা সেজন্য বিস্মিত হইতেছি। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সমালোচক আচার্য শঙ্করকে রক্ষা করিবার জন্য অকারণ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। সমালোচকের পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আচার্য শঙ্কর এতটা বিপন্ন হন নাই যে, সেজন্য তাঁহার ওকালতির আবশ্যক হইবে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে শঙ্করের দার্শনিক মতবাদের সবিশেষ আলোচনা করেন নাই; শুধু সমাজের উপর মায়াবাদের ফল কি দাঁড়াইয়াছে, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করের উপদেশ-ব্যাখ্যাকারগণের সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পরবর্তী সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ শঙ্করাচার্যকে বুঝেন নাই, সে বুদ্ধি শুধু 'অমৃতবাজারের' সমালোচকেরই একচেটিয়া—ইহা স্বীকার করিলেও বলিতে হয় যে, আলোচ্য গ্রন্থের সমালোচনায় শ্রীপাদ শঙ্করকে টানিয়া আনিবার এবং আজীবন যিনি উদার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে নব্য বৈষ্ণব ধর্মের সাম্প্রদায়িকতাবাদী এই অত্যুৎকট বিশেষণে আপ্যায়িত করিবার কোন হেতুই 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রৌঢ় পণ্ডিত সমালোচক প্রবরের ছিল না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'শ্রীবৈষ্ণব' গ্রন্থে যে প্রেম-পীযূষধারা বিতরণ করিয়াছেন, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সমালোচক তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়; কিন্তু বাঙলার ভক্ত এবং রসিক সমাজ আলোচ্য গ্রন্থে 'শ্রীবৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের ভক্তগণের পুণ্যচরিতসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে গ্রন্থের লেখক, তাহার পরিচয় বিশেষভাবে প্রদান করা আমরা বাহুল্য মনে করি। এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সাধনা—মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২১এ, অপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০।

আমরা "সাধনা"র শারদীয়া সংখ্যা পাঠ করিয়াছি। এই সংখ্যা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গিরিজাকুমার বসু, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবি সেনগুপ্ত, আশালতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, অপরাজিতা দেবী প্রভৃতি বাঙলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাগণের সুচিন্তিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদিতে সমৃদ্ধ হইয়া বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৪]

প্রমোদের যে কথা সে কাজ। তিন দিনের মধ্যে তার দোকান খোলা হ'ল, সাইনবোর্ড টাঙানো হ'ল "রঞ্জন স্টোর্স"। বাঁড়ুজ্যের কথা থেকেই এ নামের আভাস তার মনে জেগেছিল। নানা রংএর টফি চকোলেট লজেঞ্জ রিবন প্রভৃতি কাচের আলমারি ও শো-কেসে সাজিয়ে প্রমোদ বসল গিয়ে তার দোকানে—ভোর না হ'তে হ'তেই।

প্রহেলিকার বাড়ি সেখান থেকে দেখা যায়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রমোদ তার বারান্দা আর দরজা জানালার দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল, কিন্তু হায়, চক্ষু সার্থক হ'ল না।

মাঝে মাঝে এক-একবার তাকে অন্যমনস্ক ক'রে দিলে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে লজেঞ্জুস কিনতে এসে। ভারী বিরক্ত হয়ে সে এক-একবার উঠে তাদের ফরমাশ তামিল ক'রে বসতে যায়, ছেলেগুলা ছাড়ে না। বলে, এটার দাম কত, ওটার দাম কত, তাদের কৌতূহলের সীমা নেই, কিন্তু হাতের পয়সা নিতান্ত অপ্রচুর।

ভারী বিরক্ত হয়ে প্রমোদ শেষে তাদের ধমকে তাড়ালে নিতান্ত অব্যবসায়ীর মত। কিন্তু উপায় কি? হতভাগারা জানে না যে তাদের সওদার জন্য তো এ দোকান নয়, তারা যে নিতান্ত অনধিকারপ্রবেশ করেছে এখানে।

বিকেলে প্রমোদ যখন দোকান খুলতে এল, তখন সে দেখতে পেলে প্রহেলিকা তার দোকানের সামনে দিয়ে তরঙ্গ তুলে ছুটে চলেছে। দোকান না খুলে প্রমোদ তার পিছু পিছু কিছুদূর গিয়ে দেখলে প্রহেলিকা গেল তার সেই আগের দোকানে। সে দোকানের সামনে নিখিলেশ দাঁড়িয়ে আছে দেখে প্রমোদ তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দোকান খুলে ব'সে চুল ছিঁড়তে লাগল। কি দুর্দৈব, দু মিনিট আগে যদি সে আসত তবে আজই তো—।

পরের দিন সে দুপুরে দোকান বন্ধ করলে না মোটে। বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়ে বসে রইল।

সারাদিন গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, প্রহেলিকার আজ দেখাও নেই।

এর পর সাত দিন তার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না।

ভেবে চিন্তে প্রমোদ একবার নিখিলেশের মেসে গিয়ে হাজির হ'ল।

নিখিলেশও নেই! সে গেছে পুরী। বোধ হয় হপ্তা তিনেক থাকবে। প্রহেলিকাও অবশ্যই গেছে, নইলে নিখিলেশ নড়ে? হতাশ হয়ে প্রমোদ দোকানে এসে বসল।

একবার মনে হ'ল পুরী গেলে কেমন হয়? কিন্তু ভাবলে কি লাভ? নিখিলেশ পুরী ও প্রহেলিকাকে দখল ক'রে বসে আছে, কোনও সুবিধে হবে না। তা ছাড়া দোকান যখন ক'রে বসেছে সে, সে দোকান ফেলেই বা যায় কেমন ক'রে?

একদিন দোকানে ব'সে ব'সে এমনি ভাবছে প্রমোদ, হঠাৎ বাঁড়ুজ্যে এসে হাজির।

"এই যে এখানে দোকান খুলে ব'সেছ। বেশ বেশ, আসল কাজ এগুলো কিছু?"

ও অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রমোদের উৎসাহ ছিল না। সে এ প্রশ্ন অগ্রাহ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তোমার বাণিজ্য ফেলে এলে যে বড়?"

একটা টুলের উপর যথাসম্ভব চেপে ব'সে বাঁড়ুজ্যে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, "সে ভাই চুকে গেছে।"

"কি রকম?"

"পটলাটা সেয়ানা হয়ে গেছে। সে স্থির করেছে একা চক্রবর্তীকে দিয়েই দোকান চালাবে, মাইনের টাকাটা এখন থেকে সে ঘরেই নিয়ে যাবে। তাই অগতির গতি প্রাইভেট টিউইশনের চেষ্টায় ঘুরছি। হাঁ ভাই, এইটেই গোকুল মুখুজ্যে লেন না?"

"হাঁ।"

"৬৫নং বাড়িটা কোন্‌খানে বলতে পার কি?"

"৬৫নং বাড়ি?" প্রমোদ যেন চমকে উঠল, "সেখানে তোমার কি দরকার?"

"একটা টিউইশনের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তারা, আজ আমাকে তলব হয়েছে। কোন্‌খানে বাড়িটা?"

অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে প্রমোদ প্রহেলিকাদের বাড়ি দেখিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, "চাকরি হয়ে গেছে তোমার?"

"হয়নি, তবে ডেকেছে যখন তখন হ'তেও পারে।"

চট্‌ ক'রে প্রমোদের মনে হ'ল বাঁড়ুজ্যে এম-এতে থার্ড ক্লাস পেয়েছে, প্রমোদ সেকেন্ড ক্লাস। এখনও চেষ্টা করলে হয়তো সে চাকরিটা ছিনিয়ে নিতে পারে।

বাঁড়ুজ্যে বললে, "হ'লেও চাকরি যে টিকবে, তা বলতে পারি না। ওরা স্থির করেছে যে ইকনমিক্স আর অঙ্কে আমি খুব সরেশ, কেননা ইকনমিক্সে এম এ পাস করেছি আর অঙ্ক ছিল আমার বি-এতে। কি ক'রে যে পাস করেছি সে খবর তো ওরা রাখে না। যদি আমার বিদ্যের বহর বেরিয়ে পড়ে তবেই গেছি।"

প্রমোদের উদীয়মান উৎসাহ একেবারে চুপ্‌সে গেল। সেকেন্ড ক্লাস এম-এ সে, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল সাইকলজিতে। অঙ্ক সে ছেড়েছে ম্যাট্রিকের পরই আর ইকনমিক্সের ধারও সে ধারে না। বড়ই হতাশ হয়ে সে ব'সে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবলে যে নিখিলেশটা কি আকাট মূর্খ। দোকানের সামনে পথে সে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাকে আর একেবারে দুর্গ দখল করবার এতবড় সুযোগের খবরই সে রাখে না! সে তো ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস, অঙ্কও জানে!

বাঁড়ুজ্যে ব'লে গেল, "তবে ভরসা এই যে পড়াতে হবে, কোনও ডেঁপো ছেলেকে নয়, একটা মেয়েকে। তাদের আধ ছটাক বুদ্ধিতে আমার বিদ্যের বহর নাও পারে ধ'রতে।"

এইবার প্রমোদ উঠে দাঁড়াল। রাগে সে মনে মনে গজরাতে লাগল, যদিও রাগের কোনও ন্যায্য কারণ ছিল না। কবেই বা থেকে থাকে, তেমন কারণ এসব ক্ষেত্রে? কিন্তু বাঁড়ুজ্যে ওই বাড়িতে গিয়ে একটা মেয়েকে, নিশ্চয় প্রহেলিকাকে, পড়াবে আর সেই মেয়ের বুদ্ধিকে সে মনে করে আধ ছটাক, এতেই সে মনে মনে ফুলতে লাগল।

এই মুহূর্তে ওই বিপুল দেহটাকে গুঁড়ো ক'রে হাওয়ায় মিলিয়ে দেবার কোনও উপায় তার মনে এল না। তদভাবে বাঁড়ুজ্যেকে ভুল পথ ব'লে বিভ্রান্ত করা যেত, কিন্তু সন্ধানটা আগেই দিয়ে ফেলেছে সে। এখন কি করবে বা কি বলবে তা সে কিছুই ঠিক করতে না পেরে মিথ্যেই দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগল। এমন সময়—

একটা ছোট মেয়ে হাত ধ'রে প্রবলবেগে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে প্রমোদের দোকানে নিয়ে এল—প্রহেলিকাকেই।

একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘ'টে গেল। প্রমোদের রাগ একেবারে নিখোঁজ হয়ে উবে গেল। বাঁড়ুজ্যের তিন মণ দেহটার কোনও অনুভূতি তার মনের চতুঃসীমাতেও রইল না। তার সমস্ত মুখ একটা প্রচণ্ড উল্লাস ও কৃতার্থতায় বিগলিত হয়ে গেল, সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে ব'সেছিল শো-কেসের পিছনে একটা টুলে, এক লাফে সামনে এসে দাঁড়াল আর তড়বড় ক'রে ব'লে যেতে লাগল, "এই যে আপনি এসেছেন? আসুন (হঠাৎ মনে হ'ল যে এমনি পরিচিতের মত তাকে সম্ভাষণটা ঠিক হ'ল না, তাই সামলাতে গিয়ে বললে), মানে, ওর নাম কি বসুন—আমি রোজ ভাবি, (থমকে গিয়ে ভাবলে, একথা বলা হবে অমার্জনীয় বেয়াদবি) আপনার জন্যেই এ দোকান (এই রে! এমন কথাও বলে? ছি!) মানে আপনাদের জন্যেই—আপনারা মুখ তুলে চাইবেন, মানে কিনবেন, টফি, চকোলেট, রিবন, সেফটি পিন, ক্রীম"—

ছোট মেয়েটা দোকানে এসে অবধি প্রহেলিকার দিকে চেয়ে ক্রমাগতই ব'লে চলেছে বেলুন, বেলুন।'

প্রহেলিকা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই এসেছিল দোকানে, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই বললে, "বেলুন আছে?"

"বেলুন—বেলুন—তাই তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বেলুন তো নেই! সন্ধ্যেবেলায় আপনার বাড়িতে দিয়ে আসব, কি বলেন? এখন আর কিছু? টফি, চকোলেট, রিবন, সেফটি পিন, ক্রীম—কিছুই চাই না?"

ততক্ষণ ছোট মেয়েটা প্রহেলিকাকে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

চুপসে যাওয়া বেলুনের মত প্রমোদ মুখখানা কালি ক'রে বসল গিয়ে আবার সেই টুলে।

বাঁড়ুজ্যে এতক্ষণ নিঃশব্দে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল, এখন তার মুখখানা বেলুনের মত ফুলে উঠল আর সারা দেহের ভিতর ভূমিকম্প হ'তে লাগল। ক্রমে এই সব উপসর্গ এ[illegible] কানফাটা হাসিতে পর্যবসিত হ'ল। সেটা হজম ক'রে [illegible] সে বললে, "ইনিই বুঝি তিনি?"

প্রমোদের মন তখন যে সব সুদূর দেশে ছট্‌ফট্ ক[illegible] ছুটে বেড়াচ্ছিল সেখানে বাঁড়ুজ্যের এ প্রশ্ন পেঁছুল না।

পুরী যায়নি প্রহেলিকা। মন্দের ভাল। নিখিলেশ হতভাগা সেখানে গিয়ে মরেছে কেন? কিন্তু কি ভুল? এত জিনিস কিনে এনেছে সে, বেলুনের কথাটা খেয়াল হয় নি! এখনই গিয়ে তিন ডজন—না এক গ্রোস বেলুন কিনে এনে দোকানের আষ্টেপৃষ্ঠে বেলুন ফুলিয়ে রাখবে। এমন ভুলও মানুষে করে। আর মেয়েটাই বা কি? দোকানে এত জিনিস আছে, চকোলেট, লজেঞ্চ, রিবন, সেফ্‌টি পিন, ক্রীম—যা কিনতে প্রহেলিকা নিজে অতদূরে গিয়েছিল সেদিন, তার একটাও তার চাই না, চাইলে কি না বেলুন। না হয় ছোট মেয়েটা ধরেইছিল বায়না, তাকে এক বাক্স চকোলেট, কি টফি, কি লজেঞ্চ দেখিয়ে ভুলোলেও তো হ'ত! এমন বিড়ম্বনা লোকের হয়! যদি বা এতদিনের স্বপ্ন সফল হ'ল, এলো সে দোকানে, তবু হায়, এমন ক'রে এল গেল।

তার কথাগুলো বড় বেফাঁস হয়ে গেছে। হয়তো রাগ করেছে প্রহেলিকা। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই। সেদিন সে দেখেছিল প্রহেলিকাকে—যেন তরল হাসির ফোয়ারা। আর আজ, কোথায় সে ফোয়ারা, মুখ চেপে ব'সে আছে তার মেঘ—ভ্রূকুটি। নিখিলেশকে দেখে সে হেসে ওঠে, আর প্রমোদের বেলায় সুধু ভ্রূকুটি! নাঃ! নিখিলেশ ভাগ্যবান, তার সঙ্গে এ'টে ওঠবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আর, দেখ অদৃষ্টের পরিহাস! তার প্রাইভেট টিউটার দরকার, তাও ভাগ্যে জুটবে কি না ওই হোঁৎকা বাঁড়ুজ্যের!

এতক্ষণে মনটা বাঁড়ুজ্যের কাছে ভিড়ে আসতে সে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যে বাঁড়ুজ্যে যেন তাকে কি একটা কথা বলছিল। তাই সে বললে, "হাঁ, কি বলছিলে বাঁড়ুজ্যে?"

বাঁড়ুজ্যে হাসছিলই—হাসতে হাসতে সে বললে, "জিজ্ঞেস করছিলাম ইনিই কি তিনি? তা আর বলতে হবে না, বুঝতেই পেরেছি।"

"তবে মাথা কিনেছ", খুব বিরক্ত হয়ে বললে প্রমোদ।

বাঁড়ুজ্যে উঠতে উঠতে বললে, "থাক ভাই, উঠি এখন। দেখি ভাগ্যে কি আছে?"

প্রমোদ মনে মনে বললে, "ভাগ্যে তোমার ছাই থাকুক, আগুন পড়ুক তোমার মুখে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ হতাশার সঙ্গে সে অনুভব করলে যে ছাই বা আগুন কোনটাই হয়তো তার ভাগ্যে নেই। ওই হোঁৎকা, ওইটাই কি না কাছে ব'সে অঙ্ক আর ইকনমিক্সের ছাই পাঁশ বোঝাবে—প্রহেলিকাকে! —কি অদ্ভুত খেয়াল মেয়েটার! মেয়েছেলে সে ইকনমিক্স বা অঙ্ক প'ড়ে কিই-বা করবে—সাইকলজি পড়লেই তো হয়।

(ক্রমশ)

অজন্তা গিরিমন্দিরে

অধ্যাপক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[২]

অজন্তা গিরিমন্দির নিজাম রাজ সরকারের রাজ্যভুক্ত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নিজাম বাহাদুর নিজ রাজ্যে একটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ (Archaeological Department) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অজন্তা গিরি মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। নিজামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে ইলোরা ও অজন্তা প্রভৃতি গিরি মন্দির সম্পর্কিত পুস্তকাবলী, পোস্ট কার্ড ও রঙীন চিত্র এবং গিরি মন্দিরের তথ্য সংবলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাও অনেক প্রকাশিত হইয়াছে।

অজন্তা গুহা মন্দির দেখিতে যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বইগুলি পড়িয়া লইলে কিংবা সঙ্গে লইলে সহজেই চিত্রগুলি বুঝিতে পারিবেন এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করাও সহজ হইবে। (১) Cave Tamples of India--Burgess & Fergusson, (২) A History of Fine Art in India and Ceylon by Vincent A. Smith, (৩) Indian Architecture by E. B. Havell, (৪) My Pilgrimage to Ajanta and Bagh, by Mukul Dey, (৫) Jottings at Ajanta by W. E. Gladstone Solomon, (৬) The Women of the Ajanta Caves by W. E. Gladstone Solomon (৭) Life in India by Mrs. Spier, (৮) The Paintings in the Buddhist Caves at Ajanta by J. C. Griffiths, (১০) অজন্তা ও বাগ—অসিতকুমার হালদার; ইংরেজী ও বাঙলা মাসিক পত্রিকাদিতেও অনেকেই অজন্তা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় **'প্রবাসী'** পত্রিকায় ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যায় অজন্তার সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও এবং আরও অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখক অজন্তার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া বাঙলী পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট অজন্তা সুপরিচিত। অজন্তার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা হইল, এইবার আমরা যেমন দেখিলাম, সেই কথাই বলিতেছি। আমরা উপরে উঠিয়া অজন্তা পাহাড়ের উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের গায়ে লতাগুল্ম এবং ছোট ছোট গাছ মাত্র রহিয়াছে। শুনিলাম বর্ষাকালে যখন বর্ষার ধারাসিক্ত হইয়া বৃক্ষলতা গুল্ম সতেজ ও সুন্দর হয়, তখন এই পাহাড়ের শোভা অতি মনোরম হয়।

অজন্তার ১, ২, ৯, ১০, ১২, ১৬, ১৭, ১৯ এবং ২৬নং গুহাবলীর মধ্যে অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পদ, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই গুহাবলীতে সর্বশুদ্ধ ২৫টি খোদিত লিপি রহিয়াছে। কতক লিপি রহিয়াছে গুহার ভিতরে কতক রহিয়াছে গুহার বাহিরে।

আমরা প্রথমে ১নং গুহাটিতে প্রবেশ করিলাম। সুন্দর চিত্রিত গিরি মন্দির। ইহার মধ্যে কতকগুলি চিত্র আছে, যাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন। গুহার ভিতরের বামদিকের প্রাচীর গাত্রে দেখিলাম 'শিবিজাতক।' বোধিসত্ত্ব শিবি রাজারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি নিরাশ্রয় পারাবতকে আশ্রয় দিবার জন্য বাজপক্ষীর তৃপ্তির জন্য নিজ দেহ হইতে মাংস কাটিয়া প্রদান করিতেছেন।

ভগবান বুদ্ধ জাতকের যে সব আখ্যান মুখে মুখে প্রচার করিতেন, তাঁহার পূর্ব জীবনের সে সমুদয় কাহিনী বা জাতকের চিত্র এখানকার বিভিন্ন গিরিমন্দির গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে।

আমরা একটির পর একটি গুহার চিত্রাবলী দেখিতে-

অজন্তার ১৯নং গুহার সম্মুখভাগ
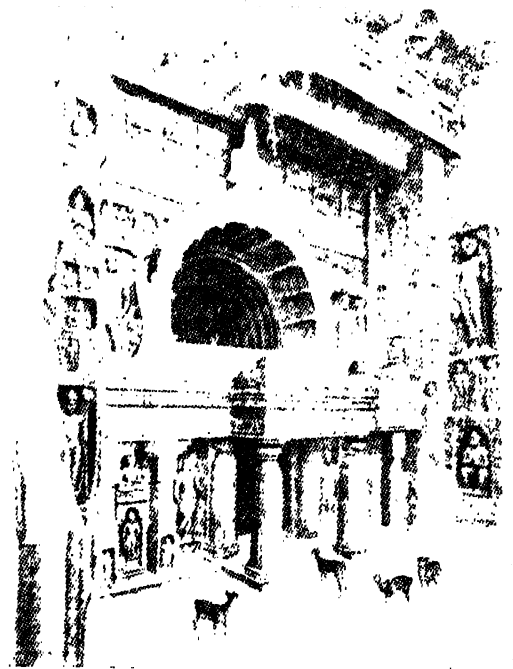
ছিলাম। প্রত্যেকটি গুহার কথা ধরাবাহিকতা রক্ষা করিয়া বলা সম্ভবপর হইবে না, তবে যেমন যেমন দেখিয়াছি তেমনই বলিতেছি। স্থানে স্থানে গুহার পরিচয় দিয়াই বলিব।

অজন্তার গিরি মন্দিরে নানা জাতীয় চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেকটি গুহাতেই জাতকের চিত্র, ঐতিহাসিক চিত্র, জীবজন্তুর চিত্র, সাংসারিক জীবনের ঘটনাবলী, রাজা ও রাণীর বিলাস চিত্র, গন্ধর্ব ও অপ্সর, নাগ ও নাগিনী, প্রসাধন, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম, আলঙ্কারিক চিত্র, নানা জাতীয় লোকের জীবন চিত্র, মৃগয়ার চিত্র প্রভৃতি বহুবিধ চিত্র অতি সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

অজন্তার গিরি মন্দিরগুলি দেখিতে দেখিতে একটি প্রশ্ন আপনা হইতেই মনে আসে, এই গিরি মন্দিরগুলি কত দিনের প্রাচীন ? বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এখানকার সব গিরি গুহাগুলি একই সময়ে খোদিত ও চিত্রিত হয় নাই। ৯নং ১০নং গুহা দুইটি আনুমানিক খৃস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে নির্মিত হইয়াছে। আর ১নং ২নং ১৬নং গুহা কয়টি সম্ভবত খৃস্টের ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল।

অজন্তার গিরি মন্দিরের অবস্থানটি এমন সুন্দর যে বৌদ্ধগণের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অজন্তা বা অজন্টা (Ajanta) গ্রাম হইতে অজন্তা গিরি মন্দিরগুলির দূরত্ব প্রায় চার মাইল হইবে। অজন্তা গ্রাম হইতে অজন্তা গিরি মন্দির উত্তর দিকে অবস্থিত। ঐ গ্রামটি ঘাট পর্বতের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহার সৌন্দর্য বিশেষ উপভোগ্য। এক-দিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অপর দিকে তাপ্তি সলিল-ধারাবিধৌত খান্দেশ প্রদেশ। বৌদ্ধগণ বিশেষ যত্ন সহকারে পার্বত্য গিরি মন্দিরগুলির স্থান নির্বাচন করিয়াছেন। প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, জনকোলাহল হইতে দূরে এমন সব নিভৃত বিজন প্রদেশে গিরি গুহাগুলি খোদিত হইয়াছে যে, সহজে ইহা লোকের চোখে পড়ে না। অজন্তা পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ২৫০ ফিট। পাহাড়টি অর্ধ বৃত্তা-কারে অবস্থিত বলিয়া গুহাগুলিও সেইভাবেই খোদিত হইয়াছে। আমরা পূর্বে যে জলপ্রপাতটির উল্লেখ করিয়াছি তাহার নাম "সাতকুণ্ড।" উহা একটির পর একটি তার পর একটি এইভাবে ছয়টি ভাগে বিভক্ত হইয়া নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলের নিম্নে যে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাই সাতকুণ্ড ("Sat Kund") নামে অভিহিত। তার নীচেই অজন্তার নদী বহিয়া চলিয়াছে। নদীটির কি যেন একটি নাম আছে, তাহা আমার মনে নাই। সম্ভবত ওয়াঘোরা। নদীটিও পাহাড়ের নীচ দিয়া কুল কুল শব্দে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এমনি প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে অজন্তা গিরি মন্দির প্রাচীনের স্মৃতি বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আমরা এখানে আসিয়া দেখিলাম, বেশীর ভাগ লোকেরাই আসিয়াছেন শুধু একটা sight seeing হিসাবে দেখিতে। সকলের সঙ্গেই খাদ্যদ্রব্যের সরঞ্জাম খুবই বেশী। প্রথমেই

অজন্তার ৭নং গুহার একটি বারাণ্ডা

আমার সঙ্গে Asst. Curatorএর একটু কথান্তর হইল। অজন্তার গুহার ভিতরকার চিত্রাবলী সুস্পষ্টভাবে দেখিতে হইলে পেট্রোল ল্যাম্পের প্রয়োজন হয়, সেজন্য পাঁচ টাকা দিতে হয়। আমরা যখন এক নম্বর গুহায় প্রবেশ করি, তখন কয়েকজন পার্শী ভদ্রলোক ও পার্শী মহিলাকে পেট্রোল ল্যাম্পের সাহায্যে ছাদের নীচেকার (Ceiling) ছবি দেখানো হইতেছিল, আমরা প্রবেশ করিবামাত্রই কিউরেটার আসিয়া বলিলেন,—আপনারা বাইরে যান। আমি বলিলাম—কেন?

কিউরেটার—এখন আপনারা দেখতে পাবেন না। ভদ্র-লোকদের দেখা হলে পর দেখতে পাবেন।

আমি বলিলাম,—ভদ্রলোকেরা যদি দু'ঘণ্টা সময় দেখেন, তা হলে আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? এমন কি কোন নিয়ম আছে? নিয়ম দেখান।

কিউরেটার কোন নিয়ম দেখাইলেন না। আমার সঙ্গে যখন বেশ একটা বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন একান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের বাঙালী যে কয়েকজন লোক ছিলেন তাঁহারা কেহই আমাকে সমর্থন করিলেন না, করিলেন বোম্বাই প্রবাসী দুইজন প্রবীণ পার্শী ভদ্রলোক। পরে আমাকে আর কিউরেটার ভদ্রলোক কোন বাধা দেন নাই। কি মুস্কিল ! যদি দলে দলে যাত্রীর দল 'পেট্রোল ল্যাম্পের' সাহায্যে ছবি দেখিতে আরম্ভ করেন, আর অন্যদের সব বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হয়, তবে সাধারণ দর্শকের যে দেখাই হইতে পারে না। এ বিষয়ে সদাশয় নিজাম গভর্মেণ্টের কর্তব্য যে ঐ সব চিত্রিত

(শেষাংশ ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রমীলার মৃত্যু

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দীর্ঘ আঠার ঘণ্টা ধরিয়া একটা লেবার কেস লইয়া ধস্তাধস্তি করিবার পর বাড়ি ফিরিলাম, রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে।

ডাকাডাকি করিতে ভৃত্য সুখন দরজা খুলিয়া দিল।

লুচি ভেজে আপনার শোবার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখেছি বাবু।

এত রাত্রে আর খাব না। স্টোভ জেবলে এক কাপ চা করে দে। সোজা সিঁড়ি বাহিয়া দোতালায় শোবার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

খোলা জানালাপথে খানিকটা চাঁদের আলো আমার লিখিবার টেবিলটার 'পরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। ইজি চেয়ারটার 'পর গা এলাইয়া দিয়া একটা সিগ্রেট ধরাইলাম।

পাশের ঘরে সুখন বোধ হয় স্টোভ জবলাইয়াছে, সোঁ সোঁ আওয়াজ শুনা যায়।

ঈষৎ চন্দ্রালোকিত ঘরের মধ্যে স্টোভের আওয়াজ যেন কেমন অদ্ভুত নিঃসঙ্গ মনে হয়।

অল্পক্ষণ পরেই সুখন চা লইয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ঃ আপনার একটা চিঠি এসেছিল বাবু।

কোথায় ?

টেবিলে আছে।

টেবিল ল্যাম্পটা জবালিয়ে দে। চিঠিটা দিয়ে যা।

একটা ভারী খাম হাতে দিয়া সুখন টেবিল ল্যাম্পটা জবালাইয়া দিয়া গেল।

পুরু শাদা খামে একখানা চিঠি! কে আবার এত ভারী চিঠি দিল? আত্মীয় বন্ধু এমন কেইবা আছে? চিঠি দিয়া সংবাদ লইবে? সংসারে মা বাবা ভাই বোন কেহই নাই।

বন্ধুবান্ধব! তাই বা এমন কে কোথায় আছে? যে চিঠি দিয়া মনে করিবে?

বেশ একটু কৌতূহলবশেই খামখানি ছিঁড়িলাম। শাদা লেটার পেপারের দীর্ঘ চার পৃষ্ঠাব্যাপী এক চিঠি! আশ্চর্য! সুন্দর পরিস্কার ঝরঝরে হস্তাক্ষর! ধূমায়িত চায়ের কাপ টিপয়ের 'পরে তেমনি পড়িয়া রহিল, চিঠিতে মন দিলাম।

সুনীল, প্রমীলা মারা গিয়াছে।

ঃ সহসা যেন প্রবল একটা শক্ খাইয়া শরীরের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীগুলো অসাড় হইয়া গেল!

প্রমীলা মারা গিয়াছে! কিন্তু কেন? কেন প্রমীলা মারা গেল? প্রমীলা মারা গিয়াছে! মিথ্যা কথা! প্রমীলা মারা যায় নাই। মারা যাইতে পারে না।

মনের সবখানি জুড়িয়া আজিও যে প্রমীলা বাঁচিয়া আছে তবে কেমন করিয়া ইহা সম্ভব!...

আবার চিঠির 'পরে চোখ বুলাইলাম ঃ না, ঐত' সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে ঃ সুনীল, প্রমীলা মারা গিয়াছে। আমি জানি তুমি একথা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু সূর্যের আলোর মতই ইহা সত্যি। ঐত' সামনের ঐ মেহগনী খাটের 'পরে দুধের মত শাদা ধবধবে শয্যায় প্রমীলার প্রাণহীন হিমানীর মত শীতল ও কঠিন দেহ পড়িয়া আছে। কিন্তু এর জন্য কে দায়ী জান? আমি! হাঁ আমি। আমিই প্রমীলার এই অকাল অপমৃত্যুর কারণ! কিন্তু তবু কেন মনে হয় এ তাঁর অভিমান নয়; প্রকান্ড একটা ভুল। হাঁ ভুল বৈকি। যে মুহূর্তে সে বুঝতে পেরেছিল আমাদের মিলনের মাঝে আর যাই হোক ভালবাসা নেই সেই মুহূর্তেই ত' সে এই বন্ধনহীন গ্রন্থী ছিঁড়ে দিয়ে যেথায় খুশী চলে যেতে পারত, আমি ত' তাকে বাধা দিতাম না।

তবু কেন সে একাজ করলে? ভাবতে পার সুনীল! প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে? শঙ্খের মত শুভ্র নিটোল নরম গলার 'পরে শক্ত শণের দড়ির নীল দাগটা যেন জীবনকে মৃত্যুর একটা পরিপূর্ণ পরিহাস!

শাদা-নীলচে ঠোঁটের কোল বেয়ে রক্তের দাগটা কালচে হয়ে শুকিয়ে আছে।

গত বছর হতেই আমাদের সংসারে একটা চিড় লেগেছিল।

আমরা দুজনেই চাকরী করতাম। যদিও মোটেই আমার সে ইচ্ছা ছিল না। কেননা বৌকে প্রতিপালন করবার ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ অন্তত আমি করতাম না। প্রমীলাও হয়ত তা জানত। প্রমীলা স্থানীয় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের মেয়েকে লেখাপড়া শিখাত। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বিপত্নীক! প্রায়ই রাত্রে সে তার মোটরে ক'রে প্রমীলাকে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে যেত।

প্রথম প্রথম যেন কতকটা ইচ্ছা করেই ওদিকে নজর দিতাম না। কিন্তু পুরুষের চিরন্তন কাপুরুষতাই একদিন আমার সহজ সৌজন্যতা ও ভদ্রতাকে কণ্ঠ চেপে ধরল।...

স্পষ্ট বললাম ঃ প্রমীলা চাকরি ছেড়ে দাও।

সে শুধালে, কেন গো?

এমনি, আমি জবাব দিলাম।

তুমি কি পাগল হলে? সামান্য খেয়ালের বশবর্তী হয়ে দেড়শ টাকা মাহিনার চাকরিটা ছেড়ে দেব!......

খেয়াল নয়। এটা আমার ইচ্ছা!

এ তোমার অন্যায় ইচ্ছা!

তবু এ তোমার স্বামীর ইচ্ছা! একটু কঠিন সুরেই বললাম, সহজ ও সুন্দর যা, তাকে বিকৃত করো না!

প্রমীলা ঘর ছেড়ে উঠে গেল।

রুদ্ধ আক্রোশে আমি ভিতরে ভিতরে ফুলতে লাগলাম। কিন্তু যে পরাজয়ের গ্লানি আমার মনের মাঝে একদিন সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গের মত দেখা দিয়েছিল, ক্রমে সেটাই লেলিহান হয়ে উঠল।

ক্রমে দুজনে দুজনের কাছ হতে দূরে দূরে স'রে যেতে লাগলাম। সামান্য কারণে মন কষাকষি! রাগারাগি, দুজনে দুজনের কাজ করে যাই! বড় একটা কথাবার্তা হয় না। কিন্তু তবু প্রমীলা চাকরি ছাড়লে না, পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটিও নিয়মিত তাকে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে যেতে লাগল তার মোটরে।

কিন্তু স্পষ্টই যেন বুঝতে পারছিলাম এমনি করে আর বেশী দিন চলবে না।

ফাঁকির কারবার একদিন ভেংগে যাবে।

কিন্তু তারপর?

পরশু যখন প্রমীলাকে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বাড়ি পেণছে দিতে এল তার মোটরে, রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা। ইদানিং সে প্রায়ই একটু রাত্রি করে বাসায় ফিরত। কিন্তু এত রাত্রি কোন দিনও হয়নি।

রাত্রে আর কোন কথা বললাম না।

ভোরবেলা উঠেই প্রমীলার ঘরে গেলাম। প্রমীলা তখন সবে বিছানা হতে উঠে খোলা চুলটা হাত দিয়ে জড়াচ্ছে। ঘুমক্লান্ত চোখের পাতা অর্ধনিমিলিত। কোন প্রকার ভণিতা না করে বললাম ঃ শোন প্রমীলা। আমায় তুমি না মানতে পার। কিন্তু আমাদের বিবাহের বন্ধনটাকে মানছ নিশ্চয়ই? কেননা এখনও যখন সেটা তুমি অস্বীকার করছ না। তাই তোমায় জানাতে এলাম। আমার সঙ্গে এক বাসায় থাকতে হ'লে এ ব্যভিচার তোমায় বন্ধ করতে হবে। তোমার মনে রাখতে হবে তুমি ভদ্রলোকের বিবাহিত স্ত্রী! ঘরের চৌকাঠ ও বাইরের রাস্তা দুটোর মাঝখানে ব্যবধান অনেকটা।

ব্যভিচার? অস্ফুট স্বরে প্রমীলা বললে.—

হাঁ!...কচি খুকীটি তুমি নও যে এটা তুমি বোঝ না। একজন ভদ্রমহিলার পক্ষে সারারাত পরপুরুষের সঙ্গে কাটিয়ে এলে সেটা কেমন দেখায় নিশ্চয়ই তা বুঝতে পার!

অসহ্য রাগে ও ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল।

কী বলছো তুমি!...আমি...প্রমীলার গলার স্বর আটকে আসে।

ছি! তোমার লজ্জা হয় না; কিন্তু লজ্জায় আমার যে সর্বশরীর কালিয়ে ওঠে!...তোমার মুখ দেখতেও ঘৃণা হয়। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম এবং সোজা একটা জামা গায়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। অভিমানে রাগে দুঃখে ও লজ্জায় সর্বাংগ তখন আমার বিষের জ্বালায় জ্বলছিল।

সারাটা দিন অনাহারে পাগলের মতই রাস্তায় রাস্তায় ছুটাছুটি করে বেড়ালাম।

আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেন সব গুলিয়ে একাকার হয়ে গেছে!

মিথ্যা, মিথ্যা সব!

শ্রান্ত হয়ে গভীর রাত্রে মনটা তখন অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছে, বাড়ি ফিরলাম।

চাকরটা ঘুমিয়ে ছিল। ডাকতে উঠে দরজা খুলে দিল।

সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। একটা আলো পর্যন্ত জ্বালান হয়নি।

সোজা উপরে উঠে এলাম। ভেজান দরজার ফাঁক দিয়া মৃদু আলোর আভাস। দরজা ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। ঘরের কোণে বাতিদানে ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতিটা তখন কম্পিত শিখাখানি নিয়ে জ্বলছে।

সহসা এমন সময় ঘরের মাঝখানে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলাম। কড়িকাঠের সাথে প্রমীলার দেহ ঝুলছে! একটা অস্ফুট জীর্ণ চীৎকার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল।

প্রমীল একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে গেছে ঃ আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এ আমার স্বেচ্ছামৃত্যু—প্রমীলা।

বলতে পার সুনীল আমি কী করবো? আমি এই রাত্রেই এদেশ ছেড়ে চললাম। তুমি প্রমীলার ভার নাও।

একদিন প্রমীলার ভার নিতে চেয়েছিলে, কিন্তু প্রমীলা তা নিতে দেয়নি। সেদিন যে ভুল সে করেছিল আজ তার সে ভুল ভেংগেছে। আজ তাই সে সম্পূর্ণভাবে তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে গেল।

* * * * *

প্রমীলা!

কলেজ লাইফের দীর্ঘ চার বছরের পরিচিতা সে আমার।

প্রমীলার মা ছিল খৃষ্টান, বাবা ছিল পাঞ্জাবী। ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাশেই তাঁহার সাথে পরিচয় হইয়াছিল। ক্রমে সে পরিচয় বন্ধুতে পরিণত হয়।

বি এস সি পাশ করিবার পর আমি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলাম। প্রমীলা এম-এ পড়িতে লাগিল।

এম-এ ক্লাশেই একদিন রাজেনের সহিত প্রমীলার আলাপ।

রাজেনের পিতা পূর্ববংগের মস্তবড় একজন জমিদার। শুধু অর্থের দিক দিয়াই নয়, রূপের দিক দিয়াও রাজেনের মত পুরুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। কাঁচা সোনার মত গায়ের রং।

সন্ধ্যাটা প্রায়ই আমার প্রমীলাদের বাড়িতেই কাটিত।

প্রমীলাদের ওখানেই একদিন রাজেনের সহিত আলাপ হইল।

মুগ্ধ হইলাম রাজেনকে দেখিয়া।

সে শুধু সুন্দরই নয়, আশ্চর্য মধুর।

তাহাকে ভালবাসিতে হয় না, জোর করিয়াই যেন সে ভালবাসায়।

তার পর প্রায়ই রাজেনকে প্রমীলাদের ওখানে দেখিতাম। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য ব্যথা অনুভব করিতাম। যেন একটা আশঙ্কা উঁকি দিয়া যাইত?

মনে মনে কতদিন প্রশ্ন করিয়াছি নিজেকেই নিজেঃ তবে কি প্রমীলাকে আমি ভালবাসি?

ক্রমে যখন এই প্রশ্নটা আমাকে একান্তভাবে পীড়ন করিতে লাগিল, এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় প্রমীলাদের ওখানে গিয়া শুনিলামঃ প্রমীলা ও রাজেনের বিবাহের বাক্‌দান হইয়া গিয়াছে।

প্রমীলা গৃহে ছিল না। প্রমীলার মা সংবাদটা দিলেন! হোস্টেলে চলিয়া আসিলাম।

আলো জ্বালিতে মন সরিতেছিল না।

অন্ধকারের নিঃশব্দে বিছানায় নিজেকে এলাইয়া দিলাম। ......কতক্ষণ এমনিভাবে শুইয়াছিলাম মনে নাই! সহসা রাজেনের কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিলামঃ সুনীল! কে? রাজেন!

রাজেন সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালাইয়া দিল।

ঃ একি! কাঁদছিলে নাকি?

তাইত! গালে হাত দিতেই আশ্চর্য হইলাম, কখন অশ্রুধারায় গাল ভাসিয়া গিয়াছে।

সিগারেট কেস হইতে একটা সিগারেট লইয়া অগ্নি-সংযোগ করিতে করিতে রাজেন কহিলঃ একটা খবর দিতে এসেছিলাম সুনীল।

আমি জানি। কিন্তু তোমার মা-বাবা কী এ বিবাহে মত দেবেন! তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান।

Hang your মা বাবা! I must obey my heart.

আচ্ছা আজ চললাম ভাই! বলিতে বলিতে সহসা সে আমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে কহিল। কিন্তু believe me সুনীল, It was out of my dream! আর যাই হোক, আমি চোর নই! ......রাজেন মুখুজ্যে আর যাই হোক পরস্বাপহরণ করে না।

এক প্রকার ছুটিয়াই রাজেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিবাহের দিন যাইতে পারি নাই।

হিংসায় নয় দুর্বলতায়। এবং বোধ হয়ত সেই দুর্বলতায়ই পরবর্তী জীবনে বিবাহ করিতে পারি নাই।

শুনিয়াছিলাম পশ্চিমের কোন এক শহরে প্রমীলা ও রাজেন নীড় বাঁধিয়াছে এবং রাজেনের পিতা রাজেনকে তেজ্যপুত্র করিয়াছে।

দীর্ঘ দুই বছর পরে একদিন প্রমীলার মার সঙ্গে মার্কেটে দেখা হইয়াছিল। তার মুখেই শুনিলামঃ তাহাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই।

কিন্তু প্রমীলার মার কথা সেদিন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কেননা প্রমীলাকে আমি চিনিতাম। জানিতাম। প্রমীলার ভুল হয় না।

তার পর দীর্ঘ তিন বছর পরে এই চিঠি।

আবার চিঠির 'পরে দৃষ্টি দিলাম।

তোমার হাত হ'তে কেড়ে এনেছিলাম বলেই বোধ হয় প্রমীলাকে রাখতে পারলাম না।

ডাক্তারের নির্মম তীক্ষ্ণ ছুরী তার সুন্দর নিটোল দেহখানি চিরে ফেলবে, এ আমি কোন মতেই ভাবতে পারছি না। চাকরটা ঘুমিয়ে আছে এই ফাঁকে আমি পালাব। কেউ জানবে না। শুধু তুমি জানলে। আমি জানি এ সংবাদ পেলে তুমি আসবেই। ঘরে তালা দিয়ে রেখে যাব। সিঁড়ির পাশে কুলুঙ্গীতে চাবী রইল। চাকরটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। এস কিন্তু। প্রমীলা একা রইল।

* * * * *

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। এক কাপড়েই, সেই অবস্থায়ই কোটটা গায়ে চাপাইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিলাম।

জুতার শব্দে সুখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় যাচ্ছেন বাবু!

পশ্চিমে যাচ্ছি!

পশ্চিমে? এত ভোরে পশ্চিমে যাবার ট্রেন কোথায়?

পশ্চিমে যাবার ট্রেন নেই!

না ত'!

তবে! প্রমীলা যে একা আছে!

মাথার মধ্যে যেন কেমন সব অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। কে যেন পিছন হইতে দু হাত বাড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে।

অজন্তা গিরিমন্দিরে

(৯২ পৃষ্ঠার পর)

গুহাগুলির মধ্যে বিজলী বাতির ব্যবস্থা করা কিংবা পেট্রোল ল্যাম্পের ব্যবস্থা করা সকলেরই জন্য, তাহা হইলে কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বরং এইজন্য বৃটিশ গভর্মেণ্ট যেমন সামান্য একটা Fee আদায় করেন, তেমন একটা আদায় করিলেই ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারে।

অজন্তার চিত্রাবলী দেখিবার আনন্দে ও বিস্ময়ে অভি-ভূত হইলাম। সেই কবে কোন্ দূর শতাব্দীতে অজন্তার এই শিল্পিগণ গুহার ছাদের নীচে, প্রাচীর গাত্রে স্তম্ভ, অলিন্দ ও বারান্দায় এই সব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। উজ্জ্বল আলোর সাহায্য তাহারা পায় নাই, অন্ধকার গুহার মধ্যে কত বড় অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহারা এই সব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা ভাবিলে তাহাদের অসাধারণ সহিষ্ণু-তার জন্য শতবার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। কি আশ্চর্য ছিল তাঁহাদের শিক্ষা ও নিপুণতা। (ক্রমশ)

ছোটনাগপুরের আদিবাসী

ভবানী পাঠক

বর্তমান ছোটনাগপুর আর গড়জাত উড়িষ্যার যে অংশ বাঙলায় 'ঝাড়খণ্ড' নামে অভিহিত সেই অংশের আদিম অধিবাসী যারা তাদেরই আদিবাসী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'আদিবাসী' কথাটির সম্প্রতি উদ্ভব হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে নব জাগ্রত রাজনীতিক চেতনা।

ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটনাগপুর অন্যান্য প্রদেশ বা বিভাগের চেয়ে রূপে গুণে অনেক উন্নত। ছোটনাগপুরের নিসর্গ শোভার তুলনা মেলা ভার। এর প্রত্যেকটি উপত্যকা ও অধিত্যকায় লতা, গুল্ম, ওষধি মহীরূহ সমাকীর্ণ অরণ্যের বিস্তার; খনিজ ঐশ্বর্যে ওতপ্রোত এর প্রত্যেকটি ভূস্তর। নদী, পাহাড়, জলপ্রপাত ও বিচিত্র বন্য পশুপক্ষীর আশ্রয় এই ছোটনাগপুর দুদিকের সমতল বিহার ও বাঙলার মাঝখানে প্রাকৃতিক গরিমায় বিশিষ্ট ও উন্নত হয়ে রয়েছে।

এই ছোটনাগপুরের অরণ্যের পশু পাখী শিকার করে, বনফল খেয়ে, ভূমি কর্ষণ করে যে অনার্য মানুষেরা তাদের জীবনচর্যা করে আসছে সেই মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, হো, বিরহোর প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদেরই বর্তমানে আদিবাসী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আদিবাসীদের পুরাতন সমাজতন্ত্র আজ আর নেই। সাধারণত জংলী বা বুনো বললে যা বোঝায় আদিবাসীদের পক্ষে তা একেবারে প্রযোজ্য নয়। বর্তমানে এরা কৃষিজীবী। আচার ব্যবহারে দ্রুত পরিবর্তনের ছোপ লেগেছে। দুটো নূতন সংস্কৃতির সংঘাতে এদের সাংস্কৃতিক জীবনও পাল্টে যাচ্ছে। একদিকে প্রচারকুশল খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব, অন্যদিকে প্রতিবেশী হিন্দুদের আচার ব্যবহার, ধর্ম ও সমাজ জীবনের স্বাভাবিক প্রভাব। এই দুই সংস্কৃতির টানে এদের সমাজ জীবন প্রতিনিয়ত রূপ ফিরিয়ে চলেছে। একটি বিশেষ প্রনিধান করার বিষয় এই যে, ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব এদের ওপর আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। অথচ অন্যান্য প্রদেশে নিম্নস্তরের হিন্দুর মধ্যে ইসলামের বিস্তার একটি ঐতিহাসিক সত্য।

বর্তমান ব্রিটিশ আইনের প্রকোপে এদের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে বাধ্য হয়েছে। পারিবারিক জীবনে এখনও ঐতিহ্যের প্রভাব এরা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বিবাহ উৎসব ইত্যাদি প্রথায় এদের অতীত সমাজ ব্যবস্থা এখনো কিছু কিছু মিলিয়ে আছে। অতীতের গোষ্ঠীগত সমাজ ব্যবস্থায় আদিবাসীদের মধ্যে যেভাবে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের নিয়ম ছিল তা বর্তমান ব্যবস্থা থেকে যেমন ভিন্নতর তেমনি উন্নত ছিল। ব্যক্তিগত সঞ্চয় অপচয় বা অভাবের অবকাশ সে সমাজে ছিল না। সেখানে সব ব্যাপারই সমষ্টির স্বার্থের প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হত।

আদিবাসীদের মধ্যে ভূম্যধিকারী নামে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি খুবই নিকট অতীতের ঘটনা। পূর্বে গোষ্ঠীই ছিল ভূমির অধিকারী। শ্রম আর ভোগ দুইই সমানাধিকার প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হতো।

পরবর্তীকালে জমির মালিক নামে একদল স্বত্বাধিকারীর সৃষ্টি হওয়ার পরও মুণ্ডা সমাজে কৃষিকার্য যেভাবে নির্বাহ করা হতো তার মধ্যে উগ্র সামন্ততন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়

কয়েকটি ওঁরাও তরুণী ফটো—সুনীল দত্ত

না। মুণ্ডারী খুঁটকাট্টিদারের স্বেচ্ছামত শস্যোৎপাদন এবং আবাদ পত্তন করতো। এটা সমষ্টিগতভাবেই করা হতো। ব্যক্তিবিশেষের জন্য বিশেষ ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট ছিল না।

ক্রমে পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থা ও আইন কানুনের প্রতিক্রিয়ায় এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিস্বার্থবাদের বীজ প্রবেশ করলো। খুঁটকাট্টিদারেরা পুত্রকলত্রের জন্য জমির উত্তরাধিকার ব্যবস্থা করলো।

সব চেয়ে বড় বিপ্লব ঘটে গেল যেদিন, কি কারণে জানা যায় না, আদিবাসীরাও 'রাজা' নামে একটি দণ্ডমুণ্ডের মালিক প্রতিষ্ঠা করলো। ক্রমে, সর্ব্বদেশের যা ইতিহাসের অভিশপ্ত অধ্যায় সেই রাজা-প্রজা সম্বন্ধ ও সামাজিক গঠনের সূত্রপাত হলো।

আদিবাসী সমাজে 'রাজা' সৃষ্টি হবার পর থেকে তাদের অতীতের উৎপাদন ও বণ্টন প্রথা চূর্ণ হয়ে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যা এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বর্তমান আদিবাসী সমাজ মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। তাদের সমাজের অর্থনীতির দিকটা আর অনন্যসাধারণ নয়! অন্যান্য প্রদেশের 'রায়ৎ' শ্রেণীর সমতুল্য।

পারিবারিক ব্যাপারে বিবাহ-উৎসবে পুরাতন সমাজতন্ত্র এখনও বিলুপ্ত হয় নি। তবে সভ্যতর প্রতিবেশীদের প্রভাবে তাও ক্রমে পরিবর্তিত হতে চলেছে।

আদিবাসীদের অতীত ইতিহাসের কোন লিখিত পরিচয় পাওয়া যায় না। এদের ভাষা আছে, লিপি নেই। এদের ইতিহাসের টুকরা টুকরা বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় শুধু এদের উৎসবের গান, রূপকথা উপকথার মধ্যে। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ইতিহাস যা পাওয়া যায় তা বৈপ্লবিক, ঘটনা বাহুল্যে পরিপূর্ণ।

মাঝে মাঝে আদিবাসীদের মধ্যে এক একটি নূতন ধর্মমতের অভ্যুত্থান হয়েছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, এই ধর্মান্দোলন শেষ দিকে রাজনীতিক অর্থ গ্রহণ করেছে—আন্দোলন পরিণত হয়েছে বিদ্রোহে। ব্রিটিশ সরকারকে কয়েকবার ভারি হাতে এই সব বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছে।

মুণ্ডাদের এক ধর্মগুরু বিরসা মুণ্ডা এমনি এক আন্দোলনের নেতা ছিলেন। মুণ্ডারা আজও তাদের 'বিরসা ভগবানকে' বিস্মৃত হয় নি। 'বিরসা ভগবান' প্রবর্তিত ধর্ম আন্দোলন শেষে বিদ্রোহে পরিণত হয়। বিরসা ভগবানকে কারাগারে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হয়।

এই ক'মাস আগেও রাঁচী পালামৌ প্রভৃতি জিলায় বিরসা ভগবানের স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতরক্ষা আইনের নির্দেশে সেটি আর সম্ভব হয় নি।

১৯১৫-২০ সালে রাঁচীর লোহারডাগা এলাকায় আর একজন ধর্মগুরু ওঁরাওদের মধ্যে নূতন মতবাদ প্রচার করলেন।

যাত্রা ওঁরাও নামে একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ সকল

দুইটি ওঁরাও যুবক ফটো—সুধীন দত্ত

ওঁরাওকে জানালেন—ভূত প্রেতে বিশ্বাস করো না, পশুবলি দিও না, মদ্যপান করো না, এমনকি হালচাষ করো না কারণ তাতে গরুবলদের প্রতি হিংসা করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব এই আন্দোলনের ওপর পড়ে। ক্রমে রাজনীতিক বিদ্রোহের আকার ধারণ করায় গবর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন দমন করতে বাধ্য হন।

আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সৌজন্যে আদিবাসীদের মধ্যে একটা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীও ধীরে গড়ে উঠেছে। এরা রাজনীতিক আন্দোলনেও যোগদান করছেন। তবে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির যে ধুয়া, এঁরাও তাকেই আশ্রয় করেছেন—সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক স্বার্থসংস্থান ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা। দুঃখের বিষয়, এ রাজনৈতিক চেতনা জাতীয়তা বোধ থেকে উৎসারিত হয় নি। আদিবাসীদের অভাব অভিযোগ যথেষ্ট আছে; তাদের দাবীর যথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। তবে যে পন্থায় সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে তা জাতীয়তার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত নয়।

অধিকাংশ আদিবাসী আজও অরণ্যের আশ্রয় ত্যাগ করতে নারাজ। ভূমি ও অরণ্যের মায়া, শিকার ও উৎসবের মোহ তাদের কাছে এখনও প্রবল। ক্ষুধার তাড়না এখনও এদের মাটী থেকে উচ্ছেদ করে খনি ও কারখানার মধ্যে বন্দী করতে পারে নি। অবশ্য বহুসংখ্যক আদিবাসী আজ নানা সহরে শ্রমশিল্পে কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে; তাদের মধ্যে একদল ভূমিহীন শ্রমজীবী শ্রেণীও আবির্ভূত হয়েছে।

বর্তমান আদিবাসী সমাজে এই সব বিচিত্র রাষ্ট্রীয়, অর্থ-নীতিক ও সামাজিক শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করছে।

(শেষাংশ ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[৯]

যখন তাহার মনের এবং দেহের আবার সক্রিয় অবস্থা ফিরিয়া আসিল তখন ভোর হওয়ার আর বিলম্ব নাই। প্রথমেই যে চিন্তা তাহার মনে দেখা দিল, তাহা হইতেছে অপরিসীম ধিক্কার ও আত্মগ্লানি! দেহের প্রতি রক্তকণা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছিঃ, তুমি চোর!

সে ভদ্রসন্তান দরিদ্র হইলেও উচ্চবংশে তাহার জন্ম, আজীবন সে শুনিয়া আসিয়াছে যে চুরি করার মত হীন কাজ ভদ্রসন্তানের পক্ষে আর নাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভাল, মোট বওয়া ভাল, কিন্তু চুরি করা কিছুতেই, কোনমতেই শ্রেয় নহে। কিন্তু আজ সে সেই সমস্ত শিক্ষা, পূর্বপুরুষদের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরবকে হেলায় তুচ্ছ করিল! তবু তাহার আগে মরিতে পারিল না?

একবার ভাবিল ফিরাইয়া দিই, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, নিঃশব্দে চুরি করা বরং সম্ভব, কিন্তু এখন গিয়া পুনরায় সকলের অজ্ঞাতসারে ফিরাইয়া দেওয়া আরও কঠিন। বহুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সে বিছানার উপরেই বসিয়া রহিল, তারপর মুখ-হাত ধুইবার অছিলায় সে একবার রাজা বাহাদুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল।

রাজা বাহাদুর তখনও ঘুমাইতেছেন। খুব সম্ভব আরও দুই-তিন ঘণ্টা ঘুমাইবেন। এখনও সরিয়া পড়িতে পারিলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই পূর্বগামী ট্রেন হয়ত একটা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চুরি ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অদৃশ্য হওয়াটা কি দুই আর দুইয়ে যোগ করার মতই সকলের চোখে সহজে ধরা পড়িবে না?

মানুষ যখন একবার একটা পাপ কাজ করিয়া ফেলে, তখন তাহার আনুষঙ্গিক চিন্তা বা কাজগুলিকেও সহজে মানিয়া লয়। অমলেরও তাহাই হইল। ইতিমধ্যেই সে তাহার মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল যে, দশ টাকার নোটের নম্বর থাকে না, সুতরাং সে যদি হোটেলে বসিয়া থাকে তাহা হইলে চুরি ধরা পড়িলেও তাহাকে ধরিবে কি করিয়া? এবং এমন কথাও তাহার মনে আসিতে বাধিল না যে, ঐ মদ্যপের হাতে টাকাটা থাকিলে ত বাজে খরচ হইতই, বরং তাহার হাতে টাকাটা পড়িলে তাহার কাজে লাগিবে বলিয়াই ভগবান তাহাকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু তবুও সে ঘরে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, কম্পিতবক্ষে রাজা বাহাদুরের ঘুম ভাঙ্গিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার সেই সময়কার পাংশু, বিবর্ণ মুখ ও অস্থির ভাব দেখিলে যে কোনও পুলিশের লোক বুঝিতে পারিত যে, সে কোনও একটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য করিয়া প্রতিমুহূর্তেই তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলের আশা করিতেছে!

ঘণ্টাখানেক পরে রাজা বাহাদুরের ঘুম ভাঙ্গিল। তাঁহার হাঁকডাক, চাকরবাকরের ছুটাছুটি এবং হোটেলওয়ালাদের সন্ত্রস্ত ভাবেই সেই মহা ঘটনাটি বিজ্ঞাপিত হইল। সময়কার প্রতি মুহূর্ত অমলের কাছে এক একটি যুগ ব মনে হইতে লাগিল; তাহার এক এক সময় মনে হইতে লা যে, আশঙ্কায় তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাই চুরি করা যে এত কঠিন কাজ, তাহা সে জীবনে কো কল্পনা করিতে পারে নাই।

যাহা হউক—রাজা বাহাদুর দাড়ি কামাইয়া, স্নান সা *গাড়ি ডাকাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। পকেটের অনেক নোটের সবগুলি আছে কি না সে হিসাব করা তাঁহার প সম্ভবও ছিল না, তিনি সে চেষ্টা করিলেনও না। কে অমলের পরমায়ুর অনেকখানি শুধু দুশ্চিন্তায় ক্ষয় হ গেল।*

কিন্তু সে একটু সুস্থ হইয়াই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই স্নান সারিয়া, শেষবার হোটেলের অন্ন গ্রহণ করিল। বিভা বাবুর মতই যে সর্বাপেক্ষা সার, ইহা সে এই কদিনে নিজে মনের মধ্যে অনুভব করিয়া লইয়াছিল, সেইজন্য হোটেলে চাকর-বাকরদের স্পষ্ট অবজ্ঞা হজম করিয়াও অনায়াসে সেদিনও সেখানের খাবারই আনাইয়া লইল। নিতান্ত প্রয়োজ ভিন্ন সে আর একটি পয়সাও খরচ করিবে না, মনে ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে হোটেলে যখন সকলে কাজে ব্যস্ত তখন নিজে পরিধেয় কাপড়জামাগুলি একটা খবরের কাগজে জড়াই যথারীতি ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তা বাহির হইয়া যখন ট্রামে চড়িয়া বসিল, তখন তাহার বক্ষ ভে করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। জীবনে যে স আশা তাহার ছিল আজ তাহার কোনটারই পূর্ণ হইবা সম্ভাবনা নাই, বরং এই বিপুল শহর, এই রাজধানীতে আসি কলঙ্কের গভীরতম পঙ্কে নামিয়া গেল। জীবনে যদি কখন সে অর্থ উপার্জন করিতেও পারে, তাহা হইলেও এ কলঙ্ক কখন মুছিবে না!

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিল যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কলিকাতাগামী একটা ট্রেন ছাড়িবে। সে কম্পিতবক্ষে একখান টিকিট কিনিয়া কোনমতে একটা থার্ডক্লাস কামরায় ঢুকি পড়িল। ভয় তাহার হোটেলওয়ালাদের; যদি কোনও গাইড তাহাকে কলিকাতাগামী গাড়িতে চড়িয়া বসিতে দেখে, তাহ হইলে কি অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করিয়াই অমলের ললা ঘাম দেখা দিল। লাঞ্ছনার ত অবধি থাকিবে না, উপরন্তু হয় হাজতে যাইতে হইবে।

কিন্তু কোনমতে সে একঘণ্টা সময়ও কাটিয়া গেল এব একসময়ে সত্যই ট্রেনখানা দিল্লির প্লাটফর্ম পার হইয়া চলিতে শুরু করিল। একটা লোক একটা বড় শহরে প্রাণপণ চেষ্টা ঘুরিলেও অন্নসংস্থান করিতে পারে না একথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বোধ হয় সে বিশ্বাস করিতে পারিত না, কিন্তু আ আর সে বিষয়ে সংশয় নাই, আজ সেই ক্রমবিলীয়মান শহরে

চাহিয়া অকস্মাৎ দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আজ হইল, মা-বাপ, ভাইবোনের মধ্যে থাকিয়া পঁচিশ টাকা ও অনেক সুখের হইত!

কলিকাতায় ট্রেন পৌঁছিল পরদিন সন্ধ্যায়। হাওড়ায় ...ল জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আশ্রয়ের আশু চিন্তাটা তাহাকে ...ম করিলেও সে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হইল। মনে ...ল যে এ তবু স্বদেশ, এখানে হয়ত উপবাস করিয়া মরিতে ...বে না! সে অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া বাসের নিকট ...ন্ত আসিয়া দ্বিধায় পড়িল, তারপর অভ্যাসবশত হ্যারিসন ...ডের বাসেই উঠিয়া পড়িল। কলেজ স্কোয়ারের পাড়া ছাড়া ...র কোথাও আশ্রয়ের কথা সে মাথায় আনিতে পারিল না। ...ন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিতেই যে লোকটি বাসে ...ঠিল, তাহাকে দেখিয়া আশঙ্কায় অমলের মুখ শুকাইয়া ...ঠিল। লোকটি আর কেহ নয়, আগের মেসের কার্তিকবাবু। ...নি উঠিয়াই অমলকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে ভায়া ...! কোথায় থাক আজকাল? কি করছ?

কার্তিকবাবু তাহার পাশে আসিয়া বসিলেন। অমল ...প্রতিভ হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, কাজকর্মের চেষ্টায় একটু ...শ্চিমের দিকে গিয়েছিলুম; সুবিধে হ'ল না, তাই চলে ...সছি—

কার্তিকবাবু অনুকম্পার সুরে কহিলেন, কি আর বলব ...ই, ছেলেমানুষ তোমরা, মিথ্যে হাঁকড়-পাঁকড় কর। কল্‌কাতা ...ড়া পয়সা রোজগারের জায়গা আর নেই, যতই দিল্লি লাহোর ...ও না কেন!...তা মালপত্র ত নেই, সে সব কি রেখে আসতে ...ল নাকি?

শেষের কথাগুলি নিম্নস্বরে বলিলেও অমলের মুখ বিবর্ণ ...ইয়া উঠিল। সেদিকে চাহিয়াই কার্তিকবাবু ব্যস্ত হইয়া ...ঠলেন, আরে কী আশ্চর্য, এতে লজ্জা পাবার কি আছে? এ ...জ আমার জীবনেই কি কম করেছি? বলি জুয়া ত আর ...জ থেকে খেলছি না!...ওতে লজ্জা পেওনা ভায়া—ওতে ...জ্জা পেওনা।

ততক্ষণে গাড়ি কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়াছে; ...ভয়েই বাস হইতে নামিয়া পেভমেণ্টে দাঁড়াইলেন।

কার্তিকবাবু কহিলেন, তার পর কোথা যাবে এখন?

অমল নতমুখে কহিল, তাই-ত ভাবছি, কোথায় যাই—

কার্তিকবাবু কহিলেন, ইস্ তাইত, সঙ্গে ত দেখছি ...ছানাপত্রও নেই। ....তা এক কাজ কর, আজকের মত ...মার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে একটা সতরঞ্চি আর বালিশ ...য়ে দিই, কোনও ধর্মশালা কি হোটেলে গিয়ে থাক। কাল ...কালে বাসা-টাসা খুঁজে নিও—। এই এখানেই, নবীনকুণ্ডু ...লেনে—

তাঁহার সহিত যাইতে যাইতে অমল কহিল, ইন্দু ...ছে আপনাদের মেসে?

কার্তিকবাবু জবাব দিলেন, আছে বৈকি! পাশ করেছে, ...কন্তু স্কলারশিপটা পেলে না, চাক্‌রি খুঁজছে—

অমল কহিল, কাল আমার সঙ্গে সকালে দেখা করতে বলবেন? আমি যেখানেই থাকি আজ রাত্রে, কাল সকালে হেঁদোতে যাব, সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে।

কার্তিকবাবু কহিলেন, বিলক্ষণ, তা বলব না কেন? এক ফাঁকে চুপি চুপি ভোরবেলাই জানিয়ে দেব এখন।

অমল আর কথা কহিল না, ভাবিতে লাগিল ইন্দুর কথা, বেচারা স্কলারশিপটা পাইল না তাহা হইলে! ইন্দুর উচ্চশিক্ষার আশা এইখানেই শেষ, পড়াশুনা আর চলিবে না। বেচারী!

নবীনকুণ্ডু লেনের এক জরাজীর্ণ বাড়ির দ্বারে আসিয়া কার্তিকবাবু কড়া নাড়িলেন। বহুক্ষণ কড়া নাড়িবার পরে গৃহস্বামী একটি ভাঙা হ্যারিকেন হাতে দেখা দিলেন; বয়স কার্তিকবাবুর মতই, তবে চুল কিছু বেশী পাকিয়াছে। ছেঁড়া কাপড় পাট করিয়া পরিয়াছেন, তবু লজ্জা নিবারণ হওয়া কঠিন। কিন্তু কার্তিকবাবুকে দেখিয়াই সকলরবে অভ্যর্থনা করিলেন, আরে কাত্তিক যে, এস, এস, ইটি কে ভাই?

কার্তিকবাবু কহিলেন, এর জন্যেই এসেছি রে, একটা সতরঞ্চি, আর একটা বালিশ দিতে পারিস? এই ভদ্রলোক আজই দিল্লি থেকে আসছেন, বিছানা-বাক্স সব পথে চুরী গেছে; আজ রাত্রে শুতে হবে ত! ......কী, পারবি দিতে?

বোধ হয় মুহূর্তকালের জন্য ভদ্রলোকের মুখ মলিন হইয়া উঠিল; খুব সম্ভব বালিশের অবস্থা চিন্তা করিয়াই; পরক্ষণেই কিন্তু আবার মুখে হাসি ফুটিল। কহিলেন, বিলক্ষণ, তা আর পারব না। আসুন দাদা, ভেতরে আসুন —আয় কাত্তিক!

যেটি বাহিরের ঘর, সেটিরও অবস্থা শোচনীয়; একটি জীর্ণ তক্তপোষের উপর মসিমলিন শতরঞ্চি, তাহার উপর অজস্র কালিমাখা বইখাতা ছড়ানো; ছেলেরা ইহারই উপর বসিয়া পড়াশুনো করে বোঝা গেল। গৃহস্বামী লজ্জিত-মুখে কহিলেন, বস্‌তে বলব কি, ঘরের যা ছিরি! ...... আ মোলো, আবার ঘুঁটেগুলোও দেখ্‌ছি ঝি-মাগী ঘরের মধ্যে তুলে রেখেছে!

শুধু ঘুঁটে নয়, এক বস্তা ছোবড়াও তোলা আছে; আর আছে এক পুঁটুলি তুলা। ইঁদুরে কাটার ফলে ঘরময় ছড়াইয়া আছে। বই-খাতাগুলা সরাইয়া একপাশে জড়ো করিয়া রাখিয়া বলিলেন, বসুন ভাই, ভেতর থেকে আস্‌ছি একটু, বোস্ কাত্তিক, ...চা খাবি?

কার্তিকবাবু সম্মতি জানাইয়া বিড়ি ধরাইলেন। কহিলেন, এ হ'ল গঙ্গাধর, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, এমন ভাল মন মানুষের মধ্যে দুর্লভ! কিন্তু অবস্থা খারাপ, এই পৈত্রিক বাড়ী তাও বাঁধা আছে। মাইনে ত পায় মোটে বায়াত্তর টাকা! ......পথে বস্‌তেই হবে একদিন, ...তবু, এমনি ক'রে যে ক'টা দিন যায়!

অমল বিস্মিত হইয়া কার্তিকবাবুর দিকে চাহিল, এই লোকটিকে এতদিন শুধু পাকা জুয়াড়ী বলিয়াই জানিত,

কিন্তু ইহার মধ্যেও যে হৃদয় আছে, তাহা সে বোধ হয় কল্পনা করে নাই। মিথ্যাকথা সত্যকথার মতই অনায়াসে বলিয়া যায়, মানুষের চরম সর্বনাশের বার্তাও সহজ কণ্ঠে প্রকাশ করে, নিজের স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে লোকটি সম্পূর্ণে নির্বিকার, কিন্তু তবুও কোথায় একটু হৃদয় এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে। নহিলে তাহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনিবে কেন?

গঙ্গাধরবাবু ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, ওরে, মলিনার মা বলছিল যে ভদ্রলোকটি আজ থাকবেন কোথায়? তোর বাসায় নিয়ে যাবি?

কার্তিকবাবু কহিলেন, না, সেখানে একটু অসুবিধা আছে। ...আজ রাত্রে কোনও ধর্মশালায়, নয়ত হোটেলে থাক, কাল বাসা খুঁজে নেবে এখন—

গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, তাতে দরকার কি, উনি আজকের রাতটা এখানেই থাকুন না, অবিশ্যি অসুবিধা হবেই একটু, কিন্তু ধর্মশালার চেয়ে ভাল হবে—

কার্তিকবাবু অমলের মুখের দিকে চাহিলেন; অমল ইতস্তত করিয়া কহিল, একটা রাত বৈ-ত নয়, খামকা ভদ্রলোক-দের বাড়িতে উৎপাত ক'রে লাভ কি?

গঙ্গাধরবাবু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না, উৎপাত কিচ্ছু না, একটা রাত গরীবের ঘরে কোনরকমে থাকু কাল ধীরে সুস্থে বাসা খুঁজে নেবেন এখন!

অমল তবুও ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া কার্তিকবা কহিলেন, না না, কিছু ভয় নেই। সে রকম লোক হ এখানে আনতুম না!...তুমি এখানে থাক, কাল সকালে ইন্দু বরং এখানেই আসতে বলব। আচ্ছা, আসি তাহলে গঙ্গাধর

ইতিমধ্যে বছর দশেকের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে চা বাটি হাতে প্রবেশ করিল। কার্তিকবাবু কহিলেন, ওঃ চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

চা খাইতে খাইতে কার্তিকবাবু চুপি চুপি বলিলে কোথায় বাসা নাও আমাকে জানিও ভায়া, আসছে শনিব একটা নির্ঘাৎ খবর পাওয়া গেছে; বেশী নয় দুটি টাকা দি বরাত ঘুরিয়ে দেব!

চা খাইয়া কার্তিকবাবু প্রস্থান করিলেন।

গঙ্গাধর কহিল, ভায়া কি চান করবে, তাহ'লে এস আ আস্তে। যা অন্ধকার বাড়ি, কলতলাও ভাঙ্গা, আমি আ ধ'রে নিয়ে যাই, সাবধানে চলে এস— (ক্রমশ)

ছোটনাগপুরের আদিবাসী

(৯৭ পৃষ্ঠার পর)

আদিম যূথসংহত গোষ্ঠী জীবন বহুধা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করছে। আবার একদিকে এক শ্রেণী তাদের অতীত আরণ্যক জীবনের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পশু শিকার, মহুয়া চোলাই, মাদল পিটিয়ে উৎসব আর নৃত্যের উল্লাস আর ডাইনী পোড়ান—অনগ্রসর আদিবাসীদের মধ্যে এ সব আদিমতা এখনও প্রচলিত। তীর ধনুকের মায়া কাটিয়ে ওঠা এদের পক্ষে অসম্ভব। এরা এখনও তাদের প্রাচীন টোটেম প্রধান ধর্মের অনুসরণ করে। নরনারীর সম্পর্কও কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক নৈতিক আদর্শের বিচার শ্লথ। কোন কোন সমাজে যৌন সম্পর্কের স্বাধীনতা বিশেষভাবে খর্ব করা হয় নি।

আদিবাসী সমাজে নারীর স্থান সভ্য সমাজের চেয়ে উন্নততর। এখানে সে পুরুষের চেয়ে মর্যাদায় ও অধিকারে বড় না হোক ছোট নয়। আদিবাসী সমাজের নারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধরণ ধারণ লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, এদের সেই অতীতের মাতৃতান্ত্রিক আভিজাত্য এখনও রেশ টেনে চলেছে।

একটা বিষয় মনে রাখা উচিত যে, আদিবাসীদের সকলকেই রুচি ও সভ্যতা অনুসারে একই পর্যায় ফেলা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে বুনো বর্বর গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আজও আছে। কিন্তু মোটের ওপর আদিবাসীরা সংস্কৃতি-হীন জাতি নয়। আর্য সভ্যতা আছে, দ্রাবিড় সভ্যতা আছে; তেমনি আদিবাসীদেরও একটা সভ্যতা এক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার নিদর্শন আজও রয়েছে। এদের কারু-শিল্প, বয়নশিল্প, দারুশিল্প, গৃহস্থালীর সামগ্রী প্রভৃতি নির্মাণে একটা বিশেষ রীতি ও কুশলতা দেখা যায়। শিল্প সামগ্রীর উৎকর্ষতায়ও একটা রুচির ছাপ পাওয়া যায়। গৃহকুটীর নির্মাণ ও আল্পনা প্রভৃতির পদ্ধতিতে আদি-বাসীদের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের নাচ গান ও ছড়ার মধ্যেও কবিত্বশক্তির প্রমাণ কিছু কম নেই।

তবে যে দেশে এদের বাস তার ভৌগোলিক প্রকৃতির জন্যই তাদের সংস্কৃতি অরণ্যের দুর্গমতা ভেদ করে সমাজে পরিব্যাপ্ত হবার সুযোগ পায় নি।

বর্বরতার এক অধ্যায়

শ্রীশ্যামকুন্ড

ধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে মানুষ স্বীয় ধর্মমত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না—মন হয়ে যায় সংকীর্ণ; মনের সচলতা অচলতা প্রাপ্ত হয়। মানবীয় ধর্ম ভুলে মানুষ হিংস্র পশুর চেয়ে হয় নিষ্ঠুর। প্রাণ ধর্ম, মনুষ্য ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে আনুষ্ঠানিক ধর্মের জন্যে মানুষ যে কত নির্মম হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় পোপের বিরুদ্ধবাদীদের বিচারার্থ বিচারালয়ের নির্যাতনের অভিনব প্রণালী হতে।

প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধবাদ (heresy) দমন করবার জন্যে এবং প্রচলিত ধর্মমতের (heretic) বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূল করবার জন্যে রোমান ক্যাথলিকদের Inquisition-এর প্রতিষ্ঠা। Albigenesরা রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধবাদী ছিল। Albigenesদের কর্ম প্রচেষ্টা, মতবাদ, মনের সক্রিয়তা ধ্বংস করার জন্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ও যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার কল্পনা পোপ Innocent-এর মনে জাগে। এরই ফলে, ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগে Holy Inquisition-এর প্রতিষ্ঠা। Dominique ছলেন এর প্রথম Inquisitor- General.

Inquisition প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গে এর নেতারা বিরোধীদের সমূলে বিনাশ করবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দেশের সর্বত্র গুপ্তচর নিযুক্ত করা হলো। কারও মুখ হতে সন্দেহজনক অতি নগণ্য উক্তি বার হলেই তাকে Inquisition-এর বিচারশালায় আহ্বান করা হত। সাক্ষীরা নির্বিচারে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে যেত। এরা কেবলমাত্র যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধীদের প্রতি ঘৃণার জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিত তা নয়—ধর্মযাজকদের খুসী করবার আগ্রহ ছিল এদের অপরিমেয়।

খৃষ্টীয় ১২৩৩ সালে Toulonse-এ প্রথম পোপ-বিরোধীদের বিচারার্থ বিচারালয় (Inquisition) প্রতিষ্ঠিত হয়। Toulonseএর এই বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পাঁচ বছর পরে Aragonএ অনুরূপ আর একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। এর পর পোপ-বিরোধীদের দমন করবার আন্দোলন চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়তে লাগল। জার্মানি, হল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্সে প্রচলিত ধর্মমতবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড অভিযান আরম্ভ হলো।

এইসব বিচারালয়ের ঘর ছিল প্রকান্ড বড়, যেন একটি রাজপ্রাসাদ। নানা কারুকার্যে ঘরগুলিকে সুন্দর করবার চেষ্টার কোন ত্রুটিই হত না। কেবল পর্তুগীজদের Inquisition সম্বন্ধে আলোচনা করলে কিছু ধারণা করা যায়। পর্তুগীজদের বিচারালয়ের বিচারের জন্যে চারটে কক্ষ থাকত। প্রত্যেকটি কক্ষ সমচতুষ্কোন—৪০ ফিট প্রশস্ত, ৪০ ফিট দৈর্ঘ্য। প্রাসাদের মধ্যেই প্রধান বিচারপতির জন্যে স্বতন্ত্র সুবিস্তীর্ণ বাসগৃহের ব্যবস্থাও ছিল। বিশাল প্রাঙ্গণের চারিদিকে অনেকগুলো সারি সারি বৃহৎ বৃহৎ সুরম্য কক্ষ থাকত। ঐ ঘরগুলোর কতকগুলো অভ্যর্থনার জন্য ব্যবহার করা হতো। আর কতকগুলো হতে রাজপরিবারের লোকেরা, বিচারালয়ের কর্মকর্তারা এবং অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অবসর বিনোদনের জন্যে দন্ডবিধান দেখতে আসতেন।
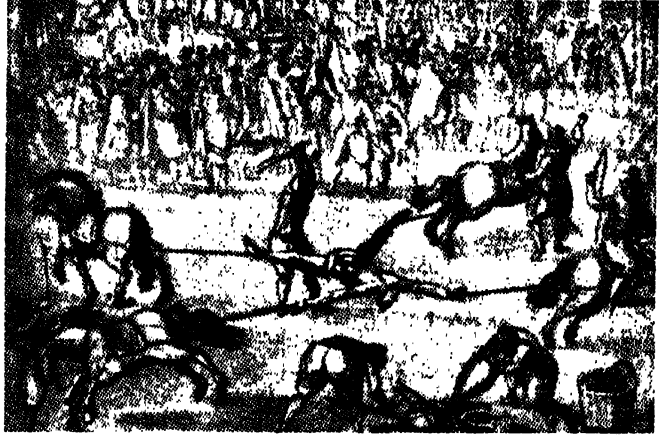
১৬১০ সালে ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরীকে হত্যার অপরাধে দণ্ডিত রাভাইলাকের শেষ পরিণাম।
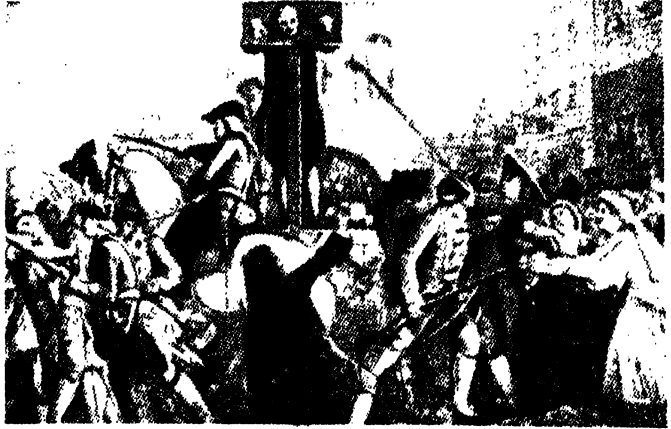
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে অপরাধীর মাথা ও হাত কাঠের ফ্রেমে আটকে রেখে জনসাধারণের সামনে লাঞ্ছনা দেবার রীতি ছিল। 'রবিনসন্ ক্রুশোর' লেখক ডেনিয়েল ডিফোকে এ্যাংগ্লিকান চার্চের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশের অপরাধে এইভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।

হতভাগ্য বন্দীদের যেসব অন্ধকারময় কুঠরীতে রাখা হতো, তার সঙ্গে এইসব অভ্যর্থনা কক্ষগুলোর তুলনা করে বৈষম্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। পর্তুগীজদের Inquisitionএ বন্দীদের জন্যে ছোট ছোট তিনশত কুঠরী ছিল। এই কুঠরীগুলো ছিল যেমন অন্ধকার, তেমনি স্যাঁতসেতে। প্রতি কুঠরীতে বন্দীদের ব্যবহারের জন্যে একখানা নিকৃষ্ট ভাঙ্গা খাট, একটা মূত্রাধার, একখানা গামলা, দুটো কলসী, একটা প্রদীপ আর

একখানা থালা দেওয়া হতো। বন্দীদের আহার্য যে কেবলমাত্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল তা নয়--পরিমাণেও তা নিতান্ত কম। কথা বলা, কোনরকম গোলমাল বা শব্দ করার কোন অধিকার বন্দীদের ছিল না।

কোনরকম বিচার বা পরীক্ষার পূর্বে অধিকাংশ সময়েই বন্দীদের এইসব অন্ধকূপে মাসের পর মাস আবদ্ধ করে রাখা হতো। এই ব্যবস্থার ফলে বন্দীদের মনের জোর ধীরে ধীরে কমে যেত। মনের শক্তিকে এইভাবে নষ্ট করার প্রথা তাঁদের সুচিন্তিত ব্যবস্থা।

বিচারকমন্ডলীর সম্মুখে বিরুদ্ধবাদীদের এনে তাদের সত্যকথা প্রকাশ করতে ও দোষ স্বীকার করতে বলা হ'তো। এ ছাড়াও তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হতো—তারা ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের গোপন তথ্যগুলি প্রকাশ করবে না। বন্দী বিচারকদের সর্তে সম্মত হলে নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাকে যেতে হতো; আর অস্বীকার করলে তাকে পুনরায় সেই অন্ধকূপে ফিরে যেতে হতো।

পরীক্ষা আরম্ভ হলে বিচারকমন্ডলীর সভাপতি তাকে নানা রকমের প্রশ্ন করতেন। একজন কেরাণী বন্দীর জবাবগুলি লিখে রাখতো।

প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হবার দিন-কয়েক পরেই অভিযুক্তকে পুনঃপরীক্ষার জন্যে আবার বিচারকমন্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করা হতো। তাকে স্বীকার করতে বলা হতো যে সে ধর্ম বিরোধী অপরাধে অপরাধী। একথাও এই সঙ্গে জানানো হতো যে তার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং অনেকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং তাঁরা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী। কিন্তু প্রমাণের বিষয় ও সাক্ষীদের নাম তাকে জানান হতো না। বন্দীদের কাছ হতে স্বীকারোক্তি বার করতে সহজে না পারলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হতো।

খৃঃ ১২৫২ সালে Pope Innocent অপরাধীদের স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্যে উৎপীড়নের আদেশ জারী করলেন। Inquisitorদের বিচিত্র রকমের উৎপীড়ন প্রণালী দেখে মনে হতো যে তাঁরা এই প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য বেশ মাথা ঘামাতেন। তাঁরা দিনের পর দিন নূতন নূতন উৎপীড়ন প্রণালী আবিষ্কার করতেন। তাঁদের উৎপীড়নের ফলে সবল দেহ দৃঢ়চেতা লোকদেরও দেহমনের শক্তি ধীরে ধীরে কমে যেত।

দোষ স্বীকার না করলে অপরাধীদের মনে উৎপীড়নের বিভীষিকা সৃষ্টি করা হতো। অনেক সময় নিষ্ঠুর উৎপীড়নের ভয় দেখিয়েই কার্য উদ্ধার করা হতো। এতে যদি কার্য উদ্ধার না হতো তা' হলে তাকে পীড়ন-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হতো। সেই পীড়ন-কক্ষগুলো ছিল অত্যন্ত ভীষণ ও ভয়াবহ। অত্যন্ত সবল স্নায়ু না হলে সকলেই সে দৃশ্য দেখে ভয়ে আতঙ্কে ও নৈরাশ্যে মুহ্যমান হয়ে পড়ত।

পীড়ন-কক্ষগুলি সাধারণত মাটির নীচে জানালাবিহীন হতো। সামান্য বাতির আলোতে সে ঘরের অন্ধকার দূর হওয়া দূরে থাক আরও গাঢ় হয়ে উঠত। সেই কক্ষের ভিতরে কালো কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃত উৎপীড়ক নর-পিশাচদের দেখে আতঙ্কে সমস্ত শরীর শিউরে উঠত।

উৎপীড়ন-কক্ষের ভয়াবহ দৃশ্য, উৎপীড়ন যন্ত্রের ভীষণতা, উৎপীড়কগণের ভয়ংকর মূর্তি দেখেও যদি কোন বন্দী অবিচল থাকত তা'হলে তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে তার হাত পা বেঁধে ফেলা হতো। Limboret বলেছেন যে পুরুষনারী সকলকেই নির্বিচারে বিবস্ত্র করা হতো। অনেক সময় নিষ্পাপ ও পবিত্রতম কুমারীরাও এ'দের হাত হতে মুক্তি পেত না।

বন্দীদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে হাত পা আবদ্ধ করেও যদি কোন ফল না হতো তা'হলে বিচারকমন্ডলীর পশুত্বের নগ্নমূর্তি আত্মপ্রকাশ করত। উৎপীড়করা কপিকল, হাত পা সম্প্রাসন যন্ত্র ও আগুন সাধারণত উৎপীড়নের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া আরও অন্যান্য প্রকারের উৎপীড়নের প্রণালীও ছিল।

যে সব হতভাগ্য Inquisitorদের কবলে পড়ত নির্বাসন বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চলত। Leaএর মতে বহুদিনব্যাপী অন্ধকারায় বাস করে আর পুনঃপুন উৎপীড়িত হয়ে তাদের চিন্তাশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসত; শেষে তাদের ধারণা হতো--তাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তা' সত্যি, তারা বুঝি সত্যই অপরাধী।

নিষ্ঠুর উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে অপরাধী নিরপরাধী-নির্বিশেষে দোষ স্বীকার করত। অনেক নির্দোষ ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করত না—তাদের ওপর চলত অবিরাম অত্যাচার। পীড়নে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ত। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে আবার তাদের অন্ধকারময় কক্ষে নিয়ে যাওয়া হতো।

নির্যাতিত একটু সুস্থ হলে বিচারকমন্ডলীর নির্যাতনের আর একটা ভীষণরূপ আত্মপ্রকাশ করত। নির্যাতনের পেষণে স্বীকার করলে দু'রকম শাস্তি ভোগ করতে হতো--হয় অন্ধকার কারার অন্তরালে সারাজীবন কাটাতে হত, নয় মৃত্যুকে বরণ করতে হতো। প্রায় সকলকেই এই দু'য়ের একটা শাস্তি ভোগ করতে হতো। অথবা, অত্যাচারের যে রথচক্র তাদের ওপর দিয়ে চলে যেতো তার ফলে নির্ধারিত শাস্তি পাবার আগেই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

স্পেনে পাষন্ড দলনের বীভৎস প্রথা। অপরাধীদের জীবন্ত দগ্ধ করা হচ্ছে।

এইরূপ অমানুষিক নির্যাতন কত হতভাগ্যকে, কত নিরপরাধীকে পৃথিবীর বুক হতে সরিয়ে নিয়েছে তার ইতিহাস অন্ধকারেই রয়ে গেছে। নির্যাতিতদের আত্মা আজও আমাদের চারিদিকে আর্তনাদ করে ফিরছে। নির্যাতকের নানা রকমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক উৎসৃষ্ট বলি মৌন থেকে গেছে। অসংখ্য অত্যাচারেও তাদের মুখ হতে একটা কথাও বার হয়নি। ঘন অন্ধকার থেকে যে কয়টা ঘটনা জানা গেছে তা' থেকে আমরা দেখি খৃঃ ১৬৩৮ অব্দে ৫ই নভেম্বর Thomas De Leonএর বাঁ হাত দেহ-সম্প্রাসণ যন্ত্র (Roue) দিয়ে তাঁর দেহ হতে ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এই যন্ত্র দিয়ে পীড়ন করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মুখ হতে একটা কথাও বার হয়নি। Florencia De Leonএর ওপর তিন রকমের অত্যাচার করা হয়েছে—সে অত্যাচার যেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি ভয়াবহ। এ সব ভয়াবহ অত্যাচার, পীড়ন তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। শত পীড়নেও তিনি কোন স্বীকারোক্তি করেন নি। ৬০ বৎসর বয়সে Exquacia Rodriguira একখানা হাত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর পা হতে একটা আঙুল বিচ্যুতি করে ফেলা হয়েছিল। এই সব পীড়ন সত্ত্বেও তিনি কিছু প্রকাশ করেন নি।

অনেকে যেমন শত নির্যাতনে একটি কথাও বলেনি, আবার অনেকে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত জেনেও নির্যাতনের হাত হতে মুক্তি পাবার জন্যে নির্যাতনের ইঙ্গিতেই স্বীকারোক্তি করতে দ্বিধা করত না।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করবার জন্যে প্রতি পরীক্ষায় একজন Inquisitor, একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন। উৎপীড়নের উপায় প্রণালী ও পরিমাণ বিচারকমণ্ডলী নির্ধারণ করতেন। উৎপীড়নের সময় বিচারকগণ, লিপিবন্ধকারী (Register) এবং ঘাতকগণ ব্যতীত অন্য কারও সেখানে থাকবার অধিকার ছিল না।

বাইরে থেকে নির্যাতিতদের আর্তনাদ যাতে না শোনা যায় সেজন্য কক্ষের ভিতরের দেয়ালে তুলোর গদির আচ্ছাদন দেওয়া হতো। নির্যাতনের সময় কোন বন্দী স্বীকারোক্তি করলে লিপিবন্ধকারী লিখে রাখতেন। পরে বন্দী তা' অনুমোদন করত।

বন্দী নির্যাতনকালে যে স্বীকারোক্তি করত তা' মঞ্জুর করে দলিলে সই করতে অস্বীকার করলে আবার তার ওপর নির্মমভাবে পীড়ন চলত। Taquemeda আইন গ্রন্থে এই রকম পৌনঃপৌনিক উৎপীড়নের ব্যবস্থা আছে। স্পেনীয় Inquisitionএর জন্যে ১৪৮০ খৃঃ অব্দে এই আইন জারী করা হয়েছিল।

কতক্ষণ ধরে যে উৎপীড়নের তাণ্ডবতা চলবে সে বিষয়ে সর্বত্র এক নিয়ম ছিল না। এক এক বিচারালয়ে এক এক রকমের নির্যাতন চলত। এক সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশী নির্যাতন করা চলবে না—এই মর্মে তৃতীয় ফিলিপ এক আদেশপত্র জারী করেন। বেশীর ভাগ সময়েই বন্দী নির্ধারিত সময়ের আগেই সংগাহীন হয়ে পড়ত। পীড়নের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্দী অচেতন হয়ে পড়লে চিকিৎসকের মত নেওয়া হতো—সে সত্য সত্যই সংগাহীন হয়ে পড়েছে না সংগাহীনতার ভান করছে। এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের মতামত চরম বলে গ্রহণ করা হতো। চিকিৎসকের মত বন্দীর অনুকূলে হ'লে উৎপীড়ন স্থগিত রাখা হতো আর প্রতিকূলে হ'লে আবার উৎপীড়ন চলত।

আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে দীর্ঘ সময়ব্যাপী উৎপীড়ন চলেছে এ রকম ঘটনা অপ্রতুল নয়। Vallodolid এ ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে Antonio Lo pezকে ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অবিরাম দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছিল।

প্রাচীনকালে চীনদেশে ধর্মভ্রষ্ট অপরাধীকে দণ্ডদানের রীতি

ঐ হতভাগ্য গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবার জন্যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পীড়নের হাত হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে চেয়েছিল সেই মৃত্যু এক মাসের মধ্যে তাকে শান্তি দিল।

স্বীকারোক্তি আদায় করবার পর শাস্তির রূপ নিরূপণ করা হতো। লঘু অপরাধে বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড এবং নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হতো। আর যাদের অপরাধ গুরুতর বলে মনে করা হতো, তাদের দণ্ডে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। অথবা শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা হতো।

একই অপরাধীকে অনেক রকম শাস্তিভোগ করতে হতো। মৃত্যুদণ্ড ছিল অতিরিক্ত (additional) দণ্ড। শেষ বিচারে সাব্যস্ত অপরাধী বন্দীদের নির্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রা করে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হতো। এই অনুষ্ঠান Auto da fe নামে খ্যাত ছিল। এই Auto da feর কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যাজক সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে সময় স্থির হতো। এই নরমেধ যজ্ঞ অবশ্য রবিবারেই হতো। সমস্ত জনগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করত। অপরাধীরা সকলের সামনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বা অন্য কোন নিষ্ঠুর উপায়ে মৃত্যুকে বরণ করত।

বধ্যভূমিতে একটি বধ্যমঞ্চে অপরাধীদের নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ দেওয়া একটা প্রধান কাজ ছিল। কারণ ধর্মোপদেশের ভেতর দিয়ে Inquisitorদের অসংখ্য প্রশংসা করা হতো, আর heresyদের নিন্দে করা হতো। বন্দী ক্যাথলিক মত গ্রহণ করে ক্যাথলিক মতে মৃত্যু-কামনা করলে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে তারপর তাকে পোড়ান হতো। কিন্তু প্রোটেস্টাণ্ট বা অন্য ধর্মমতাবলম্বীদের জীয়ন্ত অবস্থায় ঝলসিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের অসহিষ্ণুতার সীমা নির্ধারণ অসম্ভব। যেখানে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রভুত্ব করেছে সেখানে heresyদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে বাস করতেন। যে কোন মুহূর্তে নির্যাতনের অভিশাপ তাঁদের ওপর বর্ষিত হতে পারে। এই অস্ত্র একবার নিক্ষিপ্ত হলে মুক্তি অসম্ভব।

Inquisitorরা বর্বরতার ও পশুত্বের মদ এরূপ আকণ্ঠ পান করেছিলেন যে, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এরূপ নির্মমতার উদাহরণ বিরল।

পাঁচশত বৎসর ধরে Inquisitorরদের অত্যাচার এত প্রবল ও নির্মম ছিল যে, কেবলমাত্র ধর্মমত নয় কোনরকম স্বাধীন মত প্রকাশ এক রকম অসম্ভব ছিল। যে কোন স্বাধীন মত প্রকাশ করলেই তাকে heresy হিসেবে দণ্ড গ্রহণ করতে হতো। এমন কি ব্যক্তিগত কারণে Inquisitorএর কর্মকর্তাদের বা ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের কুদৃষ্টিতে পড়লে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তার ওপর চলত নির্যাতন, বর্ষিত হতো নির্মম দণ্ড।

Heresy অপরাধে ধৃত হলে দুর্জয়ী সাহসীরও বুক ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে উঠত। এই নির্যাতনের রঙ্গভূমিতে একবার প্রবেশ করলে প্রায়ই কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরত না; যারা ফিরত, তারা পঙ্গু মন আর বিকল দেহ নিয়ে ফিরে আসত।

Inquisition লোকের মনে এমনই আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল যে, ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মনে বিরাট অসন্তোষ ও ঘৃণা পোষণ করলেও কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করত না। নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে সকলেই এইসব ধর্মজীবীদের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠত। এমন কি যারা এঁদের হাতে নিগৃহীত হয়ে পঙ্গু দেহ মন নিয়ে ফিরে আসত, তারাও এঁদের গুণগান করত।

বিচারকমণ্ডলীর অনেকেই ছিলেন ইন্দ্রিয়াসক্ত। এঁদের অনেকেই অস্বাভাবিকভাবে দৈহিক ক্ষুধা তৃপ্ত করতেন। Heresyর মিথ্যা অভিযোগে তাঁরা অনেক সময় সুন্দরী তরুণীদের ধরে আনতেন। এইসব হতভাগিনীরা দিনের পর দিন মনের আগুন চেপে দেহের উপচার সাজিয়ে এঁদের কামনার ইন্ধন জোগাত।

ফরাসী সৈন্যেরা যখন Aragon শহর অধিকার করেছিল, তখন Lieutenant-General M. de Legalএর আদেশে Inquisitionএর কারাগার উন্মুক্ত করে প্রায় চারিশত বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বন্দীদের মধ্যে প্রায় ৬০ জন সুন্দরী যুবতী ছিলেন। এই সব হতভাগিনীদের Inquisitionএর বড়কর্তাদের কামায়ণ যজ্ঞে প্রতিদিন ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

Inquisition'র হাত হতে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র কারও মুক্তি ছিল না। স্পেনের রাজা Philip II'র জ্যেষ্ঠপুত্র এঁদের হাত হতে রেহাই পান নি। যুবরাজ Don Carlos নিজের বন্ধু ও পরিচিত মহলে এইসব ধর্মধ্বজীদের স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র নিন্দা করতেন। ক্রমে একথা Inquisitorদের কানে উঠলো। যুবরাজ বন্দী হলেন। রাজা ফিলিপ ভাল করেই জানতেন, এঁদের শক্তি রাজশক্তির চেয়েও প্রবল। তাই তিনি এদের বাধা দেবার চেষ্টা করেন নি। এ থেকেই বোঝা যায়, এঁদের ক্ষমতা ছিল কিরূপ অপরিমিত ও ব্যাপক।

বিচারে heresyর অপরাধে Don Carlosর মৃত্যুদণ্ড হল। কেবল যুবরাজ হিসেবে তাঁর প্রতি এইটুকু অনুকম্পা দেখান হল যে, তিনি নিজের ইচ্ছামত পন্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারেন। যুবরাজ বললেন, রক্তপাতে তিনি মৃত্যু কামনা করেন। তাঁর একটি ধমনী ছিন্ন করে দেওয়া হল, ছিন্ন ধমনী দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে যুবরাজের জীবন-প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

যুবরাজ যে রক্ত-চিহ্ন ধরিত্রীর বুকে এঁকে দিলেন, সেই রক্ত-চিহ্নই শেষ চিহ্ন নয়।

গান

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

পিছু টানে চলিতে জানে না মোর তরী
আগাইয়া চলে তাই পিছাইতে ডরি।
যে পথ নাহিক জানা
সে পথে চলিতে মানা
যে পথে ভিড়িবে তরী সেই পথ ধরি।
সমুখে অথৈ জল
বলে চল্ শুধু চল্
তরণী চলিছে তাহে টলমল করি।
চলে সে বিরাম হারা
জানে যে আছে কিনারা
দিক্ হারা চোরা পথে না ঘুরে মরি॥

লালমেঘ

শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত

অস্তগামী সূর্যের শেষ কয়েকটি রশ্মির রক্তিমাভা পড়িয়া চেরাপুঞ্জির ক্ষুদ্র ডাকবাংলোটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। দূরের গাছটার হরিৎ পল্লবভার সোণালী আভায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। কাজের তাড়াহুড়া নাই। নিসর্গের মোহে পড়িয়া মন যেন ধ্যানস্থ হইতে চাহে। এমনি আলস্যমধুর মুহূর্তে মনের পটে অতীত দিনের স্মৃতিলেখাগুলি যেন আবার সজীব হইয়া উঠে। অরুণ চাহিয়া রহিলেন।

না, শ্যামলী অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বের সে চাপল্য নাই, কথায় কথায় অকারণ হাসিতে আর লুটাইয়া পড়ে না। মুখে, অবয়বে যৌবনের সে তরুনিমা—স্তিমিত ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে। পরমায়ুর পথে নিজে যেমন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে সে, শ্যামলীও তেমনি।

শুধু রূপ নহে, মনেও যেন শ্যামলীর একটা আর্ত-রিক্ততার ছাপ পড়িয়াছে। পৃথিবীর ধূলি বাতাস হইতে সে যেন আজ দূরে সরিয়া গিয়াছে। সে আদর্শের সন্ধান পাইয়াছে। সেই শ্যামলী আজ এতদিন পরে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে খাসিয়াদিগের উন্নতিবিধান করিতে। ইহাদিগের মধ্যে সে নাকি কি সত্যের সন্ধান পাইয়াছে।

দল বাঁধিয়া চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছিল, গম্ভীর-মুখে বক্তৃতা করিয়া গেল, পূর্বপরিচয়ের এতটুকু আভাস পর্যন্ত কাহাকেও দিল না। আশ্চর্য.........।

—সাব!

বয় আসিয়া টিপয়ের উপর চা রাখিয়া গেল।

অরুণের অবচেতনায় থাকিয়া থাকিয়া আজ জাগিয়া উঠিতেছে 'কলরোলের' মুখরতা। প্রৌঢ়ত্বের স্থৈর্য ছিন্ন করিয়া যুবক অরুণ উঁকি দিতেছে এই বিমনা লঘু অবসরের ফাঁকে ফাঁকে। সেও একটা ইতিহাস।

হাল্কা শরতের মেঘের মতো জীবন, বাইসিক্‌ল চড়িয়া কলহাস্যে পথ মুখরিত করিয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় কলেজ যাওয়া-আসা—দূরস্থিত পাহাড়গুলির রোমাণ্টিক চাহনি—নূতন যৌবনোচ্ছ্বাস।

এমনি কোন এক দিনে টেনিস র‍্যাকেট ঝুলাইয়া, সঙ্গীদের কাঁধে হাত রাখিয়া, সাইকেল ছুটাইয়া চলার দিনে প্রভাতের নির্মল আলোকের মধ্যে হঠাৎ দুটি প্রাণবন্ত, আবেগময়ী কালো চোখের সামনে আসিয়া অরুণ থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বড়লোকের মেয়ের দেখা কলেজে মিলিল, গাছতলায় মিলিল, বাড়ীতে তাহার পাত্তা মিলিল না। দারিদ্র্যের সে অপমান অরুণ আজও ভুলিতে পারেন নাই।

জাপান-ফেরৎ এঞ্জিনিয়ারের সহিত শ্যামলীর এনগেজ-মেণ্ট কেন ভাঙিয়া গেল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, কিন্তু জীবনের সেই যে মোড় ঘুরিয়া গেল, তাহা আর তিনি ফিরিয়া পান নাই। সকল কিছুর মধ্যে আগাইয়া যাওয়া অরুণ বোস ধীরে ধীরে সকল কিছুতেই পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। ফাজলামি হৈ হৈ-এর স্থানে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িলেন শেলী, কীট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথ। 'হাইওয়েম্যান' কবিতাটা যে কি ভালই লাগিত!

তারপর তো কতদিন কাটিয়া গিয়াছে—এম-এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে প্রথম হইয়া চাকুরী জুটিল সুদূর গৌহাটীতে। আসামের এই অদ্ভুত একটা রহস্যময় বন্য সৌন্দর্য—মৌস্‌মাই ফলস্‌, পাইনের বন, বুনো হাতীর পাল, চেরাপুঞ্জির গভীর খাদ—এসব যেন তাঁহাকে কি রকম পাইয়া বসিয়াছে। আজ প্রায় তেইশ চব্বিশটা বৎসর তো এমনি করিয়া ছেলের দল পড়াইয়া, মিলটন, সেক্সপীয়র ব্যাখ্যা করিয়াই কাটিয়া গেল। আরও কতদিন কাটিবে, কে জানে।

বিবাহ করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবেরা এখনও অনুরোধ করে—ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ আর কি বয়স! কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার চুলের পাশের দিকে পাক ধরিয়াছে, চোখের তলায় অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। একটু হাসিয়া অরুণ উত্তর দেন—বুড়ো বয়সে বিয়ে করে একটা তরুণীর জীবনটা মাটি করে কি হবে বলো?

বন্ধুবর্গ পাল্টা জবাব দিতেন—কোন তরুণীকে বিয়ে করতে হবে, সে কথা তো বলা হয় নি।

অরুণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেন। নিজের এই অসতর্ক মুহূর্তের স্খলিত কয়টি কথার ভিতর নিজের স্বরূপ হাতে হাতে ধরা পড়িয়া যাইত। আত্মধিক্কারে মন পীড়িত হইয়া উঠিত—তাই তো! এ কি কথা! প্রেম তো একটা ভুয়া ফ্যাসন নহে। জলের তিলকের মত উবিয়া যায় না। শ্যামলীকে সে আজও ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু শ্যামলী আজ আর তরুণী নহে। সে নিজেকে বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে—তাহার নিষ্ঠা আজও অবিচল। তবুও এমন কথা মুখ দিয়া ভুলেও বাহির হয় কেন? শ্যামলীর প্রেমের প্রতি এই অমর্যাদা—তাহারই মুখে! অনুশোচনায় মন ভরিয়া উঠে অরুণের।

বন্ধুবর্গ জানেন অরুণের জীবনের সেই আখ্যায়িকা। শ্যামলী আজও বিবাহ করে নাই। কেন করে নাই, এ রহস্য তাঁহারা জানেন। অরুণের প্রতি তাঁহাদের অনুকম্পা হয়।

অরুণ আর শ্যামলী—এখনও তো তাহারা সংসারে আসিয়া দুজনে হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে। মনে মনে ব্রাউনিংএর দুই মর্মর মূর্তির মত এ উহার দিকে চিরকাল তাকাইয়া থাকিয়া অবশিষ্ট জীবনের উপর একটা অভিশাপের দাগ টানিয়া দিয়া লাভ কি?

বন্ধুরা শ্যামলীকে কথাটা জানাইয়াছিলেন। শ্যামলী চোখের জলে উত্তর দিয়াছিল—নূতন ব্রত সে গ্রহণ করিয়াছে। ফিরিবার পথ আর নাই। সংসার খেলার সখ মনেই থাকিবে তার, কাজে সম্ভব হইবে না। সে সব দিনের কথা সে ভুলিবে না। সে যে তার চিরকালের সম্পদ, নিভৃত

অন্তরেই তাহাকে পুষিয়া রাখিবে। অরুণ যেন তাহাকে ক্ষমা করে।

ঘুম পাইতেছে। ঘরে গিয়া অরুণ শুইয়া পড়িলেন।

যখন ঘুম ভাঙিল, তখন ম্যাণ্টলপিসের উপরকার ঘড়িতে দুইটা বাজিতেছে। সামনের খোলা জানালাটা দিয়া ঘরের ভিতর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। অরুণ উঠিয়া গিয়া জানলার শিক ধরিয়া দাঁড়াইলেন।—সমস্ত উপত্যকাটার উপর দিয়া উজ্জ্বল জ্যোৎস্না আর আবছা অন্ধকারের মায়াময় লুকোচুরী চলিয়াছে—দূরে—বহুদূরে, মৌসম্মাই ফলসের গা'টা রজতাভায় চকচক্ করিতেছে—একটানা জলপ্রপাতের অস্পষ্ট ঝির্‌ঝির্ শব্দ—কেবল কান পাতিয়া থাকিলে শোনা যায়।

হঠাৎ সমস্ত শরীর মনে কেমন যেন একটা দুর্দমনীয় আবেগ আসিল। জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া অরুণ ব্রিচেস পরিলেন, লাল গরম কোট পরিয়া মাথায় টুপি আঁটিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।......

ঘোড়া ছুটিল—নক্ষত্রগতিতে। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুদ্র ডাকবাংলো পিছনে মিলাইয়া গেল, রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দ্রুত খটাখট্ শব্দ—সিনেমার পটের মতো চারদিকে আলোছায়ার ছুটাছুটি লুকোচুরি—ঘোড়ার শাদা গা'টার উপর জ্যোৎস্না খেলিয়া বেড়াইতেছে......Hot Hot in the frosty silence......Hot, Hot in the echoing night......দূরের ঐ রহস্যময় পাহাড়গুলির মধ্যে যেন কোন্ অনাগতের অভ্যগ্র পদধ্বনি বাজিতেছে...গতির উন্মাদনায় সমস্ত শরীর মন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে—অরুণ আরো জোরে ঘোড়া ছুটাইলেন।

মোড় ঘুরিতেই মোটরের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়া গেল—প্রাণপণে ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিলেন—'আরেরে'... থামাও—উঃ।

অরুণ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন।

মোটর জোরে ব্রেক দিয়া থামিয়া গেল। চকিতে এক তরুণ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, সঙ্গে আর একজন—তরুণী নহে—প্রৌঢ়া—শ্যামলী। আহত অরুণকে তুলিয়া লইয়া মোটর আবার ছুটিল।

কপালে শীতল করস্পর্শ অনুভব করিয়া অরুণ ঘাড় ফিরাইয়া মাথার দিকে তাকাইতেই দেখেন—শ্যামলী। অস্ফুটস্বরে অরুণ কি যেন বলিয়া ফেলিলেন! শ্যামলী চমকাইয়া হাত সরাইয়া লইল। দরজার নিকট একটি সুদর্শন যুবক দাঁড়াইয়াছিল, অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছেন স্যার? ক্ষীণস্বরে অরুণ প্রশ্ন করিলেন—আমি কোথায়? ছেলেটি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—এটা শিলং। 'অল্ রাইট মাই বয়' বলিয়া অরুণ চোখ বুজিলেন—বড় ক্লান্তি। ডাক্তার শ্যামলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'রাত্তিরটা আপনিই অ্যাটেণ্ড করবেন তো? শ্যামলী শুধু কহিল—'হ্যাঁ, আপনি যেতে পারেন'। ডাক্তার পুনরায় কহিলেন—'ওঁকে বেশী নড়াচড়া করতে দেবেন না, কোমরের উণ্ডটা একটু সীরিয়াস্, যদিও ভয়ের কিছু নেই'। ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

জান্‌লা দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া শ্যামলীর পায়ের উপর, মাটিতে খসিয়াপড়া শাড়ীর আঁচলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া শ্যামলী বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ উঠিতেছে। বাহিরের জ্যোৎস্না আরো নিস্প্রভ হইয়া আসিল। অরুণ যন্ত্রণা ভুলিয়া বিমুগ্ধের মত জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিল। নূতন তথ্যের সন্ধান যেন পাইয়াছে সে। এই ভাল, এই মেঘই সত্য। আর এই জ্যোৎস্নাটার এখনি নিভিয়া যাওয়া উচিত।

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় অধিকারের স্বরূপ

(১০৮ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা ব্যবস্থা আজ নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্ক হইতে এইসব আদর্শ যদি শিক্ষা করিতে না পারে তবে প্রাচীন তুরস্কের মতই তাঁহাদিগকে বহু যুগ পর্যন্ত অন্ধকারেই পড়িয়া থাকিতে হইবে।

(৬) বিপ্লবাত্মক কর্মধারা:—বিপ্লবী মন না হইলে কেহই কোন দেশের আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে না। তুর্কি বিপ্লবের প্রত্যেক নেতা এই বিপ্লবাত্মক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। তাই রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে ও শিক্ষা নীতিতে তুরস্ক বিপ্লবপূর্ণ কর্মধারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ধাপে ধাপে উন্নতি, ক্রমবিবর্তনের পথে উন্নতি—এইসব প্রতিক্রিয়াশীল কর্মধারায় তুরস্কের বিশ্বাস নাই। তুরস্ক চায় আমূল পরিবর্তন—সে জন্য বিদ্রোহ ও বিপ্লবকেই অবলম্বন করিয়াছে। তুরস্ক আজ যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সে তাহা হইতে এক পদও পিছাইয়া যাইতে চাহে না। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা, অবাধ গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আদর্শের উপর আস্থা স্থাপন করা, নারী জাতির কল্যাণ এইসব আদর্শই তুরস্কের বিপ্লবাত্মক কর্মধারা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইসলামের জন্য তুরস্কে কেহ মায়া কান্না কাঁদে না, বিশ্বমুসলিমের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য তুরস্কের কেহ 'মুসলিম দিবস পালন করে না।' ইহাকে তাহারা ছেলে মানুষী মনে করে, শুধু তাই নয়—ইহাকে দেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। হায় ভারতীয় মুসলমান! কবে তোমার চৈতন্যোদয় হইবে, কবে তোমার ধর্মান্ধতার মোহ কাটাইয়া তুমি তুর্কির মত সত্যিকারের স্বদেশ প্রেমে দীক্ষিত হইবে!

লাফানোর দাম

উ'চু যায়গা থেকে লাফানোর বিপদ যথেষ্ট আছে। তবু লোকে লাফায়, অক্ষত দেহে দর্শকদের চমৎকৃত করে। আবার অনেক লোক খুব উ'চু যায়গা থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা একেবারে ভেঙ্গে ফেলে। এ ধরণের বিপদকে কেউ চায় না। কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনাও লোকের খোরাক জোগায়। অনেক ফটোগ্রাফার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় দুর্ঘটনার ছবি তুলে পয়সা উপার্জনের জন্যে। একবার সন্ধান পেলেই হাসিমুখে ছুটে যায় ঘটনাস্থলে, নিজের বিপদ যে কোন সময়ে আসতে পারে তা একবারও ভেবে বোধ হয় দেখে না।

বলছিলাম লাফানোর বিপদ আছে বটে কিন্তু দাম যে আছে সেটা অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই।

কিছুদিন পূর্বে ইউরোপের এক ফিল্ম ষ্টুডিও চল্লিশ ফিট উ'চু থেকে লাফানোর জন্যে এক লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। একটা বাড়ীর চল্লিশ ফুট উ'চু দেওয়াল, দেওয়াল থেকে আঠার ফুট দূরে একটা মালগাড়ি। সেই মালগাড়ির ছাদের উপরই লাফিয়ে পড়তে হবে। লাফানো শেষ হলে উপযুক্ত অর্থে সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত যে করা হবে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপন দেখে অনেক লোক ষ্টুডিওতে ভীড় জমিয়েছিল কিন্তু ঐ উ'চু বাড়ি, দূরের মালগাড়ির ছাদ, লাফানোর কায়দা, একটু বেচাল হলেই মৃত্যু—এসব শুনে সব ভীড় হাল্কা করে দিল। রয়ে গেল একটা বে'টে দালাল। সে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটকে ভাল করে তলিয়ে দেখে শেষে লাফানোই স্থির করলে। স্টুডিও ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে দালালটি জানাল, সে লাফাতে রাজি কিন্তু প্রতিবারের লাফানোর জন্যে তার ১০০ পাউন্ড প্রয়োজন। প্রতিবারের লাফানোতে বেশী খরচ হবে দেখে ছবিখানার পরিচালক মাত্র একবার লাফানোর নির্দেশ দিলেন। লোকটা লাফানোর সঙ্কেত পেয়ে উ'চু যায়গাটাতে থেকে লাফ দেয় আর নিরাপদেই মালগাড়ির ছাদের উপর পে'ছায়; শরীরের একটুও ক্ষতি হয়নি। অবশ্য যাতে শরীরের কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যে স্টুডিও কোম্পানি যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছিল লোকটি প্রতি সেকেণ্ডে ৫১৬·২৭ ফিট বেগে নীচের দিকে নেমেছিল। লোকটার নাম লোরেন রীবি।

সব থেকে দ্রুতগামী কে?

এ প্রশ্নের উত্তরে একমাত্র মানুষের মনকেই সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বলা যায়। কিন্তু দৃশ্যমান জীব এবং বস্তু জগতে আমরা চাক্ষুষ যাদের সচল বলে প্রমাণ পেয়েছি, তাদের মধ্যে কার অতি দূরত্ব পথ কম সময়ে অতিক্রম করবার ক্ষমতা আছে? বৈজ্ঞানিকগণ দ্রুতগামী জীব এবং আধুনিক আবিষ্কৃত যানবাহনের একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রে কে কত বেগে পথ অতিক্রম করে, তা দেখিয়েছেন। সুবিধার জন্য ছবিটি সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

মারাত্মক উদ্ভিদ

উদ্ভিদ জগতের অনেকে যেমন মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে আবার তেমনি অনিষ্টও করে। বিশেষ পরীক্ষা না করে সেইজন্যে কোন উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ না করলেও অনেক উদ্ভিদ

আছে যারা কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারা জীবের অনিষ্ট করে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। পোকা মাকড় খেয়ে অনেক উদ্ভিদকে আবার জীবনধারণ করে থাকতে হয়। ঐসব পতঙ্গভুক উদ্ভিদ অদ্ভুত কৌশলে পোকা মাকড়দের ফাঁদে ফেলে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ জগতে পতঙ্গভুকের সংখ্যা অনেক। অস্ট্রেলিয়ার কান্নিবাল গাছ আগন্তুকদের তার পাতার ফাঁদের মধ্যে বন্দী করে হত্যা করে। ভারতবর্ষে এক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় তাদের টেলিগ্রাফের গাছ বলে। এই জাতীয় উদ্ভিদের পাতাগুলি অদ্ভুতভাবে নড়াচড়া করে। এদের স্পর্শ করলে প্রবল তাড়িত প্রবাহের শক্তি অনুভব করা যায়। ঐ তাড়িত প্রবাহ দুর্বল লোকের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট।

মাস্টার ফ্রাঙ্ক-এর স্বাভাবিক আকৃতি

দক্ষিণ আমেরিকার অক্টোপাস গাছই সব থেকে ভয়ঙ্কর। একবার একজন পথিক কুকুরের কাতর চীৎকারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেন কুকুরটি অক্টোপাস গাছের ফাঁদে পড়ে অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, নিজেকে মুক্ত করবার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়েছে। অক্টোপাস গাছের লম্বা লম্বা দড়ির মত ডালপালা চারিপাশ থেকে শিকারকে বেঁধে ফেলে কাবু করে দেয়।

নেপোলিয়ানের চিঠি

নেপোলিয়ানের কতকগুলি চিঠি এমন দুষ্পাঠ্য যে, সেগুলিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের মানচিত্র মনে করে অনেকে ভুল করেন।

অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি!

অতি বুদ্ধিমান লোকও সময়ে সময়ে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে কোন কাজ ঠিক করে উঠতে পারে না। আমাদের দেশে প্রবচন আছে 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি'। এবং এই প্রবচন কতখানি সত্য তা বুদ্ধিমান লোকের কার্যকলাপে বুঝা যায়। জটিল ব্যাপারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে অতি সামান্য ব্যাপারে কি করে যে তাঁরা উপস্থিত বুদ্ধিটুকু হারিয়ে ফেলেন তা ভাবলে রীতিমত প্রহসন বলে মনে হয়। অথচ সেই উপস্থিত বুদ্ধিটুকুকে জীবজগতের অতি নিকৃষ্ট জীবের মধ্যেও কাজ করতে দেখা যায়।

আইজাক নিউটনের মত পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও একবার কিরকমভাবে চাকরের সাধারণ বুদ্ধির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন তা একটি ঘটনা থেকে জানতে পারা যায়। আইজাক নিউটন অত্যধিক শীত অনুভব করে চাকরকে উনুনে আগুন ধরাতে বললেন। চাকর আগুন ধরিয়ে চলে গেল আর নিউটন তার সামনে একটি চেয়ারে বসে আগুনের উত্তাপ শরীরে নিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর আগুনের উত্তাপ এত বৃদ্ধি পেল যে তার সামনে বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। অসহ্য উত্তাপে আর থাকতে না পেরে তিনি কলিং বেল প্রাণপণে বাজাতে লাগলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাস্টার ফ্রাঙ্ক অদ্ভুতভাবে মেক্ আফ্ নিয়েছে। বোলতার হুলের শক্তি এমনই, সব রকম সালসা হার মনে যায়।

চাকর আবার এক জরুরী কাজে বাইরে বেরিয়েছিল, দূরে থেকে মনিবের ঘণ্টার আওয়াজ পেয়ে ছুটতে ছুটতে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দেখে, বৈজ্ঞানিক নিউটনের শরীরের চামড়া আগুনের উত্তাপে ঝলসে গেছে। চাকর উপস্থিত হতেই তিনি উনুনটাকে সরিয়ে দিতে আজ্ঞা দিলেন।

'এভাবে আগুনে ঝলসে না পুড়ে চেয়ারটা খানিকটা সরিয়ে নিলেই আপনার ভাল হত না'—চাকরটা আইজাক নিউটনের কাছে প্রস্তাব করলে।

'আমার কথার উপর কথা—, আমি কোন দিন ভাবতেও পারিনি'—পৃথিবীর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটন উত্তর দিলেন।

পায়ের কড়া কাটার নিরাপদ খুর

আজকাল দাড়ি কামাবার অনেক ধরণের খুর তৈরী হয়েছে। অতি সহজে এবং বিনা রক্তপাতে ঐসব খুর দিয়ে দাড়ি কামান চলে। দাড়ি কামাবার যেমন সেফ্টি রেজার, পায়ের কড়া কাটবার তেমনি সেফটি রেজার বের হয়েছে। এই খুর দিয়ে পায়ের কড়াকে কিছুদিনের জন্য একেবারে নিশ্চিহ্ন করা যায়। অবশ্য কিছুদিন পর আবার কড়া বসে। খুরের ধার পড়ে গেলে পুনরায় নতুন খুর লাগাবার চমৎকার ব্যবস্থাও আছে।

আজ-কাল

সত্যাগ্রহ আন্দোলন

গান্ধীজীর পরিকল্পনানুযায়ী সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কাউকে সত্যাগ্রহ না করতে তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাচ্ছেন। তিনি শহরে সভাসমিতি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু গ্রামে সভাসমিতি করা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নি। তিনি নাকি নির্দেশ দিয়েছেন যে, সত্যাগ্রহ করতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করলেই চলবে। প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকেই তিনি সত্যাগ্রহ করবার পূর্বে তাঁর সত্যাগ্রহের প্রণালীর কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে বলেছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি স্থির করেছেন, বর্তমানে তিনি শুধু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের মধ্যেই সত্যাগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় নি। এদিকে এও শোনা যাচ্ছে যে, সাময়িকভাবে পড়াশোনা বন্ধ রাখলে এবং সম্পূর্ণরূপে গান্ধীজীর নির্দেশ ও কর্মপন্থা মেনে চললে তিনি কয়েকদল ছাত্রকেও সত্যাগ্রহ করার অনুমতি দিবেন। তিনি নাকি এও বলেছেন যে, যে সমস্ত ছাত্র সত্যাগ্রহ করবে, তারা ধর্মঘট বা ঐরূপ যে সকল কাজ গান্ধীজীর অনুমোদিত নয়, তা করতে পারবে না। যাঁরা রুগ্ন ও সত্বর একটা আপোষের আশা পোষণ করেন, তাঁদের গান্ধীজী সত্যাগ্রহ করতে নিষেধ করেছেন। যা হোক, সমস্ত প্রদেশেই সত্যাগ্রহের তোড়জোড় চলেছে, অনেকে সত্যাগ্রহ করেছেন, সত্যাগ্রহী হিসাবে অনেকের নাম ও সত্যাগ্রহের তারিখ সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেককে, কারাদণ্ডও কারো কারো হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিয়ানীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ডাঃ টি এস রাজন এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাছাড়া তাঁর জরিমানা হয়েছে ১০০০্ টাকার। ঐ টাকা অনাদায়ে তাঁকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ও মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশংকর শুক্ল ভারতরক্ষা বিধানের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীবালগঙ্গাধর খেরকে তাঁর বাসগৃহে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়েছে। কুমারী প্রেমকণ্টক ২ শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলে গণ্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী স্পীকার শ্রীমতী রুক্মিণী লক্ষ্মীপতির বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে এক বৎসরের। মধ্যপ্রদেশের পূর্বতন মন্ত্রী মিঃ এস ভি গোখেল, পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র ও মিঃ সি জে ভারুকা এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। ত্রিচিনপল্লী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীরত্নভেলু থিবরের প্রতি এক বৎসর কারাবাসের হুকুম হয়েছে। প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী শ্রীমতী প্রমীলাবাঈ ওক্‌কে ২০০্ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। শ্রীমতী ভক্তিলক্ষ্মী দেশাই ও দরবার গোপালদাস দেশাই বোরসাদ তালুকের রাসগ্রামে (বোম্বাই) সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হন। দেশাইজীর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০্ টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে। জরিমানার টাকা আদায় না হলে তাঁকে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। শ্রীমতী ভক্তিলক্ষ্মীকে আদালতের শুনানী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া তাঁকে ২০০্ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পুণা সিটি মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীগোপৎলাল সাহা এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীমতী লক্ষ্মী বাই থুসের প্রতি ২০০্ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মিঃ এফ এম পাতিল, ভূতপূর্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ বি এম গুপ্তে, পুণা সিটি কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আচার্য ভি পি লিমায়ে ও বোম্বাই পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য মিঃ ডব্লু এস মুকাদাম এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। মিঃ পাতিলকে 'বি' শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রতি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। শ্রী কে কেলাপ্পানের প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। শ্রীমতী সুমতিবাঈ কীর্তনে ও শ্রীমতী কমলাবেন সংঘবি বোম্বাইয়ের গ্রামে সত্যাগ্রহ করে ২০০্ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য ভাল নয় বলে গান্ধীজী ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ডাঃ সৈয়দ মামুদকে সত্যাগ্রহ না করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

বড়লাটের ভাষণ

কেন্দ্রীয় পরিষদদ্বয়ের এক যুক্ত অধিবেশনে গত ২০শে নবেম্বর বড়লাট এক বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ইউরোপের যুদ্ধের অবস্থা, ভারতের সমরপ্রচেষ্টা, প্রাচ্য সাম্রাজ্য সম্মেলনের উপকারিতা, মায় নূতন দালাই লামার অভিষেকে লাসায় মিশন প্রেরণ পর্যন্ত অনেক কথাই আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার যেটা আসল কথা তা হল এই যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কোনরূপ সাড়া না পাওয়ায় বর্তমানে শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ বা সামরিক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন স্থগিত রাখা হবে। এতে অবশ্য দেশের লোকের মনে আশা-নিরাশা কিছুরই সঞ্চার হয় নি। কারণ কংগ্রেস তো দূরের কথা, মোসলেম লীগও ঐ প্রস্তাবকে সাদর আহ্বান জানাতে পারে নি।

মিঃ আমেরির বক্তৃতা

গত ২০শে নবেম্বর, বুধবার ভারতসচিব মিঃ আমেরি কমন্স সভায় এক বক্তৃতা করেন এবং সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে বিতর্কের উত্তরে আর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বড়লাটের ও মিঃ আমেরির বক্তৃতা একটা বিষয়ে অন্তত একসুরে বাঁধা ছিল। তা হল প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্বলাভের সুযোগ (?) প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস যে কি ভুল করেছে, তাই নিয়ে দুঃখোচ্ছ্বাস। আরও একটা বিষয়ে তাঁদের বক্তৃতার মিল আছে। তা হল ভারতে যে কি বিপুল যুদ্ধায়োজন চলছে, সে সম্বন্ধে সপ্রশংস মুখরতা। কিন্তু এই যুদ্ধায়োজনের স্বরূপটা তাঁরা কেউই বিশ্লেষণ করে দেখান নি। ভারতীয় জনগণের সমর্থন এর পেছনে কতটা আছে, তা খোলা-খুলিভাবে বললে ইংলণ্ডবাসী ভারতের প্রকৃত অবস্থা বোঝবার কতকটা সুযোগ পেতেন। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন,—"আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এ নিছক শান্তিবাদ প্রচারের আন্দোলন নয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বিবেকানুমোদিত মত প্রকাশের যে অধিকার আমরা দেই, বড়লাট তা মিঃ গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু মিঃ গান্ধীর মত তাঁর সহকর্মীদের

মনোভাব নয়। তারা চেয়েছেন ভারতীয়েরা যাতে সৈন্যদলে ভর্তি না হয়, অস্ত্র কারখানায় কাজ না করে ও যুদ্ধ কমিটিতে স্বেচ্ছায় অর্থসাহায্য না করে, তার জন্যে তাদের মধ্যে প্রচার করবার অধিকার। এ আন্দোলন এখানে বা অন্য কোন দেশে কোন গবর্মেণ্ট যুদ্ধের সময় বরদাস্ত করতে পারে না।" পণ্ডিত জওহরলালের কারাদণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতসচিব বলেছেন,—"যেদিক থেকেই বিচার করা যাক্ না কেন, পণ্ডিত নেহরুর দণ্ড শাসন বিভাগের ব্যাপার নয়, আইনের ব্যাপার। তিনি যদি তাঁর কারাদণ্ড অত্যধিক হয়েছে বলে মনে করেন, তবে তিনি আপীল করতে পারেন। তিনি জেলে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী। তাঁকে গ্রন্থাদি পাঠ করতে দেওয়া হয়, থাকবার জন্য তিনি স্বতন্ত্র ঘর পেয়েছেন; অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুবিধা তিনি পান, ঘন ঘন চিঠিপত্র লেখার ও বাইরের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়। তা'ছাড়া অন্যান্য প্রকারের সুবিধাও তিনি ভোগ করেন। ঐগুলির দ্বারা, তিনি সম্প্রতি যে বক্তৃতা করেছেন, তার পুনরাবৃত্তি করে বেড়ানোর স্বাধীনতা ছাড়া আর প্রায় সমস্ত বিষয়ের ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে।" মিঃ আমেরির বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরাজাগোপাল আচারিয়া বলেছেন—"আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হয় নাই, চাওয়া হয়েছে আমাদের টাকা আর মাল। তাঁদের মতে ভারতকে বেঁচে থাকবার জন্যে ব্রিটেনের উপর নির্ভর করতে হবে। 'সতী'র আদর্শানুরক্তা হিন্দু স্ত্রীর মত ভারতবর্ষ কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা, অস্তিত্ব বা লক্ষ্যের কল্পনা করবে না। আমরা চাষ করব, উৎপাদন করব এবং উৎপাদিত খাদ্যবস্তুজাত অন্য জিনিষগুলি ও আমাদের যা' কিছু টাকা পয়সা আছে, সবই তাঁদের দিব। শাসন করা, যুদ্ধ করা প্রভৃতি কাজের ভার থাকবে ব্রিটিশ শাসকবর্গের উপর।" রাজাজীর এই শ্লেষোক্তির বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকবর্গ কথায় ভিজবেন, এ কালের দুর্বলতা তো তাঁদের গত সার্ধশতাব্দীকালের আচরণ থেকে বোঝা যায় নি।

ভাওয়াল মামলার রায়

২৫শে নবেম্বর, সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বিশ্বাস ও বিচারপতি মিঃ লজ ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার আপীলের চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। তাঁরা আপীলের বিচারকদের মধ্যে অধিকাংশের মত অনুসারে আপীল নামঞ্জুর করে, ঢাকা জজ আদালতে যে সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের মেজকুমার বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং তাঁকে ভাওয়াল জমিদারীর এক-তৃতীয়াংশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বহাল রেখেছেন। তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপীলকারিণী রাণী বিভাবতী দেবীকে মামলার খরচ দিতে হবে।

ফাইনান্স বিল

কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য যে অতিরিক্ত ফাইনান্স বিল উত্থাপিত হয়েছিল, তা গত ১৯শে নবেম্বর ৫৫—৫৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। এই বিলের আলোচনায় কংগ্রেসী সদস্যেরা যোগ দিয়েছিলেন। ভোট গ্রহণের সময় মুসলিম লীগ দল নিরপেক্ষ ছিল। পরে বড়লাটের সুপারিশে বিলটি পুনরায় পরিষদে উত্থাপিত হয়। গত ২০শে নবেম্বর এই সুপারিশযুক্ত বিলও ৫৫—৫৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এর পর বিলটি বড়লাটের সুপারিশযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রেরিত হয়েছে। সেখানে বিলের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ

আসাম মন্ত্রিসভা কিছুদিন আগে যুদ্ধ তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার সাদুল্লা গত ১৯শে নবেম্বর আসাম ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সেই সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীকামিনীকুমার সেন ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। আসাম পরিষদের স্পীকার শ্রীবসন্ত-কুমার দাস স্যার সাদুল্লার প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এইরূপ অর্থসাহায্য সম্বন্ধে গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত নানারূপ জটিলতা আছে।

সিন্ধুর অবস্থা

সিন্ধুর অশান্তিকর অবস্থা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করার জন্য কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সিন্ধুতে গিয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার ফলে মৌলানা সাহেব তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। সিন্ধু মন্ত্রিসভার কিছু অদলবদল হয়েছে। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও সরকার বিরোধী দলের নেতা খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স পুনরায় মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছেন। মুসলিম লীগ দলভুক্ত শিক্ষামন্ত্রী মিঃ গোলাম মুর্তজা সৈয়দ পদত্যাগ করেছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মীর বন্দে আলি মিঞা প্রধান মন্ত্রীর কাজ করবেন, তারপর স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা প্রধান মন্ত্রী হবেন—এইরূপ নাকি স্থির হয়েছে। খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের ভার পাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এ ব্যবস্থায় সিন্ধুর ভবিষ্যৎ শান্তিপূর্ণ হবে বলে মৌলানা সাহেব আশা পোষণ করেন।

আন্তর্জাতিক

গ্রীক-ইতালীয় যুদ্ধ

এ সপ্তাহে গ্রীক ও ইতালির যুদ্ধের যে সব খবর এসেছে তার আগাগোড়াই ইতালির নাজেহালের কাহিনী। কোরিটজা শহর গ্রীক সৈন্যেরা দখল করে নিয়েছে, তা ছাড়া তারা পোগ্রাডেন ও মস্কোপোলিস এই দুটি শহর দখল করেছে এবং আর্গিরোকাস্ট্রো শহরের উপকণ্ঠে ঢুকে পড়েছে বলে সংবাদ এসেছে। ইতালীয় সৈন্যেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে হটে গিয়েই পার পাচ্ছে না, শত শত ইতালীয় সৈন্য গ্রীকদের হাতে বন্দীও হচ্ছে। আগে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, কোরিটজার চারদিকে যে কয়দিন যুদ্ধ হয়েছে তাতে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত সম্পূর্ণ একটি ইতালীয় ব্যাটালিয়ন গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়েছে। ২৩শে নবেম্বর রয়টার জানায় যে, ২৮ হাজার ইতালীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এও বলে যে, সংবাদটি অসমর্থিত। তারপর গত ২৪শে নবেম্বর রয়টার খবর দিয়েছে কোরিটজা অঞ্চলে আরও ১৫ শত ইতালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে এবং আরও ১২টা ভারী কামান, কয়েকটি মর্টার এবং আরও নানারূপ সমরোপকরণ হস্তগত করা হয়েছে।

এক্সিস শক্তিচক্র

এক্সিস শক্তিচক্রের পরিধি যেভাবে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপে তারা 'নববিধানের প্রবর্তন' না করে ছাড়বেনই না। রুমানিয়া, শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী প্রভৃতি একে একে চক্রে ভিড়ে গেছে। কিন্তু এদের এই বজ্র-আঁটুনি গেরো ফস্কাবার পূর্বাভাস নয় তো?

২৬।১১।৪০ বিষ্ণুশর্মা

চিত্রায়—ঠিকাদার

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের চিত্র। পরিচালক—প্রফুল্ল রায়। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন দুর্গাদাস, জীবন গাঙ্গুলী, রেণুকা, তুলসী লাহিড়ী, কমলা ঝরিয়া, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ।

গল্প বলি শুনুন। চা-বাগানের এক ঠিকাদার। জনশ্রুতি, বাগানের ভূতপূর্ব মনিব বেহারী হালদারের আত্মজ—এক নেপালী মেয়ে তার মা। বেহারীর ছোট ভাই অবনী হালদার মৃত্যুর পর সেই নেপালী স্ত্রীকে পাগলা গারদে পাঠাইয়া ভাবী ঠিকাদার মতিকে অসহায় করিলেন। মা মৃত্যুশয্যায় প্রতিহিংসার জন্য পুত্রকে প্ররোচিত করিয়া চোখ বুজিয়াছেন। আজ সেই সুবর্ণ সুযোগ। অবনী হালদার স্বয়ং বাগান পরিদর্শনে আসিয়াছেন। টমটমের ক্ষিপ্ত ঘোড়ার হাত হইতে ঠিকাদারই হালদার সাহেবকে রক্ষা করিয়াছেন। ঠিকাদার স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ—বক্‌শিশ নেয় না—অপ্রয়োজনে দেখা করে না। মায়ের ফটোর সম্মুখে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি ঘনীভূত হয়। বন্দুক লইয়া হালদারের বাংলোয় আসে রাতে—কিন্তু মারা হয় না। আবার সুযোগ আসে। অবনী হালদারের একমাত্র কন্যা মিস্ লতিকা বন দেখিবেই। উপযুক্ত পথপ্রদর্শক এক ঠিকাদারই হইতে পারে। ঠিকাদার অসম সাহসী। বনে হালদার সাহেব ভয় পান। ঠিকাদারের বাংলোয় যখন তাঁহাকে আনা হইল তখন তিনি বন্দী। ঠিকাদার এইবার প্রতিহিংসা লইবে—ভোজালী প্রায় বুকের কাছে পেঁছায়। ঠিকাদারের বিবেকে লাগে সংঘর্ষ—নারী পথরোধ করে। পুলিশের কাছে শেষাশেষি কোন অভিযোগই পেঁছায় না। মিলনান্ত দৃশ্যে সিনারিওর গল্প বিলীন হইয়া যায়।

অর্থাৎ সবই আছে। প্রেম, জিঘাংসা, বিরহ, মিলন। গল্পের বৈচিত্র্যের দাবী একমাত্র জারজ সন্তানে। বৈচিত্র্য—অভিনব নহে। আখ্যান চিত্রায়িত হয় নাই, বিক্ষিপ্ত চিত্র আখ্যানের গ্রন্থি পাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বৈচিত্র্য—তাই পটভূমিকা পাহাড় ও চা-বাগান। চা-বাগান ও পাহাড়ে রোমান্স আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সে রোমান্স কলিকাতা শহরের স্টুডিয়ো মালিকের খুশী আর ফরমায়েস মত গজায় না। এই কথাটা পরিচালক বা সিনারিও লেখকের মনে ছিল না। ইহার ফলে যাহা হইবার হইয়াছে। ঠিকাদারকে কেন্দ্র করিয়া লেখা-গল্প যদিও সম্ভব হইত, একাধারে রূপায়িত ও শব্দায়িত হইতে গিয়া তাহাই অত্যদ্ভুত হইয়াছে। একে তো পরিচালক বা লেখকের পাহাড়িয়া বা বাগিচা জীবনের সহিত সামান্য পরিচয়ও নাই, তাহাতে রীলের দৈর্ঘ্য বজায় রাখিতে গিয়া এমন সব অর্থহীন দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা স্থূল-দৃষ্টিকেও পীড়িত করে। বাউল দোতারা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে কোথায় যাইতেছে আর কোথায় কাজ হইতেছে, দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইলেও, এগুলিকে গ্রথিত করিয়া লওয়া, হৃদয়ঙ্গম করা দর্শকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। কমলা ঝরিয়ার গান ভাল খাঁ আব্বাসউদ্দীনের গান মিষ্টি, জয়ন্তী পাহাড়ের দৃশ্যও মনোরম, তাহার মধ্যে নারী চলিয়াছে অভিসারে—মিলাইয়া গুলাইয়া দাঁড়ায় এই: ঠিকাদার বনপথে চলিয়াছেন, মজুরেরা গান গাহিয়া কাজ করিতেছে আর সখীসহ চণ্ডলী ঠিকাদারকে ফুল দিতে চলিয়াছে।

তাহার পরেই মালিকের শুভাগমন সংবাদ। হিন্দী চাল হইতে গৃহীত নরনারীনির্বিশেষে কোরাস্ সঙ্গীতের অসঙ্গত ঝামেলার পর যশোহরবাসী স্টেশন মাষ্টারের অবান্তর অভিনয়াধিক্য অক্লেশে সহ্য করিবার মতো হাল্কা রুচি দর্শকমাত্রেরই আছে এরূপ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। চা-বাগিচায় সাধারণত শ্রমিকশ্রেণী নাগপুরী মুণ্ডা, সাঁওতাল বা বিমিশ্র নেপালীজাত হইতেই আসে, মিস্ত্রীরা প্রায়ই চীনাম্যান এবং অফিস ও বাগানবাবুরা অবশ্যই বাঙালী। আলোচ্য চা-বাগানটি অতি ছোট। বাগানের পরিস্থিতি প্রায় প্রয়োজনই হয় নাই; তাই বাগানের বিস্তার বা কারখানা কোন কিছুরই আভাস উহাতে নাই। কেননা, কলিকাতার "হলিউডের" অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ওখানে পিক্‌নিক করিতে গিয়াছিলেন মাত্র। তাই লেখক বা পরিচালকের খুশী মতো অস্বাভাবিক ঘটনা ও "গুলতুনির" সমাবেশের মধ্য দিয়া ঠিকাদার তাহার পথ কাটিয়া চলিয়াছে। যশুরে, ঢাকাই বাঙালের অবতারণা অতি আদিমকালের কঠিন রস, আজও ইহাকে নিঙড়াইয়া রস বাহির করিতে গেলে বেদনাই জাগে। হিন্দুস্থানীর বাঙলা কথা বা "বাহে-ভাষা" শুনাইবার প্রবৃত্তিও তেমনি বালসুলভ। তাহার পর ঠিকাদারের ঘরের পাশে ঐ গান ও পরে মাথায় গামছা জড়াইয়া চুপিসারে উঁকি মারা ও পরে সমস্বরে কোরাস্ সঙ্গীতে কি রসের সৃষ্টি হইয়াছে উপলব্ধি করা কঠিন। ঠিকাদারের সঙ্গে ম্যানেজারের ঝগড়াটা যেন লেখক আগাইয়া আসিয়া করিয়াছেন আর এসব জায়গায় সংলাপ এত রূঢ়, নীতিবহুল ও অসংলগ্ন যে দর্শককে ইহাদের কাণ্ডটা বুঝিয়া লইতে রীতিমত বেগ পাইতে হয়। তাই ঝরিয়ার মুখে যে ভাষা ঝরিতে থাকে ভাষাতত্ত্ববিদেরাই কেবল বলিতে পারিবেন তাহাতে কতটা মুর্শিদাবাদী, কতটা কলিকাতার, কতটা নাগপুরী, কতটা বাহে কথা ও উচ্চারণ আছে।

জঙ্গলে আসিয়া বাঘ ও ভালুকের গল্পই শুনিলাম, দেখিতে দেখিলাম কুচবিহার মহারাজের পিলখানার গোটাকয়েক মূক ও স্তব্ধ হাতী। শালবনে তাহাতেই ছুটাছুটীর অবধি নাই। ইহাতে কতখানি সিরিয়াসনেস কতখানি ব্যঙ্গ তাহা ভাগ করিয়া লওয়া মুস্কিল। এই জঙ্গল-থ্রিলের ভারতলক্ষ্মীর "কমেডী অব্ এরার্স" সংস্করণে আফ্রিকার বুনো সমাজের আভাস হইতেও পরিচালক আমাদের বঞ্চিত করেন নাই। সেই অবোধ্য ভাষায় (বহুলাংশে বাহে-ভাষা) দীর্ঘ পুরোহিতের শাস্ত্র হুমকি আর লোক পুড়াইয়া মারা!

অর্থাৎ লেখক ও পরিচালকের বড় প্রয়োজন, প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য যে কোন প্রকারে হউক হালদার ও হালদার তনয়াকে খেদাইয়া ঠিকাদারের বাংলোয় আনা। এও যেন সেই আফ্রিকানদের বন্দীশালা ও বর্বর পাহারা! ঘটনাটা যে কোন্ যুগের বলা মুস্কিল। মিস্ লতিকার প্রতি সুবিচার করিলে বলিতে হয় যুগটা এই অতি-আধুনিক 'লেকে'র যুগ। কিছু কলেজ কিছু বিস্মরণীর পাষাণতলে প্রেমাশ্রু খুঁজিয়া ফেরা। কিন্তু পরক্ষণেই এমন সব ঘটনার সমাবেশ হয় যে, যে-কোন যুগের সীমা গুলাইয়া যায়। সর্বশেষ দৃশ্যে পুলিশ দারোগার সম্মুখে চণ্ডলী আর ঠিকাদারের হাত মিলাইয়া দেওয়া সেকি অতি-আধুনিক—প্রাচীন—না' মধ্যযুগীয়?

অল্প দুইদিন দুইরাত সময়ের মধ্যে গল্পলেখক এত অধিক অসম্ভব অভাবিত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে, ইহা গল্প না হইয়া কোন গুদামঘরের বদ্ধ গুমট্ হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের অনেকবারই মনে হইয়াছে যে, যে-ঘটনা বহুদিন আগে হইয়া যাওয়ার কথা, তাহা আজ সকালে ঘটিয়াছে বলিতেছে কেন? রাতে ঠিকাদার হালদারকে মারিতে যায়, চণ্ডলীর সহিত সে রাতে দেখা, পরদিন সকালে আবার চণ্ডলীর সহিত দেখা, আবার ওষুধ দিতে চণ্ডলীর সহিত তাহার দেখা, তাহার পর বনদৃশ্য, তাহার পর বন্দীদশা, তাহার পর হত্যার ব্যবস্থা, তাহার পর পুলিশ, তাহার পর মিলন ও বি-বা-হ। এক মুহূর্তের অবকাশ নাই। সব সাজানো সিন গুটাও আর সুট করো। সময়ের এই অনবসর ধোঁয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

গল্পে একজন নায়কের হয়তো সন্ধান মিলে কিন্তু নায়িকা নাই। তাই এমন কতকগুলি চরিত্র প্রাধান্য পাইয়াছে যাহা সংগত হয় নাই। সুখন ও মুংরী বারবার নানাচ্ছলে দেখা দিয়াছে। অথচ ইহারা অপরিহার্য নয়।

কথা উঠিয়াছে, দৃশ্যের মনোহারিত্বে ইহা নাকি অভিনব। কলিকাতার ইঁটের দেওয়ালে ঘা খাইয়া যাহাদের চক্ষুতে চশমা উঠিয়াছে তাহাদের একথা বলিতেই হইবে। কিন্তু এটি তো "জঙ্গল ছবি" নয়, জঙ্গলের ভীষণতাও ইহাতে নাই। সেরকম হইলে পরিচালকদের আফ্রিকা বা নিদেন টেরাইতে না গেলেও চলিত; যে অঞ্চলে এই ছবি তোলা হইয়াছে সে অঞ্চলের নিরাপদ ও সভ্যতাস্পৃষ্ট দৃশ্যগুলিই তাঁহাদের চোখে পড়িয়াছে। কুচবিহারের নীলকুঠির পরিচ্ছন্ন শালবনে না গিয়া রাজাভাতখাওয়ার "রিজার্ভ ফরেস্টেও" দুই একটি তাজা জন্তু মিলিতে পারিত এবং দৃশ্যের দিক দিয়া জয়ন্তী-বক্সারের অনেক দৃশ্যই তাঁহারা মিস্ করিয়াছেন! অতএব ইহা দৃশ্যের ছবি নহে; দৃশ্য পটভূমিকা মাত্র।

এই দৃশ্যাবলীকে পটভূমি করিয়া যে আখ্যান তাহার দেহে আরোপের চেষ্টা হইয়াছে তাহা বাহিরের; তাই পরিচালক ও লেখকের অসাধারণ অজ্ঞতার ফলে যেসব নরনারী সেখানে ভীড় করিয়াছে তাহারা তেলের মতই জলের উপরে ভাসিয়াছে। গল্প একদিকে গিয়াছে, পার্শ্ব-অভিনেতাদের আচরণ একদিকে গিয়াছে, ইহারই পিছনে দৃশ্য নির্বিকার হইয়া আছে। একটা উদাহরণ দি। চায়ের পাতা তোলার একটা রীতি আছে। ইহার ব্যতিক্রমে গাছকে গাছ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। একটা গাছে বড় জোর পাঁচ সাতটা প্লাক হয়। আলোচ্য চিত্রে যাহাদের ক্লোজ আপ্ লওয়া হইয়াছে তাহারা এলোপাথাড় "পাতি" তুলিয়া যাইতেছে এবং মিনিটের পর মিনিট একই গাছের সুমুখে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে।

অভিনয়ের দিক দিয়া দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সুনিপুণ, দক্ষ ও সংযত। রেণুকার অভিনয় অন্যত্র তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নহে; কেননা, এই শ্রেণীর অভিনেত্রীরা অতি-মাত্রায় কলেজীয়ান ভঙ্গি প্রদর্শন করিতে চাহে এবং নিউ থিয়েটারী ঢঙে "ও" বলার রীতি অস্বাভাবিক রকমের কটু ঠেকে। কিন্তু বন্দী অবস্থায় অনিবার্য মৃত্যুর মুখে পিতাকে আঁকড়াইয়া থাকিবার লীলায়িত ছন্দটি রেণুকার অভিনয়ে একটা সম্পদ। চরিত্রের দিক হইতে জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিতে ইচ্ছা জাগে। তার মৌন গাম্ভীর্যের অন্তরালে একটা ক্রুর চেতনার আচ্ছন্ন ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাক্-কৌশল ভাল—আঙ্গিক গঠনও চরিত্রোপযোগী। চঞ্চলীর ভূমিকায় সামঞ্জস্য পাওয়া কষ্টকর। প্রথম তাহার দেখা পাই পাঠাভ্যাসে রত অবস্থায়; সে অভিনয় ভাল হয় নাই। ভূমিকার তাৎপর্যটি চিত্রা ধরিতে পারে নাই। প্রেমাভিনয়গুলিও উৎরায় নাই। গান গায় গানের মানে বোঝেনা—লতিকা গান গাহিয়া প্রেমের গান বুঝাইয়া দেয়। "গ্রাম্য সরল জীবন, সাঁওতাল জীবন" ইত্যাদির তারিফ শুনিয়া লেখক যে শিব গড়িতে বসিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব অজ্ঞতার ফলে "——" হইয়াছে।

সন্তোষবাবুকে আদৌ কোন ভূমিকায় নামান সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। কি রকম একটা কৃত্রিম নাটকীয় স্তরে উনি বিচরণ করেন যেখানে কোন কথাই স্বভাবের নিয়ম মানিয়া চলে না। সব সময় এই চেতনা তাঁহার থাকে যে তিনি নাটক করিতেছেন এবং

নিউ থিয়েটার্সের 'অভিনেত্রী' চিত্রে কানন ও পাহাড়ী। ৩০শে নভেম্বর শনিবার হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে ইহা প্রদর্শিত হইবে।
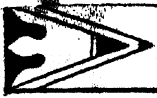
অপর কেহ শুনিতেছে বা দেখিতেছে। বলিয়াছি, কমলা ঝরিয়ার মুখরী অভিনয় অনুল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পার্শ্ববর্তী চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র তুলসী লাহিড়ী প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু 'রিক্তার' বুলাকীপ্রসাদকে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। তুলসীবাবু লেখা ছাড়িয়া অভিনয় করুন, আর্টিস্ট হিসাবে তাঁহার যশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। উৎপল সেনের পুরোহিত ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য।

যদি বলেন গানগুলি? বলিব—গান প্রক্ষিপ্তভাবে বিচার করিলে সুরচিত ও সংগীত, সেজন্য শৈলেন রায়, আব্বাস ও কমলাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এমেন ফোর্স ফিডিং—গান শুনিতেই হইবে। তাই যে কোন জায়গায় গান এবং আরও মারাত্মক, একেবারে কোরাস—মায় "ছেলেবুড়ো মেয়ে মদ্দা।"

আলোকচিত্রশিল্পীরা আজও যে উন্নতস্তরে পেঁছাইতে পারিল না, সেই প্রাথমিক যুগেই পড়িয়া আছে, সুদৃশ্য সত্ত্বেও এই চিত্রখানি তাহার উদাহরণ। বিভূতিবাবুকে ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না। স্থিরচিত্রশিল্প ভাল হইয়াছে। রূপসজ্জাকরেরা বড় অল্পতেই সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছেন; তাই অভিনেতা-নেত্রীদের শহুরে ভদ্রত্বের উপর ছাই চাপা দিত পারেন নাই। বড় মাজা ঘষা ও পোষাকী।

শব্দগ্রহণে অসংগতি আছে।

ছায়ালোকের টুকিটাকি

চায়ের দোকানের আড্ডা। সেদিন রেস্-ডে ছিল না।

"শুনচো ভায়া! লীলা চিত্নিশ ছবি পরিচালনা করচে। A new achievement for নারী-রাজ্য!"

"না দাদা! বাঈ জদ্দন বাঈও পরিচালক হয়েছিল।"

"রেখে দাও ভায়া! তোমার বাঈ জদ্দন বাঈ। অমন জাঁদরেলি নাম—ওকি মেয়েছেলে! একখানা জাঁদরেলি গোঁফ চড়িয়ে দাও, নামের 'পরে—বেটাছেলের বাবা! —আর 'লীলা চিৎনীশ'! হ্যাঁ-হে চায়ের চিনির মত কেমন মিষ্টি নামটি! প্রেমের পাঠের মহারাণী! ও আবার পরিচালক হয়ে কী 'সুটিং' করবে হে?"

"ভাবচো কেন দাদা! চা যে জুড়িয়ে গেল। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, 'আরে হায়াৎ'এর পরিচালক 'K.G.'—কেষ্ট গোপালজী, লীলা দেবীর সহকারী হচ্ছেন—ভয় কি?"

"ওরে বাবা! তাই বল! তা'লে 'regular shooting' হচ্ছে এবার। আমি বলি তাই তো! মেয়েছেলে—তায় রাঙ্গা টুকটুকে আঙ্গুরটির মত heroine!...........হাঁ! বোকার মত ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে আছে! যতসব হ্যাবলারা!.........'regular shooting' কথাটা জানো না—বুঝেছি!

আরে, রাজরাজড়ার সুটিং।.........রাজকুমার শীকারে চলেছেন। মারবেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সেদিন বনের বাঘ হে! হাতী-ঘোড়া, শিপাই শান্ত্রী, বিলিতী সাহেব, মার্কিন সাহেব, মিলিটারী সাহেব—সব সেরা সেরা শিকারী চলেছেন সাথে! বেঘো জালে ঘেরাও হল। Beater জঙ্গল পিটিয়েছে! তারা সারা জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে শিকারটিকে কুমার সাহেবের নজরে এনে হাজির করল। বেশী বেতরিবৎ বাঘ হলে সামনে বেঁধে রেখে দাও—ব্যাস্! কুমার সাহেবের shooting! চমৎকার হাতের তাগ্!...........এক গুলীতেই খেল খতম্! এতেও যদি বাঘ না মরে তবে সাঙ্গপাঙ্গোরা রয়েছে কি করতে হে!

Shooting হয়ে গেল। বন্দুকখানা সেকেন্দারী কায়দায় বাগিয়ে ধরে কুমার সাহেব একখানা পা মরা বাঘের পিঠে রেখে দাঁড়ালেন, বিরাশী হাত ছাতি ফুলিয়ে।

ইংরিজী, মার্কিনী, ফরাসী শিকারী সাহেবেরা বন্দুক ফেলে ক্যামেরা ঘাড়ে ছুটে এলো!

কাগজে কাগজে মহারাজ কুমারের বাঘ মারা ছবি। শিকারের অদ্ভুত কাহিনী!.........বুঝবেনা তো কিছুই! হাসো।—শ্রীমতী লীলা চিৎনিশের ডায়রেক্টরি সুটিং কুমার সাহেবের সুটিংএর চেয়ে ফ্যাল্না নয় হে!

দুঃখু কেবল কৃষ্ণগোপাল মহাশয়ের জন্যে। এই বুড়ো বয়সে তাঁকে 'beater'—'জঙ্গল পিটিয়ে' হতে হলো।

তর্কের বিষয়—ছবির শেষ কিসে জমে!

রামদা'দের গ্রুপ বললেন—মিলনান্ত হলে। টেবিলের আরশোলা রাজ্যে ভূমিকম্প তুলে শ্যামদা'রা বললেন—আলবৎ নয়—end চাই—বিরহ! মহাবিরহ! great tragedy! কমসে কম তিনটে চিতা!

যদুদা'দের তা'তে করুণ আপত্তি—'বিরহ ভাল! বৌয়ের বাপের বাড়ি যাওয়ার মত মন্দ লাগে না। তবে মিলন হলে টিকিট বিক্রি বেশী হতো।

শুনে হরিদা'রা নাক সিঁটকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন—তাঁরা সাধারণ দর্শকের চেয়ে অনেক উঁচু দরের।

তর্ক চলতে চলতে বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটবার উপক্রম হয়ে উঠল। এহেন সময়ে আমার রুম-মেট্ অধরদা' এসে এক কথায় তর্কের মীমাংসা করে দিয়ে গেলেন। বললেন—প্রথম বিয়োগান্ত করে শেষ করো। দেখো—দেখাও। তারপর 'অথবা' অর্থাৎ যাকে বলো 'alternate' দিয়ে মিলনান্তক করে দেখাও। সব্বার ভাল লেগে যাবে।

অধরদা'র একটু পরিচয় আবশ্যক। তিনি কাটা কাপড়ের দোকানে 'বদেশী—salesman'। খদ্দের কখনো তাঁর হাতছাড়া হয় না। এটা না হয় ওটা, একটা তিনি গছাবেনই।

* * * * *

অনেক কালের পুরোনো একখানা 'Life' কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিলুম! একটা লেখার উপরে গিয়ে চোখটা আটকে গেল। তিন তিনটে ইংরেজ যুবতী, ফরাসী ছবি দেখে ফিরচে। Hall থেকে বেরিয়ে তাঁদের একজন বল্লেন—

"Wasn't it grand to hear real French that way? I could follow it so easily, too; couldn't you?"

জবাবে আরেকজন—

"of course I could . . . ."

তৃতীয়া—

"I'm going to every French movie that comes along after this . . . . "

ছবিটির সংলাপ, গল্প, টেকনিক, ডাইরেকশন, ফটোগ্রাফি, রেকর্ডিং, মিউজিক, আর্টিস্ট—মোদ্দা সব কিছুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ (তিন নয়) হয়ে উঠতে উঠতে এক সময়ে তিনজনে লেগে গেল কোঁদল—মূল গল্পটাকে নিয়ে। এক নম্বর চটে গিয়ে বললো—

"Why, silly—he was her lover! . . . ."

দু নম্বর তা মানবে কেন? সে মাতৃভাষা ইংরেজীর চেয়েও ফরাসী ভাষায় ওস্তাদ বেশী। সে বল্লো।

"He was not—Pat. He was her brother. you missed the point entirely . . . ."

তিন নম্বর তন্বী ও ফরাসী ভাষায় কম সমজদার নয়। সে রুখে উঠলো—

"You are Crazy, Anne. He was her husband, and she hadn't seen him for a long time and had been cutting up with the other man . . . ."

তিনজনই জলের মত পরিষ্কার বুঝেছেন—গল্পটা কি এবং কে তার hero!

কলকাতায় যে সব হিন্দুস্থানী সিনেমা হাউস থেকে, যেসব খাঁটি উর্দু ছবি দেখে দলে দলে যেসব খাঁটি বাঙালী মহিলারা ছবির তারিফ গাইতে গাইতে বেরোন্—তাদের কটাক্ষ করবার জন্য কিন্তু এই ইংরেজ তরুণীদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আমরা জানি ঐ বাঙালী মহিলারা সকলেই খাঁটি উর্দু বোঝেন। বোম্বাইয়া হিন্দিতো তাঁদের ডালভাত!

তাঁরা Bus conductorকে ডেকে বলেন—"বাঁধকে"! রিক্সা-ওয়ালাকে বলেন—"হিঁয়া আও"। আয়াকে হুকুম দেন—'ঘুম পাড়ায়কে দেও।"

তাঁরা জানেন—উর্দু ডান দিক থেকে নয়—বাঁ দিক থেকে লেখে। চিনা হরফের মত। দেবতাদের নাগরা জুতোর পায়ের তলার নালের ছাপ থেকে দেবনাগরী হরফের জন্ম। —চিত্ররথ

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলার দল

আগামী ৩০শে নভেম্বর হইতে জামসেদপুরের কিনান স্টেডিয়ামে বাঙলা ও বিহার দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইবে। গত বৎসরে বাঙলা দল ঐ মাঠে খেলিয়া বিহার দলকে পরাজিত করিয়াছিল। এই বৎসরেও বাঙলা দল পূর্ব বৎসরের অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হউক ইহাই সকলের কামনা।

বাঙলা দল নির্বাচিত

রণজি প্রতিযোগিতার উক্ত খেলার জন্য বাঙলার দলের খেলোয়াড়গণ নির্বাচিত করা হইয়াছে। গত বৎসর যে সকল খেলোয়াড় খেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই এই দলে খেলিতে দেখা যাইবে না। এন হ্যামন্ড যিনি গত বৎসরের খেলায় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি এই বৎসরের দলে যোগদান করেন নাই। ডব্লিউ সুট, এস হার্কার, এইচ সাধু, জে এন ব্যানার্জি, এম মিত্র প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ নির্বাচিত দল হইতে বাদ পড়িয়াছেন। এই সকল খেলোয়াড়দের পরিবর্তে এস ডব্লিউ বেরহেন্ড, এ গার্বিস, এ রামচন্দ্র, টি ভট্টাচার্য, এ জব্বর প্রভৃতিকে লওয়া হইয়াছে। এস দত্ত গত বৎসর জামসেদপুরের খেলায় অপূর্ব বোলিং করিয়া প্রতিপক্ষ দলের ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। তিনি নির্বাচিত দলের অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে গমন করিবেন।

নির্বাচন একরূপ ভাল হইয়াছে

বাঙলা দলের খেলোয়াড় নির্বাচন সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে একরূপ ভালই হইয়াছে। ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণ যখন সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই, তখন নির্বাচকমন্ডলীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব হইত না। তবে এই কথা না বলিয়া আমরা পারি না যে, এই দলে পি ডি দত্তকে স্থান দিলে নির্বাচকমন্ডলী ভালই করিতেন। পি ডি দত্ত টালার বাছাই খেলায় বোলিংয়ে যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে দলভুক্ত করিলে বাঙলা দলের বোলিং দিকটা অধিকতর শক্তিশালী হইত।

নিম্নে বাঙলা দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

(১) কে বসু (অধিনায়ক)	স্পোর্টিং ইউনিয়ন
(২) এস ডব্লিউ বেরহেন্ড	(বালীগঞ্জ সি সি)
(৩) কমল ভট্টাচার্য	(এরিয়ান্স ক্লাব)
(৪) সুশীল বসু	(এরিয়ান্স ক্লাব)
(৫) এ কামাল	(মহমেডান স্পোর্টিং)
(৬) নির্মল চাটার্জি	(স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৭) এ জব্বর	(ই বি আর ও মহমেডান স্পোর্টিং)
(৮) কে রায়	(স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(৯) টি ভট্টাচার্য	(ই বি আর মোহনবাগান)
(১০) এ গার্বিস	(ডালহৌসী)
(১১) এ রামচন্দ্র	(কালীঘাট ক্লাব)

অতিরিক্ত

(১) গণেশ বসু	(স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
(২) এস দত্ত	(বি এন আর ও কালীঘাট)

বিহার ক্রিকেট দল

বিহার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটি রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য যে দল গঠন করিয়াছেন, তাহা গত বৎসর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এই দলে এই বৎসর যে সকল খেলোয়াড়কে লওয়া হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই প্রায় এই বৎসরের বিভিন্ন খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙলা দল গত বৎসর যত সহজে বিহার দলকে পরাজিত করিয়াছিল, এই বৎসর তত সহজে পরাজিত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। খেলায় উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নিম্নে বিহার দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—কে ডি নারোজী (অধিনায়ক), বিজয় সেন, জাহুর আমেদ, শান্তি বাকচী, বিমল বসু, এস ব্যানার্জি, এম ভানিয়া, সানজানা, খাম্বাটা, এস চক্রবর্ত্তী, এন মোদী। অতিরিক্ত:—এস রায় চৌধুরী ও বাল সোরা।

বাঙালী টেনিস খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব

গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকায় বাঙালী টেনিস খেলোয়াড়ের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। সম্প্রতি সেই অভাব পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কলিকাতা সাউথ ক্লাবের তরুণ টেনিস

দিলীপ বসু ও ইফতিকার আমেদ

খেলোয়াড় দিলীপ বসু এই আশা সঞ্চারের কারণ। তিনি এই বৎসর বাঙলার টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবের টেনিস ক্রমপর্য্যায় শীর্ষস্থান অধিকারী ইফতিকার আমেদকেও দিলীপ বসু উত্তর ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় স্ট্রেট সেটে পরাজিত করিয়াছেন। ইফতিকার আমেদ এই বৎসর বিরিটোন চোপ্রা টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের ক্রমপর্য্যায় তালিকার শীর্ষস্থান অধিকারী গউস মহম্মদকে পরাজিত করিয়াছেন। দিলীপ বসু এইরূপ একজন ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে পরাজিত করিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকায় তাঁহার স্থান হইবে ইহা আশা করা খুব অন্যায় হইবে না।

দিলীপ বসুর ক্রমোন্নতি

১৯৩৫ সালের পূর্বে দিলীপ বসুর স্থান বাঙলার জুনিয়ার টেনিস খেলোয়াড়গণের মধ্যে ছিল। এই সময় ইঁহার খেলা দেখিয়া কেহই আশা করিতে পারেন নাই যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়গণের মধ্যে তিনি স্থান পাইবেন। সেই জন্য ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম দিলীপ বসু প্রথম শ্রেণীর টেনিস খেলায় যোগদান করিয়া নৈরাশ্যজনক ফল প্রদর্শন করিলে অনেকেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে দিলীপ বসু হতাশ হন না এবং সাউথ ক্লাবের লনে নিজ প্রচেষ্টায় ক্রীড়া-কৌশলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রচেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য লাভ করে। এবং ১৯৩৮ সালে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে ১৯৩৯ সালে ভারতীয় টেনিস দলের ইউরোপ ভ্রমণের কথা উঠিলে দিলীপ বসুর নাম নির্বাচকমণ্ডলীর আলোচনার মধ্যে উঠে। তবে নির্বাচিত দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, দিলীপ বসু স্থান পান নাই। গউস মহম্মদ, ইফতিকার আমেদ, যুধিষ্ঠির সিং ও সোহানী এই চারিজন খেলোয়াড়কে নির্বাচিত করা হয়। সোহানী কোন বিশেষ কারণে ভ্রমণকারী দলে যোগদান করিতে না পারায় দিলীপ বসুকে নির্বাচকমণ্ডলী দলভুক্ত করেন। এইরূপে দিলীপ বসু ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন খেলায় যোগদানের অধিকারী হন। কিন্তু দিলীপ বসুর এমন দুর্ভাগ্য যে ইউরোপের কোন খেলাতেই তিনি উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন না। ইফতিকার আমেদ, যুধিষ্ঠির সিংহের খেলাও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে না। একমাত্র গউস মহম্মদ উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার সেমি ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলিয়া ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণের সম্মান বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পুনরায় দিলীপ বসুকে ক্রীড়াকৌশলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেখা যায়। নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশন ফরাসী টেনিস শিক্ষক এণ্ট্রোয়ো কলিকাতায় আগমন করিলে দিলীপ বসু নিয়মিতভাবে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবের অভিজ্ঞ টেনিস খেলোয়াড় রণবীর সিং নিখিল ভারত এসোসিয়েশনের শিক্ষক হিসাবে কলিকাতায় আগমন করিলে দিলীপ বসু পুনরায় তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়া ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা করেন। এইরূপ দুইজন অভিজ্ঞ টেনিস শিক্ষকের সাহায্য দিলীপ বসু যে ভাল করিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে তিনি তাহার পরিচয় দিতেছেন। ভবিষ্যতে এইরূপ শিক্ষকের সাহায্যপ্রাপ্ত হইলে তিনি খেলায় আরও উন্নতি করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। সাউথ ক্লাবের পরিচালকগণ দিলীপ বসুকে এই বিষয় সাহায্য করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। ইহাতে সাউথ ক্লাবের সুনাম বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী টেনিস খেলোয়াড়দেরও সম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙলার টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকা

নিম্নে এই বৎসরের বাঙলার টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রদত্ত হইল:—

প্রথম:—**দিলীপ বসু**

দ্বিতীয়:—**এ মদনমোহন**

তৃতীয়:—**ডব্লিউ মিচেলমোর**

চতুর্থ:—**ডি এলবার্ট**

বাঙলার ক্রিকেট দলের ভ্রমণ

বেঙ্গল জিমখানার নির্বাচিত ক্রিকেট দলের ভ্রমণ সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করা গিয়াছিল, ফলত তাহাই হইয়াছে। বাঙলার ক্রিকেট দল প্রথম খেলাতেই আমেদাবাদে গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের নিকট শোচনীয়ভাবে ৭ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। কি ব্যাটিং, কি বোলিং সকল বিষয়েই বাঙলার খেলোয়াড়গণকে গুজরাট দলের খেলোয়াড়গণের নিকট অপদস্থ হইতে হইয়াছে।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাঙলার দল প্রথমে ব্যাটিং করিবার সুযোগলাভ করে। মাত্র ১৭১ রান করিবার পর সকলে আউট হইয়া যায়। একমাত্র এ জব্বর এই ইনিংসে ৫১ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। গুজরাট দলের বোলার বালুক ৫১ রানে ৫টি ও চিপ্পা ৫৯ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। পরে গুজরাট দল ব্যাটিং গ্রহণ করিয়া ২৫৪ রানে ইনিংস শেষ করে। বাঙলার বোলারগণ প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও রান তোলা বন্ধ করিতে পারেন না এই ইনিংসে গুজরাট দলের অধিনায়ক মুস্তাক আলী ৯১ রান পাঠান ৪৬ রান ও ঠাকুরসাহেব ৫৩ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বাঙলা দলের বোলারদের মধ্যে এস দত্ত ও রামচন্দ্রের বোলিং এই ইনিংসে কার্যকরী হয়। বাঙলা দল ৮৩ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। সকল ব্যাটসম্যানই রান তুলিবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। গুজরাট দলের বালুক ও চিপ্পার বোলিং পুনরায় খেলোয়াড়গণকে বিব্রত করে। ফলে দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৪৫ রানে শেষ হয়। একমাত্র সুশীল বসুর ৬৭ রান ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড় অধিক রান করিতে পারেন না। এই ইনিংসেও বালুক ৪২ রানে ৬টি ও চিপ্পা ৪৬ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। গুজরাট দল পরে খেলিয়া তিন উইকেটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করিতে চ্চপসিম লবপন্ লচ 'নইটপ্র সদপএ্ মহয়ছশ অতরবগ

খেলার ফলাফল:—

বেঙ্গল জিমখানা প্রথম ইনিংস:—১৭১ রান। (জব্বর ৫১, রামচন্দ্র ২৯, এস গাঙ্গুলী ১৫; বালুক ৫১ রানে ৫টি, চিপ্পা ৫৯ রানে ৩টি ও মিঃ প্যাটেল ৩২ রানে ২টি উইকেট পান।)।

গুজরাট প্রথম ইনিংস:—২৫৪ রান। (মুস্তাক আলী ৯১, পাঠান ৪৯, ঠাকুর সাহেব ৫৩; কে ভট্টাচার্য ৬৫ রানে ২টি, জে ব্যানার্জি ৪১ রানে ১টি, এস দত্ত ৪৫ রানে ৩টি, রামচন্দ্র ৩৬ রানে ২টি ও এস ব্যানার্জি ৫২ রানে ১টি উইকেট পান।)

বেঙ্গল জিমখানা দ্বিতীয় ইনিংস:—১৪৫ রান। (এস গাঙ্গুলী ১৬, সুশীল বসু ৬৭, এন চ্যাটার্জি ১৬, রামচন্দ্র ১৪; বালুক ৪২ রানে ৬টি, চিপ্পা ৪৬ রানে ৩টি, ঠাকুর সাহেব ৮ রানে ১টি উইকেট পান।)

গুজরাট দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৩ উইকেটে ৬৭ রান। (প্রজাপতি নট আউট ৩৭, চিপ্পা ১৯; কে ভট্টাচার্য ১৩ রানে ১টি, জে এন ব্যানার্জি ১৬ রানে ১টি ও এস দত্ত ২১ রানে ১টি উইকেট

পান।)

বেঙ্গল জিমখানা দল ৭ উইকেটে পরাজিত।

কলিকাতায় বিশেষ ক্রিকেট খেলা

আগামী ৩রা জানুয়ারী হইতে ইডেন উদ্যানে তিনদিনব্যাপী এক বিশেষ ক্রিকেট খেলা হইবে। এই খেলায় বড়লাট বাহাদুরের দলের সহিত বাঙলার লাট বাহাদুরের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ উভয় দলে যোগদান করিবেন। নিম্নে উভয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

বড়লাট বাহাদুরের দল

পাতিয়ালার মহারাজা (অধিনায়ক), অমরনাথ (পাতিয়ালা), বিজয় মার্চেণ্ট (বোম্বাই), আমীর ইলাহি (পাতিয়ালা), ভি এস হাজারী (মহারাষ্ট্র), বিনু মানকড় (নবনগর), যুবরাজ ইন্দ্রবিজয় সিং (নবনগর), মহম্মদ নিশার (লাহোর), মারোয়াৎ হোসেন (দক্ষিণ পাঞ্জাব), ডি ডি হিন্দেলকার (বোম্বাই), মহম্মদ সৈয়দ (দক্ষিণ পাঞ্জাব) ও নাজীর আলী (দক্ষিণ পাঞ্জাব।)

বাঙলার লাট বাহাদুরের দল

পতৌদীর নবাব (অধিনায়ক), মেজর সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলী (গুজরাট), টি সি লংফিল্ড (কলিকাতা), এস ব্যানার্জি (নবনগর), পি ই ভাণ্ডারগাট (বোম্বাই), কার্তিক বসু, নির্মল চ্যাটার্জি, কমল ভট্টাচার্য, জাহাংগীর খাঁ ও পি ই পালিয়া।

কোয়াড্রাংগুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা

আই এফ এর পরিচালিত কোয়াড্রাংগুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। মুসলিম দল ফাইনালে হিন্দু দলকে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় একটি মাত্র গোলে পরাজিত করিয়া কোয়াড্রাংগুলার বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। মুসলিম দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়।

অসময়ে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করিলে যাহা হইয়া থাকে এই প্রতিযোগিতার পরিণামও তাহাই হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন দল বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত হইলে কি হয়, কোন দলের কোন খেলোয়াড়ই স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এমন কি এইরূপ একটি বিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় যেরূপ দর্শক সমাগত হওয়া উচিত ছিল সেইরূপ দর্শক সমগমও হয় নাই। অধিকাংশ দিনই প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহকে ফাঁকা মাঠে খেলিতে হইয়াছে।

হিন্দু বনাম এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

হিন্দু বনাম এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দলের খেলাটি বেশ প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল। এই খেলার মীমাংসা হইতে চারিদিন লাগে। প্রথম দিনে উভয় দল একটি করিয়া গোল করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে উভয় দল কোন গোল করিতে না পারায় খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এইরূপে তিনদিন খেলাটি অমীমাংসিত থাকায় দর্শকগণও বিরক্ত হইয়া উঠেন। হঠাৎ চতুর্থ দিনে হিন্দু দলের খেলা খুলিয়া যায়। হিন্দু দল এই দিন খেলায় প্রাধান্যলাভ করে ও দুইটি গোলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দলকে পরাজিত করে। এই দিনের খেলায় হিন্দু দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তাহাতে অনেকেই আশা করেন যে, হিন্দু দল কোয়াড্রাংগুলার বিজয়ী হইবে। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা নিরাশায় পরিণত হয়। হিন্দু দল ফাইনালে মুসলিম দলের নিকট এক গোলে পরাজিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল ও বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল।

খেলার ফলাফল

হিন্দু দল (২) — এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান (০)

(বুচী ও সোমানা হিন্দু দলের পক্ষে গোল করেন)

মুসলিম দল (১) — ইউরোপীয়ান দল (০)

(মুসলিম দলের পক্ষে রসিদ গোল করেন)

ফাইনালে

মুসলিম দল (১) — হিন্দু দল (০)

(মুসলিম দলের পক্ষে সাবু গোলটি করেন)

বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়গণ

মুসলীম দল:—আলীহোসেন; সিরাজুদ্দিন, জুম্মা খাঁ; বাচ্চি খাঁ, রসিদ খাঁ ও মাসুম; নুরমহম্মদ (ছোট), করিম, রসিদ, সাবু ও আব্বাস।

হিন্দু দল:—ডি সেন; পি চক্রবর্তী, আর মজুমদার; এ নন্দী, প্রেমলাল ও জয়রাম; এস গুই, স্বামীনাথম, সোমানা, বুচি ও এস্ নন্দী।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দল:—জার্ডিন; জি কার্ভে এস আর্ল; জে ফলস্, জে লামসডেন ও এ জর্ডন; জে মিলস, জে রেণ্টন, আর লামসডেন, আর ফিণ্ডলে ও জে হুইটবার্ন।

ইউরোপীয়ান দল:—মিলস; স্মিথ ও ওয়াট; মরিস, মার্স ও মেলিয়া; ব্যাটার্সবি, ওয়েল্ডিং, ডিক্স, মুলার ও বেসউইক।

বোম্বাই পেণ্টাংগুলার ক্রিকেট

বোম্বাই পেণ্টাংগুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দলের খেলোয়াড় নির্বাচন এখনও শেষ হয় নাই। মেজর নাইডু হিন্দু দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্বাচন ক্রীড়ামোদি অনেককেই আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। অধ্যাপক দেওধর হিন্দু দলের অধিনায়ক হইবেন বলিয়া সকলের ধারণা ছিল। অধ্যাপক দেওধরের পক্ষ যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা একরূপ জোর করিয়াই বলিয়াছেন যে, মেজর নাইডুকে অধিনায়ক নির্বাচন করিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ অধ্যাপক দেওধরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অধ্যাপক দেওধর এই বৎসর বিভিন্ন খেলায় ব্যাটিং ও দল পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে ২৪৬ রান করিয়া দেওধর প্রকৃতপক্ষেই ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মেজর নাইডু পূর্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও বর্তমান বৎসরে কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। এমন কি তিনি এই বৎসর কোন বিশিষ্ট খেলাতেই যোগদান করেন নাই। অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও অধ্যাপক দেওধর মেজর নাইডুর বহু পূর্বের খেলোয়াড়। সুতরাং দেওধরকে অধিনায়ক না করিয়া মেজর নাইডুকে অধিনায়ক করিয়া নির্বাচন কমিটি অন্যায় করিয়াছেন।

উজীর আলী মুসলীম দলের, পি ই পালিয়া পার্শী দলের ও এইচ হ্যারিস অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন।

দেশ
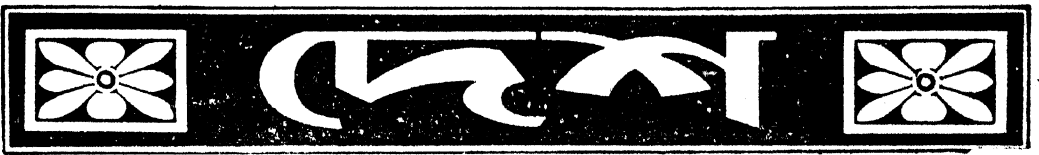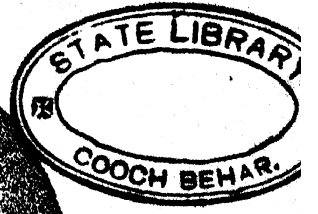
৮ম বর্ষ] ২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 7th December, 1940 [৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইংরেজের আদর্শ—

ভারত সচিব আমেরি সাহেবের আর এক দফা বক্তৃতা পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের নিউ মার্কেটে তিনি এই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভারত সচিব যখন তিনি, তখন ভারতের কথাও তাঁহার বক্তৃতায় আছে, কিন্তু ভরসার কথা কিছুই নাই। আমেরি সাহেব এই বক্তৃতায় দিল্লীতে আহূত প্রাচ্য-সাম্রাজ্য সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া দার্শনিকতার উচ্চ স্তরে উঠিয়া বলেন, "সম্প্রতি দিল্লীতে যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহার মধ্যে আমরা শুধু শিল্পোৎপাদনের কতকগুলি উপায়ের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি ধাতুতে গঠিত এই সম্মেলন তাহার একটি প্রমাণ। আমাদের সাম্রাজ্য এমন সাম্রাজ্য নহে, যেখানে শুধু শাসন আর শোষণই দুইটি মাত্র কাজ। হিটলার অবশ্য মনে করেন যে, আমরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছি এবং আমাদের সাম্রাজ্য নাকি অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। এক পুরুষ আগে যে সম্পর্ক ছিল, বর্তমানে আমাদের স্বদেশ ও সাম্রাজ্যের ভিতর সেই সম্পর্ক অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে ইংলণ্ডের অবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় সূর্যের মত, এবং অন্যান্য উপনিবেশ ও অধীন দেশগুলি ছিল তাহার চতুর্দিকে আবর্তমান গ্রহ; কিন্তু প্রেরণা ও আদেশের মূল আধার ছিল এই দেশ। বর্তমানে তাহারা আর এইরূপ কক্ষবদ্ধ নহে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া, সাম্রাজ্যের সমান অংশীদারস্বরূপে পরস্পর সাধারণ হিত সাধনায় কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়া এক আদর্শে চলিতেছে।" ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির সম্বন্ধে আমেরি সাহেব যদি ঐ সব কথা বলিতেন, তবে তাহার মূল্য আমরা কতটা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সাম্রাজ্যের সমান অংশীদাররূপে কর্মশক্তি নিয়োগ করিবার অধিকার ভারতের নিশ্চয়ই নাই। ভারতবর্ষ এখনও আদেশের জোরেই শাসিত হইয়া থাকে এবং সেই আদেশের মূল আধার আমেরি সাহেবেরই দেশ—ইংলণ্ড। ব্রিটিশ জাতির এক পুরুষ আগে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির যে সম্পর্ক ছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, একথা আমরাও অস্বীকার করি না; কিন্তু ভারতের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। হিটলারের মনে অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের সম্বন্ধে কি ধারণা আছে আমরা জানি না; কিন্তু জগতের সকল জাতির স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ সংগ্রাম করিতেছে, যুদ্ধের এই যে আদর্শ যাহা প্রচার করা হইয়া থাকে এবং আমেরি সাহেব তাহার বক্তৃতায় শুধু ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি নহে, ব্রিটিশের অধীন দেশগুলির সম্বন্ধেও ব্রিটিশ জাতির যে আদর্শের কথা বলিয়াছেন, সেই আদর্শকে মূল্য দান করিতে হইলে, সকলের আগে ভারতের স্বাধীনতার দাবী তাঁহাদের মানিয়া লওয়া উচিত। নহিলে তাঁহাদের আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ সংশয় জগতে সৃষ্টি হইবে এবং হিটলারের শুধু মনের ধারণার পরিবর্তন নহে, হিটলারের প্রচার-প্রচেষ্টার কুফলও সুনিশ্চিতভাবে রোধ করিবার ইহাই হইল প্রকৃত পথ; কিন্তু কর্তাদের ওস্তাদী কথার বেলা, তাঁহারা কাজের পথে যাইবেন না।

দায়িত্ব এড়াইবার কৌশল—

ভারতের সম্পর্কে ব্রিটিশ জাতির যুদ্ধের আদর্শ শুধু কথায় নিবদ্ধ রাখিয়া কাজের পথ এড়াইবার যে কৌশলটি বর্তমান ভারত সচিবের সকল বক্তৃতায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, নিউ মার্কেটে তাঁহার এই বক্তৃতাতেও তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিল্লী সম্মেলনের বিশেষত্ব আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া আমেরি সাহেব বলেন, "দিল্লী সম্মেলনের আসল বক্তব্য হইল যে, প্রত্যেক সাম্রাজ্যগত রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্নভাবে সাম্রাজ্য রক্ষার একটি দায়িত্ব আছে। ভারতের পক্ষে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, যাহা

না। ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে কার্যত তাঁহারা সাহায্য করিবেন না; কি জানি, এই সুযোগে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের জাহাজী ব্যবসাটা পাছে ভবিষ্যতে ব্রিটিশ ব্যাপারীদের হাতছাড়া হইয়া যায়! সুতরাং বুঝা যাইতেছে, যুদ্ধ ব্যাপারে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির বড় বড় কথা কর্তারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ব্রিটিশ উপনিবেশবাসীদের স্বার্থই তাঁহাদের কাছে বড়—কথায় আছে রক্তের টান বড় টান।

ভারতে বিজ্ঞান সাধনা—

ডাক্তার এস এম ভাটনগর ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নব-গঠিত বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান বোর্ডের ডিরেক্টর। তিনি সেদিন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বক্তৃতা প্রদান করেন। জগতের বিভিন্ন দেশ বর্তমান যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেশরক্ষার উহা একটা অঙ্গস্বরূপ, তাহা ছাড়া অর্থনীতিক স্বাধীনতার দিক হইতেও উহার মূল্য আছে। ডাক্তার ভাটনগর তাঁহার বক্তৃতায় জাপানের রসায়ন শিল্পের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, জাপান সম্প্রতি এই ক্ষেত্রে বিশেষ রকমে আগাইয়া গিয়াছে। বিগত মহাসমর এবং চীনের সহিত জাপানের সংগ্রাম জাপানের এই অগ্রগতিতে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে এবং পিছনে সাহায্য যোগাইয়াছেন জাপানের গভর্নমেণ্ট। কিন্তু ভারতের বেলায় কি ঘটিতেছে? ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্পর্কে যে কাজ হইতেছে ডাক্তার ভাটনগর তাহার উল্লেখ করেন এবং এই সম্পর্কে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল, টাটা প্রভৃতি কয়েকটি কোম্পানীর তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতিরও প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে এই যে, অন্যান্য দেশের গভর্নমেণ্ট এই সম্পর্কে যেরূপ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার তুলনায় আমাদের অবস্থা কি? ভারত গভর্নমেণ্টের কর্ণধারদের মুখে আমরা বড় বড় কথা অনেক শুনিয়া থাকি, যুদ্ধ বাধিবার পর, বিশেষত্ব দেখিতেছি, শুধু বড় একটা নাম দিয়া বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প বাণিজ্য তথ্যানুসন্ধানের এই বোর্ডের গঠন। ডাক্তার ভাটনগর জানাইয়াছেন যে, এই বোর্ড তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ১৫টি কমিটি গঠন করিয়াছেন, কিন্তু কমিটি-কমিশন গঠনে এদেশে প্রকৃত কাজের পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং প্রকৃত কাজ চাপাই পড়িয়া গিয়া থাকে। ডাক্তার ভাটনগরের বক্তৃতায় জনসাধারণের মন হইতে এ সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইবে না।

বিক্রয় কর বিল—

বিক্রয় কর বিল সিলেক্ট কমিটিতে গিয়াছে। এই বিলের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে সর্বত্র প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়াতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙলা দেশের ব্যবস্থা পরিষদে জোহুকুমী জোটবাঁধা দলের জোর কত এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিক্রয়ের কি ব্যবসা সেখানে চলিতেছে। অর্থসচিব স্যার এইচ এস সুরাবর্দী এই বিলের পক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি একেবারেই ছেঁদো। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, দেশের গঠনমূলক কর্ম টাকার অভাবে বন্ধ হইয়া আছে। এ দুঃখ দূর করিবার জন্যই মন্ত্রীদের এই উদ্যম। গঠনমূলক কার্য বলিতে এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা তো ইহাই বুঝিয়াছি যে, উহা বড়দরের একটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং নির্দিষ্ট কোন কাজের হিসাব দেখাইবার ঝঞ্চাট এড়াইবার জন্যই এই কৌশলটি চলিয়া আসিতেছে। বিশেষত গঠন-মূলক কাজে যদি এতদিনই সবুর সহিয়াছে, তাহা হইলে নূতন বাজেট উপস্থিতির সময়টা পর্যন্ত কি সবুর সহিত না! যুদ্ধের জন্য বাঙলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার একেই তো বলিতে গেলে নষ্ট হইয়াছে, এই নূতন করভারের চাপে ছোট ছোট যে সব ব্যবসা আছে, সেগুলি সবই নষ্ট হইবে, তাহার উপর জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির চাপ আসিয়া পড়িবে গরীবের উপর। কিন্তু বাঙলা দেশের মন্ত্রীদের সে বালাই নাই। তাঁহাদের মোড়ল প্রধান মন্ত্রী—যিনি গরীবের ডালভাত যোগাইবার পুণ্যব্রতে নামিয়াছিলেন, এখন সুবে বাঙলার গদীতে বসিয়া তিনি সে কথা ভাবিবার ফুরসৎই পাইতেছেন না! হক মন্ত্রিমণ্ডলের এই মাহাত্ম্য বাঙলার জনসাধারণ ক্রমেই বুঝিতেছে এবং হিসাবের দিনও আসিতে দেরী নাই।

স্বাধীনতার আদর্শ ও ছাত্রসমাজ—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা জাতির এই সঙ্কটকালে ছাত্রসমাজকে মহান্ আদর্শে উদ্দীপ্ত করিবে। প্রাণবান্ তাঁহার ভাষা, গভীর তাঁহার আবেগ। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যুবকদিগকে এমনভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলুন, যাহাতে তাহারা সাহসের সঙ্গে, মর্যাদাবুদ্ধির সহিত এবং আন্তরিকতা সহকারে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে পারে। ভারতের সর্বত্র আজ অনৈক্য এবং বিভেদ দেখা দিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধতা এতই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের মাতৃভূমিকে বিখণ্ডিত করিবার দাবীও উত্থিত হইয়াছে।' সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর দেশ-দ্রোহীদের তেমন দাবীকে আমরা ভয়ের চোখে দেখি না, যদি ভারতের ছাত্র ও যুবক সমাজে স্বাধীনতার আদর্শ অম্লান থাকে; কিন্তু সেই ছাত্রসমাজের মধ্যে যখন ভীরুতা দেখি এবং ছাত্রদের সুবুদ্ধি বাড়াইবার অছিলায় ভীরুতার স্বপক্ষে পাণ্ডিত্য ফলাইয়া প্রচারকার্য দেখি, তখনই আমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। ডাক্তার মুখুজ্যের অভিভাষণ আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে।

অজন্তা গিরিমন্দিরে

অধ্যাপক-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[৩]

অজন্তার প্রায় প্রতি গুহায়ই অতি সুন্দরভাবে অনেকগুলি জাতকের চিত্র অঙ্কিত আছে। তাহার মধ্যে দুই নম্বর গুহার 'হংসজাতক', অতি মনোজ্ঞভাবে অঙ্কিত। বারাণসীর রাজা ও রাণীকে রক্ষার জন্য বোধিসত্ত্ব পূর্বজন্মে সুবর্ণ হংসের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে চিত্রিত হইয়াছে। দুই নম্বর গুহার ন্যায় ষোল নম্বর গুহাতেও বুদ্ধদেবের জীবনের বিবিধ ঘটনার সুরঞ্জিত চিত্রসমূহ দেদীপ্যমান আছে। কোথাও মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন, ষড়্‌দন্তযুক্ত শ্বেতহস্তী তাঁহার উদরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কোন চিত্রে লুম্বিনী উদ্যান মধ্যে মায়াদেবী তাঁহার সহচরিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র অপরাপর দেবতাগণসহ তথায় আসিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। দেবতাগণের প্রসন্ন মুখশ্রী অপূর্ব প্রভামণ্ডিত। চিত্রকর প্রত্যেকটি রেখার ভিতর দিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

কোথাও 'সপ্তপদী' চিত্র, কোথাও শ্রাবস্তীর একটি ঘটনার চিত্র। নৃপতি প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ দেখিয়া তাঁহার চরণে আত্মবিসর্জন করিলেন। রাজা মহদ্ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে আপনাকে আবির্ভূত করিয়া নৃপতি প্রসেনজিৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

মারের প্রলোভন বা "The Temptation of Buddha" চিত্রখানি অজন্তা গুহার একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পদ। এই চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্বজনবিদিত। মার নানা প্রলোভনে বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছেন। ডক্টর বার্জেস্‌ এই চিত্রখানার সম্বন্ধে বলেন,—

"One of the most complete and graphic representations of that celebrated episode in Buddha's life."

অজন্তার একটি বিখ্যাত চিত্র হইতেছে বোধিসত্ত্বের চিত্র। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ বলেন,—এই মূর্তির প্রত্যেকটি অঙ্গ নিখুঁত। মুখমণ্ডল, নাসিকা, চক্ষু, দৃষ্টিভঙ্গিমা—সবই অতুলনীয়। এই চিত্রটি অজন্তার এক নম্বর গুহায় অঙ্কিত রহিয়াছে।

আমরা একটির পর একটি গুহা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মাথার উপরে নিরভ্র নীলাকাশে প্রদীপ্ত তপন, পাশে গুহার পর গুহা সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। আমাদের গুহাগুলি দেখিবার সময় বোম্বাই আর্ট স্কুলের একজন শিল্পীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তিনি বলিলেন,—শুনিয়াছি অজন্তা গুহার অধিকাংশ ভাল ছবিই সতেরো নম্বর গুহাটিতে আছে। আমরা তাঁহার সঙ্গে সতের নম্বর গুহাটিতে আসিলাম। দেখিলাম, শিল্পীর কথা সত্য। এই গুহার ভিতরে যে অনেক পরিচিত চিত্রের সাক্ষাৎ পাইলাম। এদের সঙ্গে যে অতি অন্তরঙ্গভাবে পরিচয় সে অনেকদিন হইতেই হইয়াছে। এই যে মাতা ও সন্তান (Mother and Child)। মা পুত্রের হাত ধরিয়া তাহার হাত দিয়া বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিবার জন্য তাহার

নৃত্যোৎসব : ১নং গুহা

হাতে ভিক্ষাপাত্রখানি দিয়াছেন। বালকের মুখে সারল্য ও ভক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা আনন্দে বিভোর। তাহার মনে প্রাণে সারা দেহে ভক্তির পুলক তরঙ্গ দোলা দিয়া এক স্বর্গীয়ভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছে। আর ভক্তবৎসল বুদ্ধ এই ভক্তি ও আনুগত্য দেখিয়া যেন বিমুগ্ধ হইয়াছেন, এমনি ভাবটি চিত্রকর সযত্নে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আবার এই গিরিমন্দিরেই দেখিলাম বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের

চিত্র,—মনে হইতেছিল যেন রণদামামার রব শুনিতে পাইতেছি, বিজয়সিংহের সেনানিগণের রণকোলাহল যেন দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। ভেঁপু বাজিতেছে, হস্তীপৃষ্ঠে সব যোদ্ধারা রহিয়াছে। অতি সুন্দর!

এই গুহারই এক স্থানে দেখিলাম—বিলাস বিভোর রাজদম্পতি। প্রেমবিহ্বল নৃপতি রাণীকে আদর করিতেছেন। সুসজ্জিত, সুচিত্রিত রাজ-বিলাসগৃহে সহচরীরা সব রহিয়াছে নানা কাজে। একপাশে ছত্রধর দুইজন সুবেশা রূপসী তরুণী মাথার উপর ছত্রধারণ করিয়াছেন।

বাস্তবিকই সতেরো নম্বর গুহাটি বিবিধ চিত্র-সম্ভারে পরিপূর্ণ। কোথাও গন্ধর্ব ও অপ্সর তুষার শুভ্র মেঘমণ্ডলের মধ্য দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। প্রফুল্ল তাহাদের মুখমণ্ডল। কেহ বাঁশি বাজাইতেছে, কেহ বীণা হাতে করিয়া আছেন। এ যেন একটি স্বপ্নরাজ্যের বিচিত্র দৃশ্য। এই গুহেও কয়েকটি প্রসিদ্ধ জাতকের চিত্র আছে।

বোধিসত্ত্ব : ১নং গুহা

সেকালের বিলাসিনী রাজমহিষীর প্রসাধন দৃশ্যও এখানে দেখিলাম। কালিদাসের সময়ে রমণীরা কেশে ধূপের ধোয়া লাগাইয়া কেশজাল কৃষ্ণবর্ণ করিতেন, বদনমণ্ডলের শোভার জন্য মুখে লোধ্র ফুলের রেণু মাখিতেন, সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়া অঙ্গমাধুরীর অরুণ প্রভায় নায়কের চিত্ত বিমোহিত করিতেন। এই মহারাণীও বড় কম যান না। দর্পণে মুখ দেখিতেছেন, কণ্ঠে তাঁহার ফুলের মালা দুলিতেছে। প্রসাধন সামগ্রী ধারণ করিয়া এক পাশে একজন পরিচারিকা দাঁড়াইয়া আছে। আর চামর হস্তে এক পাশে একজন পরিচারিকা দাঁড়াইয়া ব্যজন দ্বারা মহারাণীর ক্লান্তি দূর করিতেছেন। এই চিত্রখানি "Queen's Toilet" নামে পরিচিত।

এই গিরিমন্দিরে অনেক তরুণ তরুণীর চিত্র আছে। কোথাও কোন রমণী দোলনায় দোলা খাইতেছেন, কোথাও প্রসাধন করিতেছেন, কোথাও প্রিয় কণ্ঠালিঙ্গিত হইয়া ভাব-বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। অজন্তার শ্রমণ শিল্পীরা (Artist Monk) নারীচিত্র অঙ্কিত করিতে কেমন করিয়া এতখানি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে একটু আশ্চর্য হইতে হয় বই কি! এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন গ্ল্যাডষ্টোন সোলোমোন্ (Captain Gladstone Solomon) তৎ-প্রণীত—"Woman in Ajanta" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"Woman had for them a decorative value, altogtehr too precious to be diminished by Laws of Art for she made them. They learned from her. They struggled to reproduce every turn of her head, every curve of her form, every glance of her eye. She enthralled them with her airs and graces; enmeshed them in the mysteries of her toilet, more strongly than does the Parisienne the painted of to-day."

অজন্তার নারীচিত্র নারী-মহিমাজ্ঞাপক। প্রত্যেকটি রমণীর চিত্রই শুভ্র শতদলের ন্যায় পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত। একটা মহৎ আদর্শ লইয়া শিল্পীরা এখানে নারী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নারীর সৌন্দর্য এখানে ক্যাপ্টেন গ্ল্যাডস্টোনের ভাষায়—

"She is there not female merely but the incarnation of all the beauty of the world. Hence with all her gaiety, her charm, her "insouciance", she never loses her dignity, and nowhere is she, belittled or besmirched. Everywhere in the garden of flowers, we behold the full-blown rose in its pride and perfume—nowhere the trampled lily. 'Majesty and Pawer' invest the women of Ajanta."

ইহার প্রত্যেকটি কথা সত্য। সতেরো নম্বর গুহা বা বিহারের আলঙ্কারিক চিত্রসমূহ ছাদের নীচে (Painting on Ceiling) কিভাবে যে শিল্পীরা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা না দেখিলে বুঝানো সম্ভব নহে। এই বিহারের বারান্দার ছাদে যেমন চিত্র রহিয়াছে, তেমনি দরজা, জানালা ও স্তম্ভগাত্রেও অনেক খোদিত মূর্তি দেখিলাম।

আমাদের সতেরো নম্বর গুহাটি দেখিতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল। এই স্থানে আমাদের দলটিও বেশ ভারি ছিল। কিন্তু সকলেই এ সমুদয় অনবদ্য চিত্রাবলী দেখিয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

অজন্তা গিরিমন্দিরের এই চিত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটি অতি বৃহদাকারের বুদ্ধদেবের মূর্তি চিত্রিত রহিয়াছে। সেগুলি বর্ণসুষমায় এবং ভাবভঙ্গিমায় অনির্বচনীয়। এখানকার বিহার ও চৈত্যে যেমন অসংখ্য চিত্র আছে তেমনি প্রস্তর মূর্ত্তিও আছে অনেক। ঊনিশ নম্বর গুহার নাগরাজা ও নাগরাজ মহিষীর মূর্তিটি তক্ষণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যাইতে পারে। নাগরাজের মাথার উপর সাতটি ফণা রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে চামরধারিণী আর বাম পার্শ্বে মহিষী রহিয়াছেন। দুইদিকের গোলাকার স্তম্ভগাত্রও কারুকার্যখচিত। ২৬নং গুহার শাক্যসিংহের ধ্যানভগ্ন করিবার মূর্তিটিও অতুলনীয়। এই গুহার একস্থানে দেখিতে পাই; বুদ্ধদেবকে পূজা করিবার জন্য উপাসক-মণ্ডলী করজোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের মাথায় পাগড়ী, হাতে বালা, কর্ণে কর্ণভূষা এবং গলায় রত্নমালা দেখা যায়। ২৭নং গুহামন্দিরে দেখিলাম গঙ্গাদেবীর মূর্তি। চার নম্বর গুহার পদ্মপাণি মূর্তিটি অজন্তার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। এইখানে অনেক পুরুষ ও নারী মূর্তি দেখিতে পাইলাম। অজন্তা প্রধানত চিত্রের জন্যই বিখ্যাত। এই জন্য এখানকার মূর্তি সম্বন্ধে কেহ তেমন ভাবে আলোচনা করেন না। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা অজন্তার খোদিত মূর্তিসমূহ নিবিষ্টভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই এখানকার প্রস্তর গঠিত শ্রীমূর্তিসমূহেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অজন্তায় একটি মাত্র বিহার দ্বিতল। সে বিহারটি হইতেছে ছয় নম্বর গুহা। আর এখানকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিহার হইতেছে চার নম্বর গুহা।

আমরা এখানে ১৯নং গুহার মধ্যে যে দণ্ডায়মাণ বুদ্ধ মূর্তিটি দেখিয়াছিলাম তাহার সেই মূর্তিটি এখনো যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। দুইদিকে গোলাকার চিত্রিত স্তম্ভরাজি আর কক্ষটির শেষপ্রান্তে স্তূপের গায়ে দণ্ডায়মান ভগবান বুদ্ধের মূর্তিটি খোদিত। সহাস্য তাঁহার মুখমণ্ডল। এখনও যেন তিনি বিশ্ব মানবকে আশীর্বাদ করিতেছেন।

আমরা দেখিতে দেখিতে একেবারে শেষ গুহাটির কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। বিহারের সম্মুখে পাথরের উপর বসিলাম। অদূরে জলপ্রপাত, সম্মুখে চৈত্য। মনে হইতে-ছিল এই চৈত্য গুহাটির বারান্দা প্রভৃতি যেন শিল্পীরা শেষ করিতে পারে নাই, তাই বারান্দা ও গুহের অভ্যন্তরভাগ মসৃণ ও সমতল নহে। অজন্তা চিত্রাবলী এত বিভিন্ন রকমের যে, তাহা দেখিলে শুধু এই কথাটিই মনে হয়, যাঁহারা ধ্যান ও ধারণার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন যাঁহারা ত্যাগকেই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহারা কিভাবে এত বড় শিল্পী হইলেন? জীব-জন্তু, গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, গার্হস্থ্যচিত্র, শিকারী, ব্যবসায়ী, রাজ-অনুচর, রাজ-দরবার, নর্তক-নর্তকী প্রত্যেক চিত্রই স্বাভাবিক। সুদূর অতীতের স্বর্ণমুকুটধারী নরপতির চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দীন দরিদ্রের সুখ দুঃখের চিত্র পর্যন্ত আঁকিতে শিল্পীরা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল অসাধারণ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের শক্তি এমন ছিল যে, সামান্য খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রকৃত রূপটি বুঝিতে হইলে ভারতবাসী মাত্রেরই একবার অজন্তা আসিয়া এখানকার গুহাচিত্রাবলী দেখা কর্তব্য। ভারতের শিল্পীরা পৃথিবীর কোন দেশের শিল্পী অপেক্ষা যে ন্যূন ছিলেন না তাহা অজন্তার চিত্রাবলী দেখিলে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য মনীষিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে অজন্তার তুলনা পৃথিবীতে বড় বেশী নাই। কতকাল আগে শিল্পীরা এই সব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তবু এখনও তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্য রেখাঙ্কন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আশ্চর্যান্বিত করে। রঙ্ উঠিয়া গিয়াছে অনেক স্থানে, অনেক চিত্রের মুখ, হাত, পা, অঙ্গুলি অপসৃত হইয়াছে, তবু মনে হয় ইহার তুলনা কোথায়? আমাদের বঙ্গ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়া গিয়াছেনঃ

"আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।"

অজন্তা চিত্রাবলী দেখিয়া কিন্তু আমার একেবারেই মনে হয় নাই যে ইহাতে বাঙ্গালী পটুয়ার কোনও কৃতিত্ব রহিয়াছে! তারপর জানি না সত্য কি না!

অজন্তার চিত্রকলা, অজন্তার স্থাপত্য, অজন্তার ভাস্কর্য দেখিলে মনের মধ্যে অভূতপূর্ব এক আনন্দের উদ্রেক হয়। মনে হয় এই চিরন্তন রূপ রাজ্যের ঘুমন্তরাণী চিরদিনই শিল্পানুরাগী জনগণের সোনারকাঠি ও রূপারকাঠির স্পর্শে শব্দমুখর হইয়া উঠিবে, নর্তক-নর্তকীগণের নূপুরশিঞ্জনে, প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমসম্ভাষণে, নারীর লাস্যে ও বিলাসে, সন্ন্যাসীর ত্যাগে ও মহত্ত্বে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিচিত্র লীলার আনন্দধারায় ইহা চিরন্তনভাবে জগদ্বাসী নরনারী-গণের চিত্তে গুঞ্জরণ করিবে—অজন্তা যেন সৌন্দর্যের নিভৃত নিকেতন।

চৈনিক পর্যটক ইউয়ান চাঙ্ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে অজন্তা গিরিমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ৬১১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে আসিয়াছিলেন, তখন পুলকেশীর রাজধানী ছিল বাতাপি নগরীতে। ইউয়ান চাঙ অজন্তা গিরি-মন্দিরের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন।

অজন্তা গুহার চিত্র হইতে আমরা সেকালের ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করিতে পারি। চিত্রের ভিতর দিয়া সেকালের চিত্রশিল্পীরা ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়া

(শেষাংশ ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমাজ ও রাজনীতি

ফরিদপুরে শহরে পদার্পণ করিয়া ৩০ বৎসর পূর্বের স্মৃতি জাগিল। ছায়ায় ঢাকা প্রভু জগদ্বন্ধুর সেই কুটীর। স্বদেশীর যুগে যশোহর জেলার ভিতর হইতে পদব্রজে এইখানে আসিয়াছিলাম। প্রভু জগদ্বন্ধু তখন নিভৃত এই পল্লীকুটীরে যোগে নিমগ্ন; দ্বারদেশ রুদ্ধ, কাহারও দেখা সাক্ষাতের উপায় নাই। আজ আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম প্রভুর সেই অঙ্গনতলে সহস্র মাদল সংকীর্তন উপলক্ষে। সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে দলে দলে নরনারী আসিয়া অঙ্গনতলে সমবেত হইয়াছে। ইহাদের আকুলতা এবং আগ্রহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিসের এই আকর্ষণ? আজকালকার দিনে ধর্মের নাম শুনিলে যাঁহারা শিক্ষিত বিশেষত তরুণ তাঁহারা অনেকে নাসিকা সংকুচিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ধর্ম একটা মোহ মাত্র এবং ধর্মের নামে জগতের যত অনিষ্ট হইয়াছে, এমন আর কিছুতেই হয় নাই; কিন্তু ইঁহারা ধর্ম না মানিলেও সমাজের হিত, মানুষের কল্যাণ এগুলিকে মানেন। প্রকৃতপক্ষে সমাজের হিত, মানুষের কল্যাণ, অল্প কথায় ধর্মের সংজ্ঞা যদি দিতে হয়, তবে দাঁড়ায় উহাতেই। দুর্গত মানব সমাজের কল্যাণ কামনার আত্যান্তিকতায় মহামানবতার যে উচ্ছ্বাস, প্রভু জগবন্ধুর অঙ্গনে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে তাহারই অলঙ্ঘ্য প্রভাবকে উপলব্ধি করিলাম। এই জিনিষকে ধর্ম নাম দিতে কাহারও আপত্তি থাকে, তিনি অন্য নাম দিতে পারেন ক্ষতি নাই; কিন্তু অঙ্গনতলে আকর্ষণ ছিল সেই জিনিষেরই।

ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে যে জ্যোতির্ময় পুরুষটি সুদীর্ঘ সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি মানুষের কল্যাণ সাধনার মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন। তিনি যে প্রেমব্রত জীবনে পালন করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাতে সমাজের সকল ভেদ বিভেদকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এদেশের অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত এবং তথাকথিত নিম্ন জাতির সেবায় তিনি আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, কি মন্ত্রে সকলকে আপনার করা যায়। তাঁহার লৌকিক জীবনের কাজ নিবদ্ধ ছিল বুনাদের মধ্যে, ডোমদের মধ্যে; আভিজাত্যের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই সব নিম্ন জাতিকে তিনি সেবা করিয়াছেন এবং সেবা করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহার সেই সাধনার শক্তিই ফরিদপুরে সহস্র মাদল সংকীর্তনে মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছিল, প্রেমময় পুরুষের প্রেমের স্পর্শ আবেগ জাগাইয়াছিল শত শত নরনারীর অন্তরে।

ফরিদপুরে 'সহস্র মাদল' শোভাযাত্রা

ইহার কি কোন মূল্য নাই? আধুনিকতাবাদীরা বলিবেন, আগে চাই দেশের অর্থনীতিক দুর্দশার প্রতীকার। ঐ সব আন্দোলনের মধ্যে যখন অর্থনীতি নাই, তখন ঐগুলির কোন মূল্যও নাই। দেশের দুঃখ-দুর্দশা ইহাতে দূর হইবে না। দেশের অর্থনীতিক দুর্দশার প্রতীকার আবশ্যক এবং সেই অর্থনীতিক দুর্দশার প্রতীকার নির্ভর করে রাজনীতির উপর, এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি আমাদেরও নাই এবং আমরা রাজনীতিক সাধনার মূল্যকে স্বীকার করিয়া

থাকি কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সেই যে রাজনীতিক সাধনা, তাহার কার্যকারিতা তো একটা পারিভাষিক সূত্রের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ফলোপধায়ক শক্তির উপরে এবং সে শক্তি নিহিত রহিয়াছে দেশের এই জনসাধারণেরই মধ্যে অর্থাৎ সমাজ সেবার ভিতরে। কারাগারে গমন করিবার পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু "সমাজ হিতের মূলকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—"সমাজের প্রকৃত হিত সাধন জিনিষটা কি? সমাজের লোকের কল্যাণ সাধন; আমি এইভাবেই উহাকে গ্রহণ করিয়া থাকি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা এবং সমাজ সম্পর্কিত যতকিছু কল্যাণকর কার্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা মানুষের সকল কর্মতৎপরতা এবং ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।"

সুতরাং সমাজের বিপুল জনসাধারণকে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা দান করিবার যে প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে তাহাতে রাজ-নীতি না থাকিলেও তাহার ফল রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। কিন্তু এমন প্রচেষ্টা সব জায়গায় যথার্থরূপে ফুটিয়া উঠে না, কতকগুলি সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়। প্রধান সমস্যাটি কি পণ্ডিত জওহর-লালই বলিয়াছেন,—"তথাকথিত ধর্মই হইল সর্বাপেক্ষা বড় বাধা; অবশ্য প্রকৃতপক্ষে যাহা ধর্ম তাহার সঙ্গে কোন সঙ্ঘর্ষ ঘটিবার কারণ নাই; কিন্তু এমন কতকগুলি দেশাচার এবং বিধিবাধন রহিয়াছে যেগুলি ধর্মের নামে চলে, সেগুলিকে আক্রমণ করিতে গেলেই গোঁড়ার দল প্রবলভাবে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে।"

এই বাধাকে অতিক্রম করিতে হইলে শুধু উপরভাসা সাংস্কারিক বিলাসেই কুলায় না। আবশ্যক অন্তরের প্রগাঢ় মানবপ্রেম এবং সহানুভূতির—বড় কথায় সম দর্শনের। আধুনিক রাজনীতিকেরা কেহ কেহ সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা বলিতেছেন এবং পূর্বেও বলিয়াছেন; কিন্তু সেগুলির প্রভাব গভীরভাবে সমাজের সর্বস্তরকে আন্দোলিত করিতে সক্ষম হইতেছে না। মানবপ্রেমের যে গভীর অনুভূতি সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হইয়া সাড়া জাগাইতে পারে, তাহাদের তাহার অভাব থাকিয়া যাইতেছে। ইঁহারা স্থূলভাবে ধরিতে না পারিলেও হয়ত ইঁহাদের মনের কোণে আভিজাত্যের এমন একটা ভাব চাপা থাকিয়া যাইতেছে, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ভেদের আবরণ সৃষ্টি করিয়া যাহা সমাজের এই সব নিম্ন শ্রেণী ও তাঁহাদের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ধর্মকে বর্জন করিবার নামে এই বাধাটি কার্যত বড় হইয়া না উঠে এদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল এ সত্যটি ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, অবজ্ঞাত এবং উপেক্ষিতকে আমরা কৃতার্থ করিব, ধন্য করিব এমন ভাব অন্তরে লইয়া এই সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নাই। আবশ্যক আন্তরিকতার, পরের প্রতি অবিচারের প্রতীকারের জন্য প্রগাঢ় অনভূতির, আবশ্যক আত্মীয়তার ভাবের এবং অন্য কথায় আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের। বোধ হয়, এইজন্যই পণ্ডিতজী দেশাচারকেই আক্রমণ করিয়াছেন এবং তিনি একজন সমাজতান্ত্রিক হইয়াও প্রকৃত যে জিনিষ ধর্ম তাহাকে আক্রমণ করেন নাই।

প্রচলিত দেশাচার এবং বিধি-বিধানের বৈষম্যমূলক নিপীড়ন হইতে প্রকৃত ধর্মকে রক্ষা করিবার মহাপ্রাণতা বাঙলাদেশে বিকাশলাভ করিয়াছিল এবং বাঙলার সংস্কৃতির তাহাই একটা বৈশিষ্ট্য। এই সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িকতার উপরে মহামানবতাকেই স্থান দিয়াছে। ভেদ-বিভেদমূলক সংকীর্ণতার গণ্ডী ভাঙিয়া ফেলিয়া প্রেমের শক্তি সমাজ দেহে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-কুমার সরকার মহাশয় তাঁহার 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' নামক সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙিয়া হিন্দু সমাজ দেহে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। ভারতের ইতিহাসে কয়েকবার এই চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু নানা প্রতিকূল শক্তির জন্য উহা সফল হইতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম তাহার সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের ভিতর দিয়া এই চেষ্টা করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম ও এই চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ গোস্বামীরা আসিয়া এই উদারতার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। * * * হিন্দু সমাজের সনাতনী অনুদারতার ফলে অহিন্দুরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে সম্মানের আসন পায় নাই বরং তাহাদের জন্য একটা পৃথক 'জাত বৈষ্ণবে'র সৃষ্টি হইয়াছিল।"

"মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি ইহাই—ইহা শ্রীচৈতন্যের জাতিভেদ সম্বন্ধে নিঃসংকোচ নির্দেশ। সবার উপরে মানুষ বড় তাহার উপরে নাই, ইহাই বাঙলার কৃষ্টির মর্মবাণী"—অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙলা ও বাঙালী' নামক পুস্তকে এই কথা দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন। কিন্তু বাঙলার কৃষ্টির মর্মবাণীর বিগ্রহ মহাপ্রভুর নির্দেশ কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই; গোঁড়া দলের বিরুদ্ধাচরণে আবার আভিজাত্য ও ভেদ-বিভেদের অচলায়তন সমাজের আলো ও বাতাস বন্ধ করিয়া দেয়। ফরিদপুরের পূর্ণ কুটীরে—গোয়াল চামটের অঙ্গনতল আলো করিয়া যে সোনার বরণ মানুষটি একদিন শোভা পাইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর প্রেমময়ী বাণীতে এদেশের অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতকে তিনি আবার সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন। নৈরাশ্যে অভিভূত নিম্ন শ্রেণীকে তিনি আবার প্রেমের বাণী শুনান। তিনি বলেন, হরিনাম মহা উদ্ধারণ। ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া সকলে প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হও। তিনি কেবল উপদেশ দেন নাই। তিনি আপনি ধর্ম আচরণ করিয়া শিখাইয়াছেন। অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতের দুয়ারে দুয়ারে গিয়া তিনি প্রেমমন্ত্র প্রচার করিয়াছেন এবং সকলকে কোল দিয়াছেন।। মহাত্মা গান্ধী যে অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দো-লনের উপর এত করিয়া জোর দিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতার পক্ষে উহাই প্রথম প্রয়োজন, বাঙলাদেশে মহাপ্রভু সেই বাণী বহুদিন পূর্বেই প্রচার

করেন এবং প্রভু জগদ্বন্ধু তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন তাঁহার কর্মজীবনে এবং ধর্ম সাধনার ভিতর দিয়া। বাঙলার এই মনের মানুষটির মধ্যে বিশ্বপ্রেমের যে বিরাট অনুভাবনা উদ্দীপ্ত ছিল, জনমনের সম্পর্ক সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন বাঙলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের তাহার সঙ্গে পরিচয় অতি সামান্য। কিন্তু বাঙলার সংস্কৃতির এই দিকে শিক্ষিত সমাজের যতদিন দৃষ্টি না পড়িবে, ততদিন পর্যন্ত বাঙলার, শুধু বঙলার কেন ভারতের রাজনীতিক জীবনের শক্তিপূর্ণ বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এই প্রয়োজনই একান্তভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"আজ আমাদিগকে উদারতর সমাজ-গঠনী প্রতিভা লইয়া নূতন জাতিনাশা ভক্তি ও প্রেমের অপরাজিতায় কৃষ্ণবর্ণ জাতির কৃষ্ণবরণী দেবীকে আরাধনা করিতে হইবে। বাঙলার সমাজ ও কৃষ্টির মৃত্যু সেই দিন,—যেদিন নদ নদীতে কৃষ্ণলহরী আর খেলিবে না, শস্য ও বনভূমিতে আঁধারের কৃষ্ণ মেঘের ছায়া আর পড়িবে না। শুধু তাহাই নহে, যখন বাঙলার একই আকাশ বাতাসে পালিত কৃষ্ণবর্ণ জাতি ও সম্প্রদায় দেশ ও ধর্ম ভুলিয়া পরস্পরকে ঘৃণা ও অবমাননা করিবে, সামাজিক আচারে ব্যবহারে পরস্পরকে হিংসা ও আঘাত করিবে সেদিনও বাঙলার বড় দুর্দিন। কৃষ্ণবরণী বাঙলার ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগকে যুগ-পরম্পরা প্রদর্শিত ঔদার্য, সমদর্শিতা ও সৎসাহস দিয়া এই মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন।

মানব সভ্যতা আজ আসুরিক মদ ও দম্ভে অভিভূত। প্রবল পশুশক্তি দুর্বলের দলনে দৃপ্ত হইয়া তান্ডবে প্রমত্ত হইয়াছে। প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই মহাপ্রলয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানব-প্রেমের পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর সে বিশ্ব-প্রেম এবং মহাপ্রাণতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর গন্ডীর মধ্যেও যদি জাতি হিসাবে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি মানুষের মর্যাদা আমরা সত্যই লাভ করিতে চাই তাহা হইলেও আমাদিগকে তাঁহার পতিতপাবন নীতিতে অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রথম যৌবনে প্রভুর শ্রীঅঙ্গনে গিয়া অন্তরে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম আজ সেই সত্যকে অধিকতর এবং গভীরতরভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আসিয়াছি এবং এই প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছি যে, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া আজ বাঙালী জাতি শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে, রাষ্ট্রধর্মে নূতন ঔদার্য ও সর্বজনীনতা অবলম্বন করিয়া দেশে নূতন সম্পদ বীর্য ও যৌবনের উদ্বোধন করুক। বাঙালী ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া সকলকে ভালবাসিতে শিখুক। জাতি বুঝুক যে, তাহার রাজনীতিক স্বাধীনতা নির্ভর করে সমাজের সর্ব স্তরে প্রেমের প্রগাঢ় অনুভূতি প্রসারের উপর, শুধু পাশ্চাত্যের রাজনীতিক সূত্র আবৃত্তি বা অনুকৃতির উপর নয় ; প্রভু জগবন্ধু অদ্ভুত এবং নিগূঢ় সেই প্রেমের বার্তাই প্রচার করিয়াছেন।

অজন্তা গিরিমন্দিরে

(১২৯ পৃষ্ঠার পর)

গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে—দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে পারস্যদূতের আগমন দৃশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সুন্দর ঐতিহাসিক ঘটনাটি এক নম্বর গুহার প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্ লিখিয়াছেনঃ

"The fame of the King of Deccan spread beyond the limits of India, and reached the ears of Khushru II, King of Persia, who, in the thirty-sixth year of his reign, A.D. 625-6, received a complimentary embassy from Pulakesin. The courtesy was reciprocated by a return embassy sent from Persia, which was received with due honour at the Indian court. A large fresco painting in Cave No. 1 at Ajanta, although unhappily mutilated, is still easily recognizable as a vivid representation of the ceremonial attending the presentation of their credentials by the Persian envoys."

"This picture, in addition to its interest as a contemporary record of unusual political relations between India and Persia, is of the highest value as a landmark in the history of art. It not only fixes the date of some of the most important paintings at Ajanta, and so establishes a standard by which the date of others can be judged; but also suggests the possibility that the Ajanta school of pictorial art may have been derived directly from Persia, and ultimately from Greece."*

কাজেই অজন্তার চিত্রাবলীর মূল্য যে কতখানি তাহা পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ভিন্‌সেন্ট স্মিথ অজন্তার চিত্রাবলীর উপর গ্রীস ও পারস্যের প্রভাব আছে বলিয়া যে অনুমান করিতেছেন তাহা যে সত্য নহে তৎ সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। তবে আমার মনে হয় যে অজন্তার চিত্রাবলী যাঁহারা অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহারা শ্রমণ শিল্পী বা Artist Monk নাও হইতে পারেন, হয়ত বা সেকালের রাজদরবারের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্পীরাও হইতে পারেন। অজন্তার চিত্রকরগণ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কেহ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে কোন কোন চিত্রের উপর যে পাশ্চাত্য প্রভাব না আছে তাহাও নহে।

শেষ

* The Early History of India by Vincent A. Smith, page 426.

মোটা

[গল্প]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বাজারের লোক হা করে চেয়ে থাকে। মেদ মাংসের একটা চলমান পর্বত। ঘাড় ফেরাতে ভদ্রলোকের কষ্ট হয় নিশ্চয়। ঘাড়ের পেছনে চর্বির তিনটে খাঁজ এমন প্রবল পুরু হয়ে উঠেছে, পাশের কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে বিপদ। আপাদ বিশাল দেহস্তূপটী সঙ্গে সঙ্গে না ঘুরিয়ে ভদ্রলোকের তখন উপায় থাকেনা। তাই, অনেক সময়, পাশে কোনো লোক কথা বললে ভদ্রলোক ওদিকে তাকাবার চেষ্টা না করে শুধু একটা হাত তুলে কথা বলেন, কথার জবাব দেন। আর বাজারের লোকগুলো বাবুকে দেখেছে কি ক্ষেপে ওঠে যেনঃ "আসুন, আসুন বড়বাবু, বহরমপুরের নতুন ফুলকপি সবে গাড়ি থেকে নামলো।" "বাবু সাঁতরাগাছির ওল।"... ওদিকে মাছের কারবারি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেঃ "লালগোলার তেলেল রুই রাজাবাবু........."হাত তুলে রাজা-বাবু সবাইকে নিবৃত্ত করেন, মিহি হেসে আস্তে মাথা নাড়েন, মানে, সবুর, আসছি। আর সত্যিই দেখা যায় তাঁর চাকরের ঝুড়িতে বাজারের বাছাই সব জিনিস একে একে উঠে আসছে, বাদ পড়লোনা কোনটা। আশ্বিনের নতুন ফুলকপি আর ডজন দুই গলদা চিংড়ি, সাঁতরাগাছির ওল, বদনাহাটার লাউ, চার আনা সেরের দুর্লভ টম্যাটো রাজাবাবু ছাড়া এ-বাজারে আর নেবার আছে কে। এবার তিনি সোজা চলে যান মাংসের দোকানে, মাংসের দোকান হয়ে ফলের দোকানে। দোকানিরা ঠান্ডা হয়, যেন বড়বাবুর জন্যে এত সব সাজিয়ে রাখা। এলেন আর চিলের মত ছোঁ মেরে এক এক করে সব তুলে নিলেন। বাজার নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে।

ঘণ্টাখানেক পর বাজার সেরে ভদ্রলোক যখন বাইরে আসেন দেখা যায় পুরু চর্বির স্তর ঠেলে শরীরের নোনা জল বৃষ্টির ধারার মতো অনর্গল নেমে আসছে। জামার পেছনটা ভেজা। মোটা মানুষের ঘাম বেশি। মোট নিয়ে চাকর আগে আগে চলে গেলো। ভদ্রলোক এসে দাঁড়ান বাস-স্ট্যান্ডে। ভারি ক্লান্ত।

অথচ আমি জানি, আমি কেন, সবাই জানে, রোজ চোখের ওপর দেখছে দুঃসহ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেও ওঁর প্রত্যহ বাজারে আসা চাই। কেউ বলে পেটুক, বাতিক কারো মুখে শোনা যায়। বাজারে আজ নতুন জিনিস এলো কি না, ভারি ওজনের ভেট্‌কি মাছ কই হে, রামপালের কলা কত করে কেবল এই সব। "খেয়ে খেয়ে পেটের চামড়া পুরু হ'য়ে গেছে," "এতো ফুলে উঠলো তবু খাওয়ার কম্‌তি নেই যে," "এবার ফাটবে", আড়ালে আবডালে লোকটিকে কেন্দ্র করে এসব কথা হয়। আসলে ঠিক তাই কিনা বোঝা যায় না। তবে বাজার করা ওঁর সখ। হাস্‌তে হাস্‌তে বলছিলেন আমায়ঃ "সকাল বেলা একটু ঘোরা ফেরা করা ভালো, বুঝলেন না মশাই! চিনিও কমে আর জিনিসপত্তরও দেখে-শুনে ভালো কেনা গেলো। চাকর ঠাকুরকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই, কি বলেন।

বললাম, "খুব খাঁটী কথা।"

নটবরের চায়ের দোকানে আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ। একদিনই আলাপ হয়। আর জীবনে সেই একদিনই বোধ হয় ভদ্রলোক নটবরের দোকানে যান। যা চেহারা একখানা দোকানের! দুসারি লোহার চেয়ারের একটাও আস্ত নেই। কোনটার নেই পিঠ কোনটার গেছে পায়া। যেমন নেই পেয়ালা পিরিচগুলোর কোনটার হাতল কোনটার কার্নিশ। দিনরাত মাছি বন্ বন্ করে। দেয়াল জুড়ে কালি আর ময়লা। বলি, "নটবর, দোকানটাকে একটু মানুষ কর, বাইরের কোনো ভদ্রলোক এলে আমাদেরই লজ্জা করে।"

'লজ্জা করে, আর এসোনা।' উল্টে ও আমাদের ধমক দেয়ঃ "ভদ্রলোকটা আবার এলো কে শুনি? বাজারের দোকান, তেলওলা ডিমওলা নিয়ে আমার কারবার।"

"পেয়ালা-পিরিচগুলো এই বেলা বদ্‌লে ফেলো।"

"থাক হয়েছে, এই পেয়ালায় করে আজ দশ বছর চা গিলে এলে তো?"

এরপর আর কিছু বলা চলে না। কেননা নটবর এখন এমন কোনো বাক্যবাণ ছুঁড়ে মারবে যা আমাদের কয়টি প্রাণীর পক্ষে নিতান্তই হৃদয়-বিদারক হবে। আমরা ক'জন ওর দোকানে ধারে চা খাই, আড্ডা জমাই, গল্পগুজব করি, আর সুবিধা পেলে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সকালটাকে দুপুর পর্যন্ত টেনে নিই। সুতরাং এখানে উচ্চবাচ্য করা চলে না। কিন্তু সেই মোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে নটবর এমন ব্যবহার করবে কে জানতো।

বাদলার দিন। সকাল থেকে আকাশটা সিসের মতো ভারি। হাওয়া দিচ্ছে কন্‌কনে। আনাজের গাড়ী নিয়ে একজোড়া মোষ দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে। আমাদের আড্ডা সবে জম্‌তে সুরু করবে। এমন সময় দেখা গেলো বাস এসে দাঁড়িয়েছে স্ট্যান্ডে। ভদ্রলোক নামলেন। মাটিতে পা দিয়েছেন কি আকাশ ভেঙ্গে চেপে বৃষ্টি এলো। আর যায় কোথা। চাকরটা অবিশ্যি তাড়াতাড়ি মাথায় ছাতা ধরেছিলো। অতবড় বহর ছাতায় ধরবে কেন। ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে অগত্যা ভদ্রলোককে আশ্রয় নিতে হয় নটবরের দোকানে। দশ পা দ্রুত হাঁটার দরুণ মোটা মানুষ ভীষণ হাঁপাতে আরম্ভ করেন। ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়াইঃ "আসুন।" চুনীলাল তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়। রাসবিহারী চীৎকার করে উঠলো, "কই হে নটবর, বাবুকে চা-টা দাও।"

অন্ধকার উনুন-ঘর থেকে জবাব এলোঃ "আরে বাপু, অত তাড়া দিওনা, যার গরজ থাকে চা খেয়েই উঠবে।"

লজ্জায় আমাদের মুখ কালো হ'য়ে গেলো। যেন এমন একটা সম্ভ্রান্ত লোক ওর দোকানে রোজ আসছে, নাকি সবাইকে ও এক চোখে দেখে। তখনকার মতো রাগটা চেপে যাই। বিনীত হেসে বললাম, "বসুন, বৃষ্টি ধরলে তবে তো বাজারে যাবেন।"

"বড্ড বেয়াড়া সময়ে জল এলো।" ইতস্তত করে ভদ্রলোক একটা চেয়ারে বসেন। চেয়ারটা কট্‌কট্ শব্দ করে'

উঠলো। ভয়ে আমরা কয়টি প্রাণী এক সেকেণ্ড নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম। যদি সেদিন চেয়ারটা ভেঙ্গে পড়তো কি কেলেঙ্কারিটা হ'তো।

"আপনি তো রোজই বাজারে আসেন?"

"হ্যাঁ, সকাল বেলাটা একটু বেড়িয়ে যাই।"

কি একটা প্রশ্ন করবার জন্যে চুনী খুঁত্খুঁত করছে। প্রশ্ন মানে আলাপ করা। অতবড় একটা লোকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কথা কওয়ার সুযোগ সবাই নিতে চায়। বললাম, "কাশীপুরে থাকেন আপনি?"

(রোজ কাশীপুরের বাসে করেই তিনি ফেরেন)

"হ্যাঁ, বরানগরের বাগান বাড়ীতে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকি।" কথার শেষে ভদ্রলোক মিহি হাসলেন। মোটা গোঁফ কদমফুলের মতো করে ছাঁটা।

"বরানগর খুব সুন্দর জায়গা।" চুনী বললে। চুনীর কথায় সায় দিই আমিঃ "চমৎকার, তা অতদূরে থেকে আসতে আপনার কষ্ট হয় যে।"

"হয় বৈকি।" পাশে হাত বাড়িয়ে দিতেই চাকরটা তাড়াতাড়ি টিন থেকে সিগারেট বার করে বাবুর হাতে তুলে দিলে, দিলে দেশলাই ধরিয়ে। প্রকাণ্ড একটা ধূমকুণ্ডলী নির্গত করে ভদ্রলোক আরম্ভ করেনঃ "ছেলে বৌমারা দিল্লীতে। গাড়ীটা সেখানে। জানুয়ারীর দিকে আরেকটা গাড়ী আমার কিনতেই হয়—"

"সেতো ঠিকই।" এক সঙ্গে আমরা গুঞ্জন করে উঠি আর চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। মস্ত ভাগ্যবান পুরুষ। কপাল থেকে আরম্ভ করে মাথার আধখানা পর্যন্ত চক্চকে পালিশ টাক। মোটা লোমশ আঙুলে তিনটে হীরের আংটি। এত কাছে কোনদিন দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমাদের। আরও দুয়েকটা কথা হয়। এমন সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে নটবর এলো চা নিয়ে। সেই হাতল-ভাঙ্গা ফাটা কাপ। পেয়ালাটা ঠক্ করে' ভদ্রলোকের সামনে ঠেলে দিয়ে মুখটা অন্ধকার করে ফের ও গিয়ে ঢুক্লো উনুন-ঘরে। একটা কথা পর্যন্ত না। কেন, হেসে হাত-জোড় করে একটা নমস্কার জানালে ওর নবাবি ছুটে যেতো নাকি। না, এক আধটা ভালো পেয়ালা পিরিচ রাখলে ওর আর একটা পা খসে পড়তো। "এ জন্যেই তোর দোকানের উন্নতি নেই, নটবর।" কথাটা বলেছিলো চুনীলাল পরে, ভদ্রলোক যখন চলে গেছেন। কিন্তু তখন? যেমন কুকুর তেমন মুগুর। ও চা রেখে চলে যাবার পর ভদ্রলোক তাকালেন তাঁর চাকরের দিকেঃ "খাবি, গরম চা খেয়ে বাদ্লায় শরীরটা জুৎসই করে নে।" বলে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেনঃ "বুঝলেন না, দোকানের চা আমার সহ্য হয় না।"

'সে তো ঠিকই, খুব সত্যি কথা।' সমবেতভাবে আমরা আবার গুঞ্জন করে' উঠলাম।

বৃষ্টি ধরে গেছে। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান। চাকরকে ইঙ্গিত করতেই মনিব্যাগ খুলে দুটো পয়সা টেবলের ওপর রেখে সে প্রভুর পদানুসরণ করলে।

আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। নট্খটে চেয়ার ভাঙ্গা টেবিল, ময়লা আর মাছি। আধপোড়া সিগারেট মেঝেয় পড়ে তখনও ধোঁয়াচ্ছে। উবু হয়ে চুনীলাল তাড়াতাড়ি ওটা হাতে তুলে নেয়। গভীর মনোযোগ দিয়ে লেখাটুকু পড়ে বললেঃ 'মাইরি, এক সলার দাম আড়াই পয়সা রেসো।'

'না কি তোর মতো বিড়ি টানবে।' রাসবিহারী হাসে। তারপর আমাদের যতো কথা ওঁকে কেন্দ্র ক'রে। গাড়ী বাড়ি নিয়ে কত বড়লোক। এই তো পাশে বসেছিলেন। উঠে গেলেন। সত্যি কেমন যেন আপশোষ হয়। যেন কি পেয়ে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। রাসবিহারী বলছিল, 'ভদ্রতা কেউ কাউকে শেখাতে পারে না, ওটা পুরুষানুক্রমে এসে যায়।'

বললাম, 'তোর এ ব্যবহারটা ঠিক হ'ল নটবর?'

চুনী মহা খাপ্পা। বললে, 'ভাঙ্গা পেয়ালায় চা দিলি, যদি পেয়ালাটা তোর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতো?'

'আমি মারতাম লাথি।' নটবরের কুৎসিত মুখে আটকায়না কিছু।

'ছোটলোক।' বিড়বিড় করে চুনী চেয়ারে নড়েচড়ে বসলোঃ 'তোর মতো পাঁচটা নটবর ওর বাড়িতে চাকর খাটছে দেখগে।'

'দেখগে তুমি।' নটবর গর্জন করে ওঠে, রোগা লিক-লিকে শরীর বেঁকে যায়।—'না পোষায় আমার দোকানে তোমরা এসো না, ভদ্দরলোক আমি ঢের দেখেছি।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে উনুন-ঘরে চলে যায়।

আসল কথা চুনীলাল বীমার দালাল। ভদ্রলোককে পেলে ওর অনেক কাজ হ'তো। রাসবিহারীর না কি কোথায় কাটা-কাপড়ের দোকান আছে। বড়জাতের একজন খদ্দের বাগাতে পারতো ও। আর আমি। দশ মিনিট অপেক্ষা করলেই বলতাম শরীরের চিনির অংশ কমাতে হবে, নাক্স্ ভোম তিরিশ, রাতে রুটী, বিকালে ফল। হায়, ওসব কিছুই হল না। নটবর আমাদের আশার গুড়ে বালি দিয়েছে। আবার ও কি না দাঁত বার করে হাসেঃ 'আসবে আসবে, আবার বাদ্লা হোক ঠেকে এখানে আসতেই হবে, অত উতলা হও কেন।' ওর হাসি দেখে পিত্ত জ্বলে যায়।

তবু আশায় আশায় গালে হাত দিয়ে আমরা রোজ বসে থাকি। কি জানি সত্যি যদি একদিন বাদলা হয়, আকাশ ভেঙ্গে তেমনি হুড় হুড় করে বৃষ্টি নামে। কিন্তু কই। খট্খটে দিন। আকাশ ভরা রোদ। ভদ্রলোক বাসে চড়ে আসনে। বাজার সেরে ফিরে যান। চাকরের মাথায় প্রকাণ্ড মোট। বাঁধা কপি আর রামপালের সুপুষ্ট কলা। হাতে ঝোলান মস্ত এক কাতলা মাছ। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ভদ্র-লোক হাঁপাচ্ছেন। ঘর্মাক্ত বিশাল দেহ। রোদে আঙুলের হীরেগুলো আগুনের মতো জ্বলছে। ইদিকে একবার ফিরেও তাকান না। তাকাবার প্রয়োজন নেই তাঁর। তীর্থের কাকের মতো বসে বসে আমাদের দিনের পর দিন কাটে।

একদিন ঈশ্বরের কানে আবেদন পৌঁছলো যেন।

(শেষাংশ ১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞানের চোখে জাতি ও বর্ণ

পঙ্কজ দত্ত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাদৃশ্য কিছু নেই এবং এরা চিরকাল পৃথকই থেকে যাবে—এই অপভাষণে কিপলিং কোন্ যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন বলা যায় না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে ওকথার কোন অর্থই প্রতিভাত হয় না। বৈজ্ঞানিকরা যে তত্ত্বের ওপর ভিত্তি ক'রে আলোচনা করেন, তার মধ্যে কল্পনার কোন অবকাশ নেই, সমস্তটাই প্রকৃত নিদর্শন ও প্রমাণ-সাক্ষীর ওপর নির্ভরশীল; সুতরাং তাঁদের কথাটাই ধর্তব্য। তাঁদের মতে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশের অধিবাসীদের মধ্যেই মিলন ও রক্তের সংমিশ্রন আদিকাল থেকেই চলে এসেছে এবং আজও চলেছে—জাতিগত এই সংযোগকে প্রতিরোধ করবার মত আজও কোন শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

বস্তুত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তের সংযোগ, প্রকার আকার ও বর্ণের সংমিশ্রন ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান এতো গভীর ও ব্যাপক যে বিশুদ্ধ জাতি হিসেবে কোন একটি বিশেষ জাতিকে পৃথক ক'রে তুলে ধরার কোন সম্ভাবনাই আজ আর নেই। তবুও বর্ণ ও জাতি বৈষম্যের ধূয়া, বিশেষ ক'রে ইউরোপীয় কোন কোন রাষ্ট্রে তুলে ধরা হয়, তার কারণ জাতিতে জাতিতে স্বার্থপ্রণোদিত রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভেদ সৃষ্টি ক'রে রাখা ছাড়া আর কিছু নয়।

লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষের মাথার খুলি, দাঁতের পাটি ও দেহের অন্যান্য অঙ্গের অস্থি এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন মানুষের গড়া নানাবিধ বাস্তব যে সমস্ত নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে আদিম মানুষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান তার ওপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিচার ও বিশ্লেষণের পর বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে একমত যে পৃথিবীতে আজ যত প্রকারের মানুষই দেখা যাক না কেন সবের মূল একই। নানাভাবে বিবর্তিত হ'য়ে, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প'ড়ে আজকের ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতির এই বৈসাদৃশ্য দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব বলে বিজ্ঞান যাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে তার জন্ম হ'য়েছিল আনুমানিক দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে চীনের অন্তবর্তী পিকিংয়ে। জাভার ট্রিনিলে আদি মানবের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তারও অভ্যুদয়কাল দশ লক্ষ বৎসরের কাছাকাছি। ইংলণ্ডের পিল্টডাউন এবং জার্মানীর হেডেলবার্গে প্রাপ্ত মানুষের বয়সও প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর। আর নিয়ানডারথল মানুষ দুলক্ষ বৎসরের পূর্বে আসে নি বলেই অনুমান করা হয়। অনেকের মতে পিকিং মানব ও ট্রিনিল মানব এবং তৎপরে পিল্টডাউন ও হেডেলবার্গ মানব কালে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে লোপ পেয়ে যায়, অথবা বর্তমান মানবের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকলেও যোগসূত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এখন ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে যে, নিয়ানডারথল মানবই বর্তমান মানব জাতির আদি পুরুষ; অস্ট্রেলিয়া, এসিয়া ও ইউরোপের বর্তমান বুনো-জাতিদের মধ্যে তার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। আবার অনেকে বলেন, নিয়ানডারথল মানবও আর সবায়ের মতই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিল এবং এখনকার মানব জাতির পূর্ব-পুরুষ এরা নয়—তাদের সম্ভবত এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু বাস্তবিকই কি ব্যাপার—উপরিউক্ত আদি মানবেরা সত্যিই লোপ পেয়েছিল কি না, আজকের মানুষ তাদেরই বিবর্তিত রূপ কি না এ তত্ত্বের এখনও কোন মীমাংসা হয় নি।

চীনেই হোক আর জাভাতেই হোক, মানুষের প্রথম অভ্যুদয় যে স্থানেই হ'য়ে থাকুক এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা এক-মত যে, মানুষ কোন একস্থানে চিরকাল সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারে নি। কখনও হয়ত তারা স্বইচ্ছায় চরে বেড়িয়েছে আবার কখনও বা প্লাবন দুর্ভিক্ষ বরফপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একস্থান থেকে স্থানান্তরে বিতাড়িত হ'য়ে ফিরতে বাধ্য হ'য়েছে এবং এইভাবে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছে। স্থানান্তর গমনে দু' দশজন হয়ত মূল দল থেকে ছটকে এদিকে সেদিকে গিয়ে পড়েছে এবং পুনর্মিলিত

পিকিংএ প্রাপ্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব
(দশ লক্ষ বৎসর)

না হ'তে পেরে নিজেরাই এক একটা সম্প্রদায় গড়ে নিয়ে সংস্পর্শচ্যুতভাবে বসবাস ক'রে এসেছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এসিয়ার কোন কোন অঞ্চলে আজও অসভ্য বর্বর যে সমস্ত জাতি দেখা যায় এদের পরস্পরের সবায়ের সঙ্গেই বহু বিষয়ে, দৈহিক আকৃতির দিক থেকেই হোক আর আচার ব্যবহার রুচির দিক থেকেই হোক, হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়—এ থেকে সবাই যে একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এমন ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না। এই সব থেকে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছি যে বর্তমান পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির উৎপত্তি একই সূত্র থেকে। সুতরাং কি জার্মান, কি ভারতীয় আর কি ইংরেজ, চীন, জাপান কাউকেই পৃথক পৃথক জাতি বলা যেতে পারে না এরা সবাই-ই মাত্র একটি জাতিরই অন্তর্ভুক্ত, সে জাতি হ'চ্ছে মানব জাতি।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক, যাঁরা এক একটি দেশের অধিবাসীকে এক একটি জাতি ব'লে গণ্য করেন তাঁদের মতে কোন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একই অবস্থায় লালিত হ'য়েছে এবং একই স্থানে চিরকাল সীমাবদ্ধ থাকতে পেরেছে যারা তাদেরই বিশুদ্ধ জাতি ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। কার্যত কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কেই একথা খাটানো চলে না। পৃথিবীর কোন ভূভাগই কোনকালে দেশান্তরী মানুষের গমনাগমন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পায় নি। মধ্য এসিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি সভ্যতার আদিভূমি যে সব স্থান প্রাচীনকালে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল সে সব স্থানে চতুর্দিক থেকেই লোকের আমদানী যেমন হয়েছে তেমনি আবার এই সব স্থান থেকে লোকে দিকে দিকে ছড়িয়েও পড়েছে—সভ্যতার বিস্তার সম্ভব হ'য়েছে যার ফলে। ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভূমিতে রোমানদের অভ্যুত্থানের বহুপূর্বে এট্রস্কানদের বাস ছিল; এরা সম্ভবত মধ্য এসিয়া থেকে গিয়েছিল। আজ আর এদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, গেলেও পৃথিবীর বহু স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের সংমিশ্রনের ছাপ বর্তমান দেখতে পাওয়া যায়। হিটাইট, সিনোয়ান, লিডিয়ান, কোরিয়ান প্রভৃতি
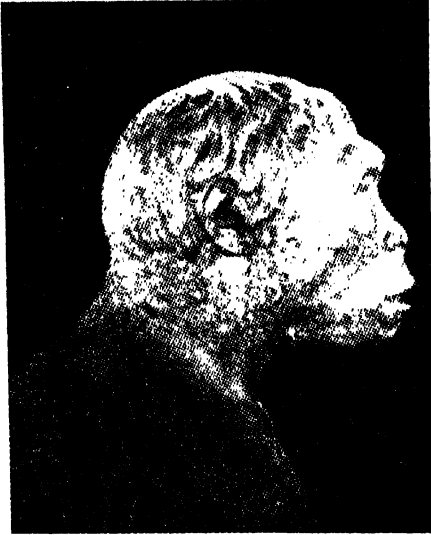
জাভার ট্রিনিল মানব
(দশ লক্ষ বৎসরের কাছাকাছি)

প্রাচীন সম্প্রদায়গুলিরও কোন অস্তিত্ব আজ না পাওয়া গেলেও এদের ছাপ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত দেখতে পাওয়া যায়।

আইবেরিয়ানরা লোপ পেয়ে গেলেও তাদের ভাষা উত্তর স্পেনে 'বাস্ক' নামে প্রচলিত রয়েছে। এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূভাগে যারা বাস করে তারা ফিন, ম্যাগায়ার, ল্যাপ, তুর্কী, মঙ্গলিয়ান, সামোয়া, আভর প্রভৃতির সংমিশ্রণেই সৃষ্ট হ'য়েছে। প্রাচ্য ইউরোপ বারংবার আক্রান্ত হওয়াতেও এই দুই স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ খুব বেশী পরিমাণেই হ'য়েছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হুণরা বল্টিক উপসাগর পর্যন্ত ধাওয়া ক'রেছিল এবং 'অস্ট্রোগথস্', 'মার্কো-ম্যানস্', 'সুয়েভি', 'থুরিঞ্জিয়ান্স' প্রভৃতিদের সম্পূর্ণ বশীভূত ক'রে নিয়েছিল। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আরবরাও অনেককাল যাবৎ ইউরোপ আক্রমণ ক'রে এসেছে। এরা সবাই যে যে স্থানে গিয়ে পড়েছিল কালে সেই সব স্থানে অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছিল। উত্তর দিক থেকে ইউরোপের ওপর দীর্ঘকাল আক্রমণ চালিয়ে এসেছে ভাইকিংরা; এরা ইউরোপের প্রায় সমুদয় অংশ গ্রাস তো করেছিলই অধিকন্তু মরক্কো, বলেরিক দ্বীপপুঞ্জে পর্যন্তও। এদের ছাড়াও বর্তমান ইংলণ্ডে পিক্টস, স্কটস, গল, কেল্টস, ব্রিটনস্, স্যাকসন্স, এঙ্গেলস্, জাটস ও নর্মানদের রক্ত যে কি পরিমাণ মিশে রয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

সপ্তম শতাব্দীতে শ্লাভদের পশ্চিম অভিযান ড্যানুয়ুবের উত্তর তীর দিয়ে আল্পসের পূর্বাঞ্চল এবং এ্যাড্রিয়াটিকের উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়েছিল। পঞ্চম শতাব্দী বা সম্ভবত তৎপূর্বেই এদেরই ওয়েন্ডার নামক একটি শাখা জার্মানীর হামবুর্গ পর্যন্ত এগিয়ে আসতে পেরেছিল। তুর্কীদেরই একটি অংশ আভররা শ্লাভদের পরাভূত করে—এরা অস্ট্রিয়া পর্যন্ত অধিকারে এনেছিল। এর পর নবম শতাব্দীতে তুর্কীদের চাপে পড়ে হাঙ্গেরীয়ানরা কার্পেথিয়ান পার হ'য়ে মোরাভিয়াতে গিয়ে আস্তানা নিয়েছিল। দশম শতাব্দীতে এই হাঙ্গেরীয়ানরাই শেষে রাইন অতিক্রম ক'রে জার্মানি, বারগ্যাণ্ডি ও ইটালি আক্রমণ ক'রেছিল। মঙ্গোলিয়ানরা ইউরোপে এসেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং পূর্ণ আড়াই শত বৎসর ধ'রে রাশিয়াতে রাজত্ব করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল দখল ক'রে নেয় এবং সেই থেকে অষ্ট্রিয়ার তাদের শক্তি বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধ'রে তা'রা ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার ক'রে রেখেছিল। এ সমস্ত উদাহরণ স্পষ্টই দেখিয়ে দেয় যে, মানুষে মানুষে রক্তের সংমিশ্রণ কিভাবে যুগ যুগ ধ'রে চলে আসছে। প্রাচ্যের রক্ত তুর্কী, হুণ ও মঙ্গোলিয়ানদের মারফৎ কিভাবে ইউরোপে মিশছে সেটাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

আমাদের দেশে সিন্ধু, ঝিলাম, কাশ্মীর উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন মানবের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে নর্মদা উপত্যকা, পশ্চিমঘাট ও দক্ষিণঘাটে অধ্যুসিত মানবের মিল দেখতে পাওয়া যায়। আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মেগালিথিক কালচারের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা কোনকালে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের মোন্‌ঘসার অধিবাসীদের দ্বারাই আনিত বলে মনে হয়। আগরার কয়েক মাইল দূরে বেয়ানা নামক স্থানে এবং শিয়ালকোটে যে প্রস্তরীভূত অস্থি পাওয়া গিয়াছে তার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রাপ্ত অস্থির মিল

জার্মনীর হেডেনবার্গ মানব
(পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার মানুষ)

সুইডিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নর্ডেন-স্ক্রৈল্ডের মতেঃ "মানুষের মধ্যে এক একটা বিশিষ্ট জাতি বেছে বের করা সম্ভব নয়, যেহেতু একই মূল থেকে সবাই জন্মলাভ ক'রেছে; বস্তুত সমগ্র মনুষ্যজাতি একটি বিরাট অখণ্ড পরিবার।" হাক্সলী, হেডেন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মতেঃ "জাতি বিচার করবার কোন নির্ধারিত মাপকাঠি নেই—চীনের সংগে নিগ্রোর তফাৎ যেটা সেটা হ'য়েছে ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া, আবেষ্টনী ও অনুক্রম পরম্পরায়।" ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আরো বহুদেশে স্থায়ী বসতি ইউরোপীয়েরা কিভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে মিশে যাচ্ছে এবং অনুক্রম পরম্পরায় কিভাবে খাঁটি ইউরোপীয়দের

ইউরোপের নিয়ানডরথল মানব
(দু' লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষের রূপ)

পাওয়া যায়। নেলোরে প্রাপ্ত অস্থিতে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বুশম্যানদের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ার আর্মেনিয়ানদের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। আসামের অংগামি-নাগাদের মাথার চুল যেরকম কোঁকড়ান তার সামিল শুধু আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যেই পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কুর্গ, নিলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের চেহারায় আরবীয় আকৃতির আভাষ পাওয়া যায়। হিমালয় উপত্যকা, ব্রহ্মদেশ ও আসামের ছহাজার অধিবাসীকে একবার পরীক্ষা ক'রে তাদের মধ্যে দু'হাজারজনকে পাওয়া গিয়েছিল ইন্ডো-ইউরোপীয় ধাঁচের।

মেক্সিকোর অধুনালুপ্ত অধিবাসী মায়াদের অস্তিত্বের যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় তার সংগে হিন্দুদের অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের বহু বিষয়ে হুবহু মিল পাওয়া যায়। এদিকে শ্যামদেশে আঙ্করেও হিন্দুদের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ বহুবার বহু বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছে; গ্রীক, পাঠান, মোগল, শক, হুণেরা এদেশে এসে বসবাস ক'রে কালে এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছে। আরও পরে ইউরোপীয়েরাও এসেছে এবং তাদেরও বহু সংখ্যায় ভারতীয়দের সংগে মিশে গিয়েছে।

এইভাবে পৃথিবীর প্রতিদেশের সংগে প্রতিদেশের অধিবাসীদের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যের অসংখ্য উদাহরণ দেখান যায়। আর প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা ধরতে গেলে, মানুষ সবাই-ই যখন একই জীব তখন প্রকৃতি তফাৎ হ'তেই পারে না। বুদ্ধিমান নির্বোধ, হাবা বোবা, চটপটে অলস, সৎঅসৎ, পণ্ডিত মূর্খ সব দেশের অধিবাসীদের মধ্যেই থাকে। তবুও, পার্থক্য যা লক্ষ্যে পড়ে তার কারণ স্বতন্ত্র জাতি ব'লে নয়—তার কারণ হ'চ্ছে জলবায়ু, ধান্য, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ওপরই নির্ভর করে।

সংগে পৃথক হ'য়ে যাচ্ছে সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। উত্তর আমেরিকায় একশো বৎসর আগে কয়েক লক্ষ রেড-ইন্ডিয়ানের বাস ছিল, কিন্তু আজ খাঁটি রেড-ইন্ডিয়ান কয়েক শত খুঁজে বের করা মুস্কিল—ইউরোপ থেকে আগত লোকেদের সংগে ওরা মিশে গিয়েছে।

পৃথিবীর অধিবাসীদের পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ ক'রে তাদের এক একটা "জাতি" আখ্যা দেওয়া সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরোধী। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, "জাতি" কথাটা এতো ঠুনকো যে কার্যক্ষেত্রে ওটাকে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। যে অর্থ ধরে "জাতি" কথাটা ব্যবহার করা হয় তা আরও পরিষ্কার ক'রে বোঝান সম্ভব যদি ঐস্থানে "গ্রুপ" বা "দল" কথাটা ব্যবহার করা হয় এবং বৈজ্ঞানিকদের মতে তা-ই করা উচিত। একই জীবাণু থেকে সৃষ্ট জীবের প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র জাতি ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে না। আসলে "জাতি" বিভাগের এই যে রীতি তার পরিপোষকদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে একদল মানুষের তুলনায় আর এক দলকে উন্নততর জীব প্রতিপন্ন করিয়ে পরস্পরের মধ্যে একটা বিভেদ-রেখা টেনে দেওয়া।

বর্তমানে জার্মানীতে "আর্য" জাতির যে ধুয়া উঠেছে বৈজ্ঞানিকরা তো সে কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। জেনেভার নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক পিটার্ড আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ববিদ সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে' 'খাঁটি "আর্য" ব'লে কাউকে ধ'রে নেওয়ার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু থাকতে পারে না। পৃথিবীর অধিবাসীদের "উন্নত" ও "অনুন্নত" জাতি বিভাগের মধ্যে মানুষে মানুষে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই।"

"জাতি" বিভাগ নীতির পিছনে থাকে রাজনৈতিক কারণ। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে এই কারণটির রূপ ও রঙ আলাদাও হ'য়ে থাকে। জার্মানিতে ইহুদীদের যে নিকৃষ্টতর জীব ব'লে গণ্য করা হয় তার কারণ রাষ্ট্রের যা কিছু গলদ ও ত্রুটি সেগুলো সবই ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রসমূহে ডিক্টেটরদের নিজেদের অক্ষমতা ও অপারদর্শীতাকে চেপে রাখবার জন্য এরূপ একটা "ভাংগাকুলো" ঠিক ক'রে তা'রা রাখবেই। আফ্রিকাতে কৃষ্ণকায়দের ওপর যে অনাচার চলে তার কারণ হ'চ্ছে সেখানকার মুষ্টিমেয় শ্বেতকায়রা মুষ্টিমেয় ব'লে নিজেদের প্রতাপ দেখান দরকার ব'লে; শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক কারণেও শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে বিভেদ রেখা টেনে না রাখলে চলে না। ভারতীয়দের ওপরে শ্বেতকায়দের, বিশেষ ক'রে ইংরেজদের যে উৎকট ঘৃণা সেটা রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়; শাসিত ও শাসক সমপর্যায়ে থাকবে না, এইটাই হ'চ্ছে কারণ। আমেরিকায় নিগ্রোদলন, তারও সূত্রপাত ঐ অর্থনৈতিক কারণ থেকেই। কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায়ের মধ্যে এই বিভেদ-রেখা যাতে পাকা ক'রে টেনে রাখা যায় চিরকাল তার জন্যে কৃষ্ণকায়দের দেশীয় রুচি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক-নীতি এক কথায় কৃষ্টি যতই অনুন্নত হোক তা সংরক্ষিত করবার জন্যে শ্বেতকায়দের মধ্যে দরদ বড় কম দেখা যায় না। একদিকে শ্বেতকায়রা প্রগতির সংগে তালে তালে নিজেদের যেমনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে কৃষ্ণকায়দের প্রাচীনত্বের বেড়াজালে জড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা ক'রে চলেছে।

কৃষ্ণকায়রা শ্বেতকায়দের চেয়ে নিকৃষ্ট যে কোন্ বিষয়ে বিজ্ঞান আজও তার কোন হদিস্ খুঁজে বের ক'রতে পারেনি। মহামনিষী ও গুণী জ্ঞানী জগদ্বরেণ্য ব্যক্তি কৃষ্ণকায়দের মধ্যে কিছু কম জন্মায় না, যেমন কম জন্মায় না শ্বেতকায়দের মধ্যে দুর্বৃত্ত ও হীনচরিত্র ব্যক্তি। কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণেরই একটি অনুক্রম মাত্র যেমন আর একটি অনুক্রম হ'চ্ছে পীতবর্ণ। এই বর্ণানুক্রম বিভেদে মানুষকে নিকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতর জীবের পর্যায়ভুক্ত করা, বৈজ্ঞানিকদের মতে, বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।
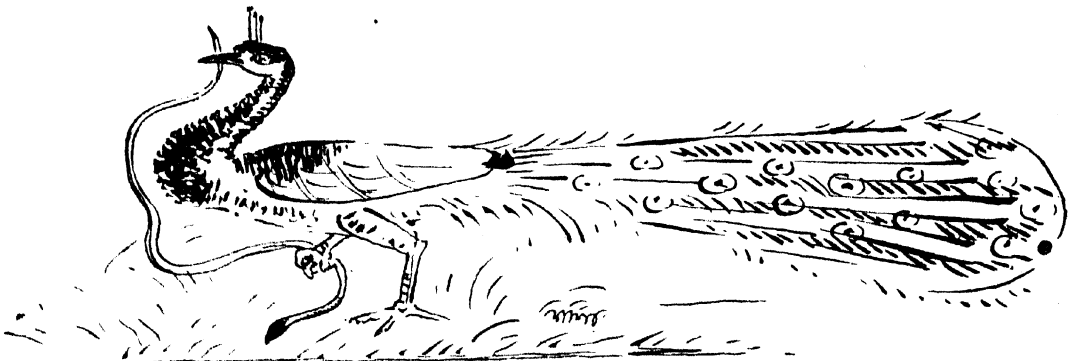
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[৫]

হতাশার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে প্রমোদের মনে হ'ল, সব আশা এখনও যায় নি। কথায় বলে, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্। আজ দোকানে এসেছে সে। বেলুন ছিল না সে তার দুর্ভাগ্য, কিন্তু পরের দিন, কি তার পরের দিন আবার নিশ্চয় আসবে এমন কিছু চাইতে যা আছে তার দোকানে।

তাই সেদিন বাজার থেকে রাজ্যের বেলুন কিনে এনে স দোকানে সাজিয়ে রাখলে।

—সে বেলুন কিনতে অনেকে এলো, এলো না প্রহেলিকা।

তার বাড়ির ছোট মেয়েটি এসেছিল পরের দিন, একটা াকর সঙ্গে ক'রে।

ইতিমধ্যে এক গাল হাসি নজর দিয়ে বাঁড়ুজ্যে ব'লে গেল াকরী তার হয়েছে, পড়াতে হবে প্রহেলিকাকেই।

ব'সে পড়লে প্রমোদ!

দোকানে সে এখন আসে, বসে—সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ হ'য়ে। ার রক্ত শুধু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে যখন তার দোকানের সামনে দয়ে আঁচলের পাখনা উড়িয়ে চ'লে যায় প্রহেলিকা। সে ন্ত্রস্ত হ'য়ে বসে—আশা জেগে ওঠে, বুঝি এই আসে। কন্তু আসে না, ফিরে চায়ও না।

একদিন, দু দিন, তিন দিন গেল।

প্রহেলিকা রোজ দু তিন বার যায় দোকানের সামনে দিয়ে। লেজে যায় আসে, লেকে বেড়াতে যায়, হয় তো বা ঐ ্রের মনিহারী দোকানটাতেই যায়; প্রমোদের দোকানের দকে ফিরেও চায় না।

রোজ মুখ লাল ক'রে রাজ্যের বেলুন ফুলিয়ে প্রমোদ াকানের সামনে সাজায়। তাদের রং বেরঙের বাহার দেখে ন ভাবে আজ এগুলো চোখে পড়বেই প্রহেলিকার। রোজ নগুলো বেচে অন্যের কাছে; মনে হয় দেবীর পূজার অর্ঘ নিবেদন ক'রে দিচ্ছে দৈত্য দানবকে। খদ্দের—বিশেষত বলুনের খদ্দেরকে সে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, যেন তারা ার—ডাকাত। চুরী ক'রে নিচ্ছে তার বুকের রক্তে গড়া ্জোর নৈবেদ্য। রাত্রি হ'লে সে তুলে রাখে বিক্রীতাবশিষ্ট বলুনগুলো, বাইরের সব সজ্জা নামিয়ে রাখে। হিংস্রভাবে ুড়ে ফেলে দেয় সেগুলো মেঝের উপর; তার পর দোর বন্ধ 'রে চাবি দিয়ে হাঁড়িপানা মুখ ক'রে চলে যায় সে তার াসে।

একদিন সে মরিয়া হ'য়ে দোকান ফেলে রেখেই চল্‌ল হেলিকার পিছু পিছু—একটু তফাতে। ক্রোধে ক্ষোভে ার গা জ্বলে যাচ্ছিল, কেন না সে ভাবছিল মেয়েটা নিশ্চয় যাচ্ছে সেই দূরের টফির দোকানে, নিখিলেশ যেখানে ওৎ পেতে ব'সে থাকে। মনে মনে সে বল্‌লে, কিনবেই তো সেই সব জিনিস, প্রমোদের দোকান থেকে কিনতে কি মাথার দিব্যি দিয়ে কেউ বারণ করেছে তাকে? এই বেয়াড়া হতভাগা মেয়েটার এই খামখেয়ালীর কথা ভেবে তার মস্তক চর্বণ করতে ক'রতে সে তার অনুসরণ করলে।

শেষে দেখতে পেলে সে যে, প্রহেলিকা সে দোকান ছাড়িয়ে চলে গেল, আর—এদিক ওদিক চেয়ে নিখিলেশকেও সেখানে দেখতে পেলে না। দেখতে পেলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক একজন পক্ককেশ প্রৌঢ়কে যাঁর সঙ্গে প্রহেলিকা চলতে চলতে গিয়ে বাসে উঠে বসলো।

ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছাড়লো। যাক, প্রহেলিকা তবে সুধু জিদ ক'রে তার দোকানকে অবহেলা করে নি, নিখিলেশের সন্ধানে যায় নি। প্রমোদের দোকানে আসে নি সুধু তার কোনও জিনিসের দরকার নেই ব'লে। দরকার হলেই আসবে সে।

আশা ফিরে এলো। পরম উৎসাহের সঙ্গে সে দোকানটাকে আরও মনোহারী ক'রে সাজাতে লেগে গেল।

দোকানের কাটতি মন্দ হয় না। সারাদিনই কিছু না কিছু বেচাকেনা করে সে। হিসেব ক'রে দেখলে যে, এমনি চল্‌লে তার বাসা খরচ দোকান থেকে অনায়াসেই চলবে। পাড়ার সব বাড়ি থেকেই লোকে এটা ওটা কিনতে আসে। প্রহেলিকার বাড়ি থেকেও আসে, কিন্তু চাকর কিম্বা সরকার —প্রহেলিকা নয়।

তবু অপেক্ষা করতে পারে সে, বিশেষ, দোকান যখন বেশ চলছে। আর তাড়াও খুব বেশী নেই, কেন না প্রহেলিকা বি-এ প'ড়ছে, পাশ হবার আগে বিয়ে হবে না তার নিশ্চয়! অতএব মা ভৈঃ!

বুক ঠুকে সে দোকান সাজিয়ে ব'সে থাকে সারাদিন।

কিন্তু তার ধৈর্য টলে যায় বিকেল কি সন্ধ্যে বেলায়। ক্ষেপে ওঠে সে, যখন ওই বাঁড়ুজ্যেটা হেলতে দুলতে, পান চিবুতে চিবুতে ঐ পথ দিয়ে যায় প্রহেলিকাকে পড়াতে!

কি কপাল পাষণ্ডটার!

ওকে খুন ক'রে ফেললে ক্ষতি কি?

কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, কপাল তার যত জোর হোক্, বাঁড়ুজ্যে যে প্রহেলিকাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলবে এ রকম সম্ভাবনাও তার মনে বিশেষ আমল পেলো না। একে তো ওই মোটা হোৎকা চেহারা, তার উপর বেশভূষা সম্বন্ধে তার অপরিসীম অজ্ঞ ঔদাসীন্য যেন ইদানীং আরও বেড়েই গিয়েছিল। ওই জন্তুটাকে প্রহেলিকা কখনই সুনজরে দেখতে পারে না।
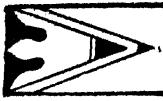
প্রহেলিকাকে পড়িয়ে ফেরবার পথে বাঁড়ুজ্যে প্রায়ই প্রমোদের দোকানে ব'সে গল্প সল্প ক'রে যায়। তাতে প্রমোদের রাগ হয়, তবু সে একটু ব্যগ্র প্রতীক্ষা নিয়ে তার কথা শোনে এই আশায় যে, হয়তো সে তার ছাত্রীর প্রসঙ্গেই কথা কইবে।

কিন্তু কি হতভাগা ঐ বাঁড়ুজ্যেটা, সে কথার ধার দিয়েও যায় না সে। তার জীবনের এত বড় অপরিমেয় সৌভাগ্য যেন তার মনে কোনও সাড়াই দেয় নি। যেন সে আসে যায় শুধু দিনগত পাপক্ষয় করতে। প্রহেলিকার অস্তিত্ব তার কাছে যেন বাস, ট্রাম, গ্যাস পোষ্ট বা ইলেক্‌ট্রিক লাইটের মত কলকাতার জীবনের একটা সাধারণ নিত্য আনুষঙ্গিক বস্তু। তাই প্রতীক্ষা করতে করতে প্রমোদ ক্রমে ক্ষেপে ওঠে। শেষে বাঁড়ুজ্যেকে তাড়াবার জন্য সে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ লাগিয়ে দেয়।

যদি বা কালে ভদ্রে প্রহেলিকার কথা বলে সে—সেও এমন কথা যে, তা' শুনে তার গালে, ঠাস ক'রে চড় মেরে দিতে ইচ্ছা করে।

একদিন সে বল্‌লে, "প্রাইভেট টিউশন আরজন্মের পাপের ফল ভায়া। তাও যদি একটা ভাল ছাত্র পাওয়া যায়! কিন্তু আমার বরাতে কি জোটেও যত আকাট!" তার পর তার আর গোটা দু'তিন ছাত্রের মেধার পরিচয় দিয়ে বল্‌লে, "আর এই ছুঁড়ি যাকে পড়াচ্ছি, ছ্যাবলামীর গুরুঠাকুর, কিন্তু আঁক কষতে গিয়ে দুয়ে তিনে কোনও দিন ভুলে পাঁচ নামায় না। আবার বি-এতে পড়ছেন অঙ্ক। আর ইকনমিক্স, তাতে তো বিদ্যের জাহাজ।"

রাগে প্রমোদের ইচ্ছে হচ্ছিল তার গলাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবার। কিন্তু রাগ চেপে সে বল্‌লে, "তাই রক্ষে বল। নইলে দু দিনেই তোমার বিদ্যের দৌড় বুঝে নিয়ে তোমায় অর্ধচন্দ্র দিত।"

বাঁড়ুজ্যে হেসে বল্‌লে, "তা মিথ্যে বল নি। সে মেয়ে কিছু বুঝুক না বুঝুক, পাশ করুক ফেল করুক, ব'য়ে গেল আমার। আমার মাসে পঁচিশ টাকা তো বেঁচে থাকুক।" ব'লে খুব বেশী হাসলে, এত বেশী যে তাতে ধৈর্য রক্ষা করা প্রমোদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

হায় রে! বানরের গলায় মুক্তামালা, শুয়োরের সামনে মণিমুক্তা ছড়ান। অন্ধ বিধাতার বিশ্বনিয়মনের কেরামতির এই তো নমুনা! একদিনের জন্যও যদি বিশ্বরাজ্যের ভার পেতো প্রমোদ তবে এর চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ প্রতিভা দেখাতে পারতো সে!

বাঁড়ুজ্যে ক্রমেই প্রমোদের কাছে বেশী অসহ্য হ'য়ে উঠলো। তাকে দেখলেই সে ক্ষেপে উঠতে চায়! অথচ রোজ তার অশোভন মূর্তি দেখতেই হয় তার, শুনতে হয় তার কথা ধৈর্য ধ'রে।

এত সে সয় শুধু এই আশায় যে, একদিন যদি পায় সে সুযোগ—নাই বা পাবে কেন?—তবে ওই বাঁড়ুজ্যের চোখে আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দেবে যে, এ অমূল্য মণির যোগ্য সমাদর কেমন ক'রে করতে হয়।

একটা দুর্দমনীয় আশায় সে কিছু দমকা খরচ ক'রে বসলে ক্যাশমেমো ছাপিয়ে। তার মাথায় লেখা হ'ল—"রঞ্জন ভাণ্ডার। প্রোপ্রায়টার—প্রমোদকুমার ঘোষ, এম-এ"। এ ক্যাশমেমো সব বাড়িতেই যাবে প্রহেলিকার বাড়িতেও, হয়তো তার চোখেও পড়বে। তখন সে জানতে পারবে যে, প্রমোদ শুধু একটা বাজে দোকানদার নয়—এম-এ। তখন কি প্রহেলিকা তাকে এমনি অবহেলা করতে পারবে?

আরও খরচ ক'রে সে একখানা ছোট সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার ছাপালে, তার ভিতরও তার এম-এ ডিগ্রীটা খুব জ্বলজ্বলে ক'রে দেখান হ'ল। পাড়ার সব বাড়িতে সে ক্যালেণ্ডার বিলিয়ে এলো, প্রহেলিকার বাড়িতে ডজনখানেক দিয়ে এলো।

দিনের পর দিন যেতে লাগলো। দোকানের শ্রীবৃদ্ধি হ'ল, খদ্দের আরও বেশী আসতে লাগলো। কিন্তু প্রমোদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো ক্রমেই। কেন না প্রহেলিকার চাকর যদিও ঘন ঘন আসতে লাগলো এটা ওটা সেটা—লজেন্স, টফি, চকোলেট, রিবন, সেফটীপিন প্রভৃতি কিনতে তবু প্রহেলিকা এলো না।

রোজই যায় প্রহেলিকা দোকানের সামনে দিয়ে, চটুল চাহনি দিয়ে প্রমোদের দোকানকেও মাঝে মাঝে ধন্য ক'রে যায়, কিন্তু আসে না সে।

মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে, প্রমোদের ধৈর্য সেই সীমার উপর এসে টল্‌মল্‌ করতে লাগলো।

দোকানে লাভ হচ্ছে। কিন্তু সেজন্য কি তার দোকান? যার জন্য তার এ আয়োজন সে কোথায়?—প্রমোদের মনে হ'ল—এ একটা ব্যর্থ মর্মন্তুদ প্রহসন।

বোঝার উপর শাকের আঁটি! সেদিন প্রমোদ দেখতে পেলে প্রহেলিকা লেক থেকে বেড়িয়ে ফিরছে হাসতে হাসতে, কথা কইতে কইতে, নিখিলেশের সঙ্গে।

সব সীমা পার হ'য়ে গেল।

প্রমোদ বল্‌লে, দুত্তোর।

দোকান বেচে ফেলবে স্থির ক'রে সে খদ্দেরের সন্ধান ক'রতে লাগলো।

জলের দরে দোকান বেচতে সে প্রস্তুত। এখানে ব'সে ব'সে দেখে দেখে জ্বলে পুড়ে মরতে সে আর পারে না।

তার চেয়ে লিখবে সে।

"বিবিক্তা"য়ে তার "উড়োজাহাজ" উপন্যাসখানা এতদিনে বের হ'তে আরম্ভ হয়েছে। দু'চারজন তার প্রশংসাও করছে।

সেই ভাল, শুধু ঘরে ব'সে নভেলই লিখবে। দোকানটা বেচে ফেলতে পারলে বাঁচে।

(ক্রমশ)

সাহিত্যিক

(গল্প)

শ্রীতারাপদ রাহা

ট্রামটা আলিপুর ঘুরিয়া গড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। দীপ্তি আধুনিক সাজে সজ্জিত হইয়া পাশে বসিয়া তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে মাঝে মাঝে আমার সহিত কথা কহিয়া যাইতেছিল। শুধু তাহার কথা শুনিতে পাইলেই মাথাধরা আমার একেবারে সারিয়া যায়—একথা অবশ্য ইচ্ছা করিয়াই কতবার তাহাকে বলিয়াছি, তবু আজ লিখিতে বসিয়া সত্য কথাই লিখিতেছিঃ দীপ্তি, কি কারণে জানি না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এবং মাঠের ঠাণ্ডা খোলা হাওয়া বাধাহীন হইয়া আমার চোখে মুখে কপালে আসিয়া লাগিতেছিল, তাই ট্রামে বসিয়াই বোধ হয় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিয়া কে যেন ডাকিতেছে—

কি ঘুমুলে না কি!

মনে মনে বিরক্ত হইলেও হাসিয়া দীপ্তির দিকে তাকাইলাম। সেও হাসিল। হাসিয়া চোখের ইসারায় পিছনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার নির্দেশমত পিছনে তাকাইয়া দেখি—আমার পিছনে যে বেঞ্চখানা খালি পড়িয়াছিল তাহাতে একজন পুরুষ আসিয়া বসিয়াছে। বয়স সাতাশ আঠাশ হইবে, গায়ে আধময়লা আদ্দির পাঞ্জাবি, মাথার চুল উস্কখুস্ক, তিনি চা'র দিন দাড়ি কামায় নাই। কোথায় যেন ইহাকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছি অথচ ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছিলাম না। আমার এই দ্বিধার ভাব দেখিয়া লোকটা আমার গায়ে আর একটা ধাক্কা দিয়া একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—

আরে,—চিনতেই পারলে না! আমি দিব্যেন্দু ব্যানার্জি, তোমার সতীর্থ।

হাসি দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, শুধু সতীর্থ নও, বলো—বন্ধু....কিন্তু এ তুমি কি রকম হয়ে গেছ, ইন্দু, দেখে চেনাই যায় না,...শুধু তোমার হাসিটা এখনও বদলায় নি,...ঐ দেখেই শুধু তোমায় চিনতে পারলাম, নইলে কার সাধ্য ছিল তোমায় চেনে!

নামটা দেখি এখনও ভোলো নি!

মহকুমার স্কুলে পড়িবার সময়—শুধু আমি নয়, ক্লাসের সব ছেলেরাই দিব্যেন্দুকে ভালবাসিত। তাহার নামটাকে সংক্ষেপ করিয়া আমার দেখাদেখি সবাই ডাকিত—ইন্দু। সে গান গাহিত, গল্প কবিতা লিখিত; স্কুলের ছেলেদের লইয়া হাতে লিখিয়া একটা মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিত। ইন্দুকে দেখিবা মাত্র স্কুল-জীবনের সমস্ত ঘটনা অতি দ্রুত বায়স্কোপের ছবির মত মনে পড়িয়া যাইতেছিল।

ইন্দু সহসা আমার সাময়িক চিন্তাধারায় বাধা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? বৌদি—বুঝি!

বুঝতেই পারছ!

নমস্কার, বৌদি।

নমস্কার।

ইন্দু আমার দিকে তাকাইয়া অনুযোগের সুরে কহিল; তুমি ত আচ্ছা লোক হে, বৌদির শুভাগমনের দিনে আমাকে একবার মনেও পড়লো না, না হয় দাড়িটাড়ি কামিয়ে একটু ভালো কাপড় জামা পরেই আসতাম।—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দীপ্তির পরিচ্ছন্ন সুন্দর বেশভূষার পাশে বন্ধুর এই অর্ধমলিন পরিচ্ছদ সত্যই তেমন খাপ খায় না, কিন্তু এই কথা লইয়া পাছে সে অস্বস্তি বোধ করে তাই ব্যাপারটাকে লঘু করিবার জন্য দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিলাম, বুঝতে পারছ ত, ইনি কি ধরণের লোক? ইনি ভাবুক, কবি, সাহিত্যিক...।

কি হে, সত্যি কি না?

ইন্দু মৃদু হাসিতে লাগিল।

গল্প কবিতা লেখ না আজকাল?

ইন্দুর মুখের ভাব যেন হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল—ঃ একটু আধটু লিখি বই কি, কাগজেও কিছু কিছু বেরিয়েছে...।

দীপ্তি প্রশংসমান দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল, কি কি কাগজে বলুন ত!

'নবালোক'—'সোনার বাংলা'—এই সবে আর কি!

দীপ্তি বলিয়া উঠিল, নবালোকের গল্পটা আমি পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।

ইন্দুর মুখখানা প্রসন্নতায় ভরিয়া গেল।

ইন্দুর দিকে তাকাইয়া বলিলাম, যা'ক এইবার তোমাদের বন্ধুত্বটা তা হলে জমে উঠবে।

দীপ্তি পূর্ব হইতেই বিপদ আশঙ্কা করিয়া কটাক্ষে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে নিষেধ আমি মানিলাম না। দীপ্তির দিকে চাহিয়া ইন্দুর উদ্দেশ্যে বলিলাম, ইনিও একজন সাহিত্যিক কি না!

ও তাই নাকি, বেশ, বেশ!

ইন্দুর দৃষ্টি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল, আর দীপ্তি এদিকে আমার প্রতি কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ কিছুকাল চলিলেই হয়ত ভালো হইত, কিন্তু তাহা আর হইল না। আমিই বাধা দিলাম। একে আমি অরসিক তাহাতে মাথাধরা সারাইবার জন্য ট্রামে চাপিয়াছিলাম, গড়ের মাঠে নামিয়া আবার খোলা হাওয়ায় ট্রামেই ফিরিয়া আসিব,—তাই ইন্দুকে বিদায় দিবার পূর্বে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয় কয়েকটি সংবাদ জানিয়া লইলাম।

—ইন্দুর মা বাপ দু'জনাই মারা গিয়াছেন। ছোট ভাই ও বিবাহযোগ্যা ভগিনী লইয়া সে বৌ-বাজারে বাসা করিয়া আছে। বেহালায় টিউসনী করিতে গিয়াছিল। ছোট ভাই কর্পোরেশনে ২৫৲ টাকা বেতনের চাকুরী করে। কোন রকমে দিন চলে। নিজের জন্য তার ভাবনা নাই,—বোনটিকে বিবাহ দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কোন চাকুরীর জন্য চেষ্টা

করিতেছে কি?......না, চাকুরী সে করিবে না......ব্যবসা? না ব্যবসাও না, সে সাহিত্য চর্চা করিয়া জীবন কাটাইবে।

দীপ্তি ইন্দুর কথা খুব উৎসাহের সহিত শুনিতেছিল। দীপ্তি ও ইন্দুর কথা ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমি আবার চোখ বুজিলাম। এস্‌প্লানেড পৌঁছিবার পূর্বে আর একটু তন্দ্রা আসিতে পারিলেই মাথাধরা কম হইবার কথা......

দীপ্তি আমাকে একটু নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া দিল, দেখি এস্‌প্লানেডে আসিয়া গিয়াছি। ট্রামের আর সকল লোকই প্রায় নামিয়া গিয়াছে, কেবল দীপ্তি ও ইন্দু আমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে চোখ মেলিতে দেখিয়াই ইন্দু বলিল, নিমন্ত্রণ পেলাম হে....তুমি ত আর করলে না,—বান্ধবীই করলেন।

তন্দ্রার রেশটুকু তখনও কাটে নাই, গম্ভীরভাবে বলিলাম, অন্য সব ব্যাপারে উনি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী, কিন্তু এ সব ব্যাপারে উনিই আমার 'বস্'। সুতরাং নিমন্ত্রণটা ঠিক জায়গা থেকেই হয়েছে।

দীপ্তি সকোপ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

ইন্দু বলিল, তোমাদের ঠিকানাটা নেওয়া হয়ে গেছে, আমার—আমারটাও দিয়েছি।

বেশ, বেশ, শুনে খুসী হ'লাম। আফিস তা হ'লে আবার ভলোই চলবে। আমার নিজের আর কিছু দেখাশুনা করতে হ'বে না।

ইন্দু সেদিনকার মত বিদায় লইল। আমরা ফেরতা-ট্রামে আবার মাঠের পথে যাত্রা সুরু করিলাম। দীপ্তি সানুনয় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, দিব্যেন্দু বাবুকে আসতে বলেছি বলে' রাগ করেছ?

পাগল! বলা ত আমারই উচিত ছিল, তুমি বলাতে আরও ভালো হয়েছে।

লেখাগুলি অনেক দিন পড়ে আছে, তুমি ত কুঁড়েমি করে কোথাও একটু চেষ্টা করবে না, দেখি তাঁকে ধরে যদি ওগুলির কোথায় একটা গতি করা যায়!

ওঃ স্বার্থ আছে—বলো!

তবে?—তুমি ভেবেছ আমি ওঁর—?

বিচিত্র কি!

* * * * *

পরের রবিবারে—ইন্দু দাড়ি কামাইয়া ভালো জামা কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। দিদিকে রান্নাঘর হইতে ছুটি দিয়া দীপ্তি সেদিন নিজে রাঁধিল। আমি বসিয়া বসিয়া ইন্দুর সহিত আমাদের স্কুলজীবনের নানা কথা আলোচনা করিলাম। অন্তত একটা দিনের জন্যও মনে হইল—আমরা যেন আমাদের হারানো শৈশব ফিরিয়া পাইয়াছি।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কাজকর্ম সারিয়া দীপ্তি আসিয়া আমাদের আলোচনায় যোগদান করিল। ইন্দু লক্ষ্য করিয়াছিল কি না জানি না,—কিন্তু আমি দেখিলাম দীপ্তির বন্ধু-বাৎসল্য নিঃস্বার্থ নয়ঃ বাঁ-হাতে আঁচলের নীচে সে একতাড়া কাগজ আনিয়াছে। বুঝিলাম বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও আমার দৃষ্টি হইতে হাসি ঠিকরিয়া পড়িয়াছে। দীপ্তি কটাক্ষে আমাকে শাসন করিল।

ইন্দু তখন উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিয়াছে, তুমি বলবে কি ভাই, আমি বুঝি, বিয়ে না করলেও অবিবাহিতা বোনটি রয়েছে, ওর ত একটা হিল্লে করতেই হবে। টাকা আমার চাই-ই। কিন্তু তা' বলে লেখা আমি ছাড়তে পারবো না। দেখি বোনের বে' না হয় একটু দেরী করেই দেব।

কিন্তু বোনের বিয়ে দিতে যে অনেক টাকা চাই, ইন্দু। সে টাকা কি তুমি লিখে আয় করতে পারবে?

চেষ্টা ত করতে হবে।

দীপ্তি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি কখন লেখেন, ইন্দুবাবু?

কখন লিখি?...আমি দিন-রাত-ই লিখি—এক টিউসনীর সময় ছাড়া দিন-রাতই কাগজ কলম নিয়ে আছি। লিখতে লিখতে কোন কোন দিন রাত' দুটো তিনটে বেজে যায়।

লিখে তা হ'লে আপনি অনেক টাকা করেছেন—বলুন।

ইন্দু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ঃ টাকা?...বাংলা-দেশে কাগজে লিখে অনেক টাকা!

দীপ্তি একটু সঙ্কোচ করিল, তারপর বলিল, আপনার—আপনারও এমন দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে?

মুহূর্তের জন্য ইন্দুর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, তারপরই সে হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়,...সঙ্কোচ করছেন কেন আপনি?...দুর্ভোগ আমারও পোহাতে হয়েছে,—সবারই হয়। উপন্যাস আমার খান পনের ষোল লেখা হয়ে গেছে।

বলেন কি!

হাঁ, পনের ষোল। দিন রা'ত লিখি আমি। প্রত্যেক মাসে গড়ে আমি প্রায় একখানা করে উপন্যাস শেষ করি।

এর একখানাও ছাপা হয় নি?

ইন্দুর চোখ কেমন করিয়া আসিল ঃ না, একখানাও না। অত বড় এক একখানা খাতা ওরা পড়ে দেখতেই চায় না।

তা' হ'লে উপন্যাস না লিখে—

ছোট গল্প লিখি না কেন—বলছেন? হাঁ ছোট গল্প লিখেছি, তার অনেকগুলি ছাপাও হয়েছে, দু' এক কাগজে টাকাও পেয়েছি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গল্পগুলি একত্র ছাপিয়ে বই করুন বিক্রী হ'বে না, কিন্তু উপন্যাস—একখানা অপদার্থ—একেবারে trash বই ছাপা হতে না হতে অনেক বিক্রী হ'য়ে যাবে।

আমি বলিলাম, দু' একখানা নিজে ছাপিয়ে দেখলেও ত পার।

টাকা কোথায়, দাদা?......

দেখিলাম দীপ্তির মুখও ম্লান হইয়া উঠিয়াছেঃ হয় এই নবীন লেখকের প্রতি সহানুভূতিতে, না হয় নিজের লেখাগুলির বুঝি আর গতি হইল না ভাবিয়া।

রবিবার দুপুরে খাইয়া উঠিয়াই কেমন ঘুম পায়। একটা হাই তুলিয়া বলিলাম, ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও ভাই,—দিয়ে একটা কোন চান্দনী-নান্দনীর চেষ্টা কর, এখনও বয়স আছে।

হয়ত আমার ঘুমের ভাব দেখিয়াই ইন্দু উঠিল। সে হাসিয়া বলিল, জানই ত পাগলামি করাই আমার ধাত, পাগলামি ছাড়লে বাঁচব না আমি। আর বার বার লাইন বদলানও ভাল নয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—A rolling stone gathers no moss.

ইন্দু তখন দাঁড়াইয়া আছে,—পাছে লেখাগুলি ধরা পড়িয়া যায়—তাই দীপ্তি সেগুলি ক্রমেই কাপড়ের আড়ালে লইতে লাগিল।

ইন্দু বলিল, প্রথম প্রথম এ সব ঝকমারি সবারই পোহাতে হয়—তাই বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। ন্যুট হামসনের প্রথম জীবনটা কেমন করে কেটেছে? বালজাক? এমন যে তোমাদের বার্ণাড শ তার কি হয়েছে? রাশি রাশি লেখা তার কাগজের অফিস থেকে ফেরত আসত, ষ্টাম্পের খরচ জোগানই দায়। 'শ' তার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম ন বছর লেখা দিয়ে মাত্র ছ পাউন্ড আয় করেছেন।

বুঝিলাম লোকটা এক রকম পাগল—ইহার সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহা ছাড়া ঘুমে আমার দুচোখ বুজিয়া আসিতেছিল, তাই শেষ মুহূর্তে আমি আর তাহার কথার উত্তর দিতে পারি নাই। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখেই দেখিলাম ইন্দু দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিতেছে, তা হলে আসি বৌদি—নমস্কার।

নমস্কার!

খুব খাইয়েছেন, রান্না—হয়েছিল চমৎকার। আসবেন মাঝে মাঝে।

আর যে লোভ দেখিয়ে রাখলেন,—ভালো কিছু খেতে ইচ্ছে করলেই ছুটে আসব, তখন তাড়াতে দিশে পাবেন না—বলিয়া হাসিতে হাসিতে ইন্দু বিদায় লইল।

সেদিন ইন্দুর মুখে নতুন সাহিত্যিকের দুর্দশার কথা শুনা অবধি দীপ্তি আর লিখিতে বসে নাই। ব্যাপারটা বোধ হয় কাঁটার মত তাহার মনে বিঁধিত। ইন্দুর প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রায়ই সে নতুন সাহিত্যিকদের জন্য ক্ষোভ করিত। আমি বলিতাম, তোমার অত ভয় পাবার কারণ নেই, দীপ্তি, ইন্দুর লেখা ছাপা না হলেও দীপ্তি দেবীর লেখা কাগজে ঠিক বেরুবে—এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

মানে?

মানে অত্যন্ত সহজ,—তুমি মেয়ে।

শুনিয়া দীপ্তি রাগিয়া যায়। তার রোষদীপ্ত মূর্তি আমার ভালই লাগে। আমি তাহাকে আরও রাগাইয়া বলি, তবু যদি ভড়কে যাও, তা হলে সাহিত্যিক নাই বা হলে! আমি তাতে তোমাকে একটুও কম ভালবাসবো না—দীপ্তি, তার চেয়ে তুমি সুগৃহিনী হওঃ তুমি নিজে রেঁধে আমায় ভাল করে খাওয়াবে—ক্লান্ত হয়ে এলে—

যাও, যাও—ফাজলামি রাখ,...কিছুই যেন করিনে আমি!

কথাটায় ফল হইয়াছিল। দীপ্তি গোপনে গোপনে লিখিত কিনা জানি না, কিন্তু ইহার পরে সে ক্রমে আমার সুখ-শান্তি বিধানের জন্য অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিল।

*   *   *   *   *

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। অফিসের কতকগুলি জরুরী চিঠির ফাইল বাড়িতে আনিয়াছিলাম, চা খাইবার পর তাহাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছি—এমন সময় দীপ্তি দৈনিক সংবাদপত্রখানা হাতে করিয়া এক রকম হাঁপাইতে আসিয়াই এক স্থানে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—

দ্যাখো।

ফাইল হইতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম—

শোচনীয় দুর্ঘটনা। উদীয়মান নবীন সাহিত্যিকের মৃত্যু।

তরুণ সাহিত্যিক দিব্যেন্দু ব্যানার্জি গতকল্য রবিবার সন্ধ্যায় তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী সবিতা ব্যানার্জিকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় নৌ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সবিতা নৌকার মধ্য ভাগে ছিল, দিব্যেন্দু এক পার্শ্বে। একখানা ষ্টীমার চলিয়া যাইবার পর নৌকা অসম্ভব দুলিতে থাকে। সবিতা ভয়ে চীৎকার করিয়া ওঠে। ভীতা ভগিনীর নিকট যাইবার জন্য উঠিবা মাত্র তিনি মাথা ঘুরিয়া জলে পড়িয়া যান। দিব্যেন্দু সম্প্রতি কঠিন অসুখ হইতে উঠিয়াছিলেন। শরীর অত্যন্ত দুর্বল ছিল। তাহা ছাড়া তিনি ভাল সাঁতার জানিতেন না। আত্মরক্ষার জন্য দু একবার সামান্য চেষ্টা করিতে করিতেই গঙ্গা গর্ভে তাহার সমাধি হয়।

দিব্যেন্দুবাবু সাময়িক অনেক প্রধান প্রধান কাগজে অনেক গল্প কবিতা লিখিতেন। তাহার প্রত্যেক গল্পেরই একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল। সম্প্রতি দিব্যেন্দুবাবু গল্প লেখা ছাড়িয়া উপন্যাসে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এক বিবাহযোগ্যা ভগিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমান আছেন। তাহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করুন।

সমস্তই পড়িলাম। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া আসিল। দীপ্তির দিকে চাহিলাম। তাহার চোখ দেখি জলে ভরিয়া আসিয়াছে। মেয়েদের এমনি কোমল মন,—মাত্র দু দিনের পরিচয়, তাই এই।

বললাম, হয়ে গেল!...মানুষের জীবন এই!...এই ছ মাস আগে সে এই ঘরে বসে কত কথা বলে গেছে।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া দীপ্তি বলিল, সাহিত্যিক হবার জন্য কি বিপুল আগ্রহ ভদ্রলোকের!—বলে, আমি দিন রাত

লিখি, বৌদি, দিন রাত...আবার প্রত্যেক বড় বড় সাহিত্যিক-দের জীবন কেমন করে পর্যালোচনা করেছেঃ কে সারারাত ধরে লিখতেন, কার লেখা বার বার ফেরৎ এসেছে তবু হাল ছাড়েনি—সব। এ সব নিজেরই অধ্যবসায়ের প্রচ্ছন্ন মনোভাব।

ইন্দু আমার প্রথম জীবনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, সুতরাং আমি বেশি কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। দীপ্তি আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, তুমি যাও না গো ওদের বাড়িতে একবার,—ভাই আর বোনটা যে কি করছে!... ঠিকানা ত আমাদের লেখা আছে।

তা হয় না, দীপ্তি।

কেন?

বে'চে থাকতে একদিন আমরা যার বাড়িতে যাবার সুযোগ করতে পারিনি, আজ সে মারা গেলে আমরা কোন মুখে তাদের ওখানে যাই। তা ছাড়া তার ছোট ভাই বোন আমাকে চিনতেও পারবে না,...আর লোকের এ দৃশ্য দেখতেও পারিনে আমি।

নতুন করিয়া একটা দুঃখ পাইবার জন্যই যেন ছ মাস আগে ইন্দুর সহিত অমনি করিয়া ট্রামে দেখা হইয়া গিয়াছিল, নইলে কৈশোরের অন্যান্য বন্ধুর মত সেও বিস্মৃতির কোন অতল গর্ভে ডুবিয়া হারাইয়া যাইত।

দিন যাইতে লাগিল। প্রথম কয়েকদিন ইন্দুর কথা আমরা ঘন ঘন আলোচনা করিতাম, পরে আর আর কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহার প্রসঙ্গ আর তেমন উঠিত না, অথবা মহাকাল তার স্নিগ্ধ স্পর্শে আমাদের সমস্ত বেদনা ক্রমে জুড়াইয়া দিতেছিলেন।

দিব্যেন্দুর মৃত্যুর পর প্রায় দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। তাহার কথা আর তেমন মনে পড়ে না। অফিস হইতে আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া বিশ্রাম করিয়াছি, চা খাওয়াও হইয়া গিয়াছে। দীপ্তি ধীরে ধীরে আসিয়া একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা আমার হাতে দিয়া বলিল, দ্যাখো।

কি ব্যাপারটা কি?

নিজেই দ্যাখো—না!

এলোমেলো পাতা উল্টাইয়া চলিলাম।

দীপ্তি বলিল, ৩৭৫ পৃষ্ঠা খোল।

৩৭৫ পৃষ্ঠা খুলিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাস—'প্রথম অঙ্ক'। উপন্যাস আরম্ভ হইবার পূর্বে ব্র্যাকেটে লেখা রহিয়াছে—(তরুণ সাহিত্যিক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আর এ জগতে নাই। তাহার সুলিখিত ছোট গল্পের সহিতই পাঠক সমাজ এ যাবৎ পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এমন সুন্দর উপন্যাস লিখিতে পারিতেন তাহা আমরাও জানিতাম না। তিনি অনেকগুলি উপন্যাসের পান্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত অমিতেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমরা তাহার দু'একখানি প্রকাশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব বলিয়া আশা করি। আরব্ধ উপন্যাসখানি একটি কিশোর বালকের মনস্তত্ব লইয়া লেখা। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য দিবে।—)

উপন্যাসের যেটুকু বাহির হইয়াছে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহাতে একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া গেলাম; বেশ ভাল লাগিল। তার পর তখনই আর একবার বেশ ভাল করিয়া পড়িলাম। দীপ্তি আমাকে মনযোগের সহিত পড়িতে দেখিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন পড়লে?

মাসিক পত্রিকা দীপ্তির হাতে ফেরত দিয়া বলিলাম, চমৎকার!

নিজের উপন্যাস কাগজে ছাপা দেখে যেতে পারলে না ভদ্রলোক. বইখানা বেশ সমাদর লাভ করবে বলে মনে হয়,—কি বল?

তাই ত মনে হয়।

আমি ভাবিতেছিলাম তখন আমারই জীবনের কৈশোরের দিনগুলির কথা। দিব্যেন্দু উপন্যাসখানা নিজেরই বাল্যজীবন লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। কাহিনী অগ্রসর হইলে হয়ত আমার জীবনের কথাও ইহার মাঝে কত দেখিতে পাইব। দিব্যেন্দু বাঁচিয়া থাকিলে উপন্যাসখানি বাস্তবিকই উপভোগ্য হইত। মাঝে মাঝে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া উপন্যাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবন আলোচনা করিতাম।

মাসের পর মাস 'প্রথম অঙ্ক' বাহির হইতে লাগিল। দিব্যেন্দুর বর্ণনার ভঙ্গী, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, তরুণ মনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সবই আমাকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। দীপ্তি ত দিব্যেন্দুর অন্ধ ভক্ত হইয়া উঠিল। তাহার হাবভাব দেখিয়া মাঝে মাঝে বেদনা বোধ করিতামঃ তবুও ভাল—আজ দিব্যেন্দু বাঁচিয়া নাই!

'নবালোক'এ দিব্যেন্দুর আর একখানা উপন্যাস আরম্ভ হইল—'আমি সুদূরের পিয়াসী'। একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস। দীপ্তি দিব্যেন্দুর প্রতিভা দেখিয়া একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। মৃতের সহিত প্রেমে পড়া সম্ভব হইলে আজ বোধ হয় আমার দুর্দশার সীমা থাকিত না। সুযোগ পাইলেই দীপ্তি বলিত, আজ যদি তোমার বন্ধু বে'চে থাকত গো!

দিব্যেন্দুর মৃত্যুতে প্রথম প্রথম খুবই দুঃখ পাইয়াছিলাম, কিন্তু ইদানিং দীপ্তির রকম সকম দেখিয়া মনে হইত—ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

দীপ্তির পড়িবার ঝোঁকের জন্য অনেকগুলি বাঙলা কাগজ আমাদের বাড়ীতে আসিত। এইবার প্রত্যেকখানা আসিতে সুরু করিলঃ কি জানি কোন ফাঁকে তাহার অন্য উপন্যাস যদি অন্য কোন কাগজে বাহির হইয়া যায়।

বাধা দিতে গেলে পাছে দীপ্তি আমার সন্দেহ আশঙ্কা

করিয়া ব্যথা পায়, তাই কোন কাগজ নিতে বাধা দিতেও পারিতাম না। 'প্রবী', 'উদিতা' ও 'ধরিত্রী'তেও তার উপন্যাস বাহির হইতে লাগিল। প্রতি কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভেই এই মৃত সাহিত্যিকের জয়গান। মাঝে মাঝে সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া আমি নিজেও সর্বান্তঃকরণে বলিতাম, আজ যদি দিব্যেন্দু বাঁচিয়া থাকিত!

দিব্যেন্দুর মৃত্যুর পর প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রবিবার বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্বে বাহিরের ঘরে বসিয়া চা খাইতেছিলাম, এমন সময় ২১।২২ বছরের একটি ছেলে সাইকেলে করে আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেলঃ গোলাপী খাম, তার উপর হলুদের দাগ, এক কোণে আড়াআড়ি লেখা—শুভবিবাহ। এ সব চিঠি তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখার উৎসাহ আমার কোনদিনই নাই—কারণ ইহাদের প্রত্যেকেই একটা খরচের তাগিদ লইয়া আসে।

ছেলেটি চিঠিখানা দিয়া ফিরিবার জন্য সাইকেলে চাপিয়া বসিয়াছে, এমন কি দু'চার পা আগাইয়াও গিয়াছে এমন সময় দীপ্তি ঘরে আসিয়া জানলার ফাঁকে তাহার পিছনটা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—আরে!

কি ব্যাপার কি?

দেখেছ—ছেলেটি দেখতে ঠিক দিব্যেন্দুবাবুর ছোট ভাইয়ের মত?

তার ছোট ভাইকে ত তুমি কোনদিন দেখনি!

ছোট ভাইকে দেখিনি কিন্তু দিব্যেন্দুবাবুকে ত দেখেছি।

ছেলেটি ঐ চিঠিখানা দিয়ে গেল—বলিয়া গোলাপী খামখানার দিকে দীপ্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

ওকে বসতে বললে না কেন?—বলিয়া দীপ্তি তৎক্ষণাৎ গোলাপী খাম হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া ফেলিল।

বলিলাম, নাও—এবার বোঝো, এখন কি দেবে দাও,—বোনের বিয়ে বুঝি!

দীপ্তি আমার কথার একটিও জবাব দিল না। চিঠির লেখার দিকে নজর পড়িতেই বিস্ময়ে আনন্দে দীপ্তির চোখদুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিলঃ

আরে দ্যাখো দ্যাখো—কি তাজ্জব ব্যাপার দ্যাখো!

আমি স্পষ্ট দেখিলাম দীপ্তির হাতদুটি কাঁপিতেছে। সে আমার পিছনে আসিয়া চিঠিখানা আমার চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। পড়িলাম—

আসছে ২৫শে বোশেখ আমার ছোট বোন সবিতার বিয়ে। তোমরা সকলে এসে একে সত্যিকার উৎসব করে তোলো—এই প্রার্থনা।

তোমাদেরই
দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

* ছাপা চিঠির এক কোণে দিব্যেন্দু নিজের হাতে লিখিয়াছে,—ভাই অশোক, তুমি ত আসবেই বৌদিকেও সঙ্গে করে আনা চাই। আর সব দেখা হলে—ইতি তোমার ইন্দু।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। দীপ্তিকে বলিলাম, স্বপ্ন দেখছি না ত?

কি জানি!...চল না একবার দেখে আসি।

এখনই?

হাঁ এখনই—এমন মজার ব্যাপার!

দীপ্তি বলিল বটে এখনই,—কিন্তু প্রসাধনে তার প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সুতরাং বাহির হইতেই আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

মনে করিয়াছিলাম অন্ধকার গলিতে একটা আলো-বাতাসহীন রুদ্ধ ঘরে তিন ভাই বোনের দেখা পাইব। কিন্তু দিব্যেন্দুর বাড়িতে আসিয়া আমার সে ভুল ভাঙিয়া গেল। দোতালার তিনখানা ঘর লইয়া বাড়ির একাংশে সে থাকে। বাইরের বসিবার ঘর দিব্য আধুনিক ভঙ্গীতে সজ্জিত। আমরা যাইতেই সে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈঠকখানা ঘরে তখন কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। দীপ্তিকে ভিতরে দিয়া আসিয়াই সে উপস্থিত লোকগুলিকে বলিল, আজ আমাকে ছুটী দিতে হচ্ছে, আর একদিন আসবেন আপনারা, তখন কথাবার্তা হবে।

লোকগুলি নমস্কার করিয়া একে একে বিদায় লইলে সে আমাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া চলিলঃ চিনতে পারলে বাড়ি?

হাঁ, এ ত দিব্যি সাহেবী কায়দায় রয়েছ তুমি, আমি ভেবেছিলাম,—

তুমি যা ভেবেছিলে—তাই ছিলাম, রে দাদা,—ঐ যে নীচের ঘর—মাত্র ঐ ঘরখানায় ঠাসাঠাসি করে তিনজনে থাকতাম দু'বছর আগে। এ ঘরগুলো সম্প্রতি নিয়েছি, নইলে চলে না, ভাই—এত লোকজন আসে!

তা ত দেখতেই পেলাম।

যাদের দেখলে—ওরা সব পাবলিসার—দু' একখানা নভেল নেবে বলে ঘোরাঘুরি করছে।

দীপ্তি সবিতার সহিত হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছিল। শুনিলাম সবিতা বলিতেছে, বড়দা এই ত এক মাস হল কলকাতা এসেছেন। দিব্যেন্দুকে দেখিবামাত্র দীপ্তি বলিয়া উঠিল, এই যে—মৃত্যুঞ্জয়বাবু, নমস্কার।

নমস্কার!

তার পর ব্যাপার কি—বলুন দেখি কি যোগবলে আপনি আমাদের মুখ চেয়ে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করে—মৃত্যুঞ্জয় হলেন? তাই শুনবার জন্য কাজকর্ম ফেলে পত্র পাঠ ছুটে এসেছি।

দিব্যেন্দু খাটের এক পাশে বসিয়া গম্ভীর হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিল, সে কাহিনী যেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি দীর্ঘতর, এত শীগ্গির বলা চলে না। বোনের বিয়ের পর আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার হাতের চা খেতে খেতে বর্ণনা করা যাবে,—এখন নয়। সিন্দবাদের কাহিনীর চেয়েও চিত্তাকর্ষক, আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের চেয়েও আশ্চর্যজনক সে কাহিনী নিয়ে অনায়াসে আপনি এক উপন্যাস রচনা করতে

পারবেন। আর সেই আশ্চর্য প্রদীপের বলেই আমি আপনার সেই উপন্যাস ছাপিয়ে দিতে পারব।

দীপ্তি হাসিয়া হাসিয়া বলিল, দিব্যেন্দুবাবু বেঁচে উঠলেন, শুধু বেঁচে উঠলেন নয়—অমর হয়ে উঠলেন, কিন্তু শেষে মিথ্যার আশ্রয়ে? আপনার জীবনটা তা হলে মিথ্যার জয়গান বলতে হবে!

মিথ্যা নয়, বৌদি,—সত্য। সাহিত্যের দরবারে এই উপায়ই আমার সত্য। ঠিক সময়ে সত্য পথের সন্ধান পেয়েছিলাম বলেই ত বেঁচে উঠলাম।...তা ছাড়া...তা ছাড়া—কিছু মনে করবেন না, বৌদি, ভিতরে হয়ত আমার সত্যিকার সাহিত্য কিছু ছিল, সেইটাই আমার সত্য। আর তাকে প্রকাশ করবার জন্য অহর্নিশ আমি যে অধ্যবসায় অবলম্বন করে চলেছি—সেটাও আমার জীবন সম্পর্কে কম সত্য নয়। জানেন ত—এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন?

দিব্যেন্দু তার মধুর গম্ভীর কণ্ঠে অভিনয়ের ভঙ্গীতে আবৃত্তি করিয়া উঠিল

ছাড়িস নে, ধরে থাক, ওরে হবে তোর জয়,
ঐ দেখ পূর্বাশার ভালে, নবীন বনের অন্তরালে
শুক-তারা হতেছে উদয়
ওরে, আর নাহি ভয়।

ইহার পর অনেক সাহিত্য-আলোচনা হইল। দিব্যেন্দু তাহার উপন্যাস প্রকাশের সুযোগ দিয়া কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তাহার গল্প হইল। বিশেষ আড়ম্বরের সহিত জলযোগ হইল, সবিতার বিবাহে আসিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ হইল। সবই আনন্দের।

মৃত প্রিয়জন যদি কোন যাদুমন্ত্রবলে মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে কাহার না আনন্দ হয়? তাহা ছাড়া সঙ্গে করিয়া জীবনে সাফল্য!

সেদিনকার মজলিসে ইন্দু হাসিল, সবিতা হাসিল, দীপ্তি হাসিল, আমিও হাসিলামঃ বন্ধুকে ফিরিয়া পাইলে কে না সুখী হয়?

আমাকে যদি আপনারা ঘৃণা না করেন, তবে একটা সত্য কথা বলিবঃ ইন্দু বাঁচিয়া আছে জানিয়া সুখী আমি সত্যই হইয়াছি, কিন্তু আমার দুর্ভাবনার অন্ত নাই। আপনাদের মাঝে কেহ যদি আমার মত স্ত্রৈণ থাকেন, তিনিই শুধু বুঝিতে পারিবেন—আমার বেদনা কোথায়!

মোটা

(১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

সকাল থেকে বাতাসটা নরম। বেশ মনে আছে সেই সীসের রঙের ঠান্ডা আকাশ। আনাজের গাড়ী নিয়ে মোষ দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে চুনী তাড়াতাড়ি একসেট নূতন পেয়ালাপিরিচ কিনে এনে চাদরের তলায় লুকিয়ে রাখলো। ভদ্রলোক দোকানে এসেছেন কি তাড়াতাড়ি চা করে' এনে ও সামনে ধরবে। এতে আর লজ্জা কি। বড়র কাছে ছোটর লজ্জা করার কোনও মানে হয় না যে। রাসবিহারী নিয়ে এসেছে এক প্যাকেট সিগারেট। আমরা মিনিট গুনছি আর দেখছি বাতাসের গতি। ওপাড়ার হারাধন মাস্টার বাজার সেরে এই-মাত্র ফিরে গেল। তারাপদ আজ এসেছিল চাদর জড়িয়ে। এমন সময় হঠাৎ হুড় মুড় করে' বৃষ্টি নামে, আর সত্যিই তখন দূরে দেখা দিল বাস। বাসটা আসছিল গর্জন করে' তেড়ে যেন বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আমাদের বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটোচ্ছে। গাড়ী এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়ায়। কিন্তু এমন হৈ চৈ কেন। বাস থেকে নেমে লোকগুলো এমন ভিড় করে দাঁড়াল যে! বাজারে হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই ছুটে যাচ্ছে স্ট্যান্ডের দিকে জলে ভিজে। ব্যাপার কি। আমরাই বা চুপচাপ দোকানে বসে থাকি কী ক'রে। বাইরে নেমে পড়লাম।

ব্যাপার কিছুই না। বাসে উঠতে গিয়ে পা ফস্কে যায়। মোটা মানুষ টাল সামলাতে পারে নি বিপরীত দিক থেকে একটা ট্যাক্সী এসে.........

মুখে মাথায় চাপ চাপ রক্ত। নাকটা থেঁৎলে গেছে। ভীড়ের মধ্যে কে জানি বলছিল, 'হাসপাতাল পর্যন্ত পেঁাছানো গেল না।' চাদরের তলায় চুনী তখনও নতুন পেয়ালাপিরিচ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। রাসবিহারীর কানে কানে বললে, 'জানুয়ারী মাসে নিজের গাড়ীই এসে যেতো।'

'আর গাড়ী, গাড়ী চড়া ইহকালের মতো ফুরিয়েছে।' ভীড়ের মাঝে নটবরের গলা।

চুনী কট মট করে ওদিকে তাকালোঃ 'শুয়ার, সব সময় এ রকম করতে আছে?'

'বলি রাগ কর কার ওপর, কার ওপর রাগ দেখাও চুনী-দা।' রোগা লিক্‌লিকে শরীর নিয়ে খোঁড়া এসে সামনে দাঁড়ায়ঃ 'বাবা যখন মারা গেল খোঁড়া বলে ও আমায় দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দেয় নি? একলা রাজত্ব লুটে খাবে। এখন? চাকার তলায় মোটা পেট চ্যাপ্টা হ'ল তো?

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১০]

স্নান ও আহার সারিয়া অমল আবার বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যেই সতরঞ্চির উপর একটা ধোয়া শাড়ী বিছানো হইয়াছে এবং একটি ময়লা বালিসের উপর একটি ফর্সা তোয়ালে বিছাইয়া ভদ্রলোকের মত করা হইয়াছে। ইঁহাদের যত্নে বহুদিন পরে অমলের মা-বাবার কথা মনে পড়িয়া গেল। গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী তাহার মায়ের মতই বসিয়া জোর করিয়া খাওয়াইলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছিলেন যে, কাল যেখানেই বাসা ঠিক করুক না কেন, দ্বিপ্রহরের আহার সারিয়া তবে যেন যায়, আজ কিছুই খাওয়া হইল না।

ছেলেমেয়েগুলিও ভাল। যেমন শান্ত, তেমনি ভদ্র। অন্ধকার ঘরে শুইয়া অমলের কার্তিকবাবুর কথাগুলি মনে পড়ায় শিহরিয়া উঠিল। এই অমায়িক পরিবারটিকে হয়ত সত্যই একদিন পথে বসিতে হইবে; ইঁহাদের দয়া-স্নেহ-মমতার জন্য পৃথিবীর নিকট হইতে একবিন্দু করুণাও পাইবার সম্ভাবনা নাই—। মানুষের দেনা-পাওনার সম্পর্ক সমস্ত বিশ্বের সহিত, পাওনার চেয়ে দেনা বেশী হইলেই আর তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।

পরের দিন সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে ধুইতেই ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় তেমনিই আছে, শুধু মুখে দুশ্চিন্তায় কয়েকটি গভীর রেখা পড়িয়াছে মাত্র।

সে নীরবে আসিয়া অমলের পাশে বসিয়া পড়িল। কি হইল, কেন অমল এমন শুধু হাতে ফিরিল, কোন কথাই জানিতে চাহিল না; নিজের দুর্ভাগ্য দিয়া পরের দুঃখের গভীরতা সে মাপিতে শিখিয়াছে, নীরব সহানুভূতিতে এই কথাটাই শুধু বুঝাইয়া দিল।

একটু পরে অমলই কথা কহিল, বলিল স্কলারশীপটা রাখতে পারলেন না?

ইন্দু একটা ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল, না, বড্ড অভাব অমলদা, ক্ষিধেতে পেট জ্বলত, মাথা ঘুরত—পড়াশুনা আর মাথায় ঢুকত না। কিন্তু তবুও এতটা যে খারাপ হবে, তা ভাবিনি। শেষদিনটা পরীক্ষা দিতে গিয়ে কি যে মন খারাপ হয়ে গেল, মনে হল সব বৃথা, জীবনে এ-সবের কোন দাম নেই।......আর কিছু লিখতে পারলুম না।

ইন্দু কহিল, আমাকে পড়াবার ক্ষমতা মামার নেই; এখন চাকরি খোঁজা ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু তাই বা কৈ? এই দু-তিন মাস কলকাতার মেসে থেকে চাকরি খুঁজছি, মামাকে ত কিছু পাঠাতে হচ্ছে, সেই ক'টি টাকা পাঠাতেই তাঁকে কি কষ্ট পেতে হচ্ছে তাও বুঝছি। কিন্তু উপায় কি বলুন! একটি দশ টাকার টুইশনি, এই ত ভরসা।

অমল চুপ করিয়া রহিল, কি-ই বা জবাব দিবে?

ইন্দু পুনশ্চ কহিল, আপনি এখন কি করবেন?

অমল কহিল, একটা বাসা-টাসা খুঁজে নিতে হবে। তারপর যাব আমার সেই পুরানো ছাত্রের বাড়িতেই—কিন্তু সে কি আর এখনও আছে?

ইন্দু কহিল, আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না? আমরা যদি একটা খুব সস্তার ঘর দেখে নিয়ে দুজনে একসঙ্গে থাকি? আর নিজেরা রেঁধে খাই? তাহলে বোধ হয় আমাদের এই আয়েতেই চলে যায়।

অমলের মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, সে ত বেশ হয়। আমি তাহলে বেঁচে যাই ইন্দুবাবু, একলা এত অসহায় মনে হয় নিজেকে, দুজনে হলে তবু এক সঙ্গে 'ফাইট' করা যায় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে—

ইন্দু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাহলে চলুন এখনই বেরিয়ে পড়ি। আজই একটা বাসা ঠিক করে ফেলা যাক্—

এই সময়ে গঙ্গাধরবাবুর কন্যা দুইটি রেকাবীতে কিছু মুড়ী, বাতাসা, আর দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল। অমলের বন্ধু আসিয়াছে, এ কথাটি গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রীর দৃষ্টি এড়ায় নাই।

ইন্দু বিস্মিত দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিল, অমল কহিল, অনেকদিন বাড়ি থেকে বেরবার পর আবার মা খুঁজে পেয়েছি ইন্দুবাবু, কিন্তু আমারই মা—দুর্ভাগ্যের দিক দিয়ে অন্তত।

তাহার পর মুড়ী খাইতে খাইতে অমল গতকল্যকার ইতিহাস ইন্দুকে সব খুলিয়া বলিল। ইন্দু কহিল, কার্তিকবাবু লোকটিকে আমারও খুব খারাপ বলে মনে হয় না। আজ ভদ্রলোক রাত থাকতে গিয়ে ডেকে তুলে আপনার খবরটি শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু সব কথা সেরে বেরবার সময় ঐ এক কথা—'আসছে শনিবার একটা সিওর টীপ ভাই, দুটি টাকা উইনে ফেলে দাও, দশটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবে!' আশ্চর্য, না?

অমল উন্মনা হইয়া কহিল, আশ্চর্য কিছুই না ইন্দুবাবু—সমস্ত রকমের দোষ আর গুণ মিলিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ তৈরী, এর মধ্যেই সব আছে!......

জলযোগের পর দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল; বাসা খুঁজিবার জন্য। কিন্তু শহরের প্রায় তাবৎ সরকারী প্রস্রাবখানা ও গ্যাসপোস্ট দেখিয়াও তাহাদের মনের মত বাসা পাওয়া গেল না। ঘরের ভাড়া তাহাদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশী ...নে সস্তার মেসের সস্তার সীটও পছন্দ হয় না। শেষ সাফ... বেলা দ্বিপ্রহরের পর ছুতারপাড়ার নিকট একটি মারুচিসং... তাহারা ভাড়া ঠিক করিয়া ফেলিল। সীমেণ্টে ভাল ...মাটির দেওয়াল এবং খোলার চাল। কিন্তু ঘরটি ...লের গ্রন্থ...কে, রাস্তার দিকে দোর বসান এবং জল-কলে... ...ছে; ভাড়া চার টাকা। শুধু তাহাই নয়,

পূর্ববর্তী কোন্ এক ভাড়াটিয়া দুইটি আমকাঠের চৌকী ফেলিয়া গিয়াছে, সে দুটিও পাওয়া যাইবে।

অমল নিজের পকেট হইতেই চার টাকা অগ্রিম দিয়া ঘর সেইদিন হইতেই ভাড়া করিল এবং আহারাদির পর সামান্য শয্যা কিনিয়া আনিয়া সেই রাত্রেই ঘরে চলিয়া আসিল। গঙ্গাধরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বার বার বলিয়া দিলেন, যখনই অসুবিধা হবে, এখানে চলে এস, লজ্জা ক'র না।

গঙ্গাধরবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা বিপুল দেনা, রাত্রে দেনার চিন্তায় ঘুম হয় না; মরমে মরে রয়েছি। নইলে তোমার মত ছেলেকে দুটোদিন থাক্‌তে বলতে কি ইচ্ছে করে না? কি করব—ভগবান মেরে রেখেছেন!

ইন্দুও পরের দিন মেসের দেনা-পাওনা চুকাইয়া চলিয়া আসিল। দুজনে অপটু হস্তে রান্না করিয়া খাইতে লাগিল এবং আশা করিতে লাগিল যে, এদিন হয়ত শীঘ্রই কাটিবে।

দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি।

অতি মন্থরগতিতে তাহাদের দুঃসহ দিনরাত্রি কাটিতে লাগিল। কিছুই হয় না। কোনদিনই দৈবাৎ তাহাদের কোন সুসংবাদ আসে না। অতিকষ্টে উপার্জিত এবং আত্মাকে বঞ্চিত করা পয়সা হইতে শুধু মধ্যে মধ্যে স্ট্যাম্পের পয়সা বাজে খরচ হয় মাত্র। কেরানীর কাজ, টুইশন, ভদ্রভাবে অর্থ উপার্জনের যত পথ আছে, সবগুলিতে মাথা ত ঠুকিলই, এমন কি থিয়েটার ও বায়স্কোপের গার্ডের চাকরির জন্যও দরখাস্ত করিতে ত্রুটি করিল না; কিন্তু পরে বুঝিল তাহাতেও সুপারিশের প্রয়োজন হয়। অমলের পুরাতন টুইশনটি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই শুধু গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব হইতেছিল।

অবশেষে ইন্দুর মুখে স্পষ্ট হতাশা ফুটিয়া উঠিল। সে আর পারে না। মাঝে মাঝে অমলকে বলে, অমল দা, ভাল খাবারের অভাবে এত কষ্ট হয়, তা আগে ভাবতে পারি নি! ভাব্‌তুম যে, ওটা ছেলেবেলাকারই ব্যাপার, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের লোভটা অন্য লোভে দাঁড়ায়। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি ভাল খাবারের জন্য পরিণত বয়সের লোকের মনও ঠিক শিশুর মত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে! এক এক সময়ে আমি খাবারের দোকানের সামনে দিয়ে চল্‌তেই পারি না।

অমল চুপ করিয়া শোনে। তাহার লোভ ও কামনার উৎসমুখ কে যেন নীরেট পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার মনে হয় তাহার আত্মা যেন বহুদিন উপবাসী, ক্ষুধার্ত হইয়া আছে।

একদিন, কি একটা লগন্‌সা সেদিন, অমল সহসা সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এই ইন্দুবাবু, ফরসা কাপড় আছে?

ইন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, আছে, কেন?

অমল কহিল, কাপড় জামা পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, চলুন কোথাও একটা নেমন্তন্ন খেয়ে আসা যাক্—

ইন্দু আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, তার মানে?

অমল কহিল, আজ অনেক বিয়ে, কোনখানে ভীড় বেশী দেখে ঢুকে পড়া যাক্, কে আর চিনবে?

নিমন্ত্রণ অর্থে সুখাদ্য; লোভে ও ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ইন্দু প্রশ্ন করিল, যদি ধরে ফেলে?

অমলও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, কে ধরবে? পাগল! বরযাত্রীরা মনে করবে কন্যাপক্ষের লোক, কন্যাপক্ষরা মনে করবে বরপক্ষের—চলুন, চলুন।

সত্য-সত্যই দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। খানিকটা ঘুরিয়া একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে ভীড়ের মধ্যে ঢুকিল। উৎসবের সমারোহ দেখিয়া মনে হইল বড়লোকের বাড়ি, অভ্যর্থনার বিশেষ ঝঞ্ঝাট থাকিবে না। কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই একটি ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া কহিলেন, আসুন, আসুন......এই যে এদিকে—

ইন্দুর মুখের অবস্থা কল্পনা করিয়া অমল তাহার হাত ধরিয়া এক রকম টানিয়া লইয়া একটু ভীড়ের মধ্যে গিয়া বসিল। তাহার পরের ঘটনা নিতান্তই সাধারণ এবং স্বাভাবিক। গোলাপ জল, গোলাপের 'বোকে' প্রীতি-উপহার ও সর্বশেষে ভোজ। আহার্যের সুগন্ধে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল, সে একাগ্রমনে খাইয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর ভীড়ের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসা আরও সহজ। কেহ লক্ষ্য করিল না পর্যন্ত। কিন্তু ফিরিবার পথে নিঃশব্দে পথ চলিতে চলিতে অমল কহিল, কোন ভদ্রসন্তান যে এমন চুরি ক'রে নেমন্তন্ন খেতে পারে, তা কি বছর দুই আগেও ভাবতে পেরেছিলেন? কোথায় নেমে এসেছি আমরা বুঝতে পারেন?

ইন্দুর মনে তখনও সুখাদ্যের রেশ ছিল, সে একটু ক্ষুণ্নস্বরে কহিল, ওদের হয়ত এমনিই কত ফেলা যাবে—

অমল কহিল, তা যাক্—তাতে আমাদের অপরাধ লঘু হয় না। হয়ত মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে।

ইন্দু আর কথা কহিল না। কিন্তু তাহার পেটের মধ্যে লুচী ও মাছ মাংস যেন তাল পাকাইতে লাগিল।

অমল একটু পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যাক্‌গে, ওসব ভেবে লাভ নেই, অবস্থাকে মেনে নেওয়াই ভাল। (ক্রমশ)

রূপবাণীতে—'অভিনেত্রী'

নিউথিয়েটার্স: প্রধান ভূমিকায়, পাহাড়ী, কানন, শৈলেন, ইন্দু প্রভৃতি। পরিচালক অমর মল্লিক। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "শুভযোগ" কাহিনী অবলম্বনে।

অভিনেত্রীর জীবনে কি প্রেম সম্ভব? অথবা প্রেমাভিনয়ে কি আন্তরিক প্রেম জন্মায়?

প্রেমের দৈহিক ও মানসিক সংজ্ঞা নির্দেশের বিতর্ক থাকুক, আমাদের কল্পনায় যে একটা ধোঁয়াটে অস্পষ্ট প্রেমানুভূতি আছে তাহা সর্বজনীন কিনা এই প্রশ্নের উত্থাপন অথবা জবাব গ্রন্থকার দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সিনারিওটি মূল কাহিনীর "অবলম্বনে" রচিত; কাজেই মৌলিক তথ্যটি কতখানি নির্মূল হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গ আমরা এখানে তুলিব না। অমর মল্লিকের পরিচালিত কাহিনীটিই বলি। এক পালিতা কন্যা—অভিভাবক এক থিয়েটারের মালিক। পালিতা কন্যার বড় ইচ্ছা অভিনেত্রী জীবন যাপন করে। প্রথম আবির্ভাবেই প্রচুর প্রশংসা অর্জিত হয়। অভিভাবক ও থিয়েটারের মালিকের মনে যেটুকু নৈতিক বা ব্যবসায়িক সংশয় বাষ্প ছিল তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। থিয়েটার গৃহের নাম রবি। শহরে আরও একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গমঞ্চ আছে—তাহার নাম বীণা। সেখানে এক বিখ্যাত অভিনেতা আছে। তাহার নাম পরেশ মিত্র। রবি থিয়েটারে পালিতা কন্যা সুরমার আবির্ভাবের পর দর্শকশ্রেণীর মনে ইহাদের যোগাযোগের স্বপ্ন জাগিল। তাহাই সংক্রামিত হইয়া লেখক ও পরিচালকবর্গকে আচ্ছন্ন করিল। লেখকের তাড়ায় পরেশ সুরমার এক অভিনয় দেখিয়া আসিল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রশংসাও করিয়া আসিল। বীণা থিয়েটারের মালিক ও লেখক সুরমাকে বীণা থিয়েটারে আনিবার জন্য এক মিথ্যা চায়ের পার্টী দিল; সুরমা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। পরেশের নামে ডাকা চায়ের পার্টির এই পরিণতির খবর পাইয়া পরেশ ক্ষুব্ধ হইল ও বীণা থিয়েটার ছাড়িয়া রবিতে যোগ দিল। "এইরূপে প্রণয় জন্মিল"! বিবাহের প্রস্তাব আসিতেই অভিভাবক ও মালিকের বিপরীত দ্বন্দ্ব দেখা দিল—কেননা, বিবাহের পর ইহারা থিয়েটার ছাড়িতে চায়। মালিকের "পিতৃস্নেহ" ও "ভবিষ্যৎ সর্বনাশ" এই বিবাহে বিঘ্নস্বরূপ হইল—পরেশ বিবাগী ও সুরমা রোগাক্রান্ত হইল। রবি থিয়েটার নিলামে যায়—বীণা থিয়েটার উঠিল বলিয়া। পরেশের ডাক পড়িল। "মহামানবতার" আহ্বানে পরেশ বীণা থিয়েটারে আসিয়া শুনিল, রবি থিয়েটার নিলামে আর সুরমার অবস্থা শঙ্কাকুল। পরেশের পূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসের বেগে সব কিছুই ভিন্ন পথ গ্রহণ করিল। সুরমা ও পরেশের মিলন হইল।

উপেনবাবুর লেখা। নামী লেখক। দেখিলাম তিনি অখ্যাতির জন্যও প্রস্তুত। আমরা উপরে যে মনস্তত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি কাহিনী ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিকশিত হয় নাই। গৃহস্থ ঘরের শিক্ষিতা মেয়ের রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ ও সমর্থনের মোটা দাগ কাহিনীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত বিবাহের পরও রঙ্গমঞ্চে থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্নের জবাবে প্রেম নহে, অবস্থাবৈগুণ্যই প্রাধান্য পাইয়াছে। কন্যাটি পালিতা—আত্মজা নহে। রঙ্গমঞ্চ আর্টের সাধনায় যথেষ্ট ভদ্রস্থ হইয়া উঠে নাই, এ খবর অভিভাবক ও মালিকের জানা ছিল। তবু মেয়ের এই "অসামাজিক" ইচ্ছায় তিনি "চিত্রস্থলে" অনায়াসেই সম্মতি দিলেন। বীণা থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তথায় বিখ্যাত পরেশ মিত্তিরের উপস্থিতিটা কাহিনীর পরিপুষ্টির জন্য। পরেশের সহিত সুরমার একদিনের সাক্ষাৎ—এই সাক্ষাৎ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব—যেখানে পর্দার দারোয়ান পাহারা দেয় না। কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া বীণা থিয়েটারের মালিক ও নাট্যকার সুরমাকে নিমন্ত্রণ করিল। সুরমা অন্তর দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইহাতে সায় দিল। পরেশের অনুপস্থিতি নৈরাশ্য জন্মায়—সাক্ষাতে ক্রোধ হয়—পরেশের ত্বরান্বিত কৈফিয়ৎ অনুরাগের সঞ্চার করে। তারপরই একই মোটরে চড়িয়া গ্রামে গ্রামে রেঁদেভু!.........

পরেশের গ্রাম্য বাড়ীতে এক বৃদ্ধ চাকর—চাকর তো নয় অভিভাবক—অভিভাবকও নহে—একেবারে অ্যাপ্লায়েড সাইকো-লজির একটি ওস্তাদ। পরেশের মন সে জানে, পরেশ কাহাকে চায় তাহাও সে জানে এবং কোন্ গানখানি পরেশের মনে একাধারে আঘাত ও সাড়া দিবে তাহার সমস্ত খবরই সে রাখে। সে একে-বারে বিছানাপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত।........

"সতীসাধ্বী বারাঙ্গনা"র অন্তস্তলে 'প্রেমের নিকষিত হেম' খুঁজিয়া ফেরার রেওয়াজ আমাদের শরৎচন্দ্র অভূতপূর্ব দরদের সঙ্গে প্রবর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে সে কথা খাটে না। এই কাহিনীর নায়িকার পিতৃ পরিচয় বা মাতৃ রক্তধারা জানিবার উপায় নাই, তাই ইহার বংশানুক্রমিক শোণিতবেগ বলিবার পথও নাই। কাহিনীটিকে খণ্ডভাবে গ্রহণ করিলে অভিভাবিকাহীনা এই মেয়েটিকে কতকাংশে স্বাভাবিক বলা চলে। কাজেই ইহার প্রণয়ও একপ্রকার স্বাভাবিক খাতেই ফিরিয়াছে। অভিনেত্রী জীবন সে গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু অভিনেত্রী বলিতে যে একটা দুষ্ট অনুভূত আমাদের মনে জাগে তাহা এস্থলে জাগিবার কথা নহে। এরূপ ভালবাসার প্রশ্রয় আমাদের উর্ধতন সমাজে এক প্রকার চলিয়াই গিয়াছে। কিন্তু 'অভিনেত্রী' শব্দটির সহিত সংশ্লিষ্ট ভাব আমাদিগকে পূর্বাহ্নেই বিভ্রান্ত করে। যে অভি-নেত্রী ছিল না সে অভিনয়কে আশ্রয় করিয়া দয়িতকে পাইল, তাই প্রেমোচ্ছ্বাসে রঙ্গমঞ্চকে ভুলিতে পারিয়াছিল। অভিভাবকের প্রতি কৃতজ্ঞতা—সেও নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের বিবেকাঙ্কুশ। কাজেই আলোচ্য অভিনেত্রীর জীবনে আমাদের সমাজদৃষ্টিতে যাহা বাঞ্ছনীয়, এক অভিনয় ছাড়া, সবই ছিল। সেদিক হইতে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর কাহিনী। সুরমার মনে গৃহী মনটি যেন বরাবর অক্ষুণ্ণ আছে; তাই গ্রাম ও গ্রাম্যজীবনও তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, সুরমার এই সুন্দর সহজ চরিত্রটিকে 'অবলম্বন' করিয়া পরিচালকের 'অভিনেত্রী জীবনের' ওকালতিটি আমাদের কানে অপ্রাসঙ্গিক ঠেকিয়াছে। গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা স্টেজে আসিতে যে কারণে ভয় পায় সে কারণের সমূহ অবসান না হইলে এই নিমন্ত্রণের মধ্যে সদবুদ্ধির অনস্তিত্বই প্রমাণিত করে। আর্ট সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞানতা, অভিনয় ও বিশেষ বিশেষ উপাদানের যোগাযোগ, বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা ও আব-হাওয়ায় 'আসুন' বলিয়া আহ্বান জানাইলে.........জানাইলে তাহার অর্থ কি হয় নাই বলিলাম।

ছবিটি ব্যর্থ হইয়াছে দুইটি কারণে। প্রথমত গল্প নাই, দ্বিতীয়ত কাননকে অভিনয় করিবার কোন সুযোগই দেওয়া হয় নাই। 'বিদ্যাপতি'র গৌরব কাননের অভিনয়, 'পরাজয়' চিত্র কাননকে exploit করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাহা মার খায় নাই। কিন্তু 'অভিনেত্রী'তে পরিচালক ভুল করিয়াছেন সেইখানেই। ছবিটির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কাননকে তাঁহার অভিনয়কুশলতা দেখাইবার সুযোগ না দিয়া পরিচালক যে ভুল করিয়াছেন তাহার ফলেই ছবির এই দুর্দশা। অভিনয়ের যতটুকু সুযোগ কাননকে দেওয়া হইয়াছে তাহা তিনি সাফল্যের সহিত দেখাইয়াছেন। তাঁহার সংযত অভিনয় রুচিসঙ্গত ও প্রশংসনীয়। পাহাড়ীর অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অমর মল্লিক ও পাহাড়ী সান্যালের গ্রন্থ ও ভূমিকা নির্বাচনে বুদ্ধির পরিচয়

পাওয়া যায়। বড়দিদি ও আলোচ্য কাহিনীটিই তাহার প্রমাণ। অন্তত নামী লেখকের কাহিনী গ্রহণ করার এই সুবিধা যে কাহিনীর সমালোচনা তত তীব্র হয় না; পাহাড়ী ভূমিকা গ্রহণের মধ্যেও সেই সুরেন পরেশে উঁকিঝুঁকি মারে। স্বভাবতঃই চরিত্র দুইটি আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদী চরিত্রের দিকে প্রমথেশ বড়ুয়ারও খুব ঝোঁক। সমাজের সংগে সুসমঞ্জস আদর্শবাদের প্রচার সুস্থতারই লক্ষণ। কিন্তু যে জায়গায় অভিনয় শুনিয়া পরেশের মুগ্ধ হইবার কথা, সেই দৃশ্যটি পরিচালক একেবারেই ফুটাইতে পারেন নাই। লেখক হয়তো এরূপ ঘটনা সমাবেশ লিখিয়াই মুক্তি পাইয়াছেন কিন্তু তাহাই চিত্রায়িত করিয়া পরিচালক একেবারে ব্যর্থ হইয়াছেন। এ যেন সেই শিশুদের মানুষ আঁকা—অংকনের চাইতে কল্পনার কসরৎই বেশী। ভাবিয়া লইতে হয়, এ জায়গায় পরেশ সুরমার অভিনয়ে মুগ্ধ হইল। কাননের গাওয়া গানগুলিতে সুরের বৈচিত্র্য নাই, নিতান্ত মামুলী ও একঘেঁয়ে। কেবল কাননের কণ্ঠমাধুর্যের গুণেই তাহা কোনরকমে উৎরাইয়া গিয়াছে। সমস্ত অভিনয়ে পরেশ ও সুরমার একটি মাত্র ডুয়েটই ভাল হইয়াছে। শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জির স্ব স্ব ম্যানারিজম এখন মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। জীবন-মরণের শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জি যেন এখানে প্রতিফলিত হইয়াছে, প্রতিফলনের বক্রতাটুকুই মাত্র ব্যতিক্রম। ইহাদের সকলের থিয়েটারী ঢঙে অতিসাধারণ কথা বলা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং তাহা সন্তোষ সিংহের অভিনয়ে একেবারেই অসহ্য। এই ভদ্রলোক অভিনয়কে স্বভাবে পরিণত করিবেন কি, স্বভাবকেই অভিনয়ে পরিণত করিতেছেন। রঙ্গ-মঞ্চের এই কৃত্রিম বোলচাল ও ক্যামেরা চেতনা না গেলে আমাদের দেশের অভিনয়োন্নতি অসম্ভব এবং যতদিন ইঁহারাই অভিনয় একচেটিয়া করিয়া রাখিবেন ততদিন এতটুকু ক্ষীণরশ্মিও চোখে পড়ে না। আমরা স্বীকার করি কাতুকুতু দিলেও মানুষ হাসে, কিন্তু কাতুকুতু যখন আঁচড়ে পরিণত হয় ও নখচ্ছেদনে রক্তপাত হইতে থাকে তখন?—তখন যে চোখের জলরোধ করা দায় হইয়া পড়ে! তাই একদল ভাঁড়কে নাচাইয়া গান গাওয়াইয়া যে বীভৎসরসের সৃষ্টি করা হয় তাহা পরিচালকের পক্ষে আত্মতুষ্টির কারণ হইলেও দর্শকসমাজকে ব্যংগই করা হয়। আর সেই ভাঁড়ামোর জন্য বাঙলার রংগমঞ্চ যেন একদল স্থায়ী অতি-পরিচিত মুখ একচেটিয়া অধিকার করিয়া আছে। বাঙালীর রসবোধ যে এত স্থূল হইয়া পড়িয়াছে তাহা দর্শক সমাজের চাইতেও পরিচালকই বেশী জানেন বলিয়া মনে হয়—নতুবা পুরুষে মাজা দুলাইয়া অপরের থুৎনী ধরিয়া নাচিলে আজও হাসি পায় একথা কে ভাবিতে পারিয়াছিল। ছি! এই অকৃতিত্ব লইয়া বাঙালীর চিত্রপ্রতিষ্ঠান অবাঙালীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে? একটা কথা উঠিয়াছে। অবাঙালীর সমবেত অর্থ ও প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সমাবেশ বাঙলার চিত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে। কথাটা সত্য, কিন্তু তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইলে বাঙালীর চিত্রকে আরও উন্নত স্তরে লইতে হইবে। কাহিনীতে, সংগীতে, অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচনে আরও দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হইবে।

অনাবশ্যক ভাঁড়ামিটুকু বাদ দিলে এই চিত্র আমাদের মোটামুটি ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই পরিচালনার এই ত্রুটিও আমাদের মনে জাগিয়াছে। এরূপ নায়ক-নায়িকার সমাবেশ ও ভূমিকা নির্বাচনের দক্ষ দৃষ্টি থাকিলে উৎকৃষ্টতর চিত্রোৎপাদন খুবই সম্ভব। ভাল লেখক বাঙলাদেশে বিরল নহে, ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যাও বাঙলাতেই বেশী, বাঙলাদেশ দরিদ্র এমনও নহে—তবুও যে কাহিনী পরিচালনা ও অভিনয় ভাল হয় না তাহার কারণ সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতা ও লালফিতার নিষেধাত্মক গণ্ডী। ইহা কাটাইয়া উঠা কি এতই অসম্ভব?

ছায়ালোকের টুকিটাকি

চিত্ররথ

সুটিং। ডিরেক্টার স্টপ-ওয়াচ হাতে রিহার্সেল দেওয়াচ্ছেন। নায়ক অভিনয় করচে—আনমনে চলেছে সে ধীরে—shotটা দেখা গেল ত্রিশ সেকেন্ড হবে। ডিরেক্টার বল্লেন—make it twenty seconds!

......'বলেন কি।' ভয়ে ভয়ে সহকারী বল্ল, তাহলে যে চলাটা ধীরে না হয়ে দৌড়ে হবে। অস্বাভাবিক মনে হবে না।'

ধম্কে উঠ্ল ডিরেক্টার। মুখ ভেংচিয়ে বল্ল—'আজ্ঞে না! 'শ্রী'তে 'অভিনব' ছবিখানা দেখেচো! মোটা নির্মল বাড়ুজ্যে কী speedএ অভিনয় করেছে! কি তারিফ দেখ্চো তার? দর্শক, কাগজের সমালোচক কে না বল্চে, 'অভিনবের' মত এমন সুন্দর অপূর্ব অভিনয়, গল্পের অমন speed ডাইরেক্সনের এমন কেরামতি আগে দেখেনি!'

ডিরেক্টার মহাশয়ের বক্বকানি অভ্যাসটা একটু বেশী। তিনি speed & inspirationএর মাথায় বলেই চল্লেন—'জানো, গল্পের এই অদ্ভুত speed—এই অপূর্ব অভিনয় কি করে সম্ভব হয়েছে? দেখেছো ছবিখানা? সরমে জড়িতা আঁখি নায়িকা এমন ধীরে ধীরে মাথা লজ্জায় নত কর্ল যেন মনে হল, ভূতে হঠাৎ ঘাড়টা মুচ্ড়ে দিল, ঘাড়টা মড়্মড়্ করে ভেঙে পড়ল। কি quick অভিনয়! কী speed! কেউ স্বাভাবিক চলাফেরা করে না, সব হাওয়াই জাহাজের Rocketএ চলেছে।

'সেরেফ্ speed! নির্বাক যুগে সেকেণ্ডে ছবি উঠ্তো ষোল-খানা করে! এখন ওঠে চব্বিশখানা করে। দেড়গুণ speedএ উঠচে; কিন্তু তোমাদের আর্টিস্টরা কি অভিনয় দেড়গুণ speedএ করচে?—না। তাই সব অভিনয় slow—গল্প slow। 'অভিনব' চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েচে, নির্বাক যুগে যে ছবিখানা মিনিটে ষাট্ ফুট করে চল্ত সে ছবিখানাকে এখনকার যুগের মিনিটে নব্বুই ফুট করে চলা প্রজেক্শন মেশিনে চাড়িয়ে দেওয়ায় দেখো কি অদ্ভুত result পাওয়া গিয়েছে! এ যুগটাই speedএর যুগ হে।

ধর! সৈন্যেরা slow march করে চলেছে। তুমি সেকেণ্ডে ষোলখানা হিসাবে তার ছবি নিলে এবং আজকালকার projection machineএ যাতে সেকেণ্ডে চব্বিশখানা করে ছবি চলে তাতে চালিয়ে দিলে। পর্দ্দায় কি দেখ্বে?

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'মনে হবে না যে সৈন্যরা দৌড়ুচ্ছে?' গর্বিত পরিচালক জবাব দিলেন, 'হাঁ। শুধু মনে হবে কেন? দেখ্বেও তাই। কিন্তু তবু তারিফ্ করে বল্বে—আহা! কী চমৎকার slow march দেখালো! অপূর্ব! অদ্ভুত।'

* * * *

ভারতবর্ষ রূপকথার দেশ! এখানে রাজপুত্তুর আসেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। রাজকন্যা থাকেন সাতসমুদ্র তের নদীর ওপারে। নয় কি?

সাইগল নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা ছবির নায়ক। অশোককুমার বোম্বে টকিজের হিন্দি ছবির!

লীলা চিৎনীশ বাঙলার হৃদয়ে রাসলীলা খেল্চে। কানন বোম্বের হৃদয় কাননে গুলবাগিচা।

পণ্ডিত সুদর্শন, এম এম বেগ, কে এস দরিয়ানীর লেখা ছবির গল্প অনুবাদিত হয় বাঙলা ছবির জন্য। বোম্বে, হিন্দি ছবির জন্য নেয়—শরদিন্দু বাড়ুজ্যে, গজেন মিত্তির, নিরঞ্জন পালের বাঙলা গল্প এবং প্রয়োজন মত না বলে অনুবাদ করে বঙ্কিম চাটুজ্যে ও শরৎ চাটুজ্যের লেখা!

রবীন্দ্রনাথ যে universal! তাই তাঁর লেখা গল্প ছবির জন্য কোন দেশেই চলে না!

আজ-কাল

অনশন ধর্মঘট

বাংলা গবর্মেণ্টের ইস্তাহারে প্রকাশ, গত অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে রাজবন্দীরা বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার জন্য কতকগুলি দাবী জানান এবং দাবী পূরণ না করলে অনশন ধর্মঘট করবেন বলেও জানান। গবর্মেণ্ট তাঁদের দাবী সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে গত ২৫শে নবেম্বর নিম্নোক্ত ১৫ জন বন্দী অনশন ধর্মঘট করেছেনঃ—(১) শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, (২) শ্রীঅনিল গাঙ্গুলী, (৩) শ্রীধরণী গোস্বামী, (৪) শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশ, (৫) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী, (৬) শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (৭) শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্তী, (৮) শ্রীআশুতোষ কাহালী, (৯) শ্রীরাধাগোবিন্দ ভঞ্জ, (১০) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক, (১১) শ্রীশ্রীপতি নন্দী, (১২) শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী, (১৩) শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ, (১৪) শ্রীচারুবদন চক্রবর্তী ও (১৫) মৌলবী আব্দুল হালিম।

ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত বিচারাধীন কয়েদী শ্রীমনি-মোহন ঘোষ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ ও শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলীও ২৫শে তারিখে অনশন করেছিলেন কিন্তু তাঁরা ২৬শে তারিখে অনশন ত্যাগ করেছেন।

গত ২৯শে নবেম্বর থেকে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু অনশন ধর্মঘট করেছেন। তিনি এখনও অনশন অবলম্বন করেই আছেন। শ্রীশ্রীপতি নন্দীকে জোর করে খাওয়ানো হয়েছে। তিনি জেল হাসপাতালে আছেন। বন্দীদের অনশনের সংবাদে দেশবাসীর মধ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন

সম্প্রতি গান্ধীজী ফরোয়ার্ড ব্লকের অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীমুকুন্দলাল সরকারের পত্রের উত্তরে যে পত্র লিখেছেন, তাতে তিনি তাঁর বর্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রায় সব কথাই বলেছেন। কাজেই এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বোঝার দিক দিয়ে পত্রখানার বিশেষ গুরুত্ব আছে। পত্রের অনুবাদ নীচে দেওয়া গেলঃ—

"বক্তৃতা ও লেখার স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়েই যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেক সমস্যার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের কথা জড়িত আছে। প্রথম যখন এই আন্দোলনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন দু'তিনজন ব্যক্তির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর তা ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির সদস্যদের মধ্য থেকে আমার নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসারিত করা হয়েছে। এরপর অবস্থা বুঝে এবং প্রত্যেক কাজের ফলে আমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তদনুসারে একে যত ইচ্ছা প্রসারিত করা চলবে। আমি প্রাদেশিক, জেলা, জির্গা অথবা তালুক এবং শেষে পল্লী কংগ্রেস কমিটিগুলির কার্যকরী সমিতির ও সভ্যদের তালিকা শ্রেণী বিভাগ করে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছি। এ আন্দোলন যতই প্রসারিত করা হউক না, একে কখনও গণ-আন্দোলন করা হবে না। যতদূর আমি বুঝতে পারছি তাতে এ সব সময়ই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহেই নিবদ্ধ থাকবে এবং যাঁরা আমার নির্দিষ্ট সর্তগুলিতে বিশ্বাসী এবং তা পালন করতে প্রস্তুত তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে যাঁদের কারাদণ্ড হয়েছে তাঁদের মধ্যে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী বি গোপাল রেড্ডী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। মধ্য প্রদেশের পূর্বতন মন্ত্রী ও অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রী টি প্রকাশমের হয়েছে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রী জি ভি মাভলঙ্করকে ভারতরক্ষা বিধানের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিহারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। যুক্ত প্রদেশের পূর্বতন মন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজুর দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ও ৭৫০, টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা কুমারী মনিবেন প্যাটেলের প্রতি ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। মাদ্রাজ পরিষদের সদস্যা শ্রীমতী জি আম্মান্না রাজাকে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০, টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে আরও ৬ মাস কারাভোগ করতে হবে। শ্রী জি এস গুপ্ত এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ টি বিশ্বনাথমের হয়েছে ১০ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০, টাকা জরিমানা। জরিমানা অনাদায়ে তাকে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। মধ্য প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ঘনশ্যামদাস সিংহ গুপ্ত এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। পুণা জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভি সাথের এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মিঃ ভি ভি গিরি ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। পাঞ্জাব পরিষদে কংগ্রেসী দলের ভূতপূর্ব নেতা ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে ভারত রক্ষা বিধানের ২ ধারা অনুসারে আটক রাখা হবে। মধ্য প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লকেও এক বৎসরের জন্য আটক রাখা হবে। বিহারের মুসলিম গণ-সংযোগ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা মিঃ মনজুরাসান আজাজীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ও মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীকুমারচন্দ্র জানা এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। যুক্ত প্রদেশে শ্রী আর এস পণ্ডিত ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। জব্বলপুরে শেঠ গোবিন্দদাসের হয়েছে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড। অনাদায়ে তাঁকে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট উড়িষ্যার শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব, উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীবোধরাম দোবে ও শ্রীমতী সরলা দেবী এম-এল-এ যথাক্রমে এক বৎসর কারাদণ্ডে, এক বৎসর কারাদণ্ড ও ৫০০, টাকা অর্থদণ্ডে (অনাদায়ে আরও ২ মাস), ৯ মাস কারাদণ্ডে ও ৯ মাস কারাদণ্ড ও ১০০, টাকা অর্থদণ্ডে (অনাদায়ে ৪ মাস) দণ্ডিত হয়েছেন। বোম্বাই গবর্মেণ্টের ভূতপূর্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রী টি আর নেস্বী এম-এল-এ'র এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। মাদ্রাজে ভূতপূর্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রী বি বাপিনিডুর এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীশঙ্কর রাও দেও-এর হয়েছে দেড় বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

রাজস্ব বিল

বড়লাট অতিরিক্ত রাজস্ব বিলে সম্মতি দিয়েছেন। এই বিল সম্মতির তারিখ থেকেই কার্যকর হবে।

গ্রেপ্তার কারাদণ্ড ইত্যাদি

গত ২রা জুলাই আলবার্ট হলে এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এম এল এ ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে অভিযুক্ত হন। গত ২৮শে নবেম্বর প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

গত ২১শে ও ২২শে নবেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ আপত্তিজনক মনে করে যুক্ত প্রদেশ গবর্মেণ্ট 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার প্রকাশক ও কীপারের নিকট ৩ হাজার টাকা করে মোট ৬০০০্ টাকা জামিন তলব করেছেন। এই আদেশের পরে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ স্থগিত রেখেছে।

গত ২৬শে অক্টোবর 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় 'নাগপুরের অনুসরণ কর' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তৎসম্পর্কে বাংলা গবর্মেণ্ট ঐ কাগজের ২০০০্ টাকা জামিন বাজেয়াপ্ত করেছেন। ঐ কাগজের সেই সংখ্যাও গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেছেন। ৩০শে নবেম্বর ঐ কাগজের অফিসে খানাতল্লাসও করা হয়।

আপোষবিরোধী সম্মেলনের সেক্রেটারী মিঃ ধনরাজ শর্মাকে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাঁওতাল পরগণা জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী উষারাণী দেবীকে যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহার বিলির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁর ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

এ ছাড়া বাঙলার নানা জেলার বহু লোকের উপর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করা হয়েছে, অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, নানা জায়গায় খানাতল্লাসও করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক

ইউরোপের কথা

গ্রীকদের আক্রমণে ইতালীবাহিনীর লাঞ্ছনার এক শেষ হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রীকেরা প্রোগ্রাদেজ শহর দখল করে নিয়েছে এবং তা ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হস্তগত করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে আলবানিয়াতেও নাকি অল্পবিস্তর অসন্তোষের আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে। মাঝখানে শোনা গিয়েছিল মার্শাল বাদোলিও ইতালীয় অভিযানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন। তাতে কেউ কেউ মনে করছিলেন যে, যুদ্ধের অবস্থার হয়তো বা পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু পরে সে সংবাদেরও প্রতিবাদ এসেছে। ইতালির এই বিপদকালেও যে জার্মানি সাহায্য করছে না তার পিছনে রুশিয়ার হাত আছে বলে অনেকে মনে করেন এবং সে অনুমান বোধ হয় একেবারে অমূলক নয়।

এ সপ্তাহে সাদাম্পটন ও লিভারপুরে জার্মান বিমানগুলি প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করেছে বলে সংবাদ এসেছে। গত বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত লিভারপুলে বোমাবর্ষিত হয়। তাতে বাড়ি, দোকান, হোটেল, সিনেমা, গির্জা প্রভৃতির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। হতাহতও অনেক হয়েছে। সাদাম্পটনে বিমান আক্রমণ হয় গত শনিবার ও রবিবার রাত্রিতে; অসংখ্য বিমান থেকে নাকি বৃষ্টিধারার মত বোমা বর্ষিত হয়। দোকান, বাড়ি ইত্যাদির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, লোকও মারা গেছে। এই দুর্দিনের আক্রমণের সময়ই কয়েকখানা জার্মান বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। ব্রিস্টল ও বার্মিংহামেও প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের সংবাদ পাওয়া গেছে।

ব্রিটিশ বিমান উইলহেলম্‌শ্যাভনের জাহাজ নির্মাণ অঞ্চলে ও লোরিয়াঁ প্রভৃতি স্থানে বোমাবর্ষণ করে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে বলে শোনা গেছে।

প্যারিসে গত ১১ই নবেম্বর ছাত্রেরা এক শোভাযাত্রা করে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তার জের এখনও চলেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তো বন্ধ করেই দেওয়া হয়েছে, অধিকন্তু প্যারিসের ৫ শত ছাত্রকে জার্মানিতে বন্দীশালায় প্রেরণ করা হয়েছে বলে প্রকাশ। এ ছাড়া হল্যাণ্ডের অন্তর্গত লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ও নাকি বন্ধ করা হয়েছে।

আয়র্লণ্ডে পশ্চিমে সমুদ্রে ৫খানা ব্রিটিশ জাহাজ টর্পেডো দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। জাহাজগুলির নাম—'লেডী গ্লেনলী (৫,৪৯৭ টন)', 'গুডলে (৫,৪৪৮ টন)', 'ভিক্টোরিয়া', 'ভিক্টর রস (১১,০০০ টন)', 'কিলগেরান ক্যাসল (২৭৬ টন)', 'লক র‍্যাঞ্জা (৫,০০০ টন)'। তা'ছাড়া 'জি কে আই এফ' ও অন্য আর একখানি জাহাজও আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ সাবমেরিন 'ট্রিয়াড'ও ধ্বংস হয়েছে বলে নৌ বিভাগ ঘোষণা করেছেন।

যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় রুমানিয়াতে বিশৃঙ্খলার বন্যা বয়ে চলেছে। রুমানিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আর্গেসিয়ানো ও শান্তিরক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মঃ মারেনেস্কু সহ ৬৪জন রাজনীতিক বন্দীকে গুলী করে মারা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। আয়রণ গার্ডের নেতা কড্রিনুকে যখন গুলী করে মারা হয় তখন জেনারেল আর্গেসিয়ানো প্রধান মন্ত্রী ও মঃ মারেনেস্কু পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা ক্যারলের সময়ে আয়রণ গার্ডের সভ্যদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয় তার প্রতিশোধস্বরূপ এরূপ করা হচ্ছে বলে মনে হয়। এ অনুমান আরও দৃঢ় হয় রাজা ক্যারলের শেষ প্রধান মন্ত্রী মঃ জিগুর্তু, অর্থ সচিব মঃ আর্গেটোইয়ানো ও সামরিক মন্ত্রিসভার চীফ জেনারেল ইলাসিয়াভিকের গ্রেপ্তারে। রাজা মাইকেল নিজেকে বান্দী বলে মনে করছেন। রাজমাতা রাণী হেলেন পলায়ন করে ফ্লোরেন্সে গেছেন, রাজাও নাকি পলায়নের চেষ্টা করছেন। আরও দু'জন ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মঃ মাদাগ্রু ও প্রফেসর গোর্গার হত্যার সংবাদ পাওয়া গেছে। এদিকে বিক্ষুব্ধ একদল আয়রণ গার্ড সভ্য আয়রণ গার্ড আন্দোলনের হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। মৃত আয়রণ গার্ড নেতা কড্রিনুর পুনর্বিচার করে সামরিক বিচারে তাঁকে যে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী করা হয়েছিল তা' নাকচ করে দেওয়া হয়। এক কথায় রুমানিয়ায় যেন আতঙ্কের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। বিশৃঙ্খলার অজুহাতে হিটলার রুমানিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর তাঁবেদারীতে যদি টেনে আনেন তাতে বিস্ময়ের কিছু হবে না।

জার্মান তাঁবেদার নরওয়ে গবর্মেণ্টের প্রধান কর্তা মেজর কুইসলিংএর বিরুদ্ধে নরওয়েতে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করা হয়েছিল।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যু—

বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্র ব্যবসায়ী লর্ড রোদারমীয়ার ৭২ বৎসর বয়সে গত ২৬শে নবেম্বর মারা গেছেন।

মিশরের দেশরক্ষা সচিব ইওনিস্‌ পাশা গত ২৭শে নবেম্বর হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

৩।১২।৪০ শ্রীবিষ্ণুশর্মা

রণজি ক্রিকেটের পূর্বাঞ্চলের খেলা

এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় বাঙলা দল বিহার দলকে পরাজিত করিয়াছে। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে এই পর্যন্ত বাঙলা দল যতবার বিহার দলের সহিত মিলিত হইয়াছে ততবারই বাঙলা দল বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়াছে। সুতরাং এই সাফল্যে খুব আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তবে বাঙলা দল যে পূর্ব অর্জিত গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়।

বিহার দলের ক্রমোন্নতি

বিহার দল এই পর্যন্ত পাঁচবার বাঙলা দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে এবং পাঁচবারই পরাজিত হইয়াছে। তবে এইবারের পরাজয় পূর্বের ন্যায় শোচনীয় হয় নাই। খেলাটি অমীমাংসিতভাবেই শেষ হইয়াছিল। বাঙলা দল কেবল তিনদিন-ব্যাপী খেলার নিয়মানুসারে প্রথম ইনিংসে যে ৪০ রাণে অগ্রগামী হইয়াছিল তাহার বলেই বিজয়ী হইয়াছে। বিহার দল যে খেলায় উন্নতি করিয়াছে ইহা হইতেই বুঝা যায়। তাহা ছাড়া বিহার দলের প্রথম ইনিংসে ২১৭ রাণ লাভ বিহার ক্রিকেট দলের ইতিহাসে নূতন কৃতিত্ব। এ পর্যন্ত রণজি ক্রিকেট খেলায় কোন বৎসরই বিহার দল এক ইনিংসে এত রাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। গত বৎসর তাহারা ১৩৫ রাণ করিয়াছিল এবং তাহাই ছিল বিহার দলের এক ইনিংসে সর্বাপেক্ষা অধিক রাণ। বিহার দলের খেলোয়াড়গণ এই বৎসর ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সকল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাতে মনে হয় আগামী বৎসরে বিহার দল বাঙলা দলকে রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় বেশ বেগ দিতে পারিবে।

পরবর্তী খেলায় বাঙলা দল

বাঙলা দল প্রথম খেলায় বিজয়ী হওয়ায় পরবর্তী রাউণ্ডে যুক্তপ্রদেশ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। এই খেলায় যে বাঙলা দল বিজয়ী হইবে তাহার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ বিহার দলকে পরাজিত করিবার সময় বাঙলা দলে যে কয়েকজন ইউরোপীয় খেলোয়াড় খেলিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই খেলিতে পারিবেন না। বিশেষ করিয়া এস ডবলিউ বেরহেণ্ড যিনি অপূর্ব বোলিং দ্বারা বিহার দলের খেলোয়াড়গণকে বিপর্যস্থ করিয়াছিলেন তিনি এই খেলায় যোগদান করিতে পারিবেন না। তাঁহার স্থান পূরণ করিবার মত বাঙলা দলে আর কোন খেলোয়াড়ই নাই। তাঁহার অভাবে বাঙলা দলের বোলিং বিভাগটি যে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়া পড়িবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাঙলা দলে অপর যে সকল বোলার আছেন তাঁহারা কেহই জামসেদপুরে বিহার দলের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিবেন ইহা আশা করা চলে না। গত বৎসর যুক্তপ্রদেশ দল বাঙলা দলকে পরাজিত করিয়াছিল, এই বৎসরও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে বলিয়াই আশঙ্কা। খেলার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব হইতে কিছুই বলা যায় না। তবে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটাও একেবারে অসম্ভব নহে।

খেলার বিবরণ

বাঙলা দল টসে বিজয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করে। একমাত্র বেরহেণ্ড ব্যতীত অপর সকল খেলোয়াড় অল্প রাণে আউট হন। বেরহেণ্ড আউট হইলে বাঙলা দল দুই শত রাণ পূর্ণ করিতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়। তবে গণেশ বসু এই সময় অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তাঁহার দৃঢ়তা রামচন্দ্রকে রাণ তুলিতে শক্তি দেয়। রাণ উঠিতে থাকে। রামচন্দ্র আউট হইলে পুনরায় বাঙলা দলের দ্রুত উইকেট পতন হয় ও ২৫৭ রাণে ইনিংস শেষ হয়। গণেশ বসু শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকিয়া ৩৫ রাণ করেন।

বিহার দলের খেলার সূচনাও নৈরাশ্যজনক হয়। বিজয় সেন খেলায় যোগদান করিবার পর খেলার অবস্থা পরিবর্তিত হয়। রাণ উঠিতে আরম্ভ করে। সানজানা খেলায় যোগদান করিলে রাণ খুবই দ্রুত উঠিতে থাকে। বাঙলা দলের বোলারগণ একরূপ হতাশ হইয়া পড়েন। ঠিক এই সময় বেরহেণ্ডের বোলিং বিহার দলের রাণ তুলিবার পথ বন্ধ করে এবং বিহার দলের ইনিংস ২১৭ রাণে শেষ হয়। বাঙলা দল প্রথম ইনিংসে ৪০ রাণে অগ্রগামী হওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে বেপরোয়া হইয়া খেলিতে আরম্ভ করেন। বিহার দল বিশেষ চেষ্টা করিয়া রাণ তুলিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। বাঙলা দল মাত্র ৩ উইকেটে ২৬২ রাণ করিতে সক্ষম হন। ৩০২ রাণে অগ্রগামী বাঙলা দলের বিরুদ্ধে বিহার দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলিতে আরম্ভ করিলেন। রাণ তোলা অসম্ভব জানিয়া সময় ক্ষেপনের দিকে দৃষ্টি দেন। ফলে দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৫৮ রাণ করেন। খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়। বাঙলা দল তিনদিনব্যাপী খেলার নিয়মানুসারে প্রথম ইনিংসের রাণের বলে বিজয়ী হন।

খেলার ফলাফল:—

বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস:—২৫৭ রাণ (ডবলিউ বেরহেণ্ড ৫০, সুশীল বসু ৩৭, কার্তিক বসু ৩১, গণেশ বসু ৩৫ রাণ নট আউট, রামচন্দ্র ৫১; ডি খাম্বাটা ৫১ রাণে ৩টি, বিমল বসু ৪২ রাণে ২টি, জহুর আমেদ ৭৯ রাণে ১টি, বিজয় সেন ১৯ রাণে ১টি, এন ব্যানার্জি ৭ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

বিহার দলের প্রথম ইনিংস:—২১৭ রাণ (এস বাগচী ৩১, ভানিয়া ১৪, বিজয় সেন ৩১, সানজানা ৫৪, নাওরোজী ২১; বেরহেণ্ড ৬৮ রাণে ৫টি, টি ভট্টাচার্য ২০ রাণে ১টি, কে ভট্টাচার্য ৩৯ রাণে ১টি, এন চ্যাটার্জি ৪৫ রাণে ২টি ও রামচন্দ্র ৩০ রাণে ১টি উইকেট পান।)

বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৩ উইঃ ২৬২ রাণ (জব্বর ৬৮, টি ভট্টাচার্য ৬২, এন চ্যাটার্জি ৬১, কে ভট্টাচার্য ৩৫ রাণ নট আউট; খাম্বাটা ৭৪ রাণে ১টি, জহুর আমেদ ৪১ রাণে ১টি উইকেট পান।)

বিহার দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৬ উইকেটে ৫৮ রাণ (বিজয় সেন নট আউট ১৭, ভানিয়া ১২; বেরহেণ্ড ২৪ রাণে ৪টি, টি ভট্টাচার্য ২৪ রাণে ১টি ও রামচন্দ্র ১ রাণে ১টি উইকেট পান।)

(বাঙলা দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিজয়ী)

বাঙলা ও বিহারের পূর্ববর্তী খেলার ফলাফল—

১৯৩৬-৩৭:—বিহার দল:—প্রথম ইনিংস ১৩০ রাণ, দ্বিতীয় ইনিংস ১২৭ রাণ, বাঙলা দল:—প্রথম ইনিংস ৮৯ রাণ, দ্বিতীয় ইনিংস ২ উইকেটে ১৫২ রাণ।

(বাঙলা দল ৮ উইকেটে বিজয়ী)

১৯৩৭-৩৮:—বাঙলা দল:—প্রথম ইনিংস ৭ উইকেটে ৩৭২ রাণ, বিহার দল:—প্রথম ইনিংস ৯৯ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংস ১০৭ রাণ।

(বাঙলা দল এক ইনিংস ও ১৬৬ রাণে বিজয়ী)

১৯৩৮-৩৯:—বাঙলা দল:—প্রথম ইনিংস ৩ উইকেটে ৩৬৬ রাণ, বিহার দল:—প্রথম ইনিংস ১০৫ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংস ৭৬ রাণ।

(বাঙলা দল এক ইনিংসে ও ১৮৫ রাণে বিজয়ী)

১৯৩৯-৪০ঃ—বিহার দলঃ—প্রথম ইনিংস ১৩৫ রাণ, দ্বিতীয় ইনিংস ১১১ রাণ, বাঙলা দলঃ—প্রথম ইনিংস ২৯৭ রাণ।

(বাঙলা দল এক ইনিংস ও ৫১ রাণে বিজয়ী)

সিন্ধু ক্রিকেট দল পরাজিত

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় সিন্ধু ক্রিকেট দল ছয় উইকেটে পশ্চিম ভারতরাজ্য দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। সিন্ধুদল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইয়াও খেলায় পরাজিত হইল ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। তবে পশ্চিম ভারতরাজ্য দল ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিজয়ী হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিন্ধুদল শেষ দিনে জয়লাভের জন্য এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। সিন্ধু দল প্রথম ইনিংস ২৩৯ রাণে শেষ করে। দাউদ খাঁ ও কিষেণচাঁদ ব্যতীত কেহই অধিক রাণ করিতে সক্ষম হন নাই। পশ্চিম ভারত দলের সৈয়দ আমেদ ৭৮ রাণে ৫টা ও নেহালচাঁদ ৭৩ রাণে ৪টা উইকেট দখল করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পরে পশ্চিম ভারতরাজ্য দল খেলিয়া ২৫০ রাণে ইনিংস শেষ করে। উমর খাঁ ও পৃথ্বিরাজের ব্যাটিং প্রশংসনীয় হয়। সিন্ধু দল ১১ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। দ্রুত রাণ তুলিবার চেষ্টা করেন। ফলে অল্প রাণে কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় আউট হন। কুমারন্দীন গিরিধারী ও কিষেণচাঁদ ব্যাটিংয়ে সাফল্যলাভ করেন। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৭ উইকেটে ১৬৮ রাণ হইলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন। তখন তাঁহাদের আশা ছিল পশ্চিম ভারত দলের ইনিংস ১৫০ রাণে শেষ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা কার্যকরী হইবে বলিয়া প্রথমে মনে হয় যখন তিনটি উইকেট ৪৩ রাণে পড়িয়া যায়। তাহার পর মানভাদারের নবাব খেলিতে নামিয়া খেলার অবস্থা পরিবর্তন করেন। তিনি উমারের সাহায্যে দ্রুত রাণ তুলিতে সক্ষম হন। একা ৬৯ রাণ করিয়া আউট হন। পরে উমার প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। পশ্চিম ভারতরাজ্য দলের ৪ উইকেটে ১৫৯ রাণ হয়। সিন্ধু দল ৬ উইকেটে পরাজিত হন।

খেলার ফলাফল ঃ—

সিন্ধু প্রথম ইনিংসঃ—২৩৯ রাণ (দাউদ খাঁ ৬১, কিষেণচাঁদ ৫০, আব্বাস খাঁ ৪৭; সৈয়দ আমেদ ৭৮ রাণে ৫টি ও নেহালচাঁদ ৭৩ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

পশ্চিম ভারতরাজ্য দল প্রথম ইনিংসঃ—২৫০ রাণ (বারিট ৩৪, উমার খাঁ ৫০, পৃথ্বিরাজ ৫১, মানভাদারের নবাব ৩৪, সৈয়দ আমেদ নট আউট ২৪; গিরিধারী ৩৭ রাণে ৩টা, মোবেদ ৪৮ রাণে ৩টা, ইব্রাহিম উজীর ৪৯ রাণে ২টা, গোপালদাস ২৩ রাণে ১টি ও নাওমল ২৮ রাণে ১টি উইকেট পান।)

সিন্ধু দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৭ উইকেটে ১৬৮ রাণ (কুমারন্দীন ৬৬, গিরিধারী ৩৪, কিষেণচাঁদ ৩৩ রাণ।)

পশ্চিম ভারতরাজ্য দল দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৪ উইঃ ১৫৯ রাণ (মানভাদারের নবাব ৬৯, উমার নট আউট ৪০, বারিট ২৩; কুমারন্দীন ৪১ রাণে ১টি, গোপালদাস ২৩ রাণে ২টি ও গিরিধারী ৪৪ রাণে ১টি উইকেট পান।)

(পশ্চিম ভারতরাজ্য দল ছয় উইকেটে বিজয়ী)

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। বোম্বাইর জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ছাত্রগণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে এইরূপ আনন্দদায়ক খেলার ব্যবস্থা হওয়া অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কতিপয় বিশিষ্ট ছাত্র নেতা একজন ভূতপূর্ব মন্ত্রীর সহযোগিতায় পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটির নিকট খেলা বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ছাত্রগণ এতই উত্তেজিত হইয়াছেন যে, অনুরোধ ব্যর্থ হইলে পিকেটিং করিয়া খেলা বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষগণ এই বিষয় কোনরূপ মতামত প্রকাশ করেন নাই। তাহারা কেবল বলিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণ, ক্রীড়ামোদিগণ, খেলোয়াড়গণ ও বিভিন্ন জিমখানার পরিচালকগণ যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন। ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। খেলোয়াড়গণই দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া খেলিতে রাজি হন নাই। এই বৎসরও সেইরূপ অবস্থা যখন সৃষ্টি হইয়াছে তখন খেলোয়াড়গণ পুনরায় কি অভিমত প্রকাশ করিবেন ঠিক বলা যায় না। বিশেষ করিয়া ছাত্রদের তীব্র বিরূপ মনোভাব অনেক খেলোয়াড়কেই খেলা হইতে বিরত করিবে বলিয়া মনে হয়। প্রতিযোগিতার সকল আয়োজন প্রায় শেষ হইয়াছে। এমন কি বিভিন্ন দলের খেলোয়াড় নির্বাচন পর্যন্তও হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় প্রতিযোগিতা বন্ধ হইলে পরিচালকগণের বিশেষ হতাশার কারণ হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জোসেফ স্ট্যালিন

(১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

যেটুকু বলেন, তার একটি লাইনও বাজে কথা নয়। বক্তা হিসাবে ট্রটস্কি তাঁর অনেক উপরে হলেও ডিপ্লোমেট হিসাবে স্ট্যালিন যে বড় এ-কথা অনস্বীকার্য।

বেশভূষায় তিনি সাধারণ চাষীর মতই আড়ম্বরহীন। এই সারল্যের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা তাঁকে গালাগাল দিতে বাকী রাখে নি। জিনোবিফ্ তাকে প্রায়ই 'হলদে চোখ বাঁদর' আখ্যা দিতেন। ট্রটস্কি তাঁকে ককেশাসবাসী বর্বর বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তাকে পুনরায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। এবার তার সঙ্গে যথেষ্ট গার্ড পাঠানো হয়েছিল। বার বার পলায়নের চেষ্টা সত্ত্বেও এবার তিনি পালাতে পারেন নি। দীর্ঘ চার বছর নির্বাসন বাসের পর, বিপ্লবের প্রারম্ভে তার মুক্তি হয়।

তিনি যখন ফিরে এলেন, জারের দিন নিঃশেষিত হয়ে এসেছে।

(১) M. A. Aldanof Sovremerriki

সমর বার্তা

২৫ নভেম্বর।—

ইংলান্ড ও জার্মানিতে অল্পাধিক পারস্পরিক বিমান আক্রমণ ঘটিয়াছে। গ্রীস যুদ্ধের সংবাদ গ্রীকদের অনুকূল। গ্রীসে ইতালীয়দের পরাভবে ইতালিতে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, সরকারী ইস্তাহারে পরাভবের যে কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ইতালীয়রা তাহাতে তুষ্ট হইতে পারিতেছে না।

লণ্ডনের সংবাদ—এ বছর ব্রিটেনে বড়দিনের ছুটি দেওয়া বন্ধ থাকিবে।

২৬ নভেম্বর।—

ইংলাণ্ডে পূর্ববৎ অল্পাধিক জার্মান বিমান আক্রমণ ঘটিতেছে। ইংরেজরাও জার্মান ও ইতালীয় এলাকায় নানা স্থানে প্রবল বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করিয়া কার্যত সাহায্য করিবার জন্য আর কোনও শক্তিকে আমন্ত্রণ করা হইতেছে না। সোভিয়েট রাশিয়ার জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ নাকি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বুলগেরিয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে, গ্রীকরা আলবেনিয়ায় আরও সাত হাজার ইতালীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। অনুমিত হয়, চার ডিভিসন ইতালীয় সৈন্যকে যোগবিচ্ছিন্ন করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে।

২৭ নভেম্বর।—

জার্মানিতে ব্রিটিশ বিমান বহরের ব্যাপক অভিযান ঘটিয়াছে। বার্লিনও গতরাত্রে আক্রান্ত হয়। সাধারণত ডক ও বিমান ঘাঁটিই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইতালীয় হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, টুরিনে ইংরেজরা হাওয়াই হামলার সময় মলোটভস ব্রেড বাস্কেট নিক্ষেপ করিয়াছে। জার্মান হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় তাঁহাদের বিমান আক্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল।

গ্রীক বাহিনীর নানাদিকে অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ আছে। অনেক ইতালীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ার জিলাটি সামরিক বন্দীশালায় সৈন্যেরা গুলি করিয়া ৬৪ জন রাজনৈতিক বন্দীকে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে রুমানিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আর্গেসিয়ানু ও জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মারিনেস্কু ছিলেন।

কমন্স সভায় শ্রীযুত বাটলার ঘোষণা করিয়াছেন, যে সকল হাবসী সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে ব্রিটিশ সরকার তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্যদান করিতেছেন; আবিসিনিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা ব্রিটেনের নাই।

২৮ নভেম্বর।—

ব্রিটিশ বিমান বহর গত রাত্রে কোলন, মাহাভার, বোলন, অ্যানটোআর্প প্রভৃতি স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ইতালীয়রা স্বীকার করিয়াছে যে, 'লানসের' নামক তাহাদের এক ডেস্ট্রয়ার ভূমধ্যসাগরে সার্দানিয়ার দক্ষিণে ব্রিটেনের সহিত নৌসংঘর্ষের ফলে ঘায়েল হইয়াছে। গ্রীস যুদ্ধের সংবাদ গ্রীকদের অনুকূল। আলবানিয়ান রণাঙ্গনের উত্তর ও দক্ষিণে গ্রীক সৈন্যরা আরও কয়েকটি পর্বত দখল করিয়াছে।

বার্লিনের সংবাদ, রুমানিয়ায় আর একটি হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। আয়রন গার্ড আন্দোলনকারীরা রুমানিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী প্রফেসর জরগাকে বাড়ি হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে। রুমানিয়া সরকার হত্যাকারীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

১৯৪১ সালের প্রথম ভাগ হইতে লেফটেনাণ্ট জেনারেল সি জে ই অচিন লেক ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইবেন।

২৯ নভেম্বর।—

কাল লিভারপুল অঞ্চলে জার্মানরা প্রবল বিমান আক্রমণ চালায়। মার্সি নদীতটে ইহাই প্রচণ্ডতম বিমান আক্রমণ। বস্তুত ইংলাণ্ডের দক্ষিণ অর্ধাংশের বহু স্থানে জার্মানরা বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। জার্মান এলাকাতেও ইংরেজদের বিমান আক্রমণের সংবাদ আছে।

গ্রীস যুদ্ধের সংবাদ গ্রীকদের অনুকূল। সমগ্র উত্তর রণাঙ্গনে প্রবল সংগ্রাম চলিয়াছে। ওআশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সমরোপকরণ ক্রয় সম্পর্কে গ্রীস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গ্রীক সরকারের অনুকূল এক চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ছয়টা ইতালীয় যুদ্ধ জাহাজ কর্ফুর উত্তরে গোলা বর্ষণ করে। ইংরেজরা লিবিয়া ও দেদোকানিজে জোর হাওয়াই হামলা চালাইয়াছে।

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ার অবস্থা সংকটময়। জার্মান সংবাদপত্রের সুর দেখিয়া মনে হয় রুমানিয়ার বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য জার্মানি হয়তো হস্তক্ষেপ করিবে। রুমানিয়ার জার্মান দূত শ্রীযুক্ত কব্রিসিউম জেনারেল আণ্টোনেস্কুর সহিত দীর্ঘকাল আলোচনার পর বার্লিন যাত্রা করিয়াছেন।

৩০ নভেম্বর।—

ইংলাণ্ডে জার্মান বিমান আক্রমণ অল্পাধিক চলিতেছে। জার্মান অঞ্চলেও ইংরেজরা বিমান আক্রমণ করিয়াছে। ব্রিটিশ নৌবিভাগীয় ইস্তাহারে প্রকাশ, ইংলিশ চ্যানেলে সংঘর্ষের ফলে এক ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার জলমগ্ন হইয়াছে।

গ্রীকরা পোগ্রাডেজে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি তাহাদের দখলে আসিয়াছে। সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, একটি গ্রীক ডেস্ট্রয়ার একটি ইতালীয় সাবমেরিনকে ধ্বংস করিয়াছে।

টোকিওর সংবাদ, সেখানে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, জাপানের কর্তৃত্বাধীনে ওআং চিং ওয়েইএর যে গভর্নমেণ্ট আছে জাপান উহাকে "চীন সাধারণতন্ত্রের জাতীয় গভর্নমেণ্ট" বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই ঘোষণা প্রকাশিত হইলে সাংহাইএ ছয়শত চীনা পুলিশ ধর্মঘট করে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৬ নভেম্বর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—দেরাদুন, নিউদিল্লি, কলিকাতা, বীরভুম, গৌহাটি, পুরুলিয়া, মুঙ্গের প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সত্যাগ্রহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অনেকে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বি গোপাল রেড্ডি (দণ্ডিত), মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত টি এস রাজেন (দণ্ডিত), মাদ্রজের ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত টি প্রকাশম (গ্রেপ্তার), যুক্ত প্রদেশের বিচার বিভাগীয় প্রাক্তন মন্ত্রী ডাক্তার কাটজু (গ্রেপ্তার) প্রভৃতি আছেন।

বিখ্যাত সংবাদপত্র ব্যবসায়ী ও ধনিক লর্ড রাদারমিয়ার আজ ৭২ বৎসর বয়সে বারমুডা দ্বীপে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বাঙ্গলা গভর্নমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় অপ্রদীপের মহড়া ৪ ডিসেম্বরে না হইয়া ১১ ডিসেম্বরে হইবে।

২৭ নভেম্বর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—পাটনা, পুরুলিয়া, আরা, কাশী, বোম্বাই, আমেদাবাদ কলিকাতা, জব্বলপুর, চিত্তুর, ওয়ার্ধাগঞ্জ, কটক প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সত্যাগ্রহ ও গ্রেপ্তার প্রভৃতির সংবাদ আসিতেছে। পাটনায় বিহারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিং এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভারত রক্ষা আইন।—চট্টগ্রাম, বীরওয়ার, নারায়ণগঞ্জ, মুঙ্গের প্রভৃতি নানা স্থান হইতে এই আইনের প্রতাপের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

পাটনার সংবাদ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিকদের নিকট মন্তব্যচ্ছলে বলিয়াছেন কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন নাও হইতে পারে।

অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সএ গবেষণার জন্য ভিকটোরিয়া ইন্সটিটিউশনের প্রফেসর শ্রীমতী বিভা মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মেয়াট মেডেল দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন।

২৮ নভেম্বর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—পুরুলিয়া, পুনা, পাটনা, লাহোর, মজঃফরপুর, নিউদিল্লি, ইন্দোর, লাহোর, শিলং প্রভৃত নানা স্থান হইতে সত্যাগ্রহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সর্দার বল্লভভাই সবরমতী জেল হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এলাহাবাদের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কাটজু দেড় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং ৭৫০, টাকা অর্থদণ্ডে (অনাদায়ে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে), শ্রীমতী মনিবেন প্যাটেল ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং মধ্য প্রদেশের পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত জি এস গুপ্ত এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আরও অনেকে গ্রেপ্তার ও দণ্ড লাভ করিতেছেন।

আজ নিউদিল্লি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড়লাটের প্রশংসাপত্র যুক্ত ফাইন্যান্স বিল ২৭—১১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদ, ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হল্যাণ্ডেরও বিখ্যাত লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে। প্রকাশ, কতকগুলি ইহুদী বিরোধী আইন কানুনের বিরোধিতা করার ফলে বার্লিনের আদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৯ নভেম্বর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ—আরা, কাশী, সিবন, আমেদাবাদ, কালিকট, নিউদিল্লি, ওয়ার্ধা, মাদ্রাজ, পুনা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সত্যাগ্রহের সংবাদ আসিতেছে। অনেকে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে মাদ্রাজ পরিষদের শ্রীমতী জি আম্বা দণ্ডিত, (দেড় বৎসর বিনাশ্রম), পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত ইফতিখারউদ্দিন (গ্রেপ্তার), পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের শ্রীযুক্ত গোপীচাঁদ ভার্গব (গ্রেপ্তার), যুক্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ (গ্রেপ্তার) আছেন।

নাগপুরের সংবাদ, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক ১৯৩৯ সালে মধ্য প্রদেশ ও বেরারের যে কারা ব্যবস্থা সংশোধন আইন পাস হয় তাহা রদ করিয়া আজ উক্ত প্রদেশের গভর্নর এক নূতন আইন জারি করিয়াছেন।

সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশ ও মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক মতামত ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া যে নির্দেশ জারি করিয়াছিলেন, এবং সেজন্য দিল্লি ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর যে দুইজন ছাত্রের ডিগ্রি বাতিল করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতার ফরওআর্ড ব্লক ছাত্র সংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের শোভাযাত্রাদি বাহির হয়।

৩০ নভেম্বর।—

বাঙলা সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রেসিডেন্সি জেলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত আবদুল হালিম প্রমুখ ষোলজন রাজবন্দী তাঁহাদের দাবি পূরণ করা হয় নাই বলিয়া অনশন ধর্মঘট করিয়াছেন। সকলের শারীরিক অবস্থা ভাল. কেবল শ্রীযুক্ত শ্রীপতি নন্দীকে জেল হাসপাতালে জোর করিয়া খাওয়ানো ও শুশ্রূষা করা হইতেছে।

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—বিহার, বাঙলা, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের নানা স্থান হইতে সত্যাগ্রহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অনেকে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু (গ্রেপ্তার), শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই (গ্রেপ্তার), ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (গ্রেপ্তার), শ্রীযুক্তা সরলা দেবী (গ্রেপ্তার), শ্রীযুক্তা উষারাণী দেবী (গ্রেপ্তার) প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন।

আজ গেজেট অব ইণ্ডিয়ার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে বড়লাট ফাইন্যান্স বিলে সম্মতি দিয়াছেন। তাহা অবিলম্বে বলবৎ হইল।

গণ্ডারের খড়্গ

১৫১৩ সালে ভারতবর্ষ থেকে পর্তুগালের রাজার কাছে একটি জীবিত গণ্ডার পাঠান হয়। গণ্ডারের আগমনে সে সময়ে ইউরোপে এক মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। দর্শকেরা তার নাম দিয়েছিল "নোজ-হর্ণ।" কথাটা ঠিক। খাঁড়াটা আবির্ভাব হয় নাকের উপর থেকে, কপাল থেকে নয়।

চীনেতে এবং এসিয়ার কোন কোন দেশে গণ্ডারের খাঁড়ার চূর্ণ অংশ জ্বরের মহৌষধ বলে পরীক্ষিত এবং উচ্চ প্রশংসিত। ফলে গণ্ডারের খাঁড়ার একটা বাজার মূল্য আছে; এক ইঞ্চি খাঁড়ার দাম ১০০ শিলিং।

* * *

পৃথিবীতে পাঁচ প্রকারের গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়। জাভা ও ভারতীয় গণ্ডারের মাত্র একটি খাঁড়া থাকে। আফ্রিকার জঙ্গলে যে সব গণ্ডারের বাস তাদের দুই, তিন, এমন কি চারটি পর্যন্তও খাঁড়া থাকে। ফ্রিক জাতীয় গণ্ডারের নাকে পাঁচটা খাঁড়া আবির্ভাব হয়। পৃথিবীতে এর থেকে বেশী খাঁড়ার অধিকারী আর কোন গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায় না।

জোলো মাকড়সা

ভারতবর্ষে এক রকমের জোলো মাকড়সা জলের উপর চরে বেড়াতে দেখা যায়। কোনরকম ভয় পেলেই তারা জলের মধ্যে আত্মগোপন করে। জলের মধ্যে তারা কুড়ি মিনিট সময় পর্যন্ত থাকতে পারে।

মাকড়সার জাল নয়—একজন বিমানচালক প্যারাসুট দিয়ে পৃথিবীর মাটিতে নামছে

টেলিফোন বইয়ের আয়ু

কথাটা পড়ে হয়ত ভাবছেন এ আবার কি! নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ারস্থিত কর্ণার সিগার ষ্টোরে যে টেলিফোন বইখানি দেওয়া হয় তার আয়ু মাত্র ৯৬ ঘণ্টা। চার দিনের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক টেলিফোন বইখানি ব্যবহার করে একেবারে নষ্ট করে ফেলে। সাধারণের ব্যবহারের জন্যে যে সব টেলিফোন আছে তাদের মধ্যে ঐ স্থানেই বেশী লোকের ভীড় জমে। প্রতি চার দিন অন্তর সেখানের টেলিফোন বই বদলিয়ে দেওয়া হয়।

বুড়ো আঙ্গুলের দাম •

নামে বুড়ো হলেও অন্য আঙ্গুলের চেয়ে বুড়ো আঙ্গুলের দাম বেশী। আইনও একথা স্বীকার করে। বুড়ো আঙ্গুলে যদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে আমেরিকার কলকারখানার আইন অনুসারে সেই হতভাগ্যকে কারখানা থেকে ৫১ সপ্তাহের মাহিনা দিতে বাধ্য হয়। অন্য আঙ্গুল নষ্ট হলেও টাকা দেবার ব্যবস্থা আছে। তবে তা বুড়োর তুলনায় কম, মাত্র ২৮ সপ্তাহের মাহিনা।

কবর ইন্সিওর

লাইফ ইন্সিওর, মোটর ইন্সিওর, খ্যাতনামা নর্তকীর পা ইন্সিওরের খবর পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। এছাড়া অনেক জিনিষও ইন্সিওর করা যায়। সম্প্রতি একটি বিলাতী পত্রিকায় কবর ইন্সিওরের কথা দেখলাম। কবর যাতে নষ্ট না হয় অথবা বেহাত না হয় তার জন্যেই এরকম ব্যবস্থা।

এরপর আরও কত খবর পাব।

সুখময় কোরে তুলুন আপনার ঘর এই কয়টি এইচ্ এম্ ভি রেকর্ডে

বীণা চৌধুরী

কৃষ্ণপ্রেমের অন্ত — ভাটিয়ালী } N 27053
শোন গো ললিত — „

কমলা দেবী (হাজরা)

বল নারে সখি — কীর্ত্তন } N 27054
ধনী ভেল মূরছিত — „

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

নাও ছাড়িয়া দে — ভাটিয়ালী } N 27055
ময়ূরপঙ্খী নৌকা আমার — „

কুমারী সুধা ব্যানার্জ্জি

নন্দন-বন হ'তে কিগো (কাব্য গীতি) } N 27056
আকাশে ভোরের তারা — „

সন্তোষ সেনগুপ্ত

কেন ফিরে ফিরে চলে যাও — কাব্য-গীতি } N 27057
কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও — „

মিস্ ইন্দুবালা

বাজ্‌বে গো মহেশের বুকে — শ্যামা সঙ্গীত } N 27058
আদর ক'রে হৃদে রাখো — „

রহিম মিঞা

একে তো বাঁশবাড়িয়া মশা — ভাওয়াইয়া } N 27059
কালা তুই ছাড়িয়া না যাস্ রে — „

ধীরেন সরকার

হায় গো আমার মনে কয় রে — ভাওয়াইয়া } N 27060
সোণার চাঁদ চাঁদ রে — „

মিস্ হরিমতী

সব ভুলানি ঘুম পাড়ানি (বন্দিনী হইতে) } N 27061
কুসুম ফুলের মালা গেঁথে — „

কুমারী যূথিকা রায়

সোণার কাঠি রূপার কাঠি (রূপগীতি) } N 27062
সাত ভাই চম্পা — „

দিলীপ রায় ও কুমারী উমা বসু

ওকে কে গান গেয়ে গেয়ে — কীর্ত্তন } HT 82
বন্ধু কি আর বলিব আমি

প্রোঃ জ্ঞান গোস্বামী

স্বপনে এসেছিল } N 27063
এস প্রিয় আরো কাছে

মডেল ১৭৯

একটি চমৎকার টেব্‌ল্ গ্র্যান্ড গ্রামোফোন। ইহার কেবিনেট বর্ম্মার নিরেট সেগুন কাঠে তৈয়ারী। সমুদয় ফিটিং ফ্লোরেণ্টাইন ব্রোঞ্জে নির্ম্মিত। শক্তিশালী ডবল স্প্রীং মোটর। ১২" টার্ণটেব্‌ল, অটো ব্রেক, ৫ বি সাউণ্ড বক্স। মূল্য ১৭৫৲ টাকা।
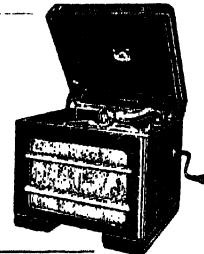
হিজ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ড

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস : দমদম। ব্রাঞ্চ : বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ।
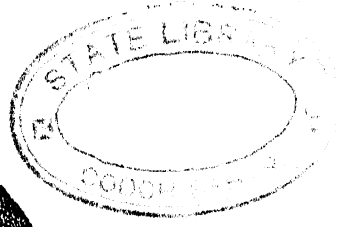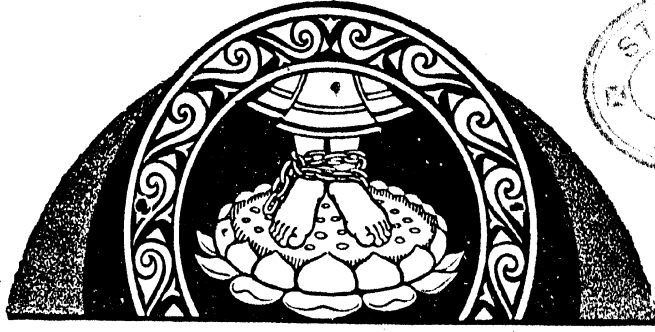
৮ম বর্ষ] ২৮শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল Saturday, 14th December, 1940 [৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের সমস্যার সমাধান—

মোড়লী করিবার ভাগ্য যাহারা পাইয়াছে, তাহারা মোড়লী করিবেই, সুতরাং ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বিলাতের 'টাইমস' পত্রের মোড়লীতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। 'টাইমসের' কথাকে আমরা বিশেষ কোন গুরুত্ব প্রদান করি না, তবে এবার 'টাইমসের' সুরের নূতনত্ব একটু দেখিতেছি, শুধু সেই সম্বন্ধেই গোটাকতক কথা বলিতে চাই। 'টাইমসের' উক্তির সারতত্ত্ব এই যে, ইংরেজ যে জিনিষ ভারতবাসীদিগকে দিতে চাহিয়াছে, তাহা খুবই ভাল জিনিষ; কিন্তু ভারতবাসীদের বুদ্ধির দোষে ভারতবাসীরা ব্রিটিশের সেই দানের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; সুতরাং সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচিত, তাহারা কি বস্তু দিতেছেন, তাহা অধিকতর প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখা বিশেলষণ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। নিজেদের দেশের স্বার্থ ভারতবাসীরা বুঝে না, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বসিয়া ইংরেজেরাই তাহা ভাল করিয়া বুঝে, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এমন আভিজাত্য-স্পর্দ্ধিত অভিভাবকত্বের আঘাত ভারতবাসীরা আর বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহে, এমন অনুকম্পা ভারতবাসীদের চিত্ত বিক্ষুব্ধই করিয়া তোলে এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধানের পথ তাহাতে পরিষ্কার হয় না, অধিকতর জটিল হইয়া পড়ে, 'টাইমসের' মোড়লদের এটুকু বুদ্ধি এখনও দেখা দেয় নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, 'টাইমস' অতি বুদ্ধিমানদিগকে এই ধরনের যুক্তি শুনাইতেন, তাহার একটা অর্থ থাকিত, কারণ এদেশে অতিবুদ্ধির বড়াই লইয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে যাহারা বিচরণ করেন, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ঔদার্য এবং অনুগ্রহের বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে একান্ত; কিন্তু এবার 'টাইমসের' নেকনজর পড়িয়াছে ভারতের যুবকদের উপর। এদেশের যুবকদের প্রতি ওপক্ষের পিরীতির রীতি কি এবং তাহার পরিণতি কি আমাদের জানা আছে। 'টাইমস' জানিয়া রাখুন, তাঁহাদের ফাঁকা কথার বোলচালে অপরে ভুলিলেও এদেশের যুবকেরা ভুলিবে না। ভারতের যুবকেরা চায় ভারতের স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐকান্তিকতা ভারতের যুবকেরা দেখাইয়াছে এবং এখনও দেখাইতে তাহারা প্রস্তুত। ভারতের যুবকদিগের সমর্থন লাভের ইচ্ছা যদি সত্যই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের থাকে, তবে শুধু কথার ওস্তাদী বা ব্রিটিশের অন্তঃসারহীন প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ভাষ্যের ফোঁপর দালালীতেই কুলাইবে না, ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

হক-জিন্না সমস্যা—

কংগ্রেস যদি ভারতের স্বাধীনতাই চায়, তাহা হইলে ভারতকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে সে স্বীকৃত হউক। ভারতের নয় লক্ষ মুসলমান উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র না স্থাপন করিয়া ছাড়িবে না। বোম্বাইয়ের জনসভায় জিন্না সাহেব যখন এই জিগীর ছাড়িতেছেন, তখন জিন্না সাহেবেরই মোশ্লেম লীগের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মোশ্লেম লীগের জরুরী বৈঠক আহ্বান করিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। হক সাহেবের যুক্তি এই যে, দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; প্রথমত, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র হয়, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল, ভারতের

জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কথা শুনিতে খুবই ভাল; কিন্তু এই কথা কার্যে পরিণত করিতে হইলে যতদূরে যাওয়া উচিত, হক সাহেব সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মন জোগাইয়া ততদূর যাইতে পারিবেন কি না, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সন্তোষ-অসন্তোষে অনপেক্ষ হইয়া ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে নিষ্ঠা বজায় রাখিতে যে ঝুঁকি লইতে হয়, তিনি তাহা লইতে সত্যই রাজী আছেন কি? দুধও খাইব, তামাকও খাইব—এমন মতিগতিতে ঐক্য সম্ভব হইবে না। পাকিস্থান প্রস্তাবের সংগে ঐক্যবদ্ধ ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী শাসনতন্ত্রের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

তরুণ ভারতের মতিগতি—

তরুণ ভারত কি চায়? অন্যদেশের তরুণেরাও যাহাই চায়, ভারতের তরুণেরাও চায় সেই স্বাধীনতা। গত ৮ই ডিসেম্বর যুক্তপ্রদেশের ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি মিঃ আনসার হারবানী সে কথাটা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছাত্রদের লক্ষ্য। তিনি মিঃ ফজলুল হক এবং মিঃ জিন্নাকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ায় একজন ছাত্রকেও তাঁহারা এই আদর্শ হইতে টলাইতে পারিবেন না। ব্রিটিশ ছাত্রদের দেশ-রক্ষার সাহসের প্রশংসা করিয়া মিঃ হারবানী বলেন, 'ভারতীয় ছাত্রগণকে কেন মাতৃভূমির জন্য চিন্তা করিতে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতে দেওয়া হইবে না।' অপর দেশের ছাত্রদের পক্ষে স্বদেশ প্রেম হইল আদর্শ, আর এদেশের ছাত্রদের পক্ষে সেই স্বদেশ প্রেম হইল নিন্দনীয়—তাহা শৃঙ্খলা বিরোধী যত কিছু। এই ধরণের ছেঁদো যুক্তির দিন আর নাই।

হিন্দুর আদর্শ—

ভারতের জাতীয়তাই হিন্দুই আদর্শ, হিন্দুর আদর্শ সাম্প্রদায়িকতা নয়, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বিলাসপুরে হিন্দুর এই আদর্শকে বেশ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর আগেও হিন্দুত্ব বলিতেই ভারতের জাতীয়তাকে বুঝাইত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সেই আদর্শই ছিল উদ্দীপ্ত। আজ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কৃপায়, অন্যদিকে জাতীয়তার আদর্শ এক শ্রেণীর মধ্যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই, হিন্দু নিজেই পৃথক হইয়া পড়িয়াছে তাহার আদর্শ লইয়া। ভারতের জাতীয়তা এবং ভারতের স্বাধীনতায় হিন্দুর সমান ভাবেই আদর্শ আছে; মিঃ জিন্না প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল পরপ্রত্যাশায় ক্ষুদ কুঁড়ার মোহে পড়িয়া সেই আদর্শ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এক দল লোককে সরাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন আধুনিক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমগ্র স্বরূপ হইল ইহাই। পরপ্রত্যাশায় এই ক্ষুদ কুঁড়ার লোভ যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সোজা সমাধান হইয়া যায়। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন, স্বাধীন মানুষের ছেঁড়া নেকড়াও ভাল কিন্তু বিদেশীর ক্রীতদাসের রাজপোষাক অতি ঘৃণার বস্তু। তিনি বলেন, হিন্দু সভা এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় যে, রাজনীতিক অধিকারের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষা করিয়া কোন জাতি কখনও স্বাধীনতা পায় নাই। অপরে যতই বলশালী হউক না কেন, আমরা তাহার নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষার দান হিসাবে চাহি না। মানুষের মত মানুষের আদর্শ ইহাই, ভারতের সর্বশ্রেণীর মধ্যে পর প্রত্যাশা ছাড়িয়া এই আদর্শ দেখা যদি দেয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যাও থাকে না। মনুষ্যত্বহীন, পরপ্রত্যাশী, দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন স্বার্থান্ধদের জন্যই সাম্প্রদায়িকতার কৃত্রিম সমস্যা গড়িয়া তুলিবার সুযোগ হইতেছে এবং স্বার্থান্ধতার জন্যই ভারতের প্রকৃত অধিকার অস্বীকারের ঐ অজুহাত।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। বরোদার রাজস্বসচিব শ্রীযুত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এবারকার অধিবেশনে সাহিত্য, বৃহত্তর বঙ্গ ও বিজ্ঞান এই তিনটি শাখার অধিবেশন হইবে। সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বৃহত্তর বঙ্গ শাখার শ্রীযুত কালিদাস নাগ মহাশয় সভাপতিত্ব করিবেন। বিজ্ঞান শাখায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন—এই তিনজনের একজন সভাপতিত্ব করিবেন। জামসেদপুর সাকচি অঞ্চলে এবং একরোডস্থ বিরাট ময়দানে অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং অভ্যর্থনা সমিতি উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙালীর সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় হইল বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতির এই সূত্রেই জাতির সংহতি, ঐক্য, জাতীয়তা এবং জাতি জগতে টিকিয়া থাকিবার অধিকার লাভ করে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বাঙলার সংস্কৃতি, সভ্যতার প্রসার করিয়া বাঙালীকে এই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে। বাণীর এই বেদীমূলে বাঙলা মায়ের সন্তানগণ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমবেত হইবেন, আমরা ইহাই আশা করিতেছি।

ভারতের দুর্দশার কারণ—

গত রবিবার ডাক্তার মেঘনাদ সাহা চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থ মাড়োয়ারী ছাত্র নিবাসে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ সম্বন্ধে

একটি চিন্তাশীলতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার সাহা বলেন, ভারতবাসীদের চরিত্রের নৈতিক অধোগতি হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু চিরদিনই এমন অবস্থা ছিল না। পনের শত বৎসর পূর্বে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতবাসীদের নৈতিক চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এমন একদিন ছিল, যেদিন ভারতবাসীরা জগতের সকল দেশের লোকদের চেয়ে সর্ববিষয়ে উন্নত ছিল। আজ যে অবনতি ঘটিয়াছে, এই অবনতির কারণ অন্য কিছুই নহে, ভারতবাসীদের অপরিসীম দারিদ্র্য। ভারতবাসীদের নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভারতের দারিদ্র্য প্রথমে দূর করা প্রয়োজন। ভারতবাসীদের দারিদ্র্যের নিদারুণতা কিরূপ, ডাক্তার সাহা অন্য দেশের তুলনায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। গড়ে এক একজন ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ৬৫ টাকা, সেখানে একজন মার্কিনের আয় দুই হাজার টাকা। এক একজন জাপানীর আয়ও ভারতবাসীর চার-পাঁচ গুণ বেশী। কারণ কি ভারতবাসীদের এই দারিদ্র্যের? ডাক্তার সাহাও কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, যেমন পরিবর্তনশীল জগতের অগ্রগতির সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে না পারা, অতীতের প্রতি অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি। তিনি বলেন, কেবলমাত্র বিদেশীর অধীনতাই আমাদের এই নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য দায়ী নহে। আজ যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি আমাদিগকে সুগঠিত করিয়া লইতে পারিব? ডাক্তার সাহা বিদেশীর অধীনতাকে ভারতের দারিদ্র্যের পরোক্ষ কারণ স্বরূপে দেখিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মতে তাহাই প্রধান কারণ এবং একমাত্র কারণ, স্বাধীনতা পাইলে সব হয়। ডাক্তার সাহা জাপানের উন্নতির কথা বলিয়াছেন, জাপান যদি পরাধীন থাকিত, তবে উন্নতি সাধন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত কি? ডাক্তার সাহা নিজেই বলিয়াছেন যে, এদেশের রাজনীতিক ব্যবস্থাই এমন যে, বেকারদের কাজের সংস্থান এখানে হয় না। সেই যে রাজনীতিক ব্যবস্থা, বিদেশীয়ের অধীনতাই তাহার কারণ নয় কি? ভারতবর্ষ যদি পরাধীন না থাকিত, তাহা হইলে পরিবর্তনশীল জগতের অগ্রগতির সঙ্গে তাহার স্বাভাবিকভাবে প্রত্যক্ষ যোগ ঘটিত এবং সংস্কার ভারতীয় জীবনে বাস্তব হইয়া উঠিত। বিদেশীর অধীনতার আড়ালেই ভারতের তথাকথিত নেতাদের সংস্কারবিরোধী মতিগতির মূলে রহিয়াছে।

ব্রিটিশের দান—

'টাইমস' মহাত্মা গান্ধীকে দোষী করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দানের কদর বুঝেন নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, দানটা কি এবং এমন কি দুরূহ এবং গভীর সে তত্ত্বের বস্তু। ভারতবাসীরা ইহাই চাহিয়াছিল যে, ভারতবর্ষকে কত দিনের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তাহার সময়ের মেয়াদ নির্দেশ করিতে হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা ভারতবাসীরা না পায়, ততদিন কেন্দ্র গভর্নমেণ্টে দায়িত্বশীলতা প্রবর্তন করিতে হইবে। ভারতবাসীদের মধ্যে মারপেঁচ কিছুই নাই; অপরপক্ষে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও জলের মত পরিষ্কার। তাঁহারা বলিলেন, স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের সম্বন্ধে আমরা সময়ের কোন নির্দেশ দিব না এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টেও আমাদের কর্তৃত্ব এখন আমরা ছাড়িতে নারাজ। এই সঙ্গে ভাষার কারসাজী অনেক খেলা হইল, বড়লাট শুনাইলেন কতকগুলি ফাঁকা কথা এবং ভারতসচিব আমেরী সাহেব শুধু ফাঁকা কথাই নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের ধুয়া তুলিয়া কারসাজী খাটাইলেন এবং 'টাইমস' পত্র ভারতের ঐক্যের যে আদর্শের উপর জোর দিতে কর্তাদের কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ভারতসচিব সেই ঐক্যের ভিত্তির উপরই আঘাত করিলেন। কংগ্রেস যতদূর সম্ভব নরম সুর কাটিয়াই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়াইতে গিয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সব ব্যর্থ হইল। অবশেষে মহাত্মাজী নিতান্ত হতাশ হইয়াই সত্যাগ্রহের পন্থা অবলম্বন করিলেন। আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার যাঁহারা প্রতীক, যাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি, তাঁহারা অনেকেই কারাগারে। 'টাইমস' যদি আশা করিয়া থাকেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি তাহাদের মতিগতির পরিবর্তন না করেন এবং নিজেদের জিদ ছাড়িয়া ভারতের দাবী পূরণের জন্য তাঁহারা আগাইয়া না আসেন, তাহা হইলেও শুধু কিঞ্চিৎ কথার কারসাজীতে বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই ভারতের যুবকেরা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ঔদার্যে গলিয়া পড়িবে, তাহা হইলে তিনি ভুল করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি ভারতের যুবকদের আন্তরিকতাকে উপযুক্ত মূল্য না দিয়া ভারতের যুবকসমাজকেই অবমাননা করা হইয়াছে। এমন মোড়লী ফলাইবার আগে তাঁহার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা বক্তৃতার বক্তা হিসাবে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তিনি বলেন,—"যে সকল প্রবল বিদেশী আক্রমণ এদেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার যে কোন একটি অন্য যে কোন জাতিকে ধ্বংস করিতে পারিত; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা তাহাতে ধ্বংস হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার অপর বৈশিষ্ট্য—উহা মৃত্যুঞ্জয়ী। নূতনকে গ্রাস করিয়া আত্মাকে চির তরুণ রাখিয়া ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বজয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে।"

সবই সত্য, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার এই বিশ্বজয়ের সঙ্গে জাতির সংবেদন সম্পর্ক আছে কি? যোগ আছে কি এই বিশাল ভারতের বিপুল জনসাধারণের—উচ্চ নীচ সকলের? ইহাই জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার অভাবেই আমাদের পরাধীনতা। ভারতের সভ্যতার প্রতি যদি আমাদের সত্যকার দরদ থাকে, আমরা যদি সত্যই চাহি যে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট দানে জগৎ সমৃদ্ধ হউক, তাহা হইলে আমাদিগকে আগে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে; জাগাইতে হইবে তাহার জন্য অন্তরে প্রেরণা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অন্তরে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন—প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে সেই আত্মমর্যাদার উদ্বোধনের।

বাঙলাকে উপেক্ষা—

সর্বভারতের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার কার্যে ভারত গভর্নমেণ্ট যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বাঙলা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র বা মাদ্রাজ হইতে কোন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী এইগুলিই প্রধান। শুধু তাহাই নহে, বাঙলা, মারাঠী, হিন্দী এবং গুজরাটী ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার কার্য প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী এবং গুজরাটী এই সব ভাষাগুলি সংস্কৃতমূলক। এই জন্যই কি এই ভাষাভাষী প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিদের কোন স্থান হয় নাই? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভারত গভর্নমেণ্টের বড় নাম দিয়া এই ঠাট খাড়া না করিলেই হইত, কারণ ভারতের পারিভাষিক শব্দসম্ভারে ভারতের যে ভাষাগুলি বিশিষ্ট এবং সমৃদ্ধ, সে সব ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সর্বভারতের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার কার্য পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। রবীন্দ্রনাথের মত মনীষার অবদানে বাঙলা ভাষা সাহিত্যের দিক হইতে যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় ভাষা-সম্পর্কিত কোন সংস্কারই বাঙলা ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না, একথা আমরা বলিবই।

ফ্রান্সের দুর্দশা—

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মনীষী হেনরী বার্গসঁকে কলেজ-দ্য-ফ্রাসে'র অধ্যাপকের পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। বার্গসঁ জাতিতে ইহুদী এবং সেই ইহুদী জাতিত্বের গৌরব তিনি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে রাজী হন নাই। ফরাসী গভর্নমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ইহুদী আইন হইতে অব্যাহতি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বার্গসঁ ব্যক্তিগত এই মর্যাদাকে এক্ষেত্রে স্বীকার করিবার মূলে যে প্রচণ্ড আত্মাবমাননা রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া লন নাই। তাঁহার এই স্বাজাত্যগৌরব ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা যে ফরাসী জাতি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছিল, জাতি এবং বর্ণগত বৈষম্য হইতে এতদিন ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে মুক্ত ছিল যে ফরাসী দেশ, নাৎসী জার্মানির পদানত হইয়া তাহার দুর্দশা কি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে পরাধীন তাহার ধর্ম থাকিতে পারে না—মানবতা থাকিতে পারে না; এক কথায় মনুষ্যত্ব হইতে সে বঞ্চিত হয়।

পরলোকে সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা—

ভারত গভর্নমেণ্টের ইনফরমেশন অফিসার সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে হৃদরোগে পরলোক-গমন করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র বাঙলা সরকারের সহকারী প্রেস অফিসারের কার্যে যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। তাঁহার ভদ্রতা, সৌজন্য এবং অমায়িক প্রকৃতিতে আমরা সুখী হইয়াছি। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত হইয়াছি। আমরা তাঁহার শোকার্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

'বাণেশ্বর ভারতী—

কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ বাণেশ্বর ভারতী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপুল যশ অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার জীবনের বড় কথা নয়। তাঁহার অন্তরটি ছিল বড়, দরিদ্র এবং নিঃসহায়ের সেবা তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাকে তিনি ব্রতস্বরূপে দেখিতেন, সেবা মনে করিতেন। তাঁহার এই উদার প্রকৃতির জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। আমরা তাঁহার পরলোক-গত আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কনকলতা

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

কনকলতা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল। সে যে আবার বাঁচিয়া উঠিবে তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। নিশ্চিত মরণ বলিয়াই সকলে জানিত, কনকলতা নিজেও তাহাই জানিত।

কিন্তু কনকলতা সত্য সত্যই মরিল না, বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচা নয়ত কি! সকাল বেলাও কনকলতা বিছানায় পড়িয়া গোঙাইতে ছিল। পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, এমন কি জ্ঞানবোধেরও কোন লক্ষণ ছিল না। হঠাৎ দুপুরে না গড়াইতেই কনকলতা উঠিয়া বসিয়াছে। কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘরকন্নার কাজে লাগিয়াছে।

এতে বিস্মিত না হইলে লোকে আর কিসে বিস্মিত হইবে! নিত্য হালদার পক্ক মাড়ি দুইটি উপরের দিকে উল্টাইয়া দুই দিকে যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া তামাক পাতার গুঁড়া দাঁতে ঘসিতে ঘসিতে বলিল, অবাক যাই রমা!

রমা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি হ'ল ঠানদি!

ঃ ওমা তা' জানিস না। নবীনের বউ না যেতে বসেছিলু, দিব্যি উঠে বসেছে, ঘরকন্নায় মন দিয়েছে। একেবারে যেন জ্যান্ত মানুষ।

রমা মৃদু হাসিয়া ছোট করিয়া বলিল, তাই নাকি।

নিত্য হালদার সমজদার পাইল না, তবু দমিবার পাত্র নয়, বলিল, বলিস কি লা, একি যে সে কথা। আজ সকাল বেলাও যে দেখে এলুম, যা শুধু ওপরটানটা বাকি ছিল। ওমা, এখন খবর নিতে গিয়ে দেখি কোথায় অসুখ—দিব্যি ভাল মানুষের মত কাজ কম্ম করছে। একেই বলে কপালের জোর।

ঃ আজ যে নবীন ঠাকুর পো আসবে ঠানদি!

ঃ তাই নাকি। আমিও ত' বলি, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কাজের এত তাড়া কেন। যাই বলিস বউটার পতি ভক্তি আছে।

নিত্য হালদারের কল্যাণে সারা পাড়াময় রটিয়া গিয়াছে যে, কনকলতা মরিতে মরিতে দৈব কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছে।

কথাটা নেহাৎ বাজে নয়। কনকলতা সত্যই মরণের মুখে গিয়াছিল। বাঁচিবার কোন লক্ষণ ছিল না।

ক্রমাগত ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়িয়া কনকলতা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতি পরিচিত এ ব্যাধির সহিত লড়িবার মত উৎসাহ বা শক্তি তাহার ছিল না। কনকলতার কোন দোষ নাই। একা মানুষ কাহাতক আর পারে। মাসের মধ্যে প্রায় বার তের দিনই জ্বর হয়। কত বা সে কুইনাইন কিনিতে পারে আর কত কালই বা বার্লি খাইয়া থাকিতে পারে! জ্বর যখন নিশ্চিত তখন উপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না।

পল্লীবাসীরা এমনই করে। বাঁচিবে না জানে, তবু তাহাদের বাঁচিতে হয় মরিয়া। হয়ত চাষ করিতে চলিয়াছে, রওয়ানা হইতে না হইতে জ্বর আসিয়া যায়, চাষ করা আর হয় না, কাঁথা মুড়ি দিয়া বিছানায় শয়ন করে। কয়েক ঘণ্টা গোঙাইবার পর উঠিয়া বসে, নিশ্চিন্ত মনে ভাত খায়। যাহাদের অন্ন জোটা দুষ্কর তাহাদের অষুধ খাওয়া এবং রোগীর পথ্য করা ভাববিলাসিতা মাত্র। জ্বর সারিলেই লাঙগল ধরিতে হয় কাজেই বার্লি সাগু খাওয়া সম্ভবপর নয়।

কনকলতাকে লাঙগল ধরিতে হয় না, কোথাও কাজ করিয়া রোজগার করিতে হয় না। অবশ্য রোজগার করিবার মত কোন সুবিধা নাই, থাকিলে সে করিত। তবু তাহার বার্লি সাগু খাইয়া পড়িয়া থাকা চলে না, শিশু পুত্রটির জন্য উঠিতে হয়, অন্ন সংস্থানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়, দুর্দশার কথা ভাবিয়া কাঁদিতে হয়।

চেষ্টার ত্রুটি সে করে নাই কিন্তু বাঁচিতে পারিল না। ঊনিশ বছর এখনও পূর্ণ হয় নাই, মরিতে সে চায় না কিন্তু বাঁচিতেও পারিল না।

বাঁচিবার জন্য তাহার কত আকুল প্রয়াস। মাত্র ত' আঠার বছর কয়েক মাস—এখনই কি সে মরিতে পারে—না, পারে না। অন্তর-দেবতার পদধ্বনি সে শুনিতে পায়। তাহাকে বাঁচিতে হইবে। তাই মৃত্যুর দ্বারে পেঁাছিয়াও হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে মুখে উল্লাস, অন্তরে মৃত্যু দেবতার প্রতি ভ্রুকুটি।

নিত্য হালদার সকলের পূর্বেই আসিয়াছে এবং কনকলতা জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে এক ফাঁকে আবেদনটা পেশ করিয়াও রাখিয়াছে। যে হাবাতে দেশ, বলা যায়, শত জনে দুই শত আব্দার, অনুরোধ করিয়া বসিবে।

মসলা রাখিবার একটা পুরাতন বাটি কনকলতা ফেলিয়া দিয়াছিল, নিত্য হালদার তাড়াতাড়ি তুলিয়া বলিল, ফেলতে নেই বৌমা, বড় কাজে আসবে। কলকাতায় গিয়ে ত' ঘর কন্না করতে হবে তখন পাবে কোথায়।

কনকলতা বলিল, এটা পুরানো হয়ে গেছে, মিছিমিছি বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভারি ত' দাম, কিনে নেব'খন।

নিত্য হালদার বাটিটি তথাপি ঝুড়িতে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, এখন ত' থাক, কেউ ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে. হ্যা, নিত্য হালদার চারিদিকে একবার তাকাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন, বুড়ী খুড়ীমার কথা ভুলো না যেন বৌমা, ক'দিন আর বাঁচব—ছেলেটা যদি আজ থাকত'......নিত্য হালদার চোখ মুছিলেন।

কনকলতা বলিল, আমার ঠিক মনে থাকবে খুড়ীমা। আপনাকে আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কালীঘাটে গঙ্গাস্নান করাব, দক্ষিণেশ্বর বেলুড়ে তীর্থ করাব।

—আমার যত চুল তত তোমার পরমায়ু হোক। নিত্য হালদার আশীর্বাদ করিলেন।

একে একে গাঁয়ের অনেকেই খোঁজ খবর লইতে আসিল। সরসীবালা দেবী, যোগেশের মা, বগলাসুন্দরী, মণ্টুর দিদিমা —সকলেই আসিলেন।

সরসীবালা দেবী বাতে পঙ্গু, দুই উরুতে দুই হাত চাপিয়া কোনভাবে ধড়টা তুলিয়া রাখিয়া বলিল, তা'হলে খোকার মা চললে!

কনকলতা জবাব দিবার পূর্বেই নিত্য হালদার বলিল, নবীনের মাইনে বেড়ে ছ'কুড়ি পাঁচ টাকা হল—যাবে না বল কি। কোন দুঃখে এখানে পড়ে থেকে মরবে।

কনকলতা একটা পিঁড়ি আগাইয়া দিল, সরসীবালা দেবী অতি কষ্টে বসিতে বসিতে বলিল, বাতের জ্বালায় মরছি, নড়বার চড়বার শক্তি নেই; খবর পেয়ে লাঠি ভর করে এলুম।

কনকলতা কি একটা জিনিস আনিবার জন্য মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য রান্নাঘরে গিয়াছিল। হারানের দিদিমার ভাগ্য ভাল, রান্নাঘরের দুয়ারে কনকলতাকে একা পাইল। এত বড় সুযোগ হারানের দিদিমা ছাড়িতে পারে না, চুপি চুপি বলিল, নবীনের বউ তুমি ত' মা শহরে চল্‌লে, আমাদের উপায় কি হবে?

কনকলতা বলিল, কি করি, উনি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেনই। কমত' ভুগলুম না।

—তোমরা কি কালই যাবে।

—তা' যেতে হবে বই কি। ওকে ত' জানেন তর সয় না। এসেই এমন তাগিদ লাগাবে যে এক দণ্ড দেরি করবার উপায় থাকবে না।

—না, কালই যাও। বেশি দিন থাকলে বলা যায় না নবীনেরও ম্যালেরিয়ায় ধরতে পারে। হারানের দিদিমা দরজার দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি দিয়া নিম্নস্বরে বলিল, আমার হারানের একটা হিল্লে তোমাকে করতেই হবে।

—আমি গিয়ে একটু গুছিয়ে নিই পিসীমা, তারপর হারানকে নিয়ে যাব। ওর সঙ্গে সাহেবদের কত ভাব, একটা চাকরি হয়ে যাবে।

তোমার ধনেজনে উন্নতি হোক মা। নবীনকে একটু বল, নবীন চেষ্টা করলে একটা কিছু হবেই। ঠিকানা জানিও, চিঠি দেব।

হারানের দিদিমা বেশিক্ষণ সুযোগ পাইল না। লোকজন আসিয়া পড়ায় কথার মোড় ঘুরাইতে হইল।

যাহারা সুযোগের জন্য চেষ্টা করে তাহারা সুযোগ পায়। কনকলতাও কাহাকেও বিফল করিতে পারিল না। শুধু একদিনের জন্য অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া, সকলের অনুরোধ রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল।

নবীন সন্ধ্যার কিছুকাল পরেই বাড়িতে পৌঁছিয়াছে। কনকলতার সঙ্গে দুই একবার দেখা হইয়াছে কিন্তু কোন কথা হয় নাই। পাড়াপড়শীরা থাকায় কনকলতা ঠুক্ করিয়া একবার প্রণামটা সারিয়া লইবার পর্যন্ত কোন সুযোগ পায় নাই।

নবীন কয়েকবার চেষ্টাও করিয়াছে কিন্তু কনকলতার তরফ হইতে কোন সাড়া পায় নাই। বেচারী কনকলতা! কি করিবে সে, বয়স্ক লোকরা রহিয়াছে, তার ওপর কত কাজ। এখন ত' আর সে ছেলেমানুষ নয়, কত বড় দায়িত্ব তাহার উপর রহিয়াছে। চা ও খাবার করিয়া দেওয়া, রাত্রের রান্না, ছেলেটার বার্লি—কত কাজ।

সকল কাজকর্ম মিটিতে মিটিতে প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। কনকলতা নিজে কিছু খাইল না। কি করিয়াই বা সে খাইতে পারে। এত বড় ব্যাধি, এত পরিশ্রম এবং এত উত্তেজনায় সে এক গ্রাস ভাতও গিলিতে পারিল না। মাথা ধরিয়াছে, শরীর যেন একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। কোন ভাবে চাদর মুড়িয়া চোখ বুজিতে পারিলে যেন সে বাঁচে।

স্বামীর পাতের প্রসাদ কনকলতা বহুকাল খাইতে পারে নাই, তাই নবীনের থালা হইতে একটা মাছের কাঁটা ভক্তিভরে তুলিয়া খাইল।

কনকলতা তাড়াতাড়ি করিয়াই সকল কাজ শেষ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। সব কিছুই যে তাহাকে একা একাই করিতে হইয়াছে। কালই তাহাদের রওয়ানা হইতে হইবে, নেহাৎ যদি সম্ভবপর না হয় তবে পরশুদিন যাত্রা করিতেই হইবে। পরশুদিনের বেশি সে দেরি করিতে পারে না। তারপর নবীন যে কড়া মানুষ শত অনুরোধ করিলেও একদিন থাকিয়া যাইতে রাজি হইবে না। না, সে দেরি করিবে না, বলা যায় না, বেশি দিন থাকিলে নবীনেরও ম্যালেরিয়া ধরিতে পারে—সে নিজেও হয়ত পুনরায় অচল হইতে পারে।

নবীন ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল। কনকলতাকে দেখিয়া বলিল, কাজ মিটল?

কনকলতা টলিতেছে, কোনভাবে দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, হাঁ, সব কিছু গোছাতে হল কি না।

ঃ তোমার না ভীষণ অসুখ গেছে, তোমার এই দোষ, খালি খালি শরীরের উপর অত্যাচার করা, দুদিন পরে গোছালে কি এমন ক্ষতি হত?

দুদিন পরে? কনকলতা কোন জবাব দিতে পারিল না, তাহার অন্তরটা শুধু কাঁপিয়া উঠিল।

নবীন কনকলতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না, বলিল, রাত অনেক হয়েছে, আর কিছু কর না, এবার এসে শোও। এত অত্যাচার কর বলেই ত' অসুখ সারে না।

কনকলতা আলো নিভাইয়া দিয়াছে তাহাই তাহার মুখ দেখা গেল না। আঁচলে চোখ মুছিয়া কনকলতা ধীরে ধীরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

নবীন কনকলতার হাতটা টানিয়া বলিল, রাগ করলে, ঠান্ডা লাগাচ্ছ বলেই বল্‌লুম। এ দুর্বল শরীরে এত পরিশ্রম কখনও সয়। ছিঃ রাগ কর না। আবার অসুখ বাড়লে কত অসুবিধা হবে বলত'।

কনকলতার অভিমান ভাসিয়া গেল, স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া ছেলেমানুষের মত সোহাগ করিয়া বলিল, আমায় কবে কলকাতায় নিয়ে যাবে?

ঃ কলকাতায়! কেন—চিকিৎসা করাতে না বেড়াতে?

ঃ যাও ঠাট্টা কর না। সত্যি বলছি, ক' দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ। যত দিনেরই থাক, একদিনের বেশি কিন্তু থাকা হবে না, আমার সব গোছানো আছে। যে ম্যালেরিয়া, তোমাকে একদিনের বেশি এখানে থাকতে দেব না।

ঃ আমি যে দেশে বাস করব বলে সঙ্কল্প করেছি।

ঃ ও সব পাগলামি ছাড়। দেশে আর মানুষ বাস করতে পারে। সব পালাচ্ছে, যারা পালাতে পারছে না ওরা মরছে।

(শেষাংশ ১৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

[৬]

প্রমোদ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু প্রহেলিকা দেখতে পেলো যে, বাঁড়ুজ্যে অর্থাৎ মাস্টার ম'শায়ের চালটা একটু ফিরেছে। প্রথম যখন সে আসে এ বাড়িতে তখন চুল সে কখনও ফেরাত না। এখন ক্রমে চুলের উপর চিরুণী বুরুষের বেশ কারিগরি দেখা যেতে লাগলো। দাড়ি কামানটা আগে বড় হ'ত না তার, আজকাল রোজ সে দাড়ি কামায়। কাপড় চোপড়ের দৈন্য বা এলোমেলো ভাব তার যায় নি, কিন্তু নেহাৎ ময়লা কাপড়, যা' সে আগে রোজই পরতো তা আর এখন তার বড় দেখা যায় না। মোট কথা, বাঁড়ুজ্যের অপটু চিত্তের পক্ষে যতদূর সম্ভব হয়েছে, ততখানি বেশবিন্যাস সে এখন করে। এ পরিবর্তনটা এত সুস্পষ্ট নয় যে তা' প্রমোদের চোখে পড়ে, কিন্তু প্রহেলিকার চোখে তা' পড়লো। সে মনে মনে হাসলো।

প্রহেলিকার সম্বন্ধে বাঁড়ুজ্যে যা বলেছিল সেটা চেষ্টাকৃত অতিরঞ্জন হলেও, তার মূলে এইটুকু সত্য ছিল যে, আঁক কষতে প্রহেলিকা প্রায় ভুল করে। কিন্তু তাতে বাঁড়ুজ্যে রাগ করা বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, যেন খুশীই হয়। আঁক বোঝাবার সময় প্রহেলিকা তার চক্ষুদুটি বড় ক'রে যেমন ক'রে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তাতে বাঁড়ুজ্যে নিজেকে বিশেষ পুরস্কৃত মনে করে, আর তার মনের এ খুশী ভাবটুকু সে যতই গোপন করুক, প্রহেলিকার চোখে ধরা প'ড়ে যায়। আর তাই সে রোজই ইচ্ছে ক'রেও দু'চারটে ভুল ক'রে বসে, শুধু মাস্টার মশায়ের তাকে বোঝাবার জন্য আকুলি-বিকুলি দেখবার জন্য। এমন কৌতুক বোধ করে সে এতে যে, একটা আঁক নিঃশেষে বোঝা হ'য়ে গেলেও সে তার পর এমন একটা বোকার মত প্রশ্ন ক'রে বসে যে বাঁড়ুজ্যেকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।

একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে যেন চায় না। নিউটনের Law বলে যে প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা সমান উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়। প্রহেলিকা বলে, "তা'হলে ধরুন, ঘোড়া গাড়ীটাকে যখন টানে, তখন গাড়ীটাও ঘোড়াকে ঠিক সমান জোরে উল্টোদিকে টানে। তবে গাড়ীটা এগোয় কেন?"

এ কথাটা বাঁড়ুজ্যে তাকে খুব কম ক'রে একশো বার বুঝিয়েছে, তবু সে-রকম কোনও অঙ্ক এলেই প্রহেলিকা আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই প্রশ্নই করে, একটু চেহারা ফিরিয়ে, বাঁড়ুজ্যে কথাটা বোঝাতে গিয়ে যে গলদ্‌ঘর্ম হয় সেইটা সকৌতুকে শুধু দেখবার জন্যে।

ক্রমে প্রহেলিকার যেন সাহস বেড়ে গেল। সে মাস্টার মশায়কে নিয়ে দিব্যি নাচাতে লাগলো। একদিন নিউটনের নিয়ম নিয়ে তিনশ' প'য়ষট্টিতম আলোচনার মাঝখানে সে জিগ্‌গেস ক'রে বসলে, "হাঁ, মাস্টার মশায়, এই নিয়মটা কি মানুষের বেলায়ও খাটে?"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "খাটবে না? আপনি যদি একটা কলসী টেনে তোলেন, তবে আপনি যে শক্তিটা দিয়ে তাকে টানেন কলসীও ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি দিয়ে আপনাকে টানে।"

"কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে একজন আর একজন মানুষকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে, তার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই।"

হেসে বাঁড়ুজ্যে বললে, "ও! এ যে টানের কথা বলেছেন, সে টান Staticsএর নিয়মের বাইরে। মনের টানটা তো আর matter-এর motion নয়।" তার কান দুটো একটু লাল হ'য়ে গেল, গলাটা অযথা একটু ধ'রে গেল।

প্রহেলিকা কিন্তু এত সহজে তাকে ছাড়লো না, সে খুব গম্ভীরভাবে বললে, "তবু এ নিয়ম কি মোটেই খাটে না? অনেক সময় তো দেখা যায় যে, একজন যখন আর একজনকে খুব বেশী ক'রে ভালবাসে, তখন শেষ পর্যন্ত সে লোক তাকে ভাল না বেসে পারে না।"

বাঁড়ুজ্যের অভ্যস্ত রসিকতা প্রহেলিকাকে পড়াবার সময় যেন কোথায় নিখোঁজ হয়ে পালিয়ে যায়। নইলে সে এ কথার রসটাও গ্রহণ করতে পারতো আর একটা বেশ লাগসই জবাবও দিতে পারতো। তা' না ক'রে সে কান দুটো আরও লাল ক'রে শুধু জবাব দিলে, "এটা সাইকলজির বিষয়, অঙ্কশাস্ত্রের নয়।"

তবু ছাড়ে না। প্রহেলিকা বললে, "সাইকলজি দিয়ে মনের আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিমাণ, গতি বা ক্রিয়া ঠিক Statics dynamics-এর মত অঙ্ক ক'ষে বের করা যায় না?"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "বোধ হয় যায় না, কিন্তু আমি জানি না, সাইকলজি কখনও পড়ি নি।"

"আমার ভারী জানতে ইচ্ছে হয়। আমি বোধ হয় ফিলসফি নিলে ভাল করতাম, না? মানুষের মন কেমন ক'রে কাজ করে, কিসে কি ভাব হয়, কেন কে কি করে, এ সব জানতে পারা যায় নিশ্চয় সাইকলজি প'ড়ে। কি বলেন?"

"হয়তো যায়।"

"আচ্ছা, আপনার বন্ধুদের মধ্যে সাইকলজি ভাল জানেন এমন কেউ নেই?"

"হাঁ, আছে বই কি—প্রমোদ ঘোষ Experimental Psychology নিয়ে এম এ পড়েছিল।"

"প্রমোদ ঘোষ? ঐ যার 'উড়ো জাহাজ' বিবিক্তায় বের হচ্ছে?"

"বোধ হয় সেই, তার গল্প লেখাটেখা আসে। আর—হাঁ—সে বলেছিল বটে যে, বিবিক্তায় নাকি তার কি গল্প বের হবে।"

"চমৎকার লিখেছেন তিনি। আচ্ছা তাঁর কি বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"তবে বোধ হয় মেয়েদের সঙ্গে তিনি খুব মেলামেশা করেন, না?"

"কই তা' তো জানি না।—আচ্ছা থাক, এখন কাজের কথা হোক, এই আঁকটা কষুন তো।" এ প্রসঙ্গটা বাঁড়ুজ্যের কেমন ভাল লাগছিল না।

প্রহেলিকা কিন্তু বললে, "নইলে মেয়েদের, বিশেষ ক'রে কলেজে-পড়া মেয়েদের মনের তলার কথাগুলো তিনি কেমন ক'রে টের পান—যে সব কথা লিখেছেন, ঠিক যেন আমাদের মনের কথা।"

প্রমোদের উপর বাঁড়ুজ্যে হঠাৎ বিষম চ'টে উঠলো মনে মনে। মরিয়া হ'য়ে সে বললে, "কি জানেন, ছোকরা ইদানীং একেবারে ব'খে গেছে। কলেজের কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে সে যাচ্ছে-তাই বখামি ক'রে বেড়াচ্ছে।"

গম্ভীর মুখে প্রহেলিকা বললে, "তাই বলুন, আর সে-বেচারীরা সরল প্রাণে তাকে যা' ব'লেছে সেইগুলো হাটের মাঝে ভেঙ্গে ব'লে তিনি বাহবা নিচ্ছেন। বিশ্বাসী মেয়েদের প্রাণের কথা ভাঙিয়ে পয়সা রোজগার করছেন। বেশ লোক্ তো? আপনার যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তো ব'লে দেবেন তাঁকে যে এ ভারী অন্যায়।"

প্রসঙ্গটা জোর ক'রে চাপা দেবার জন্য বাঁড়ুজ্যে বললে, "বলবো। আচ্ছা এখন ক্যালকুলাসটা বের করুন, সেদিন বুঝেছেন তো function এর কথাটা?"

"কিচ্ছু বুঝি নি।"

বাঁড়ুজ্যে তখন প্রাণপণ ক'রে তাকে ক্যালকুলাসের গোড়ার কথা বোঝাতে আরম্ভ করলে।

আর একদিন ইকনমিক্স পড়াবার কথা। বইখানা চেপে রেখে প্রহেলিকা বললে, "দেখুন ইকনমিক্স জিনিসটা কিছু নয়। এতে value সম্বন্ধে যা' বলে সব ভুল। Value in exchange, value in use সব বাজে, এ ছাড়া আর একরকম ভ্যালু নেই কি? জিনিসের একটা নিজস্ব ভ্যালু আছে যা ঠিক value in useও নয় value in exchangeও নয়, আর সে value টাকা আনা পাই দিয়ে মোটেই হিসেব করা যায় না।"

বাঁড়ুজ্যে এ কথায় একটু ঘেমে উঠলো। এ সব বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তীর্ণ নয়, আর প্রহেলিকা যেমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করে তাতে সে পরিধি সহজেই ছাড়িয়ে গিয়ে এমন জায়গায় তাকে টেনে নিয়ে যায় যেখানে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া তার উপায়ান্তর থাকে না। তাই সে বললে,—

"হাঁ, কোনও কোনও ইকনমিস্টের মতে এমনি একটা নিজস্ব মর্যাদা জিনিসের আছে—যেমন মার্ক্স-এর মতে। কিন্তু সে সব নিয়ে Passএ আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। সেকথা বরং আর একদিন আপনাকে বুঝিয়ে বলবো।"

মার্ক্সের মত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান তার বিশেষ ছিল না, তাই কথাটা আপাতত চাপা দিয়ে বাঁড়ুজ্যে ভাবলে যে একদিন নিখিলেশের কাছে জিনিসটা ভাল ক'রে বুঝে এসে সে প্রহেলিকাকে বোঝাবে। কিন্তু, বৃথা আশা! প্রহেলিকা বললে,—

"মার্ক্স্ ছাই বলেছেন। তাঁর মত তো এই যে জিনিসটা করতে কতটা বা কতক্ষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে সেইটে তাঁর নিজস্ব ভ্যালু"—

নিজের অজ্ঞাতসারে বাঁড়ুজ্যে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো। একথা এ মেয়েটা জানে—আর বাঁড়ুজ্যের নিজের এ সম্বন্ধে একটা আবছায়াময় ধারণা ছাড়া কিছুই নেই!

প্রহেলিকা বললে, "কিন্তু আমার একখানা বই আছে, এক বন্ধু সেটা উপহার দিয়েছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন। বইখানার নতুন দাম দশ আনা—এই তার value in exchange. তার value in use কিছুই নয়, কেন না তার ভিতর গোটাকয়েক কবিতা আছে সে আমার মুখস্থ—সুতরাং তা' দিয়ে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। অথচ আমার কাছে সে বই অমূল্য, একশো টাকা পেলেও আমি তা বেচবো না। এ ভ্যালু, তার বাজার দরও নয় ব্যবহারের মূল্যও নয়, শ্রমের পরিমাণও নয়—টাকা আনা পাই দিয়ে এর মাপ হয় না—এ কি বস্তু?"

যা' ভেবেছিল তাই। এক প্রশ্নে প্রহেলিকা বাঁড়ুজ্যেকে অথৈ জলে টেনে ফেললে। এর উত্তর বাঁড়ুজ্যে হাতড়ে পেলো না। সে বললে,

"ও সব sentimental value নিয়ে ইকনমিক্স মাথা ঘামায় না, কেন না ওকে কোনও নিয়মের ছকে ফেলা যায় না।"

মনে মনে সে ভাবলে, নিখিলেশের সঙ্গে এই কথা নিয়ে একটা জোর তর্ক অবিলম্বে ক'রতে হবে।

প্রহেলিকা বললে, "কিন্তু ধরতে গেলে এই ভ্যালুটাই আসল ভ্যালু। তা' ছাড়া ধরুন একটা মানুষের ভ্যালু কি? এই ধরুন, আপনি। আপনার বাজার দর বা value in exchange মাসে প'চিশ, কি পঞ্চাশ, কি জোর একশ' টাকা। কিন্তু বিয়ের বাজারে আপনি হয়তো হাজার টাকার কমে বিকোবেন না, স্ত্রীটি পাবেন ফাউ। আবার যদি কেউ আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তবে সে সমস্ত বিশ্বের সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়েও আপনাকে পেতে চাইবে। এ কী value?"

এ দারুণ বিপদে উদ্ধারের আশায় যে যুক্তি বাঁড়ুজ্যে অবলম্বন করলে, দেখা গেল সেটা খড়ের কুটোর চেয়েও অপদার্থ। সে হেসে বললে,

"দেখুন ইকনমিক্সের বিষয় মানুষ কেনা বেচা নয়, মাল—commodity—কেনা বেচা। মানুষ তো মাল নয়। আজকালকার দিনে বাজারের কেনা বেচায় মানুষের আদান প্রদান হয় না।"

"কিন্তু এটা কি ঠিক নয় যে এই মানুষকে পাবার চেষ্টাটাই মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা; ভালবাসার চেয়ে বড় জিনিস কিছুই নেই। মানুষ শুধু খেয়ে বাঁচে না, বরং ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে বাঁচে। শুধু খাবার পরবার উপায়

নিয়ে জিনিসের দরদাম বাঁধবো তার প্রাণের দিকটা চাইবো না, এ নিয়ে যদি ইকনমিক্স শাস্ত্র হয়, তবে সেটা ভুল হ'তে বাধ্য।"

প্রসঙ্গটা ভয়াবহ, এ নিয়ে ঘাঁটাতে বাঁড়ুজ্যের সাহসে কুলোয় না, কিন্তু কি জানি কেন, এটা ত্যাগ করতেও সে পারে না।

সে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে বললে,

"ঠিক বলেছেন। মানুষ যখন কোনও কিছুর মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে হৃদয়ের দিকটা ভুলে যায় শুধু তার ভৌতিক জীবনের মাপ কাঠি প্রয়োগ করে, তখন বিচারটা খুবই ভুল হ'য়ে যায়। তা' থেকে আসে ভুল values আর সেই ভুল values নিয়ে মানুষ মারামারি কাটাকাটি করে—যুদ্ধ করে, মামলা করে, দাঙ্গা করে। মানুষকে এ ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করবার জন্যে দরকার নতুন values সৃষ্টি—যার ভিতর তার হৃদয়ের দিকটা হবে প্রধান।"

"অর্থাৎ ভ্যালু জিনিসটা a function of two variables—দুটি হৃদয়। কি বলেন?"

"হয়তো তাই, কিন্তু"—

"হয়তো বলছেন! নিশ্চয় তাই। আমার বোধ হয় আপনার হৃদয় নেই। কখনও ভালবাসেন নি কাউকে। কেমন?"

হৃদয় মানে যদি হৃৎপিণ্ড হয়, তবে সেটা যে তার আছে সে কথা বাঁড়ুজ্যে তখন খুব জোরের সঙ্গেই অনুভব করছিল, কেন না সে যন্ত্রটা তখন তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড বিক্রমে হাতুড়ি পিটছিল। কিন্তু তাতে তার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক তা' একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। খানিকক্ষণ মুখ চেপে থেকে বুকের ধড়ফড়ানিটাকে কায়দা ক'রে সে বললে,

"দেখুন এটা অবান্তর কথা। এর উত্তর, ওর নাম কি—যাকগে সে কথা, এখন বইটে খুলুন"—

খিল খিল ক'রে হেসে উঠে প্রহেলিকা বললে,

"যা ভেবেছি তাই। আপনারা সব একজাত। ভালবাসার কথা মন খুলে প্রকাশ করতে বা আলোচনা করতে কিছুতেই পারেন না আপনারা। আমার অনেক পুরুষ বন্ধুকে পরখ ক'রে দেখেছি—সামনাসামনি কথাটা পাড়লেই তারা সবাই একেবারে হকচকিয়ে যায়। কেন? ভালবাসেন যদি তবে সে কথা বলতে বাধা কি? না বাসেন তাই বা বলতে কি দোষ? এতে অত ভড়কে যাবার কি আছে?"

যেটুকু আত্মসংযম বাঁড়ুজ্যে বহুকষ্টে সংগ্রহ করেছিল এ কথায় তা' একেবারে চুরমার হ'য়ে গেল। সে স্পষ্ট হাঁপাতে লাগলো, আর গা ব'য়ে ঘাম ঝ'রতে লাগলো তার। এতে সে নিজের উপর খুব চ'টে গেল, কিন্তু তাতে বিশেষ উপকার হ'ল না।

তার পর প্রহেলিকা আরও কি কথা বললে, তা' বাঁড়ুজ্যে শুনতে পেলে না। সে মনে মনে তার উত্তরটা তৈরী করতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে সে তার জবাব দুরস্ত ক'রে বললে,

"যার দাম বা value in exchange মাসে প'চিশ টাকা তার ও সব ব্যারাম হ'তে নেই।"

"ব্যারাম কি কখনও কারও হ'তে আছে না কি? ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা এসবও হ'তে নেই, তবু হয় না কি? ভালবাসাটা যদি ব্যারাম-ই হয়, তবে সেটা হ'তে নেই ব'লে হবে না, এমন কোনও কথা নেই। হাঁ, তবে আপনাকে দেখে মনে হয় বটে যে আপনার হয়তো এ ব্যারাম নাও হ'তে পারে। আচ্ছা কেন হয় না বলুন তো?"

মেয়েটা দারুন নাছোড়বান্দা, নাচার হ'য়ে বাঁড়ুজ্যে বললে, "জানি না।"

প্রহেলিকা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, "আমার মনে হয়—না থাক, সে কথা বললে আপনি রাগ করবেন"—

ব'লতেই হ'ল, "না, না রাগ করবো কেন? বলুন।"

"আমার মনে হয় ভালবাসা আপনার কাছে ভিড়তে পারে না আপনার নামের ভয়ে; আচ্ছা আপনাকে হর্যক্ষ বিক্ষোভ নামটা কেন দিলে বলুন তো!"

এই নামটা নিয়ে বন্ধু মহলে বাঁড়ুজ্যেকে অনেক রসিকতা শুনতে হয়েছে, কিন্তু কেউ কোনও দিন রসিকতা ক'রে জিতে যেতে পারে নি তার কাছে। সে তার চেয়ে বেশী রসিকতা ক'রে নামের মর্যাদা রক্ষা ক'রে গেছে, যদিও বন্ধুদের কাউকে এই জিহ্বা বিক্ষোভকারী উচ্চারণ ক'রতে সে বাধ্য করতে পারে নি। একবার একজন তাকে ডেকেছিল 'কুৎকুতাক্ষ' ব'লে, সেদিন শুধু সে হেসে জবাব দিতে পারে নি, মুষ্ঠ্যাঘাতে উত্তর দিয়েছিল। তাই তার নামটা বন্ধুমহল যদিও বয়কট করেছিল, তা নিয়ে তারা তাকে সঙ্কুচিত ক'রতে পারে নি।

আজ কিন্তু সে ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ করলে তার এই নামের জন্য। যদি সেই মুহূর্তে ব্ল্যাক বোর্ডে চকের আঁকের মত এ নামটা সে ঝাড়ন দিয়ে পুঁছে ফেলতে পারতো, তবে তা' করতো। কিন্তু যেহেতু তা' পারা গেল না তাই সে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে শুধু বললে,

"নাম কার কেন হয় তা কি বলা যায়? আপনার নামটাই কি কোন হিসেব ক'রে রাখা হ'য়েছিল?"

হেসে প্রহেলিকা বললে, "কেন আমার নামটা চমৎকার মিলে যায় নি আমার চরিত্রের সঙ্গে? আমার পুরুষ বন্ধুরা তো সবাই বলে যে আমি সত্যি সত্যিই একটা জীবন্ত প্রহেলিকা, আমাকে বোঝা যায় না। আপনিও নিশ্চয় তাই ভাবছেন। না?"

গম্ভীরভাবে বাঁড়ুজ্যে বললে, "না। কিন্তু অনেকটা সময় বাজে কথায় নষ্ট হয়েছে, এখন দয়া ক'রে বইখানা খুলুন।"

খোলা হ'ল বই—কিন্তু পড়া সেদিন বেশী এগুলো না। খানিকটা অগ্রসর হ'তেই প্রহেলিকা হঠাৎ ব'লে উঠলো, "ইকনমিক্স যদি ঠিক হয়, তবে আমাদের জীবনের পনের আনাই বাজে খরচ। লেখা পড়া, বিশেষত কাব্য সাহিত্য

প্রভৃতি, গান বাজনা, সবই বাজে। মানুষের একমাত্র কর্তব্য পেট থেকে প'ড়েই ধন সৃষ্টি করা, সংগ্রহ করা, আর invest করা। একটা বোকা মেয়ের মাথায় ইকনমিক্স ম্যাথামেটিক্স ঢোকাবার বৃথা চেষ্টা না ক'রে আপনার উচিত চাষ করা, কি জুতো সেলাই কি—আর কিছু না পারেন একটা মনিহারী দোকান করা।"

বাড়ুজ্যে এবার উঠলো। "আজ এই পর্যন্তই থাক।" ব'লে উঠে সে চোঁচাঁ ছুট দিয়ে উঠলে গিয়ে প্রমোদের দোকানে হাঁপাতে হাঁপাতে। সেখানে গিয়ে তিন গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হ'য়ে সে বললে,

"বাপ, প্রাইভেট টিউশন কি ঝকমারী। বিশেষ মেয়েদের পড়ান, আর সে মেয়ে যদি হয় আমার ছাত্রীর মত পাগলাগারদের পলাতক বাসিন্দা।"

প্রমোদ অতিকষ্টে তাকে উত্তম মধ্যম দেবার আকাঙ্ক্ষা দমন করলে। (ক্রমশ)

কনকলতা

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

ঃ এই আমাদের মাতৃভূমি, পালালে চলবে কেন। লোক রেখে আমি নিজে চাষ আবাদ করব। খাঁটী দুধ, তরিতরকারি মাছ খেয়ে বাঁচব। এত দিন ত' শহরে ছিলুম—ও আমাদের স্থান নয় বড়লোকদের আর বদমাইস গুণ্ডাদের স্থান। আমার চুলের ছাঁট, কায়দা দুরস্ত কাপড় চোপড়, চালচলন আর পালিশ করা ভাষা পর্যন্তই সার—ভেতরটা একেবারে ফাঁপা।

ঃ বলছ কি! চাষ করবে? জমিতে কতটুকু ফসল হয় যে পেট ভরে খাবে, পাটের দর কত, চাষ করবে কাকে নিয়ে? এক টাকা, পাঁচ সিকে মজুরী দিয়েও লোক পাওয়া যায় না। ম্যালেরিয়ায় ভুগতে ভুগতে লাঠি ভর করে চলে আবার লাঙগল ধরবে। কলকাতায় আরাম কেদারায় বসে ফ্যান চালিয়ে "সোনার বাঙলার" প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লিখ, এখন কলকাতায় চল।

ঃ দেশের খবর কিছু কিছু জানি কনকলতা—কিন্তু উপায় কি, বাঁচতে ত' হবে।

ঃ এখানে বাঁচতে চেষ্টা করা বৃথা। দশজন যখন থাকছে আমরা কেন থাকতে পারব না, এসব বাজে সেণ্টিমেণ্ট্যাল যুক্তি ছেড়ে দাও। এমন একটা বাড়ি পাবে না যে বাড়িতে অসুখবিসুখ লেগে নেই; কারও স্বাস্থ্য ভাল নেই, বহু পরিবার নির্বংশ হয়ে গেছে।

নবীন স্তম্ভিত হইয়া রহিল, কোন জবাব পাইল না, এত বড় সমস্যার কোন সমাধান খুঁজিয়া পাইল না।

কনকলতা বলিল, এ সাধারণ ম্যালেরিয়া নয়, সাধারণ ম্যালেরিয়ায় হাজার হাজার লোক মরে না। চাষ করার দুর্বুদ্ধি ছাড়, যাই মাইনে পাওনা কেন আমাদের চলে যাবে—অন্তত ৩৬৫ দিনের মধ্যে দু'শ' দিনত' বিছানায় পড়ে থাকতে হবে না।

ঃ আমার চাকরি গেছে—

ঃ চাকরি গেছে! কনকলতা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এত আশা ভরসা, এত কল্পনা, বাঁচিবার এত চেষ্টা সকলই এমনভাবে একেবারে ধূলিস্মাৎ হইয়া গেল! কনকলতা ভাবিতে পারিতেছে না, তাহার শিরা উপশিরাগুলি যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মাথায় রক্তের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে।

সর্বনাশ, চাকরি গিয়াছে! সে ত' বাঁচিতে পারিল না, কাল কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে না। মান সম্মান সবই গেল। সে নিজে কতজনকে কত আশা কত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে—তারপর? অপমান, অত্যাচার, নিন্দা, বিদ্রূপ সে কি করিয়া সহিবে!

নবীন ডাকিল, কনকলতা কোন সাড়া দিল না। নবীন ভাবিল, বেচারী, দুর্বল শরীরে আর জাগিয়া থাকিতে পারে নাই, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কনকলতা ঘুমায় নাই, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। বেচারী! আর যদি তাহার জ্ঞান না ফিরিত। এই যদি তাহার শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস হইত!

আবার হয়ত কনকলতার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে। কনকলতার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, সে ভাবিবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু ভিন্ন যে আর কোন সমাধান নাই।

তারপর যখন ভুল ভাঙিয়া যাইবে তখন মুখের হাসি মিলাইয়া যাইবে। মরিতে সে চাহিবে কিন্তু মরিতে কি পারিবে! অন্তরদেবতা তাহাকে স্বামী পুত্রের আকর্ষণেই জড়াইয়া থাকিবার ইঙ্গিত করিবে। শোকে দুঃখে অসুখে বিসুখে সকলের সঙ্গে তাহাকেও আবার চলিতে হইবে। সুখ দুঃখের প্রহসনে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে। হয়ত আজ যে মৃত্যু একান্ত কাম্য তখন আর সেরূপ কাম্য থাকিবে না। ইহাই ত' বাস্তব জীবনের সত্য ধারা।

কনকলতা যখন বাঁচিয়াই উঠিল তবে বাঁচিতে পারিল না কেন, আর যখন বাঁচিবার মত কোন উপায় রহিল না তবে সে আজ মরিল না কেন? অচল পঙ্গু দেহটিকে কেন্দ্র করিয়া জীবন-দেবতার আর্তনাদ ভিন্ন কি আর কোন পথ নাই?

ময়ূর পঙ্খী

(গল্প)

দেবব্রত ঘটক

সম্পর্কের নৈকট্য হয়তো আছে বংশীকে দাদা বলে ডাকে লক্ষণ অন্য কারণে। হিমাইৎপুরে তো নয়ই আশেপাশে পাঁচ-সাতটা গ্রামেও নাকি বংশীর মত ওস্তাদ মাঝি নেই। একথা স্বীকার করে সকলেই বিস্মিত শ্রদ্ধায়। ধরো, পদ্মার নীল জল প্রখর রৌদ্রে আয়নার মত চকচক করছে, মেঘহীন ঝলসানো শূণ্যে তপ্ত বাতাস ভারী হ'য়ে আছে, বহুদূরে হলুদ রঙের মরীচিকা হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঘর্মাক্ত লক্ষণ শ্রান্ত হ'য়ে দাঁড় টানে। মন্থরগতিতে নৌকা চলে। কোথাও কিছু নেই, ভোজবাজির মত আকাশ মেঘে মেঘে ভরে গেল, মেঘের কালো ছায়ায় হলুদ মরীচিকা মিলিয়ে এলো, দমকা হাওয়ায় গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেল, তারপর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানোর পরে এলো বৃষ্টি। কি বৃষ্টি! অজস্র ধারায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হোয়ে যায়, ওপারের গাছপালা ঝাপসা হোয়ে আসে, তীব্র স্রোত আর উত্তাল তরঙ্গে টলমল করে নৌকা। লক্ষণ বিমূঢ় হোয়ে দাঁড় ছেড়ে দেয়। উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে বংশী। এতক্ষণে যেন তার সম্বিত ফিরে এলো। পেশল হাতে সে দাঁড় তুলে নেয়। সুনিপুণ কৌশলে বংশী নৌকার ভারসাম্য বজায় রাখে। মন্ত্রমুগ্ধের মত ক্ষুদ্র নৌকা শান্ত হ'য়ে তার নির্দেশ পালন করে। বংশী কি যাদু জানে? অবাক হ'য়ে লক্ষণ তাকায়। বৃষ্টিতে ভালো দেখা যায় না তবু মনে হয় উচ্ছ্বসিত হাসিতে বংশীর মুখ ভরে উঠেছে। প্রকৃতির রুদ্র লীলায় বংশীর চেতনা ফিরে আসে, অদ্ভুত আনন্দে তার রক্তে মাতন জাগে। ক্ষুব্ধ তরঙ্গ নৌকার গায়ে আঘাত করে, বংশী নিশ্চিত মনে গুনৃ গুনৃ করে গান গায়। ভয়ে ভয়ে লক্ষণ ডাকে—"বংশীদা—"

গান বন্ধ করে একবার তাকায় বংশী। দীর্ঘ কালো পাথরের মত উদ্ধত ভঙ্গী তার। বলে—"ডাকছিস কেন? নৌকা কিন্তু আমি ফেরাতে পারব না বাপু।"

লক্ষণ মলিন হোয়ে যায়। ঢোক গিলে বলে—"কিন্তু এই ঝড়জলে—"

—"প্রাণের ভয় করিস? ছি ছি, তুই না পুরুষমানুষ?" বংশী ভর্ৎসনা করে—"পৃথিবীতে তুই কি চিরদিনের জন্যে বাঁচতে এসেছিস?"

আরো মিইয়ে পড়ে লক্ষণ। মৃত্যুর মত অন্ধকার দিক-দিগন্ত গ্রাস করেছে। সেই অন্ধকারে বংশীকে বীভৎস বলে মনে হোল লক্ষণের। বৃষ্টিধারা তীরের মত গায়ে এসে বিঁধছিল; কিন্তু এই কথা কয়টি শুনে সেই অনুভূতিটুকুও নিঃশেষে লুপ্ত হোয়ে গেল যেন। লক্ষণ নিরুত্তর হ'য়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর দাঁড় ছেড়ে দেয় বংশী—"নৌকো চালা।"

লক্ষণের কাণে কথাটা বেখাপ্পা শোনাল। ঝড়-তুফানে নৌকা চালাতে উদ্দীপ্ত হোয়ে ওঠে বংশী। নৌকা চালিয়ে এমন আনন্দ নাকি নেই। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়,—হঠাৎ একপাশে হেলে পড়ে নৌকা, ঝলকে ঝলকে জল উঠে বুঝি তলিয়ে যায় এবার। পর মুহূর্তেই বংশীর অদ্ভুত কৌশলে সোজা হোয়ে নৌকা তীর-বেগে ছোটে। মূর্ছাহত লক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বালতি দিয়ে নৌকার জল ছাঁকে। পরিশ্রমে একসময় তার হাত ব্যথায় টনটন করে। কিন্তু বংশী? তার হাত দুটি কি ইস্পাত দিয়ে তৈরী? শ্রান্তিহীন নিরুদ্বেগ আনন্দে নৌকা বেয়ে চলে বংশী। বংশীর স্বরে বিরক্তি আর উষ্মা, তাই লক্ষণের কাণ এড়ায় না। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে তাই প্রশ্ন করে—"আমি চালাব? ডাঙ্গা কোনদিকে?"

বাঁহাতের একটা আঙ্গুল দিয়ে বংশী নৌকার উল্টা দিকে ইঙ্গিত করে।

বংশীর কঠিন মুখের পানে তাকিয়ে লক্ষণ দাঁড় তুলে নিল। তারপর নৌকার মুখ পারের দিকে না ঘুরিয়ে দক্ষিণের অজানা পথে পাড়ি দিল। খুশীতে বংশীর রাগ কর্পূরের মত উবে গেল। লক্ষণের পিঠ চাপড়ে বলে—"এই তো মরদের কাজ। ঘরে গিয়ে কি হবে, সেই একঘেয়ে পুরোনো ঘর? তার চেয়ে অজানা পথে নোতুন নোতুন আনন্দ রয়েছে। আসুক ঝড়, কি করবে আমাদের?"

না, বংশী যতক্ষণ পাশে আছে লক্ষণের কোন ভয় নেই। যেমন করেই হোক অন্তত লক্ষণকে সে পারে পৌঁছে দেবেই। সেটুকু বিশ্বাস তার আছে। এরকম ব্যাপার পূর্বে কতবার ঘটেছে, বংশীর নৌকা চালানোর গুণে আরোহীসমেত নৌকা রক্ষা পেয়েছে। সে সব কথা স্মরণ করে এই অকারণ দুর্বলতায় লজ্জিত হ'ল লক্ষণ। বংশী তাকে কি ভাবল কে জানে। ভীরু, কাপুরুষ ব'লে মনে মনে হয়তো তাকে ঘৃণা করে, হয়তো দুর্বল ব'লে তাকে সে ঈষৎ কৃপা করে। করুক, লক্ষণের তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ সত্যিই যে সে তাই। তবু এই জন্যই সে সম্মান করে বংশীকে, শ্রদ্ধা করে তার পৌরুষকে, ভালোবাসে তার বর্বর, বেপরোয়া ভাবকে। ঘরের মায়া তাকে বন্দী করতে পারে নি, অন্নচিন্তা তাকে কাতর করতে পারে নি, শয্যাশায়ী অসুখ কাবু করতে পারে না তাকে। পদ্মার উদার আহ্বানে তার শিরার রক্ত ঝনঝন ক'রে বেজে ওঠে, বংশী তার নৌকা নিয়ে নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়ায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বৃষ্টি কমে গেল। অপরাহ্নের আলো জলের উপর ম্লান হোয়ে কাঁপে। ঝড়ের পদ্মা ক্রমশ শান্ত হ'য়ে এলো, শান্ত হ'য়ে গেল আকাশ আর পদ্মা। সঙ্গে সঙ্গে বংশীও যেন নির্জীব হোয়ে গেল। পা ছড়িয়ে সে পাটাতনের উপর শুয়ে পড়ল।

—"এ সময় আবার আলো এলো কোত্থেকে?" লক্ষণ প্রশ্ন করে—"দুটো আলো দেখছি যেন?"

—"হুঁ, মাছ ধরছে। এসময় খুব মাছ ওঠে।" ঘাড় ফিরিয়ে বংশী একবার দেখে নেয়—"নৌকোটা ওদিকে নিয়ে চল, দেখি কি রকম ধরল।"

নৌকা নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়াল। নৌকার উপরে উবু হোয়ে ত্রিলোচন অত্যন্ত মন দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। পাটাতনের নীচে মাছগুলো ঝটপট শব্দ করছে।

ইলিশ মাছের তেল চকচকে পিঠের উপর জ্যোৎস্নার মৃদু আলো পিছলে পড়ে। অনেক মাছ ধরেছে তো ত্রিলোচন। এক, দুই, তিন, চার.........

—"কতগুলো মাছ ধরলি তিলোচন?"

—"বংশী না কি?" তেমনি জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই ত্রিলোচন সান্ত্বনা দেয়—"কি আর করবি বল, সবই ভগবানের হাত, তাঁর ওপর কারু হাত নেই।"

অন্যমনস্ক হোয়ে যায় বংশী। মাথা ঝিমঝিম করে, শরীর শিথিল হয়ে আসে। সে এত দুর্বল বোধ করছে কেন? তার হাত-পায়ে যেন জোর নেই। ত্রিলোচনের দার্শনিক বাণী তার কানে ঢুকল না। অর্থহীন নেত্রে বংশী তার পানে চেয়ে রইল।

—"আহা, এমন বৌ হিমাইৎপুরে আর আসেনি। বৌ নয় তো যেন লক্ষ্মী-পিতিমে।" বলে বংশীর মৃতাপত্নীর জন্য শোক প্রকাশ করে ত্রিলোচন।

অকস্মাৎ লক্ষণ রেগে ওঠে। মুখ বিকৃত করে বলে—

—"তুমি তো আচ্ছা লোক তিলোচন! জিগ্যেস করল তোমাকে মাছের কথা, উত্তরে তুমি মরা মানষের জন্যে কান্না শুরু করলে। বৌদির জন্যে কে তোমাকে কাঁদতে বলেছে?"

—"এই তোর বদ স্বভাব। মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্ষেপে যাস তুই।" বংশী লক্ষণের পিঠ মৃদু স্পর্শ করে বলে—"সামনে এগিয়ে চল। কিছুক্ষণ পরেই আকাশে চাঁদ উঠবে।"

কিন্তু বংশীর অন্যমনস্কতা কাটল না। ত্রিলোচনের কথা শুনে মনটা তার খারাপ হোয়ে গেছে। কেবলই মনে পড়ে পদ্মকে, যে পদ্ম পদ্মার বুকে লুকিয়ে আছে। ধরতে গেলে যে পালিয়ে যায়, ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে যে কেবল এড়িয়ে বেড়ায়। তিন মাস আগে বংশীকে যে বাহুবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছে তিন মাস পরে তাকেই বংশী বৃথা অনুসরণ করে। কোথায় আছে এখন সে? বংশীকে সে একেবারে ভুলে গেছে নাকি? বেঁচে থাকতে এক মিনিটের জন্যও যে বংশীকে ভুলতে পারে নি মরার পরে সে কি সব একেবারেই ভুলে গেছে?

—"জলের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ বংশীদা?"

বংশী উত্তর দিল না, তেমনি চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর সে প্রশ্ন করল—"জলের নীচে কি আছে রে লক্ষণ?"

লক্ষণ কথাটা বুঝতে পারে না। কোন্ কথা শুনতে চায় বংশী? ইতস্তত ক'রে সে বলে—"পাতালপুরী"—

পাতালপুরী। কথাটা কয়েকবার উচ্চারণ করে বংশী। তারপর আবার সে নির্বাক হয়ে যায়।

এলো রাত্রি। এই জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি বংশীকে উদাস করে, বিহ্বল করে। রাত্রিকে বংশী ভয় করে, ভালোবাসে। রূপোর মত শাদা জ্যোৎস্না আকাশ থেকে গলে পড়ে, তরঙ্গায়িত নীল জলের উপর পিছলে পড়ে জ্যোৎস্না, নদীর জলে ভাঙ্গা চাঁদের ছায়া পড়ে। ঠাণ্ডা আলো বংশীর চোখে মায়াকাজল বুলিয়ে দেয়। স্পষ্ট সে দেখতে পায় পদ্মকে। নৌকার ডান-দিকে জলের উপর আলগোছে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। ঠিক সেই চাউনি, তেমনি নরম হাতে ডাকবার ভঙ্গী। নদীর কলধ্বনির মতই তার হাসি বাতাসে ভর করে বংশীর কানে এসে বাজে। সমস্ত শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে লক্ষণের কাছ থেকে দাঁড় ছিনিয়ে নিয়ে পদ্মকে ধরবার জন্য দৃঢ়হস্তে বংশী দাঁড় টানে। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মও পিছিয়ে চলে। আচ্ছন্নের মত বংশী নৌকা চালায়। লক্ষণ হতভম্ব হোয়ে চেয়ে থাকে। তারপর একসময় চেয়ে দেখে বংশী, দমকা হাওয়ার মত পদ্ম অদৃশ্য হোয়েছে। হাত থেকে দাঁড় আপনিই খসে পড়ে, দক্ষিণের হাওয়া গায়ের উপর লুটোপুটি খায়। মোহাবিষ্ট বংশী গান গেয়ে ওঠে—

রাজার মেয়ে পাতালপুরে ঘুমায় আজো হায়
তার তরে মোর ময়ূরপঙ্খী পাগলপারা ধায়।

গান শুনে অবাক হোয়ে যায় লক্ষণ। বংশী অবশ্য গান ভালোই গায় কিন্তু এ গান সে আগে শোনে নি। কেমন করে শিখল সে এই গান? হয়তো কোন মাঝির মুখ থেকে শুনেছে, কিম্বা হয়তো নিজেই রচনা ক'রে সুর দিয়েছে। সে যাই হোক, এত দরদ দিয়ে গাইতে পারে বংশী? গান তো নয়, এ যেন বংশীর অতৃপ্ত কামনার অর্ধপ্রকাশ। সত্যিই কি বংশী পাতালপুরে যেতে চায়?

ভয়ে লক্ষণ শিউরে ওঠে।

আদর ক'রে বংশী তার নৌকার নাম দিয়েছে ময়ূরপঙ্খী। পরম স্নেহে নৌকার সারা গায়ে সে হাত বুলায়। স্পর্শে তার রোমাঞ্চ হয়, অপূর্ব আনন্দে তার দেহে শিহরণ খেলে যায়। সুখে চোখ বুজে আসে। আধবোজা চোখে চুপচাপ সে নৌকার উপর শুয়ে থাকে। পদ্মার জলে রাঙা সূর্যের শেষ আলো উচ্ছল হোয়ে কাঁপে। সজাগ হোয়ে ওঠে বংশী। জল-কল্লোলে সে যেন কার আগমনী শুনতে পায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা কানের কাছে সে ছুরীর মত তীক্ষ্ন করে রাখে। কে বলে এ জলকল্লোল? এ যে তার ময়ূরপঙ্খীর হৃৎস্পন্দন। বংশী স্পষ্ট শুনতে পায় ওর বুকের ধুক ধুক শব্দ। বুক দিয়ে সে অনুভব করে নিষ্প্রাণ নৌকার রক্তোচ্ছ্বাস। অস্ফুটস্বরে বলে—"ময়ূরপঙ্খী, আমার ময়ূরপঙ্খী।"

মিষ্টি হাসির শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। চমকে ওঠে বংশী। ঘাটে কলসী নামিয়ে মুখে আঁচল গুঁজে পদ্ম হাসি চাপতে চেষ্টা করছে। বিস্মিত হোয়ে বংশী প্রশ্ন করে—"তুই কখন এলি?"

—"জল নিতে এসেছিলাম।" বলে সে উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ প্রশমিত করতে চেষ্টা করে।

বংশী ভ্রূ কুঁচকে বলে—"তা হাসছিস কেন অমন করে? কি হয়েছে?"

—"হাসছি তোমার নৌকোর নাম শুনে।" পদ্মর শাদা দাঁত মুক্তার মত ঝিকমিক করে ওঠে—"এমন নৌকোর নাম কখনও ময়ূরপঙ্খী হয়?"

ক্ষুব্ধ হয় বংশী। দুঃখে আর অভিমানে চোখে তার জল আসে। বলে—"কি নাম তা হোলে?"

—"জেলেডিঙ্গি।"

রাগে বংশীর জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়। বলে—"ইস্, রঙটা একটু ফর্সা বলে' গর্ব তোর কম নয় বৌ। নিজেকে অত সুন্দর ভাবিস নে।"

কপট ক্রোধে পদ্ম তর্জনী তুলে বলে—"খপর্দার বলছি, আমার সঙ্গে তোমার নৌকোর তুলনা কোরো না। তা হ'লে আর কথা কইব না তোমার সঙ্গে।" তারপর স্বর নামিয়ে লীলায়িত কণ্ঠে বলে—"আচ্ছা তুমিই বলো, আমাকে দেখলেই তোমার ভালোবাসতে ইচ্ছে করে না? বৌ, পদ্ম, পদ্মা বলে আদর করে ডাকতে সাধ হয় না তোমার? আর"—পদ্ম আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে—"আর তোমার নৌকোটাকে দেখলেই হাসি পায়।"

—"আমার ময়ূরপঙ্খী তোর চেয়ে হাজার গুণে ভালো।" আহত কণ্ঠে বংশী বলে—"আমায় সে মায়ের মত বুকে করে রেখেছে। তোর মত এমন করে দুঃখ দেয় না।"

নিমেষে পদ্মর রূপ বদলে গেল। কোথায় থাকে কপট ক্রোধ কোথায়ই বা তার কপট অভিমান! কাছে এসে নিঃসংকোচে বংশীর একটা হাত তার নিজের হাতে তুলে নিল। কোমলস্বরে বলে—"রাগ করেছো? রাগ কোরো না। আমি কি তোমার মনে দুঃখ দিতে পারি?"

কি মিষ্টি পদ্মর হাতের পরশ! কি সুন্দর পদ্মার ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ! জোলো হাওয়ায় বংশীর শীত করতে লাগল। শরীরটাকে গরম করবার জন্য ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে সে সজোরে টান দিতে লাগল। ময়ূরপঙ্খীর ঝপঝপ চলার শব্দে বংশীর স্বপ্ন টুকরো টুকরো হোয়ে গেল।

ময়ূরপঙ্খী তো ময়ূরপঙ্খীই। মুগ্ধ দৃষ্টিতে বংশী ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, স্নেহে তার দৃষ্টি ঘোলাটে হোয়ে আসে।

কিন্তু ময়ূরপঙ্খী সত্যিই কি আর ময়ূরপঙ্খী? ময়ূরপঙ্খী না ছাই। ছোট্ট নৌকা, লম্বায় সাত হাতের বেশী নয় তবু গর্ব কত বংশীর। কি নিয়ে সে গর্ব করে সেই জানে কিন্তু পুরানো ঘুণধরা নৌকার চিড়খাওয়া ফাটলে আলকাতরা-রঙ দিয়েও তার লজ্জা ঢাকতে পারে না। লজ্জা ঢাকতে গিয়ে তার কুৎসিত দিকটাই অত্যন্ত অশ্লীল ভাবে সকলের চোখে আঘাত করে।

তবু সে ময়ূরপঙ্খী। নিষ্প্রাণ একখণ্ড কাঠমাত্র নয়। তার হৃদয় আছে, তার শিরা-উপশিরায় বংশীর জন্য স্নেহ সঞ্চারিত হয়ে আছে। বংশীর ডাকে ওর স্নায়ুতন্ত্রী নাকি ঝংকার দিয়ে ওঠে, বংশীকে আলিঙ্গন দিতে সে বুক ছড়িয়ে দেয়।

শুধু কি তাই? তার রূপ? না-হয় তার নৌকা একটু ছোট কিন্তু পদ্মার উন্মত্ত তরঙ্গে যখন সে হেলে দুলে চলে কি চমৎকার যে তখন তাকে দেখায়! মনে হয়, একটা ময়ূর পেখম মেলে ধীরে ধীরে আসছে। তাই না তার নাম ময়ূরপঙ্খী!

—"তুই কি বলিস লক্ষণ?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে লক্ষণ তাকায়। বংশী স্পষ্টতর প্রশ্ন করে—"আমার নৌকোখানা সুন্দর নয়?"

—"সুন্দর না আর কিছু। এমন বিশ্রী নৌকো আর কারুর নেই।" অতশত না বুঝে লক্ষণ উৎসাহিত হয়ে বলে—"নৌকোটা বেশীদিন টিকবে না। তাই বলি, বড় দেখে একটা নৌকো কিনে ফেল তাড়াতাড়ি। কত আর লাগবে? বিয়ের সময় আমি পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলাম, তিরিশ টাকা এখনো আমার কাছে আছে। সে টাকাটা তোমায় আমি দিয়ে দেব।"

কথাটা শুনে বংশী বিমর্ষ হয়ে যায়। আশ্চর্য, বংশী ছাড়া আর সকলের কাছেই ময়ূরপঙ্খীর কি কোন রূপ নেই? তারা অবাক হোয়ে ভাবে, এমন একটা সাধারণ নৌকা কেমন করে বংশীর চোখে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি অবাক হয় বংশী নিজে। ওদের কি চোখ নেই? শাদা চোখে ওরা কি সব জিনিসই শাদা দেখে?

লক্ষণ পুনরায় প্রশ্ন করে—"কথা বলছ না যে?"

বংশী সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়—"আমার টাকা নেই। ইচ্ছা করলে তুমি নিজের জন্যে কিনতে পারো।"

—"অতবড় নৌকো দিয়ে আমি কি করব? আমার নৌকোয় তুমি তো পা দেবে না।"

—"দেবোই না তো। বড়লোকের নৌকোয় মাঝিগিরি আমি করি না।"

আঘাতটা লক্ষণের মনে বাজল। আস্তে আস্তে সে বলে—"আমার টাকা থাকলে সত্যিই একটা নৌকো তোমাকে উপহার দিতাম।"

—"সে নৌকো আমি চালাতে পারতাম ভেবেছিস? কক্ষণো না। আমার কথা সে শুনতো নাকি?" নৌকার উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে অবোধ শিশুর মত বংশী বলে—"আর এই নৌকো আমার মনের সমস্ত কথা বুঝতে পারে। যেদিন এ নৌকো ভেঙে যাবে সেইদিন আমারও বুক ভেঙে যাবে।"

কিন্তু এসব কথা বলে লাভ নেই। লক্ষণ বিশ্বাসও করবে না, বুঝতেও পারবে না। বুঝতে পারবে না তার এই ভাঙা নৌকোখানাকে সে কতখানি ভালোবাসে। বংশী কি জানে না তার এই সাধের নৌকা একদিন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে? বংশী জানে। পুরানো কোন জিনিসই টিঁকে থাকে না। শেষ পর্যন্ত একদিন তা ধ্বংস হয়ে যাবেই। কোন কিছু দিয়েই তাকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যায় না। শেষ পর্যন্ত নূতন জিনিসকে হাসিমুখে বরণ করতে হয়।

তবু তার পুরানো, খয়ে-যাওয়া নৌকাকে বেঁচে থাকতে বংশী বিদায় দিতে পারবে না। এই নৌকা তার ছেলেবেলার সাথী, এই নৌকা তার যৌবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এই নৌকায় কতদিন কত রাত সে পদ্মার বুকে কাটিয়েছে। ঝড়ে যখন বাঁচবার কোন আশাই ছিল না এই নৌকাই জীবন্ত জীবন-দাতার মত তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। আজ বার্ধক্যে, স্থবিরতায় না হয় নৌকাখানা অকর্মণ্য হয়েছে তবু বংশী তাকে অবহেলা করতে পারবে না। এতখানি অকৃতজ্ঞ বংশী নয়। শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, মায়াও। এতকালের পরিচয়ে যে সম্বন্ধ নিবিড় হোয়ে গড়ে উঠেছে তাকে ছিন্ন করা অসম্ভব। ময়ূর-পঙ্খী আর পদ্মা, দুটোর একটাকে হারালে পৃথিবীতে আর রইল কি?

ময়ূরপঙ্খী আর পদ্মা। পদ্ম আর পদ্মা। দুটোতে কতটুকু পার্থক্য? বিষণ্ণ রাত্রিতে বংশীর মন নরম হয়ে যায়।

চোখের পাতা ভারী হোয়ে আসে। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে টলটলে সুন্দর একখানা মুখ। মুখের দুপাশে রুক্ষ কালো চুল এলিয়ে পড়েছে। শ্রীহীন মলিন বেশ-ভূষা। বেশ-ভূষা করবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল নাকি পদ্মর? এই রকম উদ্‌গ্রীব আরো সে কতবার হোয়েছে, সপ্তাহখানেক সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ থেকে বংশী ফিরে এসেছে তবু পদ্মর ব্যস্ততার সীমা নেই। অকারণ ব্যস্ততা। কিন্তু বড় ভালো লাগে এই প্রতীক্ষা, এমন উদাস হোয়ে চেয়ে থাকা।

—"মাগো!" বংশীকে হঠাৎ তার পাশে দেখে পদ্ম ভয়ানক চমকে উঠে।

বংশী হাততালি দিয়ে বলে—"কেমন ভয় পাইয়ে দিলাম!"

উত্তেজনাটা কমতে কিছু সময় লাগে পদ্মর। বুক তার তখনো কাঁপে। বলে—"সত্যি, কি ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি। ভয়ে আমি বাঁচিনে।" বলে সে আরেকবার শিউরে উঠল।

তরল কণ্ঠে বংশী প্রশ্ন করে—"কেন?"

পদ্ম বলে—"কাল সন্ধোবেলা নৌকো নিয়ে তো তুমি চলে গেলে। তারপরেই এলো ঝড়। শাঁ শাঁ হাওয়ায় গাছ ভেঙে পড়তে লাগল, কড় কড় করে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! ঘরের ভিতর থেকে পদ্মার বানের ডাক পরিষ্কার শুনতে পেলাম।"

বংশী কথা বলল না। পদ্ম বলতে লাগলো—"বিছানায় খালি ছটফট করতে লাগলাম, একফোঁটা ঘুম আসে যদি চোখে। লক্ষণ এক সময় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দোরে টোকা দিয়ে বললে—বৌদি, বংশীদা কি নৌকো নিয়ে আজ বেরিয়েছে? তাড়াতাড়ি দোর খুলে আমি বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু এখনো ফিরে আসেনি। লক্ষণ এ কথায় ভয় পেয়ে গেল—কি সর্বনাশ! এইমাত্র যে খবর পেলাম দুটো নৌকোডুবি হোল। আচ্ছা, আমি দেখছি, তুমি ভেবো না বৌদি। সেই থেকে আমার যা হোয়েছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। সারারাত শুধু ঘর-বার করেছি।"

সহানুভূতির স্বরে বংশী বলে—"আহা, কাল রাতটা তোর তা হোলে বড় কষ্টে কেটেছে। কিন্তু অত ভাবিস কেন বৌ? ময়ূরপঙ্খী থাকতে আমার কোন অকল্যাণ হবে না।"

পদ্মর কানে শেষের কথাটি প্রবেশ করল না। ওসব কথা পরে শুনলেও চলবে। আগে ভগবানকে কোটি নমস্কার—বংশী সুস্থ দেহে ফিরে এসেছে।

—"ওকি তুই কাকে নমস্কার করিস বৌ? ভগবান নয়, ভগবান নয়।" বংশী হাসিমুখে পদ্মর ভুল সংশোধন করে দেয়—"নমস্কারটা আসলে কার পাওনা জানিস? আমার ময়ূরপঙ্খীর।"

ময়ূরপঙ্খী, ময়ূরপঙ্খী। শুনে শুনে পদ্ম ক্ষেপে যায়—"ময়ূরপঙ্খী! আমার সামনে ওনাম আর কক্ষণো কোরো না। তাহোলে চুপি চুপি একদিন ওকে জলে ডুবিয়ে দেব।"

হো হো করে হেসে ওঠে বংশী। বলে—"ময়ূরপঙ্খীর ওপর তোর যে ভারী হিংসে দেখি। কেন, সে কি করেছে?"

—"আমার সর্বনাশ করেছে। আমার মাণিককে সে যাদু করে রেখেছে।" পরিহাস করে বলতে চাইলেও পদ্মর অন্তরের ক্ষোভ গোপন রইল না—"আমাকে তুমি তো একেবারে ভুলে গেছ।"

—"তবু তোর রাগ করা উচিত নয়। ময়ূরপঙ্খী সত্যিই তো তোর সতীন নয়।"

—"সতীনের বাড়া সে। সতীনের তবু প্রাণ আছে কিন্তু তোমার ময়ূরপঙ্খীর না আছে প্রাণ না আছে মায়া-দয়া।" তারপর কোমল হোয়ে বলে—"আচ্ছা, কি দেখে ভুললে বলো না। বলো না গো।"

উত্তর দিল না বংশী। শুধু আদর করে পদ্মর চিবুকটা নেড়ে দিল।

পদ্ম মাথা সরিয়ে নিল—চাই না এ সোহাগ। এ তোমার মিছে আদর। এমন ভালোবাসা আমি চাই না। ভালোবাসা চাই—যেমন ক্ষ্যাপার মত তুমি ময়ূরপঙ্খীকে ভালোবাসো।"

—"পদ্ম, পদ্মা।" বলতে বলতে বংশীর মন অনেক দূরে চলে যায়—"তোকে দেখে আমার পদ্মাকে মনে পড়ে। তেমনি দামাল, তেমনি খেয়ালী তুই। তোর মুখে যে আলো পড়েছে সেদিকে তাকিয়ে আমার পদ্মার রাত্রিকে মনে পড়ে।"

পদ্মায় বিষণ্ণ রাত্রি। রাত্রির ধূসর আলোকে মনে পড়ে পদ্মর ম্লান মুখখানি। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সে যেন বংশীর পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সেদিকে চাইতে সাহস হয় না বংশীর। শঙ্কিত বেদনায় বংশী চোখ বন্ধ করে। কিন্তু কোথায় পদ্ম? চারিদিকে দিকচিহ্নহীন উন্মত্ত পদ্মার নিষ্ঠুর-হাস্যরোল। জল, জল! ঠাণ্ডা ছুরীর মত তীক্ষ্ম জলের পরশ। মোহময় শীতল অনুভূতি। নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে এসে অকস্মাৎ বংশী একদিন শুনল, পদ্ম নেই। অভিমানী পদ্মকে মায়াবী পদ্মা হাতছানি দিয়ে নিজের কোলে লুকিয়ে রেখেছে।

চোখে হয়তো জল এসেছিল বংশীর, কি আসেনি, অনুতাপে কঠিন হৃদয় হয়তো বা দ্রব হোয়েছিল কি হয়নি, জীবন নিশ্চয় কিছুক্ষণের জন্য অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল সে সব কথা এখন ভালো করে মনে পড়ে না। কিন্তু মনে পড়ে সেইদিনই আবার সে বেরিয়ে পড়েছিল নৌকা নিয়ে। এইবার সে মুক্ত! তাকে আটকে রাখতে জগতে আর কেউ নেই। কেউ নেই তার আশাপথ চেয়ে। অন্ধকার বৃষ্টিপড়া রাতে শঙ্কিত হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে তার মঙ্গল কামনায় কেউ আর দুরু দুরু বক্ষে রাত জাগবে না। অভিমানের মায়া দিয়ে, সোহাগ-চুম্বনে কেউ তার মনকে এখন ময়ূরপঙ্খী থেকে বিক্ষিপ্ত করবে না। এখন সে স্বাধীন, মুক্ত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল বংশী। দুপুরের নির্মেঘ আকাশ থেকে তপ্ত রোদ বাঁকা হোয়ে গায়ে এসে পড়বে, জলরাশি কাঁচের মত চিকচিক করে উঠবে, অসহ্য গরমে গা দিয়ে দর দর করে ঘামের ধারা ঝরে পড়বে, বংশী তখন দ্রুত হস্তে বৈঠা চালিয়ে যাবে।

তারপর আসবে বৃষ্টি। গায়ের ঘাম মরে গিয়ে মাথা বয়ে

বৃষ্টিধারা পড়বে, উচ্ছ্বসিত জলরাশি সাবানের মত ফেনায়িত হয়ে উঠবে, প্রবল ঝড়ে দৃষ্টি নিভে আসবে। প্রচণ্ড তরঙ্গে টলমল করে নৌকা দুলবে, তখনো বংশী আন্দাজ করে ডাঙ্গার দিকে নৌকা চালাবে না।

এক সময় তাও শেষ হয়ে যাবে। আকাশে উঠবে রামধনু, শান্ত নদীতে নেমে আসবে সন্ধ্যা, নেমে আসবে রাত্রি। তখনো বংশী নৌকার উপরে। সর্বাঙ্গ দিয়ে সে অনুভব করছে প্রকৃতির পটপরিবর্তন। নৌকার বেগ ক্ষীণতর করে সে তখন একটা ভাটীয়ালী সুর আওড়াচ্ছে।

এই তার জীবন, এই তার পৃথিবী।—

লক্ষণের শ্বশুরবাড়ী কুষ্ঠিয়ায়। বৌ সেখানেই থাকে,—স্বামীর ঘর করবার অনুমতি সে বেচারা পায়নি। শ্বশুর তাঁর মেয়েকে পাঠাতে রাজী নয়। মাঝির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাঁর মাথা নাকি ভদ্রসমাজে হেঁট হোয়ে গেছে। আগে জানলে এমন লোকের সঙ্গে তিনি বিয়ে দিতেন না। তবু যদি জামাই কিছু রোজগার করতো! তা নয়, দিনরাত শুধু নৌকা বেয়ে বেড়ানো। এমন করে কতদিন চলে মানুষের? এমনি ভাবে চললে, একদিন তাকে না খেয়েই মরতে হবে। কিন্তু জেনে-শুনে তিনি তো তাঁর মেয়েকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারেন না। মেয়ে তিনি কিছুতেই পাঠাবেন না মাঝির কাছে। তাঁর সম্মানে আঘাত লাগে। আঘাত লাগাটা স্বাভাবিক—কুষ্ঠিয়ার কাপড়ের কলে চাকুরী করে পঁচিশ টাকা তিনি পান।

অনেকদিন পর্যন্ত লক্ষণ কিছু বলে নাই। কিন্তু আর ঠিক থাকতে পারল না। মহাক্রুদ্ধ হয়ে জোর করেই লক্ষণ বৌকে নিয়ে আসবার জন্য একদিন রওনা হোল, শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর তখন বাড়ি ছিল না, প্রথমেই দেখা হোল সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে।

তারপরে কি হোল সেটা না হয় উহ্য থাকলো। তবে কিছুদিন বাদে দেখা গেল, জোয়ান লক্ষণ শ্বশুরের একান্ত অনুগত হয়ে পড়েছে, হিমাইৎপুরে ফিরে যাবার নামও সে করে না। জামাইএর এ রকম আনুগত্য দেখে খুশী হোয়ে শ্বশুর মহাশয় কলের মালিকদের পায়ে ধরে তার জন্য দিন-মজুরীর একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। কণামাত্র আপত্তি করল না লক্ষণ। স্বচ্ছন্দে নূতন জীবনে সে অভ্যস্ত হোয়ে গেল।

শ্বশুর মহাশয় পরামর্শ দিলেন, এইখানেই যখন সংসার পাতা হোয়েছে তখন হিমাইৎপুরে যে সম্পত্তি আছে তা বিক্রী করে ফেলাই ভালো। অনর্থক ফেলে রেখে লাভ কি?

সম্পত্তির মধ্যে তো খালি একখানা ভাঙা ঘর আর হাত তিরিশেক জমি। তারই ব্যবস্থা করবার জন্য লক্ষণ দেশে ফিরে এলো। কাজ চুকিয়ে ফিরে যাবার দিন লক্ষণ দেখা করবার জন্য বংশীর বাড়িতে এসে ডাক দিল—"বংশীদা"—

বংশী দাওয়ায় বসে মেঝেতে আঁচড় কাটছিল। ডাক শুনে মুখ তুলে বলল—"লক্ষণ নাকি? কবে এলি?"

—"কাল এসেছি। আজই আবার চলে যাচ্ছি। একদম ছুটী নেই।" বংশীর মুখের দিকে সম্পূর্ণভাবে তাকিয়ে বিস্ময়ে লক্ষণ হতবাক হয়ে যায়—"তোমার চোখের কি হোয়েছে? তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ?"

—"কিছু আর দেখতে পাই না। বসন্তে চোখ দুটো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।"

লক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। বংশী ম্লান হেসে বলে—"ঘর থেকে বেরোতে পারি না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। সব সময় তাই চুপচাপ বসে থাকি।"

অনামনা লক্ষণ অতর্কিতে বলে—"ময়ূরপঙ্খী!"

হতাশায় মাথা নাড়ে বংশী—"কতকাল সে আমায় কোলে নেয় না, কতদিন হোল পদ্মার মুখ দেখি না।" আশান্বিত হোয়ে বংশী বলে—"একবার আমাকে নিয়ে নৌকোয় যাবি লক্ষণ?"

লক্ষণ আপত্তি জানায়—"এই অবস্থায়"—

—"না, না, তুই বাধা দিসনে।" বলে বংশী তার হাত বাড়িয়ে দিল।

নৌকা তখনো ঘাটে বাঁধা ছিল। দড়ি খুলে লক্ষণ বংশীকে হাত ধরে নৌকায় তুলল। অন্ধ বংশী খুশী হয়ে বলে—"আমার হাতে বৈঠা তুলে দে তুই।"

ঝপ ঝপ শব্দে নৌকা এগিয়ে চলে। পদ্মার হাওয়ায় বংশীর দেহে শক্তি ফিরে আসে, উ[illegible] বুকের ভিতরটায় আলোড়ন জাগে। বংশী ডাকে—'লক্ষণ।'

লক্ষণ বলে—'কি?'

—"আমরা এখন কুষ্ঠিয়ার দিকে যাচ্ছি, না?" লক্ষণ সে কথায় সায় দিল না। বংশী ভ্রুক্ষেপ করে না। বলে—"তোর বৌ এখন কোথায় আছে? কুষ্ঠিয়ায়?"

—'হ্যাঁ।'

বংশী চুপিচুপি প্রশ্ন করে— 'বৌ তোকে ভালবাসে?'

—'বাসে।' ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলে লক্ষণ বলে—'নৌকোটা এবার ঘুরাও, আকাশে মেঘ করেছে।'

সেকথা বংশী মানল না, তেমনি আনমনে নৌকা বাইতে লাগল। লক্ষণও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

পদ্মার জল ক্রমশ কালো হয়ে এলো।

এক ফোঁটা, দুই ফোঁটা, তারপর ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ঠাণ্ডা জলে বংশীর মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল, হাত থেকে বৈঠা শিথিল হয়ে পড়ে গেল। আচ্ছন্নের মত সে গান গেয়ে উঠল—

রাজার মেয়ে পাতালপুরে ঘুমায় আজো হায়
তার তরে মোর ময়ূরপঙ্খী পাগল পারা ধায়।

লক্ষণের বুকটা হু হু করে উঠল। দুই হাত দিয়ে সে তার মুখ ঢেকে ফেলল।

গণমন

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত

রাষ্ট্র নীতির বর্তমানে যে চিন্তা ধারা চলেছে তাতে রাষ্ট্রে উন্নতির সমস্ত দিকগুলিই গণকে উপলক্ষ করে পুষ্ট হচ্ছে। গণকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র গঠন বা পরিচালন এখন অসম্ভব মনে হয়। যে সমস্ত স্থলে একনায়কত্ব শাসন প্রবর্তিত হয়েছে সে সমস্ত স্থলেও গণমতই প্রথমত নায়কত্বের সোপান সৃষ্টি করেছে এবং গণমতের উপরই নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এইরূপ নেতা আপনার মতের দ্বারা গণমতকে প্রভাবান্বিত করেছেন এবং নিজের মতানুবর্তি করেছেন ইহা খুবই সম্ভব কিন্তু তথাপি গণমতকে উপেক্ষা করে একেবারেই স্বৈরাচার অবলম্বন করেছেন কোন এক-নায়কত্বেরই অভ্যুত্থানের ইদানিং ইতিহাস এরূপ সাক্ষ্য দেয় না। একনায়কের গণমনের গতি নির্ণয় এবং নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তির উপর নায়কত্বের স্থায়ীত্ব নির্ভর করেছে। আমাদের দেশেও যে গণ-আন্দোলন চলেছে তাতেও গণমনের সন্ধান নেবার চেষ্টা আছে, কিন্তু এই আন্দোলন গণের মর্ম্ম স্পর্শ করেছে এরূপ বলা চলে না যদিও সূচনা আশান্বিত বলে মনে করা যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে গণ উন্নতি করতে হলে গণের মনের সন্ধান অগ্রে পাওয়া প্রয়োজন।

গণ কথাটি খুবই ব্যাপক। ইহার ভিতরে স্তর ভেদ আছে, শিক্ষা ভেদ আছে, অর্থের অসামঞ্জস্য আছে এমন কি সংস্কৃতিগত পার্থক্য আছে। ধর্মগত বিভেদ সংস্কৃতিগত পার্থক্যেরই রূপান্তর বা নামান্তর। কিন্তু তা না হলেও, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সুবিধার জন্য যখন বর্তমানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন এই ধর্মগত বিভেদও গণমন বিশ্লে-ষণের অন্যতম বিচার্য বস্তু। গণের বিভিন্ন স্তরের পরস্পরের ভিতর এবং সমষ্টিগত গণের এবং অন্যান্য উন্নততর শ্রেণীর ভিতর একাত্মবোধের বাধা এইগুলি এবং ইহাদের মধ্যে ধর্ম-গত পার্থক্য একেবারে অলংঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে। এক ধর্ম মতাবলম্বিগণের অধিকার রাষ্ট্রীয় জীবনে অন্য ধর্ম-মতাবলম্বিগণের অধিকার হতে আপাত দৃষ্টিতে পৃথক না হলেও এই ধর্মমতগত পার্থক্যের দরুণ উভয় স্তরের ভিতর দ্বন্দ্ব, অসূয়া বুদ্ধি অতীতেও বহু উন্নত দেশে কম বৈষম্য সৃষ্টি করে নি এবং আধুনিক যুগেও ইউরোপের কোন কোন দেশে ও আমাদের দেশে কম সমস্যার উদ্ভব করে নি। সুতরাং জাতীয়তা বুদ্ধিতে গণ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে উন্নত চিন্তাশীল স্তরের শ্রেণীগুলিকে যেমন সমস্ত বৈষম্যের উর্ধ্বে একত্বের ভূমি প্রস্তুত করতে হবে তেমনি গণ মনের ভিতরেও জাতীয়তার ক্ষেত্র রচিত করতে হবে। দেশের উন্নতির আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি যদি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অসম্ভবরূপে পৃথক থাকে তা হলে আন্তরিকতা বিহীন প্যাক্টের মূলে সাময়িক বাহ্যিক সম্প্রদায় গত বা শ্রেণীগত ঐক্য আনা সম্ভবপর হলেও জাতীয় জীবনের স্পন্দন খুব দ্রুত অনুভূত হবে না। সমস্ত জাতীয়তার মূল উৎস দেশ এবং জাতীয়তা বাসা বাঁধে গণের মনে। যে দেশবাসীর জাতীয়তা বোধ দেশকে আশ্রয় ক'রে স্ফুরণ না হয় বা যে দেশের গণের ভিতর দেশ মাতৃকার প্রতি মমত্ববোধ এবং তার ঐতিহ্য সম্পদে গৌরব বোধ না থাকে সে স্থলে অন্য যাই গড়ে উঠুক না কেন জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই গণমনকে রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে সম রাষ্ট্রীয় অধিকারের আদর্শের ভূমিতে গণমন গঠনের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

আমাদের দেশের গণ রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাপন্ন নহে। বরং ধরা যেতে পারে পারিবারিক ও সামাজিক মনভাবাপন্ন পরি-বারের গণ্ডির ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার সঙ্গে সামাজিক জীবনে যতটুকু অংশ লওয়া প্রয়োজন হয় ততটুকুর যোগ্য, তার বেশী নয়। ১৯৩৫ সালের আইন লিখন-পঠন-ক্ষমা নারীকে এবং সামান্য চৌকিদারী কর প্রদানকারী নরকে ভোটাধিকার দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষেত্রে গণমন গঠনের যে সুবিধা দিয়েছে, আইন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ অনেকখানি থাকলেও, এই সুবিধা শিক্ষার পক্ষে একেবারে অবহেলার বিষয় নয়। যে-হেতু আমাদের গণমনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় চেতনা তেমনভাবে জড়িত নয় সেহেতু এই সামান্য অধিকারটুকুকে বিপথে চালিত না করে সুনিয়ন্ত্রিত করা নেতৃবর্গের অবশ্য কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের গণমন সাধারণত নির্জীব। পরাধীনতার যুগে চেতনাসম্পন্ন জীবনের অভাবে, সংসার ও সামান্য সামাজিকতার বাহিরে বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রের অভাবে গণের কর্মশক্তি হয়েছে পঙ্গু, চিন্তাশক্তি হয়েছে নিষ্ক্রিয় এবং উৎপাদিকা শক্তি বিহীন। যেখানে কর্মের উন্মাদনা নাই, চিন্তায় সজীবতা নাই সেখানে না থাকে মনের দেবার শক্তি, না থাকে নূতন কিছু গ্রহণের শক্তি, অথবা গ্রহণে বিলম্ব যেরূপ থাকে না বর্জনেও সময় ক্ষেপণ মোটেই হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরম্ভ হলেও গণমন রাষ্ট্রীয় জীবনকে আবশ্যিক বলে এখনও তেমনভাবে গ্রহণ করে নাই। নির্বাচনের প্রারম্ভে, সংক্রামিক উত্তেজনার স্পর্শে চালিত জনসংঘ নির্বাচনের পরে রাষ্ট্রীয় চিন্তার সঙ্গে আর নিজকে জড়িত রাখে না, রাখবার প্রয়োজন অনুভব করে না; অবসরও নেই শক্তিও উদ্বুদ্ধ নয়।

আমাদের গণমন ভগবৎ বিশ্বাসী এবং পরলোক সম্বন্ধে আস্থা সম্পন্ন। তা'রা সহস্র অভাবের দারুণ নিষ্পীড়নের মধ্যেও এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়ে বজায় রেখেছে, বিবেকা-নন্দের কথায়—অপূর্ব সহিষ্ণুতা। এই সহিষ্ণুতা কতকটা নিরুপায় এবং কতকটা নিজ শক্তি সম্বন্ধে অপরিচয় প্রসূত হলেও প্রাচ্য মনে দার্শনিকভাবের যে স্পর্শ একটু লেগে থাকে তারও কিছু যে ক্রিয়া—যতই বিকৃতভাবে হোক না কেন —এই গণমনের উপরও না হয়েছে এরূপ মনে হয় না। সুতরাং শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে দর্শনের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেলে অন্ধতা যে রেশটুকু আঁকড়ে ধরে থাকে তা কার্যত মনের শূন্যতা ও কর্ম বিমুখতাকেই শ্রেয় করে ধরে। ফল হয় নিজের অতি প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও মানুষকে অজ্ঞ, উদাসীন ও চিন্তা বিহীন করে ফেলে। এ অবস্থায় শক্তিমান ও কুট বুদ্ধিসম্পন্ন যারা তারা নিরঙ্কুশ অবস্থায় নিজেদের সীমা

লংঘন করে অধিকার স্থাপন করে অন্যের অধিকার মধ্যে। গণ ক্রমশ হয়ে পড়ে নির্বীর্য। তাদের ধর্ম বিশ্বাসে তাদিগকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে দিক্ষা দেয় না, তারা রাষ্ট্রীয় জীবনে মৃত্যুকে বরণ করে নিজেদের অজ্ঞাতে। এমনিভাবে আমাদের গণ হতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বা সরে গেছে জ্ঞানের আলো, অভাব রয়ে গেছে আত্মানুশীলনের সুযোগের, জাগ্রত হয় নাই কোন কালে উন্নত জীবনযাত্রার কল্পনা ও রুচি। রাষ্ট্র চিন্তা বা রাষ্ট্রাধিকার প্রতিষ্ঠার কল্পনা পূর্বে কোনকালেই স্থান পায় নাই গণের মনে।

আমাদের গণের সামাজিক মনের দিকেও বিচার করলে তাতেও সংগঠনী শক্তির অভাব অনুভূত হবে। সমাজকে সুন্দর করব, ক্লেদ দূরীভূত করব, সামাজিক নৈষ্ঠিকতাকে জীবনে রূপ দেব এ চিন্তা মনে ক্রিয়া করে না। অতি তুচ্ছ জিনিসের বিচারে ও আলোচনায় শক্তি নিঃশেষিত হয়। উদারতা আছে যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু বিচার করে প্রয়োজনে কঠোরতা গ্রহণের শক্তি নাই। বহির্সৃষ্ট উন্মাদনায় ভেসে যেয়ে নির্বিচার সাময়িক নিষ্ঠুরতা আশ্রয় করতে মন দ্বিধাগ্রস্থ হয় না কিন্তু উত্তেজনার অবলোপে বিপুল ভীরুতাকে পরিহার করবার শক্তি মনের মাঝে নাই।

গণমন দেহে শক্তির স্ফুলিঙ্গের একেবারে অভাব আছে তা নয়। শক্তি রয়েছে সুপ্ত, ক্ষণিক স্ফুরণ যেখানে হয় তা অনিয়ন্ত্রিত। যেটুকু প্রকাশ পায় তা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ব্যয়িত। তাই দেখতে পাই সংসারের জন্য বিপুল ঝঞ্ঝা নগ্ন গাত্রে, ছিন্ন বস্ত্রে দৈনন্দিন জীবনে তারা নীরবে সহ্য করে, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ধনোৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, আবার তারাই বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় প্রাণের দুলালকে তুলে দেয় মরণের মুখে, সান্ত্বনা পায় নিজের অদৃষ্ট ফলের উপর নির্ভরতায়। শক্তি তাদের আছে কিন্তু তা স্বপ্নাবিষ্ট মনের মুগ্ধ ক্রিয়া। তাতে শৃঙ্খলা নাই সংহতি নাই। তাই এলোমেলো জীবনের বৈচিত্র্যহীন ছন্দে তাদের জীবন হয় প্রভাবান্বিত।

এর জন্য দায়ী গণ নয়, দায়ী তাঁরা সুবিধার অনুগ্রহ পেয়ে অনাচারে যাঁরা সেই অনুগ্রহকে নিগ্রহের যন্ত্রে পরিণত করেছেন। বুদ্ধিকে স্বার্থপথে চালিত করে গণ হতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করে জাগতিক স্বাভাবিক সামঞ্জস্যকে দূরে ঠেলে ফেলে যাঁরা অসামঞ্জস্যকে বিধির বিধান বলে মনে করে নিয়ে তাই নিয়ম বলে মূঢ়তার সঙ্গে সমাজের বুকে দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী চালিয়ে আসছেন, তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতে নিজেদের কার্যের দ্বারা রাষ্ট্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। কাজেই বর্তমানে হিন্দু, মুসলমান, তপশীলভুক্ত জাতীর পৃথকীকরণে, ধনিক, শ্রমিকের সংঘাতে, কৃষক ভূম্যাধিকারীর মনোমালিন্যে বর্ণের বর্ণের প্রতি অশ্রদ্ধায়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভিতর সদ্ভাবের অভাবে যে তথ্য প্রকট হচ্ছে জাতীয় একাত্মবোধের উপাদান তার ভিতর নাই। এই সংঘাত ও পার্থক্য গুলিকে অস্বীকার করে জাতীয়তার যে স্বপ্ন দেখা চলেছে তাতে কল্পনার স্বর্গসৌধ নির্মিত হবে বটে, কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে যে বিভীষিকা সৃষ্ট হচ্ছে তাতে না হবে গণের কল্যাণ না হবে শিক্ষিতের কল্যাণ না হবে আভিজাত্যের কল্যাণ। বিভ্রান্ত গণ কিছুকাল চালিত হবে প্রলুব্ধতায়, উপায়হীন শিক্ষিত অবলম্বন করবে সাময়িক প্রয়োজনানুরূপ নীতি। অর্থের পরিবেশন হয়ত কিছু হবে, কিন্তু প্রার্থিত একাত্মবোধ আসবার আশা সুদূর পরাহত।

রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা সামাজিক জীবনে যাঁরা উন্নত স্থান অধিকার করেছেন বুদ্ধি যাঁহাদের মার্জিত, শিক্ষা যাঁদের বিস্তৃত, ক্ষমতা এবং অর্থ যাঁদের করতলগত জাতীয় জীবন গঠনে দায়ীত্ব তাঁদের অধিক। কিন্তু বর্তমানে ধন লিপ্সা বা ধনের যথেচ্ছ শৃঙ্খলাবিহীন ব্যবহারে তাঁরাও হারিয়ে ফেলেছেন আদর্শ। যে কোন উপায়েই হউক লব্ধ ক্ষমতার সংস্থিতি লোলুপতা জাগিয়ে তুলেছে দেশের প্রতি স্তরে শ্রেণী গত বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকগত জ্বালাকর অবিশ্বাস। সমাজের স্তরে স্তরে ঢুকে গেছে পঙ্কিলতা। অপব্যয়িত শক্তির অনাচার আর উপায়হীন নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে যে যোগাযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত রয়েছে তাতে একপক্ষের অধিকার অন্তরসম্পর্কবিহীন মুরুব্বিয়ানা আর একপক্ষের অধিকার হচ্ছে নীরবে তা মানা। গণমন জানে না অন্তত এতদিন জানে নাই —সে কি দেয় এবং বিনিময়ে সে কি পায়। এ দেওয়া শুধু অর্থ দেওয়া নয়—অর্থ দিয়েও যদি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার থাকে, মনকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারে তা হলেও, মানুষ একেবারে নিঃস্ব হয় না। কিন্তু তাতো হবার যো নাই—অর্থ গেলেই এবং সেই যাওয়াটা যদি চিরন্তনীপ্রথার মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় মানুষ মনও খুইয়ে সর্বপ্রকার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মনের উপরে এইরূপে যখন ছাপ পড়ে যায় অর্থের অভিঘাতের, আভিজাত্যের দূরত্বের, শিক্ষার বৈষম্যের, জীবনযাত্রা পদ্ধতির বিপর্যয়ের এবং ধর্মের নামে আচার অনুষ্ঠানের বিচারহীন পালনে সেখানে সাধারণ্যের মন স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সর্বরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অভিঘাত শুধু গণমন নয় যে কোন মানুষের চেতনাকে যে কোন মানুষের বুদ্ধিকে বিমূঢ় করে ফেলে। এই সম্মোহ হতে গণকে বিমুক্ত করতে হলে গণমনের চেতনা বিধান আগে দরকার।

অর্থনৈতিক পরিবেশনের অসামঞ্জস্য দূরীকরণের যাঁরা সম্পর্কিত প্রাণ হয়েছেন তাঁদের সাধু উদ্দেশ্য সফল হলে অর্থের পরিবেশন রূপান্তর গ্রহণ করবে, গণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ উপস্থিত করে দেওয়া হবে এবং উপরের শ্রেণীগুলিকে কিছু নৈকট্যের ভিতর আনা যাবে এরূপ আশা অবশ্যই করা যেতে পারে, কিন্তু গণের মন এই অর্থ পরিবেশনের জন্য যদি সজাগ না হয় অর্থকে ধরে রাখবার মত শিক্ষা সংযম এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অনুশীলিত হবার ব্যবস্থা না হয় এবং এইগুলি তাদের চরিত্রে স্থিতিলাভ না করে, তবে সে ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় বুদ্ধিজীবীর গলায়ই জয়মাল্য পরিয়ে দেবে, হয়ত বর্তমান আভিজাত্যের ধ্বংস স্তূপের উপর নূতন আভিজাত্যের গোড়া পত্তন করবে আর সেই নয়া

(শেষাংশ ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১০]

আরও মাস কতক পরে সহসা একদিন ইন্দু কহিল, অমলদা, আমি বিয়ে করছি!

অমল আশ্চর্য হইয়া কহিল, তার মানে?

ইন্দু চৌকীটার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, আর এরকম করে পারি না, একটু বৈচিত্র্য দরকার। যা অদৃষ্টে আছে হোক—

অমল একটু অসহিষ্ণুভাবেই কহিল, তার মানে কি? কী ব্যাপার?

ইন্দু কহিল, আমার এ ট্যুইশনটিও ত যাবে যাবে হচ্ছে, আমি ভদ্রলোককে খুব কাকুতি মিনতি করে বলেছিলুম আর একটা ট্যুইশনের জন্যে। অবশ্য নিজের অবস্থাও খুলে বলেছিলুম। তিনি আজ আমাকে ডেকে বললেন যে, তাঁর এক বন্ধু আছেন, কোথাকার পাটকলের বড়বাবু, তাঁর একটি মেয়ে আছে; মেয়েটি শ্যামবর্ণ—

অমল কহিল, তারপর?

ঈষৎ লজ্জিত নতমুখে ইন্দু কহিল, সে ভদ্রলোকের মেয়েটিকে যদি আমি বিয়ে করি ত তিনি আমায় টাকা চল্লিশেকের মত একটা চাকুরী করে দেবেন। তা ছাড়াও বিয়ের খরচ বলে মামার হাতে হাজার খানেক টাকা দিতে রাজী আছেন; গয়না দান-সামগ্রী আলাদা—

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু চল্লিশ টাকা মাইনেতে কি হবে, এ দারিদ্র্য কি আর ঘুচবে? তা ছাড়া বিয়ে করলেই ত ছেলেপুলে হবে, তখন? শেষকালে ঐ গঙ্গাধরবাবুর মতই ত হবে।

ইন্দু সারা পথ একটা সুখস্বপ্নের জাল বুনিতে বুনিতে আসিয়াছিল, সহসা বাস্তবের আঘাতে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে কহিল, আপনি বড্ড সব জিনিসের ডার্ক সাইড দেখেন!...সে মেয়েটি তার বাপের এক মেয়ে, তার সাচ্ছন্দ্যের মুখ চেয়েও ভদ্রলোক নিশ্চয় প্রাণপণে চেষ্টা করবেন আমার উন্নতির জন্যে।

অমল উঠিয়া বসিয়া কহিল, তা বটে, ভালও হতে পারে; তবে ঘরপোড়া গরু আমি, কোনওটাতেই ভাল কিছু যেন দেখতে পাই না।

ইন্দু উৎসাহিত হইয়া কহিল, চাই কি, আমি যদি আপিসে ঢুকি ত সুবিধে মত আপনাকেও ঢুকিয়ে নিতে পারি। কি বলেন?

অমল মনে মনে বিশেষ উৎসাহ না পাইলেও মুখে বলিল, তা বটেইত! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু খামকা বলিয়া ফেলিল, আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি!

অমল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কথা দিয়ে এসেছেন একেবারে?

মুখ নীচু করিয়া ইন্দু জবাব দিল, হ্যাঁ, ভেবে দেখলুম ইতস্তত করে বিশেষ লাভ নেই। যা হয় হোক—। কাল মামাকে চিঠি লিখে দেব।

আরও কিছুক্ষণ পরে ইন্দু কহিল, মামার যে কি দারিদ্র্য তা আপনি জানেন না অমলদা, কিন্তু আমি জানি। বেচারী আমার খরচ জোগাতে গিয়ে ভিটেটি শুদ্ধ দেড়'শ টাকায় বাঁধা দিয়েছেন, তার ওপর চালে আজ তিন বছর খড়ের কাটীটি শুদ্ধ ওঠেনি। হাজার টাকায় তাঁকে নিঋণী করে ঘরদোরগুলো যদি ভাল করে একবার ছাইয়ে দিতে পারি ত তাই আমার লাভ। ইহজীবনে ত কোন কাজে এলুম না!

অমল কহিল, না মিছে ভাববেন না। সত্যিই ত, এর চেয়ে আর কি খারাপ অবস্থা আমাদের হতে পারে?

দিন পাঁচেক পরেই ইন্দুর মামা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার দুই চোখে জল, মুখে হাসি। ইন্দুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, কি শান্তি যে আমাকে দিলি বাবা, তা আর কি বলব। তুই বিয়ে-থা করে ঘরবাসী হলি, এইটুকু যে আমি দেখে যেতে পারলুম, এই ঢের।

তার পর রাঙাটুকটুকে বউ আনব, ইন্দু আমার ঘর-সংসার করবে এই দেখে বুড়ো-বুড়ী চোখ বুজব। তা মানুষের সব সাধ পোরে না। বড়লোকের মেয়ে আমার মাটীর ঘরে ঘর করবে না, কিন্তু তবু তুই ত সুখী হবি!... নাই করলে সে আমার ঘর!

ভাঙা ছাতিটায় চোখের জল মুছিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু বিয়ের নিয়মকর্মগুলো আমার ওখান থেকেই হবে ত? তা নইলে তোর মামী বড় দুঃখু পাবে।

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, বোধ করি তাহার চোখও শুষ্ক ছিল না। সে কহিল, কেন মিছে ভাবছেন মামা,

মামা শুধু নীরবে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না। অমল একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার অবস্থাটাই এবার কাহিল হল আর কি!

ইন্দু যেন নিমেষে ম্লান হইয়া উঠিল, কহিল, সত্যি দাদা, আপনি একলা এই ঘরে—তাইত!...আচ্ছা, আমি কয়েক মাসের আমার শেয়ারটা যদি চালিয়ে যাই, আপনি রাগ করবেন?

অমল জবাব দিল, সবই ত জানেন ইন্দুবাবু, অতখানি সৌখীন ভদ্রতার অবস্থা কৈ?

ক্রমশ ইন্দুর বিবাহের দিন অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার এক অতি দূরসম্পর্কের ভগ্নির বাড়ি হইতে পাকা দেখার কাজটা সারা হইল, মামা তাহার পর দেশে গিয়া অল্প দুই একজন আত্মীয়স্বজনকে কথাটা জানাইয়া আসিলেন এবং ইন্দু তাহার দুই একজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিল মাত্র। মামা এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, বিবাহের পর খরচার অঙ্কটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ভাবিয়া ইন্দু ও অমল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাকা দেখার দিন পাত্রীপক্ষ পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি আড়াই'শ টাকার গায়ে-

হলুদের বাজার করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দু তাঁহাকে কতকটা জোর করিয়াই বাকী টাকাটা দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিল এবং মাথার দিব্য দিয়া দিল যেন তিনি দেনাটা শোধ না করিয়া কোনমতেই টাকাটা অন্য কোন বাবদে খরচ না করেন।

ইন্দু অমলকে ধরিয়া বসিল তাহার বিবাহে দেশে যাইতেই হইবে। অমলেরও বিশেষ আপত্তি ছিল না, সে সহজেই রাজী হইল। ছাত্রদের নিকট হইতে সাত দিনের ছুটী লইয়া সে প্রস্তুত হইল এবং বিবাহের পর দিন একেবারে বর-কন্যার সঙ্গে দেশের ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

দেশে আসিয়া ইন্দু মামীমার নিকট দেনার খরচ লইল। শোনা গেল মামা সুদ ও আসলের পঞ্চাশটি টাকা মাত্র দেনা শোধ করিয়াছেন, সামান্য কিছু ঘরদোর মেরামতি কার্যে ব্যয় হইয়াছে এবং বাকী সমস্ত টাকাটী তিনি ভোজের আয়োজনে জেলে, গোয়ালা প্রভৃতিকে বায়না দিয়া গিয়াছেন।

ইন্দু মামাকে ধরিয়া তিরস্কার করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তখন দিশাহারা। ইন্দুর শ্বশুররা জিনিসপত্র ভালই দিয়াছিলেন এবং কন্যার গায়ে গহনাও খুব কম দেন নাই। মামা গ্রামশুদ্ধ লোককে ডাকিয়া সেই সব জিনিস দেখাইতে লাগিলেন এবং পাগলের মত প্রত্যেককে বলিতে লাগিলেন, ইন্দু আমার রাজকন্যা বিয়ে করবে একথা বলিনি তোমাদের? সাক্ষাৎ রাজার মেয়ে বিয়ে করে এনেছে, আশীর্বাদ কর যেন বেঁচে থেকে ভোগ করতে পারে—

ইন্দুর অনুরোধে অমলও তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এসব কি করছেন মামা? এখন কি এসব শোভা পায়? দিন কতক যাক না—

মামা হাত-পা নাড়িয়া তাহাকে জবাব দিলেন, তুমি বোঝ না বাবা অমল; ইন্দুর শ্বশুর আমার সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁরা যেমন প্রাণপূরে দিয়েছেন, তার মর্যাদা রাখতে হবে ত? আর তা ছাড়া ইন্দুর একটা চাকরী হলে কিসের অভাব বাবা আমাদের? এমন দিনে আমোদ না করলে কবে করব বাবা?

অমল কহিল, কিন্তু চাকরী হোক আগে, আগে থাকতেই তার টাকায় হিসেব ধরা কি উচিত?

বৃদ্ধ সোৎসাহে কহিলেন, চাকুরী করে দেবে না? নিশ্চয় দেবে! কি বলছ, অমল, এ নিজের মেয়ে জামাইয়ের সুখ-দুঃখের কথা যে! এ না দিয়ে যাবে কোথায়? সে সব তুমি কিছু ভেবো না।

তিনি পুনশ্চ উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া দ্রুত অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। ইন্দু হতাশ হইয়া কহিল, কি হবে দাদা, মামা হয়ত গ্রামশুদ্ধ লোকই নিমন্ত্রন করে আসবেন!

অমল কহিল, খুব সম্ভব।

তাহাদের আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল সন্ধ্যা-বেলায়। স্বগ্রামের লোক ত সকলে আসিলই, নিমন্ত্রণের উদারতা দেখিয়া ভিন্ন গ্রামের লোকও বিনা-দ্বিধায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আয়োজন যাহা হইয়াছিল তাহা নিঃশেষে উড়িয়া গেল, তারপর সম্মান রক্ষার জন্য ছুটাছুটী দৌড়া-দৌড়ির অন্ত রহিল না। সমস্ত খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া ক্লান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ইন্দু যখন জীবনের মধুরতম রজনীর অপেক্ষায় ফুলশয্যার দিকে অগ্রসর হইল তখন সূর্যদেব পূর্বা-কাশে দেখা দিয়াছেন এবং এদিকে বরকনের সমস্ত টাকা নিঃশেষে উড়িয়া গিয়া টাকা ত্রিশ-চল্লিশ বাজারে ধার পড়িয়াছে।

ইন্দু ফুলশয্যার নিয়মকর্ম শেষ করিয়া বিছানায় না শুইয়াই বাইরে চলিয়া আসিল এবং শুষ্কমুখে অমলকে ডাকিয়া লইয়া বাহিরের বাগানে একটা আমগাছ তলায় শুইয়া পড়িল।

কি হবে অমলদা?

অমল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, কি করবেন বলুন। মামা আপনার জন্য অনেক কষ্টই করেছেন, একটা দিন না হয় জীবনে তাঁকে আনন্দ করতে দিলেনই? আর সেও ত আপনারই জন্য!

ইন্দু ভয়ে ভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, চাকরী ওরা করে দেবে বোধ হয়, কি বলেন?

অমল কহিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে বৈকি! নিজের জামাই যদি কষ্ট পায় ত মেয়েরও কষ্ট হবে।

ইন্দু ট্যাঁকের মধ্য হইতে গোটা বাইশ টাকা বাহির করিয়া কহিল, এই কটা কাল যৌতুকের বাবদ পাওয়া গিয়েছিল, একটা টাকা আর মামার হাতে পড়তে দিই নি। দশটা টাকা আপনার কাছে রাখুন, মাস পাঁচেকের জন্য অন্তত ঘরটা রাখতে পারবেন। কিছু নিজের কাছে না রাখলেও নয়; শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আসা আছে, কলকাতায় যাওয়ার খরচা আছে, মামার হাতে বোধ হয় একটা পয়সাও নেই আর।

দুজনেই খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দু কহিল, কাজটা ঝোঁকের মাথায় করে যা ভাবনা হচ্ছে! এখনই যদি চাকরী না পাওয়া যায় তাহলে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

অমল কহিল, বিয়ের ঐ দিকটাই শুধু দেখেছেন ইন্দু-বাবু, তাতে আপনার স্ত্রীবেচারীর ওপর কি একটু অবিচার করা হচ্ছে না?

লজ্জিত হইয়া ইন্দু কহিল, তা বটে। কিন্তু কি উপায় বলুন?...আচ্ছা, বৌ কেমন দেখলেন অমলদা?

অমল একটু ভাবিয়া কহিল, মন্দ কি!...রংটা ময়লা বটে কিন্তু বেশ শ্রী আছে।

সত্যই ইন্দুর বৌ মন্দ হয় নাই। কালো রং কিন্তু অল্প বয়স ও মুখশ্রী ভাল বলিয়া ভালই দেখায়। তাহার চোখে যে চমৎকার একটি বুদ্ধির আভা আছে তাহাও সহজে নজরে পড়ে।

ইন্দুর মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, তাহলে এ পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমি ঠকিনি। এখন শেষ রক্ষা হলে হয়।

অমল প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য প্রশ্ন করিল, মামা কোথায় গেলেন?

ইন্দু জবাব দিল, কাল ফুলশয্যার তত্ত্বে যে মিষ্ট এসেছে,
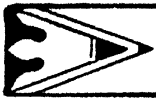
তাই পাড়ায় বিলোতে গেছেন। সেটা অবশ্য নামে। ওরা মামীমাকে ত গরদের শাড়ী নমস্কারী দিয়েছেই, উপরন্তু ওঁকেও একখানা গরদের ধ্বতি দিয়েছে; আসল কাজ হোল সেই দ্বটোই পাড়ায় দেখাতে যাওয়া—

বাগানের অসংখ্য গাছের পাতায় পাতায় সোনালী রোদ ঝিক-মিক করিতেছিল, পাখীদের প্রভাতী গানে স্বনিবিড় শান্তির আভাষ। সেদিকে এবং আলো ঝলমল স্বদ্বরে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে মনে হয়, এ পৃথিবীতে কোথাও ব্বঝি কোন অভাব, কোন অশান্তি নাই। এই তরুণ য্ববক দ্বটিও বহ্ব-ক্ষণ নিঃশব্দে বহিঃপ্রকৃতির সেই অপ্রূর্ব রূপভাণ্ডারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আবার ওদিকের একটু গোছগাছ করা দরকার। বাড়ির যা অবস্থা হয়ে আছে, যেন চাইতেই পারছি না।...তা ছাড়া হিসেবটাও একটু জানা দরকার—Where we stand!

সে চলিয়া গেল। অমল আর উঠিল না, একটু পরেই ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা দ্বইটি ব্বজিয়া আসিল।

(ক্রমশ)

গণমন

(১৮৭ পৃষ্ঠার পর)

আভিজাত্য প্রাচীন আভিজাত্যের প্বর্বষানক্রমিক সঞ্চিত গ্বণ, অভিজ্ঞতা সংস্কৃতি ও র্বচির শোভনতার দিকে লক্ষ্য না করে তাকে মেরে ফেলে কেবল তার অবলম্বিত নিতান্ত বাহ্য ফ্যাসনের অন্বকরণে নিজেকে যদি নিয়োজিত করে, তবে দেশে জাতীয় জীবন গঠনে সে পন্থা সহায়ক হবে না এ কথা স্বনিশ্চিত।

যাজকতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্র (Theocracy) এককালে সমগ্র পৃথিবীতেই প্রবল ছিল, রাজতন্ত্রের শক্তি এর কাছে হীন বল ছিল। আমাদের দেশেও এর ব্যত্যয় ঘটে নাই। রাজ সিংহাসনের পার্শ্বে ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব রামায়নী মহা-ভারতীয় য্বগে আরম্ভ হয়ে প্রাগ বৌদ্ধয্বগের ভিতর দিয়ে মহা-রাষ্ট্রীয়য্বগের শেষ সময় পর্যন্ত একরূপ ধারা বজায় রেখে চলে এসেছে। শাসনচক্রের দন্ড একই শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত থাকায় ব্রাহ্মণ্যাভিজাত্যের ধর্মনীতি হিন্দ্ব জাতির আপামর সাধারণের জীবনে জড়িত হয়ে গেছে ওতপ্রোতভাবে। ম্বসলিম-য্বগেও রাজতন্ত্রের পোষণে ধর্মযাজকগণের প্রচারে ভারতীয় ম্বসলিম সমাজে গণমনের উপর ধর্মযাজকতার প্রভাব অন্বরূপ-ভাবেই কার্য করেছে। কিন্তু ম্বসলিম ধর্মযাজকতায় সাম্যের বাণী ম্বসলিম সমাজের গণমনের একত্ব বোধের সহায়ক হয়েছে, অপর পক্ষে হিন্দ্ব ধর্মযাজকতায় শক্তি হীনতার য্বগে লব্ধ সত্তাকে বিস্মৃত হবার য্বগে বাহ্যিক আচার অন্বষ্ঠান প্রাণ-হীনতাকে আশ্রয় করেছে আর এই বিকৃত প্রভাব হিন্দ্ব সমাজের গণমনের উপর তার অধিকার ত্যাগ করে নাই; কাজেই বর্ণগত বিভেদ হিন্দ্ব মনকে আরও ভারাক্রান্ত করে রাখলে।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হিন্দ্ব-ম্বসলমানকে যদি একত্রে বাস করতে হয়, তবে হিন্দ্ব ও ম্বসলমান উভয় সমাজের গণ-মনকে গ্রথিত করতে হবে একস্বত্রে, এক আদর্শে; জাগাতে হবে এক স্বার্থব্বদ্ধি, প্রেরণা দিতে হবে এক কর্মের। রাষ্ট্র-নীতির চেতনার উপর জাতীয় উন্নতির সৌধ নির্মাণ করতে হবে। প্রতীচ্য জগতে ধর্মকে যেমন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বা আত্মীক জীবনের প্রয়োজন রূপে রাখা হয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্র হতে দ্বরে অপসারিত করা হয়েছে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় ঠিক অন্বরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। গণমনে এই চেতনা যদি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় এই আদর্শে যদি অন্বপ্রাণিত হন তা হলেও পরস্পরের সমাজগত, পরিবারগত এবং ধর্মগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিকে বজায় রেখে এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার চক্ষে দেখে জাতীয়তার ক্ষেত্রে মিলনের ব্যবস্থা করতে হবে। তার ফলে ন্বতন আদর্শ ন্বতন সংস্কৃতি দেখা দেবে অথচ প্বরাতন তার বৈশিষ্ট্য হারাবে না। এটা যদি স্বপ্নও হয় তবে তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে; না হলে পরস্পরের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং তৃতীয় পক্ষের জয়পতাকা স্কন্ধে বহন করবার গৌরব আরও দীর্ঘকাল ধরে অন্বভব করতে হবে। আর কোন পন্থা নাই।

চিকাগোর পথে

(ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

শ্রীজগদ্‌বন্ধু দেব তো বললেন, 'ভুলে যান', আমি কিন্তু ভুলতে পারি নি। কেন যে বলেছিলেন 'ভুলে যান' তা আমি বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমেরিকায় যত হিন্দু আছেন তাঁরা প্রায়ই জাতীয়তাবাদী। জর্জ ওআশিংটন থেকে লিসবন পর্যন্ত সকলেই জাতীয় ভাবের পূজারী ছিলেন। তাঁদের মতবাদ এখনও আমেরিকার শতকরা সত্তর-জন লোক মেনে চলে। তারাই রাষ্ট্রের নীতি ধার্য করে। তাদের নীতি যারা মানে না তাদের তা'রা কোনওরূপ সাহায্য করে না। যদি দেখে সরকারী তহবিল থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কেউ তাদের নীতির বিরুদ্ধে চলছে, অমনি তার সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। আমেরিকায় এখনও হিন্দুরা বসবাস করবার অধিকার পায় নি; এমন অবস্থায় তাদের মনের আসল ভাব গোপন করাই কর্তব্য। দে মহাশয়ের মনের ভাব কি তা আমি জানতাম না, আমাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করিয়েছেন ব'লে মনে হ'ল। পর্যটকদের এমনভাবে অনেকে ব্যবহারে লাগায় তা আমি আগেও জানতাম; তাই চুপ ক'রে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ভারতীয় পর্যটক বিদেশে ভারতের সম্বন্ধে সত্যপ্রচারে নানারকম বাধা বিঘ্ন পায়। এই সব বাধা বিঘ্ন দূর করবার আশায় স্বর্গত প্যাটেল কিছু টাকা দিয়ে যাবেন ব'লে ভিয়েনাতে বলেছিলেন। প্যাটেলের প্রিয় বন্ধু ডিট্রয় নিবাসী শ্রীযুক্ত হাসিম উল্লা তাঁকে সে উদ্দেশ্যে কিছু টাকা খরচ করতে বলেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকার অনেক হিন্দু তাঁকে টাকার তোড়া দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু স্বর্গত প্যাটেল তাদের টাকা না নিয়ে নিজের টাকাই খরচ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি যখন চেকোস্লোভাকিয়া পৌঁছই তখন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একটা বড় গ্রামে শরীর সারাবার জন্য থাকতেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তাঁর বুদাপেস্তবাসী এক প্রিয় বন্ধুই আমাকে জানিয়েছিলেন যে, স্বর্গত প্যাটেল বিদেশে প্রচারার্থে অনেক মিলিয়ন পেঙ্গ বসু মহাশয়কে দিয়ে গেছেন। ভেবেছিলাম ভিয়েনাতে গিয়ে তার নমুনা দেখব। কিন্তু নমুনা যা দেখলাম তা চমৎকার। শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী অস্ট্রো-ইন্ডিয়ান লিগ নামের এক প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। সেই লিগের টাকা কোথা থেকে যে আসে তা আমি জানি না, তবে কার্যকলাপ দেখে যা মনে হ'ল তাতে তাকে 'অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান লিগ' বলতেই ইচ্ছা করে।

দুজনা অস্ট্রিয়ান মেম্বরের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা, বাল্যবিবাহ, বিধবার না বিয়ে হওয়া, হরিজনকে মানুষ ব'লে গণ্য না করা—এসব কি ক'রে হয়। সে প্রশ্নের জবাব কি দিয়েছিলাম এখন তা ঠিক মনে নেই, তবে একথা মনে আছে যে, অগ্নিহোত্রী মশায় আমাকে যা দেবেন ব'লেছিলেন, আমার উত্তর শোনবার পর তা আর দিতে চান নি।

ইউরোপ স্বাধীন দেশ। সেখানে সহজে কেউ কারও মুখ বন্ধ করতে পারে না। বাধা পেলে তাদের আরও বেশী ক'রে মুখ খোলে। হিটলারের দেশেও দেখেছি তাঁর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধবাদীরাও কম মুখ খুলে থাকেন না। কিন্তু তা'রা আমাদের দেশের মত হইচই করে না। ছাগলে চীৎকার করে, বাঘে গম্ভীরভাবে কার্যসাধন করে। জার্মনিতে পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে কেউ 'হিটলার জাহান্নমে যাক' ব'লে চিৎকার করে না, জানে সত্যকার ক্ষমতা থাকলে বিনা চিৎকারেই কর্মসাধন হয়। আমার মুখ জার্মনিতে সব সময়েই খোলা ছিল, কেউ বাধা দেয় নি; হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমি ছাগল, বাঘ নই।

ভারত থেকে ইউরোপে অতি অল্প কয়জন লোকই বেড়াতে গিয়েছেন। লোক অর্থাৎ লোকের মত লোক। এই যেমন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, স্বর্গত প্যাটেল। আমি আর শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মানুষের মত মানুষ নই, ছাগল বললেও দোষ হয় না; সারারাত্রি ম্যা ম্যা করলেও কেউ সাহায্য করতে আসে না। ভারতের বাইরে যে সকল ভারতবাসী অর্থাভাবে মনের কথা খুলে বলতে পারেন না তাদের সাহায্যার্থেই স্বর্গত প্যাটেল অনেক টাকা রেখে গেছেন শুনে সুখী হয়েছিলাম। স্বর্গ যদি সত্যই থাকে তো স্বর্গত প্যাটেলের আত্মা নিশ্চয়ই তাঁর অর্থের সদ্ব্যবহার কামনা করছেন।

প্রবল বাসনা যার মাঝে আছে, দুঃখ-দৈন্যের চাপেও প্রবল বাসনা যাদের নষ্ট হয় নি, এমন দু-একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের একজন হলেন স্বর্গত সাকলত-ওয়ালা। মাটির নীচে চাএর দোকানে দু' পেনির চা খেয়ে যখন পাঁচসাতজন শ্রোতার সামনেই তিনি বক্তৃতা দিতেন, তখন শরীর দস্তুরমত ঘেমে উঠত।

স্বর্গত প্যাটেল ডিট্রয় নগরীতে অনেক দিন ছিলেন। তাঁর দুঃখের কথা তিনি অনেক সময় বলতেন। অশিক্ষিত হিন্দুরাও সে করুণ কাহিনী শুনে যে যত অপকর্ম করত, ছেড়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধের চারিপাশে শতাধিক লোক সকল সময় ব'সে থাকত। তিনি মুসলমানদের মোল্লা ছিলেন না, পীরও ছিলেন না; তবু যারা তাঁকে সর্বদা ঘিরে ব'সে থাকত তাঁরা ভারতের অশিক্ষিত মুসলমান। স্বর্গত শওকত আলি জানতেন, সাগরপারের মুসলমানরা প্যাটেলকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, কত আদর-অভ্যর্থনা করেছিল। যাঁরা দুঃখকষ্ট সয়ে ভারতের গরিবদের সঙ্গে মিশেছেন তাঁরাই জানেন, তাঁরা কত হীন। ধর্ম ওরা বোঝে না, গ্রাহ্য করে না। সেজন্যই তা'রা স্বর্গত প্যাটেলকে ঘিরে বসে থাকত। আমি যখন ডিট্রয় পৌঁছই, স্বর্গত প্যাটেলের কথা তখন প্রত্যেক লোকের কাছেই শুনতে পেতাম। স্বর্গত প্যাটেল যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন অনেক বেকার হিন্দুকে সাহায্য ক'রেছিলেন। তাঁরা হয়তো আর ভারতে আসবে না, এলেই তো সেই রাজ-পুরুষদের হাতে তাদের নিপীড়ন হবে! আমেরিকাতে তাদের কাজ করবার অধিকার নেই, সেইজন্যই তারা কষ্ট পাচ্ছে। কাজ করবার অধিকার নেই শুনে অনেকে হয়তো ভাববেন তাদের কেরানীগিরির অধিকার নেই। কেরানীর কাজ নয়, জুতো

পরিষ্কার করা, পথ পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, নাপিতের কাজ, মাঠের কাজ এই সবই তারা চায়; তাও পায় না।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে বিদায় দিয়ে শ্রীযুক্ত দেকে সঙ্গে নিয়ে কাছেরই একটা থিয়েটার হলে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। যে সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠলাম তা ভয়ানক অপরিষ্কার। হলের চেয়ারগুলো অনেক দিনের পুরনো। সভাপতি যেখানে বসবেন তার পিছন দিকের যে দরজা, তার কাচ ভেঙে গেছে। দিবালোক তা দিয়ে ঢুকে এমনভাবে শ্রোতাদের চোখে মুখে পড়ছে যে, সে আলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে সভাপতি বা বক্তার মুখই দেখা যায় না। বিশ্রামগৃহের (rest room) অবস্থা এত কদর্য হয়েছে যে, সমস্ত হলটাতে তার দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। যারা বক্তৃতা শুনতে এসেছে তাদের পায়ের মোজা কতদিন যে ধোয়া হয় নি তার ইয়ত্তা নেই; এমন দুর্গন্ধ বার হচ্ছে যে শ্রোতাদের কাছে বসা দায়। এরূপ শ্রোতা দেখতে পাওয়া যায় গির্জায়, যেখানে শ্রোতাদের কিছু খাবার খেতে দেওয়া হয়। যদি খাবার খেতে দেওয়া না হ'ত, তারা গির্জায় যেত কি না সন্দেহ। কিন্তু এই সভায় খাবারের কোনও বন্দোবস্ত হয় নি, বরং শ্রোতাদের পকেটে হাত পড়বার সম্ভাবনা ছিল, তবুও ঘরটা দেখলাম একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত দে বলেছিলেন, আমি শ্রোতাদের মাঝে ব'সে থাকব, যখন দরকার হবে তখন তিনি আমাকে ডেকে নেবেন।

এত শ্রোতার সমাবেশের কারণ, সদ্য আগত একজন হিন্দুর কাছ থেকে পৃথিবীর লোকের কথা শোনার আগ্রহ। হাতে আঁকা আমার এক প্রতিকৃতি গেটের কাছেই রাখা ছিল। অনেকে সেই ছবি দেখছিল। কিন্তু আমি যখন সেই ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন কেউ আমাকে চিনতে পারলে না। বোধ হয় তখন আমার মাথায় টুপি ছিল তাই। আমার পরিচয় দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল, এই লোকটি রাণজী প্যাটেল নন যে আপনাদের কাছে 'পারসেনটেজ'এর কথা বলবেন, মিস্টার বিশ্বাসও নন যে আপনাদের ট্রিক দেখাবেন; এঁর নাম রামনাথ বিশ্বাস, একজন পর্যটক মাত্র; পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যা দেখেছেন তাই আপনাদের বলবেন। যখন গিয়ে আমি গ্যালারিতে দাঁড়ালাম, তখন অনেকেরই মনে খট্‌কা লাগল, হয়তো আমি নিগ্রো। লোকের সে চাহনিতেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম, নিগ্রো কি মানুষ নয়, তারা কি শিক্ষিত হ'তে পারে না? এই কথাটা নিয়েই অন্তত এক ঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। শেষে বলেছিলাম, কাউকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা মানে ভবিষ্যতে নিজেরই দমিত হবার পথ প্রশস্ত করা।

সুখের বিষয়, আমেরিকায় লেকচারের পর শ্রোতাদের পক্ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রথা আছে। আমেরিকার সাধারণ লোক সংবাদপত্র পাঠ ক'রে তৃপ্ত নয়, মুখের কথায় খবর শোনবার আগ্রহই যেন তাদের বেশী। আমি যখন বললাম যে, ভাল ইংরেজী জানি না ব'লে কেউ যেন কিছু মনে না করেন, তখন অনেকে বললেন যে, "আমাদের কপাল ভাল তাই আপনি ভাল ইংরেজী জানেন না। জানলে সরল ভাষায় সত্য কথা শুনতে পেতাম না, যত সব বুদ্ধি খাটানো বজ্জাতি আর কূটনীতিপূর্ণ ভাষার বাহুল্যে আমাদের কর্ণকুহর পূর্ণ হ'ত।" আজ আমেরিকার লোক আর জিজ্ঞাসা করে না, ভারতে শিশু-বিবাহের কারণ কি, হরিজন কি ক'রে হ'ল। যারা ফিউড্যালিজ্‌মএর উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করেছে এবং সম্রাট সৃষ্টির কারণ শুনেছে তারাই বুঝেছে হরিজনের সৃষ্টি কেমন ক'রে হয়। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যবাদ যে একদা এত হীন স্তরে পেঁছেছিল তার সংবাদ অনেকেই জানে না, শুনেছি এমন কি মার্কস্‌-ও সে কথার উচ্চবাচ্য ক'রে যান নি। আমেরিকার নিগ্রোদের অবস্থার সঙ্গে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর সঙ্গে হরিজনদের তুলনাই হয় না। তাদের মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছে।

আজ ডিট্রয়ের সাধারণ শিক্ষিত লোক ভারতের আধ্যাত্মিক সংবাদ রাখতে চায় না। তারা জানতে পেরেছে, যে-দেশে মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখা হয়েছে, সে-দেশের বড় বড় তথ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা—আধ্যাত্মিকতাই নয়। তবে যারা ভারতের আধ্যাত্মিকতার সংবাদ শুনে বিভোর হয়, সংবাদপত্রে ভারতের অধ্যাত্মতার বক্তৃতাদি আগাগোড়া ছাপিয়ে দেয়, তারা হ'ল আমেরিকার millenarians।* এই ধার্মিকরা অপরকে ঠকিয়ে ধনী হয়েছে, তাই চায় ধর্মযাজকদের টাকার ঘুষ দিয়ে একটু পারলৌকিক সদ্‌গতি সঞ্চয় করতে। বড় বড় ইমারত গ'ড়ে দিচ্ছে ধর্মযাজকদের, তাই তারা ধর্মযাজকদের সুখী রাখবার চেষ্টা করছে। যারা চোরের উপর বাটপাড়ি করে তাদের মনের শক্তি অসীম। এই শক্তিই বোধ হয় ভারতের আধ্যাত্মিকতা।

বক্তৃতার পর আমি পারিশ্রমিক চাই নি। সভাপতির কথায় গরিবরা পকেট খালি ক'রে একটি টুপিতে ফেলতে লাগল আর বলতে লাগল, আজ খাঁটী হিন্দুর কাছ থেকে পৃথিবীর অনেক সত্য সংবাদ শুনতে পেয়ে পকেট শূন্য ক'রে ফিরতে তাদের দুঃখ নেই।

এখানকার নিগ্রো সমাজ মস্ত বড়। শহরের একচতুর্থাংশ তাদেরই দখলে। তাদের বাড়িঘর শ্বেত আমেরিকানদের মত, তাদের চালচলনও তাই। শিক্ষার দিক দিয়েও এরা খুব উন্নত। অনেক সময় দেখা যায় অনুপাতে শ্বেতকায়দের চেয়ে নিগ্রোরা বেশী শিক্ষিত। অর্থের দিক দিয়েও কম যায় না, সমান। তবু কোন অংশে কম না হলেও এরা হোটেলে শ্বেতকায়দের সঙ্গে খেতে পায় না। শ্বেতকায়দের হোটেলে গিয়ে শুতে পায় না। এই ব্যবহারিক বৈষম্যের ফলেই এদের মাঝে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে। শ্বেতকায়রা প্রতি পদেই সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চলে। নিগ্রো চাকরানী রান্না করতে পারে, বাসন মাজতে পারে, খাবার এনে টেবিলে দিতে পারে, পাশের ঘরে উত্তম শয্যায় শুতে পারে, মনিবের ছেলেমেয়েকে ঠেঙাতে পারে, অনেক সময় মনিবকে গাল দিতেও পারে,

* যীশুখৃষ্ট পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সহস্র বৎসরকাল রাজত্ব করিবেন এই মতে বিশ্বাসী।

কিন্তু ওই ঠেঙ্গানো ছেলেই যখন শ্বেতকায়দের রেস্তরাঁয় গিয়ে খেতে বসে তখন ঘরের চাকরানী তার সঙ্গে বসতে পারে না।

শ্রীযুক্ত গুহ রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি জাতে হিন্দু, কিন্তু আমেরিকার নাগরিক (citizen)। তাঁকে আমেরিকা হ'তে তাড়ানো যাবে না, অন্তত কোনও হিন্দু সে-চেষ্টা করবে না। তিনি নিগ্রো পাড়ায় রাশিয়ার সমাচার বিক্রয় ক'রে থাকেন। আমেরিকার সরকার সেই সংবাদ রাখে না। নিগ্রোরা তাঁর কথা শুনে অনেকেই সামাজিক সাম্য পেতে ব্যস্ত হয়েছে; পথেঘাটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। শ্বেতকায় দরিদ্রদেরও তারা দলে টানছে। শ্রীযুক্ত গুহ ভাল বক্তা নন, কিন্তু উত্তেজিত হয়ে যখন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে থাকেন, তখন তা শোনবার মতন। বোধ হয় সেইজন্যই লোক ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। গুহ স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য ক'রে বলেন, "তোমরা মানুষ নও, যদি মানুষের মতন সাহায্য করতে তবে ডিট্রয় হ'তে আজই সব বর্ণবৈষম্য দূর হয়ে যেত।" তাঁর বক্তৃতা দরিদ্রের মনে শান্তি আনে, অত্যাচারিতের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, পুঁজিবাদীদের মনে ভয়যুক্ত অস্বস্তির সঞ্চার করে। কিন্তু শ্রীযুক্ত গুহ যখন বক্তৃতা দিয়ে গ্যালারি থেকে নামেন, তখন সকলেই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

ডিট্রয় বৃহৎ নগরী। এই নগরী শ্রীযুক্ত ফোর্ডের মোটর কারখানার জন্য একদিন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত ফোর্ডের বিখ্যাত মোটর কারখানা এইখানেই। প্রভাতে যখন মজুরের দল মোটরে ক'রে কারখানা নগরীতে প্রবেশ করে তখনকার দৃশ্য পর্যটকদের গিয়ে দেখা উচিত। হাজার হাজার মোটরকার একটানা স্রোতের মত ক্রমাগত গেট দিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করছে। একটি লোকও কথা বলছে না কিংবা একটি লোকও মোটরে হর্ন দিচ্ছে না, অভ্যস্ত ধারায় অন্যের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে কারখানাতে প্রবেশ করছে। তাদের এই আচরণের পিছনে ধর্মের প্রেরণা নেই, কারও আদেশ নেই; আছে স্বচ্ছন্দ বিনয় (discipline)। অনেকের ধারণা, যাদের অভাব নেই, শৃঙ্খলা বা বিনয় তাদেরই থাকে। আমাদের দেশে অনেকের অভাব নেই, অথচ তাদের মাঝে বিনয়ের ব-ও দেখা যায় না। মজুর সমাজকে সাধারণত নরকের সঙ্গে তুলনা করলে ফোর্ড সাহেবের কারখানা দেখলে বলতে ইচ্ছা করে, তিনি সত্যই নরকে নন্দনের সৃষ্টি করেছেন।

মজুরের দল যখন কারখানায় প্রবেশ করে তখন মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি করে। তাতে আমাদের দেশের অমুক কি জয়এর মত ফোর্ড সাহেব বা অন্য কারও নাম জড়িত থাকে না। তারা জয় দেয় নিজের নিজের জাতের—সর্বসাধারণের, কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়। আমাদের দেশের মজুর অনাহারে থাকে। ওদের মজুররা পকেট ভরে মজুরি পায়, পেট ভরে খেয়ে হজম করে, প্রাণ ভরে ঘুমোয়, স্বচ্ছন্দে পরিশ্রম করে শরীরের রক্ত চলাচল সতেজ রাখে; তাই তাদের পরিষ্কার মগজে নিত্য নূতন পরিকল্পনা জন্মাবার সুযোগ পায়। অন্য দেশের কারখানার মত ফোর্ডের কারখানাতেও যে দোষ নেই তা নয়, কিন্তু সে দোষ বড় একটা দানা বাঁধতে পারে না। সুপারভাই-জার, সাধারণ মজুর এবং ম্যানেজার, সবাইকেই ফোর্ড সাহেব বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের মধ্যে অফিসার ও সাবঅর্ডিনেট কেউ নয়, তাঁরা সকলেই মজুর ও সহকর্মী, একথা যেন তাঁরা ভুলে না যান; কেউ কোনওরূপ বিশেষ অনুগ্রহ (special favour) পাবেন না, খোশামোদ করলে কাজ ছেড়ে চলে যেতে হবে ইত্যাদি। প্রমোশন সেখানে ভোটের সাহায্যে হয়, প্রমোশন দেবার অধিকার কোনও ব্যক্তিবিশেষের নেই। আরও এই ধরণের এমন কতকগুলি আইন আছে, যা দেখলে মনে হয়, সে সব রাশিয়া থেকে ধার ক'রে আনা। এজন্যই ফোর্ডের কারখানায় ধর্মঘট হয় না। মজুরদের দেখলেই মনে হয় তারা মনের সুখে আছে।

কিন্তু যুগের বাতাস এহেন কারখানাতেও বইছে দেখে এলাম। এরই মাঝে মজুরদের মাঝে রব উঠেছে শুনলাম, ফোর্ড সাহেব থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যারা কারখানা থেকে বৎসরের শেষে মোটা টাকা বার করে নেন, তা বন্ধ করতে হবে, ফোর্ড সাহেবকেও নূতন মতে নূতন পথে চলতে হবে। বাস্তবিক, ফোর্ডের কারখানা বর্তমানে যেন আমেরিকার জুজুর ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিন; ওদের ভাষায় the fatty guy, যেন নূতনরূপে প্রভাব বিস্তার করছেন ব'লে মনে হ'ল। সেখানে তিনি অভিনেতা নন, গোপনে নূতন ভাবের নেতা হবার বাসনা বোধ হয় তাঁর হৃদয়ে বিরাজিত। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি, সর্বত্র মজুর ও দরিদ্রদের জাগরণ আমার এই মোটা চোখেও ধরা পড়েছে। ধনীদের মধ্যে সর্বত্রই যেন একটা ভয় ও লুকানো ছাপানোর ভাব। আমার মনে হ'ল আমেরিকার পুঁজিবাদও বোধ হয় আর বেশী দিন নয়। এমনিই, একদিন চীন দেশে গিয়ে যে নূতন ভাবের ও নূতন জাগরণের আভাস দেখে এসে বাঙলা সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিখে-ছিলাম, আজ সেখানে তা স্পষ্টরূপে প্রকাশমান। শ্রীযুক্ত চু-তে আজ চীনকে এমন এক অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যে, জাপানীরা পর্যন্ত আজ আর চিয়াং-কাই-সেককে ভয় করে না, ভয় করে কমিউনিস্ট চীনের।

ফোর্ডের কারখানাতে আগে অনেক হিন্দু কাজ করতেন। বর্তমানে ফোর্ডে এক জনমত গড়ে উঠল যে, যাদের second paper নেই অর্থাৎ যারা আমেরিকার বাসিন্দা নয়, তাদের আর নূতন ক'রে কাজ তো দেওয়া হবেই না, উপরন্তু যারা পূর্বে কাজ করত তাদেরও কাজ থেকে বার ক'রে দেওয়া হবে। বেশী দিন গেল না, দেখা গেল হিন্দুরা (ভারতবাসীরা) সবাই চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ফোর্ডের কারখানায় আজ আর কোনও হিন্দু কাজ করে না। আমার মনে হয় এই মনো-ভাবকেই হিন্দুস্থানে provincialism বলে। আমি অনেক মজুরের কাছে তাদের প্রাদেশিকতার প্রতিবাদ করেছিলাম। অনেক সভায় তাই নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। অনেকে আমার মত পোষণ করলেও বর্তমানে যারা মজুর সমস্যা নিয়ে কাজ করে উক্ত provincialismএর উপর তাদের কোনও হাত নেই বুঝেছিলাম।

এরই মাঝে ওদেশে জাতীয় ভাব এবং জাতীয়তার (nationalism) বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। এতে বিপন্ন হিন্দুরাও আপন আপন শক্তির ব্যবহারে ত্রুটি করছে না। যে সকল হিন্দু ভারতীয় ধর্মের প্রভাবে পূর্বে সদা-সর্বদা নিজেদের পৃথক ক'রে রাখত, আমেরিকান হ'তে চাইত না, তারাও আজ বুঝতে পেরেছে যে ধর্ম যেমন একটা সংকীর্ণ গণ্ডি, জাতীয়তাও তেমনি একটা সংকীর্ণ গণ্ডি। এই ছোট ছোট গণ্ডি নানা সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। জাতীয়তাবাদও পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার একটা বিশেষ উপায়। যারা এই পুঁজিবাদের প্রভাবে প'ড়ে আর্থিক কষ্টে পেটের ক্ষুধায় অহরহ কষ্ট পাচ্ছে তারাই বুঝতে পারছে ধর্মের গণ্ডি, জাতীয়তাবাদের গণ্ডি তাদের পক্ষে কত কষ্টদায়ী, কত অমঙ্গলকর।

ফোর্ডের কারখানা দু দিন দেখতে গিয়েছিলাম। বড় বড় মেশিন, বড় বড় গুদাম, বড় বড় লরি, বড় বড় যন্ত্র দেখে যেমন মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল, তেমনি কারখানার ল্যাবরেটরিতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সব নিক্তি দেখে মনে হয়েছিল অত বড় বড় মোটর তৈরির কাজে কত ক্ষুদ্র জিনিসেরও দরকার! যারা এই কারখানায় কাজ করে তাদে পোশাক এবং আচার ব্যবহার দেখলে মনে হয় না, এরা পদমর্যাদায় কেউ কারও চেয়ে ছোট। মনে হয় এদের মাইনের কোনও প্রভেদ নেই, এদের মধ্যে বড় ছোট নেই। কেউ কাউকে ধমকাচ্ছে না, কেউ কাউকে অপদস্থ করছে না, কেউ কাউকে বড়বাবু বড়সাহেব বলে তোষামোদ করছে না, সবাই সমান কাজ করে চলেছে। পরিশ্রম করছে ব'লে কারও কপালে ঘাম, পরিশ্রম সমাপন করেছে বলে কারও মুখে হাসি। কিন্তু তা ব'লে একে অন্যকে হিংসা করছে না। কাজ করতেই হবে। মাঝে মাঝে নারী মজুররা পুরুষ মজুরের কষ্ট লাঘবের জন্য শিষ্টাচার দেখিয়ে কাছে গিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলছে, "Go ahead boy, work is ours" আধুনিক সভ্যতায় যে ফোর্ডের কারখানার দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সীকার্য, সেই কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, অতএব মাথার ঘামও পায়ে ফেলতে হবে।

টিফিনের সময় যখন লোক খাবারের জন্য বেরিয়ে আসে তখনকার দৃশ্যও দেখবার মতন। সেই দৃশ্য দেখে সুখী হয়েছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশে একটা দৃশ্য দেখে মনটা বিমর্ষ হয়েছিল। দেখলাম কতকগুলি স্নানাগার রয়েছে মজুরদের জন্য। এই স্নানাগারে নিগ্রোদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না অথচ তাদের জন্য পৃথক স্নানাগার কোনও ব্যবস্থা নাই। কেন এই ব্যবহারবৈষম্য, নিগ্রো কি মানুষ নয়? তাদের কি স্নানের দরকার হয় না? হয়তো তাদের স্নানাগার অন্যত্র থাকতে পারে, কিন্তু কাছে পাশে তো দেখছি না? শুনেছি হিন্দুরা যখন কাজ করত তখন হিন্দুদেরও নাকি স্নানাগারে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম কবে এই অমানুষিক ব্যবহার পৃথিবী হতে দূর হবে। মানুষকে যারা মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না, তাদের ডিমক্র্যাসির মানে বুঝি না। আমার মনে হয় এদের ডিমক্র্যাসিকে 'হোআইট ডিমক্র্যাসি' বলে সংকীর্ণ ক'রে দেওয়া উচিত। যেমন জার্মানিতে রয়েছে National socialism। তারা স্পষ্টই ব'লে দিয়েছে, সমাজতন্ত্রবাদ ভাল থিওরি, কিন্তু তার সার্বদেশিকতাকে তারা মানবে না। তাদের সমাজতন্ত্রবাদ তাদের নিজেদের স্বার্থে নিজেদের দেশের জন্য নিজেদের খেয়ালে গড়া। যাঁরা জার্মানির অন্ধ ভক্ত, তাঁদের উচিত চোখ খুলে জার্মানির সংকীর্ণ নীতির আসল পরিচয় নেওয়া। সেইজন্যই বলছিলাম, আমেরিকার ডেমেক্র্যাসিও সংকীর্ণদেহ, তাদের ডিমক্র্যাসি হোআইট ডিমক্র্যাসি। আমরা অনেক সময় না বুঝেই অনেক তন্ত্রের ভক্ত হয়ে বসি; না ঠেকলে আমাদের ভক্তি ঘোচে না। শুনেছি মাইকেল মধুসূদনের কাছে একদিন এক বৈষ্ণব ভক্ত গিয়ে ভক্তির কথা আরম্ভ করতেই মাইকেল সেই ভক্তকে ব'লেছিলেন তাঁর নাম মাইকেল মধুসূদন। ভক্ত যখন তার অর্থ বুঝলেন না তখন দয়ার্দ্র হয়ে মাইকেল ভক্তকে বলেছিলেন তিনি ধর্মে খৃীষ্টান। তখন ভক্ত হা হতোস্মি ব'লে ফিরে গিয়েছিলেন। ডিমক্র্যাসিই হ'ক আর natianal socialismই হ'ক, এদের প্রকৃত অর্থ না বুঝে ভক্ত হ'লে উক্ত ভক্তেরই মত আমাদের শেষটায় হা হতোস্মি বলতে হবে।

বিদায়ের বেলা একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ভারতে মহাত্মা গান্ধী কলকারখানার (mechinary) বিরুদ্ধে এখনও কি প্রচারকার্য করছেন? কলকারখানার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী কোনও প্রচারকার্য করেছেন কি না তা এখনও জানি না; বলেছিলাম, মহাত্মাজী এমন কোনও কাজ করেছেন ব'লে আমার মনে হয় না। একজন বললে, বেকার সমস্যার জন্য কলকারখানাই দায়ী, বেকার কমাতে হ'লে কলকারখানা কমানো দরকার। আমি বললাম, কারখানা দায়ী নয়; যারা স্বেচ্ছায় বেকার তৈরি করছে, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে, দায়ী সেইসব পুঁজিবাদীরাই।

ফোর্ডের কারখানায় যারা কাজ করে তারা ছুটির সময়েও কিছু ভাতা পায়। এমন সব কারখানাও আছে যারা বাজারের চাহিদা মিটিয়ে কল বন্ধ ক'রে দেয়, এবং লভ্যাংশের টাকা ব্যাঙ্কে রেখে আরামের হাওয়া খায়। অসময়ে কারখানা খুলে রেখে মজুরদের কেন সুখের ভাগ দিতে যাবে?

ফোর্ডের কারখানা ডিট্রয়এর বিশিষ্ট গৌরব। দু দিন সেখানে গিয়ে মনের তৃপ্তি হয় নি। আরও যাবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সময়াভাবে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

ফোর্ডের কারখানাতেই শুনেছিলাম এদিক থেকে অনেক জীব চিকাগোতে হননের জন্য পাঠানো হয়। ব্যাপারটা দেখবার ইচ্ছা হ'ল। তাই একদিন কয়েকজন হিন্দুকে নিয়ে একটা গ্রামে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। আমেরিকার ছোট ছোট গ্রামের দৃশ্য এবং তার গড়ন পদ্ধতি আমাদের কেন ইউরোপের গ্রামের মতও নয়।

ছোট একখানি ডাকবাংলো। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, সর্বত্র শুধুই মাঠ। মাঠে কোথাও ঘাস গজিয়েছে,

(শেষাংশ ১৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় নৃত্যে নবদর্শন

অনন্ত মৈত্র

ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে; যেদিন ধর্ম ও সমাজজীবন ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং মন্দির ছিল সেই সত্যসুন্দর জীবনের প্রতীক—মন্দির কেবল পান্ডাপীড়িত, ষন্ডশোভিত বা বানরবেষ্টিতই ছিল না।

দক্ষিণী নৃত্যে ঔপপত্তিকতা ও ক্রিয়াসিদ্ধি, উভয়েরই পরাকাষ্ঠা ঘটেছিল। ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রের মূলসূত্র অবলম্বনে কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তি, যার চর্চা বর্তমানে তার সমৃদ্ধি। অপাংক্তেয় সে প্রধানত সেই কারণে নয়, অপাংক্তেয় সে এই কারণে যে, তার প্রথম এবং শেষ ভাব ইন্দ্রিয়াসক্তির আদিমতা, অতীন্দ্রিয়লোকের বার্তা তাতে নেই। দক্ষিণী ও মণিপুরীতে যে পর্বতের মত গাম্ভীর্য, আত্মসমাহিত ভাব আছে এতে তার একান্ত অভাব। এ সাময়িকভাবে মন ভোলাতে পারে হয়তো, কিন্তু মনোহরণ করে না। ক্ষণিক মোহের সঞ্চার করতে পারে, মনের পটে চিরকালের স্বাক্ষর রেখে যায় না।

কথাকলি নৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ (মণিপুরী)

শ্রীকৃষ্ণ (কথাকলি)

প্রধানত মালাবারের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ও নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও চলে এসেছে। পূর্বভারতে পর্বতবেষ্টিত মণিপুর রাজ্যে আর একটি অপূর্ব নৃত্য পদ্ধতি আবহমানকাল হতে প্রচলিত। এ নৃত্য বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ; রাধা-কৃষ্ণের প্রেমসুধায় সিঞ্চিত বলে এ নৃত্য কাব্যধর্মী (lyrical), ভগবানের লীলামৃত ব্যাখ্যা এর মূল সুর। কথাকলির অঙ্গসঞ্চালনের আধিক্য মণিপুরী নৃত্যে নেই,—ভাবাবেশ ও তন্ময়তাই এর লক্ষ্য। মণিপুরী ও কথাকলি এই দুই নৃত্য পদ্ধতিকেই ভারতীয় নৃত্যের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মসাধনার প্রধান বাহনস্বরূপ গণ্য করতে হয়।

উত্তর ভারতেও অবশ্য নৃত্য ছিল; কিন্তু সে নৃত্য জারজ। পারস্য থেকে তার প্রেরণা এবং বাদশাহী খেয়ালে

দেহে প্রাণের অস্তিত্বের পরিচায়ক যেমন তার হৃদ্‌-যন্ত্রের স্পন্দন, জাতীয় জীবনের দ্যোতক তেমনি তার শিল্প-কলা। জাতির প্রাণপ্রাচুর্য তার কলাশিল্পের ভাবপ্রাচুর্যের দ্বারা পরিমিত হয়। একদিন ভারত যে শিল্পকলা সম্পদে গরীয়ান ছিল এবং জগতকে তার অংশ দান করেছিল একথা যেন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি সত্য যে, আজ তার সে সঞ্জীবনী ধারা শুষ্ক ও লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে। ভারতের শিল্পকলা গগনে মেঘ কেন ঘনালো তার যথাযথ কারণ নির্দেশ করা সুকঠিন। তবে মোটামুটিভাবে এই বলা যেতে পারে যে, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির বহুল পরিবর্তন, তথা শাস্ত্র, পুরাণে (যার উপর প্রাচীন নৃত্যের ভিত্তি) অনাস্থা এবং তাদের অনধিগম্যতা এই অব-

উদয়শঙ্কর

জোহ্‌রা শঙ্কর সিমকী
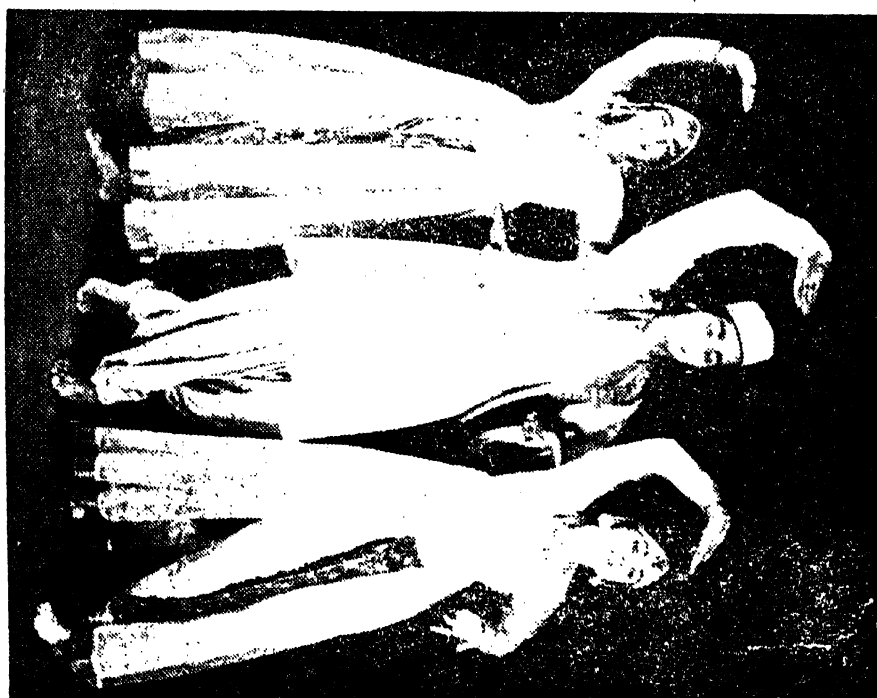
নীতির জন্যে প্রধানত দায়ী। অবশ্য শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্য অবিকৃতই আছে; কিন্তু পরিবর্তিত মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না—এইটাই তার সব চেয়ে বড় সমস্যা। বলা বাহুল্য এর সমাধান জনসাধারণের স্থূল রুচির যূপ-কাষ্ঠে আর্টের সত্যকে বলিদানে নেই। আজ দিন এসেছে ভাববার কি ছিল, কি হয়েছে, কেন হয়েছে এবং কি করা কর্তব্য। কোনো আর্টের প্রকাশকৌশল (Technique) প্রয়োজনমত, কলাসম্মতভাবে পরিবর্তন দরকার কিনা যাচাই করবার দিন আজ সমাগত। যদি তার কোনও বিশেষ রীতি

কথাকলি নৃত্য

মৃত প্রতিপন্ন হয় তাকে বর্জন করার সাহস অর্জন করতে হবে। শব-সাধনা তো শিল্পীর সাধনা নয়। এই সংস্কারের কাজ দুরূহ এবং শক্তিসাপেক্ষ। এই সাধনায় নেমেছেন উদয়শংকর।

উদয়শংকরকে আবিষ্কারের গৌরব রদেনস্টাইন বা পাভ্‌-লোভার তা বিচারসাপেক্ষ। তবে রদেনস্টাইন-নির্দেশিত চিত্রকলা চর্চায় তাঁর মন প্রথম নৃত্যছন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল, অজন্তার চিত্রকে নৃত্যে রূপ দেবার স্বপ্ন সেই তিনি প্রথম দেখেন। পরে অবশ্য পাভলোভার সংস্পর্শে এসে তাঁর অনন্যসাধারণ নৃত্যকুশলতায় আকৃষ্ট হয়ে নৃত্যচর্চা রীতিমত-ভাবে আরম্ভ করেন। পাভলোভা শংকরকে পাশ্চাত্য নৃত্য-শিক্ষা দেন নি, পরন্তু তার প্রতিকূলতাই করেছিলেন। তাঁর প্রাচ্য নৃত্যকলার আধ্যাত্মিকতার উপর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, এবং তিনি বুঝেছিলেন, সে নৃত্যের পুনরুদ্ধার শংকর করতে পারেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্য এই দুই ধারার উৎস এক—ধর্ম। পশ্চিম কালক্রমে বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে নতুন পথে চলতে সুরু করে এবং বাহ্যিক রূপরেখাভঙ্গীর সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেয় ও তার কলাকৌশল এক অতি উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু তার বিনিময়ে সে অধ্যাত্ম সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে পশ্চিমের নৃত্য তার জীবনযাত্রার সঙ্গে একসুরে বাঁধা, তার জীবনের যথাযথ অভিব্যক্তি এতে আছে। সেই কারণে এ সত্য, আধ্যাত্মিকতা বা বস্তুতান্ত্রিকতার তর্ক এখানে অর্থহীন।

কিন্তু প্রাচ্যের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচীনধারা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত ও শুষ্ক হলেও এখনও তা অন্তঃসলিলা হয়ে ভারতীয় চিত্তকে অভিষিক্ত ও প্রভাবিত করছে। সুতরাং ভারতকে তার প্রতিমা গড়তে গেলে তার কাঠামো রাখতেই হবে। তার রং মাটি সাজসজ্জার দরকার মত বদল কাম্য; তবে দেবী যেন 'স্কুল-গার্ল' হয়ে না পড়েন তার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। নৃত্যের নবদর্শনের গোড়ার কথা তাতে প্রাচীনের গতানুগতিকতা না থাকে, তা আধুনিকের অনু-করণ সর্বস্বতা দোষদুষ্ট না হয়।

উদয়শংকরের পরিচয় নতুন করে দিতে যাওয়া একরকম ধৃষ্টতা। নাট্যমঞ্চে তাঁর অপরূপ সৃষ্টি দর্শকনির্বিশেষে আনন্দলোকের আস্বাদ দিয়েছে। প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্টির রসগ্রহণ যে আঙ্গিক, অর্থাৎ technique-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না—এ সত্য পুনপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। উদয়শংকরের অভ্যুদয় নৃত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রতিকূলতার কত বড় জগদ্দল পাথর সরিয়ে যে তাঁকে পথ করতে হয়েছে সে এক অসম্ভব কাণ্ড। নিন্দাস্তুতি কোনটাই তাঁকে আদর্শ-চ্যুত করতে সক্ষম হয় নি। শ্রেয়ের জন্যে একটা আকুতি, একটা অতৃপ্তির ভাব, যাকে বলা যায় "divine discontent" তাঁকে বরাবর প্রেরণা দিয়েছে, অস্থির করেছে, এগিয়ে দিয়েছে। ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তৈরী করে এসেছেন। শংকর যে সর্ববিধ সমালোচনার ঊর্ধ্বে, একথা বোধ করি তাঁর অতিবড় স্তাবকও বলবেন না; তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাঁকে সমালোচনা করার দিন আজও আসে নি, কারণ

রাস-নৃত্য (মণিপুরী)

তাঁর পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি, আত্মজিজ্ঞাসার চরম উত্তর আজও তিনি বোধ হয় পান নি।

ভারতীয় সংস্কৃতি আত্মকেন্দ্রিক; ভারতের সাধনা আত্মোপলব্ধির সাধনা। ভারতে নৃত্যের আদর্শও ছিল তাই; পশ্চিমী 'আনন্দদানের' উদ্দেশ্য তাতে ছিল না বা থাকলেও তা ছিল গৌণ। উদয়শংকর তাই অনুভব করেছেন যে, নৃত্যকে আজ শুধু "ওরিয়েণ্টাল্‌-ড্যান্স"—বিলাসী দর্শকের অবকাশ-রঞ্জনের ব্যাপার ক'রে তুললেই যথেষ্ট হবে না, তাকে জীবন-যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ ক'রে গড়তে হবে, যেমন পূর্বে ছিল এবং আজও যা' গ্রাম্যনৃত্যে অবশিষ্ট আছে। এই আদর্শে ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র (Indian Culture Centre) স্থাপিত

হয়েছে আলমোড়ায়; ভারতীয় সাধনার পীঠস্থান হিমালয়ের নির্জনতায়, সৌন্দর্যের পারিপার্শ্বিকে। নৃত্যচর্চা এখানকার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—সমান গুরুত্বের সঙ্গে সংগীত, অভিনয় ইত্যাদি কলাবিদ্যার অনুশীলন এবং পুরাণশাস্ত্রাদির আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উদয়শংকরই প্রথম এই স্বপ্ন দেখলেন, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। ঋষি রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে এ জাতীয় মহান্ স্বপ্ন দেখেছেন এবং তার বাস্তব রূপও দিয়েছেন বিশ্বভারতীর মহাতীর্থে। তবে সে স্বপ্নের বাহ্যিক রূপ স্বভাবতই উদয়শংকরী-রীতির থেকে ভিন্ন; কিন্তু তারা পরস্পরবিরোধী নয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের (I. C. C.) সভ্যদের উদ্দেশ ক'রে উদয়শংকর যা বলেছেন, তা' তাঁর যথার্থ শিল্পী মনেরই পরিচায়ক:—

"......I want to see that fire in you, the greatness latent in you...... we have to develop our imagination and understanding until the inner technique is developed enough to receive creative inspiration...... our technique has to be rescrutinized and remodelled, the means of external expression must be permeated by the strength of living spirit and vitality...... Day and night you have to remember you are artists...... and as artists we form one nation; whether Hindu, Mohammedan or Christian, one faith, one religion and one God—Art."

চিকাগোর পথে

(১৯৪ পৃষ্ঠার পর)

কোথাও যব কেটে নেওয়া হয়ে গেছে, কোথাও বা ট্রাক্টরএর সাহায্যে মাঠ চষা হচ্ছে। প্রত্যেক ফার্মের চারিদিক আমাদের দেশের রেলের দুপাশে যেমন বেড়া দেওয়া থাকে তেমনি বেড়া দেওয়া। জমির মাঝ দিয়ে কোথাও ছোট নদী বয়ে চলেছে, কোথাও বা গাছের ঝোপ। কোথাও রাখালরা সাধারণ পোশাক প'রে ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, কোথাও বা গৃহস্থের ছেলে-পিলে প্রজাপতি ধরবার জন্য জাল পেতে ব'সে আছে। আমাদের উদ্দেশ্য কৃষক তার গৃহপালিত জীবকে কশাইএর হাতে কি ক'রে তুলে দেয় তাই দেখা। কাজেই একটা দুটো ক'রে অনেক কৃষকের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতে লাগলাম। একজন বললে, সেইদিনই বিকালে তার বারটা গরু বিক্রি হবে। সেজন্য তারই বাড়ির কাছে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় গিয়ে ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

সন্ধ্যা হবে হবে এমন সময় পশ্চিমাকাশে ধুলো উড়িয়ে কয়েকখানা লরি তাদের আগমনী জানালে। আমরা নিকটস্থ রেস্তোরাঁ থেকে কৃষকের বাড়িতে এসে বাড়ির বাইরের বেঞ্চে ব'সে পড়লাম। যারা এসেছে তারা কশাই নয়, তারা পশু-চালানের (transport) কাজ করে। তারা লরিগুলিকে সারি দিয়ে দাঁড় করাল; তারপর প্রত্যেক লরিতে কাঁচা ঘাস বিছাল এবং গরুতে খাবারের জন্য অনেক ঘাস স্তূপাকার ক'রে রাখল। নিমেষের মধ্যে রাখালরা কতকগুলি ষাঁড় লরির কাছে এনে হাজির করলে। ষাঁড়গুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। প্রত্যেকটি লরিতে দুটো ক'রে ষাঁড় পুরে তাদের মুখের কাছে প্রচুর ঘাস রেখে দেওয়া হ'ল। ষাঁড়গুলিকে লরিতে ওঠাতেই যা কষ্ট দেখলাম। তার পরই তারা ঘাস চিবতে লাগল। ট্রান্সপোর্ট অফিসার সকলের কাছ হ'তে 'বাই বাই' ব'লে বিদায় নিলে।

সাহিত্য সংবাদ

কথাভারতীর রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

গত ২৬শে অক্টোবর 'দেশ' পত্রিকায় কথাভারতীর উদ্যোগে যে প্রতিযোগিতার কথা প্রকাশিত হয়, গত রবিবার ১০ই নবেম্বর তাহার পুরস্কার বিতরণী সভা শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী মহাশয়ার সভানেত্রীত্বে শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ১৫।এ, রজনী গুপ্ত রোস্থিত 'মাতৃমন্দির' ভবনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাগুলি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগিগণ পাঠ করেন ও সভায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নানারূপ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে অন্ধগায়ক জি কুণ্ডু, কল্পনা সেন ও বকুল মিত্রের গান, হেম সেনের ব্যঙ্গ-কৌতুকগুলি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। 'সাজি'র সম্পাদক মনোরঞ্জন নন্দী ও নীলাদ্রিকুমার বসু উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলামণ্ডলীকে সম্বর্ধনা করেন ও জিতেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয় সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন। সভায় বিশিষ্ট প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফলাফল

গল্প প্রতিযোগিতা: -১ম—কুমারী শেফালিকা দাস (১টি রৌপ্য কাপ), ২য়—মিহির ভট্টাচার্য (একটি রৌপ্য পদক)।

হাসির কবিতা প্রতিযোগিতা:—১ম—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'একাদশ অবতার' (রৌপ্য কাপ), ২য়—হিমাদ্রিকুমার বসু—'কেমন জব্দ' (রৌপ্য পদক)।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (ঝর্ণা ও হিমালয়াষ্টক:—১ম—দিলীপ-কুমার নাগ (রৌপ্য কাপ), ২য়—নীলাদ্রিকুমার বসু (রৌপ্য পদক)।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী বড়দিনের সময় শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভার উৎসব উপলক্ষে ১৬ বৎসরের অনূর্ধ বালকবালিকাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নকলগড়" এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য "মরণ" এই দুইটি কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আগামী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিলে বাধিত হইবে।

নিবেদক—অমলেশ মুখোপাধ্যায়, আণ্ডার সেক্রেটারী, খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদ বিভাগ, শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী।

নিউ থিয়েটার্সের বিচিত্র আনন্দানুষ্ঠান

গত সোমবার রাত্রি সাড়ে নয়টায় গ্লোব রঙ্গমঞ্চে নিউ থিয়েটার্সের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেতৃ সম্মেলনে নৃত্যগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানটি স্মরণীয়; কারণ, নিউ থিয়েটার্সের শ্রেষ্ঠ তারকাদের একত্রে রঙ্গমঞ্চে দেখিবার ও তাহাদের গান শুনিবার সুযোগ দর্শকেরা এই প্রথম লাভ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বিচিত্র অনুষ্ঠানে এমন পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ সচরাচর ঘটে না। এই অনুষ্ঠানে গান গাহিয়াছেন শ্রীমতী কানন-দেবী, জাহানারা বেগম, সায়গল, পাহাড়ী, পঙ্কজ, শচীন দেববর্মন, বিনয় গোস্বামী প্রভৃতি। কাননদেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'সেই ভালো সেই ভালো' গানটি শ্রুতি-মধুর হইয়াছিল। সায়গলের উর্দু গজল শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছে। পঙ্কজ মল্লিকের 'পিয়া মিলনকে জানা' গানের সহিত লীলা দেশাইয়ের 'অভিসারিকা' নৃত্য উল্লেখযোগ্য।

একটি অপ্রিয় কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। ব্যবস্থাপকদের অব্যবস্থার দরুণ দর্শকদের যে পরিমাণ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা নিউ থিয়েটার্সের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের কাছ হইতে আমরা আশা করি নাই। যে পরিমাণ আসন প্রেক্ষাগৃহে রহিয়াছে, তাহার বেশী টিকিট বিক্রীত হওয়ায় প্রেক্ষাগৃহে জনসমাগম অত্যধিক হয় এবং টিকিটে সীটের নম্বর থাকা সত্ত্বেও বহু দর্শককে দাঁড়াইয়া, সিঁড়ির উপর বসিয়া, দরজার ফাঁক হইতে কোন রকমে গলা বাড়াইয়া এবং প্রেক্ষাগৃহসংলগ্ন 'বার' হইতে চেয়ার ভাড়া করিয়া আনিয়া পুরা তিন ঘণ্টা কাটাইতে হইয়াছে। অনেক মহিলাকেও অসহায়ভাবে এই দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে, কারণ ব্যবস্থাপকদের খোঁজ করিয়াও দেখা পাওয়া যায় নাই এবং দেখা পাওয়া গেলেও কোন ফল হয় নাই। দর্শকেরা পয়সা খরচ করিয়া এই ধরণের অনুষ্ঠানে যান আনন্দলাভ করিতে, বিপদগ্রস্ত ও অপদস্ত হইতে নহে।

চিত্রাভিনেত্রীর বিবাহ

গত ৪ঠা ডিসেম্বর বুধবার পরলোকগত অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অশোক মৈত্রের সহিত প্রতিথযশা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবীর শুভবিবাহ কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অশোক মৈত্র ও শ্রীমতী কানন দেবী

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, পি এন রায় এবং বিনয় দত্তর উপস্থিতিতে রায় সাহেব পি এন মুখার্জি (সিভিল ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার) ১৮৭২ সালের ৩ আইনে ইঁহাদের বিবাহ রেজিষ্ট্রার করেন।

নাট্যনিকেতনে নূতন নাটক

জানা গিয়াছে যে, আগামী বড়দিনের সময়ে প্রথিতযশা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁহার সম্প্রদায় 'বনফুল' রচিত 'মধুসূদন' নাটকটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর ঘটনাবহুল জীবনী লইয়া এই নাটকটি রচিত, এবং শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী কবি মধুসূদনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

নৃত্য-মাহাত্ম্য

—চিত্ররথ—

য়ুরোপে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে।......জাপানীরা চীনাদের জাপানী নৃত্য শেখাচ্ছে।......শীতের উত্তুরে হাওয়ায় বাংলা জুড়ে 'কম্পন-নৃত্য' সুরু হয়েছে।......আলমোড়ার 'দেওদার নৃত্য' নিয়ে অভিভূত হচ্ছেন উদয়শংকর! 'শ্যামে'র 'বাজারে' পশ্চিম সমুদ্রতীরে অবস্থিত বোম্বে শহর হতে 'রাজ নর্তকী'

আসছেন, বাংলার হাড়ে উত্তর পূবের যে হাওয়ায় শীতের কাপুনি ধরে সেই হাওয়া নিয়ে। 'রাজনর্তকী' দেখাবেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্যদেশ মণিপুরের নাচ। মণিপুরীরা গোঁড়া বৈষ্ণব; তাই বুঝি শ্যামবাজারেই তাদের আগমন হচ্ছে। নাচটা হবে 'উত্তরা'র বক্ষে!...'দেবকী' এবার শ্রীকৃষ্ণকে আনছেন-না আনছেন 'নর্তকী'। কোন্ 'রূপ' কোন্ 'বাণী' তার নৃত্য-গীতে বিকচ হবে জানি না।

*   *   *   *   *   *

'কমলা টকীজে'র 'রাজকুমারের নির্বাসন'। শুনচি তাতেও নাকি রাজকুমারকে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে নৃত্য ভঙ্গিমায়। সে নৃত্য 'শ্রী' নৃত্য এবং তা দেখানো হবে 'শ্রী'তে। শ্রী! শ্রী!! শ্রী !!! তবে সুশ্রী কি কুশ্রী কি করে বলব?

পূর্ব-ভারতে (ইস্ট-ইণ্ডিয়ায়) এসেছেন নিমাই, নিয়েছেন সন্ন্যাস। এবার সুরু হবে তাঁর সংকীর্তন। দুই বাহু তুলে শ্রীমৃদঙ্গের তালে তালে কোন্ সিনেমা গৃহের 'আঙ্গিনা' তিনি মাতাবেন—এখনও তা জান্তে পারি নি।......হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্। কলিকাতার কলির শীতে নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। নিতাই জগাই মাধাই সব আছেন তাঁর সাথে।

*   *   *   *   *   *

ইতিমধ্যে এই Globeএরই কলকাতার গ্লোবে বিগত সোমবাসরে সোমরসে উল্লসিত (শীতের রাত যে) নিউ থিয়েটার্সের বিচিত্র নৃত্যগীতানুষ্ঠান (variety show) হয়ে গেল। শুনলাম সাহায্য রজনী—দাতব্য উদ্দেশ্যে।

বাংলার জিলায় জিলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দারিদ্র্য, শীত-বস্ত্রের দৈন্য, অন্নের অনটন এবং আশ্রয়ের অভাব। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি 'বিচিত্র' 'বুভুক্ষু নৃত্য'। নিউথিয়েটার্সের বিচিত্র নৃত্য কি এদেরই সাহায্যের জন্য?

......কেউ কেউ কানে কানে বলছেন,—শুনছি, মাতৃজঠরে যে সব শিশু পৃথিবীর 'ঊষা নৃত্য' দেখবার আশায় নীলপাখী (blue-bird) নৃত্য করছে তাদের সাহায্যের জন্য। ভালো! নিউ থিয়েটার্সের এই 'উদাম নৃত্য' প্রশংসনীয়। স্টুডিওর গর্ভে নিহিত নিজস্ব ছবি দুখানা তো নৃত্যলেশহীন! এই নাচের, হাটে, সে দু'খানার সুটিং গত পাঁচদিন ধরে বন্ধ রেখে, 'বিচিত্র নৃত্যানুষ্ঠানের' ব্যবস্থা করবার জন্যে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*   *   *   *   *   *

কিন্তু হালেই মা 'মৈ ভুখাহু' নৃত্য দেখিয়ে নিউ থিয়েটার্সের এক গোষ্ঠীর চাকুরী খেয়ে দিলেন। লোকসঙ্কোচ ক'রে কোম্পানীর ব্যয় সঙ্কোচ করালেন। এখন থেকে মা যদি এভাবে থেকে থেকে কোম্পানীর কাজ বন্ধ রেখে 'বিচিত্র দাতব্য নৃত্যের' তালে নিউ থিয়েটার্সকে নাচান, তবে কোম্পানীর কর্মীরা 'ভীতি-নৃত্য 'নাচ্তে নাচ্তে যে মারা পড়বে! চাকুরী যাওয়ার ভয়ের চেয়ে বাঙালীর বড় ভয় আর কি আছে!

কানাকানি

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

ছোট ছোট গলি, শুধু ভিড়,
মহানগরীর।
ঠেলাঠেলি এখানে সেখানে,
দলে দলে কথা পশে কানে;
স্তূপ হয়ে তারা করে ভিড়
অলিতে গলিতে নগরীর।

কানাকানি দুইটি গলিতে
দেখেছিনু চলিতে চলিতে।
সাঁঝ না আসিতে আলো জ্বলে,
পথ কাঁপে, যাব ধেয়ে চ'লে।
ইটের দেওয়াল
আকাশেরে করে না খেয়াল।
সলাজ বাঁশির মৃদু স্বর
কখন বাতাসে করি ভর
দুইটি গলির কানে বলে
পথ কাঁপে, যাব ধেয়ে চ'লে।
কানাকানি দুইটি গলিতে
দেখেছিনু চলিতে চলিতে।

ঘোলাটে ধূলাতে
দুটি চোখ চাহিছে ভুলাতে।
লোফালুফি কলের ধোঁয়ার,
লোভ করে নীলাকাশটার।
জমা জল পথে—
আকাশেরে বাঁধে কোনোমতে।
ইটের দেওয়াল
পৃথিবীরে করে না খেয়াল।
সেখানে বাঁশির মৃদুস্বর
আমার ছন্দেরে করি ভর—
দুইটি গলির কানে বলে।
পথ কাঁপে, যাব ধেয়ে চলে।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলা শেষ হইয়াছে। বাঙলা দল এই খেলায় শোচনীয়ভাবে যুক্তপ্রদেশ দলের নিকট ১৪৪ রাণে পরাজিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ দল গত বৎসরও এই খেলায় বাঙলা দলকে প্রথম ইনিংসের খেলার ফলাফলে পরাজিত করিয়াছিল। বাঙলা দলের পরাজয় নৈরাশ্য-জনক হইলেও অপ্রত্যাশিত হয় নাই। বাঙলা দল যে পরাজিত হইবে, তাহা বিহার দলের বিরুদ্ধে বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণের খেলা অবলোকন করিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তবে বাঙলা দল যেরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে, তাহা অনেকেরই কল্পনাতীত ছিল। ইহা যে কেবল বাঙলা দলের অধিনায়কের পরিচালনার ত্রুটির জন্যই হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অধিনায়ক তৃতীয় দিনে বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সময় খেলোয়াড়গণকে অযথা দ্রুত রাণ তুলিবার জন্য নির্দেশ দিয়া শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছেন। খেলোয়াড়গণ ধীর, স্থিরভাবে সতর্কতার সহিত খেলিলে দ্বিতীয় ইনিংস কখনও ১২৬ রাণের মধ্যে শেষ হইত না, অথবা খেলা এক ঘণ্টা সময় থাকিতে শেষ হইত না। ইহা ছাড়া দলের খেলোয়াড়গণও কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং সকল বিভাগেই অতি নিম্নস্তরের কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পর পর দুই বৎসর যুক্তপ্রদেশ দলের নিকট পরাজিত হইয়া বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ যে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিলেন, আশা করা যায়, আগামী বৎসরে তাহা বিদূরিত করিবার জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। বাঙলা দেশে ক্রিকেট খেলার প্রচলন হইয়াছে ৫০ বৎসরের অধিক-কাল হইতে, আর সেই বাঙলা দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ সম্প্রতি যে প্রদেশে ক্রিকেট খেলার চলন হইয়াছে, তাহারই নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতেছে, ইহা কত লজ্জা ও অপমানের বিষয়। বাঙলার উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ কি ইহা নীরবে সহ্য করিবেন?

যুক্তপ্রদেশ দলের কৃতিত্ব

যুক্তপ্রদেশ দলের তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সকল বিভাগেই পূর্ব বৎসর অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নিজ প্রদেশের সম্মান বৃদ্ধির দিকে তাঁহাদের যে বিশেষ দৃষ্টি আছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নবাগত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ফানসালকারের ব্যাটিং ও ফিরাসৎ হোসেনের বোলিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজন খেলোয়াড় দলের জয়লাভে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ইঁহারা ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণের মধ্যে যে স্থান পাইবেন, ইহা জোর করিয়াই বলা চলে। ইঁহাদের পরেই দলের অধিনায়ক অভিজ্ঞ প্রবীণ খেলোয়াড় পি ই পালিয়ার প্রশংসা করিতে হয়। ব্যাটিং, বোলিং, এমন কি, দল পরিচালনা বিষয়েও তিনি বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ইনিংসেই তিনি দলের পতনমুখে খেলিয়া যেরূপ দৃঢ়তা-পূর্ণ ব্যাটিং করিয়াছেন, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তাঁহার খেলা অধিনায়কোচিতই হইয়াছে। বোলিং বিষয়েও তিনি কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার ন্যায় অধিনায়ক যুক্তপ্রদেশ দলে ছিল বলিয়াই দলের অপর খেলোয়াড়-গণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। পর পর দুই বৎসর যুক্তপ্রদেশ দলের অধিনায়ক হইয়া তিনি বাঙলার মাঠে যে সুনাম অর্জন করিলেন, তাহাতে আগামী বৎসরেও তাঁহাকে যুক্তপ্রদেশ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

খেলার বিবরণ

যুক্তপ্রদেশ দল টসে জয়ী হইয়া প্রথমে ব্যাটিং গ্রহণ করেন। অল্প রাণের মধ্যে প্রথম দুইটি উইকেট পড়িয়া যায়। ইহার পরে দলের অধিনায়ক পালিয়া খেলিতে নামিয়া খেলার মোড় ফিরাইয়া দেন। রাণ দ্রুত উঠিতে আরম্ভ করে। তিনি খেলায় যে উৎসাহ দান করেন, তাহার ফলে তিনি আউট হইবার পর দলের অপর খেলোয়াড়গণ রাণ তুলিতে সক্ষম হন। দলের ভাঙ্গন ধরে দিলওয়ার হোসেনের জন্য। শেষ খেলোয়াড়গণ বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংস ১৯১ রাণে শেষ হয়। বাঙলা দল পরে খেলা আরম্ভ করিয়া প্রথম দিনের শেষে এক উইকেটে কুড়ি রাণ করে। ইহাতে ধারণা হয় যে, বাঙলা দল যুক্তপ্রদেশ দলের অপেক্ষা অধিক রাণ প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু সে আশা চলিয়া যায় দ্বিতীয় দিনের খেলা এক ঘণ্টা চলিবার পর। বাঙলা দলের সুশীল বসু, রামচন্দ্র, কামাল প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং করা সত্ত্বেও বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস ২৪৭ রাণে শেষ হয়। যুক্তপ্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় সুবিধা করিতে পারে না। পালিয়া খেলিতে নামিয়া ফানসালকারের সহযোগিতায় পতন রোধ করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে তিন উইকেটে ৯৭ রাণ হয়। ফিরাসতের সহযোগিতায় পালিয়া পুনরায় অধিক রাণ তুলিতে সক্ষম হন। বাঙলা দলের বোলিং ও ফিল্ডিং নৈরাশ্যজনক হয়। যুক্তপ্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংস ২২৬ রাণে শেষ করে। বাঙলা দল ২৭০ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ফিরাসৎ হোসেন ও আলেকজেণ্ডারের মারাত্মক বোলিং বাঙলা দলের বিপর্যয়ের কারণ হয়। বাঙলা দল দ্বিতীয় ইনিংস ১২৬ রাণে শেষ করে ও খেলায় ১৪৪ রাণে পরাজিত হয়।

খেলার ফলাফল

যুক্তপ্রদেশ প্রথম ইনিংসঃ—১৯১ রাণ; (পালিয়া ৪৫, ফান-সালকার ৫১, খাজা ২৭, আফতাব আমেদ নট আউট ২১; কে ভট্টাচার্য ৪১ রাণে ৬টি, টি ভট্টাচার্য ৪০ রাণে ২টি, এন কেণ্ড্রু ২০ রাণে ১টি উইকেট পান)।

বাঙলা প্রথম ইনিংসঃ—১৪৭ রাণ; (বেরহেণ্ড ২০, সুশীল বসু ৩৮, রামচন্দ্র ২৫, কামাল নট আউট ৩১; পালিয়া ৩০ রাণে ৩টি, ফিরাসৎ হোসেন ৩৬ রাণে ৩টি, আলেকজেণ্ডার ৩২ রাণে ১টি, আফতাব আমেদ ২৩ রাণে ১টি উইকেট পান)।

যুক্তপ্রদেশ ২য় ইনিংসঃ—২২৬ রাণ; (পি ই পালিয়া ৬৫, ফানসালকার ২৭, এফ হোসেন ৩০, গুরুদাচার ৩৯; কে ভট্টাচার্য ৬০ রাণে ৪টি, বেরহেণ্ড ৭১ রাণে ৩টি, এন চ্যাটার্জ্জি ২১ রাণে ২টি, এন কেণ্ড্রু ২৭ রাণে ১টি উইকেট দখল করেন)।

বাঙলা ২য় ইনিংসঃ—১২৬ রাণ; (এন চ্যাটার্জ্জি ২২, এন কেণ্ড্রু ২৩, কে ভট্টাচার্য নট আউট ৩০; আলেকজেণ্ডার ২০ রাণে ৪টি, পালিয়া ২৫ রাণে ২টি, ফিরাসৎ হোসেন ৩৯ রাণে ৩টি ও আফতাব আমেদ ১৪ রাণে ১টি উইকেট লাভ করেন)।

(বাঙলা দল ২৪৪ রাণে পরাজিত)

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বন্ধ আন্দোলন ক্রমশই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। হিন্দু জিমখানার পরিচালকগণ খেলায় যোগদান করিবেন না বলিয়াই একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু জিমখানার তরফ হইতে তিনজন বিশিষ্ট সভ্য মহাত্মা গান্ধীর নিকট এই বিষয় মতামত জানিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি

দান করিয়াছেন। নিম্নে মহাত্মার প্রদত্ত বিবৃতি প্রদান করা হইল:—

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

"বোম্বাইয়ের ১৪ই ডিসেম্বর হইতে যে পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, ঐ ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আমার অভিমত অনেকে জানিতে চাহিয়াছেন। ঐ ক্রিকেট খেলা বন্ধ করার জন্য যে একটা আন্দোলনও আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমি সবেমাত্র অবগত হইলাম। আমি অবগত হইলাম যে, সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করায় ও কারাগারে প্রেরণ করায়, বিশেষ করিয়া সম্প্রতি দেশের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করায় বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য এই ক্রিকেট খেলা বন্ধের জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। হিন্দু জিমখানার তিনজন প্রতিনিধিও এ বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে সবেমাত্র আমার সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সব প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে যে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। উহার রীতি-নীতিই বা কি, তাহাও আমি জানি না। কাজেই এ বিষয়ে আমি যে মত প্রকাশ করিব, তাহা এই সব খেলাধূলা ও উহার বিশেষ নিয়মকানুন সম্পর্কে একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত বলিয়াই ধরিতে হইবে। তবে একথাও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যাঁহারা এই সব ক্রিকেট খেলা বন্ধ করিতে ইচ্ছুক, আমি তাঁহাদের প্রতিই সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতিশীল।

সত্যাগ্রহী হিসাবে এই আন্দোলনের প্রতি যে কোন উপায়ে গণ-সমর্থন লাভে ইচ্ছুক বলিয়াই যে আমি এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছি, তাহা নহে। সে সম্বন্ধে আমি একথা নিশ্চয়ই বলিব যে, বর্তমানের এই আন্দোলন এইরূপ বিক্ষোভ প্রকাশ বা সুবিধা-মূলক সমর্থনের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নহে। তবে মহাসমরে ইউরোপের সুপ্রতিষ্ঠিত পরিস্থিতি ধ্বংস হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বলিয়া এবং এশিয়াকেও অভিভূত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় এইরূপ খেলাধূলা আমি কোনক্রমেই সমর্থন করিতে পারি না। বরং আমি এই কথাই বলি যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই সুযোগ লাভ করিলে, আমি যাহাকে নৃশংস নরমেধ যজ্ঞ মনে করি, তাহা বন্ধের উপায় উদ্ভাবনে তাঁহাদের বুদ্ধি ও সুবিধা দুইই প্রয়োগ করা উচিত। ইহা একটি দূষিত বাতাসের তুল্য। দূষিত বায়ু প্রয়োগে যেমন কেহই উপকৃত হয় না, ইহাও কাহারও উপকারে আসিবে না। এই আমার মত। কাজেই আমার উল্লিখিত অনুদার অভিমতের দিক দিয়া এই সব ক্রিকেট খেলা বন্ধের আন্দোলনে সহানুভূতিশীল হওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমি বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে খেলাধূলা সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব সংশোধন করিতে এবং উহা হইতে সাম্প্রদায়িক খেলা উঠাইয়া ফেলিতে বলিতে চাই। বিভিন্ন কলেজের বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতি-যোগিতা খেলার সার্থকতা বোঝা যায়। কিন্তু হিন্দু, পার্শী, মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায় হিসাবে দল গঠনের সার্থকতা আমি কখনই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এইরূপ অখেলোয়াড়োচিতভাবে বণ্টনকে খেলোয়াড়ী ভাষায় ও আচরণে নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি। সাম্প্রদায়িকতার ভাব বর্জিত হইয়া কি আমরা খেলার মাঠে মিলিত হইতে পারি না? সেজন্য আমার ইচ্ছা, এই খেলা বন্ধের আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষয়টি আরও ব্যাপকতরভাবে গ্রহণ করিয়া উদারতর দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়া এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করিবেন এবং চিরতরে খেলাধূলার কেন্দ্র হইতে সাম্প্রদায়িক কলঙ্করেখা মুছিয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে সময় রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, তখন আমাদের জীবনধারা হইতে এই সব খেলাধূলাও রহিত করার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

মিঃ বার্ণাড শ' এবং আরও অনেকের মতে জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের উপর যখন মৃত্যুর তাণ্ডব চলে বা তাঁহারা নরহত্যায় মত্ত হয় ও নানা প্রচেষ্টায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ ধ্বংস কার্যে লিপ্ত হয়, তখনও জাতির খেলাধূলা অব্যাহতভাবে চলা উচিত। এই সব মনীষীর সহিত একমত হইতে অসমর্থ বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি এবং ভয়প্রকম্পিতকণ্ঠে আমার এই অভিমত আমি ব্যক্ত করিতেছি।"

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ডাঃ সুব্বারায়ন সস্ত্রীক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়া-ছেন। তিনি কারাবরণের পূর্বে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অভিমতকে সমর্থন করিয়াছেন। পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়া যে উচিত, ইহা তিনিও বিশ্বাস করেন। তবে তিনি বিবৃতিতে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা অথবা সিংহল ক্রিকেট দলের ভ্রমণের বিভিন্ন খেলা বন্ধ না করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন।

পেন্টাঙ্গুলার পরিচালকগণ

বোম্বাই পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পরিচালকগণ অনুষ্ঠান বন্ধ করিবেন না বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা খেলার ব্যবস্থা করিতেছেন। হিন্দু দল যোগদান না করিলে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে ওয়াক ওভার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পরিণতি কি হইবে কিছুই বলা যায় না। তবে মহাত্মা গান্ধী যিনি দেশের ও জাতির একমাত্র কর্ণধার, তাঁহার অনুরোধ বাণী উপেক্ষা করিয়া পরিচালক-গণ শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চালাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা

ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্যায়ের ১৯৩৯-৪০ সালের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুষদের বিভাগে গউস মহম্মদ ও মহিলাদের বিভাগে কুমারী লীলারাও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। পাটনার তরুণ বাঙালী টেনিস খেলোয়াড় শ্রীমান্ খসু সেন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের যে বিশেষ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। ক্রমপর্যায় কমিটি তালিকা প্রস্তুতকালে ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন খেলোয়াড়গণ যেরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই করিয়াছেন। যে সকল পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়গণের খেলা সমান সমান মনে হইয়াছে, তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় বলিয়া একত্রে নাম প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে প্রকাশিত তালিকা প্রদত্ত হইল:—

পুরুষদের বিভাগ

১ম—গউস মহম্মদ (লক্ষ্ণৌ); ২য়—ইফতিকার আমেদ (লাহোর); ৩য়—যুধিষ্ঠির সিং (এলাহাবাদ); ৪র্থ—এম এল আর সোহানী (লাহোর)।

প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়গণ:—ই ডি বব, প্রেম গান্ধী, ডি এন কাপুর, সোহনলাল ও খসু সেন।

মহিলাদের বিভাগ

১ম—কুমারী লীলারাও (বোম্বাই); ২য়—মিস্ এল ডারিজ (দিল্লী)।

প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়গণ:—মিসেস সি কার্গিল (পূর্বের মিস হার্ভিজনষ্টন), মিস হাদী, মিস ডুবাস, মিসেস সি ডি এন শাস্ত্রী ও মিসেস সি ম্যাসী।

বেতারে ক্যাট্‌ফিসের বক্তৃতা

মনের আনন্দে মানুষই কেবল গান গায় না; জীব-জগতের অনেক নিকৃষ্ট পশুপক্ষী মনের আনন্দে গান ক'রে মানুষকেও মুগ্ধ করে। মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে সেই সুরের আবার অনুকরণ ক'রে আনন্দ পায়। কিন্তু অনেক জীব-জন্তুর কণ্ঠস্বর আমাদের মত শ্রোতাদের মোটেই আকৃষ্ট করতে পারে না। যেমন ধরুন, গাধার বিকট চীৎকার,—কাকের এক-ঘেয়ে কা-কা। ইউরোপের লোকেরা কিন্তু প্রকৃতির এই সন্তানদের অনাদৃতভাবে সমাজের গণ্ডীর বাইরে রাখে নি।

ক্যাটফিস রেডিওর সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে

এদের কাছে আমরা যে বহু বিষয়ে ঋণী, তা তারা যতখানি স্বীকার করে, আমরা তার এক তিলার্ধও করি না।

লোকশিক্ষা প্রসারতার পক্ষে বেতারবার্তার প্রয়োজন যথেষ্ট। বেতারবার্তার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে জীব-জন্তুদের জন্য একটা পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। জীব-জন্তুর বিষয়ে বক্তৃতা ছাড়া তাদের সশরীরে সেখানে হাজির করিয়ে তাদের অদ্ভুত ভাষার কথা শ্রোতাদের শুনান হয়। সহস্র সহস্র মাইল দূরে থেকে একান্ত আগ্রহে শ্রোতার দল তাদের কথা শুনে,—ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দে মেতে উঠে।

কিছুদিন পূর্বে নিউ ইয়র্ক সিটি রেডিও স্টেশন থেকে একটি ক্যাট্‌ফিস তার মাতৃভাষায় এক অদ্ভুত শব্দ ক'রে শ্রোতাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। বেতার অফিস থেকে ঘোষণা করা হ'ল, এবার জীব-জন্তুদের বৈঠক আরম্ভ হবে; প্রথমেই যিনি বলিবেন, তাঁর জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অঞ্চলে—নাম ক্যাট্‌ফিস।

লক্ষ লক্ষ শ্রোতা ক্যাট্‌ফিসের কথা শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মাথার কাঁটা বের করার উপায়

মেয়েরা মাথার চুল সংযত রাখবার জন্যে মাথায় তারের কাঁটা ব্যবহার করে। যাদের চুল খুব বেশী ঘন তাদের মাথার কাঁটা খুলতে গিয়ে সময়ে সময়ে রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। হলিউডের সব ব্যাপারই আলাদা। সেখানের সময়ের মূল্য বেশী। অভিনেত্রীরা মাথা থেকে কাঁটা খুলতে বেশী সময় দিতে পারে না। অনেক চিন্তা করে একজন আবিষ্কারক একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। যন্ত্রটা এমন কিছুই নয়। একটা লোহার ঘোড়ার খুর, তাতে একটা হাতল। লোহাতে চুম্বক থাকায় এই যন্ত্র সাহায্যে পরিচারিকারা হলিউডের অভিনেত্রীদের মাথা থেকে কাঁটাগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র খুলে দিতে সক্ষম হয়। চুম্বকের আকর্ষণে কাঁটাগুলি অনায়াসে যন্ত্রটিতে এসে আশ্রয় নেয়। ফলে আনাড়ীর হাতে পড়ে চুলের পাট নষ্ট হয় না, আর সময়ও অযথা নষ্ট হয় না।
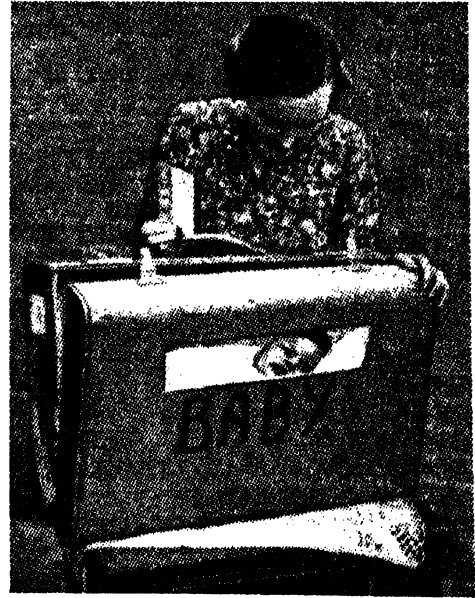
সুটকেশের মধ্যে ছোটছেলেমেয়েদের থাকবার চমৎকার ব্যবস্থা

খালি চোখে নক্ষত্র দেখা

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে খালি চোখে ২৫০০ শত নক্ষত্র দেখা যায়। অবশ্য চোখের কোন রকম দোষ থাকলে একটাও দেখা যাবে না।

পুরাতন মাখন

ভারতবর্ষে মাখনকে তৈল আকারে প্রায় ১০০ শত বৎসর রাখা যায়। ফলে মাখনের মধ্যে কোন দোষ পাওয়া যায় না।

৮ম বর্ষ] ৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল Saturday, 21st December, 1940 [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কূটনীতির ব্যর্থতা—

বাঙলার কবি লিখিয়াছেন, কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে, কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে? কংগ্রেসের দক্ষিণী দল বাঙলাকে চাপিয়া মারিবার এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতার সাধনায় সবল শক্তি বিকাশে বাধা দিবার যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপ্ত বাঙলা, ভারতের নব জাতীয় জীবনের উদ্বোধক বাঙলা যে তাহা কোনদিন স্বীকার করিয়া লইবে না, কেন্দ্রীয় পরিষদে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন হইতে সেদিন তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং স্পষ্টতরভাবে তাহা প্রতিপন্ন হইল বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে পুনরায় এই দলের নেতৃত্বপদে নির্বাচনে। দক্ষিণী দলের ধুরন্ধর কূটনীতিক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় কেরামতি ফলাইয়াছিলেন, সত্যকে মিথ্যা করিতে এবং মিথ্যাকে সত্য করিতে, কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানেই বাঙলার জনমতের প্রতিনিধিগণ তাঁহার চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। হালে কোনগতিকে পানি না পাইয়া তিনি শেষ মুহূর্তে সভা স্থগিত রাখিবার কৌশল অবলম্বন করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, এই ক্ষমতা তাঁহার নাই। সে সভা স্থগিত রাখিলে আহূত সভায় সমবেত সদস্যদের মত অনুসারেই তাহা হইতে পারে, কিন্তু বিধিবিহিত সে পন্থা অবলম্বন সামর্থে তাঁহার কুলায় নাই। তাঁহার কূটনীতিক কারসাজী দলের অধিকাংশ সদস্যদের ভোটে ব্যর্থ হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রকে বাঙলার রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া দক্ষিণী দল স্বেচ্ছাতন্ত্র চালাইবার যে চক্রান্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বাঙলার কংগ্রেস কর্মক্ষেত্রের বাহিরে এবং আইন সভার ভিতরে তাহা সমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙলা দেশ ইহাতে আনন্দিত হইবে, বাঙলার তরুণ-চিত্ত ইহাতে উল্লসিত হইয়া উঠিবে। পার্লামেণ্টারী দলের সদস্যগণকে আমরা এজন্য অভিনন্দিত করিতেছি, তাঁহারা বাঙলার জাতীয় জীবনের আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার দায়িত্বকে পর-নির্ভরতার দৈন্যে ক্লিন্ন করেন নাই; আর অভিনন্দিত করিতেছি আমরা শ্রীযুত শরৎচন্দ্রকে, বাঙলার আইন সভায় কংগ্রেসের আদর্শ তাঁহার নেতৃত্বে নিরাপদ হইল সন্দেহ নাই।

চূড়ান্ত জবাব—

বড়লাট কলিকাতায় আসিয়া গত সোমবার শ্বেতাঙ্গ বণিক সমিতিগুলির সম্মিলিত বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়াছেন। বড়দিনের মরসুমে কলিকাতায় বড়লাটের যে কয়েকটি রাজনীতিক বক্তৃতা হয়, তন্মধ্যে এ তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। কিন্তু প্রথম বক্তৃতা মুখেই বড়লাট শেষকথা শুনাইয়া দিয়াছেন। ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি ভারত সচিবের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার ৮ই আগস্টের প্রস্তাবের উপর জোর দিয়াছেন এবং ভারত সচিব যেটুকু বলিতে বাকী রাখিয়াছিলেন, তাহাও খোলাখুলিভাবে বলিয়া একেবারে ভেজাল চুকাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে আমাদের যতদূর যাওয়া সম্ভব ৮ই আগস্টের বক্তৃতাতেই আমরা গিয়াছি। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহার বেশী আর কিছু আমরা করিতে পারি না। ভারত সচিব, এ কথাটা এতটা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তাঁহার কথার মধ্যে এমন ফাঁক কেহ কেহ এখনও দেখিতেছিলেন, যাহাতে তাঁহাদের আশা হইয়াছিল যে, আপোষ-আলোচনার পথ এখনও বোধ হয় খোলা আছে। দক্ষিণী দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তি ভারত সচিবের বক্তৃতা হইতে ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি পাকি-

স্থান প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতি যাহাতে ব্যাহত হয়, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের হাতে এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হইবে না,—ভারত সচিবের বক্তৃতায় এমন একটা কথা ছিল; কিন্তু বড়লাট কথাটা ঘুরাইয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, "সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যাকে উপেক্ষা করিয়া ভারতের সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে, মুহূর্তের জন্য ইহা মনে করাও নির্বোধের কাজ হইবে।" তারপর বড়লাট আরও একটি কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের শান্তিরক্ষা এবং কল্যাণসাধনের দায়িত্ব এমন শাসন-ব্যবস্থার কাছে হস্তান্তরিত করিতে পারেন না, যাহাদের কর্তৃত্ব ভারতের জাতীয় জীবনের বিপুল এবং শক্তিশালী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকৃত হইয়া থাকে।" এ স্থলে কংগ্রেসকেই যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ইহা বড়লাটের ভাষায় স্ফটিকের মত সুস্পষ্ট। কংগ্রেসকে খাটো করিবার যে সব 'এলিমেণ্ট' চেষ্টা করিতেছে বড়লাটের এই বক্তৃতায় তাহারা চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। এ বক্তৃতার বিশেষত্ব হইল এই রকম। বড়লাট জোর দিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতের সমস্যা সমাধানের উপযোগী কোন কার্যকর প্রস্তাব আমাদের নিকট হইতে কোন ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত করা হয় নাই। আমরা তাঁহার এই উক্তিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লীতে গৃহীত প্রস্তাব সর্বতোভাবে তেমন কার্যকর প্রস্তাবই ছিল। ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের যে পরিকল্পনা প্রথমত সুভাষচন্দ্র উপস্থিত করেন, ওয়ার্কিং কমিটি সেই প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন এবং এখনও পারেন কিন্তু বড়লাটের বক্তৃতা হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, তাঁহারা তাহাতে রাজী নহেন। বড়লাট বলিয়াই দিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে ন্যাশানাল গভর্নমেন্ট বলিতে ৮ই আগস্টের বক্তৃতায় যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা ছাড়া আর বেশী কিছু তাঁহারা সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। অর্থাৎ দায়িত্বহীন দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট, বর্তমানে একমাত্র সাধ্য! স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীরা যদি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হয়, তাহাদেরই দোষ।

সোনার পাথরের বাটি—

সোনার পাথরের বাটি, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে অগম্য হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি মীমাংসকদের পক্ষে উহা যে অগোচর নহে, মীমাংসাবাদীদের ধুরন্ধর পুরুষ স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর বিবৃতি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ব্রিটিশ জাতির এই বিপদে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার জগদীশপ্রসাদ, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ই'হাদের প্রাণ ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক এবং সেই মীমাংসার উদ্দেশ্যে স্যার তেজবাহাদুরও এই বিবৃতি বাহির করিয়াছেন। মডারেটী সূক্ষ্মবুদ্ধির বিস্তার, সুতরাং স্যার তেজবাহাদুরের সেই বিবৃতি যে বিস্তর হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। সেই বিস্তর বিবৃতিতে স্যার তেজবাহাদুর বড়লাটের প্রস্তাবকেই মানিয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছেন। শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সেই প্রস্তাবের সংশোধন চাহিয়াছেন, দেশরক্ষা বিভাগের কর্তৃত্ব শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের হাতে না রাখিয়া একজন ভারতবাসীর হাতে দেওয়া হউক এই প্রস্তাব করিয়া। ইহাই হইল স্যার তেজবাহাদুরের মতে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট বা জাতীয় গভর্নমেণ্ট। স্যার তেজবাহাদুর স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছেন, এই সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদকে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইন সভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন আপাতত না করিলেও চলিবে। আপাতত তাঁহারা বড়লাটের বা পার্লামেণ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নীতির দ্বারা পরিচালিত চাকুরিয়া হইলেন তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি তাঁহারা ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট! বিদেশী বা বিজাতির কর্তৃত্বে পরিচালিত গভর্নমেণ্ট কেমন করিয়া ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট হয়, কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন, সে প্রশ্নের একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই যে, দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ভারতবাসী হওয়াতেই গভর্নমেণ্টও ভারতীয় হইয়া যাইবে এবং ভারতবাসীরা স্বাধীনতার রসের আস্বাদন পাইবে! জনমতের অভিব্যক্তি শাসনতন্ত্রে থাকুক আর নাই থাকুক, চাকুরীতেই চতুর্বর্গ সিদ্ধি। আর কেহ এমন প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপ্ত ভারত এমন প্রস্তাবকে উপেক্ষাই করিবে এবং ভারতের স্বাধীনতার আদর্শে সংগ্রামে লিপ্ত কংগ্রেস এমন প্রস্তাবকে কিছুতেই আপোষ-নিষ্পত্তির ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

চতুরঙ্ক অভিনয়—

ভারত সচিব মিঃ আমেরি গত ১২ই ডিসেম্বর লণ্ডনের এক ভোজসভায় চতুরঙ্ক অভিনয় করিয়াছেন। 'অগ্রে ভারত' এই অভিনয়ের অভিধেয় হইল ইহাই এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি পরম প্রেমই এক্ষেত্রে প্রয়োজন, ভারত সচিব তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি হিন্দু সাজিয়াছেন, তারপর সাজিয়াছেন মুসলমান, তারপর ভারতীয় সামন্তরাজা এবং পরিশেষে ইংরেজ সাজিয়া এই 'অগ্রে ভারত' তত্ত্বের আস্বাদন করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত শুনাইয়াছেন যে, এই যে, এই 'অগ্রে ভারত' নীতি যদি সত্যই সার্থক করিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই চারি শ্রেণীর মনুষ্য, বড়লাট তিন মাস পূর্বে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাই শিরোধার্য করিয়া লও। যে দিক দিয়াই বিচার কর না কেন, ইহা ছাড়া অন্য পথ আর নাই। আমেরি সাহেবের

কথায় নূতন কিছুই নাই; তবে একান্ত আশাবাদীরা ব্রিটিশ মুরুব্বীদের কথার মধ্যে নূতন মহিমা খুঁজিয়া কিছু পানই। আমেরি সাহেবের এই বক্তৃতার মধ্যেও তাঁহারা সে রসে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, বড়লাটের প্রস্তাবে যে কথা নাই, আমেরি সাহেব, তেমন একটা কথা এবার বলিয়াছেন, অন্ধ তোমরা, তোমাদের চোখ থাকিলে তাহা দেখিতে। সে নূতন কথাটি হইতেছে এই যে, তিনি ভারতের সংহতি যাহাতে নষ্ট না হয়, মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে এমন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। আমেরি সাহেবের সে উল্লেখযোগ্য কথাটি হইল এই যে, 'আমি মুসলমান, ভারতের জাতীয় জীবনে আমার জাতির অধিকার স্বীকৃত হয়, ইহার জন্য চেষ্টা করিতে আমি বাধ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া ভারতের সর্বপ্রকার রাজনীতিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়, শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে এমন অধিকার কি আমার পক্ষে দাবী করা উচিত হইবে? আমার পক্ষে উচিত হইবে কি এমন দাবী করা যাহাতে ভারতের সংহতি নষ্ট হইবে, যাহা আমাদের হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর?' ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মনস্তত্ত্ব তলাইয়া বুঝিবার বাতিক যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সে চেষ্টা করুন, কিন্তু আমাদের আর সে স্পৃহা নাই। আমরা দেখিতে চাই কাজ, কিন্তু সে কাজের কোন পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কথার শুভেচ্ছা যদি কার্যে পরিণত করিবার গরজ প্রকৃতপক্ষে থাকিত, তবে কংগ্রেসের দবাী মানিয়া লইবার পক্ষে কোন অন্তরাই তাঁহাদের থাকিত না। কংগ্রেস ভারতের কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই অস্বীকার করে নাই; কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মনের কোণে 'অগ্রে ব্রিটিশ' এই নীতি উঁকি দিতেছে। এই 'অগ্রে ভারত' নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়াও সেই ব্রিটিশের স্বার্থই অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমেরি সাহেবের বক্তৃতার সারবস্তু হইল ইহাই। ভারতের বাস্তব স্বার্থের বিচার ব্রিটিশের স্বার্থের এই সংস্কারে বিজড়িত হইয়াই তাঁহার দৃষ্টিতে দেখা দিয়াছে। পরানুগ্রহপ্রত্যাশীরাই এ সব কথার মধ্যে মহিমা খুঁজিয়া পাইবে। এমন যুক্তির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপ্ত যুবকদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। ভারত সচিবের এই চতুরঙ্ক অভিনয় ভারতের তরুণচিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না, বরং তিক্ত করিয়াই তুলিবে।

কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া লাইন—

গাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে মধ্যপথ-বর্তী যাত্রীর যেমন দুর্দশা হয়, হঠাৎ এক নোটিশে পূর্ব বঙ্গ রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখা লাইনটি বন্ধ হইয়া গেলে বাঙলা দেশের যশোহর এবং ফরিদপুরের বড় একটা অঞ্চলের জনসাধারণের নানাদিক হইতে সেইরূপ দুর্দশার সৃষ্টি হইবে। ফরিদপুরে সদর, গোয়ালন্দ, যশোহরের মাগুরা, নড়াইল প্রভৃতি মহকুমায় গতিবিধির একমাত্র পথ হইল এই লাইন; তাহা ছাড়া এই লাইন তুলিয়া দিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটিবে তাহা বলিবারই নয়। এই রেলপথের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা কারবার চালাইতেছেন, আকস্মিকভাবে লাইন তুলিয়া দিলে তাঁহাদের সর্বনাশ হইবে। ভারতের রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতবাসীদের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া নিয়ন্ত্রিত হয় না, ইহা আমরা জানি, কিন্তু দেশের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি এই যে নির্মম উপেক্ষা ইহার তুলনা দুর্লভ। ক্ষতির জন্য যে এই রেলপথ তুলিয়া দিতে হইবে, এমন নয়, বরং যতদূর জানিতে পারা যায়, এই লাইনে লাভই হইতেছে। যুদ্ধের জন্য রেলের সাজসরঞ্জাম দরকার, সেই জন্যই এই লাইন তুলিয়া দিতে হইবে বলিয়া প্রকাশ। বাঙলা সরকার ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াও কোন সুফল পান নাই। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ সদ্য সদ্য লাইন উঠাইয়া ফেলিবার প্রস্তাবটা স্থগিত রাখিয়াছেন, গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা আংশিকভাবে সঙ্কোচ করা হইতেছে। এই নূতন ব্যবস্থা সাময়িকভাবে লোকের অসুবিধা দূর করিবে বটে; কিন্তু প্রতিবাদের মূল কারণ থাকিয়া যাইবে। লাইনটি পূর্বের ন্যায় বাহাল যাহাতে রাখা যায়, কর্তৃপক্ষের উচিত তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যুদ্ধের প্রয়োজন বড় ইহা আমরা বুঝি, কিন্তু যুদ্ধের দিনকালে দেশের লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে আর্থিক নিরাপত্তা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা যুদ্ধের স্বার্থের দিক হইতে আরও বেশী, ভারত সরকার ইহা বুঝিয়া দেখিয়াছেন কি?

বীরের মর্যাদা—

গত ৩০শে নভেম্বর কলিকাতার বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে জনৈক গুণ্ডা কোন ভদ্রলোকের পকেট কাটিয়া দৌড়াইয়া পলাইবার সময় হরিপদ সেনগুপ্ত সাহসের সহিত গুণ্ডাটাকে চাপিয়া ধরেন। কিন্তু উহার ছোরার আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হন। গত ১২ই ডিসেম্বর এই সাহসী যুবক কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। দুর্বৃত্তকে দমন করিবার জন্য এই যে বলিষ্ঠ প্রেরণা, ইহাকেই বলে বীরত্ব। এই বীরত্বের আদর্শ বাঙলার যুবকদিগকে উদ্দীপ্ত করিবে, ইহাই আশা করি। হরিপদ-বাবু স্ত্রী ও কয়েকটি নাবালক শিশুসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দরিদ্র ছিলেন; সুতরাং তাঁহার অভাবে তাঁহার পরিবারবর্গ একান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে সহায়তা করিয়া হরিপদবাবু প্রাণ দিয়াছেন। এই কার্যে সহায়তা করিবার জন্য মন্ত্রীদের মুখে আমরা অনেক উপদেশ শুনিতে পাই, হরিপদবাবুর পরিবারবর্গকে সরকারী সাহায্য দান করিয়া আদর্শকে কার্যত অনুপ্রেরণা প্রদান করা তাঁহাদের কর্তব্য।

ছাত্র সমাজের আদর্শ—

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় কুমার স্যার মহারাজ সিং ছাত্রদিগকে সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি বর্জন করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন,—'বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে এবং ইহার কারণ যতই হউক, দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইহা কমে নাই বরং আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে।' স্যার মহারাজা সিং যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার কারণ সত্যই আছে, ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর আদর্শের প্রতিষ্ঠা যতদিন না হইবে, ততদিন ইহা থাকিবেই। সাম্প্রদায়িকতার সস্তা বুলি বিকাইয়া যতদিন পর্যন্ত নেতাগিরি করা যাইবে এবং সেই ফিকিরে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাওয়া সম্ভব হইবে, ততদিন ইহা চলিবেই। এই পাপের প্রতীকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের হিসাব নিকাশ কিংবা দর কষাকষির দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হইবে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দরকার মানুষের মত মানুষের। মানবতার এই বলিষ্ঠতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে শুধু তরুণেরাই। জগতের দিকে তাকাইয়া তাহারা একবার মাথা তুলুক, দাসের জীবন ছাড়িয়া দাবী করুক মানুষের জীবন, তাহাদের মহৎ আদর্শের আলোয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী স্বার্থান্ধের দল মুখ লুকাইতে বাধ্য হইবে।

পরলোকে লর্ড লোথিয়ান—

বিগত মহাসমরে লর্ড রেডিংয়ের উপর যে ভার পড়িয়াছিল, বর্তমান সমরে সেই ভার পড়ে লর্ড লোথিয়ানের উপর। আমেরিকার ব্রিটিশ রাজদূতরূপে তিনি দক্ষতা সহকারে আমেরিকাকে ইংরেজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এ কথা বলা যায়। ইংরেজ রাজনীতিকদের চরিত্র অধিকাংশ স্থলে অগম্য; বিশেষভাবে, ভারতের সম্বন্ধে কথায় যাহাই হউক, কার্যে তাঁহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। লর্ড লোথিয়ানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘটে বর্তমান শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পর্ব হইতে। এই সময় সহকারী ভারত সচিবস্বরূপে তিনি ফ্রাঞ্চাইজ কমিটির সভাপতি স্বরূপে কাজ করেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে কার্যত ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা সম্প্রসারণের জন্য কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি কয়েকবার ভারতবর্ষে আসিয়া মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি নেতাদের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ভারতের প্রতি তিনি বহু সদিচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি উদারনীতিক হইলেও সাম্রাজ্যবাদে সুগভীর বিশ্বাসী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিকের বিশিষ্ট গুণ যে চাতুর্য তাহাও তাঁহার ছিল; কারণ তাহা না থাকিলে বর্তমান সময়ে আমেরিকার মত স্থানের ব্রিটিশ রাজদূতের গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডের বিশেষ ক্ষতি ঘটিল এবং সে ক্ষতি সহজে পূরণ হইবার নয়।

ত্রুটি কোথায়—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—"আমি নিজে কমপক্ষে বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দু সমাজের অনেক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু জীবন-সন্ধ্যায় হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, তাহাতে আশানুরূপ ফল পাই নাই। দুঃখের বিষয় বাঙলার ভদ্র যুবকদের নিকট আমার আবেদন পুরাপুরি সফল হয় নাই।" সমস্যাটির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া আচার্যদেব বলেন,—"বর্তমান হিন্দু সমাজে দুইটি শক্তিশালী বিভাগ রহিয়াছে,—প্রথম সনাতনী, দ্বিতীয় প্রগতিবাদী। সনাতনীরা রক্ষণশীল; যুগ যুগ ধরিয়া যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা দাঁড়াইতে চান না। ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে অস্বীকার করিয়া একটা কাল্পনিক গরিমা লইয়া ইঁহারা বিচরণ করিতেছেন। প্রগতিবাদীদের মধ্যে অনেকেই আবার নামে মাত্র প্রগতিবাদী, কার্যকালে হিন্দু সমাজের অভ্রভেদী অচলায়তন ভেদ করিয়া এতটুকু অগ্রসর হইবার সাহস তাঁহাদের নাই। অনেকে আবার প্রগতিবাদী সাজেন একটা কাল্পনিক আদর্শবাদের মোহে। এই জন্যই প্রগতিবাদীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে গেলেও আসল কাজ কিছুই হইতেছে না। এই সব প্রগতিবাদীদের সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, অনেক ক্ষেত্রেই ভাববিলাসের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের প্রগতিবাদ।"

সংরক্ষণশীলদের জন্য আমাদের বিশেষ চিন্তা নাই। মানুষ চায় পরিবর্তন, সমাজের গতি কালোচিত পরিবর্তনেরই অভিমুখে, সুতরাং অবস্থা প্রগতিবাদীদেরই অনুকূলে; কিন্তু আচার্যদেব যাহা বলিয়াছেন, প্রগতিবাদীদের অভাব সেই আন্তরিকতার। তাহাদের অনেকেরই প্রগতিবাদ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতির সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে বিজড়িত নহে। এ জন্য সমাজের সর্বদেশকে তাহা স্পর্শ করিতেছে না; নাগরিক আভিজাত্যমূলক আবরণে তাহা জনগণের অন্তর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন থাকিয়া যাইতেছে। এই শ্রেণীর প্রগতিবাদীদের প্রগতিবাদ শুধু থাকিতেছে কতকগুলি সাজান গোছান ভাষায় এবং অলঙ্কারে তাহা ভাবের প্রভাবে সমগ্র সমাজ দেহকে নাড়া দিতে পারিতেছে না। আবশ্যক বিদেশীর নকল করা সাজা প্রগতিবাদীর নয়, আবশ্যক সমাজের সর্বস্তরের দুঃখ-দুর্দশার একান্ত উপলব্ধির। এ জিনিসটির মূলে রহিয়াছে দেশকে ভালবাসা; জাতিকে ভালবাসা, এককথায় কৃত্রিম ভাববিলাসিতা ছাড়িয়া বৃহত্তর আত্মীয়তার অনুভূতি।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১১]

মামা সন্ধ্যাবেলা অমলকে ডাকিয়া কহিলেন, মোটে সাতচল্লিশটি টাকা বাকী পড়েছে। এটা কি একটা দেনা হ'ল?......এত বড় একটা বৃহৎ কাজে এই ক'টী টাকা ধার পড়বে না?......ইন্দু ত মুখ শুকিয়ে অস্থির; আবার বলে বৌমার একখানা ছোটমোটো গয়না বেচে ধারটা শোধ ক'রে দিতে! ছিঃ ছিঃ এই কি একটা কথা হ'ল?......তুই বেঁচে থাক্, চাক্‌রী বাক্‌রী হোক্—টাকাটা শোধ দিতে কতক্ষণ? কি বল বাবা?

অমলকে অগত্যা বলিতে হইল, তা বটেই ত!

ইন্দুর ঋণ শোধের স্বপ্নকে অদৃষ্ট কি নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করিলেন সেই কথাটা ভাবিয়া তাহার মনে দুঃখ হইল। উপায় কি?

কিন্তু ইন্দুর মনের মধ্যে তখন তারুণ্যই জয়ী হইয়াছে। সে সন্ধ্যাবেলা চুপি চুপি অমলকে ডাকিয়া কহিল, শেষ রাত্তিরে একবার বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে আমার ঘরের জানলায় যাবেন, ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, কেমন?

তাহার চোখে মুখে রোম্যান্সের রঙ্। অকস্মাৎ সেদিকে চাহিয়া অমলেরও মন যেন দুলিয়া উঠিল, সে কহিল, নিশ্চয় যাব, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কইবে ত?

তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ইন্দু জবাব দিল, সে আমি কওয়াব নিশ্চয়। আপনাকে যেতে হবে কিন্তু!......

আশ্চর্য! রাত্রে শুইয়া অমলের ঘুম হইল না। মনে হইয়াছিল এ জীবনে বাসা বাঁধিবার স্বপ্নকে সে বহুদিন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজ তাহার এ কিসের উত্তেজনা? তবে কি মানুষের স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর করিবার আশা কোনদিনও যায় না?

বহুক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিবার পর সে বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। চাই, রোম্যান্স চাই, ভাবাবেগ চাই, জীবনের কাব্য চাই—নহিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না!

ঘুরিতে ঘুরিতে সত্য-সত্যই সে যখন ইন্দুর শয়নঘরের জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অপরে নবোঢ়া কিশোরী বধূর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, সেখানে তাহার স্থান কোথায়? সে নিজে এ সব ব্যাপারের ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে এই-ত তাহার বিশ্বাস, তবে আজ এ কৌতূহল কেন? এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল?......

ইন্দু জাগিয়া ছিল, সে জানলাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া কহিল, এসেছেন অমলদা, উঃ, কী ভীষণ লোক এ, আমার সঙ্গেই কিছুতে কথা কইবে না! কত সাধ্য-সাধনা ক'রে, কত হাতে পায়ে ধ'রে তবে কথা বলিয়েছি—এই, আবার পালাচ্ছে!

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই ম্লান আলোতে কমলার মুখখানি বড় ভাল লাগিল। গত রাত্রেও কে তাহাকে চন্দন পরাইয়া দিয়াছিল, তাহারই কিছু কিছু চিহ্ন তখনও তাহার মুখে লাগিয়া; সলজ্জ হাসিতে ঠোঁট দুটী ঈষৎ কম্পিত, চোখে লজ্জা ও সুখের আবেশ মাখানো।

তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া জানলার কাছে টানিয়া আনিয়া ইন্দু কহিল, ইনি আমার বন্ধু অমলবাবু, আর এটী আমার স্ত্রী কমলা—। এই শোন, অমলদা'র সঙ্গে আলাপ কর!

কমলা লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল এবং স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কথা কহিতে পারিল না। সেদিকে চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য অমল নিজের জীবনের সমস্ত বেদনা যেন ভুলিয়া গেল এবং মনে হইল পৃথিবীতে সেদিন ইন্দুর অপেক্ষা সুখী কেহ নাই। সে-ও আব্দারের সুরে কহিল, কথা কইবেন না ত?

কমলা বিষম বিপন্নভাবে মাথা নীচু করিয়া রহিল; হাতের মধ্যে তাহার স্বেদসিক্ত হাতখানি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে দেখিয়া ইন্দু সস্নেহে কহিল, ভয় কি লক্ষ্মীটী, কথা কও, নইলে অমলদা কী ভাববেন বল দেখি!

কমলা তবুও কথা কহিতে পারিল না, একবার মাত্র মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিয়াই পুনরায় দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ নামাইয়া লইল। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়াছিল, সে কহিল, তাহ'লে আমি যাই ইন্দুবাবু, উনি যদি কথা না কন্ ত কি দরকার ওঁকে বিরক্ত করায়?

ইন্দু কহিল, দেখ উনি চলে যেতে চাইছেন—

অমলও খানিকটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এই বিপদে কমলা ঘামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছিল, অথচ সত্যসত্যই অমল কিছু মনে করিবে ভাবিয়া সে কোন মতে জড়িত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, কথা কইছি ত!

ছোট্ট দুটী কথা! কিন্তু অমলের মনে হইল যেন এত মিষ্ট কণ্ঠ সে কখনও শোনে নাই। তাহার বুকের সব কটা তারে যেন সেই কণ্ঠস্বর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সে বলিল, ইন্দুবাবু, উনি বড়ই বিপন্ন বোধ করছেন, ওঁকে আর টানা-টানি করবেন না, আমার মান যে উনি রেখেছেন এতেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি এখন যাই—

আসল কথা সে নিজের এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাটাকে একটু নির্জনে অনুভব করিতে চায়! সে আর ঘরে না ফিরিয়া প্রথম ঊষার অস্পষ্ট আলোতেই বাগানে পায়চারী করিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া এই কথাটাই সে বারম্বার মনে মনে বলিতে লাগিল, রোম্যান্স কিছুতেই মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় না, সে চিরদিন থাকে এবং চিরদিন তাহার থাকা দরকার। নহিলে পৃথিবীতে জীবনের কোন মূল্যই থাকিত না।

পরের দিন বেলা বাড়িতেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু ইন্দুর মামা ঘোরতর আপত্তি

তুলিলেন; যে মানুষটীকে অমল ইন্দুর মামা বলিয়া জানিত, সে মানুষটী যেন আর নাই, এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক। অর্থাৎ ইন্দুর বিবাহের যে অভাবনীয়ত্ব, তাহার ঘোর তখনও তাঁহার মন হইতে কাটে নাই; সেই রেশটুকুই তখনও তাঁহার গলার সুরে। তিনি প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তাহার পিঠে চাপড় মারিয়া কহিলেন, পাগল নাকি? আজ কিছুতে হ'তে পারে না। না, সে আমি কোন মতেই শুনব না। এ ক'দিন তোমার মোটে খাওয়া দাওয়া হয়নি, আমরা ত নজর দিতেই পারিনি।

ইন্দুকে কথাটা সে বলিতে গেল কিন্তু সেদিকেও বিশেষ সুবিধা হইল না। সে কহিল, কী দুর্ভাবনা আর কী অবস্থায় রয়েছি বুঝছেন ত? আপনি চলে গেলেই যেন বিভীষিকার মত সেগুলো ঘাড়ে এসে পড়বে। আর একটা দিন অন্তত থেকে যান্—আপনি আছেন তবু একটু রঙ্গীন নেশায় আছি যেন। না, আজকের দিনটা না থাকলে সব মাটী হ'য়ে যাবে—

শেষের দিকে তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সুতরাং অমল আর কথাটায় জোর দিতে পারিল না কিন্তু বুঝিল তাহার যাওয়াই উচিত। এখানে বেশী দিন থাকিলে হয়ত ঘর বাঁধার নেশা তাহাকেও পাইয়া বসিবে।

কিন্তু সারাদিন ইন্দুর দেখা নাই। সে নানা ছুতায় রান্না ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে যখন খেয়াল হয় যে, অতিথিকে বোধ করি অবহেলা করা হইতেছে, তখন দুই মুহূর্তের জন্য আসিয়া বসে এবং খাপছাড়া দুই-একটা কথা বলিয়া আবার একটা ছুতায় উঠিয়া যায়। অমল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসে।

কিন্তু তবু যে ঐ যৌবন-লীলার মধ্যে কী মাদকতা আছে, অমল চেষ্টা করিয়াও তাহার হাত এড়াইতে পারে না। সে দুপুর বেলা মাদুরটা টানিয়া লইয়া আসিয়া বাগানের মধ্যে একটা নভেল লইয়া পড়িতে বসিল কিন্তু সেই অতি আধুনিক নভেলেও তাহার মন বসিল না। দৃষ্টি কখন বইয়ের পাতা হইতে সরিয়া দূর দিগন্তরালে চলিয়া যায় তাহা সে বুঝিতেই পারে না।

সন্ধ্যার একটু আগে ইন্দু একবার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া যায়, আসবেন একটু বাগানের ধারে রাত্তির বেলা। আমিও চুপি চুপি বেরোব'খন ওকে নিয়ে!

অমল মৃদুস্বরে একটা আপত্তি করিতে গেল কিন্তু তাহা টিঁকিল না, হয়ত তাহার কণ্ঠস্বরে তেমন জোরও ছিল না। ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, চলে আসবেন একটু—নইলে আমার ভাল লাগবে না!

অমল চুপ করিয়া রহিল। ঘর ছাড়িয়া আসিয়া সে দুঃখ পাইয়াছে প্রচুর, আত্মীয়-স্বজন-বিরহও তাহাকে কম আঘাত করে নাই, কিন্তু এ সমস্তর মধ্যেও তাহার স্বাধীনতার একটা সুখ ছিল বলিয়া তাহা দুঃসহ হইয়া ওঠে নাই। আজ কিন্তু সে মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। অন্তরের মধ্যে কে যেন হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সব ব্যর্থ হইল, সব ব্যর্থ হইল!

রাত্রে সেদিন একটু সকাল সকালই আহারাদি শেষ হইয়া গেল। তাহার প্রথম কারণ আত্মীয় সমাগম যাহা হইয়াছিল তাঁহারা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয়ত ইন্দুর মামারও শরীর ভাল ছিল না। অপরাহ্নে গ্রামের কয়েকজন নববধূর সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকাল সকালই বিদায় লইয়াছিলেন।

আহারাদির পর বিছানায় শুইয়াই অমল প্রথমটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু খানিকটা পরেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, ঘড়িতে দেখিল তখন এগারোটা। জাগিয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই প্রবল ঘুমের মধ্যেও অমন করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা অমল বুঝিতে পারিল কিন্তু তবু তাহার কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে জানলার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিকটা পরেই ইন্দু ও কমলার প্রণয় লীলা তাহাকে অজ্ঞাত বন্ধনে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কৌতূহলের যেন শেষ নাই, তাহাকে শেষ পর্যন্ত দেখিতেই হইবে। সে নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং অস্তোন্মুখ চন্দ্রের ম্লান আলোতে বাগানের পথ দেখিয়া সে ইন্দুর ঘরের দিকেই চলিল।

কিন্তু ইন্দুও ইতিমধ্যে কখন কমলাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা তাহার ঘরের দিকেই আসিতেছিল। মধ্য পথে দেখা হওয়াতে ইন্দু ইঙ্গিতে অমলকে ডাকিয়া লইয়া একেবারে পুকুরের পাড়ে গিয়া বসিল। এককালে চত্তরটা বাঁধানো ছিল, এখনও তাহার খানিকটায় শান্ আছে; বসা চলে। কমলা লজ্জিতভাবে আড়ষ্ট হইয়া বসিল, ইন্দু তাহার পাশে বসিয়া অমলকে জোর করিয়া আর এক পাশে বসাইল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ-চাপ, অপ্রত্যাশিত সুখে ইন্দুর মন কানায় কানায় ভরা আর অমল চুপ করিয়া ছিল সংকোচে। কিছুক্ষণ পরে সে-ই কথা পাড়িল, আমরা ত দিব্যি সকলে বেরিয়ে এলুম, চোর ঢুকবে না ত?

ইন্দু কহিল, না, না, আমরা তিন-তিনটে লোক এখানে জেগে বসে রয়েছি, চোর ঢুকতে সাহস করে কখনও?

তাহার পর যেন অসংলগ্নভাবেই কহিল, একে নিয়ে কিন্তু মহা মুস্কিলে পড়লুম অমলদা, আপনার সঙ্গে আলাপ করবে মনে ক'রে আপনাকে বেরোতে বলেছিলুম বটে কিন্তু এখনও ত আমার সঙ্গেই ভাল করে কথা বল্ছে না।

অমল মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

কৃত্রিম কোপের সহিত ইন্দু কহিল, কে জানে! বোধ হয় লজ্জা।

কমলা অপাঙ্গে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিয়া আরও বেশী করিয়া ঘাড় নামাইল।

ইন্দু কহিল, অমলদা'র সঙ্গে কথা কও না, লক্ষ্মীটী,

কাল উনি চলে যাবেন, আবার কতদিনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে!......শুনছ, কথাবার্তা বল না—

নেশা একটু যেন অমলের মনেও ধরিয়াছিল, সে কহিল, কথা কইবেন কি, মনে মনে আমার ওপর চটে রয়েছেন ত! দিব্যি এমন ফাঁকা জায়গাতে নির্জনে স্বামীস্ত্রীর আলাপ জমবে তা নয় আমি এক আপদবালাই কোথা থেকে এসে হাজির হলুম!

ইন্দু কমলার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, তাই নাকি, সত্যি?

কমলা নতমুখেই মাথা নাড়িল, কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরিহাসটুকু সে বেশ উপভোগ করিতেছে।

ইন্দু কহিল, তবে কথা কইছ না কেন ওঁর সঙ্গে। উনি কি ভাবছেন বল দেখি? দেখছ ত কত দুঃখ করছেন।

অমল উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, নাঃ আমি যাই, উঠি, উনি যখন আমার ওপর প্রসন্ন হলেনেই না, মিছিমিছি ওঁকে বিরক্ত ক'রে লাভ কি—

ইন্দু কহিল, ঐ দেখছ ত?

সত্যসত্যই অমল উঠিতেছে দেখিয়া কমলা কোনমতে হাতটা বাড়াইয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ লজ্জা পাইয়া হাত টানিয়া লইল। অতি অল্পক্ষণ, বোধ করি এক মুহূর্তকাল মাত্র, কিন্তু সেইটুকু সময়ের জন্যই সেই স্বেদসিক্ত, লজ্জাকম্পিত কোমল হাতের স্পর্শটুকুতে অমলের সর্বাঙ্গ যেন জুড়াইয়া গেল। মনের মধ্যে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস বহিয়া তাহাকে যেন মাতাল করিয়া দিল। সে বসিয়া পড়িয়া এবার নিজেই কমলার ডান হাতটা জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, বেশ, বসছি কিন্তু কথাও কইতে হবে!

কমলা এবার কথা কহিল, অত্যন্ত মৃদুস্বরে, জড়িত কণ্ঠে কহিল কী কথা বলব?

অমল কহিল, যা খুশী, আপনার বাপের বাড়ির কথা কিছু বলুন না!

ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল। কমলা শুধু সংক্ষেপে দুই একটি কথার জবাব দেয়, বকিয়া যায় ইহারাই বেশি। অমলের হাতের মধ্যে কমলার হাতখানা ঘামিয়া সপসপে হইয়া উঠিল, কিন্তু তবু অমল ধরিয়াই রহিল। অবশেষে এক সময়ে পূর্বাকাশে ঊষার আভাস লাগিতে তাহার চৈতন্য হইল, সে কহিল, ইস্ আপনাদের সারারাতটাই মাটি করে দিলুম দেখছি; ভোর হয়ে গেল যে!......যান, যান—শুতে যান!

ইন্দুরা উঠিয়া পড়িল। অমল কিন্তু আর শুইতে গেল না, গ্রামের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। যে স্বপ্ন এতক্ষণ ধরিয়া সে দেখিল, তাহাকেই মনের মধ্যে সে ভাল করিয়া অনুভব করিতে চায়।

[১২]

পরের দিনই অমল কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সেই ছুতার পাড়ার ধূমপরিপূর্ণ গলি এবং সেই নীচু খোলার চালের ঘর। এতদিনে ইহা ক্লেশকর হইলেও এমন করিয়া গলা চাপিয়া ধরে নাই। সে আসিয়া স্নান সারিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু ঘর অসহ্য বোধ হইয়া থাকিলেও পথ ত একেবারেই অসম্ভব। সে সেই দ্বিপ্রহরেই গোলদীঘির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া অপেক্ষাকৃত ছায়াশীতল একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল এবং দূরের ট্রাম ও বাসের গতির দিকে চাহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস দিবাস্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিল।

ক্রমে অপরাহ্ণও মলিন হইয়া সন্ধ্যার দিকে ঢলিয়া পড়িল। এমন করিয়া বসিয়া থাকাও অসহ্য। ইন্দুর কথা, তাহার মামার কথা, কমলার কথা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, স্বপ্ন বটে কিন্তু বড় মধুর সে স্বপ্ন; সহসা হইতে লাগিল, স্বপ্ন বটে কিন্তু বড় মধুর সে স্বপ্ন; তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া কিছুতেই আর বাস্তবে মন বসিতেছে না। বিশেষত, সহসা সে এতদিন পরে অনুভব করিল, কলিকাতা অসহ্য। নিজের দেশ হইতে আসিয়া একদা যে এই শহর ভাল লাগিয়াছিল, সেই অকৃতজ্ঞতার শোধ দ্বিগুণ আদায় করিয়া লইয়াছেন পল্লীজননী তাহাকে দুই দিনের জন্য ইন্দুদের দেশে লইয়া গিয়া।.........

একেবারে সন্ধ্যার মুখে সে উঠিবে উঠিবে করিতেছে এমন সময় সে যেখানে ছেলে পড়ায় সহসা সেই মনিবের সহিত সাক্ষাৎ। আর যেখানেই হউক্ গোলদীঘির মত স্থানে সে তাঁহাকে দেখিবার আশা করে নাই, খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে সে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না।

কথা তাহাকে কহিতেও হইল না, দেবেশবাবু নিজেই কথা কহিলেন, সশব্দে পাশের বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, ইস্, এই সবে ফাগুন মাসের প্রথম, এইতেই ঘামিয়ে দিলে! আর শালা কাপড়ের দোকানে ভীড়ও কি তেমুনি! অতখানি গুঁতোগাঁত ক'রেও ঢুকতে পারলুম না!

অমল এবার সাহসে ভর করিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কাপড় কিনতে এসেছিলেন বুঝি?

না, মসলা কিনতে! কাপড়ওলার দোকানে আবার কী কিনতে ঢোকে হে ছোক্‌রা!......ইস্ কাল-ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে!

অমল সভয়ে চুপ করিয়া গেল। দেবেশবাবু কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়াই তাহার দিকে মনোযোগ দিলেন, সেই অস্পষ্ট আলোতেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখটা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, তারপর মাস্টার, বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া হ'ল? পড়াতে যাওনি যে আজ? আজ অবধি ছুটি নেওয়া ছিল বলে ছুটিটা পুষিয়ে নিচ্ছ, না?......ভাল, ভাল।

ই'হার কাছে কোনরূপে প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করাই আহাম্মুকি তাহা অমল জানিত, তবু সে একবার কহিল, আজ্ঞে না, এই কিছুক্ষণ আগেই এসেছি মোটে—

তিনি বিরাট এক হাস্য করিয়া কহিলেন, ওহে আমরাও জানি, জানি! চাকরি করার আগে আমিও তিনটি বচ্ছর ছেলে পড়িয়েছি; একবার ছুতো পেলে আর ও মুখোটি হতুম না!......যাক্ গে, যাওনি ভালই করেছ, পচারা আবার কাল মামার বাড়ী গেছে কাল বিকেলে ফিরবে, কাল পর্যন্ত তোমার ছুটি! ও হতভাগার কিচ্ছু হবে না, বুঝলে মাস্টার, শুধু শুধু অদেষ্টে আছে কতকগুলো অর্থদণ্ড, তাই হচ্ছে!

অমল কহিল, মাথাটা ওর ত খুব খারাপ নয়, তবে মোটে পড়ায় মন দেয় না এই যা, একটু মন দিলেই করতে পারে। আপনার ক্ষুদের মাথাটা কিন্তু বেশ সাফ্, ওর পড়াতেও বেশ মন। ওর future দেখবেন খুব ভাল হবে!

দেবেশবাবু প্রায় ধমক দিয়া উঠিলেন, গোবর, গোবর! আমার ছেলেমেয়ে আমি জানিনে? ও সব বেটা-বেটির মাথাতেই গোবর পোরা আছে, কিচ্ছু হবে না ওদের! হুঃ!!

মিনিটখানেক রুমালটা নাড়িয়া হাওয়া খাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, ওসব কথা থাক, এখন তোমার খবর বল! বলি কাজকর্মের কিছু হ'ল?

অমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, কিছুই হয় নাই। দেবেশবাবু কহিলেন, জানি আমি, যা দিনকাল পড়েছে কিচ্ছুটি হবার যো নেই! আমার ছেলেগুলোকে,ত তাই বলি মাস্টার, যতদিন আছি খা পাস খেয়ে নে, এর পর হয় ভিক্ষে করতে হবে নয় জেল খাটতে হবে!......তা দেখ মাস্টার একটা অল্প টাকার মাইনের চাক্‌রী খালি আছে আমার অফিসে, করবে নাকি?

নাকি? অমল একেবারে দেবেশবাবুর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, পাঁচটা টাকা পেলেও আমার জীবন রক্ষে হয় এখন, আমি এমন উপোষ ক'রে ক'রে আর পারি না।

দেবেশবাবু তাঁহার মোটা ভারি হাতখানা অমলের কাঁধে রাখিয়া কহিলেন, সবই বুঝি মাস্টার! বড় ছাঁপোষা মানুষ আমি, নইলে আমিই দুটাকা বাড়িয়ে দিতুম।

যে কাজটার কথা দেবেশবাবু উল্লেখ করিলেন সেটা তাঁহার অফিসেই, লাইব্রেরীর কাজ। এক ভদ্রলোক অফিসের কাজ করিয়া লাইব্রেরীর কাজ করিতেন কিন্তু তিনি একা আর পারিয়া উঠিতেছেন না বলিয়া সাহবকে ধরিয়া আর একটা লোক রাখিবার বরাদ্দ মঞ্জুর করানো হইয়াছে। লোক অবশ্য অফিসেরই কর্মচারীদের কাহাকেও উপরি রাখিবার কথা কিন্তু যদি দেবেশবাবুদের বড়বাবুকে ভাল মতে 'পাক্‌ড়ানো' যায় তবে তিনি হয়ত সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, ছুটির পরে অন্য বাবুদের দিয়া কাজ করানোর অপেক্ষা বাহিরের কোন লোককে ঐ মাহিনাতে পাওয়া গেলে অনেক সুবিধা হইবে।

দেবেশবাবু পরদিন তাহাকে অফিসে যাইতে বলিয়া যাইবার সময় আশ্বাস দিয়া গেলেন, কিচ্ছু ভেবো না মাস্টার, সে আমি বড়বাবুকে এ্যায়সা পাক্‌ড়ান্ পাক্‌ড়াবো যে আর 'না' করতে পারবে না। আর বড়বাবু ভিজলেই সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে যাবে, শালা ছোট সাহেব ত ওর কথায় ওঠে বসে!

তিনি পুনশ্চ কাপড়ের দোকানের দিকে যাত্রা করিলেন কিন্তু অমলের সেদিন রাত্রে ঘুম হইল না। আশা ও আশঙ্কায় সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া অমল অপেক্ষা করিতে লাগিল শুধু ঘড়িতে এগারটা বাজার, কারণ দেবেশবাবু তাহাকে বারোটার সময় হাজির হইতে বলিয়া দিয়াছেন। মাত্র বারোটাকা মাহিনা, কিন্তু তাহা হউক্, মাসিক পনেরটা টাকা আয় হইলেও সে অন্তত একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। সুখে থাকিবার আশা সে আর করে না, স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারাই এখন তহার কাছে সুদূর কল্পনা!

অবশেষে বারোটাও এক সময়ে বাজিল। অফিসের বাবুদের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা তাহার দিল্লীতেই হইয়াছিল কিন্তু তবু সে এখানকার ব্যাপারগতিক দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিল না। অধিকাংশ বাবুই নিজেদের স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া আড্ডা দিতেছেন, যাঁহারা নিজেদের 'সীটে' আছেন তাঁহাদের অবস্থাও বিশেষ খারাপ নয়, অপেক্ষাকৃত যাঁহারা প্রবীণ তাঁহারা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, ছোক্‌রার দল লাইব্রেরী হইতে আনা প্রকাণ্ড নভেল কিম্বা অতি আধুনিক নাটকে মন দিয়াছে। অত বড় হলটার মধ্যে যাঁহারা ঠিক অফিসের কাজ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় পাঁচ ছয়ের বেশী হইবে না।

ঠিক সামনেই যে বাবুটি বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কি একটা লিখিয়া যাইতেছিলেন, বয়স কম দেখিয়া অমল তাঁহার ডেস্কের কাছেই গিয়া দাঁড়াইল কিন্তু কাছে গিয়া দেখিল, তিনি অফিসের কাগজ ব্যবহার করিলেও লিখিতেছেন বাঙলায় এক সুদীর্ঘ চিঠি। বোধ করি প্রেম-পত্রই হইবে, কারণ লেখক সহসা মুখ তুলিয়া উগ্রস্বরে কহিলেন, বাইরে লেখা রয়েছে দেখছেন না, No Vacancy—তবু ভেতরে কেন আসেন জ্বালাতন করতে?

অমল ভয়ে ভয়ে কহিল, আজ্ঞে না—

'আজ্ঞে না' আবার কি? এখানে চাকরী পেতে হ'লে বড়বাবুদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দরকার হয়, তা আপনার নিশ্চয়ই নেই, নইলে এমন ক'রে আমাকে জ্বালাতন করতে আসতেন না, একেবারে চাক্‌রী পেয়ে নিজের টুলে গিয়ে বসতেন! আগে বাইশ টাকা তারপর একেবারে বিয়াল্লিশ টাকায় 'কন্‌ফার্মেশন্'!......ঐ যে 'নো ভেকেন্সি' বোর্ডটি দেখছেন, ওটি কমসে কম তের বচ্ছর টাঙ্গানো আছে, ওর মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে তিনশ' লোক নেওয়া হয়ে গেল, তবু শালা বোর্ড আর নড়ল না!......বাড়ি যান্ মশাই, বাড়ি যান! কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করবেন, এখানে এমনি যদি এসে সুবিধে হ'ত তাহ'লে আর আমার ভাইটা এতদিন বসে থাকত না!

বাধা দেওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা জানিয়া অমল এতক্ষণ চুপ করিয়াই শুনিয়া যাইতেছিল। এইবার বক্তৃতা বন্ধ

হওয়াতে প্রায় মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, আমি দেবেশবাবুকে খুঁজছি।

ভেংচি কাটিয়া ভদ্রলোক জবাব দিলেন, দেবেশবাবুকে খুঁজছি!......তা আমি কি করব? আমি কি Director General of Information? ভ্যালা জ্বালা হয়েছে এই এক দোরের কাছে সীট্ হয়ে, দুনিয়া শুদ্ধ লোকের ভগ্নিপতির খোঁজ দিতে দিতেই দিন চলে গেল! ছোঃ!...একটু স্বস্তিতে যে একখানা চিঠি লিখ্‌ব তার জো নেই!

বলিয়া, বোধ করি অমলের উপরে রাগ করিয়াই অতখানি লেখা চিঠিটা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে দেবেশবাবু কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, মাস্টার ইন্দরের কাছে আমার খোঁজ করছিলে বুঝি? আর লোক পেলে না জিজ্ঞেসা করবার বাবা! ইন্দর বুঝি আজ টিফিনের আগেই বৌকে চিঠি লিখতে শুরু করছিলে?

তারপর গলাটা নীচু করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বৌ বুঝি মাস তিনেকের জন্যে চেঞ্জে গেছে, তা তাকে রোজ একখানা ক'রে চিঠি দেওয়া চাই, সেই সময়ে কেউ এসে পড়লে আর রক্ষে নেই, একেবারে তেলে-বেগুনে! ......অফিসের কাজ-কর্ম এই তিন মাস একদম বন্ধ আর কি!

ইন্দ্রবাবু সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি রাগে তোৎলা হইয়া গেলেন, দে-দেখুন দ্-দেবেশবাবু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

দেবেশবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, আমি কিছুই বলব না দাদা তবে এই বাবুটি যে বড়বাবুর কে তা-ত জান না, কথাটা যদি কানে ওঠে তাহ'লে ছোটসাহেব ডেকে তোমাকে মোয়া খাইয়ে দেবে'খন। যত বলি ইন্দর বৌকে চিঠি লেখা একটু কমাও, তা-ত শুনবে না—

দেবেশবাবু অমলের হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে চলিতে শুরু করিলেন কিন্তু অমল তাহারই মধ্যে একবার ইন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেল, যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িয়াছে, সে মানুষটিকে আর চিনিবার উপায় নাই!

দেবেশবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া দিলেন, ঐ ওধারের বড় টেবিলটা দেখছ, ঐ যে টেলিফোন রয়েছে—হ্যাঁ, উনিই আমাদের সেক্‌শনের বড়বাবু; দূরে থেকে চোখাচোখি হ'লেই একটা নমস্কার করবে আবার কাছে গিয়ে আর একটা। নমস্কারগুলো বেশ দেখিয়ে করবে, এমনভাবে ক'রো না যেন যে তুমিও করলে অথচ উনিও দেখতে পেলেন না!

তাহাকে দুইবার নমস্কার করিবার উপদেশ দিলেও দেবেশবাবু নিজে বোধ হয় ঐটুকুর মধ্যে বারচারেক নমস্কার সারিয়া ফেলিলেন, তাহার পর কাছে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, এই সেই ছোকরাটি বড়বাবু, বড় ভাল ছেলে; দিন যা হয় একটা সদ্‌গতি করে এখন, আপনার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হলুম!

বড়বাবুর প্রতাপ যতটা, তাঁহার চেহারা তাহার ঠিক বিপরীত। মানুষটি যেমন বেঁটে তেমনি রোগা। ভদ্রলোকের মাথায় পাতা কাটিবার ধরণে টেরিকাটা, গায়ে অলপাকার কোট এবং সেই ফাল্গুন মাসেও পায়ে পশমের মোজা। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া অমলের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কলেজে পড়েছিলে?

অমল জবাব দিবার পূর্বেই দেবেশবাবু কহিলেন, রামচন্দর! ওর কি সেই অবস্থা? তা ছাড়া ও প্রায়ই বলে, দেবেশবাবু, চাকরী করেই যখন খেতে হবে, তখন আর বি-এ এম-এ পাশ করে কি হবে মিছিমিছি?

বড়বাবু যেন প্রসন্ন হইলেন বলিয়াই বোধ হইল। কহিলেন, তবু ভাল! বি-এ পাশ করে যে আমাকে জ্বালাতে আসেনি এই আমার বাবার ভাগ্যি! বুঝলে দেবেশ, মুখ্যু হয়ে যারা আসে তবু তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি ক'রে নিতে পারি, আর ঐ তোমার যাঁরা বি-এ পাশ, কোন জন্মে ওদের অফিসের কাজ শেখাতে পারবে? ওরা এক একটি আস্ত বাঁদর তৈরি হয়ে আসে!

দেবেশবাবু মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, ঠিক কথা! এই দেখুন না কেন আপনি ত সেকালের এণ্ট্রেন্স পাশ, আপনি যেমন করে অফিসের কাজ চালিয়ে গেলেন, পারচেজ সেকশানের বড়বাবু একদিনও তা পারলে! আজ এখানে ভুল, কাল ওখানে গল্‌তি লেগেই আছে। অথচ শুনি ত ওধারে এমেতে ফার্স্ট না কি হয়েছিলেন!

বড়বাবু এবারে হাসিলেন। কহিলেন, অত কথায় কাজ কি দেবেশ? এই ত তুমি, তুমি ত ম্যাট্রিকটা পাশও দাওনি, অথচ তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে যেমন আমি নিশ্চিন্ত হই, তেমন কি আর কাউকে দিয়ে হতে পারি? রাধেমাধব! বি-এ পাশ!...হুঁ!! এই দেখনা মুকুন্দ, মুকুন্দ কাল একটা চিঠির ড্রাফ্‌ট্ করে নিয়ে এল, আমার বড় তাড়া ছিল বলে দেখতে পারলুম না, একেবারে সাহেবের কাছেই পাঠিয়ে দিলুম, ভাবলুম ইংরিজিতে 'অনার' ওলা ছেলে ওসব, আর যাই হোক ভুল করবে না। ওঃ হরি, ছোটসাহেব ডেকে শুধু আমাকে বললেন, আজই মুকুন্দকে এক মাসের নোটিশ দাও, অমন কেরাণীতে দরকার নেই।

ছোট ছোট চোখ দুইটি যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া দেবেশবাবু কহিলেন, বলেন কি? একেবারে নোটিশ দিতে বললে?

বলবে না? একটা চিঠিতে সাতাশটি ভুল!...মুকুন্দকে ডেকে চিঠিটা দিয়ে বললুম মুকুন্দ, এসব কি? তাই কি ভুল বুঝতে অবধি পারে, বলে কেন বড়বাবু ঠিকই ত আছে গেল তোরই চাক্‌রী, আমার কি?

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমলকে প্রশ্ন করিলেন, সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে ইংরিজীতে কথা কইতে পারবে ত?

দেবেশবাবু তাঁহার জুতার ডগাটা দিয়ে সজোরে অমলের পা মাড়াইয়া দিলেন। অমল জবাব দিল, আজ্ঞে বোধ হয় পারব না, সাহেবদের সঙ্গে কথা কওয়া ত অভ্যেস নেই!

বড়বাবু আবারও হাসিলেন। মুখে তাঁহার বরাভয়

কিন্তু কণ্ঠে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া কহিলেন, তাও পারবে না? মাটি করেছে, আচ্ছা দেখি কি করতে পারি—

তিনি ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেবেশবাবু অমলের পিঠে চাপড় মারিয়া কহিলেন, আর ভয় নেই মাস্টার, চাকরী তোমার হয়েই গেলো ধরে রাখো—

তাঁহার অনুমান যে মিথ্যা নয় তাহা মিনিট দশেক পরেই বোঝা গেল, বড়বাবু উদ্ভাসিত মুখে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, যাক্—সেয়াল বাঁহাতি করে বেরিয়েছিলে বটে, সাহেব বললে, তুমি যখন রেকমেণ্ড করছ বাবু, তখন আর আমি কি দেখব, যাও একেবারে বসিয়ে দাওগে—

দেবেশবাবু সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, সে ত আমি জানতুমই স্যার, সাহেব আর কবে আপনার ওপর কথা বলেছে?

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বড়বাবু জবাব দিলেন, না, সাহেব আমার তেমন নয়, যদি দিনকে রাত বলি তাহলেও একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখবে না, সত্যি কি মিথ্যে! যাও তাহলে দেবেশ, ভাল করে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে একেবারে ওকে লাইব্রেরী ঘরে বসিয়ে দাওগে—

দেবেশবাবুকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না, তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া সোজা লাইব্রেরীতে লইয়া গেলেন এবং অফিসেরই একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন, লেখ দেখি মাষ্টার একখানা দরখাস্ত, মোদ্দা সব যেন ঠিক ঠিক লিখ না, অন্তত গোটা ছয়েক ভুল যেন থাকে—

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, ভুল? ভুল থাকবে?

দেবেশবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ঐ বানান ভুল, গ্রামার ভুল সব মিলিয়ে অবিশ্যি! এমন ভুল রাখবে যেন বড়বাবু ধরতে পারেন।

তাহার পর কহিলেন, এ একরকম মন্দ হল না মাষ্টার, কাজ এমন কিছু নয়—অফিসের লাইব্রেরী, তুমিও যেমন, ওর কি মা বাপ আছে? ও আপনিই চলে—

দরখাস্ত লিখাইয়া লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এতক্ষণে অমল তাহার নূতন অফিসের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর পাইল। অনেকগুলি আলমারী, বইয়েরও অভাব নাই। অভাব সেগুলির ভাল রকম রক্ষণাবেক্ষণের শুধু। বই যেগুলি ফেরৎ আসিয়াছে, তাহাদের কোনখানিই পুনরায় আলমারীতে ঢোকে নাই, মেঝের উপর স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে। অমল সেইগুলি নম্বর মিলাইয়া পুনরায় আলমারীতে তুলিতে তুলিতেই অফিসের ছুটির সময় হইয়া গেল। এইবার আসিলেন স্বয়ং লাইব্রেরীয়ানবাবু। ঘরে ঢুকিয়াই কহিলেন, তুমিই নতুন এ্যাসিস্ট্যান্ট এলে বুঝি হে? কতটি দিতে হল বড়বাবুকে?...যাক্ থাক বলতে হবে না, আন্দাজ করে নিতে পারব'খন্—

তাহার পর চেয়ারে বসিয়া টেবিলটায় পা তুলিয়া দিয়া কহিলেন, বইগুলো ভুল নম্বরে তুলছ না ত হে? শেষকালে আর খুঁজে পাবে না, বেয়ারাটাকে ডেকে নাওনি কেন, ও সব জানে শোনে। আমি আর ও আলমারীতে তুলি না, বাবুদেরই বলি বেছে নিতে—

তাহার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া কহিলেন, কোনটায় কি আছে দেখে শুনে রাখ ভাল করে, আর পার যদি ত Missing List একটা তৈরী করো। ধীরে সুস্থে করলেই চলবে, এমন কিছু তাড়া নেই।...দাও দিকি আমাকে একখানা ভাল দেখে বই বেছে—যা হয় হলেই হবে। আমার গিন্নীকে বই জোগানো ভারী সুবিধে, তিনি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যান, এক বই তিনবার নিলেও অসুবিধে হয় না—

মিনিট পাঁচেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজ আর কেউ বই নিতে আসবে না, আজকে আমাদের মিলিয়ে তোলবার ছুটি। আমি তাহলে চল্লুম, তুমিও বরং আজ বাড়ি যাও, কাল যা হয় করো—

তাহার পর গলা নামাইয়া কহিলেন, মোদ্দা একটা কথা সাফ বলে দিচ্ছি, এখানে যদি বনিয়ে কাজ করতে চাও তাহলে আসছে মাসের মাইনে থেকে পাঁচটি টাকা আমাকে দিতে হবে। আর যদি না দাও কিম্বা ঐ দেবেশ হতভাগাকে বলো, তাহলে কিন্তু তিনটি মাসও টিকতে পারবে না তা বলে দিলুম—

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অমল পাথরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার কাজে মন দিল। মোটে বারটি টাকা মাহিনা, তাহার মধ্য হইতেও পাঁচটি টাকা চলিয়া গেল!

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা কাজ করিবার পর বেয়ারাকে চাবী দিতে বলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইন্দ্রবাবু তখনও পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া বোধ করি তাহারই অপেক্ষা করিতেছেন। কাছে আসিতেই হাত কচলাইয়া কহিছেন, কী দাদা, কাজ সারা হল, বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি? চলুন আমিও যাব ঐ পথে—

তাহার পর প্রায় ফটকের কাছাকাছি আসিয়া সহসা অকারণেই অমলের কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন, ন'মাস প্রেগন্যান্সির পর পড়ে গিয়ে মরা ছেলে ডেলিভারী হল, যমে মানুষে টানাটানি—ডাক্তার বললে এর পরেও যদি চেঞ্জে না পাঠাও তাহলে তোমার নামে ক্রিমিনাল কেস করব। শালাদের কাছে ছুটি চাইলুম, শালারা ছুটি দিলে না, বললে 'তোমায় স্পেয়ার করা চলবে না'! সেটা কি আমার অপরাধ?

অমল তাঁহার মূল বক্তব্যের আভাষমাত্র না পাইয়া কতকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ইন্দ্রবাবু তখন নিজেই আবার সুরু করিলেন, অগত্যা আমাকে চেঞ্জে পাঠাতে হ'ল: একা তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেই বিদেশ-বিভুঁয়ে পড়ে, কাজেই আমাকে দৈনিক খবর নিতে হয়।......আছে অবিশ্যি আমার ছোট শালা, কিন্তু সে মানুষ বললেও চলে ভূত বললেও চলে।...যদি বলবেন যে 'চিঠি ত রোজ আসে না তোমার নামে—তুমিই বা রোজ লেখ কেন'—আচ্ছা সে রোগা মানুষ, রোজ কখনও চিঠি লিখতে পারে? কিন্তু আমার চিঠি না পেলেই ভয়ঙ্কর ভাবতে সুরু করবে, তাতে 'চেঞ্জ' হওয়া ত চুলোয় যাক আরও রোগ বেড়ে যাবে। বুঝলেন না?

এতক্ষণে অমল যেন আঁধারে কুল পাইল। সে কহিল, ঠিকই-ত! অকারণে ভাবানো উচিত নয়—

(শেষাংশ ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

ভবানী পাঠক

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, যিনি স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস নামেই বেশী সুপরিচিত, তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন আজও রয়েছে।

আমরা জানি কবি গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন। তাঁর জীবন বহু ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা ও বেদনার একটা আখ্যায়িকা।

সহস্র সহস্র দেশের মানুষ তাঁর মত মন্দভাগ্য ও নির্যাতন বরণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। এর মধ্যে স্মরণ করার মত কিছু নেই। বর্তমান সমাজের এই স্বভাব, যুগের এই বিকার আজও নিরাময় হয় নি। বহু গোবিন্দ দাসের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে আমাদের রাষ্ট্র সমাজ সম্পদ ও নীতির মূঢ়তা ও অনাচারে।

কিন্তু এরই মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম গোবিন্দ দাসকে—সেটা সৌভাগ্য। সেটা স্বাভাবিক প্রাপ্তি নয়। সেটা আকস্মিক। কবি গোবিন্দ দাস আর পাঁচজনের মতই বিদায় নিয়েছেন—কিন্তু যাবার আগে আমাদের বাঙলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিভা চিহ্নিত করে গেছেন। যার ফলে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। মানুষ হিসাবে তিনি অসাধারণ কিছু ছিলেন না। তিনি নগণ্য সাধারণের একজন ছিলেন। কিন্তু প্রতিভা হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। তাঁর এই প্রতিভার কাছে আমরা ঋণী। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর সময়ে কবি আরও অনেকে ছিলেন। কিন্তু কবি হিসাবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

কি কারণে তাঁকে অনন্যসাধারণ বলা যেতে পারে? তিনি তো কোন বড় ছান্দসিক ছিলেন না। ভাষাকে কোন নূতন অলংকারে ঐশ্বর্যবান তিনি করেন নি। তিনি মহাকাব্য লেখেন নি। তিনি ডজন ডজন বই লেখেন নি। তিনি Scholar ছিলেন না। তবে কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল যার জন্যে আজও আমরা তাঁকে স্মরণ করতে উদ্যোগী।

সত্যি কথা, তিনি এসব কিছুই ছিলেন না। কিন্তু তিনি কবি ছিলেন—একেবারে ষোল আনা কবি—নিরঙ্কুশ কবি। কাব্যের প্রাণবস্তু যা ভাবের সহস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা—যা আমাদের মনের প্রান্তরে প্রান্তরে মেঘ রৌদ্রের মায়াজাল সৃষ্টি করে, সম্মোহিত করে, সহজ হবার অবকাশ দেয়, তিনি তারই পরিবেষক ছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভার উৎস, তাঁর বিচার দৃষ্টি ছিল অনিরুদ্ধ ও অনাবিল। তত্ত্ব বুদ্ধি ও বৈদগ্ধের ভীড় সেখানে ছিল না। আবেগ দিয়েই তিনি যাচাই করে গেছেন সৎ ও অসৎ। নীতিতত্ত্বের লৌকিকতার কোন অনুশাসনের ক্রীতদাস তিনি ছিলেন না।

এই কারণে সেকালের অভিজাত সাহিত্যিকের আসরে তাঁকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কালের কষ্টি পাথরে অনেক সত্যি মিথ্যে, খাঁটি আর ভুয়ো যাচাই হয়ে যায়। আজ ঠিক ঐ কারণেই কবি গোবিন্দচন্দ্রকে আমরা সাহিত্যের আসরে শুধু পাংক্তেয় করে নিয়েছি তা নয়—তাঁকে উচ্চাসনে স্থান দিচ্ছি।

এর কারণ আর কিছুই নয়। আধুনিক কাব্যসাধনায় আমরা আজ যে লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি, সে সাধনায় কবি গোবিন্দ দাসকে আমরা পাচ্ছি সতীর্থ সহযোগীর মতন। সেকালের গোবিন্দচন্দ্র আজকের দিনের কাব্যিক সাধনায় পুরশ্চরণ করে গেছেন। এ সাধনায় আমরা তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ অনুভব করছি।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্য, উপমা দিয়ে বলতে গেলে বনশ্রীর মত। একটু crude, একটু কর্কশ—লতা গুল্ম ফল ফুল কণ্টক বন এলোমেলো ঝড় বাতাস, পাখীর ডাক—কিন্তু সব মিলিয়ে একটা স্বভাবজ শব্দে বর্ণে গন্ধে শ্যামল প্রাচুর্যে নিসিক্ত তাঁর কাব্য। কিন্তু যা আছে সবটাই খাঁটি। কলম-চারা দিয়ে সাজানো বাগানের যত্নকৃত সৌকর্য এর মধ্যে নেই। এই জন্যেই বোধ হয় তাঁকে স্বভাব কবি বলা হয়।

তাঁর 'ফুলরেণু' নামে কবিতা পুস্তক থেকে কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করা হলো। এ কবিতাগুলি সবই আজ থেকে প্রায় ৫২।৫৩ বৎসর পূর্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথের ৫২।৫৩ বৎসর পূর্বের লেখা কবিতার দীপ্তি আমাদের আজও বিমুগ্ধ করে। এ কবিতা আমরা বিস্মৃত হইনি এবং হচ্ছিও না। কিন্তু জানি না গোবিন্দ দাস কি কারণে ফুলরেণুর কবিতাকে চাপা দিয়ে রেখেছি। টেকনিকের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যের' কবিতাগুলির সঙ্গে এ কবিতাগুলি সমতুল্য। তবে নৈবেদ্যের ভাষা 'ফুলরেণুর' চেয়ে কিছুটা বেশী শালীনতা সম্পন্ন। অপরদিকে 'ফুলরেণুর' কবিত্ব 'নৈবেদ্যের' কবিত্ব থেকে সত্যি সত্যিই অনেকটা অগ্রসর এবং ভাষার মধ্যে lyric সৌন্দর্য অনেক বেশী।

'সুপ্রসন্ন শ্বেতপদ্ম বদন বিমল
কালীয়দহের ঢেউ আঁখি মনোচোরা
পুষ্পিত ললাটে ভুরু বঙ্কিম উজ্জ্বল
ভুজঙ্গ বেষ্টিত যেন কুসুমের তোড়া।'

*   *   *   *   *

'তুমি আর আমি দোঁহে তুমি আর আমি
আবার ভাসিয়া গেছি দূরে দুইজন,
তুমি আর আমি দোঁহে তুমি আর আমি
তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরি দুইটি স্বপন।'

*   *   *   *   *

'বচনে অমৃত তব, অমৃত অধরে
স্বর্গীয় অমৃতগন্ধে দেহ সুবাসিত
সকল ইন্দ্রিয় আজ একত্রিত করে
নয়নে করিব ভোগ 'কর না বঞ্চিত।'

*   *   *   *   *

'আমি এ পুরুষ আর সরলা এ নারী
পাপে পুণ্যে আছি পথে দেখা দুজনারি।'

*   *   *   *   *

ভুলিয়াছ তুমি বটে, তুমি গিরি নদী,
নিত্য বহ নবস্রোতে নব স্থান দিয়া
বালুতে আঁকিয়া তব তরঙ্গ আধি,
আমি শুষ্ক স্রোতচিহ্ন রয়েছি পড়িয়া।

*   *   *   *   *

প্রভাত পলাশে দেখি তাহারি অধর
শরৎ প্রভাতপদ্মে সেই যেন হাসে
শিহরিয়া উঠে মোর শ্লথ কলেবর
সে যখন গায় পড়ে বসন্ত বাতাসে
বন থেকে সে আমারে কুহুরবে ডাকে
তাহারি গায়ের গন্ধ পাই বেলি বাসে

*   *   *   *   *

তাহারি মমতামাখা মিঠামিটি চাওয়া
নিশির শিশির ভরা তাহারি নয়ন
তাহারি সলাজ আঁখি দিনে নিভে যাওয়া
তারি মান নব ঘন চুরি করা মন

*   *   *   *   *

যাদেরে দেবতা বলি দিয়াছিনু স্থান
তারা তো দেবতা নহে করিয়াছি ভুল।

সেকালের বায়ুমার্গচারী অতি নৈতিক সমালোচক প্রবরেরা গোবিন্দ দাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন। কবি গোবিন্দ দাসও তাদের শ্লেষবাণে বিদ্ধ করতে ছাড়েনি। শ্লেষালঙ্কারে তাঁর Irony পটুত্বের নমুনা দেওয়া হলোঃ—

'কুরুচি-আতঙ্কে ক্ষিপ্ত সুরুচির স্বান
দংশিবারে সদা তারে করে আস্ফালন
গর্জনে কাঁপায় বঙ্গকাব্যের উদ্যান
সশঙ্কের কবিতাবালা সঙ্কুচিত মন
কবি কহে কবিতা গো ভয় কর দূরে
রুচি ফোবিয়ায় আমি ফরাসী পাস্তুর।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'ফুলরেণু' পড়লে এর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য কাব্যরসিককে হঠাৎ চমকিত করবে। তাঁরা এর মধ্যে একটা আবিষ্কারের আনন্দ পাবেন। যা বাঙলা সাহিত্যে একান্ত অভাবনীয় বলে মনে হতো তারই অপূর্ব অদ্ভুত সমারোহ রয়েছে এর ভেতর। যে কারণে গোবিন্দ দাসকে আজ আমরা বড় কবির আসনে বসাতে চাই তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় এই কবিতা পুস্তকে। গোবিন্দ দাসের প্রতিভার যত কিছু বৈশিষ্ট্য, তাঁর নিজস্বতা বা মৌলিকতা ও তাঁর কবিত্বের বিদ্যুৎঝলক এর পাতায় পাতায় পংক্তিতে পংক্তিতে ভরা।

ইরাণের কবি ওমর খৈয়ামের কথা সকলেই জানেন। ইংরেজীতে তাঁর রুবাইগুলো অনুদিত হবার পর বিশ্বময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এ এক নূতন প্রেমদর্শন (love's philosophy); আবেগপ্রধান ও sensuous। কিন্তু বিশ্ববাসী অমৃত বচনের মত ওমর খৈয়ামের রুবাই পান করে আনন্দ পেয়েছে। তার কারণ এর মধ্যে তাত্ত্বিক মস্তিষ্কদর্প—সুরুচি শুষ্ক নীতিশ্লোক নেই। প্রাত্যহিক জীবনের ধূলিধূসরতার মধ্যে ওমর খৈয়ামের কাব্য পাঠকের চোখে ক্ষণিকের জন্য তুলে ধরে গোলাপ বাগিচার ছায়াগন্ধ বুলবুলের গানে ভরা এক টুকরো আনন্দের জগৎ। মানুষ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। আবেগ এখানে বাধাহীন—অন্তর পেয়েছে মর্যাদা। আশ্চর্যের বিষয় ওমর খৈয়াম যখন আমাদের কাছে এত আদর পেয়েছে —গোবিন্দ দাসের ফুলরেণু কেন পেল না? ফিটজারাল্ড ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করলেন—তাকেই আবার আধুনিক বাঙলা ভাষার চটুল শব্দের ঘুঙুর পরিয়ে আমরা বিমুগ্ধ হয়ে শুনেছি। কিন্তু যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখবেন 'ফুলরেণুর' ঐশ্বর্য, এর love's philosophy বাঙলা সাহিত্যে অভিনব এবং অদ্বিতীয়। এর শব্দ ভাব ভাষা, এ একেবারে indigenous—বাঙলার মাটীর সুরে মাজা। গাঙ্গেয় জোয়ারের মত এর আবেগ। ইরাণের পক্ষে ওমর খৈয়াম যা—বাঙলার পক্ষে গোবিন্দ দাসও তাই। আজ যদি কেউ কবির নামটি না উল্লেখ ক'রে তাঁর 'ফুলরেণুর' কবিতাগুলোকে আধুনিক প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করতো, তা হলে সাহিত্যরসিক মহলে নিশ্চয়ই একটা খোঁজ খোঁজ রব পড়তো।

আবেগ প্রধান sensuous গুণবিশিষ্ট কবিতা অনেক কবি লিখেছেন। গোবিন্দ দাসের 'ফুলরেণু'ও তাই। তবে এটী সম্পূর্ণ বিশিষ্ট। এ প্রেমের আদর্শে অতীন্দ্রিয় mysticism এর স্থান নেই—সুফী বা বৈষ্ণব পরকীয়া, অথবা ভারত-দাশরথি ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যের স্থূলে sensuous উল্লাস এর মধ্যে নেই। কবি গোবিন্দ দাসের নর ও নারী সম্পূর্ণ তাঁর নিজের প্রতিভার সৃষ্টি। তিনি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে দেখেছেন এ সৃষ্টি রহস্যকে। এ love's philosophy অপ্রতিম ও অদ্বিতীয়। এ কথাটাই আমাদের আজ নূতন করে জানতে হয়েছে। 'ফুলরেণুর' যে কয়েকটি পংক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে

তারই মধ্যে কবি গোবিন্দ দাসের প্রেম সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টি ও ব্যাখ্যার আভাষ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব প্রেমাদর্শ থেকে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

নিছক তত্ত্বমূলক সমস্যা, ধর্ম, স্বদেশ অনেক কিছু নিয়ে তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন। কিন্তু সে সবের মধ্যে আমরা শিল্পী গোবিন্দ দাসকে পাই না। তার মধ্যে তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি কিছুই হয় নি। তবুও কবিত্বশক্তিতে সেগুলি শক্তিমান—তাঁর 'বরষার বিল' কবিতাটি বাঙলার নিসর্গের একখানি নিখুঁত অঙ্কন। এর তুলনাও খুব কম আছে।

গোবিন্দ দাসের অজস্র কবিতার পদ উদ্ধৃত করতে পারা যায়—যা থেকে তাঁর কবিত্ব প্রতিভার পরিমাপ সম্ভব।

বিশেষ কোন্ দিক দিয়ে এবং কি গুণে তিনি বাঙলা কাব্য সাহিত্যকে রসাঢ্য ক'রে গিয়েছেন, 'ফুলরেণু' প্রসঙ্গেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন প্রয়োজন গোবিন্দ দাসকে আজ সাহিত্যের আসরে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে আবার প্রতিষ্ঠিত করা।

এ সম্বন্ধে সত্যিকার কাজের দুটি প্রস্তাব করা যেতে পারে। প্রথম—গোবিন্দ দাসের 'ফুলরেণু' জাতীয় নূতন 'প্রেমদর্শন'মূলক কবিতাগুলিকে একত্র ক'রে যদি একটি পুস্তক কেউ প্রকাশিত করেন, তবে আশা হয় গোবিন্দ দাসের মর্যাদা আর তার সঙ্গে সৎসাহিত্যের মর্যাদা এবং বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—কবি গোবিন্দ দাসের এমন অনেক কবিতা আছে যাকে আমরা সংগীতে স্থান দিতে পারি। প্রকৃত গুণী ও সুরকার যদি তাতে সুরযোজনা করেন, তবে আমাদের বিশ্বাস তা এতই উপভোগ্য ও মনবিমোহন হবে, যাতে গোবিন্দ দাসের আসন আবার সাহিত্যের দরবারে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অনুদার রুচিবাতিক আভিজাত্যের ষড়যন্ত্র তাঁকে একদিন নগণ্যতায় ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, সেই অপরাধের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত সাধন হবে। কবির 'ছুঁয়োনা' নামে একটি কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। এ কবিতায় সুর সংযোগ করলে তা কতটা রূপপ্রবণ হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়।

ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন
লাগিলে গায় গায়
সহজে ভেঙে যায়
রাখ হে ভালবাসা বাসনা হীন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন
থাকিলে দূরে দূরে
পাবে ভুবন জুড়ে
দেখিবে সদা তারে নিতি নবীন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন.
কিছুই চেয়ো নাকো
কেবলি দিতে থাক
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর ঋণ
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন
পরশে হয় কালা
দরশে বাড়ে জ্বালা
মানসে ফোটে শুধু প্রেমমলিন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।

যে বিখ্যাত ইরাণী কবি ওমর খৈয়ামের সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্রের তুলনা করা হয়েছে তা কতদূর সঙ্গত ও সত্য তার প্রমাণে কবির একটি কবিতার পদ উপসংহারে উদ্ধৃত করা হোল। তাঁর কাব্যদর্শন Key-note-এরই মধ্যে সংক্ষেপে নিহিত।

বৈজয়ন্তী কাব্যে—মাঘে কবি বলেছেন,—
স্মরণে অনন্ত পুণ্য মরণে উল্লাস
আমি পাপী—আমি আর কিছুই না জানি
দগ্ধবুকে শত মুখে বহে বার মাস
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি পা দুখানি।

মনে ছিল আশা

(২২২ পৃষ্ঠার পর)

সোৎসাহে ইন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, এই দেখুন, আপনি ইয়ংম্যান, আপনি যেমন কথাটা বুঝলেন তেমন কি আর কেউ বুঝবে? অফিসের সব বাবুরা যেন এক একটি ঢেঁকি অবতার, পেছনে লেগেই আছে! কেউ মানুষ নয় বুঝলেন, সব জানোয়ার! আর ঐ দেবেশ শালা আরও বেশী—

বলিয়াই পরমুহূর্তে জিভ কাটিয়া বলিলেন, ইস্! কী বলতে কি বলে ফেললুম—দেবেশবাবু লোক ভাল, পেছনে লাগে বেশী ঐ কিঙ্করবাবু, সত্যকিঙ্কর!

তাহার পরই সহসা অমলের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া প্রায় কান্নার সুরে কহিলেন, দোহাই দাদা, বড়বাবুকে কিছু বলবেন না, তাহলে মারা যাব একেবারে। একেই ওর মেয়ের বিয়েতে পরিবেশন করব না বলেছিলুম বলে—মরুক গে, দাদা আপনি ইয়ংম্যান আমার দুঃখটা একটু বুঝুন, আর এই কুড়ি পঁচিশটে দিন, তারপরই আনিয়ে নেব—

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি চাপা দায় হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া অমল কহিল, না, না সেসব কিছু ভাববেন না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কাউকে কিছু বলব না—

ইন্দ্রবাবু অকস্মাৎ পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া অমলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, বহু ধন্যবাদ দাদা, না, না ও আমি শুনব না, ছোট ভাই সন্দেশ খেতে দিচ্ছে মনে করুন—

এবং পরক্ষণেই প্রতিবাদের অবসর মাত্র না দিয়া ইন্দ্রবাবু একরকম ছুটিয়া গিয়া একটা ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। টাকা দুইটা অমলের হাতের মধ্যেই রহিয়া গেল।

জননায়ক

গল্প

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

(১)

ছোট বেলার কথা মনে হইলে পার্থের হাসি পায়। জীবনের সে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ। কচি বাল্যের সারল্যময় ইতিহাসে ভরা ছোট ছোট এক একটি কাহিনী ঃ যাহার মধ্যে বাস্তবের কঠিন স্পর্শ নাই—কল্পনার রঙে যা পরিমিত প্রাচুর্য লইয়া নিজেই পরিপূর্ণ।

পরিপূর্ণ এবং একক।

তাহা ছাড়া আর কি! ঠাকুরমার কোলের কাছে চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া পার্থ শুনিত অচিন দেশের রাজকন্যার কথা। রূপে আর লাবণ্যে, উচ্ছ্বাসে আর বিহ্বলতায় রাজকন্যাকে ঘিরিয়া সুর আর ছন্দ। প্রাসাদ পুরীর বাহিরে তার শসস্ত্র প্রহরীর সতর্ক পাহারা। দ্বারের দেউড়িতে প্রহরের পর প্রহর কাটে—শান্ত্রী বদল হয়। নূতন আসে।

ভাবিতেও হাসি পায়। এমনি এক রাজকন্যাকেই বুঝি মনে মনে সে কামনা করিত। ইচ্ছে হইত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রের বেশে সেও যাইবে নিদ্রিত পুরীর সেই রাজকন্যাকে লইয়া আসিতে। ঘুমন্ত রাজকন্যার শিয়রে ঘৃতের প্রদীপ তেমনিই জ্বলিতে থাকিবে। ঘুমের ঘোরে রাজকন্যা কটির হেম মেখলা নাচাইয়া ওপাশ হইতে এপাশে ফিরিয়া শুইবে মাত্রঃ কেহ টেরই পাইবে না। আর টের পাইলেই বা কি! সে কি ভয় করে নাকি? হাতের ধারালো তলোয়ার তার ঝকঝক করিয়া উঠিবে—দেখিতে দেখিতে সৈন্য সামন্ত সব রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার পথ পাইবে না।

রাজকন্যা জাগিয়া বলিবে ঃ তুমি?

খুশীতে পার্থের মুখ আলোয় আলোময় হইয়া উঠিবে। বলিবে এবারে তাহলে চল আমার সাথে।

শিশু বাল্যের সেই সব কাহিনী মনে করিয়া পার্থের হাসি পায়। জীবনটা যেন চলিতে চলিতে অকস্মাৎ বালু চড়ায় ঠেকিয়া গিয়াছে। যেন মুহূর্তের এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাহাকে ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে ভূমিকম্প বুঝি তাহার নিজেরই সৃষ্টি। ইহার মাঝে রাজকন্যার স্থান কই। এই ত কয়েকদিন হইল সে বাহিরে আসিতে পারিয়াছে মাত্র। স্বদেশ হইতে বহুদূরে, পরিচিতের গণ্ডী হইতে দীর্ঘ ব্যবধানে সে ছিল এতদিন বন্দী। বন্দীশালার উপরের নীল আকাশও বুঝি সেখানে ছিল নূতন। তার পর বাহিরে আসিয়াছে। জনতার জয়ধ্বনি এবং বরমাল্য আর তাহার কাছে নূতন কিছু নয়, কিন্তু বলিতে গেলে এখনও মাটির পৃথিবীকে সে দুই চোখ ভরিয়া দেখিতেও পারে নাই। বহু মানুষের মাঝে, অথচ মানুষ হইতে দূরে—সতর্ক দৃষ্টির মাঝে—সকলের দৃষ্টির বাহিরে দিনের পর দিন তাহার কাটিয়াছে—চোখে মুখে এখনও তাহারই পরিচয়। সেই নীল রংয়ের বাড়িটাই যেন বেশী পরিচিত। লোহার বড় গেটটা দিয়া সোজা চলিতে চলিতে প্রথম বাঁকের বড় তেতালা বাড়িটার সব ঘরগুলি তার বিশেষ করিয়া জানা। লোহার শিক দেওয়া বড় বড় দরজা-জানালা-গুলি পর্যন্ত তার যেন বন্ধু। দীর্ঘ দিনের অন্তরীণের পর আজ পার্থের মুক্তি।

এ মুক্তি সে চাহিয়াছিল। সমস্ত মন দিয়া কামনা করিয়াছিল, হে ভগবান্! ক্ষণিকের জন্য শুধু বাহিরের নিঃশ্বাস লইতে আমায় দাও।

সে কামনা আজ তার পূর্ণ।

(২)

কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া রাজকন্যার কথা তবু তার মনে পড়ে। কাজলপড়া কালো দুটি চোখ বুজিয়া রাজকন্যা মাধবীবিতানে শুইয়া আছে! গোলাপকুঞ্জের পাশ দিয়া ফোয়ারা বাহিয়া জল পড়িতেছে, ও পাশে করবীবীথি আর হাসনাহানার গাছ ফুলে ফুলময় হইয়া উঠিয়াছে।

কোথায় গেল সে রাজকন্যা?

অচিনদেশের রাজকন্যা আবার কল্পনার রঙে আসিয়া দেখা দেয়। এ রাজকন্যারও তেমনি ঘন কৃষ্ণ একরাশ চুল। চোখে মুখে তৃপ্তির পরশ কে যেন ঢালিয়া দিয়াছে। কালো রঙের সেই শাড়ি পড়িয়াই বুঝি কুন্তলা তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে!

নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা।

তুচ্ছ নয় ত কি! কবে একদিন কুন্তলার সাথে তাহার পরিচয় হইয়াছিল, সে কথা পার্থকেও আজ হিসাব করিয়াই বলিতে হইবে। বাস্তবের ইতিহাসে তাহার দামই-বা আর কতটুকুন!

তবু আজ কুন্তলাকে বার বার তার মনে হইতেছে। কিন্তু পার্থকে আজ আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবার কি উদ্দেশ্যই-বা থাকিতে পারে। সেকি জানে না যে, পৃথিবীর সকল মানুষের শ্রদ্ধা যারা পায়, সংসারে কত অসহায় তারা। দূরে দাঁড়াইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে বুঝি-বা অভ্যর্থনা করা চলে, সহজ করিয়া আপন জন ভাবিতে কেহ চায় না যেন।

চাহিবেই বা কেন? রাজনীতির কঠিন আবর্তে পার্থ আজ জড়িত। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু মানবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাহাকে লইয়া প্রয়োজন ত কাহারই হইতে পারে না।

সেখানে সে পঙ্গু। সে অক্ষম।

তবু কুন্তলার আহ্বান সে দূরে ঠেলিয়া দিতেও যেন ব্যথা পায়।

কে জানে, কুন্তলা এখন কেমন হইয়াছে। কি দুষ্টুই না ছিল। মহকুমার সেই বড় পুকুরটার পাড়ে প্রকাণ্ড বাড়ি তখন কুন্তলাদের। অকারণে দুই কিশোর-কিশোরী আসিয়া সান বাঁধানো পুকুরের ধারে বসিত। কোথায় লিচু ফলিয়াছে, কামরাঙ্গা গাছের নূতন ইতিহাস মুখে মুখে গড়াইয়া যাইত।

কেহ জানিল না, একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমান্তরালে একটি গভীর পরিচয় ধীরে ধীরে তাহাদের মনে বাসা বাঁধিয়াছে।

সেই সব হারাইয়া যাওয়া দিনগুলি যেন নূতন করিয়া

পার্থের মনে হইতে থাকে। হিজলতলার দোলনা। বুড়ো বটগাছটার কাছে সেই গোলাছুট খেলা এক এক করিয়া মনে হয়।

হাসি পায় তার।

কিন্তু হাসিলে চলিবে না। এখানকার স্থানীয় নেতা সুরেনবাবু ঠিক পাঁচটায় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে ব্যবস্থা আছে। পার্থকে লইয়া সব জেলাগুলি পরিভ্রমণ চলিতেছে। ইহা নাকি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাবান্ নেতার পক্ষে একান্তই আবশ্যক। মহাত্মা গান্ধীকেও নাকি সফরে না গেলে চলে না। কিন্তু সে মহাত্মা নয়—কিন্তু জনতার কাছে তার মূল্যও কোন নেতার তুলনায়ইত কম নয়। তাছাড়া শীঘ্রই য়্যাসেমব্লির নির্বাচন। রাষ্ট্রনেতা পার্থের মনোনীত ব্যক্তিরাই যাহাতে নির্বাচিত হইতে পারে, সে জন্যেও সব জেলাগুলি পরিভ্রমণ আবশ্যক। নেতা যতই মানুষের চোখে চোখে থাকিবে, ততই সে পপুলার হইবে বেশী। খবরের কাগজে বুকিং চাই রোজ যদি কোন না কোন বিষয়ে তাহার নাম না ছাপা হয়, তাহা হইলে কালই যে সে ব্যাকডেট হইয়া উঠিবে।

পার্থ বোঝে সবই।

নগরের পর শহরের, শহরের পর মহকুমার—তারপর গ্রাম কিছুই বাদ যাইতেছে না। চড়কির মত তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। যেখানে যায় সেখানেই স্থানীয় লোকেরাই সেখানকার প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া দেয়। তাহার নাম লইয়া দিগন্ত মুখরিত হইয়া জয়ধ্বনি উঠিতে থাকে—ফুলের মালা, মালায় মালাময় হইয়া উঠে হাততালিতে আকাশের বাতাসও যেন মুহূর্তের জন্য প্রাণবন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। স্বপক্ষের দল বিপক্ষের দিকে এমনভাবেই তাকায় যেন দেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছে—আর স্বাধীন করিয়াছে তাহারাই।

(৩)

এখানেও পার্থ আসিয়াছে তাহারই জন্য। কুন্তলা এখানেই এখন থাকে, এ কথা যেন কোথায় কাহার নিকট শুনিয়াছিল—কিন্তু আসিবার সময় ফুলের মালার ভিড়ে সে কথা মনেও হয় নাই। কিন্তু নিমন্ত্রণ পত্রটা পাওয়া অবধি সে মন চঞ্চল হইয়া আছে। ঠিক নিমন্ত্রণও করে নাই। অতি সংগোপনে লিখিয়াছে।

লিখিয়াছেঃ হয়তো আমাকে আপনার মনে নাই। আপনার যশই শুধু শুনি। এখানে আসিয়াছেন শুনিলাম—কেমন আছেন জানিতে ইচ্ছা করে। আমি জানি আজ আর আপনার পক্ষে আমার এখানে আসিয়া দেখা করা সম্ভব নয়—না হইলে হয়তো আসিবার জন্যই অনুরোধ করিতাম—

পার্থ চুপ করিয়া ভাবিতে থাকে। স্পষ্ট করিয়া কুন্তলা কিছুই লেখে নাই। কি বলিতে চাহিয়াছে তাহাও বোঝা যায় না। কত পত্রই ত আজ পার্থের কাছে আসে। কিন্তু তবু যে কুন্তলার পত্র!

সকলের সাথে এক করিয়া ইহাকে ছোট করিলে সেই-ত দুঃখ পাইবে সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু পার্থ কি করিয়া বোঝাইবে যে তাহার প্রতিক্ষণ আজ জনসাধারণের। তাহাদের হিসাব করা রুটিন মত তাহাকে চলিতে হয়। একটি শহরে কোন মতেই দুই দিনের বেশী থাকিবার উপায় নাই। খাওয়া-শোওয়ার সময় বাদ দিয়া দিনের আর রাতের সর্বক্ষণ অন্যের হাতে। ইহার মধ্যে কুন্তলার স্থান কই?

কোথাও যাওয়া—কাহারও কাছে গিয়া দেখা করা এর মধ্যে যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু কেউ তাহাকে দিয়া দেখিতেই চায় না। তাহার মত জননায়ক কি বলিয়া কি উদ্দেশ্যে কেনই বা অখ্যাতনামা একটি মেয়ের সহিত দেখা করে! অসম্ভব।

কিন্তু তবুও যদি দেখা হয় তাহাকে দেখিয়া কি করিবে কুন্তলা। অনেকক্ষণ হয়তো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। কালো কালো চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিবে বুঝি।

বলিবেঃ ভাল আছ ত পার্থদা।

পার্থ হাসিবে মাত্র। কি উত্তর দিবে সে।

কুন্তলাও কি বলিবে ভাবিয়া পাইবে না। মনে মনে বোধ হয় ভাবিতে থাকিবেঃ এই সেই পার্থদা, সমস্ত দেশের যিনি জননায়ক।

তাহার সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে ভাবিয়া গর্বে তাহার বুক উঁচু হইয়া উঠিবে। অভিমানভরাকণ্ঠে হয়তো বলিতে চেষ্টা করিবেঃ কোন খোঁজই তুমি আমার নাও না পার্থদা।

অভিমান শুধু মনেই থাকিবে—বলিতে পারিবে না নিশ্চয়ই।

পার্থও কিছুতেই আগের মত করিয়া উত্তর দিতে পারিবে না। বন্দীশালার মাঝে সব লৌকিক কথা যেন আটকা পড়িয়া আছে। যতটুকু বাকী এখনও বা আছে তাহাও জননায়কের আবরণতলে আটকা। রসিকতা, অর্থহীন কোন শব্দ উচ্চারণ এত বড় জননেতার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

সভার শেষে শ্রান্ত পার্থ অতিথিগৃহের বড় বারান্দায় আসিয়া বসিল। সভায় লোক হইয়াছিল বিস্তর। বহু-কষ্টে এই মফঃস্বল শহরে লাউড স্পীকারও সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সামনের টেবিলটা ফুলের মালায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—আর মুহুর্মুহু সে কি করতালি।

কিন্তু পার্থের আজ বক্তৃতা দিতে ভাল লাগে নাই।

সভাপতি এ শহরেরই এক উকিলবাবুঃ আগেই শ্রোতাদের বলিয়াও দিয়াছিলেন যে আমাদের মহামান্য অতিথিকে বিদেশ ভ্রমণের ক্রমাগত ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে। আজ তাঁর শরীরটাও ভাল নয়। তাই বেশীক্ষণ বক্তৃতা করতে পারবেন না।

অবশ্য বিদেশে গেলে থাকা খাওয়ার কষ্ট পাইতেই হয় না। যেখানেই যান সেখানেই সেখানকার সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতেই তাঁহাকে অতিথি লওয়া হয়। এখানেও আছে সে তাই।

সভার পরও অতিথি গৃহে কর্মী ও নেতাদের আগমনের বিশ্রাম নাই। লোকাল পলিটিক্স, মিউনিসিপ্যালিটির
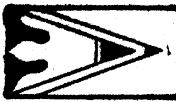
ব্যাপার, ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের ইলেকসান হইতে আরম্ভ করিয়া এস-ডি-ও পর্ব কিছুই বাদ যাইতেছে না—

সুরেনবাবু বলিতেছেন'—এস ডি ও ব্যাটা, স্যার, অমন বদখত হলে হবে কি—স্ত্রীটি তার ভারী চমৎকার। সেবার ফ্লাড্ রিলিফের জন্য গেলাম, যেতেই আমাদের পঞ্চাশ টাকা দিলেন। এই যে আপনি এলেন এর রিসেপশান কমিটিতেও তিনি 'জনৈক বন্ধু' বলে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন।

সবাই সমর্থন করিয়া জানাইল সুরেনবাবুর কথা সত্য। অকারণে পার্থের ইচ্ছা হইল তাহার নাম জিজ্ঞাসা করে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—আলোচনা ততক্ষণ অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সত্যিই ত কোন ভদ্র মহিলার নাম জানিয়াই বা তার লাভ কি হইবে। এমন ত কতই আছে। কিন্তু সভায় সে আজ একান্তই আশা করিয়াছিল কুন্তলাকে সে দেখিতে পাইবেই। মঞ্চের উপর হইতে যতদূর দৃষ্টি যায় বার বার সে তাকাইয়া দেখিয়াছে। কুন্তলাকে তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পায় নাই।

কুন্তলার অভিমান অভিমানই রহিয়া যাইবে। সে পার্থের অন্তরের ব্যথা কিছুতেই আজ বুঝিতে চাহিবে না। কিন্তু তবু সভায় তাহাকে যে একান্তভাবেই দেখিতে চাহিয়াছিল।

না। কুন্তলা তার হারাইয়া গিয়াছে। অচিন দেশের রাজকন্যার মত কুন্তলা অচিন দেশেরই একজন হইয়া রহিল —দ্বারে তার আজো প্রহরী। প্রহরীর হাত হইতে মানসী প্রিয়াকে ছিনাইয়া লইবার ক্ষমতাও বুঝি যৌবনের রাজ-কুমারের আর নাই।

গভীর রাতেও তার আজ ঘুম আসিতেছে না। কালই সকালে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। যাইবার আগে কুন্তলার সাথে দেখা হইলে বেশ হইত যেন।

জননায়ক পার্থ আজ কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে যেন ভুলিয়া যাইতে চায়। কল্পনার রেখা চিত্রে অকস্মাৎ ঝড়ো হাওয়ার মত কি যেন তার মনে হয়। আকাশে তারা তারাময়। চারিদিকে ঘুমের গান। তারই শুধু ঘুম নাই চোখে। পার্থ জানালাটা দিয়া দূরের পানে তাকাইয়া রহিল।

এমনি এক দিনের কথা পার্থের মনে পড়ে। তখন পার্থ পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। কুন্তলাও সেবার ম্যাট্রিক দিল বুঝি। দুজনে আসিয়া তাদের ছোট্ট বাগানটিতে বসিয়াছে। গল্প হইতেছে কুন্তলা ইহার পর আর পড়িবে কি না আর পার্থ পাশ করিয়া নিশ্চয়ই বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে চলিয়া যাইবে।

পার্থের ইচ্ছা ছিল তাই। বিলাত যাইবে। ফেরার পথে ইউ এস এ হইয়া 'কেপ অব গুড হোপ' দিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবে।

কুন্তলা সেই কথাই বলিয়াছিল সেই বেশ হবে পার্থদা। তুমি জ্ঞানে বিজ্ঞানে বড় হয়ে ফিরে এস. সে হবে কত গর্বের।

কুন্তলাকে কাছে টানিয়া তার খোপায় রজনীগন্ধার একটা স্তবক পরাইয়া দিতে দিতে পার্থ বলিয়াছিলঃ সত্যি?

কুন্তলা চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিয়াছিলঃ নয়তো কি! তোমার যশ হলে আমার গর্ব হবে না? আমি যে তাই চাই পার্থদা।

কুন্তলা আর কিছু বলিতে পারে নাই সেদিন।

(৪)

বুঝি বা সেদিন ভাল তাহাদের দুইজনেরই দুইজনকেই লাগিয়াছিল। তারপর পার্থ সত্যই চলিয়া গেল ইউরোপে। বিদেশের শিক্ষার গৌরবে নিজের দেশকে মহিমান্বিত করিয়া সেদিন সে দেশে ফিরিয়া আসিল তখন সমস্ত দেশ তাকাইয়া দেখিল পার্থকে। উজ্জ্বল, গৌরবান্বিত প্রতিভাময়।

কিন্তু পার্থের মন তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেশাত্ম-বোধে। সেই হইতে বন্দী জীবনই তার একান্ত আপনার হইয়া উঠিয়াছে। আর ইহারই ফাঁক দিয়া কুন্তলা ছিটকাইয়া অতল হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। সে আর আসিবে না।

নিশীথ রাতের তারা ভরা আকাশের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া—পার্থের চোখে ঘুমের ছোয়া যেন আবির্ভাব হইতেছে। অকারণেই তার মনে হইতে থাকে এখান হইতে অল্প কিছুদূরে আর্কিট হাউসের একটি ঘরে একটি মেয়েও যেন নিশীথের তারাভরা আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছে যে তাহার সমস্ত গর্বই আজ সফল হইল। কিন্তু এ সাফল্য দুঃখের সাফল্য। গভীরতা আছে—তৃপ্তি নাই।

পার্থ ইজি চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল।

রাত আর নাই। পূর্বদিক লাল হইয়া উঠিয়াছে। চোখে ঘুম জড়াইয়া আসিতেছে। তাহারই মধ্যে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল কুন্তলা তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া দিয়াছে —দুপুরবেলা শা করিয়া যে মোটরটা তাহার বাড়ির কাছ দিয়া চলিয়া গেল তাহার মধ্যে যে মেয়েটি একাগ্র দৃষ্টিতে পার্থের প্রতি তাকাইয়াছিল সে ত আর কেহ নয়—সে যে কুন্তলা, একথা জানিতে আর যাহারই হউক তাহার ভুল হয় নাই।

কিন্তু না।

ভাবিলে চলিবে না।

সে জননায়ক। কোটি কোটি মানুষের সুখ দুঃখ লইয়া তাহার কারবার। সেই হইল ভবিষ্যতের ইতিহাসের অগ্রদূত। এ সব বাজে চিন্তা করিবার সময় তার কই।

ওদিকে সুরেনবাবু আসিয়া গিয়াছেনঃ দরজা খুলুন। আর বেশী দেরী করলে ট্রেনটা পাওয়া যাবে না। পার্থ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। আজই নটায় অন্য এক জায়গায় পৌঁছিয়াই একটা সভায় যোগ দিতে হইবে। আর সে কি না ভাবিতে বসিয়াছে কুন্তলা না কে—তাহার কথা।

হাসি পায় পার্থের। ফুলের মালা গলায় দিয়া বিদায় অভিনন্দন শেষে পার্থ ট্রেনে গিয়া উঠিয়াছে। জয়ধ্বনি হইতেছে মুহুর্মুহু।

ধীরে ধীরে ট্রেন চলিতে লাগিল।

এবারেও সে হাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বুকের মাঝে কোথায় যেন একটা গভীর ক্ষত রহিয়া রহিয়া কেবলই কি যেন বলিতে চায়।

সিংহলের ডাক

বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়; কিন্তু স্মৃতিপট হইতে জীবনের কাহিনী মুছিয়া যায় না। কালেরগতি সম্মুখপানে, তবুও মধ্যে মধ্যে পিছনের দিকে তাকাইয়া জীবনের ঘটনাগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই দেখার মধ্যে একটা মোহ আছে। পশ্চাতের ঘটনার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে; কিন্তু হায়! এই আকর্ষণ মিথ্যা মরীচিকার, সেখানে আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না।

ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু সিংহলই আমাকে ডাকে, সমুদ্রতীর নারিকেলের সহস্র বাহু তুলিয়া যেন ডাকিতেছে। সিংহলের সমুদ্রতীরে কতদিন কাটাইয়াছি, কতদিন ভ্রমণ করিয়াছি।

কলম্বোর সমুদ্রতীর

তিন বৎসর কাটাইয়াছি কলম্বো শহরে। সমুদ্রের তীরে কলম্বো শহরের সৌন্দর্য অবিস্মরণীয়। সমুদ্রের তীরে ভ্রমণের জন্য বাঁধান রাস্তা গলফেসওয়াক, বালুকা তীর হইতে খাড়া বাঁধান পাড়। পদব্রজে ভ্রমণের জন্য সিমেণ্টে বাঁধান ফুটপাথ, মোটরের জন্য প্রশস্ত পিচে ঢালা রাস্তা আয়নার মত ঝক ঝক করে। তারপর আছে সবুজ ঘাসের মাঠ—লন্। গলফেস্‌ওয়াক পথের শেষে দেখা যায়, প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা গলফেস হোটেল, কলম্বোর শ্রেষ্ঠ বিলাসী হোটেল। সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া প্রায় হোটেলের পাদদেশে লাগে।

ডোডানডুয়ার সমুদ্রতীর

সান্ধ্য ভ্রমণ উপলক্ষ্যে নানা পোষাকে নানা জাতির সমাবেশ। কলম্বো একটা বড় বন্দর হওয়াতে পৃথিবীর সকল দেশের জাহাজে সকল জাতির আনাগোনা। ইংরেজীতে যাকে বলে কসমোপলিটন, কলম্বো শহরটি তাই। আধুনিক সিংহলবাসীরা সাজপোষাকে পুরোদস্তুর সাহেবী; অথবা মিশ্রিত পোষাক, রঙীন লুঙ্গিপরা (সিংহলের ভাষায় সারং) গায়ে বুকখোলা কোট, শার্ট, কলার, টাই, মাথায় লম্বা চুল খোপার মত বাঁধা, তাহাতে চিরুণী গোঁজা। ন্যাশনাল ড্রেস বা আধুনিক জাতীয় পোষাক, গায়ে বাঙালীদের মত খাটো পাঞ্জাবী, পরনে ধুতি মাদ্রাজীদের মত কাছাছাড়া লুঙ্গির মত পরা; গলায় জড়ান সরু লম্বা চাদর, প্রায় পা অবধি ঝুলিতেছে। জাফনা তামিল—সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী—সাদা ট্রাউজার, বুকবন্ধ লম্বা কোট, মাথায় শাদা পাগড়ী (যেমন স্যার রাধাকিষণ পরিয়া থাকেন)। সাধারণ তামিলদের শাদা কাপড় পাঞ্জাবী অথবা খালি শরীরেও দেখা যায়। পুরুষদের ন্যায় সিংহলী এবং তামিল মেয়েদের বিচিত্র পোষাক। ভারতীয় চেহারাও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। গুজরাটী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও বোরা সম্প্রদায়ের মুসলমান নিজ সম্প্রদায়ের পোষাক বজায় রাখিয়াছে। কলম্বোতে ইহাদের ব্যবসা আছে। কলম্বোতে অল্প কয়েকজন বাঙালী চাকুরে আছেন, তাঁহারা বড় একটা সমুদ্রতীরে চোখে পড়েন না। এ ছাড়া ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আছে, মাঝে মাঝে তাহাদের নিজস্ব দেশীয় পোষাকেও দেখা যায়।

মিঃ রবার্টসন

ফুটপাথের উপর মাঝে মাঝে বেঞ্চ পাতা আছে, সমুদ্রের দিকে মুখ করা; ভ্রমণকারীরা বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে এবং সমুদ্রের শোভা উপভোগ করিতে পারে। পরিচিত কারও সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হইত না। একজন ইংরেজ চিত্রকর মিঃ রবার্টসন ছিলেন, একমাত্র ভ্রমণের সঙ্গী। তিনি নিয়মিত আসিতেন সমুদ্র তীরে। বেঞ্চে বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, পুরাতন কোট প্যাণ্টলুন, মোটা চামড়ার ভারী বুট পায়ে, হাতে একটি সরু লাঠি, তাও ভাঙ্গা। পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যালো মিঃ রবার্টসন, হাউ ডু ইউ ডু? কেমন আছেন, স্বাস্থ্য কি রকম?"

"আমার স্বাস্থ্য! খারাপ হইতে পারে না। স্বাস্থ্য খারাপ করার মত আমার টাকা নেই; দেখুন না, অমুকে ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন ভ্রমণ করিতে অল্প কিছুদিনের জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করিয়া আসিয়াছেন, এখন অসুখে

পাড়িয়া আছেন। এই তো আমি চা খাইয়া আসিয়াছি, মোটে পাঁচ সেণ্ট খরচ।"

"আচ্ছা আপনাকে এক্‌জিবিসন খোলার দিন দেখিলাম না কেন? গভর্নর এক্‌জিবিসনের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন? আপনার কতগুলি ছোট ছোট জলরঙা ছবি দেখিয়াছি।"

"ওঃ লোকেরা বড় কাপড় চোপড়ের দিকে দৃষ্টি দেয়। আমার এ পুরাতন স্যুট আর বুট জুতা—দোকান হইতে চামড়া কিনিয়া নিজে তৈয়ার করিয়াছি।"

"অনেকক্ষণ বসিয়া আছি, চলুন, একটু হাঁটা যাক।" আমরা নানা গল্প করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম।

ইউরোপের বোহিমিয়ানদের কথা শুনিয়াছি, সেই ধরনের লোক। তিনি বলিতে লাগিলেন, কলম্বোতে ড্রাফট্‌স্‌ম্যানের কাজ করিয়া এক সময় তিনশত টাকার উপরে রোজগার করিয়াছি; কিন্তু টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে ভাল লাগে না, তাই ওকাজ ছাড়িয়া দিয়াছি।

"তবে আপনার টাকা এখন কোথা হইতে আসিতেছে?"

ডোডানডুয়ার রাস্তা

"বিলাতে আমার সামান্য কিছু টাকা আছে, সেখান থেকে মাস এক পাউণ্ড সুদ পাইতেছি, এতেই চলিয়া যাইতেছে। বাড়ি ভাড়া সাড়ে চার টাকা আর খাওয়া কাপড় নয় টাকা, এতে আমার কলম্বোতে চলিয়া যায়। আগে আমার অনেক টাকা ছিল, বিলাত হইতে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়াছি; ইউরোপে গিয়াছি, নেপল্‌সএ গিয়াছি সাতবার। ইহাতেই আমার সব টাকা গিয়াছে।"

"আচ্ছা আপনার দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না?"

"নাঃ, দুয়েকবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। একবার একজন মহিলার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তাব আসিয়াছিল, যাইবার ভাড়া ইত্যাদি খরচ দিতে রাজি হইয়াছিল কিন্তু যাই নাই। লণ্ডনে এখন এক পাউণ্ডে মাস কাটান অসম্ভব; কিন্তু আমি জানি লণ্ডনে এমন যায়গা আছে, যেখানে যুদ্ধের পূর্বে এক পাউণ্ডে কাটান যাইত।"

একদিন তাঁর বাসস্থানে যাওয়া গেল। কলম্বোতে Y. M. B. A.র বাড়ি আছে, সিংহলের বৌদ্ধ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, খৃষ্টানদের Y. M. C. A.র ধরণের। Y. M. B. A.র পিছনে একটা কুঠরী, সেখানে থাকেন মিঃ রবার্টসন। মাটীতে শুধু একটা মাদুরপাতা, আর একটা বালিস, এই হল শয্যা। দুয়েকখানা কাপড় দড়িতে ঝুলান এক কুঁজা জল, দুই একটা পাত্র, ঘরে আর কোনও জিনিসপত্র নাই। দেওয়ালে ছোট ছোট কয়েকটা জলরঙা ছবি টানান। ছবিগুলি টিনের ফ্রেমে নিজের হাতেই বাঁধান। ঘরের সামনে আবর্জনা, নারিকেলের ছোবড়ার স্তূপ। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ যে বড় নোংরা, এগুলি এখান থেকে পরিষ্কার করিয়া ফেলেন না কেন?"

"না, ও জিনিস আমার দরকার হয়। রাত্রে ছোবড়ার আগুন জ্বালি মশা তাড়াইবার জন্য।"

আশ্চর্য, কি করিয়া ভদ্রলোক এখানে থাকেন, আমরা হয়তো একদিনও এরকমে দিন কাটাইতে পারিতাম না; অথচ তাঁহার সন্তোষের অভাব নাই, সমুদ্র তীরে যখনই দেখি মনে হয় লোকটা বেশ স্ফূর্তিতেই আছে, মুখে পাইপটি লাগিয়া আছে।

সমুদ্রের শোভা

পুরী, ভিজাগাপট্টম, ওয়ালটেয়ার, মাদ্রাজ, বোম্বে প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে সমুদ্র দেখিয়াছি, কিন্তু সিংহলের সমুদ্রতীর সকল স্থানকেই হার মানাইয়াছে। আমার মনে হয়, সিংহলের সমুদ্রের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সমুদ্রের শোভা উপভোগ করিয়াছি, মন যেন একটি বিশাল বিরাট ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। রঙের কত রকম বাহার কত রকম পরিবর্তন। আকাশের আলোতে ছায়াতে, সমুদ্রের বর্ণবিন্যাসের কত ভঙ্গি কত রকমেরই বা নীল আছে; ইণ্ডিগো, প্রানিয়ান ব্লু, আল্ট্রামেরিন, কোবাল্ট, কিছুরই বাদ নেই। মাঝে মাঝে সবুজের পোঁচ। নীলের সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্রিমসন লাল মিশিয়া নীলের পর্দাকে আরও দীর্ঘতর এবং মধুর করিয়াছে। চোখে লাগিতেছে বর্ণ সুষমা, কানে লাগিতেছে সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ। ঢেউর পর ঢেউ আসিয়া বালুকাতটে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ফেনপুঞ্জ উচ্ছ্বসিত হইয়া রজত ধারায় শতধা বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের দিকচক্রবালের যেন একটা মায়া আছে, ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। —সতত ডাকিতেছে, হে পথিক বাহির হইয়া পড়, সমুদ্রের নীল জলে ঝাঁপাইয়া পড়। ঊর্মিমুখর সাগরের ওপরে কী রহস্য বিরাজ করিতেছে, মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে কাহার আলয় আছে, মনকে কোন কুহকিনী যেন প্রলুব্ধ করিতেছে।

চতুর্দিকে আলোকবন্যায় ভাসাইয়া দিয়া সহস্র শীর্ষ সূর্য পশ্চিমে ডুবিয়া যায়। সমুদ্রের কালো জলে আরও কালো ঘনাইয়া আসে। ক্রমশ দিকচক্রবাল অস্পষ্ট হইয়া আকাশে সাগরে এক হইয়া যায়। অসংখ্য তারকার দ্যুতিতে আকাশ ভরিয়া ওঠে।

দূরে দেখা যায়, আলোকমালায় সজ্জিত একটি বাষ্পীয় পোত, নীল আকাশে ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া চলিতেছে। মন আরও অধীর হইয়া ওঠে, প্রবাসী মন যেন বাহিরে ছুটিয়া

যাইতে চায়। কে জানে, ঐ তরণীতে কত গান, কত আনন্দোৎসব চলিয়াছে, কত লোক চলিয়াছে প্রিয়জনের কাছে, কত লোক চলিয়াছে নূতন দেশের সন্ধানে আর আমি পড়িয়া আছি একলা সমুদ্রতীরে। সমস্ত অন্তর হইতে তখন কেবল একটি কথা জাগিয়া ওঠে।

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।

সমুদ্রতীরে রিকসা

ওয়েলাওয়াত্তা কলম্বোর শহরতলী; আমি থাকিতাম মারাদানায়, আনন্দ কলেজের হোস্টেলে। মারাদানা হইতে ওয়েলাওয়াত্তা ছয় মাইল দূর হইবে। ওয়েলাওয়াত্তায় থাকিতেন মিঃ ওয়াসু (বাসু বা বসু, বাঙালী নামকে সিংহলীরা ওয়াসু বলিয়া উচ্চারণ করিত)। এখানকার উইভিং মিলের একটা ডিপার্টমেণ্টের কর্তা ছিলেন তিনি, মিলের কম্পাউণ্ডের ভিতর তাঁর কোয়ার্টার। তিনি তাঁর

নারিকেল বনের ভিতর হইতে সমুদ্রের দৃশ্য

পত্নী এবং ছোট দুই কন্যা লইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক উইক-এণ্ডে সেখানে যাইতাম বেড়াইতে। সপ্তাহের দুটা দিন তাঁদের আতিথ্যে এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে কাটিত ভাল; দুই দিন বাঙালী ধরণের রান্না খাইয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যাইত। সপ্তাহে শনি রবি দুদিন পুরা ছুটি ছিল, হাফ হলিডে বলিয়া আমাদের কিছু ছিল না।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া রবিবার রাত্রে স্বস্থানে যাত্রা; রাত্রি প্রায় এগারটা বারটা হইয়া যাইত। তখন বাস পাওয়া যাইত না, আর এপথে ট্রাম নাই, কাজেই রিকসা করিয়া চলিতে হইত।

সমুদ্রের ধার দিয়া রাস্তা। দূরে দূরে বিজলীবাতির থাম্বা। জনশূন্য পথ একদম সোজা চলিয়া গিয়াছে। রিকসা চলিতেছে, আমার চোখে একটু ঘুমের ঘোর রহিয়াছে, রাত্রের অন্ধকারে সমুদ্রের গর্জন, নারিকেল পাতার শব্দ আর মাঝে মাঝে রিকসার টিঙ টিঙ শব্দ খুবই আমার কাছে শ্রুতি মধুর ও আনন্দদায়ক লাগিত।

সমুদ্রতীরে ভবঘুরের জীবন

কলম্বোর গলফেস ওয়াকের বেঞ্চে বসিয়া ঢেউ গণিতে আর ভাল লাগে না। ইচ্ছা হইল, সমুদ্রের ধার দিয়া দক্ষিণ-দিকে গল শহরে যে রাস্তা গিয়াছে, সেখানে পদব্রজে ভ্রমণ করি। সমুদ্রের ধার দিয়া পিচ ঢালা মোটরের রাস্তা গিয়াছে। কত গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়া যাইবে, সিংহলের জীবন এবং দৃশ্য অনুশীলন করা যাইবে, আর শোনা যাইবে সাগর-সংগীত। যা স্থির করিলাম সে রকম কাজ। ছুটীর সময় একদিন শেষ-রাত্রে কলেজ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তার আলো তখনো জ্বলিতেছে; লোকজন, গাড়ী তখনো বাহির হয় নাই। মরাদানার নির্জন পথে আমি একা পথচারী। শহরের রাস্তা ছাড়িয়া সমুদ্রের পথ ধরিলাম, আকাশে তখন আলোকচ্ছটা দেখা দিয়াছে।

রাস্তার মাঝে মাঝে চায়ের দোকান আছে। এক কাপ চা ও কিছু খাদ্য গ্রহণ করা গেল। আমাদের দেশের চিতে পিঠার মত একরকম খাবার সিংহলীরা চায়ের সঙ্গে পেঁয়াজের তরকারী দিয়া খাইয়া থাকে।

আমার পোষাকটা ভবঘুরের মত। খাকী শার্ট ও শর্ট, পিঠে হ্যাভারস্যাক বা ঝোলা (যেমন সৈন্যেরা ব্যবহার করিয়া থাকে); তাতে রাস্তায় ব্যবহারের জন্য কাপড়চোপড় আছে। কাঁধে ঝোলান আছে জলের বোতল। মাথায় শোলার টুপি, হাতে ছাতি আছে। আমার এ পোষাকের জন্য পথিকেরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়াছে, "এ আবার কে?" কেউ কেউ আমাকে আবার চাইনিজ সিল্ক বিক্রেতাও মনে করিয়াছে! এক ভদ্রলোক সিল্ক কেনার আশায় বাড়ির গেট হইতে আমাকে ডাক দিলেন, কাছে গেলাম, শেষে ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আই এ্যম্ সরি।" আমিও "দ্যাটস্ অল রাইট" বলিয়া হাত নাড়িয়া রাস্তায় হাঁটা শুরু করিলাম।

কলম্বোর পরেও শহরতলী অনেকদূর পর্যন্ত সমুদ্রের ধার দিয়া চলিয়াছে। রাস্তার দুই দিকে টালীর ছাদওয়ালা বাড়ি, দোতালা বাড়ি কম; আর পাকা ছাদ একেবারেই নাই। যেখানে সেখানে নারিকেল গাছ; মাঝে মাঝে পাই দীর্ঘ নারিকেল বন, মাইলের পর মাইল চলিয়া গিয়াছে, গাছের ফাঁক দিয়া সমুদ্র দেখা যাইতেছে।

বাড়িঘর ছাড়াইয়া চুনকাম করান ডাগোবার উচ্চচূড়া (বর্মাভাষায় পেগোডা বৌদ্ধস্তূপ) উপরে উঠিয়াছে। অলস মন্থরগতিতে বৃহদাকার গরুর গাড়ী চলিতেছে, টানিতেছে ক্ষুদ্রাকৃতি কাল রঙের ষাঁড়; এঁরকম প্রাণী কেবল সিংহলেই দেখা যায়, ভারতে এরকম ষাঁড় দেখি নাই।

রাত্রে বিশ্রাম হইত আমার কোনো ছাত্রের বাড়িতে; পূর্বে চিঠি লিখিয়া জানাইতাম। হিক্কাডুয়া গ্রামে আমার ছাত্র কীর্তিশ্রীর বাড়িতে কাটাইয়াছিলাম, খুব স্মরণীয়। (পূর্বে কীর্তিশ্রীর নাম ছিল ভিনি ডি সিলভা, সেই নাম বদলাইয়া এখন সিংহলী নাম রাখিয়াছে, কীর্তিশ্রী রাজসিংহ)। তার পিতামাতা এবং ভাইরা আমার সঙ্গে খুব আতিথেয়তা ও সহৃদয়তার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। সমুদ্রের ধারে বাংলো ধরণের বাড়ি, আমার শোবার ঘর ছিল সমুদ্রের দিকে। সে রাত্রে আকাশে চাঁদ ছিল, বাতাস ছিল কিছু ঝোড়ো, সারারাত ধরিয়া শুনিয়াছি সমুদ্রের অশান্ত গর্জন এবং তীরে

নারিকেল পাতার ঝটাপটি। মাঝে মাঝে বাতাসের আঘাতে কাচের জানলা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতেছিল।

কীর্তিশ্রীদের রবারের চাষ আছে, পরদিন আমরা সকলে মিলিয়া চলিলাম চড়ুইভাতি করিতে। বাগানে যাইতে হইয়াছিল সরু খাল দিয়া ভেলায় করিয়া। রবারের বাগানে কলাপাতায় ভাত খাইয়াছিলাম।

বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষুদের সঙ্গেও কোথাও কোথাও রাত কাটাইতে হইয়াছে। অনেক বৌদ্ধবিহারে পুরাতন ম্যুরাল পেণ্টিং দেখা যায়। এসব চিত্র অবশ্য খুব পুরাতন নয়, খুব বেশী হইলেও ২০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। এ সকল সিংহলের কান্ডি পদ্ধতির (Kandian Style) চিত্র দক্ষিণ ভারতের প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য বাহির করা যাইতে পারে। ডোডানডুয়া গ্রামের শৈল বিম্বারামে একদিন এক রাত্রি কাটাইয়াছি। এ স্থানের আর একটি দর্শনীয় বিহার গল বিহার। এই দুই বিহারে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক পশুপক্ষীর চিত্র আছে; সিংহলের অন্যান্য বিহারে এমন পশুপক্ষীর চিত্র দেখি নাই।

শৈলবিম্বারাম বেশ বড় একটি বিহার। এখানে একজন যুবক তিব্বতীয় ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হইল, খুব বাল্যকাল হইতেই এখানে আছেন এবং একদম সিংহলী বনিয়া গিয়াছেন। মাসিক পত্রিকায় সিংহলী ভাষায় কবিতা ছাপাইয়াছেন, আমাকে দেখাইলেন। ডোডানডুয়ায় একটি নাতিবৃহৎ হ্রদ আছে। জন দুই ভিক্ষুর সঙ্গে তালের ডোঙ্গায় চড়িয়া হ্রদে বেড়াইতে বাহির হইলুাম। হ্রদের ভিতরে একটা ছোট্ট দ্বীপ, সেখানে একটা ভাঙ্গা বাড়ি। ভিক্ষু বলিলেন, গত মহাসমরের সময় তিনজন জার্মান ভিক্ষু এ বাড়িতে নজরবন্দী ছিলেন।

আমার এই ভ্রমণে কিছু যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই এমন নহে; ঘটনাটি হইয়াছিল বেরু অল গ্রামে। সিংহলের মধ্যে এখানকার লোকেরাই নাকি একটু কর্কশ প্রকৃতির। একজন দীর্ঘাকৃতি লোক মুখে দীর্ঘ গোঁফ, মাথায় লাল রুমাল বাঁধা, রুমালের দুই কোণা মাথার দুই দিকে ঝুলিতেছে, মনে হয় যেন রাবণ রাজার বংশধর। আমার পিছন ধরিল, একদল লোকও আমার পিছনে লাগিল এবং নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল সিংহলী ভাষায়। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আর আমার ইংরেজী কথা তারাও কিছু বোঝে না; শেষে এই লোকটি আমার হাত ধরিয়া টান দিয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, এসব লোক হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নিকটের একটা চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম।

একদিন বিকালবেলায় এক গ্রামের ইস্কুলের সামনে দিয়া যাইতেছিলাম। তখন সবেমাত্র ছুটীর ঘণ্টা পড়িয়াছে, দলে দলে ছেলের দল বাহির হইতেছে। আমাকে রাস্তায় দেখিয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি ছোট ছোট ছেলে ঘিরিয়া ফেলিল, যেমন মৌমাছির চাকে ঢিল ছুড়িলে মৌমাছিরা করে। আমার চারদিকে নৃত্য আর চীৎকার "চিন চুন, চায়না ম্যান।" আমার সঙ্গে একজন সিংহলী পথিক ছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম, "ব্যাপারখানা দেখিতেছেন! আমাকে এই শিশু সৈন্যদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন।" পথিক ছেলেদের ভর্ৎসনা করিলে ছেলেরা চলিয়া যায়।

গল

আমার গন্তব্যস্থল গল। সেখানকার বাঙালী মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার দাশগুপ্তের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

গল পুরাতন পর্তুগীজ শহর; উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। এখন অবশ্য প্রাচীরের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। এখানে দুর্গ ছিল, পর্তুগীজরা এখান হইতে সমুদ্র শাসন করিত। সমুদ্র হইতে খাড়া চওড়া বিরাট প্রাচীর উঠিয়াছে; প্রাচীর এত চওড়া যে, এর উপর তিন চারজন পাশাপাশি ভ্রমণ করিতে পারে। সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য এখানে সমুদ্রতীরে রাস্তা নাই, এই প্রাচীরই রাস্তার কাজ করে।

গলের দুই দিকে সমুদ্র, কাজেই সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুইই দেখা যায়।

কলম্বো হইতে গল ৭৫ মাইল দূরে। পদব্রজে গলে পৌঁছিতে সাতদিন সময় লাগিয়াছিল।

বিদায়

সিংহলের তীরে যেদিন প্রথম পদার্পণ করি, সেদিন হইতে বিদায়ের দিনে কত প্রভেদ! প্রথম দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯২৪ সনের জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি হইবে। ভারতের রেলপথের শেষ ধনুষ্কোডি। সেখানে জাহাজে উঠিয়া যাইতে হয় সিংহলের তীরে তালাইমান্নারে। তালাইমান্নারে উঠিলাম কলম্বোর গাড়ীতে। তখন রাত্রি হইয়াছিল। গাড়ীর জানালার বাহিরে দেখিতেছিলাম চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত দৃশ্য, অনুর্বর ক্ষেত্র, তালগাছের ঝোপ। সবই ছিল অস্পষ্ট, রহস্যাবৃত বাসরঘরের মত।

তারপর দিন প্রভাতের আলোকে এক নূতন জগৎ এক নূতন উদ্দীপনা, এক নূতন প্রেরণা আমার সামনে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইবে, সেই আশায় হৃৎপিন্ড যেন দুরু দুরু করিতেছিল।

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে সিংহলের স্বপ্নলোকে। প্রভাতে একদিন শেষবারের মত তালাইমান্নারে জাহাজে ভাসিলাম। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। জাহাজের ডেকের সামনে দাঁড়াইয়া তীরভূমি দেখিতেছিলাম। খেলাঘরের পালা শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার ভারতে আসিয়া দেখিব বাস্তব জগৎ।

অশ্রুভারাক্রান্ত আকাশ এবং তালবনখচিত তীরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—"এ ডিউ, এ ডিউ সিলোন শোর!"

[৭]

দোকানের দুটি হবু খদ্দের বার বার ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। তারা প্রমোদের খাতাপত্র দেখে, জিনিসগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে বাজারে যায় দর যাচাই করতে। পরামর্শ করতে যায়, জেঠাম'শায়, পিসেম'শায় প্রভৃতি রাজ্যের ম'শায়ের কাছে। অনর্থক কথা ব'লে ব'লে হাড় জ্বালিয়ে দেয়। পাকা কথাটা কেউ ব'লে ফেলতে যেন জানে না।

এমনি ক'রে ব'কে ব'কে আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো প্রমোদ। এ আপদ ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচে সে, অথচ এদের সে বিষয়ে গা মোটেই নেই।

আবার দোকানের বিক্রী এত বেড়ে গেল যে দিনরাত লোকের সওদা দিতে দিতে অবকাশই পায় না প্রমোদ আরও চেপে চেষ্টা করবার। যত সব বাজে খদ্দের রাজ্যের বাজে জিনিস কেনবার জন্য যেন ভীড় ক'রে আসতে লাগলো—সুধু প্রমোদের হাড় জ্বালাতে!

শেষে একজন বললেন, "আচ্ছা নেব দোকান যদি দরে পোষায়।"

তিনি দর দিলেন দু'শ' টাকা।

প্রায় হাজার টাকার মাল আছে তার দোকানে, বিক্রী হচ্ছে যথেষ্ট। তাই যতই গরজ থাক প্রমোদের, দু'শ' টাকায় দোকান বেচে দিতে তার মন সরলো না। সে চাইলে হাজার টাকা।

এই নিয়ে পাঁচ সাত দিন অলোচনা চললো। শেষে একদিন অবস্থাটা সঙ্গীন হ'য়ে এলো। প্রমোদ নেমে এলো সাত শ' টাকায়, খরিদ্দার বললে, সাড়ে পাঁচ শো।

কথা কাটাকাটি চলতে লাগলো, কিন্তু নিরপেক্ষ লোক কেউ শুনলে বুঝতো যে বিক্রী হ'তে আর দেরী নেই। কেন না, স্পষ্টই দেখা গেল যে, প্রমোদেরও বেচবার যেমন আগ্রহ, খরিদ্দারেরও কেনবার তেমনি গরজ। এ অবস্থায় দেড় শ' টাকার ব্যবধান লঙ্ঘন হওয়া বেশী কষ্টকর হবে না।

খদ্দের বললে, "আমার শেষ কথা ম'শায় ছ'শো টাকা। রাজী হন এখুনি টাকা এনে দিচ্ছি, নগদ।"

প্রমোদ টলমল। আমতা আমতা ক'রে বললে, "দেখুন বড্ড লোকসান হচ্ছে। হাজার টাকার তো মালই আছে, তা' ছাড়া দেখছেন তো কেমন বিক্রী হচ্ছে"—

খদ্দের বললে, "কিন্তু আপনার মালের দামের দরুন দেনা"—

"জোর প'চিশ টাকা। এ অবস্থায়"—

খরিদ্দার বুঝলে যে টোপ গিলতে আর বেশী দেরী নেই; আর একটু চার ফেললে। বুক পকেটের ভিতর থেকে সে গুনে গুনে ছ'খানা একশো টাকার নোট বের ক'রে প্রমোদের সামনে ধ'রে বললে,

"তা' বুঝুন। দেন তো এই ছয় শ' টাকা নগদ দিচ্ছি, এখনি একটা রসিদ কেটে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যান।"

প্রমোদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে, একবার হাত বাড়ায় আবার হাত টেনে নেয়; এমনিভাবে অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে—

এলো প্রহেলিকা।

একা।

এসেই বললে, "দুখানা একসারসাইজ বুক দিন তো?"

প্রমোদ দোকানে একখানা বেশ ভাল চেয়ার রেখেছিল। প্রহেলিকা এসে তাতে বসবে এই আশায়ই সে সেখানা কিনেছিল। সেই চেয়ারে চেপে বসেছিলেন দোকানের সেই হবু খরিদ্দার।

প্রমোদ তাকে বললে, "এখন যান আপনি—উঠুন।"

খরিদ্দার অনিচ্ছুকভাবে উঠি উঠি ভাব করেও চেয়ারে বসেই নোট ক'খানা ধ'রে বললেন, "এ টাকা তা' হ'লে"—

"নিয়ে যান আপনি, উঠুন এখন"—

"কিন্তু"—

"এখন ওসব কথা হবে না উঠুন আপনি।"

একরকম ঠেলেই তুলে দিলে তাকে প্রমোদ। তার পর কোঁচা দিয়ে চেয়ারটা ঝেড়ে ফেলে প্রহেলিকাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি চাইলেন আপনি?"

"একসারসাইজ বুক।"

"হাঁ, একসারসাইজ বুক!"

বুকের ভিতর তার ধুপ ধাপ করতে লাগলো। হাত তার থরথর করে কাঁপছে।

আলমারীর উপরের থাক থেকে একতাড়া খাতা নামাতে গিয়ে অর্দ্ধেক সে ফেলে দিলে মেঝের উপর। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রহেলিকার কাছে রেখে সে আকুল নয়নে চেয়ে রইল প্রহেলিকার দিকে। প্রহেলিকা খাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো।

একটা ছোকরা এলো। "এক পয়সার লজেঞ্জস দিন।"

ভারী বিরক্ত হয়ে প্রমোদ একটা বোতল থেকে এক মুঠি লজেঞ্জস তুলে তাকে দিলে। যা দিলে সে প্রায় তিন পয়সার মাল, আর পয়সাটা সে তুলতে ভুলে গেল।

আর একজন এলো, একটা পেন্সিল নিতে। দিলে প্রমোদ।

তারপর আর দু'জন, একজনের চাই রিবন আর একজনের সেফ্‌টিপিন।

প্রমোদ আর পারলে না সইতে, সে বললে, "এখন হবে না, আর একটু পরে এসো।"

তারা তর্ক করতে চাইলো, প্রমোদ বললে, "নেই যাও।"

প্রহেলিকার খাতা বাছাই করা হ'য়ে গেল। সে বল্‌লে, "রিবন আছে নাকি আপনার দোকানে? কেমন রিবন, দেখি?"

যত রকম রিবন ছিল সব নেমে এলো প্রহেলিকার সামনে। একটা তুলে নিয়ে প্রহেলিকা বল্‌লে, "বেশ সুন্দর এটা, দিন তো তিন গজ।"

প্রমোদের হাত পায়ের কাঁপুনি অসহ্য হ'য়ে উঠলো। তিন গজ রিবন সে কেটে দিলে।

"কত হ'ল?" প্রহেলিকা জিগ্‌গেস করলে।

দাম বল্‌লে প্রমোদ।

পয়সা বের করতে করতে প্রহেলিকা বল্‌লে, "স্নো আছে আপনার দোকানে?"

"স্নো"—নিশ্চয় আছে—শুধু স্নো নয়, ক্রীম পাউডার পাফ এসেন্স ইত্যাদি যা চাই সব আছে। সব জিনিস সারবন্দী হয়ে কাউণ্টারের উপর জড় হয়ে গেল। দু একটা নিলে প্রহেলিকা।

প্রহেলিকা দিলে একখানা পাঁচ টাকার নোট। তার ভাঙানি দিতে গিয়ে প্রমোদ কিছুতেই হিসাব ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। এক টাকায় যে ঠিক ক' আনা হয় এই কথাটাই তার কিছুতে মনে আসতে চায় না। অনেক চেষ্টায় হিসাব ঠিক ক'রে যখন ভাঙানি দিলে সে তখন প্রহেলিকা ক্যাশ মেমো দেখিয়ে বল্‌লে, "এই নাম কি আপনারই?"

অনাবশ্যক উৎফুল্লতার সহিত প্রমোদ বল্‌লে, "আজ্ঞে।"

"আপনি এম এ?—আশ্চর্য তো!"

আশ্চর্য, কেন আশ্চর্য হবার কি আছে এতে? প্রমোদের মনে হ'ল বোধ হয় তার চেহারায় এমন কিছু আছে যাতে তাকে নেহাৎ বোকা মনে হয়—অন্তত এম এ পাশ করবার অযোগ্য মনে হয় তাকে। সে ভারী দমে গেল।

প্রহেলিকা বল্‌লে, "আচ্ছা আপনিই কি—আপনি বিবিক্তায় 'উড়ো জাহাজ' লিখছেন?"

পরম কৃতার্থতার সহিত প্রমোদ স্বীকার করলে যে সেই সে দীন অভাজন।

প্রহেলিকার মুখ চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বল্‌লে, "কি আশ্চর্য! আর আপনি এমনি। ভারী আশ্চর্য!"

সে চলে গেল। প্রমোদের চোখ দুটো প্রহেলিকার পিঠের উপর বিঁধে বসে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল যতদূর তাকে দেখা যায়।

কৃতার্থতায় তার বুক ভ'রে গেল। কিন্তু ঐ যে প্রহেলিকা বার বার বল্‌লে, "আশ্চর্য" তাতে তার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। তার চেহারাটা ঠিক এম এ পাশ অথবা "উড়ো জাহাজ" লেখবার মত নয় কি?

আলমারি থেকে একটা আরসী বের ক'রে নিয়ে সে নিবিষ্টভাবে তার মুখখানা দেখতে লাগলো। রাজ্যের ত্রুটি ও অভাব যেন তার চোখে বিঁধতে লাগলো।

এলো একটি খদ্দের!

আপদ ব'লে আর তাকে মনে হ'ল না। হাসিমুখে সে সেই খদ্দেরের সব অসম্ভব খুঁৎ খুঁতি ও আব্‌দার সহ্য ক'রে মাত্র চার আনার সওদা বিক্রী করলে।

তারপর এলো তার দোকান কেনবার সেই হবু খদ্দের।

সে এসে বল্‌লে, "কি বলেন প্রমোদবাবু, টাকাটা নেবেন এখন?"

প্রমোদ মাথা ঝেড়ে জবাব দিলে "না ম'শায় না, ছশ' টাকায় এই দোকান! ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছেন?"

"যাক গে যাক, আর পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, আর কথা কইবেন না।"

প্রমোদ বল্‌লে, "উহুঁ।"

আরও কিছুক্ষণ বকাবকির পর শেষ পর্যন্ত লোকটা আর একখানা একশো টাকার নোট বের ক'রে বল্‌লে, "আচ্ছা নিন, আপনার কথাই রইল, এই সাতশ নিন, আর পঞ্চাশ টাকা? আচ্ছা তাও বিকেলে দেব। নিন।"

"না মশায় না। বেচবো না আমি দোকান। সাড়ে সাতশ' কোন্ ছার, সাড়ে সাত হাজার দিলেও বেচবো না।"

লোকটা অবাক হয়ে বল্‌লে, "বা রে, আপনিই তো বললেন সাড়ে সাতশ'—আবার এখন কথা পাল্টাচ্ছেন।"

"হাঁ পাল্টাচ্ছি। আমি বেচবো না দোকান।"

"কেন বলুন তো।"

"ইচ্ছে।"

"আচ্ছা যাক, আর কিছু বেশী চান তো তাই বলুন।"

প্রমোদ বল্‌লে, "না মশায়, বেশীও চাই না কমও চাই না, কিছুই না। বেচবো না আমি।"

"তবে কেন নাহক আমাকে হয়রানি করলেন এতদিন?"

"বেশ করেছি—আমার খুসী আমি করেছি। এখন উঠুন, বিদায় হ'ন।"

লোকটাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিয়ে প্রমোদ সেই চেয়ারখানায় বসে চোখ বুজে মনে মনে পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। আজ যে মহাসৌভাগ্য হ'য়ে গেছে তার। প্রহেলিকা দোকানে আসবার পর থেকে যা কিছু হয়েছে তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ ক'রে তার উপর অপূর্ব ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা ক'রে সে তখন স্বর্গলোকে বিচরণ করতে লাগলো।

প্রহেলিকার মায়ামূর্তি নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে তার চারিদিকে বিচরণ ক'রে তার দোকানঘরখানা হুরীবিশোভিত বেহেস্তে পরিণত ক'রে দিলে। সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো, আজকের এই পরিচয় যে শুভারম্ভের সূচনা করলে তার পরিণতি শঙ্খমুখরিত এক মধুর সন্ধ্যায়, কুসুমাস্তীর্ণ এক সুশোভন শয্যায়—

"এই প্রমোদ, রাস্কেল, তুই এখানে?" উচ্চকণ্ঠে শ্রীবিলাস এই সম্ভাষণ ক'রে এইখানে তার স্বপ্নের স্রোত ভেঙে দিলে।

[৮]

শ্রীবিলাসের সম্ভাষণে প্রমোদ রাগ করলে না। সে একেবারে লাফিয়ে উঠে তাকে প্রবল বেগে আলিঙ্গন ক'রে ফেল্‌লে। এতটা আবেগ সে দেখালে যে শ্রীবিলাস হকচকিয়ে গেল।

শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার দেখা নেই এক বছরের উপর। সে হঠাৎ এখানে কি ক'রে উদয় হ'ল, এতদিন সে কি করছিল, এখনি বা কি করে, সে সুখে আছে কি দুঃখে আছে সে সব অবান্তর কথা এখন তার একবারও মনে হ'ল না। সে বলতে গেলে কেবল তার চারদিক ঘিরে লাফাতে লাগলো, আর কথা যা' বল্‌লে সে খুব সুসংলগ্ন নয়। যথা—

"এই যে শ্রীবিলাস—হ্যাঁ-হ্যাঁ—বেশ বেশ—খুব ভাল। কি যে খুসী হয়েছি কি বলবো—তার পর—শ্রীবিলাস তুমি—কি আশ্চর্য—দেখ এ পৃথিবীটা ভারী আশ্চর্য, না?—কি বল?"

শ্রীবিলাস কি বলবে ভেবে পেল না। তার বন্ধুর এ ব্যবহার দেখে সে শুধু হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

"চল ভাই তোমাকে আজ কিছু খেতে হবে," ব'লে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ ক'রে সে শ্রীবিলাসকে টেনে নিয়ে গেল একটা রেষ্টুরাণ্টে। সেখানে রাজ্যের খাবারের ফরমায়েস দিয়ে বসলো।

তার পর খেতে খেতে সে বল্‌লে, "নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে? হয় নি? সে হতভাগা কেমন বোকা মেরে গেছে—কিছু সুবিধে করতে পারছে না। আমি ঐ ছোট্ট দোকান ক'রে ব'সেছি। জানতো, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী! হাঁ কথাটা বেজায় ঠিক—লক্ষ্মী একেবারে জ্যান্ত লক্ষ্মী বুঝলে কি না?—আর একটা অমলেট? খাবে না? সে কি? খেতেই হবে—এই বয়, লে আও আর একঠো অমলেট। পয়সা খরচের কথা ভেবো না, আমার পয়সার কোনো চিন্তা নেই—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী যাকে কৃপা করেন তার আর দুঃখ কি?"

খাবার পর শ্রীবিলাসকে টেনে নিয়ে চল্‌লে সিনেমায়। একটা সিনেমায় গিয়ে শুনতে পেলে তিন টাকার কম টিকিট সব বিক্রী হ'য়ে গেছে। "কুছ পরোয়া নেই" ব'লে সে দুখানা টিকিট কিনে ব'সলে গিয়ে দোতলায়।

যতক্ষণ ছবি আরম্ভ না হ'ল ততক্ষণ সে অনর্গল বকতে লাগলো।

ক্রমে সে একটু আত্মস্থ হ'তে জিজ্ঞেস করলে, "তারপর তুমি এখন আছ কোথায়?"

শ্রীবিলাস বল্‌লে, "তোমার পাশে, সিনেমায় ব'সে।"

হো হো ক'রে হেসে প্রমোদ বল্‌লে, "সে তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে কথা জানতে চাই নি। জানতে চাই কোন বন থেকে বেরিয়ে এ টিয়েটি ক'লকাতায় উদয় হ'য়েছে?"

"পাবনা জেলার অন্তর্গত জাঁহাবাজপুর গ্রাম থেকে।"

"ও তা' হ'লে তুমি দেশেই আছ। আশ্চর্য তো? কোনও কাজকর্মের চেষ্টা না ক'রে ঠায় গাঁয়ে ব'সে আছ।"

"কেন গাঁয়ে কি কাজকর্ম হয় না। অনেক লোক গাঁয়ে থাকে আর কাজকর্মও করে। আমিও করছি। আর তাতে ক'রে সামান্য দু পয়সা উপায়ও ক'রছি।"

ক্রমে শ্রীবিলাস বেশ দর্প করেই তার গ্রাম্য কর্মজীবনের বিস্তীর্ণ পরিচয় দিয়ে গেল, আর সেই পরিচয় প্রসঙ্গে সে দশ বারোবার শহরবাসী ভাগ্যান্বেষীদের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা মিশ্রিত অবজ্ঞা প্রকাশ করলে। বল্‌লে সে, গ্রামে লক্ষ্মীর বাসা বাঁধা আছে। সেখানে চক্ষের নিমিষে ক্রোড়পতি না হ'তে পার কিন্তু কাজ করতে জানলে বেশ দু পয়সা উপায় হয় আর যা' উপায় হয় তাতে ভাল খেয়ে প'রে আরামে থাকতে পারা যায়—শহরের এই দমফাটান হুটোপাটির মধ্যে আলেয়ার সন্ধানে ছুটোছুটির চেয়ে সে হাজার গুণে ভাল।

শ্রীবিলাসের ইতিহাস সংক্ষেপে জেনে রাখা দরকার। সে সেই যে প্রতিজ্ঞা করেছিল লক্ষ্মীর সন্ধান না ক'রে ত্যাগের ব্রত গ্রহণ ক'রবে, সেই ঝোঁকের মাথায় সে কংগ্রেসসেবী হ'য়ে খদ্দর প'রে বেরিয়ে প'ড়েছিল। পল্লী সংগঠন ও খাদি প্রচারের মহাব্রত গ্রহণ ক'রে সে কিছু থোক টাকা ও মাসিক সামান্য বৃত্তি নিয়ে গাঁয় গিয়ে বসলো।

তখন তার খেয়াল হ'ল যে পল্লীসংগঠনের প্রথম কাজ গ্রামবাসীদের জীর্ণ বাসগৃহগুলির উন্নতি করা। তাই তার হাতে যে থোক টাকা ছিল তা' দিয়ে নিজের ঘরখানা বেশ ভাল ক'রে ঠিক ক'রে নিলে।

গ্রামে এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ক'রে সে ক্রমে তাদের সহায়তায় তার বাড়ির আশপাশের ডোবা বুজিয়ে তার বাড়ি যাবার পথ ঘাট দুরস্ত ক'রে ফেললে। তার পর আরও টাকা এনে সে পাটের ব্যবসা সংগঠনে মনোযোগ দিলে। এক বছরের ভিতর সে বিস্তর লাভ ক'রে ফেললে।

তার পর তার বৈরাগ্যের ঝোঁকটা হঠাৎ কেটে গেল। পাটের ব্যবসায় ছলছলে টাকা দেখে সে লক্ষ্মীরই পক্ষপাতী হ'য়ে উঠলো। আর সেই সময় কংগ্রেস কমিটি তার কাছে টাকার হিসাব চাওয়ায় সে চ'টে মটে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ও ক্রমে প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে বসলো।—এবারে সে রায়সাহেব খেতাব পাবার আশা রাখে।

সিনেমায় যে ছবিখানা হচ্ছিল প্রমোদ তা ভাল ক'রে দেখলোই না। শ্রীবিলাসের আত্মচরিতেরও খুব অল্প অংশই তার কানে গেল। তার মনের ভিতর দিয়ে এক অপূর্ব পুলকের স্রোত ব'য়ে যেতে লাগলো আর সে স্রোতে ভেসে চললো কাতারে কাতারে নানা মনোজ্ঞ স্বপ্ন যার সামনে পেছনে ও চার ধারে ছাপমারা ছিল প্রহেলিকার মুখ।

তার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল—সিনেমার বাজনার তালে তালে সে ব'সে ব'সে যতদূর সম্ভব নাচছিলও! ইণ্টারভাল এসে গেল। বাতিগুলো জ্বলে উঠলো। শ্রীবিলাসকে টেনে প্রমোদ নিয়ে গেল চা খাওয়াতে।

তার পর ফিরে এসে যখন সে ব'সতে গেল তখন নীচের অডিটোরিয়ামের দিকে চেয়ে সে যা দেখলো তাতে তার বুকের ভিতর দারুণ উল্লাস ও আপশোষ একসঙ্গে চাড়া দিয়ে উঠলো।

—সে দেখলে, সেখানে ন' আনার সীটে ব'সে আছে—স্বয়ং প্রহেলিকা!

প্রহেলিকাকে দেখা যাচ্ছে এতে হ'ল উল্লাস—কিন্তু, হায়, সে কেন আগে জানতে পেলো না—তা' হ'লে মিছে পৌণে সাত টাকা খরচ ক'রে এতখানি ব্যবধান সহ্য না ক'রে সে তো

(শেষাংশ ২৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চুলকাটার নিয়ম

আমাদের দেশে এখনও অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা বাড়ীর ছেলেদের দশ আনা ছ' আনা চুলকাটা মোটেই পছন্দ করেন না। ছোট মেয়েদের বব্‌ড হেয়ার ত তাঁরা দু' চোখে দেখতে পারেন না। ছেলের দল প্রকাশ্য কোন তর্ক যুদ্ধে নামতে সাহস পায় না বটে তবে শহরে পড়তে এসে বা অন্য কোন সুযোগ মিললেই মাথার বাইরের বেশটা পরিবর্তন ক'রতে ছাড়ে না। বাইরের বেশটার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরের কতকটাও যে পরিবর্তন হয় তার প্রমাণ না খুঁজলেও পাওয়া যায়। কেশ প্রসাধনে কোন কোন ছাত্র যে পরিমাণ সময় ব্যয় করে সেটা যদি পড়াশুনায় দেয় তা হ'লে বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে হয় না অথবা চোখের জল ফেলতে হয় না—এ ধরণের মন্তব্য স্কুলের মাস্টার মশায়দের প্রত্যহই করতে দেখা যায়। মাথার বাইরের দিকে নজর দিতে গিয়ে আসল দিকেই যে নজর দেওয়া হয়নি এটা ধরা পড়ে এত দেরীতে যে তখন সংশোধনের আর সময় থাকে না।

তাই ছাত্রজীবনে বিলাসীতার মোহ থেকে ছাত্রদের রক্ষার জন্য স্বাধীন দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি দেয়, আইন ক'রে ছাত্রদের তা পালন করতে বাধ্য করে।

শ্যাম দেশের কথা বলছি; সেখানের পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাকশনের মন্ত্রী নূতন আইন প্রণয় ক'রে দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন, স্কুলের মেয়েরা স্থায়ী ঢেউ তোলা চুলের জন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করবে না। এ ছাড়া নখের উপর রং লাগাতে বা চোখের নীচে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে না। ছেলেরা চুল কাটবে ছোট ছোট। বিলাসীতার প্রশ্রয় যেন কোন ছেলেমেয়েই না পায় এটাই হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য। এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন অথবা স্কুলে কলেজে হরতাল হয়েছে কিনা এরূপ সংবাদ এ পর্যন্ত আসে নি। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা নাকি শান্তভাবেই নিয়ম পালন করতে চেষ্টা করছে।

জীবন্ত সমাধি

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। এবং মারাত্মক ভুলের জন্য পৃথিবীর বুকে অনেক ওলটপালটও যে হয় না এমন নয়। সময় থাকলে ভুল সংশোধন করা যায় বটে কিন্তু যে ভুলের পরিণতি অতি শোচনীয়—তাদের জন্যই মানুষের দুঃখ। দীর্ঘকাল ধরে মানুষ সে ভুলের স্মৃতিকে বহন করে।

মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই ভুল করে বসে। এমনি একটা ভুলের খবর বলি।

অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে এক ভদ্রলোক নিউমোনিয়া রোগে মারা গেলেন। যে ডাক্তার রোগীকে দেখছিলেন তিনি নিজে এসে পরীক্ষা করে, রোগী মৃত বলেই সার্টিফিকেট দিলেন। এরপর কফিনের মধ্যে মৃত ভদ্রলোককে রাখা হ'ল; কফিনের ঢাকাটা খোলা রইল ওদেশের প্রথা অনুযায়ী। এদিকে যখন সকলেই অন্যান্য কাজে ব্যস্ত তখন মৃত ভদ্রলোক হঠাৎ সকলকে আশ্চর্য ক'রে কফিনের মধ্যে উঠে বসলেন, আত্মীয় স্বজনদের এমনিভাবে ব্যস্ত দেখে অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

সৌভাগ্যের কথা সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমাদের দেশের মত ভুতের উপর কারও বিশ্বাস ছিল না। ভদ্রলোককে কফিন থেকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

আমরা আমাদের দেশের হাতুড়ে ডাক্তারদের কথা ভাবছি। আরও ভাবছি শ্মশানবন্ধুদের কথা। তাঁরাও কম ভুল করেন না।

বাদুড়ের হোটেল

হোটেলটা পাইস হোটেল নয়। মিঃ মিল্টন এফ্‌ ক্যাম্পবেলের হোটেলে সব স্থায়ী বাসিন্দা। সেখানের আস্তানা ছেড়ে কেউ ত যাবার নাম করে না বরং আরও স্বজাতি জুটিয়ে নিজেদের দলপুষ্ট করে। এতে মিঃ ক্যাম্পবেলের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। আশ্চর্যই বটে; বাদুড়ের হোটেল খুলে কেউ যদি লাভবান হয়। কিন্তু সত্যিই বাদুড়ের হোটেল চালানটা তাঁর লাভজনক সখ। লেকের ধারে খানিকটা জায়গা জুড়ে লম্বা একটা কাঠের ঘর, দেখতে ঠিক উইন্‌ডমিলের মত। সেটাই হোটেল। স্থায়ী বাদুড়ের বাসিন্দা ২৫০,০০০ এর উপর। হোটেল চালানর খেয়ালটা কিন্তু মিঃ মিল্টনের মাথায় প্রথম আসেনি। তাঁর বাবা, ডাঃ চার্লস এ আর ক্যাম্পবেল কয়েক বছর আগে ম্যালেরিয়ার বীজাণু বাহক মশাদের দেশ থেকে নিশ্চিহ্নের জন্যে প্রচুর পরিমাণে বাদুড় আমদানী ক'রে একটা কাঠের ঘরে আবদ্ধ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই সব বাদুড়ের নৈশ অভিযানের ফলে গ্রাম থেকে মশার উৎপাত দূর হয়ে যাবে; ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণে দেশবাসী আর সর্বস্বান্ত হবে না। সূর্য্যি ডোবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত শব্দযন্ত্রের কর্কশ আওয়াজে হাজার হাজার বাদুড় আস্তানা ছেড়ে শিকারের খোঁজে বার হয়, উদর ভর্তি করে একে একে আবার হোটেলে হাজির হয়। আলো বিহীন অল্প পরিসর প্রকোষ্ঠে, চারিদিক আবদ্ধ—এমন স্বাস্থ্যকর নিরাপদ হোটেল ত্যাগ করতে কারও ইচ্ছা হয় না। ডাঃ ক্যাম্পবেল পরীক্ষা করে দেখেছেন, মাত্র একটি বাদুড় এক রাত্রির অভিযানে প্রায় ৩৭৫০টি মশা বা ঐ জাতীয় পোকা মাকড় স্বচ্ছন্দে উদরে স্থান দিতে পারে—পরিপাক ক্রিয়ার কোনরূপ গোলযোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

মিঃ ক্যাম্পবেলের হোটেলে তারা বিনা খরচে থাকে না, বৎসরে একটা খাজনা দেয়। তা থেকেই হোটেলের মালিক বেশ বড় লোক। বৎসরে একবার করে হোটেলে নতুন রং লাগান হয়; সে সময় সেই কাঠের ঘর থেকে স্তূপাকার আবর্জনা সরিয়ে ফেলা হয়। সেই আবর্জনার শক্তি কম নয়

যে কোন অনুর্বর মাটিতে তা সোনা ফলায়। প্রচুর মূল্য দিয়ে আশপাশের দালালরা সেই পরিত্যক্ত আবর্জনা কিনে নিয়ে গিয়ে সারের কাজে লাগায়। মিঃ ক্যাম্পবেলের দেখে শুনে অনেকেই মশক নিবারণকল্পে বাদুড়ের হোটেল খুলেছে।

খুদে ব্যারন

ব্যাণ্ডের মধ্যে যে খুদে ছেলেটা দেখছেন ওর নাম হ'ল ব্যারন। সত্যি সত্যিই ও মানুষ। সার্কাস দেখতে এসে সহস্র সহস্র দর্শক কিন্তু ওকে প্রথমে মানুষ বলেই ভাবতে পারে না। বড় ব্যাণ্ডটা যখন বাজান হয় ব্যারন তখন চুপচাপ থাকে। বিকট আওয়াজে কানে আঙ্গুলও দেয় না। তারপর সেটা চুপ করলে ব্যারন দর্শকদের চমৎকৃত করে নিজের ছোট ব্যাণ্ডে ফুঁ দেয়। দর্শকরা ব্যারনকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে। খেলার শেষে ব্যারন দর্শকদের

খুদে ব্যারণ ব্যাণ্ডের মুখে আবির্ভাব হয়েছে

সামনে হাজির হয়; চারিদিক থেকে একটা তুমুল হাস্য-কোলাহল, সকলে অবাক হয়ে খুদে ব্যারনকে দেখে। ব্যারন লম্বায় ২১ ইঞ্চি ওজনে ১৭ পাউণ্ড, বয়স ১৯ বৎসর। ওদের বংশে ব্যারনই কেবল বামন, আর কেউ বামন ছিল না। সহস্র সহস্র দর্শক খুদে ব্যারনকে পেয়ে যেমন আনন্দ পায় ব্যারনও জনসমুদ্রের মাঝে নিজের মন্দভাগ্যের কথা ভেবে এতটুকু দুঃখ না পেয়ে খুসীতে ভরে উঠে। সার্কাসের একঘেঁয়ে জীবনটা ব্যারনের ভালই লাগে।

নিক্‌নেম

ইউরোপের কোন একটি দেশের সনাক্ত বিভাগে প্রায় ২০০,০০০ জন অপরাধী ব্যক্তির গোপন নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সব ব্যক্তি একস্থানে একনামে নিজের পরিচয় দেয় এবং কোন অপরাধঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেই ভিন্ন দেশে পালিয়ে গিয়ে অপর এক 'নিক্‌নেমে' নিজেকে পরিচয় দিয়ে পুলিশের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে। তালিকাটির মধ্যে এমন সব অদ্ভুত নাম পাওয়া যায় যা পড়তে গেলে রীতিমত হাসি পায়। যেমন—কারবলিক কিড্, স্নো টাউন ব্লাকি, বো বো হো হো এমনি আরও কত। নিক্‌নেমে পরিচয় দিয়েও কিন্তু এরা বেশীদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। পুলিশের তীক্ষ্ন দৃষ্টি একদিন না একদিন এদের মুখোস খুলে দিয়ে আসল লোকের পরিচয় দেয়।

আমেরিকায় আত্মহত্যার সংখ্যা

আমাদের দেশের আত্মহত্যার নানা কারণের মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতাও একটা কারণ। বর্ত্তমানে আত্মহত্যাটা যেন সংক্রামক ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি আমেরিকার সেনসাস্ ব্যুরো এক রিপোর্টে ১৯২০-৩৮ সালের যুক্তরাষ্ট্রে যে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে তার এক হিসাব দিয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২০ সালে যে সংখ্যক লোক আত্মহত্যা করেছে বর্তমানে তার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক আত্মহত্যা করে। এর কারণ কি তা তারা প্রকাশ করে নি। একমাত্র আত্মহত্যার সংখ্যার হিসাব প্রকাশ করাই তাদের কাজ।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ৮,৯৫৯। ১৯৩৮ সালের সংখ্যা ১৯,৮০২। নেভেদা স্টেটে নাকি বেশী সংখ্যক লোক আত্মহত্যা করে। সেখানে ১৯৩৮ সালে প্রতি ১০০,০০০ সংখ্যক লোকের মধ্যে ৩৫·৬ জন লোক আত্ম-হত্যা করেছিল। দক্ষিণ কারোলিনায় সব থেকে কম লোক এই পাপ কাজ করে। কোন্ কোন্ দেশে ১৯৩৮ সালে কি পরিমাণ আত্মহত্যা হয় তার হিসাব দেওয়া হল,—(১) নিউইয়র্ক—২,২৪৮; (২) কালিফার্নিয়া—১,৮৭৪; (৩) পেনসিলভানিয়া—১,৩৯৭; (৪) ওহিও—১,২৭১।

ওসব আমি পছন্দ করি না

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

পছন্দ আমিও করিতাম না।

গ্রাম হইতে শহরে আসিবার পূর্বে রামকৃষ্ণ কথামৃত, মহাত্মা গান্ধীর প্রতিজ্ঞা, এসব একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ, ন্যাস, প্রণায়াম এগুলিতেও আমার রীতিমত অভ্যাস ছিল। 'ওসব' সম্বন্ধে আমি ছিলাম অসম্ভব রকম সাবধানী। অথচ কি দিয়া কি হইল, কিছুই বুঝিলাম না! --সেই কথাই আজ বলিব।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলেজে ঢুকিয়াছি। আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আশ্রয় পাইয়াছি শহরের এক ভদ্রলোকের বাসায়। সেখানে দুইবেলা তিনটি ছেলেকে পড়াইতে হইত। ভদ্রলোকের বহির্বাটিতে ক্ষুদ্র একটি ঘর,—সেখানেই তাঁহার আগন্তুকদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার স্থান—এইটিই আমার পাঠশালা গৃহ, ইহাই আমার পাঠাগার এবং এই-খানেই আমাকে রাত্রিযাপন করিতে হয়; সুতরাং জাগিয়া স্বপ্ন দেখিবার মত অবসর বা মনের অবস্থা আমার ছিল না।

গৃহকর্তার নাম গিরীনবাবু। সেকেলে বনিয়াদী ঘর। বাড়িতে অবরোধ-প্রথা ভীষণ। এক আহারের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে কোন কারণেই আমার বাড়ির মধ্যে যাইবার প্রয়োজন তাঁহারা মনে করিতেন না।

পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের নাম অতুলবাবু। ইনি স্থানীয় বারের মোক্তার। দিনরাত ফৌজদারী মামলা এবং তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যাপার লইয়া থাকেন। মানুষকে ইনি সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং ছেলেমেয়েদের আধুনিক ধরনের চাল-চলন ইনি একেবারেই পছন্দ করেন না।

অতুলবাবুর ভাগ্নী রাণু। বয়স তের-চৌদ্দ। স্থানীয় ইস্কুলে পড়ে। এর মধ্যেই সে নিজেকে কত বড় হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে! ধিঙ্গি মেয়েদের রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ান সে পছন্দ করে না।

আমি বাহিরের যে ঘরটিতে থাকি, তার পিছনেই ছোট্ট একটু ফুলবাগান। জবা, বেল, চাঁপা, গন্ধরাজ, এই সব ফুল ফুটে থাকে এই বাগানে। রোজ সকালের দিকে পাড়ার কয়েকটি ছোট মেয়ে গৃহকর্তার অনুমতি লইয়া ফুল তুলিয়া লইয়া যায়।

আমার ঘর দিয়াই যাতায়াতের পথ। গৃহকর্তা গিরীন-বাবু বলেন, 'খবরদার, ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা তুল না কিন্তু। ওটা দামী গাছ, কুচবিহারের রাজবাড়ি থেকে মালীকে ঘুস দিয়ে আনা।'

তখনও রাত্রি প্রভাত হয়নি।

জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রাণু আমাকে ডাকিতেছে, 'মাস্টার মশাই, ওগো মশাই, নব বাবু'।

উত্তর দিলাম না। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছে। মনে মনে শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করিতেছি।

'কি কুম্ভকর্ণের ঘুম রে বাবা! ব্যাটা ছেলের আবার এমন ঘুম হয় নাকি!'

কি, আমি তাহ'লে ব্যাটা ছেলে নই?—বড় রাগ হইল। উঠিয়া বসিলাম। বলিলাম, 'কি?'

'দরজাটা খুলে দিন ত?'

প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

রাণু একডালা ফুল তুলিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় কতকটা উপেক্ষাভরেই একটা ম্যাগনোলিয়া আমার তক্তপোষের উপর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ভাবিয়াছিলাম, গিরীনবাবুকে বলিয়া দিব, কিন্তু তাহা হইল না। ফুলটিকে ফেলিয়া দিব ভাবিলাম, কিন্তু তাহাও পারিলাম না—কোথায় কে দেখিয়া ফেলিবে ঠিক কি? অতি সংগোপনেই বিছানার নীচে ফুলটিকে লুকাইয়া রাখিতে হইল।

সমস্ত দিন গেল। রাত্রিতে আহ্নিক করিলাম—এক অধ্যায় গীতাও পড়িলাম। না, নিজেকে শক্ত রাখিতে হইবে—এইগুলিই ত সংসারের প্রলোভন! ওসব আমি পছন্দ করি না।

ভোর সাড়ে পাঁচটা হইবে। রাণু আসিয়া আজও ডাকিতেছে, 'স্যার, মাস্টার—উঠুন।'

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, না—আর না। কাপুরুষই হই, আর বীরসিংহই হই, ঘুম আমার কিছুতেই আজ ভাঙিবে না।

'মাস্টার মশাই, নব বাবু—ভূত নাকি?'

নিঃশব্দে পড়িয়া রহিলাম। চারিদিকে আর কোন সাড়া-শব্দ নাই।

রাণু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। যাক্, বাঁচা গেল!

কিন্তু তাহার চাইতে মরাও ভাল ছিল বোধ হয়। রাণু একটা লাঠি আনিয়া আমাকে খোঁচা মারিতেছে!

সর্বনাশ! যদি কেহ দেখিয়া ফেলেঃ তার চেয়ে দরজা খুলিয়া দেওয়াই ভাল।

কোন কথা না বলিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াই আবার শুইয়া পড়িলাম—কাজ কি আমার অত সব ফ্যাসাদ দিয়ে? রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, গায়ে তেল মাখিয়া ডুব দিবে,—আমিও দরজা খুলিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাণু ফুল লইয়া চলিয়া গেল।

কর্তা ছোট মেয়েদের শাসাইলেন, নিশ্চয় তোরাই আমার গ্রান্ডিফ্লোরা চুরি করেছিস্, নইলে অতগুলো ফুল—

তারা ঠিক ঠিক কথার জবাব দিতে পারে না, যাহা বলে, তাহাতে সন্দেহই হয় বেশী; মনে হয়, উহারাই ফুল চুরি করিয়াছে!

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই দরজা খুলিয়া রাখিয়া দিলাম। সাধক তুকারাম বলিয়াছেন, ঐ সব ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয়, কথাবার্তা যত কম হয় ততই ভাল।

ঘুম আর আসিল না। অহেতুক কাহারও আগমন-প্রতীক্ষায় মন এবং কান উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। রাণু

আসিয়া কোনরূপে উচ্চবাচ্য না করিয়াই ফুল তুলিতে চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিটও হয় নি—হঠাৎ ফুলের ডাল ভাঙিয়া তাহারও পড়িয়া যাইবার শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। রাণু কুচবিহারের রাজবাড়ি হইতে আনা ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডি-ফ্লোরার ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে!

কর্মভোগ! —একবার ভাবিলাম চুপ করিয়া থাকি; আমার এত হাঙ্গামে দরকারই বা কি! কিন্তু এখনই যে প্রশ্ন উঠিবে দরজা খুলিয়া দিয়াছিল কে?

রাণু তখনও মাটিতেই পড়িয়া আছে। তুলিলাম এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে বাড়ি পেঁছাইয়া দিয়া আসিলাম।

বিকালের দিকে খোঁজ পড়িল, গ্রাণ্ডিফ্লোরার ডাল ভাঙল কে? নিশ্চয় দুপুরের বেলায় যখন কেউ থাকে না, তখনই ভেঙেছে।

এ বাড়িতে কোনও আন্দোলন হইলে রাণুদের বাড়ি হইতে শোনা যায়। পরদিন সকালে সমস্ত ছোট মেয়েগুলিকে আটকাইয়া ফেলা হইল, 'কে ডাল ভেঙেছিস্ বল্।' মীনা কাঁদিয়া বলে, 'ঐ শেফালী বড্ড গাছে ওঠে। ওই হয়ত ভেঙেছে।' শেফালী বলে, 'না আমি ত ভাঙি নি! লতি সেদিন আমায় বলছিল, 'ভাই গ্রাণ্ডিফুল পাড়বি?'

আমি চুপ করিয়া থাকি।

রাণুর পায়ে 'পায়োমিক' ফোঁড়া দেখা দিয়াছে।

ডাক্তারের এনকোয়ারীতে রাণু তাহার মায়ের নিকট ডাল-ভাঙার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ফেলিয়াছে। মা তাহাতে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছেন—কি জানি, কি বিষটিষ ছিল সেখানে ইত্যাদি।

কথা ছড়াইতে বিলম্ব হইল না।

অতুলবাবু অসম্ভব গম্ভীর হইয়া গেলেন, রাণুর বড়াশুনায় ইতি পড়িল, ছেলেমেয়েরা, পাড়াপড়শীরা সকলেই বলিল,—'জানিস্ ভাই—'

'ওমা এর মধ্যে এত! ভোর রাত্তিরে দরজা খুলে দেওয়া, ফুল দেওয়া-দিয়ি, অথচ থাকেন যেন ভেজা বেরালটি! গিন্নী ত প্রকাশ করিলেন!

সেখান হইতে আমার আস্তানা তুলিতে হইল। সঙ্গে পাইলাম অপরিমিত নিন্দা ও গ্লানি।

তার পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আপনারা ভাবিতেছেন, রাণুর সহিত বুঝি আবার আমার সাক্ষাৎ হইলঃ—না, ওসব আমি পছন্দ করি না।

পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করিয়াছি এবং আমার অবস্থা ফিরিয়াছে—অর্থাৎ বি-এ পড়িবার সময় কলেজের হোস্টেলে বিনা খরচায় থাকিবার অনুমতি পাইয়াছি।

ঠাকুরকে লইয়া কি একটা ব্যাপারে হোস্টেলে 'স্ট্রাইক' আরম্ভ হইল। কেবল স্ট্রাইকও নয়—আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করিব স্থির করিলাম। দুপুরে বেলাটা না খাইয়াই কাটিল, সন্ধ্যায় যে যেখানে পারিল গা-ঢাকা দিয়া খাইয়া লইল।

স্থানীয় পোস্টমাষ্টারের ছেলে অমরনাথ আমাদের কলেজেরই ছাত্র। রাত্রি দশটার সময় সে যখন আবিষ্কার করিল, আমি সত্য সত্যই সমস্তদিন না খাইয়া আছি, তখন একপ্রকার জোর করিয়াই সে আমাকে তাহাদের বাসায় লইয়া চলিল।

'মা, আমার খাবার দুভাগ ক'রে দাও—আমরা দু'জন আছি,' সবিশেষ শুনিয়া মা বলিলেন, 'তাও কি হয়? ভদ্রলোকের ছেলে আধপেট খেয়ে থাকবে? —আবার রান্না করেই দিচ্ছি'।

সবিনয়ে বলিলাম, 'মাপ করবেন, তাহ'লে আমি না খেয়েই ফিরছি'।

অমরনাথের সঙ্গে ভাগেযোগে খাওয়া গেল। কিন্তু মায়ের মন তাহাতে তৃপ্ত হইল না।

'বাবা, তুমি আমার নিজের ছেলের মত। কাল দুপুরে তোমার এখানে খেতেই হবে—মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও।'

না গিয়া উপায় নাই; সুতরাং স্ট্রাইক ভাসিয়া গেলেও আমাকে পরদিন মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পোস্টঅফিস পর্যন্ত ছুটিতে হইল।

মন্দ লাগিল না। বিবাহ করি নাই—অথচ জামাই-আদরে পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জনের আহার্য! তার উপর এটা খাও ওটা খাও ইত্যাদি, অর্থাৎ রাত্রে যে ভাল খাওয়াইতে পারেন নাই তাহারই প্রতিক্রিয়া!

এইভাবে অমরনাথের সহিত আমার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা; কিন্তু আসল ব্যক্তিটিকে এ পর্যন্ত বাদ দেওয়া হইয়াছে। অমরনাথের একটি ছোট বোন ছিল—নাম চিন্তা। পর পর তিন মেয়ের পর এটি চতুর্থ কন্যা বলিয়া হয়ত বাপ-মায়ের ভারাক্রান্ত মনের অভিব্যক্তি এই চিন্তা। ...কিন্তু আপনারা যাহা মনে করিতেছেন, অর্থাৎ যাহা হইলে আপনাদের গল্প-উপন্যাসের মন কিছু খোরাক পাইত, সে সব কিছুই নয়—ওসব আমি পছন্দও করি না; অমরনাথের বাবাও পছন্দ করেন না। তিনি গুরু-গম্ভীর, রাশভারী প্রকৃতির লোক। মেয়েদের ব্যাপকতা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে গল্প করে, তাস খেলে—এগুলি তাঁহার দুচক্ষের বিষ।

অমরনাথের মেজদিদির ছোট ছেলে অতুর টায়ফয়েড্। কর্তব্যের খাতিরে পর পর কয়দিন রাত্রি জাগিতে হইতেছে। অমরনাথের বাবা গণেশবাবু মধ্যে মধ্যে রোগীর ঘরে আসেন —ঘরে ঢুকিবার পূর্বে তাঁহার 'তারা' 'তারা' শব্দে আমরা সচকিত হইয়া উঠি—অর্থাৎ নিঃশব্দে যে যার কাজ করিয়া যাই।

রোগীর অবস্থা অনেক ভাল। ডাক্তার বলিয়াছেন, ক্রাইসিস পার হইয়া গিয়াছে। —রাত্রি দশটা হইবে। আমরা রোগীর ঘরে নিষ্প্রভ আলোকে তাস খেলিতেছি। হঠাৎ বাহিরে শব্দ হইল, 'তারা' 'তারা'! —অমনি অমরনাথ রোগীর

বগলে থার্মোমিটার দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল, মেজদি পাখা লইলেন, সুধীন ফিডিং কাপ ধুইতে লাগিল—আমিও গত্যন্তর না দেখিয়া এবং হঠাৎ কোনও কাজ না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিলাম! কিন্তু ঠিক এমনি দুঃসময়ে শ্রীমতী চিন্তা বাথরুমের মধ্যে বসিয়া বসিয়া বরফ ভাঙ্গিবে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? উপায়ও নাই! এককোণে চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

'জ্বর কত?'

অমরনাথ চিন্তাক্লিষ্টের মত আন্দাজে উত্তর দিল,—'তিন।'

'আইসব্যাগ কই?'

মেজদি বলিলেন, 'বরফ পুরতে নিয়ে গেছে।'

বরফ কতখানি আছে আর?

অমরনাথ তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল, 'অনেক আছে, আজ চলবে।'

গণেশবাবু পোস্টঅফিসে চাকরী করেন। 'এ্যাকিউরেট' উত্তর চান তিনি। রাগ করিয়া বলিলেন, আমি জানতে চাই কতখানি বরফ আর আছে। 'অনেক' বললে একটা পরিমাণ বুঝায় না।

আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছে।

মেজদি বলিলেন, 'মেপে আর দেখেছে কে—যা আছে আজ চ'লে যাবে। কাল দেখেশুনে যা হয় করলেই হবে—'

গণেশবাবু আরও রাগিয়া গেলেন,—'করলেই হবে! যত সব ইয়ে। ভোরে 'রাণার' যাবে, তার সঙ্গে আনতে দিতে হবে না? —কৈ, দেখি বরফ কতখানি আছে?'

আলো লইয়া গণেশবাবু বাথরুমে ঢুকিলেন।

'কে?'

চিন্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি। তাহার বা হাতে আইসব্যাগ, ডান হাতে মুগুর।

আমি তখন কাঠের গুঁড়ার মধ্যে বরফের টুকরা খুঁজিতেছি, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে—বুকের মধ্যে একশো হাতুড়ী পিটিতেছে!

'কে?'

'আমি আইসব্যাগটা নিতে এলাম' —গলার স্বর অসম্ভব রকম ভারী!

গণেশবাবু গম্ভীর হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, 'হুঁ।'

তাহার পর গণেশবাবু শুইবার ঘরে গিয়া স্ত্রীকে ধমকাইয়া উঠাইলেন, কাচের জিনিসপত্র ভাঙ্গিলেন এবং পর পর তিন দিন না খাইয়া রহিলেন।

চিন্তার ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, —শুনিতেছি, তাহার বিবাহ দেওয়ার জন্য গণেশবাবু উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন! ওসব তিনি পছন্দ করেন না।

পছন্দ ত আমিও করিতাম না! —কিন্তু মানুষের কল্পনা ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কতখানি!

হোস্টেল ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইব কি না ভাবিতেছি।

প্রহেলিকা

(২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

জো সো ক'রে ন' আনার সীটে ঠিক প্রহেলিকার পাশেই ব'সতে পারতো। তা হ'লে—তা' হ'লে যে কি হ'তে পারতো সে সম্ভাবনার কল্পনায় সে আত্মহারা হ'য়ে গেল।

তার পর—

ও কি?—

প্রহেলিকার পাশের সীটে বসেছে একজন—প্রমোদ ভাবলে কি ভাগ্যবান সে! অথচ হায়, সে অভাগ্য হয় তো এ সৌভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন!

কিন্তু—

লোকটাকে তো ঠিক অচেতন ব'লে মনে হচ্ছে না! সে মাঝে মাঝে কথা কইছে প্রহেলিকার সঙ্গে। —আবার নোনতা বাদাম কিনে দিচ্ছে সে তাকে।—হিংস্র দৃষ্টিতে তার পশ্চাদ্ভাগের দিকে চেয়ে প্রমোদ ভাবলে, কে লোকটা?

লোকটা একবার মুখ ফেরালে। তখনি বাতি নিভে গেল।

এর পর যে এক ঘণ্টা ছবি দেখান হ'ল তাতে প্রমোদ না কইলে একটা কথা, না দেখলে ছবি। সে সুধু সাসুয় তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো নীচের সেই আসনের দিকে—যেন জোর ক'রে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে লোকটাকে দেখবেই।

লোকটার উপর দারুণ জিঘাংসায় তার মনে যেন ঝড় বইতে লাগলো।

সেই মস্ত লম্বা এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এক ঘণ্টা অত্যন্ত ঢিমে চালে চ'লেও শেষে শেষ হ'ল!

বাতিগুলো জ্বলে উঠলো। সবাই উঠে দাঁড়াল।—প্রমোদও দাঁড়াল—তার চোখটা সেই নীচের সীটের উপর নিবদ্ধ!

দেখলে প্রমোদ।

"হা ভগবান" ব'লে সে ধপ ক'রে ব'সে পড়লো আবার। সে লোক আর কেউ নয়—নিখিলেশ!

চুরমার—ছত্রছন্ন হ'য়ে গেল প্রমোদের এতক্ষণকার রচিত মায়াজাল।

শ্রীবিলাস যে পাশে আছে সে খেয়ালই তার রইলো না। সে উঠে ভিড় ঠেলে ছুটলো বাইরের দিকে।

যখন গেটের কাছে এলো তখন সে দেখতে পেলে প্রহেলিকা সেই অপ্রাসঙ্গিক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্যাক্সি চ'ড়ে চলেছে—সেই বুড়ো ভদ্রলোক যার সঙ্গে সে একদিন বাসে চ'ড়েছিল। নিখিলেশকে দেখতে পেলে না।

প্রমোদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুধু গা কামড়াতে লাগলো।

(ক্রমশ)

নিকেতন ঃ

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্থায়ীভাবে নিকেতনে যোগদান করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন র বৈচিত্র্যময় জীবনী অবলম্বনে লিখিত একটি নাটক দনের পূর্বেই মঞ্চস্থ হইবে। শরবাবু বর্তমানে নাটকটির সম্পাদনা, ধন ও পরিচালনা কার্যে মনোনিবেশ য়াছেন। শিশিরবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব ম্লান াছে বলিয়া এ পর্যন্ত কোন সন্দেহের ক হয় নাই কারণ শিশিরবাবুর ভা—অপর কোন নট শিল্পীরই ভার পর্যায়ে পড়েন না। একদা াকল নাটক শত শত রজনী ধরিয়া নীত হইয়াছে, তাহার পুনঃপুন নয়ে বিপুল দর্শক সমাগম দেখিয়া কথাই প্রমাণিত হয় যে, রসজ্ঞ গণ রসের সন্ধান পাইলে নূতন তন বিচার করেন না, স্টান্ট ও র চেয়ে খাঁটি শিল্প রসই পছন্দ । শিশিরবাবুর মত প্রতিভাবান ীর অদ্ভুত শক্তি, ইনটেলেক্ট ও র্ গুণে শ্রীমধুসূদনের চরিত্রটি জীবন্ত ও অকৃত্রিম হইয়া ব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

লে ঃ

বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ন স্থায়ীভাবে যোগদান করিয়াছেন। 'ঘূর্নি' শীর্ষক ানি নাটক ১৪ই ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হইয়াছে। অহীন্দ্র- এই নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া- বড়দিনের সময় বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিরচিত 'মহাযুদ্ধ' নামক একখানি জক নাটকও অভিনীত হইবে।

ারতী ঃ

পি-ডবলিউ-ডি সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে। সমাগম হ্রাস না পাওয়ায় বড়দিনে অপর কোন নূতন সম্ভবত মঞ্চস্থ হইবে না।

থিয়েটার ঃ

শ্রীমদ্ভাগবতের এক কাহিনী অবলম্বনে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র এম-এ বিরচিত পৌরাণিক নাটক "ঊষা-হরণ" সাফল্যের অভিনীত হইতেছে।

মিনার্ভা থিয়েটার ঃ

গত ৭ই ডিসেম্বর হইতে অর্জুন-বিজয় নামক একখানি পৌরাণিক নাটক অভিনীত হইতেছে।

ছায়ালোকের টুকিটাকি

—চিত্ররথ—

আনন্দবাজারে 'বঙ্কিমবাবুর অবস্থা পড়িয়া দুঃখ হয়।

উদয়শঙ্করের নূতন নৃত্যপরিকল্পনা

'শরৎবাবুকে জীবন্ত অবস্থাতেই সিনেমা পরিচালকদের যশোগান গাহিতে হইয়াছিল; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের প্রপিতামহ বেচারা সে-যুগে মৃত বঙ্কিমকে এখনও হোটেলে, প্রডিউসারদের ঘরে, পরিচালকের বাড়িতে ছুটাছুটি করিতে হয়। বুড়ো বেচারার মরার উপর খাঁড়ার ঘা!

সিনেমা পরিচালকের latest খবর সংগ্রহ করিয়া এ'বার তাঁহাকে ভূতদেহে দেবলোকে ফিরিতে হইয়াছে। হয়ত, একদিন দেখিব—সেই latestএর বাড়ির গোপন কক্ষে তিনি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন!......দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

* * * * *

কিন্তু তখন, সিনেমার সহিত সংশ্লিষ্ট খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা বিপদে পড়িবেন না তো! 'বঙ্কিমবাবু যে শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না;—তাঁহার সমালোচনা ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ম। অধিকন্তু তিনি ছিলেন সম্পাদক।

* * * * *

যে সব প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক অর্থপিপাসু চিত্তে, রোতো উর্দু নাট্যকারের নাটক সিনেমার জন্য বাঙলায় অনুবাদ করিতে বসেন—অবাঙালী প্রডিউসারের দাম্ভিকতাকে তোয়াজ করিবার আকাঙ্ক্ষায়—মৃত বঙ্কিম যদি হঠাৎ কোনো দিন ব্রহ্মদৈত্য হইয়া তাঁহাদের কাঁধে চাপিয়া ধরেন?

শুনিয়াছি 'বঙ্কিমের প্রচন্ড আক্রমণকে সে যুগে সকলেই ভয় করিতেন।

* * * * *

নিউ থিয়েটার্সে শেঠ জগৎনারায়ণ পাঞ্জাবী বই তোলাচ্ছেন—'চম্বে-দি-কলি'। ভাববেন না যেন—বইটা কোন দুম্বা ভেড়ার গল্প! বা চম্বা রাজ্যের চমুড়ী গাইয়ের ইতিবৃত্ত! 'চম্বে-দি-কলি' অর্থে পাঞ্জাবীরা 'চাঁপার কলি' বোঝে। তবে ভাবনার বিষয়, 'ডাক্তারে'র সুখ্যাত পরিচালক ফণি মজুমদার 'চম্বে-দি-কলি'র চিকিৎসা ক'রে তাকে কোমল লাজুক 'চাঁপার কলি'তে রূপান্তরিত করতে পারবেন কি?

এইজন্য, এই শীতের দিনে তাঁকে পাঞ্জাবের পাহাড়ে দৌড়তে হলেই মুস্কিল। তবে বয়সে যুবক—এই যা ভরসা!

* * * * *

কী দেখিলাম! কী হেরিলাম! ভারতের filmএর ভাগ্যাকাশে। এ কাহারা!—রণচন্ডী বেশে? লক্ষ্মী ও সরস্বতী কি? পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিতেছেন! পরস্পরকে সম্মার্জনী হস্তে তাড়াইয়া বেড়াইতেছেন!

* * * *

আর কে উহারা সরস্বতীর পা ধরিয়া ঝুলিতেছে? বাঙালী পরিচালকবর্গ নহে কি? ঐ কাহাদের এক হাত সরস্বতীর পায় ও অপর হস্ত লক্ষ্মীর পদ ধারণ করিয়া রহিয়াছে?

* * * *

আবার ঐ! ঐ কাহারা ভোজপুরী! বোম্বাই যষ্টি হস্তে সরস্বতীকে আক্রমণ করিতে ছুটিতেছে? উহারা কোন্ দেশীয়?

* * * *

স্বপ্ন দেখি নাই। কমলাকান্তের মত আফিংও খাই নাই। যে চক্ষুতে দেখিতেছি বস্তীর কলতলায় দুই বস্তী-দেবী কুরুক্ষেত্র বাধাইয়াছে। তাহাদের দাপটে পাড়ার ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। লোক পাড়া ছাড়িয়া পলাইতেছে। সেই চক্ষুতেই পরিষ্কার দেখিয়াছি, filmএর ভাগ্যাকাশে লক্ষ্মী সরস্বতী পরস্পরকে তাড়াইয়া বেড়াইতেছে।

নূতন চিত্রগৃহ 'পূরবী'

হ্যারিসন রোড ও মির্জাপুর রাস্তার সংযোগস্থলে পূরবী নামে নূতন চিত্রগৃহের উদ্বোধন গত রবিবার প্রাতে হইয়া গিয়াছে। চলচ্চিত্র সাংবাদিকগণ ও ছায়াচিত্র জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বোধন কালে উপস্থিত ছিলেন। 'ডিলুক্স' ডিষ্ট্রিবিউটার্স এই চিত্রগৃহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ২১শে ডিসেম্বর হইতে 'রেনস্ কেম' চিত্র প্রদর্শিত হইবে।

জ্যোতি সিনেমায় 'সজনী'

সুদামা প্রডাক্শনের নূতন হিন্দী চিত্র 'সজনী' ২১শে ডিসেম্বর শনিবার হইতে জ্যোতি সিনেমায় প্রদর্শিত হইবে। ছবিটি পরিচালনা করিয়াছেন সর্বোত্তম বাদামী; প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন সবিতা দেবী, পৃথিরাজ মিস্ প্রধান, নূরজাহান ও দিক্ষীত।

পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের জীবন লইয়া এই কাহিনী। গ্রামের বড়লোক মহাজনের একমাত্র পুত্র নন্দা সেই গ্রামেরই এক দরিদ্র চাষীর রূপসী কন্যা রূপাকে ভালবাসে। তাহাদের মিলনের পথে বাধা রূপার দারিদ্র্য আর নন্দার ঐশ্বর্য। নন্দার পিতা গ্রামের দরিদ্র চাষীদের টাকা ধার দিয়া উচ্চ সুদ আদায় করিয়া বড়লোক—পুত্র নন্দা তাহা পছন্দ করে না, মন্ন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। একদিন গ্রামের চাষীরা এই অত্যাচারী মহাজনের উপর বিদ্রোহ করিল, তাহার দলপতি হইল রূপার পিতা। উভয়ের পিতার এই বিরোধই নন্দা ও রূপার মিলনে প্রধান অন্তরায়। রূপার সহিত নন্দার যাহাতে মিলন না হইতে পারে তজ্জন্য নন্দার পিতা পুত্রের বিবাহ ঠিক করিলেন বাহিরের এক বড়লোকের কন্যার সহিত বেশ কিছু অর্থ প্রাপ্তিও তাহাতে আছে। পুত্রের আপত্তি টিকিল না, একদিন জাঁকজমকের সহিত রূপার গৃহের আঙ্গিনা দিয়াই সে রাধাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। রাধা তাহার স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভালবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু নন্দার মন পড়িয়া থাকে রূপার কাছে। স্ত্রীর অধিকার বঞ্চিতা রাধা একদিন রূপার কাছে তাহার প্রার্থনা জানাইল স্বামীকে সে স্বামীরূপেই ফিরিয়া পাইতে চায়। এমন সময় নন্দা আসিয়া উপস্থিত রূপারই গৃহে। রূপা তাহার নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রেরণায় নন্দাকে রাধার সহিত মিলিত করাইয়া দিল, নিজেকে রাখিল দূরে।

কাহিনী অত্যন্ত মামুলী, প্রকাশভঙ্গীও পুরাতন। কাহিনী মামুলী হইলেও ছন্দমধুর গতি আছে, ছোট ছোট ঘটনাগুলি ছোট ছোট উপনদীর মতই গল্পের মূল ধারাকে সজীব রাখিয়াছে। নন্দার ভূমিকায় পৃথিরাজের অভিনয় মনোরম রূপার ভূমিকায় সবিতা দেবীও সুঅভিনয় করিয়াছেন। জ্ঞান দত্তের সংগীত পরিচালনা প্রশংসনীয়।

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। বন্ধ করিবার আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধও উপেক্ষিত হইয়াছে। পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পরিচালকগণ তাঁহাদের জেদ বজায় রাখিয়াছেন। হিন্দু দল খেলায় যোগদান করে নাই। ১৩ই ডিসেম্বর হিন্দু জিমখানার সাধারণ সভায় "না" যোগদান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় হিন্দু দল যোগদান করে নাই। ঐ দিনের সভা বিশেষ শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে শেষ হয় নাই। হিন্দু দল যোগদান "করুক" এই ইচ্ছা সভ্যগণের মধ্যে অনেকেরই ছিল। ভোট গণনার সময় তাহা প্রকাশ পায়। যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন ২৮০জন ও পক্ষে দিয়াছেন ২৪৩জন। মাত্র ৪৭টি ভোটে "না" যোগদান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সভা আরম্ভের বহুপূর্ব হইতে বিপুল জনতা হিন্দু জিমখানার প্যাভেলিয়নের সম্মুখে সমবেত হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "হিন্দু দলের যোগদান করা উচিত" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। সভা শেষ হইবার পর ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, চেয়ার টেবিল পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিতে ছাড়েন নাই। ফলে জনতার মধ্যে দাঙ্গার লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুলিশবাহিনী আসিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করে ও হিন্দু জিমখানার যে সকল সভ্য খেলা বর্জনের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের গৃহে পেণাছিয়া দিয়া আসেন। এইরূপ ঘটনা হওয়া যে খেলোয়াড়োচিত মনোবৃত্তির অধঃপতনের নিদর্শন ইহা বলাই বাহুল্য। পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ১৯৩০ সালেও বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই বৎসর এইরূপ অপ্রীতিকর কিছুই ঘটিয়া ছিল না; কিন্তু এই বৎসর হইল ইহাই দুঃখের বিষয়। তবে এই প্রসঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে যে, পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভের দিন হিন্দু জিমখানার জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারীতে কোন দর্শককে দেখা যায় নাই। ইহাতে মনে হয় যে, যাঁহারা সভার দিন গণ্ডগোল করিয়াছিলেন বা যাঁহারা প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভুল সংশোধন করিয়াছেন। প্রস্তাবের উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

নূতন হিন্দু দল গঠনের প্রচেষ্টা

তবে প্রস্তাব গ্রহণের পরেও প্রতিপক্ষ ক্রিকেট উৎসাহী নূতন হিন্দু দল গঠনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও পরে জানিতে পারা গিয়াছে। এই প্রচেষ্টার পিছনে ছিলেন, বোম্বাই সিটি ক্রিকেট এসোসিয়েশন, মহারাষ্ট্র ক্রিকেট এসোসিয়েশন, বরোদা ক্রিকেট এসোসিয়েশন ও পশ্চিম ভারত রাজ্য দল ক্রিকেট পরিচালকগণের কতিপয় সভ্য। ইহারা ঐদিন এক সভা করেন ও পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট পরিচালকগণকে তাঁহাদের মনোনীত হিন্দু দলকে প্রতিযোগিতায় খেলিতে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র পাইয়া পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট পরিচালকগণ পত্র প্রেরকগণকে জানান যে, তাঁহারা মনোনীত দল গ্রহণ করিতে পারেন, যদি মনোনীত দল প্রকৃত প্রতিনিধি দল বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার উত্তরে প্রচেষ্টাকারিগণ জানান যে, তাঁহারা যে দল গঠন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব নির্বাচিত দল অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ হইবে না। পূর্ব নির্বাচিত দলের প্রায় সকল খেলোয়াড়ই তাঁহাদের নির্বাচিত দলে খেলিবেন। মেজর সি কে নাইডুও তাঁহাদের নির্বাচিত দলের অধিনায়ক হইবেন। খেলোয়াড়গণকে খেলার পূর্বে বোম্বাইতে আনিতে তাঁহারা পারিবেন। ইহা সম্ভব করিবার জন্য তাঁহারা অমরনাথকে আসিবার জন্য তার করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ পেণাছিলে তাঁহারা মুস্কিলে পড়িয়া যান। সভা করিয়া তাঁহাদের মতামত দিবেন বলিয়া জানাইয়া সভা আহবান করেন। সভা হইলে উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। হিন্দু জিমখানা, পার্শী জিমখানা ও ক্যাথলিক জিমখানার প্রতিনিধি ইহার বিরুদ্ধতা করেন। মুসলিম জিমখানা ও ইউরোপীয় জিমখানার প্রতিনিধিগণ কেবল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। বিপক্ষে ভোট বেশী হওয়ায় নূতন হিন্দু দল গঠন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হইলে হিন্দু জিমখানা যাঁহারা এতদিন পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য হিন্দু দল মনোনীত করিয়া আসিতেছেন, অধিকার হইতে বঞ্চিত ও অপমানিত হইতেন। হিন্দু খেলোয়াড়দের পক্ষেও খুব সুখের বিষয় হইত না।

পেণ্টাঙ্গুলারের প্রথম খেলা

১৪ই ডিসেম্বর হইতে পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম খেলা আরম্ভ হয়। ছাত্রগণ পিকেটিং করিবেন বলিয়া যে সংবাদ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এই দিন সেইরূপ কোন ঘটনা হয় নাই। তবে দর্শক সমাগম খুবই কম হইয়াছিল। মুসলিম ও পার্শী দল এই খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। খেলা ১৬ই ডিসেম্বর বিনা গণ্ডগোলের মধ্যে শেষ হইয়াছে। মুসলিম দল পার্শী দলকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত করিয়াছেন। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। উভয় দলের বোলারগণই খেলায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। পার্শী দল প্রথম খেলিয়া ২৪৫ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করেন। এই দলের তারাপোর, মিস্ত্রি, আইবরা ও ভায়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মুসলিম দলের আমীর ইলাহি এই ইনিংসে একা ১২২ রাণে ৬টি উইকেট দখল করেন। অবশিষ্ট ৩টি উইকেট ইয়াকুব শেখ ৫১ রাণে পান। পরে মুসলিম দল খেলা আরম্ভ করেন। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত খেলিয়া প্রথম ইনিংস ৩০৪ রাণে শেষ করেন। মুসলিম দল রাণ তুলিবার দিকে মন না দিয়া উইকেট রক্ষার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেন। ইহার ফলে দর্শকগণকে অনেক সময়ই বিরক্তি অনুভব করিতে হইয়াছে। এইরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ খেলিলেও ৩০৪ রাণ করা কেবল মাত্র সম্ভব হইয়াছে পার্শী দলের ফিল্ডিং খারাপ হওয়ায়। দ্বিতীয় দিনের শেষে পার্শী দলের কয়েকজন খেলোয়াড় অতি সহজ ক্যাচ ধরিতে পারেন নাই। অনেকের মতে মুসলিম দল যে বিজয়ী হইয়াছেন এইরূপ সৌভাগ্যের বলে। তৃতীয় দিনে পার্শী দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত খেলিয়া ৬ উইকেটে ১৭৬ রাণ করেন। ফলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তিনদিন ব্যাপী খেলার নিয়মানুসারে মুসলিম দল প্রথম ইনিংসে অধিক রাণ সংগ্রহ করায় বিজয়ী সাব্যস্ত হন। এইবার মুসলিম-দলকে ফাইনালে অবশিষ্ট দল ও ইউরোপীয় দলের বিজয়ীর সহিত খেলিতে হইবে। অবশিষ্ট ও ইউরোপীয় দলের খেলা ২০শে ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে। এই খেলাটিও খুব উচ্চাঙ্গের হইবে না। প্রথম খেলার ন্যায় ইহাও নিরুৎসাহপূর্ণ হইবে। অবশিষ্ট দল বেশ শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছে। এই দল ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করিতে পারিবে বলিয়া অনেকের ধারণা। তাহা হইলে ফাইন্যাল খেলা হইবে অবশিষ্ট ও মুসলিম দলের মধ্যে। এই খেলাটিও বিশেষ আকর্ষণীয় হইবে না। হিন্দু দল খেলায় যোগদান না করিয়া প্রতিযোগিতার সকল উৎসাহ ও উত্তেজনা যে হরণ করিয়াছে, ইহা ক্রীড়ামোদী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। নিম্নে মুসলিম ও পার্শী দলের খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

পার্শী দল প্রথম ইনিংস:—২৪৫ রাণ (কে তারাপোর ৪২,

এম মিস্ত্রি ৫০, আইবরা ৪৭, জে ভায়া ৪৭, এম দে মোবেদ নট আউট ২৮; আমীর ইলাহি ১২২ রাণে ৬টি, ইয়াকুব শেখ ৫১ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

মুসলিম দল প্রথম ইনিংস:—৩০৪ রাণ (ইয়াকুব শেখ ৫১, মুস্তাক আলী ৭৯, উজীর আলী ৩০, কে নাসিরুদ্দিন ৬৪, সৈয়দ আমেদ ৩৬; পলসিটিয়া ৫৩ রাণে ৩টি, জে খোট ৪৫ রাণে ২টি, কে তারাপোর ৭৫ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

পার্শী দল দ্বিতীয় ইনিংস:—৬ উই ১৭৬ রাণ (এম মিস্ত্রি ৩৩, আইবরা ২৭, জে লইয়ার ৪০, খোট ২০, জে ভায়া নট আউট ২৮; আমীর ইলাহি ৬৪ রাণে ৪টি, চিপ্পা ২১ রাণে ১টি ও ইব্রাহিম ২৫ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন)।

পূর্বভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

কলিকাতার সাউথ ক্লাব পরিচালিত পূর্বভারত টেনিস প্রতিযোগিতা শীঘ্র আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড়গণ যোগদান করিবেন। বৈদেশিক টেনিস খেলোয়াড় দল এইবার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না। কেবল সুইজারল্যান্ডের ম্যাক্স এলমার ও চেকোশ্লোভাকিয়ার কুকুলজেভিক খেলায় যোগদান করিবেন। এই দুইজনের টেনিস খেলায় বিশেষ খ্যাতি আছে। সেইজন্য মনে হয়, ইঁহাদের খেলা বেশ দর্শনযোগ্য হইবে। । বাঙলা প্রদেশের বিশিষ্ট বাঙালী খেলোয়াড়গণের অধিকাংশই খেলায় যোগদান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলে খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে না পারিলেও প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত রীতিমত লড়িয়া যে পরাজয় বরণ করিবেন এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া বাঙলার তরুণ খেলোয়াড় দিলীপ বসু সম্প্রতি ইফতিকার আমেদকে পরাজিত করিয়া যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। বাঙলার খেলোয়ারগণ সুনাম বৃদ্ধি করুন ইহাই আমাদের কামনা। প্রতিযোগিতায় যে সকল বিশিষ্ট খেলোয়াড় বিভিন্ন বিভাগে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

পুরুষদের সিংগলস

ম্যাক্স এলমার, কুকুলজেভিক, গউস মহম্মদ, ইফতিকার আমেদ, এস এল আর সোহানী, যুধিষ্ঠির সিং, প্রেম পান্ধী, সোহনলাল, মদনমোহন, কৃষ্ণস্বামী, দিলীপ বসু, খসু সেন, নসু সেন প্রভৃতি।

মহিলাদের সিংগলস

মিসেস সি কার্গিন, মিস উডব্রিজ, মিসেস ম্যাসী প্রভৃতি। কুমারী লীলারাও যোগদান করেন নাই তবে শোনা যায় তিনি শেষ পর্যন্ত যোগদান করিবেন।

পুরুষদের ডাবলস্

এল ব্রুক এডওয়ার্ডস ও পি মুর্তি, এস এল আর সোহানী ও এইচ এল সোনী, ওয়াই সাবুর ও জিম মেটা, সুব্বারাও ও কৃষ্ণমুর্তি, এম দেও ও দিলীপ বসু, ম্যাক্স এলমার ও রসিককুমার প্রভৃতি।

মিক্সড্ ডাবলস্

জিম মেটা ও মিসেস আর এল ফুটিট, এস এল সোহানী ও মিসেস সি কার্গিন, ইফতিকার আমেদ ও মিস উডব্রিজ, এস মিশ্র ও মিস সুনীতি দেবী প্রভৃতি।

মহিলাদের ডাবলস্

মিসেস ফুটিট ও মিস উডব্রিজ, মিসেস কৃপালনী ও মিস কৃপালনী, মিসেস ম্যাসী ও সঙ্গিনী, মিসেস কার্গিন ও সঙ্গিনী।

প্রবীণদের সিংগলস্

এল ব্রুকএডওয়ার্ডস, এস মির্জা, দয়াশঙ্কর ভার্গব, এল পি মিশ্র, রায় বাহাদুর জি দত্ত, জে কৃপালনী ও এইচ ব্রুক।

সুইস্ টেনিস খেলোয়াড় এলমার

ম্যাক্স এলমার পাঁচবার সুইস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় সিংগলস্ ও ডাবলসে বিজয়ী হইয়াছেন। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যান্ডের পক্ষ সমর্থন করেন ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায়। ১৯৩৬ সালে ব্রিমেন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জার্মান কভার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়ান হন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি পর পর স্টেডম্যান, ডাঃ ডেসার্ট, হেঙ্কেল ও প্যালাভাকে পরাজিত করেন। ১৯৩৮ সালে উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় জাপানী খেলোয়াড় কুরামিটসু, মর্টন, সোহানী ও মিটিককে পরাজিত করেন। কোয়ার্টার ফাইন্যালে অস্টিনের নিকট পরাজিত হন। এথেন্সে তিনি গউস মহম্মদকে পর পর দুইবার খেলায় পরাজিত করেন। প্রথম খেলায় তিনি ৬—৪, ৬—০ গেমে ও দ্বিতীয় খেলায় ৬—৩, ৫—৭, ৬—২ গেমে পরাজিত করেন। তিনি ফ্রান্সের লায়ন্সে ফন ক্রামকে পরাজিত করেন। পরে প্যারিস ও জার্মানীতে ফন ক্রামের নিকট পরাজিত হন। মেটাক্সাকে তিনবার পরাজিত করেন। বরোস্কীকে একবার পরাজিত করেন ও একবার পরাজিত হন। জেন্টনের সহিত খেলিয়া পাঁচবার বিজয়ী হন। এন্ডারমনকে একবার পরাজিত করেন। পুনেসেকের সহিত খেলিয়া একবার পরাজিত হন ও একবার পরাজিত করেন। ব্রুগননকে দুইবার পরাজিত করেন ও একবার পরাজিত হন। হাগসকে দুইবার পরাজিত করেন। ১৯৩৪ সালে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় মহম্মদ শলীমকে পরাজিত করেন। মার্সেল বার্ণার্ডকে একবার পরাজিত করেন।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দক্ষিণাঞ্চলের একটি খেলা হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় মাদ্রাজ দল মহীশুর দলকে ৩ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। মহীশুর দল এইবার লইয়া পাঁচবার মাদ্রাজ দলের নিকট পরাজিত হইল। খেলাটি তিনদিন ব্যাপী হইবার কথা ছিল কিন্তু দুইদিন ব্যাপী হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টি হওয়ায় খেলা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। প্রথম ইনিংসের উপরই নির্ভর করিয়া খেলার ফলাফল নির্ণয় করা হইয়াছে। প্রথমে মহীশুর দল খেলিয়া ১৭১ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। পরে মাদ্রাজ দল খেলিয়া ৭ উইকেটে ১৭৪ রাণ করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

মহীশুর দলের প্রথম ইনিংস:—১৭১ রাণ (এফ ইরাণী ৫৩, এস রমারাও ৩৬; এ জি রামসিং ৩৮ রাণে ৫টি ও সি রঙ্গচারী ৩৭ রাণে ৩টি উইকেট পাইয়াছেন।)

মাদ্রাজ প্রথম ইনিংস:—৭ উইকেটে ১৭৪ রাণ (এস স্বামীনাথম ৬০, ভি মাধবরাও ২৮, এম গোপালন নট আউট ৩৯; বিজয় সারথী ৭৫ রাণে ৪টি, ওয়াই রামস্বামী ৪০ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন।)

সিংহল ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ

সিংহল ক্রিকেট দল ভারতে আসিয়া পেঁছিয়াছে। বর্তমানে এই দল মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছে। ২০শে ডিসেম্বর এই দল সর্বপ্রথম মাদ্রাজ দলের সহিত খেলিবে। দল বেশ শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছে। মাদ্রাজের খেলা শেষ করিয়া উক্ত দল কলিকাতায় আসিবে। বাঙলা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য শক্তিশালী দল গঠন করিতেছেন। বাঙলা দলের অধিনায়কতা করিবেন মেজর সি কে নাইডু। নবনগরের এস ব্যানার্জিও এই খেলায় বাঙলার পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া জানা গেল।

পুস্তক পরিচয়

মনীষীদের ছোটবেলা—শ্রীবিমল ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক মধুচক্র, ১০নং রাজা দীনেন্দ্রনাথ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

লেখক ইতিপূর্বেই ছোটদের উপযোগী কয়েকখানি বই লিখিয়া শিশুমহলে সুপরিচিত হইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের কয়েকজন প্রতিভাবান মনীষীর ছোটবেলার জীবনী অবলম্বনে লিখিত। ইদানীং শিশুসাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ের বেশী সমাদর। প্রতিভাবান মনীষীদের জীবনীও এক একটা অ্যাডভেঞ্চার, আবার শিশুদের চরিত্র গঠনে এর ক্ষমতা অমিত। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কর্মধারায় যে সব মনীষীর দানে সমাজ শক্তিশালী হইয়াছে, সেইরকম কয়েকজন মনীষীর বাল্যজীবনী বইখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বইখানি ছোটদের, সুতরাং সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের উপযোগী আদর্শ জীবনী নির্বাচন ব্যাপারে লেখক যে বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রশংসার পাত্র। লেখকের বলিবার ভঙ্গী চমৎকার, ভাষা ঝরঝরে।

বইখানির ছাপা, প্রচ্ছদপটের বাহিক সৌষ্ঠব এবং লেখকের নিজ হস্তে চিত্রিত মনীষীদের প্রতিমূর্তি—এ সমস্তই বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। জগতের মনীষীদের জীবনীর সংগে সকলেরই পরিচয় থাকা দরকার। জীবনের বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে পেঁৗছাইবার পূর্বে এই সুযোগে প্রতিভাবান মনীষীদের বাল্যজীবনীর সংগে ছোট ছেলেমেয়েদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস বইখানি ছোটদের জীবনে নূতন আলোক সম্পাত করিতে পারিবে।

সুপণ্ডিত ডক্টর কালিদাস নাগ বইখানির ভূমিকাতেও ইহার উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

Bangabasi College Magazine, Autumn number,
Editor-in-chief—Mr. P. K. Bose, M.A., B.L.

বঙ্গবাসী কলেজের সাময়িকপত্র। প্রথমেই ইহার মুদ্রন পারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবে একটা মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে নয়টি ইংরাজী ও তিরিশটি বাঙলা লেখা আছে। মৃত্যুঞ্জয় রায় দুইটি ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার দিক হইতে এই প্রচেষ্টা মন্দ নহে, কিন্তু কি ইংরাজী সাহিত্য কি বাঙলা সাহিত্য ইহাতে সমৃদ্ধ হয় না। Pseudo-Nationalism প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহাকে Pseudo বস্তু অনুসন্ধানের পূর্বে Nationalism-এর সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি। Pseudo কথাটার অপপ্রয়োগে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য বাড়ে না। অধ্যাপক প্যারিমোহন সেনগুপ্ত 'বর্ষা-সুখ' ছন্দে বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'বায়স ভিজিছে আর গাভী ভেজে সুখে'; 'অবিশ্রান্ত বরষার দুরন্ত নর্তনে' গাভীর ভিজিবার সুখটি কবি অনুভব করিয়াছেন, আমরা বুঝি নাই। ছাত্রদের প্রবন্ধগুলিতে একটা সিনিসিজম্-এর রেশ পাওয়া যায়; এই নিদারুণ পরিস্থিতির ইহাই স্বাভাবিক প্রসব মাত্র। এই জিজ্ঞাসা স্বাস্থ্যকর। চিন্তাধারা এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু সম্ভাবনা আছে। কলেজের কাগজে আমরা একটি জিনিস প্রত্যাশা করি—তাহা বিদেশী সংবাদের সঠিক উচ্চারণ। কার্টুনটি সুন্দর।

ভারতবর্ষঃ—পৌষ সংখ্যা। প্রবন্ধগৌরবে পৌষ সংখ্যার ভারতবর্ষ' বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে।। ডক্টর সুরেন্দ্রচন্দ্র দেবের দৃষ্টির স্বাধীনতা ও ইচ্ছা শক্তি', অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চৌধুরীর 'বাঙলায় সমবায় আন্দোলন', শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দাসের দুঃখের নিবৃত্তি ও স্বধর্মপালন' সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ রচনা, প্রবোধকুমারের 'আচার্যিদের বউ', বনফুলের 'বাণপ্রস্থ' সরস গল্প, তারাশংকরের 'গণ দেবতা' ক্রমঃপ্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হইল, স্বর্ণকমলের তীর ও তরঙ্গ'র আকর্ষণ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যার চিত্রসম্পদও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদকের কৃতিত্ব সকল দিক হইতে পরিস্ফুট।

বল্লাল সেনের বৌদ্ধ বিজয়ঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রকালী রায় কবিরত্ন, ধন্বন্তরী, বেদান্ত বিশারদ প্রণীত। ১৯১২, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা। আলোচ্য গ্রন্থখানি রাজভাট ভগীরথ মশ্রের বল্লালের বৌদ্ধ বিজয় গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন ঐতিহাসিক বিষয় জানিবার আছে। ভাষা বিদ্যাসাগরী ঢঙের।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা পাঁচ আনা। প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—'কৃষ্ণপ্রেম জাগে যাঁহার অন্তরে পণ্ডিতেহ ডরে চেষ্টা বুঝিতে না পারে'—ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র নিরক্ষর লাটু মহারাজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রোজ্জ্বল যে স্মৃতিকথা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কীর্তন করিয়াছেন, তাহা পাঠে উক্ত মহাজন বাণীর সার্থকতা পাঠকপাঠিকাগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। ছাপরা জেলার দরিদ্র কৃষক পিতার অনুন্নত-প্রতিবেশ প্রভাব হইতে কলিকাতা শহরে আসিয়া যিনি ভৃত্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা অর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ঘটনাচক্রের কি অদ্ভুত গতিতে মহাপুরুষ-সংস্রবের দ্বারা তিনি মহাসাধকের উচ্চস্তরে অধিরূঢ় হইলেন, তাঁহার স্মৃতিকথার বৈচিত্র্য সামান্য নহে; সাধ্য এবং সাধনতত্ত্বের অনেক অসামান্য সম্পদ এমন জীবনকথার সর্বত্র উদ্দীপ্ত রহিয়াছে, দেশবাসীকে এই সব সম্পদলাভের সুযোগ দিয়া গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গ্রন্থকার মহারাজের উক্তিগুলি অবিকল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের আশ্রয় যে গ্রহণ করেন নাই, ইহাতেই বুঝা যায় তিনি নিজে একজন ভক্ত, ভাবুক এবং প্রকৃত পণ্ডিত পুরুষ। সাধকের উক্তির শব্দ এবং অর্থের শক্তির নানা রস অভিব্যক্তির সংগে তাঁহার আত্যন্তিক পরিচয় আছে এবং তিনি তেমন উক্তির অন্তর্নিহিত গর্ব আস্বাদনের নিজে একজন অধিকারী।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—ষোড়শ বার্ষিক বিশেষ সংখ্যাঃ—কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যাগুলি শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ের সুসম্পাদনায় এতটা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে যে, সেগুলির পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ গৌরবে, মুদ্রণ সৌষ্ঠবে, চিত্র-সম্পদে সকল দিক হইতেই অপূর্ব হইয়াছে। এমন সংখ্যা-সম্পাদনের কৃতিত্ব শুধু সম্পাদককেই গৌরব দেয় নাই, কলিকাতার পৌরজনগণেরও গৌরব বর্ধন করিয়াছে। স্বদেশ এবং বিদেশের বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দের মননসম্পদে গ্রথিত এই মণিহারের ঔজ্জ্বল্য সকলকে মুগ্ধ করিবে। পাঠক-পাঠিকাগণ এই সংখ্যা পাঠে নিজেদের ঘরের কথা অনেক জানিতে পারিবেন এবং তাহার ভিতর দিয়া জাতির জীবনধারার সংগে যুক্ত হইতে সক্ষম হইবেন। এমন সুদৃশ্য এবং শোভন-সংস্করণের মূল্য মাত্র আট আনা—খুবই সুলভ বলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা।

'শ্রদ্ধয়া দেয়ং'—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ পণ্ডিত ব্যক্তি, তদুপরি তিনি সাধক এবং ভক্ত। তাঁহার দান শ্রদ্ধার অবদান। তাই তাঁহার সম্পাদিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি একাধারে মনোরম, সুগম এবং সুবোধ্য। তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল এবং মূল্যানুগ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এমন সুন্দর এবং সুশোভন সংস্করণ আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। এমন পুস্তক প্রতি গৃহের সম্পদ এবং শোভা বৃদ্ধি করিবে। এমন বই দেখিতে আনন্দ, পড়িতে আনন্দ এবং হাতে লইলেও আনন্দ হয়।

সায়ন্তনী (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীভারতী নিয়োগী, সংহতি পাবলিশিং হাউস, ৭নং মুরলীধর লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ফর্মা, ১৫৩ পৃষ্ঠা। 'নীরাজন' এবং 'মধুচ্ছন্দা'র কবি অপূর্বকৃষ্ণের এই নূতন কাব্যগুচ্ছগুলি আমাদের মধুর লাগিয়াছে। অপূর্ববাবুর লেখা শুধু বুদ্ধিবৃত্তির আনুমানিকতার আখড়াই নহে, তাহা অনুভূতিতে বলিষ্ঠ এবং সজীব এবং সেইজন্যই সেগুলি নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। অন্তর-রসের উৎসধারার সংগে নিজকে যুক্ত করিবার মত বিগাঢ়তা কবির আছে, তাঁহার ছন্দোমাধুর্যের মূল হইল এইখানে। তাঁহার গাথাগুলি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে, জাতীয়তামূলক এই গাথাগুলির ঝঙ্কার মানবতার উচ্ছ্বাসে চিত্তকে আপ্লুত করে। তাঁহার লেখার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হইল এই যে, শ্যামা বাঙলার স্বাভাবিক এবং বিশিষ্ট যে একটি সুর, সেই সুর তাঁহার লেখার মধ্যে পাওয়া যায় এবং সেই আত্মীয়তার স্পর্শ দেয় অন্তরে অপূর্ব আপ্যায়ন; মাধুর্য পায় রূপ। বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে কবি অপূর্বকৃষ্ণের সৃষ্টির এই স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা 'সায়ন্তনী' সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। এমন সুন্দর প্রচ্ছদপট আমাদের চোখে খুবই কম পড়িয়াছে।
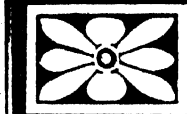
দেশ
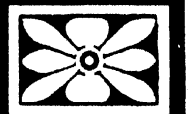
৮ম বর্ষ ।   ১৩ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল Saturday, 28th December, 1940   [৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গ্রামে আহ্বান

"অশুভ-প্রণোদিত এবং অনিষ্টকর এই উদ্যম"—অশীতিপর চার্য প্রফুল্লচন্দ্র মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতির আসন তে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে এই অগ্নিগর্ভ ণী উচ্চারিত করিয়াছেন। সম্মেলনে বাঙলা দেশের শিক্ষা-ব্রতী এবং প্রতিনিধিস্থানীয় দশ সহস্রের অধিক নরনারী মবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শুধু দশ বিশ জার লোকের প্রতিনিধি নহেন, সমগ্র বঙ্গের শিক্ষা এবং স্কৃতির তিনি প্রতিনিধি। তাঁহার কথা সমগ্র বাঙালী জাতির ন্তরের কথা। সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জের ব্যক্তিত্বকে সমগ্র বাঙালী জাতির সঙ্গে এক করিয়া য়াছেন। বাঙলার শিক্ষাসচিব মৌলবী ফজলুল হক সেদিন লয়াছেন যে, প্রস্তাবিত শিক্ষা বিলের বিরোধিতা আন্ত-রিকতার সঙ্গে বাঙলা দেশে হয় নাই। উহা বর্ণ হিন্দুদের ম্প্রদায়িক আন্দোলন মাত্র। গত ২১শে ডিসেম্বর লিকাতায় হাজরা পার্কের সভার ব্যাপারে তাঁহার তন্যোদয় হইবে কি? যদি না হয়, জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য ফুল্লচন্দ্রের বাণী আমরা তাঁহাকে শুনাইয়া দিতেছি। চার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন, 'যদি এই অনিষ্টকর উদ্যম ত্যাহৃত না হয়, তাহা হইলে বাঙলা দেশে শান্তি থাকিবে ।' বাঙলী জাতি এখনও মরে নাই। বাঙালী শিক্ষার স্কার যে না চাহে, এমন নহে, কিন্তু শিক্ষার সংস্কারের নামে ম্প্রদায়িক স্বার্থমূলক রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বাঙলা দেশের স্কৃতিকে বলি দিতে সে প্রস্তুত নহে। প্রস্তাবিত বিলে ক্ষার আদর্শকে বড় করিয়া দেখা হয় নাই। যাঁহারা প্রকৃত ক্ষাব্রতী কিংবা বাঙলা দেশের সংস্কৃতিকে যাঁহারা নিজেদের দানে গড়িয়া তুলিতেছেন, প্রস্তাবিত বোর্ডে তাঁহাদের স্থান নাই, আছে সে ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিচারের। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট এবং সে কথা লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যে বিলের পরিকল্পনা এইরূপ, শিক্ষার সম্প্রসারণ সে বিলে হইতে পারে না। আচার্যদেব কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন এবং সে কথা সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তরের কথা, বাঙলা দেশের শুভানুধ্যায়ী মাত্রেরই তাহা মর্ম বাণী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন—'এই বিল কাহারও পক্ষে কল্যাণকর হইবে না, এমন কি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষেও নয়। শিক্ষার মৃদুল স্নেহ-লতিকা শুধু পারস্পরিক বিশ্বাসের স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যেই পুষ্পিত এবং পল্লবিত হইয়া থাকে। যদি এই লতিকাকে প্রচুর ফল-পুষ্প-প্রসবিনী দেখিতে চাও, জাতীয় ঐক্যের ভূমি হইতে তাহার মূলকে ছিন্ন করিও না। শিক্ষা সম্প্রসারণের সুফল যদি সমগ্রভাবে লাভ করিতে ইচ্ছা সত্যই থাকে, সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা কর এবং দেশ হইতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া জাতির সকল শক্তিকে সংহত কর। কিন্তু কার্যকারিতা এবং সংগঠনের নামে, এই লতাকে, যে ভিত্তি এত ঝঞ্ঝা হইতে ইহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহা হইতে ছিন্ন করিও না।"

বাঙলা দেশের বর্তমান শিক্ষা সংকটের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আচার্য রায় বলিয়াছেন—

'বাঙলা দেশের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষা পরিচালনা সরকারের সর্বময়কর্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত করার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। বর্তমানে প্রচলিত গভর্নমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিধাকর্তৃত্ব মোটের উপর ভালই চলিয়াছে; কিছু কিছু সংস্কার করিয়া লইলে এবং মধ্য শিক্ষার উৎকর্ষ ও প্রসারের জন্য যথেষ্ট সাহায্য মিলিলে ইহা হইতেও উৎ-

কৃষ্টতর ফল লাভ হইতে পারে। বর্তমান শিক্ষা ব্যাপারের যে সকল ত্রুটী তাহা দ্বৈধ কর্তৃত্বের ফলে ঘটে নাই, অর্থাভাবে ঘটিয়াছে।' কিন্তু বাঙলার শিক্ষা সচিব সে দিকে না গিয়া শিক্ষা সংস্কারের নাম শিক্ষা সংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি যদি এই অনিষ্টকর উদ্যম হইতে এখনও প্রতিনিবৃত্ত না হন, সমগ্র বাঙলার জনমতের বিরুদ্ধতার তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতার উদ্দেশ্য—

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলন সংশিলষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া এদেশের যুবক সম্প্রদায়কে যে উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনাইয়াছেন, আমরা আশা করি, মুসলমান তরুণদের চিত্তে তাহা প্রভাব বিস্তার করিবে। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস এই যে, ভারতের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িকতাজনিত যে সব ভেদবিরোধ এতটা দেখা দিয়াছে, আইনসভাসমূহে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন নীতির প্রবর্তনই ইহার মূল কারণ। যাহারা ভারতে জাতীয়তার বিকাশ দেখিতে চাহে না, তাহারাই এমন নীতির ক্রীড়নকস্বরূপে চলিতে চাহিবে। কিন্তু আমার মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, আপাতলভ্য সুখ-সুবিধা বা অধিকারের বিনিময়ে সমগ্র জাতির চরম স্বার্থকে বিসর্জন করা তাঁহাদের উচিত নহে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাম্প্রাদায়িক সিদ্ধান্ত আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের অধিকার রহিয়াছে। সে ক্ষেত্রে ঐ নীতি অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইবে। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, যদি ঐক্যের এই বাণী বহুলভাবে প্রচারিত হয় এবং এই আন্দোলন দেশে ব্যাপক আকার ধারণ করে, তাহা হইলে তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন যে, শিক্ষক হিসাবে আমরা হিন্দুও নহি, মুসলমানও নহি, সে ক্ষেত্রে জাতির আদর্শ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট করিবার দায়িত্ব আমাদের উপর রহিয়াছে। শিক্ষা-সংস্কারের নামে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতির সম্প্রসারণে সায় দেওয়া আমরা আমাদের পক্ষে আত্মমর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করি। স্যার সর্বপল্লী সকল শিক্ষাব্রতীর অন্তরের কথা প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। শিক্ষার আদর্শ যিনি লাভ করিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের মূল নীতির বিরুদ্ধতা তিনি করিবেনই। এমন বিল সমর্থন করার অর্থ জাতির আদর্শ এবং উন্নতির স্পষ্টভাবে পরিপন্থিতা অর্থাৎ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। দেশের দুর্দশা লইয়া যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের মধ্যেই শুধু ইহা সম্ভব।

বড়দিনের বাণী—

বড়দিন আরম্ভ হইয়াছে এবং কামানের গর্জনে এই উৎসবের হইয়াছে উদ্বোধন; বোমাবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত গ্রাম এবং পুরবাসিগণের কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশকে মুখরিত করিয়া বড়দিনের আনন্দের আসর জমিয়া উঠিতেছে। মানুষকে ভালবাসার কথা, প্রেমের কথা, শান্তির কথা, এখন উপেক্ষিত এবং উপহসিত। এমন সময়ে ভারতের এক নিভৃত আশ্রম হইতে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' ভারতের প্রাচীন ঋষিদের এই প্রেমের মন্ত্র উদ্গীত হইয়াছে। রোগশয্যা হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"যে ভোগ একান্ত স্বার্থগত, ত্যাগের দ্বারা তাকে ক্ষালন করিতে হইবে। যে ভোগে সর্বমানবের ভোজের আহ্বান আছে, সভ্যতার স্বরূপ আছে তার মধ্যে। কিন্তু রিপু অতি প্রবল, সাধনা অতি দুরূহ। সেই কারণেই এই সাধনায় যতদূর সিদ্ধিলাভ করা যায়, মনুষ্যত্বের গৌরব ততদূর প্রসারিত হোতে থাকে, ব্যাপ্ত হোতে থাকে তার সভ্যতা। যুগ প্রতিকূল, বর্বরতা বলিষ্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ করে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় বলে ভুল না করি। লোভ যে সম্পদ আহরণ ক'রে আনে, তাকে মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত ঐশ্বর্য জ্ঞান করে এসেছে এবং অহংকৃত হয়েছে সঞ্চয়ের মরীচিকায়। লোভের ভাণ্ডারকে রক্ষা করবার জন্যে জগৎ জুড়ে অস্ত্র-মহাযুদ্ধের আয়োজন চলল। সেই ঐশ্বর্য আজ ভেঙে চুরে তার ভগ্নাবশেষের তলায় মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে।"

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ-মিশ্রিত, জগৎ আজ যে অবস্থায় পেঁৗছিয়াছে তাহাতে বাহিরের এই ঐশ্বর্যের উপচারের আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া অন্তরের পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে একান্ত করিয়া উপলব্ধি করিবার মত শক্তি তাহার নাই। সে ঐশ্বর্যগত সংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের অর্জিত সম্পদের প্রতি লুব্ধ হস্তক্ষেপ, এই অভ্যাস অনার্য অভ্যাস এবং এই অভ্যাস মাদকতার মতো শরীর মনকে অভিভূত ক'রে রাখে। তার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা পরম আঘাতেও অসাধ্য। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর শিক্ষা দেশকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই মনের ভিতর ধ্যান করিতে হইবে; কারণ পাশ্চাত্য সংক্রামকতা আমাদের জাতির মধ্যে প্রবেশ ক'রে ভারতবর্ষের পুরাতন আধ্যাত্মিক বীর্যকে প্রতিদিন পরাস্ত করেছে।" এই যে পরাভব এবং পরাভবের মূলে এই যে অবীর্য, যাহার জন্য পাশ্চাত্যের সংক্রামতা স্পৃষ্ট হইবার মত অবস্থায় আমরা পড়িয়াছি তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ত্যাগময় বলিষ্ঠ সাধনার উদ্বোধন করিতে হইবে; এবং সেই জিনিষের যদি উদ্বোধন ঘটে, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং রাজনীতিক স্বাধীনতা এক সঙ্গেই আসিবে। রাজনীতিক হিসাবে পরাধীন থাকিয়া ঋষি বাক্যের গূঢ়ার্থকে যেমন আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না, তেমনই ঋষি বাক্যকে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে রাজনীতিক অধীনতাও আমাদের থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের বাণী মানবধর্মের বাণী, সেই বাণী ভারতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করুক।

বড়দিনের ডালি—

বিলাতের কমন্স সভার নয় জন সদস্য ভারতের জনসাধারণের নিকট এক দীর্ঘ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা লিখিলেন তাহাতে নূতন বিশেষ কিছুই নাই; আছে শুধু এই কথা যে, বড়লাট শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারতবাসীদের তাহাই মানিয়া লওয়া উচিত; কেন উচিত, সে পক্ষে তাঁহারা কারণ দেখাইয়াছেন এই যে, যুদ্ধের পর ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসন যখন দেওয়া হইবেই, তখন মাঝামাঝি এই ব্যবস্থাই একমাত্র উপযুক্ত। তাঁহারা বলিয়াছেন,—'প্রশ্ন হইতেছে যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন ভারতবর্ষ কিভাবে শাসিত হইবে। যুদ্ধে ভারতের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যাহাতে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা আরও পূর্ণভাবে যুক্ত থাকেন, সেজন্য ইচ্ছা পোষণ করা ভারতের পক্ষে খুব উচিত এবং স্বাভাবিক; তবে আমাদের মনে হয় যে, নূতন ধরণের গভর্নমেণ্ট সৃষ্টি না করিয়া একটা সাময়িক ব্যবস্থা দ্বারা উহা কার্যে পরিণত করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমাদের মনে হয় যে প্রথম পন্থায় অনেক বিপদ আছে। ঐরূপ গভর্নমেণ্ট স্থায়ী হইবে—চূড়ান্ত ব্যবস্থায় পৌঁছিবার পথে একটা মাঝামাঝি ঘাঁটির মত। এখানে বিপদ আছে, ভারতীয়রা হেতু সন্দেহ করিবে যে, তাহাদিগকে অনির্দিষ্টকাল ঐ মাঝামাঝি ঘাঁটিতে থাকিতে বলা হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহারা নিশ্চয়ই ঐ মাঝামাঝি ঘাঁটিতে চূড়ান্ত শাসনতান্ত্রিক নিরিখে পরিমাপ করিবে। সে পরিমাপে উহার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইতে বাধ্য।" বলা বাহুল্য, এই সব যুক্তি নিতান্তই বাজে। এক পক্ষের জিদে কোন মীমাংসা হয় না, মীমাংসায় উভয় পক্ষের মতের সামঞ্জস্য থাকা চাই। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতবাসীদের মতের কোন মূল্য না দিয়া নিজেদের মতকেই বড় করিয়া দেখা হইতেছে। শাসন-পরিষদের সদস্যদিগকে আইনসভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন করিতে গেলে গোটা শাসনতন্ত্রের উলট-পালট কিছুই করিতে হইবে না—সাময়িক ব্যবস্থা স্বরূপে স ব্যবস্থা অবলম্বনে শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণের চেয়ে বিশেষ কিছু ঝঞ্ঝাটও নাই। দায়িত্বসম্পন্ন শাসন পরিষদের ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকাল বজায় রাখা হইবে, এমন সন্দেহের কারণ যদি থাকে, তাহা হইলে দায়িত্বহীন সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের ব্যবস্থার মারফতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বৃটিশ কর্তৃত্ব যুদ্ধের পরও অনির্দিষ্টকাল বজায় রাখা হইবে, এমন সন্দেহ করিবার কারণ ভারতবাসীদের পক্ষে আরও বেশী থাকিবে। ইহা নিতান্ত বালকেও বুঝে। কেননা প্রস্তাবিত দায়িত্বশীল শাসন-পরিষদে এখনই তবু একটু ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে; ভারতবাসীরা এখনই কিছু পাইতেছে এবং সেই পাওয়ার ভিতর দিয়া বৃটিশ রাজনীতিকদের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস বরং বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু কোন ক্ষমতা কার্যত না দিয়া এখন যদি শুধু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেওয়াই হয়, তাহা হইলে অতীতের অভিজ্ঞতায় ভারতবাসীদের মধ্যে বৃটিশ রাজনীতিকদের প্রতি সন্দেহ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে। সকল দিক হইতেই এই বিবৃতি প্রদান নিতান্ত অনাবশ্যক ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। বিবৃতি প্রদানকারী সদস্যগণ বলিয়াছেন, যাঁহারা বড়লাটের বিবৃতি ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সম্প্রতি বিলাতে গিয়া যুদ্ধের পরে বৃটিশ জনসাধারণের মনোভাবের যে কতটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আসেন নাই, করিলে দেখিতে পাইতেন, ভারতকে 'পূর্ণ রাজনীতিক স্বাধীনতা' দিবার জন্য ইংরেজজাতি কি পরিমাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে বৃটিশ জাতির এই ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ আমাদিগকে করিতে হয় নাই, কারণ কোমলপ্রাণ ভারতবাসীদের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন হইত; কারণ, যুদ্ধের জন্য বৃটিশ রাজনীতিকেরা এমনি ব্যাকুল, তার উপর আবার ভারতের জন্য ব্যাকুলতা!

অন্তরেই শক্তির উৎস—

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের চত্বারিংশৎ বার্ষিক উৎসবে তাঁহার প্রদত্ত বাণীতে বলিয়াছেন—"যৌবনের তেজ যখন প্রখর ছিল ভাবতুম বার্ধক্যটা একটা অভাবাত্মক দশা অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তি হ্রাস হয়ে সেই দশা মৃত্যুর সূচনা করে। কিন্তু আজ আমি এর ভাবাত্মক দিক ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারছি। সত্তার যে বহিরঙ্গ, যাকে আমরা অহং নাম দিতে পারি, তার থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশ শিথিল হ'য়ে আসছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন পরিণত ফল তার বাহিরের খোসাতে আর আসক্ত হয়ে থাকে না, সেই খোসাটা ক্রমশ তার পক্ষে নিরর্থক হয়ে ওঠে। তখন তার প্রধান সম্পদ হয় ভিতরের শস্য। কাঁচা অবস্থায় সেই শস্যের পরিণত রূপ সে অনুভব করতে পারে না, সেইজন্যে তাকে বিশ্বাস করে না। তখন সে আপনার বাহিরের পরিচয়েই পরিচিত হোতে চেষ্টা করে। সেখানে কোন আঘাত পেলে সে পরম ক্ষোভের বিষয় ব'লে মনে করে। সে অন্তরের পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে যত উপলব্ধি করতে পারে ততই একটা পরম আশ্বাস লাভ করে এবং ততই বাহিরের ক্ষতি অথবা অসম্মান তাকে আর ক্ষুব্ধ করতে পারে না। আমাদের সত্তার যে অন্তর বিভাগে আধ্যাত্মিক সত্য পরিব্যক্ত হইয়া থাকে তার প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ হয়, তখন সর্বত্র তার শান্তি এবং সকলের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য। এই আন্তরিক সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করার সাধনায় কোন বয়সের ভেদ নেই।" বাঙলার বৈষ্ণব সাধক অন্তরের এই রস উৎসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলিয়া গিয়াছেন—"ন বয়ঃ তস্যাঃ অতিবিপ্লবায়"—"ন গ্রায়তি দ্যোতত এব কামম্" এ রস ক্ষীণ হয় না ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—অন্নচিন্তার আত্যন্তিকতায় অভিভূত যাহারা, সেই নিত্য মৃত্যুগ্রস্ত, চিন্তাগ্রস্ত জাতির পক্ষে সে রসের আস্বাদন কোথায়?

ভারতের ঐক্য—

জিন্নাসাহেব সিন্ধুপ্রদেশে গিয়া মোস্লেম লীগের মর্যাদা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। মৌলানা আজাদ সকল দলের ঐক্যকে ভিত্তি করিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সিন্ধুর ব্যাপারে জিন্নাসাহেব তাহা উল্টাইয়া মোস্লেম লীগের স্বাতন্ত্র্যকে বড় করিয়া দিয়াছেন। পাকিস্থানি মন্ত্রের তিনি প্রচারক। তিনি যে সময়ে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিবার নীতিকে জিদের সঙ্গে চালাইতে চাহিতেছেন, এমন সময়ে ভারতের চিন্তাশীল মুসলমান জনসাধারণ যে ঐক্যের উপর জোর দিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়। স্যার সুলতান আহম্মদের রাজনীতিক মতবাদের সঙ্গে আমাদের মতের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান; কিন্তু তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-সংস্কার উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর জোর দিয়া যুবকদের কাছে তিনি যে আবেগপূর্ণ আবেদন করিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। স্যার সুলতান আহম্মদ বলেন, যদি সহজ-বুদ্ধিতে আমরা হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাটিকে দেখি, তবে তাহা সমাধানের অতীত নহে, আর যদি উভয় সম্প্রদায়ের ভেদ-বিভেদ ও অনৈক্যকে বড় করিয়া দেখি, তবে মিলনের আশা সুদূরপরাহত। কথা তো হইতেছে ইহাই—নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং মান, যশ ও প্রতিষ্ঠার দায়ে একদল লোক এই বিভেদকেই বড় করিয়া দেখিতেছে, শুধু তাহাই নহে, যেখানে বিভেদ নাই, সেখানেও বিভেদের কারণ বুঝাইয়া দিতেছে। এই শ্রেণীর লোকের অনিষ্টকারিতা দেশের তরুণ সম্প্রদায় যত সত্বর উপলব্ধি করিতে পারেন, ততই মঙ্গল এবং জগতের অবস্থার দিকে তাকাইয়া দেশের স্বাধীনতার বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে যুবক সম্প্রদায়েরই সর্বাগ্রে তাহা উপলব্ধি করা উচিত; কারণ মহান্ আদর্শের সর্বপ্রকার প্রেরণা যুবকদের অন্তরকে সহজে স্পর্শ করে। ভারতের তরুণ মুসলমান সম্প্রদায় এখনও নিশ্চয়ই মধ্যযুগীয় সংস্কারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইবে না।

হক সাহেবের হুঙ্কার—

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাবে যে সব উপদেশ ছিল তাহা বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়াছেন, বিল আমি পাশ করাইবই। বিলের বিরুদ্ধে যত সব আন্দোলন তাহা গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতামূলক এবং কাস্ট হিন্দুদের কান্ড। এদেশের জাতীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বৃটিশ রাজ-নীতিকগণ যে সব কূটকৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার ফলে কতকগুলি উদ্ভট পরিভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'কাস্ট হিন্দু'ও একটি। হক সাহেব জাতীয়তাবিরোধী কূটবাক্য-বিস্তারে শিক্ষা বিলের আন্দোলনের জোর কমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন, পিতলকে সোনা বলিয়া চালাইবার দিন এদেশে আর নাই। বাঙলার জনমতকে উপেক্ষা করিয়া তিনি শিক্ষা বিল আইনে পরিণত করিতে হয়ত পারেন, কিন্তু মর্লের পাকা সিদ্ধান্তকে যে বাঙলা কাঁচা করিয়াছিল সেই বাঙলার জাগ্রত জাতীয়তার শক্তির কথা তাঁহার যেন কিঞ্চিৎ স্মরণ থাকে।

দুর্জ্ঞেয় নীতি—

যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি করিয়া সত্যাগ্রহ করিবার ফলে দুই বৎসরের জেল হইতে আরম্ভ করিয়া আদালত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আটক প্রভৃতি বিভিন্ন রকম সাজার মধ্যে নিরিখ যে কি আছে, সে তত্ত্ব নির্ণয় করিতে আমরা চাহি না। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কর্মিগণ প্রত্যহ সত্যাগ্রহ করিতেছেন, এমন কি সত্যাগ্রহী দলের নেতা ডাক্তার খানসাহেব প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছেন যে, বক্তৃতায় স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না; তেমনই বাঙলা দেশের অন্যত্র সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, অথচ কলিকাতা শহরে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি দিনের পর দিন করিলেও গ্রেপ্তার করা হইতেছে না। ইহাতে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে, বাঙলার মন্ত্রীদের বিশেষ ক্ষমতায় কলিকাতা শহরে বক্তৃতার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও তেমনই বিশেষ অধিকার স্বীকৃত অঞ্চল? এই দুইটি স্থানে যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি করিতে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এলাইয়া না পড়িয়া থাকে, তবে কি ইহাই বুঝা যায় না যে, অন্যত্রও সে আশঙ্কা অমূলক।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

(১৩)

চিত্র ব্যাপার!

অনেকদিন পরে অমল সারাটা পথ আপন মনে হাসিতে সিতে বাসায় ফিরিয়া আসিল। টাকা দুইটা তাহার রাইয়া দেওয়াই হয়ত উচিত, কিন্তু তাহার তখন যা বস্থা, তাহাতে টাকা হাতে পড়িলে আর ফিরাইয়া দেওয়া য় না। আর, সে ভাবিয়া দেখিল, যখন তাহাকে ঘুষ দিয়া ্রি বজায় রাখিতে হইবে, তখন লইতেই বা বাধা কি? পথেই একটা খাবারের দোকানে ঢুকিয়া বহুদিন, বোধ র একযুগ পরে নিজের ইচ্ছামত খাবার কিনিয়া লইল। দও পথে আসিতে আসিতে আবার ঐ সাত আনা পয়সা কা খরচ করার জন্য মনে মনে একটু অনুশোচনাও য়েছিল।

ঘরের চাবি খুলিতেই নজরে পড়িল একখানা খামের ঠি মেঝের উপর পড়িয়া আছে। পিওন চাবি বন্ধ দেখিয়া জা গলাইয়া দিয়া গেছে; তাহাকে আবার এ ঠিকানায় চিঠি দিল? সে বিস্মিত হইয়া খামটা তুলিয়া লইয়া খিল হাতের লেখা ইন্দুর; অর্থাৎ অমল চলিয়া আসিবার ই ইন্দু চিঠি লিখিয়াছে। অমল মনে মনে হাসিল, নব-বাহিতদের কান্ডই আলাদা!

মুখ হাত ধুইয়া কেরোসিনের আলো জ্বালিয়া সে জা বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার পর ধীরে সুস্থে টা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। ইন্দুর বড় চিঠির হইতে আর একটা একফালি কাগজের টুক্‌রা বাহির য়া পড়িল, অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা, আঁকাবাঁকা বড় হরপে দুইটি মাত্র লাইন।

লবাবু

কেমন আছেন? আপনার জন্য বড়ই মন খারাপ বোধ হইতেছে। ১ দিবেন। নমস্কার জানিবেন। —কমলা।

কমলা চিঠি দিয়াছে! ইন্দুর বৌ!

অমল সেই দুইছত্র লেখাই বার-তিন পড়িল, তাহার পর খ বুজিয়া কমলাকে ভাবিবার চেষ্টা করিল। তাহার কথা আসিতেই চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে সেই চন্দনলিপ্ত নত মুখখানি, আর মনে পড়ে তাহার থরথর কম্পিত দসিক্ত কোমল হাতখানি! আর তাহার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর! ি প্রথম দিনের কোনমতে বলিয়া ফেলা তিনটি শব্দ— া কইছি ত!'

অকস্মাৎ অমলের সারাদেহ যেন কোন্ এক অদ্ভুত নকানুভূতিতে বার বার শিহরিয়া উঠিল। বিছানায় চুপ য়া শুইয়া থাকা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল, সে ঠটা সযত্নে বালিশের তলায় রাখিয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া বার চারিদিকে চাহিল। মনে হইল যে, এই অত্যাশ্চর্য াদটা কাহাকেও দেওয়া প্রয়োজন, কাহাকেও ডাকিয়া যেন শোনাইতে পারিলে বাঁচে যে, এক নববিবাহিতা কিশোরী াকে চিঠি লিখিয়াছে।* ইহা নিতান্তই সৌজন্য, হয়ত ইন্দুর বিশেষ অনুরোধেই তাহাকে লিখিতে হইয়াছে, খুব সম্ভব কথাগুলি ইন্দুরই বলিয়া দেওয়া, কিন্তু তবু চিঠি ত? অমল কল্পনায় তাহার লিখিবার সময়কার অবস্থাটা ভাবিয়া লইল, সংকোচে, লজ্জায় কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, খারাপ হাতের লেখা বলিয়া লিখিতে রাজী হইতেছে না, অথচ ইন্দুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত কলম ধরিতে হইয়াছে; হাত কাঁপিতেছে, কিন্তু মুখে কৌতুকের হাসি এবং বোধ হয় মনের মধ্যে লিখিবার ইচ্ছাও আছে—

সহসা অমল যেন নিজে-নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। এ কি? তাহার কি এখন কিশোরী মেয়েকে লইয়া দিবা-স্বপ্ন দেখা উচিত? এমন কথাও একবার যেন মনের মধ্যে কে প্রশ্ন করিল, সে কি ঐ কালো মেয়েটির প্রেমে পড়িতেছে? কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে যতটা দেখা যায়, একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বুঝিল যে, সে আশঙ্কা নাই, ইহা নিতান্তই কিশোরী মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের সহজাত দুর্বলতা।

মনে পড়িয়া গেল যে, ইন্দুর চিঠিটাই সে এখনও পর্যন্ত পড়ে নাই; বেচারীর উপর ঘোরতর অবিচার করিয়াছে। চিঠিটা কখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, দেখিতেও পায় নাই। সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে শুরু করিল—

ভাই অমলদা,

আপনি চলে যাবার পরই এমন মন খারাপ হয়ে গেল যে, আর যেন কিছুই ভাল লাগছে না। রাজ্যের দুর্ভাবনা এসে ঘিরে ধরছে। মনে হচ্ছে আপনাকে কাছে পেলে যেন একটু বল ভরসা পেতুম। সে উপায় ত আর নেই, এই মুহূর্তে আপনাকে কোথায় পাই বলুন? তাই চিঠি লিখতে বসলুম।

আপনার নতুন বন্ধুটিও আপনাকে চিঠি দিচ্ছে, জবাব দেবেন। লিখতে কি চায়? বলে আমার বিশ্রী হাতের লেখা, বানান ভুল, তোমার অমলদা কি ভাববেন বলো ত? আজ আবার কি কান্ড করেছে জানেন? সকাল বেলা উঠেই ঢিপ ক'রে এক প্রণাম। বলে 'পিসিমা শিখিয়ে দিয়েছিল, এতদিন মনে ছিল না'। অদ্ভুত, নয়?

আমরা বোধ হয় রবিবার নাগাদ ফিরব। ও'রা তাই লিখেছেন। সোজা গিয়ে ও'দের বাড়ীই (মানে আমার শ্বশুর বাড়ী) উঠতে হবে।

আমার ভালবাসা ও নমস্কার নেবেন। ইতি—

আপনার ইন্দু।

একেবারে ছেলেমানুষ! যৌবনের রঙগীন স্বপ্ন এবং বাস্তবের দুশ্চিন্তা—এই দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যে পড়িয়া কিশোর মনটি টলমল করিতেছে। এ বয়সে আনন্দের দিকে, রসের দিকেই মন স্বভাবত ঝুঁকিয়া থাকে, সুতরাং দুর্ভাবনাকে আপাতত ইন্দু ঠেকাইতে পারিবে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া অমল চিন্তিত না হইয়া পারিল না।...

বাহিরে গিয়া কাগজ কলম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাত্রেই অমল চিঠি লিখিতে বসিল। ইন্দুকে কয়েক লাইন এবং কমলাকে দুই ছত্র; কী-ই বা লিখিবে? কিন্তু তবুও ছোট্ট দুখানি চিঠি শেষ করিয়া শুইতেই রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, সে কোন্ এক দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে,

অন্ধকার রাত্রি, শুধু সেই বনের মধ্যেও কোথা হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সানাইয়ের সুর, সে সুর যেন আর থামে না—

পরদিন বারোটার সময় অফিসে গিয়াই সে কাজে লাগিয়া গেল। এতদিন পরে একটা কাজ পাইয়া সে বাঁচিয়াছে। মাহিনা না পাক্, তবু কাজ। আরো একটা সুবিধা যে, লাইব্রেরী ঘরটি অফিসের অন্যান্য বিভাগ হইতে দূরে এবং একেবারে আলাদা। কেরাণীবাবুদের যা নমুনা সে পাইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া কাজ করিতে হইলে বিষম বিব্রত হইতে হইত।

কিন্তু মনটা খারাপ হইয়া গেল তাহার দরখাস্তের মঞ্জুরীপত্রটা পাইতে। তাহার দরখাস্তের উত্তরে কোম্পানী জানাইয়াছেন যে, লাইব্রেরীয়ানবাবুকে সাহায্য করিবার জন্য "লেখাপড়া জানা বেয়ারার" কাজটি তাহাকেই দেওয়া হইল!

এতদিন পরে কাজ যদি-বা মিলিল ত সে বেয়ারার। কিন্তু দেবেশবাবু পিট চাপড়াইয়া বলিয়া গেলেন, ও নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ ক'রোনা ভায়া, বার টাকা মাইনেতে কেরাণী রাখা যায় কি ক'রে বল দেখি? সেই জন্যই ও কথাটা লিখেছে। তাছাড়া চিরদিনই কি তুমি এই বার টাকা মাইনেতে কাজ করবে? ঢুকতে বেরতে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলেই ভাল ক'রে নমস্কার ক'রো, আর নতুন বই কেনা হ'লেই ভাল ভাল বইগুলো আগে থাকতে খাতায় লিখে বড়বাবুর পরিবারের জন্যে গছিয়ে দিও—ব্যস্! হঠাৎ একদিন দেখবে যে চল্লিশ টাকা মাইনেতে ঢুকে গেছ—।

যাক্—ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! দুইবেলা ভাল করিয়া আহার জোটেনা যাহার, তাহার কাছে বেয়ারার চাকরীও অবহেলার বস্তু নয়।

অমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাজে মন দিল। কাজও খুব কম নয়। বই জমা করা, বই বাছিয়া দেওয়া, পুনরায় সেগুলি মিলাইয়া তোলা, খাতাপত্র ঠিক করা—কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহার যেন আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না। লাইব্রেরীয়ান বাবু সেদিনও একবার মিনিট পনেরর জন্য দেখা দিয়া সরিয়া পড়িলেন, বলিলেন, একটা এস্টিমেট করতে করতে উঠে এসেছি, বুঝলে না, এখন যদি এখানে দেখতে হয় ত ওধারে রাত আটটা বেজে যাবে বাড়ি ফিরতে। তুমি চালিয়ে নিতে পারবে না আজকের দিনটা?

অমল রাজী হইতেই তিনি গৃহিণীর জন্য আর একখানা মোটা বই সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। অমল একলা থাকিতে মোটেই অনিচ্ছুক নয়, বরং ঐ মানুষটি থাকিলেই সে অস্বস্তি বোধ করিত। সব কাজ শেষ করিয়া যখন সে খাতাপত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল তখন সন্ধ্যার খুব বেশী দেরী নাই। অফিসের প্রায় সব বাবুই চলিয়া গিয়াছিলেন, শুধু যাঁহারা ক্যাশে কাজ করেন তাঁহারাই কয়েকজন তখনও হিসাব মিলাইতে ব্যস্ত। আর বসিয়াছিল তাহার বেয়ারাটা—সে আসিয়া ঘরের জানলা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, বাবু আপনি ত ভূতের মত খাটছেন দেখছি, বার টাকা মাইনেতে অত খাটেন কেন? আর ও বাবু পঁচিশ টাকা বাড়তি পায় এই কাজের জন্যে, অথচ দিব্যি ফাঁকি দিচ্ছে—তাহার বার টাকা মাহিনার সংবাদটা তাহা হইলে এই বেয়ারাটাও রাখে। লজ্জায় অমলের দুইটা কান হইতে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল, সে কহিল, কী বা করব ভাই, কাজ না ক'রে! শুধু শুধু বসে থেকেই বা লাভ কি?

বেয়ারাটা কহিল, কেন এলেন আপনি অত কম মাইনেতে? এত লেখাপড়া জানেন, অন্য কোন কাজ পেলেন না? আমিই ত আপনার চেয়ে বেশি মাইনে পাই!

অমল ম্লান হাসিয়া কহিল, অন্য কোনও কাজ পেলে কি এখানে কেউ আসে জগন্নাথ? বার টাকায় অন্তত দুটি খেতে পাবো ত?

জগন্নাথ বোধ হয় এতটা আশা করে নাই। সে লজ্জিত হইয়া কহিল, তা বটে বাবু, মাপ করবেন ওটা আমার বোঝবার ভুল।......আপনি কিছু ভাববেন না বাবু, বড়বাবুর জামাই রেসের দিন হলেই আমার কাছে টাকা ধার চাইতে আসে, ওকে দিয়েই আমি আপনার মাইনে ঠিক করিয়ে দেব—

অমল মোটা বই একখানা বগলে করিয়া অতি ধীরে ধীরে অফিসের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আজ সারাদিন ধরিয়াই তাহার মায়ের কথা মনে হইতেছে, কেমন আছেন তাঁহারা কে জানে? দশ বার দিন পরেই এ মাস কাবার, অন্ততঃ অর্দ্ধেক মাসের মাহিনা ত সে পাইবেই, সেই টাকাটা একেবারে বাবার নামে মনিঅর্ডার করিয়া দিয়া সে মাকে চিঠি দিবে মনে মনে সংকল্প করিল।

[১৪]

একটু অন্যমনস্কভাবেই অমল পথ চলিতেছিল, সহসা পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল গঙ্গাধরবাবু। সে একটু লজ্জিতই হইল। কারণ সেই রাত্রির আশ্রয়ের পর আর একটি দিন মাত্র সে তাঁহার বাড়ি গিয়াছিল, আর কোন খবরই লওয়া হয় নাই। কিন্তু গঙ্গাধরবাবু কোনপ্রকার ভর্ৎসনার ধার দিয়াও গেলেন না, কাছে আসিতেই একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, কেমন আছ ভাই? ......নানা রকমে এমন জড়িয়ে রয়েছি তোমার একদিন যে খবর নেব তাও পারিনি, বড্ড লজ্জিত আছি।

অমল হেঁট হইয়া গঙ্গাধরবাবুর বাধাসত্ত্বেও তাঁহার পায়ের ধুলা লইল, তাহার পর কহিল, অপরাধ আমারই দাদা, আমার মত বেইমান কেউ নেই—। আমারই যাওয়া উচিত ছিল।

জিভ কাটিয়া গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, ছি ছি ওকথা কি বলতে আছে! আর তা ছাড়া তুমি যাওনি ভালই করেছ, আমরা এখন এই বৌবাজারেই আছি যে—

অমল বিস্মিতও হইল, ভীতও হইল, কহিল, তার মানে? ও বাড়ী—

গঙ্গাধরবাবু জবাব দিলেন, না ভাই মাস তিনেক হ'ল সে গেছে।

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেনাটার জন্যেই কি—

বেশ সহজভাবেই গঙ্গাধরবাবু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ওরা নিলাম ক'রে নিলে। ও একরকম ভালই হয়েছে অমল, একটু একটু ক'রে দগ্ধে মরার চেয়ে ও আপদ গেছে ভালই হয়েছে। কি বলব ভাই রাত্রে দুশ্চিন্তায় ঘুম হ'ত না। বরং দেনা শোধ হয়েও ছশ' টাকা নগদ পেয়েছি, মেজ মেয়েটাকে যদি ওর মধ্যেই পার করে দিতে পারি ত মন্দ হয় না—

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলিবার পর গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, আমাদের কার্তিকের কি হয়েছে শুনেছ?

অমল কহিল, কৈ না, কি হয়েছে?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গাধরবাবু জবাব দিলেন, ওর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। শেষ ছেলেটা হবার পর থেকেই নানা অসুখে ভুগছিল, শেষে বাড়াবাড়ি হ'তে কল্‌কাতায় নিয়ে আসতে হ'ল। বেচারীর ভয়ানক সাধ ছিল কলকাতায় বাসা ক'রে স্বামী-পুত্র নিয়ে দিনকতক ঘর করবে, বাসা নেওয়াও হ'ল শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঘর করতে আর হ'ল না। চেয়ারে চড়ে বাড়িতে ঢুক্‌লে আর একেবারে খাটে চেপে বেরিয়ে গেল।

অমল নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। কীই-বা কথা কহিবে সে! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বেচারী কার্তিকবাবু! একমাত্র রেসের নেশাতেই লোকটির সব গেল, কিন্তু মানুষটির যে হৃদয়ের পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহার পর আর তাঁহাকে অবজ্ঞা করা চলে না! ভদ্রলোক এখন কি অবস্থায় আছেন কে জানে, স্ত্রীর জন্য তাঁহার যে গভীর আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে ত সন্দেহ নাই। রেসে বড় লোক হইয়া একেবারে ভাল বাড়ীতেই স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া আসিবেন, এই ইচ্ছা ছিল বলিয়াই কিছুতে আগে বাসা করিতে পারেন নাই। এখন নিশ্চয়ই তাঁহার অনুতাপের সীমা নাই।

গঙ্গাধরবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, শুধু কি তাই? আবার বিপদের ওপর বিপদ দেখ না, রেস খেলে খেলে একেই দেনাপত্তরে জড়িয়ে ছিল, তার ওপর এই দম্‌কা খরচার মধ্যে এসে পড়ল। বিশেষ করে শেষের দিকটায় ওর ত আর জ্ঞান ছিল না, পাগলের মত হয়ে পড়েছিল একেবারে—ডাক্তার আর ওষুধ যেখানে যত ছিল, সব এনে জড়ো করেছিল—ব্যস্! সেই সময়টায় কোথা দিয়ে কি হয়ে অফিসের কতকগুলো টাকা ভেঙে ফেলে চাক্‌রীটিও গেল।

অমল চকিত হইয়া কহিল, চাক্‌রীও গেল? বলেন কি? তাহ'লে এখন উপায়?

গঙ্গাধরবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, উপায় ভগবান ভাই, আমাদের আর কি উপায় আছে বলো? সাহেব ভালবাসত বলে প্রভিডেন্ড ফন্ডের টাকাটা পুরোই পেয়েছিল, এখনও তাইতে চলছে। তবে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে, এখানকার বাসা তুলে ওর ভাইয়ের কাছে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেবার সময় ভাইয়ের হাতে বৌয়ের গয়নাগুলো আর হাজার টাকা নগদ দিয়ে দিয়েছে। বড় মেয়েটা মাথায় মাথায় হয়েছে, সেটাকে পার করতে পারবে, আর যাই হোক, বাকী ছেলেমেয়েগুলোকেও ভাই ফেলবে না। তাদের জন্য ভাবি না, ভয় ওর জন্যেই। সেই মেসেই আছে, হাতেও চার-পাঁচশ' টাকা ছিল জানি, হিসেব করে চললে বছর দুই চলতেও পারে, কিন্তু রেস না খেলে কি থাকতে পারবে?

সে সংশয় আর যাহারই থাক্ অমলের ছিল না। রেস তিনি খেলিবেনই এবং আগে যতটুকু বাঁধ ছিল, এবারে বোধ করি তাহাও থাকিবে না। হয়ত ইতিমধ্যেই সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। সে কহিল, এর মধ্যে কতদিন কার্তিকবাবুর খবর পান নি দাদা?

গঙ্গাধরবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া কহিলেন, তা প্রায় মাস দেড়েক হ'ল। বড্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে বুঝি, কিন্তু মোটে সময় ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। আজ যাবে ভাই? চল না বাসাটা ঘুরে আসি—।

অমল ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার ও মেসে যেতে একটু বাধা আছে দাদা—

নিমেষে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, ঠিক ঠিক—আমারই ভুল বটে।......আচ্ছা আমি কাল যাব এখন। তুমি এখন চলো আমার বাসায়, একটু চা-টা খেয়ে যাবে—

তাঁহারা ততক্ষণে গঙ্গাধরবাবুর নূতন বাসার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছিল। একটা তেতালা বাড়ীর নীচের দুইটি ঘর লইয়া উঁহারা থাকেন, কতকটা ফ্ল্যাটের মতই, তাহারই ভাড়া মাসে আঠারো টাকা। তবু উহা নিজের বাড়ির চেয়ে অনেকখানি পরিষ্কার, আলোবাতাসও ঢের বেশী। তাহাকে দেখিয়া গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী সকলরবে অভ্যর্থনা করিলেন, চা, জলখাবার ত দিলেনই, রাত্রের খাবারও না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না এবং বাহিরের রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া বার বার মাথার দিব্য দিয়া দিলেন যে, রবিবার যেন সে নিশ্চয়ই আসে এবং এইখানে আহার করে; আজ কোন যোগাড়ই ছিল না, কিছুই খাওয়া হইল না, ইত্যাদি।

পথে আসিয়া অমলের আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, এই জন্যই মানুষের ঘরের এত মায়া, বাসা বাঁধিবার ইচ্ছা তাহার এত প্রবল! গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী পৃথিবীতে অসংখ্য নাই সত্য কথা, কিন্তু ঐ যে দৈবাৎ এক আধবার জীবনে ইঁহাদের সাক্ষাৎ মিলে, সেই কথাই মানুষ আর ভুলিতে পারে না, ইঁহাদের মায়া দুর্নিবারবেগে মানুষকে ঘরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে!

গঙ্গাধরবাবু উপদেশ দিয়া দিলেন, ভায়া বার টাকা মাইনে মার্চেন্ট অফিসে বাহাত্তর টাকা হ'তে বেশি দেরী হয় না, শুধু বড়বাবুর দিকে নজরটা রেখে যেও, আর সাহেব দেখলেই সেলাম কেরো—

অমল যখন বাসায় পৌঁছিল, তখন প্রায় বারটা বাজে, কিন্তু দূর হইতে নিজের ঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়া

তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে প্রায় দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, ইন্দু দ্বার খুলিয়া আলো জ্বালিয়া তাহারই বিছানাতে চুপ করিয়া শুইয়া আছে! তালার দ্বিতীয় চাবিটা যে এখনও তাহার কাছে আছে, অমল ভুলিয়াই গিয়াছিল।

ইন্দু ক্লান্ত সুরে কহিল, আপনি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন অমলদা--

গলার আওয়াজটা অমলের ভাল লাগিল না, ইহা অন্তত ঠিক নববিবাহিত তরুণের মত নয়। সে বসিয়া পড়িয়া কহিল, কিন্তু আমি ত আপনাকে আশাই করিনি এরি মধ্যে!

ইন্দু জবাব দিল, আমি আজই সকালে এসেছি। বিকেলবেলা বেরোবার আগে ওখানে বলেই এসেছিলুম, আজ রাত্রে আমি আপনার কাছে থাকব। একটু থাকব অমলদা--?

কী আশ্চর্য! আপনি পাগল হলেন নাকি? নিশ্চয়ই থাকবেন। কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা যে তার আগে করা দরকার!

ইন্দু হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, থাক্ থাক্ আমার খাবার ইচ্ছাও নেই, দরকারও নেই বিশেষ। শ্বশুরবাড়িতে জলখাওয়া হয়েছে প্রচুর। কিন্তু আপনি?

অমল সংক্ষেপে গঙ্গাধরবাবুর কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল, কিন্তু তা হোক্. সামান্য কিছু নিয়ে আসি আপনার জন্য।

ইন্দু কহিল, আনুন। বেশি কিছু আনবেন না, সত্যিই আমার খাবার ইচ্ছে নেই--

অমল খাবার আনিয়া দিয়া, জল গড়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিল। ছোট হ্যারিকেনের সামান্য আলোতে ইন্দুর মুখের যে চেহারাটা নজরে পড়িল, তাহাতে দুঃসংবাদের আভাস! ইন্দুও কথা কহিল না, নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া আবার শুইয়া পড়িল। অমল আলোটা নিভাইয়া দিয়া তাহার পাশে শুইয়া পড়িয়া কহিল, তারপর ব্যাপার কি বলুন দেখি--?

ইন্দু অনেকক্ষণ পর্যন্ত জবাব দিল না। সামনেই দড়ির আনলায় খানকতক কাপড় টাঙ্গান ছিল, তাহার উপর রাস্তার গ্যাসের আলোর একটা রেখা আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণের বাতাসে কাপড়টা মধ্যে মধ্যে দুলিতেছিল, ফলে তাহার ছায়াটা যেন পিছনের দেওয়ালে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। দুজনেই সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল। অমল অনেকক্ষণ পরে ইন্দুর দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার বুকে একটা হাত রাখিয়া আবারও কহিল, কি হ'ল বলুন দেখি শেষ পর্যন্ত? কোন মনোমালিন্য ঘটেছে কি?

ইন্দু আরও মুহূর্ত-দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, সে সব কিছু নয় অমলদা, আপনি যে মনোমালিন্যের কথা ভাবছেন, আপাতত তার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরকম স্ত্রী বহু ভাগ্যে মেলে--

তবে?

ইন্দু জবাব দিল, শ্বশুরমশায় যে বহুদিন ধরে লুকিয়ে রেস খেলেন, সেটা অনেকেই জানত না। কিন্তু তার ফলে তাঁর হাতের নগদ টাকা সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। টাকাটা গেলেও মেজাজটা যায়নি, মেয়ের বিয়েতে খরচার হাতটা কিছুতেই কমাতে পারলেন না এবং সেটা কোথা থেকে নিতে হয়েছিল তা জানেন কি? অফিস থেকে।

অমল কথা কহিল না। এখনও সমস্তটা শোনা হয় নাই, কিন্তু যেভাবে মেঘ জমিয়াছে তাহাতে দুর্যোগটার পরিমাণ অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দুই একটু পরে পুনরায় কথা কহিল, তাতেও বিশেষ অসুবিধা হ'ত না কারণ বহুকাল ধরেই অফিসের বাড়তি টাকা ওঁর জিম্মাতেই থেকে আসছে আর নগদ চার পাঁচ হাজার টাকার কম কোনও দিনই থাকেনা। ....সে টাকা কেউ দেখতেও পায় না শুধু কাগজে কলমে তার হিসাবটা দেখেই সাহেবরা ছেড়ে দেন। সেই ভরসাতেই শ্বশুর মশায় তা থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, ভরসা ছিল যে এর মধ্যে কিছু কিছু ক'রে টাকাটা আবার শোধ ক'রে দেবেন, কেউ জানতে পারবে না।

ইন্দু চুপ করিল। অমল কহিল, তারপর?

ইন্দু ম্লান হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি, আমার বরাত। কখনও যা হয়নি আমার অদৃষ্টে তাই ঘট্‌ল। গত শনিবার হঠাৎ বড়সাহেব এসে টাকাটা দেখতে চাইলেন। হয় ত তার মধ্যে অফিসের আর কারুর হাতও ছিল, যাই হোক্--টাকাটা যখন দেখান গেল না, তখন তাঁরা মাত্র তিন দিনের সময় দিলেন। আর কোনও উপায় ছিল না ব'লেই শাশুড়ীর অসুখের খবর দিয়ে আমাদের আনানো হয়েছে; শাশুড়ী ঠাক্‌রুনের সব গহনা বিক্রী ক'রেও পাঁচশ টাকা কম পড়েছিল, আমার কাছে কমলার খানকতক গহনা ধার ব'লে চাওয়া হ'ল। সুতরাং আর্মলেট আর নেকলেশ দুটিই বেচারীকে খুলে দিতে হ'ল। আমারই চোখের সামনে পোদ্দার ওজন ক'রে নিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল--

অমল খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিল, তা হোক্, গেলই বা না হয় দুখানা গয়না। মনে করুন তাঁরা ও দুটো গয়না দেননি--

ইন্দু হাসিল। অন্ধকারে সে হাসি দেখা গেল না, নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তবুও অমল তাহা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, সবটা এখনও শোনেন নি যে! .... টাকাটা শোধ করে দিয়ে চাক্‌রী যাবারই কথা, সাহেব ভালো বাসেন ব'লে সেটা এড়ানো গেছে বটে কিন্তু বড়বাবুর চাকরি আর ওঁকে করতে হবে না। মাইনেটাও একশ পঁচাত্তর থেকে শুধু পঁচাত্তরে নেমে এসেছে! সুতরাং, যদিও শ্বশুর মশাই এখনও মুখে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কিন্তু ও অফিসে কারু

চাক্‌রী করে দেওয়া যে আর ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে, এ বিশ্বাস আমার নেই—

আবারও বহুক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া রহিল। মনে হইল যেন ঘরের মধ্যেকার বাতাসটা ডেলা পাকাইয়া দুজনের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, কাহারও কথা কহিবার সাধ্য নাই—

অনেকক্ষণ পরে অমল ভাষা খুঁজিয়া পাইল, কহিল, দেখুন এখন নামিয়ে দিলেও সাহেবরা যে সব বাবুকে ভালবাসে, চট্‌ করে তাদের ওপর থেকে স্নেহটা যায় না, আবার আপনার শ্বশুর মশায় রাইজ করবেন; তা ছাড়া তাঁর নিজের প্রোমোশন পাওয়া সম্ভব না হ'লেও ব'লে কয়ে তাঁর জামাইকে কি আর কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না? আমার ত মনে হয় সেটা এমন কিছু অসম্ভব হবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দু জবাব দিল, কে জানে কি সম্ভব হবে! কিন্তু আমি ত মনে কোন বল পাচ্ছি না।

তাহার পর সহসা অমলের দিকে পাশ ফিরিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, কী হবে অমলদা। আমার যে কী ভয় হচ্ছে কী বলব আপনাকে। কেন একাজ ক'রে বসলুম তাই ভেবে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি, সুবিধে কিছুই হ'লনা বরং আরও দুর্ভাবনা বাড়ল। বেশ ছিলুম আপনার কাছে, কেন এ দুর্মতি হ'ল কে জানে! পেলুমনা কিছুই—উপরন্তু আগে স্বাচ্ছন্দ্য না থাক্‌ শান্তি ছিল, এখন সে শান্তিটুকুকেও বিদায় দিতে হ'ল।

অমল সান্ত্বনাচ্ছলে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, কিছুই কি পেলেন না? একটী মেয়ের ভালবাসা কি তাহ'লে এতই তুচ্ছ জিনিস ইন্দুবাবু?

লজ্জিত হইয়া ইন্দু জবাব দিল, তা বটে। সেটা তুচ্ছ করার জিনিস নয় মানি, আর ভগবানের ইচ্ছেয় সেটা পেয়েছিও অজস্র। কিন্তু বড্ডই দুর্ভাবনা অমলদা—

আর কেহই কথা কহিল না।

ঘরের মধ্যে নিবিড় নিস্তব্ধতা, বাহিরেও প্রায় তাহাই; একটা রাস্তার কল কে দড়ি বাঁধিয়া খুলিয়া রাখিয়াছে, সারারাত্রি ধরিয়া তাহারই একটা একটানা জল পড়ার শব্দ, আর দূরে, প্রশস্ততর রাজপথে কদাচিৎ এক-আধখানা গাড়ি চলার আওয়াজ, ইহা ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নাই; সমস্ত শহর যেন মরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তবুও সেই দুটি তরুণের কিছুতেই নিদ্রা আসিল না, সেই রকম আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই দুজনে সারারাত জাগিয়া কাটাইয়া দিল। (ক্রমশ)

ঘাটের ব্যথা

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

নদীতে তোমার এসেছে জোয়ার
টলমল তরী তব;
যাও তবে দূরে যত পারো দূরে
লও গতি-পথ নব!
নোঙর তোলার যত হোক ব্যথা
বুকে আমি চুপে তবু সহিব তা
ঘাটের বেদন চির হয়ে থাক
তাই নিয়ে আমি রব।

রেখো নাক মনে কভুও গোপনে
এ ঘাটের কোনো স্মৃতি
নদী-কল্লোলে গাহ নানা ছলে
নব যাত্রার গীতি।
কেন বিষণ্ণ করিছ বয়ান
কেন জলে ভরো তব দুনয়ান;
ভুলে যাও ওগো ঘাটে সঞ্চিত
বন্ধন-মোহ প্রীতি।

নীল নভে চলে হের দলে দলে
হালকা মেঘের সার,
পাল তুলে যায় কত তরী হায়
পিছনে চাহে না আর।

তুমি কেন তবে ম্লান করো মুখ
ছাড়িতে পার না মায়া এইটুক?
কেন পিছনের পানে নত চোখে
চাহ শুধু বার বার।

আমি বুক পাতি রব দিন রাতি,
রহিব হেথায় স্থির,
তাহে কিবা যায় ভরা দরিয়ায়
চলমান তরণীর!
দিন যায় চলি রাতি আসে ফিরে
দখিনের বায়ু বহে ধীরে ধীরে
ঘাটে এসে তরী যায় চলে' ভেসে
বুকে নদী সরণীর।

তুমি যাও দূরে বাঁকে বাঁকে ঘুরে
জোয়ারের টানে টানে,
মিশে যেয়ো শেষে দিগন্ত-দেশে
নূতনের সন্ধানে।
অপলক চোখে আমি রব চেয়ে
হেরিব কোথা সে তরী যায় ধেয়ে,
ঢেউ আসি দিবে আমারে বেদন
জোয়ারের জয়গানে।

আমাদের শিল্পকলা

শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত

শিল্প সমালোচনা প্রসঙ্গে আর্টের ইতিহাসে দেখা যায় যে,—'প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে যে অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় লোক প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তারই আভাস কল্পনার ঐশ্বর্যে ও সুদক্ষ হস্তের তুলি চালনার নৈপুণ্যে স্পষ্টতররূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার মধ্যে নিয়ে আসার নামই চিত্র শিল্প।' তবে আর্টের কোন নির্দিষ্ট সংগা দেওয়া কঠিন। মানুষের মধ্যে—রেখায়, বর্ণে, অনবদ্য সংগীতে যেদিন অন্তরের অনুভূতিকে রূপ দেওয়া হল, সেদিনই আর্টের জন্ম। সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মনে যে ভাবধারা উদ্বেল হয়ে উঠে, সেই অন্তর-ধর্মই আর্ট সৃষ্টির গোড়ার কথা। মানুষের সমস্ত অন্তর সাধনা ও প্রেরণার একত্রীভূত প্রকাশকেই আর্টের আখ্যা দেওয়া হয়। বিশ্বকবির কথায়—'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই আর্টের কাজ।'

তিনিই প্রকৃত আর্টিষ্ট যিনি জগতের সকলের সঙ্গে আপনার অন্তরের অনুভূতির একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজের ভাবধারাকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। আর্টিষ্টের দায়িত্ব তাই অসীম। মানব সমাজের তিনি প্রতিভূ, জাতির তিনি মুখপাত্র। জাতির সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতি ও অবনতি ঘটে। কোন জাতির পরিচয় সেই জাতির সাহিত্য ও শিল্প।

সত্যিকারের আর্টিষ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জাতির মঙ্গল ও জন-সমাজের কল্যাণ সাধন করা। সংস্কার-গত বা জন্মগত সুকৃতির ফলে আর্টিষ্ট প্রকাশের যে শক্তি পেয়েছেন, তার উপযুক্ত ব্যবহার—জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই তাহার প্রয়োগ করা। অবশ্য রূপ ও রস প্রয়োগ করাই আর্টিষ্টের অন্যতম ধর্ম। কিন্তু শুধু রূপ ও রস পরি-বেশন করেই আর্টিষ্টের কর্তব্য সমাপ্ত হবে না—যদি না ইহাতে শিক্ষার একটা কিছু দিক থাকে।

শিক্ষা বলতে আমরা কোন্ শিক্ষা বুঝি? কেবল লিখতে পড়তে সমর্থ হওয়া নহে, কেবল স্মরণ শক্তির চর্চা নহে। কেবল বিষয় বিশেষের জ্ঞান লাভও নহে। প্রকৃত শিক্ষা গঠনমূলক ও উহার স্বভাব অতিশয় ব্যাপক। কাজেই শিল্প শিক্ষার মধ্যে যে শিক্ষা আমাদের চাক্ষুষ জ্ঞান (visual knowledge) ও সৌন্দর্য বিজ্ঞানকে মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত করে তাহাই হয় শিল্প-শিক্ষার একমাত্র আদর্শ।

আমরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি? ভারতীয় শিল্প ও

সিদ্ধার্থ—শিল্পী নন্দলাল বসু

পাশ্চাত্য শিল্পকলার সাহায্যে পৃথক একটা জগত নির্মাণ করে ত্রিশঙ্কুরের মতো সেখানে বাস করছি। তার ফলে ভারতীয় শিল্পকলাকেও সম্পূর্ণরূপে জানি না; পাশ্চাত্য শিল্পকলারও রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারি না। এই পাশ্চাত্য কলা সাধনায় আমরা যতটুকু উৎসাহ ও constructive imagination অপব্যয় করি, তাতে আমাদের জাতীয় সৌন্দর্য বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারতাম। সাধারণত বিলাতী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করলে ইংরেজী ভাষা যেরূপ সহজে আয়ত্ত করা যায়, শিল্পকলা সম্বন্ধে ঠিক সেরূপ কথা বলা চলে; কিন্তু তাতে জাতীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের জাতীয় শিল্পকলা ভালই হোক,

আর মন্দই হোক্, তাই আমাদের নিজস্ব এবং তা সগৌরবে রক্ষণীয়। তার বহুল প্রচারে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে, স্কুল-কলেজে, শিক্ষিত মহলে চাই এর প্রাণপণ সহানুভূতি ও সচল তাগাদা। তাদের মধ্যে যেমন অন্যান্য বিষয় আলোচনা হয়, তেমনি শিল্পের বিশেষ করে ভারতীয় শিল্পের আলোচনা হওয়া উচিত।

প্রথমত আমাদের এই অভাব দূর করার সহজ উপায় হচ্ছে দেশীয় চিত্রশালার প্রতিষ্ঠান। সুখের বিষয় যে, বর্তমান যুগে আমাদের দেশে নিজস্ব সম্পদের দিকে মানুষের দৃষ্টি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও রস-গ্রাহীর চেষ্টায় অনেকটা আকৃষ্ট হয়েছে। তার ফলে ভারতের নানাস্থানে চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, ভারতীয় নৃত্য ইত্যাদির চেষ্টা ও শিক্ষার প্রসার কিছু কিছু অগ্রসর হয়ে চলেছে। সে আজ বেশী দিনের কথা নয় যখন শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হ্যাভেল সাহেবের চেষ্টায় ভারতবর্ষে চিত্রকলার নবযুগ আরম্ভ হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, শিল্পকলা তখন ছিল ধর্মের ভিত্তি, সামাজিক জীবনের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। সেজন্য দৈনন্দিন জীবনের উপর শিল্পের প্রভাব ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বাড়ির দরজার আলপনা থেকে আরম্ভ করে, কাঁথার উপর সূচী শিল্প, বরণ ডালা, দেবমন্দিরের গাত্র পর্যন্ত কোন জিনিসই শিল্প সুষমার প্রলেপ থেকে বঞ্চিত নয়।

শেষ কথা, বিশ্বের দরবারে ভারতীয় শিল্প আজ তার সীমানা অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে। নিক্তির মাপকাঠিতে একে ওজন করার দিন চলে গেছে। অবশ্য ভারতীয় শিল্প ও পাশ্চাত্য শিল্পের পথ বিভিন্ন—কারুর সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক আনা চলে না। দুইটি সমান্তরাল পথ নিয়ে যেখানে অনুভূতি, সেখানে হয়তো হবে এদের সমন্বয় বা মিলন।

চৈতন্যদেবের বৈরাগ্য—শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্নদা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক কষ্টে চাকর মিলিল। বন্ধুই সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বলিয়া গেলেন, "লোকটা বিশ্বাসী, চোর ছ্যাঁচড় নয়। একটু যত্ন ক'রলেই টি'কে যাবে।"

অন্নদাচরণ টি'কিয়া যাইবার লক্ষণই দেখাইতেছিল। তাহার সেই অতিরিক্ত রকম উগ্র টি'কিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বাড়িশুদ্ধ লোক চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। যাহাই হউক শ্বশুরের অসুখের সংবাদ পাইয়া অন্নদা সম্প্রতি দেশে গিয়াছে, আশা করি আর ফিরিয়া আসিবে না। শুনিয়াছি শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে ছাড়া কেহ নাই। অন্নদা বলিয়াছিল সম্পত্তি যথেষ্ট আছে এবং সেই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাহার জমিদারী নিষ্কণ্টক হোক, আমরা গৃহস্থপোষা গোছ একটি লোক খুঁজিতেছি।

প্রথম দিন কাজে লাগিয়াই অন্নদা আমাদিগকে তাহার গুণের ফিরিস্তি দিল। বন্ধু তাহার একটা গুণের কথাই বলিয়া গিয়াছিলেন, এখন বুঝিলাম তাহার গুণ অনেক! সে স্পষ্টবাদী, সে শিক্ষিত, সে ধর্মভীরু! বলিল, "বাবু, আমি ভদ্দরলোকের ছেলে পেটের দায়ে চাকরী করতেই না হয় এসেছি, তা ব'লে অধর্ম ক'রব কেন? আর চাকরী ক'রব, তা'তে লজ্জাই বা কিসের? চাকরী তো আপনিও ক'রছেন? মাইনে দু' টাকা বেশী কি দু' টাকা কম, এই তো? গতর খাটা'ব, জুতো মে'রে পয়সা নেব। কি বলুন বাবু?"

পয়সা দিতে নারাজ নই, কিন্তু তাই বলিয়া চাকরের কাছে জুতা খাইবার প্রস্তাবটাতে সজ্ঞানে সম্মতি দিতে পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিজের সহিত তাহার তুলনাটা একটু শ্রুতি-কটু লাগিল। অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, "যাও, যাও, এখন নিজের কাজ করগে।" বুঝিলাম লোকটা স্পষ্টবাদী; কিন্তু আমি নিজেই স্পষ্টবাদী বলিয়া একই সংসারে একজন সমগুণান্বিত ব্যক্তির আবির্ভাবটা খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলাম না।

দুপুরে ভাত খাইতে বসিয়াছি, গৃহিণী পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "আচ্ছা, লোক এনেছ যা হোক! কোনও কাজ জানে না, কেবল বাক্যি সার! বাসনগুলো মেজেছে দেখ না? হাত দিতে ঘেন্না করে। ব'লতে গেলুম, তাই আবার কত কথা! সদ্য এ'টোগুলো জল দিয়ে ধুয়ে রেখেছে গো!"

ডাক দিলাম, "অন্নদা!" অন্নদা দোতলায় ঝাঁট দিতে-ছিল, ঝাঁটা হস্তে ছুটিয়া আসিল। তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীটা একটু বিচিত্র রকমের, দুইটি পায়ের গোড়ালি বাহিরের দিকে করিয়া বুড়া আঙুল দুটি পরস্পর ঠেকাইয়া দাঁড়ায়, দেখিলেই ছোটবেলার উপকথায় শোনা অপদেবতার কথা মনে পড়ে। সে একটু হাসিয়া বলিল, "বাবু, ডাকছিলেন?"

আমি গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "দুপুর-বেলা এতক্ষণে তোমার ঝাঁট দেবার সময় হ'ল? কি ক'র-ছিলে এতক্ষণ? আর বাসনগুলো কি রকম ক'রে মেজেছ? সমস্ত সক্‌ড়ি লেগে রয়েছে যে?" অন্নদা একগাল হাসিয়া বলিল, "পুরুষ মানুষের বাসন মাজা আর ওর চেয়ে কি ভালো হ'বে বাবু? আমাদের বাড়িতে মেয়েরা বাসন মাজে, যেন রুপোর মত ঝক ঝক করে। আমাদের এ তো বাসন মাজা নয়, যেন যাদুর গায়ে হাত বুলোনো। কথায় বলে যার কাজ তারে সাজে।"

গৃহিণী বলিলেন, "শুনলে কথা? চাকরবাবু ব'সে থাকবেন আর আমরা যা'ব বাসন মাজতে!"

অন্নদার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। বলিল, "তা' ক'রবে কেন মাঠাকরুণ? তা' হ'লে যে সংসারের উপকার হবে? আমাদের বাড়ির মেয়েরা বাসনও মাজে, কাপড়ও কাচে, ঘরও নিকোয়, ধানও ভানে আবার রান্না ক'রে, দুবেল্যা দুমুঠো খেতেও দেয় সোয়ামীপুত্তুরকে। তোমরা শহুরে মেয়ে, খাবে দাবে আর পটের বিবিটি হ'য়ে ব'সে থাকবে। দেখুন বাবু, আপনারাই মেয়েদের মাথা খাচ্ছেন আদর দিয়ে দিয়ে"—

ধমক দিয়া বলিলাম, "বেশ ক'রছি। তুমি বেশী কথা কইবে না। কাজ ভালো ক'রে ক'রবে তো কর, না পার তো বলো, আমি অন্য লোক দে'খব। যাও!" অন্নদা অগত্যা সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, "গরিবের কথা বাসি হ'লেই মিষ্টি লাগে।"

গৃহিণী বলিলেন, "শুনলে আস্পর্ধার কথা! আমার মাথা খুঁড়ে ম'রতে ইচ্ছে ক'রছে! চাকরে আমাকে বলে কি-না"—বলিলাম, "চাকরবাকরের কথা যত কানে না তোলা যায় ততই ভাল! আচ্ছা ডালটা এমন ট'কে গেল কেন বল দেখি? কালকের বুঝি?"

টকের ডাল ভালবাসি বলিয়া গৃহিণী সেটা মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া ছুটির দিনে, নিজে রাঁধিতেন! রাগ করিয়া বলিলেন, "না, পরশুর।"

বুঝিলাম ঔষধ ধরিয়াছে, গৃহিণী অন্নদাকে ছাড়িয়া আমারই উপর মনঃসংযোগ করিয়াছেন। বলিলাম, "গরম-কাল, বাসি জিনিস কাউকে খাইয়ো না। বাকীটা বরং ফেলেই দিয়ো।" গৃহিণী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আচ্ছা।"

বলিয়াছি সেদিন ছুটি ছিল। দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রা সারিয়া অন্নদার খোঁজ লইতে গেলাম। দেখি, সে বৈঠকখানায় আমার দামী কৌচখানার উপর নিজের তৈলসিক্ত কাঁথা পাতিয়া এবং ততোধিক কৃষ্ণবর্ণ বালিসে মাথা দিয়া দিব্য আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে। ডাকিলাম "অন্নদা!"

অন্নদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পরক্ষণেই চোখ কচলাইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে প্রথমত পা বাঁকাইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "এখানে ঘুমোচ্ছ কেন? তোমার ঘরে কি হ'ল?"

অন্নদা সপ্রতিভভাবে বলিল, "এ ঘরটা বেশ ঠান্ডা কিনা। আর কখন কে আসে, দরজা খুলতে হয় কি না হয়"—

অন্নদার বুদ্ধি আছে। আমি সুর নামাইলাম। বলি-লাম "তুমি তো দেখি চাকরদের ঘর ছেড়েই দিয়েছ, এই ঘরেই তোমার আড্ডা। বিছানা-মাদুরগুলোও তোমার তোলবার

ফুরসৎ হয় না। পাঁচটা ভদ্রলোক আসে ঘরে, কি ভাবে তা'রা? খবরদার বলছি তুমি আমার কৌচে শোবে না, শুতে হ'লে মেঝেতে মাদুর পেতে শোবে, উঠে যাবার সময় তুলে নিয়ে যাবে। আমার ঘরে তোমার ও নোংরা কাঁথাপত্তর রাখা হবে না। লোকের কাছে আমার মান থাকে না তোমার জন্যে"—অন্নদা চটিল। বলিল "লোকেদের বাড়ির চাকরবাকরেরা বৈঠকখানায় শোয় না তো কি ঠাকুর ঘরে গিয়ে শোয়? আর আপনার কোচে শুলে ওর গায়ে ফোস্কা পড়বে? কাঁথা বালিশও তো আমি ঘর থেকে আনি নি, নোংরা তো এমন বিছানা দেন কেন চাকরদের?"

বুঝিলাম জাগ্রত জনমতকে আর বেশী ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। কথা পালটাইলাম। বলিলাম "তুমি মা ঠাকরুণের কথা শোনো না কেন?"

অন্নদা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "শুনব কি, যা তাঁর কথার ছিরি!"

অনেক কষ্টে গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে হইল। বলিলাম, "ছিরি যেমনই হোক, কথা শুনবে। আর দুপুরবেলা বামুন ঠাকুরের সঙ্গে কি ঝগড়া করেছ? সে খায়নি শুনছি সারাদিন?"

অন্নদা বলিল, "আচ্ছা, আপনিই বিচার করুন। পাশাপাশি ভাত বেড়েছে, নিজের ভাগে নিয়েছে পেটির মাছখানা আর আমার ভাগে দিয়েছে ন্যাজার দুটো কাঁটা। রাগ হয়না এতে? তবু আমি কিছু বলিনি, শুধু খপ করে মাছখানা তুলে নিয়েছি তার পাত থেকে। তাইতেই কি রাগ বাবুরে! বলে, ছোঁয়া গেছে, খাব না! নাই খেলি, আমার তো বয়ে গেল! আমি দু'থালাই শেষ করলুম। এখন মর তুই শুকিয়ে!"

অবাক হইয়া বলিলাম, "দু'জনের ভাত তুমি একলা খেলে?"

অন্নদা বলিল, "আজ্ঞে চাষার ছেলে, ক্ষিদেটা আমাদের একটু বেশীই হয়। আপনাদের ঐ আধ সের চালের ভাতে কি আমার পেট ভরে? কি করব, পরের বাড়ি যা দেয় খাই। গিন্নীমাকে বলবেন না, দুটি বেশী করে চাল নিতে।" লোকটার মনটা খুব সরল, আমার ত নিত্য নূতন চাকর খোঁজা পোষায় না।

অন্নদাকে কিছুক্ষণ সদুপদেশ দিলাম। কথা দিলাম, সে যদি গিন্নীমাকে খুসী রাখিয়া চলিতে পারে তাহা হইলে আমি তাহাকে খুসী করিয়া দিব। গৃহিণীর হাতে যখন ভাণ্ডার তখন তাঁহাকে খুসী রাখিয়া চলিলে মাছের পেটির জন্য তাহাকে প্রতিদিন ঠাকুরের সহিত ঝগড়া করিতে হইবে না। অন্নদা বুঝিল, খুসী হইয়া বলিল, "বাবু আমার সদাশিব! এমন নইলে সোয়ামী! আমাকে চারটে পয়সা দেবেন তো বাবু, ভালো করে বাসন মাজব। তেঁতুল আর খোল না হলে কি বাসনের ময়লা ছাড়ে?"

বৈকালে কলে জল আসিবার পূর্বেই অন্নদা বাড়ির সমস্ত বাসন দ্বিতীয়বার করিয়া মাজিল। পথে ছড়াইবার জন্য কর্পোরেশন ফুটপাথের ধারে বালির গাদা দিয়াছিল, সেখান হইতে বালি আসিল। তেঁতুল বা খৈল আসিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু বাসনের চেহারার পরিবর্তন স্পষ্ট দেখা গেল। অন্নদা রান্নাঘর ধুইয়া বাসন সাজাইয়া রাখিতেছে, গৃহিণী দূরে হইতে দেখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "পারে সব কাজ, ইচ্ছে ক'রে করে না।" অন্নদা শুনিতে পাইয়াছিল, একগাল হাসিয়া বলিল, "কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়। আমি না হয় অপরাধ করেছি, আপনি কোন্ ছেলে বলে মাপ করলেন?" গৃহিণী জল হইয়া গেলেন।

দুই চারিদিন যায়। গৃহিণী মাঝে মাঝে গজ গজ করেন, অন্নদা নাকি গাঁজা খায়। সন্ধ্যার পর পৃথিবী হাজিয়া যায় সে একবার বাহিরে যাইবেই। সে নাকি বাজারের পয়সা চুরি করে। তাহার হাতীর খোরাক। বিছানা করিতে জানে না, ঘর ঝাঁট দিতে শিখাইলেও শিখে না। অন্নদার অনেক দোষ, তথাপি কি জানি কেন তাহাকে একেবারে তাড়াইবার কথা বলেন না, আমিও নিত্য নূতন চাকর খোঁজার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

আর এক রবিবার। দুপুরে দোতলার ঘরে খাটে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, অন্নদা আসিয়া নিঃশব্দে পা টিপিতে আরম্ভ করিল। বুঝিলাম কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে। বলিলাম, "হঠাৎ পা টেপা কেন? কি মতলব?"

অন্নদা বলিল, "ছুটির দিন, ভাবলুম বাবুর পা'টা একটু টিপে দিই। বৌ দিত কিনা, বেশ আরাম লাগত।" বৌয়ের সেবায় আরামটা কতদূরে হয় জানি না, অন্নদার সেবায় আরামের চেয়ে কষ্টই বেশী হয় দেখিয়া বলিলাম, "ছাড়ু, লাগছে।" অন্নদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পা ছাড়িয়া দিল। বলিল, "আমার কাঠখোট্টা হাত, আপনাদের ননীর শরীর! লাগবে বৈকি!"

অন্নদা আঘাত করিবে বলিয়া আঘাত করে না, তাই তাহার কথায় রাগ করা যায় না। বলিলাম, 'লণ্ঠনগুলো কালিঝুল হয়ে আছে, রোজ মুছিস না কেন জ্বালবার আগে, যা এই সময় একটু ঝেড়েমুছে রাখগে দিকি!" অন্নদা চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচেক পরেই চীৎকার শোনা গেল। অন্নদা ডাকিতেছে "দাদবাবু, দাদাবাবু, একবারটি এদিকে আসুন তো! শীগ্‌গির আসুন দৌড়ে!"

আমার মেজ ছেলে কিরণ পাশের ঘরে বিয়ে পরীক্ষার পড়া করিতেছিল, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল। দুই মিনিট বাদে হাঁফাইতে হাঁফাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা লোক! জিজ্ঞাসা করিলাম, "হল কি, চেঁচাচ্ছিল কেন?" কিরণ বলিল, 'লণ্ঠনের চিমনি ভেঙে ফেলেছে; আমাকে ডাকছিল ভাঙাটুকরোগুলো খুলে বার করে দেবার জন্য!' বললুম, 'ভেঙেছ জিনিসটা লজ্জা করে না? আবার আমাকে ডাকছ খুলে দেবার জন্যে? তোমার

হাত কি হল?' তাতে বলে কি, 'আপনাদের লণ্ঠন, আপনাদের চিমনি ভেঙেছে! আমি পরের বাড়ি চাকরী করতে এসে হাত কেটে মরব নাকি শেষকালে? তখন আপনি আমাকে বসিয়ে খাওয়াবেন?'

যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন! কিরণকে বলিলাম, "তুমি পড়োগে যাও, ওর কথায় কান দিয়ো না।" কিরণ বলিল, "কান না দিয়ে উপায় আছে? ওর জ্বালায় আমাকে এবার ফেল করতে হবে বাবা। খালি এসে বকবক করবে আমার ঘরে, আর আমার বই ঘাঁটবে! সেদিন জিজ্ঞেস করছে, 'দাদাবাবু কোন ক্লাসে পড়েন?' বললুম, 'বি-এ ক্লাসে।' তাতে বলে কি, 'আমি দ্বিতীয় ভাগ পড়েছি, শিশুশিক্ষাও পড়েছি। তা' যে দ্বিতীয় ভাগ পড়েত পারে, সে বি-এ ক্লাসের বইও পড়তে পারে। মোটের উপর আপনিও লেখাপড়া জানা লোক, আমিও লেখাপড়া জানা লোক।' এমন অদ্ভুত ওর বুদ্ধি!" পুত্রকে হাসিয়া বিদায় দিলাম, ছোটমেয়ে মিন্তিকে ডাকিয়া বলিলাম, "তুই অন্নদাকে রোজ খানিকটা করে পড়াস দেখি।" মিন্তির নূতন উৎসাহ, সে তখনি তাহার বোধোদয় লইয়া ছুটিল। তিন মিনিট পরে নীচে চীৎকার শুনিতে পাইলাম। অন্নদা বলিতেছে, যাও, "যাও, আমি ওসব মেয়েমদ্দানি পছন্দ করি না। মেয়েমানুষের কাছে আবার লেখাপড়া শিখব কি? যত কিছু বলি না, তত যেন সব মাথায় উঠছে।" মিন্তি কাঁদো কাঁদো হইয়া ফিরিয়া আসিল।

বেলা তখন প্রায় দুইটা, আমার ভগ্নীপতি নরেন্দ্র হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। সে বালিগঞ্জে থাকে, কাজেকর্মে এদিকে আসিলে আমাদের খোঁজ লইয়া যায়। বলিলাম, "বোসো, একটু জলটল খেয়ে যাও। কুটুমবাড়ীর তত্ত্ব এসেছে—"সে হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমার তিনটে পনেরোয় একটা এনগেজমেণ্ট আছে, এখনি উঠতে হবে।" গৃহিণী আসিয়া অনুযোগ করাতে বলিল, "কোন্ পেটে খাব বলুন? বেলা একটায় ভাত খেয়ে উঠেছি। আচ্ছা, আর একদিন হবে এখন, আজ আসি।" বলিতে বলিতে সিঁড়ি দিয়া তড় তড় করিয়া নামিয়া গেল। আমিও আর একবার একটু গড়াইয়া লওয়া যায় কিনা তাহারই চেষ্টা দেখিতে খাটে আসিয়া শুইলাম।

আধ ঘণ্টাও বোধ হয় নাই, গৃহিণী আসিয়া ডাকিলেন। বলিলেন, "দেখে যাও অন্নদার কাণ্ড!" তাঁহার নির্দেশমত ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া দেখি অভাবনীয় ব্যাপার! সেদিন সকালে আমার বড় ছেলে হিরণ্ময়ের শ্বশুরবাড়ি হইতে গ্রীষ্মের তত্ত্ব উপলক্ষ্যে একঝুড়ি আম, একথালা সন্দেশ এবং একহাঁড়ি রাজভোগ আসিয়াছিল। তখন ভাত খাইবার সময় বলিয়া গৃহিণী ছেলেমেয়েদের তাহাতে হাত দিতে দেন নাই, বিকালে জলযোগের খরচ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সেগুলি রাখিয়া দিয়াছিলেন। অন্নদা কোথা হইতে একটা হ্যাংলা ছেলে জুটাইয়াছে, ছেলেটা বোধ হয় পাড়াতেই থাকে, পথে তাহাকে ঘুরিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বাড়িতে ঢুকিবার সাহস তাহার এতদিন ছিল না। অন্নদা তাহাকে আনিয়া দোতলায় তুলিয়া ভাঁড়ারঘরের একপ্রান্তে মেঝে ধুইয়া মুছিয়া আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া একটা থালাভর্তি করিয়া চারিটা ল্যাংড়া আম ছাড়াইয়া চারিটি রাজভোগ এবং চারিটি সন্দেশের সঙ্গে সাজাইয়া দিয়া নিজে পাশে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। সে অন্যমনস্ক ছিল আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ছেলেটা আমাদিগকে দেখিয়া সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওকি হচ্ছে?" অন্নদা বলিল, "বাড়িতে মানুষ এলে কি রকম করে যত্ন করতে হয় তাই শেখাচ্ছি। ঠিক দুপুরের বেলা কুটুমের ছেলেটা যে না খেয়ে বাড়ি গেল, তা আপনাদের কি একটু চোখের চামড়াও নেই?"

আমাদের বাসা ছিল পরেশনাথের বাগানের কাছে। সুতরাং অন্নদা মাণিকতলার বাজারে বাজার করিতে যাইত। জামাই-ষষ্ঠীর দিন, গৃহিণী অন্নদাকে ভোরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া জাগাইয়া সকাল সকাল বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচটি টাকা দিলেন, ফর্দ লিখিয়া বলিয়া দিলেন, "ভালো দেখে মাছ নেবে; ও বাজারে না পাও তো হাতীবাগানের বাজারটাও ঘুরে আসবে। তুমি এলে তবে রান্না হবে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।" অন্নদা "যে আজ্ঞে, মাঠাকরুণ" বলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিল। পূর্বে বলিয়াছি তাহার পা ফেলিবার ভঙ্গীটা ছিল বড় মজার, দেখিলেই হাসি পাইত।

বেলা দশটা বাজিল। জামাতা বাবাজীরা একে একে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্নদার দেখা নাই। এগারোটা বাজিবার পূর্বেই গৃহিণীর তাড়নায় নিজে বাজারে গেলাম। সব জিনিস পাইলাম না, যাহাও বা পাইলাম তাহাও বাছপড়া মাল, জামাতাদিগের পাতে দিবার যোগ্য নয়। যাহা হউক দুইটা উনান এবং একটা ষ্টোভের সাহায্যে বেলা দুইটার মধ্যে কোনমতে রান্না শেষ হইল। আমাদের খাওয়া শেষ হইতে আড়াইটা বাজিল। গৃহিণী এবং মেয়েরা তখনও অন্নদার আশায় বসিয়া আছেন। আমি বলিলাম, "খেয়ে নাও, সে মবলগ পাঁচ টাকা হাতে পেয়েছে, দুদিন হল মাইনের টাকাও মিটিয়ে নিয়েছে, তার আর ফেরবার আশা নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওকথা বোলো না! সেদিন নাইবার ঘরে সোনার হার ফেলে এসেছিলুম, অন্নদা আমাকে কুড়িয়ে এনে দিলে। যাই বলো লোকটা বিশ্বাসী। আমি ভাবছি পাড়াগাঁয়ের লোক, গাড়ীচাপা পড়ল নাকি কে জানে?" তাঁহাদিগকে অনেক কষ্টে খাইতে বসানো গেল।

বেলা চারটার সময় আর ধৈর্য রক্ষা করা গেল না। জামাতাদের অভ্যর্থনার ভার মধ্যমপুত্রের উপর দিয়া অন্নদার খোঁজে থানায় থানায় ফিরিতে লাগিলাম। কোথাও কোনরূপে পাত্তা না পাইয়া ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরিতেছি, দেখি অন্নদা কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়া কলাপাতায় মোড়া কি যেন একটা জিনিস লইয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। ধমকাইয়া বলিলাম, "কোথায় গেছলি হতভাগা? তোর জন্যে খুঁজে খুঁজে অস্থির। বাড়ি শুদ্ধ লোকের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হবার যোগাড়! কি করছিলি কি এতক্ষণ?"

অন্নদার মুখে সেই সপ্রতিভ হাসি। বলিল, "আজ্ঞে, এ বাজারে ভালো মাছ পেলুম না, ভাবলুম ছাতুবাবুর বাজারটা একবার ঘুরে আসি। সেখানেও সেই অবস্থা জামাই-ষষ্ঠীর টান,—একটা ভালো জিনিস পড়বার যো নেই। পটলডাঙার বাজারে গিয়ে তবে ভালো একটা রুই মাছ পাই।"

বলিলাম, "পটলডাঙার বাজার থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হয় মানুষের? ন্যাকা বোঝাচ্ছ? আর সে মাছই বা কই? হাতে কি ও?" অন্নদা বলিল, "এগুলো মায়ের প্রসাদী ফুল। ভাবলুম অ্যাদ্দুরেই যখন এলুম, তখন একবার বরং যাই, টপ করে একবার মাকে দর্শন করে আসি। তাই তাড়াতাড়ি হাবড়ার পুলের মুখে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে চলে গেলুম মায়ের বাড়ি। আহা, মায়ের কি রূপ? এই ঝক্ ঝক্ করছে খাঁড়া, এই লক্‌লক্ করছে জিভ!" কলেজ স্ট্রীট হইতে কালিঘাট এমন আর কি দূর? মায়ের রূপ বর্ণনা আরও কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, কিন্তু আমার শুনিবার ধৈর্য রহিল না। ধমক দিয়া বলিলাম, "বাজারের জিনিসপত্তর কই?"

অন্নদা ম্লানমুখে বলিল, "তা মায়ের বাড়িতেও আপনাদের এমন চোরের উপদ্রব তা কি করে জানব? বাজার নিয়ে তো আর মন্দিরে ঢোকা যায় না? একটি বুড়োপানা লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, ভাবলুম বুঝি ভালোমানুষ। বললুম, দাদা এই মোটটা রইল, একটু দেখো। আমি টক্ করে দর্শনটা করে আসি। তা বললে না পেত্যয় যাবেন বাবু ঢুকেছি আর বেরিয়েছি, দু'ঘণ্টাও থাকিনি ভেতরে, এসে দেখি ব্যাটা আমার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে। হারে কলিকাল!"

গৃহিণী বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, অন্নদা গাঁজা খাইবার জন্য সব কয়টা টাকাই সরাইয়া রাখিয়াছে। সার্চ করিয়া কিছু পাওয়া গেল না। বোঝা গেল অন্নদার নিজের ছাড়া আর সবারই দোষ। কিন্তু লাভের মধ্যে আমার পাঁচ পাঁচটা টাকা গেল।

পরদিন প্রাতে জামাতা বিপিনচন্দ্র জলযোগ সারিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘর হইতে ডাক আসিল, "জামাইবাবু শুনে যান।"

বাবাজীবনের পিছু ডাকটিতে অত্যন্ত আপত্তি ছিল, একবার ছোটবেলায় পথের মধ্যে কে নাকি তাঁহাকে পিছু ডাকে ফলে সে যাত্রা তিনি গাড়ীচাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতে পথে বাহির হইবার সময় কেহ পিছু ডাকলে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন। যাহা হউক বিপিন বিরক্তভাবে পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য বাহিরের ঘরে জড় হইয়াছিলাম, আমরা আর গেলাম না। ভাবিলাম, মীনা বোধ হয় কোনও বিশেষ কারণে ডাকিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। পাশের ঘরে অন্নদা বিপিনকে দেখিয়াই তাহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "জামাইবাবু, ঝাঁটাগাছটা কোথায় বলতে পারেন?" বিপিনচন্দ্রের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। বলিলেন, "আজ্ঞে না, শ্বশুরবাড়ি এসে ঐ খোঁজটা এখনও রাখতে পারি নি।" রাগে গর গর করিতে করিতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। অন্নদা একটু অপ্রতিভভাবে তাঁহার পিছন পিছন আসিয়া বলিল, "আহা, রাগ করেন কেন? মানুষকে কি মানুষ একটা কথা জিজ্ঞেস করে না? আপনি কাল বসেছিলেন ওঘরে; জিনিসটা খুঁজে পাচ্ছি না, তাই ভাবলুম একবার জিজ্ঞেস করেই দেখি। জিনিসটা তো আর উড়ে যেতে পারে না।"

অভিযোগ গুরুতর! আমরা সভয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম, অন্নদা কিন্তু একভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, উত্তর না লইয়া নড়িবে না। বিপিনচন্দ্র রাগে মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলতে চাও আমি তোমাদের ঝাঁটা চুরি করেছি?" অন্নদা অস্বীকারও করিল না, কথাও কহিল না, মৃদু হাসিল। বিপিন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পাজি, রাস্কেল, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?" আমি হিড় হিড় করিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলাম, গৃহিণী জামাতাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, "তুমি কিছু মনে করো না বাবা। ওটা পাগল। মাথায় ছিট আছে।" এমন সময় মিন্তিটা বিপদ বাধাইল। সে হাততালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল—"জামাইবাবু, ঝাঁটা চোর, জামাইবাবু ঝাঁটা চোর।" গৃহিণী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর, হতভাগা মেয়ে।"

অন্নদাকে সে যাত্রা বাবাজীবনের ক্রোধ হইতে কোনমতে রক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু কন্যার ক্রোধ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছিলাম না। প্রথম দিন শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়া মীনা তাহাকে একবার তাহার এক বৎসর বয়স্ক শিশুসন্তানটিকে কিছুক্ষণের জন্য ধরিতে বলে। তাহাতে অন্নদা উত্তর দেয়, "পুরুষমানুষ আবার ছেলে নিয়ে বেড়াবে কি? বিয়োতে পেরেছ, কোলে করে বেড়াতে পারো না?" মীনা আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। অন্নদাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিয়া বলিল, "আপনিই বিচার করুন বাবু! আজ বলচে ছেলে ধর, কাল বলবে ছেলের ন্যাতা কাচ, পরশু বলবে ছেলেকে দুধ দে। আমি কি মেয়েমানুষ?"

মীনা কাঁদিয়া বলিল, "হয় আমি বাড়ি থেকে বেরুব, না হয় ও বাড়ি থেকে দূর হবে।" অন্নদা সপ্রতিভভাবে বলিল, "এয়োস্ত্রী সোয়ামীর ঘরে যাওয়াই তো উচিত, বেশী দিন বাপের কাঁধে বসে খাওয়া কি ভালো?" মেয়েকে অনেক কষ্টে শান্ত করিলাম বটে, কিন্তু স্বামীর সেই ঝাঁটাচুরির অপবাদের পর হইতে তিনি আর এ বাড়িতে না আসায় মীনা অন্নদাকে ভালো চোখে দেখিত না। আমিই বা কি করি, কলিকাতা শহরে বিশ্বাসী চাকর নিত্য এখন কোথায় পাওয়া যায়? অন্নদাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম, দিদিমণিকে খুসী কর। বড়লোকের বৌ, যাইবার সময় মোটা বখশীষ দিয়া যাইবে। দুই দিনেই দেখিলাম সুর বদলাইয়াছে। অন্নদাকে আর বলিতে হয় না, সে দিদিমণিকে আপনি বলিয়া কথা কহে, বৈকালে খোকাকে কোলে করিয়া প্রতিদিন পরেশনাথের

বাগানে বেড়াইতে যায়। নিজের মাহিনার বা বাজারের চুরির পয়সা হইতে একদিন খোকার লজেঞ্জস ও কিছু কাঁচপোকার টিপ কিনিয়া আনিয়া সে মীনাকে একরূপে বশ করিয়াছে। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে, দিদিমণির সঙ্গে ভাব হল?" অন্নদা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "ঢেঁকির মিলন, এদিক মেলে তো ওদিক মেলে না।" আর বেশী ঘাঁটাইলাম না।

আগ্রার ফুলকাটা শ্বেতপাথরের রেকাবীখানা জামাই-ষষ্ঠীর দিন বাহির হইয়াছিল, পরদিন হইতে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সাধারণত কাচের আলমারীতে সাজানো থাকিত। আমি সেখানাকে স্বস্থানে না দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম অন্য কোথাও আছে; গৃহিণী ভাবিয়াছিলেন তাসের আড্ডাতে আমি বা বিপিন বাবাজীবন কেহ ভাঙিয়াছে, লজ্জা দিয়া লাভ নাই; মীনা ভাবিয়াছিল অন্নদা চুরি করিয়া বেচিয়াছে, বেচিয়া গাঁজা খাইয়াছে। কিন্তু কাহারও মনের কথা কেহ প্রকাশ করে নাই, অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করাও হয় নাই। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে তাহার তো ঠিক নাই। শনিবার দিন হঠাৎ অভাবনীয়রূপে রেকাবীটার সন্ধান পাওয়া গেল। কতকগুলো পুরাতন প্যাকিং বাক্স বারান্দার কোণে অনেক দিন হইতে জড় করা ছিল। হঠাৎ কিছু জিনিস পাঠাইবার প্রয়োজন হওয়াতে তাহারই মধ্যে একটা টানিয়া বাহির করিতে গিয়া দেখি রেকাবীখানা তিন টুকরা করিয়া ভাঙিয়া কে বা কাহারা তাহার তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। এ কাজ ছোট ছেলে-মেয়ের নহে। ডাকিলাম, 'অন্নদা।' অন্নদা অপরাধীর মত মুখ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "ভেঙেছ তো দেখতে পাচ্ছি, লুকিয়ে রেখেছ কেন? তুমি না বড় সত্য-বাদী?"

অন্নদা বলিল, "ভাবলুম দামী জিনিস, আপনারা যদি রাগ করে মাইনে কাটেন? তাই কুঁজো ভাঙলুম, লণ্ঠন ভাঙলুম, চায়ের পেয়ালা ভাঙলুম, কিছুই তো লুকোইনি বাবু, সঙ্গে সঙ্গে মাঠাকরুণের কাছে গিয়ে বলেছি।"

মুখে বললাম, "মাথাটা ভাঙতে পারো নি আমার? সেটা আস্ত রেখেছ কেন দয়া করে? যত রাজ্যের আলবড়ো অলুক্ষুণে লোক এসে কি জোটে আমার বাড়ি?" কিরণ আসিয়া ভাঙা টুকরাগুলি লইয়া গেল, কি এক রকম আঠা পাওয়া যায়, জুড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। বুঝিলাম, আর পাঁচজনের মত অন্নদার সত্যবাদিতাও ভগ্নদ্রব্যের মূল্যের তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

রাত্রে গৃহিণী বলিলেন, "তুমি অন্য লোক দেখ, ওকে দিয়ে চলবে না।" স্ত্রীচরিত্র বোঝা ভার। বলিলাম, "কেন? ওতো আজকাল বেশ কাজকর্ম শিখছে ক্রমশ। একটু মাথার ছিটই আছে না হয়"—

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি বোঝ না, ও মিন্সের ভীমরথি ধরেছে। কাল দুপুরবেলা বাসন মাজতে মাজতে গান ধরেছে, —দিবস-রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি। বাড়িতে সোমথ মেয়ে-বৌ, চাকর ওসব গান গাইবে কি! ভেবেছিলুম তোমাকে বলব না"—

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম। অন্নদা গান গায়? ডাকিলাম, "অন্নদা।" অন্নদা কাছেই কোথায় ছিল ছুটিয়া আসিল। বলিলাম, "তুমি 'দিবস-রজনী' গান গাইছিলে? ও গানের মানে জানো?" অন্নদা একগাল হাসিয়া বলিল, "তা আর জানি নি বাবু? অশোক বনে মা জানকী বিলাপ কর-ছেন আর হনুমান বসে বসে শুনছেন। আহা, ভারী মিষ্টি গান—হুঁ—উ—উ—উ"। দেখিলাম আমার সাক্ষাতেই সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখনই গান ধরিবে। সভয়ে বলিলাম, "থাক আমি জানি ও গান। তুমি খবরদার বাড়ির মধ্যে গান গাইবে না। মাঠাকরুণ পছন্দ করেন না।"

অন্নদা বলিল, "চাষা কি মদের স্বাদ জানে! ঠাকুর-দেবতার কথা ভাল লাগবে কেন?" সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। গৃহিণী রাগ করিলেন না, হাসিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

ইহার পর বাজারের খরচ হঠাৎ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। দুই পয়সার জিনিস রাতারাতি ছয় পয়সা হইল, দুই আনা সের আলু চার আনা দাঁড়াইল। এই লইয়া গৃহিণী বারবার অনুযোগ করিলেন, একদিন অন্নদাকে খুব ধম-কাইলাম। পরদিন আবার সব জিনিসের দাম কিছু কিছু কমিল। সেদিন অফিস হইতে ফিরিবার পথে কলার খোলায় পা পিছলাইয়া একটা আছাড় খাইয়াছিলাম, বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম সর্বাঙ্গে বেশ ব্যথা। অন্নদাকে চুপি চুপি ডাকিয়া আর্নিকা আনিতে দিলাম, ইচ্ছা ছিল, দুর্ঘটনার কথাটা সকলের কাছে আর প্রকাশ করিব না। খুচরা পয়সা ছিল না, একটা টাকাই দিলাম। অন্নদা ঔষধ আনিয়া হিসাব দিল, সাড়ে সাত পয়সা। একে গায়ের ব্যথা, তাহার উপর এইরূপ দিনে ডাকাতি। আর সহ্য হইল না। বলিলাম, "আজ তোকে পুলিসে দেব। বার কর দেড় পয়সা!" অন্নদা গজ গজ করিতে করিতে বলিল, "সব তাতে যদি ও রকম করেন বাবু, তাহলে নিজেরা বাজারে যান।" সে গাঁট হইতে দেড় পয়সা বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া বলিল, "ঢের ঢের বাবু দেখেছি, দেড় পয়সার জন্য এমন ছেঁড়াছেঁড়ি করতে কাউকে দেখিনি। চোখের পরদাও কি থাকতে নেই?" নিজেকে বড়ই অপরাধী বোধ হইতে লাগিল। অন্নদা বিজয়গর্বে দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। এমন কি রাগ করিয়া বাজারের পয়সা চুরিও বন্ধ করিয়া দিল।

ইহার পর সাত দিন না যাইতেই অন্নদা একদিন হাসিমুখে আসিয়া পায়ের ধুলো লইল। বলিলাম, "কি হল, এত ভক্তি কিসের?" অন্নদা বলিল, "আমার শ্বশুরের ভারী অসুখ বাবু। পরিবার চিঠি লিখেছে, না গেলেই নয়। তা আমার মাইনেটা"—বলিলাম, "সেকি অন্নদা, যাই বললেই কি যাওয়া হয়? দাঁড়াও, একটা ভালো লোক-টোক দেখি"—

অন্নদা বলিল, "বড্ড অসুখ বাবু চিঠি দেখুন।" চিঠি

(শেষাংশ ২৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সেকালের অস্ত্র

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

সেকালের অস্ত্র ও শস্ত্র একালে অচল। যুদ্ধের সে রীতি পদ্ধতিও একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। কয়েক হাত দূরে আসিয়া তীর ছুঁড়িয়া মারা, কিম্বা গদা ও খড়্গ লইয়া হানাহানি, আর মাঝে মাঝে 'ওরে পাষণ্ড, তোকে ধিক্', 'থাক থাক্', 'তোর আর বেশী দেরী নাই, এইবার গেলি' ইত্যাদি সারগর্ভ বচনবিন্যাস, মনে কোনরূপ ভয়ের উদ্রেক করে না। দূরপাল্লার কামানে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূর হইতে গোলাবর্ষণ, আকাশ হইতে অতর্কিতে বোমাবৃষ্টি, সমুদ্রের বুকে জাহাজী-লড়াই, সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি। মানুষে মানুষে দেখা সাক্ষাৎ নাই, অথচ যুদ্ধ চলিতেছে। বালক, রমণী, বৃদ্ধ, রোগী, দোষী, নির্দোষের কোন প্রভেদ নাই। দেবস্থান, বিশ্রামাগার, চিকিৎসালয় বলিয়া কোন বিচার নাই। মানুষ আজ রাক্ষস অসুরের স্থান অধিকার করিয়াছে। পৈশাচিক উল্লাসে ধ্বংসের তাণ্ডবে মাতিয়াছে। সেকালে তবু ধর্মযুদ্ধ বলিয়া একটা কথা ছিল। শাস্ত্র ও পুরাণাদি পড়িয়া মনে হয় ধর্মযুদ্ধও ছিল। আমরা আজ যুদ্ধরীতির কথা না বলিয়া সংক্ষেপে সেকালের কয়েকটা অস্ত্র-শস্ত্রের পরিচয় দিতেছি।

যুদ্ধশাস্ত্রের নাম ধনুর্বেদ। ধনুর্বেদ চারিভাগে বিভক্ত। ১ম দীক্ষা, ২য় ধনুঃসর সংগ্রহ, ৩য় অভ্যাস, ৪র্থ প্রয়োগ। অস্ত্র ও শস্ত্রের নাম আয়ুধ। যাহা মন্ত্র, যন্ত্র অথবা অগ্নি দ্বারা নিক্ষেপ করা যায় তাহাই অস্ত্র। এতদ্ভিন্ন অন্য সব শস্ত্র। অস্ত্র যেমন শর, শস্ত্র যেমন খড়্গ। হস্ত দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত চক্রও অস্ত্র মধ্যে গণ্য হইতে পারে। আয়ুধ পঞ্চ-বিধ—১ যন্ত্রমুক্ত, ক্ষেপনী অথবা ধনু দ্বারা যাহা নিক্ষেপ করা যায়, প্রস্তর খণ্ড ও শরাদি। ২ হস্তমুক্ত, যথা শূলে চক্রাদি। ৩ মুক্ত-অমুক্ত বা মুক্ত সন্ধারিত, যাহার প্রয়োগ ও প্রতিসংহার যোগ্য। যেমন কুন্ত, প্রাস ইত্যাদি। ৪ অমুক্ত—যেমন খড়্গাদি। ৫ হস্ত পদ, মল্লযুদ্ধে প্রযোজ্য। এই অস্ত্র-শস্ত্রের দিব্য, আসুর, মানব এইরূপ ত্রিবিধ ভাগ আছে। ইহার আবার দুই ভাগ, মান্ত্রিক ও যান্ত্রিক।

রথের উপরেই হউক, আর মাটীর উপরেই হউক যোদ্ধার অবস্থানের নানাবিধ ভঙ্গীর নাম 'স্থান'। এই স্থান ছয় প্রকার। ১ সমপাদ, ২ বৈশাখ, ৩ মণ্ডল, ৪ আলীঢ়, ৫ প্রত্যালীঢ় ও ৬ বৈষ্ণব। অন্যমতে এই 'স্থান' আঠার প্রকার; ১ সমপাদ ২ মণ্ডল, ৩ বৈশাখ, ৪ আলীঢ়, ৫ প্রত্যালীঢ়, ৬ বিকট, ৭ সম্পুট ও ৮ স্বস্তিক। অন্যত্র মণ্ডলের নাম অসম্পাদ, বিসটের নাম দর্দুরক্রম, বৈষ্ণবের নাম গরুড়ক্রম এবং স্বস্তিকের নাম পদ্মাসন। ধনুধারণ, জ্যা-জোযনা বা গুণ আরোপণ এবং শরসংযোগ প্রভৃতির অভ্যাস ও প্রয়োগ অর্থাৎ লক্ষ্যভেদ ধনুর্বেদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ধনুর পরিমাণ হইত চারি হাত, সাড়ে তিন হাত ও তিন হাত। শরের পরিমাণ হইতে দ্বাদশ মুষ্টি, একাদশ মুষ্টি ও দশ মুষ্টি।

অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে বাহুযুদ্ধ প্রণালী ছিল বত্রিশ প্রকার। খড়্গ ও চর্ম প্রয়োগ প্রণালী ছিল বত্রিশ রকম। কৃপাণের পদ্ধতি ছিল সপ্তবিধ। পাস ধারণ পদ্ধতি ছিল একাদশ প্রকার। চক্রের প্রয়োগ সাত প্রকার। গদাধারণপদ্ধতি দ্বাদশবিধ। পরশু ও তোমর ছয় প্রকার। শূল ও মুদ্গর পাঁচ প্রকার। বজ্র, পট্টিশ, ভিন্দিপাল ও লগুড় প্রয়োগের পদ্ধতি ছিল চারি প্রকার। বাহুযুদ্ধ ও নিযুদ্ধ প্রায় এক জাতীয় ছিল। মাথার লম্বা চুল ধরিয়া টানা, মাথায় পদাঘাত, মাটীতে ফেলিয়া পেষণ, গালে চড়মারা, জানু দিয়া পেটে গুঁতা দেওয়া ইত্যাদি ছিল নিযুদ্ধের লক্ষণ। আর বাহু-যুদ্ধে ছিল সন্ধিস্থান ও মর্মস্থানে আঘাত অথবা কষিয়া জাপটাইয়া বন্দী করা। হাতীর পিঠে বোধ হয় দুইজন অঙ্কুশধারী, দুইজন ধানুকী ও দুইজন খড়্গযোদ্ধা ভিন্ন একজন চালক থাকিত। আবার ভগদত্তের মত প্রসিদ্ধ হস্তীযোদ্ধাদের যুদ্ধে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিত। তখন প্রধান যোদ্ধার রক্ষীরূপেই ইহারা যুদ্ধ করিত। রথ ও গজ-রক্ষার জন্য তিন তিনজন অশ্বারোহী ও একজন অশ্বারোহীর জন্য তিনজন ধানুকী এবং একজন ধানুকীর জন্য এক একজন চর্মধারি থাকিত।

অস্ত্র ও শস্ত্রে লোহের প্রয়োজনই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। যদিও বাঁশের ধনুরই প্রচলন ছিল বেশী, তথাপি লোহ ধনুরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহিষ ও মৃগের শৃঙ্গ নির্মিত ধনুর নাম শার্ঙ্গ ধনু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনুর কথা পুরাণ প্রসিদ্ধ। শরের মাথায় লোহার ফলা থাকিত। পাশের পরিমাণ হইত দশ হাত, কার্পাস, আকন্দ গাছের অথবা সিন্দির গাছের আঁশ কিম্বা শরমুজা (মুঞ্জ) দিয়া পাশের জ্যা তৈরী হইত। পাশের দুই মুখে দুইটি লোহগোলক বাঁধা থাকিত। এই গোলকের পরিবর্তে দুইটি সর্পমুখ থাকিলে সেই পাশ নাগপাশ নামে পরিচিত হইত। এতদ্ভিন্ন চক্র, খড়্গাদি সমস্ত অস্ত্রই ছিল লোহ নির্মিত। গদা কাষ্ঠ নির্মিত অথবা লোহ নির্মিত হইত। এক একটা অস্ত্রের বা শস্ত্রের এক একটা বিশেষ বিশেষ কার্য ছিল। অর্ধচন্দ্র দ্বারা ধনু, গ্রীবা বা মস্তক ছেদন, ক্ষুরপ্র দ্বারা বাহু বা শর ছেদন, ভল্ল দ্বারা ধনুর্গুণ কর্তন ইত্যাদি। সেকালে যুদ্ধে প্রস্তরের প্রয়োজনীয়তাও কম ছিল না। ক্ষেপনী দ্বারা প্রস্তর খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত। 'শতঘ্নী' প্রস্তর নির্মিত হইত, —'অয়ঃ কণ্টক সংছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা'। শাণিত লোহ শলাকাযুক্ত বৃহৎ প্রস্তর স্তম্ভের নাম ছিল শতঘ্নী। দুর্গ প্রাকারে শতঘ্নী রক্ষিত হইত এবং শত্রুসেনার উপরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। শতঘ্নীর পেষণে বহু লোক

হতাহত হইত, তাই নাম শতঘ্নী। অন্যত্র কামান অর্থেও শতঘ্নী শব্দ পাইতেছি। (ধনুর্বেদ সংহিতায়)

সিংহাসনস্য রক্ষার্থং শতঘ্নং স্থাপয়েদ গড়ে।
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যং বটয়ো ধীমতা॥

শুক্র নীতিসারে ইহারই নাম 'বৃহৎ নালীক'। রঞ্জকের পরিবর্তে শুক্রনীতি বলিয়াছেন অগ্নিচূর্ণ এবং বটিকে বলিয়াছেন গোলা। উপরের সংস্কৃতটি কত দিনের পুরাতন জানি না। বশিষ্ঠ প্রণীত ধনুর্বেদ সংহিতায় নালিক নামক অপর একটি যন্ত্রের উল্লেখ আছে, যাহা বন্দুক বলিয়া মনে হয়।

নালীকালঘবো বাণা নল যন্ত্রেন নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চ দূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥

নালীকা একপ্রকার লঘুবাণ, যাহা নলযন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। অতি উচ্চ স্থান ও দূর স্থান হইতে এবং দুর্গযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ কুণপ বা কণপ শব্দের ব্যাখ্যায়—'অয়ঃ কণপং'—বলিতেছেন যে, যন্ত্র লৌহ কণিকা পান করিয়া আগ্নেয় ঔষধি বলে গর্ভস্থ লৌহগুলি তারকার ন্যায় ছড়াইয়া দেয়। (আদিপর্ব) 'তুলাগুড়' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি স্পষ্ট 'বন্দুখ' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। (বনপর্ব) এই বনপর্বেই সৌভযুদ্ধ বিবরণে দ্বারকাপুরীর বর্ণনায় 'অয়োগুড়' নামক আর একটি অস্ত্রের উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত আছে—হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্বত লইয়া অযোধ্যার পথে লঙ্কা যাইতেছিলেন, সে সময় নন্দীগ্রামে রামের পাদুকা লঙ্ঘন করায় শত্রুঘ্ন লৌহ বাঁটুল নিক্ষেপে হনুমানকে ধরাশায়ী করেন। 'অয়োগুড়' কি এইরূপ কোন লৌহ গোলক—যাহা বাঁটুলের মত দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। আমাদের দেশে সাঁওতালদের মধ্যে এবং অপর কোন কোন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আজিও এইরূপ বাঁটুলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ধনুকের দ্বারাই নিক্ষিপ্ত হয়। ভুষণ্ডীও এইরূপ একটি অস্ত্র। যাহা গুলতীর দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করা চলিত। ভুষণ্ডীও এক প্রকার লৌহ গোলক। ইহা প্রস্তর খণ্ডও হইতে পারে।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ অয়ঃ কুনপের ব্যাখ্যায় 'আগ্নেয় ঔষধির' উল্লেখ করিয়াছেন। মূল ব্যাসদেবও এইরূপ আগ্নেয় ঔষধের কথা বলিয়াছেন। (মহাভারত আদিপর্ব) জতু গৃহদাহের পর পাণ্ডবগণ পলায়নের পথে রাত্রিকালে গঙ্গাতীরে অঙ্গারপর্ণ নামক এক গন্ধর্বের বিহারভূমিতে উপস্থিত হন। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে কতকগুলি অনব ও চাক্ষুসী বিদ্যা দান করেন। প্রতিদানে অর্জুনের নিকট হইতে 'আগ্নেয়াস্ত্র ও বৃদ্ধি' নামক ঔষধ গ্রহণ করেন।

মহাভারতের পদ্যানুবাদক স্বর্গত কবি রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় নিজের অনুবাদিত মহাভারতের পাদটীকায় 'বৃদ্ধি' ঔষধটিকে বারুদ বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্জুন কিন্তু দান করিবার প্রসঙ্গে অস্ত্রটীকে ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়াছেন। রামায়ণে এক ব্রহ্মাস্ত্রের প্রসঙ্গ দেখিয়াছি রাবণ বধে। রামচন্দ্রের ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণ নিহত হইয়াছিলেন। রামায়ণের ব্রহ্মাস্ত্র—'দীপ্তং নিশ্বসন্ত মিবোরগং জাজ্জ্বল্যমানং সুপুঙ্খং সধূমং'। উজ্জ্বল, সাপের মত ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া জ্বলিতেছিল, ধূমযুক্ত ছিল। ইহাকে বন্দুক নিক্ষিপ্ত গুলীই বলিতাম, কিন্তু ঐ 'পুঙ্খ' বা পক্ষ থাকাতে বাণ মনে হইতেছে। হাঁস, ময়ূর, কাক, কুরল, শকুনি, বাজ কোঁচ বক এই সবের পাখায় বাণের পক্ষ প্রস্তুত হইত। বাণ জ্বলিতে থাকিলে এই পক্ষও পুড়িয়া যাইবে। তবে যদি অন্য অর্থে পুঙ্খ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, কিম্বা এ পুঙ্খ লোহার পাতের তৈরী হইয়া থাকে তো সে স্বতন্ত্র কথা।

যুদ্ধ ছিল মোটামুটি সাত প্রকার। ১ ধনু, ২ চক্র, ৩ কুন্ত ৪ গদা, ৫ খড়্গ, ৬ কৃপাণ ও ৭ বাহুযুদ্ধ। অস্ত্রশস্ত্র যে কত ছিল, তাহাও জানা যায় না। আকৃতি ভেদে ও প্রয়োগ ভেদে নাম ভেদ হইত। শেল, শূল, জাঠা, পট্টিশ, পরশু, তোমর ভল্ল, নারোচ, পরিঘ, মুদ্গর, প্রাস, ভিন্দিপাল, চক্র, খড়্গ ইত্যাদি যেমন ছিল, তেমনই অগ্নিবাণ, বরুণ, বাণ, পর্বত বাণ, বায়ু বাণ, সর্প বাণ, পিপিলিকা বাণ, ইত্যাদি বাণও অসংখ্য ছিল। শুক্র, কৌটীল্য, কামন্দক, বরাহমিহির প্রভৃতির গ্রন্থে এবং অগ্নিপুরাণে ও বশিষ্ঠের সংহিতায় যুদ্ধপ্রণালী ও অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়।

অন্নদা

(২৭০ পৃষ্ঠার পর)

দেখিলাম, সত্যই অসুখ গুরুতর বলিয়া উল্লেখ আছে। গৃহিণী বলিলেন, "আহা যাক, যাক, বুড়ো মানুষ শেষটা দেখা হবে না। তাড়াতাড়ি ফিরো অন্নদা—ভালোয় ভালোয়—"

অন্নদা বলিল, "সেই আশীর্বাদই করুন মাঠাকরুণ, ভালোয় ভালোয় চুকে বুকে যাক। বুড়োর অনেক টাকা—"

অন্নদা সেই যে বাড়ি গেল, আর ফিরে নাই। হিন্দুস্থানী চাকর নাউ আনিতে বলায় রান্নাঘরে নাপিত আনিয়া হাজির করিল, উড়িয়া চাকর পুটি ময়রার রাজভোগকে চুষিয়া দীনু ময়রার দুই পয়সার স্পঞ্জ রসগোল্লা করিয়া আনিল, কিন্তু কেহই গৃহিণীর মন পাইল না। তিনি এখনও বলেন "চাকর ছিল অন্নদা!" আমি মনে মনে হাসি, ইংরেজ কবির কথা মনে পড়ে, "দূর হতে যাহা দেখ সকলি সুন্দর!"

মাহেন্দ্র মুহূর্ত

সমীর ঘোষ

সন্ধ্যার পূর্বে মন খারাপ হইতে সুরু হয়। আকাশের পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখনও লম্বমান থাকেন, ছাদের উচ্চতা আর নিম্নতার গৌরবানুসারে কমবেশী কখনো সোনালী, কখনো বা রক্তাভ রশ্মি ছাদের গায়ে ঢালিয়া দেন। গ্যাস তখনও উড়িষ্যাদেশীয় মিস্ত্রীর হাতে প্রজ্বলিত হয় নাই, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার আরতি না করিয়া গৃহে গৃহে বিজলী-প্রদীপ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় সমস্ত কোলাহল সহ্য করিয়া, শুধু বায়ুর জন্য, মুক্ত বায়ু নয়, মাত্র বায়ুর জন্য আমার দোতলার কোণের ঘরের একটিমাত্র জানালার, জাপানী পর্দা দুইভাগে সরাইয়া দিই। পর্দা সরাইয়া আমার আটফুট ঘরের প্রায় ছয়ফুট (টেবিল ইত্যাদি বাদ দিয়া) পরিসরে পাদচারণ করিয়া সমস্ত দীর্ঘদিনের পাঠব্যস্ত জটিল মস্তিষ্ককে একটুখানি হালকা করিয়া লই।

অত্যন্ত কর্মব্যস্ত পাঠভারাক্রান্ত জীবন, পি-এইচ-ডি'র গবেষণা চালাইতেছি, কাজেই কখন সূর্যোদয় হয় তাহাও যেমন জানিতে পারি না, তেমনই আরো জানিতে পারি না, কখন এবং কেমন করিয়া সকালে চা হইতে অপরাপর আহার গ্রহণ করিতে বিকাল পর্যন্ত হইয়া যায়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তাহার পর হইতে আমার মন অত্যন্ত সচেতন। বেশ বুঝিতে পারি সময় হইয়াছে। সমস্তদিন অবচেতন প্রতীক্ষার ভিতর দিয়া যাহার জন্য কাটিল, এইবার সে উপস্থিত। জানালার জাপানী পর্দা দ্বিধাবিভক্ত করিয়া আকাশের দিকে চোখ তুলিলাম। তাহার পর সরিয়া আসিয়া পায়চারী আরম্ভ করিলাম। অনেকবার হিসাব কষিয়া দেখিয়াছি, এক, দুই, তাহার পরে অসম্পূর্ণ আধপথে থামিতে হয়। অর্থাৎ আমার ঘরের পায়চারী করিবার পরিসর পদতল প্রসার করিয়া মাপিলে হয়, এক, দুই তাহার পরে পা কোনোমতে আড়াই-এ পৌঁছিবার আপ্রাণ চেষ্টা চলিতে পারে। আমার পাদচারণের ধারা হইতেছে ওই রকমঃ এক, দুই, হয়, হয়, আড়াই কিন্তু হইল না!

কেহ একজন ঘরের দরজা সরাইয়া আমার এই পাদচারণা দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, কেন আমি মাঠে অথবা নগরোদ্যানে গিয়া সম্পূর্ণ আড়াই-এর সুযোগ গ্রহণ করি না? প্রশ্ন শুনিয়া কোনো জগদ্বিখ্যাত পুরুষের মত আমার নাতিখর্ব হস্তসমন্বিত বাহুদ্বয় পশ্চাৎদিকে একত্রিত করিয়া প্রায় দুই পর্যন্ত গিয়াছি, তাহার পরে তাহার প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি, জগতে আজ পর্যন্ত ওই 'কেন'র কোনো মীমাংসা হইল না। তাই আমার মনে হয় যদি কাহাকে কখনো কোনো প্রশ্ন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে, মধ্যে অথবা অগ্রে মানে পুরোভাগে কদাপি ওই অমীমাংসিত, অন্তহীন 'কেন' আটকাইয়া দেওয়া অনুচিত। উহাতে আমার মনে হয়, প্রশ্নকারী উত্তরদাতাকে অবহেলা, অবজ্ঞা করেন। কিন্তু মানুষের বোঝা উচিত দাতা যখন দান করেন, তখন সেই দান হৃদয়ের উচ্চস্তরের মহৎবৃত্তি হইতে জীবনীশক্তি গ্রহণ করিবার পরে প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়। তাহা জানিয়াও যদি কেহ সেই দান সম্বন্ধে সন্দেহাকুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে স্বভাবতই, হ্যাঁ স্বভাবতই সেই দান শুকাইয়া যায়। অর্থাৎ কিনা...............

তাহার পর আমার সমস্ত সচেতন শরীর অবহেলাতে কাঁপিতে থাকেঃ আমি চোখ তুলিয়া দেখিয়াছি, প্রশ্নকারী অসম্পূর্ণ উত্তর শুনিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি অমীমাংসিত 'কেন' লইয়া আর অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া আমাকে ব্যাপৃত রাখিয়া আমার মানে তাহার মূল্যহীন সময় নষ্ট করেন নাই, যদিও আমি জানি আমার উত্তর শেষ পর্যন্ত শুনিলে, তাঁহারই অধিক লাভ হইত।

এই আটফুট ঘরের এই প্রায় ছয়ফুট পরিসরের মধ্যে যখন আমার সচেতন গোধূলিলগ্ন অতিবাহিত হইতে থাকে, সেই গোধূলিলগ্নে, সেই নিরবচ্ছিন্ন 'কেন' বিরহিত শান্তির মাঝখানে আমার মন খারাপ হইতে আরম্ভ হয়। মধ্যে মধ্যে সম্মুখের গলিপারের রুদ্ধ জানালার দিকে চাই আর মনে হয়, ওই বুঝি খুলিয়া গেল, ওই বুঝি আমার সন্ধ্যা নামিল!

ওই বুঝি, ওই বুঝি করিতে করিতে পালে বাঘ আসিয়া পড়ে। আমার মন খারাপ থাকে না, মন খারাপ হইবার আশংকা হইতে আমি উপস্থিত নিস্তার পাই। এইবার আমার বিরক্ত হইবার পালা। মন যখন ভয়েতে খারাপ হয় না, ভয়ের আশংকা যখন কাটিয়া যায়, তখন আমরা মানে মানুষ স্বভাবতই দাসত্ব হইতে প্রভুত্বে আসীন হইতে থাকে বা অধিরোহণ করে। কাজেই প্রভু যদি বিরক্ত হন, সেই বিরক্তির কথা পাঁচজনের সম্মুখে বলিতে পারা যায়, তাই আমিও বলিলামঃ এইবার আমার বিরক্ত হইবার পালা।

সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। গোধূলিলগ্ন অপসৃত। রাস্তার গ্যাস প্রদীপ্ত। গলির বাহিরের রাস্তার কলকোলাহল ছাপাইয়া কেহ চিতোরের রাণাকে জলস্পর্শ করিতে দিতেছেন না, কেহ কাঙালিনী মেয়ের দুঃখকে গলাবাজির দ্বারা প্রচারিত করিতেছে অধুনা ভাষায় যাহাকে বলা হয় জনগণ সমাজে, সেইখানে। সকলেই ব্যস্ত। তাহার মাঝে শুনিতে পাইলাম হারমোনিয়ামের রীড খুলিয়াছে, বেলো টেপা সুরু হইয়াছে। তাহার পর—হায়! হে আস্তিকের ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে, কেশব আইচকে ধনীলোক করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করো নাই? যদি কোনোদিন আইসে, আমার ধ্রুব বিশ্বাস আসিবেই, কেননা, ধর্মের কল পবনে বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে মনে মনে ঠিক করিয়াছি, যদি কোনো দিন আইসে, হে আস্তিকের ঈশ্বর! তোমার বিচার আমি করিব আমাকে গরীব করার জন্য (জানি না কবে সেইদিন আসিবে!)।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি হারমোনিয়ামের রীড্ শুধু সন্ধ্যার আসন্নপ্রায় অন্ধকারের ভীতিতে নিমজ্জিত করে তাহা নয়, আরও একজনকে আমার মত ভীত, অকথিত যন্ত্রণায় মথিত করে। তাহাকে আমি চিনি, আশেপাশের লোক চিনে, আপনারাও চিনিয়া রাখুন। স্বীকার করিতেছি রেণুকা নামটি মিষ্ট, স্বীকার করিতেছি তরুণী হিসাবে সে দ্রষ্টব্য। সেই কারণেই তাহার উপর আমার রাগ (অনুরাগ নহে) হয়,

হয়না বিরক্তির উদ্রেক। সে আমার মতন উৎপীড়িত, অত্যাচারিত। নিজেকে দিয়া অপরকে অনুভব করাই বিশ্বজনীন হইবার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সরলতম পন্থা। তাই নিজের দুঃখকে সূক্ষ্মস্নায়ুতন্তু হইতে স্নায়ুতন্তুতে প্রসারিত করিতে গিয়া তলাইয়া বুঝিতে পারি রেণুকাকে, রেণুকার সত্তাকে। সেই কারণে যদিচ রেণুকা উৎপীড়িতা, অত্যাচারিতা তথাপি আপনার ন্যায় তাহার দুঃখ গলাধঃকরণ করিয়া তাহাকে উৎপীড়িতা এবং অত্যাচারিতা না কহিয়া, কহিলাম, উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, কখনো কখনো নির্যাতিত।

—সারে গামা পাধা নিসা—সানি ধাপা মাগা রেসা—শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়স্থ হইয়া গিয়াছে। এই পর্যন্ত বেশ বুঝিতে পারি, সহিয়া সহিয়া শুনিতে পারি। তাহার পরে সহিতে না পারিলেও সহিতে হয়, শুনিতে না চাহিলেও কানের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়া প্রায় বেটনের খোঁচা লাগায়। কোমলে খেলে না, খাদে নামে না, সপ্তমে চড়ে না। হায় রেণুকে, ভগবান (আস্তিকের) তোমাকে সুরসমন্বিত গলা দেন নাই। কিন্তু তাহা কহিলে, অপটুত্বের দোষে তোমার মাষ্টার মহাশয়ের মাসিক মাহিনা মারা যাইবে, তোমার মাতা চটিবেন। সেই চটিয়া যাওয়া যে কিরূপ তাহার সহিত আপনাদের পরিচয় না থাকিলে করিয়া লউন।

—গলা ছেড়ে দিয়ে গা।—হুকুমের স্বর এবং বয়স্ক নারীর কণ্ঠ।

—গলা যে ওঠে না।—মিনতিপূর্ণ স্বর এবং তরুণী কণ্ঠ।

—উঠবে, উঠবে। সাধতে সাধতে গলা পোষকার হবে। তাহার পরে অস্ফুটস্বরে দুই চারিটি মিনতির কথা শেষ হইতে না হইতে সরোষে বয়স্ককণ্ঠের গর্জন এবং নিঃশব্দে অপরের রোদন।

—আ মোলো, নাকের ডগায় আবার জল এলো। চারপাশের সব মেয়ে বেতারে গেয়ে এলো আর এই অকম্মার দ্বারা আজ পর্যন্ত চারখানা গান তোলা হোল না।—অতএব আর একপালা নিঃশব্দ ক্রন্দনের পর তরুণীকণ্ঠ ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে গাহিয়া উঠিল—।

আমি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি সন্ধ্যার অবতারণার পরে নীলচে কালো আস্তরণের উপর মাত্র দুইটি তারারাজি বিরাজিত। তারা তবু দুইটি। কিন্তু বাঙলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক জীবনে হে নারীপ্রগতি, তোমরা কয়টি এবং কতদূর অগ্রবর্তী? (পূর্বেই কহিয়াছি, আপনার মধ্য দিয়া বিশ্বকে অনুভব করি, তাই স্ত্রীলিংগে অগ্রবর্তিনী হইল না।) যাহারা শশ্রূমাতা ও ননদিনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্য কাহারও দ্বারা লাঞ্ছিত তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। তাহাদের প্রগতি নাই, আছে অচল পশ্চাদগতি। কেন না, আবিষ্কারের যুগ হইতে এই বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত এই পশ্চাদগতি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যে পশ্চাদ্দিকে একপদ জমি লাভ করিতে পারে নাই—অধিকতর তীক্ষ্ম কোনো অস্ত্রাঘাতে (যাহা মনু ইত্যাদির দ্বারা নাকি পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত) পর্বতোপম স্থির রহিয়াছে।

ওকথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু প্রগতি, যাহার জীবনছন্দ হইতেছে, আগে চল আগে চল ভাই—তাহার ভিতরে যে এত শাখাপ্রশাখা বিরাজিত তাহা কি আমার মতো এই কক্ষাবদ্ধ কক্ষমণ্ডুক জানিত, না জানিতে পারিবার কোনো উপায় ছিল! এই প্রগতি, বেতারে যে গাহিতে পারিবে না, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় পারিবার যাহার কোনো ক্ষমতা নাই, তাহাকে যে অসাধারণ সুন্দরভাবে প্রগতির কেন্দ্রভূমি কলিকাতা শহরে বসাইয়া বসাইয়া লাঞ্ছিত করে তাহা তো জানিতাম না! তাই ওই নীলচেকালো আকাশের পানে উদাস আঁখি মেলিয়া ভাবিতেছিলাম, গাহিতে না পারিলে আধুনিক প্রগতি যদি এই লাঞ্ছনার ব্যবস্থাপত্র শিক্ষিতা (বোধ হয়) সপ্তদশী তরুণীর উপরে লিপিবদ্ধ করে তবে আগামী কালে হে বিংশ শতাব্দীর কলিকাতার প্রগতি, নৃত্য করিতে না পারিলে সপ্তদশী কিম্বা অষ্টাদশীদের অবস্থা কি সেই অচল পশ্চাদগতিসম্পন্ন বঙ্গবধূর সমতুল্য করিবে না!

হঠাৎ আমার চারিপাশে আশ্চর্যরকম প্রশান্তি যেন লঘু অপসরগতিতে নামিয়া আসিল। মুখ তুলিয়া ম্যাণ্টালপিসস্থিত ছোট ঘড়ির দিকে চাহিয়া আশ্বস্ত হইলামঃ ছোট এবং বড় হাত দুইটি সাড়ে আটটার দাগ পার হইয়া গিয়াছে। জানালার দুইপাশের পর্দা একত্রিত করিয়া দিয়া আমার চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। হারমনিয়ামের রীড্ থামিয়াছে আর সেই সংগে থামিয়াছে—যাউক, পুনরুক্তি বিরক্তি আনয়ন করে। শুধু এইটুকু বলিলে বোধ হয় বেশি হইবে না যে, আগামী সন্ধ্যার পূর্বে আর আমার মন খারাপ হইবার কোনো আশংকা নাই।

এমন করিয়া সকলের সংগে তরণী বাহিতেছিলাম। বরাবর অবগত ছিলাম বাহিরের এবং বিদেশের জীবনের সহিত আমার পরিচয় কম। আজকাল কিন্তু সেই গতানুগতিককে মানিয়া লইতে মন কেমন করে। অর্থাৎ এইটুকুন আজকাল আমি জানিতে পারিয়াছি যে কলিকাতাবাসী আধুনিক তরুণী যদি যে কোনো বেতার স্টেশনে গিয়া মাইক্রোফনের সাহায্যে বাঙলার বাতাসে ছোটবড় বায়ুতরঙ্গ তুলিতে না পারিল, তবে তাহার জীবন অসংকোচে যাহা জানিয়াছি তাহাই কহিতেছি, সেই তরুণীজীবন বৃথা! কেন?

অমীমাংসিত 'কেন' লইয়া কেন ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে যাই? আজ পর্যন্ত আমি এইটুকুন 'কেন' লইয়া পরিতৃপ্ত যে কেন আমি ওই হারমনিয়ামের রীড্গুলি প্রবল মুষ্টাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে পারিলাম না? তাহা হইলে বোধ হয় আমি অচল পশ্চাদগতির অচল পাশ হইতে মুক্ত হইয়া বিংশ শতকের বিশেষ কোনো পাদকের হারমনিয়াম-নাইট বলিয়া পরিচিত হইতাম—তরুণীর চোখের জল অপসৃত করিবার মহান গৌরব লাভ করিতাম।

দুই হস্তে সজোরে মাথার চুল টানিয়া আমার পদচারণের পরিবিস্তার প্রায় আলমারীর তলায় পা চালাইবার উপক্রমে প্রায় সাড়ে ছয়ফুটে পরিণত হইবার সম্ভাবনাতেই আমি আনন্দিত হইয়া উঠিয়া ভাবিঃ কেন, কেন, কেন? কলিকাতার প্রতি ঘরেই কি রেণুকার ন্যায় তরুণীবৃন্দ হারমনিয়ামের চাবি

টিপিতেছে বেতারে গাহিয়া প্রশংসাপত্র আদায় করিতে? আর, হে বেতারের হর্তাকর্তা বিধাতারা! এমন প্রতিষ্ঠান কেন খুলিয়াছেন? যে প্রতিষ্ঠানে গাহিবার জন্য রেণুকার চক্ষু হইতে লবণাক্ত বারি উৎসারিত হয়, যে প্রতিষ্ঠানে গাহিবার রিহার্সাল দিয়া উহারা আমার মনে সান্ধ্যভীতি উদ্রেক করে—এমনি প্রতিষ্ঠান কেন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন? আমি আপনাদের ক্ষমা করিতে পারি না। আপনারা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া কাহাকেও মাইক্রোফোনের সম্মুখে দাঁড়াইতে দেন, কাহাকেও বা দেন না। আমি, কেশব আইচ আপনাদের কহিতেছি, আপনারা এই পক্ষপাতিত্ব দূর করুন। সাঁঝবাতি জ্বালিবার সংগে সংগে যে হারমনিয়ামের রীড্ টিপিবার কোনো প্রয়োজন নাই, সেই কথা বুঝাইয়া গৃহে গৃহে গাহিবার আহ্বান আর সংগীতান্তে প্রশংসাপত্র (যদিও না থাকে, নূতন ব্যবস্থা হউক) প্রেরণের ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে কলিকাতাবাসীরূপে আমি অন্তত মন খারাপ হইবার অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিব।

বেতারের হর্তাকর্তা বিধাতারা কিন্তু যে রেণুকাকে হারমনিয়ামের রীড্ চাপিবার জন্য বাধ্য করেন নাই, অকস্মাৎ একদিন আমার সেই দিব্য দৃষ্টিলাভ হইল। আকাশের দিকে দৃষ্টি হানিয়া দেখিলাম, সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তের অনেক উপরে বিরাজমান। রাস্তার দিকে চাহিলাম, ছেলেরা ফুটবল হাতে খেলার মাঠযাত্রী। তবু আজ এই অসময়ে হারমনিয়ামের রীড কেন ঝনঝন্ করিয়া উঠিয়াছে! সভয়ে পর্দা দ্বিধাবিভক্ত করিতে করিতে ভাবিলাম, আজ কি দীপক রাগিণী বাজিবে এই বৈশাখের পূর্বাপরাহ্নে!

চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে রেণুকা-সংশ্লিষ্ট 'কেন'র অনেক উত্তর আমি পাইলাম। অবগত হইলাম, রেণুকার সংগীতের জনাই মুগ্ধ হইয়া পাত্রসমেত পাত্রপক্ষ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, এই বৈশাখে উদ্বাহের নিমিত্ত।

কান পাতিয়া থাকা (অভ্যাস মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব) সত্বেও হারমনিয়ামের কোনো পর্দা আর আমার মরমে কোনোদিন প্রবেশ করিল না—করিল সেই সূর্যোদয়ের পূর্বে একদিন শানাইতে সুমধুর ভৈরবীর আলাপন। ছোটবোন আসিয়া স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইয়া গেল, আজ রেণুদির বিবাহ। সারাদিন কাটিয়া গেলে অপরাহ্নে অভ্যাসানুযায়ী পর্দা সরাইতে দেখিলাম কয়েকটি তরুণীর সহিত রেণুকা এই পাশের ফাঁকা ছাদে, যেখানে কোনো আবরণী দেওয়া হয় নাই, সেইস্থানে উঠিয়া আসিয়াছে।

আমার দৃষ্টি তীক্ষ্ন হইয়া উঠিল। না, কাহারও ভুল বোঝা অনুচিতঃ আমি তরুণীদের পানে চাহিয়া আমার দৃষ্টি তীক্ষ্ন করি নাই। উহাদের দেখিতে আমার কষ্ট হয়, যেহেতু উহারা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত এবং সেই উৎপীড়নের প্রতিকার আধুনিক প্রগতিসম্পন্নরাও করিতে পারেন নাই। আমি চাহিয়া দেখিতেছিলাম আমার সেই বহুবার শ্রুত হারমনিয়ামটির দিকে। ছাদের আলিসার উপর আমার সেই অভুতপূর্ব বস্তুটি রাখিয়া পরিষ্কার করিতে করিতে একটি তরুণী কহিল, রেণুদি আজ আমরাই গাহিব, তোমার বরকে তোমার গান শুনতে দেব না। সেতো চিরদিনই শুনবে। আর মা কি বলেছেন জানো, আমি এইবার তোমার হারমনিয়ামে গাইব—হারমনিয়ামটা বড় পয়া......এইটে নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে তোমার গান সেদিনওতো চমৎকার হোয়েছিল......

বুঝিলাম আশীর্বাদের দিনের কথা হইতেছে। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলঃ হারমনিয়াম লইয়া গান শিখিবার প্রয়োজন বিবাহের জন্য—বেতারে গাহিবার জন্য নহে। কারণ, সংগীতজ্ঞা না হইলে নাকি আজকালকার প্রগতিসম্পন্ন দিবসে কন্যার কোনো মূল্য নাই। ইহা আমার নিজের মন্তব্য বা মীমাংসা নহে, ওই ছাদের উপরস্থিত রেণুকাসংগিনীদের কথা!

থমকিয়া থামিলামঃ হায় রেণুকা! ইহাই যদি হইবে তো আমাকে কেন এতোদিন ইহা জানাও নাই! তাহা হইলে আমি, কক্ষমণ্ডুক কেশব আইচ তোমাকে হারমনিয়ামের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দিতাম। না, ভুল বোঝা উচিত নহে, আমি বিবাহ করিতাম না, এমন পাত্রের সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করিতে বোধ হয় পারিতাম যে প্রকৃতপক্ষে সংগীত বুঝিয়া থাকে এবং সেই নিমিত্ত এই পাত্রপক্ষের ন্যায় 'বাহবা' বলিয়া ঈশ্বর যাহাকে গলা দেন নাই তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইত না 'সংগীতজ্ঞা' কহিয়া। সে সকল কিছু বুঝিয়া তোমাকে ঘরে লইয়া যাইত—আমি বহুপূর্বে তোমার সহিত বাঁচিতাম।

দুম্ করিয়া যে প্রচণ্ড শব্দ হইল, তাহাতে চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম পাশের নির্জনগলিতে আলিসার উপর হইতে হারমনিয়াম আসিয়া পড়িয়াছে। রেণুকা ব্যতীত সকলে মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। একজন যেন কহিল, রেণুদির হাত লেগেই তো সরে গেল, তাই নীচেতে.........

রেণুকা তাহাকে বাঁধা দিল, বাজে বকিস্ নি, নীচে চল আমার দিকে যেন কটাক্ষ হানিয়া তাহারা সরিয়া গেল।

এতোক্ষণে কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম দুইটি কথাঃ হারমনিয়ামটা অনেক দোল খাইয়াছে, রেণুকা তাহার দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ শেষ করিল; এই হইতেছে প্রথম, দ্বিতীয় হইতেছে যাহার গলা উঠে না তাহাকেও হারমনিয়াম লইয়া গলার কসরত দেখাইতে হয় বিবাহের জন্য আর যে প্রকারেই হউক বেতারে গাহিবার অনুমতি যোগাড় করিতে হয়।

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলিয়া দেখি, বেতারে গাহিতে হইলে, এইবার হইতে তানপুরা ইত্যাদির সহযোগে গাহিতে হইবে, হারমনিয়াম আর চলিবে না। তাহা পড়িয়া আমি, কেশব আইচ মনে মনে কহিলাম, হে রেণুকা, তুমি মাহেন্দ্রমুহূর্তে পার হইয়া গেলে। কারণ আগামীকল্য অথবা অদ্যই যদি পাত্র এবং পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিতে আসিতেন তাহা হইলে তাহারা কহিতেন, তানপুরায় গান ধরুন—হারমনিয়াম আজকাল চলে না।—তোমার তখনকার অবস্থা কল্পনা করিতে গিয়া যে আমার সান্ধ্যভীতি কি ভয়াবহ রূপে ধারণ করিতেছে তাহা কাহাকে আমি বোঝাইতে পারিব?

শ্রীনিকেতনে পল্লীশিক্ষা

শ্রীতারকচন্দ্র ধর

“শ্রীনিকেতনে পল্লী-শিক্ষা” সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে শ্রীনিকেতনে কী কাজ হয় তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া দরকার। শ্রীনিকেতন হচ্ছে বিশ্বভারতীর পল্লী-সংগঠন বিভাগ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ জীবনের আদর্শ শান্তিনিকেতনে ছিল খণ্ডিত-ভাবে, শ্রীনিকেতনে তাহা পরে পূর্ণতা-লাভ করেছে। শান্তিনিকেতনে তিনি গড়েছেন জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র, আর শ্রীনিকেতনে জ্ঞান, কর্ম ও সেবার সংযোগে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। হতশ্রী, অবজ্ঞাত পল্লীর জন্য তিনি শুধু ভেবেই ক্ষান্ত হন নি, যথাবিহিত সংগঠন দ্বারা তাহা পূর্ণভাবে গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করেছেন। সত্যদ্রষ্টা কবিগুরু বহু পূর্বে বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রামের মৃত্যুতে ভারতের মৃত্যু; সুতরাং ভারতের উন্নতি করতে গেলে আগে গ্রামগুলির উন্নতি-সাধন অত্যাবশ্যক। পল্লী-সংস্কারই জাতি-গঠনের প্রধান উপায়। তাই এখানে রয়েছে কৃষি-বিভাগ, শিল্প-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ, পল্লী-সেবা-বিভাগ, তত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগ ও শিক্ষা-বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগেরই লক্ষ্য হচ্ছে সংগঠন কার্যে সাহায্য করা। গ্রামের প্রকৃত উন্নতি করতে হ'লে এর কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। শিক্ষা-বিভাগ তাহার ভিতর অন্যতম। শিক্ষাই হচ্ছে জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। কাজেই বিশ্বভারতী পল্লী-শিক্ষাকে অবহেলা না করে তাহার প্রতি নজর দিয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণ এবং শিক্ষা প্রচারের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পন্থার নির্দেশ করেছেন। কল্পনা ও অনুধাবনার দ্বারা পল্লী-শিক্ষার একটা বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী ১৮টি গ্রামে সংগঠন-কার্য চলেছে। প্রায় সবগুলি গ্রামেরই প্রাথমিক শিক্ষা (গভর্নমেণ্ট সহযোগিতায়) বিশ্বভারতী পরিচালনা করছেন। সংগঠন-কার্যের জন্য নির্দিষ্ট সীমার বাহিরেও কয়েকটি গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্বভারতীকে করতে হয়েছে। এর ভিতর ৫টি বিদ্যালয়ে কেবল সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা পড়ে, বাকিগুলির প্রায় সবই হরিজন ছেলেমেয়েদের জন্য। স্থানীয় গ্রামের ছেলেদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিদ্যালয় কোন স্থানে সকালে ও কোন স্থানে সন্ধ্যায় বসে।

আমরা কাজ আরম্ভ করার আগে গ্রামে শিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি এই তথ্যগুলি নিয়ে থাকি—গ্রামের লোকসংখ্যা (পুরুষ ও স্ত্রী), তাদের শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলে ও মেয়ে, গ্রামের বিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন বিদ্যালয়ে কতজন যায় ইত্যাদি। যেখানে পাঠশালা থাকে আমরা তাহাকে সংস্কার করতে চেষ্টা করি।

খোলামাঠে শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের অধ্যয়ন

শিক্ষকের আর্থিক সাহায্যের এবং তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডার যাহাতে বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি রবিবার সকল শিক্ষক সকাল বেলা শ্রীনিকেতনে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে অধ্যাপনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়—কী করে চঞ্চল মনকে শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করা যায়, কী করে আনন্দের মধ্য দিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-লাভ করতে পারে, কীভাবে কোন্ পথে চালালে এবং কোন্‌খানে শিশুদের শিক্ষা-পদ্ধতির নির্দেশ করলে লক্ষ্যস্থানে সহজে পোঁছুতে পারা যায় ইত্যাদি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এছাড়া তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি রীতিমত পড়ান হয়।

পাঠশালার শিক্ষকদের জ্ঞান-ভাণ্ডার কত দরিদ্র তাহা সকলেই জানেন। অর্থের দিক্ দিয়ে তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। যে বিদ্যালয়ে স্কুলবোর্ডের অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্য থাকে না সেখানে আমরা সাহায্যের পরিমাণ বেশী করে থাকি। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র। সকলেই মুখে বলি, ‘প্রাথমিক শিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ’। কিন্তু
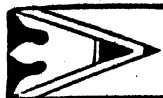
এদিকে সকলেই উদাসীন। যাহাদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার তাহাদের দিকে কাহারও কৃপাদৃষ্টি নেই। মাসে ৩৲।৪৲ পেয়ে এ'দের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের এই সব শিক্ষক যাহাতে অন্তত সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে তজ্জন্য স্কুলবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় আমরা কাজ করে থাকি। মাসিক সাহায্য ব্যতীত অবসরকালে হাতের কাজ করবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তাহাতে অনেকে ২৲।৪৲ টাকা আয় করেন, ছেলেদেরও কিছু কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

তাহার চেষ্টা করা। এদের জ্ঞানের মাপকাঠি "পরীক্ষা-পাস্" না হলেও ম্যাট্রিক পাস করা শিক্ষিতদের চেয়ে এদের জ্ঞান সাধারণভাবে বেশী বই কোনদিক্ দিয়ে কম থাকবে না, গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে এরা সচেতন থাকবে এবং তাহার সমাধান নিজেরাই করবার চেষ্টা করবে। জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে এরা বিব্রত হয়ে না পড়ে তজ্জন্য প্রত্যেককে কোন একটা হাতের কাজ শিক্ষা করতে হয়। হাতের কাজের সংগে জ্ঞানের সংযোগ রক্ষা করা হয়।

জোর করে বাহির থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না,

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এবং শ্রীনিকেতন কর্ম্মিবৃন্দের গ্রুপ ফটো

শিক্ষকদিগকে সংগঠিত করে নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার এবং পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ-দানের উদ্দেশ্যে বোলপুর সার্কেলে একটি শিক্ষা-সমিতি গঠন করা হয়েছে। বার্ষিক অধিবেশনে শিক্ষাবিদ্‌দের এনে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষা-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। এতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়া শ্রীনিকেতনে একটি আদর্শ বিদ্যালয় আছে, নাম 'শিক্ষা-সত্র'। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ থেকে ছেলেদের নেওয়া হয়। সুনির্দিষ্ট পন্থানুসারে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যের সংযোগ রক্ষা করাই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উদ্বোধন করা এবং যাহাতে তাহাদের সমস্ত বৃত্তি-গুলি জাগ্রত হয়, তাহাদের ভিতর সংযোগ স্থাপিত হয় পথের সংকেত করে দেওয়া হয় মাত্র। আমরা পথপ্রদর্শক ও সহায়ক। তাহারা নিজেরা সব কিছু করছে এবং শিখছে। গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করে ছাত্রদের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত হবার সুযোগ দেওয়া হয়।

ছেলেরা সাধারণত সুন্দর সুন্দর গল্প, বীর-কাহিনী, দেশপ্রেমের বৃত্তান্ত শুনতে বা পড়তে ভালবাসে। এই সবের ভিতর দিয়ে ছেলেরা যাতে ইতিহাসের জীবন্ত ও মহৎ অংশগুলি আয়ত্ত করতে পারে তাহার যথারীতি ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাহাতে ছেলেরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠতে পারে তাহার জন্য সপ্তাহে একদিন প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা আছে—তাহারা জিজ্ঞাসা করে, আমরা উত্তর দিয়ে থাকি। যে কোন প্রশ্ন তাহারা করুক আমরা বাধা দিই না। এতে আর একটা জিনিস আমরা পেয়ে থাকি—কোন্ ছেলে কীভাবে চিন্তা করছে, কে কী লক্ষ্য করছে ইত্যাদি জানা যায়।

ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ কোন্ বিশেষ গুণ, ধারণা বা সংবৃত্তিকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে তাহা পূর্ব থেকে জানা যায়।

সবক্ষেত্রেই এরা করছে, শিখছে, জানছে। ভুল করতে গেলেও বাধা দেওয়া হয় না, কারণ ভুল করেও এরা শেখে, কাজেই ভুল করারও মূল্য এখানে দেওয়া হয়। হাতের কাজের মর্যাদা বাড়াবার উদ্দেশ্যে এদের অনেক কিছু কাজে চালিত করতে হয়। সব দিক্ দিয়ে এদের আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহারা সকলে মিলে যেন একটি ছোট সমাজ। দৈনন্দিন জীবনের ভুলত্রুটির বিচার নিজেরাই করে, তাহাদের বিচার-সভা নিজেরাই গঠন করে। গৃহস্থালী কার্যের খুঁটিনাটি পর্যন্ত তাহাদের শিক্ষনীয়। স্বহস্তে অঙ্গন পরিষ্কার, শয্যা-প্রস্তুত, হাটবাজার করা, হিসাব রাখা প্রভৃতি সবই তাহাদের কর্তব্য। নিজেদের ভিতর এবং সাধ্যমত বাহিরেও তাহারা অসুস্থের সেবার ভার নেয়। সব কাজই যাহাতে আনন্দের সঙ্গে করে, স্বেচ্ছায় করে তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

তাহাদের চারিপাশের সকল বস্তুর প্রতি যাহাতে তাহাদের দৃষ্টি পড়ে এবং সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার আগ্রহ-লাভ করে তাহার জন্য প্রতি বৎসর তাহারা

(শেষাংশ ২৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংকালীতলার মেলায় ছাত্রদের সেবাকার্য্য

শিক্ষাসত্রের ছেলেরা বাগানের কাজ করিতেছে

প্রহেলিকা

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[৯]

"ও নাম-না-জানা ম'শাই।"

লেকের ধারে প্রায় সম্পূর্ণ নির্জন অংশে যখন নিখিলেশ অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে বেড়াচ্ছে তখন পিছন থেকে এই শব্দ এসে নিখিলেশের ভিতর এমন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিলে যে সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

সে বেরিয়েছিল যথারীতি বিকেল বেলায় এবং সেই মণিহারী দোকানের সামনে ঝাড়া দু ঘণ্টা পায়চারী ক'রে যখন কিছুতেই প্রহেলিকার দেখা পাওয়া গেল না এবং আজ নিয়ে সমানে সাতদিন এই দুর্ঘটনা ঘটা দেখা গেল, তখন সে হতাশভাবে চ'লে এসেছিল লেকে; একটা হতাশের আশা নিয়ে যে এখানে হয়তো তার দেখা পেলেও পেতে পারে।

রোজই যে নিখিলেশের এ অভিযান সার্থক হ'ত এমন কখনই হয় নি। কিন্তু দু'দিন কি বড় জোর চারদিনের সাধনায় প্রায়ই দেখা হ'ত। কিন্তু ইদানীং চার দিনও পেরিয়ে যায় দেখে সে আকুল হ'য়ে সেদিন সিনেমায় গিয়েছিল তার দুঃখ ও নৈরাশ্য একটা ট্রাজেডী দেখে উপভোগ করবার জন্যে। সেখানে গিয়ে তার হয়েছিল আছাড়ে পদ্মলাভ! তার অন্তরের বেদনার অনুভূতিকে যথোচিত নিবিড় ক'রে মুখের উপর একরাশ মানসিক কালি লেপে দিয়ে যখন সে মনের ভিতর আসন্ন ট্রাজেডীর ছবি দেখবার জন্য জমী সম্পূর্ণ তৈরী ক'রে এনেছে তখন হঠাৎ তার পাশের সীটে এসে বসলেন একটি মহিলা। সে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করলেও মনের বৈরাগ্যের নিবিড়তা পরিপূর্ণরূপে তাজা রাখবার জন্যে সেদিকে অনেকক্ষণ চাইলে না। যখন চাইলে শেষে—তখন অমনি সমস্ত শরীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। দেখলে পাশে বসে আছে প্রহেলিকা।

সে যে তখনি তাকে একেবারে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ ক'রে ফেললো না, তার কারণ তার স্বভাব ভীরুতা, সিনেমায় একরাশ অনাবশ্যক লোকের অস্তিত্ব, প্রহেলিকার মনে কি রকম সাড়া পাওয়া যাবে সে বিষয়ে সুপ্রচুর সন্দেহ প্রভৃতি—নিখিলেশের আকাঙ্ক্ষার অভাব নয়। তখনি যে সে তাকে আবেগভরে সম্ভাষণ করলে না, তার প্রধান কারণ প্রহেলিকার অপর পার্শ্বের লোকটির সেরূপ কার্যের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা।—সে তাই নীরবে কিন্তু প্রচুর অন্তশ্চাঞ্চল্যের সহিত ব'সে বিচার করতে লাগলো ঠিক কি করা যায়?

—এ সুযোগ ছাড়া যায় না।

—আজই একটা এস্পার ওস্পার করতেই হবে। কেবল ঠিক করতে পারলে না এস্পার বা ওস্পার কোনও পারে যাবার প্রণালীটা।

সেই বিচার করতে করতে হয়তো সেখানে নীরবেই সে রাত কাটিয়ে দিত, কিন্তু ছবির অবসরকালে বাতি জ্বলে উঠলো এবং প্রহেলিকাই বিশেষ চমৎকৃত এবং উল্লসিত কণ্ঠে ব'লে বসলে "এই যে আপনি!" তখন তার সমস্ত অন্তর হঠাৎ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো মুখখানিও সফলতার হাস্যে উজ্জ্বল হ'য়ে গেল। কিন্তু সে বল্‌লে সুধু—"অ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।" বলবার মত আর কোনও কথাই তার মনে এলো না।

খুব হেসে প্রহেলিকা বল্‌লে, "খুব উৎসাহ তো আপনার! এখানেও পিছু নিয়েছেন।"

কথাটায় যে খোঁচা আছে সেটা মিথ্যা। অতএব নিখিলেশ প্রতিবাদ করতে বাধ্য হ'ল। সে বল্‌লে, "না, না, ও কি বলছেন? আমি জানতামও না যে আপনি এখানে আসবেন।"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "সত্যি বলছেন?"

"নিশ্চয়।"

বেশ একটু অভিমানের সুরে প্রহেলিকা বল্‌লে, "তবে আর আপনি কি? আমি ভেবেছিলুম যে আপনি ঘরে ব'সে বসেই telepathyতে জানতে পান যে আমি কখন কোথায় থাকবো! এ নইলে gallant?"

হঠাৎ এ উল্টো সুরে নিখিলেশ একটু দমে গেল। তার পর সাহস ক'রে সে বল্‌লে, "ইচ্ছা তাই হয়, কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হয় না। আন্দাজে অনেক ভুল হয়।"

"যা' হ'ক, ইচ্ছে হয় তবু ভাল। আচ্ছা ছবিটা কেমন লাগছে আপনার?"

এ বিষয়ে অভিমত দেবার অধিকার ছিল না নিখিলেশের কেন না সে ছবি দেখেওনি এতক্ষণ, তার কোনও কথাও শোনে নি। তবু সে বল্‌লে, "খুব ভাল লাগছে।"

"ছাই! ব'লে প্রহেলিকা মুখ বিকৃত করলে।

আবার নিখিলেশ নিভে গেল। আমতা আমতা ক'রে সে বল্‌লে, "অবিশ্যি একেবারে প্রথম শ্রেণীর নয়, তবু হাজার হোক গ্রেটা গারবো—"

"উঃ! ও মেয়েটা আমার দু চক্ষের বিষ! যেমন দেখতে হাড়গিলের মত, তেমনি হেঁড়ে গলা। আর acting? যেন মড়া ব'য়ে নিচ্ছে! ও কি ছাই!"

নিখিলেশের ভিতর যে প্রচণ্ড তার্কিক থাকে সে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ ও আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, কিন্তু একথায় সে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো। গ্রেটা গার্বো সুন্দর কি অসুন্দর, সে অভিনেত্রী ভাল কি মন্দ এ কথাটার জন্য সে অন্য সময় হয় তো মাথা ঘামাত না, কিন্তু সে সম্বন্ধে সে একটা মত প্রকাশ করেছে এবং তাতে প্রতিবাদ এসেছে। এ অবস্থায় তর্ক না ক'রে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। সে খুব ঝোঁকের সঙ্গে বল্‌লে, "আপনি কি বলেন? গ্রেটা গার্বো—বিশ্বের

সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, তার সম্বন্ধে কোনও দুইমত থাকতে পারে না। তার সৌন্দর্য ঠিক সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে বিচার করলে হয়তো খাটো ক'রে দেখবেন, কিন্তু যাঁরা সৌন্দর্যজ্ঞানের রীতিমত কালচার করেছেন তাঁদের চোখে তার রূপ অসামান্য; তা ছাড়া তার ভিতর যে glamour আছে—"

"Glamour! সে আবার কি? আচ্ছা, আমার চেহারায় glamour আছে?"

হেসে নিখিলেশ বল্‌লে, "অত্যন্ত বেশী। এত বেশী যে—"

"প্রায় গ্রেটা গার্বোর কড়ে আঙুলের ধাক্কা—কেমন?"

এ রকম লোকের সঙ্গে তর্ক করা কঠিন। তুমি গেলে ধনুক বাণ নিয়ে, চাই কি তলোয়ার নিয়ে শাস্ত্রসঙ্গতভাবে যুদ্ধ করতে, আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও শাস্ত্রের ধার না ধেরে তোমার পাঁয়তাড়ার মাঝখানে ঘটোৎকচের মত একটা গাছ নিয়ে ধাঁই ক'রে তোমার মাথায় বাড়ি মেরে বসলো, এতে কি যুদ্ধ চলে? নিখিলেশের মনে হ'ল কতকটা সেই রকম। তর্কযুদ্ধের উদ্যোগপর্বেই হ'য়ে গেল তার অপঘাত।

কি আর ক'রবে? সে সুধু হাসলে।

প্রহেলিকা বল্‌লে, "আপনার পাশে আমি না ব'সে যদি বসতো ধরুন গ্রেটা গার্বো, তা' হ'লে আপনি কি ক'রতেন? নিশ্চয় এক শিশি নোনতা বাদাম কিনে তাকে উপহার দিতেন। কেমন?"

একটা ভেণ্ডার নোনতা বাদাম নিয়ে তাদের সামনে এসে পড়েছিল। নিখিলেশ তাই বাস্ত সমস্ত হ'য়ে একশিশি বাদাম কিনে কম্পিত হস্তে প্রহেলিকাকে দিলে।

শিশিটা খুলে প্রহেলিকা বাদাম বের ক'রে কয়েকটা নিখিলেশকে দিলে, কয়েকটা নিজের মুখে পুরে দিলে আর কয়েকটা তার অপর পার্শ্বের লোকটিকে দিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে লেগে গেল।

তখনি বাতি নিভে গেল, ছবি আবার আরম্ভ হ'ল। যখন শেষ হ'য়ে গেল তখন নিখিলেশের সঙ্গে একটি কথাও না ব'লে প্রহেলিকা অপর লোকটির সঙ্গে সুড় সুড় ক'রে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

নিখিলেশ হাঁ ক'রে চেয়ে রইল সুধু।

ভারী চ'টে গিয়ে নিখিলেশ প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলো মেয়েটার সঙ্গে আবার সাক্ষাতের। কিন্তু একাদিক্রমে সাত দিন সেই মণিহারী দোকানে পাহারা দিয়েও দেখা না পেয়ে আজ হতাশ চিত্তে লেকের সব চেয়ে নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে অস্তমান সূর্যের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ সেই পরিচিত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল, "ও নাম-না-জানা ম'শাই।"

ধাঁ ক'রে মুখ ফিরিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তার অনেক মুসাবিদা করা এক বক্তৃতা করবার মুখে সে থমকে গেল। প্রহেলিকা একা নেই, তার সঙ্গে আছে আর একটি লোক। হয় তো মহিলা, হয় তো যুবতী, হয় তো সুন্দরী; কিন্তু সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল না, সে দেখলে সুধু আর একটি মানব—তার আবেগের মুখে মূর্তিমান বিঘ্ন!

আর সে দেখলে, প্রহেলিকা আজ হাসছে না। তার মুখ গম্ভীর, যেন বিষাদে আচ্ছন্ন! এই অনৈসর্গিক ব্যাপারে তার বুকের ভিতর চড়াৎ ক'রে উঠলো।

সে কিছু বলবার সুবিধা হবার আগেই প্রহেলিকা বল্‌লে, "আপনাকেই খুঁজছিলাম।"

ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে নিখিলেশ বল্‌লে "কেন বলুন তো?"

"বড় বিপদে প'ড়েছি।" নিখিলেশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "কি বিপদ?"

"চলুন বলছি" ব'লে প্রহেলিকা গম্ভীরভাবে নীরবে কিছুক্ষণ নিখিলেশের সঙ্গে অগ্রসর হ'ল।

অনেকক্ষণ পর সে বল্‌লে, "আমার বাবা"—

বিচার ক'রে দেখলে নিখিলেশ অবশ্যই বুঝতে পারতো যে প্রহেলিকার বাবা, মা, পিশি, মাসী, সর্দি, কাশি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন আনুসঙ্গিক উপসর্গ থাকা সম্ভব। কিন্তু এ পর্যন্ত এসব উপদ্রবের কথা তার মনের আশ পাশেও আসে নি। তার কাছে প্রহেলিকা ছিল প্রহেলিকা—ক'লকাতার জনসমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত এক অভিনব উর্বশী। তার বাবার কথাটা যেন তাকে ধাক্কা দিলে। সে বল্‌লে, "হ্যাঁ আপনার বাবা"—

"পশ্চিমে সামান্য মাইনেয় চাকরী করেন।"

অবশ্যই করতে পারেন এবং করতে থাকুন তিনি, কিন্তু তাঁর এমনি সময়ে হঠাৎ নিখিলেশ ও প্রহেলিকার মাঝখানে এমনি একটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যবধান হ'য়ে দাঁড়াবার কোনও প্রয়োজন নেই।

"তিনি আমার বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নিখিলেশ বল্‌লে, "ভারী অন্যায়!"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রহেলিকা বল্‌লে, "অন্যায়? অন্যায় কিসে? আমার বিয়ে হওয়া অন্যায়?"

তার স্বরের তীব্রতায় নিখিলেশ ঘাবড়ে গিয়ে খানিকক্ষণ আমতা আমতা ক'রে শেষে বল্‌লে, "তা নয়, কিন্তু আপনার বিয়ে নিয়ে তাঁর মাথা ঘামান অন্যায়—আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে"—

"গোল্লায় যেতে পারি, কিন্তু বাপ হ'য়ে তিনি তার কোনও প্রতিকার ক'রবেন না, এই ব'লতে চান?"

এর একটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত এবং লাগসই উত্তর ঘণ্টা-খানেক সময় পেলে নিখিলেশ দিতে পারতো। কিন্তু সে সময় সে পেলে না। সে নীরবেই রইলো। প্রহেলিকা তাকে কিছুই বলবার সময় না দিয়ে বল্‌লে, "যাক গে, তিনি ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি গরীব, টাকা পয়সা দেবার উপায় নেই তাঁর। আর আমিও তেমন সুন্দর নই। অথচ অপেক্ষাও ক'রতে পারছেন না। মাসখানেক বাদে তিনি সরকারী কাজে একবার কলকাতায় আসবেন, দিন পোনেরো থাকবেন। এর ভিতরই আমার বিয়ে দিয়ে যেতে চান।"

এ বক্তৃতার মাঝখানে অনেকবার বাধা দিয়ে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হয়েছিল নিখিলেশের, কিন্তু আবার কি বল্‌লে

মেয়েটা কি ভেবে বসবে তাই সে চুপ করেই রইলো। এতক্ষণে সে বল্‌লে, "তা সে আর শক্ত কি?"

গম্ভীরভাবেই প্রহেলিকা বল্‌লে, "শক্ত কিছুই নয়, সুধু বরের জোগাড় নেই। তাই ভারী বিপদে পড়েছি। ভাবছিলাম আপনি হয় তো একটা সাধারণ চলনসই গোছ বরের সন্ধান দিলেও দিতে পারেন। তাই আপনাকে খুঁজেছিলাম।—পারেন কি? খুব ভাল বর আর আমার কোথ্‌থেকে হবে—বিশেষ বাবা যেখানে গরীব—এই সামান্য লেখাপড়া জানে, টাকা পঞ্চাশেক রোজগার করে, এমনি বর দিতে পারেন?"

এমন একটা বেপরদা কথা যে কোনও মেয়ে হঠাৎ একটি স্বল্পপরিচিত যুবককে বলতে পারে একথা কানে না শুনলে নিখিলেশ বিশ্বাস করতো না। আর ঠিক বহাল তবিয়তে কথাটা শুনলে হয়তো তার প্রথমেই মনে হ'ত সে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু নিখিলেশ ভাবছিল সে পরীস্থানে—এখানে অসম্ভবটা একমাত্র সম্ভব। তাই এসব নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হ'ল। তাছাড়া যথোচিত চমকিত হবার অবসর তার হ'ল না, কেন না তার আকুল আগ্রহ তাকে ঠেলা মারতে লাগলো এই কথাটাই সর্বাগ্রে বলতে যে সে বর তার নিজের ভিতরই মজুত আছে সুতরাং যে কোনও তারিখে বিবাহ হ'তে কোনও বাধা নেই।

কিন্তু সে কথা তার বলা হ'ল না।

এই কথা হ'তে হ'তে তারা এসে পড়েছিল ক্লাব ঘরের সামনে। ক্লাবের গেট থেকে সেই অপ্রাসঙ্গিক বুড়ো ভদ্রলোক "হ্যালো, Riddle," ব'লে তাকে সম্ভাষণ করতেই প্রহেলিকা ছুটে তার কাছে চ'লে গেল।

নিখিলেশের সময় হ'ল সুধু এইটুকু বলবার, "খবর পেলে, কোথায় কখন জানাব?"

প্রহেলিকা মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "২৫নং গোল্লাপাড়া লেন—আমার বাবা সতীশচন্দ্র বোসের নামে চিঠি দেবেন।"

ব'লেই সে গেটের ভিতর চ'লে গেল। নিখিলেশ হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো।

প্রহেলিকার সঙ্গিনী তাকে গুঁতো মেরে বল্‌লে, "পোড়ারমুখী!"

প্রহেলিকা গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "কেন?"

প্রশান্তভাবে উত্তর হ'ল,—"এসব কি হ'ল প্রহেলিকা?

নিখিলেশ তখনি বাড়ি গিয়ে সতীশচন্দ্র বোসকে চিঠি লিখলে যে সে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী; এবং নিজের যোগ্যতার সম্পূর্ণ পরিচয় সে চিঠিতে দিয়ে দিলে। এম এ পাশ করবার পর থেকে সে অনুমান গণ্ডা দশেক চাকরীর দরখাস্ত করেছে; অভ্যাসবশে সেই সব দরখাস্তের ভাব এবং ভাষা এই চিঠিতে তার আত্মপরিচয়ের ভিতর প্রবেশ ক'রে গেল।

(ক্রমশ)

শ্রীনিকেতনে পল্লী শিক্ষা

(২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

নানাপ্রকার বস্তু সংগ্রহ করে, যথা—ফুল, পাতা, মাটি, শস্য, ফলের বীজ সার, লেখ্য উপকরণ, ওষধি, কাঠের নমুনা ইত্যাদি। এই সবগুলি তাহাদের ছোট্ট মিউজিয়মে সযত্নে সাজিয়ে রেখে দেয়। নিকটের বস্তুর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে ক্রমে দূরের বস্তু দেখবার ইচ্ছা যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য নানাপ্রকার তথ্য-সংগ্রহের কাজও এরা করে থাকে। মোটের উপর আমাদের সব সময়েই এবং সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টি থাকে যাহাতে এদের চিন্তাশক্তি মরে না যায়, নূতন জ্ঞান-লাভের ঔৎসুক্য বাড়ে।

বিকাশোন্মুখ এই বিদ্যালয়টিকে সামনে রেখে পল্লীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে। এখানে 'শিক্ষাচর্চাভবনে' সুশিক্ষক করবার জন্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। 'শিক্ষাচর্চা' থেকে বাহির হয়ে ছাত্ররা পল্লীতে গিয়ে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে এই আশা।

ড্রিল, খেলাধুলা যেমন এখানকার ছাত্রদের প্রাত্যহিক কর্তব্য, তেমনি পল্লী-জীবনের সকল সমস্যার সঙ্গে পরিচিত থাকার জন্য মাঝে মাঝে তাহারা গ্রামে গিয়ে থাকে। বন-ভোজন উপলক্ষ করে বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা এবং সাধ্যমত গ্রামবাসীদের সকলপ্রকার সাহায্য করার অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। খেলা প্রভৃতি উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকরূপে এরা যে কাজ করে তাহা জন-সেবার একটি দৃষ্টান্ত।

এ ছাড়া তর্কবিতর্ক সভা, সাহিত্য-সভা প্রভৃতির দ্বারা গ্রামের, দেশের সমস্যাগুলিকে তাহারা নিজেদের কাছে পরিষ্কার করে নেয়। দৃষ্টি সুদূর-প্রসারী করার জন্য তাহারা প্রতি বৎসর ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করতে যায়। এই সব বিষয়েই তাহারা অধ্যাপকদের সম্পূর্ণ সহায়তা পেয়ে থাকে।

শ্রীনিকেতনে একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বালিকারা পড়ে। পড়ালেখার সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, হাতের কাজ, খেলাধুলা প্রভৃতির যথাযোগ্য চর্চা হয়ে থাকে।

শ্রীনিকেতনের বহুমুখী কার্যের সম্পূর্ণ বিবরণ বৃহৎ ব্যাপার। সংক্ষেপে এইটুকুই বলা হল। আমাদের চেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে তা বলা কঠিন; তবে আমাদের কার্যের গতি দেখে আনন্দিত, উৎসাহিত হবার কারণ আছে। সকলের সহানুভূতি আমাদের আরও অগ্রসর হবার সহায়তা করবে।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ও শ্রীমন মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা —(অনুবাদ বিস্তৃত তাৎপর্য, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সহিত)। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম এ, পি আর এস, পি এইচ ডি কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক, কৃষ্ণ ব্রাদার্স, ২২নং পেয়ারাবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। দশ খণ্ডে বিভক্ত মূল্য প্রতি খণ্ড সাধারণ পক্ষে পাঁচ সিকা, গ্রাহক পক্ষে এক টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত টীকার অনুবাদ এবং তাৎপর্য-সম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থ সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইল, এজন্য আমরা অনুবাদক সপ্ততীর্থ মহাশয়কে এবং ব্রহ্ম মহাশয়কে আমাদের সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীল মধুসূদনের টীকার পরিচয় বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রদান করা অনাবশ্যক, তাঁহার পাণ্ডিত্য ভারতের সর্বত্র প্রথিত; কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না মধুসূদন অদ্বয়তত্ত্ব-মননপরায়ণ পরম জ্ঞানী। তাঁহার এই জ্ঞান রসবিগ্রহতত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত—কবি কর্ণপূরের ভাষায় ইহা ভগবানের অনুগ্রহ-জনিত বিশেষ জ্ঞান। শাস্ত্রকারগণের মতে অভেদ দর্শনই হইল জ্ঞান; কিন্তু অভেদ দর্শনের অন্তর্নিহিত একান্ত যে উপপত্তি, তাহা সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয়, তাহাতে মাধুর্যের আকর্ষণের ক্ষমতা আছে, তাহাতে লীলা আছে। আচার্য্য শংকরের গীতাভাষ্যের মধ্যে একান্ত এই তত্ত্বটি না আছে এমন নহে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত গূঢ় ভাবে আছে, সূক্ষ্মদর্শী সাধক ছাড়া সে বস্তু ধরা বড়ই কঠিন। শ্রীল মধুসূদনের ব্যাখ্যার বিশেষত্ব হইল এই যে, তিনি স্বীয় মনন-মাধুর্যের দ্বারা সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন,—তাঁহার নিজের উক্তিতে—'ইহ যোগিত বিমোহয়ন্ মনঃ পরমানন্দঘনঃ সনাতনঃ' তাঁহার রসতত্ত্বকে গীতাভাষ্যের ভিতর দিয়া বিশিলষ্ট করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও পরাভক্তির যে সমন্বয় গীতার সার কথা, মধুসূদনের ভাষ্যের সাহায্যে তাহার উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। মধুসূদনের এই ভাষ্যকে আশ্রয় করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অদ্ভুত এবং নিগূঢ় প্রেমের মহিমা নিজে আস্বাদন করিয়া তাহার সীমা দেখাইয়াছেন, কিঞ্চিৎ সেই প্রেম অপেক্ষাকৃত অনুভবগম্য হইতে পারে, ভাগবতের কৃষ্ণকে জানিবার এবং বুঝিবার অন্তত পক্ষে একটা ধারা পাওয়া যায়। লীলার মাধুর্যে মনকে মাখাইয়া অভেদতত্ত্বের আস্বাদ পাইবার সুবিধা হয়। নির্বিশেষ তত্ত্বের দুরূহ দার্শনিকতার বিচারের ঊর্দ্ধে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অনুধ্যানে চিত্তকে আপ্যায়িত করিবার পথ মধুসূদন তাঁহার ভাষ্যের ভিতর সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সাংখ্যের সঙ্গে যোগের এবং যোগের সঙ্গে ভক্তির সমন্বয়-সূত্র তিনি ধরাইয়া দিয়াছেন। গীতা শাস্ত্রের প্রত্যেকটি অক্ষর জ্ঞানময়; ইহাতে শব্দ ও অর্থ দুই শক্তি নানা রস ব্যক্ত করে, বিতর্কের স্তরকে অতিক্রম করিয়া প্রত্যক্ষতা ব্যতীত এখানে বাগার্থের প্রতিপত্তি হয় না। মধুসূদন গীতার প্রত্যেকটি বাক্যের বিশ্লেষণ করিয়া সেই প্রত্যক্ জ্ঞানের স্পর্শ দানের সাধনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধাবান পাঠকগণ সে সাধনার রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে সক্ষম হইবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় কর্তৃক মধুসূদন বিরচিত গীতাগূঢ়ার্থ দীপিকার অনুবাদ সে পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। অনুবাদ মূলানুগভাবে এমনই সহজ এবং সরল হইয়াছে যে, অনুবাদকের কৃতিত্বে বিস্মিত হইতে হয়। একটি অবান্তর কথার অবতারণা নাই, উপলব্ধির পক্ষে যেটুকু দরকার অনুবাদক তাৎপর্যটি ঠিক তেমনভাবেই দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের জ্ঞান নাই কিংবা বেদান্তের দার্শনিক পরিভাষায় যাঁহাদের পাণ্ডিত্য নাই, তাঁহারাও ভিতরের জিনিষ স্বচ্ছন্দেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অবশ্য বিষয়ানুপ্রবেশের জন্য কিঞ্চিৎ আগ্রহ থাকা আবশ্যক এবং একথা বলাই বাহুল্য যে তেমন আগ্রহ না থাকিলে গীতার ন্যায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের উপলব্ধি কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতে পারে না।

তারপর সম্পাদকের কথা। সম্পাদক ব্রহ্ম মহাশয়ের 'ভাব প্রকাশে'র ব্যাখ্যার একটি বিশিষ্টতা আমরা দেখিতে পাইলাম। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। পণ্ডিতেরা অনেকে সহজ কথাটা ঘুরাইয়া বলেন; কিন্তু ব্রহ্ম মহাশয় সর্বত্রই অনেক দুরূহ বিষয় প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। দার্শনিক পরিভাষার প্যাঁকে এবং প্যাঁচে পড়িয়া তাঁহার ব্যাখ্যায় পরিশ্রান্ত হইতে হয় না। তাঁহার যাহা বলিবার সহজ কথায় বলিয়াছেন এবং সহজ কথাতেই [illegible] য়া দিয়াছেন। তাঁহার কথা সহজে বুঝা [illegible] যাই পাঠে তৃপ্তি পাওয়া যায়। পাণ্ডিত্যকে হজম করিয়া নিছক এই রস পরিবেশন করার মধ্যে যে কৃতিত্ব আছে তাহা খুবই দুর্লভ। অনুভব ব্যতীত এ জিনিষ সম্ভব হয় না—ব্রহ্ম মহাশয়ের 'ভাব প্রকাশ' তাঁহার ভাব সম্পদের পরিচায়ক, তাঁহার মনস্বিতার সূচক। ১২৮৪ পৃষ্ঠায় এই বিশাল গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে কাগজের এই দুর্মূল্যতার বাজারে দামী সুন্দর কাগজে, সুন্দর এবং নির্ভুলভাবে ছাপা এমন গ্রন্থ দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দ হয়। যেমন পুস্তক সে তুলনায় মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে, একথা বলিতেই হয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার এই সংস্করণটি বাঙলা ভাষার একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবে। সম্পাদক এবং অনুবাদক ইঁহাদিগকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে কিরূপ কঠোর শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, যাঁহারা এমন কাজের কিছু খবর রাখেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহাদের সে শ্রম সার্থক হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ স্বরূপে পরিগণিত হইবে। বঙ্গের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এবং অধ্যাত্ম রসপিপাসু সমাজে এমন সৎগ্রন্থ যে সমাদৃত হইবে এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

এপার ও ওপার—শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক—রসময় রায়, নোয়াখালি।

কবিতার বই। দুর্বল হাতের প্রথম রচনা। অনুভূতিহীন অনুকরণ। 'আমি যে ধ্রুব তারা, সারাটি রজনী রহিব জাগিয়া এক পায়ে হ'য়ে খাড়া', 'দীনের চেয়ে অধম দীন তুমি ক্ষুদ্র ধূলি, বাতাস যখন বয়গো বেগে, নাচ পুচ্ছ তুলি'—প্রভৃতি নমুনা। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে, কবিতাগুলি তাঁহার অপরিপক্ক বয়সের নানা চিন্তা হইতে প্রসূত। এগুলি পুস্তকাকারে না ছাপাইলেই ভাল হইত।

নারী:—শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা মাত্র।

প্রবন্ধের বই। লেখিকা বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িকীতে যে সব বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। একে তো বাঙলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিকের অভাব, তাহাতে নারী প্রাবন্ধিকের কথা একরূপ মনেই আসে না। সেই হিসাবে লেখিকার এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই। তিনি একজন ঔপন্যাসিক হিসাবেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ভাষার অভাব তাঁহার অনুভূতিকে ব্যাহত করিতে পারে না। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, নারী সমস্যার বহুবিধ বিতর্ক ও আলোচনা এবং পুস্তকাদির নিরপেক্ষ বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহার এই উক্তিটিই অনপেক্ষ নহে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, শিশুকাল হইতেই তাঁহার মানসপটে নরনারীর ব্যবস্থার বৈষম্যগুলি আশ্চর্যভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং বুঝিয়া না বুঝিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছেন। তাহার পর পরিণত বয়সে "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা" মন্থন করিয়া নারীর যে আদর্শ রূপটি তাঁহার মনের মধ্যে উন্মেষিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রবন্ধের উপজীব্য। তাঁহার সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পুরুষ সমাজের প্রতি কতখানি উষ্মা, কতখানি ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও নৈরাশ্য মিশিয়া আছে, তাহা তিনি কালি কলমের সূক্ষ্মাগ্র ও অংকণে চিনিতে পারেন না সত্য, কিন্তু অপরের কাছে ধরা পড়ে। "আধুনিক প্রেমের কথা" একখানি চিঠি। তিনি জনৈকা বিবাহিতা বান্ধবীকে তাঁহার বিবাহিত জীবনের ফাঁক ও ফাঁকি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কে নাকি "অযাচিত ভালবাসা দিয়ে অকস্মাৎ অকারণে (?) সরে দাঁড়ালেন। এই পলায়ন তোমাকে মর্মান্তিক পীড়া দিচ্ছে বুঝতে পারি; কিন্তু আমি বলি ভাই, আজকের দিনে পুরুষের পক্ষে এই পলায়ন যে খুব স্বাভাবিক।" ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লেখিকা আরও বলিতেছেন: "আর যত পুরুষের ভালবাসার কথা ও কাহিনী শুনতে পাও, তার শতকরা নব্বই জন আসলে একেবারেই ভালোবাসে না, ভালোবাসা-ভালোবাসা খেলা করে মাত্র। বিশেষভাবে পুরুষের সম্বন্ধেই এ কথা বলছি, কারণ, মেয়েরা যারা খেলায় যোগ দেয়, তাহার বেশীরভাগই বাস্তব মনে ক'রে নামে, খেলা ভেবে নয়।" এরূপ নিরপেক্ষতার নমুনা কেবলমাত্র সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সঞ্চয়েই পাওয়া যায়। ভৌগোলিক সীমা ছাড়াইয়া বিরাট বিশ্ব সম্বন্ধে অতখানি বিচার করিতে গেলে আমাদের ভয় হয়, তাহা নির্বিচার হইবে এবং তাহাই হইয়াছে। তবুও লেখিকার বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও কথনভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। আমরাও পারিবারিক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, এ গ্রন্থখানি সর্বাংশে না হউক অনেকাংশেই আধুনিক নারী সমাজে সমাদৃত হইবে ও চিন্তার বিকাশ ঘটাইবে।

কলিকাতায় উদয়শঙ্কর

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও তদীয় কালচার সেণ্টারের ২৫ জন নৃত্যশিল্পী ও সংগীতজ্ঞ গত ২১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার গ্লোব মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে যে সকল নৃত্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পুরাতন হইলেও নূতনভাবে পরিবেশিত হইয়াছে এবং নূতন কয়েকজন নৃত্যশিল্পীরও দেখা পাওয়া গিয়াছে। 'বিলাস', 'সাদিনা', 'বুদ্ধযাত্রা', 'উষা ও চিত্রলেখা', 'দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা', 'হরপার্বতী নৃত্যদ্বন্দ্ব' প্রভৃতি নৃত্যগুলি পূর্বের মতই দর্শকদের কাছে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে। সিমকী, অমলা, রবীন্দ্র, শান্তি, জোহ্‌রা, উজরা প্রভৃতি নৃত্যশিল্পী এবং তৎসহযোগে সিরালী, ওস্তাদ আলাউদ্দীন, নগেন দে, রবীন্দ্র প্রভৃতি বাদ্যকার উক্ত নাচগুলিতে নিজেদের অসাধারণ নৈপুণ্য যথাযথই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবারকার প্রদর্শনীর সর্বপ্রধান আকর্ষণ হইতেছে 'শ্রম ও যান্ত্রিকতা' নামক নৃত্যনাট্যটি। নৃত্য যে কেবল প্রমোদ উপভোগের জন্যই নয়, লোকশিক্ষায়ও যে ইহাকে কিভাবে নিয়োজিত করা যাইতে পারে—এ নাচটি না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। নাচটির প্রদর্শনকাল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট এবং ইহা শুরু হইতেই মনকে এমনি অভিভূত করিয়া দেয় যে, একটা দীর্ঘ সময় কোথা দিয়া যে চলিয়া যায় বিস্ময়বিমুগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর তাহা খেয়ালই থাকে না। যে বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করিয়া নৃত্যটি রচিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বর্তমান জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ প্রয়াস পাইয়াছে। আধুনিক যুগে যন্ত্রকে বাদ দেওয়া চলে না অথচ সেই যন্ত্রের চাপেই মানুষের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে; সুতরাং যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে এমন একটা রফা হওয়া দরকার যাহাতে উভয়েরই প্রাণধর্ম বজায় থাকিয়া যায়। নৃত্যনাট্যটির আখ্যানবস্তু হইতেছে এই : শান্তিপূর্ণ গ্রামে হঠাৎ একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল মিলের দালাল; গ্রামের সুখী অধিবাসীদের প্রলুব্ধ করিয়া সে তাহাদের মিলের কাজে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইল। দিন যায়; ক্রমে যন্ত্রের তালে তালে চলিয়া শ্রমিকরা নিজেদের মনুষ্যত্ব একেবারেই বিস্মৃত হইয়া এক একটি যন্ত্রেই পরিণত হইল। হঠাৎ একদা তাহাদের চেতনার উদয় হইল এবং বিদ্রোহ করিয়া আবার তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ইহাদের সহিত মিলওয়ালাদের বাধিল সংঘর্ষ এবং পরিশেষে উভয়পক্ষেরই সন্তোষজনক আপোষে মিটমাট হইয়া গেল। এই নৃত্যনাট্যটির সমস্ত পরিকল্পনায় যে কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, উদয়শঙ্কর বা তদীয় সম্প্রদায়ের ইহা অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য কখনও প্রকাশ পায় নাই। আর উদয়শঙ্কর ব্যক্তিগতভাবে ইহাতে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া স্বীকার লাভ করিবে। নৃত্যের যে সত্যই মুখর ভাষা আছে এবং কেবলমাত্র অঙ্গ প্রক্ষেপণের সাহায্যে হইলেও সে ভাষা যে গভীরভাবে প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে এক্ষেত্রে উদয়শঙ্কর তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আর কোন নর্তকের কথা বাদ দিই, এমন কি উদয়শঙ্কর নিজেও নৃত্যকে এতটা মর্মস্পর্শী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানা নাই; রচনা ও বিন্যাসের দিক হইতেও ইহা নিখুঁত। এই নৃত্যনাট্যটিতে সম্প্রদায়ের সমস্ত শিল্পীই যোগদান করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই যেন প্রাণ দিয়া নিজেদের অংশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংগীত ও সাজপোষাকের দিক হইতেও ইহা সমধিক উল্লেখযোগ্য। জাতিকে গড়িয়া তুলিতে নৃত্যকলা যে একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ—'শ্রম ও যান্ত্রিকতা' দেখিবার পর সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না।

"শ্রী"তে "রাজকুমারের নির্বাসন"

পরিচালনা—**সুকুমার দাশগুপ্ত**
কাহিনী—**শ্রীকান্ত সেন**
শ্রেষ্ঠাংশে—**ধীরাজ, চন্দ্রাবতী, অহীন্দ্র, তুলসী** প্রভৃতি

রাজকুমার প্রকাশচন্দ্র অর্থে ও আচরণে অমিতাচারী। রুষ্ট পিতা অবাধ্য সন্তানকে নির্বাসন দেন। বিত্তহীন রাজকুমার ক্ষুব্ধ অহংকারে শহরতলীর একাংশে সামান্য ভাড়াটেরূপে পর্যবসিত হয়। বাড়িওয়ালা আর্টিষ্ট অশোক রায়। আর্টিষ্ট চিত্রাঙ্কনে মোহাচ্ছন্ন। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বড় মেয়ে অনু—অবিবাহিতা। নিরু ছোট বোন—কলেজে পড়িয়া একেবারে পরিপক্ক। একটি ছোট ভাই আছে—নাম অসীম। বাড়িতে আরও ভাড়াটে আছে—স্কুল মাষ্টারণী প্রমীলাবালা, জাতিতে খৃষ্টান; আর বাঙাল স্বর্ণকার কেষ্টগোপাল।

রাজকুমার প্রকাশচন্দ্র লুপ্ত হইয়া নরেন হালদার হইয়াছে। তাহার সংসারানভিজ্ঞতা অনুকে দ্রবীভূত ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে। তাহাই ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়।

প্রকাশচন্দ্রের বা নরেনের জীবনে একে একে বিপর্যয় ঘটিতে থাকে। বেকার অবস্থায় একটা ড্রাইভারীর কাজ জোটে। কিন্তু জোটে একটা মোটর দুর্ঘটনার ফলে। নরেনের রক্তাক্ত দেহ মাষ্টারণীর সংশয় বৃদ্ধি করে, শিল্পী অশোক রায় নরেনকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু অনুর মধ্যস্থতায় সমস্ত সংশয়েরই বাষ্প উড়িয়া যায়—প্রীতি জন্মায়। নরেন ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। তাহার 'রাজকুমার' জীবনে এক প্রণয় ছিল—যে প্রণয় টাকার মোটর ছাড়িয়া মাটীতে নামিতে ভয় পায়। প্রণয়িণী সবিতা নরেনকে ফ্যাক্টরীতে আবিষ্কার করে। ভ্যানিটি ব্যাগ চুরি যাওয়ার অছিলায় বন্দীকৃত নরেন বা প্রকাশচন্দ্রকে সবিতা পুলিশ থানা হইতে মুক্ত করিয়া গুপ্তবাস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় ও অতীতের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। অনুর মনে মেঘ ঘনায়। নিরুর এক প্রেমাস্পদ জোটে। দুর্ভাগ্যবশত নরেন তাহাকে ছোটবেলা হইতে চেনে ও জানে। সেই মধুপ প্রমোদ অনুর মনের মেঘ আরও ঘনীভূত করে : নরেন হালদার নয়, রাজকুমার প্রকাশচন্দ্র! 'মুসাফির' রাজকুমার এ গৃহ পরিত্যাগ করে।

ইহার পর প্রকাশচন্দ্র মাইকা-খনির সহকারী ম্যানেজার হইতে একেবারে ম্যানেজারের পদলাভ করে। সেই উন্নত শিখরে মনে হয় সে অন্তরে ক্ষয়িত হইতেছে। এমনই দিনে মধুপ প্রমোদ ও নিরুর সাক্ষাৎ মিলে। নিরুপায় নিরুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে আবার অনুর দেখা মিলে।

মাইকা-খনির চেয়ারম্যান স্বয়ং প্রকাশচন্দ্রের পিতা। ম্যানেজার প্রকাশচন্দ্র চেয়ারম্যান পিতার সহিত দেখা করিতে গিয়া নিজের অন্তঃ ও দৈহিক পীড়া গোপন করিতে পারে না। পিতা-পুত্রের দৃশ্যমান মিলনকে অনু ও প্রকাশচন্দ্রের মিলনে প্রকৃতিস্থ করে।

গল্পের শেষ। অ্যালজেব্রার একগুচ্ছ ফরমুলার মতো বাঙলা সাহিত্য-কাহিনী যেন ফরমুলা-বাঁধা হইয়া গিয়াছে। এ প্লাস বি হোল-স্কোয়ারের আদিম আদিরস ছাড়াও পার্শ্ববর্তী চরিত্রগুলি কেবল ছাঁচ হইতে টানিয়া বাহির করিতে হয়। বাঙলা সাহিত্যে চরিত্র-দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। সম্পত্তি সম্পর্কে পিতা ও পুত্রের ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতার টাগ্‌-অব-ওয়ার, একমাত্র পুত্র ও

উত্তরাধিকারী, জেদী পিতা, তাহার পর আত্মসম্মানবদ্ধ পুত্রের মুসাফির ও বিপর্যয়কর জীবন, উপসংহারে চোখের জল কাটিয়া মিলনান্ত।

নির্বিকার ও নির্লিপ্ত পিতা—পুত্র কন্যার জন্ম দিয়াই খালাস—নির্বোধ সংসারী, নিজের হবি লইয়া ব্যস্ত। পিতৃভক্ত স্বাধীন প্রকৃতি কন্যা স্বাতন্ত্র্যবোধে সচেতন ভূমিতে ফল্গু প্রেম অবরুদ্ধ করিতে পারে না। দয়িত মেলে। পুষ্টিকালে যোগাযোগ সংস্থাপনে ইচরে পাকা একটি জ্যাঠা ছেলে—কেবল বাচ্চা বলিয়াই যাহার কথা সহ্য হয়, অপ্রত্যাশিত বলিয়া হাসি পায়।

কলেজের মেয়ের ফ্লার্ট ও প্রেমমোহ—মধুপ যাহাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলে।

রসসৃষ্টির জন্য আপত্তিকর বাঙাল ও বাঙাল ভাষা। রসবোধ যদি ইহাকে ডিঙাইতে না পারে তবে বাঙলা সাহিত্য রসবিহীন শুষ্ক সিরিয়াসনেসে পূর্ণ হউক, তবুও এই ভাঁড়ামোর অবসান চাই। তুলসী লাহিড়ী বাঙাল ভাষা বলিতে পারেন অথবা বাঙাল চরিত্র কাহিনীর বৈচিত্র্য পরিবেশ করিবে অথবা ব্যর্থ প্রকাশ-অক্ষম প্রেমকে উপহাস করিতে হইবে; ঠিক কি কারণে এই চরিত্রের অবতারণা বলা শক্ত। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য অনেকগুলি অবান্তর চরিত্র অনর্থক ভীড় করিয়াছে, কাজেই এই ভীড় ঠেলিয়া চিত্র পরিচালনা করিতে গিয়া পরিচালক বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে, যে জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিচালক ও সম্পাদক পরিচ্ছন্ন করিতে পারেন নাই। ঘটনা সমাবেশের মধ্যে একটি ঘটনা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কুশীদ-জীবি মহাজনের গৃহটি—যেখানে প্রকাশচন্দ্র আংটি জমা দিয়াছিল।

একটি ঘটনা আমাদের কাছে নেহাৎ ফোর্স-ফিডিং গোছের বলিয়া পীড়াদায়ক ঠেকিয়াছে—সেটি অনুর পক্ষে অকস্মাৎ এক দীর্ঘ বক্তৃতা—পিতৃপক্ষে ওকালতি ও স্বপক্ষের বেদনা প্রকাশ। প্রেমে লোকে প্রগল্‌ভা হয় শুনিয়াছি, কিন্তু সে কি এমনই বোর্? সবিতা চরিত্রটি দৃশ্যোন্মোচনে যে ধারণা জন্মায় তাহা মোটেই শোভন নয়। মনে হয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশচন্দ্র টেলিফোঁযোগে তাহার.........থাক্। সেই সবিতার চরিত্রে শেষের দিকে একটা উজ্জ্বল রেখাপাতের চেষ্টা হইয়াছে। প্রকাশের এক ইয়ারও শেষটায় মহৎ বলিয়া পরিচিত হয়। নিরু চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও নীতির এখনও যোগসূত্র খুঁজিয়া পাই নাই; অবশ্য এরূপ সম্ভাব্যতা আমরা অস্বীকার করি না; অতি মাত্রায় স্মার্ট হাল্কা প্রণয়াচ্ছন্ন অনভিজ্ঞার এরূপ পরিণতি স্বাভাবিক কিন্তু এই কাহিনীর সহিত ইহার আত্মীয়তা আবিষ্কার করা কঠিন। তেমনি শিল্পী অশোক রায়। চুণের দেয়ালে আঠা দিয়া সাঁটিয়া দিবার মতো—ক্ষণেকের জন্য দেয়ালকেও আড়াল করে, কিন্তু বারবারই খসিয়া পড়ে। মোটর দুর্ঘটনাটাকে একরকম মানাইয়া লওয়া যায় কিন্তু ফ্যাক্টরীর দুর্ঘটনাটা—সহসা গ্রহণ করিতে বাধে। সবিতার ব্যাগ হারানোটা মন্দ হয় নাই কিন্তু বাজীতে (প্রকাশচন্দ্রের) নরেনের পা পুড়াইয়া অনুকে পরিচর্যায় লিপ্ত করা যেন অনেকটা জোর করিয়া পায়রার জোড়-বাঁধান। নরেন ও অনুর রে'দেভ্যুর আকস্মিকতা কেবল কাহিনীর প্রয়োজনেই মানা চলে কিন্তু সেখানে কেষ্টগোপাল, মাষ্টারণী ও নিরুর ভীড়ের রসপ্রবাহ কাহিনীকে তরল করে মাত্র। অসীমের সামান্য প্রয়োজন হয়তো আছে কিন্তু তাহাকে সীমাহীন অবসর দেওয়ার সার্থকতা খুঁজিয়া পাই না। কেষ্টগোপালের জন্য নরেনের ঘট্‌কালি—ঘটনা পরিপুষ্টির জন্য আরম্ভ। স্বভাবগত নহে।

অভিনয়ের দিক হইতে ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় পূর্ববর্তী কোন কোন অভিনয়ের তুলনায় উন্নত হইয়াছে। রাজকুমারের নিদ্রোত্থানটা স্বাভাবিক হয় নাই। ছোটখাট ত্রুটী ছাড়া তিনি পরিচালকের সহিত নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। কিন্তু চরিত্রটি নেহাৎ সুনীতি-সঙ্ঘের ছাপমারা, তাই বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। সে দোষ অভিনেতার নহে।

চন্দ্রাবতীর বয়োধিক্য চরিত্রোচিত হয় নাই; ফলে, ধীরাজের সহিত অসামঞ্জস্যকর ব্যবধান রাখিয়া যে প্রেমাভিনয় তাহা দৃষ্টি-সুখকর হয় নাই। এই বয়সকে ভুলা কঠিন কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিলেই কেবল বলা চলে চন্দ্রাবতীর অভিনয়দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু সাধারণ চরিত্রকে অসাধারণ করিবার যে প্রয়াস পরিচালক বা কাহিনীকারের ছিল তাহা অভিনয়কে সহজ গতি দিতে পারে নাই—অনেকস্থলে আগু বাড়াইয়া যে কাজ করিতে হইয়াছে তাহাতে চরিত্রের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। প্রথমাবধি নরেনের প্রতি তাহার একটা প্রণয়ী চেতনা যেন চরিত্রটিকে ছলনা-অনুসন্ধিৎসু করিয়া তুলিয়াছে। কাহিনীকার বা পরিচালকের অতিরিক্ত কাব্যমন এই যোগাযোগের জন্য সঙ্গীতের আশ্রয় লইয়াছে। ইহাকে কাব্য মনও বলিতে পারি, যাত্রামনও বলিতে পারি। যাত্রায় একটা পাগলের চরিত্র থাকে; সে গান গাহিয়া মনস্তত্বের সিঁড়ি রচিয়া চলে। ঠিক সময়টিতে ঠিক গান—অর্কেষ্ট্রা গান—সিনেমায় অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা গান গুঁজিবার ঠাঁই নাই।

সংগীতে নিরুর অভিনয় বেশ হইয়াছে। পরিচালকের দোষে এই চরিত্রটি অসংযত হইয়াছে। ষ্টোভের আগুনে বিব্রত নবাগত নরেনের প্রতি নিরুর প্রথম পরিচয়ের অভিনয় স্মার্টনেস্‌কেও বিদ্রূপ করিয়াছে।

অশোক রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন "নটসূর্য" অহীন্দ্র চৌধুরী। চরিত্রটি খাপছাড়া ও বিক্ষিপ্ত। অহীন্দ্র চৌধুরীর শত চেষ্টায়ও চরিত্রটি ফুটে নাই। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁহার অভিনয় ব্যর্থ হইয়াছে। কাব্যধর্মী কাহিনীকার এজন্য সর্বাংশে দায়ী। কাব্যের এই উন্মাদনা একটি অসম্পূর্ণ পার্শ্ববর্তী চরিত্রে বিকশিত করার পরিণতি ইহার অতিরিক্ত কিছু হইতে পারে না। কলাকুশলতার দিক হইতে অহীন্দ্রবাবুকে এ ভূমিকা কেন দেওয়া হইল অথবা অহীন্দ্রবাবু কেন ইহা মানিয়া লইলেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

সন্তোষ সিংহের অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব পূর্ববারের মন্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবার কোন কারণ এবারও ঘটে নাই।

প্রমোদরঞ্জনের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য সু-অভিনয় করিয়াছেন। অমল বন্দ্যোর "বিভাস" চলনসই। কিন্তু কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চক্রবর্তী" অনবদ্য; ইহার সহিত আর একটি চরিত্রের মাত্র তুলনা হইতে পারে, সেটি মাষ্টারণীর ভূমিকায় মনোরমা।

পরিচালক হিসাবে সুকুমার দাশগুপ্ত উপেক্ষণীয় তো নহেনই, বাংলার অনেক পরিচালক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার দৃষ্টি আরও সংক্ষিপ্ত ও সংযত করা প্রয়োজন; আবার তাহা যেন এমন সংক্ষেপ না হয় যে সময়ের ফাঁকটুকু পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ—যে জায়গায় অনু পীড়িত প্রকাশের নিকট আসিল সেখানে প্রকাশের ঘোর জ্বর চার্টে চিহ্নিত আছে, তাহার পরেই জ্বর কমিয়া একেবারে নর্মাল ও অনু প্রস্থানোৎসুক, তাহার কথাতেই জানা গেল, সে অনেকদিন সেখানে ছিল। দৃশ্যান্তরটি আকস্মিক। আবার ইহাতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঘটনা সমাবেশ যেন অনাবশ্যক ঘটনার ভীড় না হয়।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট রোহিনণ্টন বারিয়া প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল শোচনীয়ভাবে পাঁচ উইকেটে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরাজয় নৈরাশ্যজনক হইলেও ক্রীড়ামোদিগণকে আশ্চর্যান্বিত করে নাই। রোহিনণ্টন বারিয়া প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল এইরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই বৎসর পূর্বে পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি হইল মাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড়গণকে যতদিন পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষাধীনে না রাখা হইতেছে ততদিন উক্ত দলকে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় দলের নিকট শোচনীয় পরাজয় যে বরণ করিতে হইবে ইহা পূর্বে আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। এই উক্তি যে কতদিন করিতে হইবে তাহা আমরা জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিচালকগণের জ্ঞানসঞ্চারও কতদিনে যে হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। গত কয়েক বৎসর তাঁহাদের কেবল দল নির্বাচন করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে দেখা যায় নাই। কেবল যে ক্রিকেট খেলার সময়ই তাঁহারা এই নিয়ম পালন করেন তাহা নহে, টেনিস, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস সকল বিষয়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম তাঁহারা করেন না। সেই জন্য অনেক সময় মনে হয় যে, এই পরিচালকমন্ডলী বর্তমান থাকিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়গণ কি ক্রিকেট খেলায়, কি টেনিস খেলায়, কি ফুটবল খেলায়, কি এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় কোন বিষয়েই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াক্ষেত্রে সম্মানলাভ করিতে পারিবেন না।

পরিবর্তন সম্ভব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব যদি খেলোয়াড়গণ ও এ্যাথলেটিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইহার জন্য আন্দোলন করেন, বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য দাবী করেন। খেলোয়াড়গণের ও এ্যাথলিটগণের নিরবতাই এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। আমরা আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়গণ ও এ্যাথলিটগণ ইহা শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই বৎসরের ক্রিকেট খেলার বিবরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করেন। খেলার সূচনা ভাল হয় না। আর মজুমদার ও ডি সেনার প্রচেষ্টায় দলের অবস্থা কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু ইহাদের প্রচেষ্টা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রথম ইনিংস ২০৬ রাণে শেষ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি ডি সেনা একা ৬৪ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গরাজ ৭২ রাণে ৫টি ও গুরুদাচার ৭৫ রাণে ৪টি উইকেট পান। পরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দল ব্যাটিং আরম্ভ করে। প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেটে মাত্র ৫৩ রাণ করে। দ্বিতীয় দিনের খেলার সূচনায় কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দলের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কলিকাতা দল বিজয়ী হইতে পারে। কিন্তু সেই আশা চলিয়া যায় যখন রেড্ডী ও দস্তুর একত্রে খেলিয়া অনেক রাণ সংগ্রহ করেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রথম ইনিংস ২৫৬ রাণে শেষ করে ও প্রথম ইনিংসে ৫০ রাণে অগ্রগামী হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় শোচনীয় ফল প্রদর্শন করেন। এন চ্যাটার্জি ডি সেনা দলের অবস্থার পরিবর্তন চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় দিনের শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ উইকেটে ১৩০ রাণ হয়। তৃতীয় দিনে অল্পক্ষণ খেলিয়া কলিকাতা দল ২০০ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। রঙ্গরাজ পুনরায় ৬৮ রাণে ৬টি ও গুরুদাচার ৮৩ রাণে ৩টি উইকেট দখল করেন। ইহার পর কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দল খেলা আরম্ভ করিয়া ৫ উইকেটে প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করে। ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল পাঁচ উইকেটে পরাজিত হয়।

খেলার ফলাফলঃ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ইনিংসঃ—২০৬ রাণ (ডি সেনা ৬৪, আর মজুমদার ২৬, এস দাস ৩০; রঙ্গরাজ ৭২ রাণে ৫টি, গুরুদাচার ৭৫ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

কাশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ইনিংসঃ—২৫৬ রাণ (খাজা ৩৪, ফানসালকার ৪২, রেড্ডী ৫০, এ দস্তুর ৪৯; এইচ সাধু ৬১ রাণে ২টি, এ দত্ত ৪১ রাণে ২টি এস ব্যানার্জি ৪৮ রাণে ৫টি, ডি দাস ৪৩ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় ইনিংসঃ—২০০ রাণ (এন চ্যাটার্জি ৪১, ডি সেনা ৫০, এইচ সাধু ৩২, বি ব্যানার্জি ২৮; রঙ্গরাজ ৬৮ রাণে ৬টি, এস গাঙ্গী ১৮ রাণে ১টি, গুরুদাচার ৮৩ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

কাশী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় ইনিংসঃ— (৫ উইঃ) ১৫৩ রাণ (ডি রাও নট আউট ৪৮, ফানসালকার ৩০ খাজা ২৫; এ দত্ত ৩৪ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল অবশিষ্ট বনাম ইউরোপীয় দলের খেলা শেষ হইয়াছে। ইউরোপীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলার ফলাফলে পরাজিত হইয়াছে। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। ইউরোপীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুত রাণ তুলিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা এই ইনিংসে ২১০ মিনিটে ৩০০ রাণ ও ২৪০ মিনিটে ৩৫০ রাণ করিতে সমর্থ হন। এই ইনিংসে রাইমারের ১২০ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মাত্র ৮৮ মিনিটে নিজস্ব শত রাণ পূর্ণ করেন। ইহার পরেই ব্যারিটের ৫৩, ওয়াল্টার্সের ৫৯ রাণও উল্লেখযোগ্য।

অবশিষ্ট দলের কৃতিত্ব

অবশিষ্ট দল প্রথম ইনিংসে ৪৪৫ রাণ করে। ইহার মধ্যে ভি এস হাজারী একাই ১৮২ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দলের প্রথম খেলোয়াড় গণশেভ ৯৩ রাণ করিয়া দলের রাণ তোলার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। অবশিষ্ট দলের ৪৪৫ রাণ পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ইতিহাসে অবশিষ্ট দলের পক্ষে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিল। ইতিপূর্বে কোন খেলায় অবশিষ্ট দল এত অধিক রাণ করিতে পারে নাই। অবশিষ্ট দল যেরূপ খেলিয়া বিজয়ী হইয়াছে, তাহাতে অনেকেই আশা করেন যে, মুসলীম দল ফাইনালে হয়তো এই দলের নিকট পরাজিত

হইবেন। ইহ যদি সত্য হয় তবে পেণ্টাঙ্গুলার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করা হইবে; অবশিষ্ট দলের সম্মান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

খেলার বিবরণ

অবশিষ্ট দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে। খেলার সূচনা ভাল হয় না। গণশেভ ও হাজারীর মিলন দলের রাণ বৃদ্ধি করে। ইহাদের চেষ্টায় ৭৯ রাণ হয়। ইহার পর পুনরায় পতন আরম্ভ হয়। হাজারী ধীরে ধীরে নিজস্ব শত রাণ পূর্ণ করেন। ৩০০ মিনিটে ৩৫০ রাণ হয়। আরোলকার পরে রাণ তোলায় সাহায্য করেন। প্রথম দিনের শেষে অবশিষ্ট দলের ৮ উইকেটে ৩৮৪ রাণ হয়। হাজারী ১৫২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। ইহাতে অনেকের আশা হয় অবশিষ্ট দলের হাজারী দুই শত রাণ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় দিনে কিন্তু এই আশা পূর্ণ হয় না। হাজারী ১৮২ রাণ করিয়া আউট হন। অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংস ৪৪৫ রাণে শেষ হয়। ইউরোপীয় দলের উইলিয়ামস ৮৮ রাণে ৩টি, হল ৮৩ রাণে ২টি, টর্মলিনসন ৭৪ রাণে ২টি ও পিয়ার্সন ১০১ রাণে ২টি উইকেট পান। ইহার পর ইউরোপীয় দল খেলা আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২০০ রাণ করে। টর্মলিনসন ৭৮ রাণ ও অধিনায়ক টিউ ৭৬ রাণ করেন। তৃতীয় দিনে ৪৫ মিনিট খেলিয়া ইউরোপীয় দল প্রথম ইনিংস ২৩৭ রাণে শেষ করেন। অবশিষ্ট দল প্রথম ইনিংসে ২০৮ রাণে অগ্রগামী থাকায় ইউরোপীয় দলকে 'ফলো অন' করিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে ইউরোপীয় দলকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিতে হয়। ইউরোপীয় দল খেলা আরম্ভ করিয়াই পিটাইয়া খেলিতে আরম্ভ করেন। ব্যারিট এই নিয়মের সূচনা করেন। পরে রাইমার তাঁহার অনুসরণ করেন। ফল ভালই হয়। রাণ দ্রুত উঠিতে থাকে। অবশিষ্ট দলের বোলারগণ ব্যর্থ হন। ইউরোপীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭৪ রাণ করিতে সক্ষম হন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তিনদিনব্যাপী খেলার নিয়মানুসারে অবশিষ্ট দল প্রথম ইনিংসের খেলার ফলাফলে বিজয়ী হন। ফাইনালে অবশিষ্ট দলের সহিত মুসলীম দল খেলিবে।

খেলার ফলাফল:—

অবশিষ্ট দল প্রথম ইনিংস:—৪৪৫ রাণ (গণশেভ ৯৩, এম মিস্ত্রী ২৯, ভি হাজারী ১৮২, রিচার্ডস ৪২, আরোলকার ৪৮, ম্যাক্লোরেনহাস ২৫; উইলিয়ামস ৮৮ রাণে ৩টি, হল ৮৩ রাণে ২টি, টর্মলিনসন ৭৪ রাণে ২টি, পিয়ার্সন ১০১ রাণে ২টি ও এ্যানসন ৪৪ রাণে ১টি উইকেট পান।)

ইউরোপীয় দল প্রথম ইনিংস:—২৩৭ রাণ (টর্মলিনসন ৭৮, ই টিউ ৭৬; রিচার্ডস ৬৪ রাণে ২টি, হ্যারিস ৩০ রাণে ৪টি, হাজারী ৪১ রাণে ৩টি, আলেকজেণ্ডার ৪০ রাণে একটি উইকেট পান।)

ইউরোপীয় দল দ্বিতীয় ইনিংস:—৩৭৪ রাণ (ব্যারিট ৫৩ রাইমার ১২০, টিউ ৪৮, ওয়াল্টার্স ৫৯; হাজারী ৫৮ রাণে ২টি, ম্যাক্লারেনহাস ৮৩ রাণে ৩টি, আলেকজেণ্ডার ৩৯ রাণে ২টি উইকেট পান।)

সিংহল ক্রিকেট দলের খেলা

সিংহল ক্রিকেট দল মাদ্রাজে প্রথম খেলায় তিন উইকেটে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করিয়াছেন। এই দল বিজয়ী হইলেও ব্যাটিং ও বোলিংয়ে খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অনেকে ধারণা করেন যে, এই দল হয়ত ভারতীয় দলের নিকট পরাজয় বরণ করিবে। শীঘ্রই এই দল কলিকাতায় একটি ভারতীয় দলের সহিত খেলিবেন। সেই খেলা দেখিয়া এই দল বিশিষ্ট ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে কিরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিবে, সে সম্বন্ধে অনুমান করা যাইবে। দল হিসাবে এই দলকে খুব শক্তিশালী বলা চলে না। এই দলে বোলার কয়েকজন আছেন যাঁহাদের প্রশংসা করা চলে ও প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ভুক্ত করা যায়। কিন্তু ব্যাটিং বিষয় খুব উচ্চস্থান পাইবার মত খেলোয়াড় এই দলে যে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

প্রথম খেলার বিবরণ

মাদ্রাজ দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং করেন। মাদ্রাজ দলের জনষ্টন প্রথম হইতে খেলায় বিশেষ দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। ইহার পর রামসিং ইহার সহিত যোগ দিলে খেলার অবস্থা পরিবর্তিত হয়। রাণ দ্রুত উঠিতে থাকে। হঠাৎ জনষ্টন ও রামসিং আউট হইলে মাদ্রাজ দলের পতন আরম্ভ হয়। সিংহল দলের জয়সুন্দর কোন রাণ না দিয়া চারিটি উইকেট পতন সম্ভব করেন। মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস ১৮৯ রাণে শেষ হয়। পরে সিংহল দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৭৬ রাণ করে।

দ্বিতীয় দিনে সিংহল দলের খেলা ভাল হয়। কেলার্ট, জি গুণরত্ন, জয়বিক্রম প্রভৃতি খেলোয়াড় অধিক রাণ করিতে সক্ষম হন। সিংহল দলের প্রথম ইনিংস ২৫৫ রাণে শেষ হয়। কৃষ্ণরাও ৬৩ রাণে ৪টি ও ভেঙ্কটসন ৫৮ রাণে ৩টি উইকেট পান। পরে মাদ্রাজ দল খেলিয়া দিনের শেষে ২ উইকেটে ১০০ রাণ করে। তৃতীয় দিনে রামসিং ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ১০৩ রাণ করেন। মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৩ রাণে শেষ হয়। এ গুণরত্ন ৪৫ রাণে ৩টি উইকেট পান।

পরে সিংহল দল খেলিয়া ৭ উইকেটে ১৮৪ রাণ করিতে সক্ষম হয়। এ গুণরত্ন ৪৫ রাণ করেন। মাদ্রাজ দল ৩ উইকেটে পরাজিত হন।

খেলার ফলাফল:—

মাদ্রাজ প্রথম ইনিংস:—১৮৯ রাণ (রামসিং ৬৫, জনষ্টন ৫[illegible] গেলার ৩৭; জয়সুন্দর ৩৩ রাণে ৪টি, কেলার্ট ৪১ রাণে ১টি গুণরত্ন ১৮ রাণে ৫টি উইকেট পান।)

সিংহল প্রথম ইনিংস:—২৫৫ রাণ (মেণ্ডিস ২৫, কেলার্ট ৫[illegible] জি গুণরত্ন ৫৮, জয়বিক্রম ৪২, রবার্টস ২২; কৃষ্ণরাও ৬৩ রাণে ৪টি, ভেঙ্কটসন ৫৮ রাণে ৩টি, রঙ্গচারী ২৮ রাণে ১টি ও রামসিং ৩৬ রাণে ১টি উইকেট পান।)

মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংস:—২৪৩ রাণ (রামসিং ১০৩, এ গোপাল ৩৫, জনষ্টন ২৬, আর নেলার ৩৫; জয়সুন্দর ৪২ রাণে ২টি, এ গুণরত্ন ৪৫ রাণে ৩টি, জয়বিক্রম ১৯ রাণে ১টি, জি গুণরত্ন ১৯ রাণে ১টি, কেলার্ট ৬৪ রাণে ১টি ও পেরিট ৪২ রাণে ১টি উইকেট পান।)

সিংহল দ্বিতীয় ইনিংস:—(৭ উইঃ) ১৮৪ রাণ (এ গুণরত্ন ৪৫, পেরিট ২৫ নট আউট, সোলমন ২৭; জি গুণরত্ন ২ গোপালন ১৭ রাণে ২টি, ব্রাউন ৪২ রাণে ২টি, কৃষ্ণরাও ২৩ রাণে ১টি ও রামসিং ৪৪ রাণে ১টি উইকেট পান।)

(সিংহল তিন উইকেটে বিজয়ী)

জীবজন্তুর ল্যাজের প্রয়োজনীয়তা

আমরা যখন কোন জীবজন্তুর লেজের দিকে তাকাই তখন সেটিকে কেবলমাত্র সংযোজিত আলঙ্কারিক বস্তু বলেই মনে করি, কিন্তু সময়ে সময়ে এই লেজই অধিকারীর কিরূপ প্রয়োজনে আসে, তা বিবেচনা করি না। অবস্থাবিশেষে এই লেজ ভিন্ন ভিন্ন রূপ কাজে লাগে। অনেক সময় দেখা যায়, একটি বিড়াল খুব উচ্চ ও অপ্রশস্ত দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে ক্রমাগত তার লেজটি দোলাচ্ছে। এখানে এই লেজ দোলানোর অর্থ ভার সাম্য রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার কুকুর খুব দ্রুতবেগে দৌড়বার সময় তার গতি ফিরাতে হ'লে লেজটি ব্যবহার করে।

বিভিন্ন জন্তুর লেজ বিভিন্ন প্রকৃতির। কোন জন্তুর লেজ লম্বা, কোন জন্তুর ছোট; কাহারো খুব মোটা আবার কাহারো খুব সরু। কোন কোন লেজ সোজা হয় এবং কোন কোন লেজ কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া গোল এবং চ্যাপ্টা প্রকৃতির লেজও আছে। আর এক প্রকার লেজ আছে, এই লেজের বিশেষত্ব যে, যে কোন বস্তুকে আঁকড়িয়ে ধরতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার বানরেরা এই লেজবিশিষ্ট। কোন বস্তু সংগ্রহের কাজে এই লেজ হস্তের সমকক্ষ। এই সব লেজের উপরিভাগে মোটেই লোম থাকে না, ফলে কোন বস্তু টেনে আনবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। বেশীর ভাগ সময়ে এই সব জন্তু কোন কিছু তুলে নিতে হ'লে লেজটি উপর থেকে তলার দিকে নামিয়ে দিয়ে বস্তুটিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু মেক্সিকোর ট্রি পোর্কপাইনের অনুরূপ লেজের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তারা নীচে থেকে লেজটি উপরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বস্তু সংগ্রহ করে।

অস্ট্রেলিয়ায় এক শ্রেণীর সরীসৃপ পাওয়া যায়, যার লেজটি অবিকল মাথার মত। বহুদিন পর্যন্ত একে 'Two-headed lizard' বা 'দুমুখো গিরগিটি' বলা হত। মাথা এবং লেজের এত বেশী সাদৃশ পৃথিবীর আর কোন জন্তুর নাই। শীতকালে এরা রৌদ্রের উত্তাপ গ্রহণ করতে বড় ভালবাসে এবং এই সময় তারা নির্জীবের মত রৌদ্রে শুয়ে থাকে। এরা লেজগুলিকে চর্বিতে পরিপূর্ণ করে রাখে এবং সময়ে সময়ে যখন অনশন অবলম্বন করে, তখন ঐ চর্বিই তাদের দেহযন্ত্রের খোরাক যোগায়।

যমজ ভাইবোন

যমজ ভাই কিম্বা বোনের মধ্যে এমন সৌসাদৃশ্য থাকে যে, অপর লোক দূরের কথা, মা বাপও সময়ে সময়ে ভুল ক'রে একের অপরাধে নির্দোষীকে সাজা দিয়ে বসেন। অনেক যমজের কেবল চেহারার মিলই থাকে না, রুচিরও যথেষ্ট
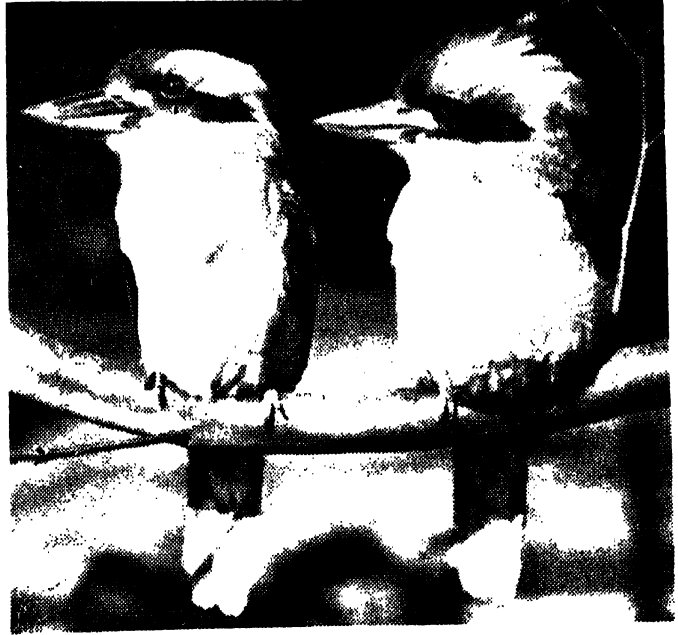
যুগল
অস্ট্রেলিয়ার একজাতীয় পাখী—নাম কোকাবুরাস

দুই যমজ ভাই—চার্ট ও বীল
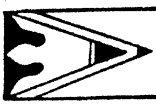
মিল থাকে। আমেরিকার কোন কাগজে এক খবর বের হয়েছিল, সেখানে দুই যমজ ভাইয়ের রুচির মিল এমন ছিল যে, তাদের দুজনকে পৃথক্ ঘরে বসিয়ে রেখে একটা বিষয়ের ছবি আঁকতে বলায় তারা প্রায় একই ধরণের ছবি এ'কে পরীক্ষকদের কাছে নিজেদের চিত্রবিদ্যার পরিচয় দিয়েছিল।

দুই যমজ ভাই চার্ট ও বীলের ছবি তুলে একজনের বাম অংশ এবং অপরের ডানদিকের অংশ জুড়ে দিয়ে দেখান হয়েছে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়

এছাড়া তাদিকে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে পরীক্ষকেরা একই-রূপ ফল পেয়েছিলেন।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ এইচ নিউম্যান যমজদের নিয়ে ব্যাপক গবেষণা আরম্ভ করেছেন। দীর্ঘ প'চিশ বৎসরে তিনি যমজদের সম্বন্ধে যে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তা এক বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমেরিকার প্রতি ৮৬ জন লোকের মধ্যে দুইজন ক'রে যমজ ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সঙ্গে যমজ ভাইয়ের ছবি দেওয়া হ'ল। দুজনের মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য কতখানি আছে, তাও একখানি ছবিতে দেখান হয়েছে।

আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়

আমাদের বহুদিনের পুরাতন বিশ্বাস, আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। সম্প্রতি মনস্তাত্ত্বিকেরা গবেষণা স্বারা এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয় আছে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ এই পুরাতন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যতীত নিম্নলিখিত আরও ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকেরা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

উত্তাপঃ—আমাদের দেহে প্রায় ৩০,০০০টি উত্তাপ-অনুভূতিসম্পন্ন এবং ২৫০,০০০টি শৈত্য অনুভূতিসম্পন্ন

মা ও ছেলে
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি তারোঙ্গা পার্ক জুতে এই সিংহিনী ও সিংহ-শাবকের বাসস্থান

ক্ষুদ্র দাগ (Spots) আছে। হাতের তালুদেশ চিবুকে তলায় রাখলে আমরা ঠাণ্ডা অনুভব করি; কিন্তু কানে উপর রাখলে উত্তাপ পাই। ইহার কারণ আমাদের হাতের ে নিয়মানুগত তাপ বা শৈত্য বিদ্যমান রয়েছে, তা চিবুক এব কানের অবস্থার মধ্যবর্তী।

সাম্য অবস্থাঃ—আমাদের কানের মধ্যে যে অধ বৃত্তাকার কৃত্রিম থালগুলি আছে, তারাই এই ইন্দ্রিয়ে প্রধান যন্ত্র। আমরা যখন হে'টে বেড়াই, তখন আমাদে টলটলায়মান অবস্থা থেকে ঐ যন্ত্রগুলিই রক্ষা করে।

বুভুক্ষাঃ—পাকস্থলীর মাংসপেশীযুক্ত প্রাচীরগুলি সঙ্কোচনে বুভুক্ষার উদ্রেক হয়।

মাংসপেশীঃ—মেজের উপর থেকে কোন জিনিষ তু নেওয়ার ফলে আমাদের মাংসপেশীর সাহায্যে মস্তিষ্কে অনুভূতি সঞ্চারিত হয়, তার স্বারা আমরা জিনিষের ভ বিচার করতে সক্ষম হই। কোন একটা বস্তুর দূরত্ব নিরূ করতে গিয়ে বস্তুর উপর যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তা

চক্ষুগোলকের মাংসপেশীসমূহের সঙ্কোচনে কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ইহার ফলেই বস্তু কতদূর স্থানে অবস্থান করছে, তা আমরা নির্ভুলভাবে বলতে সক্ষম হই। যখনই আমরা উচ্চরবে চীৎকার করতে ইচ্ছা করি, তখনই আমাদের মাংসপেশী-ইন্দ্রিয় বলে দেয়, নিম্নস্বরের কথা বলা অপেক্ষা কতখানি কণ্ঠনালীর মাংসপেশীর সঙ্কোচন প্রয়োজন।

যন্ত্রণাঃ—অন্য সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আমরা যন্ত্রণাই ব্যাপকভাবে অনুভব করি। যে কোন প্রকারের অতিরিক্ত উত্তেজনা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। সময়ে সময়ে যন্ত্রণা ঠিক কোন্ স্থান কেন্দ্র করে আবির্ভাব হয়েছে, তা বলা শক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যন্ত্রণা যতই কষ্টদায়ক হউক না কেন, আমরা সকল সময়ে সেই যন্ত্রণাটাকে অভিসম্পাত বলে মনে করব না। কেননা, এই যন্ত্রণাই শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের অসুস্থতা ও অক্ষমতা পূর্বে থেকেই সঙ্কেত করে।

তৃষ্ণাঃ—এই ইন্দ্রিয়কে যথাসময়ে নিবারণ করতে না পারলে বিশেষ যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আমরা যদি তরল পদার্থ শিরার মধ্যে দিয়েও শরীরে প্রবেশ করাই, তাহলেও তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

সবচেয়ে বড় জুতা

কোন কোন জুতার দোকানে অদ্ভুত আকারের বড় জুতা সাজিয়ে রাখতে দেখা গেছে। দোকানের নামের জন্যে আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে, যে লোকের পায়ে জুতোটি বেশ ফিট্ করবে, তাঁকে বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হবে। বড় জুতো দেখে কেউ কোন দিন চেষ্টাও করে না। খবরটা পেলে, যাদের পায়ের ছাপে লোকে রীতিমত ভয় পেয়েছিল, সেই সব অতিকায় মানব নিশ্চয় ছুটে আসত।

চিকাগোর এক পাদুকা প্রদর্শনীতে একবার একটা মস্ত বড় জুতো অনেকখানি জায়গা জুড়ে লোকের ভীড় জমিয়েছিল। লোকে অবাক্ হয়ে জুতোটা দেখছে, দোকানদারের শত অনুরোধে কেউ আর এগিয়ে গিয়ে তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে কিরকম জুতোটা ফিট্ করছে, তা পরীক্ষা করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অথচ ব্যাপারটা কিরকম হয়, এ দেখবার আগ্রহ সকলের পুরোমাত্রায় আছে। শেষে এক স্থূলকায়া মহিলা এগিয়ে এসে জুতোর মধ্যে শুধু পা নয়, সমস্ত শরীরটা ঢুকিয়ে ফেললেন। এর পরও আছে, মহিলাটি জুতোর দুপাশের ফিতে দুটো ধরে লাগামের কাজে লাগিয়ে দিলেন। চারিপাশের লোকের সে কি হাসি আর হাততালি!

দর্শকদের উৎসাহিত করবার জন্যে পাদুকা কোম্পানির মালিক সেইদিন থেকেই মহিলাটিকে মোটা মাহিনায় চাকুরি দিয়ে দিলেন। তাঁর কাজ হ'ল, মাঝে মাঝে জুতোর মধ্যে শরীরটা ঢুকিয়ে দিয়ে উৎসুক জনতাকে হাসিতে মুখরিত ক'রে তোলা। উপস্থিত মহিলাটিকে আর এ কাজ করতে হয় না। তিনি এখন প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাঁর স্থানে নতুন লোক এসেছে।

দেশ

৮ম বর্ষ] ২০শে পৌষ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল Saturday, 4th January, 1941 [৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বড়দিনের সভাসমিতি—

বড়দিনের ছুটীতে ভারতের সর্বত্র সভাসমিতির মরসুম পড়িয়া যায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, জাতির স্বার্থ এবং কল্যাণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং আলোচনা এই কয়েক দিনে বিশেষভাবে হইয়া থাকে। ইহার কোনটিকেই আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না; কারণ সমগ্র ভারতের স্বার্থের সহিত, আমরা জাতিতে বাঙালী হইলেও আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং বাঙালী কোনদিনই সমগ্র ভারতের স্বার্থ ছাড়িয়া নিজের স্বার্থকে দেখে নাই। বাঙালীর এই যে বিশিষ্ট সংস্কৃতি তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া। টাটা কোম্পানীর কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে জে গান্ধী বাঙালী নহেন; কিন্তু বাঙালী না হইয়াও তিনি যে বাঙলা সাহিত্যের এই গতি-প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছেন এবং বাঙালীদিগকে মাতৃভাষার সেবার উপর জোর দিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সে বাণী এই—

"বাঙলা সাহিত্যের ফল ভারতের অপরাপর প্রদেশের নরনারীর পক্ষে সহজলভ্য করিতে হইবে। ভারতে বহু তীর্থক্ষেত্র আছে। তীর্থযাত্রিগণ যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের স্ব স্ব প্রাদেশিক সত্তা ব্যতীত একটি বৃহত্তর সত্তা আছে, ইহাই হইল এই সব তীর্থক্ষেত্রগুলির প্রধান কার্য। একথা বলিলে ঠিক হইবে না যে, বাঙলা সাহিত্যে কেবলমাত্র বাঙালীর জীবনধারাই প্রকটিত হইয়াছে। ভারতের প্রতিটি প্রদেশের অন্তর হইতে জীবনরসধারা আহরণ করিয়াই বাঙলার জীবন সমৃদ্ধ হইয়াছে। কাজেই বাঙলা সাহিত্যে যাহা কিছু মহান্ ও গৌরবজনক তাহা সমগ্রভাবে ভারতের গৌরব এবং মহত্ত্বের প্রতীক।" বাঙলা সাহিত্যের সেবার ভিতর দিয়া নিখিল ভারতের সংস্কৃতির এই যে রসসূত্র-সংযোগ—ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতার মূলে তাহাই হইবে প্রধান শক্তি এবং আর্থিক ও সামাজিক সকল সমস্যার সমাধানের পথ রহিয়াছে এই সাহিত্য সেবার ভিতর দিয়াই। এইজন্যই বড়দিনের এতগুলি সভাসমিতির মধ্যে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনই আমাদের কাছে স্বভাবত বড় হইয়া উঠে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জামশেদপুরের অধিবেশন এবার জাতির অন্তরে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। এমন সাফল্যপূর্ণ অধিবেশন খুব কমই দেখা গিয়াছে। এজন্য আমরা অভ্যর্থনা সমিতি এবং কর্মকর্তৃগণকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রবীণ ও নবীনে মিলন—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। অন্নদাশঙ্কর বয়সে নবীন, আধুনিক সাহিত্যে তাঁহার ভাবধারা অভিনবত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—'সাহিত্যিকরা প্রধানত সাহিত্যের সৌন্দর্য ও আর্ট লইয়া কারবার করিবেন অথবা জন-মনোভাবের সামাজিক দিকটা লইয়াই বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন? সাহিত্য কিসের জন্য এবং সাহিত্য কাহাদের জন্য? "বিনু"র মুখ দিয়া অন্নদাশঙ্কর নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, "তাকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে এমনভাবে যেন একদিন শিক্ষাবিস্তার হ'লে সব শ্রেণীর লোক সেই সৃষ্টি উপভোগ করতে পারে। এমন এক রস দিয়ে যাবে, যা সমাজ-বিপ্লবের আগে রাষ্ট্রবিপ্লবের আগে ফুরিয়ে যাবে না, ইদানীন্তন দেবতারা খেয়ে শেষ করে দেবেন না, যা তথাকথিত দৈত্যদের জন্য মজুত থাকবে।" অন্নদাশঙ্কর বলেন,—"জমিদারের অত্যাচার, কলওয়ালার স্বেচ্ছাচার, জাগো কিষাণ মজদুর ইত্যাদি লিখে শ্রেণী সাহিত্য পরিবেষন করা কঠিন নয়। কিছু গরম মসলার সঙ্গে মার্কস-বাঁটা মিশিয়ে স্বাদু করতে পারা সহজ; কিন্তু সাহিত্য বলে' যদি গণ্য করা হয়, তবে শ্রেণী সাহিত্য কেন, নিম্ন শ্রেণীর সাহিত্য ব'লে তা গণ্য

হবে।" অন্নদাশঙ্করের কথাটাই আরও একটু খোলসা করিয়া লইয়া আমরা বলিতে পারি, শুধু গরম মসলার সঙ্গে মার্কস-বাঁটা মিশিয়ে স্বাদু করিতে গেলেও সে লেখা যেমন নিম্ন-শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবে, তেমনই বিদেশীর ধার করা যৌনবিলাস দিয়া লেখার জলুস বাড়াইতে গেলেও প্রকৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে সব হইবে জঞ্জাল। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে এই কথাটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, "যেখানে জীবনের অনুভূতি প্রকাশ না পেয়ে লেখকের পাণ্ডিত্য ও অহমিকা আত্মপ্রকাশ করে—যার মধ্যে রয়েছে অনুকরণ-বৃত্তি এবং আলঙ্কারিতার আড়ম্বর তা কখনও জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে না। তাতে সমাজের মধ্যে সাময়িকভাবে চমক জাগাতে পারে; কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষণজীবী। অবশ্য চিরস্থায়ী কিছু নয়; হয়ত সাহিত্যও নয়—তবুও সত্যিকার সাহিত্য পুরুষানুক্রমে বহুকাল গণচিত্তকে প্রভাবিত করে। সত্যিকার সাহিত্যে চাই গণ-জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ।" আমরা বলিব সত্যিকার সাহিত্যের রসসৃষ্টি যে উৎসের স্পর্শ পাইলে হয়, সেখানে আর গণ-জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ চাহিতে হয় না, সে জিনিস আপনা হইতেই আসিয়া যায়; কারণ প্রকৃত সাহিত্য উদ্ভবই হয় অহমিকাকে অতিক্রম করিয়া একান্ত রসোপলব্ধির মধ্যে, সাহিত্যিকের চিত্ত সে ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি লাভ করে। প্রকৃত সাহিত্যের ধর্ম হইল এই। প্রগতি সাহিত্যের স্বভাব। তাহার বিরোধী কেহ নয়, কিন্তু প্রগতি সাহিত্যের নামে ঘৃণ্য পরানুকরণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেই আপত্তি। আপত্তি হইল নিজে-দের লেখা সস্তায় আকর্ষণীয় করিবার মোহে বিদেশী মুখরোচক মসলা ভেজাল দিবার বাতিকে। সাহিত্যকে সত্যই যদি বাস্তব জীবনে শক্তিশালী করিতে হয়, তবে প্রয়োজন একটা জিনিসের—শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "আধুনিক সাহিত্যে প্রগতি" শীর্ষক জামশেদপুরে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধে বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"সর্বাগ্রে চাই প্রকৃত দরদ। যদি এই সমস্ত সাহিত্যিকেরা বাস্তবিকই দরদী হন, তা হ'লে তাঁদের রচনা পড়ে অন্য লোকেরা দুঃখীর দুঃখ মোচনে ব্রতী হবেন। তা হয়ে থাকলে ভাল কথা। ওঁদের রচনা পড়ে গরীব লোকদের জন্যে যদি কারো প্রাণ কাঁদে তা হ'লে তাঁরা ধন্য। আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন যদি ওঁদের সাহিত্যে থাকে, তা হলে ওঁদের সাহিত্য হবে সত্য; কিন্তু প্রবৃত্তিপ্রসূত আর বণিক-বুদ্ধি থেকে প্রসূত হইলে কারো লেখা সত্য হবে না। প্রকৃত করুণাপূর্ণ সহানুভূতি দেখানো হলেও তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা যাতে বড় হতে পারে—সে চেষ্টা না করলে সবই ব্যর্থ।" শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের সব কথাই আমরা সমর্থন করি, কিন্তু চেষ্টা করার যে কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের মতের একটু গরমিল আছে। দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা হউক বা না হউক, সে বিচার সাহিত্যিকের নয়, যদি তেমন চেষ্টা সাহিত্যিকের লেখা বই বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে না হয়, সেজন্য সাহিত্যিক নিশ্চয়ই দায়ী নহেন। 'আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন' পর্যন্তই হইল সাহিত্যিকের কাজ। সাহিত্যিকের আবেদন যদি আন্তরিক এবং হৃদয়স্পর্শী হয়, তবেই তাঁহার সৃষ্টি সার্থক; কিন্তু এ জিনিস কৃত্রিম নয়।

সংহতিই শক্তি

রাজরত্ন শ্রীযুত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় বাঙালীর পক্ষে প্রথম প্রয়োজন কি, তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণের মধ্যে কয়েকটি কথায় পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। বাঙলা দেশের বাহিরে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, কয়েক লক্ষ হইবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হিসাবে ব্রহ্মদেশে তিন লক্ষের অধিক বাঙালী আছে, আসাম ও বিহারে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশেও বাঙালীর সংখ্যা কম নয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এই সব প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে বাঙলা দেশের সম্পর্ক নিবিড় এবং সক্রিয় রাখাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। সে কর্তব্য সম্পাদনের উপায় সম্বন্ধে তিনি সাহিত্যের উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিয়া বলেন যে, বাঙালী জাতির বিশিষ্ট সভ্যতার ধারার সঙ্গে যোগ এই সাহিত্যের পথেই হইতে পারে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের প্রধান দুর্বলতা হইল এই যে, আমরা এক হইতে পারি না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর চেয়ে বাঙালী-দের মধ্যে এই দুর্বলতাটা দেখিতে পাওয়া যায় বেশী। আমরা নিজের মান, প্রতিষ্ঠা এবং যশকেই বড় বলিয়া বুঝি এবং অপরকে বড় হইতে দেখিলে, তাহা সহ্য করিতে পারি না। বাঙালী যে আজ ভারতের রাজনীতিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন হারাইতে বসিয়াছে, তাহা এই কারণে। আমাদের এই দুরবস্থায় ভারতের অন্য লোকেরা তাকিয়া ঠেসান দিয়া মুচকি হাসে। আমরা আশা করি, বাঙালী মাত্রেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কথাগুলি গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করিবেন এবং নিজেদের ভিতরকার এই দুর্বলতাকে দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। বিদেশীর নীতি নিয়ন্ত্রিত প্রাদেশিক [illegible] বাঙালীর সংহতি-শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ইহা আমরা জানি, কিন্তু বাঙালী যদি নিজেদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি না হারায় এবং সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ধারক ও বাহক, তাহার যে মাতৃভাষা তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি প্রখর রাখে, তাহা হইলে এই সংহতি সুদৃঢ় রহিবে সন্দেহ নাই এবং এই আশাই বাঙালীর পক্ষে একমাত্র আশা এবং ইহাই ভবিষ্যতের বড় ভরসা।

পরলোকে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গত ১৪ই পৌষ, রবিবার কলিকাতার বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা কৈশোর

হইতেই লোকসমাজে খ্যাতিলাভ করে। ১৮৮৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার হুগলীতে মাতুলালয়ে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রামগোপাল পণ্ডিত মহাশয়ের আদিবাস ছিল নবদ্বীপে। চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে শিশু নলিনীরঞ্জনকে লইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। শৈশবে সাত বৎসর বয়সে নলিনীরঞ্জনের মাতৃবিয়োগ হয়, মাতার নাম কুসুমকুমারী দেবী। প্রথমে মতি শীলের স্কুলে নলিনীরঞ্জনের পাঠ্য-জীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু ষোল বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গী অবস্থায় পিতৃহারা হন। কপর্দকহীন নলিনীরঞ্জন কলিকাতার রাজপথে একান্ত অসহায়ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তখন হইতে তাঁহার বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রবল অনুরাগ ছিল এবং সভা-সমিতিতে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন একদিন তাঁহার "বৈষ্ণব দর্শনে"র বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া আগ্রহ করিয়া এই তরুণবক্তার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঘোষিত "বাঙলার বাউল সম্প্রদায়" প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই মৌলিক প্রবন্ধ তদানীন্তন 'গৃহস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩১১ সাল হইতে ১৩১৬ পর্যন্ত তিনি 'জাহ্নবী'র সম্পাদক ছিলেন এবং ১৩১৭ সালে ৺ধীরেন্দ্রনাথ পালের সহিত যুগ্ম-সম্পাদকতায় এক বৎসর 'যমুনা'র সম্পাদনা করেন। পরে অল্পদিনের জন্য তিনি একাই 'যমুনা'র সম্পাদক হন। ব্যোমকেশ মুস্তফী ও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের তিরোধানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' যখন বিপন্ন, তখন নলিনীরঞ্জন প্রাণ দিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন এবং সে সেবা তাঁহার কোনদিন শিথিল হয় নাই। নলিনীরঞ্জন বাঙলার দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীর একান্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ও হাওড়ার ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুত ব্রজমোহন দাশের চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের হাওড়া অধিবেশনে "দুঃস্থ সাহিত্য-সেবী ভাণ্ডার" খোলা হয় এবং কবি গোবিন্দদাসের পুত্রকে তাঁহার পৈত্রিক ভিটা উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে চারিশত টাকা দেওয়া হয়। নলিনীবাবু যথার্থ সাহিত্যিক ছিলেন। তেজস্বিতা, সত্যপ্রিয়তা, দয়া ও ক্ষমা এইগুলি ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক "আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর" (লেখা সংগ্রহ)। পরে "কান্তকবি রজনীকান্ত" রচনায় তিনি সে যুগে জীবনী রচনার যে অভিনব পন্থা দেখাইলেন, তাহা সত্যই বাঙলা ভাষায় স্মরণীয় দান। ইহার পর ১৩৩২ সালে তিনি "শরতের ফুল" নামক একটি উপাদেয় গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৩৩৯ সালের ফাল্গুনে রামমোহন লাইব্রেরীতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধু ও গুণগ্রাহিগণ তাঁহার সম্বর্ধনা করেন এবং একটি "নলিনী সাহিত্য" শীর্ষক স্মারক পুস্তক মুদ্রিত হয়।

বাল্যকালে সাহিত্যাচার্য অক্ষয় সরকার হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই নলিনীরঞ্জনকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। "জলধর জয়ন্তী" উপলক্ষে 'জলধর কথা' সম্পাদনে তিনি তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাশকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর ১০ মাস হইয়াছিল। গত ২৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় "শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে" তাঁহার পুত্রকন্যার সম্মুখে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। তাঁহার ৭ পুত্র, ৩ কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ৮টি।

বাঙলা সাহিত্যের সাধনায় একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা বিশেষভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় তাঁহার অক্লান্ত অবদান এই দরিদ্র বাণী-সেবকের স্মৃতিকে জাগরূক রাখিবে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইংরেজী নববর্ষ—

ইংরেজী নূতন বৎসর পড়িল। অতীতের কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই, ভবিষ্যৎ কি, ইহাই ভাবিবার বিষয় এবং সেই ভবিষ্যতের ভাবনার বড় ভাবনা ভারতবাসীদের নিকট হইল অন্নবস্ত্রের ভাবনা, আর্থিক অবস্থার চিন্তা। যুদ্ধের ফলে দেশের আর্থিক দুর্দশা বাড়িয়াছে, যুদ্ধের ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং করভারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে। রেলের মাশুল বাড়িয়াছে, অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স বসিয়াছে, ডাকমাশুলে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু এইখানেই যে শেষ ইহাও বলা যায় না; আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় আকার ধারণ করিবে, এমন সম্ভাবনাই ষোল আনা দেখা যাইতেছে। ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র ভারত হারাইয়াছে, চীন-জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রও ক্রমে বন্ধ হইতেছে। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের কোন আশা আপাততও দেখা যাইতেছে না। সমগ্র দেশ আজ করভারে প্রপীড়িত। এই করভার দিয়া যদি ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট কোন ভরসা থাকিত, তবেও সান্ত্বনার বিষয় কিঞ্চিৎ থাকিত; কিন্তু ভরসা ভারতবাসীর পক্ষে শুধু তত্ত্বগত—অতি সূক্ষ্ম সে বিশ্বপ্রেমের বস্তু, আমাদের বাস্তব জীবনে ধরাছোঁয়ার বাহিরে। যুদ্ধের ফলে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ফাঁদিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে, এমন কথা-শুনিয়াছিলাম, যুদ্ধসম্ভার সম্পর্কিত শিল্পগুলিতে উদ্যম বাড়িবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু এদেশের জাহাজী ব্যবসায়, উড়োজাহাজ নির্মাণ, মোটর প্রভৃতি প্রস্তুত এ-সব যুদ্ধ-শিল্পের মধ্যে নয়—ভারতকে এ-সব বিষয়ে বিদেশীর মুখাপেক্ষীই থাকিতে হইবে। সুতরাং নূতন বৎসর আসিলেও দেশবাসীকে নূতন আলো এবং নূতন ভরসা দিবার মত কিছুই আমরা দেখিতেছি না। অন্ধ কুয়াসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ পরাধীন ভারতবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত দেখা যাইতেছে।

বুদ্ধিমানদের বাক্‌পটুতা—

কথায় আছে বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো—দেশের উদারনীতিক দলের অবস্থাও হইয়াছে তেমনই। কথার বেলায় ইঁহাদের কমতি কিছুই নাই, কিন্তু কর্ম কালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ। বৎসর বৎসর বৈঠক করিয়া ইঁহারা যেমন মূল্যবান বচনসুধা বিতরণ করেন, এবারও কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে তেমনই বাক্-বিকীরণ হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুত চন্দাবারকর অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন, অন্যতম কর্মকর্তা লর্ড সিনহাও ব্রিটিশ রাজনীতিকদিগকে অনেক কড়া কথা শুনাইয়াছেন এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতবাসীদিগকে দেওয়ার ঔচিত্য বুঝাইয়াছেন; কিন্তু কাজের পথ কেহই দেখান নাই, বরং কাজের পথ ধরিয়া চলিতেছে যে কংগ্রেস, তাহারই করিয়াছেন নিন্দা। সভাপতি চন্দাবারকর মহাশয় একটা নূতন কথা শুনাইয়াছেন; এই যুদ্ধের বাজারে সে কথাটা বেশ জমকালো। তিনি বলিয়াছেন, "ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচিত ভারতবর্ষে একদল শান্তিদূত প্রেরণ করা। ইঁহারা আসিয়া ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে যে রকম সন্ধি হইয়াছে, তেমনই সৌহার্দমূলক সন্ধিপত্র প্রণয়ন করিবেন।" সন্ধি কথাটার ব্যঞ্জনা এক্ষেত্রে আমরা আর বুঝাইতে চাহি না তবে এইটুকু শুধু বলিতে চাই যে, যেখানে পক্ষ দুইটি, সন্ধি সেখানেই হয় এবং দুইটি পক্ষকে স্বীকার করার অর্থ উভয় পক্ষের বিশিষ্ট অধিকার এবং স্বাধীনতাকেও স্বীকার করা। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকেই এ পর্যন্ত কার্যত স্বীকার করিয়া লন নাই; পাকে প্রকারে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, তাঁহাদের নিজেদের মত ভারতবাসীদের পক্ষে একমাত্র গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে সন্ধি হইবে কাহার সঙ্গে? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের জনমতকে আগে স্বীকার করিয়া লউন, স্বীকার করুন ভারতের সমানাধিকারকে এবং এতাবৎকাল যে সর্বময় কর্তৃত্বের মতিগতি লইয়া ভারতের বেলায় তাঁহারা চলিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করুন, তবে তো সন্ধির কথা উঠিতে পারে! উদারনীতিকগণ সন্ধির কথা শুনাইয়াছেন, অথচ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যাহাতে ভারতের অধিকারকে স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তেমন কোন কাজ করিবার পথ দেখান নাই। অধিকন্তু সভাপতি চন্দাবারকর যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা অকাজেরই পথ। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস এবং মোস্লেম লীগ ছাড়াও ভারতে রাজনীতিক বোধসম্পন্ন এবং স্বদেশপ্রেমিক এমন বহুসংখ্যক ভারতবাসী আছেন, যাঁহারা ইংলণ্ডে এবং ভারতের মধ্যে মৈত্রীর পথ মসৃণ করিতে সম্মত হইবেন; এই উক্তির নির্গলিতার্থ যে পরোক্ষভাবে ইংরেজের দরবারে নিজেদের মান বাড়াইবারই বেসাতি, ইহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও তাহা বুঝিবেন; কিন্তু সেই সঙ্গে উদারনীতিক সংঘের সভাপতির স্বমুখের এই স্বীকৃতিও অবশ্য তাঁহারা ভুলিবেন না, তাহা এই যে, উদারনীতিক দল ভারতে অস্বাভাবিক রকমে নগণ্য। অতীতে গৌরবের দোহাইতে এই "অণু" কিছুতেই 'বৃহৎ' হইতে পারিবে না। বৃহৎ হইতে হইলে উদারনীতিকদিগকে কথা ছাড়িয়া কাজের পথে নামিতে হইবে। ব্রিটিশ জাতি শক্তেরই ভক্ত, সে শক্তি নিহিত রহিয়াছে জনগণের সমর্থনের মধ্যে। কথার যুগ কাটিয়া গিয়াছে, এখন জনগণের সমর্থন নির্ভর করে কাজের উপর। অতি বুদ্ধিমান উদারনীতিক দল এইটুকু বুঝেন না, ইহাই বিচিত্র।

পাকিস্থানের পরিণতি—

জিন্না সাহেব সেদিনও জোর গলায় শুনাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্থান প্রস্তাব প্রায় পাকিয়া আসিয়াছে। এদিকে জিন্নাই দলের জবরদস্ত পাণ্ডা মৌলবী ফজলুল হক এবং পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান, ইঁহারা দুইজনে পাকিস্থানের প্রতি প্রেমাসক্ত বলিয়া মনে হয় না। স্যার সেকেন্দার তো প্রকাশ্যেই পাকিস্থানকে উড়াইয়া দিয়াছেন; বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি—তিনি কাঁচা কাজ করেন না, নিজের বুঝটি গোছাইয়া রাখিয়া তিনি কাজ করিতে চাহেন, এইজন্য পাকিস্থান প্রস্তাবের খোলাখুলি বিরুদ্ধতা তিনি করেন নাই; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের মিলন প্রস্তাব তিনি ফাঁদিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সহিত একযোগে এই সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হইবার নিমিত্ত তিনি জিন্না সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু জিন্না সাহেব সে অনুরোধের উত্তর পর্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। হক সাহেব পুনায় গিয়া জিন্না সাহেবকে পরে টেলিগ্রাম করেন; কিন্তু সে টেলিগ্রামের জবাবও মিলে নাই। তবু জিন্না, জিন্না; জিন্নাই জলুষ না চড়াইলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভোটের জোর যে মিলে না। সুতরাং হক সাহেব অন্যের কাছে সিংহ, ব্যাঘ্র হইলেও, এবেলা তিনি মেষবৎ নিরীহ, তাঁহার ভাষা জিন্নাই জিগীরই ছাড়িবে।

ভারতীয় সমস্যায় উদ্বেগ—

২৩জন খ্যাতনামা ইংরেজ মহিলা ভারতীয় সমস্যা সমাধানে ভারতবাসীদের সহযোগিতা করিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া এক আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয়া সদস্যা, যেমন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইঁহাদের কারাদণ্ডে ইঁহাদের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে বলিয়াছেন। ইঁহাদের এই আবেদনে কোন কাজ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; তবে ইঁহারা যে ভারতবাসীদিগকে আর এক প্রস্থ অযাচিত উপদেশ দিতে না গিয়া উপদেশটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে দিয়াছেন, ইহাই হইল বিশিষ্টতা। পার্লামেণ্টে ৯ জন সদস্য কিছুদিন পূর্বে যে আবেদন প্রচার করেন, সেই আবেদন হইতে মহিলাদের এই আবেদনে ভারতবাসীদের প্রতি মর্যাদা বুদ্ধি অধিক আছে, ইহাই আশার কথা।

রবীন্দ্র-দৈনিকী

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ রোগের কবলে থাকলেও মনকে সহজে রোগের করস্থ হতে দেন না। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যাঁর করস্থ তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনের ভাবটা কেমন তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত ছন্দে গাঁথা লাইনগুলিতে। ১৭।১২।৪০ তারিখের মধ্যাহ্নে যখন তাঁর নাত্‌নী শ্রীমতী নন্দিতা কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে ছেড়ে অনুপস্থিত ছিলেন সেই ফাঁকে দুর্বল হাতেই হাতের কাছের ডায়রিতে কলম দিয়ে নাত্‌নীকেই উপলক্ষ করে তৈরী হোলো দিন কাটানো খেলা। সে লাইনগুলি এইঃ—

ঘড়ি ধরা নিদ্রা আমার
নিয়ম ঘেরা জাগা
একটু তার সীমার পারেই
আছে তোমার রাগা।
কী কব আর রবি ঠাকুর
ভয়ে তরস্ত
এত বড় মানুষ ছোট্ট
হাতের করস্থ।
দুপুরবেলা ঘরে গেছ
সেই ফাঁকে এই খাতা
টেনে নিয়ে লিখে দিলেম
তোমার নামে যাতা।
একটু যদি বাড়িয়ে থাকি
সেটা তো সম্ভাব্য
কথার সীমা রেখে চলা
নয় সে কবির কাব্য।
কবির কলম মেতে ওঠে
কথার লম্বা চৌড়য়,
একটু সুযোগ পেলে পরেই
চার পা-তুলে দৌড়য়।

এইটে হয়ে যাবার পর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঐ কবিতারই জের শুরু হোলো, হোলো তৈরী আর কিছু লাইন। লিখে ফেল্‌লেন—

চারিদিকে মোর ঠেসে ঠুসে
খাটো করে দিনকে
যেন তোমার মুঠোর মধ্যে
এক করেছ তিনকে।
থেকে থেকে গ্ল্যাক্‌সো খাওয়াও
চামচ দিয়ে মেপে,
একটু নড়াচড়া করলে
যাও তখনি ক্ষেপে।
পড়তে গেলে বই চাপা দাও
বলো এখন থাক না
প্রহরগুলোর চতুর্দিকে
পরিয়ে দিলে ঢাকনা।
হাসপাতালের চেহারাতে
রচলে এই নীড়টা
একেবারে সাফ করেছ
যত লোকের ভিড়টা।

এই সব কাণ্ড হয়ে যাবার পর যখন নাত্‌নী পুনরায় এলেন ঘরে, কবি তাঁর দিকে বেশ সকৌতুকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে চেহারায় অপরাধীর ভাব ধারণের অভিনয় ক'রে বল্‌লেন,—"দিদিমা, অপরাধ করেছি, তুমি ঘরে চলে গেছ জেনে, একটু কলম চালনা করে তোমার সম্বন্ধেই যা-তা লিখে ফেলেছি, রাগ কোরো না।" বলা বাহুল্য— দাদামশায়ের অপরাধের রকম দেখে নাত্‌নী খুসী হয়েছিলেন।

পরিহাস-পর্ব শেষ হতেই শ্রীমতী নন্দিতা কবিকে দিলেন এক গেলাস টমাটোর রস। সে রস পান শেষ করেই ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে তাঁর মুখে মুখে হয়ে গেল তৈরী চার লাইনের ছড়া—

সকল কাঠের সেরা
যেমন শেগুন
সব্‌জীর মাঝে সেরা
বিলাতী বেগুন।

এই ছড়াটি কেটে হেসে বল্‌লেন, "দিদিমা যত্ন ক'রে তৈরী করে দিচ্ছে টমাটোর রস কাজেই টমাটোর গুণকীর্তন করা ভালো।"
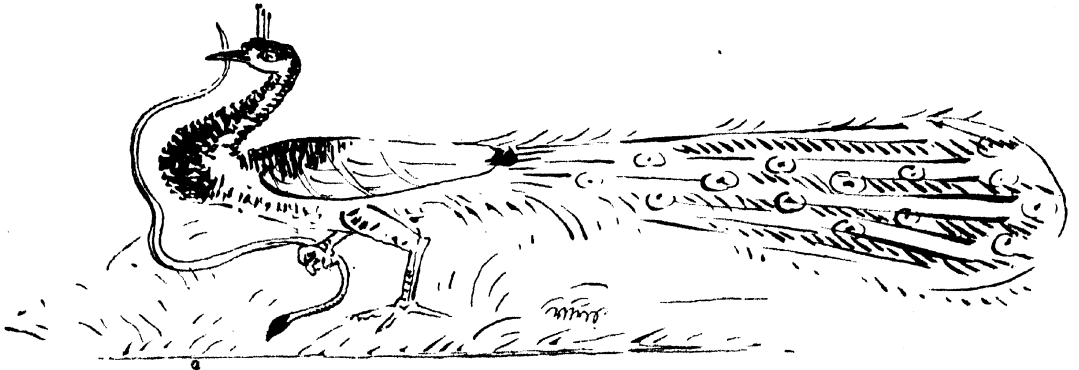
জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন—

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সময় সমবেত নরনারী দণ্ডায়মান থাকিয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

নিমন্ত্রিত মহিলা এবং দর্শকদের এক অংশের দৃশ্য

বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ

আপনাদের এই সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ করে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন, সেজন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আজকার অভিভাষণে "বিজ্ঞান ও মানবতা" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে অবতারণা করব বলে মনে করছি। বিষয়টি নিয়ে মতভেদ আছে ; অথচ বর্ত্তমান যুগে এই বিষয় সুবিচারিত মত ও সেই অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ কার্যপ্রণালী না গ্রহণ করতে পারলে সমগ্র মানব সমাজের দুঃখ অন্ততঃ কিছুকালের জন্য যে আরও ঘনীভূত হবে তাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালে যে কোটি কোটি লোক অনন্ত কষ্ট ভোগ করছে সেই দুঃখের মধ্যে বিশেষ দুঃখ এই যে, এই গভীর অমাবস্যার ভিতর দিয়ে ঊষার অগ্রগামী রক্তিমরেখা এখনও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এইচ্ জি ওয়েলস্ প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিতমহামান্য লোক এ বিষয়ে আলোক সম্পাত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তবে সে আলোক আমার কাছে আলেয়ার প্রবঞ্চক আলোক বলেই প্রতিভাত হয়। তাতে ঊষার লক্ষণ আছে বলে মনে হয় না। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আমি আপনাদের কাছে এ সম্বন্ধে একটি আলোচনা উপস্থাপিত করতে সাহসী হয়েছি।

এটা আপনারা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বর্ত্তমান যুগের বহুবিধ সুখ-সম্পদ, এমন কি আমাদের এই টাটা নগরও, বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের প্রচেষ্টার ফলেই গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় গতি মাত্র গত দু'তিন শতাব্দী হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এর পূর্ব্বের পাঁচ দশ হাজার বৎসর যা হয়নি তার অপেক্ষা বিজ্ঞান বহুগুণ প্রসার লাভ করেছে গত দু' তিন শতাব্দীতে। এর কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপে চিন্তার স্বাধীনতা আরম্ভ হয়েছে দু' তিন শ' বৎসর আগে। ভলটেয়ার, রুসো, দিদরো প্রমুখ মনীষিগণ মানব মনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। তাঁরা শিখিয়েছিলেন য, যা পুরাতন ও শাস্ত্রসম্মত তাকে অবিচারে মেনে নেওয়া মানব সমাজের প্রগতির পরিপন্থী। ভগবান, ধর্ম্ম, সমাজ সকল বিষয়ই বিচার করে যাচাই করে নিতে মানব মনের অধিকার আছে। শুধু তাই নয়, এই অধিকার ব্যবহার না করলে মানব জাতির প্রগতি ও কল্যাণ হওয়া অসম্ভব। চিন্তার স্বাধীনতার যুগের আগে আপনারা অনেকেই জানেন, বহু মনীষী বৈজ্ঞানিক তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতের জন্য নির্য্যাতিত হয়েছেন। গ্যালিলিওকে কারাগারে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তার পরবর্ত্তী কালে ডারউইন "মানুষ এক জাতীয় বানর হ'তে উদ্ভূত" এই বৈজ্ঞানিক মত প্রবর্ত্তনের জন্য বহু খৃষ্টান পুরোহিতের এমন কি বৈজ্ঞানিকের নিকট থেকেও অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন। আমার অবশ্য মনে হয় যে, ইহাতে মানুষের বানররূপিতৃত্বই সম্প্রমানিত হয়।

আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাবে যে, এখনও ইউরোপের মধ্য যুগের তমসা আমাদের জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান আমাদের জাতির উপরে শুধু পদ্মপত্রে জলের মত অবস্থাতেই বর্ত্তমান। চিন্তার শুধু পরাধীনতা নয়, চিন্তার দাসত্ব এখনও আমাদের প্রগতির পথে পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনও অবিচারবদ্ধ কুসংস্কারান্ধ মনোভাবের উপর বহুল অংশে প্রতিষ্ঠিত। এখনও যে নিরীশ্বরবাদী সে অসঙ্কোচে তাঁর মতবাদ কোনও সাধারণ জনসমাগমে প্রকাশ করতে অক্ষম। সত্য ও অহিংসা বিষয়ে যে সুবিচারিত আপেক্ষিকতাবাদ পোষণ করে তার স্থান ভারতের কেন্দ্রীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অস্পৃশ্যের সমান। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এমন কথাও শোনা গিয়েছে যে, ভূমিকম্পের ন্যায় কোনও নৈসর্গিক দুর্ঘটনা কোনও সামাজিক [illegible] জন্য ভগবানের ক্রোধের লক্ষণ। সহজদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে বিচারসম্মত মনোভাবের একান্ত আবশ্যকতা তাঁর প্রাণস্পর্শী অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করে সমগ্র ভারতবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভারতবর্ষ যে বিজ্ঞানে অনেক পিছিয়ে আছে তার একটা প্রধান কারণ এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাব। সাধারণভাবে আমাদের দেশে চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাপক হয় নি বলেই বিজ্ঞানতরু তার শিকড় মেলাবার উপযুক্ত মাটি খুঁজে পাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক মনোভাব যদি ভারতবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত তবে শুধু যে বিজ্ঞানের প্রসার হত তা নয়। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, ধর্ম্মবিদ্বেষ ইত্যাদি যা নিয়ে ভারতবর্ষ যথার্থভাবে জগতসভায় লাঞ্ছিত হচ্ছে, সেগুলিও সূর্য্য সমাগমে অন্ধকারের মত মিলিয়ে যেত। একটুখানি স্বাধীনভাবে চিন্তা করলেই এটা প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্ম্মের অবস্থানের কোনও প্রয়োজনই নেই। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি বর্ত্তমান পৃথিবীতে সব ধর্ম্মের লোপ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং মানবতাই একমাত্র ধর্ম্ম এই কথা প্রচার করে ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীর তথা নেতৃবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারবেন? যদিও বঙ্গের কবিই বলেছিলেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য।"

আমাদের দেশে এবং অন্য দেশেও এক দল প্রতিক্রিয়াশীল লোক আছেন যাঁদের পক্ষে এই যুদ্ধটাও তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল মতের পরিপোষক। তাঁহারা বলেন যে, যদি বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসারের ফলে মানুষ এত ক্ষমতাশালী না হত তা হলে এই ভয়ানক সংহারলীলা চলত না। অতএব এ সব বিজ্ঞান ও শিল্পেরই দোষ। অর্থাৎ আগুনে বাড়ী পুড়ে গেলে সেটা আগুনেরই দোষ, বাড়ীর কর্ত্তা বা গিন্নীর দোষ নয়। এই হাস্যকর মতবাদ নিয়ে তাঁরা বলেন যে, একমাত্র পথ হচ্ছে কৃষি ও গরুর-গাড়ী, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী ইত্যাদি সব বাতিল কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। আর অমনি আশ্চর্য্য যে, বহু ধনশালী সওদাগর এবং মালদার যাঁরা শিল্প থেকেই প্রভূত ধনের উপার্জ্জন করেন—তাঁরাই এই মতবাদী লোকদের অর্থসাহায্য করে থাকেন। এর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, শুধু এই যে বর্ত্তমান পৃথিবী সঙ্কটের সুবিচারিত আলোচনা যেন এই সমস্ত বালোচিত মতভাবের কুজ্ঝটিকা দিয়ে যতদিন সম্ভব সমাবৃত থাকে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির একটা অত্যন্ত বড় কারণ এই যে, মানব সমাজের মনের অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে নি। দোষ বিজ্ঞানের নয়, শিল্পেরও নয়। বিজ্ঞান ও শিল্প মানব সমাজকে বহুযোজন এগিয়ে দিয়েছে মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য এবং চারুকলা প্রভৃত পরিমাণে বর্দ্ধন করেছে। দূরত্ব লঙ্ঘন করেছে। দেশে দেশে মনোভাবের আদানপ্রদান সহজ করেছে। মানবতার মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্দ্ধিত করেছে। আজকার সংহারলীলা শুধু মানবতার নয় বিজ্ঞানেরও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। যতদিন মানব সমাজ স্বপ্রতিষ্ঠ না হবে, যতদিন মানব সমাজ ন্যায় ও সাম্যের দ্বারা পরিচালিত না হবে, ততদিন মানবতা এবং বিজ্ঞান অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীময় যে অর্থনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়েছিল, তার জন্য দায়ী কে? সেই সময়ে যখন পৃথিবীর বহু লোক অন্নাভাবে পীড়িত ছিল তখন ক্যানাডাতে গম পুড়িয়ে রেলগাড়ী চালান হয়েছিল। স্পেনে বস্তা বস্তা কমলালেবু সমুদ্রগর্ভে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাজিলে মণে মণে কফি পুড়িয়ে ও জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই সবই শ্রম ও বিজ্ঞানের ফলে উৎপন্ন হয়েছিল। পৃথিবীর বহু স্থানে এইসব খাদ্যের দারুণ অভাব ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসাদে মানুষকে এই খাদ্য না দিয়ে ইহা নষ্ট করে ফেলাই সম্ভব হয়েছিল। আইন ইহাতে বাধা দেয় নাই। সমাজ কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলা ছাড়া এই অমানুষিক ব্যাপারের কোন প্রতিকার করার চেষ্টা করে নি। বুভুক্ষু নরনারীকে বঞ্চিত করাই যেন এই সামাজিক ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান এই ব্যবস্থার জন্য দায়ী নহে; পরন্তু যে বিজ্ঞানের সাহায্যেই এইসব খাদ্য উৎপন্ন হয়েছিল সেই বিজ্ঞান-দেবতা হয়ত অলক্ষ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিল।

বিজ্ঞানের শক্তি উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে যে, মানব সমাজ ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের ও কৃষ্টির কোনও পরিসীমা থাকবে না। বৈজ্ঞানিকেরা আজকে পরমাণু বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হয়েছেন, তাইতে প্রায় অসীম শক্তি ভবিষ্যতে পাওয়া সম্ভব, যা শিল্প জগতে হয়ত বিরাট বিপ্লব নিয়ে আসবে। এই পরমাণু ধ্বংসে এমন দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে যা মানবের দৈহিক রোগের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যও উপযোগী। কৃষিতে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া অবলম্বন করে বসুমতীকে বর্ত্তমান অবথা থেকে বহুগুণ ফলপ্রসূ করা সম্ভব। কেহ কেহ ভারতবর্ষে বহু লোক সংখ্যা হবে বলে ভীত হচ্ছেন। আমি মনে করি, বিজ্ঞানের এমন ক্ষমতা আছে এবং হবে যে, আবশ্যক হ'লে কাঠকে এমনকি বাতাসকে খাদ্যে রূপান্তরিত করা যাবে। হয়ত একশ বৎসর পরে আমরা বাতাসকে দৈনিক খাদ্য-সামগ্রী বলে গ্রহণ করব। তড়িৎ জগতে রেডিও ও টেলিভিসন এখনও তার অগ্রগতির মাত্র প্রথম সোপানে অবস্থিত। জীবনের প্রহেলিকা নিয়ে বর্ত্তমান জগতে যে গবেষণা চলছে তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কালে বৈজ্ঞানিকরা কৃত্রিমভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু আপাততঃ জীবনের লক্ষণযুক্ত কয়েকটি ভাইরাসকে প্রোটিন আকারে পাওয়া গিয়েছে। বস্তুতঃ মনে হয় যে গতিতে বিজ্ঞান গত একশ বৎসর এগিয়ে গেছে, সেই গতি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে আগামী একশ দু'শ বৎসরে মানুষ হয়ত পৌরাণিক দেবতার শক্তি লাভ করবে। যদি না অর্থ লোভের বশীভূত হয়ে মানুষ নিজেই নিজেকে হত্যা করে।

আজ আপনাদের নিকট আমার এই দুই কথাই বলার আছে। প্রথম, ভারতবর্ষে বিচার-সম্মত বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রচার করা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম হোক্, শাস্ত্র হোক্, সমাজ হোক, রাজনীতি হোক, সবই বিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নিবার রীতি আমাদের মধ্যে প্রচলন করতে হবে। ভারতবর্ষে এই কাজ করতে হলে যথেষ্ট সৎ-সাহসের দরকার। বিচারহীন বিশ্বাস আমাদের দেশের যেন মজ্জায় প্রবেশ করছে। সে ভাইরাস্ দূরে করতে হলে বেশী তাপমাত্রার ষ্টেরিলাইজেসন দরকার। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান এই বর্ত্তমান ধ্বংসের জন্য দায়ী নয়। বিজ্ঞানের পথই অগ্রগতির পথ। কিন্তু বিজ্ঞানের তথা মানবতার মর্য্যাদা যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তাহলে মানব সমাজ ন্যায়ের উপর নিজকে স্বপ্রতিষ্ঠ করুক।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[১০]

বিকেল বেলায় যখন বাঁড়ুজ্যে নিয়মিতভাবে প্রহেলিকাকে পড়াতে এলো তখন সে দেখতে পেলে যে, সে বাড়ির বৈঠকখানায় প্রচুর লোকের সমাবেশ। বাড়ির কর্তা চৌধুরী ম'শায় ও তাঁর দুই দফা পুত্র তো ছিলেনই তা ছাড়া আরও কতকগুলি লোক ছিল যাদের বাঁড়ুজ্যে চেনে না। আর ছিল শ্রীবিলাস!

শ্রীবিলাসকে এতদিন পর দেখে বাঁড়ুজ্যের বিপুল দেহ যেন আরও প্রসারিত হ'য়ে গেল। সে বল্‌লে, "এই যে, শ্রীবিলাস কোথা থেকে?"

শ্রীবিলাস সুধু বল্‌লে, "এই যে বাঁড়ুজ্যে!"—একটু ভারিক্কি চালে—প্রায় মুরুব্বিয়ানার ধাক্কা!

বাঁড়ুজ্যে সুড় সুড় ক'রে পাশের ঘরে পড়াতে যাচ্ছিল। কর্তা বল্‌লেন, "আপনি একটু এখানে বসুন মাষ্টার মশায়।"

বাঁড়ুজ্যে মজলিসের দূর সীমানায় ব'সে পড়লো, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ভাবে।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সস্পৃহ ও অবিলিপ্ত হ'য়ে উঠলো, যখন কথায় বার্তায় সে বর্তমান মজলিসের আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় পেলো।

বিয়ের কথা হচ্ছিল।

—শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিয়ে।

শ্রীবিলাস স্বয়ং বরকর্তাস্বরূপে কথা চালাচ্ছে।

যেমন মামুলী কথা হয় এসব সামাজিক মজলিসে, কথাবার্তাটা ঠিক সে ধাঁচের নয়—হঠাৎ শুনে মনে হয় যেন পাট বেচাকেনার চুক্তি হ'চ্ছে। তার কারণ বোধ হয় এই, যে কর্তা স্বয়ং প্রসিদ্ধ পাটব্যবসায়ী 'আর্সন' কোম্পানীর বড়বাবু, সে কোম্পানীর কয়েকটা গুদামে পর পর পাঁচ বচ্ছর আগুন লাগায় তারা ইনসিওরান্স কোম্পানীর প্রচুর টাকা মেরে হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে। শ্রীবিলাস এই কোম্পানীর জাঁহাবাজপুরে মোকামের সঙ্গে পাটের কারবার করে। কর্তার বড় ছেলে রেচু চৌধুরী সেই জাঁহাবাজপুর মোকামের আফিসার।

শ্রীবিলাস বলছিল, "দশ হাজার টাকা নইলে চলে না। দেখুন, বিয়ে মাত্রই লোকসানি কারবার, তায় আপনাদের মেয়ে নেহাৎ বামুনের গরু হবে না!"

বেচু চৌধুরী বল্‌লে, "এ বিয়েকে বলছেন লোকসানের কারবার? 'আর্সন' কোম্পানীকে এতে আপনি গেঁথে পাচ্ছেন। এই 'গুডউইল'-এর দামই তো লাখ টাকা।"

শ্রীবিলাস বল্‌লে, "কিন্তু ভাই নগদ টাকা হাতে না থাকলে সে গুডউইল ভাঙিয়ে ব্যবসার কি হবে? এবার পাটের বাজার যা হয়েছে তা দেখছো তো। কম সে কম বিশ হাজার টাকা হাতে না নিয়ে তো এবার পাট ছোঁয়াই যাবে না। তার অর্ধেক সুধু আমি চাইছি। তা যদি পাই তবে আমি রাজী। তাতে যদি লাভ হয়, বিবেচনা কর তোমার বোনইতো বড়লোক হবে!"

কর্তা গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, "আচ্ছা মেয়েটাকে দেখ তো, তারপর সে সব কথা হবে।" ব'লে তিনি উঠে গেলেন।

শ্রীবিলাস তখন বল্‌লে, "ওসব হাঙ্গামা কেন মিছে ক'রছো ভাই। মেয়ের আবার দেখবো কি? সব মেয়েই সমান। দুদিন চারদিন কেউ ফরসা থাকে, কেউ কালো কেউ মোটা, কেউ রোগা। তার পর দুবার আঁতুড় ঘরে এলেই সব সমান হ'য়ে যায়। ওর জন্য কোনও চিন্তা নেই, আগে টাকার কথাটা পাকা ক'রে নেও, তার পর বল তো, একবার কেন, লক্ষ বার মেয়ে দেখবো।"

"কিন্তু—"

"এর আর কিন্তু নেই। ভাবছো হয়তো, সুন্দর চটক্‌দার মেয়ে তোমাদের, তাকে দেখিয়ে কাবু ক'রে আমার দর কমিয়ে দেবে। সে হবে না, আমি দেখবোই না যে পর্যন্ত দেনা পাওনার কথা পরিষ্কার না হয়।"

কর্তা ব্যবসাদার হ'লেও এতটা ব্যবসাদারি তাঁর বরদাস্ত হ'ল না বোধ হয়। তাই শ্রীবিলাস এর পরও যখন তার দশ হাজার টাকার কথা নিয়ে পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগলো তখন কর্তা এসে তাকে জানালেন যে, মেয়ে পাটের গাঁইট নয়।

এই সব কথাবার্তা শুনে বাঁড়ুজ্যের সমস্ত শরীর যেন রাগে ফুলছিল। তারপর কর্তা যখন শক্ত কথা ব'লে শ্রীবিলাসকে তাড়িয়ে দিলেন তখন তার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা হচ্ছিল তার নির্গম্যমান পৃষ্ঠের উপর একজোড়া শক্ত ঘুসী ও গণ্ডা চারেক পদাঘাত লাগিয়ে দিতে।

কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ ও নির্জনতার অবসরের জন্য সে সম্ভাষণ আপাতত মুলতুবী রেখে বাঁড়ুজ্যে পাশের ঘরে গিয়ে বসলো তার ছাত্রীর প্রতীক্ষায়।

প্রহেলিকা এলো—কিন্তু বই খাতা নিয়ে নয়।

সে বল্‌লে, "আজ পড়তে পারবো না মাষ্টার ম'শাই।"

বাঁড়ুজ্যে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "কেন আপনি মিছেমিছি ঐ গাড়লটার কথায় এত বিচলিত হচ্ছেন। ওটা একটা পশু—ও কি আপনাকে বিয়ে করবার যোগ্য? ও যে অমনি জানোয়ার হবে তা আমি বরাবরই জানি। আগে নাকি ও বড় ত্যাগধর্মের বুলি কপ্‌চাত, তাই এখন আর পাট আর টাকা ছাড়া কথা মুখে বেরোয় না। খুব হয়েছে—দুঘা' জুতো মেরে ওকে বিদায় করলে ঠিক হ'ত।"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "আপনি ওঁর উপর অত রাগ ক'রছেন

কেন? খাসা লোক, আমার মনে হয়। একেবারে খাঁটি ইকনমিক ম্যান—ইকনমিক্সের আদর্শ!"

"ইকনমিক্সের এমন অপমান করবেন না। যখন এ শাস্ত্র পড়া হবে তখন দেখবেন যে এতে এমন অমানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। শ্রীবিলাস কোনও দিন ইকনমিক্স পড়েনি, এর কোনও ধারই ধারে না সে।"

"আশ্চর্য তো! ইকনমিক্স না পড়েই একেবারে রিকার্ডোর আদর্শ মানুষ হয়েছেন। মোলেয়ারের যে লোকটি না জেনে চিরজীবন গদ্য ব'লে গেছে জেনে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল, তারই মত শ্রীবিলাসবাবু হয়তো একদিন আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে ইকনমিক্স না প'ড়েও তিনি ঠিক ইকনমিক ম্যান হয়েছেন।"

' যাক গে যাক, ও নিয়ে আপনি নিজেকে উদ্বিগ্ন করবেন না। ও হতভাগা আপনার স্বামী হওয়া দূরের কথা এক মুহূর্তের ভাবনার যোগ্য নয়!"

এক মুহূর্ত একটু চমকিত দৃষ্টিতে বাঁড়ুজ্যের মুখের দিকে চেয়ে প্রহেলিকা বল্‌লে, "কিন্তু শুনেছি তিনি আমার মত মেয়ের বর হবার সম্পূর্ণ যোগ্য।"

"দেখুন, নিজেকে অতটা অপমান করবেন না আপনি।"—

"অপমান আমি না করলে আর দশজনে করবে। বিয়ে যদি না হয় আমার তবে"—

আবেগভরে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "আপনার বিয়ে হবে না! ওই শ্রীবিলাস ছাড়া এমন কে হতভাগা আছে যে আপনাকে স্ত্রীরূপে পেলে ধন্য হ'য়ে না যাবে। আপনার মত সুন্দরী—এমন বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কলাবতী, সুরসিকা, সুচরিত্রা—"

এই বক্তৃতায় বাধা দিয়ে চিন্তাযুক্তভাবে প্রহেলিকা বল্‌লে, "কিন্তু—কি জানেন?—মুস্কিল হয়েছে এই যে আপনি বামুন!"

কলেজে পড়বার সময় বাঁড়ুজ্যে এক প্রফেসারের কাছে পড়তো যিনি আঁক ক'ষতে একসঙ্গে পাঁচ ছয় ধাপ ডিঙিয়ে গিয়ে এক একটা ধাপ বোর্ডে লিখে যেতেন। ছেলেরা তাঁর সেই সমাধান বুঝতে হিমসিম খেয়ে যেতো।

প্রহেলিকার এই উত্তরটায় সে তেমনি যুক্তিশ্রেণীর এক রাশ ধাপ ডিঙিয়ে গিয়ে প্রতিপাদ্যের একেবারে সামনাসামনি হ'য়ে পড়ায় বাঁড়ুজ্যে তেমনি প্রথমটায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তার পর সে যখন বুঝতে পারলে কি কথাটা প্রহেলিকা ইঙ্গিত করছে, তখন একদিকে হ'ল তার রোমাঞ্চ, আর এক-দিকে সে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

সে বল্‌লে, "মানে—আপনি বলতে চান, ওর নাম কি, বামুন না হ'লে"—

প্রহেলিকা অম্লানবদনে বল্‌লে, "বিয়ে হ'তে কোনও বাধাই থাকতো না।"

এত আনন্দ কি সহ্য হয়? না বিশ্বাস হ'তে চায়। মেদমাংসের বাহুল্য না থাকলে বাঁড়ুজ্যে হয় তো লাফিয়েই উঠতো। কিছুক্ষণ কেবলি লাল হ'য়ে, শেষে সে বল্‌লে, "সত্যি বলছেন? —অসম্ভব!"

"কেন অসম্ভব কিসে? আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুরসিক, সুচরিত্র।"

"একটু হেসে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, কিন্তু আমার 'ভ্যালু ইন এক্সচেঞ্জ'—"

"আপনিই তো বলেছেন হৃদয়ের টানাটানির ভিতর ডাইনামিক্স বা ইকনমিক্স-এর কোনও সূত্র খাটে না।"

"যাক গে, ওসব আলোচনায় কোনও লাভ নেই।"

"কেন? আপনি কি জাতটাকে একেবারে অত্যাজ্য মনে করেন?"

এবার লাফিয়েই উঠলে বাড়ুজ্যে। আবেগের সহিত বল্‌লে, "মোটেই নয়। আমার এ বামনাই একটা জীর্ণ খোলস বই তো নয়, ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি।"

একটু হেসে প্রহেলিকা বল্‌লে, "তা হ'লে একদিন আমাকে নিয়ে চলুন না ফার্পোয় ডিনার খেতে।"

"বেশ কবে যাবেন বলুন।"

"মামা দার্জিলিং যাবেন দশ পোনেরো দিন বাদে তারপর একদিন! আবার আসছে মাসের পোনেরোই আমার বিয়ে, তার কিছুদিন আগে।"

হঠাৎ স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে প'ড়ে গেল বাঁড়ুজ্যে। হতাশ সুরে সে বল্‌লে, "বিয়ে ঠিক হ'য়েছে তা' হ'লে?"

"হাঁ, পোনেরই তারিখ, কেবল—হাঁ ভাল কথা, আপনার বন্ধুকে একটা খবর দিতে পারবেন?"

"কোন বন্ধুকে? কি খবর?" খুব নিস্পৃহভাবে বল্‌লে, বাঁড়ুজ্যে।

"এই শ্রীবিলাসবাবুকে। তাঁকে বলবেন যে ঠিক তিনি যা' চান তেমনি একটি মেয়ে আছে। দশ হাজার টাকা নগদ তারা দিতে প্রস্তুত—তবে মেয়ে দেখাবেন না তাঁরা কিছুতেই। খুব বড়লোকের মেয়ে, দশ হাজার তো হালফিল পাবেনই, তা' ছাড়া অতবড় একটা বড়লোক শ্বশুর, যখন তখন যা' চাইবেন তাই পাবেন।"

"আচ্ছা, দেবো খবর।"

"তাঁদের ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি, সেখানে গেলেই হবে।" ব'লে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে প্রহেলিকা ঠিকানাটা লিখে দিলে।

সেটা হাতে ক'রে উঠবার সময় বাঁড়ুজ্যের বিপুল ভুঁড়ি আন্দোলিত ক'রে যে দীর্ঘনিঃশ্বাসটা বেরুল তা' সে গোপন ক'রতে পারলে না।

হেসে প্রহেলিকা বল্‌লে, "ওকি! আপনি অতটা হতাশ হচ্ছেন কেন? আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে ব'লে? তার জন্য চিন্তা করবেন না, কার সঙ্গে বিয়ে হবে সেটা এখনো ঠিক হয়নি। —পালাই এখন।" ব'লে সে ছুটে চ'লে গেল।

(ক্রমশ)

চিকাগোর পথে

[ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি]

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

উত্তর ইউনাইটেড স্টেটে ইহুদীদের বসবাস বেশী। ইউনাইটেড স্টেটের সরকার ইহুদীদের ছেলেপিলের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নি, বিশেষ ক'রে প্রাইমারি স্কুল-গুলিতে। সেজন্য ইহুদীরা যাতে ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা হিব্রু ভাষা শিখতে পারে, তার ব্যবস্থা নিজেদের অর্থ ব্যয়েই অনেক স্থানে করেছে। ডিট্রয়এও সে রকম অনেক বিদ্যালয় আছে। একদিন সে রকম একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের হিব্রু ভাষা শিক্ষা দেখলাম। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে মাথা নত ক'রে পুস্তক পাঠ করছে। শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া বললেন "ভাষাটা একটু শক্ত ব'লেই এদের মন দিয়ে পাঠ করতে হয়।" কোনরূপ মন্তব্য না ক'রে খানিকক্ষণ থেকে দেখে ফিরে এলাম। যাঁরা আমাকে ইহুদী প্রাইমারি বিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাও ইহুদী।

বিকালে তাঁদের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড হলে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। হলের মধ্যস্থলে তিনটে লম্বা টেবিল, তার উপর কম পক্ষে পাঁচ শ বই রাখা রয়েছে। চারজন লোক বইএর কাছে বসেছেন। মঞ্চ থেকে বক্তা যখনই কোনও বইএর নাম করছেন, অমনি চারজনের একজন সেই বইখানা স্তূপ হ'তে বার ক'রেই বক্তা যে অংশের উল্লেখ করছেন সেই অংশটা প'ড়ে শোনাচ্ছেন। এভাবে ক্রমে যখন পাঁচজন বক্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা সমাপন হ'ল, সভাপতি মশায় তখন যথাবিহিত মন্তব্যাদি ক'রে সভার কার্য সমাপ্ত করলেন। আমি এ সভাতে কি বলব? অর্থনীতি, সমাজনীতি এসবের কি-ই বা বুঝি? সেইজন্য চুপ ক'রে ছিলাম। তবে সুবিধা ছিল এই যে, কফি আর সিগারেট ইঙ্গিতেই পাওয়া যাচ্ছিল; সময় কাটাতে কষ্ট হয় নি। আমি এ সভার শ্রোতা ছিলাম মাত্র। বক্তৃতার বিষয় জটিল হ'লেও কিছু কিছু বোঝবার শক্তি আমার ছিল। সভার শেষভাগে সভাপতি মশায় ইহুদী মজুরদের সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ কথা বলছিলেন।

আমেরিকানদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে ইহুদী মজুরদের স্বভাব থেকে ধর্মের গোঁড়ামি ক্রমে লোপ হয়ে যাচ্ছে দেখে এক শ্রেণীর ইহুদী তা সহ্য করতে না পেরে মজুরদের উপর কাজকর্ম দেবার দিক থেকে কড়াকড়ি আরম্ভ করেছেন। অনেক সময় তাঁরা 'গলাকাটা' মাংস খায় কি 'গুলিকরা' মাংস খায়, তাই নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন। ইহুদী মজুররা অনেক সময় এসব প্রশ্ন এড়াবার জন্য ইহুদী হয়েও ইহুদীর কাছে কাজের জন্য যেতে রাজী হয় না। কিন্তু উত্তর ইউনাইটেড স্টেটে গোঁড়া এবং ধনী ইহুদীদের সংখ্যা খুব বেশী। এদের কি ক'রে শায়েস্তা করা যেতে পারে, এই সভাতে তারই উপায় নির্ধারণের চেষ্টা চলছিল।

সভার উদ্দেশ্য ও পথ যদিও ইতিপূর্বেই দেশকাল ভেবে স্থির করা হয়েছিল, তবুও সে সম্বন্ধে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করা কয়েকজন ভোটাভুটি ক'রে ঠিক করলেন। শতকরা পঁচাশি ভোট আমাকে প্রশ্ন করার পক্ষে হয়েছিল। যেখানে ভোটাভুটি ক'রে একটা সিদ্ধান্ত করা হ'ল, সেখানে আবোলতাবোল বলা চলে না। কি বলা যেতে পারে? আমি তো প্রমাদ গুনলাম, মাথাটা গুলিয়ে এল। অনেক চিন্তা ক'রে বললাম, "যে ক্ষমতা ধনীদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়, সেই ক্ষমতাকে সৎপথে আনতে হবে, নতুবা গাছের গোড়া কাটার নামে গাছের পাতা কাটা ছাড়া বিশেষ কিছু করা হবে না।" ফের নূতন করে সভা বসল। সভাতে কি হ'ল তা অবান্তর কথা, কিন্তু এ কথা সত্য যে, গোঁড়ামি বা বাড়াবাড়ি ধর্মেই থাক আর যাতেই থাক, একদিন না একদিন বিদ্রোহের সূচনা করবেই।

এবার আমার ডিট্রয় ছেড়ে চিকাগো রওনা হবার সময় এসেছে। শ্রীযুক্ত মোহিত ঘোষ ব'লে এক ভদ্রলোক চিকাগো যাবেন। তাঁরই সঙ্গে চিকাগো যাওয়া ঠিক হ'ল। মোহিত-বাবু আই-সি-এস পরীক্ষায় ফেল ক'রে ইংলাণ্ড থেকে আমেরিকায় চ'লে যান। পূর্বে অনেক ভারতীয় মাসিকে তাঁর প্রবন্ধ বার হ'ত, এখন তিনি দেশের কোনও সংবাদপত্রেই আর কিছু লেখেন না। আমেরিকাতেই ব্যবসা ক'রে বেশ দু পয়সা অর্জন করছেন। শুনেছিলাম তিনি জাস্টিস ঘোষের ছেলে। আমেরিকায় জাস্টিসদের খাতির আছে, কিন্তু তাদের ছেলেদের খাতির নেই—যদি না তারা নিজেরাও জাস্টিস হয়। তাই, মোহিতবাবুর বিশেষ কোনও খাতির দেখলাম না। তিনিও কোনওরূপে আভিজাত্য না দেখিয়ে আমার সঙ্গে সহজভাবেই মিশলেন। তবে প্রথম প্রথম তাঁর মার্কিনী ইংরেজী না বুঝতে পেরে সমূহ বিপদে পড়তে হ'ত। তিনি বলতেন, "you can't do this, আমি শুনতাম you can do this। Can't শব্দের t-কে তিনি উচ্চারণের সময় বাদ দিতেন। আমি না বুঝে বা উলটো বুঝে সংকট ডেকে আনতাম। শেষ পর্যন্ত ইংরেজী ছেড়ে আমি খাস বাঙাল ভাষায় কথা শুরু করতে তিনিও খুশী হলেন, আমিও সংকটের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

শ্রীযুক্ত হরিদাস ব'লে একজন কলেজের প্রফেসরও আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন। ভালই হ'ল। মোহিতবাবু শিক্ষিত হ'লে কি হবে, গায়ের রং তাঁর আমার চেয়েও কালো। তাই দুজনেই একটু ভাবনায় পড়েছিলাম, পথে ক্যাবিনে ঠাঁই পাওয়া যাবে কি না। শ্রীযুক্ত হরিদাস গুজরাটী, শরীরের রং বেশ ফরসা। ফরসার সহযাত্রী হ'লে ক্যাবিনে ঠাঁই পাওয়া কঠিন হবে না জেনে আগ্রহ ক'রেই আমরা তাঁকে সঙ্গে নিলাম।

আমেরিকাতে যারা প্রফেসরি করেন, এখানে তাঁদের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার মনে করি। আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা যে, আমাদের দেশের যাঁরা আমেরিকাতে প্রফেসরি করেন, তাঁরা রোজ কোনও কলেজে যান; রাত্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে আরাম করেন এবং মাসের শেষে মাইনে পকেটস্থ ক'রে

মাসিক খরচপত্রের হিসাবনিকাশ করেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। আমাদের দেশের কেউই তেমন প্রফেসারি করেন না; করতে পারেন না; কারণ তাঁরা সে দেশের নাগরিক অধিকার পান নি।

তবুও তাঁদের প্রফেসর বলা হয় কেন? তাঁরাই বা নিজেদের প্রফেসর ব'লে পরিচয় দেন কেন? কারণটা বলি। আমেরিকায় অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সে সংবাদ আমাদের দেশের অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু সে সব বিশ্ববিদ্যালয় যে সবই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন নয়, এ সংবাদ অনেকেই জানেন না। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মতন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া, সেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ, আশুতোষ কলেজ, রিপন কলেজ প্রভৃতির মত এক-একটা কলেজ আপনাতে আপনি এক-একটা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্ষমতার তারা অধিকারী (আমাদের দেশের আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় তুলনায়), এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিক্ষিত লোকদের মাঝে মাঝে বিশেষ কোনও বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় এবং সেজন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। সাধারণত এই সব লেকচারের ব্যবস্থা শীতের সময়েই হয়ে থাকে। তাতে এক-দিকে সময় কাটানো, অন্যদিকে অর্থ উপার্জন দুই-ই হয়। ক্রমাগত কতকগুলি লেকচার কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতে পারলেই অনারারি প্রফেসর ব'লে পরিচিত হওয়া যায়। শ্রীযুত হরিদাস এইরকমই একজন প্রফেসর। এইরকম প্রফেসররাই আমেরিকাতে তাঁরা প্রফেসারি করেন ব'লে ভারতবর্ষে সংবাদ দেন। বিদেশ সম্বন্ধে, বিশেষত আমেরিকা, এমন অতিরঞ্জিত কত যে সংবাদ ভারতে রটে, তার আর হিসেব নেই। আমেরিকার যে সব আজগবী খবর আমাদের দেশে প্রচারিত হয়, তারও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ বর্তমান।

হরিদাসজী যাবেন কালিফর্নিয়ায়। সেখানে গিয়ে তিনি ভারতবাসী যাতে ক'রে আমেরিকায় নাগরিক অধিকার পায়, তারই চেষ্টা করবেন। যে তিনজন হিন্দু আমেরিকাতে হিন্দুদের জন্য নাগরিক অধিকার অর্জনের চেষ্টা করছেন, হরিদাসজী তাঁদের অন্যতম। হরিদাসজী তাঁর সুটকেস আর ছোট একটি টাইপরাইটিং মেশিন নিয়ে গাড়িতে এসে বসলেন; আমিও আমার মামুলী বোঝাটা এনে রাখলাম। তার পর তিনজনে মিলে গাড়িতে বসতে যাব, এমন সময় এক মারাঠী ভদ্রলোকও এসে আমাদের সঙ্গী হলেন। চার-জনে মিলে যখন পথে এসে দাঁড়ালাম, আমাদের দেশের তিনশত লোক এসে আমাকে বিদায় দিলে।

আমরা ডিট্রয় থেকে পুরো দমে গাড়ি চালিয়ে গভীর রাত্রে একটি ক্যাবিনে এসে দাঁড়ালাম। হরিদাসজী আমাদের জন্য ক্যাবিন ঠিক করতে গিয়ে বিপদে পড়লেন; আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব'লে তাঁকেও ক্যাবিন-ম্যানেজার কালা আদমি সমুঝে বেঁকে বসলেন। নিগ্রোদের থাকবার জন্য ক্যাবিনের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেই। কি আর করা যায়, সারারাত্রি গাড়িতে ব'সেই কাটানো গেল। প্রাতে একটি রেস্তোরাঁয় সামান্য কিছু খেয়ে যখন বেরতে যাব, তখন মোহিতবাবু বললেন—

"কেমন লাগছে?"

"পরিশ্রান্ত নই, তবে আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ মোটেই ভাল লাগছে না।"

"একটু সহ্য করতে হয় এদেশে।"

"আপনি পারেন, আমি পারি না। এইজন্যই এদেশে থাকতে ইচ্ছে নেই, যত সত্বর পারি দেশে যাব। এদেশে আত্মসম্মান পদে পদে আহত হয়।"

"কিন্তু এদেশের সঙ্গে কি আমাদের দেশের তুলনা হয়?"

"নিশ্চয়ই না। আমাদের দেশ এদেশের তুলনায় নরক হ'তে পারে, তা ব'লে বিদেশের উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে আত্ম-সম্মান খোয়ানো যায় না। তার চেয়ে দেশে গিয়ে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা দেখা ভাল।"

"যান দেশে গিয়ে সেই চেষ্টাই করুন" ব'লে মোহিত-বাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন।

আমরা সারা দিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যায় আবার সেই আশ্রয়সমস্যার সম্মুখীন হ'লাম। কোথাও ঠাঁই পেলাম না।

সঙ্গীদের উদ্দেশে বললাম, "এমন সুন্দর দেশ, এমন সুন্দর ক'রে এরা পথঘাট করেছে, কিন্তু এদের মাঝে মনুষ্যত্ব নেই।"

শ্রীযুক্ত ঘোষ প্রতিজ্ঞা করলেন, যে পর্যন্ত চিকাগো না পোঁছবেন, সে পর্যন্ত রাত্রিবাসের জন্য আর কোথাও হোটেল বা ক্যাবিন খুঁজবেন না। তিনটি রাত্রি বাইরে কাটিয়ে চতুর্থ রাত্রে চারটের সময় আমরা চিকাগো পোঁছলাম।

অত রাত্রেও পথে লোক চলাচল কম নয়। অনেকস্থলে আবার ভিড়ও আছে। ভিড় শুনলেই জনতা ও জনরোল আমাদের মনে আসে; এ ভিড় হ'ল জনরোলবিহীন জনতা। ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল নেই, একজনের উপর আর একজন এসে পড়ছে না, লোক আপন মনে আপন আপন কাজ ক'রে চলেছে। আমরা প্রথমেই নিগ্রো শহরে এলাম। একটা পার্কের চারদিকে রেলিংএর উপর কয়েকজন অতিকায় নিগ্রো ব'সে কথা বলছিল। তাদের দেখলেই মনে হয়, যেন এক-একটি যমদূত। শ্রীযুক্ত ঘোষকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কি gang-এর লোক নাকি? তিনি একটু হাসলেন এবং গাড়ির গতি আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন।

আরও কিছু দূর গিয়ে আমরা কতকগুলি আমেরিকানের সামনে প'ড়ে গাড়ি দাঁড় করাতে বাধ্য হ'লাম। তারা পথের উপর দিয়ে গজেন্দ্রগমনে চলছিল। তখনও পোলাণ্ডের পতন হয় নি। তারা এই গভীর রাত্রে পোলাণ্ডের জন্য চাঁদা আদায় করছিল। আমাদের রং কালো, অতএব আমরা তাদের মতে নিঃস্ব। কাজেই আমাদের কাছ থেকে চাঁদা চাইবার কথা তাদের মাথায় এল না, তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিলে।

ভুলুয়া

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দয়াময়ী অনেক অভিজ্ঞতা লাভের পর এই সার বুঝিয়াছিলেন যে, সংসারে সুখ, ভক্তি, ও আপন-পর বলিয়া কোন মূল্যবান দ্রব্য নাই। যতদিন সামর্থ ও টাকাকড়ি আছে, সুখ-শান্তি ততদিনের। অক্ষম ও দরিদ্রদের সকলেই পর, সকলের চোখেই তারা ঘৃণা ও বিরক্তির পাত্র।

এই সকল অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁহাকে কষ্ট করিতে হয় নাই। নিজের পুত্র ও পুত্রবধূগণ সে অভাব তাঁহার পূর্ণ করিয়াছে। পুত্রদের কাছে তিনি এখন বুড়ী, জঞ্জাল; বধূদের কাছে কৃপাপাত্রী। তাই তাঁহার গোপনে রোদন ব্যতীত কোন সান্ত্বনার পথও নাই। দু-একটা নাতী নাতনীও নাই যে, তাহাদের বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দুঃখের জ্বালা কতকটা নিবারণ করিবেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের দুইটি পুত্র হইয়াছিল কিন্তু দুইটিই অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তৃতীয় ভবিষ্যতের গর্ভে। মধ্যম ও কনিষ্ঠের সন্তানাদি হয় নাই, হইবার আশাও সুদূরে পরাহত। তাই, এখন তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ও অবলম্বনস্থল ঐ ময়না পাখী ভুলুয়া।

ভুলুয়া তাঁহার নয়নের মণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিছুদিন পূর্বে স্বীয় সঞ্চিত অর্থে তীর্থ ভ্রমণ সারিয়া ফিরিবার পথে কাশী হইতে তিনি পাখীটি কিনিয়াছিলেন। আদর করিয়া নাম রেখিয়াছিলেন, ভুলুয়া। তাহার ছোট্ট কৃষ্ণবর্ণ দেহ, সুচারু ঠোঁট ও মানুষের মত মিষ্ট কথাবার্তা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে এমন একটি মোহ ও আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ভুলুয়াকে ছাড়িয়া তিনি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না।

ভোর হইতে না হইতেই দয়াময়ী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ভুলুয়ার খাঁচার নিকট ডাকিতেন, ভুলুয়া। ভুলুয়াও ডাক বুঝিত, দুর্বোধ্য জাতীয় ভাষায় সাড়া দিয়া খাঁচার মধ্যে লাফালাফি সুরু করিয়া দিত।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিতেন, সকাল বেলা থেকেই দুস্টুমী আর হুড়োহুড়ি আরম্ভ হ'ল বুঝি? দিন দিন বড্ড ছট্‌ফটে হচ্ছিস্ ভুলুয়া। পড়বার নাম নেই খালি ধিংগীপনা। বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ টানিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া তাহার দিকে চাহিতেন।

ভুলুয়াও যেন দয়াময়ীর ক্রোধ বুঝিতে পারিত, শান্তস্বরে বলিত, হরিবোল, হরিবোল, রাধাকৃষ্ণ......।

দয়াময়ী হাসিয়া ফেলিয়া বলিতেন, কি দুষ্টু বাবা তুই! লোকের রাগ পড়াতে, আর মুগ্ধ করতে তোর জোড়া মেলা ভার।

ভুলুয়া আত্মপ্রশংসায় বিরক্ত হইয়াই যেন চীৎকার করিয়া উঠিত।

দয়াময়ীও বজ্জাত, দুষ্টু ইত্যাদি আদরের ভৎসনা করিতে করিতে অন্যত্র গমন করিতেন।

বস্তুত ভুলুয়াকে কেন্দ্র করিয়াই দয়াময়ীর সুখে-দুঃখে মিশ্রিত দিনগুলি কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার ঠিকানা নাই। ভুলুয়াকে প্রত্যহ সুগন্ধি সাবান দিয়া স্নান করান, সন্দেশ, দুগ্ধ ইত্যাদি মুখরোচক পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে যদিচ তাঁহাকে পুত্র, পুত্রবধূদের নিকট হইতে রীতিমত গঞ্জনা ও তিরস্কার লাভ করিতে হইত, তথাপি তিনি কখনও ভুলুয়াকে অবজ্ঞা ও হেয় জ্ঞান করিতেন না, যত্নের একটুও ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পারিত না। প্রতিবেশিনীদের নিকট বলতেন, ও আমার নাতী। অবলা জীব, মুখে কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু সত্যি বলতে কি ওরও একটা সুখ-দুঃখ আছে তো? ওকে কষ্ট দিলে দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন যে!

একদিনের কথা তাঁহার বেশ মনে আছে। ভুলুয়াকে বাড়িতে রাখিয়া তিনি কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভুলুয়ার দেখাশোনার ভার ছিল বোয়েদের ওপর। তবুও তিনি যাইবার সময় সন্দেশ ইত্যাদি আনাইয়া রাখিয়া বলিয়াছিলেন, আমার ফিরতে বোধ হয় সন্ধ্যে হবে বড়বৌমা। ভুলুকে খাবার-টাবারগুলো ঠিক সময়ে দিও, বলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন।

পাখীটি বধূদের একপ্রকার চক্ষুশূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাখীকে দুগ্ধ, সন্দেশ, আম, লিচু ইত্যাদি খাওয়ান কে কোথায় শুনিয়াছে বাপু। আদর যত্নে তাহারাও উৎপীড়িত ও অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। আজ পাখীটাকে জব্দ করিবার সুযোগ তাহাদের মিলিয়াছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার তাহারা করিবেই করিবে। তিন বোয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, সমস্ত দিন ভুলুয়াকে অনাহারে রাখা হইবে। মাঝে মাঝে খোঁচা দেওয়া, ডানা ধরিয়া টানা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক পীড়নগুলিও বাদ পড়িবে না।

সারাদিন কোন আহার না পাইয়া, অধিকন্তু পীড়ন লাভ করিয়া ভুলুয়া করুণভাবে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। ঝট্‌পট্ করিয়া তাহার অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবলা, অসহায় খাঁচার পাখী, এ ছাড়া কি-ইবা করিতে পারে?

সন্ধ্যার পূর্বে বড়বৌ পাখীটিকে খোঁচা দিয়া ঝট্‌পট্ ও তারস্বরে চীৎকার করাইয়া আনন্দ উইভোগ করিতেছিল, এমন সময় দয়াময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্যাতন দেখিয়া রাগে, দুঃখে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। পিছন হইতে একপ্রকার জোর করিয়া বড়বধূকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ভুলুয়ার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, একটা অবলা নির্দোষ জীবকে নির্যাতন করলে কত কস্ট হয় তা বুঝতে, যদি তোমার ছেলে থাকতো, আর তাকে কেউ বিনা অপরাধে এইরকম পীড়ন করতো বড়বৌমা। রোদনের বেগে তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া আসিল।

বড়বৌ বলিল, নির্দোষ কি রকম? সারাদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাথার শির ফুলিয়ে দিয়েছে হারামজাদা পাখী। খোঁচা দেওয়া তো কিছুই নয়, আমার পাখী হ'লে ওকে আমি জ্যান্ত বলি দিতুম।—মুখপোড়া পাজী জানোয়ার!

দয়াময়ী রাগে ফাটিয়া পড়িলেন, খবরদার বড়বৌ,

ভুলুয়ার সম্বন্ধে ওরকম কথা বললে কখন আমি তা সহ্য করবো না বলে দিচ্ছি।

বড়বৌও ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, কি করবেন কি? মারবেন?

ইহার উত্তরে দয়াময়ীর কি-ইবা বলিবার আছে। মুখ ফিরাইয়া তিনি অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। বড়বৌ ভুলুয়ার ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে অন্যত্র গমন করিল।

ভুলুয়া দয়াময়ীকে দেখিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহার হাতটি ঠোঁটে করিয়া টানিয়া বাটির উপর রাখিয়া করুণভাবে ডাকিয়া উঠিল।

দয়াময়ী বুঝিতে পারিয়া তাহার করুণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাছারে! খেতে দেয়নি বুঝি ওরা! তাই বুঝি বাছার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। কষাই, কষাই ওরা। বলিয়া চোখ মুছিয়া খাবার আনিতে চলিলেন।

মূলত ভুলুয়াকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। কোন কোনদিন ছোলা দিবার সময় ভুলুয়া ছোলা ছড়াইয়া দিত। ঠোঁট দিয়া দয়াময়ীর হাতও সরাইয়া দিত।

দয়াময়ী বলিতেন, আবার কি? বড্ড বেয়াড়া হয়েছিস্ ভুলু। কেন, ছোলা আর রোচেনা বাবুর মুখে? অমনি ছড়ান আরম্ভ করে দিলি?

ভুলুয়া দয়াময়ীর বকুনি উপেক্ষা করিয়া ডাকিয়া উঠিত। দয়াময়ী হাসিয়া ফেলিয়া বলিতেন, তোর আবদারে এবার আমি পাগল হ'য়ে যাব। যখন তখন সন্দেশ পাই কোথায় বলতো? সকাল বেলা থেকেই আব্দার সুরু হ'ল। বলিয়া একটি সন্দেশ আনিয়া দাঁড়ে রাখিতেন। ভুলুয়াও হৃষ্টচিত্তে আহারে প্রবৃত্ত হইত। দয়াময়ী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতেন, নাও, এই শেষ। আজ আর সন্দেশ পাচ্ছনা তা যেন মনে থাকে। ভালমন্দ খেয়ে খেয়ে নবাব হ'য়ে উঠেছ নয়?

ভুলুয়া চক্ষু মুড়িয়া বলিত, নবাব।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিতেন, ইঃ, নবাব। আমি চোখ বুজলে নবাবী বেরবে তোমার। বলিয়া গম্ভীর হইয়া যাইতেন। নবাব কথাটি তিনি ভুলুয়ার মুখে প্রায়ই শুনিতেন, কিন্তু শুনিবার সংগে সংগে কি একরকম বেদনায় তাহার মন ভরিয়া যাইত, তিনি হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুর পর ভুলুয়ার অবস্থা চিন্তা করিয়া বিষন্ন হইয়া যাইতেন।

(২)

বড়বধূ শান্তিময়ী হিসাবি মানুষ। সংযত ও বিবেচনা-পূর্বক অর্থ খরচ করার দিকে বরাবরই তার সুনাম আছে। সে ভুলুয়ার খাদ্য সম্বন্ধে এই অপব্যয় অধিকদিন সহ্য করিল না, স্বামী অমিতকে একদিন নিভৃতে বলিল, যাই বল বাপু, এরকম বড়মানুষী, দেখা তো দূরের কথা, কখন কানেও শুনিনি। তাও নিজের পয়সায় করনা বাপু, কেউ বারণ করবে না, দূরে দাঁড়িয়ে কেবল পাগল বলবে। কেন ছেলের পয়সা কি পয়সা নয়?.........

অমিত বুঝিল বড়বৌ কি একটা সাংসারিক গণ্ডগোল মীমাংসার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু সে এই অপ্রকাশ্য বাক্য সম্বন্ধে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া বলিল, একথা সত্যি শান্তি, যে পরের পয়সায় বড়লোকি করার একটা আনন্দ ও সতঃস্ফূর্ত প্রবল ইচ্ছা সর্বদাই পাক খায় লোকের মনে। এই দেখনা, আমিই—ছেলেবেলায় বাপের পয়সায় কত বড়লোকি করেছি, নাচ, গান, থিয়েটার, যাত্রা, দেশবিদেশে ভ্রমণ, টিন টিন সিগারেট........., আর এখন? সব বন্ধ, উপরন্তু বিড়ি ধরেছি। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

শান্তি হাসিতে যোগ না দিয়া বলিল, ইয়ার্কি নয়, সত্যিই, মা কি আমাদের পয়সা খোলামকুচি পেয়েছেন নাকি? ঐ মুখপোড়া পাখীটার জন্যে ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা সন্দেশ, বাটি বাটি দুধ, লুচি, ফলমূল, এসব কি সোজা কথা নাকি? এগুল বাজে খরচ নয়?

অমীত চুপ করিয়া রহিল।

শান্তি বলিল, চুপ করে থাকলে চলবে না, এগুল বন্ধ করতেই হবে তোমাকে। পাখীতে ছোলাই খায়। কার পাখী আবার সন্দেশ রসগোল্লায় ডুবে থাকে বলত? পয়সার এরকম অপব্যয় কিছুতেই আমি হ'তে দোব না।

অমীতও এই কথাটাই অনেকদিন ভাবিয়াছে; কিন্তু সংসার খরচের টাকা তিন ভাইই চিরদিন মাতার নিকট দিয়া আসিতেছে. মাতা বিবেচনাপূর্বক খরচ করেন। আজ হঠাৎ কি করিয়াই বা খরচের টাকা মার হাতে দেওয়া বন্ধ করা যায়, আর কি করিয়াই বা এই অপব্যয়ের কথাটা উত্থাপন করা যায়। তাছাড়া তিন ভ্রাতাই মাসিক নির্দিষ্ট টাকা দিয়া আসিতেছে, তাহার একার অসম্মতিতেও বিশেষ ফল হইবে না, সকলেরই মত থাকা চাই। অমীত ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু শান্তিকে সে রীতিমত ভয় করিত, তাই মুখে বলিল, একবার সুনীল ও অনিলের সংগে পরামর্শ করে দেখব কি করা যেতে পারে।

শান্তি বলিল, দেখাদেখির আর কি আছে? যে যার টাকা নিজে নিজে খরচ করলেই সব গোল চুকে যাবে।

অর্থাৎ অনেকদিন হইতেই শান্তি নিজের সংসার নিজেই বুঝিয়া পড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কথাটা একটু অমংগল ও স্বার্থপর বলিয়া বলিতে সাহস করে নাই। আজ তাই সুযোগ বুঝিয়া ভুলুয়ার দোহাই দিয়া কাজ গুছাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অমীত বলিল, আচ্ছা, ওদের বলে দেখি, মতামত জিজ্ঞাসা করি।

জিজ্ঞাসা করিবার সংগে সংগে তাহারা এমন করিয়া অনুকূলে সম্মতি দিল যে, মনে হইল তাহারাও বহু পূর্ব হইতেই জল্পনা করিয়া কল্পনা ঠিক রাখিয়াছিল। শুধু এতদিন উত্থাপনের অপেক্ষায় কিছুই হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু কেহই জননীর নিকট প্রথমে কথাটি তুলিতে সাহস করিল না। অগত্যা শান্তিময়ী সকলের মুখপাত্রী হইয়া দয়াময়ীকে বলিল, দেখুন মা, ওরা বলছিল একেই তো সংসারে টানাটানি, ডাঁয়ে আনতে বাঁয়ে কুলয় না, তার ওপর অত করে খরচ করলে.........

দয়াময়ী তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, বুঝে শুনেই তো

খরচ করি বড় বৌমা। ওর চেয়ে আরও টানাটানি করতে গেলে ছাইভস্ম খেতে হয়, চট পরতে হয়, কিন্তু আজ হঠাৎ ওকথা উঠল কেন বলত? তিন ছেলের কোনটিই তো আর কম উপায় করে না, তবুও বেশীর ভাগই তাদের ব্যাংকে যায়, আমাকে দেয় যৎসামান্যই। তাতে কুলন চুলয় যাক, আমার থেকেই বরং কিছু কিছু দিতে হয়। তার ওপর আরও টানাটানি করবার মানে কি বলত? বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিলেন। এই কয়দিন যে তাঁহার পুত্র ও বধূদের মধ্যে কোন গোপন পরামর্শ হইতেছে তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, আজ হঠাৎ শান্তিময়ীর কথা শুনিয়া তাঁহার মন আশংকায় ভরিয়া গেল। তিনি বুঝিতেই পারিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রেরা একান্নবর্তী থাকিবার পক্ষপাতী নয় কিন্তু এই মিলিত সংসারে ভাঙন জননীর পক্ষে কতই যে কষ্টদায়ক তাহা বধূগণ না জানিলেও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, কি চুপ করে রইলে যে? ছেলেদের পয়সায় হঠাৎ কি করে টান পড়লো বড় বৌমা?

শান্তি বলিল, টান না পড়লেই যে বাদশাগিরি ফলাতে হবে তার তো কোন কথা নেই। সকলেরই একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেই বুঝে হিসেবী হওয়া তো দোষের নয়।

দয়াময়ী অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিলেন, মুখে বলিলেন, দোষ তা'ত আমি বলিনি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে বাদশাগিরি করা হচ্ছে আর কিসেই বা হিসেব থাকছে না সেইটেই তো জানতে চাইছি বৌমা।

শান্তি শ্লেষভরে বলিল, সে কি আর আপনি জানেন না নাকি? একটা পাখীকে মর্তের ভোগ খাওয়াতে গেলে কত খরচ হয়, আর সেটা হিসেবি কি না, বাদশাগিরি কি না সেকি আর আপনি জানেন না?

কথাটি এইরূপ রূপান্তরিত হইবে দয়াময়ী ভাবিতেই পারেন নাই। তিনি কতকটা বিস্মিত ও ব্যথিতভাবে বলিলেন, ভুলুয়াকে তোমাদের পয়সায় খাওয়াই মনে কর না কি?

শান্তি বলিল, মনে করিনা মা, বিশ্বাস করি। বলিয়া অবজ্ঞাভরে বাহির হইয়া গেল।

দয়াময়ী চিত্রের মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি পুত্রবধূর নিকট হইতে আজিকার মতন কঠোর মন্তব্য কখনও শুনেন নাই, ভুলুয়াকে লইয়া অনেক কথাই উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও এমন ভীষণ আকার ধারণ করে নাই। ভুলুয়ার ওপর যে কাহারও সুনজর নাই, সকলেই যে তাহার প্রতি বিরূপ তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু সেই বিরূপতা যে কতখানি ভয়াবহ তাহা অনুমান করিলেন শান্তির উলংগ উক্তিতে। দুঃখে, রাগে তিনি মুহ্যমানা হইয়া পড়িলেন। পৃথিবী তাঁহার চোখে ধূম্রময় ও কণ্টকাকীর্ণ মনে হইতে লাগিল। তিনি সেদিন অন্নজল স্পর্শও করিলেন না, সারাদিন চোখের জল ফেলিয়া কাটাইয়া দিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কেন এরকম হয়, কেন লোক দয়া, মায়া, মমতা দেখাইতে এত কার্পণ্য করে, আর কেনই বা স্বার্থের খাতিরে মানুষ পাশব প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করে? কিন্তু কোন প্রশ্নেরই তিনি সমাধান করিতে পারিলেন না। প্রশ্নগুলিই পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল।

(৩)

সেইদিন হইতেই দয়াময়ীর অল্প অল্প জ্বর দেখা দিল এবং দুএকদিনের ভিতর ভীষণ আকার ধারণ করিয়া শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। পুত্র ও পুত্রবধূদের সেবা শুশ্রূষা তিনি যেন আর আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কি যেন একটা বেদনা তাঁহার অন্তরের মধ্যে কুন্ডলী পাকাইতে লাগিল।

সবচেয়ে বেশী করিয়া মনে হইতে লাগিল ভুলুয়ার কথা। এই কয়দিন তিনি ভুলুয়ার খবর লইতে পারেন নাই। ভুলুয়ার যত্ন যে হইতেছে না তাহা তিনি জানিতেন ও কতকটা বুঝিয়াছিলেন তাহার ব্যাকুল চীৎকারে। প্রতিকারও হয়ত তিনি করিতে পারিতেন কিন্তু বড়বৌয়ের সংগে সাংসারিক গন্ডগোলের পর তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভুলুয়ার নাম তাহাদের কাছে তিনি উচ্চারণও করিবেন না। অধিকন্তু এই ভয়ও তাঁহার ছিল যে, ভুলুয়ার আদর, যত্ন ও আহার্যের সুব্যবস্থার কথা তুলিলে হয়ত অপ্রীতিকর কিছু একটা ঘটিতে পারে। তাই তিনি রোগযন্ত্রণার সহিত একরাশ বেদনা লইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দয়াময়ী শেষে আর পারিয়া উঠিলেন না। ভুলুয়ার তিন চারদিন অদর্শন তাঁহার মনের সমস্ত কঠিনতাকে ধূলিসাৎ করিয়া তাহার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শান্তিকে বলিলেন, ভুলুকে একবার আমার কাছে এনে দাওনা বৌমা।

শান্তিময়ী বলিলেন, কি দরকার মা? এখানে আনলে আবার নানান অপকর্ম করে ঘরদোর নোংরা করবে বৈ তো নয়?

শুনিয়া দয়াময়ী কিয়ৎক্ষণ নিজের অন্তরের ব্যথা ও ব্যাকুলতাকে চাপিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু না পারিয়া বলিলেন, কিন্তু তাকে অনেকদিন দেখিনি বৌমা। একবারটি আনো মা। বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শান্তিময়ী এই অহেতুক চোখের জল দেখিয়া বোধ করি অসন্তুষ্টই হইল, কিন্তু শাশুড়ীর রোগশয্যায় তাঁহাকে আর ব্যস্ত না করিয়া বিরক্তিভরে ভুলুয়াকে আনিতে গেল। এই সময়টুকুর মধ্যে দয়াময়ী যে কত কি ভাবিয়া লইলেন তাহার ঠিকানা নাই। ভাবিলেন, হয়ত ভুলুয়া আহারের স্বল্পতাহেতু রোগা হইয়া গিয়াছে, হয়ত দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে আগেকার মতন আনন্দময় আর নাই। তাহাকে দেখিলেও হয়ত সে আর চিনিতে পারিবে না। কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই যখন সে তাঁহাকে দেখিয়া "ঠাকুমা" বলিয়া ডাকিয়া দাঁড়ের উপর লাফালাফি সুরু করিয়া দিল তখন তিনি আর অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না; তাঁহার দুই কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"ঠাকুমা" এই মধুর সম্বোধনটি তিনি অনেক কষ্ট করিয়া ভুলুয়াকে শিখাইয়াছিলেন। তাহার মুখ হইতে ঐ ডাকটি শুনিলে এক অভূতপূর্ব আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত।

আনন্দের আতিশয্যে তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন, তুই আমার নাতী, কি পাপ করে পাখী হয়ে জন্মেছিলি। নাহলে তোর ওপরইবা আমার এত টান পড়বে কেন আর তুইও আমার জন্যে এমন করবি কেন? কিন্তু আজ এই সম্বোধনে তিনি আনন্দের পরিবর্তে দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না। তিনি বুঝিতেই পারিয়াছিলেন যে, এ যাত্রায় তিনি আর রক্ষা পাইবেন না। তাই তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর এই আনন্দময়, নিরপরাধ, শান্ত পাখীটির কি দুর্দশাই না হইবে ভাবিয়া অশ্রু রোধ করিতে পারিলেন না।

শান্তিময়ী পাখীটিকে তাঁহার নিকট বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। ভুলুয়া পুনরায় ডাকিল, ঠাকুমা।

দয়াময়ী অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া তাহার কোমল গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ভুলুয়া শান্তভাবে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দয়াময়ী বলিলেন, এই কয় দিনেই বড্ড রোগা হয়ে গিছিস ভুলু। বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর আমি দেখতে পারি না, কে তোর যত্ন করবে বল, আর কে-ইবা তোর দুঃখ কষ্ট বুঝবে বল?

তাহার কথার মধ্যে যে ব্যথা ছিল তাহা বোধ হয় ভুলুয়াও বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সেও কোন সাড়াশব্দ করিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দয়াময়ী কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, হ্যাঁরে, তোকে ওরা কিছু খেতে দেয় না আর যত্নও করে না নয়?

ভুলুয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

দয়াময়ী উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া বলিলেন, জানতুম! ওদের তো আর ছেলেপুলে হয়নি।

এমন সময় শান্তি ঘরে ঢুকিতেই দয়াময়ী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, ওকে দুটি সন্দেশ আনিয়ে দাও না বৌমা। কতদিন বাছা আমার ভাল মন্দ কিছু খেতে পায়নি। একটা বনের পাখীর ওপর এতখানি বিরূপ হয়ো না। বলিয়া ছলছল নয়নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শান্তি মৌনভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দয়াময়ীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ভুলুয়ার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, শুনলে না! ওদের সকলের চক্ষুশূল তুই। ওরা তোকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবে! বলিয়া চুপ করিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ছোট বৌ ঔষধ খাওয়াইতে আসিলে তিনি ঔষধ খাইলেন না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। ছোট বৌ অনেক সাধ্য সাধনা করিল, বলিল, আপনি তো অবোধ ন'ন মা, ছোট ছেলের মতন রাগ করে ওষুধ খাব না বলে পড়ে থাকলে তো আর অসুখ সারবে না।

দয়াময়ী গম্ভীরভাবে বলিলেন, কেন কষ্ট দিচ্ছ মা, ওষুধ খেলেই কি না খেলেই কি, অসুখ আর আমার সারবে না তুমি যাও, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

ছোট বৌ বলিল, ভুলুকে এখান থেকে নিয়ে যাব মা? বড্ড ঘরদোর নোংরা করছে। বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

ভুলুয়ার কথায় দয়াময়ী সচেতন হইয়া উঠিলেন, গভীর মিনতিভরে ছোট বৌ-এর একখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, একটা মিনতি তোমার কাছে ছোট বৌমা, ভুলুকে আমার একটু যত্ন কর। না, না, আমি জানি এমন কঠিন নও তুমি যে একটা বনের অবলা পাখীর ওপরও তোমার একটুও মায়া মমতা থাকবে না! লক্ষ্মীমা আমার, আর এই নাও বলিয়া তাঁহার আঁচল হইতে একগোছা চাবি তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, আমার বাক্স তোরংগের চাবি। তোমাকেই আমি সব দিয়ে যাব বৌমা। বলিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিলেন, ওর ভেতর আমার সোনার তাগা আর হার আছে, আর বাক্সের মধ্যে বোধ হয় শ' পাঁচেক টাকা আছে, সবই আমি তোমায় দোব ছোটবৌ, তুমি কেবল ক'দিন ভুলুয়াকে একটু যত্ন কর। বাছা আমার কত কষ্টই না পাচ্ছে। শুধু এই ক'দিন ছোট বৌমা! তারপর আমার মৃত্যুর দিন আমি ওকে উড়িয়ে দোব। বনের পাখী বনে চলে যাবে। বলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোট বৌ চাবির গোছা তুলিয়া লইয়া হৃষ্টচিত্তে বাহির হইয়া গেল। তাহার গমন পথেরদিকে দয়াময়ী অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

* * * *

পরদিন বেলা আটটার সময় দয়াময়ী মারা গেলেন। বলা বাহুল্য মৃত্যু সময়ে তিনি তাঁহার নয়নের মণি ভুলুয়াকে মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় সে তীরবেগে উড়িয়া যাইবে; কিন্তু ভুলুয়া উড়িল না, দয়াময়ীর বুকের উপর বসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল, ঠাকুরমা!

দয়াময়ীর তখন শেষ অবস্থা, তবুও তিনি একবার জোর করিয়া চোখ খুলিলেন, হাত তুলিয়া ভুলুয়াকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, শিথিল হস্ত এলাইয়া পড়িল, ভুলুয়ার দিকে স্থানদৃষ্টিতে চাহিয়াই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

অমিত ভুলুয়াকে ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া আসিল। ভুলুয়াও উড়িয়া ছাদে বসিল। তাহারা যখন দয়াময়ীকে লইয়া শ্মশানের দিকে যাত্রা করিল তখন ভুলুয়া ছাদ হইতে ডাকিল, ঠাকুমা। কেহ সাড়া দিল না। শান্তি উপরদিকে চাহিয়া বলিল, পাখীটি তোয়াজে থেকে বোধ হয় উড়তে ভুলে গেছে।

পরদিন ছোটবৌ শান্তিকে আসিয়া বলিল, বড়দি, ভুলুয়া আজও ছাদে বসে রয়েছে। ধরে আনবো?

শান্তি বলিল, দরকার কি ছোট বৌ। মা'র পাখী, মা পুষেছিলেন, তিনিই ছেড়ে দিয়ে গেছেন। তাছাড়া আনলে আবার খেতে দিতে হ'বে তো?

ছোট বৌ বলিল, কিন্তু পাখীটা বড্ড রোগা হয়ে গেছে।

শান্তি হাসিয়া বলিল, ও কিছু নয়। তোয়াজি পাখী, সন্দেশ, দুধ পাচ্ছে না তাই। বলিয়া চলিয়া গেল।

(শেষাংশ ৩১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১৫]

পুরা মাস কাজ করে নাই বলিয়া অমল সে মাসে মাহিনা পাইল মাত্র নয় টাকা সাত আনা। ইহার মধ্য হইতেই লাইব্রেরিয়ানকে পাঁচ টাকা দিবার কথা, কিন্তু সে সাহসে ভর করিয়া তিনটি টাকা তাঁহার সামনে রাখিয়া কহিল, এই তিনটে টাকাই নিন্ মনমোহনদা, বড্ড টানাটানি এর বেশী দিলে আর খেতে পাব না।

কিন্তু মনমোহনবাবু কি কারণে সেদিন বেশ খোস মেজাজেই ছিলেন, প্রসন্ন মুখে টাকা তিনটি পকেটে তুলিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্য কি হয়েছে। তা ছাড়া তুমি আসায় আমার ঝঞ্ঝাটও অনেক কমেছে। কিচ্ছু ভেবো না তুমি ভায়া, নেকসট্ 'ইনক্রিমেণ্টের' সময়ে অন্তত তিনটে টাকা মাইনে যাতে তোমার বাড়ে তার জন্যে প্রাণপণে 'ফাইট' করব।

পরের দিন অফিসে আসিবার সময় পোষ্ট অফিসে ঢুকিয়া অমল পাঁচটি টাকা বাবার নামে মণিঅর্ডার করিয়া দিল। তাহার পর সেইখানে দাঁড়াইয়া পেন্সিল দিয়া মাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল। এতদিন পরে সে বড় অফিসে চাকুরী পাইয়াছে সে কথা জানাইয়া লিখিল, 'এখন কিছুদিন শিক্ষানবিশ থাকতে হবে বলে মাইনে খুবই কম, এরপর ভাল মাইনে পাব, আশা আছে।'

একদা তাঁহাদের অল্প মাহিনার মাস্টারীকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়া আজ বারো টাকা মাহিনাতে শিক্ষিত বেয়ারার কাজ করিতেছে, সে কথাটা জানাইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল।.........

দিন পাঁচেক পরে বাসায় ফিরিয়া দেখিতে পাইল একখানা খামে আঁটা চিঠি মেঝেতে পড়িয়া আছে। এতদিন পরেও তাহার বাবার সুন্দর হাতের লেখা চিনিতে দেরী হইল না। সে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া সেই অবস্থাতেই খাম ছিঁড়িয়া চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল; সামান্য কয়েক ছত্র চিঠি —কিন্তু তাহারই মধ্যে বহু দিনের ইতিহাস, বেদনা ও অভিমান জমিয়া আছে নিশ্চয়ই!

চিঠিতে লেখা ছিল—

কল্যাণ বরেষু—

তোমার পত্র এবং টাকা দুইই পাইয়াছি। কিন্তু তুমি চিঠি যাঁহাকে লিখিয়াছ, তাঁহার কাছে সে চিঠি পোঁছানো আর সম্ভব নয়, কারণ আজ তিন মাসেরও অধিক হইল তিনি স্বর্গে গিয়াছেন।

অকস্মাৎ অমলের চোখের সম্মুখে সমস্তটা যেন লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। তাহার মা নাই! মা মারা গিয়াছেন? সে লাইনটি আবারও একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিল, না ভুল ত হয় নাই! তাহার বাবা পরিহাস করিবারও লোক নহেন, সত্যই তাহার মা আর নাই।

নিস্তব্ধভাবে কেরোসিনের আলোটার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মন ফিরিয়া গেল একেবারে তাহার বাল্যকালে। দারিদ্র্যের মধ্যেই চিরকাল তাঁহাকে সংসার করিতে হইয়াছে, চতুর্দিকে অভাব-অনটন, তাহার উপর দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি সুতরাং খুব একটা লোক দেখানো স্নেহ তিনি অমলকে কোন দিনই দেখাইতে পারেন নাই; আরও পাঁচটা ছেলেমেয়ে তাঁহার ছিল, সকলের সঙ্গেই তিনি অমলকে মানুষ করিয়াছেন; সকলের প্রতি নিছক কর্তব্যটুকু পালন করিতেই দিনেরাতে কুড়ি ঘণ্টা সময় চলিয়া যাইত। কাজেই বিশেষ স্নেহের দাবী অমল করিতেও পারে না—কিন্তু তবু তবু সে ভালবাসার কি তুলনা আছে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার দিন বার চৌদ্দ আগে হঠাৎ অমলের প্রবল জ্বর হয়, সেই সময়টা সংসারের কাজও ছিল খুব বেশী, তবু অমলের বেশ মনে আছে, প্রতিটি কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি পাঁচ সাত মিনিট অন্তরই কাছে আসিয়া বসিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া যাইতেন, সাবু খাওয়ানো হইতে শুরু করিয়া বারে বারে তৃষ্ণার জল দেওয়া অবধি তাঁহার সেবার কোন কাজই তিনি অপর কাহাকেও করিতে দেন নাই। শুধু কি তাহাই? যে দুই দিন অমলের বেশী জ্বর ছিল, সেই দুই দিনই রাত্রে তিনি তাহাকে ছেলেমানুষের মত বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া সারারাত বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও একটি মিনিটের জন্য চোখ বোজেন নাই!

আরও ছেলেবেলাকার প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা মাথার মধ্যে যেন ভিড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ, এতদিন পরে সে যেন অনুভব করিল তাহার মায়ের স্নেহ তাঁহার প্রথম সন্তানের প্রতিই বোধ হয় একটু বেশী ছিল।

ততক্ষণে তাহার প্রথম স্তম্ভিত অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে, বুক হইতে একটা কি যেন ঠেলিয়া উঠিয়া চোখ দিয়া, মুখ দিয়া বাহির হইতে চায়। তাহারই অব্যক্ত বেদনায় কপালের শিরাগুলা টন টন করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু সে প্রাণপনে চোখ মেলিয়া চিঠিটার বাকী অংশটুকু পড়িয়া ফেলিল।

তুমি নিরুদ্দিষ্ট হইবার পর হইতেই তাঁহার মন ভাঙিয়া পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে দেহও। তাহার পর তোমার মাসীমার নিকট হইতে যখন তোমার সংবাদ পাওয়া গেল, তখন তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অবস্থায় আর ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই এবং সেই সময় হইতেই নানারূপ রোগে ভুগিয়া অবশেষে গত অগ্রহায়ণ মাসে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তোমাকে সে সংবাদ জানানো সম্ভব হয় নাই। তোমার পূর্ব ঠিকানায় চিঠি দিয়াছিলাম, কিন্তু সে চিঠি ফেরৎ আসে, বুঝিলাম তুমি ওখানে নাই। তোমার মায়ের শেষ-কৃত্য খোকাকেই করিতে হইয়াছে।

প্রায় বৎসর খানেক হইল আমি চাকরী ছাড়িয়া ঘরে

বসিয়া আছি। আমার মাথায় মধ্যে মধ্যে খুবই যন্ত্রণা হইত, বোধ হয় তোমার মনে আছে; সেই যন্ত্রণাই ইদানীং এত বাড়িয়াছে যে, ছেলেপড়ানো আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এখানে সরকার বাবুরা হাটের কাছে একটা চাল-ডাল-কড়াইয়ের গোলা খুলিয়াছেন, খোকা সেইখানেই কাজ করে, কুড়ি টাকা মাহিনা হইয়াছে। তাহাতেই সংসার চলে। পুঁটি, বুড়ি দুজনেই ভাল আছে; টাকার অভাবে কাহারও বিবাহের ব্যবস্থা করা যায় নাই। ঘেঁটু এখানকার ইস্কুলে পাশ করিয়া বসিয়া আছে, অর্থাভাবে তাহাকেও আর বড় ইস্কুলে দিতে পারি নাই।

আশা করি তুমি কুশলেই আছ। যদি সম্ভব হয়ত একবার বাড়িতে আসিও, কারণ আমারও যাত্রার আর দেরী নাই বলিয়াই বোধ হয়। আমার আশীর্বাদ জানিও, তোমার মাতাও মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে আশীর্বাদ জানাইয়া গিয়াছেন।

ইতি
আশীর্বাদক
তোমার বাবা

চিঠিখানা পড়া শেষ হওয়ার পরেও বহুক্ষণ অমল ঠিক সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর গভীর রাত্রে কোনমতে উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ পরে তাহার দুই চক্ষু প্লাবিয়া অকস্মাৎ বহুক্ষণের নিরুদ্ধ বেদনা অশ্রুর আকারে বাহির হইতে লাগিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল—নিঃশব্দ, কিন্তু বুকফাটা কান্না। এ শুধু তাহার মাতৃবিয়োগের ব্যথা নয়, তাহার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত বেদনা এই উপলক্ষ্যে আবার নূতন করিয়া তাহাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই অমল গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল। সে শুনিয়াছিল যে, যতদিন পরেই হউক, কানে শুনিলেই মহাগুরু নিপাতের অশোচ লাগে। সে নাপিত ডাকিয়া মাথা গোঁফ সব কামাইয়া গঙ্গা স্নান করিল, তাহার পর ঘাটের ধার হইতেই একজন ব্রাহ্মণ ডাকিয়া তাঁহার হাতে একটা টাকা দিয়া একটা ভোজের ব্যবস্থা করিয়া যথারীতি মায়ের পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিল। এটুকু না করিলে কিছুতেই তাহার শান্তি হইত না; ইহার কোন ফল আছে কি না আছে, তাহা লইয়া সে মাথা ঘামায় নাই, তবে জীবিত-কালে যে মায়ের সে কোন উপকারেই আসিল না, সে ভাবিয়া দেখিল, মৃত্যুর পর তাহার স্মৃতির প্রতি এই শেষ সম্মান-টুকু দেখানো প্রয়োজন।

সেদিন আর পাক করার সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না, সামান্য কিছু ফল ও এক গ্লাস সরবৎ খাইয়াই সে অফিসে বাহির হইয়া পড়িল!

কিন্তু সেই দিনই অফিসের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে সহসা তাহার বড়বাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। ইনি দেবেশবাবুর সেকশনের বড়বাবু বটে, কিন্তু ছোটসাহেবের পেয়ারের লোক বলিয়া অফিসে ইঁহার প্রতিপত্তিটাই বেশী। সেই জন্যই হউক আর চাকরী করিয়া দিবার কৃতজ্ঞতাতেই হউক, অমল দেখা হইলেই তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিত। সেদিনও সে নমস্কার করিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহার মুণ্ডিত মস্তক, শুষ্কমুখ ও আরক্ত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি পড়িয়া বড়-বাবু তাহাকে ডাকিলেন, কহিলেন, এসব কি ব্যাপার হে?

মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করিয়া অমল আসল কথাটাই বলিয়া ফেলিল, মা মারা গেছেন।

তাহার পর বড়বাবুর চোখে বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া সে নিজেই বলিল, অনেক দিন আগেই চাকরীর খোঁজে কলকাতাতে এসেছিলুম কিন্তু কাজকর্ম কিছুই জোটাতে পারিনি বলে আর দেশে কোন খোঁজখবর দিইনি। এতদিন পরে এ মাসের মাইনে পেয়ে মায়ের নামে পাঁচটি টাকা পাঠিয়েছিলুম, তারই জবাবে কাল দেশ থেকে চিঠি এসেছে যে মা মাস তিনেক হল মারা গেছেন!

কথাটা বলিতে বলিতেই তাহার দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। বড়বাবুরও দৃষ্টিটা যেন কোমল হইয়া আসিল, তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ঘাটে গিয়ে অশৌচটা কাটিয়ে এলে! তা ঠিকই করেছ। এখন তোমার দেশে রইলেন কে কে?

অমল জবাব দিল, বাবা আছেন, তিনি সামান্য ইস্কুল মাস্টারী করতেন তাও অথর্ব হয়ে পড়ায় ছেড়ে দিতে হয়েছে। মেজো ভাইটি একটা মুদীর দোকানে খাতা লিখে যা পায় তাইতেই সংসার চলে। আর আছে দুটি বোন আর একটি ভাই। কিন্তু না বোনদের বিয়ে, আর না ভায়ের লেখাপড়া, কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না।

বড়বাবু একবার অস্ফুটস্বরে শুধু বলিলেন, ইস!...

তাহার পর মিনিট খানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। অমলও একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া লাইব্রেরীতে আসিয়া ঢুকিল। সেদিন তাহার আর কোনও কাজে মন লাগিল না, চুপ করিয়া নিজের চেয়ারটায় বসিয়া খোলা জানলার মধ্য দিয়া দূরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। বেয়ারাটা তাহাকে ঐ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। বহুক্ষণ, প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল সে সেইভাবেই বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

বেলা আড়াইটা নাগাদ দেবেশবাবু প্রায় লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার মুখে চোখে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। কহিলেন, কি বলেছ হে মাস্টার, বড়বাবুকে?

অমল চমকাইয়া উঠিল। একটু ভীতভাবেই বলিল, বড়বাবুকে? কী বলেছি?

দেবেশবাবু কহিলেন, আর নাও, কি বলেছ তাইত জিজ্ঞেস করছি। হঠাৎ বড়বাবু তোমার ওপর এত সদয় হয়ে উঠল কেন?

তাহার পর সহসা তাহার চেহারার দিকে নজর পড়িয়া কহিলেন, এ কি, এসব কি ব্যাপার হে?

অমল সংক্ষেপে তাঁহাকে কথাটা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া

দেবেশবাবুর ছোট ছোট চোখ করুণার্দ্র হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, ইস! আহা বেচারী! তাই তুমি আজ সকালে পড়াতেও যাওনি বটে। আমার অতটা মনেও ছিল না। আর ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি। সেজন্যে ত ওদের মাথা ব্যথা নেই! মাস্টার আসেনি ত ওরা বেঁচেছে, সে কথা আমাকে একবার বলেও না।...তা তোমার সঙ্গে বড়বাবুর দেখা হয়েছিল বুঝি, এই অবস্থায়?

অমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ। তিনিও ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন, তাই তাঁকে সব কথাই খুলে বলেছিলুম।

পিঠে একটা চাপড় মারিয়া দেবেশবাবু কহিলেন, ভালই করেছ ভায়া; মা মরে তোমার শাপে বর হল!...বড়বাবু গিয়েই ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকে ছিল, আর কি ব্যবস্থা করেছে জান?

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, কৈ না ত!

দেবেশবাবু কহিলেন, আজ থেকে তুমিই লাইব্রেরীর সমস্ত চার্জ পেলে, আর সেই জন্যে তোমার মাইনেও বেড়ে একেবারে ত্রিশ টাকা হয়ে গেল। এ মাসের পয়লা থেকেই বাড়তি মাইনের হিসেব ধরা হবে।

অমল উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল কহিল, কিন্তু মনমোহন বাবু?

দেবেশবাবু বলিলেন, ঐ মনমোহনেরই যা একটু অসুবিধা হল। অবিশ্যি খুব বেশী অসুবিধা হতে বড়বাবু দেয়নি, বাড়তি যে পঁচিশটে টাকা পাচ্ছিল সেটা গেল বটে, কিন্তু তেমনি পনের টাকা স্পেশ্যাল ইনক্রিমেণ্ট পেলে।...মরুক গে মনমোহনের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, ও অনেক টাকা মাইনে পায়। তুমি এখন চল, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

বড়বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া কিন্তু অমলের কণ্ঠে কোন কৃতজ্ঞতার ভাষা আসিল না। সে শুধু নীরবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তবে তাহার দৈন্য সম্পূর্ণরূপেই ঢাকিয়া লইলেন দেবেশবাবু, কহিলেন, ছোকরা শুনেই কেঁদে ফেলে দিলে, বললে, 'বড়বাবু গেলজন্মে আমার কেউ ছিলেন দেবেশবাবু, নইলে এমন উপকার কেউ করে না!'......তা কাজ যা করলেন বড়বাবু, এ শুধু আপনাতেই সম্ভব। একটা ফ্যামিলিকে বাঁচালেন।

বড়বাবু হাসিলেন; কহিলেন, কী জানো দেবেশ, আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, বি-এ, এম-এ পাশ ত করিনি, কেউ কষ্টে পড়েছে শুনলেই আমরা আর স্থির থাকতে পারি না! তা যাও হে ছোকরা, মন দিয়ে কাজকম্ম করগে! দেশে বাপকে চিঠি লিখে দাও বরং তিনি যেন ভাইগুলোর লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করেন।

অমল লাইব্রেরী ঘরে গিয়া সর্বাগ্রে তাঁহারই আদেশ পালন করিল। বাবাকে চিঠি লিখিয়া দিল, তিনি যেন পত্রপাঠ ঘেঁটুকে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। অতঃপর হইতে সে প্রতি মাসেই দশ বারো টাকা করিয়া পাঠাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। তাহাতে ঘেঁটুর পড়ার খরচটা অন্তত চলিয়া যাইবে।...আর আগামী মাসের মাহিনা পাইলে সে দেশে গিয়া বাবাকে দেখিয়া আসিবে সে কথাও লিখিয়া দিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া চোখ বুজিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিতেই তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল তাহার মায়ের স্নেহমাখানো চক্ষু দুইটি! তাঁহার সে দৃষ্টি হইতে যেন করুণা ও আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়িতেছে! ঘেঁটু মায়ের শেষ সন্তান, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে মা স্বর্গে থাকিয়াও প্রসন্ন হইয়া উঠিবেন নিশ্চয়। ইতিমধ্যে কয়দিন আর ইন্দুর খোঁজখবর পায় নাই একথাটা বরাবরই অমলের মনকে পীড়া দিতেছিল, কিন্তু আরও তিন চার দিন পরে সে রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিল। সেদিন রাত্রে সেই যে অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তাহার পর আর দেখা করে নাই কিংবা কোন চিঠিও দেয় নাই। এক্ষেত্রে কী করা উচিত তাহা অমল ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা সে জানিত, কিন্তু সেখানে খোঁজ করিতে যাওয়া উচিত হইবে কিনা ভাবিয়া পাইতেছিল না। অবশেষে রবিবার দিন পর্যন্তও যখন কোন খবর মিলিল না, আর থাকিতে পারিল না, সে ইন্দুর শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশেই যাত্রা করিল।

পাণিহাটীর কাছাকাছি একটা কলে তিনি চাকুরী করিতেন, তাহারই কাছাকাছি তাঁহার বাড়ি; এইটুকু তাহার জানা ছিল এবং কলটার নামও সে জানিত, সেই ঠিকানা সম্বল করিয়াই বহু পথ হাঁটিয়া এবং কিছু বাস ভাড়া দিয়া অপরাহ্ণ নাগাদ সে ইন্দুর শ্বশুরবাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল।

শ্বশুর মহাশয় বাহিরেই বসিয়াছিলেন, অন্তত অমলের তাঁহাকেই ইন্দুর শ্বশুর বলিয়া মনে হইল। বাগানের মধ্যে একটি ইজিচেয়ার পাতিয়া তিনি চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলেন। অমলের প্রশ্নের উত্তরে তন একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন, তাহার পর পুনশ্চ চোখ বুজিয়াই জবাব দিলেন, সে এখন বাড়ি নেই।

অমল বোধ হয় ঠিক এটা আশা করে নাই। সে খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিল, কখন আসবে বলতে পারেন?

(ক্রমশ)
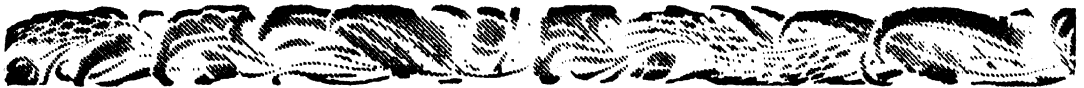
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—মূল সভাপতির অভিভাষণ

(জামশেদপুরে অধিবেশন)

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশনের সভাপতিত্বে আমাকে বরণ ক'রে আপনারা আমাকে যে উচ্চ সম্মান দান করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হ'লেও নিজেকে এই প্রতিষ্ঠার যোগ্য ব'লে মনে করতে পারছি না। আপনারা এই পদে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর বরোদা প্রবাসী শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়কে নির্ব্বাচিত করেছিলেন। তাঁরই এই পদের সম্পূর্ণ যোগ্যতা ছিল; কেন না তিনি একদিকে সত্যিকার প্রবাসী বাঙালী এবং অপর দিকে সাহিত্যিক হিসাবেও আমার চেয়ে তাঁর যোগ্যতা বেশী। শেষ মুহূর্ত্তে অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁর না আসতে পারায় তাঁর স্থান পূরণ করার জন্য আপনাদের সাদর ও সনির্ব্বন্ধ আহ্বান ব্যক্তিগত নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। কিন্তু তাঁর আসন সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারার আমার যে অযোগ্যতা ও একান্ত সময়াভাবে আমার অভিভাষণের অপরিহার্য্য স্বল্পতা ও অন্যবিধ নানা দোষ ত্রুটি আশা করি, আপনারা মার্জ্জনা করবেন। মঙ্গলময় ভগবানের নিকট ব্যক্তিগত-ভাবে এবং আপনাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আশু রোগমুক্তি কামনা করি।

বাঙ্গলা সাহিত্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠার দাবী না থাকলেও আমার যে অনুরাগের অভাব নাই, হয়ত তা জেনেই আপনারা আমাকে আজ এই উচ্চ সম্মান দান করেছেন। সেদিক থেকে আমি আপনাদের সাদর আহ্বানের নিতান্ত অযোগ্য নই, এই বিশ্বাস আমার আছে।

বঙ্গভূমির কৃত্রিম বাঁটোয়ারা

প্রবাসী বাঙ্গলা সাহিত্যিকদের এই যে বাৎসরিক অনুষ্ঠান, এর একটি বড় সার্থকতা আছে। ইহা সর্ব্ববিদিত যে রাষ্ট্রপরিচালনার সুবিধা অসুবিধার হিসাব ব্যবস্থায় আমাদের বাঙ্গলা ভূমির যে বাঁটোয়ারা সাধিত হয়েছে, তাহা অতি কৃত্রিম ও সম্পূর্ণ অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাঙ্গলা ভূমির ছন্দগত এবং প্রকৃতিগত একটি নিজস্ব সত্ত্বা আছে, সেটা বিশ্ব প্রকৃতির ভূমিগত ছন্দপ্রসূত, সেটা শাশ্বতভাবে রাষ্ট্রীয় বাঁটোয়ারার ভাগাভাগির বহু ঊর্দ্ধে। এই অতি কৃত্রিম ভাগাভাগি তাকে কখন বিনষ্ট কর্ত্তে পারে না এবং পারবে না। এই বিশ্ব প্রাকৃতিক বাঙ্গলা ভূমির সঙ্গে আমাদের অখণ্ডভাবে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে হবে—এই বিশ্ব প্রাকৃতিক বাঙ্গলার একটি সহজ সংজ্ঞা স্বরূপ আমরা বলতে পারি, যে ভূমির ছন্দে ছন্দে তার অধিবাসীর অন্তরে স্বভাবতঃই বাঙ্গলা ছন্দ তৈরী হয়, কণ্ঠে স্বভাবতঃই বাঙ্গলা ভাষা নির্গত হয়, সেই ভূমিই বাঙ্গলা ভূমি। এই অর্থে এখন বাঙ্গলার বাহিরে অনেক জেলা আছে—আমার নিজের জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলা তার অন্যতম—সেগুলি বিশ্ব প্রকৃতিগত এক অখণ্ড বাঙ্গলা ভূমির অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই প্রাকৃতিক বাঙ্গলা ভূমির সমগ্র সত্ত্বাকে রাষ্ট্রীয় খণ্ডবিখণ্ডতার মধ্যেও আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখতে হবে এবং সেই বৃহৎ বঙ্গভূমির ছন্দধারাকে, ভাবধারাকে এবং রূপধারাকে এই সমগ্র ভূমির মানুষের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত ক'রে বিশ্বে তার অতুলনীয় অবদান প্রদান করবার জন্য সাধনা করতে হবে। যাতে কৃত্রিম বাঁটোয়ারার ফলে আমাদের এই অখণ্ড ভাষা ও সংস্কৃতি বিকৃত ও বিভক্ত হয়ে না যায়, তার জন্য আমাদের

অবিরাম চেষ্টা করতে হবে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বাঙ্গলা ভূমির কৃত্রিম ব্যবচ্ছেদ অস্বীকার ক'রে এবং নানা স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীকে প্রতি বৎসর পরস্পর সম্মিলিত হবার সুযোগ দান ক'রে বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখবার অমূল্য সহায়তা করছে। আপনি, আমি একই সংস্কৃতি ও একই সাহিত্যের উত্তরাধিকারী—আপনার ও আমার চিত্তবৃত্তির মধ্যে এক অভিন্ন ঐক্যগ্রন্থি রয়েছে আজিকার এই সম্মেলনের ভিতর দিয়ে তার নিবিড় উপলব্ধি বৃহত্তর বঙ্গের সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে আসবে। প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনা হ'তে বাঙ্গলা সাহিত্য অতীতে অনেক কিছু পেয়েছে; ভবিষ্যতে যাতে সেই অবদান কেবল যে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা নয়, আরও বৃহত্তর ও ব্যাপকতর হয়, তার জন্য ঐকান্তিক সাধনার প্রয়োজন। আশা করি, প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে আজকাল যে সব কঠিন সমস্যার উদ্রেক হয়েছে, এই সম্মেলনে পরস্পর মেলামেশা ও আলোচনার ফলে তার সমাধানের সবিশেষ সহায়তা হবে এবং তাতে ক'রে সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্য সাধারণভাবে উপকৃত হবে।

সাহিত্য জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রকাশ। জীবনের কথা জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা রসাত্মকভাবে বলতে পারলে, তাহাই সাহিত্য পদবাচ্য হয়। যেখানে জীবনের অনুভূতি প্রকাশ না পেয়ে লেখকের পাণ্ডিত্য ও অহমিকা আত্মপ্রকাশ করে—যার মধ্যে রয়েছে অনুকরণ বৃত্তি এবং আলঙ্কারিতার আড়ম্বর, তা কখনও জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে না। তাতে সমাজের মধ্যে সাময়িকভাবে চমক জাগতে পারে, কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষণজীবী। অবশ্য চিরস্থায়ী কিছুই নয়; হয়ত সাহিত্যও নয়; তবুও সত্যিকার সাহিত্য পুরুষানুক্রমে বহুকাল গণ-চিত্তকে প্রভাবিত করে। সত্যিকার সাহিত্যে চাই গণজীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় যে আজ গণজীবন হ'তে দূরবর্ত্তী হয়ে সমাজের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করেছি, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। সাহিত্যে যেন সেই সর্ব্বনাশ না ঘটে। আমাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়েই যেন আমাদের জাতীয় জীবনের সকল বিভেদের অবসান ঘটে, তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে গণ-জীবনের ও গণ-সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। অতি-সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন ও অতি-সূক্ষ্ম ভাষায় অভিব্যক্ত সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। তার মূল্য সার্ব্বদেশিক। কিন্তু জাতির সাহিত্যকে সত্য, সুন্দর ও বলিষ্ঠ রাখতে হলে এবং জাতির জীবন্ত কৃষ্টিধারার বাহক করে তুলতে হ'লে, তার মূলধারা থাকবে গণজীবনের ও গণসাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন; সাহিত্যের ভাব ও ভাষার বলিষ্ঠ প্রেরণা আসবে জাতির যুগযুগবাহী জীবন্ত গণ-সংস্কৃতি ও গণসাহিত্যের ধারা থেকে। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইতিমধ্যেই এই প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা আরও ব্যাপক-ভাবে এবং আরও সত্যভাবে চাই।

অপসাহিত্যের অনিষ্টকারিতা

আগাছা অনেক জন্মে—এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। পৃথিবীর দেশে দেশে অপসাহিত্য অনেক জন্মায়। তার মূলে উৎপাটনের চেষ্টাও কর্ত্তে হবে, কারণ আগাছার অজস্র বৃদ্ধি সাহিত্যের বহু বিরাট সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে নিষ্পিষ্ট করে। কিন্তু এর জন্য অত্যধিক বিচলিত হবার কারণ নেই এবং সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হবারও

কিছু নেই। অপসাহিত্য স্বভাবতঃই স্বল্প-জীবন এবং অচিরে নিঃশেষ হবে—এই আশা করে আমরা মুকুলায়মান সত্যিকার সাধনার দিকে আশাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকব। বস্তুতঃ বাংগলা সাহিত্যের বিপুল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বাংগালী পিছু হঠছে,—রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক সকল ক্ষেত্রেই বাংগালী আজ সংকটা-পন্ন, কিন্তু এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্ববিধ বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে বাংগালীর সাহিত্য বহু বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে। বাংগলা সাহিত্যের অগ্রগতি কোন কিছুতেই রোধ করতে পারে নাই। কোন বিশেষ সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করব না, কারণ আমার এই অভিভাষণের অতি-দ্রুত প্রস্তুতির ফলে স্বভাবতঃই অনেক নাম অনুল্লেখিত থাকতে বাধ্য; তাতে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। বাংগলা সাহিত্য মোটের উপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির সংগে সমান তালে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছে, তার এই অদম্য জীবন-প্রচেষ্টা সত্যই বিস্ময় ও আশার সঞ্চার করে। সাফল্য কতটা হয়েছে, তার চেয়ে চেষ্টা কোন্ পথে কি রকম হচ্ছে, আমার মতে সেইটেই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। কারণ চেষ্টাই জীবনের লক্ষণ। আর আমাদের সাহিত্য যে জীবনসম্পন্ন, তা কেবল সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের নয়, আধুনিক বহু লেখকের লেখার মধ্যে সেই সত্যের পরিচয় পাই। বাংগলার জাতীয় জীবনের গভীর অন্তস্তলে যে একটি বলিষ্ঠ ও মৌলিক সৃজনী শক্তির অফুরন্ত উৎস চিরজীবন্ত আছে, ইহা তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৃজনী শক্তি ও মৌলিকতা ছাড়া বাংগালীর বাংগলা ভাষার ও বাংগলা সাহিত্যের একটি অসাধারণ সমন্বয় শক্তি ও সমীকরণ শক্তি আছে। তাই বাংগলা ভাষার ভিতর দিয়ে হিন্দু মুসলমানের প্রাণের যে অবিচ্ছিন্ন মিলন-নির্ঝরিণী উৎসারিত হয়ে উঠেছে, তা সমগ্র ভারতের মধ্যে অনুপম। বাংগলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই অখণ্ড ও সুগভীর সাংস্কৃতিক মিলন-প্রবাহের গৌরবে সমভাবে গৌরবান্বিত। বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক শত সহস্র দ্বন্দ্ব এই অখণ্ড মিলন-প্রবাহের গতিরোধ বা খণ্ডতা সাধন করতে পারবে না, এটি অমার একান্ত বিশ্বাস। আর বাংগলা সাহিত্যের এই মিলন-প্রবাহের ভিতর দিয়ে জাতীয় জীবনে বাংগালী যে গভীর একতার ভিত্তি স্থাপন করছে ও করবে, সমগ্র ভারত তার দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রভাবান্বিত ও উপকৃত হবে।

মোটের উপর বাংগলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী। অপ-সাহিত্যের হিসাব করে যাঁরা হাহাকার করেন, আমি সে দলের নই। আমি বলি, অপচেষ্টার চেয়ে সত্য চেষ্টা কোথায় কি হচ্ছে, তার হিসাব কর। হীনমন্যতা দূর করতে হবে। পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই কেবলমাত্র দিক-পালেরা চারিদিক আলো ক'রে বসে থাকেন না।

গণজীবনের সহযোগে সাহিত্য

গণজীবনের সংগে সংযোগে সাহিত্য যে কিরূপ সত্য ও সুন্দর হয় এবং জীবনে সাহিত্যের যে কিরূপ মনোরম স্থান গড়ে উঠে, আমার নিজের জীবনে তার নিবিড় উপলব্ধি হয়েছে। শৈশবে আমার প্রিয় মাতৃভূমি শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামে আমার মা আনন্দময়ী দেবী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আমাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত প'ড়ে শোনাতেন। বাংগলা সাহিত্যের এই দুই অনাবিল ও অফুরন্ত উৎসের ধারায় শৈশব জীবনে আমার প্রতি ধমনী ও প্রতি শিরা অনুশিরা অনুছন্দিত হয়েছিল, আমার শিশু-কল্পনা অনুরঞ্জিত হয়েছিল। আমার বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। গ্রামের নগর কীর্ত্তন দলের তিনি ছিলেন নেতা। শৈশব ও বাল্য জীবনে তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কীর্ত্তনের প্রবাহে আমার আত্মাকে ঢেলে দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাল্য জীবনে গ্রামের বাউল, গাজি, ভাটিয়ালীদের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও প্রাণের মিতালি স্থাপিত হয়েছিল এবং তাদের সংগে মিলে মিশে, তাদের সংগে নেচে গেয়ে খেটে বাংগলার লোক সংগীতের অনুপম সরল বলিষ্ঠ ও নির্ম্মল ভাব সুরে ও ছন্দে আত্মাকে পরিপ্লুত ক'রে বাংগলার গণজাতির আত্মার সংগে অভিন্ন সংযোগ স্থাপনের অমূল্য সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাই পরবর্ত্তী জীবনে বাংগলা ভাষা ও সাহিত্যের দাবীকে স্বীকার না ক'রে পারি নাই। প্রথমে বিলেত থেকে ফিরে এসে সাহেবিয়ানার স্রোতে গা ঢেলে ইংরিজি কবিতায় আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে বুঝলাম যে তাতে ভাষাগত ও ভাবগত কৌশল প্রকাশ করতে পারলেও নিজের ও জাতির গভীর আত্মার ভাবের ও ছন্দের পূর্ণ রূপায়ন করা অসম্ভব। তাই আমার ছেলের শৈশবকালে তার মনোরঞ্জনের জন্যে শিশু সাহিত্যে এবং পরে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে বাংগলা সাহিত্যের চর্চ্চার ভিতর দিয়ে নিজের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে আসছি এবং তাতে যে কেবল গভীর আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি, তা নয়, এই চেষ্টার ভেতর দিয়ে ভারতের এবং বাংগলার অতুলনীয় কৃষ্টিধারার সংগে প্রাণের অবাধ যোগ স্থাপন করে অন্তর্জীবনে যে অমূল্য উদার অবদান লাভ করবার সুযোগ পেয়েছি, তা বাংগলা সাহিত্য চর্চ্চার সহায়তা ছাড়া সম্ভব হত না। বাংগলা সাহিত্যের নিকট আমার ব্যক্তিগতভাবে গভীর ঋণের সামান্য আভাষ হিসাবে এই কথাগুলির উল্লেখ করাতে আমার যদি কোন ধৃষ্টতা হয়ে থাকে, আশা করি আপনারা দয়া করে তা মার্জ্জনা করবেন।

সমাজের অনেকক্ষেত্রে কাজ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার ফলাফল নির্ণয় করবার দিন আজ নয়। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এটুকু অসংকোচে বলতে পারি, আমার সকল কাজের প্রেরণার মূলে রয়েছে বাংগলা ভূমির সংস্কৃতির উপর অচল বিশ্বাস এবং তার প্রতি অখণ্ড ভালবাসা। আমি চাই বাংগলা ও বাংগালীর কথা সত্য ও সুন্দরভাবে রূপায়িত করে যেন বাংগল সাহিত্য ধন্য হয়। কেবল ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগ-শোক-দুঃখ-জীর্ণ বাংগলা নয়, অতুল সংস্কৃতি-গৌরবের ধারাবহ বাংগলা—বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে গৌরবান্বিত বাংগলা—বাংগালীর জীবনের সমগ্র বিপুল বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা যেন বাংগলা সাহিত্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। পরিশেষে আমার স্বরচিত একটি গানে যে আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছি, তা এখানে উদ্ধৃত করে আজকার বক্তব্যের সমাপ্তি করি'—

চির ধন্য সুজলা ভূমি বাংলার
জয় জয় সোনার বাংলার
জয় জয় ভাষার বাংলার
জয় জয় আশার বাংলার
জয় জয়—
জয় জয় সোনার বাংলার!
জয় স্ব-ভাবের বাংলার
ধারা রূপ ছন্দের বাংলার;
শস্যের শিল্পের, শৌর্য্যের বীর্য্যের, লক্ষ্যের ঐক্যের জ্ঞানের—
জয় অবদানের বাংলার!

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

(জামসেদপুর অধিবেশন)

শ্রীঅন্নদাশংকর রায়

আপনাদের সৌজন্যের জন্য যত্নেকরে ধন্যবাদ। আমার কাছে এই প্রবীণোচিত সম্মান নিছক আহ্লাদের বিষয় নয়। এতে মনে করিয়ে দেয় যে আমার বয়স হয়েছে, বয়েসের হিসাবে আমি তরুণ নই। বাস্তবিক এটা সে হিসাবে আমার বয়ঃসন্ধি। আমি প্রবীণদের মহলে নবীন নবীনদের মহলে প্রবীণ। এর ভালোমন্দ দুই আছে। মন্দের উল্লেখ ত করেছি। বয়স হয়েছে এ কথা ভাবতে একটুও ভালো লাগে না, সভাপতির মর্য্যাদা পেলেও না। আমি মনে প্রাণে তরুণ থাকতেই ভালোবাসি। পাকাচুলের উপর আমার চিরকালের বিরাগ। কিন্তু ইতিমধ্যে পাকাচুলের পরোয়ানা পৌঁছে গেছে। সুতরাং আপনাদের পরোয়ানা আর বেশী কী। তার পর ভালোও আছে। নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি পরস্পরকে পরিচিত করাতে পারি। প্রবীণদের বোঝাতে পারি নবীনরা কী ভাবে—যদিও নবীনদের সঙ্গে আমার পরিচয় অপ্রচুর। আর নবীনদের বোঝাতে পারি প্রবীণদের মনোভাব—যদিও প্রবীণদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্বল্প।

আমার আজকের অভিভাষণে আমি এই কাজটিই করব। আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্তি আছে, আমি চেষ্টা করব নিরসনের। আধুনিকদের কাছে অত্যাধুনিকদের নানা জিজ্ঞাসা আছে, আমি উত্তরদানের চেষ্টা করব। এই দুই কর্ত্তব্য একসঙ্গে করা হয় যদি অভিভাষণটিকে কাহিনীর আকার দিই। জানি তা এখানকার রীতি নয়। তবু আমার আশা আছে আপনারা মার্জ্জনা করবেন।

আমি যার কাহিনী বলতে যাচ্ছি তার নাম দেওয়া যাক বিনু। বিনু যখন খুব ছোট তখন তার বাবা তাকে এক আলমারি বই দিয়ে বললেন, এখন থেকে তোর কাছে রইল এর চাবি। বিনু যেন স্বর্গ হাতে পেল। বইগুলি পড়ে বোঝবার মত বিদ্যা তার ছিল না, তবু দিনরাত নাড়াচাড়া করত। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ছোট বড় কত রকম বই। হঠাৎ একদিন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল গৃহদাহে। বিনুর সে কী দুঃখ। তার পর তার কাকা তাকে আনিয়ে দিলেন একখানা শিশু মাসিক। ত পড়ে তার সখ গেল সেও মাসিকপত্র চালাবে। হাতে লিখে বের করল একখানা নকল মাসিক। তাতে বিজ্ঞাপনেরও নকল থাকত। ত্রিবর্ণ আর একবর্ণ চিত্র বিনু নিজে আঁকত। গল্প আর কবিতা, নাটক আর উপন্যাস অভাব ছিল না কিছুরই। অভাব ছিল শুধু পাঠকের।

এমনি করে তার সাহিত্যচর্চ্চার হাতেখড়ি হল। তারপর এক শুভদিনে স্কুলের ছেলেদের সমিতির আলমারি পড়ল বিনুর হাতে। বিনু ক্লাস পালিয়ে সমিতির ঘরে ঢুকত, আলমারি খুলে কেবল মাসিকপত্র পড়ত। তখনকার দিনের প্রায় সব ক'টি মাসিক নেওয়া হ'ত বিনুদের স্কুলে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, নারায়ণ, মানসী ও মর্ম্মবাণী ইত্যাদি ছিলই। আশ্চর্য্যের কথা—ছিল সবুজপত্র। হেডমাষ্টার মশাই কী ভেবে ও কাগজ আনিয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন, ছেলেদের মধ্যে বোধহয় একমাত্র বিনুই ও কাগজ পড়ত। আর বিনুও যে ওর একবিন্দু বুঝত তা নয়, কতই বা তখন তার বয়স, বারো কিম্বা তেরো। তবু সেই বয়সেই তার ভালো লাগত বীরবলের

স্টাইল, আর তাঁর রসিকতা। তখন থেকে মনে মনে সে তাঁর একলব্য।

কিন্তু এই সব পড়াশুনোর সদ্য ফল কিছুমাত্র ছিল না। বিনুর লেখা বন্ধ হয়ে গেছল, কেননা পরের নকল করতে তার উৎসাহ ছিল না। সে প্রায় সমস্তক্ষণ পড়ত। তাও পাঠ্যপুস্তক নয়, এই সব মাসিকপত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ। ইংরাজী মাসিকপত্র পড়তে পড়তে সে চলে গেল আর এক রাজ্যে। ভাবতে থাকল কী করে একদিন জাহাজের খালাসী হয়ে দেশান্তরে পালাবে। তার পর ইংরাজী সংবাদপত্র পড়তে পড়তে তার দৃষ্টি পড়ল রাজনীতির উপর। অমৃতসর, গান্ধী, খিলাফৎ। এ সকলের ঠিক মানে বোঝবার মত বয়স তার হয়নি, কিন্তু তারও ইচ্ছা যেত দেশের কাজ করতে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তার ধারণা জন্মিয়েছিল সেও অমন আগুনভরা প্রবন্ধ লিখতে পারে, সেও বানাতে পারে অমন এক একটি কাগজের বোমা! বিনু একদিন সত্যি সত্যি এসে কলকাতার রাজপথে হাঁটাহাঁটি সুরু করে দিল। উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের আফিসে ঢুকে দেশ উদ্ধার। কিম্বা খালাসী হয়ে জাহাজে চড়ে আমেরিকাযাত্রা। দুটোর কোনোটাই হল না কারণ সম্পাদকরা হৃদয়হীন। একজন বললেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে চাও, বেশ কথা। কিন্তু তার আগে শিখে রাখতে হয় প্রুফ দেখা। প্রুফ দেখে বিনুর চক্ষু স্থির। আর একজন বললেন, আগে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং, তার পরে জর্নালিজম। শর্টহ্যাণ্ড শিখতে গিয়ে বিনুর কান্না পেল। কোথায় কাগজের বোমা, অগ্নিবর্ষী কামান। আর কোথায় সরু সরু দাঁড়ি আর ডট। জাহাজের দিকে তাকিয়ে বিনুর বুক কাঁপে। সাত সমুদ্র তেরো নদী। একবার খালাসী হলে কি আর খালাস আছে।

কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বিনু ছেড়ে দিল পথটা। অসহযোগীরা অধিকাংশই ফিরেছিলেন, সুতরাং গোলামখানায় কে কাকে লজ্জা দেবে। তবু সেই পশ্চাদ্ অপসরণের গ্লানি বিনুকে জর্জ্জরিত করেছিল। সে সাহিত্যটাহিত্য বহুদিন ভুলেছিল, নতুন করে পড়তে সুরু করল। এবার সে পড়ল বেশীরভাগ বিদেশী বই। ইবসেন, বার্নার্ড শ, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ডষ্টইয়েভস্কি। বিশুদ্ধ সাহিত্য তাকে আকর্ষণ করল না, সাহিত্যের মধ্যে সে খুঁজল Social significance—সামাজিক সার্থকতা, সমাজ সংস্কার, সমাজের পুনর্গঠন, নানা বিচিত্র সমস্যার সমাধান, এইসব তাকে আকুল করল। সে যদি কোনো দিন কলম হাতে নেয় তবে সেই কলম হবে তার তলোয়ার, তাই দিয়ে সে কালাপাহাড়ী করবে। এই হল তার তখনকার স্বপ্ন। দু' একটি চোখা চোখা প্রবন্ধ লিখে সে সাধু সজ্জনদের ভয় পাইয়ে দিল। হয়ত আরো লিখত ওধরণের লেখা। কিন্তু ভাগ্যদেবতার চক্রান্ত চলছিল তাকে সাহিত্যিক করবার। বিনু প্রেমে পড়ল।

বিনুর প্রেমের ইতিহাস বর্ণনা করা অবান্তর। প্রেমে পড়ে বিনুর প্রধান কাজ হল চিঠি লেখা, তার পরে কবিতা লেখা। তিনটি বছর এই নেশায় মশগুল থেকে বিনু আবিষ্কার করল যে তার লেখার হাত আছে। সে সাহিত্যিক। এর জন্যে তাকে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে হবে না, প্রুফ দেখতে হবে না, শুধু অন্তরের কথা অন্তরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তার লেখনী যেন খেয়া নৌকা। একূল থেকে ওকূলে পার করাই তার কাজ। কাগজের বোমা, কাগজের তলোয়ার কোথায় পড়ে রইল। বিনু হল খেয়ানৌকার পাটনী।

তার সাধনা কথা বলার সাধনা। বোবা সংগ্রাম করছে সবাক হতে। ভাবপ্রকাশের জন্যে সংগ্রাম, struggle for expression. পাঠক ত মাত্র একজন। সেই একজনের জন্যে কী

অবিশ্রাম উদ্যম! বলতে হবে, বলতে হবে, বলতে হবে। ঠিকমত বলতে হবে, পরিমিত-ভাবে বলতে হবে, সংযমভাবে বলতে হবে। একটিও শব্দ বেশী হবে না, কম হবে না, অপ্রযুক্ত হবে না। পাঠক যদিও একজন তবু লেখা হবে সকলের সেরা। বিনুর প্রয়াস যাতে তার প্রত্যেকটি কথা হয় পড়বার মত, দু'বার পড়বার মত, আবার পড়বে বলে তুলে রাখবার মত। যে কৌটায় বিনুর প্রাণ আছে সে কি নিতান্ত একখানা চিঠি? সে সাহিত্য, দুজনের গোপনীয় সাহিত্য।

এর পরে বিনু চলে গেল মথুরায়। তার প্রেমের পরিণতি মাথুর। যাবার আগে তার এই প্রত্যয় জেগেছিল যে সে সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু নয়, সাহিত্য ছাড়া আর সবই তার কাছে পরধর্ম। যে জীবিকা সে অবলম্বন করেছিল তাতে তার মন ছিল না। কী আর করবে! সাহিত্যিক হিসাবে তার আয় এক পয়সাও না, কিন্তু বাঁচতে হলে পয়সা দরকার। সাহিত্যই যদি তার জীবিকা হত তা হলেই জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হত। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অপর কোনো জীবিকা স্বীকার করতেই হবে, নইলে অনশন। অসামঞ্জস্যের কাঁটা ফুটে থাকল তার মর্মে।

সেদিন জানল যে সে সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু নয় সেদিন থেকে তাকে পীড়া দিতে থাকল দু'টি প্রশ্ন। এক, কিসের জন্যে সাহিত্য? দুই, কাদের জন্যে সাহিত্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলতেন, জাতীয় ভাবধারায় অবগাহন করে জাতীয় বেশ পরিধান করে বিশ্বসভায় যাতে আসন পায় এই দেশ, পায় শ্রেষ্ঠ আসন, সেইজন্যে সাহিত্য। কেউ বলতেন, শিক্ষার জন্যে, সমাজ সংস্কারের জন্যে, সমাজবিপ্লবের জন্যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে, জনমনের আত্মপ্রকাশের জন্যে। কেউ বা বলতেন, চিত্তশুদ্ধির জন্যে, ভাগবত উপলব্ধির জন্যে, দেবজীবনলাভের জন্যে, নৈতিক উৎকর্ষের জন্যে। এমনি কত কথাই বিনু শুনেল। মথুরায় গিয়ে দেখল ওখানে মানুষকে এমনভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হচ্ছে যেন মানুষ বলে কিছু নেই, আছে তার দেহ, তার মন তার ব্যবহার, তার এলোমেলো চিন্তা ও লাফ দিয়ে চলা স্বপ্ন। আছে তার চেতনাপ্রবাহ, তার অবচেতনা, তার রকমারি কমপ্লেক্স, তার কত রকম রিফ্লেক্স য়্যাকশন। সাহিত্য বলতে ওখানে কী না বোঝায়! বিনু ত দিশা হারাতে বসল। তখন তার হৃদয় বলে উঠল, না, না, নেতি, নেতি। আর্টের মধ্যে অনেক জিনিষ আসতে পারে, যেমন নৌকার মধ্যে। কিন্তু আর্টকে হতে হবে আর্ট। সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। কী করে তা হবে সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক, তারাই আর্টিস্ট। তারা হৃদয়বান, তারা বিদগ্ধ, তারা মানুষকে মানুষ বলেই ভালোবাসে, প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলেই। তারা সৃষ্টি করে সৃষ্টির জন্যে, লেখনী দিয়ে খেলনা বানায় খেলার জন্যে। কিসের জন্যে আর্ট? আর্টের জন্যে আর্ট। আর্ট ফর আর্টস সেক। এই উত্তরই আর্টিস্টের উত্তর। যাঁদের উত্তর অন্যরূপ তাঁরা আর্টিস্ট নন। তাঁরা আর্টিস্টের ছদ্মবেশে শিক্ষক, সংস্কারক, বিপ্লবী তাঁরা বায়োলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট, সাইকোয়্যানালিস্ট, তাঁরা দেশানুরাগী, গণপ্রেমিক, যোগীঋষি। আর্ট ফর আর্টস সেক তাঁদের কাছে অনুমোদন পায় না। তাঁরা বলেন Art for the sake of something higher. বিনু বলে, জগতে আর্টের চেয়ে বড় অনেক কিছু আছে, কিন্তু আর্টিস্টের কাছে আর্টের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সতীর চোখে যেমন তার নিজের পতিটিই সকলের চেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আপনার, সর্বতোভাবে একান্ত—যদিও অপরের চোখে পাজী আর নচ্ছার, কাণা আর খোঁড়া, কালো আর কুৎসিত তেমনি আর্টিস্টের কাছে আর্টই highest, তার চেয়ে higher কিছু নেই। তাই তার বন্ধু যখন প্রশ্ন করেন, "আর্টাৎ পরতরং নহি?" সে উত্তর দেয়, "নহি"।

সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। কী করে তা হয় সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক। তারাই আর্টিস্ট। তারা ত বলবেই, আর্ট ফর আর্টস সেক। কিন্তু তার মানে এমন নয় যে আর্টের জগৎ একটা অন্ধকূপ, তার ভিতরে বাইরের আলো হাওয়া যাওয়া আসা করে না। এমন নয় যে আর্টিস্ট বাস করে গজদন্তের গম্বুজে; দুনিয়া পুড়ে ছারখার হলেও তার বেহালা বাজানো বন্ধ হয় না। বিনু বলে—আমি ভালোবেসেছি। কখনো নারীকে, কখনো শিশুকে, কখনো বন্ধুকে, কখনো অপরিচিতাকে কখনো দেশকে, কখনো বিদেশকে। কখনো আইডিয়াকে, কখনো আইডিয়ালকে। আমি ভালোবেসেছি মানুষকে ও মানুষের পরে প্রকৃতিকে। সেই ভালোবাসা আমাকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছে, হাতে ধরে লিখিয়েছে। আমি তোমার সৌখীন লেখক নই, না লিখলেও যার চলে। অথবা নই পেশাদার লেখক, না লিখলে যার চলে না। যাদের দেখেছি, চিনেছি, ভালোবেসেছি, তাদের কথা লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি, লেখায় প্রাণসঞ্চার করেছি। আমি প্রেমিক লেখক। ধর্ম বা নীতি, জাতীয়তা বা সাম্যবাদ, মনোবিকলন বা জৈব ব্যবহার, সাহিত্যে এদের সকলের স্থান আছে, কেননা জগতে এদের স্থান আছে। আমি ত এমন কথা বলিনি যে, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। আমার তরীতে ঠাঁই দিয়েছি সবাইকে। কিন্তু ভাই, আমার সোনার তরীতে যদি সোনার ধানই না থাকল তবে বাকী সব থেকে হবে কী! ও কি সাহিত্য হবে? যখন বলি আর্ট ফর আর্টস সেক তখন শুধু এই কথাই বলি যে সোনার ধানের জন্যে সোনার তরী। তা বলে অন্য জিনিষকে বাদ দিইনে, ওজন বুঝে জায়গা দিই।

এবার বিনুর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। কাদের জন্যে আর্ট? এই ভেবে বিনু একদা কাতর হয়েছে যে, তার এত পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে, তা শুধু জনকয়েক শিক্ষিত জনের পাতে পড়ছে, জনসাধারণের পাতে পৌঁছাচ্ছে না। ভেবেছে বোধ হয় তার লেখার মধ্যে এমন মাধুরী নেই যার জন্যে জনসাধারণ চাতকের মত তার দিকে তাকিয়ে রইবে। দোষটা তবে কার? এই অপরূপ সমাজব্যবস্থার যা শতকরা সাতজনকে অক্ষর চিনতে শিখিয়েছে, হয়ত একজনকে বই কিম্বা মাসিক কেনবার মত অর্থ দিয়েছে? অথবা বিনুর নিজের? দোষটাকে বিনু নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে মনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছে। যে দেশের সমাজব্যবস্থা এই সেদেশে জন্মিয়ে তার প্রথম কর্তব্য কি নয় দেশকে নতুন সমাজব্যবস্থা দেওয়া? সাহিত্য সৃষ্টির আগে সমাজ ভাঙাগড়া, রাষ্ট্র ভাঙাগড়া? কিন্তু সে যে দেশের সমাজব্যবস্থা এই, সেদেশে জন্মিয়ে লিখবেই বা কবে! যদি লেখে সে কি হবে সাহিত্য, তার মনের মত সাহিত্য? বিনুকে দুঃখের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে হল যে, স্বরাজ অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাহিত্য পারে না। নতুন সমাজ অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাহিত্য পারে না। তার মানে বিনুকে সাহিত্য সৃষ্টি করে যেতেই হবে, যদিও তার পাঠক মাত্র জনকয়েক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। তাকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে এমনভাবে যেন একদিন শিক্ষাবিস্তার হলে সব শ্রেণীর লোক সেই সৃষ্টি উপভোগ করতে পারে। এমন একটা রস সে দিয়ে যাবে যা সমাজবিপ্লবের আগে রাষ্ট্রবিপ্লবের আগে ফুরিয়ে যাবে না। এমন এক অমৃত পরিবেশন করবে যা ইদানীন্তন দেবতারা খেয়ে শেষ করে দেবেন না, যা তথাকথিত দৈত্যদের জন্যে মজুত থাকবে। প্রথম কর্তব্য তা হলে অমৃত মন্থন। অমৃত যখন উঠে আসবে তখন সে বস্তু সকলের জন্যেই আসবে, যদিও আপাততঃ জনকয়েক ভাগ্যবন্ত তার ভোক্তা। বিনু ভাবে, অমৃত কোথায় পাব, কোন্ সাগরে সন্ধান করব তাকে, কোন অতলে তলিয়ে যাব? যদি হলাহল ওঠে, তখন? তখন কী করব, কে তাকে কণ্ঠে ধারণ করবে, কে হবে নীলকণ্ঠ? বিনুর বুকটা দমে যায়, তার সাহস কমে যায়। সে জানে যে জমিদারের অত্যাচার, কলওয়ালার স্বেচ্ছাচার, জাগো কিষাণ মজদুর, ইত্যাদি লিখে শ্রেণীছেঁড়া সাহিত্য পরিবেশন করা কঠিন নয়। কিন্তু জানি

গরম মশলার সঙ্গে মার্ক্‌স্‌ বাটা মিশিয়ে ওকে স্বাদু করতে পারা সহজ। কিন্তু সাহিত্য বলে যদি গণ্য করা হয়, তবে, শ্রেণী সাহিত্য কেন, নিম্নশ্রেণীর সাহিত্য বলেই তা গণ্য হবে।

না, ওসব সহজ কাজ বিনুর নয়, তার জন্যে অন্য রাঁধুনী আছেন। কিন্তু একটা কথা বিনুও উপলব্ধি করল যে অমৃতের সন্ধান যেখানে করবে সে হিমালয় কি পণ্ডি-চেরী নয়, সে জনসাগর। সেই সাগরেই গাহন করতে হবে, নইলে কূলে বসে পাবে বড় জোর শুক্তি, মুক্তা পাবে না। মহামানবের সাগরতীর নয়, সাগরতল। বিনুর কি এত সাহস আছে যে সে ডুব দিতে পারবে? বিনু এই আই-ডিয়াটা নিয়ে মনে মনে খেলা করে। আজ নয়, কাল। কাল নয়, পরশু। এমনি করে তার দিন কাটে, মাস কাটে, বছর কাটে। দশকও কাটল। তবু তার ডুব দেওয়া হয়ে উঠল না। এইখানেই তার ট্র্যাজেডী। সে ভীরু, ভীরু ভয়ানক ভীরু। তবে কাপুরুষ তাকে আমি বলব না, সে পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে জীবনের অনেক পরীক্ষায়। কাপুরুষ নয়, ভীরু সে। সাগরতীরে বসে দিনের আলো অপচয় করল। এখন আসছে আঁধার। শুধু যে তার নিজের জীবনে আঁধার অর্থাৎ পাকা-চুল, তা নয়। দেশের জীবনেও আঁধার, অর্থাৎ অনিশ্চয়তা। ইউরোপের জীবনে ত মহা তমসা, ঘোর বর্বরতা। এই ঘনায়মান সন্ধ্যায় যুগসন্ধ্যায়, যৌবনসন্ধ্যায় বিনুর পাত্রে সুধা কই? কই সেই জীবনসার যা মৃতকেও নব-জীবন দেবে, মুমূর্ষুকে দেবে সঞ্জীবনী আশা?

মুক্তা নেই, আছে গুটিকতক নানা রঙের ঝিনুক। সাগরতীরে সারা বেলা বসে বালুর ঘর গড়েছে আর এইসব কুড়িয়েছে বিনু। সেই বালুর ঘরেও ভাঙন ধরেছে। আর সেই সব ঝিনুকও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। তা হলে বিনু, তুমি করলে কী?

যাক, বিনু হচ্ছে বিনু, সে যা সে তাই। যার যতটুকু দম তার ততটুকু দৌড়। বিনু যে টলস্টয় নয় এর জন্যে আফশোষ করে কী হবে! স্বয়ং টলস্টয় কি ব্যর্থ হননি? সাগরতলে ডুব দিয়ে তিনি কি তুলতে পারলেন অমৃত? জনগণের সঙ্গে বাস করলেন, কিন্তু এক হতে পারলেন কি? জনগণের মন চিনলেন। কিন্তু মন পেলেন কি? তাদের জন্যে কত লিখলেন। তারা পড়ল কি ওসব? এত বড় ট্র্যাজেডী পৃথিবীতে বেশী হয়নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা-গুলিকে তিনি ঘৃণা করে সরিয়ে রাখলেন, কেননা ওতে রয়েছে অভিজাতদের অশুচি জীবন-কথা। শেষ জীবনে প্রায়শ্চিত্ত করে ওসব ত তিনি বিসর্জন দিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের দেশেই এমন দিন এল, যেদিন অভিজাত বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল তাঁর প্রিয়তম জনসমাজ, বিপ্লবী জনসমাজ। গর্কী তাদের আপনার লোক, তাই তাদের সভাকবি। অথচ টলষ্টয়ের তুলনায় গর্কী কত ছোট—কত ছোট তাঁর পরবর্তী কাস্তে হাতুড়ী মার্কা গণসাহিত্যিক! তবে আশার কথা এই যে, দিন ফিরছে। টলস্টয়ের বই আজকাল খুব চলছে রাশিয়ায় এবং সে সব বই যে কেবল তাঁর শেষ জীবনের প্রায়শ্চিত্তের পরে লেখা বই তা নয়, প্রথম বয়সের সেই সব পঙ্কিল জটিল চঞ্চল অলস চিন্তাকুল ভাবালু বীর্যবান সম্ভ্রান্ত সমাজের চিত্র। কারণ কি? কারণ সেগুলিও আর্ট। আর্টের আকর্ষণ দুর্বার।

বিনু নিজেকে টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনা করতে চায় না। টলস্টয়ের ছিল সাহস, বিনয়, বিনুর তা নেই। বরং তুলনা করা চলে চেকভের সঙ্গে তার। চেকভ যে সময়ের কথা লিখতেন, যে সমাজের কথা লিখতেন, যেমন কারুণ্যের সঙ্গে লিখতেন, বিনুর অনেকবার মনে হয়েছে, বিনুও সেই সময়ের কথা, সেই সমাজের কথা, তেমনি কারুণ্যের সঙ্গে লিখছে। আসবে ঝড়, উড়বে ধূলো, কোথায় থাকবে আমাদের এই মধ্যবিত্ত সভ্যতা, এই "Cherry Orchard?" এই যে আমরা আজ সম্মেলন করছি, এমনি কত সম্মেলন হয়ে গেছে চেকভের দেশে, ঝড়ের আগে। সে সমাজও নেই, সে সম্মেলনও নেই, সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি শেষ হয়ে গেছে!

তা বলে অসার্থক হয়নি। ঝড়ও চিরদিন থাকে না, ধূলো মরে যায়। নতুন করে বুর্জোয়া গজায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। রুশ দেশেও তাই হচ্ছে। চেকভ পড়ে উপভোগ করবার মত শিক্ষিত সংস্কৃতি-বান সংবেদনশীল মন আবার সে দেশে বিবর্তিত হবে। তেমনি এদেশেও। কাজেই সত্যিকার সৃষ্টির ব্যর্থতা নেই। ভবভূতির উক্তি উদ্ধার করে শেষ করি—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান প্রতি নৈষ যত্নঃ
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম —তপি সমানধর্মা
কালোহায়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

ভুলুয়া

(৩০৮ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আলোচনা সেই ভুলুয়া একবার আহার খুঁজিবার বা উড়িবার চেষ্টাও করিল না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে "ঠাকুমা" "ঠাকুমা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল ও চক্ষু দিয়া যেন কাহাকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার কোমল ও দুঃখ মিশ্রিত "ঠাকুমা" ধ্বনি শূন্যে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন ভুলুয়ার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি রহিল না। সে শুইয়া পড়িয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল, ঠাকুমা। কেহ সাড়া দিল না, কেহ খবরও লইল না, তাহার ক্ষীণকণ্ঠ বাতাসে মিশিয়া গেল।

সেইদিন রাত্রে হঠাৎ শান্তির ঘুম ভাঙিয়া যাইতে সে শুনিতে পাইল কে যেন "ঠাকুমা, ঠাকুমা" বলিয়া প্রাণপণ চীৎকার করিতেছে। তাহার করুণধ্বনি নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। শান্তি বুঝিল এ ভুলুয়ার চীৎকার। সে মনে মনে বিরক্তভাবে কহিল, মুখপোড়া পাখী রাত্রেও ঘুমতে দেবে না। এমন হারামজাদা পাখী বাপের জন্মেও দেখিনি বাপু।

পরদিন প্রাতঃকালে ঝি আসিয়া শান্তিকে বলিল, ভুলুকে বড়মা বেড়ালে মেরে ফেলেছে। এঃ, কি পালক আর রক্তই না ছড়িয়ে রেখেছে ছাদের ওপর!

শান্তি চুপ করিয়া শুনিল, একবার আহাও বলিল না চোখের জলও ফেলিল না; কেবল বলিল, নোংরাগুলো ধুয়ে দে ঝি, গন্ধ বেরবে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীযুত সত্যব্রত মুখার্জ্জি অসুস্থতানিবন্ধন সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সম্মেলনে তাঁহার নিম্নলিখিত অভিভাষণ পঠিত হয়ঃ—

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আপনারা অদ্যকার সভাতে আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করে যে সম্মান দেখিয়েছেন তা আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অনুভব করছি। সুদূরে বরদায় থাকি; আইন রাজস্বে চাঁদা মাথটের খাতাপত্রের পঙ্কে নিমজ্জিত, আদমসুমারীর খাতা হাতে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি; চেতনা অর্দ্ধলুপ্ত এমন সময় আপনাদের সেক্রেটারীর তার এল—সভাপতি হতে হবে। "কোণের প্রদীপকে জ্যোতিঃ সমুদ্রের" সামনে এনে বললেন 'আলো দাও'।

এ সম্মানের গুরুত্ব অনুভব করছি প্রতি মুহূর্ত্তে যখন থেকে তার পেয়েছি। বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কি তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি চতুর্দ্দিকে অজ্ঞতা। যে ভাষাতে প্রথম কথা বলেছি, যে ভাষার মাধুর্য্য আমার চিন্তাশক্তি, ভাবনা চেতনার সঙ্গে এতদিন জড়িত ছিল তার সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এই "অল্প লইয়া থাকি" বলেই তার প্রতি ভালবাসা আমার অসীম। বাঙ্গলা ভাষাকে যদি অনিচ্ছায় অবহেলা করে থাকি—আর সে অবহেলাটা কতটা অনিচ্ছায় হয় তা প্রবাসী বাঙ্গালীর দরদী হৃদয়ই শুধু বুঝবে—একথা সঙ্গে সঙ্গে জোড় দিয়ে বলব তাকে ভালবেসেছি তেমনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। আমাদের ভাষার অতীত গৌরবময় ভবিষ্যৎ সীমাহীন স্বর্ণোজ্জ্বল দিগন্তে। পঁয়ত্রিশ বৎসর হল দেশ ছেড়েছি। সে প্রবাসের তিক্ততাকে যদি কিছু মধুময় করে দিয়ে থাকে তবে সে বঙ্গভারতীয় বিজয়শঙ্খের উদার আহ্বান। সুখে দুঃখে তার সঙ্গে যোগ রাখার চেষ্টা করছি। নূতন নূতন লেখক, কবিদের নব নব প্রচেষ্টাকে নীরব অভিবাদন জানিয়েছি!

সেই নীরব অভিবাদনকে আজকে গরব করতে গিয়ে ভাষা নেই। তবু যদি ইংরেজীতে বলতে দিতেন তা হলেও হয়তো দু'চারটে কথা নিবেদন করতে পারতুম। ইংরাজীর গলাতে যত ছুরিই লাগাই না কেন, মাতৃহত্যার পাপ তাতে হবে না—ওটা তো আর মাতৃভাষা নয়৷ কিন্তু আপনাদের সেক্রেটারী পরিষ্কার জোরালো মোগলাই কণ্ঠে যখন হুকুম দিলেন বাঙ্গলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই তখন বাধ্য হয়ে সহধর্ম্মিণীর শরণ নিতে হল। আমার অস্পষ্ট আবছায়া চিন্তাধারাকে তিনি আর আমাদের এক পরম বন্ধু ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলী যতদূর সম্ভব চোস্ত করে দিয়েছেন—দোষ ত্রুটি সব তাঁদের, প্রশংসা করবার মত যদি কিছু থাকে তা হলে অতি অবশ্য সেটা আমার প্রাপ্য।

অদ্যকার সভাস্থল জামসেদপুরে নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করছি। এ সহর যদি স্বনামধন্য জামসেদজী টাটার প্রতি স্মরণীয় নামের সঙ্গে জড়িত থাকে, আমাদের ভক্তি অঞ্জলি নিবেদন করি স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসুর স্মৃতির উদ্দেশে। সেই মহান প্রবাসী বাঙ্গালীর গভীর দেশপ্রেম, অচল কর্ত্তব্য জ্ঞানের সঙ্গে যারা পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, আমি নিশ্চয়ই জানি, তাঁরা তাঁর

পূজা স্মৃতিমন্দিরে ম্লান হতে দেবেন না। এই সহরের মানুষের হাতে গড়া প্রদীপমালার চিরন্তন দেয়ালী আজ আকাশের তারার সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছে আর এই প্রদীপের অনেকখানি তৈলরস জুগিয়েছে প্রবাসী বাঙ্গালী। একে গড়ে তোলার জন্য যে সব প্রবাসী বাঙ্গালী এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তার পুরস্কার তাঁরা পেয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের এ অভিযান এখনও শেষ হয়নি। জামসেদপুরে রথ চালনা করে ভবিষ্যতেও তাঁরা তাঁদের অর্জ্জিত কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখবেন।

আপনাদের আলাপ আলোচনার জন্য জামসেদপুরে যে আপনারা সমবেত হয়েছেন তার আরেকটি গূঢ়তর কারণ আছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর নানা রকম কঠিন সমস্যার উর্ব্বর ভূমি বিহার—জামসেদপুর বিহারের নামজাদা সহর। বিহার বঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্মরণাতীত কাল হতে চলে এসেছে। পরীক্ষিৎ জন্মেজয়ের সময় থেকে এই শক্তি পরীক্ষা পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। কিম্বদন্তীর প্রদোষ—অন্ধকার ছেড়ে পরবর্ত্তী যুগে দেখি কখনও মগধ, কখনও বঙ্গ প্রতিবেশীর নগরে দুর্গে জয়ধ্বজা উড়িয়েছে। মগধের মৌর্য্য ও পরকালীন গুপ্তেরা যেমনি বঙ্গে হাজার বৎসর রাজত্ব করেছিল, গৌড়ীয় পালেরা তেমনি তিন শত বৎসরেরও অধিক মগধের উপর রাজদণ্ড চালনা করেছে। মুসলিম যুগে দিল্লীর দীপ্তি বঙ্গের ভালে প্রতিভাত হল—বিহার তখনও বঙ্গের পার্শ্বচর। লর্ড সিংহ বিহারের প্রথম বাঙ্গালী লাট নহেন; শুধু হিন্দুর হিসেব নিলেই দেখা যায় রাজা জানকী রায়, রাজা রাজবল্লভ লর্ড সিংহের বহু পূর্ব্বে বিহারের সুবেদারী করেছেন। এসব ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আমার শুধু এইটুকু প্রমাণ করা যে বঙ্গ বিহার বহুকাল ধরে অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত। বিহার দেশে বাঙ্গালী রবাহূত নয়; বিহার যেন বাঙ্গালীকে বোঝার চেষ্টা করে, সে চেষ্টা যেন ধৈর্য ও শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়।

* * *

প্রবাসী বাঙ্গালী সমস্যা যদি বা বিহারে জটিলতম তার কারণ তার সংখ্যাগুরুত্বে নয়। আসাম প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় আসামে চল্লিশ লক্ষ বাঙ্গালীর বসতি। তারা খাঁটী আসামীর সংখ্যায় দ্বিগুণ। অথচ সংস্কৃতিতে ও নামে আসামে আসামী। আসামবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা যে আদমসুমারীতে অযথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খাঁটি আসামীরা অভিযোগ করেন তা আমার অজানা নয়, কিন্তু মোদ্দা কথা এই যে, বাঙ্গলার বাহিরে আসামেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়ায় তাদের সংখ্যাধিক্য; প্রকৃতপক্ষে এই জেলাগুলি বঙ্গের অঙ্গ বিশেষ; আজ যে তারা নিজ বাসভূমে পরবাসীরূপে পরিচিত—সে বাঙ্গালীর দোষ নয়। বিহারে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৯ লক্ষ অর্থাৎ আসামবাসী বাঙ্গালীর অর্দ্ধেক। অথচ সমস্যা গুরুতর। সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বহুকাল ধরে বিহারী ও বাঙ্গালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, সরকারী, বে-সরকারী চাকুরীতে দু'দল লড়ালড়ি করে, ও এখন দেখতে পাই বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ দূরে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসামে সমস্যা অন্যরূপ ধারণ করেছে। সেখানে প্রবাসী বাঙ্গালীর বেশীর ভাগ মুসলমান, বিহারে প্রবাসী বাঙ্গালীর বেশীর ভাগ হিন্দু। আসামে প্রবাসী বাঙ্গালী দুঃখে-কষ্টে, আশা নিরাশায় তাদের স্বধর্মী আসামী মুসলমানদের সহানুভূতি পায়। তবু মাঝে মাঝে দেখা যায় তাদের বাঙ্গালীর জাত্যাভিমান ধর্ম্ম ছাড়িয়ে উঠে; তার প্রমাণ হালে পাওয়া গেল যখন এক বাঙ্গালী মুসলমান মন্ত্রীপদ ত্যাগ করলেন আসামবাসী বাঙ্গালীর স্বার্থে আঘাত করা হচ্ছে বলে।

এদের পরেই ব্রহ্মদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর সমস্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রবাসীদের সমস্যাতে নানারকম জটিলতা রয়েছে। ১৯৩১ সনের আদমসুমারীতে দেখা যায় বাঙ্গলা ভাষাভাষী ৩৮০,০০০ লোক ব্রহ্মদেশে বসতি করে ঃ অথচ বাঙ্গালী জাতি হিসাবে, চট্টগ্রামবাসীদের নিয়েও, মাত্র ৩২০,০০র কিঞ্চিৎ অধিক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিস্তর বাঙ্গালী এখনও বাংলা বলে কিন্তু জাতি হিসাবে ব্রহ্মদেশী হয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হাজার হাজার আরাকানি

দেশ

মুসলমানদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের জন্ম বাঙালীর ঘরে, এরা বাংলায় দৈনন্দিন কথাবার্তা বলে অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে বাঙালী অথচ জাতি হিসাবে এখন সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশী। আসামের মুসলমানদের মত এদের ধর্ম ইসলাম এবং সামাজিক কার্যকারণ এই সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রাদেশিক ব্যাপারে দুর্বলতর করে তুলেছে। অন্য ভারতবর্ষীয়দের কাছ থেকে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল বাঙালীরা তাতে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় কম মার খায়নি। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একদিন তাদের উচ্চ আসন ছিল; আজ ব্রহ্মদেশী ও অন্যান্য ভারতবাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়ে দ্রুতই পশ্চাতে পড়ে যাচ্ছে। অনেক স্থায়ী বাঙালী—এদের শতকরা প্রায় ৬৫ জন চাষী—ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে বানানো আইন-কানুনের চাপে দিন দিন দুরবস্থার দিকে চলেছে। নবাগতের প্রায় শতকরা ৪০ জন কুলীমজুরের কাজে আছে—এদের দরিদ্রাবস্থার প্রমান এর থেকেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতীয় উগ্রমণ্য চেট্টিরা এদের জোর করে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে তাড়িয়ে রেখেছে। অল্পদিন হল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এক স্বামীজীর 'প্রণবে' লেখা এক প্রবন্ধ পড়লুম। গ্রামে ও অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী যায়গায় উপনিবেশস্থ বাঙালী চাষা ইত্যাদিকে ব্রহ্মদেশীয়. ও এমন কি অন্যান্য ভারতীয়দের হাতে ছোট বড় কত রকম জুলুম গুণ্ডামি বরদাস্ত করতে হয় তার বিশদ বর্ণনা তিনি করেছেন। এসব যায়গায় বেচারী বাঙালী নিরুপায়, দুর্বল এবং দরিদ্র; কোন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানও নেই যে, তার স্বার্থরক্ষা করে।

যুক্তপ্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা ২৭,০০০। দিল্লী ও মধ্য প্রদেশে এদের সংখ্যা আরো কম। অন্যান্য প্রদেশে তাদের সংখ্যা যৎসামান্য। জয়পুরে এক বাঙালী উপনিবেশ বহুকাল ধরে বাস করছে। তাদের বাদ দিলে রাজপুতনায় অল্প বাঙালী আজমীর জাতীয় বড় বড় সহরে বাস করে। সব যায়গাতেই এদের অধিকাংশ হিন্দু; মুসলমানদের সংখ্যা জানা প্রায় অসম্ভব। এ সম্পর্কে বলা উচিত যে, ভারতীয় আদমসুমারীতে ভাষা ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে ফিরিস্তি করা হয়নি বলে তাতে বড় গলদ রয়ে গেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, প্রবাসী বাঙালী মুসলমানের ভাষা হিসাবে যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী। পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে এরা বাস করে, অনায়াসে স্থানীয় পরিবারে বিবাহ করে ও দ্বিতীয় পুরুষেই দেশের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। কিন্তু অন্যান্য প্রবাসী মুসলমানদের তুলনায় প্রবাসী বাঙালী মুসলমানের ভাষার বন্ধন আশ্চর্য রকমে বহুকাল ধরে স্থায়ী থাকে। হালে আমি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিলেত যাই। কেপ্-টাউনে পাঁচটি প্রবাসী বাঙালী মুসলমান পরিবারদের কর্তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এদের সম্পর্ক পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী; এদের পুত্র কন্যারা বহুকাল হ'ল মাতৃভাষা ভুলে গেছে, কিন্তু এই বৃদ্ধেরা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন—মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে বাংলায় কথাবার্তা বলেন, বাংলা বই পড়েন।

প্রবাসী বাঙালীরূপে আমাদের প্রথম কর্তব্য দেশের সম্পর্ক জাগ্রত ও সত্য রাখা। আমাদের বিশেষ সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের প্রথম প্রয়োজন; সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমাদের একাত্মানুভূতিকে জাগ্রত করে পরিবর্ধিত করা। ঐক্যহীনতা আমাদের জাতীয় মজ্জাগত ত্রুটি। এই ত্রুটি অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বাঙালীর ভিতরেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে পশ্চিম ভারতীয় বড় বড় কারবারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমাদের বিস্তর শিখবার আছে। খোজা, বানিয়া, পার্শীদের নানারকম ব্যক্তিগত পরিবারগত ঝগড়া কলহ আছে অথচ কারবারের সময় অথবা অন্য কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হলে এরা কি আশ্চর্য রকমে নিজেদের ক্ষুদ্র, বৃহৎ কলহ ভুলতে পারে। কারবারেই বলুন আর রাজনীতিতেই বলুন, সমাজ সংস্কারেই বলুন আর শিক্ষা বিস্তারেই বলুন, এরা অতি সহজেই নায়কের নেতৃত্ব মানতে জানে, এক হয়ে কাজ করতে পারে।

এসব আমরা যদি সাহস করে গ্রহণ করি তবেই দেখতে পাব দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে দেবার মত সত্যই অনেক কিছু আছে। দুস্তর অভিযানের দুর্দমনীয় ইচ্ছা আমাদিগকে দেশের শান্ত চণ্ডীমণ্ডপের ছায়া থেকে মিত্রহীন এমন কি শত্রুসঙ্কুল ভূমিতে এনে ফেলেছে সাফল্যের সন্ধানে। দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর যে অভিজ্ঞতা অসম্ভব সেই আমাদের জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে দিয়েছে। বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে বহু প্রবাসী বাঙালী রাজপুরুষ রাজনৈতিকরূপে, দক্ষ আইনজ্ঞ হিসাবে ব্যবসা বাণিজ্যে, শিক্ষা প্রচারে, জ্ঞানে দর্শনে, গণ আন্দোলনের নেতৃত্বে কীর্তিমান ও যশস্বী হয়ে গেছেন। প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা পুরুষ—জাতীয় অধিকারের বীরসৈনিক তপস্বী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। সাহিত্য কবিতায় আমাদের মধ্যে বহু স্বনামধন্য পুরুষ হয়ে গেছেন। সঙ্গীতে সূর্যালোকস্নাত প্রভাত বিহঙ্গ অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ গীতিকাব্যে ছন্দনাতোর গুরু দেবেন্দ্র সেন উপন্যাসে ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের ভক্তিমতী শ্যামলহৃদয়া অনুরূপা দেবী প্রতিভা দ্বারা বঙ্গভারতীর অঙ্গনে প্রবাসী বাঙালীর অনির্বাণ প্রদীপ জেলে দিয়েছেন। শুধু জীবিকার্জন আর কোলাহলহীন শান্ত জীবন যাপনের জন্য বাঙালী চিরকাল বাস্তুভিটা ছেড়ে আসেনি। সুকেত, মণ্ডী ও অন্যান্য রাজবংশের স্মৃতিভ্রষ্ট ইতিহাসের কয়েক পাতা পড়লেই বাঙালীর মনে আবার জাগরুক হবে তার বিজয়ী বীরগণের সঙ্কটাভিযানের অপূর্ব সাফল্য। বৃহত্তর বঙ্গের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে চেষ্টা যদি বাঙালী করে তাতে সে সন্ধান পাবে পশ্চিম বাঙলার কলিঙ্গ জাতি কিরূপ গৌরবময় ঔপনিবেশিকরূপে বীরত্ব অর্জন করে গেছেন।

বঙ্গবাণীর মন্দিরদ্বারে প্রবাসী বাঙালীর প্রথম ও প্রধান অর্ঘ্য হবে নানা বর্ণরেখায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার অফুরন্ত আলিম্পন। পৃথিবীর কোন সাহিত্যই সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্যরস বঞ্চিত হয়ে মহান হতে পারে না; অথবা পূর্ব মাহাত্ম্য বজায় রাখতে পারে না। জাতির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রধান বস্তু অভিজ্ঞতার বর্ণ-গন্ধ-রস। বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অপূর্ণতা আজ তার আবেষ্টনীর ক্ষুদ্রতা। বাঙলা সাহিত্যের পড়ুয়া যেমন কম, বিষয় বস্তুতেও তেমনি তার দারিদ্র্য, স্বল্পকাম, অনতিকাঙ্ক্ষ জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর তার সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা—সেই মামুলী মালমশলা দিয়ে তার সাহিত্য গড়া। এই দৈন্যবশতঃ তার সমস্ত সাহিত্যের লাঞ্ছনা আজ নৈরাশ্য। যে জীবনে শুধু পরাজয় রাজনৈতিক দাসত্ব আর ব্যর্থ বিফলতা সেইখানে বিজয়গর্বের পরমানন্দ কি করে আসবে? মহাকবি রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত, অপরিমিত কাব্যরসের মাঝে মাঝেও এই একটানা সুর বারে বারে ধরা পড়ে। তাই বুঝি বর্তমান যুগের বাঙালী কবিরা প্রকাশের প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্যকে ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন প্রদোষের আধা-আলো-অন্ধকারে। ধনীর দরদহীন দয়া—বুদ্ধদেবের ভাষায় 'ঠাণ্ডা দয়া'—জনগণের অর্থহীন প্রশংসাধ্বনি দুহাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে নূতন যুগের কবিরা এক অভিনব উপভাষার সৃষ্টি করেছেন; তাতে আছে কথা ও গানের অর্ধজাগ্রত রূঢ়তা।

"The French adjective 'criard' represents the effects they produce."

এই রোজমেরির লেটরবুকের অন্য এক জায়গায় পাই—

"Gaudy, melodramatic, showy, creating conviction by their unblushing intensity; never winning their way by sweet reasonableness, but forcing us to agree with them at the point of their literary pistols."

প্রতিভাবান তরুণ মুসলিম লেখক আবু সৈয়দ আয়ুব 'আধুনিক বাঙলা কবিতার' উপক্রমণিকায় T. S. Eliot এর একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন,—

"the function of the artist should not be merely to keep the reader's mind diverted much in the same way as a burglar keeps the house dog occupied

with a piece of nice meat, but also to become impatient of 'meaning' which seems superfluous and 'perceive possibilities of intensity through its elimination'—

আবু সৈয়দ এর নাম দিয়েছেন "পলায়নী মনোবৃত্তি"। বাকচাতুর্য বা শব্দের ইন্দ্রজাল, এই "Virtuosi" ভাব (ইউরোপীয় সাহিত্যে এই ভাবের লেখকদের virtuosi বলে) আমাদের অনেক নবীন লেখকের কাব্যসৃষ্টির উচ্চতম স্তরে উঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় এই মনোবৃত্তিকে বাস্তবের উজ্জ্বল প্রশস্তপথে টেনে নিয়ে আসতে হবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথা স্বীকার করি যে, নবীন কবিরা যে আপন হিয়ার চতুর্দিকে অন্তহীন রঙিন জালবোনার অত্যধিক মায়া থেকে সরে গিয়েছেন তার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আমরা যে আশা করছিলুম, তা হয় না, সরে গিয়েও তাঁরা পূর্ণকাম হতে পারলেন না—বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে পারলেন না এবং আবার বলি একমাত্র বৈচিত্র্যেই এই মনোবৃত্তির পরম ওষধি।

এই ওষধি কাদের কাছ থেকে আসবে? দেশের প্রাচীন সভ্যতার জয়ধ্বজা উঁচু করে রেখেও যারা দেশের ঐতিহাসিক গণ্ডি পেরিয়ে এসেছেন সেই প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছ থেকে আসবে সে মৃতসঞ্জীবনী। কত বিচিত্র সমাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়; নূতন নূতন পরিবেষ্টনীর অন্তহীন জীবনশক্তি আমাদের জাগ্রত রাখে, আমাদের প্রাণধারায় রস সঞ্চার করে। আমাদের আশা নিরাশায়, প্রচেষ্টা সফলতায়, আমাদের গানে, স্বপ্নে যে নূতন রঙ্ ফুটে উঠে, যে বিশেষ ধ্বনি স্পন্দিত হয় সেই তো হবে বাঙ্গলা সাহিত্যে আমাদের নৈবেদ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জীবনে ধর্মের অনুভূতির কথা ধরুন। দীপ্তিমান দক্ষিণ ভারতবর্ষের অবদান নৃত্যগানে, পূজোআরতিতে পরিপূর্ণ বৈষ্ণব ধর্মের অনুপ্রেরণা কোন্ বাঙ্গালীকে রোমাঞ্চিত করেনি? সুকুমার কলার কথা ধরুন। কিছুদিন হল এক গুজরাটি নর্তক নটরাজ বশীর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। তাঁর দলের অধিকাংশ নর্তক নর্তকী বাঙ্গলা ও আসামের ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব কথাকলি নাচে। কি দেখলুম? নর্তক পশ্চিম ভারতীয়, সঙ্গীত পূর্বদেশীয়, নাচের রূপ খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয়। আমার মনে পড়ল সেই সনাতন সত্য—ভারতবর্ষে সুকুমার কলা কখনই ক্ষুদ্র প্রাদেশিক গতির ভেতরে ধরা দেয়নি। সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম ও ঐ জাতীয় অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের দৃষ্টান্ত নিন। সনাতন বর্ণ ও জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডির সাহায্য নিয়ে যে সব সঙ্ঘবদ্ধ সংস্কার এখনও করা যায়, প্রবাসী বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সে সব এড়ায়নি। বাঙ্গলাদেশের গ্রাম্য সামাজিক ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেয়েছে। অথচ গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ এখনও গ্রামের প্রাচীন সংগঠন, সমাজ সেবা, মহাজনের ঋণদান, চাষের জলের সুব্যবস্থা ইত্যাদি নানা উপায়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভাষার মধ্যে সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টান্ত ধরুন। যুক্তপ্রদেশ শুধু নামেই যুক্ত—শব্দ ও লিপির অর্থহীন ঝগড়া মারামারি কাটাকাটি করে করে হিন্দি ও উর্দু এক সম্মিলিত সরল গোড়াপত্তন খুঁজছে। যেখানে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রকাশ পাবে। এই সম্মেলনের আলোচনার এক প্রধান বিষয়বস্তু বাঙ্গলা ভাষার এক সর্বসম্মত বা প্রমাণিক রূপ স্থির করা। শিক্ষিত ও গ্রাম্য ভাষায় তফাৎ চিরকালই থাকবে; কিন্তু কোন কোন প্রদেশ যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাটে শিক্ষিত লোকের ভাষা প্রায় এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্গলাতে এরকম ভাষা খুঁজে বের করার অনেক কিছু অন্তরায় এখনও রয়েছে। নানা জেলার নানা উপভাষা, বাঙাল অ-বাঙালের সনাতন খিটিমিটির ফলে দায়ে পড়ে এক রকম অতি ভদ্র ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার সঙ্গে দেশের অপামর জনসাধারণের কোনও যোগ ছিল না। বঙ্কিমের প্রতিভাগুণে এই অতি দরকারী ভাষা কিছু বদলে ঘরোয়া হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ পর্যন্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ঠাঁই পেয়েছিল। তারপর বীরবলী কাটাছাঁটা ভাষা এলো, রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের লেখার ভাষার উপর তাঁর প্রভাব বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই কর্তিতপুচ্ছ ক'লকাতার ভাষার শব্দভাণ্ডার ছিল সংস্কৃতে ভরা। আধুনিক লেখকেরা দেখতে পাই সে ভাণ্ডারের কোনও অদলবদল করেননি। বীরবলী কী'র দীর্ঘ ঈকার একদিন পণ্ডিতদের রোমাঞ্চ করেছিল। আধুনিকেরা শুধু 'কী'টাকে 'কী'তর থেকে 'কী'তম পর্যন্ত key-board-এর শেষ ঘাটে নিয়ে এসেছেন। আমার মনে হয় এ সব ব্যাপারে বুঝে সুঝে পা ফেলা উচিত। সাহিত্য বিভাগের খাসজমিতে যদি একটুখানি পা ফেলার অনুমতি দেন তবে সবিনয়ে বলব, যত হুঁশিয়ার পাঁচমেশালী কমিটিই বানান না কেন, এ সমস্যার সমাধান এঁদের কর্ম নয়, কেবল প্রতিভার হাতে এর রাজদণ্ড।

প্রামাণিক ভাষা সৃষ্টি সম্পর্কে আর একটি নিবেদন আমার আছে। আমাদের সামাজিক জীবন যেন আরও বৈচিত্র্যময় হয়। আজ যে বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গলায় তাদের শাস্ত্রালোচনা করার জন্য ইসলামের ভাণ্ডার থেকে শব্দ চয়ন করছেন তাতে যেন আমরা বাঁধা না দিই। শুধু তাই নয়, বাঙ্গলা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা। তাই বাঙ্গালী মুসলমানের এ চেষ্টা যেন সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করি। উত্তর ভারতবর্ষে একদিন ধর্মালোচনার সুবিধার জন্য মুসলমানেরা আরবী, ফারসী শব্দ দেশজ হিন্দি ভাষায় প্রয়োগ করেছিলেন। হিন্দুরা সেটা বরদাস্ত করেননি বলেই উর্দু, হিন্দি দুই ভাষার সৃষ্টি হয়। আমরা যেন সে ভুল না করি। হিন্দু ও মুসলমান পৃথিবীর দুই মহান্ ধর্ম। এই দুই ধর্মের লোক এত অধিক সংখ্যায় হুবহু এক ভাষায় কথা বলে এমন আশ্চর্য ব্যাপার বাঙ্গলা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথায়ও নেই। এই দুই ধর্ম ও কৃষ্টি মিলিত হবার দেশ বাঙ্গলা। হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি ভারতবর্ষীয় সব ভাষার তুলনায় এ বিষয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরা শব্দ চয়নে যদি ক্ষুদ্র মনের পরিচয় দিই তবে হয়তো মুসলমানেরা উর্দুওয়ালাদের হাতে গিয়ে পড়বে। হিন্দু মুসলমানের মিলিত ভাষা সারা ভারতবর্ষের ঈর্ষার বস্তু। আমরা যেন অবজ্ঞা অবহেলা দিয়ে এ সম্পদ নষ্ট না করি।

শব্দের বৈচিত্র্য যদিও ব্যক্তিত্বের আসবাব কিন্তু বিষয়ের বৈচিত্র্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। তার জন্য দরকার আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উদ্ধার ও প্রচার। কে নাকি বলেছেন বাঙ্গালী সব চাইতে আপন-ভোলা জাত। আমরা অধিকাংশ স্কুলে, কলেজে পড়ে থাকি, কনৌজরাজ শ্রীহর্ষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ইতিহাসের যবনিকা পতন। পাল সম্রাটদের মাহাত্ম্য কে পড়ে? এক কারণ—অবশ্য পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ। আমাদের অতিরিক্ত হিন্দুয়ানী তাদের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার পথে এখনও অন্তরায়। মুসলমান যুগে ভুঁইয়াদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত বাঙ্গালীর ইতিহাস শিক্ষার অংশ হওয়ার দরকার। স্বীকার করি যে, বাঙ্গলার ভেজা আবহাওয়া আমাদের ইতিহাসের বহু উপাদান বিনষ্ট করেছে। কিন্তু তাই একমাত্র সত্য নয়। যা আছে তাই যদি আমরা একটু মন দিয়ে দেখি, তাতে পাই অতীতের কত বিস্ময়জনক কীর্তি; রাজনীতি, সমাজনীতি—এমন কি গণতন্ত্র (গোপালের নির্বাচন স্মরণ করুন)—সামরিক শৌর্যবীর্য, সামুদ্রিক ঔপনিবেশিক অভিযান, কত বিপদআপদে কত বীর, কত কর্মীর কত অদ্ভুত সাহস, চরিত্রবল। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—বাঙ্গলার ভিতরের বাহিরের ঐতিহাসিকেরা মিলিত হয়ে বাঙ্গলার এক প্রামাণিক ইতিহাস লিখুন। অনেক কাজ এ দিকে হচ্ছে এবং কিছুদিন হ'ল, এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আশা করি, গোড়াপত্তন শেষ হয়ে গেছে ও বাঙ্গলার এক সর্বময় সুন্দর ইতিহাস শীঘ্রই আমাদের হাতে এসে পৌঁছিবে। ইতিহাস ছাড়া অন্য এক বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ কাজ প্রবাসী বাঙ্গালীই অতি সুন্দরভাবে করতে পারবে। হায়দরাবাদের শ্রীযুত অমৃতলাল শীল নাকি উর্দু থেকে বাঙ্গলাতে অনেক চমৎকার জিনিষ তর্জমা করেছেন। উর্দু সাহিত্যে বিচিত্র ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; এতদিন ধরে তাই নিয়ে শুধু অর্থহীন কলহ চলছিল

দেশ

কোন হরফে লেখা হবে, আরবী না দেবনাগরী—এখন কি সময় হয় নি, এই বিশাল সাহিত্যের সাহায্যে হিন্দু মুসলমানকে সম্মিলিত করার? প্রবাসী বাজ পক্ষীর সন্ধানী মন এখনও কি উর্দুর সাহিত্যিক আভিজাত্য, উর্দু কবির ধ্যানের উজ্জ্বলতা, বাক্যের সামঞ্জস্য, ছন্দের অতুলনীয় সংযমকে খুঁজে পায় নি? অনেক প্রবাসী বাঙ্গালীকে জানি, যাঁরা উর্দু মাতৃভাষার ন্যায় বলতে পারেন ও উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত। এ'দের প্রধান কাজ হবে বিশেষ করে উর্দুর ও মারাঠির গুজরাটি কবিতা বাঙ্গলাতে অনুবাদ করা। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পরিষদগুলিকে আমন্ত্রণ করে শীঘ্রই এক সমবায় সমিতি গঠন করা উচিত এবং তারই সঙ্গে একদল প্রকাশক আমাদের যোগাড় করা আবশ্যক। যাঁরা যে কোন বিখ্যাত লেখকের যে কোন ভাষায় বই ছাপা হবে, তার অনুবাদ তৎক্ষণাৎ বাঙ্গলায় করতে প্রস্তুত হবেন। এই রকম বন্দোবস্তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাতে করে আমাদের এক রঙা সাহিত্যে নানা রঙের ছোপ লাগবে। নজর দরাজ হবে এবং বিশেষ করে আমাদের স্বদেশস্থায়ী বাঙ্গালীদের হামবড়াই কিছু কমবে।

অনুবাদ ছাড়া আরেকটি জিনিষ উল্লেখ করি। আমার মনে হয়, জ্ঞানের সাহিত্যের সমৃদ্ধি করার জন্য আমাদের বিশেষ করে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন। আমি জানি জ্ঞানের সাহিত্য ও শক্তির সাহিত্যের মধ্যে এক পণ্ডিতি ব্যবধান রয়েছে, কিন্তু এই দু'য়ের পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া কোনটাই বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ এমন কোন শক্তিই হতে পারে না, যে যতই গভীর অথবা অন্তর্মুখী হোক না কেন—যাতে জ্ঞান নেই আর অন্তর্দৃষ্টি যতই আধ্যাত্মিক হউক না কেন, তার ভেতরে যদি মাটির মানুষের নাড়ীর কম্পন না থাকে, তবে তার চরম গতি হবে আধা-আলো-অন্ধকারের শূন্যতায়। আবু সৈয়দের ভাষায় "কাব্যালোক ভরে থাকবে একটি অখণ্ড শূন্যতা।"

আমি আমাদের হামবড়াই বা আত্মতুষ্টি Superiority Complexএর কথা কিছু আগে উল্লেখ করেছি। অদ্যকার দিনে এ রোগের চাইতে মারাত্মক আর কিছুরই কল্পনা আমি করতে পারি না। এক কালে যখন পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ শিক্ষার পশ্চাতে ছিল, তখন হয় তো এর একটা অর্থ বা কারণ ছিল, কিন্তু আজকের দিনে এর চাইতে বড় ভুল, বড় দোষ কিছুই হতে পারে না। আমাদের সম্মুখে দুই কর্ত্তব্য:—একত্রীভূত আত্ম সংগঠন ও যে প্রদেশে ঘর বেঁধেছি, তার প্রকৃত স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলে মেনে নেওয়া। বাঙ্গালী মানে নামাবলী আর দলাদলি—এ খোঁটা যেন আর খেতে না হয়। দলাদলি যে আমাদের কত মজ্জাগত, সে আমাদের দেশের রাজনীতিই আর বারোয়ারী কাজই বলুন, সর্ব্বত্রই দেখতে পাই। যদি নাচে গানে নাম করতে চাই তো আমরা সেটা চাই খোলা আকাশে একমাত্র তারার Stardom. যদি কবিতা লিখি বা পাঁচালী গাই, তবে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় গোপন দলাদলিতে ঢুকে একে অন্যের সর্ব্বনাশ। ইতিহাসের সত্যের সন্ধান নেওয়া—কিন্তু ইতিহাস আমাদের হাতে অস্ত্র হয়েছে পাণ্ডিত্যগর্ব্বে মত্ত হয়ে পরস্পরকে আঘাত করার জন্য। পশ্চিম ও উত্তর ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালী উপনিবেশে ছোট ছোট খোঁচাখুঁচির অন্ত নেই, দলাদলির দুর্গোৎসব আর মারামারির কালীবাড়ীতে ভর্ত্তি। তাই মনে হয়, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি যে, রাজনীতি ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী তার নেতৃত্ব হারিয়েছে; আর সেই দেখে আমাদের এই দুরবস্থায় ভারতবর্ষের অন্য জাতের লোক তাকিয়া ঠেসান দিয়ে মুচকি হাসে।

জাতির সম্মুখে যে সংকট, সে কি এখনও আমাদের চোখ খুলে দেয় নি? আমার বিশ্বাস যে আমরা প্রবাসী বাঙ্গালীরা এই ব্যাপারে পথ দেখাবার শক্তি রাখি। কাজ শক্ত স্বীকার করি কারণ জাতীয় ত্রুটিগুলি আমাদের প্রবাসীদের মধ্যে আরো যেন মারাত্মক দেখায়, তার সংশোধন ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের বাঙ্গলা শিখানোর গোড়াপত্তন অনেক যায়গায় করা হয়েছে। অনেক যায়গায় দেখেছি যে তাদের সামান্য উৎসাহেই অনেক ঝগড়াঝাটি থেমে গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার বন্ধুদ্বয় আহ্‌মেদাবাদের প্রভাস বন্দোপাধ্যায় ও পুণার লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল বিজিতেন্দ্র বসুর নাম উল্লেখ করি। বাংলার বাহিরে যে সব যায়গায় পনর ঘরের অধিক বাঙ্গালী বসতি তাদের নামধাম, ব্যবসা তালিকা (ডিরেক্টরী) প্রস্তুত করা উচিত। সব যায়গায় বাঙ্গালী মুসলমানের সন্ধান ভাল করে নিতে হবে কারণ আমাদের সঙ্ঘ জাতিবর্ণের গণ্ডি ছাড়িয়ে যেন বাংলার সব ছেলেমেয়েকে আপন করে নেয়। ব্যবধান দূর করার জন্য বাঙ্গালী সমাজে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের প্রয়োজন আছে। প্রবাসী বাঙ্গালী যাতে একে অন্যের সঙ্গে প্রায়ই মিলিত হতে পারে, তার জন্য পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা উচিত। এ সম্পর্কে আরো অনেক প্রস্তাব করা যেতে পারে। বাংলা দেশের ভিন্ন বর্ণের বিবাহের কথা শুনলে কর্ত্তারা কানে আঙ্গুল দেন কিন্তু উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের এমন কি বিহার, আসাম ও ব্রহ্মদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যে এ রকম বিবাহ প্রায়ই সহজে হতে পারে। জাতির মজ্জাগত ত্রুটি প্রবাসী বাঙ্গালীর ছোট ছোট উপনিবেশগুলিতে যেমন আরো বড় দেখায় সেই হিসেবে আমাদের সদ্‌গুণরাশিও কি চেষ্টা করলে তেমনি বাড়তে পারে না? আমাদের কল্পনাশক্তি, আদর্শ ও আত্মোৎসর্গ পারিবারিক শান্তির প্রতি শ্রদ্ধা, আমাদের মেয়েদের অনাবিল চরিত্র মাধুর্য্য কি সেই রকম দৃঢ়তর আরো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না?

এক কথায় বলি আমরা যেন পূর্ণতর সর্বাঙ্গীন জীবনের কামনা করি। আমরা সমাজের মঙ্গলে যেন আত্মনিয়োগ করি, আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেন ব্যাপকতর হয়। এতদিন ধরে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি সে শিক্ষা আমাদের জাতি ও সমাজ সেবার জন্য গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের সমস্ত জাতীয় জীবন জুড়ে সে সংকট দেখা দিয়েছে, আমার বিশ্বাস, সে সংকট আমাদের চৈতন্য জাগ্রত করবে ও আমাদের জীবনকে অভিজ্ঞতার সন্ধানে নিয়ে যাবে। ওয়াল্‌টর পেটার ষ্টাডিজ ইন দি রনেসাঁসে বড় সুন্দর বলেছেন Only a counted member of pulses is given to us. আর সেগুলিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে "A quickened, a multiplied consciousness" দিয়ে। সেই পরম সচ্চিদানন্দে যখন আমাদের জীবন প্রদীপ দীপ্যমান হবে তখনই ভারতীয় সভ্যতার সব ব্যর্থতা, বিফলতা, অপূর্ণতা আমাদের চোখে ধরা পড়বে। এই আধ্যাত্মিক শক্তির লীলাভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ ধরা পড়বে। এই আধ্যাত্মিক শক্তির লীলাভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ লোক সংগ্রহের আহ্বান করেছিলেন, আজ আমাদের জাতীয় সংকটের দিনে আমাদের সেই সনাতন গুরুর পতাকার নীচে সম্মিলিত হব; তিনি আমাদের নেতৃত্ব করবেন আমাদের মৃতজীবনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে বর্ত্তমানের দুঃখ কষ্ট, ভয় নৈরাশ্যে বিভীষিকা থেকে আমাদের উদ্ধার করে ভবিষ্যতে নব নির্ম্মিত সমাজের দিকে নিয়ে চলবেন। আর্থিক, সামাজিক দ্বন্দ্বকলহের অবসান হবে, আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর পূর্ণাঙ্গ সমাজে ধন-সম্পদে, আচার ব্যবহারে আপনার প্রকৃত স্থান পাবে। সহানুভূতি আর সত্য জ্ঞানালোকের সাহায্যে বৃহৎ জনস্বার্থে ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করে আপনা স্থান চিনে নিবে।

"Just as in that multitudious diversity which is the universe, powers and dominions and elements are balanced and reshaped in harmony by the Shepherd of the Ages."
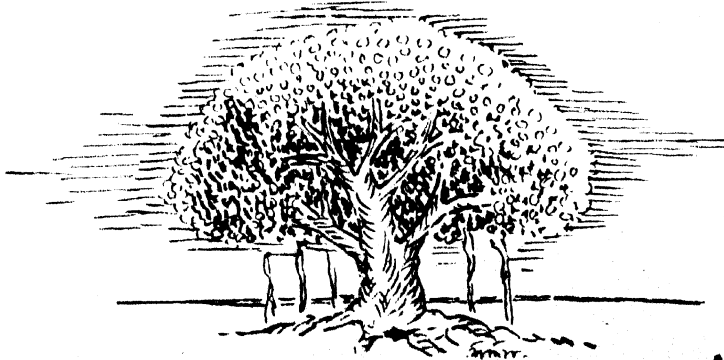
মহিলা শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ

(জামশেদপুর অধিবেশন)

শ্রীকুমুদিনী বসু

ভগিনীগণ, আমি কিন্তু এই সাহিত্য মন্দিরের একজন দীনাহীনা পূজারিণী মাত্র ; ভক্তি শ্রদ্ধা লইয়া কেবল পূজার অর্ঘ্য দিতে পারি মাত্র। মন্দিরকে শোভা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করা, তাহার গৌরব বৃদ্ধি করার ভার জ্ঞানী গুণীদিগের উপর। আমার কাজ শুধু পূজা করা। আমি সাহিত্যের কিছুই বুঝি না। তাই, আপনাদিগকে কোন গবেষণামূলক তথ্য বলিতে পারিব না, শব্দসম্পদপূর্ণ কোন অভিজ্ঞান শুনাইতে পারিব না, কোন অলংকারের ঝংকারে আপনাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিব না। আমি শুধু জানি, সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের বার্ত্তা যাহা বহন করে তাহাই সাহিত্য। আর যে সাহিত্য তাহা বহন করে না, যে সাহিত্য মহত্ত্ব দেবত্বে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে না, তাহা সাহিত্য নামের অপভ্রংশ মাত্র, তাহা সাহিত্য নহে।

প্রত্যেক দেশের কৃষ্টি, সাধনা ও আদর্শে যেমন স্বতন্ত্র্য তেমনি মূল ভাবগুলির মধ্যে একত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের এই ভারতের কৃষ্টি, সাধনা ও আদর্শ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে সমস্ত জগতের সহিত এক।

কিন্তু প্রত্যেক দেশ ও জাতির আদর্শ, কৃষ্টি ও সাধনা বিভিন্ন। ভারতের ঋষি-মুনিগণ যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মকে করতলগত আমলকবৎ করিয়াছিলেন, জগতের অন্যান্য দেশের তপস্বী সাধকগণের সাধনা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ভারতের সামাজিক আদর্শ, নারীত্বের আদর্শ, গৃহ পরিবারের আদর্শ, পাশ্চাত্য আদর্শ হইতে একেবারে ভিন্ন। ভারতের কৃষ্টি ভারতেরই নিজস্ব। সমগ্র জগতের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, যাহা মঙ্গল, তাহা আত্মস্থ করিয়া প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজেদের ধারা বাহিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতেছে এবং উন্নতিলাভ করিয়াছে।

এই সাধনা, কৃষ্টি ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে সেই দেশের সাহিত্যে। দেশের সাহিত্যের ধারা উপলব্ধি করিলেই সেই দেশের ও জাতির সাধনা, কৃষ্টি ও আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভারতের সাহিত্যে ভারতের সাধনা, কৃষ্টি ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়া ভারতীয়দিগকে এক অমৃত-লোকের দিকে লইয়া গিয়াছে এবং জগদ্বাসীকেও মহত্ত্ব ও দেবত্বের মহাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আজ কি ভারতের এবং বাঙ্গলার সাহিত্য পাশ্চাত্যের Back washএ কলঙ্কিত হইবে? সমুদ্রের Back wash যেখানে আসিয়া পড়ে সেস্থান যেমন কলঙ্কিত ও দুর্গন্ধময়, আজ কি বাঙ্গলার সাহিত্য ঐ Back wash দ্বারা কলঙ্কিত হইবে? ভারতের সেই সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের সাধনা ও আদর্শ কি পাশ্চাত্যের Back wash দ্বারা বিনষ্টপ্রাপ্ত হইবে?

নারী জননী, ধাত্রী, পালয়িত্রী। সমাজ, গৃহ-পরিবার, সন্তানকে ধারণ পোষণ, পালন রক্ষা করা তাঁহাদেরই কাজ। সমাজ, গৃহ-পরিবার, সন্তানকে সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ অমঙ্গল হইতে বাঁচান তাঁহাদের প্রধান কাজ। এ দেশের সাধারণ সামাজিক নিয়মে পুরুষ অর্জ্জন করিয়া আনিয়াছে, নারী সেই অর্জ্জিত ধন সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। সমাজ, গৃহ-পরিবার, সন্তানের নীতি, ধর্ম্ম রক্ষা করা, সন্তানের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের উন্মেষ করিয়া দেওয়া নারীরই হাতে, দেশের সাহিত্য জাতি গঠনের একটি প্রধান উপাদান, মানুষ তৈরীর একটি প্রধান সহায়। মানবকে মহত্ত্বে দেবত্বে অনুপ্রাণিত করিবার, মানবকে শৌর্য্যে বীর্য্যে

উদ্দীপ্ত করিবার, মানবকে অমৃতের পথে লইয়া যাইবার প্রধান উপাদান সাহিত্য। সেই সাহিত্য যদি আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া কলুষিত হয়, পাশ্চাত্যের Back wash দ্বারা পূতিগন্ধময় হয়, তবে জাতির মেরুদণ্ড যে ভাঙ্গিয়া যাইবে, জাতির দাঁড়াইবার ভিত্তি-ভূমি যে ভাঙ্গিয়া যাইবে?

ভগিনীগণ, সম্মার্জ্জনী আমাদেরই হাতের জিনিষ। আমরা এই সম্মার্জ্জনী দ্বারা যেমন গৃহকে সুন্দর, নির্ম্মল, উজ্জ্বল করি তেমনি ইহা আমাদের হাতের একটি অস্ত্রও বটে। সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য মা অগ্নিতে ঝাঁপ দেন, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করেন, উদ্যতফণা বিষধরের করাল ফণা চাপিয়া পিষিয়া দেন। তাই বলিতেছি, যখন দেখিব সাহিত্য কলুষিত হইয়া যাইতেছে তখনই বুঝিব ভীষণ বিপদ সমাগত, সন্তানের মেরুদণ্ড এইবার ভাঙ্গিবে; তখনি সমগ্র নারী সমাজ কি মহাশক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া, এক লক্ষ্য এক প্রাণ হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া দেশের সাহিত্য হইতে সকল প্রকার কলুষ, হীনতার আদর্শ, পশুভাব দূর করিয়া দিবার জন্য সম্মার্জ্জনী চালাইবে না? নারী যদি সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ সজাগ না থাকে, নারীও যদি ঘুমাইয়া পড়ে, নারীও যদি সাহিত্যের কলুষও সমর্থন করে, নারীও যদি স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তবে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। নারী যদি তাহার নারীত্বের ধর্ম্ম পালন করে, তবে পুরুষও তাহার পুরুষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

ভারতের সাধনা, কৃষ্টি ও আদর্শের ধারা উদ্দীপ্ত করিয়া রাখা, সন্তানের মধ্যে তাহার বীজ অংকুরিত করিয়া দেওয়া, দেশের সাহিত্য, আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পবিত্র, শুদ্ধ নির্ম্মল করিয়া রাখা নারীর হাতে। আজ যে দেশের চারিদিকে কলুষিত সাহিত্যের ছড়াছড়ি দেখিতেছি, আজ যে কলুষিত চিত্রের সমাদর দেখিতেছি, আজ যে দেশের সর্ব্বত্র ভারতের সামাজিক আদর্শ, নীতি-ধর্ম্মের আদর্শ বিধ্বস্ত হইতে দেখিতেছি তাহা আমাদেরই—নারী সমাজেরই, মায়েদেরই অবহেলার ফল। আমরা সন্তানের বিপদের গুরুত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। যদি বুঝিতাম ইহাতে সন্তানের সুতরাং জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য তবে কি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া দেশকে সকল প্রকার কলুষতা হইতে বাঁচাইবার জন্য উদ্যত হইতাম না?

আমরা কি ভারত নারীর ধর্ম্মের আদর্শ, জ্ঞানের আদর্শ নারীত্বের আদর্শ ভুলিতে চলিয়াছি? আমরা কি গার্গীর ব্রহ্মজ্ঞান, মৈত্রেয়ীর অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষার মহাবাণী, লীলাবতী ও খনার পাণ্ডিত্য, মাদালসার ধর্ম্মপ্রাণতা, সুলভা, অরুন্ধতী, অনসূয়ার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুরাগের কথা ভুলিয়া গিয়াছি? ভারতের তাপসগণ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পানে বিভোর হইয়া যে উপনিষদামৃত আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মহান সাহিত্যকে কি ভুলিয়া গিয়াছি? ভরতের সেই মহা-সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত—যাহা ভারতের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সাধনা, মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব, নারীত্বের সুষমা, নরের শৌর্য্যবীর্য্যের ছবি এ দেশের মর্ম্মে মর্ম্মে, ধমনীতে ধমনীতে, অস্থিমজ্জায় দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়া-ছিল, যে মহাসাহিত্যের এইসব মহত্ত্ব দেবত্বের ছাপে আমাদের জাতির চরিত্রকে এমন সুদৃঢ় বাঁধনে বাঁধিয়াছিল যে, আজ প্রায় সহস্র বৎসরের বৈদেশিক বিপ্লবে কত শত বৎসরের অত্যাচারের চাপেও সেই সুদৃঢ় ভিত্তিকে টলাইতে পারে নাই। ভারতের সাহিত্য ঘোষণা করিয়াছে "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মাগধঃ কস্য সিদ্ধনম্"। সে সাহিত্য যদি ভুলিয়া যাই তবে বাঁচিব কি লইয়া?

ঋষি যাজ্ঞবল্কের সম্পত্তি বিভাগের সময়

মৈত্রেয়ীর অমরবাণী "যাহা লইয়া আমি অমর হইব না তাহা লইয়া আমি কি করিব?" যে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা শাশ্বত চির নবীন, তাহা মানবের আত্মাকে যুগ যুগ ধরিয়া সেই অমৃত লোকের দিকেই লইয়া যাইবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর অমর বাণীমণ্ডিত সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিতে কি আমরা ভুলিতে চলিয়াছি?

বৌদ্ধ যুগের থেরী গাঁথাগুলি যে শাশ্বত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অনাদিকাল ধরিয়া মানবের চিত্তকে সুধা ধারায় আপ্লুত করিবে। আমরা কি এখন সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের কথা ভুলিয়া থাকিব?

মনুসংহিতায় সমাজে, গৃহপরিবারে মনু নারীর যে উচ্চ আসনের আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা চিরদিন মানব সমাজকে বিপথ হইতে ফিরিয়া আসিবার শুভ প্রেরণা প্রদান করিবে। মনু বলিয়া গিয়াছেন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" যে গৃহে, যে পরিবারে, যে সমাজে নারীরা পূজা প্রাপ্ত হন সেই গৃহে, সেই পরিবারে, সেই সমাজে দেবতা বিরাজ করেন। পৃথিবীর কোন্ দেশের কোন্ জাতির সাহিত্যে নারীর উচ্চ সম্মানের কথা ইহা অপেক্ষা অধিক উন্নতভাবে ব্যক্ত আছে?

সেই অন্ধকার যুগে নারী যখন পদদলিত, অবহেলিত তৈজসপত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হইত, যখন স্বামীর চিতায় পত্নীকে বাঁশ চাপিয়া মারি দেশবাসী উৎফুল্ল হইয়া জয়ঢাক বাজাইয়া ধর্ম্ম করিলাম ভাবিয়া উল্লসিত হইত, তখন দুঃখিনী নারীর দরদী বন্ধু মহামানব রামমোহন যে অমর ভাষায় নারীর পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভবও গ্রহণ করিতে না পারে তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছেন। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন। মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে অস্থির অন্তঃকরণ কহিয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন যে, তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।"

মহামানব রামমোহনের এই দরদ ঢালা ভাষা যে মনোহর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী মহিলাগণ যেন স্মরণ রাখেন।

কবি রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে কে পরিবে পায়?" কবি হেমচন্দ্রের "বাজারে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত শুধুই ঘুমিয়ে রয়।" অনাদিকাল ধরিয়া প্রত্যেক অবসাদগ্রস্ত প্রাণে স্বদেশ প্রেমের বহ্নি জ্বালাইয়া তুলিবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মনের ভগবদ্ সঙ্গীতগুলি শোকতাপীর চিত্তে অমৃত বর্ষণ করে, ঈশ্বরবিমুখীন মনকে ঈশ্বরমুখীন করে, নরনারীর প্রাণকে সুধাধারায় সিক্ত করে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক গীতিগুলি নিরাশায়, হতাশায় জর্জ্জরিত দেশবাসীকে জাগাইয়া মাতাইয়া তোলে। তাঁহার শান্তি-নিকেতন শীর্ষক উপদেশাবলী চিরদিন মানবের প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাবলী যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালীকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিবে। কবি কামিনী রায়ের অমর গীতি "পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি আপনার ধন সকলি দাও, এর মত সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথা ভুলিয়া যাও"—চিরদিন মানবকে পরার্থে আত্মনিয়োগে উদ্দীপিত করিবে।

এই সব মনীষী ও মনস্বিনীগণ যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই অমর সাহিত্য, তাহাই মানবসমাজের সকল প্রকার কল্যাণের পথপ্রদর্শক, বিভ্রান্ত মানবের আলোক-স্তম্ভ।

আজ আমরা এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলা মায়ের পুত্রকন্যাগণ সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায়, বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির পরিকল্পনায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণায়, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি প্রচেষ্টায় যে চেষ্টাই করিতেছি তাহা এমনি সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে, যেন তাহা দেশের পুত্রকন্যাদিগকে পাপ তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিয়োজিত হইবে, তাহাদিগকে অত্যাচার, অপমান হইতে রক্ষা করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার কাজে লাগিবে, দুঃখতাপক্লিষ্ট মানুষকে শ্রেষ্ঠ পথে লইয়া যাইবে, মরণ ভয়ে কাতর সন্তানকে অমৃতের আস্বাদন করাইবে।

আজ আমাদের সুজলা সুফলা বাঙ্গলা দেশ নানা অত্যাচার অবিচারে সন্তপ্ত, বাঙ্গলার মাতৃজাতি আজ অপমানে, লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত। উপযুক্ত শিক্ষা বিহনে আজ বাঙ্গলার নারীসমাজ, মৃতপ্রায়। সহরে জনকতক এম এ, পি আর এস, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট দেখিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই আমাদের দেশে এখনও শতকরা তিনজন নারী লিখিতে পড়িতে পারে। নারীদের অজ্ঞতা, পরমুখাপেক্ষিতা, শুধু দুটি অন্নের জন্য পরের কৃপার উপর নির্ভর তাহাদের একান্ত অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া আজ বাঙ্গলার দুর্ব্বৃত্তগণ নারীর মান নারীর মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম নষ্ট করিতে তাহাদের লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে বাঙ্গলার গ্রামের অসহায়া, দৈন্যে প্রপীড়িত অজ্ঞ নারীদের লইয়া দুর্ব্বৃত্তগণ দলপুষ্ট করিয়া আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিতে আমাদের 'নারী রক্ষা সমিতি'র নিকট এই সব লাঞ্ছিতা নারীর করুণ কাহিনী সর্ব্বদাই আসিয়া পৌঁছিতেছে। ভগ্নীগণ, যে সব অভাগিনীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আপনাদের বলিয়া সাহিত্য সম্মিলনীর মধুরতা নষ্ট করিতে চাই না। তবে আপনাদের নিকট এই অনুরোধ আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও যে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যত্নশীল, বাঙ্গলাকে ভোলেন নাই, সেইজন্য বাঙ্গলার এই সব পতিতাদেরও স্মরণ রাখিবেন। কিরূপে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে পারা যায় তাহা চিন্তা করিবেন এবং তাহাদের রক্ষা করিতে সাহায্য করিবেন।

আজ বাঙ্গলার রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন। কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ, নেতাদের মধ্যে কলহ ও গালাগালি। তেমনি শাসনকর্ত্তাদিগের অন্যায় অত্যাচারমূলক আইনের পেষণে দেশবাসী ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত।

দেশের এরূপ শোচনীয় অবস্থায় দেশকে রক্ষা করিতে হইলে নারীদের অগ্রণী হইতে হইবে, নারীকে তপস্যায় নিমগ্ন হইতে হইবে। কলুষিত সাহিত্য, কলুষিত চিত্র, মনোমুগ্ধকর নারীনৃত্য, অশোভনীয় সিনেমা, ঘৃণ্য থিয়েটারের লঘু আমোদপ্রমোদ হইতে সন্তানকে, দেশকে, জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। শত শত বৎসরের পরাধীনতার চাপে পিষ্ট হইয়া এ জাতি নিবীর্য্য, নিস্পন্দ, অসাড় হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কি আমোদপ্রমোদে দিন কাটাইবার সময়? এই নিবীর্য্য জাতের কি নারীনৃত্যে মুগ্ধ হইয়া আমোদে মত্ত হওয়া উচিত? পরাধীন জাতের আমোদপ্রমোদ শোভা পায় না। সন্তানের মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী এই সব ভীষণ বিপদ হইতে জননী ব্যতীত আর কে তাহাকে রক্ষা করিবে? এখন চাই স্পার্টান জননীদের ন্যায় জননী।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

স্থানীয় বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমি াপনাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ ভিবাদন জানাইতেছি। ভারতবর্ষের সুদূর ও বভিন্ন অংশ হইতে আজ আপনারা ভাষামাতৃকার সবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। সুতরাং াপনারা আমাদের পূজনীয়, কিন্তু আপনাদের মত পণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী, ও দেশবরেণ্য অতিথি-গকে যথাযোগ্য সমাদর করিবার সামর্থ্য আমাদের াই। বিশেষতঃ এখানকার অধিকাংশ বাঙ্গালীই ামার মত শ্রমজীবী মাত্র। সেইজন্য আশঙ্কা য় যে, বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও ামাজিকতায় অনভ্যস্ত আমাদের পক্ষে আপনাদের ত সম্মানীয় ব্যক্তিগণের উপযুক্ত সমাদর ও ত্রের ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ুতএব আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ নুরোধ যে, আমাদের বহুবিধ ত্রুটী বিচ্যুতি াপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। কান্ত আন্তরিকতার সম্পদ ব্যতীত সত্যই ামাদের আর কোন সম্বল নাই, সুতরাং শুধু ন্তরের অকপট প্রীতি এবং শ্রদ্ধা দ্বারাই আমরা াপনাদের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতে চেষ্টা রিব।

আজ এখানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মাগত প্রতিনিধিবর্গকে দেখিয়া আমার বহুদিন ূর্ব্বেকার একটা গানের একটা পদ বারম্বার মনে ড়িতেছে "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।" দিন সিংভূম ও মানভূম জেলা চিরদিনই বাঙ্গলা-দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস বং কোন অজ্ঞাত রাজনৈতিক কারণে শুধু খনীর একটিমাত্র রেখাপাতে আমাদিগকে সহসা ঙ্গালাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবাসী করিয়া ওয়া হইয়াছে। তাই আমরাও আজ নিজ বাস-মে প্রবাসী এবং সেইজনাই বোধ হয় প্রবাসের ঃখ আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহনীয় হইয়া ঠিয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের না সকল প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা াজের ঘরে প্রবাসী বাঙ্গালী আমরা অনেক ধিক দুর্ভোগ সহ্য করিতেছি। বিহারের বাঙ্গালীর র্দ্দশা আজ সর্ব্বজনবিদিত। কংগ্রেস মন্ত্রি-ভার শাসনকালে বিহারে বাঙ্গালীর উপর যে প্রত্যাশিত অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা ই প্রদেশের শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী নেতা মাননীয় যুক্ত পি আর দাশ মহাশয় মহাত্মা গান্ধী ও ংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট সবিশেষ জ্ঞাত রিয়াছিলেন। তাহার ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হারের দেশকর্ম্মী নেতা পরম শ্রদ্ধেয় ঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে নুরোধ করেন এবং অভিযোগগুলি সত্য হইলে হার ন্যায্য প্রতিকার করিবার জন্য তাঁহার পর সকল ভার অর্পণ করেন। এই তদন্তের ফলে যুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নুকূলেই তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন; কিন্তু শ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের নুরোধ সত্ত্বেও কংগ্রেস পরিচালিত বিহার র্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর প্রতিকূলে যে সমস্ত আইন-নুন প্রচলিত ছিল, তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন রেন নাই। এই অবিচারের ফলে আজ আমাদের ক্ষা, দীক্ষা ও জীবিকা উপার্জ্জনের পথ অতি-া সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে,* এমন কি দুঃস্থ ও পীড়িত বাঙ্গালীর হাসপাতালে প্রবেশাধিকারও অন্যায়রূপে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের এই দুঃখের তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া আপনাদের আর মনোকষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু আমরা আশা করি যে, বিহারের অত্যাচারিত বাঙ্গালীরা তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশায় আপনা-দের সমবেদনা ও সহানুভূতি লাভে কখনই বঞ্চিত হইবে না।

আজ যেখানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের আয়োজন হইয়াছে, সেই জামসেদপুর সহরটি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত খুব প্রাচীন বা পুরাতন জনপদ নয়, এমন কি মাত্র ১৯০৭ সালের পূর্ব্বে ইহার কোন অস্তিত্বই
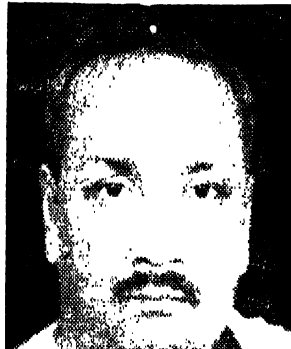
ছিল না। সুতরাং বর্ত্তমান শিল্প ও যন্ত্র সভ্যতার নবতম সৃষ্টি এই জামসেদপুরের কোন প্রাচীন গৌরব বা অগৌরবের কোন ইতিহাস নাই। কিন্তু জামসেদপুর সহরটি নূতন হইলেও ছোট-নাগপুরের যে অঞ্চলে ইহা অবস্থিত, সেই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের কোন প্রমাণাভাব নাই। সিংভূম, মানভূম, ধলভূম, ঘাটশীলা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলির কোন সুসংবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু স্থানীয় কিম্বদন্তী ও প্রচলিত লোক সাহিত্যের মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণ ঐতি-হাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সম্পদ নিহিত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার ইতিহাসের জ্ঞান অতি সামান্য; সুতরাং এতদঞ্চলের সহিত ভারতবর্ষের অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের কোন অজ্ঞাত অধ্যায় কিভাবে জড়িত আছে, তাহার সম্যক পরিচয় আমি আপনাদের দিতে পারিব না, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, বহু প্রাচীনকালেও এই সকল স্থান ভারতের আদিম অধিবাসিগণের বাসভূমি ছিল। অনুন খৃঃ পূঃ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই অঞ্চলে মনুষ্যের বসবাস ছিল এবং সেই প্রাচীন অধিবাসিগণকে কিরাত বলা হইত। এই কিরাত জাতি যে একেবারে অসভ্য ছিল না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ তাহারা তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাষণের উপায় ও পদ্ধতি সবিশেষ জ্ঞাত ছিল। জামসেদপুরের নিকটবর্ত্তী তাম্র খনিতে উপস্থিত যাহারা কার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহারা এইরূপ বহু চিহ্ন এবং প্রমাণ পাইয়াছেন যাহাতে বুঝা যায় যে, বহু প্রাচীন কালেও এইসব খনিতে কিছু কিছু কাজ হইয়াছিল। যদিও ধাতুবিদ্যায় আজ ভারতবর্ষ জগতের অন্যান্য জাতি সমূহের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তবুও বৈজ্ঞানিকগণ একথা স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর মধ্যেই ভারতীয়গণই ধাতুবিদ্যার প্রথম পথ-প্রদর্শক। এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসিগণের ধাতু বিদ্যার পারদর্শিতার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, দিল্লীর কুতব মিনারের নিকট যে অপূর্ব্ব লৌহস্তম্ভ আছে তাহা এই বাঙ্গলার লোহকার-দেরই কীর্ত্তি। প্রাচীন হিন্দুদিগের লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি যে বহু পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা আমাদের সামান্য গৌরবের কথা নয় এবং আমার মনে হয় যে, এ সম্মান এ স্থানের প্রাচীন অধিবাসিগণেরই প্রাপ্য। পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতের এই প্রাচীন ধাতুবিদ্‌গণের কর্ম্মভূমিতেই আবার ১৯০৭ সালে নব ভারতের বিরাট লৌহ কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ ভারতবর্ষকে পৃথিবীর লৌহ শিল্পের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে।

জামসেদপুরের সম্বন্ধে, কোন কথা বলিতে গেলেই যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়া এই নূতন জনপদটি গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং যাহা হইতে ইহার জন্ম, কর্ম, এবং নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়াছে সেই টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কথা কিছু না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, এই বিরাট লৌহকারখানাটির প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধির মূলে বাঙ্গালীর দান কতখানি। বঙ্গের সুসন্তান স্বর্গীয় পি এন বসু মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে আজ এই প্রতিষ্ঠানটি এখানে এভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না।

কিন্তু এই লৌহ শিল্পের বিরাট প্রতিষ্ঠানটিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের সহায়তা খুব মূল্যবান হইলেও তাহাই একমাত্র বাঙ্গালীর অবদান নহে। বাংলা দেশ হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি চিরদিন বহুবিধ ভাবে ইহার পুষ্টিলাভের অনুকূল রস সঞ্চয় করিতেছে। অর্থই শিল্পের শক্তি, এবং এই শিল্পটির প্রথম প্রতিষ্ঠার যুগে ইহার আর্থিক শক্তি সঞ্চয়ের দিক দিয়াও বাঙ্গালী ইহাকে কম সাহায্য করে নাই। এমন কি, একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন না হইলে ভারতের এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি, কিছুই সম্ভব হইত না। সে সময়ে বাঙ্গালীর এই যুগপ্রবর্ত্তনকারী আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারত-বর্ষে যে দেশপ্রীতি ও জাতীয় শিল্পানুরাগের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থ, শক্তি ও সহানুভূতি দিয়া ইহাকে সকল প্রকার ক্ষতি ও সর্ব্বনাশের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের নিকট যে এই প্রতিষ্ঠানটি কতখানি ঋণী, তাহা ইহার জন্ম এবং শৈশবের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বিশেষরূপে বুঝা যাইবে। স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে ময়ূরভঞ্জের খনি নির্ব্বাচন করিবার পর কারখানা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত অর্থসংগ্রহের সমস্যা

আসিল। টাটারা প্রথমে স্থির করিয়াছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিবার জন্য লণ্ডন হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে লণ্ডন হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া লৌহখনি পরিদর্শন করান হইল, বিশেষজ্ঞরাও এই খনি সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিলাতের ধনিকবর্গ টাটার এই পরিকল্পনাকে খুব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন না। ইহার পরবর্তী ঘটনাগুলি আমি পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরেজ লেখকটির পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এই পরিকল্পনায় আবার বাধা পড়িল। কারখানার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক কার্য্যতালিকা ইতিপূর্ব্বেই লণ্ডনের ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহাতে নানাবিধ অসুবিধা উপস্থিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানটির উপর বিলাতী অংশীদারগণের কতখানি আধিপত্য থাকিবে, তাহা লইয়া মতভেদ দেখা দিল। এমন কি, এই শিল্পটির উপর টাটার কোন কর্তৃত্বই যাহাতে না থাকে, এইরূপ একটি মনোভাব দেখা যাইতে লাগিল। ততোধিক বিপদ হইল এই যে লণ্ডনের টাকার বাজার টাটার এই পরিকল্পনাতে বিন্দুমাত্রও সাড়া দিল না। বিলাতের ধনিক সম্প্রদায় চীন বা পাটাগোনিয়া বা টিম্বাকটুতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের জন্য সর্ব্বদা টাকা ঢালিতে প্রস্তুত; কিন্তু ভারতবর্ষে পরিকল্পিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে টাকা দিতে তাঁহারা চিরদিনই অত্যন্ত অনিচ্ছুক।"

"এইরূপ নানাপ্রকার অপ্রত্যাশিত বাধাবিঘ্নের ফলে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্যার দোরাব টাটা ও মিঃ পাদশা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে বৎসরাধিককাল ধরিয়া এই বিষয়ে বিলাতে আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল লাভ হইল না।

"ইত্যবসরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ইহাই স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য ভারতীয়গণের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই সময়ে এই আন্দোলন অতি প্রবলভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই স্বদেশী শিল্পগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল উঠিয়াছিল। এই সময়ে স্যার দোরাব টাটা ও মিঃ পাদশা, মিঃ বিলমোরিয়ার সহযোগিতায়, ভারতবাসিগণের নিকট এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক আবেদনপত্র প্রচার করিলেন। এই আবেদনের উত্তরে যে সাড়া পাওয়া গেল তাহা অপ্রত্যাশিত। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী টাকা দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে কারখানা স্থাপনের উপযোগী প্রায় আড়াই কোটি টাকা সংগৃহীত হইল। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত টাটার বোম্বাই-স্থিত অফিসে টাটার অংশ ক্রয়েচ্ছু লোকের ভিড় লাগিয়া থাকিত।" এই ভাবে অর্থ সংগৃহীত হইবার পর ১৯০৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই কারখানার কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়।

পরলোকগত রায় বাহাদুর ডাঃ শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী, এই কারখানা এবং সহরের প্রধান চিকিৎসকরূপে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এই সহরের দাতব্য ঔষধ ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা। এই জামসেদপুর সহরটিতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস। এইরূপ জনবহুল স্থানে দাতব্য চিকিৎসার সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করা এবং সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

আমি সাহিত্যিক না হইলেও বাঙ্গালী, সুতরাং সেই হিসাবে আমি আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে এখানে দু একটি কথা বলিতে চাই। আশা করি, আপনারা কেহ ইহাকে আমার পক্ষে নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে করিবেন না। সাহিত্যই জাতির প্রাণ ও তাহার সঞ্জীবন মন্ত্র। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা এবং স্বপ্ন ও নিরাশাগুলি আত্ম প্রকাশ করে। আবার সাহিত্যই জাতিকে উদার আদর্শ ও বৃহৎ প্রেরণা দিয়া মহৎ হইতে মহত্তর জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। সাহিত্যের কাজ কি ও তাহার প্রকৃত মূল্য কোথায়, ইহা লইয়া জগতের বড় বড় মনীষি ও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ও তর্কের উদ্ভব হইয়াছে। সেই সকল তর্ক বিতর্কের সমালোচনা করিবার মত বিদ্যা বা বুদ্ধি আমার নাই এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার যে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাও আমার মনে হয় না। আমি সাহিত্যকে সাধারণ লোকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়া থাকি, কারণ জনসাধারণই যে শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক, ইহার প্রমাণ বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছে।

আপনাদিগকে পরামর্শ বা উপদেশ দিবার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই। সাহিত্যকে সমাজ সংস্কারের কাজে লাগাইলে তাহা কতখানি সার্থক হইবে তাহাও আমি বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয় যে, বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে একটু অবহিত হইয়া যদি জাতীয় কল্যাণের জন্য কোন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হয়ত সফল পাওয়া যাইতে পারে। কোন জাতিকে গঠন করিয়া তুলিতে হইলে দেশের প্রত্যেকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে কাজে লাগাইতে হয়। তাহা না হইলে কোন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য আমার বিশ্বাস যে, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিতে হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যকে প্রথম নূতন করিয়া গড়িতে হইবে ও তাহার পর সেই নবভাব সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন আদর্শ, নূতন চিন্তাধারা ও নূতন কর্ম্মযোগের বিস্তার করিতে হইবে। এই নূতন সাহিত্য শুধু কল্পনার লীলাবিলাস লইয়া রচিত হইবে না। যে সমস্ত সমস্যা আমাদের সমাজ দেহকে পীড়িত ও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে যে সকল অক্ষমতা আমাদের দুর্ব্বল করিয়া মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে, সেইসব জীবনমরণের প্রশ্নই হইবে এই নব সাহিত্যের বিজয় বস্তু আর এই সাহিত্যই হইবে বাঙ্গলার নূতন যুগের প্রকৃত বাস্তব সাহিত্য।

আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আপনারা সকলে যে বহু দূর দেশ হইতে অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া আমাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য দয়া করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি এবং পুনরায় আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আজ-কাল

সম্মেলন

বড়দিনের ছুটীতে নানা জায়গায় নানা সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে। নিখিল ভারতীয় সম্মেলনই হয়েছে অনেকগুলি; যথা—মাদুরায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন, কলকাতায় নিখিল ভারত উদারনীতিক সম্মেলন, জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, মহীশূরে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্মেলন, ভিজাগাপটমে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন, বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন, উদয়পুরে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন, লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত দেশীয় খৃষ্টান সম্মেলন, পাটনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সম্মেলন, মাদ্রাজে নিখিল ভারত দর্শন সম্মেলন, নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন, পুণায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন, বেহালায় যুদ্ধ সাহায্য সম্মেলন।

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভা তাঁদের প্রস্তাবে এই দাবী জানিয়েছেন যে, যুদ্ধ মেটার এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেওয়া হবে এবং জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখে শাসনতন্ত্র রচনা করা হবে, এই মর্মে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ঘোষণা করুন। গবর্ণমেণ্ট এখনো পাকিস্থান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু বলছেন না বলে' গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের নিন্দে করা হয় এবং দাবী করা হয়, অবিলম্বে এই ঘোষণা করা হোক যে, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমেই বরদাস্ত করবেন না।

যুদ্ধে সাহায্য দানের কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয় নি (যদিও শ্রীসবরকার তাঁর অভিভাষণে সে অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন); তবে সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু যুবকদের নেওয়ার জন্যে এবং ভারতীয় যুবকদের পক্ষে সামরিক শিক্ষা আবশ্যিক করতে বলা হয়েছে।

পরিশেষে প্রস্তাবে এই কথা বলা হয়েছে যে, ১৯৪১-এর ৩১শে মার্চের মধ্যে যদি গবর্ণমেণ্ট এই সব দাবীতে সন্তোষজনক সাড়া না দেন, তাহলে মহাসভা প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পন্থা গ্রহণ করবে।

জনাবী স্বপ্ন

আমেদাবাদে এক মুসলমান সভায় জনাব জিন্না বলেছেন যে, আর দেরী নেই, পাকিস্থান কাছে এসে পড়েছে। তিনি যথারীতি হিন্দুদের কুমতলবের রোমহর্ষক বর্ণনা করে' বলেন যে, উত্তর, পশ্চিম ও পূবে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পাকিস্থান করে' ফেলার জন্যে মুসলমানরা আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত। তবে তাঁর বক্তৃতায় আসল কথা এই বোঝা গেল যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে মুসলমানদের আধাআধি বখরা না দেওয়াতেই তাঁর পাকিস্থানী প্রবৃত্তি উগ্র হয়ে উঠেছে। মাদুরায় ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাঙও বলেন যে, জিন্না সাহেবের গভীর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্থানের ভয় দেখিয়ে বেশী বখরার একটা ফয়সালা করা।

পাকিস্থানের তাৎপর্য

নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ রামচন্দ্র রাও তাঁর অভিভাষণে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পাকিস্থান একটা উন্মাদ পরিকল্পনা, ওতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ চরিতার্থ হতে পারে; কিন্তু দেশের অমঙ্গল হবে ভয়ঙ্কর এবং মুসলমান জনসাধারণের অপকার ছাড়া উপকার হবে না; এ পরিকল্পনা কায়েমী স্বার্থেরই খেলা। ডাঃ রামচন্দ্র রাও তাঁর সমধর্মীদের কাছে আবেদন করেছেন যে, তারা যেন ভারতের অধিকাংশ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভেদের পথে পা না দেয়। তিনি বলেন যে, ধর্মবিশ্বাস যেন যুক্তিপন্থী হয়, তা যেন কাউকে অন্ধ উন্মত্ততায় না মাতায়।

উদারনীতিক দলের প্রস্তাব

ভারতীয় উদারনীতিক সম্মেলনের প্রস্তাবে যুদ্ধ থামার দুই বছরের মধ্যে ভারতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রবর্তনের এবং বড়লাটের নেতৃত্বে অবিলম্বে কেন্দ্রে একটা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের দাবী করা হয়েছে, বর্তমান যুদ্ধে বৃটেনকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে এবং কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের নিন্দে করা হয়েছে।

মানবেন্দ্র সম্মেলন

ভূতপূর্ব বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে বেহালায় যে সম্মেলন হয়েছে, সেখানে বৃটেনকে জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াইতে সাহায্য দেবার পন্থা বিবেচনা করা হয়েছে। ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট সমর্থকেরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বিভিন্ন প্রদেশে জরুরী মন্ত্রিসভা গঠন করে' সমর-প্রচেষ্টাকে ব্যাপক করবার এবং আগামী নির্বাচনের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করবার সংকল্প প্রকাশ করা হয়েছে। অবিলম্বে বড়লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল যত বিভিন্ন দলের লোক আছে, তাদের সকলকে নিয়ে এক "ন্যাশনাল ডেমক্র্যাটিক ইউনিয়ন" গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে।

সম্মেলনের প্রাক্কালে বৃটিশ রক্ষণশীলদের মুখপত্র "টাইম্‌স্‌" মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যমকে আশীর্বাদ করেন।

ছাত্র সম্মেলনে বিভেদ

নাগপুরে যে ছাত্র সম্মেলন হয় তাতে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মূলত সম্মেলনের অধিবেশন হয়। কিন্তু ছাত্রদের এক দল সম্মেলনের বৈধতায় আপত্তি করে' অন্য জায়গায় আর এক পৃথক সম্মেলন করে। সে সম্মেলনের সভাপতি হন এলাহাবাদের শ্রীমনোমোহন প্রসাদ।

সত্যাগ্রহের অবস্থা

বড়দিন উপলক্ষে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ স্থগিত আছে। তবে মজলিস-ই-অহ্‌রের তরফ থেকে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চলছে। তাদের অনেক কর্মী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন। পাঞ্জাবের সর্দার সম্পূরণ সিং ওয়ার্ধায় মহাত্মাজীর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করার পর নাকি স্থির করেছেন যে, তিনি সেবাগ্রাম

আশ্রমে গান্ধীজীর কাছে সত্যাগ্রহের শিক্ষা নেবেন। তিনি আদালতে তাঁর উক্তির ব্যাখ্যা করে' একটা বিবৃতি দেবেন বলেছেন। রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি নাকি এক লিখিত একরার-নামা দিয়েছেন যে, কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব তিনি সমর্থন করেন।

ভারতবাসীর উদ্দেশে পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য যে আবেদনপত্র লিখেছেন তাতে কমন্স-সভার সদস্য মিঃ সোরেন্সেন কেন স্বাক্ষর করেন নি তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, ঐ পত্রে ভারতবাসীর স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হয় নি এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের টালবাহানার কোনো উল্লেখ করা হয় নি।

আন্তর্জাতিক

লণ্ডনে বিমান-আক্রমণ

বড়দিনে লণ্ডন ৮০ ঘণ্টাকাল শান্ত ছিল। কিন্তু তারপরই গত শুক্রবার রাত্রে জার্মান বিমান প্রচণ্ড আক্রমণ করে। সে রকম প্রবল আক্রমণ আগে আর হয় নি। জার্মান বিমান অবিরামভাবে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ অতি-বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। এর একদিন পরে রবিবার রাত্রে লণ্ডনে আবার ভীষণ আক্রমণ হয়। এ আক্রমণে জার্মানদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র লণ্ডন নগরীতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। সমস্ত রাত লণ্ডনের উপর আকাশ আগুনের আভায় লাল হ'য়ে ছিল। জার্মানরা প্রথমে ক্রমাগত আগ্নেয় বোমা ফেলতে থাকে। বিখ্যাত গিল্ড হল, ওল্ড বেলী আদালত, সেণ্ট মেরী এবং আরো অনেক বিখ্যাত অট্টালিকা অগ্নিদগ্ধ হয়। আরো কয়েকটা শহরেও জার্মানরা আক্রমণ চালায়।

বৃটিশ বিমানবহর জার্মান-অধিকৃত ফরাসী উপকূলে এবং রটারডাম, ব্রিন্দিসি, ভেনিস, নেপল্‌স্‌, মানহাইম ও অন্যান্য জার্মান সামরিক ঘাঁটিতে বড়দিনের পর তীব্র বোমাবর্ষণ করে। বড়দিনে বৃটিশ বিমান আক্রমণ চালায় নি।

অন্য রণক্ষেত্র

লিবিয়ায় ইতালীয় ঘাঁটি বারদিয়া ইংরেজরা এখনো দখল করতে পারে নি। বারদিয়া এখন অনেকটা অবরোধের অবস্থায় আছে। দুই পক্ষের গোলন্দাজ দল মাঝে মাঝে কামান দাগছে। লিবিয়ার কয়েকটি ঘাঁটির উপর বৃটিশ বিমানবহর বোমাবর্ষণ করেছে।

গ্রীকরা কিমারা দখল করার পর ভালোনার দিকে অগ্রসর হয়েছে। উত্তরে এলবাসান অভিমুখেও তারা অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। গ্রীক ইস্তাহারে ক্রমাগত সাফল্যের খবর পাওয়া গেলেও তারা ঠিক কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে না।

ইওরোপীয় কূটনীতি

ফরাসী ও জার্মান গবর্ণমেন্টের মধ্যে আবার আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। রয়টার বলছেন, উভয়ের মধ্যে যে বিরোধের সংবাদ রটেছে, সেটা ভিত্তিহীন বলে' মনে হয়। আলোচনার বিষয় সম্পূর্ণ গোপন আছে।

ইওরোপের নানা স্থানে ব্যাপক জার্মান সৈন্য চলাচলের সংবাদ এসেছে। বহু জার্মান সৈন্য নাকি রুমানিয়া, ইতালি ও উত্তর ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছে। জার্মানী এখন ইতালির যুদ্ধে অংশ নেবে, না প্রথমে গোটা ফ্রান্স দখল করবে, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। জার্মান কর্তৃপক্ষ নাকি কয়েকদিন আগে এই প্রচারকার্য চালিয়েছেন যে, শীগ্‌গিরই সব দিক থেকে বৃটেনকে আক্রমণ করে' পরাজিত করা হবে। এই সৈন্য চলাচলকে তার সঙ্গেও সম্পর্কিত করা হচ্ছে।

একদল জার্মান সৈন্যকে নাকি রুমানিয়ায় বুলগেরিয়া সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। ওদিকে বুলগেরিয়ায় সম্প্রতি কমিউনিষ্ট প্রচারকার্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে' খবর পাওয়া গেছে। বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষা যে প্রবল হয়ে উঠেছে, তা পররাষ্ট্রসচিব মঃ পোপোফের বক্তৃতা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন যে, পার্লামেন্টের বাইরে কারো কথা শুনে গবর্ণমেণ্ট চলবেন না। এদিক থেকে সোফিয়ায় সোভিয়েট দৌত্যবিভাগে কর্মচারী পরিবর্তন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

হিটলার ও রোজভেল্ট

হিটলার সৈন্যদের সম্বোধন করে' নববর্ষের এক বাণীতে বলেছেন যে, ১৯৪১ সালে জার্মানী পূর্ণ জয়লাভ করবে।

প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্ট আমেরিকান জাতির উদ্দেশে এক বেতার বক্তৃতায় যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব খোলাখুলি বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'প্রবঞ্চক' নাৎসীদের জয়লাভ আমেরিকার পক্ষে মারাত্মক হবে; কারণ বৃটেনের পরিবর্তে জার্মানী ও ইতালি আটলাণ্টিকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে আমেরিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সুতরাং আমেরিকা বৃটেনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। মার্কিন বাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন নেই, তবে মার্কিন সমরোপকরণ অকুণ্ঠভাবে সরবরাহ করা হবে। তিনি বলেছেন যে, আমেরিকা হচ্ছে গণতন্ত্রী দেশের তথা বৃটেনের অস্ত্রাগার। তাঁর বিশ্বাস, এ যুদ্ধে এক্সিস শক্তির পরাজয় হবে।

রোজভেল্টের বক্তৃতায় ইতালি ও জাপান, বলা বাহুল্য, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে। জার্মানী এখনো স্পষ্ট কিছু বলে নি।

সুদূর প্রাচ্য

চীন নিয়ে জাপানীরা যে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছে, সে আভাষ আজকাল জাপানীদের মুখ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। জাপ সমর-দপ্তরের প্রচার বিভাগের কর্তা কর্ণেল মাবুৎসি বলেছেন যে, বর্তমানে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের রাজত্ব ধ্বংস হবার কোনো আশা নেই। তিনি আরো বলেছেন যে, চীন সমস্যা দিন দিন জটিলতর হয়ে উঠছে। তাঁর মতে ত্রিশক্তি চুক্তির ফলে জাপানের চেয়ে বরং চুংকিং গবর্ণমেন্টের অবস্থাই ভালো হয়েছে।

মস্কো বেতারে বলা হয়েছে যে, চীনে জাপ সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব বেড়ে যাচ্ছে।

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের মধ্যে এখনো মাঝে মাঝে সংঘর্ষ চলছে।

৩১।১২।৪০ —ওয়াকিবহাল।

সেরাইকেলার ছউ-নৃত্য

ছোটনাগপুরের সবুজ পাহাড় ঘেরা সেরাইকেলা রাজ্যে প্রত্যেক বছর বসন্তের শেষে একটি নাচের উৎসব হয়। সারা দেশটা কয়েকদিন ধরে এই নৃত্যোৎসবে মগ্ন হয়ে থাকে। বহুযুগ হতে সেরাইকেলা রাজবংশের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় নৃত্যকলার চর্চা হয়ে আসছে বলে সেখানকার নাচ অত্যন্ত উন্নত এবং কলাগুণসম্পন্ন এবং কালক্রমে সেখানকার নাচের একটা নিজস্ব পদ্ধতি, একটা বিশিষ্ট স্টাইল গড়ে উঠেছে যা অন্য কোথাও দেখা যায় না বা যা অন্য কোনও নাচের অনুকরণ নয়। যখন দু' বছর আগে কুমার বিজয়প্রতাপ সেরাইকেলার নাচের একটি দল নিয়ে রোম, প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি শহরের রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-নাট্য প্রযোজনা করেছিলেন, তখন সর্বত্রই তাঁদের এই বিশেষত্ব বা Stylisation সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উড়িষ্যা ছোটনাগপুরে যা "ছউ" নাচ বলে পরিচিত, সেরাইকেলায় সে নাচের জন্ম এবং সেখান থেকেই অন্যান্য যায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সেরাইকেলার উন্নত নৃত্যপদ্ধতির সঙ্গে অন্য জায়গার নাচের কোনও তুলনাই হয় না। 'উপলয়' ধারণ প্রভৃতি গতিভঙ্গী এত বেশী শক্তিব্যঞ্জক ও শ্রমসাধ্য যে, খুব কম মেয়ের পক্ষে তা পেরে উঠা সম্ভব। বর্তমানে দু'তিনজন মেয়ে অবশ্য সেরাইকেলা দলে যোগ দিয়েছেন। মুখোস ছাড়া সেরাইকেলার নাচ হয় না। তিব্বতী নাচের লামারা যে মুখোস পরে ভূত-প্রেত-রাক্ষসের অভিনয় করে, সেরাইকেলার মুখোস সে মুখোস নয়। সেরাইকেলার মুখোসগুলি পটুচিত্রকরদের হাতের তৈরি অপূর্ব রং ফলানো নিখুঁত সুন্দর জিনিস, এ'দের মুখোস পরার উদ্দেশ্য দর্শকের দৃষ্টিতে নর্তকের চোখ-মুখের ভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের হাত-পায়ের ভঙ্গী এবং দেহভঙ্গীর যে ভাবব্যঞ্জনা তারই উপর আকৃষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করা। এর দ্বারা আর্ট বা কলাবিদ্যা হিসাবে সেরাইকেলার নাচের দেহভঙ্গী বিশেষত পায়ের কাজ, উপলয় ইত্যাদির অতুলনীয় উন্নতি হয়েছে। বাঙলাদেশে তথা উত্তর ভারতে

শবর নৃত্যে ছীরেন্দ্র

সেরাইকেলার 'ছউ' নাচ যে উচ্চাঙ্গের কলাগুণ সম্পন্ন হয়েছে তার প্রধান কারণ, চারুকলা ও সংস্কৃতি বা "কালচার" হিসাবে পুরুষানুক্রমে উচ্চ শিক্ষিত কলাবিৎগুণগ্রাহী রাজ পরিবারের সঙ্গে এই নৃত্যচর্চার যোগ রয়েছে এবং মহারাজা ও রাজকুমারগণ সকলেই কলাকুশলী। সেরাইকেলা রাজবংশে নৃত্যচর্চার প্রবর্তন এবং উন্নতি বিধান রাজ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত অবশ্য করণীয় রাজকার্য। এই নৃত্যচর্চা তাঁদের নিজেদের এবং সেরাইকেলাবাসীর ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা সাধনার অন্তর্গত সমাজ ও ধর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, নৃত্যচর্চার সঙ্গে ধনী-নির্ধন, শিশু-বৃদ্ধ সকল সেরাইকেলাবাসীর চরিত্রগত অন্তরের যোগ রয়েছে।

সেরাইকেলা নৃত্যের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যার জন্যে এই নাচ অন্যান্য ভারতীয় নাচের অনুরূপ নয়। প্রথমত এ নাচে নারী-চরিত্র থাকলেও নর্তকী নেই। এর প্রধান কারণ এই যে, সেরাইকেলার নাচ এত বেশী প্রাণবন্ত, এ নাচের দ্রুত তাল-লয়যুক্ত পদবিক্ষেপ, আসরের নাচে পায়ের কাজ শুধু বাজনার মাত্রা বা তালের ঠেকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেরাইকেলার নাচে ভরত নাট্যশাস্ত্রের সবগুলি না হ'লেও এখনও শতাধিক পা ফেলার ভিন্ন ভিন্ন কায়দা বা Position চলতি আছে। সেই হলো এ নাচের ভাষা, পা থেকেই প্রথম নাচের ভাবপ্রকাশ সুরু হ'য়ে ক্রমশ তা সকল দেহভঙ্গীতে সঞ্চালিত হয়। নাচের ভাব-বস্তুর অর্থের গভীরতা বা জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাজ এবং উপলয় ইত্যাদিরও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় অন্যান্য নাচের ভাব-ব্যঞ্জনার কেন্দ্র হচ্ছে চোখ এবং মুখ; কিন্তু সেরাইকেলার নাচের ভাষা হচ্ছে "পায়ের" ভাষা।

"ছউ" নাচের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এতে কোনও দৃশ্য-পটের ব্যবহার নেই। দর্শকমণ্ডলী পরিবৃত উন্মুক্ত আসরে নাচের অভিনয় হয় এবং নৃত্যের দ্বারাই ঠিক যে আবহাওয়া বা atmosphere দরকার তার সৃষ্টি হয়। তবে নাচের উপযুক্ত সাজ-সজ্জার যাতে বিন্দু-

মাত্র ত্রুটি না থাকে সে দিকে অত্যন্ত সতর্ক লক্ষ্য রাখা হয়। পরিচ্ছদের বিষয়টা সেরাইকেলা নৃত্যের অত্যন্ত দরকারী অঙ্গ। যেমন "সাঘোঘাটের" মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ রক্তবস্ত্র এবং তার সঙ্গে ভুলুণ্ঠিত শ্বেত-উত্তরীয়, মাথায় ঝলমলকম্পিত রত্নমুকুট, পায়ে নূপুর নিক্কণ, ময়ূর-নৃত্যে নাচিয়ে পরেন ময়ূরকণ্ঠী নীল কিংখাবের পোষাক, মাথায় শুধু ছোট্ট একটি ময়ূরপুচ্ছের স্তবক। মরুমায়া প্রভৃতি অন্যান্য নৃত্যেও পরিচ্ছদের সঙ্গে নাচের ভাব-বস্তুর নিকট সামঞ্জস্য থাকে।

সেরাইকেলা নৃত্যের সঙ্গে শানাই, সেতার, বাঁশের বাঁশী ইত্যাদি সহযোগে সরল সুরের ঐক্যতান বাজনার ব্যবহার আছে, কিন্তু কণ্ঠ সংগীতের কোন স্থান নেই। কারণ নাচের সঙ্গে গান থাকলে নাচের অঙ্গহানি হয়। নাচের বাজনায় আধুনিকতা থাকলেও সেরাইকেলার নাচের তাল কিন্তু ভরত নাট্যশাস্ত্র এবং নন্দীকেশ্বরের প্রাচীন বিধান মেনে চলছে। তাল প্রথমে মন্থর, পরে দ্রুত এবং শেষে 'চরম' বা অতি দ্রুত (climax) হয়, কতকটা "দূন" "চৌদুন"এর মত। সব নাচেই তালের এই তিন বিভাগ আছে এবং সব নাচই চরমদ্রুত তালে অর্থাৎ climax-এ পৌঁছে, তার পরে সমাপ্ত হয়।

—নটরাজ

সালতামামী

সালতামামী লিখ্‌বার ভার দিয়েছেন সম্পাদক; কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই দূরবীন্ ফোকাস্ করে বসে রইলাম—দেখ্‌তে পেলাম শুধু অন্ধকার।

* * * * *

ওদেশে যুদ্ধ বেধেছে, এদেশে চলেছে তারই প্রতিক্রিয়া—প্রতি ব্যবসাক্ষেত্রে; বিশেষ করে আমাদের ছবির জগতে।

কেউ কেউ দরজা বন্ধ করেছেন; কেউ বা ব্যয়-সংকোচ করছেন। সবদিকেই একটা আতঙ্ক।

তাই কিছু বল্‌তে হলেই, একটা কথাই আজ মনে পড়্‌ছে—এ শিল্পকে বাঁচ্‌তে হলে, চাই টাকা, চাই অন্ন।

* * * * *

হিন্দু শাস্ত্রমতে—অন্ন প্রাণ; তাই অন্ন-চিন্তা প্রাণীমাত্রেরই আদিম চিন্তা, সেটা চরম লক্ষ্য নয় বটে, তবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লক্ষ্য। এই আদিম চিন্তা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায়, অন্নের সংস্থান করা।

এবং সে সংস্থান আজ চলচ্চিত্রের নেই। সে সংস্থান করবার জন্য চলচ্চিত্র আজ চারিদিকে হাত্‌ড়ে মরছে। তার উপর ধমক আছে দর্শকদের—চুট্‌কি চল্‌বেনা। কাজের কথা বলো। লোক শিক্ষা দাও। উপযুক্ত কথা সন্দেহ নেই।

* * * * *

কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্প আগামী বৎসর অন্ন-সংস্থান করুক।

বিদেশী ছবি, বিদেশী ডিস্ট্রিবিউটরএ বাঙলা দেশ ছেয়ে ফেলেছে। আজ মফঃস্বলের ছবিঘরগুলোকেও ভাল বাঙলা ছবি পেতে হলে, আগে হিন্দি ছবির বুকিং নিতে হয়, তা সে ছবিঘরে হিন্দি ছবির দর্শক থাকুক আর নাই থাকুক! বাঙলা ছবি এ ধরণের জুলুম থেকে নিজেকে মুক্ত করুক।

* * * * *

লোক-শিক্ষার ভার আর যেই নিক্, বাঙলার বাঙালী স্টুডিওগুলি যেন না নেয়। কারণ যে কথা একশোবার বলা হয়েছে, তার পুনরুক্তি করাই শিক্ষকদের কার্য। তাতে আছে পুরাতনের একঘেয়েমি। কাজেই তাতে আদিম অন্নচিন্তার হাত থেকে বাঁচ্‌বার উপায় নেই।

* * * * *

কেউ যেন ভুল না করেন, কোনো আদর্শমূলক ছবির বিরুদ্ধে আমি কিছু বল্‌ছি! আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য হচ্ছে—লোকশিক্ষাই যেন কোনো বাঙলা ছবির একমাত্র আদর্শ না হয়।

কারণ দেশ ও দশের কাজ করা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে সম্ভব নয়। ওসব কাজ দশে মিলে করবার কাজ; আর চলচ্চিত্র শিল্প করে চলচ্চিত্রের গল্পের বিকাশ।

তবে, বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্প যদি side work হিসাবে—দেশ ও দশের কাজে আসে—এমন ছবি গড়্‌তে চায়, তাতে আপত্তি নেই! কিন্তু তাও—এখন নয়। আগে নিজের অন্নসংস্থান সে করে নিক্।

সে চেষ্টা তার সার্থক হবে, যদি প্রকৃতির অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে অলৌকিক আনন্দ রস, কবি মনকে স্পর্শ করে—তাকেই সে রূপকথার রাজকন্যার দেওয়া সোনার কাঠির পরশে জিয়িয়ে তুল্‌তে পারে, রূপকথার রাজকন্যার সঙ্গে দর্শকের মনের পরিচয় করিতে দিতে পারে।

তাতেই একদিন শিল্প-লোকের ভোরের পাখী চলচ্চিত্রের সুরে সুর মেলাবে। তাতেই একদিন ভাগ্যলক্ষ্মী নিজের অজ্ঞাতে বাঁধা পড়্‌বেন—এই শিল্পলোকের কোষাগারে।

—দূরবীণ—

ভারত ভ্রমণকারী সিংহল ক্রিকেট দল

ভারত ভ্রমণকারী সিংহল ক্রিকেট দল সম্প্রতি কলিকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতীয় বাছাই একাদশের সহিত তিনদিনব্যাপী খেলায় যোগদান করিয়া অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। খেলাটি যেরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ও উচ্চাঙ্গের হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, সেইরূপ হয় নাই, তবে খেলাটি যে দর্শনযোগ্য হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সিংহল দলের ব্যাটিং

সিংহল দলের খেলোয়াড়গণ সকলেই ব্যাটিং বিষয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। দলের প্রথম খেলোয়াড় হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ খেলোয়াড়টি পর্যন্ত দলের রাণ তোলায় সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপভাবে দলের সকল খেলোয়াড়কে খেলার সকল অবস্থায় দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করিতে ইতিপূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। সিংহল দল প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল অপেক্ষা যে অধিক রাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাও এই দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য। এই দলের ফিল্ডিংও ভাল। কেবল অভাব বোলারের। যে কয়েকজন বোলার আছেন, তাঁহাদের বোলিং খুব উচ্চাঙ্গের বলা যায় না। সেইজন্য মনে হয়, এই দল প্রকৃত বাছাই ভারতীয় দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। বোম্বাইতে এই-রূপ একটি দলের সহিত সিংহল দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে, তখনই আমাদের উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে।

বাঙালী খেলোয়াড়গণের কৃতিত্ব

এই খেলায় দুইটি বাঙালী উৎসাহী খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহাদের একজনের নাম সন্তোষ গাঙ্গুলী ও অপরজনের নাম নির্মল চ্যাটার্জি। সন্তোষ গাঙ্গুলী ভারতীয় দলের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে খেলিয়া উভয় ইনিংসে ৬০ রাণের অধিক রাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি প্রথম ইনিংসে ৬৯ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৪ রাণ করেন। ইহার ন্যায় নির্মল চ্যাটার্জি উভয় ইনিংসে অর্ধশতাধিক রাণ করেন। তিনি প্রথম ইনিংসে ৫৩ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। সন্তোষ গাঙ্গুলী নির্মল চ্যাটার্জি অপেক্ষা অধিক রাণ করিলেও নির্মল চ্যাটার্জির ন্যায় দ্রুত রাণ তুলিতে পারেন নাই। তবে ইঁহাদের উভয়েরই ব্যাটিং বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। ইঁহাদের পরেই এস ব্যানার্জির স্থান। তিনি উভয় ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভারতীয় দলের বোলিং

নির্বাচিত ভারতীয় দলে কৃতি বোলার না থাকায়, সিংহল দল অধিক রাণ তুলিতে সক্ষম হয়। কমল ভট্টাচার্যের বোলিং অনেক সময় ভাল হইলেও প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়গণকে সকল সময় বিব্রত করিতে পারে নাই। এইজন্য মেজর নাইডু, সি কে নাইডু ও পি ই পালিয়াকে অনেক সময় বোলিং করিতে হইয়াছে। সুটে ব্যানার্জি ভারতের বিশিষ্ট বোলারদের মধ্যে গণ্য হইলেও এই খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। এই দলে ন্যাটাল নামক একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে বোলার হিসাবে লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইনিও বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ফিল্ডিং বিষয়ে ভারতীয় দলের বিশেষ নিন্দা করা চলে না। কলিকাতার খেলোয়াড়গণ ফিল্ডিং বিষয়ে উন্নতি যে করিয়াছে, তাহার প্রমাণ এই খেলায় পাওয়া গিয়াছে। এই দলের উইকেটরক্ষকের খেলা সর্বাপেক্ষা হতাশাব্যঞ্জক হইয়াছে। একরূপ ইহার দোষেই সিংহল দলের অধিনায়ক একাই শতাধিক রাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। দলের অধিনায়ক মেজর সি কে নাইডু ইহার খেলায় এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, সিংহল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সময় এন তালুকদার নামক একজন খেলোয়াড় তাঁহার স্থানে উইকেট রক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

খেলার বিবরণ

ভারতীয় দল টসে বিজয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম উইকেট এক রাণে পড়িয়া যায়। পালিয়া এস গাঙ্গুলীর সহিত যোগ দেন। রাণ উঠিতে আরম্ভ করে। পালিয়া ৩৮ রাণ করিয়া আউট হন। তখন মেজর নাইডু খেলায় যোগদান করেন। তিনিও ২৯ রাণ করিয়া আউট হন। এন চ্যাটার্জি খেলায় যোগ-দান করেন। এস গাঙ্গুলী ৭৫ মিনিটে ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ১৬৪ রাণের সময় গাঙ্গুলী আউট হন। এস ব্যানার্জি খেলায় যোগদান করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় চার উইকেটে ১৬৯ রাণ হয়। এন চ্যাটার্জি ৪৩ মিনিটে ৫০ রাণ করেন। ইহার পর দ্রুত উইকেট পতন আরম্ভ হয়। এস ব্যানার্জি শেষ সময় রাণ তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সাফল্যলাভ করে না। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৫১ রাণে শেষ হয়। সিংহল দলের কেলার্ট ৭০ রাণে ৪টি ও এম গুণরত্ন ৭২ রাণে ৪টি উইকেট পান। পরে সিংহল দল খেলা আরম্ভ করিয়া প্রথম দিনের শেষে তিন উইকেটে ৯৬ রাণ করে। এস জয়বিক্রম ৫৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হইলে অনেকে ধারণা করেন, সিংহল দলের ইনিংস ১৫০ রাণে শেষ হইবে। কিন্তু এই ধারণা কার্যকরী হয় না। জয়বিক্রম ও জি গুণরত্ন একত্রে রাণসংখ্যা ১৭৪ করিতে সক্ষম হন। জয়বিক্রম ১৫৫ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ১০০ রাণ পূর্ণ করেন। ইহার পর পুনরায় রাণ উঠিতে থাকে। ২৩৩ রাণ হইলে জয়বিক্রম ১৩৮ রাণ করিয়া আউট হন। তিনি উক্ত রাণের মধ্যে ১৫টি বাউণ্ডারী করেন। পোরিট ও এ গুণরত্ন ২৫০ পর্যন্ত রাণ তুলিতে সক্ষম হন। পোরিট পরবর্তী খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় ৩৫০ পর্যন্ত রাণ করিতে পারেন। দলের শেষ খেলোয়াড় জয়সুন্দর পর্যন্ত ভীষণ পিটাইয়া খেলিয়া রাণ তুলেন। সিংহল দলের প্রথম ইনিংস ৩৭২ রাণে শেষ হয়। পরে ভারতীয় দল খেলা আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে এক উইকেটে ৪২ রাণ করে।

তৃতীয় দিনের খেলা

তৃতীয় দিনে ভারতীয় দল সতর্কতা অবলম্বন করে। ফল ভালই হয়। সন্তোষ গাঙ্গুলী ১২২ রাণের সময় ৬৪ রাণ করিয়া আউট হন। পালিয়া ও সি কে নাইডু খেলার অবস্থা পরিবর্তন করেন। মেজর নাইডু ৮৮ মিনিটে ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ২০৯ রাণের সময় তিনি আউট হন। ইহার পর এন চ্যাটার্জি ও এস ব্যানার্জি একত্রে খেলিয়া দ্রুত রাণ তুলিতে সক্ষম হন। চা পানের পূর্বে ভারতীয় দলের পাঁচ উইকেটে ২৯৩ রাণ হইলে, মেজর নাইডু ডিক্লেয়ার্ড করেন।

সিংহল দলের খেলা

সিংহল দল পরে খেলা আরম্ভ করে। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দুই উইকেটে ৮২ রাণ করে। জনপুলে ৩৫ রাণ করেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল ঃ—

ভারতীয় দল ১ম ইনিংস ঃ—২৫১

এস গাঙ্গুলী ৬৯; পি ই পালিয়া ৩৮; সি কে নাইডু ২৯; এন চ্যাটার্জি ৫৩; এস ব্যানার্জি ৪৩। কেলার্ট ৭০ রাণে ৪টি, এম গুণরত্ন ৭৯ রাণে ৪টি ও পোরিট ১৯ রাণে দুইটি উইকেট পান।

সিংহল দল ১ম ইনিংসঃ—৩৭২

এস এস জয়াবিক্রম ১৩৮; জি গুণরত্ন ৪৪; এ এইচ গুণরত্ন ৩৪; পোরিট ৪৯ ও জয়সুন্দর নট আউট ৩৭। এস ব্যানার্জি ১১৪ রাণে ৩টি; সি কে নাইডু ৮৩ রাণে ২টি; কে ভট্টাচার্য ৪৯ রাণে ৩টি ও পালিয়া ৫৮ রাণে ২টি উইকেট দখল করেন)

ভারতীয় দল ২য়ঃ ইনিংসঃ—২৯৩ (৫উইঃ ডিক্লেঃ)

(এস গাংগুলী ৬৪; এ জব্বর ২১; পালিয়া ৩৭; সি কে নাইডু ৫০; এন চ্যাটার্জি নট আউট ৭৩ রাণ ও এস ব্যানার্জি নট আউট ২৫। জয়সুন্দর ৭৬ রাণে ২টি উইকেট লাভ করেন)

সিংহল দল ২য় ইনিংসঃ—৮২ (২ উইঃ)

(জন পুলে ৩৫; ডব্লিউ এল মেণ্ডিস নট আউট ২২)

ভারতীয় দলের মিঃ তফিক্‌ ও এস গাংগুলী

পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

কলিকাতার সাউথ ক্লাব পরিচালিত পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হইয়াছে। পাঞ্জাবের এস এল আর সোহানী প্রতিযোগিতার সকল বিভাগেই সাফল্যলাভ করিয়াছেন। এস এল আর সোহানী ইতিপূর্বে কোন বৎসর ভারতের কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় এইরূপ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। বৈদেশিক কোন বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় অথবা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় গউস মহম্মদ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান না করার ফলেই সোহানী এইরূপে গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার চাতুর্যপূর্ণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত কোন খেলোয়াড়ই এই বৎসর এই প্রতিযোগিতায় ছিল না। সেইজন্য কি সিংগলস, কি মিক্সড ডাবলস, সকল খেলায় তিনি ষ্ট্রেট সেটেই বিজয়ী হইয়াছেন। তাঁহার এই সাফল্য তাঁহাকে ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্যায় উচ্চতর স্থান লাভে বিশেষ সাহায্য করিবে।

ম্যাক্স এলমারের নৈরাশ্যজনক খেলা

সুইডিস ডেভিস কাপ খেলোয়াড় ম্যাক্স এলমার প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কি সিংগলস, কি ডাবলস, কি মিক্সড ডাবলস কোন বিভাগেই তিনি ফাইন্যাল পর্যন্ত উপনীত হইতে পারেন নাই। এম কি, তিনি সিংগলস সেমি-ফাইন্যালে তরুণ খেলোয়াড় জিম মেটার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার পর তাঁহার সম্বন্ধে পরিচালকগণ যে ইতিহাস প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, শেষ পর্যন্ত এলমারকে এইরূপ শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিতে দেখিবেন। ইহার ফলে অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "পরিচালকগণ জানিয়া শুনিয়াই সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণকে প্রতারিত করিয়াছেন।" এই উক্তি যদিও আমরা সমর্থন করি না, তথাপিও ইহা না বলিয়া পারি না যে, পরিচালকগণের ভাল করিয়া এলমারের ক্রীড়াকৌশল দেখিয়া ঐরূপ প্রচার করা উচিত ছিল।

সমর বার্ত্তা

২৫শে ডিসেম্বর

খৃষ্টপর্বের আগমনেও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে অহোরাত্র প্রচণ্ড কামান গর্জন চলিতে থাকে। বার্দিয়াতে উভয় পক্ষ হইতে জোর কামানের গোলা বর্ষিত হয়।

বৃটেনে বড়দিনের প্রভাত শান্তমূর্তিতে দেখা দেয়। গতকল্য সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে লণ্ডনে বিমানহানার কোন সংকেত ধ্বনি হয় নাই।

আলবেনিয়া রণাঙ্গনে গ্রীকগণ আরও অগ্রসর হইয়া ভ্যালোনার দিকে ধাওয়া করে। ড্রিনোস নদীর পশ্চিমে শত্রু-সৈন্যগণকে হটাইয়া দিয়া গ্রীক সৈন্যগণ নূতন সাফল্য অর্জন করে। বিধ্বস্ত কিমারা নগরীর রাস্তায় বহু ইতালীয় সৈন্যের মৃতদেহ ও পরিত্যক্ত রণসম্ভার দেখা যায়।

আদ্রিয়াতিক সাগরে গ্রীক সাবমেরিণ "পাপানিকোলিস"-এর টর্পেডো আক্রমণে তিনটি ইতালীয় সৈন্যবাহী জাহাজ জলমগ্ন হয়। জাহাজগুলি সৈন্য বোঝাই করিয়া বৃন্দিসি হইতে ভ্যালোনা যাইতেছিল। জাহাজ তিনটির মোট টনেজ ২৫ হইতে ৩০ হাজার হইবে।

থাইল্যাণ্ড-ইন্দোচীন সীমান্তে অদ্য পুনরায় সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষ হইতে কামানের গোলা বর্ষণ করা হয়। থাইল্যাণ্ড বাহিনীর আক্রমণে দুইটি অস্ত্র সজ্জিত ফরাসী জাহাজ জলমগ্ন হয়।

২৬শে ডিসেম্বর

বুদাপেস্ট হইতে প্রাপ্ত লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, জার্মান সৈন্যগণ হাঙ্গারীর ভিতর দিয়া রুমানিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং কিছু সৈন্য বুলগেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বার্ণের দূতমহল বলিতেছেন যে, জার্মানী গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে।

বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার "একিরণ" জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া বৃটিশ নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হয়।

কর্ফুর উপর ইতালীয়দের বিমানহানায় ১৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। এ পর্যন্ত কর্ফুর উপর ২৩ বার বিমান আক্রমণ হইল।

২৭শে ডিসেম্বর

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নাউরু দ্বীপের উপর একটি জার্মান জাহাজ প্রবল গোলা বর্ষণ করে। উক্ত দ্বীপের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই।

বড়দিনের আক্রমণ বিরতির পর নাৎসী বিমানসমূহ অদ্য রাত্রিতে পুনরায় লণ্ডন এলাকার উপর হানা দেয়। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা এড়াইবার জন্য তাহারা খুব উঁচু দিয়া উড়ে এবং সেখান হইতে অতিবিস্ফোরক ও অগ্নি বোমা নিক্ষেপ করে। ধ্বংসস্তূপে আটক পড়িয়া কয়েকজন লোক হতাহত হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, তিন ডিভিশন জার্মান সৈন্য ইতি-মধ্যেই ইতালীতে প্রবেশ করিয়াছে। হাঙ্গারীর দূত মহলের ধারণা এই যে, রুমানিয়ায় বর্তমানে যে জার্মান সৈন্য আছে তাহাদের সংখ্যা ৫ লক্ষ হইবে।

২৮শে ডিসেম্বর

পশ্চিম মরুভূমির সংগ্রামে প্রথম হইতে এ পর্যন্ত ৩৮১১৪ জন সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৪৮৪৫ জন ইতালীয় সৈন্য আছে। কায়রোর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের একটি ইস্তাহারে এই সংবাদ দিয়া বলা হইয়াছে যে, বার্দিয়া আক্রমণের জন্য বৃটিশ সৈন্য সমাবেশের কার্য বিনা বাধায় অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী ইতালীয়দিগকে বিব্রত রাখিতেছে। পশ্চিম দিকে ইতালীয়ানদিগকে বিতাড়ন কার্যে বৃটিশ বাহিনীর কার্যতৎপরতা অক্ষুণ্ণ আছে।

মার্শাল পেত্যাঁর সভাপতিত্বে ফরাসী মন্ত্রিসভার এক গুরুত্ব-পূর্ণ বৈঠক হয়। লণ্ডনস্থ স্বাধীন ফরাসী মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, মার্শাল পেত্যাঁ দৃঢ়তার সহিত ফরাসী নৌবহর সমর্পণের জন্য জার্মানীর দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মার্শাল পেত্যাঁ নাকি বলিয়াছেন যে, এই দাবী "সম্মানজনক যুদ্ধ বিরতি চুক্তির" সর্তাবলীর বিরোধী। সকলের বিশ্বাস, ভিসি গবর্ণমেণ্টের নৌসচিব এডমিরাল দারলাঁ মার্শাল পেত্যাঁর এই উত্তর লইয়া জার্মান অধিকৃত প্যারিসে গিয়াছিলেন।

২৯শে নবেম্বর

বৃটিশ নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বড়-দিনে উত্তর আটলাণ্টিকে বৃটিশ নৌবহর ও একটি জার্মান যুদ্ধ-জাহাজের মধ্যে যুদ্ধ হয়। জার্মান যুদ্ধ জাহাজটির উপর দূর-পাল্লার গোলা বর্ষণ করা হয়। উক্ত জার্মান যুদ্ধ জাহাজের জোগানদার জাহাজ বলিয়া অনুমিত একটি জার্মান জাহাজের (৮২,০০০ টন) গতিরোধ করা হয় এবং জাহাজটি স্বয়ং উহাতে আগুন ধরাইয়া দিলে উহাকে জলমগ্ন করা হয়। বৃটিশ ক্রুজার 'বারউইক'-এর সামান্য ক্ষতি হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যা কুমারী ইন্দিরা নেহরু সম্পর্কে ইউরোপ হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীমতী ইন্দিরা সম্প্রতি দেশে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া জেনেভা হইতে লিসবনে উপনীত হন। তিনি আকাশপথে লণ্ডনে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তারপর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

আমেরিকান জাতিকে সম্বোধন করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক বেতার বক্তৃতায় বৃটেনকে পূর্ণ সাহায্য দানের সংকল্প ঘোষণা করেন এবং এক্সিস শক্তিবর্গের তীব্র নিন্দা করেন।

৩০শে ডিসেম্বর

গতকল্য রাত্রিতে লণ্ডনের উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ হয়। আক্রমণের সময় আগ্নেয় বোমা বর্ষণের ফলে শহরে এমনভাবে আগুন লাগে যে, তাহা নিভাইতে দমকলের এক হাজার লোককে সারারাত ধরিয়া খাটিতে হয়। সকাল বেলার দিকে আগুন নিভিয়া আসে। এই আক্রমণের ফলে গিল্ড হল ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ গীর্জ্জার ক্ষতি হয় এবং কতক সংখ্যক লোক হতাহত হয়।

৩১শে ডিসেম্বর

আদ্রিয়াতিক সাগরে বৃটিশ রণতরীর আক্রমণে ৪ খানি ইতালীয় জোগানদার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

বেলগ্রেডের সংবাদে প্রকাশ, ইতালীতে জার্মান সৈন্যের উপস্থিতি বিভিন্ন মহলে সমর্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, ব্রিন্দিসে ও বারিতে জার্মান বিমানও রহিয়াছে। অস্ট্রিয়া হইতে ফ্রান্সে সৈন্য গমনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এ সম্পর্কে গুজব রটিয়াছে যে, জার্মানী শীঘ্রই ফ্রান্সের অবশিষ্টাংশ দখল করিবে। সম্প্রতি জার্মানীর মধ্যে এই কথাই ক্রমাগত প্রচার করা হইয়াছে যে, শীঘ্রই ইংলণ্ডের উপর সমস্ত দিক হইতে আক্রমণ আরম্ভ করা হইবে, যাহার ফলে জার্মানী জয়লাভ করিবে এবং যুদ্ধের অবসান হইবে।

আলবেনিয়া রণাঙ্গনে চিমারার উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলে ঘোর যুদ্ধের পর গ্রীকগণ বেশ খানিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। তাহারা আরও তিনটি গ্রাম অধিকার করিয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৫শে ডিসেম্বর।—

মহাত্মা গান্ধী পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেন্ট লালা দুনীচাঁদ এম-এল-এ'র নিকট চিঠিতে পাঞ্জাবের সত্যাগ্রহীদিগকে যে সমস্ত সর্ত অবশ্য পালন করিতে হইবে, তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কেবল নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে কেহ কারাবরণ করিতে বাধ্য নহে।

নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে দলাদলি হওয়ায় নাগপুরে একই সময়ে দুইটি পৃথক্ সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে কাশীপুরে ২৪ পরগণা জিলা কংগ্রেস কমিটির সদস্যবৃন্দের এক বিশেষ অধিবেশন হয়।

শক্করে গত দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ, ৩৬ জন হিন্দুকে হত্যার ও একটি তরুণীকে অপহরণের অভিযোগে ৫৯ জন আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়।

২৬শে ডিসেম্বর।—

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা নির্বাচন সম্পর্কে 'দণ্ডিত' ১৯ জন সদস্যের কার্য্য ও অভিমত সমর্থন করিয়া উক্ত দলের আরও নয়জন সদস্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট এক যুক্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি মিঃ এম তায়েবুল্লা ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী আসামের সত্যাগ্রহীদের ৭৮৩টি নাম অনুমোদন করিয়াছেন। পাঞ্জাব হইতে আগত একটি প্রতিনিধি দল মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, পাঞ্জাব অপরাপর প্রদেশের মতই অহিংসায় বিশ্বাসবান এবং বর্তমান সংগ্রামে পাঞ্জাব পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।

সীমান্ত প্রদেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত মিঃ আবদুল কাইয়ুম এবং হাজি ফকীর খাঁ (এম-এল-এ) এই দুইজনকে দশ দিন আটক রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এবং নাগপুর সিটি মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব সিদ্দিকআলী দুই বৎসরের জন্য মুসলিম লীগ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

২৭শে ডিসেম্বর।—

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থ কলিকাতার ভারতীয় ব্যবসায় অঞ্চলে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়।

মজলিস-ই-অহ্‌রারের দ্বিতীয় ডিক্টেটর মিঃ গুলে মহম্মদ অদ্য লাহোরে সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ডাঃ কে এস রায়ের সভাপতিত্বে ভিজাগাপট্টমে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরুর সভাপতিত্বে বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

লাহোরের কংগ্রেস সদস্যগণের এক সভায় পাঞ্জাবের ২৫টি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিগণ স্ব স্ব কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে তাঁহারা আস্থাবান বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন।

২৮শে ডিসেম্বর।—

নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মী বরিশালের বিশিষ্ট ছাত্র নেতা কমরেড শাহ আলম বি এন রেলওয়ের খার্সিয়া ষ্টেশনে ট্রেনের নীচে চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সভাপতিত্বে মাদুরায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার দ্বাবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের সভাপতিত্বে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি রাজ্যরত্ন সত্যব্রত মুখার্জি (বরোদা) অসুস্থতানিবন্ধন সম্মেলনে যোগ দিতে না পারায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত সভাপতি নির্বাচিত হন।

শ্রীযুক্ত ভি এন চন্দ্রাবরকরের সভাপতিত্বে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের ২২শ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

২৯শে ডিসেম্বর।—

গতকল্য ঝরিয়ার কস্তুর কয়লার খনির সহকারী ম্যানেজার ও অন্য তিনজন কর্মচারী খনির অভ্যন্তর পরিদর্শনকালে গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সভাপতিত্বে মাদুরায় নিখিল ভারত হিন্দু যুব-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

মাদুরায় হিন্দু মহাসভার বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে গভর্নমেণ্টকে এক চরমপত্র দিবার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, যদি ১৯৪১ সালের ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পাকিস্থান পরিকল্পনা বাতিল করিয়া ও যুদ্ধ শান্তির পর এক বৎসরের মধ্যে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা না করেন, তবে হিন্দু মহাসভা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। শ্রীযুক্ত সাভারকর, ডাঃ মুঞ্জে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডেকে লইয়া একটি 'কার্য-পরিষদ' গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত করা হয়।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির প্রস্তাবক্রমে বৃহত্তর বঙ্গ পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি বাঙালীদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ে উপদেশ দেন।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

৩০শে ডিসেম্বর।—

কলিকাতায় জাতীয় উদারনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়। বর্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুই বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে ওয়েস্টমিনস্টার মার্কা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাইয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে পৃথক্ নির্বাচন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পাকিস্থান দাবীর বিরোধিতা করা হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এডভোকেট শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইনের সভাপতিত্বে বহরমপুরে নিখিল বঙ্গ ও আসাম ব্যবহারজীবী সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন আরম্ভ হয়।

৩১শে ডিসেম্বর।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক, কর্ণেল আর এন চোপরা এ বৎসর নাইট হইয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এস এন দাশগুপ্ত সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী আঠার মাস অথবা তন্নিম্ন বয়স্ক শিশুর মাতাকে সত্যাগ্রহে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

গত ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকার এক পত্রে ২৩ জন খ্যাতনাম্নী ইংরেজ মহিলা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

সার্জেণ্ট মেজর!

দেহের আয়তনে এ'কে ততোধিক কিছু ব'লেই মনে হয়। এখন পৃথিবীতে যত মার্শেল র'য়েছেন তাঁদের ভেতর গোয়েরিংই সব চেয়ে বিপুলকায়, কিন্তু এ'র সঙ্গে তুলনা ক'রলে গোয়েরিংকে মোটেই বিপুলকায় বলা চ'লবে না। অবশ্য আমাদের এই সার্জেন্ট মেজরটি মানুষ নয় যদিও মানুষের মুখের আকৃতির সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

সার্জেণ্ট মেজর

ইনি এক জাতীয় সীল (Seal)। সমুদ্রের তলায় বসবাস করেন আর সেখানে একঘেয়ে ঠেকলে মাঝে মাঝে পৃথিবীর বুকে ওঠেন। কিন্তু সামান্য বায়ু পরিবর্তন ক'রতে এতটুকু অসতর্ক হবার উপায় নেই, এসকিমোবাসীদের দৃষ্টি কিছুতেই এড়ান যায় না, আর শিকারে হাতও তাদের নাকি ভারী নিখুঁত।

হাতের চুল দাঁড় করান

অভ্যাস থাকলে অনেকে ইচ্ছামত কান নাড়াতে পারে, কিন্তু শরীরের চুল দাঁড় করাতে পারে, এ রকম লোকের খবর রাখেন কি? আমেরিকার সাইকলজিক্যাল এসোসিয়েশনের সভ্যদের ডাঃ ডোনাল্ড ডি লিন্ডসে এক ছায়াচিত্রগৃহে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁদের একটি চলচ্চিত্র দেখান। সেই ছবিখানিতে একজন লোক ইচ্ছামত হাতের চুলগুলি দাঁড় করিয়ে দর্শকদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। চুলগুলি এভাবে দাঁড় করাতে গিয়ে লোকটি নিজে কোন রকম আকস্মিক ভয় পান না, অথবা কোন রোমাঞ্চকর কাহিনীর স্মৃতি মনে আশ্রয় দেন না। অতি সহজভাবেই ভদ্রলোক শরীরের লোমগুলি দাঁড় করিয়ে দেন। ভদ্রলোক দশ বৎসর বয়স থেকেই এভাবে দর্শকদের চমৎকৃত করে আসছেন। যখন ভদ্রলোকের ছবি তোলা হয় সে সময়ে ডাঃ লিন্ডসে ভদ্রলোককে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করেছেন, চুল দাঁড় করাবার সময় ভদ্রলোকের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন লক্ষিত হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন ভদ্রলোক একেবারেই বুঝতে পারেন না। চোখের তারা দুটি বন্ধ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতগতিতে চলতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও দ্রুত হয়। এমন কি মস্তিষ্কে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। মানুষ ভীত হ'লে যখন শরীরের চুলগুলি সজাগ হয়ে উঠে সে সময় এই সমস্ত মানসিক পরিবর্তন হ'তে দেখা যায়। সজারু নামে জীবজগতের এক জাতীয় জীব ভীত হ'লে অথবা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হ'লে শরীরের সুদৃঢ় লোমগুলি দাঁড় করিয়ে আত্মরক্ষা করে।

* * * * *

আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন পত্রিকায় ডাক্তার ই ই বাকসডেল তামাকের সঙ্গে মানুষেরে দেহে কেমন ক'রে আর্সেনিক প্রবেশ ক'রতে পারে, সে সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। যাঁরা তামাকের চাষ করেন তাঁরা যে-সব পোকা তামাক নষ্ট ক'রে ফেলে, তাদের হাত থেকে সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য লেড্ আর্সেনেট (Lead Arsenate) ব্যবহার করে থাকেন। ডাক্তার বার্কসডেল চর্মরোগের বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেখানে তামাকের সঙ্গে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আর্সেনিক আসা সম্ভব নয়। এর পর তিনি অনেকগুলি সিফিলিস রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখেন যে, প্রতিবার ইনজেক্সন দেবার পরে ঐ-সব রোগীরা উৎকট চর্ম-প্রদাহে কষ্ট পায়। সেইজন্য তাঁর মতে ঐরূপ রোগীর কোন প্রকারে তামাক সেবন করা উচিত নয়।

অবশ্য অনেকে বলতে পারেন, তামাকে আর্সেনিক ছাড়া অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার করেও পোকা নষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রে আর্সেনিক ছাড়া অন্য কোন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নি, যার দ্বারা তামাককে রক্ষা করা যায়। সুখের বিষয়, যে পরিমাণ আর্সেনিক তামাকে ব্যবহৃত হয়, সিফিলিস রোগী ছাড়া যে কোন ব্যক্তির ঐ পরিমাণ আর্সেনিক সহ্য করবার ক্ষমতা অনেক বেশী।

* * * * *

পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে, সাধারণত মানুষ সারা জীবনে ৫০ টন খাদ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

* * * * *

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, মানুষ সাধারণত ৯ই ফিটের বেশী লম্বা হয় না।

* * * * *

শরীরে ভিটামিন 'এ'র অভাবেই মানুষ রাতকানা হয়।

* * * * *

পৃথিবী থেকে চল্লিশ হাজার ফিট উপরের তাপমান ৫৫° সেন্টিগ্রেড।

রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্য 'রোগশয্যায়'

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবি মৃত্যুঞ্জয়। জীবনের একনিষ্ঠ পূজারী তিনি, মরণকেও দেখিয়াছেন শান্ত সহজ দৃষ্টিতে। তাঁহার সত্যদৃষ্টির আলোকে জীবন-মরণের বিচ্ছেদ ঘুচিয়া গিয়াছে।

"ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ
দক্ষিণ বাহুতে বহি' চলিয়াছে যুগান্তের পানে।"

শুধু আজ নহে, পূর্বেও কবি জীবন-মরণের এই দ্বৈতলীলা উপভোগ করিয়াছেন। মৃত্যুর মধ্যেও তিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন। কোথায় মৃত্যু? মৃত্যু তো প্রাণচ্ছন্দেরই ক্ষণিক যতি। "সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী, মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।" সমুদ্রের বুকে যে ঢেউটি ভাঙিয়া পড়ে, তাহাই তো পরক্ষণে নূতন ঢেউ হইয়া জাগিয়া ওঠে। ইহাই তো জগতের নিয়ম,—"মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।"

"জীবন-নির্ঝরিণী"র অমৃতধারা কবি অঞ্জলি পূরিয়া পান করিয়াছেন, তাই তো তিনি অমর; এ বিশ্বকে তিনি ভালো বাসিয়াছেন, তাই তো তাঁহাকে আমরা ভুলিতে পারি না।

"এ বিশ্বের নিত্যসুধা
করিয়াছি পান।
* * * *
"—সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবনে ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে
মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।"

বিশ্বব্যাপী অমৃতপ্রবাহকে তিনি সর্বাঙ্গ দিয়া, সর্ব অন্তর দিয়া পান করিয়াছেন; রোগান্তে প্রকৃতির এই আনন্দধারা আরও মধুময় হইয়া দেখা দিয়াছে।

"খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত,
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ,
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক্ সঞ্চারিত শিরায় শিরায়,
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও।"

মৃত্যুকে তিনি কোনদিনই ভয়ের চোখে দেখেন নাই। জীবন-প্রভাতে যাহাকে 'শ্যাম-সমান' বলিয়া প্রিয়-সম্বোধন করিয়াছিলেন, যৌবনে যাহার 'চুপি-চুপি' কথার অর্থ জানিতে চাহিয়াছিলেন, যৌবনান্তে যাহার মধ্যে 'জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা'র আভাস পাইয়াছিলেন, আজ তাহারই মুখাবরণ মুহূর্তের জন্য অপসৃত হইয়াছিল, অর্ধচেতন অবস্থায় কবি তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়াছেন।

স্থূলে প্রয়োজনের সংসার দূরে সরিয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় রোগশয্যায় আমাদের কোমল অনুভূতিগুলি অসম্ভব-রকম সূক্ষ্ম হইয়া ওঠে। সদ্য রোগমুক্ত দেহে 'ভোরের চড়ুই পাখি', 'কমলালেবুর ঝুড়ি', 'পূজাগন্ধী বাতাসের হিমস্পর্শ', 'ফুলদানে গোলাপ'—তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও অসামান্য হইয়া দেখা দিয়াছে। পৃথিবীর যে রূপ রস গন্ধ গান লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, তাহাই ফিরিয়া পাইলাম, এই আনন্দ যেন সর্বকিছুতে মায়া-মাধুরী মাখাইয়া দিয়াছে।

শুধু এই ক্ষুদ্র ও ক্ষণিকের মাধুর্যই নহে, যে ধ্রুবজ্যোতির আভায় বিশ্ব উজ্জ্বল, তাহার আভাসে অনেকগুলি কবিতা অপূর্ব মহিমমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী
চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
—আনন্দ-অমৃত-রূপে বিশ্বের প্রকাশ।"

আনন্দময়ের উপাসক কবি, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে নিত্য তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জড় ও চেতনের ব্যবধান তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন,—

"যে চৈতন্য জ্যোতি প্রদীপ্ত রয়েছে মোর
অন্তর গগনে
* * * * *
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে।"
"আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।"

অনন্ত জগৎ প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে চেতনার ধারা।

"দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে, ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্য-সাগর-তীর্থপথে।"

জীবন-মরণের মোহানায় দাঁড়াইয়া কবি যে জ্যোতির্ময় মহাসাগরের গান শুনিয়াছেন, আমরাও কবিকণ্ঠে সেই সংগীত শুনিয়া ধন্য হইলাম; আমাদের শাশ্বত সত্তাকে ক্ষণিকের জন্য উপলব্ধি করিলাম।

এ কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই মহিমার ভাব। শুধু সৌন্দর্য নহে, ইহাতে আছে ধ্রুবদীপ্তি; ইহা শুধু শিল্প নহে, ইহা স্তব, ইহা ধ্যান। এখানে কল্পনা এমন ঊর্ধ্বস্তরে উঠিয়াছে, যেখানে হৃদয়ের চঞ্চল বৃত্তিগুলি স্তব্ধ হইয়া যায়, একটি গম্ভীর প্রশান্তি অন্তরাত্মাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কবিমনের এই ধ্যানদৃষ্টি এ যুগে সুলভ নহে। ধূলিধূম্রে আজ দিগ্দিগন্ত আচ্ছন্ন এবং অনিত্যের প্রশংসায় সুচতুর কবিদল মুখর, এই সৌম্য শান্ত তপস্বীর উদার বন্দনাগীতি একালে অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ। ভোরবেলায় গোলাপ ফুলটি দেখিয়াও তিনি বিশ্বরহস্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়াছেন:—

"ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।"

কবি "পূজাগন্ধী বাতাসের" কথা বলিয়াছেন, তাঁহার কবিতাগুলিও "পূজাগন্ধী।" বিশ্বদেবতার মন্দিরে তিনি পূজা-পুষ্প বহিয়া আনিয়াছেন। শান্ত সমাহিত কবির মন। স্নিগ্ধ শিশিরার্দ্র তাঁহার পুষ্পগুলি।

"প্রত্যূষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি অভিষেক
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।"

কবির মনও নমস্কারে আনত।

কয়েকটি কবিতায় শুশ্রূষাকারিণীর প্রতি কবির বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। নারী কল্যাণী, সেবাময়ী, মমতাময় হস্তে সে মানবের দুঃখ গ্লানি মুছিয়া দেয়।

"পুরুষ আপন চারিদিকে জমায় আবর্জনা
মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা।"

রোগীর শরীর মনের ক্লান্তি দূর করিতে তাহার কতনা যত্ন! কতনা আগ্রহ!

"চুপি চুপি পা টিপিয়া
ঘরে আনে প্রভাতের আলো।
পথ্যের থালাটি নিয়ে হাতে
বারম্বার উপরোধে
রুচির বিরোধ লয় জিনি'

এলোমেলো যত কিছু সযত্নে গুছায়ে রাখে
আঁচলে ধূলার লেশ ঝাড়ি'।
দু'হাতে সমান করি' শয্যার কুঞ্চন
আসন প্রস্তুত রাখে শিয়রের কাছে
বিনিদ্র সেবার লাগি।"

* * * * *

মৃত্যুলোকের দ্বার হইতে কবি ফিরিয়া আসিয়াছেন, আনিয়াছেন লোকাতীত, মরণাতীত মহিমার বাণী। তাঁহার নূতনতম কাব্য বঙ্গসাহিত্যে যে অম্লান ধ্রুবদীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছে, তাহা চিরদিন মানবাত্মাকে সমুন্নত ও পরিতৃপ্ত করিবে।

*'রোগশয্যায়'—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০, কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲। বিশেষ সংস্করণ ৫০খানি মাত্র, কবিকর্তৃক স্বাক্ষরিত, জাপানী বাঁধাই ৪৲।

পুস্তক পরিচয়

জাগরণী—শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। যশোহর বিনোদপুরস্থ বসন্ত যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ মহাভারতী মহোদয়ের অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী। প্রাপ্তিস্থান—২সি, ধনদা ঘোষ স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

স্বামী কেশবানন্দের পরিচয় অনেকেই রাখেন না, বাঙলার জাতীয় জীবনের উদ্বোধনের মূলে যাঁহাদের ঐকান্তিকতার অবদান রহিয়াছে, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার বিনোদপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী ঘুল্লিয়া গ্রামে স্বামী কেশবানন্দের আশ্রম ছিল। যশোহরে নীলকর বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন এই স্বামী কেশবানন্দ। ঋজু, দীর্ঘদেহ, বৈরাগ্যব্রতধারী এই সন্ন্যাসীকে দেখিলে আনন্দ মঠের স্মৃতি অন্তরে জাগরূক হইত। দেশ সেবার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন এই তেজস্বী এবং একান্ত অকুতোভয় সন্ন্যাসী। আজকাল যে সব গঠনমূলক কর্মের কথা শুনা যায়, তেজস্বী স্বদেশসেবক স্বর্গীয় হীরালাল রায়, 'কল্যাণী' পত্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী কেশবানন্দের চেষ্টায় যশোহরের নিভৃত পল্লীতে তাহার সূচনা হয়। অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের প্রবর্তন করেন ইঁহারাই। স্বামী কেশবানন্দ যোগী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বিশিষ্টতা ছিল এই যে, তাঁহার আধ্যাত্ম সাধনা নিষ্ক্রিয়তার দিকে তাঁহাকে লইয়া যায় নাই, প্রেমময় কর্মসাধনার প্রভাবে রাজনীতিক কার্য্যকারিতার দিক হইতে তাহা প্রবল ছিল। শ্রীঅরবিন্দ বরদা হইতে বাঙলাদেশে আসিয়া রাজা সুবোধ মল্লিককে সঙ্গে লইয়া স্বামী কেশবানন্দ এবং তাঁহার সতীর্থদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মাগুরায় গিয়াছিলেন। সেবার ভাবময় ছিল এই শুদ্ধাচারী সন্ন্যাসীর জীবন। তাঁহার রাজনীতিক বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল প্রখর। গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী সংকলিত করিয়া দিয়াছেন, 'কল্যাণী' মাসিক পত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বামী কেশবানন্দের লিখিবার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট, পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ পাঠে ভ্রমণ কাহিনীর বিচিত্র রস আস্বাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর অন্তরের পরিচয়ও লাভ করিবেন। তাহা ছাড়া এই গ্রন্থে স্বামী কেশবানন্দের লিখিত অপর কয়েকটি প্রবন্ধ এবং কবিতা আছে। গ্রন্থকারের নিজের লিখিত দুইটি প্রবন্ধ আছে। চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরমযোগী স্বামী পূর্ণানন্দ এবং তাঁহার শিষ্যগণের জীবন কথা তৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার দিয়াছেন। বাঙলার আধুনিক ধর্ম এবং সমাজ আন্দোলনের একটা ধারণা তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া পাওয়া যাইবে। এই সব সাধক নামযশের কাঙ্গাল না হইলেও ইঁহাদের সাধনা এবং জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রত্যেকের উচিত। দেশকে এবং জাতিকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে তাহাই উপায়। ৩২ খানা ফটো-চিত্রে গ্রন্থখানি সজ্জিত। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

বর্ষায়—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পারিসার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বাঙলা দেশে গল্প সাহিত্যে রস-রচনায় যে কয়জন লেখক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন বিভূতিভূষণ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার হাত পাকা এবং মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। বাঙলা দেশের রসমাধুরী তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া ছন্দ ধরিয়া উঠে, ভাষার মধ্যে পাওয়া যায় সৌন্দর্য, আত্মীয়তার প্রতিবেশের একান্ত স্পর্শ। আলোচ্য গল্পের বইখানায় এগারটি গল্প আছে। গল্পগুলি সবই আমাদের ভাল লাগিয়াছে, সত্যকার গল্পের রস সবগুলির মধ্যেই আছে। "বর্ষায়", "পাতু", "গোলাপী রেশম", "রায়ট", "মদনগোপালের বিরহ" এই কয়েকটি গল্প তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভূতিবাবুর ভাষার একটা শ্রী আছে, সে ভাষা লাবণ্যময়ী, সে ভাষার বিভঙ্গী আছে কিন্তু সে বিভঙ্গী রসধর্মকে ক্ষুন্ন করে না; সর্বত্র সুষ্টু সংযম এবং সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলে এবং সেই সংযম-সম্ভূত তারুণ্যই পাঠককে মুগ্ধ করে। তাঁহার সৃষ্টিতে নাগরিকতার প্রগলভতা নাই, সে রস ফুটিয়া উঠিয়াছে পল্লীর নবোঢ়ার লীলাময়ী ব্রীড়ায়। উচ্ছৃংখলতার মর্মান্তিক আড়ষ্টতা তাঁহার লেখার মধ্যে নাই, আছে জীবনের স্বাভাবিক এবং সহজ সুরের অনাড়ম্বর ঐকান্তিক স্বচ্ছন্দ সঞ্চার। আলোচ্য গ্রন্থের গল্প কয়েকটি বাঙলা দেশের গল্প সাহিত্যকে সত্যকার সমৃদ্ধি দিবে এবং পাঠক পাঠিকারা গল্প কয়েকটি পড়িলে সত্যই যে আনন্দ পাইবেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই সবই সুন্দর।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অব শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীন্, মধ্যলীলা—অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার চৌধুরী এম, এ (ট্রিপল) কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কার্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ আদ্য, মধ্য এবং অন্তলীলা, মূল্য ৩০৲ টাকা অথবা দুই পাউন্ড (বিদেশে)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময় জীবনের পরিচয় ভারতের বাহিরে প্রথমে প্রচার করেন শিশিরকুমার। সেই প্রেমধর্মের একান্ত এবং অন্তর্গূঢ় রসের বিস্তার রহিয়াছে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাধনার অবদান কয়েকখানা গ্রন্থের ভিতর দিয়া বাহিরে এই তত্ত্বের কিছু কিছু বিস্তার ঘটিয়াছে। স্যার যদুনাথ এই মহা গ্রন্থের মধ্যলীলা অংশের অনুবাদ করিয়াছেন। সমগ্র শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ইংরেজী অনুবাদ এ পর্যন্ত হয় নাই। সুপণ্ডিত সঞ্জীবকুমার এবং ভক্ত নগেন্দ্রবাবু সেই প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ইঁহাদের আদ্যলীলার অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যলীলার অনুবাদ পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অতি দুরূহ গ্রন্থ, দুরূহ বলিতেছি এই হিসাবে যে, ইহার গূঢ়ার্থের উপলব্ধি শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা হয় না, বিশিষ্ট সাধন পন্থা ধরিয়া সে রসকে অনুভব করিতে হয়। এমন গ্রন্থের অনুবাদ সে তো আরও কঠিন ব্যাপার। এই গ্রন্থের ভাষার যে বিশিষ্ট দ্যোতনা এবং ব্যঞ্জনা তাহা না ধরিতে পারিলে ইহাকে ভাষান্তরিত করা সম্ভব হইতে পারে না এবং কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় সেই বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা এবং দ্যোতনা উপলব্ধি করা একান্তভাবে শুধু তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে যিনি তাঁহার অনুভূতির স্তরে পৌঁছিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর অনুভূতির সেই যে স্তর, সে স্তরে ভাষা বিগাঢ় হইয়া ভাবে পরিণত হইয়াছে এবং ঘনীভূত রসমাধুর্যে সেই ভাব ধরিয়াছে বিগ্রহের আকার। এইখানেই কবিরাজ গোস্বামীর কবিত্ব। এই হিসাবেই তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নিজে লেখেন নাই, রস-বিগ্রহের আত্যন্তিক স্পর্শেই তাঁহার লেখনী লীলায়িত হইয়াছে। নিজের অহঙ্কারকে তিনি বিলীন করিয়া দিয়াছেন ব্যাপ্তি রসের ভিতরে এবং তাহাতেই তাঁহার মাধুর্য এবং সেইখানে তিনি উপদেষ্টা এবং অনুশাসয়িতা। অনুভবের এই অতীন্দ্রিয় রসের রাজ্যে কবি যখন অনুপ্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার ভাষা হেতুমৎ হয় এবং আপনা হইতেই বিনিশ্চিত হইয়া উঠে,

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অনপেক্ষ অন্বর্থ আনন্দ রসের তিনি হন উদ্গাতা, তাঁহারা বাক্য হয় মন্দ্র এবং যিনি অন্তর রসের সাধক তিনিই শুধু সেই মন্দ্রার্থকোবিদ হইতে পারেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সে অর্থ বুঝা যায় না, তর্কের স্পর্শে সে রসটি উবিয়া যায়। এমন যে সব গ্রন্থ সেগুলির মৌলিকত্ব কোনদিন ক্ষুন্ন হয় না এবং খাঁটি রসটিকে আস্বাদন করিতে হইলে মূল গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয়, কবিকে দেশ কালের অতীত নিত্য এবং সত্যস্বরূপে পাইতে হয়, মধ্যস্থের কারবার এমন ক্ষেত্রে নাই। সাহিত্যের প্রাণপদার্থ এমন কবি এবং এমন সাহিত্যিক-দেরই অধিকারে থাকে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সার্বভৌম সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হইতেছেন ইঁহারাই। প্রাদেশিকতার গণ্ডী কাটাইয়া ইঁহাদের অবদান আস্বাদন করিয়া মানুষ আপনার মহত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, অন্তরে পায় রসলোকের সন্ধান।

এই অন্তর এবং নিগূঢ় রসের উদ্গীতি যে মহা গ্রন্থ তাঁহার অনুবাদের দুরূহতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাঙলা ভাষা যাঁহারা জানেন না, অনুবাদের আশ্রয় তাঁহাদিগকে লইতে হইবেই। বাঙলার বিশিষ্ট এই রসধারার সঙ্গে জগতের যোগ করিবার জন্য বাঙলার ভাবের যাঁহারা ভাবুক, তাঁহাদের আগ্রহ থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। বিশেষত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব তাহা কেবল বাঙলার জন্য নয়, তাহা সমগ্র জগতের জন্য। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুবাদ সেই সত্যকে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করে তবেই এই অনুবাদ সার্থক হইল বলা যায়। আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থখানা আমাদিগকে সে বিষয়ে আশান্বিত করিয়াছে। গূঢ়ার্থ শব্দগুলির বিশ্লেষণাত্মক টীকা এমন গ্রন্থে বিশেষভাবে আবশ্যক। তেমন টীকা পুস্তকের উপসংহার-ভাগে সংযোজিত হইবে, ইহা জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। সে সাফল্য সমগ্র জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে।

আধুনিক যুদ্ধঃ—শ্রীভবেশচন্দ্র রায় ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, ৪০-এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত। ইহা যুদ্ধের ইতিহাস নয়, কি ভাবে আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ হয় তাহার বর্ণনা এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত মারণাস্ত্রসমূহের পরিচয়। পুস্তকের অবতরণিকায় কি ভাবে বর্তমান যুদ্ধ বাধিল, সংক্ষেপে সেই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আভাষ দেওয়া হইয়াছে। তারপর পুস্তকখানিকে আকাশ বাহিনী, জলবাহিনী, স্থলবাহিনী, গোলাগুলি, আত্মরক্ষা, প্রচারবাহিনী, বিভীষিণবাহিনী, পরিসমাপ্তি ও পরিশিষ্ট—এই কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিমানের পরিচয়—কোন বিমানের কি কাজ—বিমানযুদ্ধের সাধারণ রীতি ও কৌশল—বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজের বর্ণনা, জলযুদ্ধে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান অস্ত্র—নৌযুদ্ধ কিভাবে পরিচালিত হয়—স্থলবাহিনীর কোন কোন বিভাগের কি কি কাজ—আধুনিক কামান বন্দুকের পরিচয়—যুদ্ধে প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তা—গুপ্তচর বিভাগের কাজ প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ই সরল সহজ ভাষায় পুস্তকখানিতে আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ইতিহাসও দেওয়া হইয়াছে। শেষের দিকের নির্ঘণ্টও উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর পুস্তকখানি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে নানা তথ্যে পূর্ণ এবং লেখকদ্বয়ের শ্রম প্রশংসনীয়।

আলোচ্য পুস্তকের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে উহার অসংখ্য চিত্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। পুস্তকের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে অপ্রিয় হইলেও দুই চারিটী সত্য কথা না বলিয়া উপায় নাই। গ্রন্থকারদ্বয় তাঁহাদের নিবেদনে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলা ভাষায় যুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন বই লেখা হয় নি" এবং আচার্য রায় তাঁহার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "বাঙ্গলায় যুদ্ধের নীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ কোন পুস্তক রচনার চেষ্টা করিতেছেন ইহা শুনি নাই।" ইহা সত্য নয়। ইতিপূর্বে "যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র" নামে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে এবং সেই একই লেখকের "রণ ও রাষ্ট্র" নামে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ নূতন পুস্তকও আলোচ্য গ্রন্থ হাতে আসিবার পূর্বেই সমালোচনার জন্য আমরা পাইয়াছি। Britain's Fighting Forces নামক গ্রন্থ হইতে হুবহু কয়েকখানি ছবি ছাপিয়া তাহাতে Kanti Sen লিখিয়া দেওয়াও সৌজন্য এবং শালীনতা বিরুদ্ধ।

সাহিত্য সংবাদ

কবিতা প্রতিযোগিতা

আনন্দ সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে কবিতা প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতায় সকল শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের সাদরে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যিনি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তিনি একটি কাপ ও একটি রৌপ্য পদক পাইবেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী দুইটি করিয়া রৌপ্য পদক পাইবেন।

অতিরিক্ত—কবিতা মনোনীত হইলে তাঁহাদের একটি করিয়া পদক দেওয়া হইবে।

কবিতার বিষয়ঃ—প্রকৃত ভালবাসার রূপ ও সাম্প্রতিক বাঙালীর আদর্শ।

কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৯শে পৌষ। এই প্রতিযোগিতার বিচারকঃ—কবিশেখর কালিদাস রায় এবং কমলারাণী মিত্র।

ঠিকানাঃ—কাশ্মীর দত্ত, ৯নং কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া।

বীরভুমের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীর সাহায্যকল্পে

দেশবাসীর প্রতি আবেদন

বর্তমান বৎসরে বীরভুম জেলার সর্বত্র অনাবৃষ্টির জন্য সমস্ত শস্যাদি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীরভুমের প্রায় এগার লক্ষ জনগণের অধিকাংশই কৃষিজীবী। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ বীরভুম মরুভূমে পরিণত হইতে বসিয়াছে। মানুষের গৃহে শস্য নাই, গৃহপালিত পশুদের আহার্য নাই, পুষ্করিণীসমূহ জলশূন্য। ইতিমধ্যেই মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুদিগের পানীয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার উপর সমগ্র জেলায় ভীষণ আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

বীরভুমের দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীকে সাহায্য করিয়া ধ্বংসের কবল হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিভিন্ন সাহায্য সমিতি খোলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বীরভুমের তরুণগণের উদ্যোগেও একটি "বীরভুম দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি" গঠিত হইয়াছে। বীরভুমের তরুণদিগের এই সৎপ্রচেষ্টা যাহাতে সমস্ত বাঙলার তরুণ ও প্রবীণদের সাহায্য ও শুভেচ্ছা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে এবং বীরভুমের রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহার জন্য আমরা সমগ্র বাঙলার এবং ভারতের প্রত্যেককে সানুনয় আবেদন জানাইতেছি। দুঃখের সময়েই সহানুভূতির প্রকৃত পরীক্ষা; সুতরাং আমরা আশা করি, দরিদ্র বীরভুম সমগ্র বাঙলার তথা ভারতের আর্থিক সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে না। নিবেদন ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, বীরভুম; রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর সি-আই-ই; শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, বীরভুম সম্মেলন; শ্রীসজনীকান্ত দাস, সম্পাদক, শনিবারের চিঠি; রায় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম-বি-ই; শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, সভ্য, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা; ডাক্তার সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, পি-এইচ-ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; ডাঃ কুদরৎ এ খোদা, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ; শ্রীহরিকিঙ্কর সামন্ত, চেয়ারম্যান, বীরভুম জেলাবোর্ড ও সিউরী মিউনিসিপ্যালিটি। যাবতীয় সাহায্যাদি সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র ১৫৯-এ, বহুবাজার স্ট্রীটে সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীব্রহ্মগোপাল মিত্রের নামে অথবা শাখাকেন্দ্র পরি-চালক শ্রীঅম্বিকা মুখোপাধ্যায়ের নামে সিউড়ী, বীরভুম ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

৮ম বর্ষ] ২৭শে পৌষ, শনিবার, ১৩৪৭ Saturday, 11th January, 1941 [৯ম সংখ্যা

দূর স্মৃতি

নির্জন রোগীর ঘর। খোলা দ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্ন তাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বল স্রোত নদীর মতন,
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে।
মনে পড়ে কত দিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
বর্ণহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা
জেলে ডিঙি চলে পাল তুলে।
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
সমস্ত দিনের পটে
অতি ক্ষীণ চিহ্ন দেয় কর্মের চিন্তার রেখাগুলি,
পরক্ষণে মুছে যায়।
স্বচ্ছ আনন্দের রূপ স্তব্ধ হেরি অন্তরে বাহিরে
প্রসারিত পাণ্ডু নীল আকাশের তলে।

হেথায় চাহিয়া দেখি বিরস প্রান্তর
সংসারের দায়হারা
তপ্ত শয্যাশায়ী
অকর্মণ্য রোগী সম।
সঙ্গীহীন ছায়াহীন তালগাছ শূন্যে চেয়ে থাকে
দেখি সেই কৃপণের মাঝে
দীর্ঘ দিনে আপনার নিরর্থক ভাবনার ছবি।

২৭।১২।৪০
উদয়ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাময়িক প্রসঙ্গ

মৌলানা আজাদ—

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এলাহাবাদের পুরুষোত্তম পার্কে একটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মৌলানা সাহেব এজন্য প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তিনি সত্যাগ্রহ করিবেন। গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে সে কাজে আগাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করা হইয়াছে। গ্রেপ্তার হইবার সময় মৌলানা সাহেব গ্রেপ্তারকারী পুলিশ কর্মচারীকে অভিনন্দিত করিয়া সেই কথাই জানাইয়াছিলেন। কংগ্রেস ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের তিনি প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার গ্রেপ্তারে যে দেশব্যাপী একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। মৌলানা সাহেবের গ্রেপ্তারে নাগপুর, লাহোর, আমেদাবাদ, দিল্লি, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে হরতালই ইহার প্রমাণ। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের দিল্লির সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মৌলানা সাহেবের গ্রেপ্তারে দেশে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাহা জানাইয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কর্তারা এত জানেন, আর ভারতের সম্বন্ধে অবলম্বিত নীতির কি পরিণতি, তাহা তাঁহারা না জানেন ইহা নহে। পণ্ডিত জওহরলালের গ্রেপ্তার এবং দণ্ডের পর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কয়েকজন সদস্য সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন; তারপর ইংলণ্ডের কতিপয় বিশিষ্ট মহিলাদের উপদেশও তাঁহারা পাইয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের জনমতের দিকে তাঁহারা দৃক্‌পাত করিতে প্রস্তুত নহেন কিম্বা ভারতের জাতীয় দাবী পূর্ণ করিতে অথবা সেই দাবী পূরণের ভিত্তিতে কোন আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে তাঁহারা সম্মত নহেন। তাঁহারা নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব লইয়াই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কটের ষোল আনা ঝুঁকি লইতে দাঁড়াইয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতির গ্রেপ্তার ব্রিটিশ রাজনীতিকদের যে শোচনীয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে তাঁহাদের বহু বিজ্ঞাপিত গণতান্ত্রিকতার শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে আন্তরিকতাহীনতারই তাহা অকাট্য নিদর্শন।

সাচ্চা ও মেকী—

বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিমউদ্দীন গত ৪ঠা জানুয়ারী শনিবার ঢাকার নর্থব্রুক হলে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতাও যেমন তেমন বক্তৃতা নয়, জটিল বিষয়ে জবর বক্তৃতা এই বক্তৃতায় তিনি বলেন,—"ইংরেজ আমাদের দাবী মানিয়া লউক সত্যই এই ইচ্ছা যদি আমাদের থাকে, তাহা হইলে আমাদের পক্ষ হইতে দাবী হওয়া দরকার একটি, দুইটি হইলে চলিবে না এবং যত সত্বর আমরা আমাদের দাবী এক করিতে পারি, তত সত্বরই আমরা যাহা চাই, তাহা আমরা পাইব।" এক দাবী না হইয়া দুই দাবী কেন হইতেছে, ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন,—"একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতে দুইটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে, যে দুইটি হাতে প্রকৃত শক্তি আছে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের; একটি কংগ্রেস, অপরটি মোশ্লেম লীগ। কংগ্রেস যাহা দাবী করিতেছে, মোশ্লেম লীগের দাবী হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। দুই প্রতিষ্ঠানই নিজেদের দাবী ভারতের প্রকৃত দাবী বলিয়া জোর করিতেছে।" স্যার নাজিম জিন্না সাহেবের অন্যতম চেলা, জিন্নাই জিগীর ছাড়িয়া তিনি প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের উহা সহজ উপায় অর্থাৎ গণতান্ত্রিকতার নীতি ছাড়িয়া মন্ত্রিমণ্ডলেও সাম্প্রদায়িকতা পাকা করিয়া লও। কংগ্রেস না হয় গণতান্ত্রিকতা বিকাইয়া দিয়া ইহাও করিল; কিন্তু কেন্দ্র গভর্নমেণ্ট সম্পর্কিত ব্যাপারে কংগ্রেস একসঙ্গে বড়লাট এবং জিন্না সাহেবের মন যোগাইয়া চলিবে কেমন করিয়া? স্যার নাজিমউদ্দীন জিন্না সাহেবের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বড়লাটের প্রস্তাব মানিয়া লইবার জন্য সুপারিশ করিতে পারেন না। জিন্না সাহেবের আদর্শ হইল পাকিস্থান এবং বড়লাটের প্রস্তাবিত শাসন পরিষদেও তিনি মুসলমানের প্রাধান্য না পাইলে খুসী নহেন। গণতান্ত্রিকতা বলি দিয়া সেখানেও সাম্প্রদায়িকতা। স্যার নাজিমউদ্দীন মিঃ জিন্নার যোগ্য শিষ্য সন্দেহ নাই; কারণ মুসলীম লীগকে কংগ্রেসের সম পর্যায়ে ফেলিবার চালটা তিনি এই বক্তৃতাতেও চালিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত ভারতের দাবী পদার্থটা কি? প্রকৃত ভারত বলিতে কি জিন্না সাহেবের দলের কয়জন চাঁইকে বুঝায়, না প্রকৃত ভারতের দাবীতে ভারতের সর্ব জাতি এবং সম্প্রদায়েরও স্থান আছে? নিতান্ত মূর্খেও এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। দেশের লোককে বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব এতটা বোকা মনে করিবেন না এবং বৃটিশ মন্ত্রীরাও নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য লীগওয়ালাদের পিঠ যতই চাপড়ান না কেন, ভারতের প্রকৃত দাবী যে একমাত্র কংগ্রেসেরই দাবী এ সত্য তাঁহারাও বুঝেন মোশ্লেম লীগ যতই চীৎকার করুক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আনুগত্যে মুষ্টিমেয়ের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ যদি লীগওয়ালারা বুঝিতেন তাহা হইলে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহারা যোগ দিতেন। কংগ্রেসে তাঁহাদের সকল সুবিধাই রহিয়াছে, তবে সে সুবিধায় নিজেদের স্বয়ংসিদ্ধ নেতাগিরির সাধ মিটে না, এই জন্যই দুই সুর তাঁহারা জিদ করিয়া চড়াইতেছেন; কিন্তু মুষ্টিমেয় স্বার্থসেবীর এই হীন প্রবৃত্তি নবজাগ্রত

ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থিতা বেশী দিন করিতে পারিবে না। ধোঁকার কারবার বেশী দিন চলে না।

দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট—

যার নাম চালভাজা তার নামই মুড়ি, কথায় ইহা থাকিলেও কাজে তফাৎ আছে; সেইরূপ দুর্ভিক্ষ এবং অন্নকষ্ট, ভুক্তভোগীদের পক্ষে জিনিষটা এক হইলেও এ দেশের শাসকদের দায়িত্বের দিক হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে। এজন্য গভর্নমেণ্টের দৃষ্টিতে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ বিরল, তবে অন্নকষ্ট কখনও কখনও ঘটিয়া থাকে এবং সে অন্নকষ্টের বিশেষ লক্ষণ এই যে, ঐ সময়ে অন্নাভাবে মানুষ কস্মিন-কালেও মরে না, মরে ব্যারাম-পীড়ায়। গভর্নমেণ্টের এই বিচার অনুসারে বীরভূম জেলায় অন্নকষ্ট ঘটিয়াছে। বীরভূম এবং মেদিনীপুর জেলার নানা অঞ্চল হইতে কিছুদিন হইতেই দুর্ভিক্ষের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন ইতিপূর্বে প্রচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি বীরভূমের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে সাহায্য করিবার জন্যও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির আবেদন আমরা প্রকাশ করিয়াছি। বাঙলা দেশে বলিতে গেলে সুভিক্ষ কোন অঞ্চলেই নাই। একে যুদ্ধের জেরে জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা, তারপর অজন্মার ফলে চাউলের মূল্য দিন দিনই চড়িয়া যাইতেছে। রেঙ্গুণী চাউলের আমদানীর উপর ট্যাক্স বসিয়াছে, তারপর বাঙলা দেশের চাউলেরও টান পড়িয়াছে বাহিরে। চাউলের দর একেবারে মন্দা থাকে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু চাউল হইল এ দেশের লোকের প্রাণধারণের প্রধান পদার্থ, তাহার দুর্মূল্যতাও আশঙ্কার কথা। চাউলের বাজার যেভাবে চড়িতেছে, তাহাতে বাঙলার সর্বত্রই এই আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। বীরভূমের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশার প্রতীকার করাই হইল গভর্নমেণ্টের প্রধান কর্তব্য, কিন্তু এদেশে আইন ও শান্তিরক্ষার উপর অতিরিক্ত খবরদারী করিতেই কর্তাদের সমস্ত উদ্যম ব্যয়িত হয়। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল বিপন্ন বীরভূমবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য কাজে কি করিতেছেন, আমরা তাহাই দেখিতে চাই। বড় বড় ফাঁকা কথার কোন মূল্য নাই।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব নির্বাচন নদী পার হইবার প্রয়োজনে একবার প্রাথমিক শিক্ষা বাঙলার সর্বত্র বিনা পয়সায় বিতরণ করিবেন এমন জিগীর তুলিয়াছিলেন। এখন আবার নির্বাচনের নদী পার হইবার প্রয়োজন ঘনাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই কি প্রাথমিক শিক্ষার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে? কারণ শিক্ষার সম্প্রসারণই যদি তাঁহার অন্তরের একান্ত কামনা থাকিত, তবে এতদিন এই পরিকল্পনা ছিল কোথায়? বর্তমান পরিকল্পনাটি এইরূপ যে, শিক্ষার্থী শিশুদের বাসস্থানের এক মাইলের মধ্যে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় বসিবে। ইহাতে প্রতি দুই হাজার লোকের একটি করিয়া বিদ্যালয় হিসাবে পড়ে। প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য একজন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন। শিক্ষকদের বেতন হইবে ১৬৲, ১২৲ এবং ১০৲ টাকা করিয়া। বাঙলাদেশের ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বাঙালী বালক এই পরিকল্পনার মধ্যে পড়িবে। পরিকল্পনা উপরে উপরে তো দেখিতে ভালই; কিন্তু কার্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া না বুঝান পর্যন্ত ভয় থাকিয়া যায় এই যে, এই সূত্রে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত না হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার যে প্রয়োজনীয়তার যুক্তি নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে হক সাহেব শুনাইয়াছেন, তাহাতে এই আশঙ্কা করিবার বেশই কারণ আছে। তারপর টাকা আসিবে কোথা হইতে? পরিকল্পনা কার্যকর করিতে হইলে বৎসরে তিন কোটি টাকার প্রয়োজন। শিক্ষাকর হইতে যে টাকা উঠিবে, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা লিখিত নয়। বাঙলাদেশের ১৪টির অধিক জেলায় এখনও শিক্ষাকর প্রবর্তিত হইতে পারে নাই। দেশের আর্থিক অবস্থা যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন জায়গায় শিক্ষাকর আদায় স্থগিত রাখা উচিত বলিয়া কথা উঠিয়াছে। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির উপর এক্ষেত্রে সব নির্ভর করিতেছে, কারণ খরচটা দেশের লোককেই বহন করিতে হইবে। কিন্তু সেদিকে কি চেষ্টা হইতেছে? মোটা মাহিয়ানা এবং ভাতার বরাদ্দ ঠিক থাকিলেই দেশের লোক কৃতার্থ হইবে না, কিংবা শুধু পরিকল্পনাতেও দেশের লোকের পেট ভরিবে না।

বাঙলায় জাহাজী শিল্পের বিরুদ্ধতা—

ভারতে উড়োজাহাজ, মোটর ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের নীতির স্বরূপ শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদের একটি বিবৃতি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্টের কাছে উড়ো জাহাজ তৈয়ারীর একটি পরিকল্পনা পেশ করা হয়, তাহাতে গভর্নমেণ্টের নিকট কোন অর্থ সাহায্য চাওয়া হয় নাই; কেবলমাত্র উৎপন্ন বিমানের সামান্য পরিমাণ ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি চাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু গভর্নমেণ্ট ইহাতে সাড়া দেন নাই; অথচ কানাডাতে মাসিক ৩৬০খানা, অষ্ট্রেলিয়ায় দৈনিক দুইখানা করিয়া বিমান প্রস্তুত হইতেছে। সিন্ধিয়া কোম্পানী গত ৫ বৎসর হইতে কলিকাতার কাছে জাহাজ নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত জমি পাইবার চেষ্টায় ছিলেন, অবশেষে যখন জমিটুকু পাওয়া গেল; তখন কলিকাতার পোর্ট কমিশন ট্রাষ্ট এত বেশী খাজনা দাবী করিলেন যে, সেখানে কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই ছাড়িতে হইল। এই পোর্ট ট্রাষ্ট ভারত গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন, কিন্তু ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রতিকূলতার কাছে তাঁহারা নিতান্ত অসহায়। অবশেষে সিন্ধিয়া কোম্পানী ভিজাগা-

পট্টমে জাহাজী কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত জমি যোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে; কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট কোন-রূপ অর্থ সাহায্য দূরের কথা, কোন রকমে সাহায্য করেন নাই।' শ্রীযুক্ত হীরাচাঁদ আরও বলেন যে, 'ভারতের অর্থ সচিব সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিভিন্ন ধরণের মোটরযান ক্রয় করিবেন। কিন্তু তাহাতে ভারতে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন আশার কথা নাই। বৈদেশিক শাসনে অনিবার্য পরিণতি যাহা ঘটে, ভারতের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে, দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বিদেশীর স্বার্থই হইতেছে বড়। এই নিত্য সত্যের ব্যাখ্যা ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। দেশ-বাসীর হাতে দেশের শাসন ব্যবস্থা না আসা পর্যন্ত আবেদনে নিবেদনে ইহার প্রতিকার অসম্ভব।

এম এন রায়ে 'বিপ্লব'—

প্রচণ্ড বিপ্লবী শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অতীত জীবন কাহিনী বাঙালী সহজে ভুলিতে পারে না, তাই তাঁহার শোচনীয় পতন দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় এবং দুঃখ হয়। এক-দিকে মোশ্লেম লীগের কতিপয় চাঁই, অপরদিকে ধামাধরা মন্ত্রিত্বের লোভী কয়েকজনকে যোগাড় করিয়া তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনে যাহারা কোন দিন ত্যাগ স্বীকার করে নাই—বিপ্লবের নাম শুনিলে যাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠে, কংগ্রেসের প্রতি দ্বেষ ও নোকরীর প্রতি লালসা, ইহাই যাহাদের গুণের মধ্যে একমাত্র গুণ, তাহাদিগকে লইয়া নেতৃত্বলোভী মানবেন্দ্রনাথ আজ আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় আশা করিতেছেন যে, ঐ শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীনদিগকে লইয়া ফাঁক তালে তিনি প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়া নেতাগিরির সাধ মিটাইবেন। তাহা কোন দিন পূর্ণ হইবে না। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার যতই ডালিই প্রদান করুন, বা, প্রাদেশিক কর্তা-দের সঙ্গে দহরম মহরম চালান না, সবই স্বপ্নে বিলীন হইয়া যাইবে। যিনি এখনও নিজেকে প্রচণ্ড বিপ্লবী বলিয়া জাহির করেন তাঁহার এই দৈন্য এবং বলিষ্ঠ আদর্শপরায়ণতার এমন অভাব দেখিয়া সত্যই দুঃখ হয়।

পরলোকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

গত সপ্তাহে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। তিনি তাঁহার এক পুত্রের সহিত বোম্বাইয়ের অন্তর্গত বান্দ্রাতে ছিলেন, গত ২৮শে ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের কর্মক্ষেত্র বাহিরেই বেশী বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত মহাশয় কলেজে স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে বর্তমান স্কটিশ চার্চ ইনষ্টিটিউশান এবং তৎকালীন ডাফ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময় স্বামীজীর সঙ্গে গুপ্ত মহাশয়ের বন্ধুত্ব ঘটে; তিনি পরমহংস দেবের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথম যৌবনেই নগেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র-সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। করাচীর "ফিনিক্স" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা হইতে তাঁহার সংবাদপত্রসেবীর জীবন আরম্ভ হয়। করাচী হইতে পরে তিনি লাহোরে আসেন এবং লাহোরে আসিয়া "ট্রিবিউন" পত্রের সম্পাদক হন। কয়েক বৎসর ট্রিবিউন পত্রের সম্পাদনা সুযোগ্যভাবে চালাইবার পর তিনি বাঙলা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং "প্রভাত" নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ আরম্ভ হইবার সময়, নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে গিয়া "ইণ্ডিয়ান পিপল" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হন—এই পত্রই পরে "লিডার" পত্রে রূপান্তরিত হয় বলা চলে। নগেন্দ্রবাবুই বিখ্যাত "লীডার" পত্রেরও প্রথম সম্পাদক। স্যার সি, ওয়াই, চিন্তামণি তখন ছিলেন সহ-সম্পাদক। এলাহাবাদ হইতে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় লাহোরে গমন করেন এবং "ট্রিবিউন" পত্রের পুনরায় সম্পাদক হন। "ট্রিবিউন" হইতে পরে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী পত্রিকা "পাঞ্জাবীর" সম্পাদক হন। "বেঙ্গলী" পত্রের সহিতও তিনি কিছুদিন সংশিলষ্ট ছিলেন। ভারতের, বিশেষভাবে উত্তর ভারতে যে কয়খানা সংবাদপত্র বর্তমানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেগুলির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বঙ্গসন্তান নগেন্দ্রনাথের লেখনী শক্তি। নগেন্দ্রনাথ ভারতের সংবাদপত্র-সেবার ক্ষেত্রে বাঙালীকে এই গৌরব দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের সেবাতেও তাঁহার অবদান সামান্য নহে। নগেন্দ্রবাবুর রচিত কয়খানা উপন্যাস এবং ছোট গল্পগুলি বাঙলার সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী তিনি নূতনভাবে সম্পাদিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার ইংরেজী অনুবাদও তিনি করিয়াছেন। পরিশুদ্ধ ইংরেজী লেখাতে তাঁহার হাত যেমন পাকা ছিল, তেমনই বাঙলা সাহিত্যে সরসতা এবং স্বচ্ছন্দতার জন্য তাঁহার লেখা সমাদর পাইয়াছে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে এবং অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বাঙলার এই বিশিষ্ট সন্তানের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মনের বন্ধন—

স্কটিশ চার্চ কলেজের সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন,—"জাতির সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ জাতির মন হইতেই। ব্যক্তির যেমন একটা মন আছে, তেমনই জাতিও একটা সমষ্টি মনের অধিকারী। এই সমষ্টি মন যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দীতে অভিব্যক্ত হয়। মনের মুক্তির জন্য আমাদের অতীতকে যে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। পক্ষান্তরে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে যাহা স্বাস্থ্যকর, যাহা উপযোগী আমাদিগকে তাহা বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।" মনকে বন্ধন মুক্ত করার অর্থ কি? কোনটি ধরিলেই বা মনের

বন্ধন, আর কিসেই বা মনের মুক্তি? সুভাষচন্দ্র কয়েকটি কথার মধ্যে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন,—"নব্য ভারতের জন্য যদি নূতন সংস্কৃতি গড়িতে চান, প্রকৃতির কোলে অগণিত মূক নরনারীর মধ্যে ফিরিয়া যান।" আজকাল অনেকের এই ধারণা হইয়াছে দেশের অতীতের যত কিছু তার প্রতি শ্রদ্ধামাত্রেই মনের বন্ধন এবং ইউরোপের আধুনিকতম অন্ধ অনুকৃতিই হইল মনের মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে অতীতের অন্ধ আনুগত্যও যেমন মনের বন্ধন, সেইরূপ ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ-স্পৃহাতেও রহিয়াছে মনের সঙ্কীর্ণতা। মনকে মুক্ত করিবার উপায় হইল সেবা এবং ভালবাসা। দেশের অগণিত মূক জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া যাওয়া তখনই আমাদের সার্থক হইবে যখন তাহাদিগের প্রতি সেবা এবং ভালবাসার প্রবৃত্তি অন্তরে লইয়া আমরা যাইতে পারিব। বিদেশীর অন্ধ অনুকৃতির সংস্কারাচ্ছন্ন অন্তরের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগ হইতে পারে না। তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকা চাই এবং দেশের অতীত সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদাবুদ্ধির সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার ঐকান্তিকতা যে অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে, যুক্তিতর্কে ইহা অস্বীকার করা চলে না এবং এ সত্যকেও স্বীকার করিতেই হয় যে, বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ, তাহাতে আধুনিকতা যতই থাকুক না কেন, এই শ্রদ্ধার অভাবজনিত ত্রুটি দূর করিতে সমর্থ নহে।

যুদ্ধে ভারতের লাভ—

যুদ্ধ বাধিবার পর ভারতের বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণের বিশেষ সুবিধা লাভ হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং জাপান হইতে আমদানী সূতী মালের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষে যত বস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ পূরণ হয় এখানকার মিলগুলি হইতে, শতকরা ২৬ ভাগ পূরণ হয় ভারতের তাঁতশিল্পের সাহায্যে এবং মাত্র ৯ ভাগ বিদেশী মালে পূর্ণ হইতেছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমানে ৪৫ কোটি টাকা খাটিতেছে এবং ৫ লক্ষ লোকের কাজ জুটিয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁতের দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের সংখ্যাও সামান্য নয়। বস্ত্রের ব্যাপারে ভারতের এই স্বাবলম্বনের দিকে গতিতে ভারতবাসী মাত্রেই সুখী হইবেন। দেশী কাপড়ের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে ইহা খুবই সন্তোষের বিষয়; কিন্তু বাঙলার কথাই এই সম্পর্কে আমাদের আগে মনে পড়ে। বস্ত্রশিল্পে বাঙালী এখনও স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই; বাঙলার তাঁতের শিল্প একদিন জগতের সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, আজ বাঙলার সেই তাঁতীদের অন্ন জুটে না। বাঙালীকে বস্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং বাঙলার তাঁত শিল্প যাহাতে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কাপড়ের বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মিলের স্বার্থকে ক্ষুন্ন না করিয়া বাঙলার তাঁত শিল্পকে সঞ্জীবিত করা সম্ভব, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। বাঙালী মাত্রেরই বাঙলাদেশে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এই নিতান্ত কর্তব্য প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন টানিয়া আনিবার আমরা কোন প্রয়োজন দেখি না। বাঙলাদেশের কাপড়ের ব্যবহার করার অর্থ প্রাদেশিকতা নয়, দেশের সেবা দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য প্রতিপালন, দেশের লোকের অন্ন সংস্থান করা।

ভগবানের বাণী শ্রবণ—

কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি সব সময় ভগবানের বাণী শুনেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, আপনি যে সব সমস্যা সমাধান করিতে চাহিতেছেন, ভারতের কোটি কোটি লোক যদি ভগবানের বাণী শুনে তাহা হইলে সে সব সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী এই প্রশ্নের কি জবাব দিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন, সব সময় ভগবানের বাণী শুনা যায় ইহা মনে করা ভুল। ভগবানের বাণী শুনিতে পারিলেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে ভারতের অগণিত জনসাধারণকে ইহা বুঝান ঠিক হইবে না। যাহাদের কোন অভাব নাই তাহাদের পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব যে, আমরা ভগবানের বাণী শুনি এবং আমাদের প্রশ্নের জবাব পাই। কিন্তু ভারতের কোটি কোটি লোকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, তাহাদিগকে আন্তরিকতার সঙ্গে কে এমন কথা বলিতে পারে যে, তোমরা ভগবানের কথা শুন, তাহা হইলে তোমাদের অন্ন জুটিবে।" মহাত্মাজীর জবাবের মধ্যে অস্পষ্টতা কিছুই নাই, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য এই যে, যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত অন্তত তাহাদের কাছে ভগবানের বাণীর দোহাই দেওয়ার কোন মূল্য নাই বরং তাহাতে মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি বাড়িবারই সম্ভাবনা আছে।

বিমান বিভাগে ভারতবাসী—

ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতীয় বিমান বিভাগের জন্য ৬ শত শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে উড়োজাহাজের কলকব্জার কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই সঙ্গে ১৫০ জন শিক্ষানবীশকে বিমান চালনাও শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং একদল ভারতীয় বিমান-বীরকে মার্চ মাসে বাহিরে পাঠান হইবে। জগতের সব দেশে আত্মরক্ষার জন্য বিমান বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এক যুগ হইতে; কিন্তু ভারতভূমির সঙ্গে অন্য দেশের তুলনা নাই। এ দেশের লোক ব্রিটিশের বীরবাহুর আড়ালেই চিরকাল নিদ্রা যাইতে পারিবে, কর্তাদের ইহাই ছিল বিবেচনা। কঠোর সত্যের আঘাতে কর্তাদের এতদিনেও যে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, ইহা আশার কথা।

লণ্ডনের উপর বোমাবর্ষণ

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বর্ষশেষে এবং ৬ই জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজের মনে খুবই আশার সঞ্চার হইবে। তিনি বলিয়াছেন, "ইংরেজ যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলে ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এ সকল প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিবে হিটলারের দল এবং আমাদিগকেও গুলীভরা বন্দুকের সামনে ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করিতে হইবে। সমগ্র জগতের লোককে জার্মানির ক্রীতদাস করাই হিটলারের উদ্দেশ্য। আমরা ইংরেজদিগকে সমরোপকরণ দিয়া সাহায্য করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে আরও করিব। ব্রিটিশ জাতি বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতেছে এবং তাহাদের সে বীরত্বের কথা জগতের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।"

ইংরেজ বীরের জাতি। স্বদেশপ্রেমের তুলনা নাই ইংরেজের একথা কে অস্বীকার করিবে? গত ৪ মাস হইতে জার্মানির বিমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ইংরেজ এই বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছে। গত ৩০শে ডিসেম্বর লণ্ডন শহরের উপর হিটলারের উড়োজাহাজ হইতে আগুনে বোমা বর্ষণ যে ধ্বংস-লীলার বিস্তার করে, তাহা ভয়াবহ। এই বোমা বৃষ্টিতে লণ্ডন শহরের ছয়টি প্রাচীন গীর্জা এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গিল্ডহলের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। গিল্ডহল লণ্ডন শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বহু শতাব্দীর ঐতিহাসিক স্মৃতি এই বাড়িটির সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। এই বাড়িটি তৈয়ার করিতে বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল, রাজা সপ্তম হেনরীর রাজত্বের সময় বাড়িটি সম্পূর্ণ-ভাবে নির্মিত হয়। গিল্ডহলে আগুন ধরা এই প্রথম নয়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে যে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, সেই সময় এই বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল এবং তাহাতে কাঠের ছাদ পুড়িয়া যায়। এই বাড়িতেই নেলসন, পিট, ওয়েলিংটন, ডিসরেলী প্রভৃতি ব্রিটিশ জাতির ধুরন্ধর পুরুষদিগকে পৌর-সম্মানে বিভূষিত করা হয়। আমাদের শ্রীনিবাসম শাস্ত্রীকেও এই বাড়িতেই লণ্ডনের পৌর-সম্মানে সম্মানিত করা হয়। বর্ষশেষের এই আগুনে বোমাবিধ্বস্ত বাড়িগুলির ধ্বংসস্তূপ অপসারিত করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা এই ধ্বংসলীলার বর্ণনা প্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে বোমাবর্ষণের ধ্বংস-লীলা আমি দেখিয়াছি, চীনেও এমন কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সেদিন পোল্যাণ্ডের যুদ্ধের ব্যাপারেও এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে; কিন্তু এমন ধ্বংসলীলা আমি আর দেখি নাই। নিউ গেট স্ট্রীটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি বাড়িও খাড়া নাই, কোন কোন জায়গায় একটি দেওয়াল হয়ত দাঁড়াইয়া আছে।
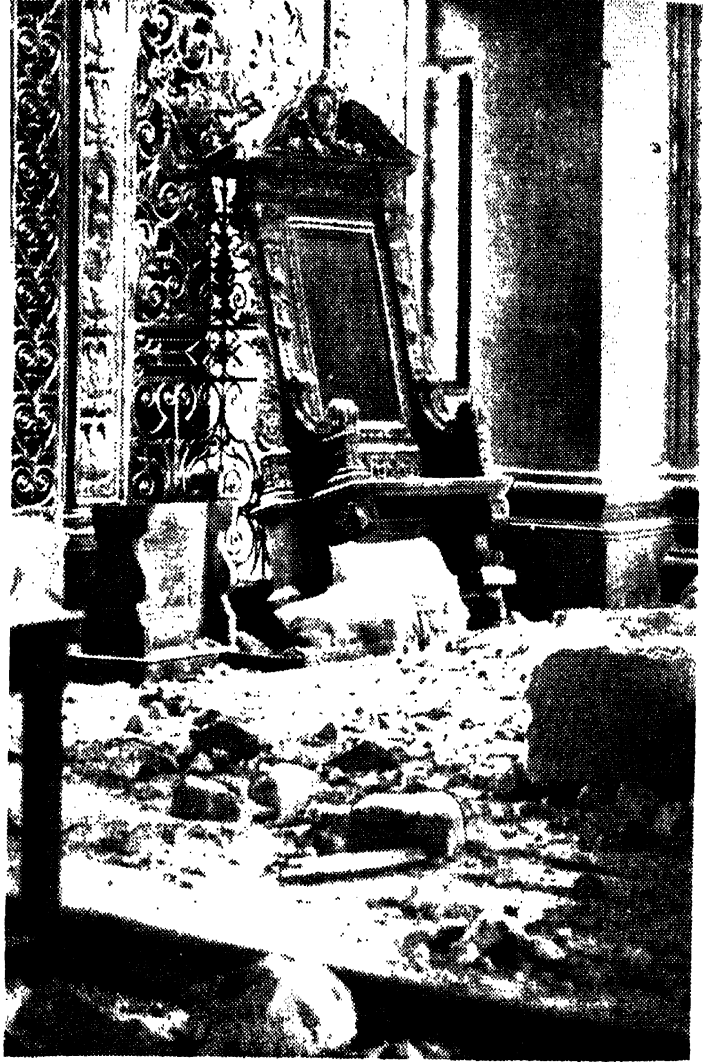
লণ্ডনে সেণ্ট পলস গীর্জার আভ্যন্তরী দৃশ্য: ভগ্নাবস্থায় পুরোহিতের সিংহাসন।

এই ব্যাপারের পর ইংলণ্ডের হোম সেক্রেটারী মিঃ হার্বার্ট মরিসন জার্মান বিমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বিশেষ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া দমকলবাহিনী গঠন করা হইবে স্থির হইয়াছে এবং গভর্নমেণ্ট এই ব্যাপারে জনসাধারণকে বাধ্য করিবার জন্য কতকগুলি অধিকার নিজেদের হাতে লইয়াছেন। কিছু ব্যবস্থা পূর্বেই অবলম্বিত হইয়াছিল; জার্মানির বিমান-বহরের কর্তারা দিনের বেলাকার আক্রমণে তেমন সুবিধা

করিতে না পারিয়া নৈশ আক্রমণের উপর জোর দিতেছে এবং বেপরোয়া রকমে আক্রমণ চালাইয়া আতঙ্ক বিস্তার করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। কলিকাতা শহরে তিনবার নিষ্প্রদীপের মহড়া হইয়াছে, কিন্তু দিনরাত আক্রমণের আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করা—শুধু জীবনযাপন করা নয়, যথারীতি সমস্ত কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাইতে মনের যে কতখানি জোরের প্রয়োজন হয়, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, দিনের বেলাতে জার্মান বিমানগুলিকে খুব কমই দেখা যায়, কারণ তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দল বাঁধিয়া আসে না, একখানা উড়োজাহাজ হয়ত আসে এবং আসে অনেক উঁচু দিয়া, এমন কি আকাশে পাঁচ ছয় মাইল উপরে থাকে। আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহে যেমন আবহাওয়ার রিপোর্ট বাহির হয়, তেমনই ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে নিষ্প্রদীপের সময় দেওয়া থাকে। নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা পূর্বে ৮০ লক্ষ লোকের বাসভূমি লণ্ডন নগরীতে আঁধার ছাইয়া পড়ে। রাস্তা সব চক্ষের নিমেষে নির্জন হইয়া যায়। জরুরী কাজের জন্য যে সব আলো থাকে, সেগুলিও থাকে ঢাকা, কয়েক গজ দূর হইতে সে আলো দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্মান উড়োজাহাজের সাড়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিপদসূচক বাঁশিগুলি বাজিয়া উঠে। আক্রমণকারীকে ধরিবার জন্য নীচু হইতে সার্চলাইটের আলো আঁধার আকাশের বুক ফুঁড়িয়া তীরের মত খেলিতে থাকে এবং মেঘের উপর পড়িয়া তাহা বিচিত্র বর্ণ বিকাশ করে। কখনও বা সার্চলাইটের আলো থাকে না; কিন্তু বিমানধ্বংসী কামান হইতে বিক্ষিপ্ত গুলি তারার ফুলকীর মত আকাশে উঠিয়া ঝরিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইতে থাকে—পটাস্, পটাস্।

বলা বাহুল্য, শহরবাসীরা এই সময় পতালপুরে আশ্রয় লয়। সকলে বিছানাপত্র লইয়া ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে এবং অনেকেই বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়ে, উপরে চলিতে থাকে উড়োজাহাজে উড়োজাহাজে লড়াই। এইরূপ এক একটি ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে আট দশ হাজার লোকের স্থান হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এমন আশ্রয়ে হয় সর্বধর্মসমন্বয়, ধনী নির্ধনের বিচার এক্ষেত্রে নাই। এই ভূগর্ভস্থ আশ্রয়গুলি ঠিক এক রকমের নয়, নানা রকমের আছে এবং অবস্থা বুঝিয়া এগুলির ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে তাস খেলিবার এবং পড়াশুনা করিবার ব্যবস্থাও থাকে।

যুদ্ধ অতি ভীষণ জিনিস, কিন্তু এমন ভীষণ ব্যাপারের মধ্যেও সেবা এবং শৃঙ্খলা ও স্বদেশপ্রেমের মহত্ব এবং সৌন্দর্য মানুষের জীবনে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। বর্তমান লড়াইতে ব্রিটিশ জাতির ভিতরে আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। মাথার উপর বোমা পড়িতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ বিদেশের ঐশ্বর্য সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশ জাতি যে ইন্দ্রপুরী নির্মাণ করিয়াছিল, চোখের সম্মুখে একটির পর একটি করিয়া তাহা বোমাবর্ষণে ভাঙ্গিতেছে। মিডল্যাণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ওয়েলস, কার্ডিফ, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে ধ্বংসলীলা চলিতেছে; কিন্তু ইংরেজ অচল অটল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকারের এই যে মহনীয় দৃষ্টান্ত ইংরেজ দেখাইল, পরাধীন জাতি-গুলির অন্তরে তাহা স্বাধীনতার স্পৃহাকে প্রবল করিয়া তুলিবে। পরাধীন জাতিরা বুঝিবে যে, স্বাধীনতা কত মূল্যবান জিনিস এবং সে স্বাধীনতা শুধু খোসামুদের দ্বারা পাওয়া যায় না, সেজন্য দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইতে হয়, অপরিসীম ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

হিটলার যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। মিশর হইতে ইতালিকে তাড়া খাইতে হইয়াছে। ইতালির নিজের জায়গা লিবিয়ার মধ্যেও ইংরেজ সেনা ঢুকিয়া বার্দিয়া দখল করিয়াছে। বার্দিয়ার পতন এই হিসাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইতালির বলাবলের বিশেষ পরীক্ষা এখানে হইয়া গেল। ইংরেজ দমে নাই, ইংলণ্ডের বিমান বিভাগের অধ্যক্ষ মার্শাল ফিলিপ জোবার্ট কিছুদিন পূর্বে এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আগামী বসন্তকালের মধ্যে আমেরিকা হইতে উড়োজাহাজ অনবরত আসিতে থাকিবে, তখন আমরা জার্মানির উপর দিয়া সাতগুণ পাল্টা প্রতিশোধ তুলিয়া লইব। হিটলার অবশ্য কি করিবেন, এখনও বুঝা যাইতেছে না। নাৎসীরা এই ভয় দেখাইতেছে যে, আমেরিকা যদি ইংরেজকে অবিলম্বে সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহারা তাড়াতাড়ি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে এবং আমেরিকা যদি সে বিষয়ে তৎপর না হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড আক্রমণে জার্মাণবাহিনী তাড়াহুড়া করিবে না। বলা বাহুল্য, এসব কথার কোন মূল্য নাই। তাড়াতাড়ি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার ক্ষমতা যদি জার্মানির থাকিত, তবে সে কিছুতেই দেরী করিত না এবং আমেরিকা যে ইংরেজকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ইহা তাহার জানাই ছিল। জার্মানির ইংলণ্ড আক্রমণ যতই বিলম্বিত হইবে, আমেরিকা হইতে ইংরেজের সাহায্য পাওয়া ততই সুনিশ্চিত হইবে, ইহাও জার্মানির অবিদিত ছিল না। তবে হিটলারকে চমকপ্রদ রকমে চূড়ান্ত চাল চালিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিটলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালে তিনি জার্মানিকে জয়ী করিবেনই এবং তিনি জলে, স্থলে ও আকাশপথে ব্রিটেনকে চূর্ণ করিবেন এবং এই মহৎ কার্যে দয়াময় পরম প্রভু যে হিটলারের সঙ্গে থাকিবেন, এ বিষয়ে হিটলারের কোন সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এইসব কথাকে আমরা কোন গুরুত্বই দেই নাই, নিজেদের মধ্যে উৎসাহ শিথিল হইবার উপক্রম হইলে এমন ধরণের কথা বলিয়া স্বপক্ষকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে হয়। সুতরাং এই সব ফাঁকা কথা বলিষ্ঠতার অপেক্ষা দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, যুদ্ধ শেষ হইতে এখনও অনেক দেরী এবং কয়েক মাসের মধ্যেই যুদ্ধের একটা মোড় ফিরিয়া যাইবে। সে মোড়টা কোন্ দিকে ফিরিবে, এখনও ঠিকমত

(শেষাংশ ৩৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লণ্ডনের বালকবালিকারা ভূগর্ভস্থ আশ্রয় হইতে জার্মান বিমান আক্রমণ লক্ষ্য করিতেছে।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[১১]

বাড়ুজ্যের খবরটা যদিও শ্রীবিলাস ঠিক বিশ্বাস করলে না তবু ভাবলে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলে ক্ষতি কি? তার দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে সে দেখলে যে খবরটা মিথ্যে মোটেই নয়।

এক ঘণ্টার বৈঠকেই সব ঠিক হ'য়ে গেল। পরের মাসের পোনেরোই তারিখে বিয়ে ঠিক হ'ল। আগাম এক হাজার টাকার চেক পকেটে ক'রে শ্রীবিলাস উঠে গেল।

তার পর থেকেই তার মনটা উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো। মেয়েটাকে একবার দেখলে না সে, না জানি কেমন সে মেয়ে? —এ কি বড়লোকী দেমাক বাপু যে বিয়ের মেয়েকে দেখাবে না?

যতই দিন গেল ততই তার অস্বস্তি বেড়েই গেল।

বিয়ের উদ্যোগ সে যথারীতি করতে লাগল, যথাসম্ভব কম খরচে যাতে হয়। খুড়োকে নিয়ে এলো দেশ থেকে।

এমন সময় সে একদিন সকালে একখানা চিঠি পেল, তা' পড়ে সে চমকে গেল।

চিঠি লিখেছে একটি মেয়ে। সে লিখেছে, "নিষ্ঠুর, যদি জানতে চাও যে দশ হাজার টাকার লোভে কি সর্বনাশ তুমি করেছ আমার, তবে কাল এগারটার পর যে কোনও সময়ে লেকের Swimming Poolএ গিয়ে দেখো তোমার কৃতকার্যের ফল।

তখন বেলা এগারটা। ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে শ্রীবিলাস ছুটে গেল লেকের ধারে। এ কি প্রহেলিকা? কি দেখবে সে? কি দেখাবে তাকে? কে দেখাবে?

ছুটতে ছুটতে লেকের ধারে গিয়ে সে দেখতে পেলে Swimming Pool জন শূন্য, কেবল তার diving boardএর উপর একটি মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে।

সে কিছু দূরে থাকতেই মেয়েটা হঠাৎ যেন ছিটকে পড়লো জলে!

ছুটে এগিয়ে গেল শ্রীবিলাস, হা-হা করতে করতে।

মেয়েটি যে ডুবলো সে ডুবলোই—আর তার চিহ্নও দেখা যায় না!

আত্মহত্যা করছে নিশ্চয়!

বিবেচনা করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি তার চাদর, কোট জুতো খুলে ফেলে শ্রীবিলাস ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সে শিক্ষিত সাঁতারু। বার বার সেখানে ডুবে ডুবে মেয়েটির খোঁজ করতে লাগলো, কোনও চিহ্ন নেই তার! আশ্চর্য! ভারী ভয় হ'য়ে গেল!

—আজকালকার মেয়েরা কি? কথায় কথায় আত্মহত্যা!

অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে সে যখন একটু হাঁফ ছাড়বার জন্য ঠাঁই জলে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সে দেখতে পেলে যে পুকুরটার অপর পারে দাঁড়িয়ে মেয়েটা খিল খিল ক'রে হাসছে।

বুঝতে পারলে সে যে মেয়েটি সন্তরণে বিশেষ পারদর্শিনী। ডুব সাঁতার দিয়ে এতখানি চ'লে গিয়ে সে নিঃশব্দে তীরে উঠে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখছে। সে শুধু মিছিমিছি এই অবেলায় স্নানাহারের পর ঠাণ্ডা জলে খানিকটা চুবুনি খেলো!

কিন্তু রাগ করতে সে ভুলে গেল। মেয়েটির দিকে চাইতেই সে এমন একটা রূপের হিল্লোল তুলে ছুটে গেল যে তার সেই অপূর্ব রূপের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে সে সব ভুলে গেল।

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে গিয়ে প্রবেশ করলে পাশের একটা বাড়িতে।

শ্রীবিলাস ভিজে কাপড়েই, জুতো জামা হাতে ক'রে অনেকক্ষণ সেই বাড়ির সামনে টহল দিলে। কেন, তা সে জানে না। তার তৃষিত দৃষ্টি শুধু সেই বাড়ির ইটের দেওয়াল ভেদ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো।

যখন আর তার দেখা পাবার সম্ভাবনা আছে মনে হ'ল না, তখন সে ফিরলে।

বাড়ি ফিরবার পথে চলতে চলতে একখানা মোটর হঠাৎ তার পাশে এলো। তার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রহেলিকা হেসে বললে, "কেমন জব্দ!"

মোটর সোঁ সোঁ শব্দে চ'লে গেল।

একখানা মোটর ট্যাক্সি জোগাড় ক'রে শ্রীবিলাস পিছু নিলে।

প্রহেলিকাকে তার বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে ফিরলে।

* * * * *

দশ হাজার টাকা—ফেলবার জিনিস নয়!

তবু শ্রীবিলাসের মনে হ'তে লাগলো, তুচ্ছ দশ হাজার! লাখ টাকা ও মেয়েটার পায় কেটে দেওয়া যায়।

এমন মেয়ে হাতে পেয়ে সে ছেড়ে দিলে!

আর দু'দিন পরে সে স্থির করলে, দূর হোক ছাই যে হাজার টাকা নিয়েছে সে তা' ফিরিয়েই দেবে। একে চাই!

চার দিন পর সে স্থির করলে প্রহেলিকা তাকে জব্দ করেছে। এর ঠিক মুখের মত জবাব হবে যদি সে তাকে বিয়ে করতে পারে।

পাঁচদিনের দিন সংকল্প স্থির ক'রে সে প্রহেলিকার বাড়িতে আবার গেল।

কিন্তু সে বাড়ির দুয়ারের সামনে দাঁড়াতেই খিল খিল হাসির শব্দ শুনে সে দেখতে পেলে একটা জানালায় দাঁড়িয়ে প্রহেলিকা হাসছে।

সব সাহস তার হঠাৎ উবে গেল। সে পায় পায় স'রে ফিরে এলো।

এর পর একদিন হঠাৎ সে উঠলো গিয়ে আরসন কোম্পানীর আফিসে।

বড়বাবুর কাছে যেতে সাহস হ'ল না। বেচু চৌধুরীকে ডেকে বল্‌লে, "একটা কথা আছে ভাই, আসবে আমার সঙ্গে একবার?"

নিয়ে গেল তাকে একটা হোটেলে চা খাওয়াতে।

কেক স্যাণ্ডউইচ চা উজাড় হ'য়ে গেল—সে কেবল এটা ওটা বাজে কথাই বল্‌লে।

খানসামা বিল নিয়ে এলো, টাকা দিয়ে উঠলে তারা, তার পর দাঁড়িয়ে উঠে খুব খানিকটা ঢোঁক গিলে শ্রীবিলাস বল্‌লে, "কথাটা কি জান? এই, তোমরা বোধ হয় খুব রাগ করেছ।"

"না তেমন কিছু নয়, তবে বাবা একটু—হাঁ চটেছেন বইকি।"

"যাক গে যাক, ওসব কথায় আর কাজ নেই, বলছিলাম কি? বিয়েটা হ'য়েই যাক।"

"মানে, দশ হাজার টাকা চাই তো তোমার?"

"না, না, অত নয়, যা হয় দিও তোমরা. কিন্তু ১৫ই তারিখেই কাজটা সেরে ফেল। আবার ফিরতে হবে আমার।"

"তা বেশ কাল এসো। বাবার সঙ্গে কথা ক'য়ে ঠিক হয় তো, কাল আশীর্বাদ ক'রে যেও।"

"বেশ বেশ! কিন্তু কথাটা কি জান তোমরা হয়তো বুঝতে পার নি। ওর নাম কি, আমাদের নিয়ম আছে শুভ-দৃষ্টির আগে বরকে ক'নে দেখতে নেই। তাই বলছিলাম। তা' আশীর্বাদ! হাঁ তা হবে, আমার এক খুড়োমশায় এসেছেন, তিনি গিয়ে আশীর্বাদ করবেন।"

"তবে দেনা-পাওনার কথাটা"—

"তোমার বোন, তোমরা যা দেবে দিও।"

খুড়ো ম'শায় পরের দিন আশীর্বাদ ক'রে এসে বল্‌লেন, "খাসা মেয়েটি বাবাজী! পটের পরী।"

"হেং, হেং!" ব'লে শ্রীবিলাস এমন একটা ভঙ্গী করলে যেন সে-ই পটের পরী গড়বার ষোল আনা কৃতিত্বটা তারই।

তারপর, যে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল তার বাপের কথা মনে হ'ল।

এক হাজার টাকা তাকে ফেরত দিতে হয়। করকরে এ-ক হা-জার টা-কা!

সে টাকা ফেরৎ দিলেও বাবুনা হয়তো বেশ এক পশলা গালাগালি বর্ষণ করবেন। এক একবার সন্দেহ হ'ল যে, সে নিজে কথাটা ব'লতে গেলে হয় তো পিঠেও দু'চার দশ ঘা প'ড়তে পারে।

যখন সে এমনি দুর্ভাবনায় ব্যাকুল, তখন একদিন তার কাছে এল শশীকান্ত।

শশীকান্ত ইউনিভারসিটির একটা ডাকসাইটে ভাল ছেলে।

শ্রীবিলাস জিগ্‌গেস করলে, "কি করছো ভাই এখন?"

শশী বল্‌লে, "পাঁচ হাজার রুপৈয়া দেলায় দে রাম।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ একটা স্কলারশিপ পেয়েছি আমেরিকা যাবার। স্কলারশিপে যে টাকা পাব, তার চেয়ে হাজার চারেক টাকা বেশী খরচ লাগবে। তাই পাঁচ হাজার টাকার জন্যে হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুনেছিলাম, কলকাতার রাস্তায়, বিশেষ ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে বড়বাজারের পথে টাকা প'ড়ে থাকে, কুড়িয়ে নিলেই হ'ল। একমাস সেখানে হেঁটে হেঁটে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম, কিছুই হ'ল না।"

শ্রীবিলাসের ব্যবসা-বুদ্ধি হঠাৎ চন্‌ চনে হ'য়ে উঠলো। সে বিস্তর সহানুভূতি দেখিয়ে বল্‌লে, "তাইতো, তোমার তাহ'লে টাকাটার বড্ডই দরকার প'ড়ে গেছে দেখছি। তা' দেখ, সম্প্রতি আমি একটা দাঁও মেরেছি। তাই ভাবছি যেখানে thy necessity is greater than mine, সেখানে সেটা না হয় তোমার সঙ্গে ভাগ ক'রেই নেওয়া যাবে। তুমি পাঁচ হাজার টাকা পেলেই খুসী তো? বাকী যা পাবে, তা আমায় দেবে?"

শশী সলম্ফ সম্মতি জানাল।

শ্রীবিলাস তখন বল্‌লে, "কিন্তু সামান্য একটা কাজ করতে হবে—ওর নাম কি—একটা বিয়ে।"

"একটা কেন পাঁচটা করতে রাজী আছি।"

শ্রীবিলাস ফন্দীটা পাকা করতে লাগলো।

চট্‌ ক'রে মেয়ের বাপের কাছে কথাটা পাড়তে সাহস হ'ল না। ঠেলতে ঠেলতে সে কাজটা ১৪ই ফাল্গুনের সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠেলে রাখলে সে—

তখনও নিজের যেতে সাহস হ'ল না, পাঠালে তার পিসতুতো ভাই তারিণীকে। তারিণী তাকে অভয় দিয়ে বল্‌লে, কোনও চিন্তা নেই, আমি সব ঠিক ক'রে দেব।

অভয় দিলে বটে, কিন্তু ভয়টা চট্‌ ক'রে কাটলো না শ্রীবিলাসের। ১৫ই তারিখ যখন সে বিয়ে করতে বের হ'ল, তখনও তারিণী কোনও পাকা খবরই দিলে না।

সেদিনের পর প্রহেলিকাকে নির্লিপ্তভাবে পড়ান বাঁড়ুজ্যের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

প্রহেলিকার সান্নিধ্য তার কাছে বরাবরই দারুণ সঙ্কোচ ও হৃৎকম্পের কারণ ছিল, এখন তার দূরশ্রুত পদশব্দও ভূমিকম্পের হেতু হ'য়ে উঠলো।

যতক্ষণ প্রহেলিকার কাছে সে থাকে, ততক্ষণ সে একবার লাল হ'য়ে যায়, একবার একদম ফ্যাকাশে হ'য়ে পড়ে; ক্ষণে ক্ষণে সে ভয়ানক ঘেমে ওঠে! মুখ তুলে আর সে

চাইতে পারে না। চায় মুখ নীচু ক'রে আড় চোখে বার বার, আর প্রহেলিকার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের সঙ্গে দেখাদেখি হ'লেই অমনি চোখ নামিয়ে প্রচণ্ডবেগে আঁক কষতে আরম্ভ করে ঘামের নদী বয়ে যায় তার গায়।

কথায় কথায় ভুল করে সে, আঁক বোঝাতে গিয়ে কোনও দিনই ভুল না ক'রে পারে না। আর প্রহেলিকা যেন হঠাৎ আঁকে এত পারদর্শিনী হ'য়ে উঠেছে যে, কোনও একটা ভুল তার চোখ এড়ায় না। বাঁড়ুজ্যে ভুল করলেই খিল খিল ক'রে হেসে সে বলে, "ও কি করলেন মাস্টার মশাই।" বাঁড়ুজ্যে সে হাসিতে আরও এলিয়ে যায়।

প্রহেলিকার মুখে চোখে দুষ্ট হাসি লেগেই থাকে সব সময়, এখন যেন সে হাসি আরও দুষ্ট, চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল—কৌতুককে ভরপুর। মাস্টার মশায়ের এ দুর্গতি সে প্রাণভরে উপভোগ করে।

কিন্তু সেদিনকার সেই খোলাখুলি আলাপের পর প্রহেলিকা আর সে প্রসঙ্গও তোলে না।

মাসকাবার হয়ে গেল। ফারপোর ওখানে যেতে গেলে ইংরেজী পোষাক চাই বলে বাঁড়ুজ্যে তার যথাসর্বস্ব খরচ করে একটা সুট বানিয়ে ফেললে। কিন্তু ফারপোর ওখানে খেতে যাবার নামও করে না প্রহেলিকা!

বাঁড়ুজ্যে হতাশ হয়ে উঠলো।

একদিন সে নূতন সুট পরে প্রহেলিকাকে পড়াতে এলো।

প্রহেলিকা তাকে সেই বেশে দেখে বললে, "বাঃ আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে!"

একথায় বাঁড়ুজ্যের অন্তর চট্‌পট্ আত্মপ্রসাদে বোঝাই হবার পথে থমকে গেল।

কেন না কথাটা বলেই প্রহেলিকা হঠাৎ হেসে যেন গলে পড়লো।

বাঁড়ুজ্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বারবার তার পোষাকের দিকে চাইলে, ভাবলে না জানি কি ঘোরতর ত্রুটি হয়েছে। না হয় তো বুঝি বা তাকে এ পোষাকে ভয়ানক হাস্যাস্পদ দেখাচ্ছে—না হয় তো—দূর ছাই, একখানা আরসী যদি থাকতো!

অনেকক্ষণ চেষ্টায় সে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হয়ে বললে, "তার মানে আমাকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাচ্ছে।"

প্রহেলিকা বললে, "না না সত্যি আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ভাবছি, আপনার স্ত্রী ঠিক কি রকম হলে মানাবে। এই যে, এতক্ষণে আপনার আসবার সময় হল?"

শেষ কথাটা ব'লে প্রহেলিকা যাকে সম্ভাষণ করলে তিনি হচ্ছেন সেই বুড়ো ভদ্রলোক যাকে সদাসর্বদাই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রহেলিকার সঙ্গে দেখা যায়। তাকে দেখে বাঁড়ুজ্যের যা কিছু উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল একেবারে নিভে গেল।

সে ভদ্রলোক বললেন, "কেন, আমার তো দেরী হয় নি। ঠিক এই সময়েই তো আমাকে আসবার কথা বলেছিলে।"

"বাঃ, বললেন, হ'ল আর কি? এখন মাস্টার ম'শায় এসেছেন, পড়তে হবে না? বলুন তো মাস্টার মশায়।"

বাঁড়ুজ্যে বললেন, তা' আপনার যদি কোনও engagement থাকে, না হয় আমি যাই, রাত্রে আসবো 'খন।"

"তার চেয়ে বরং আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।"

কোথায় যেতে হবে একথা জিজ্ঞাসা করবার ফুরসুৎ হল না বাঁড়ুজ্যের। সে তৎক্ষণাৎ বললে, "আচ্ছা চলুন"—পাছে প্রহেলিকা আবার হঠাৎ মত বদলে ফেলে।

গেল তারা ফারপোর খানা ঘরে—খাওয়া দাওয়া করলে। প্রহেলিকা সমস্তক্ষণ ফর ফর করে কথা বলে গেল—সেই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্যে ভাবলে, না এলেই ছিল ভাল।

মনটা তার এত বিরক্ত হয়ে গেল যে অনেকবার চেষ্টা করেও সে ওদের কথার ভিতর নিজের একটা কথার অনধিকার প্রবেশ ঘটাতে পারলে না।

আহারান্তে তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে এলে প্রহেলিকা সেই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চললো। বাঁড়ুজ্যে মুখখানা হাঁড়িপানা করে বললে, "তা' হলে আমি আসি। আজ রাত্রে আর পড়াতে যাব না। কি বলেন?"

হঠাৎ বুড়ো ভদ্রলোককে ছেড়ে এসে প্রহেলিকা বাঁড়ুজ্যের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললে, "তা যান। কিন্তু মনে রাখবেন, ১৫ই তারিখে আপনার বিয়ে।"

বলেই সে ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

বাঁড়ুজ্যের দমে যাওয়া প্রাণটা এতে হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। সে একরকম হাওয়ায় উড়ে চলতে লাগলো—কলকাতার পথে নয়, নন্দন কাননের সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে।

বন্ধুবান্ধব সবাইকে সে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে এলো ১৫ই তারিখ তার বিয়ে।

"কার সঙ্গে?"

বাঁড়ুজ্যে বললে সুধু, "একটা আপ্সরী হঠাৎ ছুটে এসে পড়েছে ভাই, একেবারে আচমকা।"

বন্ধুরা ভাবলে এটা তার ভাঁড়ামী। কিন্তু পরদিন সত্যি সত্যি ছাপান চিঠি পেয়ে তারা অবাক হয়ে গেল। সে চিঠি সাবেক আমলের নিমন্ত্রণ পত্রের মত নয়, একটা অতি আধুনিক কাব্যময় আমন্ত্রণ,—তা' থেকে কনের পরিচয় পাওয়া গেল না। (ক্রমশ)

ছেলেদের খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদ

শ্রীঅজিতকুমার দেব এম-এস্‌সি, এম-বি, ডি পি এম (ইংলণ্ড)

খেলার উদ্দেশ্য শিশুর কাছে এবং পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির নিকট একরূপ হইতে পারে না; খেলাই শিশুর জীবন—ইহা তাহার সারা মনেপ্রাণে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপৃত থাকে; খেলা শিশুজীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। খেলা লইয়াই শিশু বাঁচিয়া থাকে, খেলার ভিতর দিয়াই সে বড় হয় এবং খেলার মধ্য দিয়াই তাহার দক্ষতা—শুধু দক্ষতা নয় তাহার মনুষ্যত্বেরও বিকাশ হয়। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের ধারণা খেলিলে সময় নষ্ট হয় এবং ছেলেরা খেলা লইয়া থাকিলে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে এবং খেলাধূলা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক—এই মতের প্রচার হইয়াছে উৎকট ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা (Puritans)। ব্যবসায় এবং শ্রমশিল্পে (industry) যে অনেকে অকৃতকার্য হয় তাহার কারণ তাহারা কার্যকলাপ যথাবিহিতরূপে বিন্যস্ত করিতে পারে না। এই শক্তিটি মানুষে লাভ করে বাল্যের প্রথম ছয়-সাত বৎসরের খেলা হইতে। অনেক ছেলে—যাহারা ছাত্রজীবনে পড়াশুনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই—তাহাদের আত্মসম্মান বজায় হইয়াছে খেলা বা কারুশিল্পের মধ্য দিয়া। শিশুর শরীর, মন এবং ভাবাবেগ (emotion) এক সুরে বাঁধিয়া দিয়া ঠিক ওজনমত চলিবার এবং কার্য করিবার শিক্ষা দেয় এই খেলা এবং এই খেলা হইতে তাহার নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতাও জন্মায়।

ছেলেদের খেলা নানা প্রকারের হইতে পারে। বড়রা শরীর সুস্থ এবং সবল রাখিবার জন্য যে সকল ক্রীড়ায় যোগ দেয় ছেলেরাও সেই প্রকারের খেলায় যোগদান করিতে পারে।

ঘরে বসিয়াও অনেক রকমের খেলা ছেলেরা খেলিতে পারে যাহাতে মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ পরিচালনা এবং বিকাশ হয়, যেমন—তাস, দাবা, ধাঁধা ইত্যাদি।

সংগীত এবং নৃত্যের দ্বারা শিশুদের সুর-লয়ের জ্ঞানলাভ হয় এবং ইহাতে তাহারা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে।

কতকগুলি খেলা হইতে শিশুরা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লাভ করে, যেমন শিল্প ও কারুকার্য প্রভৃতি।

এমন খেলাও আছে যাহাতে এই সমস্তগুলির সমন্বয় হয়।

অভিনয় করিলে ছেলেদের কল্পনাশক্তি এবং পরস্পরকে সম্যক্‌রূপে বুঝিবার শক্তির বিকাশ হয়।

সংগীতচর্চা করিলে, বিশেষত গান গাহিলে আবেগ এবং মানসিক প্রয়াসের (mental tension) কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

আধুনিক যুগে বহুলোককে বাধ্য হইয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া শহরে বাস করিতে হয়। যেখানে বহু লোকসমাগম সেখানে সর্বদা থাকিলে শিশুদের অপকর্ম করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়। তা' ছাড়া নিকট-সংস্পর্শের জন্য রোগসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়; এবং এরূপ গৃহ সাধারণত নিরানন্দময় হইয়া থাকে—তাহার ফলে মনও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আজকাল মানুষের মনের ভিতর সর্বদা যে উৎকণ্ঠার ভাব দেখা যায় খেলাই তার একমাত্র প্রতিষেধক। শিশুদের প্রতিদিন অন্তত তিন ঘণ্টা করিয়া উন্মুক্ত বাতাসে খেলিবার সুযোগ দিতে হইবে—এই নীতিটি মধ্যবয়সের স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রতিরোধ করিবার বীমাসর্তের চুক্তিপত্রস্বরূপ। তত্ত্বাবধানপূর্বক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাই অপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার সুষ্ঠু উপায়।

অবকাশকাল যেভাবে যাপন করা হয় তাহার উপর চরিত্রগঠন অনেকটা নির্ভর করে। অবসরকাল ভালভাবে কাটাইবার ব্যবস্থা না করিলে চরিত্র খারাপ হইবার সম্ভাবনা বেশী। বাল্যকাল হইতে খেলার অভ্যাস থাকিলে পরিণতবয়সে বিরামের সময়টা কিভাবে উপভোগ করিতে হইবে তাহা ভাবিতে হয় না। শিশুর অন্তরের অন্তস্তলে যে আবেগ লুক্কায়িত থাকে, খেলার প্রভাব সেখানেও গিয়া পৌঁছায়। আবেগের উৎসের মধ্যে যে অপূর্বশক্তি নিহিত আছে তাহা শিশুর বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়।

শিশুর কাছে খেলার দরকার অনেক কারণে—এই সময়ে সে সমস্ত জিনিস হাতে-কলমে পরখ করিয়া লয়, সম্যক্‌রূপে বিচার করিতে শিখে এবং পরবর্তী জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে; খেলার দ্বারা শিশু নিজের ভয়ের কারণগুলিকে দূরীভূত করিয়া দিয়া মনে-মনে নিশ্চিন্ত বোধ করে। নিম্নলিখিত বিবরণটি ইহার একটা সুন্দর উদাহরণ—

একটি ছোট মেয়ে—তাহার বয়স মাত্র ৪ বৎসর, সে তাহার মাকে মনে-মনে অত্যন্ত ভয় এবং ঘৃণা করিত; অবশ্য এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, শিশুর প্রতি তাহার মা নিতান্ত অযৌক্তিক ব্যবহার করিত। শিশু তাহার সহজবুদ্ধি (intuition) এবং ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সোজাসুজিভাবে বিরুদ্ধাচরণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, অতএব সে তাহার অনুভূতি প্রকাশের এক উপায় স্থির করিল। তাহার কাছে একটি বড় ও কয়েকটি ছোট পুতুল ছিল। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছোট পুতুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিল এবং বড় পুতুলটি যাকে কল্পনায় ইহাদের মায়ের আসনে বসাইয়াছিল তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিল না। অল্পক্ষণ পরে সে হঠাৎ বড় পুতুলটি তুলিয়া লইয়া নিষ্ঠুরভাবে তাহার মুণ্ড মুচড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল।

আরেকবার সে একটি স্ত্রীলোকের ছবি আঁকিয়া কল্পনা করিল যে, এটি তাহার মায়ের ছবি। ছবি আঁকা হইলে সে খুব বিজ্ঞভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—'মুখ নীলবর্ণ হইলে লোকে কি মরিয়া যায়।' যখন সে শুনিল যে, মুখ মৃত্যুর পূর্বে নীলবর্ণ হইতে পারে, তখন সে একটি নীল পেন্সিল দিয়া ছবির মুখখানি নীলাভ করিয়া দিল। এইরূপে তাহার হৃদয়ের গুপ্তভাবাবেগ প্রকাশ করিবার পর সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তখন হইতে নিজের মায়ের বাধ্য হইল। এরূপ ব্যবহার শিশুদের মধ্যে অনেক সময়ে দেখা যায়। আদিম যুগের লোকেরা মাটি বা মোম দিয়া শত্রুর প্রতিমূর্তি গড়িত এবং পরে তাহার গাত্রে পিন বিদ্ধ করিয়া কল্পনা করিত যে এইরূপে শত্রুর যথেষ্ট শাস্তিবিধান করা হইল।

আমেরিকার পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে-সকল ছেলেরা দুষ্ট হইয়া যায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৮জনের বাড়ি খেলার মাঠ হইতে অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত;

সুতরাং তাহারা মনের সাধে খেলিবার সুযোগ না পাওয়ায় ঐরূপ দুষ্ট হইয়া যায়।

ইতালির ডাক্তার মণ্টেসারি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বসিবার ব্যবস্থা দেখিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, 'ছেলেদের যেন প্রজাপতির মত আলপিনে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় বিদ্ধ করিয়া নিজ নিজ স্থানে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। এরূপ করিয়া তাহাদিগকে নিয়মানুবর্তিতা শেখানো হইতেছে না, তাহাদের সমূলে বিনাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।' ইঁহার মত—ছেলেদের উপর কোনপ্রকার জোর না খাটাইয়া শিক্ষা দেওয়া এবং এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি যথেষ্ট সুফল পান।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "যে-সংসারে একসঙ্গে খেলাধুলো হয় সেই পরিবার স্থায়ী হয়" (The family that plays together stays together)। যদি কেহ শিশু কিভাবে খেলা করে এই সংবাদ দিতে পারেন, তাহা হইতে বলিয়া দেওয়া যায় শিশুর প্রকৃতি কিরূপ।

বিবাহবন্ধনছেদন বা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে শিশুর মনের ভিতর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। আর্থিক দুরবস্থাতেও শিশুর মন বিচলিত হয়। সাধারণত দেখা যায় দরিদ্রের গৃহে বহুলোকের সমাবেশ হয় বলিয়া ছেলেদের বাধ্য হইয়া রাস্তায় খেলিতে হয়। গৃহের মধ্যে কোনপ্রকার অশান্তি থাকা শিশুপালনের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী ব্যবস্থা। শিশুদের ব্যবহারে মাতাপিতার বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। যদি মাতা বা পিতার মনের মধ্যে কোন তীব্র মত দৃঢ়বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে শিশুরও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা আছে।

অনেক মাতাপিতা শিশুদের সর্বদা চোখে-চোখে রাখেন, তাহাদের সমস্ত খেলাই তদারক করেন এবং খেলার সময়েও তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা দেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ছেলেদের যথোচিতরূপে মানুষ করিতে হইলে তাহাদের খেলায় যতদূর সম্ভব মাতাপিতার পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা উচিত। শিশুরা নিজে নিজে প্রত্যেক জিনিস পরখ করিয়া দেখিলে বেশী বুদ্ধিমান্ হইবে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেকেরই সখ (hobby) বলিয়া কোন জিনিস নাই। এরূপ হইবার কারণ বাল্যকালে এদিকে মন দিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটে নাই। প্রত্যেক শিশুরই কোনো সখ থাকা ভালো এবং মাতাপিতার তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত নহে বরং উৎসাহিত করা কর্তব্য। কারণ শিশুমন সকল সময়েই কোনো কর্মে নিযুক্ত থাকিতে চায়, তাহার স্বভাব চট্‌পটে, অতএব গৃহের অভিভাবকদের কর্তব্য তাহার উপযোগী কোনো কর্মে লাগানো। কারুকলা, নাট্যকলা, সংগীতবিদ্যা বা অন্য কোনো সুকুমার শিল্পের ব্যবস্থা করা ভাল। কোনো বস্তু সংগ্রহ করিবার সখ থাকিলে তাহার জন্য বহু চেষ্টা ও সূক্ষ্ম বিচার করিতে হয়। বাড়িতে ছোটখাট বাগান করিলে গাছপালার যত্ন করিবার জন্য শিশুকে কিছুক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে হয়। কোনো পোষ্য জীবজন্তু গৃহে থাকিলে তাহাদের দেখাশুনা করিতে করিতে ছেলেদের দায়িত্ববোধ জন্মে। আজকাল আমেরিকায় স্থাপত্যশিল্পীরা গৃহ-নির্মাণের সময় ছেলেদের জন্য একটি খেলাঘর গড়িয়া দিতে কখনো ভুলেন না।

যে-সকল ছেলেমেয়েদের বয়স মাত্র দুই বৎসর বা তাহার কম তাহারা চায় সমস্ত জিনিস হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিয়া পরখ করিয়া দেখিতে—এইরূপে তাহাদের অনুভূতির পরিতৃপ্তি হয়। যে সকল খেলাগাড়ী সম্মুখ হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহা অপেক্ষা যেগুলি পিছন হইতে ঠেলিয়া দিলে চলে সেইগুলি ভালো; তাহার কারণ শেষোক্ত গাড়ীগুলি চলিবার সময় শিশু সমস্ত জিনিসটা দেখিতে পাইয়া ভারী খুসী হইয়া উঠে। চারি বৎসর বয়সের সময়ে শিশুরা প্রথম খেলার সাথী খুঁজিতে আরম্ভ করে। ছয় বৎসর বয়সের সময়ে তাহারা নূতন জিনিস গড়িতে চায়। নয়-দশ বৎসর বয়সে তাহাদের মানসিক শক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে তখন তাহারা নিজেদের প্রয়োজনমত অনেক জিনিস তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে। শিশুর মেজাজ চড়া হইলে দেখিতে হইবে যে খেলনা তাহার প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশী বা কম আছে কি-না, অথবা যে-খেলনা লইয়া সে খেলা করে সেগুলি তাহার ভালো না লাগিতে পারে বা তাহার পক্ষে অনুপযোগী হইতে পারে।

এইবার কতকগুলি ছেলেদের সখের কথা (hobbies) আলোচনা করা যাক্। পড়াশুনা করা বা গল্প করা—সময় কাটাইবার প্রশস্ত উপায়। অনেকে ফুল, পাথর, পোকামাকড় বা ডাকটিকিট সংগ্রহ করে। এ-কাজগুলি করিয়া ছেলেরা প্রচুর আনন্দ লাভ করে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘর (Natural History Museum) হইতে এই সকল ছেলেরা বহু তথ্য যোগাড় করিতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই প্রকার যাদুঘর একেবারেই নাই। সময়ে-সময়ে ভ্রমণে বাহির হইলেও ছেলেরা প্রচুর আনন্দ এবং জ্ঞানলাভ করিতে পারে। প্রতি পর্যটনেরই কিছু-না-কিছু উদ্দেশ্য থাকা উচিত। যেমন কোনো একটা কৌতূহলপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করা, অথবা এমন একটি স্থান বাছিয়া লইতে হইবে যেখানে কয়েকজনে মিলিয়া দু-এক ঘণ্টা ক্রীড়া-কৌতুক করিতে পারে বা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে (Nature study) জ্ঞান-লাভের অনুশীলন করিতে পারে, অথবা বনভোজন করিয়া ছেলেরা আমোদ প্রমোদ করিতে পারে। এক সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইলে বিনা খরচে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং পরিবারের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়। বাড়ির পিছনে আঙিনা থাকিলে সেখানে ছেলে-মেয়েরা নিরাপদে খেলিতে পারে। গৃহে কি করিয়া আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হয় এ বিষয়ে মাতা পিতার কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। আমেরিকাতে বিনা বেতনে মাতা-পিতাকে উপদেশ দিবার জন্য প্রতি সোমবার রাত্রি আটটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা আছে। ছয় সপ্তাহ ধরিয়া সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্য বিষয়গুলি এইরূপ—গৃহে খেলিবার উপযোগী স্থান স্থির করা, উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা, মাতা এবং

কন্যা গৃহে কি কি কাজ এক সঙ্গে করিতে পারেন, পিতা-পুত্রের জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা নির্দেশ করা, বাদলের দিনে কিভাবে রঙ্গ তামাসা করা যাইতে পারে, রোগ শান্তির পর স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য কিরূপ খেলার আয়োজন করিতে হইবে এবং বাড়িতে মাঝে মাঝে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান কুফল—ছেলে মেয়েদের স্বাভাবিক খেলাধুলো হইতে বঞ্চিত করা। কোন্ কোন্ ক্রীড়া কৌতুকে ছেলে মেয়েদের ঝোঁক আছে দেখিয়া—পরে তাহারা কোন্ কার্যে তৎপরতা দেখাইতে পারে বা কোন্ কার্য তাহাদের উপযোগী হইতে পারে বিচার করা সহজসাধ্য হয়। যে সকল ছেলেরা তত্ত্বাবধানের অভাবে রাস্তায় খেলা করে তাহাদের অনেক সময়ে আইন অমান্য করিতে এবং অনেক প্রকার ছোট ছোট অনিষ্টকর কার্য করিতে দেখা যায় এবং পরে তাহারা ধূর্ত হয়।

আধুনিক শিক্ষকেরা একথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, বিরামকাল (Vacation) বিশুদ্ধরূপে এবং সুচিন্তিত পদ্ধতি অনুসারে যাপন করিলে স্কুলে প্রত্যাগমন করিবার পর শিশুর মন গ্রহণক্ষম থাকে। আর তাহা না করিয়া সময়টা অন্যায়ভাবে অতিবাহিত করিলে সারা বছরের সৎকার্য পণ্ড হয়। শিশু জীবনে পাঠ্যাবস্থার প্রায় এক-চতুর্থাংশকাল বিরাম হিসাবে যাপিত হয়। অবকাশের সময় খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া যায়। শিবিরের মধ্যে কিছুকাল বসবাস করিলে (Camp life) ছেলে মেয়েদের সৎশিক্ষা হয়। তাহারা নিয়মিত সময়ে খাইতে, ঘুমাইতে এবং খেলিতে অভ্যস্ত হয়। অন্যের সহিত নিজেকে কিরূপে সুশৃঙ্খলভাবে মানাইয়া লইতে হয়, সে শিক্ষাতেও ইহা সহায়তা করে। আদুরে ছেলে যিনি নিজের ভাগে সবচেয়ে বড় রসগোল্লা এবং সন্দেশ না আসিলে চীৎকার করিয়া অস্থির হইয়া পড়েন, শিবিরে গিয়া পাঁচজন সাথীর সঙ্গে থাকিলে অতি শীঘ্রই অন্যেরও যে একটা অধিকার আছে তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং মাতারও ঘাড়ের উপর হইতে অনেকটা বোঝা নামিয়া যাইবে। তিনি কয়েকদিনের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবেন। কিন্তু এভাবে শিক্ষা দিতে হইলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন।

গ্রাম্য ছেলেরা বেশ শান্ত এবং ধীর প্রকৃতির হয়—শহরের ছেলেদের অপেক্ষা তাহাদের চিত্ত অচঞ্চল থাকে। কৃষিজীবিদের বৃহৎ মাংসপেশীগুলি (big muscles) অতি দ্রুতগতিতে বাড়ে ও সূক্ষ্ম পেশীগুলি চর্চার অভাবে উন্নতি-লাভ করে না। (fine and accessory muscles) ইহাতে অঙ্গসৌষ্ঠব এবং দেহের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। গ্রামের লোকদের এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ প্রমোদের তত সুবিধা নাই (community recreation) এবং এই সকল আয়োজনের জন্য অধিনায়কেরও অভাব দেখা যায়। বাণিজ্য ঘটিত চিত্তবিনোদন স্থলে (যেমন থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতিতে) সকলকে অলস দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিতে উৎসাহিত করে—এই ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিশেষ প্রচলন আমেরিকা হইতে। সাধারণে পয়সা খরচ করে বসিয়া বসিয়া মজা দেখিবার জন্য। যুবকদের সর্বদা দর্শক হইয়া সময় কাটানোর অপেক্ষা সংগীত এবং অভিনয়ে নিজেদের যোগদান করাই শ্রেয়। অভিনয়ে যাহা কিছু শিক্ষাপ্রদ জিনিস আছে তাহা নিষ্ক্রিয়ভাবে মজা দেখিলে লাভ করা যায় না; সৃষ্টি করার অভিজ্ঞতা হইতে শিশুর মনের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা শিশুর মনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করা যায়। শিশুরা চলচ্চিত্রে যাহা দেখে তাহাই অনেক সময়ে অভিনয় করিয়া সকলকে দেখায়।

খেলাধুলোর উদ্দেশ্য ক্রীড়ার দ্বারা মানুষের মত মানুষ তৈয়ারী করা নতুবা মানুষকে ক্রীড়ার দাস করিলে চলিবে না। বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ মনকে যে কতখানি উন্নত করিতে পারে সে বিষয়ে বেশীর ভাগ মাতা পিতার কোনো অভিজ্ঞতা নাই—এই সকল জিনিসগুলি তাঁহাদিগকে শিখিতে হইবে। ইহার পর তাঁহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে অনায়াসলব্ধ কৌতুক (cheap amusement) শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর হইতে পারে।

স্কুলে এই চারিটি বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—(১) লেখা, (২) পড়া, (৩) অঙ্ককষা এবং (৪) আমোদ প্রমোদ। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন গ্রীক আদর্শ অনুযায়ী একসাথে শরীরের এবং মনের উৎকর্ষ-সাধনের ব্যবস্থা করা উচিত। আধুনিক যুগে মাতাপিতার জানা উচিত যে ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর উদ্দেশ্য শুধু লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য নহে, ছেলে অধ্যয়ন, খেলাধুলো এবং সর্বপ্রকার শিক্ষালাভ করিয়া গড়িয়া উঠিবে একজন পূর্ণ-মানুষ। যথাযথ শিক্ষা পাইলে শিশু ভবিষ্যজীবনে বুঝিতে পারিবে যে কোন্ পথে গেলে সে কৃতী হইবে এবং জীবনে চরম সুখ ভোগ করিতে পারিবে। বয়োবৃদ্ধগণ যাঁহারা সনাতন প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারা হাতে কাজ না থাকিলে আপন গণ্ডীর মধ্যে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠেন; সেক্ষেত্রে মোটরে উঠিয়া প্রমোদের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়া ছাড়া তাঁহারা সময় কাটাইবার আর উৎকৃষ্ট উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন না বা তাঁহাদের জানা নাই।

স্কুলে ভর্তি হইবার পূর্বে শিশু গৃহে যে শিক্ষালাভ করে তাহাও তাহার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়, সে সময়ে শিশুর জীবনে খেলার প্রভাব যথেষ্ট এবং খাদ্য ও বিশ্রামের ন্যায় খেলাও তাহার দেহ মনকে পুষ্ট করে। নূতন প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্তক পণ্ডিতগণের মতে প্রত্যেক শিশুর জন্য খেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতি ছেলে মেয়েকেই খেলা করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বলিতে হইবে কার্যকালে ঠিক এরূপ হয় না। যাঁহাদের উপর খেলা শেখাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা সবল এবং সক্ষম ছেলেদের উপর অনুরাগ দেখান আর যাহারা ক্ষীণজীবি অথবা দুর্বল এবং যাহাদের বিচক্ষণতার সহিত যত্ন এবং তত্ত্বাবধান করিলে উপকার হইত তাহারা চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায় অথবা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়।

মেয়েদের খেলাধূলার সম্বন্ধে এইকথা বলা যাইতে পারে যে-সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলে মেয়েদের মনে আনন্দ হয় এবং যে-সকল মাঠের খেলায় শরীর এবং চরিত্র গঠনের সুবিধা হয় সেই সকল খেলাতে মেয়েদের যোগদান করা উচিত। শক্তির প্রমাণ বা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য মেয়েদের অনুপযোগী ক্রীড়াতে যোগদান না করাই উচিত।

খেলাধূলা করিতে গিয়া শিশুদের যাহাতে অত্যধিক পরিশ্রম না হয় সেদিকে কতক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক ক্রীড়াতে নামিতে না দেওয়াই ভালো।

প্রতি স্কুলেই মুক্তবায়ুতে খেলিবার জন্য যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত ঝড়বৃষ্টির সময়ে ব্যবহারের উপযোগী একটি ব্যায়ামাগার থাকা দরকার—যেখানে প্রচুর আলোক ও মুক্তবায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

আমেরিকাতে মেয়েদের স্কুলে নিম্নলিখিত খেলাগুলি জনপ্রিয়—বেস্‌বল বাস্কেটবল, টেনিস এবং ভলিবল। এতদ্ব্যতীত ব্যাডমিণ্টন, টেবল-টেনিস, হাডু-ডু, সাঁতার প্রভৃতি আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে উপযোগী।

শহরের প্রতি একশতজনের অনুপাতে এক একর বা তিন বিঘা ভূমি প্রমোদকাননের জন্য (park) নির্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। ন্যূনতম পরিমাণে নয় হইতে বার বিঘা জমির কমে ছেলেদের খেলার মাঠ হতে পারে না। ছেলেদের বয়স অনুযায়ী মাঠটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিতে হইবে। ভূমি সমতল হওয়া দরকার, খুব কঠিন হইলে চলিবে না এবং ইহার উপরে ঘাস থাকা দরকার যাহাতে ছেলেরা খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গেলে আঘাত না পায়। এগার বৎসরের অধিক বয়সের ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা দরকার।

খেলায় নেতৃত্বঃ—নেতার নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকিলে ছেলেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে; তাঁহাকে সহৃদয় হইতে হইবে, ক্রীড়াকৌতুক সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান থাকা দরকার, শক্তিশালী হইলে ভাল, ছেলেদের খেলায় তাঁহার নিজের অনুরাগ থাকা দরকার এবং তাঁহাকে ছেলে সাজিয়া ছেলেদের খেলায় যোগদান করিতে হইবে। তাঁহার বয়স বেশী না হইলেই ভালো, ইহা ছাড়া আমোদপ্রিয় এবং সুদর্শন হওয়া আবশ্যক। ছেলেদের চোট লাগিলে তখনই তখনই ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসায় (first aid) তাঁহার জ্ঞান থাকা দরকার এবং খেলা শিখাইবার জন্য তাঁহাকে উত্তম শিক্ষক হইতে হইবে। এইরূপ অধিনায়কত্ব বিনা শিক্ষায় লাভ করা যায় না।

বর্তমান যুগে শিশুরা নিরাপদে এবং স্বাস্থ্যকরভাবে কিছুতেই খেলাধূলা করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না সমাজ হইতে তাহাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্থান এবং উপযুক্ত নেতার ব্যবস্থা করা হয়। আজ কলকব্জার যুগে এত বেশী কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে যে পুরাকাল হইতে মা এবং শিশু, শিশু এবং পরিবার এবং পরিবার এবং প্রতিবেশীর মধ্যে যে স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ ছিল তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখনকার সমস্যা হইতেছে—কি উপায় অবলম্বন করিলে আধুনিক সভ্যতার ফলে যে নূতন এবং প্রবল শক্তির সংঘর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে ছেলেদের অবিচলিত রাখিয়া মানুষ করা যায়।

'খেলার প্রয়োজনীয়তা কি', তাহা মাতা-পিতাকে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য। পূর্বে বলা হইয়াছে খেলা লইয়াই শিশু বাঁচিয়া থাকে, ইহার দ্বারাই তাহার মনুষ্যত্বের ক্রম-বিকাশ হয়, ইহার সাহায্যে সে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে, ইহা তাহাকে শিক্ষিত করে এবং অন্যের সহিত আলাপ করিবার সুবিধা দেয়। যে-সকল ছেলে-মেয়ে তরুণ বয়সে অপকর্ম করে, বুঝিতে হইবে তাহাদের অনেকেরই খেলার সহজ প্রবৃত্তিকে (instinct) বাধা দেওয়া হইয়াছে বা ব্যর্থ করা হইয়াছে। বাল্যকালের খেলা হইতে শিশু গঠন করিবার শক্তি সঞ্চয় করে। ইহাতে যে কেবল তাহার শরীর সুস্থ এবং সবল হয় তাহা নয়, তাহার মনের মধ্যে সাহসও বাড়িয়া যায় এবং সে কৌশল ও দক্ষতা লাভ করে। খেলার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া আজকাল অন্ধদের স্কুলে পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদ ও গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শহরের ভিড়ের মধ্যে লালিত শিশু শ্রম-শিল্পে কৃতকার্য হইতে পারে কিন্তু এভাবে শিশু পালন শিশুমঙ্গলের অন্তরায়; এরূপ স্থানে ছেলেদের মানুষ করিতে হইলে আরও বেশী যত্ন লওয়া এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

দ্বাররক্ষী
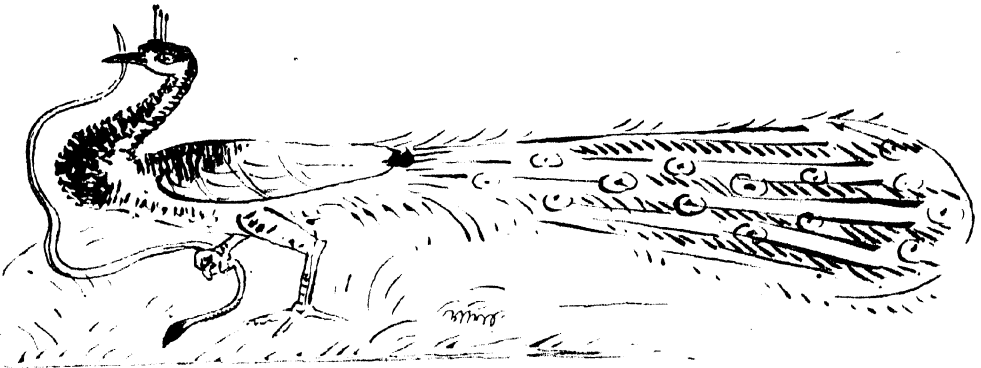
(অনুবাদ-গল্প)

গোপাল ভৌমিক এম-এ

মহামান্যা বোহেমিয়ার মহারাণী (গল্পলেখকদের জন্য বোহেমিয়ার রাজ্য সব সময় একটা থাকবেই) অতি সাধারণভাবে সেপ্ট-স্যাভোর কাউণ্টেস, নাম নিয়ে আত্মগোপন করে ট্রেনে প্যারী যাচ্ছিলেন। তাঁর সহচারিণী ছিলেন জর্জেস্থালের ব্যারোনেস্ এবং পরিচারক হিসাবে ছিলেন জেনারেল হর্স-কাউয়িজ। পা সেঁক্বার জন্য গরম জলের পাত্র এবং গায়ে ফারের জামা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রিজার্ভ কামরায় ভয়ানক শীত লাগছিল। ইংরেজী উপন্যাস পড়তে পড়তে মহারাণী বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন—তা' ছাড়া জেনারেলের অবিশ্রাম বুননকার্যও তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল; কিছু না কিছু একটা বোনা জেনারেলের বদ্ধমূল অভ্যাস। বিশ বছর বয়সের যুবতী মহারাণীর বাইরের দৃশ্য দেখবার ইচ্ছা হল; জানালার ভিতর দিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখেন বাইরে প্রকৃতি বরফাচ্ছন্ন—জানালার কাচেও টুকরো টুকরো বরফ জমেছে। তাঁকে রুমাল দিয়ে কাচ মুছতে হল। এই মাঝামাঝি শীতের সময় প্যারীতে তাঁর মা, ভূতপূর্ব মোরাভিয়ার রাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা মহারাণীর একটি বিশিষ্ট খেয়াল; তাঁর মা ব্যবস্থা করেছিলেন যে, আগামী বসন্তে প্রাগে মাতা ও কন্যার সাক্ষাৎ হবে। তা সত্ত্বেও শূন্যের নীচে দশ ডিগ্রি তাপ যখন নেমেছে, তখন তিনি রওনা দিলেন প্যারীর উদ্দেশে। ব্যারোনেসকে রাতের শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠতে হল; জেনারেল তাঁর পুত্রবধূর জন্য একটি বিছানার ঢাকনা বুনছিলেন, সেটা ফেলেই তাঁকে চলে আসতে হল; সঙ্গে তিনি মাত্র ট্রেনে চিত্তবিনোদনের জন্য একজোড়া মোজা বুনবার উপযোগী জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। তাঁদের ভ্রমণটা খুবই বিশ্রী হয়েছে; সারা ইউরোপ বরফে ঢাকা; তাঁরা বহু কষ্টে অনেক দেরী সহ্য করে অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে এসেছিলেন—কারণ শীতের প্রাবল্যে বহু স্থানে রেলওয়ে লাইন খারাপ হয়ে গেছল। অবশেষে ধীরে ধীরে তাঁরা প্যারীর কাছে এগুতে লাগলেন, সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাকোঁতে তাঁরা নৈশ-ভোজ সমাপ্ত করেছিলেন; রাতে পা সেঁকবার গরম জলও ঠাণ্ডা বলে বোধ হচ্ছিল—আর ওদিকে বাইরের অন্ধকারে বড় বড় বরফ খণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছিল। ব্যারোনেস এবং জেনারেল ফারকোট আপাদমস্তক ঢেকে তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন যে, তাঁরা প্যারীতে পোঁছে গেছেন। প্যারীতে গিয়ে ব্যারোনেস ধর্মচর্চায় মন দিয়েছেন এবং জেনারেল রু-সেণ্ট-অমর স্ট্রীটে পশমের দোকান থেকে তাঁর মনের মত রঙের সুতো কিনেছেন। মহারাণীর কিন্তু মোটেই ঘুম আসছিল না।

তাঁর নীল রঙের গরম পোষাকের নীচেও তিনি শীতে কাঁপছিলেন; তাঁর কেমন যেন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছিল; নরম গদির উপর কনুই রেখে এবং তাঁর টুপির মধ্য দিয়ে যে সুন্দর খাসরঙা চুল গড়িয়ে পড়েছিল তার মধ্যে হাত রেখে, তিনি অর্ধ-আলো ছায়ায় সুন্দর আয়ত চোখ মেলে একমনে চিন্তা করছিলেন আর তাঁর কানে এসে পোঁছচ্ছিল ট্রেনের একঘেয়ে গতির শব্দ যা অনেক সময় ভ্রমণক্লান্ত যাত্রীদের কাছে দূরাগত মধুর সঙ্গীতের মতই শোনায়। হতভাগ্য যুবতী মহারাণী তাঁর স্মৃতির কোঠা হাতড়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ খতিয়ে দেখছিলেন, আর মনে মনে ভাবছিলেন যে তিনি বড় অসুখী।

প্রথমে তাঁর মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা যখন তিনি আর তাঁর যমজ বোনটি একসঙ্গে ছিলেন। এই যমজ বোনটিকে তিনি খুব ভালবাসতেন—বহুদূরে উত্তর দেশে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তাঁদের দুজনের চেহারায় এত বেশী মিল ছিল যে, তাঁরা যখন এক রকম পোষাক পরতেন, তখন তাঁদের চেনার জন্য দুজনের চুলে দু' রঙের 'বন্ধনী' পরিয়ে দিতে হত। তখনও প্রজাদের বিদ্রোহের ফলে তাঁর বাবা রাজ্যচ্যুত হন নি; তিনি ওলমাজের রাজসভার শান্তিনিদ্রালু আবহাওয়া বড় ভালবাসতেন—ওলমাজে রাজকীয় আদব-কায়দার মধ্যেও একটা সহজ সরল গার্হস্থ্য ভাব ছিল; সেই সময় তাঁর বাবা মহদাশয় পঞ্চম লুই—যিনি পরে ভগ্ন-হৃদয়ে বনবাসে মারা গেছেন—রাজপোষাক পরেই তাঁকে নিয়ে পার্কের দিকে বেড়াতে যেতেন। তারপর বিকেলে দুই বোন বাবার সঙ্গে চীনা তাঁবুতে বসে কফি খেতেন—সেখান থেকে দূরের নদী দেখা যেত আর দেখা যেত দূরস্থিত হেমন্তকালীন লাল পাহাড়।

তারপর তাঁর বিয়ে হল—সে উপলক্ষে জুলাই মাসের সুন্দর এক রাত্রিতে বিরাট রাজকীয় বল নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁরা জানালা দিয়ে শুনতে পেলেন নীচের উদ্যানে দণ্ডায়মান আগ্রহাকুল জনতার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি। বোহেমিয়ার তরুণ রাজার সঙ্গে তাঁকে যখন কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে হয়েছিল, তখন তিনি কি রকম কেঁপেছিলেন অথচ তিনি তাঁকে প্রথম দেখার পর থেকেই ভালবেসেছিলেন—সুন্দর শিরস্ত্রাণ পরে রাজা যখন তাঁর দিকে এগিয়ে এসেছিলেন—তাঁর পরিধানে ছিল মুক্তাখচিত নীল রঙের রাজপোষাক আর প্রতি পদক্ষেপে তাঁর পায়ের ধূসর জুতোয় সোনার কাঁটাগুলো বাজছিল। প্রথম ওয়ালজ্ নাচের পরে রাজা অটোকার আদর করে তাঁর হাত ধরেছিলেন এবং তারপর তাঁর কালো লম্বা গোঁফে তা দিতে দিতে তাঁকে নিয়ে গেছলেন পাশের বিদেশী ফুলের ঘরটায়। সেখানে রাজা তাঁকে একটা পামগাছের নীচে বসিয়েছিলেন, তারপর নিজে তাঁর পাশে বসে অতি ধীরে তাঁর হাতটি তুলে নিয়ে, তাঁর চোখে চোখ রেখে বলেছিলেনঃ "রাজকুমারী, তুমি কি স্বামীত্বে বরণ করে আমায় সম্মানিত করবে?" তিনি প্রথম লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিলেন—তারপর মাথা নামিয়ে একহাতে তাঁর উন্মুক্ত বুকের কম্পনকে দাবিয়ে রেখে তিনি উত্তর দিয়েছিলেনঃ "হাঁ, মহারাজ!"—আর ওদিকে হাঙ্গেরীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সমস্ত বেহালা একযোগে আগ্রহপূর্ণ জয়সঙ্গীত 'চেক মার্চ' গেয়ে উঠেছিল।

হায়, কত শীঘ্রই না সে সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে! ছয় মাসের ভুল আর মোহ—মাত্র ছয়টি মাস—তারপর একদিন যখন তিনি মা হবার পথে অনেক দূর এগিয়েছেন, তখন হঠাৎ জানতে পারলেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন—রাজা তাঁকে ভালবাসেন না, কোনদিন ভালবাসেন নি'। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হবার পরদিনই রাজা প্রাগ থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ নর্তকী লা গ্যাজেলার সঙ্গে (যাকে সাধারণ বেশ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না) নৈশ ভোজন করেছেন। আর এইটাই তাঁর একমাত্র গুপ্তপ্রণয় নয়! তারপর তিনি জিব্রানের কাউণ্টেসের সঙ্গে তাঁর পুরানো প্রেমের কাহিনী জানতে পারলেন—অবশ্য এ ব্যাপারটা একমাত্র তিনি ছাড়া আর সবাই জানতেন। এই কাউণ্টেসের দ্বারা তিনি তিনটি ছেলের বাবা হয়েছেন—তাঁর হাজার খেয়ালের মধ্যেও তিনি এই কাউণ্টেসের কথা ভোলেন নি। তা ছাড়া তাঁর দুঃসাহস এত বেশী যে তিনি কাউণ্টেসকে তাঁর স্ত্রীর প্রধান সহচরীর পদ দিয়েছেন। একটি মাত্র আঘাতে মহারাণীর প্রেমের মৃত্যু হল—তাঁর সেই ভীরু-ভঙ্গুর প্রেম যার কথা জোর গলায় তাঁর স্বামীকেও তিনি জানাতে পারেন নি। তাঁর প্রেমকে তিনি তুলনা করতেন পোষা পাখীর সঙ্গে—হঠাৎ দাসীর হাত থেকে পড়ে গিয়ে একটি চীনা মাটির পাত্র ভাঙিবার শব্দে হঠাৎ তাঁর হাতের

মুঠো বন্ধ করেই যেন তিনি এই পোষা পাখীটির মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

তাঁর ছেলে! হাঁ, তাঁর একটি ছেলে আছে বটে আর তিনি তাঁর ছেলেকে ভালও বাসেন প্রাণ দিয়ে। কিন্তু অনেক সময় সোনার দোলনায় শায়িত তাঁর ছেলে ল্যাডিসলাসের পাশে বসে তাঁর মনে কি ভয়ংকর চিন্তা হত। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে যখনই তিনি ভাবতেন যে, এ ছেলে নিষ্ঠুর দুশ্চরিত্র অটোকারের ঔরসজাত, তখনই তাঁর হৃদয়ে যন্ত্রণার বরফস্পর্শ অনুভব করতেন। তা ছাড়া নিজের ছেলেকে কখনও তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পাননি। বোহেমিয়ার সব কিছুতেই যেন কেমন একটা কাঠিন্য, সহৃদয়তার অভাব—ওখানে সব কিছুতেই লৌকিকতার বড় বাড়াবাড়ি। তাঁর বাবার রাজসভায় কিন্তু আদবকায়দার বাড়াবাড়ি ছিল না। গম্ভীর মুখে জাঁকজমকওয়ালা পোষাক পরে একদল বুড়ী নার্স সব সময় রাজপুত্রের দোলনার আশে পাশে ঘুরে বেড়াত এবং মহারাণী যখন রাজপুত্রকে দেখতে যেতেন তখন গম্ভীরভাবে তাঁকে বলতঃ "রাজপুত্রের রাত্রিবেলায় একটু কাসি হয়েছিল......তাঁর দাঁতগুলো তাঁকে বড় কষ্ট দিচ্ছে..." তাঁর মনে হত যে এই শঙ্কহৃদয়া বুড়ীদের বরফ শীতল স্পর্শ লেগে তাঁর মাতৃহৃদয়ের সব উষ্ণতা চলে যাবে—তাঁর হৃদয় জমে যাবে।

সত্যই বেচারী মহারাণীর কোন উপায় ছিল না—তাঁর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তাই সময় সময় তিনি বিরক্ত আর ক্লান্ত হয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে ফরাসী দেশে তাঁর মা, ভূতপূর্ব মোরাভিয়ার মহারাণীকে দেখতে যেতেন। তিনি একা পালিয়ে আসতেন—যেন বন্দীজীবন থেকে তিনি মুক্তি পেতেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে থাকত না কারণ বোহেমিয়ার প্রচলিত রীতি অনুসারে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বাবার সঙ্গে ছাড়া কোথাও যেতে পারতেন না। তাই মহারাণী একাই তাঁর বৃদ্ধা মার কাছে তাঁর ব্যথা জানাতে—তাঁর গলায় হাত জড়িয়ে তাঁর সমস্ত জমানো চোখের জল ঢালতে যেতেন।

এবার তিনি বড় তাড়াতাড়ি রাজার অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছেন—আসার সময় ঘুমন্ত ল্যাডিসলাসের মুখে একটি বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে এসেছেন। না পালিয়ে এসে তাঁর উপায় ছিল না—লজ্জা আর ঘৃণায় তাঁর প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। রাজার দুশ্চরিত্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছিল; এখন বোহেমিয়ার প্রায় সব নগরের এবং তাঁর শিকারের সব জায়গায় তিনি তাঁর কুকর্মের আস্তানা করেছিলেন। সর্বত্রই তাঁর দু'একটি জারজ সন্তান ছিল; সবখানেই তিনি লোকের হাসির খোরাক জোগাচ্ছিলেন—প্রাগের রাস্তায় রাস্তায় তাঁর চরিত্রহীনতার বিষয় নিয়ে ছড়া গেঁথে গান করা হত। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, তাঁর এই অবৈধ সন্তানদের কি হবে। অটোকার কি তাঁর অবৈধ সন্তানদের দিয়ে বলবান অগাষ্টাসের মত জীবন রক্ষী সৈন্যদল তৈরী করবেন? এদের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজা সব কিছুকেই অর্থে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছিলেন—অভাবে রাজ্য জর্জরিত হয়ে উঠেছিল।

যাক্, কিন্তু এ দিকের ব্যাপার কি? ট্রেন যে ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছিল—সত্যই যে ট্রেন থেমে গেল! মধ্য রাত্রে খোলা মাঠে ট্রেন থামার মানে কি? ভীত হয়ে জেনারেল এবং ব্যারোনেস উঠে বসলেন; জানালা খুলে অন্ধকারে তাকিয়ে জেনারেল দেখতে পেলেন যে গার্ড বাতি হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, গাড়ীর চাকাগুলি বরফের মধ্যে বসে গেছে—গার্ডের বাতি হঠাৎ জেনারেলের লম্বা, শাদা, খাড়া খাড়া গোঁফের উপর এসে পড়ল—গার্ড তাঁদেরই কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"ব্যাপার কি? গাড়ী থামার কারণ কি?" বৃদ্ধ হর্স কার্উরিজ জিজ্ঞাসা করলেন। "ব্যাপার এই যে স্যার, আমাদের অন্তত একটি ঘণ্টা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ......দুই ফিট গভীর বরফ! আর অগ্রসর হবার উপায় নেই!...প্যারীর লোকদের ভাগ্যে কাল কফি জুটবে না!"

"সে কি! এই রকম অবস্থায় এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে?...আপনি জানেন যে পা সেঁকবার জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে..."

"আমরা কি করতে পারি স্যার? ওরা এই মাত্র ষ্টেনের লাইন পরিষ্কারকারী একদল লোকের জন্য 'তার' করেছে!...তবে আমি আবার বলছি যে আমাদের এখানে অন্তত এক ঘণ্টা বসে থাকতে হবে।" তারপর গার্ড বাতি নিয়ে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে যান।

"কিন্তু এযে ভয়ংকর ব্যাপার! মহারাণীর যে ঠাণ্ডা লাগবে।" ব্যারোনেস বলেন। কাঁপতে কাঁপতে মহারাণী বলেনঃ "হাঁ, আমার খুব শীত লাগছে!" জেনারেল বুঝতে পারেন যে, এই হচ্ছে বীরত্ব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ সময়; তিনি কামরা থেকে লাফিয়ে পড়েন—তাঁর হাঁটু অবধি বরফে ঢেকে যায়—পরে তিনি জোরে হেঁটে গার্ডকে ধরে ফেলেন। তিনি নীচু গলায় তাঁকে কি যেন বলেন।

"স্বয়ং মোগল সম্রাট হলেও আমি গ্রাহ্য করি না কারণ আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই!" রেলওয়ের লোকটি জবাব দিলেন। "যাক, আমরা একটি রেলওয়ের দ্বাররক্ষীর বাড়ির ঠিক বিপরীত দিকে এসে দাঁড়িয়েছি ওর বাড়িতে নিশ্চয়ই আগুন আছে...... আপনার সঙ্গে মহারাণী যদি সেখানে যান...ওহে, স্যাবোতিয়ে!.."

বাতি নিয়ে আরেকটি রেলকর্মচারী এগিয়ে আসে।

"দেখুন, দ্বাররক্ষীর বাড়িতে যদি আগুন পান।"

মহা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দ্বাররক্ষীর বাড়িতে আগুন ছিল। কোন একটা যুদ্ধ জয় করলে কিংবা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিছানার ঢাকনা বোনা শেষ হলেও বোধ হয় জেনারেল এত আনন্দ পেতেন না। তিনি মহারাণীর কামরার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কঠিন পরিশ্রম এবং তার ফল বর্ণনা করলেন। পরমুহূর্তে তিনজনে জুতার নীচের জমাট বরফ ছাড়াবার জন্য পা ঝাড়তে ঝাড়তে বহু কষ্টে দ্বাররক্ষীর ছোট বাড়িটার নীচু ঘরে এসে দাঁড়ালেন। দ্বাররক্ষী তাঁদের ভিতরে এনে আগুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নতুন কাষ্ঠখণ্ড ফেলে দিচ্ছিল অগ্নিকুণ্ডে। উজ্জ্বল আলোকের সামনে খড়ের গাদার চেয়ারে বসে মহারাণী তাঁর গরম পোষাক খুলে চেয়ারের পিঠে রেখে দিলেন; হাতের দস্তানা খুলে' আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

ছোট একটি চাষার ঘর; মেঝে কঠিন এবং অসমতল; ধোঁয়াচ্ছন্ন বরগা থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ পেঁয়াজ ঝুলছিল; অগ্নিকুণ্ডের উপরে দুটো কাঁটার উপরে একটি পুরানো শিকারীর বন্দুক ছিল আর ঘরে খাবার টেবিলে ছিল কয়েকখানি ফুল-আঁকা ডিস্। কিন্তু একটা জিনিস সবচেয়ে বেশী মহারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল; পর্দাঘেরা অর্ধ-লুক্কায়িত বিছানার পাশে একটি সাধারণ দোলনা ছিল; সেখান থেকে একটি সদ্যজাগরিত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল।

এক মুহূর্তে দ্বাররক্ষী আগুন করা বন্ধ রেখে দোলনার পাশে গিয়ে সেটাকে মৃদু দোলা দিতে শুরু করল।

"ঘুমোও মা, ঘুমোও! ও কিছু নয়—এঁরা তোমার বাবারই বন্ধু!"

লোকটাকে খুব স্নেহময় যত্নশীল পিতা ব'লে মনে হ'ল—এই দরিদ্র দ্বাররক্ষী, পরনে যার ছাগলের চামড়ার পোষাক, মাথায় টাক, মুখে সৈনিকের মত কঠিন গোঁফ আর গালে বড় বড় বিষণ্ণ দুটি বলিরেখা!

"ও কি তোমার ছোট্ট মেয়ে?" মহারাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হাঁ, মাদাম্, ও আমার সিসিলি......আগামী মাসে ওর তিন বছর বয়স হবে!"

"কিন্তু...ওর মা?" দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মহারাণী জিজ্ঞাসা করেন এবং লোকটি যখন নেতিসূচক মাথা নাড়ে, "তবে তুমি মৃতদার?"

কিন্তু সে আবার অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তখন মহারাণী বিচলিত হয়ে দোলনার কাছে গিয়ে দেখেন যে সিসিলি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে—ওর কোলের কাছে পেস্টবোর্ডের তৈরী সাধারণ একটি কুকুর!

"বেচারী!" মহারাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

দ্বাররক্ষী তখন ভাঙা গলায় বললে: "আচ্ছা মাদাম্, আপনার কি মনে হয় না যে, যে মা এই অল্প বয়সের মেয়েকে ফেলে চ'লে যেতে পারে, সে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা? অবশ্য আমাকে ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে আমার নিজেরও কিছু দোষ আছে!...আমার পক্ষে তার মত তরুণী মেয়েকে বিয়ে করা অন্যায় হয়েছিল—তা'ছাড়া তাকে শহরে গিয়ে অবাঞ্ছনীয় তরুণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশতে দেওয়াও আমার উচিত হয়নি। কিন্তু এই অবুঝ মেয়েটিকে ছেড়ে যাওয়া!..... এটা কি কলঙ্কের কথা নয়?...যাক্, কি আর করব, একা আমাকেই এই হতভাগ্য শিশুকে মানুষ করতে হবে!...রেলওয়ের কাজ করি ব'লে একে মানুষ করা অবশ্য আমার পক্ষে কষ্টকর।...রাত্রে অনেক সময় ও যখন কাঁদতে থাকে তখন সেই অবস্থায় ওকে রেখে ট্রেনের বাঁশি শুনে' আমাকে ছুটে যেতে হয়। কিন্তু দিনের বেলায় ওকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই...ও এখনই বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ও আর রেলগাড়ীকে ভয় করে না...জানেন, কাল আমি বাঁ হাতে ওকে ধরেছিলাম আর ডান হাতে নিশান দেখাচ্ছিলাম। এক্সপ্রেস্‌টা যখন সামনে দিয়ে গেল, ও তখন একটু কাঁপলও না। সবচেয়ে আমার যা' বেশী বিরক্তিকর লাগে সে হচ্ছে ওর জন্য পোষাক, টুপি প্রভৃতি সেলাই করা। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমার সময়ে আমি জুয়েভ্‌স্‌এ কর্পোর‍্যাল ছিলাম—কাজেই সূচসূতোর কাজ কিছু কিছু জানি!"

মহারাণী বললেন: "কিন্তু এত বড় কঠিন কাজ! দেখ, আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই...কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম আছে এবং সেই গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার হয়ত তোমার মেয়ে মানুষ করবার ভার নিতে পারে...এ যদি শুধু টাকারই প্রশ্ন হয়, তবে আমি..."

কিন্তু দ্বাররক্ষী আবার অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। "না, মাদাম্, না, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি অহংকারী নই—আমি সিসিলির জন্য হৃষ্টচিত্তে সাহায্য নিতে রাজী আছি... কিন্তু আমি ওকে কাছ ছাড়া করব না...না, কখনও না...এক ঘণ্টার জন্যও না!"

"কিন্তু কেন?"

"কেন?" লোকটি বিষণ্ণ গলায় জবাব দিলে: "কারণ মেয়েটিকে মানুষ করার ভার আর কারও উপর দিয়ে আমি বিশ্বাস পাই না। ওর মা যা' নয় আমি ওকে তাই করব—আমি ওকে চরিত্রবতী ক'রে তৈরী করব। কিন্তু আমায় মাপ করুন, আপনি কি দয়া ক'রে সিসিলির দোলনাটা একটু নাড়বেন—লাইনে আমার ডাক পড়েছে!"

সেই রাত্রে মহারাণী যখন এক ঘণ্টা ধ'রে দরিদ্র দ্বাররক্ষীর মেয়ের দোলনা দুলিয়েছিলেন, তাঁর তখনকার মনোভাব কি কেউ জানতে পারবে? জেনারেল এবং ব্যারোনেস্ তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের সাহায্য না নেওয়ায় তাঁরা অভিমানে গম্ভীর হয়ে আগুনের সামনে ব'সে ছিলেন। যখন গার্ড দরজা খুলে' বললেন: "ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়, আপনারা আসুন গাড়ী এখনই ছাড়বে—সবাই গাড়ীতে উঠুন", তখন মহারাণী তাঁর টাকার থলি সোনায় পূর্ণ ক'রে রেখে গেলেন—আর রেখে গেলেন তাঁর কোমরের এক গুচ্ছ ভায়োলেট্ ফুল সিসিলির দোলনায়। তারপর তিনি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

কিন্তু মহারাণী এবার মাত্র দুদিন প্যারীতে রইলেন, তারপরই তিনি প্রাগে চ'লে গেলেন—প্রাগ্ ছেড়ে তিনি আজকাল বড় কোথাও যান না—সেখানে তিনি তাঁর ছেলের শিক্ষার জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। যে-সব নার্সরা আগে শিশু ল্যাডিস্‌লাসের দোলনার আশে পাশে গম্ভীর মুখে ঘুরে' বেড়াত—তাদের আর এখন কোন কাজ নেই—যদিও তারা নিয়মিত মাইনে পায়। শিশু ল্যাডিস্‌লাস যখন বেড়ে উঠবেন তখন যদি ইউরোপে রাজতন্ত্র থাকে, তবে তাঁর বাবা যা' ছিলেন না, তিনি তাই হবেন—ভাল রাজা। পাঁচ বৎসর বয়সেই ইতিমধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন তাঁর মার সঙ্গে আঁকাবাঁকা বোহেমিয়ার রেলপথে ভ্রমণ করেন, তখন গাড়ী থেকে যদি দেখেন যে, কোন দ্বাররক্ষী এক হাতে একটি শিশুকে ধ'রে অন্য হাতে নিশান উড়াচ্ছে, তবে তিনি তাঁর মার নির্দেশমত তার উদ্দেশ্যে সব সময়ই চুম্বন পাঠিয়ে দেন। *

---

* ফরাসী লেখক Francois Coppeeর The Gate Keeper গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।
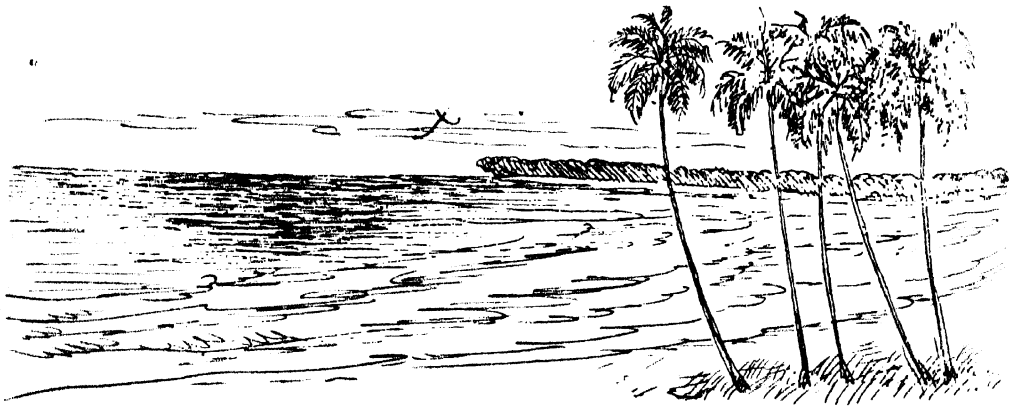
আধুনিক শিল্পকলার অস্পষ্টতা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস বি এস-সি

প্রকৃত শিল্প কি স্পষ্ট? না। তা স্পষ্টই নয়, বা কখনও তা হ'তেও পারে না। যখনই সে স্পষ্ট হবে, তখনই তার গভীরতা চ'লে যাবে, তার মধ্যে আসবে একটা লঘু ভাব। সে আর অসাধারণ থাকবে না। প্রকৃত শিল্পে থাকবে আভাস,

'নির্যাতিনী' (মূর্তি)—শিল্পী এপস্টাইন

ইঙ্গিত, কিন্তু তাতে স্পষ্টতা থাকবে না। মনীষী ইমারসন বলেছেন,—

"God himself does not speak prose; but communicate with us by hints, inference and dark resemblances in objects lying all round us."

আমরা স্পষ্ট ক'রে, মিষ্ট ক'রে কথা বললেও দেখা যায়, অনেক লোকে তাতে আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু শিশুর আধআধ উচ্চারিত কথায় লোকে কত না আকৃষ্ট হয়। শিশুর কয়েকটি অস্পষ্ট শব্দের মধ্যে সমাচ্ছন্ন থাকে প্রাণের বহু অর্থ, ইঙ্গিত বা দ্যোতনা (Suggestion)। দ্যোতনা নিয়েই এই বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি। এই বিশ্বের যে অফুরন্ত সৌন্দর্য তার মূলেও আছে এই একই বস্তু—ইঙ্গিত। শ্রাবণের স্তব্ধ প্রকৃতি, থমথমে আকাশ, কাল মেঘ, এগুলিতে কি স্পষ্টতা আছে? তবু দেখুন কবি এরই মধ্যে দেখেন একটি বিরহ-বিধুর শোকার্তা নারী মূর্তির প্রচ্ছন্ন বিকাশ। কত অস্পষ্ট ইঙ্গিত, তবু তাতে কত অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। বলা কথার চেয়ে না বলা বাণীই বেশী অর্থ প্রকাশ করে। বলা কথার অর্থ ততটুকুই, যতটুকু স্পষ্ট ক'রে বলা হয়, কিন্তু না বলা কথার অর্থ যে অনেক, তার কোনও নির্দিষ্ট সীমাই নেই। তার ভিতর সমাহিত অর্থের ইঙ্গিত বিশ্বব্যাপী। মানুষ যুগে যুগে আবিষ্কার করতে চেষ্টা ক'রে চলে কি তার সঠিক অর্থ হ'তে পারে। মানুষ আপন মনে কত অর্থই না তার কল্পনা করে, তবু তার ঠিক অর্থটি চিরকালই হেঁয়ালি হ'য়ে রয়ে যায়।

মানুষ সভ্যতার কোন্ আদিম কাল হ'তে চিন্তা ক'রে চলেছে, মিশরের সেই বিরাট সমাহিত 'স্ফিংস' মূর্তিটি কি বলতে চায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। বোধ হয়, তার অর্থ চিরকালই হেঁয়ালি হ'য়ে থাকবে। তবু মানুষ এ পৃথিবীতে আসবে, তার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে, চ'লে যাবে। সমস্যাটির সমাধান করতে পারবে না, তবু সে তা নিয়ে কেন এত চিন্তা করবে? এতে তার বিশেষ কোনও স্বার্থ নেই, তবু এতেই তার আনন্দ। চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুই নেই। সেখানে মানব নিজের পরিবেশের কথা ভুলে যায়, সীমার মধ্যে অসীমের সুর শুনে অনন্ত জগতের সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করে।

মনের উপর যে বস্তু ছায়াপাত করে তার মূল্য, যে বস্তু

বর্দেল নির্মিত শিল্পী রদাঁর মূর্তি

কেবল দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে, তার চেয়ে অনেক বেশী। দৃষ্টিকে যে বস্তু মুগ্ধ করে, তার নয়নমনোহারিত্ব যতই অধিক হ'ক না কেন, তা মনের উপর কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রতে সমর্থ হয় না। সেই জন্যই তার মূল্য এত অল্প।

পূর্বকালে পাশ্চাত্যে শিল্পকলার বিচার হ'ত, কোন্ শিল্পীর শিল্প কত নয়নমুগ্ধকর হয়েছে, সেই দেখে। কিন্তু এখনকার শিল্পকলার বিচার হয়, কোন্ শিল্পীর শিল্প মানুষের মনে কতখানি আলোড়নের সৃষ্টি ক'রতে পেরেছে সেই দেখে। ক্রমবিকাশের সোপানে মানব-মন এখন অনেক ঊর্দ্ধে উঠেছে। মানব-প্রকৃতি এখন সংযমের এত উচ্চস্তরে উঠেছে, সে রূপহীন ভঙ্গিমাহীন আড়ষ্ট আকাশের মধ্যেও কেবল তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির বলে সে সৌন্দর্যের "মালতী-বল্লী-বিতান" রচনা ক'রতে সমর্থ হচ্ছে।

আধুনিক ভাস্কর শিল্পীদের মধ্যে ইঙ্গিতময়, ভাবময় শিল্প রচনার একটা বিশেষ প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। অনেক বড় বড় শিল্পী, যাঁরা পূর্বে বস্তুতান্ত্রিকতার ভক্ত ছিলেন, তাঁরা আজকাল বস্তুতান্ত্রিকতা পরিত্যাগ ক'রে ভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ভাস্কর শিল্পী রোঁদা, এপসটিন, লিও-আন্ডার-উড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রোঁদা রূপ বর্জন করেন নি বটে তবে তাঁর মূর্তিগুলি ভাবের গভীরত্বে অপূর্ব। তাঁর রচিত 'মাতৃমূর্তি, ইং, চুম্বন' প্রভৃতি ভাস্কর্য জগতে অপূর্ব সৃষ্টি। এপসটিন পূর্বে ছিলেন একজন পোর্টরেচারিস্ট, কিন্তু বর্তমানে তিনি তা পরিত্যাগ ক'রে অনুকৃতির পরিবর্তে বিকৃতির সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। তাঁর দিবা, রাত্রি, সৃষ্টি (genesis) প্রভৃতি রচনাগুলি একেবারে বিমূর্ত (abstract)। তাতে না আছে সঠিক অস্থি ও পেশীসংস্থান (anatomy), না আছে বিষয় বস্তুর সঠিক অনুপাত (proportion)। মূর্তিগুলি অতি বিচিত্র, তাতে আছে কেবল ভাব।

লিও-আন্ডার-উড একেবারে আফ্রিকার নিগ্রো ধারায় মূর্তি রচনা শুরু ক'রে দিয়েছেন। নিগ্রো আদর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি? এতে শিক্ষণীয় অ্যানাটমি, প্রোপোরশন বা টেকনিক না থাকলেও, একটি জিনিস আছে, সেটি হ'ল অতি স্বাভাবিক ও সরল প্রকাশভঙ্গী। নিগ্রো ভাস্কর্য মার্জিত না হ'লেও, এতে শিল্পের ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকলেও, আছে শিল্পীর প্রাণের একটা গভীর আকুতি। আন্ডার-উডের মতে মার্জিত ধারায় সুপরিস্ফুট শিল্পকলার চেয়ে এ বর্বর ধারার মধ্য দিয়ে নাকি শিল্পী অনেক সহজে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন।

আধুনিক চিত্রকলাতেও এইরূপ ভাববাদী অনেক শিল্পী দলের উদ্ভব হয়েছে। এঁদের মধ্যে অরফিস্টদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাববাদী চিত্রকরদের মধ্যে রিয়ালিস্টরা উঠেছেন চরমে। তাঁদের চিত্রের অনেক সময় কোনও অর্থই আবিষ্কার করা যায় না। তাঁদের শিল্পে কোনও বিশেষ টেকনিক নেই, কোনও নির্দিষ্ট স্টাইল নেই, কোনও বিশেষ 'ফর্ম' নেই, তাতে আছে খালি রূপহীন, ভাবময়, খাম-খেয়ালী হিজিবিজি; যার আভাস অনেক সময় আপনারা রবিবাবুর চিত্রকলায় পেয়ে থাকবেন।

দেশের বিগ্রহ তুমি বক্ষে ধর একবার

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অশান্ত আকাঙ্ক্ষা আসে নিষ্ফল আবেগ নিয়া
নিরন্তর নিখিলের মনে,
সে মনের উন্মাদনা দিনে দিনে বিবর্ধিত এযুগের বুদ্ধি বিড়ম্বনে।
কল্পনায় কত ভ্রান্তি, জল্পনায় ত্রুটি কত বুঝিবে কি দেশ যাত্রিগণে,
মিথ্যা যাহা সত্য বলি প্রচারিছে আত্মঘাতী অহংমন্য ঘৃণ্য বাবদুক,
বিজাতীয় ছন্দহীন কাব্য তার কোন দিন মিটাবে কি স্বদেশের দুখ?
ভ্রান্তিভরা সাধনায় সংসার সমাজ সদা সম্মোহিত তুচ্ছ অহঙ্কারে,
স্বদেশের দেবালয়ে প্রাণের বিগ্রহ কাঁদে বুভুক্ষায় গাঢ় অন্ধকারে;
সে ক্রন্দন কে শুনিবে? অহঙ্কারে মত্ত যারা দলগত সুযোগ প্রচারে
প্রতীচ্যের পদলেহী, স্বজাতির চিন্তাধারা তুচ্ছ বলে করিয়া বর্জন
প্রাণহীন অক্ষরের মহিমারে প্রচারিয়া প্রশংসারে করিতে অর্জন
ছুটিতেছে দ্বারে দ্বারে বরমাল্য লোভে, তাহাদের কতটুকু স্থান
এ বিশ্ব সংসার মাঝে? পরছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত রহি করে অসম্মান
জাতীয় জীবন কাব্য। অসীমকালের স্রোতে
ভাসিবে কি ব্যর্থতম প্রাণ?
বিস্মৃতির বিবর্তনে রহিবে কি কোন কাব্য
কোন গীতি রচিতেছে যত?
যে কাব্যে সংগীতে নাহি জাতির বেদনা ব্যথা,
স্বদেশের ছন্দ প্রতিহত
তাই নিয়া আস্ফালন অশোভন তবু তাহা
হেরিতেছি সাম্প্রতিক মাঝে।
হে মোর চৈতন্যসত্ত্বা!......ভৈরবের রূপ নিয়া
জাগিবে কি যুগান্তের সাঁঝে?
তোমার আদর্শ নহে পশ্চিমের দিগন্তের ক্ষীণ রশ্মি
যাহা শুধু রাজে
মৌন বেদনার সনে,—তোমার আদর্শ সেই ভাগবত মন্দাকিনী ধারা,
তোমার আদর্শ সেই সুদর্শন চক্রধারী—সপ্তর্ষির পুণ্যে শুভ্র তারা।
চৈতন্য বিবেক বুদ্ধ নানক শঙ্কর প্রভু রামকৃষ্ণ গুরু রামদাস,
তোমার হৃদয় পথে মৃদঙ্গ বাজায়ে আসে, দেবতার হবে পরকাশ
দেশের বিগ্রহ তুমি বক্ষে ধর একবার, কর তার বুভুক্ষারে নাশ।
হে মোর চৈতন্যসত্ত্বা, ধ্বংস কর ওই সব অহংমন্য মানবেরে আজি,
বিজাতীয় সভ্যতারে ধ্বংস করে—মন্দ্রে তব ওঠে যেন জয়শঙ্খ বাজি'
অন্তর বেদনা ভরা করুণ রাগিনী কাঁদে স্বজাতির বুকে,
সংকট দুর্দিনে তব আবির্ভাব হবে কি গো
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আবর্তের মুখে?

সাপকাঠি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শীতের সময় সন্ধ্যা হতে না হ'তেই কুমারখালির হাট ভেঙে যায়। যেখানটায় হাট বসে সে জায়গাটা গ্রামের প্রায় বাইরে। তিনদিকে খোলা মাঠ। কেরোসিনের টিন দিয়ে দু তিনখানা চালা অবশ্য হাটের ওপর তুলেছে পোদ্দাররা, কিন্তু তাতে তারাই মুদি আর মনোহারী দোকান খুলে বসে, অন্য কোন দোকানদার সেখানে স্থান পায় না। খোলা জায়গাতেই তাদের বেচা কেনা করতে হয়। সন্ধ্যার কিছু আগে থেকেই হিম পড়তে আরম্ভ করে আর আসে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। তখন কার সাধ্য দাঁড়ায় সেখানে।

দোকানদারদের মধ্যে মাইল দেড়েক দক্ষিণের বাঁশখালির সাহারাই বেশী। তেল, নুন, শুকনো লঙ্কা, পান সুপারীর কোন না কোন দোকান তাদের প্রত্যেকেরই আছে। সন্ধ্যার পর দোকান পাট গুছিয়ে দরকারী সওদা সেরে সব একসঙ্গে গ্রামে ফিরে চলেছে। এদের মধ্যে নেই শুধু অনন্ত। সে ইচ্ছা ক'রেই দলের অনেক পরে রওনা হয়েছে এবং পিছনে পিছনে আসছে। গ্রামের মধ্যে ঢুকে সবাই যখন হাটের পথ ধ'রে আরো এগিয়ে গেল অনন্ত তখন একটু বেঁকে বাঁয়ের সরু পথ নিলে।

একটু এগিয়েই পড়তে হ'ল সরকারদের বাগানের মধ্যে। সরকাররা যখন ছিল তখন বাগানও ছিল। এখন বাগানের নামে আছে নানা রকম আগাছার জঙ্গল। গাব, আঁশ শ্যাওড়া আর ছোট ছোট চোখ উদানির গাছই বেশী। কিন্তু এই ঘন জঙ্গলের মধ্যেও অস্পষ্ট সাদা একটা সরু রেখা লম্বালম্বিভাবে পূব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে। এ পথ জঙ্গলের আর কোন অংশকেই স্পর্শমাত্র করেনি। পথের এই সংকীর্ণতা থেকে বোঝা যায়, এ রাস্তায় যাতায়াতের প্রয়োজন খুব বেশী নয়, নিতান্ত দরকার পড়লে অথবা সময় বাঁচাবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি করতে হলেই লোকে এ পথ ব্যবহার করে। অন্ধকার খুব বেশী হলেও তারার আলোয় অনন্ত বেশ পথ চিনতে পারে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহ'লে অন্ধকার যত বেশী হয়, তারার আলোও তত স্পষ্ট দেখা যায়। বাগানটা পার হ'তেই অবশ্য সোহাগীদের ঘরের আলোও দেখা গেল। সামান্য সাড়া পেতেই কেরোসিনের ডিবাটা হাতে নিয়ে সোহাগী নিজেও বেরিয়ে এল।

সওদার ধামাটা মাথা থেকে দাওয়ায় নামিয়ে অনন্ত চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবা নেই তো?'

সোহাগী হেসে বলল, 'আছে না? ঘরের মধ্যে শুয়ে ঘুমাচ্ছে দেখ এসে।'

অনন্তও হাসল। সোহাগীর বাবা মুকুন্দ কাল তার শ্বশুর বাড়ি চাঁদেরকান্দি গেছে। সেখানে তার শালাদের সঙ্গে মিলে বাঁধের ভাগ কিনেছে। কই আর সিঙি খুব চলা আরম্ভ করেছে বাঁধ দিয়ে। খবর পেয়ে মুকুন্দ কাল রাত্রেই রওনা হয়ে গেছে। দু তিনদিন মুকুন্দ আর বাড়ি মুখো হবে না। মাছ যা ভাগে পাবে তা ওখানে বসেই পাইকারীভাবে বিক্রি ক'রে দেবে। এ সব খবর অনন্ত আগেই পেয়েছে। ঘরের পৈঁচার ধারে একটা গলাভাঙা হাঁড়িতে জল ছিল পা ধোয়ার। নিশ্চিন্তভাবে পা ধুয়ে অনন্ত ঘরের মধ্যে গিয়ে ভাঙা একটুকরো তক্তা টেনে নিয়ে বসল। নৌকার একটা পাটাতনের ভেঙে যাওয়া খানিকটা অংশ বহুকাল যাবত আসন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সোহাগী বলল, 'ওভাবে বসে আরাম পাবে না, দাঁড়াও।'

খেজুরের পাতা দিয়ে নিজ হাতে বুনোন পাটিটা এক কোণে মোড়া ছিল। সোহাগী সেটা পেতে তার ওপর কাঁথা-খানা বিছিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার ভাল হয়ে বস।'

অনন্ত বিছানার ওপর গিয়ে উঠে বসল। 'আমি ভেবে-ছিলাম, তুই বুঝি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিস।'

সোহাগী বলল, 'হুঁ, তাই না, আমার আর তো কোন কাজ নেই। জাল একগাছ জুড়ে দিয়েছি। তা শেষ করতে হবে না? দেখ দেখি কেমন হচ্ছে? পছন্দ হয়? নেবে? সখ মত মাছ টাছ ধরতে পারবে।'

সোহাগী হাসল।

অনন্ত দেখল ঘরের মাঝখানে খামের সাথে নিচু ক'রে এক গাছ অসমাপ্ত জাল বাঁধা আছে। রাত্রে আলো জেলে জাল বুনবার মত অত তেল সোহাগীর নিশ্চয়ই নেই। অনন্তকে আলো ধরে পথ দেখাবার জন্যই সোহাগীর এতক্ষণ বসে বসে জাল বুনছিল এ কথা অনন্ত জানে। তাই ব'লে অমনি অমনি চার পাঁচ টাকা দামের জালখানা সোহাগী তাকে দিয়ে দেবে এমন প্রাণ আছে সোহাগীর তাও অনন্তের বিশ্বাস হল না। জালের দিকে চেয়ে যত লোভই হোক, অনন্ত বুঝতে পারল ওটা সোহাগীর পরিহাস। ওকথা এড়িয়ে গিয়ে অনন্ত বলল, 'ধামাটা বাইরেই পড়ে থাকবে না কি সোহাগী?'

সোহাগী বলল, 'কার না কার ধামা, কার না কি জিনিস আছে ওর মধ্যে জানি। পরের ধামা ঘরে আনি কি ক'রে?' বলতে বলতে সোহাগী ধামাটা ঘরে এনে আলোর কাছে ধরল।

বড় একপণ পান, একসের খেজুরে গুড় আর এক বোতল নারকেলের তেল, হাট ফেরৎ সোহাগীর জন্য অনন্ত নিয়ে এসেছে।

ধামায় আর আছে গোটা চারেক বেগুন, কয়েকটা মুলো, একটা লোহার খুন্তি, টুকটাক আরো এটা ওটা—সোহাগী বুঝল এসব অনন্তের বিধবা মার জন্য।

সোহাগী বলল, "ওসব আবার আমার জন্য তুমি আনতে গেলে কেন।'

কথাটা শুধু মৌখিক ভদ্রতা নয়, গলার স্বরে আন্তরিকতা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। অনন্ত বলল, 'প্রাণ যা

চায়' তার কিছুও কি দিতে পারি সোহাগী। বিক্রি বাটা কিছুই প্রায় হয় না আজকাল।'

'তুমি ও সব আন কেন মিছামিছি।' একটু থেমে হঠাৎ সোহাগী বলল, 'এভাবে কতদিন আর থাকবে। বিয়ে কর আবার।'

'দূর—'

'দূর কেন, বিয়ে তো একবার করেছিলে।'

'সে তো তোরও হয়েছিল।'

'তা হয়েছিল কিন্তু আমার আর তো হ'তে পারে না, তুমি আবারও বিয়ে করতে পার, বিয়ের জন্য টাকাও জমাচ্ছ, আমি জানি।'

'দূর, যত সব বাজে কথা।'

অনন্ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। বিয়ের পর ছ'মাস যেতে না যেতে বউ মারা যায় কলেরায়। ক'বছর ধরে মাতা পুত্রে যা সঞ্চয় ক'রেছিল, সব নিঃশেষে ব্যয় ক'রে বউ ঘরে আনতে হয়েছিল।

অনন্তের মা সৌদামিনীর বউর চেয়ে টাকার শোক হ'ল বেশী। অতগুলি টাকা কোন কাজেই এল না, সব একেবারে জলে গেল। সে তো কলেরার সময়ও নয়, আর কারো কিছু হ'ল না, শুধু সৌদামিনীরই এমন ক'রে সর্বনাশ হয়ে গেল। মনে হয়েছিল সৌদামিনী বুঝি আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নিজেকে সে সামলে নিল। আশা ছাড়া মানুষ বাঁচবে কি ক'রে? আবার তিল তিল ক'রে আরম্ভ হ'ল সঞ্চয়ের পালা। দু'চার পয়সা যা যখন হাতে আসে তাই সৌদামিনী তার পুরোনো বার্লির কৌটার মধ্যে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে হাট ফেরৎ দু টাকা একটাকা অনন্তও মার হাতে তুলে দেয়। 'রেখে দাও মা।' এ যে কিসের টাকা তা কেউ মুখ ফুটে বলে না, কিন্তু দুজনেই জানে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অনন্ত যেন কেমন হয়ে গেল। বৈশাখ মাসে একদিন রাত্রে নকুল সা'র বাড়ি থেকে অনন্ত দারুণ মার খেয়ে এল। সৌদামিনী বুঝল সবই, কিন্তু কোন উপায়ই ভেবে পেলে না। সাতাশ আটাশ বছরের ছেলে নিজের ভাল নিজে যদি না বোঝে সৌদামিনী কি করতে পারে। কিছুদিন অনন্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর একদিন এসে সৌদামিনীকে বলল, 'চারটে টাকা দাও তো মা।'

অবাক হয়ে সৌদামিনী বলল, 'ওমা, আমি টাকা পাব কোথায়, আর টাকা দিয়ে তুই করবিই বা কি।'

অনন্ত বলল, 'দরকার আছে, মাল কিনতে যেতে হবে।'

কেন যেন কথাটা সৌদামিনীর বিশ্বাস হ'ল না। টাকাও সৌদামিনী দিল না।

অনন্ত তখন সৌদামিনীর অসাক্ষাতে কৌটা বের ক'রে নেকড়ার পুঁটলি খুলে টাকা বের ক'রে নিয়ে গেল।

ক'দিন ধ'রে ঝগড়া, রাগারাগি খুব চলল। একবেলা রাগ ক'রে সৌদামিনী ভাত রাঁধল না, কথা বলল না অনন্তের সঙ্গে।

তারপর থেকে প্রায়ই এমন হ'তে লাগল।

সৌদামিনী অনেক ফন্দি ক'রে দেখেছে। একবার কেষ্টর মার কাছে গোপনে রেখেছিল পনের টাকা, ফলে টাকা কটা প্রায় যাওয়ার মধ্যে। বহু তাগিদ দিয়েও সৌদামিনী এখন পর্যন্ত তা আর আদায় করতে পারে নি। তারপর থেকে আর কাউকে সে বিশ্বাস করে না, কারো কাছে আর টাকা রাখতে যায় না, এমন কি চড়া সুদেও ধার দিতে রাজী হয় না কাউকে। মুড়ির হাঁড়ি, ছেঁড়া নেকড়ার ঝুলি নানা অসম্ভব স্থানে সৌদামিনী টাকা রাখে, কিন্তু অনন্তের দৃষ্টি যায় সব জায়গায়।

একেকবার অবশ্য টাকা অনন্ত ফিরিয়েও দেয়। 'এই নাও, চার টাকা নিয়েছিলাম ফেরৎ দিলাম আবার, আর এই নাও আট আনা সুদ।' অনন্ত হেসে বলে, 'তুমি ভাব আমি বুঝি কেবল নষ্টই করি।'

সৌদামিনী একটু খুসি যে না হয় তা নয়, তবু তার মন হাহাকার করতে থাকে। 'এমন ক'রে কি আর টাকা জমে? টাকা যদি তুই নষ্টই না করতি, তাহ'লে বউ কি আবার একটি আমি এতদিন আনতে পারতাম না?'

অনন্ত পরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে বলে, 'দূর, বউ দিয়ে আবার কি হবে।'

তারপর ক্রমাগত কিছুদিন বাজার থেকে ফিরে এসে অনন্ত টাকাটা আধুলিটা মার কাছে জমা দিতে থাকে। কিন্তু তারপর আবার আর ধৈর্য থাকে না। দূর ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন তার মনকে আর বেঁধে রাখতে পারে না। এই মুহূর্তের ক্ষণিক উন্মাদনাই তার কাছে সবচেয়ে লোভনীয় হয়ে ওঠে। জমানো টাকা আবার খরচ হ'তে থাকে।

অনন্তের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে সোহাগী বলল, 'কি ভাবছ, বিয়ের কথা বুঝি।'

অনন্ত বলল, 'দূর, ওসব আর নয়। এখানে ব'স্ এসে সোহাগী। তুই কি আজ দূরে দূরেই থাকবি না কি?'

'ইস্ ভারি যে গরজ। তুমিই তো কেবল দূর দূর করছ।' সোহাগী হেসে কাছে এগিয়ে এল একটু।

হাসলে চমৎকার দেখায় সোহাগীকে। দাঁতগুলি বেশ সুন্দর ছোট ছোট। শুধু সামনের একটি দাঁতের একটু ত্রুটি আছে, বাঁকা হয়ে দাঁতটি আর একটির ওপর গিয়ে পড়েছে। কিন্তু এই ত্রুটিটুকুও অনন্তের চোখে সুন্দর লাগে। এমন না হলেই যেন সোহাগীকে মানা ত না।

কথায়, হাসিতে, চোখে দারুণ আকর্ষণ সোহাগীর। কাছে এলেই টেনে নিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছা করে অনন্তের। একি উন্মামতা, ইচ্ছা করে ওকে যেন পিষে মেরে ফেলে, নিজের সর্বাঙ্গে ওকে যেন নিশ্চিহ্ন ক'রে মিশিয়ে দেয়।

'ইস্, দম বন্ধ হয়ে মরে যাব যে।' একটু একটু ক'রে সোহাগী নিজেকে ছাড়িয়ে আনে। হঠাৎ কি একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। চুপে চুপে বলে, 'ভাল কথা, একটা জিনিস তোমাকে দেখাতে হবে। একটু ছাড়, একটু। ভয় নেই পালিয়ে যাব না কোথাও। বরং তুমিই হয়ত একদিন পালাবে।' সোহাগী উঠে গিয়ে বাঁশের কারের ওপর থেকে একটা হাঁড়ি নামিয়ে আনল, তার মধ্যে পুরোনো তুলা আর জালের লোহার

কাঠি। একেবারে নিচ থেকে বেরুল ছোট সরু একছড়া হার, পাঁচ ছ' বছরের মেয়ের গলার। সোহাগী হারগাছা অনন্তের সামনে ধরল, 'দেখ তো কত দাম হ'তে পারে। আন্দাজে কাজ কি। তোমার এক কামার বন্ধু আছে না বরমগঞ্জের বাজারে, সেদিন যে বলেছিলে। কালই তার কাছে নিয়ে যাও, ভাল দাম যদি পাও বিক্রি ক'রে দিয়ে এস আর না হয় গালিয়ে নিয়ে এস।'

অনন্তের মুখ ততক্ষণে পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে, কোনরকমে জিজ্ঞাসা করতে পারল, 'এ হার তুই কোথায় পেলি সোহাগী? দেখি, এই যে রাধা লেখা আছে। এ নিশ্চয়ই দ্বারিককাকার নাতনি রাধারাণীর হার।' সব কথা অনন্তের মনে পড়ে গেল। কাল রাত্রে তাদের পাড়ার দ্বারিক সা'র বাড়িতে কীর্তন ও ভাগবত পাঠ হয়েছে, অনেক লোক এসেছিল শুনতে। সোহাগীও গিয়েছিল তাদের পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে। হাটে আসবার সময় রাধার হার পাওয়া যাচ্ছে না এমন একটা কথা যেন অনন্তের কানে এসেছিল।

'তুই নিশ্চয়ই চুরি ক'রে এনেছিস। তুই চুরি করিস সোহাগী?' এ যেন করুণ আর্তনাদের মত শোনাল।

অনন্ত ভেবে পেল না কি করে সোহাগীর এত সাহস হ'ল, কি ক'রে এত লোকের মধ্য থেকে হার সে সরিয়ে আনতে পারল। অনন্তের প্রশ্নের ধরণে সোহাগীর বিস্ময় হ'ল, ভয়ও হ'ল। হারগাছ তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে এল অনন্তের হাত থেকে, বলল, আস্তে, আস্তে, 'তাতে হয়েছে কি?'

'ছি ছি ছি, চুরি করিস তুই!'

কিন্তু সোহাগী কোনরকম গ্লানি বোধ করল না, অদ্ভুত একটু হাসল। অবশ্য বিপদের অনেক ভয় ছিল এবার। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাসে সে একেবারে দক্ষ হয়ে উঠেছে, আর কোনদিন এ পর্যন্ত ধরা পড়ে নি ব'লে সাহসও তার যথেষ্ট। এত দামী জিনিস অবশ্য আগে কোনদিন সে সরাতে পারে নি, এই প্রথম। এজন্য সোহাগী এতক্ষণ পর্যন্ত বেশ আত্মতৃপ্তিই বোধ করছিল। অনন্তের কাছে বলবার আগে একবার অবশ্য সে ইতস্তত করেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়েছিল অনন্ত ছাড়া কাকে আর সে এত বিশ্বাস করতে পারে, কার ওপর এমন নির্ভর করতে পারে? অনন্ত যে তাকে সত্যিসত্যিই ভালবাসে, সবচেয়ে বেশী ভালবাসে—এ সম্বন্ধে সোহাগীর মনে কোন সংশয় ছিল না, কিন্তু অনন্তের কথার ভঙ্গিতে তার যেমন ভয় হ'ল তেমনি হ'ল রাগ, বলল, ছি ছি ছি কেন, নিজে ভারি সাধু পুরুষ কি না।'

কিন্তু অনন্ত এমন অভিভূত হয়ে গেছে যে, কোন কথা সে বলতে পারল না, কিছু বলবার যে আছে তা তার মনেও হ'ল না। যুগপৎ দুঃসহ ঘৃণায় আর বেদনায় মন তার ভরে উঠেছে। সোহাগীকে ছুঁতে পর্যন্ত যেন অনন্তের আর কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না। মেয়েমানুষ হয়ে যে কেউ চুরি করতে পারে তা যেন অনন্ত ধারণায়ও আনতে পারল না। মেয়েদের বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে অনন্তের পরিচয় আছে। তাতে হৃদয় জ্বলে যায়, কিন্তু সে জ্বলা আর একরকমের, তাতে রাগ হয়, হিংসা হয়, প্রেমিকার ওপর তত নয়, যত প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর; তাতে মেয়েরা আরো লোভনীয়, আরো বেশী আকাঙ্খার বস্তু হয়ে ওঠে, তাতে ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় মন এমন রি রি করতে থাকে না। লাম্পট্য অনন্তের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, তা তার মনে কোন গ্লানি জন্মায় না। কিন্তু সে যাকে ভালবেসেছে সেই সোহাগী এত নীচ, এত জঘন্য, চুরি করাই তার ব্যবসা, এ যেন অনন্ত কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

একটু পরেই অনন্ত উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আমি আজ যাই সোহাগী।'

এতক্ষণের দুর্বোধ স্তব্ধতায় অনন্তের এমন আকস্মিক ভাবান্তরে সোহাগী খুব আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এখন অনন্ত চলে যাচ্ছে দেখে তার ভয় ও আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। কেন যেন তার মনে হ'ল এখনই বুঝি পুলিস এসে তাকে চারদিকে ঘিরে ধরবে। কেউ তাকে আর রক্ষা করবার নেই, ভালবাসবার নেই, সে একেবারে একা।

হঠাৎ নীচু হয়ে সোহাগী অনন্তের দু' পা জড়িয়ে ধরল, 'শেষে তুমিই আমাকে ধরিয়ে দেবে?'

এমন অসহায় ভয়ার্ত কাতরোক্তি সোহাগী বুঝি আর কোনদিনই করে নি। যেন ধরা পড়ায় সোহাগীর তেমন কোন দুঃখ নেই, শুধু অনন্ত তাকে ধরিয়ে দেবে এই দুঃখই সে সহ্য করতে পারছে না।

অনন্ত কোন কথা বলল না, কেবল হাত ধরে সোহাগীকে একটু ওঠাতে চেষ্টা করল। এ স্পর্শে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল না, উন্মাদ আকর্ষণে সোহাগীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে একটুও ইচ্ছা করল না, শুধু কেমন যেন এক বিষণ্ণ করুণ মমতায় অনন্তের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সার

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার

মানুষ যেমন খাইতে না পাইলে কাজ করিতে পারে না, জমিও তেমনি সার না পাইলে ভাল ফসল দিতে পারে না। বিনা সারে কয়েকবার ফসল দিলে জমির উর্বরতা কমিয়া যায়। বেশী ফসল দিবার ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন।

জমির প্রকৃতি ও কিরূপ ফসল জন্মান হইবে তাহা বুঝিয়া সার দিতে হয়। জমি মোটামুটি তিন রকমের—এ'টেল, বেলে ও দোআঁশলা। এ'টেল মাটিতে খুব ছোট ছোট পরমাণু আছে বলিয়া উহাতে অনেক দিন যাবৎ রস সঞ্চিত থাকে। এই প্রকার মাটিতে শীত ও গ্রীষ্মকালে ফসল জন্মিতে পারে। কিন্তু বর্ষাকালে শীঘ্র শীঘ্র জল শুকাইতে পায় না বলিয়া জমি স্যাঁতসেঁতে হইয়া থাকে, মাটিতে উত্তাপ থাকে না, এবং সেই জন্য ঐ সময়ে ভাল ফসল হয় না। বেলে মাটিতে তাড়াতাড়ি জল শুকাইয়া যায়, তাই বর্ষাকালে ইহাতে ভাল গাছপালা হয়। কিন্তু শীত ও গ্রীষ্মকালে বেলে মাটি নীরস ধুলার মতন হইয়া যায়। বেলে মাটিতে পুকুরের পাঁক মাটি মিশাইয়া লইলে উহা দোআঁশলা হয়। এইরূপ মাটি খুব উর্বর হইয়া থাকে।

সার চার রকমের—যথা, প্রথমত খড়, লতাপাতা প্রভৃতি পচাইয়া সার, দ্বিতীয়ত গরু ঘোড়া প্রভৃতির নাদ, প্রস্রাব, হাড় প্রভৃতি সার; তৃতীয়ত খনি হইতে উৎপন্ন সার; আর চতুর্থত এই সকল পদার্থের মিলিত সার। একে একে এই সকল সারের গুণ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণনা করিতেছি।

সবুজি বা উদ্ভিজ সারের মধ্যে লতা, পাতা, ধইঞ্চা, পুকুরের পানা ও শেওলা প্রধান। এই সকল আবর্জনা ফেলিয়া না দিয়া জমিতে দিলে কত যে উপকার হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পুকুরে প্রচুর পানা ও শেওলা জন্মে উহা উঠাইয়া লইলে একদিকে যেমন পুকুরের জল পরিষ্কার হয় অন্যদিকে তেমনি ক্ষেতে দিলে ক্ষেতের ফসল দিবার ক্ষমতা বাড়ে। তরিতরকারীর ক্ষেতে এই সার দিলে বিশেষ উপকার হয়। ক্ষেতের উপর কিছুদিন শেওলা ফেলিয়া রাখিলেই উহা পচিয়া যায়। তারপর হাল চালাইয়া উহা মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। আমাদের দেশে প্রায় সকল জমিই বছরে চার ছয় মাস ফেলিয়া রাখা হয়। ক্রমাগত ফসল দিয়া জমির যে ক্ষতি হয় কিছু দিন ফেলিয়া রাখিলে তাহার কতকটা পূরণ হয়। কিন্তু শুধু শুধু ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা উহাতে শণ বা ধঞ্চে লাগাইলে বেশী উপকার হয়। বৈশাখ মাসে ধঞ্চে বুনিতে হয়। প্রতি বিঘায় মাত্র দুই সের বীজ লাগাইলেই যথেষ্ট। ঐ বীজের দাম সের করা চার আনার বেশী নয়। দুই বা আড়াই মাসের মধ্যে উহা হাতখানেক বাড়িয়া উঠে। এক হাত উঁচু হইলে জমিতে জল বন্ধ করিয়া লাঙ্গল দিতে হয়। ঐরূপে লাঙ্গল দিলে ধঞ্চে গাছগুলি গোড়া সমেত উঠিয়া যায়। তারপর জমিতে মই দিলে উহা মাটির সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি ফিরিয়া আসে। একটু পরিশ্রম করিলেই এই উপায়ে সামান্য খরচে জমিকে উর্বর করা যায়

সরিষা, তিসি, নারিকেল, রেড়ী, তিল, কাপাস প্রভৃতি তৈল বীজ হইতে খৈল তৈয়ারী হয়। যদি গ্রামের মধ্যে তৈল তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে চাষী ঐ খইল জমিতে লাগাইতে পারে, গো-মহিষকে খাইতে দিতে পারে। খৈল, জল ও মাটির সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া পাঁচ সাত দিন রাখিয়া দিতে হয়। তার পর উহা জমিতে দিলে খুব ভাল ফসল হয়।

সবজীর ক্ষেতে গাছের গোড়ায় পোড়া মাটি দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। অল্প মাটির দরকার হইলে উনুনের মাটিতেই কাজ চলিতে পারে। কিন্তু বেশী মাটির যোগাড় করিতে হইলে স্বতন্ত্রভাবে উহা তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। পোড়া মাটি তৈয়ারী করিবার জন্য মাটির চাপড়া জঙ্গল, ঘাস প্রভৃতি স্তরে স্তরে সাজাইয়া পাঁজা তৈয়ারী করিতে হয়। উহা ভাল করিয়া কাদা দিয়া লেপিয়া পাঁজার নীচে আগুন জ্বালাইয়া দিবে। পাঁজার ঘাস পাতা প্রভৃতি পুড়িয়া গেলেই, পোড়া মাটি তৈয়ারী হয়। পাঁজা মাটি পুড়িবার সময় আগুন জ্বলিয়া উঠিলে জলের ছিটা দিয়া নিবাইয়া দিতে হয়। এরূপ পোড়া মাটি গাছের গোড়ায় দিলে গাছ সতেজ ও ফলসালী হইবে।

এ'টেল জমিতে সার দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তামাকের ছাই বিশেষ উপকারী। চাষীর ঘরে ও মাঠে অনেক খড়কুটা, ঘাস পাতা প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐগুলি ফেলিয়া না দিয়া একত্র করিয়া রাখিলে সস্তায় উত্তম সার তৈয়ারী করা যাইতে পারে। বিহারের কৃষি বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুত ভূতনাথ সরকার মহাশয় অনেক দিন ধরিয়া গবেষণা করিয়া এইরূপ সস্তা সার তৈয়ারী করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন। চাষী তাহাদের বাড়ির কাছে মাঠের এক কোণে একটি জায়গা ঠিক করিবে। জায়গাটি বার হাত লম্বা ও সাত হাত চওড়া হইলে ভাল হয়। ঐ জায়গায় বাজে খড়কুটা যেখানে পাওয়া যাইবে তাহা, ঘর দুয়ার ও উঠান ঝাড়ু দিবার পর যে সকল জঞ্জাল জড় হয় তাহা এবং গাছ-পালার লতাপাতা প্রভৃতি সকল জিনিষ ফেলিবে, ঐগুলি বেশ সমান করিয়া সাজাইয়া এক ফুট উঁচু করিবে তাহার পর গোয়াল ঘরের মাটি অথবা গরুর চোনা ও গোবর মিশাইয়া ছিটাইয়া দিবে ঐ মাটি অথবা চোনা গোবর এক ইঞ্চি বা একটি পয়সা উঁচা করিয়া ধরিলে যতখানি উচ্চ হয় ততটা পরিমাণ বিছাইয়া দিবে। মোটের উপর কথা হইতেছে এই যে, যতটা রাবিশ থাকিবে তার বার ভাগের এক ভাগ গোয়াল ঘরের মাটি দিবে। এক সের দুধের মধ্যে যেমন একটু দই দিলে সবটুকুই দই হইয়া জমিয়া উঠে, তেমনি রাবিশগুলির মধ্যে অল্প পরিমাণ চোনা গোবর দিলে ঐগুলি তাড়াতাড়ি পচিয়া ভাল সারে পরিণত হয়। রাবিশ ও গোয়াল ঘরের মাটির উপর কয়েক ঘড়া জল ঢালিয়া দিবে যে জায়গায় সহজে জল পাওয়া যায় সেই রকম জায়গায় রাবিশগুলি গাদা করিলে আর জল টানিয়া লইবার জন্য কষ্ট করিতে হয় না। যেভাবে একটি গাদা তৈয়ারী করিলে ঠিক ঐভাবে আরও দুইটি গাদা তৈয়ারী কর। তিনটি গাদা মিলিয়া দুই হাত উঁচা হইবে। তার পর ঐ দুই হাত উঁচা গাদার উপর দুই ইঞ্চি পরিমাণ মাটি ছড়াইয়া দেও। মাস খানেক পরে সমস্ত গাদাটা বেশ ভাল করিয়া উল্টাইয়া পালটাইয়া দেও এবং কোদালি দিয়া সবটা মিশাইয়া ফেল। তার পর আবার খানিকটা জল দাও ও সামান্য কিছু মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেও। মাঝে মাঝে ঐ গাদাটিতে এমনভাবে জল দিতে হইবে যেন ভিতরের জিনিসগুলি একেবারে শুকাইয়া না যায়। এইভাবে তিন চারি মাস ফেলিয়া রাখিলে সব রাবিশ বেশ চমৎকার সারে পরিণত হইবে।

সালফেট অব এমোনিয়ার এক মণে যে কাজ হয় এইরূপ সারের পাঁচ মণে তাহা হয়। সালফেট অব আমোনিয়া এক মণ পাঁচ টাকার কম পাওয়া যায় না; আর এই সার এক রকম বিনা পয়সাতেই সংগ্রহ করা যায়। কথা উঠিতে পারে যে, অতবড় গাদা করিবার মত খড়কুটা আবর্জনা কোথায় পাওয়া যাইবে? যেখানে আঁখের চাষ হয় সে আঁখের পাতা দেওয়া যাইতে পারে; চিনির কলের মালিকেরা পাতা ছাড়ান আঁখ খরিদ করে। বাড়িতে রোজ উঠান ঝাড়ু দিলেও তো কম জঞ্জাল যোগাড় হয় না। এইরূপভাবে সার তৈয়ারী করিতে গেলে ঐ সব জঞ্জাল যেখানে সেখানে ফেলিয়া দেওয়া হয় না, তাহাতে বাড়ির আশ পাশের জায়গা পরিষ্কার থাকে। যদি এক সঙ্গে বেশী রাবিশ যোগাড় করা না যায় তাতেও ক্ষতি

নাই, যতটা যোগাড় করা যায় ততটাই জল দিয়া একটু ভিজা ভিজা করিয়া রাখিলে চলিবে। যেমন দিন যাইবে তেমনি ধীরে ধীরে রাবিশের গাদা বড় হইবে। যদি জল যোগাড় করা কিছুতেই সম্ভব না হয় তাহা হইলে সারা গ্রীষ্মকাল ধরিয়া রাবিশ যোগাড় করিয়া রাখো, বর্ষার পূর্বে ঐগুলি সাজাইয়া দিও। আশ্বিন মাসের শেষা শেষি দেখিবে এগুলি পচিয়া সার হইয়াছে। মোটের উপর যত্ন ও পরিশ্রম করিলে এরূপ সার তৈয়ারী করা কিছুই কঠিন নহে। যে জমিতে জঙ্গাল গাদা করিয়া রাখিবে সার তৈয়ারী হইয়া যাইবার পর উহা মাঠে দিয়া আবার উহা চাষ করা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর একই জমিতে যে সার তৈয়ারী করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

গোবরের সার খুব উপকারী জিনিস। গোবরের সার যে জমিতে দেওয়া যায়, সেই জমির ফসলের স্বাদ খুব ভাল হয়। কিন্তু জমিতে কাঁচা গোবর দিলে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। কেননা কাঁচা গোবরে নানা রকমের পোকা মাকড় লাগিয়া থাকে। যতদিন পর্যন্ত না গোবর ভাল রকম পচিয়া যায়, ততদিন গাছের শরীরে উহার কোন কাজই হয় না। কাঁচা গোবর পচিবার সময় এতটা উত্তাপ সৃষ্টি করে যে তাহাতে চারা গাছের বিশেষ ক্ষতি করে।

গোবর পচাইবার জন্য একটা বড় গর্ত বা খাদ খনন করা দরকার। উহাতে প্রত্যহ গোবর ফেলিয়া রাখিতে হয়। গোবর দিয়া গর্তটি পুরাপুরি ভর্তি করা ভাল নহে। জমি হইতে আধ হাত নীচু পর্যন্ত ভর্তি করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। পুরাপুরি ভর্তি করিলে বৃষ্টির জল আসিয়া গোবরের সার অংশ ধুইয়া লইয়া যাইবে, কেবল ছিবড়া মাত্র পড়িয়া থাকিবে। গর্তটির চারিপাশে উঁচু করিয়া আল বাঁধিয়া দিলে আর সারাংশ বাহির হইয়া যাইবার ভয় থাকে না। অনেকে গর্তের মধ্যে সার রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখে। কিন্তু এরূপ করিলে গোবর পচিতে দেরী লাগে এবং গর্তের মধ্যে একটা গ্যাস জন্মিয়া গোবরের অনেক সারাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া না দিয়া উহার উপরে একটি চালা বাঁধিয়া দিতে হয়। এরূপ না করিলে সারের জলীয় ভাগ শুকাইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক সারাংশ উড়িয়া যায়। ছয় হইতে নয় মাসের মধ্যে গোময় পচিয়া জমিতে দিবার মতন সারে পরিণত হয়। জমিতে লাঙ্গল দিবার সময় এক দফা সার বিছাইয়া দিলে, জমি পাট করিবার সময়ের মধ্যে উহা মাটির সহিত মিশিয়া যায়। জমিতে চারা রোপণ করিবার অন্তত একমাস পূর্বে সার দেওয়া উচিত। গোবরের সার খুব উপকারী সন্দেহ নাই। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে গরীব চাষীরা গোবর দিয়া ঘুঁটে তৈয়ারী করিয়া তাহা পুড়াইয়া রন্ধন করে; রাঁধিবার জন্য গাছের শুকনা ডাল পাতা ব্যবহার করিয়া গোবর সঞ্চয় করিতে পারিলে খুব ভাল হয়; কিন্তু সব সময়ে জ্বালানি কাঠ ও শুকনো পাতা সংগ্রহ করা যায় না। সেই জন্য গোবর না জ্বালাইয়া গাঁয়ের লোকে পারে না।

শুধু যে গোবর হইতেই সার হয় তাহা নহে, ঘোড়া মহিষ কপোত কুক্কুট ছাগ মেষ ও মানুষের বিষ্ঠা হইতেও ভাল সার তৈয়ারী করা যাইতে পারে। মহিষের সার জমিতে দিলে ফল ও ফসলের আকার বড় হয়। ঘোড়ার সার খুব তেজালো জিনিস, উহা পচিতে এক বৎসর সময় লাগে। আঁখ কাপাস প্রভৃতি বুনিবার পূর্বে ভাল রকমে পচান ঘোড়ার সার দিলে গাছ সতেজ হয়। তবে ঐ সার দিবার পর গাছে বার বার জল দেওয়া দরকার। তর-কারীর ক্ষেতে পায়রা মুরগী প্রভৃতির সার খুব মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে ভাল হয়।

মানুষের বিষ্ঠা বৃথাই নষ্ট হয়। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের নাসিক মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ উহা এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া মাটির নীচে রাখিয়া একেবারে মাটির মতন করিয়া ফেলেন। তার পর উহা উঠাইয়া বেশ ভাল করিয়া গুড়া করাইয়া চাষীদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাতে একদিকে যেমন মিউনিসি-প্যালিটির লাভ হইয়া থাকে অন্যদিকে তেমনি জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি নাই সেখানে চাষীরা মাঠের মধ্যে ছোট ছোট গর্ত করিয়া পায়খানা করিয়া পরে উহা মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিতে পারে। এক বৎসর পরে ঐ সকল গর্তের নীচে উত্তম সার তৈয়ারী হইয়া থাকিবে।

গোবর ও আঁখের ছিবড়া মিশাইয়া এক প্রকার সস্তা সার তৈয়ারী করিবার উপায় বাহির হইয়াছে। বিহারের সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে এই উপায়ে সার তৈয়ারী হইতেছে। এক একর বা তিন বিঘা জমিতে যতটা আঁখ জন্মে তাহার ছিবড়া বর্ষার জলে পচাইয়া যে সার তৈয়ারী হয় তাহা তিন বিঘা জমির পক্ষে যথেষ্ট। ইহা কিরূপে তৈয়ারী হয় বলিতেছি।

চৌদ্দ হাত লম্বা সাত হাত চওড়া একখণ্ড জমির উপর চার পাঁচ ঝুড়ি গোবর ও বার চৌদ্দ ঝুড়ি মাটি ফেলিয়া সমান করিয়া বিছাইয়া দাও। উহার উপর আবার মুঠা হাত উঁচা করিয়া আঁখের ছিবড়া ফেল, উহা ভাল করিয়া মাড়াইয়া দিয়া তাহার পর আগের-বারের মতন গোবর ও মাটি বিছাইয়া দাও। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আঁখের ছিবড়ার চারিটি স্তর ও গোবর মাটির তিনটি স্তর একের উপর আর একটি সাজাইয়া রাখ। তার পর সবটা আর একবার ভাল করিয়া মাড়াইয়া দাও। আঁখের ছিবড়াগুলি ঝড় বাতাসে যাহাতে উড়িয়া না যায় তাহার জন্য উহার গাদার উপর কয়েকটি বড় বড় মাটির চ্যাংড়া বসাইয়া দাও। গাদাটা দুই হাতের বেশী উঁচু হইবে না। দুই হাত অন্তর অন্তর এইরূপে অনেকগুলি গাদা তৈয়ারী করিয়া যাও। এক গাদা হইতে অন্য গাদার মধ্যে যে জায়গা থাকিবে, তাহার মধ্যে এক হাত গভীর এক একটি গর্ত খুঁড়িয়া রাখিবে উহাতে বর্ষার সময় জল জমিয়া থাকিবে। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত গাদায় আর হাত লাগাইও না।

বর্ষা আরম্ভ হইলে দুই একদিনের মধ্যে যখন দুই তিন ইঞ্চি বারিপাত হইবে তখন গাদার সব চেয়ে উপরের স্তরটি পাশের জমিতে বিছাইয়া দাও। তার পর ঐ গাদার দ্বিতীয় স্তরের উপর পাশের গর্ত হইতে জল লইয়া বেশ করিয়া ছিটাইয়া দিয়া উহা প্রথম স্তরটির উপরে রাখিয়া দাও, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত গাদাটি পালটাইয়া দাও। ইহার ফলে প্রথম গাদাটি নূতন জায়গায়, দ্বিতীয় গাদাটি প্রথম গাদার জায়গায় আসিবে। ভাদ্র মাসের প্রথমদিকে আবার একবার গাদাগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দিতে হইবে। উলটাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মাঝের স্তরগুলি যেন বেশ ভিজাইয়া লওয়া হয়। প্রতি স্তরের উপর খানিকটা বেশী করিয়া মাটি মিশাইয়া দিতে হইবে। আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যাইবে যে ঐ সমস্ত জঞ্জাল পচিয়া উঠিয়াছে এবং আকারে অনেকটা ছোট হইয়া গিয়াছে। তখন দুই তিনটি গাদা একত্র করিয়া এক একটি গোল বা লম্বা ধরণের আড়াই হাত উঁচু গাদা কর। প্রত্যেকটি গাদার উপর ছয় ইঞ্চি মাটি এমনভাবে লেপিয়া দাও যে বাহির হইতে উহার কিছুই দেখা যাইবে না। এইভাবে দুই তিন মাস ফেলিয়া রাখিলে উত্তম সার তৈয়ারী হইবে। ইহার পরও যদি কোন গাদার জিনিষ ভাল রকম পচিয়া না যায়, তাহা হইলে উহা পরের বছরের বর্ষা পর্যন্ত রাখিয়া দাও এবং পূর্ব বর্ণিত উপায়ে উলটাইয়া দাও। ছোট ছোট গাদা করিলে যথা সময়ে নিশ্চয়ই উহা পচিয়া সার তৈয়ারী হইবে। যদি কোন ক্ষেত্রে উহা না পচে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উপরে লিখিত নিয়ম যথাযথ পালন করা হয় নাই। এইভাবে যে সার তৈয়ারী হয় তাহাতে জৈব পদার্থের ভাগ

খুব বেশী থাকে। উহার মধ্যে শতকরা একভাগ নাইট্রোজেন ও একের তিন ভাগ বা সিকি ভাগ ফসফরিক এসিড থাকে।

এই উপায়ে একশত গাদা সার তৈয়ারী করিতে নিম্নলিখিতরূপে খরচ পড়িতে পারে—

(১) ছয় জন মজুর রোজ চারিটি গাদার উপযুক্ত আঁখের ছিবড়া জোগাড় করিয়া একত্র করিতে পারে। জন পিছু তিন আনা মজুরি ধরিলে চার গাদায় এক টাকা দুই আনা, এক শত গাদায় আটাশ টাকা দুই আনা খরচ।

(২) গরুর গাড়ী করিয়া গোবর ও আঁখের ছিবড়া মাঠে লইয়া যাইবার খরচ—একজন গাড়োয়ান, এক জোড়া বলদ ও একজন মজুর ছয় গাদা জিনিষ লইয়া যাইতে পারে। উহাদের খরচ দিন পনের আনা। একশ গাদার উপযুক্ত মাল বহন করিবার খরচ—পনেরো টাকা দশ আনা।

(৩) একজন মজুর একদিনে চারটি গাদা উলটাইতে পারে। সেই জন্য একশত গাদা উলটাইবার খরচ চার টাকা এগার আনা। দুইবার উলটাইবার খরচ নয় টাকা ছয় আনা।

(৪) একশটি গাদাকে চল্লিশটি গাদায় মিলাইবার খরচ আড়াই টাকা। তাহা হইলে—

(১) ২৮৵৹
(২) ১৫৷৶৹
(৩) ৯৷৶৹
(৪) ২৸৹

৫৫৷৶৹

একুনে পঞ্চান্ন টাকা দশ আনায় ৪০টি মেলান গাদা সার হইবে। এক গাদায় উনিশ গাড়ী বা পচানব্বই মণ মাল থাকে। সর্বসমেত তিন হাজার আট শত মণ সার পঞ্চান্ন টাকা দশ আনায় পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ এক মণ সারের খরচা এক পয়সার চেয়েও কম পড়িবে। কয়েকজন চাষী একত্রে মিলিয়া এরূপ সার তৈয়ারী করিলে মজুরের খরচও লাগিবে না। চাষীরা অনেক সময় কাজের অভাবে বসিয়া থাকে। সে সময়ে এরূপ সার তৈয়ারী করিলে তাহাদের ক্ষেতে অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। উপরে যেভাবে সস্তা সার তৈয়ারীর কথা লিখিত হইল, সে সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে ভাগলপুর জেলার সাবোর নামক স্থানে বিহারের কৃষি বিভাগের রাসায়নিককে লিখিলেই তিনি সকল কথা জানাইবেন।

অনেক সময় তরকারীর পক্ষে ভাল সার বিশেষ উপকারী। একটি মাটির বড় গামলার মধ্যে গরু মহিষের বা কপোত মুরগীর মলমূত্র রাখিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণ জল দিতে হয়। পনেরো ষোল দিন উহা জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তার পর একটি লাঠি দিয়া ঐ জল খানিকক্ষণ নাড়িতে হয়। তাহা হইলে জলের সহিত সার ভাল রকমে মিলিয়া যায়। এই প্রকার সার চারা গাছে দিলে গাছের খুব তেজ বাড়ে আর গাছ একটু বড় হইবার পর দিলে ফসলের উপকার হয়।

নাইট্রেড অব সোডা, সালফেট অব আমোনিয়া প্রভৃতি বিলাতী সারও কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু গরীব চাষীর পক্ষে এ সকল জিনিস সংগ্রহ করা কঠিন। একটু অবস্থাপন্ন না হইলে এবং লেখাপড়া না জানিলে বিলাতী সার ব্যবহার করা যায় না।

কিন্তু গরীব লোকও হাড়ের গুঁড়ার সার ব্যবহার করিতে পারে। হাড়ের গুঁড়ায় চূণ ও ফসফরাস থাকে, সেই জন্য সকল রকম শস্যের ক্ষেতেই ইহা দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এক বৎসর জমিতে হাড়ের গুঁড়ার সার দিলে তিন বৎসর পর্যন্ত তাহার ফল পাওয়া যায়। এক মণ হাড়ের গুঁড়া সাধারণত তিন টাকায় পাওয়া যায়। তবে চাষীরা ইচ্ছা করিলে সস্তায় এই সার তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে। সকল গ্রামেই ভাগাড়ে অনেক হাড় পড়িয়া থাকে, সেইগুলি কুড়াইয়া লইলেই কাজ চলিতে পারে। মাটি ও বালি একত্রে মিশাইয়া কোন জমির উপর চার ইঞ্চি বা ছয় আঙ্গুল উঁচু করিয়া বিছাইয়া দাও। তাহার উপর ছয় ইঞ্চি উঁচু করিয়া হাড়গুলি ছোট করিয়া সাজাইয়া দাও। হাড়গুলির উপর তিন ইঞ্চি উঁচু করিয়া চূণ দাও। এই ভাবে কয়েকটি গাদা করিয়া উহার চারিদিকে তিন ইঞ্চি মাটি দিয়া ইঁটের পাঁজা লেপার মত লেপিয়া দাও। তাহার পর উপর হইতে ধীরে ধীরে জল ঢাল। ইহাতে পাঁজাটি খুব গরম হইয়া উঠিবে। দুই তিন মাস বাদে পাঁজাটি ঠাণ্ডা হইলে দেখা যাইবে যে হাড়গুলি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ গুঁড়া পাঁজার ভিতরকার চূণ বালি প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া লইয়া জমিতে দিবে। অন্য একটি সহজ উপায়েও হাড় গুঁড়া করা যায়। যতটা পরিমাণ হাড় থাকিবে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মাটি খুব করিয়া গো-মহিষাদির চোনাতে ভিজাইয়া লও। হাড়গুলি ছোট ছোট করিয়া ঐ মাটির সহিত মিশাইয়া একটা খাদের মধ্যে রাখন খাদের উপর তিন ইঞ্চি পরিমাণ মাটি চাপা দাও, মাঝে মাঝে উহার উপর গরুর চোনা ঢালিতে থাক, এইরূপ করিতে করিতে মাসখানেকের মধ্যে হাড় গুঁড়া হইয়া আসিবে। সেই সময় উহা উঠাইয়া মুগুর দিয়া পিটিয়া ফেল। এইরূপ প্রণালীতে যে সার তৈয়ারী হয়, তাহা সাধারণ হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষা অনেক বেশী উপকারী। এক মণ হাড়ের গুঁড়ার সহিত দশ সের সোরা মিশাইয়া লইলে সারের উপকারীতা বৃদ্ধি পায়।

জমিতে সার দিলে যে কিরূপ ভাল ফল পাওয়া যায়, তাহা কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। সরকারী কৃষিশালায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিনা সারে এক একর জমিতে গড়ে ১৭ মণ ৭ সের ধান ও ২৭ মণ ৭ সের খড় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে চাষীর লাভ হইয়াছে ষোল টাকা সাত আনা। ঐ জমিতে দুই টাকা তিন আনা খরচ করিয়া পঞ্চাশ মণ গোবরের সার দেওয়ায় ৪৩ মণ ১০ সের ধান ও ৫৭ মণ ৩৫ সের খড় হইয়াছিল ও চাষীর লাভ হইয়াছিল আঠান্ন টাকা চার আনা অর্থাৎ দুই টাকা তিন আনা খরচের ফলে তাহার লাভ দাঁড়াইয়াছিল তিন গুণেরও বেশী। ঐ জমিতেই আবার তিন মণ হাড়ের গুঁড়া ও ৩০ সের সোরা দেওয়ায় ধান হইয়াছিল ৫৪ মণ ৩৪ সের খড় হইয়াছিল ৭৭ মণ ৭ সের আর লাভ হইয়াছিল একশত পাঁচ টাকা। হাড়ের গুঁড়া ও সোরার দাম সর্বসমেত পড়িয়াছিল নয় টাকা চারি আনা মাত্র। এ সব বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করা হইয়াছে। যদি কাহারও ইহাতে বিশ্বাস না হয়, একবার জমিতে ভাল করিয়া সার দিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।

ক্ষেত ও ফসল বিবেচনা করিয়া কিরূপ সার দিলে সব চেয়ে বেশী উপকার পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে সার দিবার পূর্বে কৃষি বিভাগের কর্মচারী বা কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট পরামর্শ লওয়া ভাল। সব রকম ফসলের বা সব রকম জমির একরকম সারের দরকার হয় না। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, গোবরের সার ও পচাপাতার বা আঁখের ছিবড়া প্রভৃতির পচান সার সব রকম জমিতে দিলেই ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

তিনি এবারেও চোখ চাহিলেন না, সেই অবস্থাতেই জবাব দিলেন, আমি কেমন ক'রে জানব, সে কি আর কাউকে বলে যায়!

আরও মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমল ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে, এমন সময় তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন, অকস্মাৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, সে মশাই দয়া ক'রে এখানে বাস করে, বুঝলেন? যেটুকু না থাকলে নয় সেইটুকু থাকে, বাকী সময় কোথায় যায়, কি করে তা সেই জানে। আমরা সব হয়েছি তার শত্রু, জানেন, ভীষণ শত্রু!

একথায় অমল আর কি জবাব দিবে, সে চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। আরও খানিকটা পরে তিনি অমলের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নরম সুরে কহিলেন, আপনি কি তার বন্ধু?

অমল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

তিনি কহিলেন, আপনার মুখটাও যেন চেনা চেনা বলে বোধ হচ্ছে। বোধ হয় বিয়েতেই দেখে থাকব। বসুন!

তাঁহার পাশের টুলটা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, শ্বশুরে, বুঝলেন, আগাগোড়াই চোর! পান থেকে চুন খসেছে কি অমনি জামাইয়ের হয়ে গেল মেজাজ খারাপ।......কার দোষ বলুন, কালের ধর্মই হ'ল এই।...একটু চা আনতে বলি, কী বলেন?

অমল কহিল, থাক—আমি চা খাই না।

বিলক্ষণ! চা না হয় নাই খেলেন, তা ব'লে আমি ত আপনাকে এমনি ছেড়ে দিতে পারি না। এক মিনিট বসুন, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি!......একেই ত জামাইয়ের মন পাওয়া দায়, তার ওপর—

আপন মনেই বকিতে বকিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং প্রায় মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়াই আবার বলিতে শুরু করিলেন, ছেলে বলুন, জামাই বলুন, মেয়ে বলুন সবই টাকার সঙ্গে সম্পর্ক! আপনি টাকা রোজগার ক'রে তাদের ভাল ভাল খাওয়ান, পরান, দেখবেন সবাই আপনাকে ভাল-বাসবে, যে মুহূর্তে হাত গুটোবেন অমনি সবাই পর!

অমল চুপ করিয়াই রহিল। ভদ্রলোক কী গভীর বেদনায় এতটা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা অনুভব করিয়া তাহার বসিয়া থাকিতেও কষ্ট বোধ হইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া যাইবারও উপায় ছিল না। সে একটু পরে বলিল, কিন্তু হাত গুটোবার অবস্থা ত আপনার নয়, আপনার আর ভাবনা চিন্তা কি বলুন।

অকস্মাৎ তিনি যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, তার মানে আমাকে ঠাট্টা করছেন?

ব্যাকুল হইয়া অমল কি প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু সে অবসর দিলেন না, বলিয়াই চলিলেন, আপনি তার বন্ধু, আপনি কি শোনেন নি সব বলতে চান? এই যে সে দুমুঠো খেয়েই কোথায় কোথায় ঘোরে তা কি আমি জানি না বলতে চান? যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের কাছেই কি আমার নিন্দে ক'রে বেড়াচ্ছে না বলতে চান? কী করব বলুন, অদৃষ্টদোষে আজ জোচ্চোর হয়ে পড়েছি—সব সইতে হয়! আর আপনাদের দোষ কি, যে বেটারা চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস করত না, তারাই কত টিটকিরী মেরে যাচ্ছে—হুঃ!

ততক্ষণে জলখাবারের থালা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আয়োজন প্রচুর, সে দিকে চাহিয়া অমল ভীত হইয়া উঠিল। সে করজোড়ে কহিল, দেখুন, এত কি কখনও জল খাওয়া যায়? আপনিই বলুন!

তিনি যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর কহিলেন, নিজের মেয়ে জামাইয়ের কাছে জোচ্চোর বনে রয়েছি এতে কি আমার কম কষ্ট হচ্ছে মনে করেন? আমি কি চেষ্টা করছি না কিছু—কিন্তু মেয়ে জামাই-ই যদি প্রতিনিয়ত এমন ক'রে গঞ্জনা দেয়, তাহ'লে কেমন ক'রে বাঁচি বলুন দেখি?

অমল হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, আমাকে মাপ করবেন, আপনি আমারও বাবার মত, আমি না বুঝেই একটা কথা বলে ফেলেছি, অতটা ভাবি নি কিছু! ও নিয়ে আর মিথ্যে মিথ্যে মাথা গরম করবেন না—

তিনি তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, ছিঃ, ছিঃ বাবা, তুমি কেন 'কিন্তু' হচ্ছ, আমারই মাথার ঠিক নেই —যা তা বলছি। বড় অন্যায় হ'ল কিন্তু—

তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কহিলেন, জামাইয়েরও আমি দোষ দিচ্ছি না বাবা। তবে তাকে বুঝিয়ে ব'লো যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, সে যেন আর ক'টা দিন আমাকে মাপ করে— সে আর কমলা দুজনেই মুখ ভার ক'রে ঘুরে বেড়ায়, কি কষ্টই যে হয় বাবা আমার কি বলব, যেন বুক ফেটে যায়।

এতক্ষণে তাঁহার জলখাবারের থালাটার দিকে নজর পড়িল, তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, এই দ্যাখো, আবোল-তাবোল কি বকে মরছি, তুমি যে খেতে শুরুই করো নি এখনও। না-না, ওসব আমি কোন কথা শুনব না, ওসব তোমাকে খেতে হবে। কমলাই সব নিজে হাতে সাজিয়ে দিয়েছে।

অমল নতমুখে খাবারগুলি খাইতে লাগিল। কমলার সহিত দেখা করিতে পারিলে মন্দ হইত না, ইন্দুর খবর হয়ত পাওয়া যাইত, কিন্তু লজ্জায় সে কথা সে ইঁহার কাছে বলিতে পারিল না। খাবার সে প্রায় সবগুলিই খাইল, কমলা নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়াছে শুনিয়া আর কোনটাই যেন তাহার ফেলিতে ইচ্ছা হইল না।

খাওয়া শেষ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনিও উঠিয়া পড়িলেন, তাহার দুই কাঁধে দুটি হাত রাখিয়া অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কহিলেন, তুমি তাহ'লে ওকে একটু বুঝিয়ে ব'লো বাবা! কমলা বলছিল তুমি নাকি তার বিশেষ বন্ধু, তোমাকে সে খুব ভক্তি করে।

নিশ্চয়ই বলব। অমল তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া সে বাসের অপেক্ষা করিতেছে এমন সময় একটি বছর আষ্টেক দশের ছেলে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া

তাহার হাতে একটি চিঠি দিল, কহিল, দিদি এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বললে।

অমল চাহিয়া দেখিল অবিকল কমলারই মুখ, তাহারই ছোট ভাই নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিতে গিয়া তাহার হাতটা যেন একটু কাঁপিয়া গেল। কিন্তু দেখিল সামান্য দুই ছত্র মাত্র চিঠি--

সে কাজ কর্মের চেষ্টায় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার কথা তাকে বলবো, আপনার সঙ্গে দেখা করতেও বলব। বাবার কথায় কিছু মনে করবেন না। প্রণাম নেবেন। আপনার কমলা

কোন সম্বোধন নাই, অন্য কোন সম্ভাষণও নাই; কিন্তু সেই আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা। তাহার মন মুহূর্তের জন্য সেই প্রথম চিঠিখানি আসার দিনে চলিয়া গেল। সে অন্যমনস্কভাবে শুধু কহিল, আচ্ছা। কিন্তু কমলার ভাই চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল তাহাকে কোন কুশল সম্ভাষণ পর্যন্ত করা হইল না কিংবা কমলার কথাও কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না। পিছন ফিরিয়া দেখিল সে অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে তখন আর ডাকা যায় না।

চিঠিখানা বুক পকেটে গুঁজিয়া আবার পথ চলিতে শুরু করিল। সে যে 'বাসে'র জন্য দাঁড়াইয়াছিল সে কথাও সে ভুলিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল কমলার কথা, যতদূর দৃষ্টি যায় কোন আসক্তির চিহ্ন ত সে মনের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না, তবে তাহার চিঠি খুলিতে গিয়া এমন হাত কাঁপে কেন? তাহার কথা শুনিলে বুকের রক্ত এমন করিয়া চঞ্চল হইয়া ওঠে কেন? এ তাহার কী অদ্ভুত অবস্থা?

হাঁটিতে হাঁটিতে শ্যামবাজারের মোড়ে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন আর হাঁটিবার ইচ্ছাও ছিল না, শক্তিও ছিল না; সে সেইখান হইতেই বৌবাজারগামী একটা বাসে উঠিয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বাসে উঠিয়া সে যাঁহার পাশে বসিল তিনি তাহার সেই আগেকার মেসের নগেনবাবু উকীল; তিনি থাবার মত একটা হাত তাহার কাঁধে দিয়া উপর্যুপরি প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, কী হে ভায়া, কতদূর যাবে? এখন আছ কোথায়? কি করছ? চাকরি-বাকরি করছ নাকি কোথাও?

অমল বিস্মিত হইয়া দেখিল ইতিমধ্যেই তিনি যেন অনেকটা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বেশভূষার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়, কোটটি ত প্রায় শতচ্ছিন্ন। সে তাঁহার অন্য সমস্ত প্রশ্নগুলি এড়াইয়া গিয়া কহিল, হ্যাঁ মাস কতক হ'ল একটা বিলিতি ফার্মে কাজ পেয়েছি। আপনার খবর সব ভাল ত? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

নগেনবাবু কহিলেন, এদিকে এই পাইকপাড়া ষ্টেটে একটা কাজ করছি যে!

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি? ওকালতি কি ছেড়ে দিলেন?

নগেনবাবু কহিলেন, হ্যাঁ। বড্ড কম্পিটিশান, সুবিধে হ'ল না। কিন্তু তাই ব'লে বসে নেই একটি দিনও। চাকরী পেয়ে তবে কাজ ছেড়েছি। সময় অমূল্য—বাপরে, সময় নষ্ট করতে আছে! বুঝলে হে অমলবাবু, একটা কথা বলে রাখি; বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আমি, আমার কথাটা শুনে চলো, চুপ ক'রে বসে থাকবে না, একটি মিনিটও না।......

এ সবই পুরানো কথা। অমল অন্যমনস্ক হইয়া তাহার মেসের দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল, সহসা কানে গেল নগেনবাবু বলিতেছেন, এই দেখ না কার্তিকবাবু, চাকরী গেল, কিছু টাকা হাতে ক'রে এসে চুপচাপ বসলেন। আমি তখনই পই-পই ক'রে বলেছিলুম, কার্তিকবাবু অমন কাজটি করবেন না; চাকরী না থাকে অন্তত সকাল বিকেল গোটাকতক টুইশান শুরু ক'রে দিন, তাও না জোটে নিদেন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান,—সেও ভাল। তা আমার কথা ত শুনলেন না, এখন তেমনি হ'ল—

আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া অমল কহিল, কী হ'ল কার্তিকবাবুর? ওখানেই আছেন ত? অসুখবিসুখ কিছু—

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নগেনবাবু কহিলেন, আরে না না, সে ত বরং ভাল ছিল! টাকা যা ছিল সব ত রেসে উড়িয়ে দিলেন, তার পর মন গুমরে গুমরে চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকতেন আর ভাবতেন, ফল যা হবার তাই হ'ল। এখন ত দস্তুর-মত মাথা খারাপের লক্ষণ।

অমল কিছুক্ষণের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, তার পর, এখন আছেন কোথায়?

নগেনবাবু কহিলেন, আছেন ঐ মেসেই। তা সে আর কতটুকুন থাকেন বলো। তিন দিন চার দিন কোথায় উধাও হয়ে যান, তার পর আবার হয়ত একবেলা এসে থাকেন, খাওয়া দাওয়াও করেন। আমরা ভাইকে চিঠি দিয়েছিলুম, সে বেচারা নিতেও এসেছিল, কিন্তু উনি গেলেন না। আমাদেরও এতদিনের জানা শোনা, বাবুদের চক্ষু লজ্জায় বাধছে! কিন্তু আমি এবার হরিবাবুকে বলেছি যে, এমন ক'রে আমরা আর কাঁহাতক টানি, যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন মশায়!

ততক্ষণে কলুটোলার মোড় আসিয়া পড়িয়াছে। অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি নাববেন না?

ঈষৎ লজ্জিত মুখে নগেনবাবু জবাব দিলেন, বৌবাজারে আবার একটা টিউশানী আছে কিনা!......চালানি কারবার করেছিলুম দিন কতক, তাতে অনেকগুলো টাকা লোকসান গেছে, সেটা তুলে নিতে না পারলে—বসে থাকা ত ঠিক নয় চুপ ক'রে, বুঝলে না?

অমল নামিয়া পড়িল। তাহার কার্তিকবাবুর কথাটাই মনে পড়িতে লাগিল বারবার, বেচারীর দোষের মধ্যে ছিল দুর্দান্ত রেস খেলিবার নেশা, কিন্তু সেটা বাদ দিলে মানুষটি যে কত অমায়িক তাহা ত সে নিজেই দেখিয়াছে। অমন দিল-খোলা লোকটার এই পরিণাম।......কে জানে কেন এমন হইল, স্ত্রী বিয়োগের জন্য অনুতাপই হয়ত ইহার কারণ! কিম্বা স্ত্রীবিয়োগের ব্যথা। কে জানে!

একবার তাহার মনে হইল গঙ্গাধরবাবুর বাসায় গিয়া খোঁজ খবর করে, কিন্তু তখন যেন আর পা চলিতেছিল না। সে সোজাসুজি নিজের ঘরের দিকেই চলিল। (ক্রমশ)

ময়দানবের পুরী

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য

অবশেষে স্থির হইল, জামসেদপুরে আমাকেই যাইতে হইবে। সেখানে এবার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলন হইতেছে। উহারই একটা বিশেষ কার্যোপলক্ষে আমাকে সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

জামসেদপুরে সাহিত্য সম্মেলনঃ লৌহনগরীর মণিকোঠরে সাহিত্যের বাসরশয্যা; একটু অভিনব লাগে বৈকি। নূতনত্বের আস্বাদনের লোভে মনটা পুলকিত হইয়া উঠিল। বি এন আর বোম্বাই মেলের মধ্যম শ্রেণীর দুইখানা টিকেট কিনিয়া সন্ধ্যা ৬টা লাগাৎ হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। জামসেদপুর কলিকাতা হইতে ১৫৬ মাইল—প্রায় ৭ ঘণ্টার পথ। মেল ছাড়া অন্যান্য ট্রেনে রিটার্ন ভাড়া ৬ টাকার মধ্যে। বোম্বাই মেলে মাত্র ২খানা মধ্যমশ্রেণীর কামরা; উহারই মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া স্থান সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে ভাবিয়া একটিতে উঠিয়া কিছু স্থান সংরক্ষিত রাখিব ভাবিতেছি, এমন সময় শুনিলাম পার্শ্ব হইতে একজন যুবক একজন প্রৌঢ়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "খুকুর জন্য ত একটু বেশী জায়গা দরকার।" মনটা সচকিত হইয়া উঠিল। চলতি পথে ট্রেনের কামরায় feminine graceএর উপস্থিতি একটু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে বৈকি। যাহা হউক, আধুনিকজনোচিত chivalry দেখাইতে হইল না; যুবকটি নিজেই স্থানের জন্য আমার শরণাপন্ন হইলেন। আমি অগত্যা নিজের পরিসর স্থানটির মায়া ত্যাগ করিয়া এক পার্শ্বে সামান্য একটু স্থান করিয়া লইলাম। ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়া আসিল। ভাবিলাম ট্রেন ত ছাড়ে; 'খুকু' কই!

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে যাইতেছি। নিজেও বাঙালী; সুতরাং 'খুকু' বলিতে বঙ্গললনারই অস্তিত্ব বুঝায়। ট্রেন ছাড়ার মিনিট খানেক পূর্বে 'খুকু' আসিয়া উপস্থিত হইলেন! কিন্তু ও হরি! যিনি উঠিলেন, তিনি 'খুকু' কি না, অথবা 'খুকু' হইলেও তিনি কোন্ দেশীয়, তাহা প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গের আত্মীয়দের কথাবার্তায় বুঝিলাম, তিনি বাঙালী যুবতী; কিন্তু তাঁহার বেশভূষা ও আচার ব্যবহারে তাঁহার মধ্যে আমি ইঙ্গ, বঙ্গ, পার্শী, পশ্চিমা, ভারতীয় প্রভৃতির জগাখিচুড়ি একটা 'বিশ্বরূপ' দর্শন করিলাম যেন। বুঝিলাম কোনদিন তিনি বাঙলার মেয়ে হইয়া জন্মিলেও আজ তিনি এ্যাংলোসাইজড হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার মধ্যে আজ বঙ্গনারীকে খুঁজিতে গেলে ভুল করা হইবে। জামসেদপুরের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানকারী ললনাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত হইয়াই উঠিলাম।

যাহা হউক, ট্রেনের কথা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে; প্রবন্ধের বিষয় হইতেছে জামসেদপুর শহর। হ্যাঁ, জামসেদপুর শহর—যাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহ-শিল্পের কারখানা বক্ষে করিয়া সগর্বে দাঁড়াইয়া আছে এবং বর্তমানের এই সঙ্কট-কালে ভারতের লৌহ-ইস্পাত দ্রব্যাদির চাহিদা মিটাইতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্পর্কে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় বলিয়াছেন, "জামসেদপুর শহরটি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত খুব প্রাচীন বা পুরাতন জনপদ নয়, এমন কি মাত্র ১৯০৭ সালের পূর্বে ইহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং বর্তমান শিল্প ও যন্ত্র-সভ্যতার নবতম সৃষ্টি এই জামসেদপুরের কোন প্রাচীন গৌরব বা অগৌরবের কোন ইতিহাস নাই। কিন্তু জামসেদপুর শহরটি নূতন হইলেও ছোটনাগপুরের যে অঞ্চলে ইহা অবস্থিত, সেই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের কোন প্রমাণাভাব নাই। সিংভূম, মানভূম, ধলভূম, ঘাটশীলা প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থানগুলির কোন সুসংবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু স্থানীয় কিম্বদন্তী ও প্রচলিত লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণ ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সম্পদ নিহিত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যূন খৃঃ পূঃ সহস্র বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলে মনুষ্যের বসবাস ছিল এবং সেই প্রাচীন অধিবাসিগণকে কিরাত বলা হইত। এই কিরাত জাতি যে একেবারে অসভ্য ছিল না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ তাহারা তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনের উপায় ও পদ্ধতি সবিশেষ জ্ঞাত ছিল।" বর্তমান জামসেদপুর শহরটি পূর্বেকার সাকচী ও কালীমাটী পল্লীর বুকে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ সালের পূর্বে যে স্থান শুধু নিবিড় অরণ্য পরিবেষ্টিত ও কঙ্করময় ছিল। সেইখানেই ৩০ বৎসরের মধ্যে এক বিরাট নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। যেন মহাভারতে বর্ণিত ময়দানব নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী!

টাটা কোম্পানীর প্রবর্তক স্বর্গীয় জামসেদজী টাটা

নোয়ামুণ্ডি লোহখনির এক প্রান্তে উপবিষ্ট শ্রমিকগণ

সেইদিনই রাত্রি প্রায় ১২টায় আমাদের ট্রেনখানি ধীরে ধীরে অ-বিজ্ঞানীর চক্ষে অপূর্ব বিস্ময়সঞ্চারক সেই জামসেদপুর নগরীর তো[illegible]রের সমীপবর্তী হইতে লাগিল। দূর হইতেই দেখিলাম আকাশের কোলে একস্থানে যেন সর্বগ্রাসী আগুন ধরিয়া গিয়াছে; তাহারই আলোকচ্ছটা বহুদূরপ্রসারী হইয়া অনভিজ্ঞ জনসমাজের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। পূর্বেই জানিতাম যে, উক্ত আলোকশিখা টাটা লৌহ কারখানার নবনির্মিত একটি প্ল্যাণ্ট হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ট্রেণ হইতে নামিয়া আমাদের আফিসের একজন স্থানীয় সহকর্মীর সহিত প্রায় ৩ মাইল ট্যাক্সিতে করিয়া জামসেদপুর নগরীর একেবারে মাঝখানে সহকর্মীর বাসায় গিয়া উঠিলাম।

সম্মেলন উপলক্ষে পরদিন ভোরেই স্নানাদি সারিয়া জামসেদপুরের রাস্তায় বাহির হইলাম। কাজ সারিয়া প্রাতেই ঘুরিয়া ফিরিয়া শহরের বিভিন্ন রাস্তা, ঘরবাড়ি কিছু কিছু দেখিয়া লইলাম। পূর্বদিন রাত্রে যে রাস্তা দিয়া ট্যাক্সিতে আসিয়াছিলাম, উহাকে কলিকাতার চৌরঙ্গীর মত মনে হইয়াছিল। পরদিন প্রাতেও সেইটিকে দেখিয়া পূর্ব ধারণা বলবৎই রহিল। রাস্তাটি জামসেদপুর শহরের প্রধান রাস্তা বলা যাইতে পারে, নাম ফরাসী নামানুকরণে 'বুলেভার্ড'। উহার উভয় পার্শ্বে বড় বড় দোকানপাট দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তাটি বেশ চওড়া এবং উহার সহিত সমান্তরলভাবে ও উহা হইতে বিভিন্ন, উহা অপেক্ষা কিছু কম চওড়া বিভিন্ন রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় পিচঢালাই ঐ রাস্তাগুলির প্রত্যেকটিই প্রায় চৌরঙ্গীর মত তক্ তক্, চক্ চক্ করিতেছে। শহরটিতে তিনদিন ছিলাম। এই কয়দিনে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম যে, শহরটির বাড়িগুলিও অতি সুন্দরভাবে নির্মিত। অধিকাংশ একতল বাটী; তবে কিছু কিছু দ্বিতল, ত্রিতলও আছে। কিন্তু সবগুলিই একটা সুপরিকল্পনা অনুযায়ী সুরুচিসম্মতভাবে নির্মিত। সুন্দর সুন্দর বাড়ি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাগুলি দেখিয়া মন স্বভাবতঃই আনন্দিত হয়। তারপর স্থানমাহাত্মে ঐ সমস্ত যেন আরও মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। পার্বত্য মালভূমিতে নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে; তাই উহার রাস্তাগুলিও 'উঁচু-নীচু' বা ঢালু ও খাড়াই করিয়া নির্মিত হইয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত মিশিয়া ঐ 'উঁচু-নীচুত্ব' পথিকের মনকে আরও পুলকিত করিয়া তোলে। নর্দার্ন টাউনের নিকটে 'বুলেভার্ড' রাস্তাটির একটি স্থানের দৃশ্য বড়ই মনোরম; রাস্তাটি ঐস্থানে উচ্চে উঠিয়া দুইদিকে নিম্নগামী হইয়া গিয়াছে। ঐস্থানে উত্তরমুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া মনটা কেমন সুদূরের পশ্চাতে ছুটিয়া যায়। কাল পথটা ক্রমে নিম্নগামী হইয়া রাঙামাটীর পথে মিশিয়া দূর হইতে দূরান্তরে পাহাড়ের কোলে যাইয়া মিশিয়াছে; পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে শাল, তমাল বা পার্বত্য দেশজাত ছোট ছোট বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে। তাহারই মাঝ দিয়া পথিকের মনটা রাঙাপথের সঙ্গে সঙ্গে দূরান্তরে ভাসিয়া যায়; মন অজ্ঞাত কারণে হর্ষ-বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, ঐদিন দ্বিপ্রহরে সাহিত্য সম্মেলনস্থলে যাইয়া

জামসেদপুর সহরের দৃশ্য

উপস্থিত হইলাম। 'বুলেভার্ড' রাস্তাটির সমান্তরালভাবে টাটা কোম্পানীর জেনারেল হেড অফিসের প্রায় গা ঘেঁসিয়া সাকচীগামী একটি রাস্তার এক পার্শ্বে বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। মণ্ডপটির তিন পার্শ্ব ঘিরিয়া ছোট ছোট একতলা দালানে প্রতিনিধিদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। জামসেদপুরবাসী একদল বালকবালিকা যুবক যুবতীর সম্মিলিত সুসংগত মধুর কণ্ঠস্বরে 'বন্দেমাতরম' গীত হইবার পর সম্মেলন আরম্ভ হইল; প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের পর মূল সভাপতি শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে উঠিলেন। এতক্ষণে আমি অন্যদিকে নিজ মন প্রক্ষিপ্ত করিবার অবকাশ পাইলাম। দেখিলাম প্রতিনিধিগণ ছাড়াও জামসেদপুরবাসী বহু নরনারী সম্মেলনে দর্শকরূপে যোগদান

সাকচী বাজারে তরকারীর দোকান

করিয়াছেন। ট্রেনের কামরায় এ্যাংলোসাইজড বঙ্গললনা দেখিয়া মনটা যেরূপ আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, সম্মেলনে উপস্থিত জামসেদপুরবাসী ললনাদের দেখিয়া তাহা দূরীভূত হইল। দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে 'বব্-করা' চুল কাহারও নাই। সকলেই বঙ্গনারীর বেশভূষায় সজ্জিত, বঙ্গনারীর নিজ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধা। পরে স্থানীয় বান্ধবের মুখে শুনিয়াছি যে, জামসেদপুর-বাসী বাঙালী মেয়েমহল আলোকপ্রাপ্তা হইলেও অতি আলোকে আলোকিত হইয়া উঠেন নাই, কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া না থাকিলেও একেবারে 'সংস্কারমুক্ত' নহেন, পর্দানশীন না হইয়াও পর্দা একেবারে ছিন্ন করেন নাই, আধুনিক বটে, কিন্তু অতি-আধুনিক নহেন। বঙ্গনারী প্রবাসী হইলেও বাঙলার নিজ বৈশিষ্ট্য যে একেবারে বিসর্জন দেন না—জামসেদপুর হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া ফিরিয়াছি। সম্মেলন মণ্ডপ হইতে কিছুক্ষণ অবকাশ পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিকের দৃশ্য কি সুন্দর! পার্শ্বেই টাটা লৌহ কারখানার সীমান্ত দেওয়াল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অপরদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় রাঙা-মাটির বুকে নবকিশলয় শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজি; আর সম্মুখে দূরে পর্বতমালার পরিবেষ্টনী। ভাবিলাম ইহা সাহিত্য চয়নের স্থান বটে। একদিকে যান্ত্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লৌহ কারখানা, অপরদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত মালভূমির ভাব-সঞ্চারি বিহ্বলতা। সভ্যতার ক্রমোন্নোতির সাথে সাহিত্যের অগ্রগতির নিবিড় সম্পর্ক। সুতরাং জামসেদপুরের লৌহধূসর পিঞ্জর বক্ষে সাহিত্যের আসর অসমীচীন হয় নাই।

সম্মেলনটি সব দিকেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি একটি বিশেষ ঘটনায় সম্মেলনটির গুরুত্ব এবারে বিশেষ বৃদ্ধি করা হইল। প্রবাসী ও অ-প্রবাসী বাঙালীদের বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া তোলার জন্য সম্মেলন একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়া বাঙালী সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধনের সূচনা করিয়া দিলেন। অতিথিবৃন্দের আদর আপ্যায়ন ও সম্মেলন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধিব্যবস্থার সুচারুতায় ও সুসামঞ্জস্যে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ সকলের ধন্যবাদভাজন সন্দেহ নাই। যাক্ সম্মেলন দুইদিনেই শেষ হইয়া গেল এবং আমরাও শহরটি ভালভাবে দেখাশুনা করার কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইলাম।

একদিন প্রাতে স্থানীয় সহকর্মিগণ সহ আমি এবং আমাদের কলিকাতার একজন সহকর্মি সাইকেলযোগে শহর হইতে তিন মাইল দূরে 'রিভারসামিট' নামক স্থানটি দেখিতে গেলাম। জামসেদপুর নগরীর উভয় পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া পর্বতমালার উপলখণ্ড সমৃদ্ধ পাদদেশ বিধৌত করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদী দুইটি আসিয়া জামসেদপুরের পশ্চিম-উত্তর কোণে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানটির নামই 'রিভারসামিট' বা নদীসঙ্গম। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে নাকি বালু ধুইয়া এককালে বেশ সোনা সংগ্রহ করা যাইত। নদী দুইটির সঙ্গমস্থলের অপর পার্শ্বে বিস্তৃত পর্বতের আবছাওয়া বেড়া; এই পার্শ্বে সুবর্ণরেখার বিস্তৃত কাঁকরময় বালুচর ও তদুপরি শ্যামল বনানী তাহার শীতল অঙ্গ বিছাইয়া দণ্ডায়মান। স্থানটি মাধুর্যে ও মনোরম দৃশ্যে অ-কবিকেও কাব্যমুখর করিতে না পারিলেও অন্তত কবিভাবাপন্ন করিয়া তোলে। দেখিলাম স্থান মাধুর্যে মুগ্ধ কয়েক দল নরনারী মনের

আনন্দে বন-ভোজনে আসিয়াছেন।

'রিভার্স্মিটে' যাইবার পথে শহর হইতে মাইল খানেক দূরে টাটার এরোপ্লেন অবতরণ করিবার জন্য এরোড্রম অবস্থিত। তাহারই নিকটে শহরের কাছাকাছি বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত একটি কালীবাড়ি অবস্থিত। তথাও একদিন গেলাম। কালীবাড়ির ভারপ্রাপ্ত সৌম্যদর্শন বাঙালী পুরোহিত আসিয়া আমাদিগকে মিষ্টভাষায় সম্বর্ধিত করিলেন। শুনিলাম কালীবাড়িটি বহুদিনের পুরাতন। জামসেদপুরে হিন্দুদের উহাই একমাত্র কালীবাড়ি। উহার নিকটে ইউরোপীয়দের নাচঘর থাকিলেও টাটার কর্তৃপক্ষ নাকি যাহাতে পূজার্চনার ব্যাঘাত না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। দেবীকে আমরা সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।
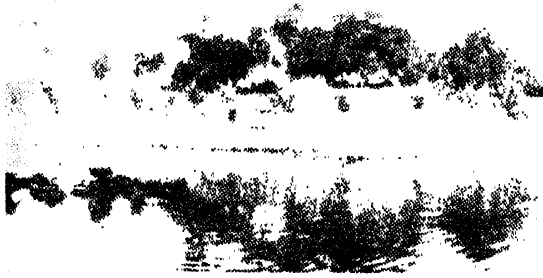
(বাঙালী); কিন্তু ফলভোগ করে অন্যে। আমরা অপরকে বুদ্ধি যোগাই; কিন্তু নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বড় কিছু গড়ে তোলার বুদ্ধির আমাদের অভাব।......জামসেদপুরে এসে বাঙালীর প্রতীক দেখলাম।" তবে সুখের বিষয় এই যে, সম্প্রতি স্থানীয় বাঙালী সমাজের তরুণ প্রবীণ সকলের দৃষ্টিই বাঙালীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার দিকে পতিত হইয়াছে।

অপর একদিন টাটা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত খরকাই নদীর সন্নিকটস্থ ডেয়ারী ফার্মটি (গোবাদি পশুর দুগ্ধজাত দ্রব্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান) দেখিয়া আসিলাম। ফার্মটি বেশ বিরাট এবং উহাতে বহু গাভী ও মহিষ রাখা হইয়াছে। ফার্মটিতে পশুগুলির স্বাস্থ্যহানি না ঘটে তজ্জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা চমৎকার। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যুদ্ধের দরুন
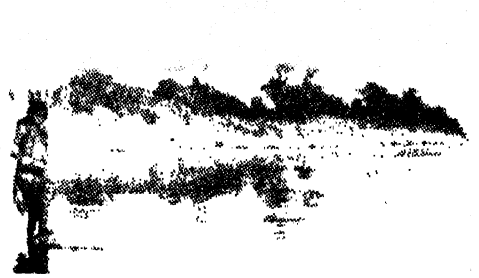
জামসেদপুরে সুবর্ণরেখা নদীর দৃশ্য

একদিন অপরাহ্ণে বাসে করিয়া টাটার লৌহ কারখানার অপর পার্শ্বে সাকচীতে গেলাম; তথায় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়ের নানাবিধ দ্রব্য নির্মাণের কারখানা দেখিলাম। বিরাট লৌহ কারখানার বাই-প্রডাক্ট কারখানা হিসাবে অন্যান্য কয়েকটি কারখানাও জামসেদপুরে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে সকলই অ-বাঙালী প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্কে শ্রীযুত রক্ষিত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ঐ কারখানাটিই বাঙালী প্রতিষ্ঠিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম' প্রতিষ্ঠানরূপে বিরাজিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শহরটিতে বিভিন্ন আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদির চালানী বা বিক্রয় ব্যবসায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত বড় বড় দোকানগুলিও অধিকাংশ অ-বাঙালীর বলিয়া প্রতিভাত হইল। বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত ঐ শ্রেণীর বড় দোকান আছে কি না তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, থাকিলেও তাহা দুই একটির অধিক হইবে না।

জামসেদপুরবাসী বাঙালীদের অধিকাংশই চাকুরীজীবি। তাঁহাদের বুদ্ধি বা জ্ঞানের অপ্রতুলতা আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ টাটার কারখানার অনেক উর্দ্ধতন পদে তাঁহাদের অনেকে কৃতিত্বের সহিত কার্য করিতেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই স্থানে টাটানগর ও লৌহ কারখানা গড়িয়া উঠার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন বাঙালী স্বর্গীয় প্রথমনাথ বসু। এইখানে যে লৌহ নির্মাণের কাঁচামাল অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাহার সন্ধান তিনিই দিয়াছিলেন। বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার সমগ্র কারখানাটির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে সেই সময়েও যেমন শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালীর মূলধন আগাইয়া আসে নাই আজ ৩০ বৎসর অন্তে এই বিরাট নগরীটি গড়িয়া উঠার পরেও বাঙালীর মূলধন তেমনি অনগ্রসর হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। এই সম্পর্কে সাহিত্য সম্মেলনে উক্ত শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'গোড়াপত্তন করি আমরা

আমরা বা সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের কাহারও ভাগ্যে টাটা কোম্পানীর লৌহ কারখানার অভ্যন্তর দেখা হইল না। আমি পূর্বে একবার দেখিয়াছি। কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি নাকি আরও বিস্ময়কর হইয়া উঠিয়াছে। তাই উহা একবার দেখার সৌভাগ্য লাভ না করায় বেশ একটু দুঃখিত হইলাম।

শুধু টাটার প্রধান সাধারণ কার্যালয়টি দেখিলাম। উহা যে বিরাট হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উহার একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম। তাহা এই যে, উহার নীচ তলারও নিম্নে মাটির তলে কতকগুলি অফিস ঘর আছে। রাস্তার সমান্তরালভাবে অবস্থিত জানলা দিয়া দেখিলাম তথায় কর্মচারিগণ নিজমনে কাজ করিয়া যাইতেছেন। শহরটিতে বাঙালী ও অন্যান্যদের নিজ নিজ শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় আছে। ঐগুলি টাটা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত স্কুল কমিটির পরিচালনাধীন। বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণ বেতনাদির জন্য মাসে নিয়মিতভাবে উক্ত স্কুল কমিটির প্রধান কর্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা এই নব সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া কিছু কিছু আলোক প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে; তবে তাহাদের অধিকাংশই এখনও কিছুটা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' পড়িয়া রহিয়াছে। রবিবার দিন শহরে হাট বসিল; সেই উপলক্ষে ঐ সব আদিম অধিবাসীদের দেখিবার কিছু সুযোগ হইয়াছিল। দেখিলাম দূরান্তরের এমন কি ৪।৫ মাইলের অধিক দূরের অধিবাসীরাও মেয়ে পুরুষে শাকসব্জী ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যাদি মাথায় ও স্কন্ধে বহন করিয়া পদব্রজে হাটে আসিয়াছেন। তাহাদের বন্য হরিণ-হরিণীসুলভ সরল চকিত চাহনী ও হাবভাব দেখিয়া মুগ্ধবোধ করিলাম। বোধ হইল ইহারা বর্তমান যন্ত্রযুগের যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শ পাইলেও একেবারে যন্ত্রদাস বনিয়া যায় নাই। জামসেদপুর শহরে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া ইহা-

কিভাবে ঘুমান উচিত

বিছানায় সকলের শোওয়া একরকম হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, শোওয়ার একটা ধারা থাকা দরকার। নানা ধরণের শোওয়াটা শরীরের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। অনেক পরীক্ষা ক'রে বৈজ্ঞানিকগণ 'Streamlined Sleep'-এর প্রচলন করেছেন। যাঁরা বেশীক্ষণ ঘুমাতে অভ্যস্ত তাঁরা এভাবের শোওয়াতে ঘুমাতে অভ্যাস করলে ঘুমানোর দু'ঘণ্টা প্রতিদিন অন্য কাজে স্বচ্ছন্দে লাগাতে পারেন। যাঁদের কাছে সময়ের মূল্য বেশী তাঁদের কাছে 'Streamlined Sleep' সত্যই মূল্যবান। সময় বাঁচান ছাড়া এভাবে শুয়ে সকলেই বেশ আরামে ঘুমাতে পারবেন। Connectiant বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বোসফিল্ড এভাবের শোওয়াটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। গত পাঁচ বৎসর ধরে আমেরিকার প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী ছাত্র 'Streamlined Sleep' অভ্যাস করে যথেষ্ট সুফল পেয়েছেন। আরাম করে ঘুমানোর জন্যে মূল্যবান নরম বিছানার প্রয়োজন নেই, আপনারা যে রকম বিছানায় ঘুমাতে অভ্যাস করেছেন তাতেই 'Streamlined Sleep' অভ্যাস করতে পারবেন। বিছানা নরম কিম্বা কঠিন হলেও আপনার কোন অসুবিধা হবে না। ডাঃ বোসফিল্ড বলেন, চীনারা বোর্ডের উপর পাতলা বিছানা বিছিয়ে, সৈন্যেরা ঝুলিখাটের উপর বেশ আরামেই নিদ্রা যায়, কোন রকম অসুবিধা ভোগ করে না। রাত্রে ঘুমাবার সময় আমাদের শরীর বিছানার উপর বহুবার নড়াচড়া করে। আমেরিকার কলেজের ছাত্রদের শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দানের জন্য প্রায় ১৪০টি নিয়ম পালন করতে হয়। এই নিয়মগুলি খুবই সহজ, পালনের পক্ষে কাহারও অসুবিধা হয় না। রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজন। রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই সব রকম কাজের চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর ক'রে দেওয়াই প্রথম কাজ। সুখনিদ্রার পক্ষে এদের আবির্ভাব সত্যই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। শোওয়ার ঘর এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখান থেকে নিদ্রা যাবার সময়ে কোন রকম অদ্ভুত রকমের শব্দ আসবে না যা ঘুমানোর ব্যাঘাত ঘটাবে। ডাঃ বোসফিল্ড পরীক্ষা করে বলেছেন, ১৭৪ জন পুরুষ ছাত্রের মধ্যে ১১৩ জন ছাত্র স্বীকার করে যে, তারা ঘুমাবার পূর্বে অতীত ঘটনা এবং আগামীকালের কাজের চিন্তা করেই রাত্রের বিশ্রামের সময়টুকু নষ্ট করে আসছে।

জীবজন্তুর ল্যাজের প্রয়োজনীয়তা

সরীসৃপ জীবের মধ্যে Chameleons-এর ল্যাজই কোন জিনিস ধরে রাখবার পক্ষে সব থেকে উপযোগী। যখন এই শ্রেণীর জীব কোন কাজে ব্যস্ত থাকে তখনই ল্যাজটিকে হাতের কাজে লাগায়। কিন্তু অন্য সময়ে ল্যাজটিকে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে রাখে অনেকটা ঘড়ির স্প্রিংয়ের মত ক'রে। কোন কোন সাপের ল্যাজ শত্রুকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু সাপের ল্যাজের আরম্ভ কোথা থেকে? কোন কোন সাপের ল্যাজটি শরীর থেকে অনেকখানি যে লম্বা থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একবার স্কুলের একটি ছেলে সাপের ল্যাজ

চীনের প্যাঙ্গোলিন

এই জাতীয় জীবের দেহ শক্ত আঁশ দ্বারা সুরক্ষিত। গাছে চড়ার পক্ষে এদের ল্যাজ খুবই উপযোগী।

কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলে, A snake was 'a thing with a tail right up to his head.' কোন কোন সাপের ল্যাজ শরীরের তুলনায় আবার ছোট হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সাপের কোন অংশটি ল্যাজ এ জানবার প্রধান উপায় সাপটিকে উল্টে নিয়ে কোথায় excretory orificeটি আছে তা খুঁজে বের করা। excretory orifice-এর সম্মুখ ভাগ (যে অংশে মুখ বিদ্যমান থাকে) সেই অংশটিই সাপের শরীর আর পশ্চাৎ ভাগের অংশটি ল্যাজ।
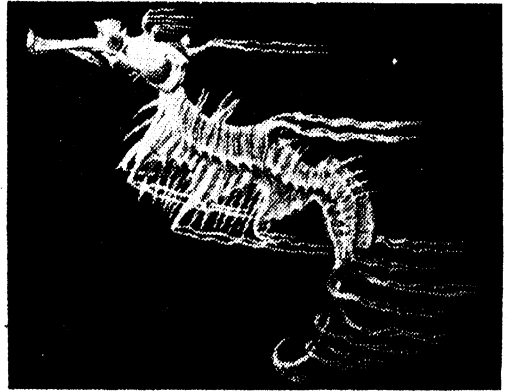
অস্ট্রেলিয়ার 'সী-হর্স'

সী-হর্সের ল্যাজের আকৃতি অদ্ভুত। গাছের ডালে নোঙ্গর ফেলে এরা বেশ আরামে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে।

মাছের ল্যাজ আছে। তবে সব থেকে কার্যকরী হ'চ্ছে Sea-horse-এর। পাইপ-ফিসের কোন কোন বংশেরও ল্যাজ যথেষ্ট শক্তিশালী বলে পরিচিত। এরা কেউ ভাল সাঁতারু নয়, সকলেই সমুদ্রের গাছগাছড়ার মধ্যে বাস করতে পছন্দ করে, সময়ে সময়ে এরা সমুদ্রের নীচে বন বাদাড়ের ডালে নোঙগর ফেলে বিশ্রাম করে।

স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে খুব কম শ্রেণীর জন্তুই ল্যাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে চর্বি ধারণ করতে সক্ষম হয়। এক জাতীয় গৃহপালিত ভেড়া এবং মরুদেশের ইঁদুরের নাম করা যায় যাদের ল্যাজে চর্বি আবির্ভাব হয়। যে সব ভেড়ার ল্যাজে চর্বি থাকে তারা আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন নামে অভিহিত। উপযুক্ত খাদ্যাভাবেও এই জাতীয় জন্তুরা কোন রকম শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে না। আরব দেশে এই জাতীয় গৃহপালিত ভেড়ার ল্যাজ সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

'Fat-Tailed-Desert-Mouse ঈজিপ্টেও পাওয়া যায়। এ নামে এই জাতীয় জীব পরিচিত হলেও সত্যসত্যই এরা ইঁদুর নয়। গার্বিলেস নামে এক জাতীয় জীবের এরা বংশধর। এদের ছোট্ট শরীর, চার পাঁচ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। শরীরের তুলনায় চোখ দুটি বড়, উজ্জ্বল। শরীরের লোমগুলি লম্বা—রেশমের মত নরম।

আমরা সিংহের ল্যাজে এক গোছা চুলই দেখি। কিন্তু সেই চুলের গোছা যে নখের আকারে এক অংশ লুকিয়ে রাখে তা দেখবার সুযোগ পাই না। এই অদ্ভুত আকারের অংশ সিংহের কি প্রয়োজনে আসে তা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেন নি।

যে সব জীবজন্তু ল্যাজের অধিকারী তারা কি ল্যাজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? কোন কোন জাতীয় সাপ সময়ে সময়ে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে উঁচু যায়গায় উঠবার সাহায্য পায়। দুই পুরুষ কাঙ্গারু যখন এক স্ত্রী-কাঙ্গারুর প্রেমে পড়ে, দু'জনে বক্সিং লড়ে উভয়ের শক্তির পরিচয় দেয় সে সময় তারা সুযোগ পেলেই ল্যাজের উপর ভর দিয়ে পিছনের পা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করে। এমনও হয় যে, দুজনেই মাত্র ল্যাজের উপর শরীরের সমস্ত ভার রেখে ক্রমাগত পা চালিয়ে চলেছে।

কোন কোন জীবের ল্যাজ এক অদ্ভুত শব্দ করে আমাদের কাছে বিপদের কথা জানিয়ে দেয়। র‍্যাট্‌ল সাপের ল্যাজের শেষ অংশে অনেকগুলি হাড়ের টুকরো এক সঙ্গে থাকায় বহুদূর থেকে তার আগমন বার্তা আমাদের জানিয়ে দিয়ে বিপদের হাত থেকে আগে থেকেই সাবধান করে দেয়। আওয়াজটা অনেকখানি ছেলেদের ঝুমঝুমি খেলনার আওয়াজের মত হয় বলে এদের আমরা ঝুমঝুমি সাপ নামে অভিহিত করতে পারি। 'Canadian Bearer' নামে ক্যানাডার এক জাতীয় জীবের ল্যাজে লোম নেই, দেখতে চ্যাপটা। এই ল্যাজের সহায়তায় এই জাতীয় জীব জলের মধ্যে নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে সাঁতার দেয়। এছাড়া লোকের ধারণা নাকি, এই ল্যাজের সাহায্যেই এরা কাদা লেপে নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরী করে নেয়।

দেশ

৮ম বর্ষ] ৫ই মাঘ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল Saturday, 18th January, 1941 [১০ম সংখ্যা

দিদিমণি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিদিমণি

অফুরান সান্ত্বনার খনি।

কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ

মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।

কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি

সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি'।

এ অখণ্ড প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি',

রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী ;

ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে

চারিদিকে স্বস্তি দেয় ব্যেপে ;

আশ্বাসের বাণী সুমধুর

অবসাদ করি দেয় দূর।

এ স্নেহ মাধুর্য ধারা

অক্ষম রোগীরে ঘিরে আপনার রচিছে কিনারা ;

অবিরাম পরশ চিন্তার

বিচিত্র ফসলে যেন উর্বর করিছে দিন তার।

এ মাধুর্য করিতে সার্থক

এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।

অবাক হইয়া তারে দেখি

রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।

উদয়ন

২রা জানুয়ারি, ১৯৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

গরীবের প্রতি দরদ—

বীরভূম জেলার কয়েকটি ইউনিয়নে মাত্র দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ অধিকতর ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। এমন জায়গাও কয়েকটি আছে যে, যেখানকার অবস্থা সরকারী ঘোষিত অঞ্চলের অপেক্ষাও খারাপ। লোকের অন্ন জুটিতেছে না, অথচ এই দুর্দিনে কৃষি-ঋণ আদায়ের নোটিশ জারী বিনা দ্বিধায় চলিতেছে, আশ্চর্য হইবার কথা নয় কি? আমরা বলিব, মোটেই নয়। সেইরূপ টাঙ্গাইল এবং কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মড়কের আকারে দেখা দেওয়াতেও যে মন্ত্রী মণ্ডল বিশেষভাবে স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবপ্রবর নির্বিকার রহিয়াছেন ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ মন্ত্রীরা যখন গরীবের বোঝা ঘাড়ে লইয়াছেন, তখন তাঁহারা যদি খোসমেজাজে এবং বহাল তবিয়তে মন্ত্রিগিরির মজা লুটিতে পারেন, তবে দেশের দুঃখ দূর তো আনুষঙ্গিক হিসাবেই ঘটিবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত অমৃতলাল মণ্ডল টাঙ্গাইলের ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত অঞ্চলের যে মর্মন্তুদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ— "জ্বরের পুনঃপুন আক্রমণে বহু লোক, বিশেষত বালক ও শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ম্যালেরিয়ায় এরূপ মড়ক সচরাচর কখনও দেখা যায় নাই। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পাটের বাজারের চাহিদা না থাকার দরুণ অর্থাভাবে লোকের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছে। কুইনাইনের মূল্য অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসার জন্য কুইনাইন কিনিবার সামর্থ্য অধিকাংশ লোকেরই নাই। দেশবাসী দরিদ্র জনসাধারণের জীবনের কোন মূল্য আছে, কি তাহাদের রক্ষার কোন প্রকার দায়িত্ব কাহারও আছে বলিয়া আদৌ মনে হয় না। গভর্নমেণ্ট কিংবা জেলাবোর্ড হইতে এ পর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন বা কোন প্রকার ঔষধাদি সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই।" মণ্ডল মহাশয় বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর মহিমা বোধ হয় বিশেষ রকম জানেন না। তিনি এই অবস্থার কি প্রতিকার, কৃপা করিয়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে গিয়া আগেই বাৎলাইয়া আসিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক বোধেই কর্তারা উদাসীন আছেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থা মত কদু বৃক্ষের চাষ করিলে, এ লোকগুলাকে এমন দুর্দশা নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইত না।

বাঙালী মুসলমানের স্বার্থ—

কলিকাতার ২৩নং গার্ডেনার লেন হইতে মিঃ নরুল ইসলাম বাঙলার বর্তমান মুসলিম লীগ পরিচালিত গভর্নমেণ্টের তাঁবেদারীর ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনে বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সংবাদপত্রে একখানা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই চিঠিতে তিনি বলেন, "গত ১৯৩৩ ও ১৯৩৬ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন যৌথনির্বাচন প্রথায় সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়াই কর্পোরেশনে বাঙালী কাউন্সিলারদের সংখ্যা শতকরা আশীজন' হইয়াছিল এবং কেবল সেইজন্যই কর্পোরেশনের অধীন অনেকগুলি বড় বড় চাকুরীতে বাঙালী মুসলমান নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যথা, ডেপুটি এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার, কালেকসন, লাইসেন্স ও এসেসমেণ্ট ইন্সপেক্টরগণ। গভর্নমেণ্ট যে কয়জন সভ্য মনোনয়ন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও একজন বাঙালী মুসলমান সভ্য মনোনীত হইতেন। পরে যখন মুসলমান মনোনীত সভ্যের সংখ্যা দুইজনে বাড়িয়াছিল, তখন ঐ দুইজনই বাঙালী মুসলমান হইতেন। ১৯৪০ সালে বাঙলার মন্ত্রীরা মুসলিম লীগ গভর্নমেণ্ট আবার কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল বিল সংশোধন করেন। ইহার ফলে গত মার্চ মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, উহাতে একুশজন নির্বাচিত মুসলমান সভ্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন বাঙালী মুসলমান নির্বাচিত হইতে সক্ষম হন। গত সাধারণ নির্বাচনের পর যতগুলি মুসলমান কর্পোরেশনের চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বাঙালী নহেন; যথা এসিস্টাণ্ট এডুকেশন অফিসার, লাইসেন্স ইন্সপেক্টর, কেরাণীগণ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই সিদ্দিকী-ইস্পাহানী-রফিক কোম্পানীর পেটোয়া লোক—যদিচ ঐ সমস্ত চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার মত উপযুক্ত শিক্ষিত অনেক বাঙালী মুসলমান যুবক ছিল। উপর্যুক্ত বিষয়গুলির দিকে আমি বাঙালী মুসলমানের ও মাননীয় ফজলুল হক সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বাঙলা দেশে বাঙলার রাজধানী কলিকাতা নগরে বাঙালী মুসলমানগণ যদি এইভাবে বিতাড়িত হয়, তবে তাহাদের স্থান কোথায়? বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটিতে কোনদিনই কোন বাঙালী মুসলমান চাকুরী পায় নাই এবং কোনদিনইও সভ্য নির্বাচিত বা মনোনীত হয় নাই। যখন দেখি যে, অ-বাঙালী এবং অ-ভারতীয় মুসলমানেরা বাঙলার রাজধানীর পৌর-প্রতিষ্ঠানের মুসলমান সভ্যগণের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এই সমস্ত নেতা সেই শ্রেণীর মুসলমান, যাঁহাদের অত বড় বড় সওদাগরী অফিসে একজনও বাঙালী মুসলমান কেরাণী, দপ্তরী, কিংবা পেয়াদা নাই, তখন আমার মাথা লজ্জায় অবনত হয়।" নাজিম-সুরাবর্দি-হক কোম্পানী কিভাবে বাঙালী মুসলমানের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করিতেছেন মিঃ নরুল ইসলামের এই পত্রই তাহার প্রমাণ।

স্বদেশপ্রেমিকের সংজ্ঞা—

স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু বিলাতের "টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী" পত্রে "বর্তমানের কর্তব্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস, আমরা যদি একবার দলাদলির সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্না উভয়েই স্বদেশপ্রেমিক। কোন কোন মহলে যেরূপ শুনা যায় মিঃ জিন্না যে দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সেইরূপ অন্ধ, অথবা তিনি মোস্লেম লীগের নেতাগিরির গর্বে এতটা পরিস্ফীত যে, দেশের প্রতি কর্তব্যের আহ্বানে তিনি সাড়া দিবেন না, একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। স্যর তেজবাহাদুর বিশ্বাস করিতে পারুন আর নাই পারুন, কোদালী আর কুড়ালি এ দুইটি যে পৃথক পদার্থ ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই এবং মিষ্টমুখে কোদালীকে কুড়াল বলিলেই কোদালী কুড়াল হইয়া যায় না। সত্যকে এইভাবে অস্বীকার করা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র, ইহাতে কাজ তো হয়ই না বরং অকাজই বাড়ে। স্বদেশপ্রেমিক মুখে বলিলেই যে-কেহ স্বদেশপ্রেমিক হইতে পারে না, ভিতরে তদুপযুক্ত কিঞ্চিৎ বস্তু থাকা প্রয়োজন। স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় লোকের কাজ হইতে। জিন্না সাহেবের মধ্যে স্বদেশপ্রেম বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে ভারতের জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য তিনি উদ্যত হইতে পারিতেন না; কারণ, এ সত্য তাঁহার অবিদিত নহে যে, ভারতের জাতীয় সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করার অর্থই হইল বিদেশীর দাসত্ব এবং অধীনতা এবং ইহাও জলের মত যে কোন বুদ্ধিমান লোকের নিকট পরিষ্কার যে, ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীনতা লাভ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতভূমি বিদেশীর দ্বারা শোষিত হইবে—সোজা কথায় নিজেদের ঘরে অন্ন থাকিতেও ভারতবাসী অন্নকষ্ট ভোগ করিবে। দেশের রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং দেশের আর্থিক অধীনতা ও আনুষঙ্গিক দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা যাঁহার অবলম্বিত ভেদনীতির অনিবার্য পরিণতি, তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমিক আখ্যা দিলে ঐ কথাটারই অবমাননা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জিন্নাসাহেব যে স্বদেশপ্রেমিক নহেন, পক্ষান্তরে মোস্লেম লীগের নেতাগিরির মোহেই তিনি পরিস্ফীত এবং দেশের প্রতি কর্তব্যে সাড়া দেওয়া দূরের কথা, সেই নেতাগিরির মোহে দেশের প্রতি কর্তব্যকে তিনি পদদলিত করিতেই প্রবৃত্ত, এ সত্য সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। দলাদলির মতিগতি ছাড়িবার জন্য উপদেশ স্যর তেজবাহাদুর যদি জিন্না সাহেবকে দিতেন আমাদের আপত্তি থাকিত না; কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রনীতির সকল হালচাল জানিয়া এবং জিন্না সাহেবের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস হইতে ক্রমাগত যেসব চেষ্টা হইয়াছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়াও স্যর তেজবাহাদুর কংগ্রেসকে দলাদলির সংস্কার ছাড়িবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতে আমরা ক্ষুব্ধই হইয়াছি। তেলে জলে কিছুতেই মিশ খাইবে না, সে চেষ্টাও বৃথা। জিন্না সাহেবের নীতির অন্তর্নিহিত দুর্বুদ্ধিকে উন্মুক্ত করিয়া কঠোর বাস্তব জাতীয় স্বার্থের প্রতি সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই একমাত্র উপায় এবং তাহা না করা পর্যন্ত জিন্না সাহেবের কাছে দরবারেরও যেমন কোন মূল্য নাই, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কাছে আবেদনও সেইরূপ নিরর্থক। ভারতবাসীরা যদি মিলিত দাবী না করিতে পারে, তবে বড়লাট কি করিবেন, ভারতসচিব কি করিবেন, স্যর তেজবাহাদুর এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার সোজা উত্তর এই যে, যত দিন ভারতের দাবীকে উপেক্ষা করা যাইবে, ততদিন বৃটিশ রাজনীতিকদের কাছে ভারতের দাবী কোনক্রমেই মিলিত দাবী হইবে না। ৩৫ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে দেশের স্বার্থকে বিক্রয় করিবার মত বিশ্বাসঘাতক একজনও থাকিবে না, ইহা কল্পনারও অতীত। অবস্থার গতিকে অধিকাংশের দাবীই একদিন মিলিত দাবীর মর্যাদা লাভ করিবে। ইহাই সোজা কথা।

স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য—

আগামী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হইবে। স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প বাক্যের কিছু পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। গত বৎসরের সংকল্পবাক্যের সঙ্গে এবার নিম্নাংশ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—

"ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং ভারতের সর্বত্র বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মী কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সেই হেতু দ্বিগুণ উৎসাহে গঠনমূলক কর্মতালিকায় আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষ কর্তব্য হইয়াছে। গঠনমূলক কর্মতালিকা পালন ব্যতীত ব্যাপক বা ব্যক্তিগত কোন আইন অমান্যই স্বরাজ অর্জনে ও স্বরাজ রক্ষায় আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, গঠনমূলক কর্মতালিকার অর্থ জনসাধারণের মধ্যে দরকার সূতাকাটা ও খাদির প্রচার এবং পল্লীশিল্প ও পল্লীজাত দ্রব্যসমূহকে জনপ্রিয় করা। আমরা বিশ্বাস করি যে, অহিংসা নীতির কার্যকরভাবে প্রসারে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সর্ববিধ অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবে।"

পল্লীশিল্প ও পল্লীজাত দ্রব্যসমূহকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা দেশপ্রেমিক মাত্রেই সমর্থন করিবেন, কিন্তু চরকায় সূতাকাটার সঙ্গে সূক্ষ্মতত্ত্বে আধ্যাত্মিকতা বা অহিংসার বিশেষ যে কোন সম্পর্ক আছে, আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না, স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতা রক্ষার দিক হইতে ইহার মূল্য আছে কি না বিশেষজ্ঞগণই বলিতে পারেন, তবে ইতিহাস প্রমাণ দিবে যে, চরকা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। স্বাধীনতা দিবসের প্রতিশ্রুতি যদি স্বাধীনতা লাভ করিবার উদগ্র আগ্রহ আমাদের মধ্যে জাগায়, তবেই উহা সার্থক হইবে। আমরা দেখিতে চাই সমাজের সর্বস্তরে সেই আগ্রহ ও বলিষ্ঠ প্রেরণার বিকাশ এবং সাধনায় সর্বজয়ী নিষ্ঠা।

জাতীয়তা বনাম সাম্প্রদায়িকতা—

হিন্দুরা কারসাজী করিয়া কংগ্রেসের মারফতে ভারতে হিন্দু রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, জিন্নাসাহেব সেদিন বোম্বাইয়ের কাওয়াসজী জেহাঙ্গীর হলের বক্তৃতাতেও পাকে প্রকারে এই কথাই বলিয়াছেন। এ কথার জবাব দিয়াছেন ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে মহাশয় গত রবিবার কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। তিনি বলেন,—"গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রধানত ভারতের জাতীয়তাবাদী হিন্দুরাই ভারতের জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন এবং দেশের মুক্তির জন্য বহু দুঃখ ভোগ ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন।। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুযোগ লইয়া এবং উহাতে প্রয়োজনানুরূপ বাতাস দিয়া সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাইয়া তোলা হইয়াছে।" হিন্দুদের স্বাধীনতার জন্য এই যে আন্দোলন, ইহার মধ্যে হিন্দু রাজত্বের নাম গন্ধ কোন দিনই ছিল না, ছিল ভারতের স্বাধীনতা। জিন্নাই দলের সুবিধাবাদীদের ভাষ্য যাহাই হউক, ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ ইহাই এবং ইহা কেবল হিন্দুদেরই আন্দোলন নয়। জিন্না সাহেবের সমধর্মীরা অনেকে এই আন্দোলনে সমভাবেই যোগ দিয়াছেন এবং সেজন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকারও করিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু, সুতরাং ভারতের জন-আন্দোলনকে হিন্দু আন্দোলন নাম দেওয়ার অর্থ ভারতের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা এবং মোস্লেম সভ্যতার মূলগত গণ-তান্ত্রিকতারই বিরুদ্ধতা করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। দেশের রাজনীতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের স্থান খুব কম —জাতিগত এবং বর্ণগত প্রশ্ন অবশ্য কিছু কিছু থাকে; কিন্তু ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ভারতেরই লোক। জিন্না সাহেব যতই যুক্তি দেখান না কেন, আরব, মিশরের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ তাঁহাদের নাই। বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে লইয়া যদি কানাডা এবং রুশিয়াতে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় আদর্শ গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে পারে, তবে ভারতেই বা কেন তাহা সম্ভব হইবে না। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। জিন্না সাহেবের নেতাগিরির পক্ষে ইহার মূল্য থাকিতে পারে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শে জাগ্রত, আরব, মিশর এবং তুরস্কেও তাহা নাই। সুতরাং স্বার্থপর সুবিধাবাদীরাই জিন্না সাহেবের যুক্তিতে ভুলিবে, মুসলমান তরুণেরা সে যুক্তিতে ভুলিতে পারে না।

পোস্টাফিসের আয় বৃদ্ধি—

ভারত গভর্নমেণ্টের ১৯৩৯-৪০ সালের ডাক এবং তার বিভাগের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে ঐ বিভাগের লোকসান তো হয়ই নাই, অধিকন্তু এত লাভ হইয়াছে যে, গত ১৪ বৎসরের মধ্যে তেমন লাভ হয় নাই। মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৮৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই লাভের ভাগী এদেশের গরীবেরা হয় নাই, উল্টা তাহাদের ঘাড়ে ডাকমাশুলের চড়া হারই আসিয়া চাপিয়াছে। খামের দাম চার পয়সা হইতে পাঁচ পয়সায় উঠিয়াছে, অন্যান্য মাশুলও বাড়িয়াছে, কথায় আছে, উল্টা বুঝিলি রাম। এদেশের গরীবদের ইহাই বিধিলিপি!

হেইল সেলাসীর আশা—

আবিসিনিয়ার সম্রাট হেইল সেলাসী মিশরের রাজধানী খার্টুমে অবস্থান করিতেছেন। মিশরের পশ্চিম দিকে জেনারেল ওয়াভেলের সেনাদল কর্তৃক ইতালীয় বাহিনীর পরাজয় তাঁহার অন্তরে আশার সঞ্চার করিয়াছে। আবিসিনিয়ার সম্রাট সম্প্রতি জনৈক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি অচিরেই সুদানের সীমানা অতিক্রম করিয়া আবিসিনয়ার মধ্যে প্রবেশ করবেন এবং ইতালীয়রা আদ্দিস আবাবাতে যে নেকড়ে বাঘের মূর্তি বসাইয়াছে, সেটিকে ভাঙ্গিয়া হাবসী দেশের জাতীয়তার প্রতীক্ সিংহের মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠা করিবেন। হাবসীরা আধুনিক সভ্যতার দিক হইতে তেমন উন্নত না হইলেও, তাহারা দুর্দম এবং স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি। আজ এই মুহূর্তে তাহারা সুবিধা একটু পাইলে, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনীতিক জেনারেল স্মাটস্ সেদিন এক বক্তৃতাতে বলিয়াছেন, এইবার আমরা কেনিয়ার সীমান্ত দিয়া আবিসিনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিব এবং সেখান হইতে ইতালীয়দিগকে বিতাড়িত করিব। লিবিয়া এবং মিশরের মধ্যবর্তী মরু অঞ্চলের সঙ্গে আবিসিনিয়ার ঠিক তুলনা হয় না। আবিসিনিয়ায় ইতালীয়দের ঘাঁটি অনেক বেশী রকমে পাকা এবং আবিসিনিয়া এতটা মরুপ্রধান দুর্গম অঞ্চলও নয়, বর্ষা পড়িলে দুর্গমতা কিছু বাড়ে। ইতালীয়রা এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবিসিনিয়াতে বড় বড় মোটরযানের গতি-বিধির উপযুক্ত রাস্তা করিয়াছে এবং উড়োজাহাজের ঘাঁটি বাঁধিয়াছে। আবিসিনিয়ায় ইতালীয়দের সেনাসংখ্যা খুব কম নয়। তবে লিবিয়ায় যদি ইতালি একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং ইতালি আর বাহির হইতে আফ্রিকাতে সৈন্য আমদানী না করিতে পারে, তাহা হইলে তিন দিক হইতে ইংরেজের আক্রমণে এবং সেই সঙ্গে অন্তর্বিপ্লবের ফলে আবিসিনিয়ায় ইতালির প্রভুত্ব বিচূর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়। কালা আদমীর দেশ আবিসিনিয়া যদি পুনরায় তাহার স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে ভারতবাসীরা সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইবে। সাদার দল একদিন এই স্বাধীন জাতিকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া প্রকারান্তরে প্রবল ইতালির হাতে সঁপিয়াই দিয়া-ছিল, আজ যদি আবিসিনিয়া স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়, তাহা হইলেও সাদার দলের উদারতা হইতে পাইবে না, জগতের রাষ্ট্রনীতিক সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শক্তি প্রয়োগের ফলেই পাইবে।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১৭]

বাসার কাছাকাছি আসিয়া অমল দেখিল কে একজন তাহার ঘরের সম্মুখের সংকীর্ণ রকে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে একটু বিস্মিত হইল, অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল আগন্তুক আর কেহ নহে—ইন্দু স্বয়ং। আগের বারে যখন সে আসিয়াছিল ডবল চাবিটি এখানেই রাখিয়া গিয়াছিল, সুতরাং এবার আর ঘরে ঢুকিয়া অপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

অমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, আরে! আমি যে আপনারই শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছি।

এবার বিস্মিত হইবার পালা ইন্দুর। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন ঈষৎ ভীত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, আমার শ্বশুরবাড়ি, সে কি? তাঁরা কি বললেন? কার সঙ্গে দেখা হল?

বলছি। বলিয়া অমল চাবী খুলিয়া আলো জ্বালিল, তাহার পর জামাটা খুলিয়া আনলায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া মুখে হাতে জল দিতে দিতে কহিল, দেখা আপনার খাস শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গেই হ'ল। আর, আর একজনের সঙ্গেও দেখা হ'ল বলতে হবে, তবে সে নেপথ্যে!

সে সমস্ত কথাই আনুপূর্বিক খুলিয়া বলিল। ইন্দু নিস্তব্ধভাবে বসিয়া সব কথা শুনিল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন জবাব দিল না, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের আর আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই অমলদা, আর তাই-ই করতে হবে!

অমল যেন শিহরিয়া উঠিয়া তাহার দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, ছিঃ, ওকি কথা ইন্দুবাবু, ওকথা মুখে উচ্চারণও করতে নেই।

ইন্দুর দুটি চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কহিল, উচ্চারণ করতে নেই তা ত বুঝি, কিন্তু এমন করে বাঁচিই বা কি করে বলুন দেখি!

দুঃখ ত নিজে পাচ্ছিই, আবার আমার জন্যও কতকগুলো লোক অনর্থক দুঃখ পাচ্ছে। আমার যে কী অবস্থা তা-ত শ্বশুর মশাই বুঝছেন না, ভাবছেন যে আমি তাঁর ওপর রাগ করেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়, সত্যি বলছি আপনাকে অমলদা, এ ক'দিন শুধু পাগলের মত পরিচিত অপরিচিত সমস্ত জায়গায় চাকরী খুঁজে বেড়িয়েছি। মামার আর্থিক অবস্থা যে কী তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকার গ্লানিই কি কম। যা হোক্ কিছু একটা পেলে বাঁচি—

অমল এই পাওয়ার আশাটা যে কতদূর তাহা জানিত। সে কহিল, এর ভেতর কি কোথাও কিছু ভরসা পেলেন?

ইন্দু জবাব দিল, ভরসা! আপনি কি ক্ষেপেছেন? এই বাজারে কেউ কাউকে ভরসা দেয়, বিশেষ করে আমার মত সহায়-সম্বলহীন লোককে?

তা বটে। অমল চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা পরে ইন্দু কহিল, একটা ছোট রকম টিউশনীর আশা আছে, সেটা যদি পাই তাহলে ভাবছি এখানে এসেই থাকব।

এখানে এসে? অমল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সে কী করে হবে? কমলা তাহলে থাকবে কোথায়?

হঠাৎ কমলার নামটা বাহির হইয়া গেল। ইন্দু লক্ষ্য করিল না, কিন্তু অমলের কানটা আপনা আপনিই গরম হইয়া উঠিল।

ইন্দু কহিল, ও ওখানেই থাকবে। আমার মামার কাছে রাখাই উচিত, কিন্তু মামা কেমন মানুষ জানেন ত, আরও জড়িয়ে পড়বেন—

অমল সহসা ইন্দুর হাতটায় চাপ দিয়া কহিল, কিন্তু তিনি বড় কষ্ট পাবেন!

বিস্মিত কণ্ঠে ইন্দু কহিল, কে, কমলা?...তা হয়ত পাবে; তবে সে খুব অবুঝ নয়, আমার কথা সে বুঝবে।

অমল আর কথা কহিতে পারিল না, এ সম্বন্ধে আর কথা বলাও তাহার অনধিকার চর্চা তাহা বুঝিল, কিন্তু তবু মনটা তাহার কমলার জন্যই কেমন যেন খারাপ হইয়া গেল।

ইন্দু প্রশ্ন করিল, আপনার এবেলা খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা?

অমল কহিল, খাওয়া? না, যা খাইয়েছেন আপনার শ্বশুরমশাই আর এবেলা কিছু খেতে হবে না—

কিন্তু কথা কহিতে কহিতেই তাহার নজরে পড়িল ইন্দুর মুখের অপরিসীম শুষ্কতা, সে ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ক'টায় বেরিয়েছেন?

আমি? ইন্দু ম্লান হাসিয়া জবাব দিল, সে সেই বেলা এগারোটায়।

ইস্ তাই অত মুখ শুকনো। আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আপনার জন্যে চট্ করে কিছু খাবার নিয়ে আসি—

ইন্দু বাধা দিয়া কহিল, কিচ্ছু দরকার নেই অমলদা, আমি এখনই ফিরে যাব।

কিন্তু ততক্ষণে অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কোঁচার খুঁটটা গায়ে টানিয়া দিয়া পকেট হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিয়া একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। সেখান হইতেই হাঁকিয়া বলিয়া গেল, এক মিনিট, আমি যাব আর আসব।

কিন্তু সদর রাস্তা হইতে খাবার কিনিয়া যেমন সে পুনরায় গলিতে ঢুকিবে মনে হইল পিছন হইতে কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল একটা খোলা ফিটন গাড়ী হইতে সত্যই তাহাকে কে ডাকি-যেন একটু বেশী বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, মাথার চুলগুলি

যেন একটু বেশী বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, মাথায় চুলগুলি

সবই সাদা হইয়া গিয়াছে কিন্তু মুখের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট হয় নাই, তেমনিই প্রসন্ন হাসিমুখ—

অমল তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনিও সস্নেহে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ

করিয়া কহিলেন, তোমার কথাই ভাবছিলুম কদিন ধরে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে দেখা হবে এ আশা আর ছিল না।... তোমার বাসা কোথায়?...খালি গায়ে যখন বেরিয়েছ তখন নিকটেই কোথাও বোধ হয়?

অমল কহিল, হ্যাঁ, এই গলিটার মধ্যেই—

তিনি কহিলেন, তাহলে চল তোমার ওখানে গিয়েই কথাবার্তা কওয়া যাক—

গাড়ী সেইখানেই রাখিয়া তিনি অমলের সহিত তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহারই অদ্বিতীয় বিছানাতে ইন্দুর পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, এখানে তুমি একলাই থাক বুঝি?...কী করছ এখন?

অমল প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করিতেছিল যে, বিভাষবাবু হয়ত দিল্লীর কথা তুলিবেন। কিন্তু তিনি খুব সম্ভব ইচ্ছা-পূর্বকই সে প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেলেন। অমল খুশী হইয়া কহিল, অনেক দুঃখে একটা চাকরী পেয়েছি মার্চেণ্ট অফিসে টাকা ত্রিশেক পাচ্ছি!

বিভাষবাবু হাসিয়া কহিলেন, তাহলে ত তুমি বড়লোক হে!...কিন্তু ছেলেটিকে চিনতে পারছি না ত!

অমল তাড়াতাড়ি ইন্দুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিভাষবাবু তাহার কাহিনীও প্রায় সবটা বাহির করিয়া লইলেন। এমনিই তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠ যে কিছু গোপন করিতে ইচ্ছাই হয় না, তা ছাড়া তিনি শোনেন যতটা অনুমান করিয়া লন তাহার চেয়ে অনেক বেশী—গোপন রাখা চলেও না।

সবটা শুনিবার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিভাষবাবু কহিলেন, সাহেব-সুবোর সঙ্গে আমার ঢের আলাপ আছে, তবে সাধারণত আমি কারুর চাকরীর কথা বলি না। কারণ একই লোকের কাছে অনেক রকম অনুগ্রহ চাইতে নেই, তাতে লোকে বিরক্ত হয়। কাজেই ওদিক দিয়ে কোন উপকার করতে পারব না। তবে ছোটখাট একটি 'অফার' হয়ত দিতে পারি—

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি থামিলেন। অমল আর ইন্দু নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আর একটু তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া বসিল। একটু পরে বিভাষবাবু প্রশ্ন করিলেন, বৌ লেখাপড়া কেমন জানে বাবা?

ইন্দু বিস্মিত হইল, একটু লজ্জিতও হইল; অপ্রস্তুত-ভাবে জবাব দিল, সে বিশেষ কিছু নয়।

বাঙলা অক্ষর পরিচয় আছে ত?

ইন্দু কহিল, হ্যাঁ, তা আছে। বাড়িতে কিছু কিছু পড়েছিল, ইংরেজী অক্ষরও চেন। বোধ হয় নামতাও দু-একটা মুখস্থ আছে।

বিভাষবাবু জবাব দিলেন, ওতেই হবে। চেষ্টা করলে আর একটু শিখিয়ে নিতে পারবে ত?

অপ্রতিভভাবে মাথা নীচু করিয়া ইন্দু জবাব দিল, তা পারবে বোধ হয়।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, আমার স্ত্রী ছিলেন ইস্কুলের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি মারা গেছেন, তাতেই বড় অসুবিধায় পড়েছি।

এমন স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি কথাটা বলিলেন, বোধ হইল যেন স্কুলের সাধারণ কেরাণী কেহ মরিয়াছে। অমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, মারা গেছেন? কবে?

এই মাস তিনেক হল। তার সঙ্গে ছেলেটাও। তাতেই ত অসুবিধায় পড়েছি।

মুহূর্ত কয়েক সকলেই চুপ চাপ। অমলই একটু পরে প্রশ্ন করিল, তাহলে কি আপনি ওখানে একলাই আছেন?

সহজ কণ্ঠে বিভাষবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তা বৈ কি!... হিন্দু ছেলেমেয়েরা কেউ ওখানে যেতেও চায় না, তা ছাড়া ছেলে দুইটি বেশ ভাল চাকরী করছে এখানে, ওখানে গিয়ে থাকাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহার পর একবার গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, যাক্ —যা বলছিলুম, ইস্কুলের কথা! এতদিন জনদুই লোকাল মাস্টার দিয়েই কাজ চালাচ্ছিলুম, তাদের গোটাদশেক করে মাত্র মাইনে দিলেই চলে যায়। দুজনেই বৃদ্ধ, কাজের হার, সুতরাং তার বেশী তারা আশাও করে না। কিন্তু এখন এক-জন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর একজন হেড মাস্টার না হলে চলছে না। আমি নিজে রেক্টর হেড মাস্টারের কাজ আমাকে দিয়ে চলছে না। ঐ দুটো অফার তোমাকে দিতে পারি। তুমি যদি হেড মাস্টার হও আর তোমার বৌ লেডী সুপারের কাজ করতে রাজী থাকে ত যেতে পার। বাড়ি অমনি পাবে, একটা ঝি আছে আমার, সে-ই কাজকর্ম সব করে দিতে পারবে। আর ফসল যা আমার বাগানে হয় তা তোমরা খেয়ে ফুরোতে পারবে না। চাল আমার চাষে কিছু হয় তাতেই চলে যাবে। এ ছাড়া যা তোমাদের আমি ম্যাক্সিমাম দিতে পারি তা হচ্ছে কুড়ি টাকা আর পনের টাকা, মোট পঁয়ত্রিশ। অবশ্য তোমাদের দুজনকেই ষাট টাকার রসিদ সই করতে হবে! সাফ কথা বলে দিলুম, এখন তুমি যা ভেবে ঠিক করতে চাও করো—

ইন্দু ঝোঁকের মাথায় একেবারে বিভাষবাবুর হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, নিশ্চয়ই যাবো, পেলে আমি বেঁচে যাই—!

অমলের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল ইন্দুর শ্বশুরের মুখ, তাঁহার সেই অপরিসীম লজ্জা ও বেদনার ছবি!...সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, অত তাড়াতাড়ি করছেন কেন, ভাল করে সব কথা ভেবে দেখুন আগে!

ইন্দু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না অমলদা ভেবে দেখবার আমার আর কিছু নেই! এ অবস্থার থেকে any-thing is better!...তা ছাড়া ইনি যা বলছেন তাতে আমা-দের গোটা পনের টাকা হলেই সব খরচা চলে যাবে। গোটা দশেক টাকাও যদি আমি মাসে মাসে মামাকে পাঠাতে পারি তাহলেও তাঁরা বেঁচে যান। আর দশটা টাকা করে জমাবো।

সামান্য একটু স্নেহ মিশানো বিদ্রূপের সুরে বিভাষবাবু জবাব দিলেন, বাঃ, এই ত দিব্যি হিসেব হয়ে গেল। এ

হিসেবটা অবিশ্যি তুমি মিছে ধরনি কিন্তু টাকা আনা পাইয়ের হিসেবটাই ত সব নয় বাবা! ভাল করে ভেবে দেখো, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করো, আত্মীয়স্বজনকে জানাও, এর মধ্যে মন ঠিক করবার কিছু দরকার নেই। আমি ক্যালকাটা হোটেলে আছি, তিন দিন থাকব। ছাপ্পান্ন নম্বর ঘর, এই তিন দিনের মধ্যে যে কোন দিন সকাল আটটার আগে গেলেই দেখা পাবে। বেশ করে ভেবেচিন্তে জানিও—

ইন্দু কহিল, কিছু ভাববার নাই আমার। আমি যাবই। তাতে যার যা আপত্তি থাকে থাক্—!

অমল কহিল, অন্তত আপনার স্ত্রীর মতটা ত নেওয়া দরকার!

ইন্দু জবাব দিল, তার অমত হবে না।

বিভাষবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমি এখন যাই। ভালো করে ভেবে দেখো, আমি এখন জবাব নেবো না তোমার কাছ থেকে। তবে একটা কথা বলে রাখি, এখন ঝোঁকের মাথায় যাচ্ছো, এরপর শ্বশুরমশাই চাকুরী ঠিক করে ডেকে পাঠালেই যদি সেইদিন চলে এসো ত আমি বড় বিপদে পড়বো। অন্তত কয়েক দিন আগে নোটিশ দিতে হবে—

ম্লান হাসিয়া ইন্দু কহিল, সে আশা সুদূরপরাহত।

দুজনেই বিভাষবাবুর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। অমল গলির মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া প্রায় মরিয়া হইয়াই প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল, কিন্তু ঐ কি ওদের শেষ ভবিষ্যৎ, না আরও কিছু আশা-ভরসা আছে?

বিভাষবাবু সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, গ্যাসের আলোতে মনে হইল যেন দৃষ্টি তাঁহার জ্বলিতেছে। কিছু-ক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, আশা-ভরসা ভিক্ষে করা যায় না, এ জ্ঞান যদি আজও তোমার না হয়ে থাকে তাহলে বৃথাই তুমি পথে পথে ঘুরলে এতদিন অমল! হয় অদৃষ্ট মানো, তাহলে ত কিছুতেই আপত্তি নেই, কারণ যদি ঐ কুঁড়িটাকাতেই ওর জীবন কেটে যায় তাহলে বুঝবে যে এই ওর নিয়তি; আর নৈলে মানো পুরুষকার—তাতেও কোন অবস্থাতেই ভয় নেই। আমি মানি পুরুষকার, আমি মানি আশা-ভরসার পথ নিজেকে সৃষ্টি করে নিতে হয়, ওর রাস্তা বাঁধা নেই!......

তাহার পর ইন্দুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি নিরেট পাষণ্ড, অর্থে আমার বড় মায়া। আমি যে সহজে কিছু দেব তা ভেবো না, তবে যদি আদায় করে নিতে পারো ত অনেক কিছুই পাবে। সে তোমাদের ক্ষমতা--

ইন্দু হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, অদৃষ্টে আমার যা আছে তাই হবে, আমি যাবই।

বিভাষবাবু তখন গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, জবাব দিলেন না। তবে অদ্ভুত এবং অতি ক্ষীণ একটি হাসির রেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল মাত্র। গ্যাসের আলো তাঁহার মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়াছিল; সে মুখের দিকে চাহিলে তাহার প্রসন্ন শান্তভাবে শ্রদ্ধা আসে কিন্তু ঐ অস্ফুট বিদ্রূপময় দুর্জ্ঞেয় হাসির দিকে চাহিলে মনে মনে কেমন ভয়ও করে। অমল একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। গাড়ী তখন চলিতে শুরু করিয়াছে।

[১৮]

পরের মাসে মাহিনা হাতে পাইবার পরই অমল বড়-বাবুকে ধরিয়া দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া দেশে গেল। দেশ, কিন্তু কতকাল পরে! তাহার যেন কেমন লজ্জা বোধ করিতেছিল। চেনা লোকের সহিত দেখা হইলে কত রকম যে প্রশ্ন হইতে থাকিবে তাহার ঠিক নাই। সে সব প্রশ্ন হয়ত প্রশ্ন কর্তাদের স্নেহেরই পরিচায়ক কিন্তু তাহার পক্ষে যেমন অপমানকর তেমনি কষ্টদায়ক। তাহার পর বাবা, তাঁহার সহিত প্রথম চোখা-চোখি হওয়ার কল্পনাতেও সে বার বার ঘামিয়া উঠিতেছিল। অথচ না গেলেও নয়।—বহুদিন আগে কোন্ এক ইংরেজী উপন্যাসে এমনিই এক 'প্রডিগালের' গৃহ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী পড়িয়াছিল, সেই কথাটাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল।

দুশ্চিন্তা তাহার যতই থাক স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছিল তখন নামিয়া পড়িতেই হইল। ইহার পরও প্রায় দুই মাইল পথ তাহাকে হাঁটিতে হইবে এবং গ্রামের মধ্য দিয়াই। গাড়ী যে না পাওয়া যায় তা নয়, কিন্তু তাহাতে আরও সকলের তাকাইয়া দেখিবার সম্ভাবনা, এ বরং মাঠের পথ ধরিলে হয়ত বেশী লোকের সহিত দেখা হইবে না। সে কোন মতে গোবিন্দর চায়ের দোকান এবং নিবারণের খাবারের দোকান পাশ কাটাইয়া মাঠের পথই ধরিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে বাবার জন্য খানিকটা ফৌজদারী বালাখানার তামাক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—ছেলেবেলায় কে একবার শহর হইতে ঐ বস্তুটি আনিয়া দিয়া-ছিল, সেই সময়কার তাঁহার সেই আনন্দের চেহারাটি সে আজও ভোলে নাই—আর ছিল ছোট ভাই বোনদের জন্য লেবু ও সন্দেশ। জিনিসগুলি একটি ছোট পুঁটলি বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়াছিল, নিজের খান দুই কাপড় জামা ও একটা খবরের কাগজে জড়ানো অবস্থায় সেই পুঁটলির মধ্যেই পোরা ছিল, সুতরাং মালপত্রে বিশেষ কোন বালাই ছিল না। মালপত্র বেশী থাকিলেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর তা ছাড়া কীই বা আছে তাহার?

বাড়ির মধ্যে যখন সে ঢুকিল তখন তাহার বুক গুরু গুরু করিতেছে, এ ভয় নয়, কিংবা দুঃখও নয়—এ যেন কী একটা স্নায়বিক দুর্বলতা, যাহার বর্ণনা দেওয়া চলে না। বাড়ি তাহাদের এমনিই যথেষ্ট পুরাতন, এই কয় বৎসরে যেন আরও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চতুর্দিকেই শ্রীহীনতার চিহ্ন, তাহার মা যে আর নাই সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। তিনি যখন ছিলেন যতই তাঁহার শরীর খারাপ হউক, সমস্ত বাড়িটা পরিষ্কার করা একদিনও বাদ যায় নাই।

একেবারে কোলের ভাইটি উঠানে খেলা করিতেছিল, সে তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, সহসা একটা অপরিচিত লোককে ভিতরের উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া

গেল। বাবাও জুতার আওয়াজ পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কে?

অমলের কণ্ঠ দিয়া কোন উত্তরই বাহির হইল না, সে শুধু কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি চশমার মধ্য দিয়া বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তবুও চিনিতে পারিলেন না। অমল বুঝিল যে তিনি চশমা সত্ত্বেও আর ভাল দেখিতে পান না, তখন সে কোন মতে গলা ঝাড়িয়া ডাকিল, বাবা!

অকস্মাৎ ভদ্রলোক তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে কান্নার মধ্যে কোন তিরস্কারের ভাষা ছিল না, শুধুই বুক ফাটা কান্না! এতদিনের বেদনা ও অভিমান সমস্ত বাধা ভাঙ্গিয়া যেন একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। অমল সান্ত্বনার কোন ভাষাই খুঁজিয়া পাইল না, অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হরনাথবাবুই প্রকৃতিস্থ হইলেন, অমলের মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর বার বার বলিতে লাগিলেন, তোর দেহে আর কিছু নেই খোকা, কলকাতায় বোধ হয় ভাল ক'রে তোর খাওয়াই হয় না!

বাহিরের পৃথিবী তাহাকে যত অপমান, নৈরাশ্য আর দুঃখের আঘাতে জর্জরিত করিয়াছিল, তাহার সব গ্লানিই যেন ঘুচিয়া গেল। একটি তিরস্কার নাই, একটি অভিমানের ভাষা নাই, শুধুই স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসা! এই বস্তুটিরই লোভে বোধ হয় সমস্ত বাঙালী জাতি গৃহগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে তাহার কোথাও স্থান নাই।

ছোট ভাই বোনরা ছুটিয়া আসিল। সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল বলিয়া সকলেই বাড়ির কাছাকাছি ছিল। সেজ ভাইটি তাহাকে সহজেই চিনিল, সে এবং বোন শান্তি আসিয়া প্রণাম করিল। কিন্তু অমল প্রথমটা কিছুতেই তাহাদের কাছে সহজ হইতে পারিল না, কী একটা অপরাধের দুর্নিবার লজ্জা যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিল। অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর লেখাপড়ার কথা তুলিতে তবু কথাবার্তার ধারা কতকটা স্বচ্ছন্দ হইয়া আসিল। দেখিল লেখাপড়া হইতে শুরু করিয়া তাহাদের খাওয়া-পরা সব বিষয়েই একটা শৈথিল্য আসিয়াছে, মাথার উপর নজর রাখিবার কোন লোক না থাকিলে যাহা হয়। মেজ ভাইটি দুপুরবেলা দোকান হইতে ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। তাহার মুখে বিড়ির গন্ধ, এই কয়দিনেই সে যেন দোকানদারদের দলে মিশিয়া গিয়াছে। অমল প্রাণপণে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া লইল। ইহার জন্য দায়ী সে-ই। সে নিজের জীবনেও বড় কিছু করিতে পারিল না, অথচ মাঝখান হইতে দিল ইহাদের জীবনগুলি নষ্ট করিয়া। তখন হইতে যদি সে বাড়িতে থাকিয়া চাকরী করিত তাহা হইলে হয়ত ইহাদের লেখাপড়াটা হইত। সুগভীর আত্মগ্লানিতে তাহার বুকের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রে আহারাদির পর সে বাবার কাছেই শুইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা আলোচনা হইবার পর হরনাথবাবু একসময় বলিলেন, তাহ'লে এইবার তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি খোকা! আর দেরী ক'রে লাভ নেই।

অমল চমকিয়া উঠিল। কহিল, বিয়ে? সে কি! ক'টাকা মাইনে পাই বাবা, তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন?

হরনাথবাবু যে ম্লান হইয়া গেলেন তাহা অন্ধকারের মধ্যেই অমল অনুভব করিল। খানিকটা পরে তিনি কহিলেন, তা বটে, তবে এখানে আমাদের খরচা ত কম। তুই যা পারিস আর তার সঙ্গে শঙ্করের টাকা ক'টা পেলে একরকম ক'রে কুলিয়েই যাবে। গেরস্ত ঘরের মেয়ে আনলে কত আর খরচা বাড়বে, পেটে এক মুঠো খাবে বৈ ত আর নয়। অথচ এদিকেও আর ঘর দোরের দিকে চাওয়া যায় না। একটা লোক না হ'লে কি চলে?

কথা কয়টি যে খুবই সত্য তাহা এই দুই বেলাতেই অমল অনুভব করিয়াছে। হরনাথবাবু চোখে ভাল দেখেন না, কিন্তু তবু তাঁহাকেই রান্না করিতে হয়। শান্তি যোগাড় দেয় মাত্র, উনানের কাছে যাইবার মত বয়স তাহার হয় নাই। লোক একটা চাই। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সে বাপ-মাকে ঢের কষ্ট দিয়াছে; মা ত চলিয়াই গেছেন, বাপও মৃতপ্রায় অথচ—সে ভবিষ্যৎ ত এই! মিছামিছি সকলকে আর বেশী কষ্ট দিয়া লাভ কি? যাহা হইবার হউক, সে আর কাহারও ইচ্ছায় বাধা দিবে না।

খুব মৃদুস্বরে সে বলিয়া ফেলিল, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন!

তখন ভরসা পাইয়া হরনাথবাবু আসল কথাটা বলিয়াই ফেলিলেন, মেয়ে তিনি ইতিমধ্যেই দেখিয়া রাখিয়াছেন। এই গাঁয়েরই মেয়ে, বেশ সুন্দরী এবং সেয়ানা। একেবারে আসিয়াই গৃহিণী হইতে পারিবে। অবশ্য অমল দেখিয়া পছন্দ না করিলে পাকা কথা দেওয়া যাইবে না তাহা তিনি বলিয়াই রাখিয়াছেন, তবে তাঁহার মনে হয় অমলের অপছন্দ হইবে না।.........

আরও অনেক কথাই তিনি বলিয়া চলিলেন, কিন্তু অমলের কানে আর তাহার সবগুলি পৌঁছিল না। বিবাহের কথা মনে হইতেই তাহার মন চলিয়া গিয়াছিল ইন্দুর বিবাহের দিনটিতে। বন্ধু-বান্ধবের বিবাহে সে বিশেষ আর যোগ দিবার সুযোগ পায় নাই, ইন্দুর বিবাহই বোধ হয় একমাত্র।......এ মেয়েটি কেমন দেখিতে হইবে কে জানে, কমলার মত কি আর হইবে! কমলাকে অবশ্য সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু তবুও নিজের মনের মধ্যে বধূরূপে কল্পনা করিতে গেলে আগেই সেই চন্দনলিপ্ত সুকুমার শ্যামল মুখখানিই মনে পড়ে, আর সেই স্বেদসিক্ত, কম্পিত হাত।......তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সে আর কোন মেয়ের সহিত ওভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই—কিংবা, আর কিছু, কে জানে।

(ক্রমশ)

চিকাগোর পথে

[ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি]

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস
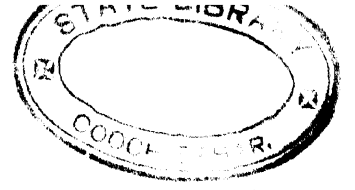
রাত্রি তখন পাঁচটা, Y. M. C. A.র দরজা তখনও খোলাই ছিল। মিঃ ঘোষ এবং হরিদাস আমাকে Y. M. C. A.র একটি রুম ভাড়া করে তাতে থাকবার সকল ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন; বলে গেলেন, বিকালে তিনটার আগে তাঁরা আর আসবেন না। ঘরটা ১৩ তলায়। তের সংখ্যা আমেরিকাতে unlucky সংখ্যা বলে সকলেই এটিকে এড়িয়ে চলতে চায়। আমার কাছে তের নম্বরের কোনও মাহাত্ম্য নেই; তাই বিনা দ্বিধায় ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রেখে ভাবলাম একটু স্নান ক'রে প্রাতঃকালীন আহারটা সেরে নিয়ে সকাল বেলার খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্।

স্নানের বেশ ভাল বন্দোবস্তই আছে। স্নানাগারের দিকে যাবার সময় একদল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এদের ভাবগতি দেখে মনে হলো, আমার Y. M. C. A.তে থাকাটা যেন মস্ত অপরাধ হয়ে গেছে। কোন রকমে চোখ বুজে স্নান ক'রে চলে এলাম। পরে রেস্তোঁরায় গিয়ে বসেই গরম গরম কেক্ আর এক পট কফির অর্ডার দিলাম। কিন্তু কিছুই যেন আসতে চায় না। অগত্যা বয়কে ডেকে বললাম, "আমাকে নিগ্রো ভাববেন না, আমি একজন হিন্দু, আপনার জাত যাবে না।" লোকটি অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে কি ভাবল, তারপর খাবার এনে দিল।

আহারের পর তিনখানা সংবাদপত্র কিনে Y. M. C. A.তে ফেরবার মুখে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। পাশ কাটিয়ে পথ ধরে চলেছি, হঠাৎ যেন মনে হোলো লোকটি আমার পিছন নিয়েছে। তাড়াতাড়ি লিফ্‌টের কাছে এসে উপরে চলে গেলাম, লোকটিও সঙ্গে ছিল। লিফ্‌টে সে একটা কথাও আমার সঙ্গে বলল না। ঘরের কাছে গিয়ে লোকটি বললে, "এই ঘরের নম্বরটা অপয়া, তাই এ ঘরে কেউ একা থাকতে সাহস করে না।" তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। ভিতর থেকে কান পেতে শুনতে পেলাম লোকটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেল। আমেরিকার পুঁজিবাদীদের উস্কানীতে অনেক দেশের কুৎসা রটিয়ে অনেক বই রচিত হয়েছে, তার পরিচয় আমরা জানি; কিন্তু Y. M. C. A.তে এসে দুশ্চরিত্র লোকদের দুর্নীতির যে চরম দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের দেশের লোক বোধ হয় তা ধারণাই করতে পারবে না।

বেলা বেজেছে একটা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই ঠিক করলাম স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে দাঁড়িয়ে বেদান্ত দর্শনের কথা বলে আমেরিকার নরনারীকে মুগ্ধ বিমোহিত করেছিলেন সেই স্থানটি দেখতে হবে। Y. M. C. A.এর প্রচার বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সেই স্থানটির সন্ধান চাইলাম। সেক্রেটারী যেন আকাশ হতে পড়লেন। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, "এটা কি ঐতিহাসিক গৃহ?"

"সে সংবাদ ত আমি রাখি নি। ভারতের এতবড় একজন দার্শনিক, যার নাম পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে সদাসর্বদা উচ্চারিত হয়, সেই বিবেকানন্দের কোন খোঁজ খবর আপনারা রাখেন না, সেটা সত্যই দুঃখের বিষয়।"

"আজকাল কজন খৃস্টান যিশু খৃস্টের নাম নেয়, সে সংবাদ রাখেন কি?"

"আর কেউ না নিক্ অন্তত আপনারা নিচ্ছেন, এটুকু বিশ্বাস করি।"

"হাঁ, মুসোলিনী, হিটলার, স্ট্যালিন এখন হয়েছেন অবতার, অতএব যিশুর নাম হয়ত আমাদের ভুলতেই হবে।"

কথা না বাড়িয়ে ফিরে চলে এলাম নিজের ঘরে। স্নান ক'রে ভাল করে পোষাক পরে খেতে বার হলাম। উপযাচক হয়ে দু'একজনের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম এবং খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। আমার কথা যেন কেউ শুনতে চায় না। সবাই যেন হিটলার আর মুসোলিনীর খবরের জন্যে উদ্গ্রীব, এ ছাড়া আর তাদের অন্য চিন্তা নেই। ধর্মকথা শুনবার এবং শোনাবার কারো প্রবৃত্তি নেই। সুতরাং তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে পথের মানুষ পথেই বেরিয়ে পড়লাম। চলেছি শ্বেতকায়দের পাড়া দিয়ে। আমার মত কালো লোককে নির্ভীকভাবে বেড়াতে দেখে, অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচদের মত মুখভঙ্গি করতে লাগল। তাদের মনের ও মুখের এরকম পরিবর্তন দেখে বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিলাম। 48th Street-এর মোড়ে যাবার পর অনেকগুলি নিগ্রোকে দেখে মনের অবস্থা অনেকটা সুস্থ হলো। এখান থেকেই নিগ্রোদের পাড়া সুরু হয়েছে।

কাছেই একখানা সংবাদপত্রের স্টল। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে সংবাদপত্র বিক্রী করছে। সে উচ্চৈঃস্বরে বলছে, Democracy is in Danger. সে দিনের সংবাদ বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। তাই ছেলেটির কাছে গিয়ে বললাম, "I say pup, why not you shout European Democracy is in Danger." ছেলেটি কিছুই বুঝল না। দোকানী এসে জিজ্ঞাসা করল আমি কি বলেছি। তাকে বললাম ডিমক্রেসীর ব্যাপক অর্থ, অতএব কথাটাকে ছোট করে বলাই ভাল। কারণ, Brown and Black have nothing to do with democracy. পোল এবং জার্মান লড়াই করছে, তাতে আমাদের কি? নিগ্রোরা সাদা পাড়ায় হাঁটতে পারে না, সাদা হোটেলে থাকতে পারে না, অতএব পোল অথবা জার্মান জাহান্নমে গেলে নিগ্রোর কিছু আসে যায় না।" দোকানী আমার কথা শুনে একটু ভাবল, তারপর বলল "আপনি সত্য কথাই বলছেন, নিগ্রো নিগ্রোই থাকবে।"

আমেরিকাতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে "Italians are builder, Irish are ruler and Jews are owner.

দোকানী জাতে জু, বিনয়ী, ব্যবসায়ী এবং স্বল্পভাষী। কিন্তু সে নূতন ধরণের ইহুদী। লুথেনিয়া হতে এসে আমেরিকাতে বসবাস আরম্ভ করেছে। লুথেনিয়ার ইহুদীরা সব সময়েই সোভিয়েট নিয়ম পছন্দ করে আসছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, যদি তাদের দেশ জার্মানরা দখল করে বসে তবে তাদের অবস্থা ভাল না হয়ে খারাপই হবে। এদিকে লুথেনিয়া যদি রাশিয়ার সঙ্গে মিলে যায় তবে মাতৃভূমি ছেড়ে তাদের পরের দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হবে না এবং ভবিষ্যতের আর্থিক দুরবস্থা এবং বর্তমানের সামাজিক দুর্গতির কথা ভাবতে হবে না। সে জন্যই দোকানী আমাকে কোন রকম বাধা না দিয়ে আমার কথায় সায় দিয়েছিল। আমি যে হিন্দু সে কথা তার কাছে না ব'লে, তাকে আমার কথার সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় সে একখানা মস্কো নিউজ আমার হাতে দিয়ে বললে, "যদি ডিমক্রেসী জানতে হয় তবে এই পত্রিকাখানি পড়ুন, দাম একটি নিকেল মাত্র।" এক নিকেল দিয়ে মস্কো নিউজ কিনে পার্কে গিয়ে তাই পাঠ করতে লাগলাম।

আমেরিকাতে ডিমক্রেসীর প্রবল প্রতাপ। ডিমক্রেট পার্টির প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট। বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা সে দেশে আছে, সংবাদপত্র পাঠ করতে কোন বাধা নেই। আমি জানতাম না পার্কে বসে মস্কো নিউজ পাঠ করতে গেলেই গুপ্ত পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। মন দিয়ে সাপ্তাহিক পত্রটা পাঠ করছিলাম, আর ভাবছিলাম ভাষাটা বেশ সুন্দর অথচ তাতে ভাবপ্রবণতা মোটেই নেই, তারপর যিনি Editor in Chief তিনি হলেন মসিয়ে বারদিন্। তার কত বদনাম চীন দেশে, তিনি কি করে এ হেন সংবাদপত্রের পরিচালনা করছেন? কাছেই একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। তার ফিটফাট সাজগোজ, চেহারার জৌলুস, বসবার কায়দা, এসব দেখেই মনে হয়েছিল, তিনি একজন বড় লোক। আমার কাগজ পড়ার ভঙ্গি দেখেই বোধ হয় কাছে আগিয়ে এসে মস্কো নিউজের বাইরের পাতাটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে একেবারে সটান, কাছে এসে বললেন, "বেয়াদবী ক্ষমা করবেন, কাগজটা একটু দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

"এটা কোথাকার সংবাদপত্র?"

"আপনাদের দেশেরই, তবে এসেছে রাশিয়া হতে।"

"আপনার দেশ কোথায়?"

"হিন্দুস্থানে।"

"এসব সংবাদপত্র আপনাদের দেশে যায় না?"

"জানি না।"

"এখানে কবে এসেছেন?"

"গত রাত্রে।"

"কোথায় থাকেন?"

"Y.M.C.A।"

"Y.M.C.A-এর ঘরের চাবি আপনার কাছে আছে?"

"আছে বৈকি।"

"দেখাতে পারেন?"

"দেখাবো না।"

"তবে দুঃখিত আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।"

"তাই হোক্, চলুন কোথায় যাবেন; আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

ভদ্রলোক একখানা ব্যাজ দেখালেন, বুঝলাম তিনি গোয়েন্দা। পকেটে ছোট একটা পিস্তলও রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খবরের কাগজ পড়ার অপরাধেই গ্রেপ্তার, তার মানে।"

"তা নয়, আপনার হাতে মস্কো নিউজ।"

"কোথায় আমার হাতে? এযে আপনারই হাতে দেখছি। চলুন কোথায় যাবেন।"

গোয়েন্দা একটু হেসে বললেন, "হাঁ আমারই হাতে, তবে এ পার্কে বসে এসব সাহিত্য পাঠের স্বাধীনতা যে নেই, সে কথা বোধ হয় আপনি জানতেন না, এখন জানিয়ে দিলাম, সুতরাং এইটাকে পকেটে পুরুন।" গোয়েন্দা পার্কের বাইরে এসে, আমায় বললেন, "গুডবাই"। আমি বললাম "একেই বলে আপনাদের দেশের ডিমক্রেসী।"

আমেরিকায় দুটি দলে আছে—রিপাবলিকান আর ডিমক্র্যাট্। এই দুই দলের কথা বহু আগেই জানতাম কিন্তু চিকাগোতে গিয়ে বুঝলাম এ দুটি দল ছাড়া তৃতীয় দল গড়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব। তৃতীয় দল গঠনের চেষ্টা যে করছে তাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। তারপর তৃতীয় দল গঠনের জন্য জেলে যাবার সম্ভাবনাও আছে। মিঃ ডাইস্ যে কমিটির চেয়ারম্যান সেই কমিটির উদ্দেশ্যই হলো মজুরদের দমন করা। যাতে আমেরিকায় মজুরেরা ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে, যাতে কমিউনিস্ট পার্টি লোপ পায় তার সকল ব্যবস্থা সেখানে আছে। ট্রট্স্কির সেই কমিটির প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর দেবার কথা ছিল এবং কেন তা দেন নি সে সম্বন্ধে তিনি দুখানা বই লিখেছিলেন। কি করে আমেরিকায় পঞ্চমবাহিনী গড়ে উঠছে, একটি বইয়ে তিনি সে কথা লিখেছিলেন। আমার আমেরিকা থাকার সময়ই বুঝেছিলাম এই বইখানা হবে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি দমনের প্রথম নম্বর অস্ত্র। সে বই তাঁর জীবিতাবস্থায় আমেরিকার সরকারকে দিতে পেরেছিলেন কি না তা জানি না। তবে তিনি যে মৌখিক কোন সাক্ষ্য দিবেন না, ডাইস কমিটিতে—সে কথা ফ্রিস্কো টাইম লিখেছিলেন।

কথা হলো, যদি ভোট দিতে হয় ত এই দুই দল ছাড়া আর কোন দলকে ভোট দেবার উপায় নেই। সে জন্য চিকাগোর লোক বলে 'Either you vote for a donkey or for a cow, there is no third. Donkey বলতে সাধারণত রিপাবলিকানকেই বোঝায়। কারণ, রিপাবলিকানরা Social Security এবং old age pension-এর পক্ষপাতী নয়, সে জন্যই ডিমক্রেট পার্টিকে গাভির সঙ্গে তুলনা করা

হয়েছে। যে পর্যন্ত তৃতীয় দল গড়ে না ওঠে সে পর্যন্ত ডিমক্রেটিক দল ক্রমাগতই ভোট পাবে।

গোয়েন্দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, দোকানীর কাছে এসে গোয়েন্দার কথা বল্‌লাম। দোকানী বল্‌ল সে জন্যই দেখ্‌ছেন না, কাগজটা একরকম চুরি করেই বিক্রী করেছি। এদিকে লিথোনিয়ার যত স্টল আছে, তাতেই মস্কো নিউজ পাবেন, আমেরিকানরা এসবের ধার ধারে না। এদের রাতারাতি কোটিপতি হবার যে রকম হুজুগ তেমন আর কারো নেই, সে জন্যই এরা এত বিপদে পড়েছে।"

"বিপদ বলে ত কিছুই দেখ্‌ছি না?"

"পূর্বে এরা কথায় কথায়, মিলিয়ন ডলারের কথা বল্‌ত, এখন এক "গ্রাণ্ট" (একশত) ডলারকেই বড় মনে করে। এই শহরেই দেখ্‌বেন নিকেল, ডায়েম (পাঁচ সেণ্ট দশ সেণ্ট) নিয়েও লোকে সুখী হয়। এখন আর পূর্বের আমেরিকা নেই। সোনার খনি উজাড় হয়েছে, পেট্রলের মাইন ধনীদের হাতে চলে গেছে, রিয়েল এস্টেট অনেক হয়েছে, মজুরী কমছে, অথচ খরচ পূর্বের মতই রয়েছে। বেকার সমস্যাও কম নয়, কাজ পেলেই লোক যেন বাঁচল।" ঘড়িতে চেয়ে দেখি তিনটা বাজতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। বাসে করে Y.M.C.A-তে এসে দেখলাম, মিঃ মোহিত তখনও আসেন নি। রিডিং রূমে মস্কো নিউজটা ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পর একজন পাঠক মস্কো নিউজটা হাতে নিয়েই ধপ করে তা টেবিলে ফেলে দিলেন, যেন সাপের গায়ে হাত দিয়েছেন। ভাবলাম এ হেন পদার্থ এখানে আনা উচিৎ হয় নি। তৎক্ষণাৎ মস্কো নিউজটা নিজের হাতে নিয়ে পাঠ করতে লাগ্‌লাম। যে ভদ্রলোক সাপ্তাহিকের নামটা দেখেই আঁৎকে উঠেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

"এটা কি আপনার?"

"হাঁ"

"আপনি কি কমিউনিস্ট মত পোষণ করেন?"

"এখনও ঠিক করি নি।"

"এ সব কাগজ পাঠ করবেন না, ভগবানে ভক্তি থাকে না।"

"আমাদের দেশে চার্বাক বলে একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি ভগবান বলে কিছু মানতেন না।"

"সেরূপ দার্শনিকের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, রাশিয়ানরা ডিমক্রেট নয়, তারা ডিক্টেটরের নির্দেশে চলে।"

"আপনারা?"

"আমাদের দেশে ডিমক্রেসী পূর্ণমাত্রায় আছে।"

"সেজন্যই নিগ্রোরা পথে বের হলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, বুভুক্ষুর দল ইমপেরিয়েল ভেলীতে মরেছে। ডিমক্রেসী বলতে আপনি কি তাই বোঝেন?"

Y.M.C.A-এর বৈঠকখানায় পাঁচশো লোক বসে আরাম করে কথা বল্‌তে পারে। আমাদের কথার সময় অন্ততঃপক্ষে শতাধিক লোক ছিল। তারা সবাই আমারই কথা শুনবার জন্য কাছে এসে পড়ল। নানা জনে নানা প্রশ্ন তুললেন, তার যথাযথ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম। ঘণ্টা নিমিষের মত কেটে যেতে লাগল। মিঃ মোহিত ঘোষ এসে দেখলেন আমি বেশ আলাপ জমিয়ে তুলেছি। যা হোক, তার সঙ্গে বাইরে আস্‌তে হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

"এরা আপনার কথা বুঝতে পারে?"

"পারে বলেই ত মনে হয়।"

"এতদিন আমেরিকায় থেকেও আমরা আমেরিকানদের সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ পাইনি।"

নিউইয়র্ক, লণ্ডন এবং অন্যান্য স্থানে দেখেছি, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক সাদা লোকের সঙ্গে মিশবার সাহস রাখেন না, অথচ আমাদের দেশের যারা খালাসী, তারা ইউ-রোপীয়ানদের সঙ্গে একবার মিশতে পারলে তাদের মতই ভাবে এবং সমানে সমান ব্যবহারও পেয়ে থাকে।

দুবৎসর আগে আমাদের দেশের কতকগুলি খালাসী ডারবান গিয়েছিল। তারা চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে যখন দেখ্‌ল যে, তাদের চা দেওয়া হচ্ছে না, তখনই তারা চায়ের দোকান ভাঙ্গতে লাগ্‌ল, দোকানীকে প্রহার দিল এবং অনেক টাকার লোকসান করল। বিচারে তাদের কোন শাস্তি হলো না, কারণ তারা বুঝিয়ে দিল যে, তাদের অপমান করা হয়েছে। তখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাতে রেস্তোরাঁতে লিখা থাকে only for Europeans.
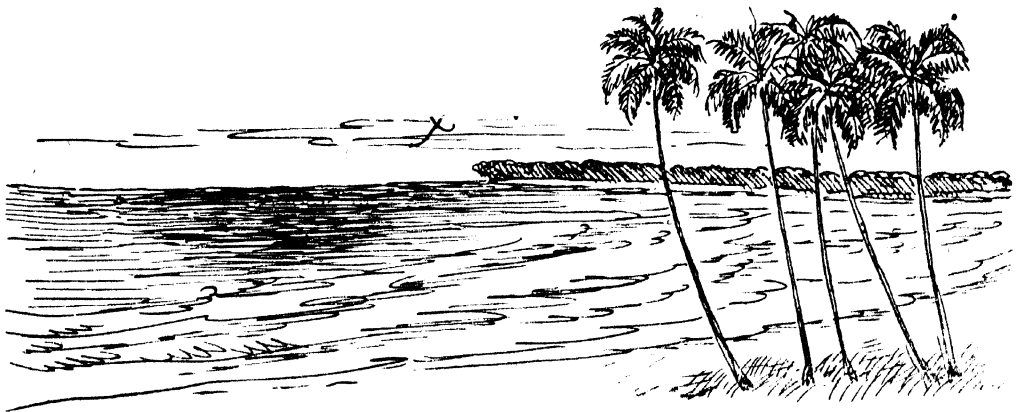
জলপ্লাবনের ইতিকথা

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

জল, জল, জল—সে জলের শেষ নেই।

দিগন্তের কোলে গিয়ে মিশেছে অনন্তবারিধি। পথ নেই, পন্থা নেই—আছে শুধু প্লাবন ধারার বিস্তৃতি। লোকজন যা যাতায়াত করে তা ঐ জলময় প্রান্তরের ওপর দিয়েই। ছপ্‌ছপ্‌ করে লগির চাড় দিয়ে নৌকা ঠেলে চলে মাঝির দল। যাত্রীরা বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে দেখে প্লাবনের ক্ষুধা। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সবাই বলাবলি করেঃ এমন বাঁধও ভাঙ্‌ল?

বাস্তবিক নদীর বাঁধ ভাঙবার নয়। বছরের পর বছর কেটে গেছে, বাঁধের বিরাট দেহ দুর্ভেদ্য পাহাড়ের মত সগৌরবে মাথা উঁচু করে টিঁকে থেকেছে। গ্রাম-গ্রামান্তরে যাতায়াত করতে গেলে বড়গোছের রাস্তার অভাব পাড়াগাঁয়ে ভয়ানক কিন্তু বাঁধ হওয়া অবধি এদিককার লোককে সে অভাব আর কখনও বোধ করতে হয়নি। দিনের পর দিন মানুষ চলাচলি করেছে বাঁধের ওপর দিয়ে—ডেলি প্যাসেঞ্জার আর ব্যবসায়ীমহল, ছাত্র আর কৃষক, কত বরবধূ আর বালক-বালিকার দল। বাঁধের কথা যারা জানে, আজ তাদের কেউ বেঁচে আছে, কেউ নেই। যারা বেঁচে আছে তাদের মনে ভেসে উঠ্‌ছে কত পুরাতন এই বাঁধের ইতিহাস।

বুড়ো নফর দাস তার নাতনীকে সপুত্র নিয়ে যাচ্ছিল নাত-জামাইয়ের বাড়ি। গোটা একটা নৌকা তার পক্ষে ভাড়া করা সম্ভব হয়নি বলে সে অন্যান্য যাত্রীর মধ্যে নাতনীকে নিয়ে বসেছে। নাতনীর কোলে আছে তার খোকা। খেয়া চল্‌ছে সোজাসুজি লক্ষ্মণপুর থেকে রামনগর অবধি।

যাত্রীদের মুখে বাঁধের কথা উঠ্‌তেই নফর বলে উঠ্‌লঃ এ বাঁধ বাবু ভাঙবার নয়। কেউ ভেঙে দেছে বলেই বিবেচনা হয়।

যাত্রীদের মধ্যে লক্ষ্মণপুরের জমিদারবাবুদের নায়েব শশধর চক্রবর্তী ছিল। সে বল্‌লেঃ তার মানে?

মানে আছে গো বাবুঃ বুড়ো নফর তার শোণনুড়ির মত পাকা মাথাটা নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেঃ আপনি যাদের কাজ করছেন তেনাদেরই বড়তরফের ছোটবাবু অর্থাৎ বাবুর বাবা ভয়ানক ধাম্মিক মানুষ ছ্যালো গো—তিনিই অনেক কাণ্ড করে এ বাঁধ দেছালেন। তা নাহলে কি বাঁধ দিতে পারতো কেউ?

অনেক কাণ্ড করে কি রকমঃ উৎসুক যাত্রীদল প্রশ্ন করে বস্‌ল।

নফরের কথার মধ্যে ছিল রহস্যের আভাষ। সকলে কান খাড়া করে তার দিকে তাকালো। আমিও ছিলাম ঐ নৌকার যাত্রী—বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে তখন ঐ অঞ্চলেই আমাকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। নফরের কথায় আমারও মনটা সেদিকে আকৃষ্ট হল।

সেদিন যা শুনেছিলাম এবং দেখেছিলাম তা-ই আজ গল্পাকারে লিখ্‌তে বসেছি।

সে আজ অনেকদিনের কথা।

রাক্ষসী নদীর ক্ষুধার অন্ত ছিল না কোনদিন। বর্ষা আরম্ভ হতে না হতেই খরস্রোতা নদী নিজমূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করত। যে শান্ত সহজ নদী শীতের হিমেল হাওয়ায় মানুষের মনে প্রশান্তির তৃপ্তি জাগিয়ে তুল্‌ত সেই নদী বর্ষার সময় যে ভয়ঙ্করী মূর্তিতে চারিদিক গ্রাস করবার জন্য দুরন্ত পিপাসা বুকে নিয়ে ছুটে যেতে পারে একথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। অথচ বছর বছর সেই নদীই চারিদিক ডুবিয়ে, ভাসিয়ে, মানুষের বুকে-বুকে সর্বনাশের কান্না তুলে দুর্বার গতিতে বহে যেত! এতে রামনগর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির যে কি দুর্দশাই হত তা আজ বর্ণনা করা যায় না।

রামনগর ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। অনেকটা বন্দরের মত-ও বটে। এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করে তখনকার দিনে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। দূরে দূরান্তের গ্রাম থেকে লোভাতুর মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল এখানে। এখানকার যানবাহনাদি বল্‌তে তখনকার দিনে স্থলপথে গরুর গাড়ী আর জলপথে ছিল নৌকা। তখন এ অঞ্চলে রেলও ছিল না, আর মোটরলরী বা বাসও ছিল না।

রামনগরের আশেপাশে এখন যেমন ঘনবসতি, গ্রামের পর গ্রামের সারি তখনকার দিনে ঠিক এমনটি ছিল না—দূরে-দূরান্তে এক একটি গ্রাম, মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ, জঙ্গল, ছোট ছোট বিল আর তারই মাঝে এদিক-ওদিকে ক্বচিৎ কদাচিৎ দু'দশঘর লোকের বাস। এইসব পেরিয়ে ক্রোশ তিনেক দূরে লক্ষ্মণপুর গ্রাম। লক্ষ্মণপুরের পর থেকে বরাবর মানুষের ঘনবসতি ছিল। গ্রামের পর গ্রামে ওদিকটা বেশ একরকম জনবহুলই ছিল। কিন্তু রামনগরকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মণপুরের মাঝামাঝি ক্রোশ তিনেক জায়গাটাকে ধরলে যে কিছুই ছিল না তা তখনকার দিনের কথা জানলেই বোঝা যায়। শুধু নদীর তীরে জলপথের সুবিধাটুকু পাওয়ার জন্য রামনগরের বসতিস্বারা বহির্জগতের ব্যবসাবাণিজ্যের সাথে যোগসূত্র বজায় রাখা যেত এবং প্রয়োজনমত আমদানী রপ্তানি চল্‌ত। রামনগর থেকে একটা কাঁচাপথ এ'কে বেঁকে পাক খেতে খেতে গিয়ে মিশেছিল নিভৃত পল্লীঅঞ্চলের পথের সাথে। এই পথটিই ছিল তখনকার দিনের একমাত্র সম্বল।

কিন্তু বর্ষাকালে নদী ভয়ঙ্করী মূর্তিতে গ্রাস করত ঠিক এইখানটাকেই। উন্মত্ত জলস্রোত রামনগরের লোভাতুর ব্যবসায়ীদের আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মানুষের বসতিকে ভাসিয়ে নিয়ে এবং ঝোপজঙ্গল, বিল প্রভৃতি ডুবিয়ে দিয়ে ছুটে যেত একেবারে লক্ষ্মণপুরের সীমানা অবধি। সেসময়ে কাজকর্ম সকল কিছু অচল হয়ে পড়ত। আদিম যুগের মানুষের মত এখানকার মানুষগুলি দেখ্‌ত শুধু জল আর জল।

এইভাবে প্রতিবৎসরই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে রামনগর এবং আশপাশের লোকেরা ঠিক করলে যে এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী গোষ্ঠ শেঠকে মোড়ল করে তারা বড়তরফের ছোটবাবু হরিহর মুখুয্যের কাছে বন্যার প্রতিকার করতে যাবে। যথাসময়ে

তারা গেলও। হরিহর মুখুয্যে তাদের বল্লেঃ বাঁধ বাঁধাতো আর যা-তা কাজ নয় বাপু। তাছাড়া আমার এ জমিদারীর আয়ই বা কত? তোমাদের যদি এখানে না পোষায় ত আমার মনে হয় তোমরা আর কোথাও উঠে যাও—

এখানকার লোকেরা তা শুনলনা। শোনবার কথাও নয়। কারণ এই জায়গায় তারা পয়সার আস্বাদ পেয়েছে। এ আস্বাদ একবার যে পেয়েছে সে কখনো ভুলতে পারে না একে। অনেকটা নররক্তের আস্বাদ পাওয়া আদমখোর বাঘের মত। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে গোষ্ঠ আবদার করে বল্লেঃ সে কি বলছেন—আমরা আপনার সন্তানতুল্য, আপনি যদি আমাদের না দেখেন ত দেখবে কে?

হরিহর মুখুয্যে মনে মনে হাসলে। এ হাসির অর্থ এই যে, সন্তানতুল্য হলেই যেন লোকে দেখে। তা যদি হত তা'হলে হরিহরের বাবা তাকে এমন একটা বাজেরকমের জমিদারী দিয়ে যেতেন না। তাই সে বল্লেঃ আমার দ্বারা ওসব হবেনা বাপু—

গোষ্ঠ শেঠ দলবলসহ মুখুয্যের ওখান থেকে ফিরে এল। তারা ফিরে এল বটে কিন্তু মুখুয্যে পরের দিনই লোক পাঠিয়ে তাদের ডাকিয়ে আনালো। যে-লোক আগের দিনে সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে সেই লোকই হঠাৎ আবার তাদের ডাকিয়ে আনালো কেন, তার পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

.........হরিহর মুখুয্যের পিতা শ্যামসুন্দর মুখুয্যে ছিলেন উত্তরাধিকারীসূত্রে জমিদারীর প্রকৃত মালিক, কিন্তু তার ছোট ভাই চন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে ব্যাপারটা গেল একটু ঘুরে। চন্দ্রনাথের তিন ছেলে। পাছে তারা কিম্বা অন্য লোক বলে যে বাপ মারা গেল বলেই জ্যাঠামশাই তাদের কিছু দিলে না, সেই ভয়ে শ্যামসুন্দরবাবু নিজের দুই ছেলের চেয়ে জমিদারীর ভাল ভাল এবং মোটামুটি অংশগুলি তাদেরই দিলেন। শ্যামসুন্দরের দুই ছেলে—বিশ্বনাথ এবং হরিহর। বিশ্বনাথ ছেলেবেলা থেকেই বখে গিয়েছিল বলে তিনি তাকে এমন জমিদারী দিলেন যে যাতে সে উড়িয়েই দিতে পারে। কিন্তু জমিদার হিসাবে যদি তাঁর উত্তরাধিকারী কারোকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে হয় তবে সে হচ্ছে হরিহর। চন্দ্রনাথের ছেলেদের এবং বিশ্বনাথকে শ্যামসুন্দর যা দিলেন, তার চেয়ে ঢের কম আয়ের জমিদারী দিলেন হরিহরকে।

হরিহর বাবাকে বললেঃ এ জমিদারী নিয়ে আমি কি করব বাবা?

শ্যামসুন্দর বললেনঃ তুমি বুঝছনা হরিহর! ওদের যা দিয়েছি তার আয় আছে বটে কিন্তু ও কলসীর জল—ঢালতে ঢালতে একদিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু তোমাকে যা দিলাম তা ফুরুবেনা কোনদিন। যদি তুমি ঠিকভাবে চালাতে পারো তাহলে দেখবে তোমার জমিদারীতেই সোনা ফলবে।

হরিহর বল্লেঃ সে কেমন করে হয়?

শ্যামসুন্দর বললেনঃ হয় বাবা, হয়। সেকেলে মন্ত্র-তন্ত্রগুলো একটু আধটু পোড়ো। নদীশাসন, কর্ষণ এসব তাতে উল্লেখ করা আছে। সোনা কি আর গাছে ফলে, এতেই ফলবে—

হরিহর বাপের কাছে অভিমান করত, কিন্তু তাঁর অবাধ্য হ'ত না কোনদিন। সে বাপের কথা মেনে নিলে।

গোষ্ঠ শেঠদের হরিহর যেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল সেইদিনই রাতে সে স্বপ্ন দেখলে—শ্যামসুন্দর মুখুয্যে তাকে বলছেনঃ আমি তোমায় বার বার করে বলেছি হরিহর অথচ তুমি শোননি। আজও তোমায় বলছি—তুমি শোনো, তুমি যদি তোমার জমিদারীতে সোনা ফলাতে চাও তবে নদীশাসনের ব্যবস্থা কর, কর্ষণ সুরু কর। তা না হলে তোমাকে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে।

পিতার সেই মরামুখ—বীভৎস, ভয়ংকর; জীবদ্দশার সেই পুরানো কথা বলে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—হরিহর ভয়ে শিউরে উঠল। তাই রাত্রি প্রভাত হতে না হতে সে লোক পাঠালো গোষ্ঠ শেঠদের কাছে।.........

গোষ্ঠ শেঠরা আসতেই হরিহর প্ল্যান তৈরী করতে বসল। প্ল্যানও হল এবং তদনুযায়ী সর্বরকমের ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেল। বনেদী জমিদার। তখনকার দিনে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সাথে আলাপ পরিচয় এঁদের থাকতই। সেচ বিভাগের কর্মচারীদের সাথে পরামর্শ করে কোথায় কি কেমন করে করলে ঠিক হবে, তার ব্যবস্থা করা হল। সকলেই কিছু কিছু টাকা দিলে, সরকার থেকেও কিছু পাওয়া গেল, প্রজারাও কিছু দিলে। কিন্তু খরচের তুলনায় সে টাকা কিছুই নয়। নদীর তীরে কয়েক মাইলব্যাপী বাঁধ দেয়া বড় সোজা কথা নয়। খরচ অনেক। যেটাকা পাওয়া গেল তার অনেকগুণ বেশী টাকাই হরিহরকে দিতে হল।

লোকজন লেগে গেল। মাটী কাটা আর মাটী ফেলা চলল। এক বছর পরে তারপর একদিন বাঁধ বাঁধা শেষ হল। লোকে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দূরদূরান্তর থেকে লোকজন এল এখানে বাস করবার আশায়। তখনকার দিনে যেখানে জীবনধারার প্রবহমান স্রোতধারা মানুষ দেখতে পেত সেখানেই ছুটে যেত, কারণ পুরানো দিনের সকল ব্যবস্থাই তখন নড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আত্মসন্তুষ্ট গ্রামাসমাজের মধ্যে সকলের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা তখন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে বসেছে।

কিন্তু হারে বিধাতা!

মানুষের এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা, হরিহরের পিতৃ আদেশ পালন, গোষ্ঠ শেঠদের আশা ভরসা সবকিছুকে ভেঙে-চুরে দিয়ে পর বৎসর আবার নদীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার অভিব্যক্তি দেখা গেল—রামনগরের উত্তর দিকে বাঁধের একাংশ নদীর উন্মত্তবেগের ধাক্কায় ধ্বসে পড়ল। কপালে হাত দিয়ে বসল সবাই। হরিহর ব্যথিত হল।

সে বছর বাঁধ হওয়ার ফলে রামনগর এবং আশপাশের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। ফসলও ফলেছিল প্রচুর। এককথায় বাঁধের ফলে হরিহরের লাভ বই লোকসান কিছু হয়নি। তাই বাঁধভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই হরিহর নিজে এসে গোষ্ঠ শেঠকে সঙ্গে নিয়ে চারিদিকটা ঘুরে দেখলে। তারপর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বাঁধের ভাঙা অংশটুকু মেরামত করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে।

আশ্চর্য! বাঁধ যথারীতি মেরামত হল কিন্তু আবার তা জলস্রোতের বেগে ভেঙে পড়ল। এত পয়সা খরচ করে বাঁধ তৈরী হল, সে বাঁধ ভেঙে গেল, আবার মেরামত করানো হল, তাও ভেঙে গেল! হরিহর বিস্মিত হল। কিন্তু পিতৃআদেশ নদীশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়াও যেটা বড়—এই নদীশাসনের সঙ্গে তার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ঐশ্বর্য-সম্ভোগটুকু ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে এবং সে প্রত্যক্ষও করেছে যে বাঁধ বেঁধে তার লাভ বই লোকসান হয়নি। আবার সে মরিয়া হয়ে বাঁধ মেরামতের ব্যবস্থা করলে।

একবছর, দুবছর, তিনবছর কেটে গেল বাঁধ আর মেরামত হলনা। ঠিক সেই একই জায়গায় বার বার ভাঙে। সমস্ত বাঁধটা তৈরী করতে একবছরের বেশী সময় লাগলনা অথচ তারই একাংশ মেরামত করতে গিয়ে তিন-তিনটে বছর কেটে গেল! কিন্তু কেন? কেউ বল্‌লে ভগবান বিরূপ, কেউ বল্‌লে হরিহরের কর্মফল।

ওসব কিছু নয়। ব্যাপারটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিল গোষ্ঠ শেঠ। একদিন সকালে সে উড়ুনীটা কাঁধে ফেলে চ'লে গেল মুখুয্যেবাড়ি। হরিহর হতাশ হ'য়ে গিয়েছিল। সে বললেঃ না গোষ্ঠ, আমি আর ওতে নেই। বাবা আমায় কিছুই দেননি তবুও আমি আমার অনেক কিছু ঐ বাঁধের পিছনে খুইয়েছি—আর নয়। এবার তোমরা আমায় ছেড়ে দাও—

গোষ্ঠ করযোড়ে বল্‌লেঃ আজ্ঞে অধীনের নিবেদন—

এই 'নিবেদন' 'নিবেদন' ক'রেই তোমরা আমাকে কাজে নামিয়েছিলে, আজও তাই চাইছো কিন্তু আমি বেশ জানি ও হবার নয়—

আজ্ঞে হ'তে পারেঃ গোষ্ঠ বল্‌লে। হরিহর বললেঃ বল কি?

ঘরে কেউ ছিল না তবু গোষ্ঠ চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে হরিহরের কানের কাছে গিয়ে চুপি চুপি কি বললে। হরিহর চমকে উঠ্‌ল। গোষ্ঠ গলার স্বরটা একটু স্পষ্ট ক'রে পুনরায় বল্‌লেঃ ভরা অমাবস্যার রাতে—

ঃ হবে তাহলে?

ঃ ক্ষুধার্ত দেবীকে সন্তুষ্ট ক'রতে হ'লে এ ছাড়া আর পথ নেই।

হরিহর ভাব্‌লে, হয়ত তাই হবে।

অমাবস্যার রাত্রি এল একদিন।

সাফল্যের আনন্দে হরিহর নিরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে শুধু অট্টহাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল। এ অট্টহাসির মূলে ছিল, এখন যেখানটাকে নবগ্রাম বলা হয় সেইখানকারই এক বিধবা তরুণীর একটিমাত্র সপ্তমবর্ষীয় বালক। ভাঙাবাঁধের একদিকে সদ্য পূজো করা কালীঠাকুরের সামনে ছেলেটিকে বলি দিয়ে দেবীকে দিলে তার মুণ্ড। তারপর সেই উৎসর্গীকৃত নরমুণ্ডের শোণিতধারা ভাঙা-বাঁধের জলস্রোতে ছড়িয়ে দিয়ে, মুণ্ডটা দিলে জলের মধ্যে পুঁতে। জলস্রোত গেল স্তব্ধ হ'য়ে।

* * * * *

মন্থর গতিতে আমাদের নৌকা চলেছে।

নফরের নাতনীর দিকে দৃষ্টি পড়ল। সে তার খোকাকে এমনভাবে বুকে চেপে ধ'রেছে যে, ছেলেটা অসম্ভব চীৎকার ক'রছে। সকলেই সেদিকে তাকালো।

নরমুণ্ডে দিয়ে বাঁধ বাঁধার কাহিনী অনেক পুরাতন এবং অন্ধবিশ্বাসের পরিচায়ক। অথচ এই অন্ধবিশ্বাসের জোরেই শশধরের মনিবের বাবা হরিহর মুখুয্যে একটা সাত বছরের ছেলেকে হত্যা করেছে, একথা ভাবতেও তার মাথা হেঁট হ'য়ে যায়। শশধর তাই চালাকি ক'রে প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা ক'রলে। সে নফরকে বল্‌লেঃ এতে বাঁধভাঙার কি দেখ্‌তে পেলে বাবু?

নফর অতি সহজভাবেই বল্‌লেঃ সেই বিধবা মেয়ে-ছেলেটাই এবার পিরতিশোধ নেছে বাঁধ কাটিয়ে দিয়ে।

এখনও সে বিধবা মেয়েছেলেটা বেঁচে আছেঃ শশধর প্রশ্ন ক'রল। নফর বল্‌লেঃ তা' আর থাকবে না-কতদিনের কথা বাবু?

কথা যতদিনেরই হোক্—ওটা নফরের নিছক কল্পনা কারণ সে বিধবা স্ত্রীলোকটিকে কখনও দেখেনি। তাছাড়া সে জানবেই বা কি ক'রে? কিন্তু আমি জানি, সেই স্ত্রী-লোকটি আমাদের বন্যার্ত সেবাসমিতির আশেপাশে আজও ঘুরে বেড়ায়। বাঁধের জল শুকিয়ে যাবার পর সেই যে প্রায় সত্তর বছর আগে সে তার ছেলের মাথাটা বাঁধের পাশ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গলায় বেঁধে নিরুদ্দিষ্ট হ'য়েছিল, তারপর প্লাবনের সংবাদ পেয়ে এতদিন পরে সে এখানে এসেছে। সে দেখ্‌তে চায় বন্যার ফলে মরণের তাণ্ডব নৃত্য! আজও তার গলায় ছেলের সেই মাথার কঙ্কালটা দড়ি দিয়ে ঝুলানো। আজও সে অতীতের সেই ঘটনা ভুল্‌তে পারে নি। অতীতের বয়সের সঙ্গে আজ তার কোন মিল নেই, দেখ্‌লে কেউ চিন্‌তে পারবে না—মহাকাল একে একে সত্তরটি বছর যোগ ক'রে দিয়েছে তার জীবনে। মাথার চুলে লেগেছে জট, গায়ের চামড়া পড়েছে শিথিল হ'য়ে, অতীতের যৌবনময় স্বচ্ছতায় জড়িয়ে গেছে পৃথিবীর যত কালি। পরনে তার কাপড় নেই, একটুক্‌রো চট্ জড়িয়ে সে থাকে। চোখগুলো তার জ্বলে। প্রেতিনীর মত আমাদের বন্যার্ত সেবা সমিতির ঘরটার আশে পাশে আরও বহু নরমুণ্ড একত্র ক'রে সে গেণ্ডুয়া খেলে। বাঁধ সে ভাঙেনি, কে ভেঙেছে তা-ও সে জানে না। বুড়ীকে আমি খুব যত্ন করতাম ব'লে আভাষে ইঙ্গিতে সে এসব কথা আমাকে জানিয়েছিল।

যাত্রীদের মাঝে এসব কথা আর ভাঙ্‌লাম না। কে একজন বল্‌লেঃ সে বিধবা মেয়েছেলেটা বেঁচে আছে কি না আছে, সেকথার দরকার কি বাবু? বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে মা আবার নররক্ত চান আর সেইজন্যই বাঁধ ভেঙেছে—

কথাটা লাগসৈ—সকলে মেনে নিলে। আমি দেখ্‌লাম—নফরের নাত্‌নী তার খোকাকে বুকের মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরছে।

আমাদের নৌকা যেমন মন্থর গতিতে চল্‌ছিল তেমনিই চল্‌তে লাগ্‌ল।

জীবন আর মহাজীবন

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য
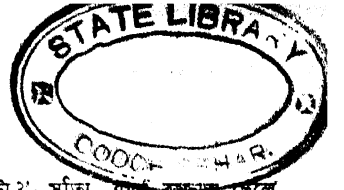
শীতের সন্ধ্যায় একখানা লোকাল ট্রেন কট্‌রাসগড় স্টেশনে এসে দাঁড়াল। যাত্রীর সংখ্যা বেশী নয়; যে কয়জন নেমে আসল তাদের অধিকাংশই খাদের কুলী, দিনমজুর। তাদের সবারই হাতে একটা সাবল, কাপড়ের পুঁটলিতে কয়েক সের হিসাবে কয়লা বাঁধা। সকলের সাথে একজন লোক তেমনই ভাবে অন্ধকারে বেরিয়ে এল হাতে তারও একটা পুঁটলি। পুঁটলিতে অবশ্য কয়লা বাঁধা নাই—আছে অন্য কোন জিনিস। দীর্ঘ ঋজু দেহ; এখনও অপরিসীম বলিষ্ঠতায় যেন সে সকল কিছুকেই অগ্রাহ্য করতে পারে। পরনে তার একখানা শতছিন্ন ময়লা কাপড়, মাথায় অনেক দিন তেল পড়ে নি। চুলগুলো বড় হয়ে কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে।

দশ বছর আগে ঠিক এমনই দিনে, ঠিক এমনই সময় সে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে এ স্টেশনেই এসে গাড়িতে উঠেছিল। হাতে তার এ পুঁটলিটা সেদিনও ছিল। জীবনে যেন কিছুই পরিবর্তন হয় নি। আস্তে কথাটি না বলে সে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। চারিদিকে ঘনায়মান অন্ধকার তথাপি যায়গাটা চিনে এগিয়ে চলতে তার বিশেষ কষ্ট হয় না। তা হবে বৈ-কি, দশ বছর ত এমন বেশী কিছু নয়।

এখানকার অলিগলি, ছেলেবুড়ো, খাদ, ইঞ্জিনিয়র, প্রতিটি মানুষ, আর তাদের পথ চলার শব্দ—সমস্তই যে তার পরিচিত ছিল। দশ বৎসর—দশ বৎসরে আর কটাই বা মাস, কটাই বা দিন আর কটাই বা মুহূর্ত। সত্যি, কেমন সহজেই যে তার দশ বৎসর কেটে গেল।

সে এগিয়ে চলল। এদিকে অন্ধকারও গভীরতর হয়ে উঠেছে। দুদিকে কুলীদের আড্ডা; সেখানে রান্নাঘরের ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠতে না পেরে রাস্তাতেই আনাগোনা করছে। পথও ভাল করে এখন দেখা যায় না।

মনে পড়ে...

ছেলেটা একদিন পায়েস খাবার জন্য কী অপ্রতুলটাই না করেছিল! আহা, বড্ড ছেলেমানুষ!—কথাটা মনে হতেই আজ তার হাসি পেল। সত্যি, এ সমস্ত বায়না করতে ছেলেদের কে যে শেখায়?

ইফতার এগিয়ে চলল। এধারের কাঁধের পুঁটলিটা ওধারের কাঁধে নিল। ব্যস, চলো এবার। কোথায় যে সে চলেছে, কার উদ্দেশ্যে, এ প্রশ্ন তার মনে একবারও উঠল না। পাশের একটা কুঠুরী থেকে কে একজন কচ্ছপের মত গলা বাড়িয়ে জানতে চাইলঃ কে যায়? —চিনবে না বাপু, চিনবে না—অযথা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিই বা কেন? কচ্ছপের মতই লোকটা আবার গলাটা গুটিয়ে নিল। বললে আপন মনেঃ—নাইবা চিনলাম, তবু দেশ-গাঁয়ের কথা কেউ জানতে চাইলে তা কি বলতে নাই? বাপরে—দেমাক দেখো একবার—।

ইফতার এগিয়ে চলল...।

ছেলেটার বাঁদরামোর কথা বড় বেশী মনে হয়। একদিন কোথা থেকে কতগুলি পাকা পেয়ারা চুরি করে এনে বলেছিলঃ 'নেবে বাবা, দুটো?'—সত্যি, এমন কাণ্ড ছেলে কেউ কোনদিন দেখেছে? রাবেয়া কিন্তু সে জন্যই বড় বেশী আদর করত তাকে। বলত, ওসব অভ্যাস কি আর বড় হলে থাকবে? আবার এক এক সময় ইফতারকে লক্ষ্য করে ছেলেকে বলত রাবেয়া—চরিত্তিরটা ত বাবার মতই হবে। এ এমন বিচিত্রই বা কি? স্ত্রীর মুখে এ সময় একটু হাসি ফুটে উঠত। অর্ধভুক্ত রোগজীর্ণ সে নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে ইফতার যেন এক এক দিন মরাকেই চোখে দেখত। কিন্তু, হঠাৎ একী হল? ইফতারের চোখে যে এক ফোঁটা জল! সে বিশ্বাস করতে পারলে না নিজকে, নিজের চোখকে। না, কি হবে পেছনের দিকে তাকিয়ে? চল না, এগিয়ে যাই—।

ও কাঁধের পুঁটলিটা এ কাঁধে নিল—তারপর এগিয়ে চলল। কিন্তু একটা যায়গায় এসে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। এ যায়গাটাতেই তার কুঠুরী ছিল, হাঁ এ যায়গাটাতেই। ডান দিকে একটা লাইট পোস্ট, বাম দিকে একটা জলের কল, সামনে তেল-নুনের দোকান। কিন্তু, কই সেখানে ত আজ কিছুই নাই। সে যায়গাটাতে আজ প্রকাণ্ড একটা তেলের ঘানি চোখে ঠুলি বেঁধে লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে বলদগুলি অনিচ্ছার সাথে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে আর কিছু-ই নাই—শুধু সেই নিঃশব্দ অন্ধকারে ঘানিটার একঘেয়ে শব্দ যেন কেমন করুণ এবং বীভৎস হয়ে উঠেছে। পাশের একটা ঘরের দাওয়ায় সে বসল। অনেকক্ষণ পর সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ ওগো শুনছ, কে আছ ঘরে? ঘরের অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা লোক বললে, কেন, এই যে আমি আছি, কি চাই তোমার বলত?—

ইফতার মুহূর্তের মধ্যে কী যেন একটা মতলব পাকাল' তারপর সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে বলল, দেখ এপাড়ায় যে ইফতার বলে চোরটা ছিল, তার ছেলেটার কোন খবর দিতে পার তোমরা?

—ইফতার, ইফতার কে? ঘানিওয়ালা যেন চিনতেই' পারল না। বললে, ইফতার উফতার কাউকে চিনি না, বাপু—।

ইফতার তবু নিরাশ হল না। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বললঃ এ-যে বছর দশেক আগে চুরির দায়ে দশ বছর সাজা হয়েছিল।

লোকটি নিজের কাজ ফেলে রেখে এবার একটু সামনে এগিয়ে এল। বললঃ ও, চোরটার কথা জিজ্ঞাসা করছ বুঝি? কিন্তু এত বছর পরে আবার ওটার দরকার হল কিসে? ইফতার এবারও সাহসে ভর করে আত্মগোপন করে রইল। বললঃ ইফতারে দরকার আমার নাই, ব্যাটা ত জেলেই পচছে—আমি চাচ্ছি তার ছেলেটার খবর—।

হঠাৎ একটু ঢোক গিলে আবার বললঃ বলো না আর, হাঙ্গামা কী আর কম? বীরভূম জেলায় এক চুরি হয়েছে—সেখানে তারা ইফতারের ছেলের নাম পেয়েছে। দিতে পার, শ্যালার পোর খবর?

ইফতার এক নিঃশ্বাসে যদিও সমস্ত বলে গেলঃ কিন্তু এতক্ষণে তার সর্বশরীরে ঘাম দিয়ে উঠছে—।

ঘানিওয়ালা হঠাৎ যেন মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল। বললঃ পারি বৈকি? চলো, শ্যালাকে এখ্‌খুনি পাকড়াও করছি—তুমি একটু দাঁড়াও—আমি আসছি কাপড় পরে—। হন হন করে বরাবর উত্তর দিকে মাইল খানেক গেলেই পুল দেখতে পাবে একটা—সেই পুলের নীচে ভিখারীদের আস্তাতেই ওরা মায়েপোয়ে থাকে—চলো, শ্যালাকে ঠিক ধরে আন্দামানে পাঠাব—লোকটা কাপড় বদলাবার জন্য তাড়াতাড়ি পাশের একটা ঘরে ঢুকল। কিন্তু বেরিয়ে এসে ইফতারের আর পাত্তা পেল না। সমস্তটাই যেন তার কাছে একটা প্রহেলিকার মত মনে হল। বলল আপন মনেঃ বারে মজা। অতঃপর সে নিজের কাজে মন দিল। ইফতার একবার দ্রুত-পদে এগিয়ে যায়, আবার পিছনে তাকায়। ওঃ, কী কলরবই না করে উঠবে ছেলেটা? রাবেয়াও আনন্দে ঘেমেই উঠবে—হয়ত এতক্ষণে সে পুলের নীচে রান্না বসিয়েছে উনুনের আঁচে তার মুখখানা কেমন করুণ আর ব্যথাহত দেখাচ্ছে..... ছেলেটা ওপাসে কতগুলো বাঁদর ছেলের সাথে ইয়ার্কি করে বেড়াচ্ছে হয়ত......।

ভাবছে......

ধরো, রাবেয়া চিনতে পারল না তাকে। তবে সুন্দর একটি অভিনয়, একান্ত একটি নাটক। বলবে সে রাবেয়াকে লক্ষ্য করে, খেতে পাবো, দুমুঠো?—

রাবেয়া হয়ত মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠ্‌লঃ—দুপুর রাতে কে এল জ্বালাতে? না, বাপু, ভাতটাত এ রাজ্যে মিলবে না।

তবু বলবে ইফতার......

দাওনা গো দুমুঠো, বড়লোক তোমরা, ইচ্ছে করলেই ত দিতে পার—।

রাবেয়া আর সইতে পারবে না। ফস্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে—দেখি, কার আবার এত সখ হল?......তারপর...... তারপরেকার কথা ইফ্‌তার ভাবতে পারে না। রাবেয়া তাকে চিনতে পারল। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পর বললে, উঃ, কতদিন হয়ে গেল! ছাড়ল তারা শেষ পর্যন্ত?—

তারপর......তারপর হয়ত হাতমুখ ধুয়ে ইফতার খেতে আসবে। রাবেয়া বলবে—এসো, দুজনে আমরা এক পাতে খেতে বসি—।

পথের উপর কিসে যেন হোঁচট খেয়ে ইফ্‌তারের সমস্ত চিন্তার জাল এবার ছিঁড়ে গেল। কিন্তু ব্যথা সে তখন বেশী পায় নি। আস্তে পুলটার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল—কিন্তু কই, পুলের আশে পাশে বা নীচে কোথাও ত কেউ নাই। সর্বশরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল—ভয়ে আশঙ্কায়, মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না।

একবার ওদিকে এদিকে তাকিয়ে রাস্তা হাতড়িয়ে সে উপরে উঠে এল। কোথাও কেউ নেই যে সে জিজ্ঞাসা করবে বা কারু থেকে কোন কথা জেনে নেবে। অন্ধকারেই সে আবার সামনের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। পথের ধারে এক মেয়ে মানুষ, ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে পড়ে আছে—দূরে থেকে তার গোঙানি শুনে ইফতার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ কে ও?

মেয়ে মানুষটি এবার ক্ষেপে উঠে জিজ্ঞাসা করলঃ কে মারবি নাকি?—

ইফ্‌তার সংযত হয়ে বললেঃ না ভাই মারব না একটুখানি এগিয়ে মেয়ে মানুষটির মুখের কাছে মুখখানা নিয়ে বললেঃ বহু দূর থেকে এসেছি ভাই, একটা খবর দিতে পারিস?—

মেয়ে মানুষটি এতক্ষণে আবার ভাল করে' কাঁথা জড়িয়ে নিয়ে গোঙাতে আরম্ভ করেছে। ইফ্‌তারের কথার দিকে লক্ষ্যই করল না সে।

ইফ্‌তার তবু ছাড়ল না। বল্‌লঃ বল্‌তে পারো ভাই চোর ইফতারের ছেলে বউ কোথায় থাকে এখন?

বৃদ্ধা এবার কথায় ঝাল মিশিয়ে বল্‌লেঃ চোরের খবর চোরদের কাছেই পাবে—এখানে জ্বালাতে আসা কেন?—

ইফ্‌তার আরও দু'এক যায়গায় ঢুঁ মারল। অবশেষে জানতে পারল, মড়ক লেগে পুলের নীচের ভিখারীর দল একদিনে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইফ্‌তারের ছেলেটা?—

ইফতারের মনে হ'ল—এক সু-উচ্চ গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে সে ঊর্ধ্বে হাত বাড়িয়েছে—এবার হয়ত নিঃসীম নীলাকাশ—অথবা, নির্বাত নিরন্ধ্র অন্ধকারের দুর্গম গহ্বর। একটা সে চায়, কিন্তু এই অনিশ্চিত রহস্য নিয়ে এক মুহূর্তের জীবনের অর্থ অনন্তকালের মৃত্যু।

—উঃ, সব মরেছে রে, সব মরেছে—শুয়েরের পালে মড়ক লাগলে কি এক-আধটা মরে? দেখতে পারো, খুঁজে তুমি—।

এইবার সমতল মৃত্তিকা। বহু জীবনের বহু পরিচয়ে এ মৃত্তিকাকে সে পেয়েছে। এর উপর দাঁড়িয়ে সে জীবনকে স্পর্শ করবে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে—কিছু আসে যায় না।

ইফতার আবার এগিয়ে চল্‌ল। কিন্তু আর সে পারে না। খানিকক্ষণ পথের ধারে একটু বসল সে—আবার এগিয়ে চল্‌ল। কিন্তু কোথায় যাবে সে, সেও জানে না। অন্ধকার, গভীর অন্ধকার,—ঊর্ধ্বের আকাশে, নিম্নের মৃত্তিকায়, সর্বত্র। নীচের এক পাশে একটি বদ্ধ জলাশয়। পুঁটলিটা উপরে রেখে ইফ্‌তার আস্তে নেমে এল। জলের দিকে অনেকটা নেমে অঞ্জলি ভরে জল পান করল। এবার একটু বিশ্রাম করতে পারলে সে বাঁচে।

সামনে একটা ন্যাড়া পাহাড়, সামান্য উঁচু। আস্তে লাঠি ভর করে ইফ্‌তার পাহাড়ের দিকে উঠতে লাগ্‌ল। দু'পাশে ছোট কাঁটা গাছ, রুক্ষ পাথর, এপাশে ওপাশে দু'একটা শাল আর মহুয়া। কিন্তু তবু যেন পাহাড়ের নেশায় ধরেছে আজ। সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে যদিও, কিন্তু তবু সে উপরে উঠ্‌ছে। এইবার পাহাড়ের চূড়া! সত্যি, এত সুন্দর, অপূর্ব! উঃ, আকাশে কত

'বনফুলের' চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা অসামান্য, তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য অন্য ধরণের। তাঁর কৃতিত্বও যথেষ্ট ও সমাদরেরযোগ্য। এ'রা দুইজনেই সত্যিই গল্প সাহিত্যে আপন স্বাতন্ত্র্যকে উজ্জ্বল করেছেন।" সজনীবাবু কবির উক্তিতে সায় দিয়া বলিলেন, "এই রাজ্যে সত্যিই নব ভাবের আবির্ভাব ঘটেছে। এমন সব বিষয় এবং অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের পরিচয় এই গল্প সাহিত্যে আসছে যা কৃত্রিম নয়, একেবারে সত্যি, অথচ এ লাইনে আপনি বাধা সৃষ্টি করতে পারেন নি, এ'দের যে অভিজ্ঞতা আছে আপনার সে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটেনি।" রবীন্দ্রনাথ সজনীবাবুর মতের সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, "একথা মানি, এ'দের বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে মানব চরিত্রের যে অদ্ভুত অথচ বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন তাতেই নব যুগের অনন্যপূর্ব পরিচয় দেয়, এ সবের বাইরে আমার অভিজ্ঞতা কবির এবং মনস্তাত্ত্বিকের অর্থাৎ আমিও জীবনক্ষেত্রে অনেক কিছু দেখেছি এবং ঔৎসুক্যের সঙ্গেই দেখেছি, কিন্তু কবি ও মনস্তাত্ত্বিকের চক্ষেই সেগুলি দেখেছি। সেইজন্যেই এ'দের সাহিত্য আমার ভালো লাগে। আচ্ছা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, আমার 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি তোমাদের কেমন লাগল, আমার মনে হয় এর ঠিক মর্ম কথাটি হয়তো অনেকেই ধরতে পারে নি।" কবির কথা এ সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর হইবার পূর্বেই, সজনীবাবু বলিলেন "'তিনসঙ্গী' গ্রন্থে আপনার এই ল্যাবরেটরি গল্পটি পুনরায় পড়েছি। আপনার এ গল্পটির সম্বন্ধে নিন্দে প্রশংসা সমভাবেই হচ্ছে। যাঁরা ভালো করে আপনার সাহিত্য পড়েন নি সেই শ্রেণীর সেকেলে দল আপনার এ গল্পের ভয়ানক নিন্দে করছেন। আর যাঁরা এটা নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছেন অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিকের দল তাঁরাও এর বহিরঙ্গের চটকেই মুগ্ধ—শুধু মুগ্ধ তা নয়, তাঁদের এই মুগ্ধবোধকে নিজেদের সাহিত্যের অপসাধনায় ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন। আমাদের মনে হয় আপনি সোহিনীর মধ্যে যেটি ক্ষুধাতুর রক্ত মাংসের উপরের মানুষ, তাকেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিই তাঁর স্বামীর ছিল পৌরুষময় শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। সোহিনীর মেয়ে সে পেয়েছিল মায়ের দেহ, যে দেহ বাসনায় জর্জরিত, পায় নি সোহিনীর সেই নারী-চিত্ত, যেটা আদর্শ ও শক্তির প্রতীক, যার কাছে অধ্যাপক করেছিলেন মাথা নীচু, অধ্যাপকের বিশ্বাসের মর্যাদাও রক্ষা করেছিল সোহিনী—তার সেই অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের এই মর্ম কথা খুব কম লোকই বোধ হয় ধরতে পেরেছে।" কবি ক্লান্ত ছিলেন, তাই সেদিনের আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত হয়।
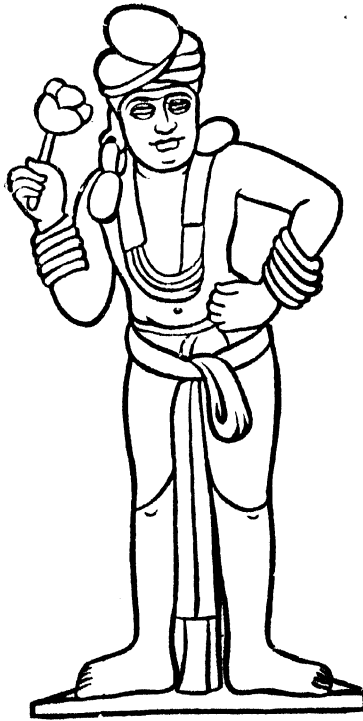
দক্ষিণাপথ ভ্রমণ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কত সীমাবদ্ধ সেটা বুঝা যায় দাক্ষিণাত্যে গেলে। অগস্ত মুনি সেই কবে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেছিলেন, এখনও সে দিনটি অগস্ত্য যাত্রা বলে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি যে আর ফেরেন নি, সেটা তাঁর যাত্রার দিনটির দোষ অথবা দক্ষিণ দেশের দোষ, সে কথা নিশ্চয় করে' বলা যায় না। তবে দেশটি যে অতি সুন্দর, তার কানন প্রান্তর নগরে যে অনুপম শোভা ও শান্তি সঞ্চিত রয়েছে, তা দেখে সহজে ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা হয় না, একথা ঠিক। সমুদ্রের অঞ্চল বিছিয়ে ভারত-জননী সেখানে যেন
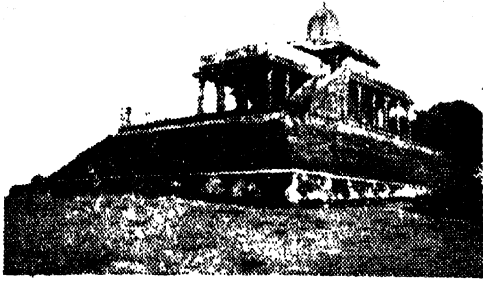
রামঝরোকা—রামেশ্বরম্‌

অনন্ত বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছেন। দুধারে পূর্ব-ঘাট ও পশ্চিম-ঘাট শৈলমালা তাঁকে বেষ্টন করে' রয়েছে নিবিড় শান্তির ছায়া দিয়ে। গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি কত নদী পাহাড় পর্বত ভেদ করে' সুমিষ্ট জল বয়ে' এনে জননীর শ্যামাঙ্গ শীতল করে' দিচ্ছে।

দক্ষিণ ভারতে যে দেখবার অনেক কিছু আছে, সে কথা না বল্‌লেও চলে। দ্রাবিড়ী সভ্যতা আর্য সভ্যতা থেকে পৃথক্‌ কি না এবং যদি পৃথক হয়, তবে সে পার্থক্য কতখানি এ প্রশ্ন মনে আসে না। মনে আসে এই যে, হিন্দুর সংস্কৃতি, হিন্দুর ভাবধারা যেন এই দক্ষিণ দেশেই আশ্রয় নিয়েছে। মাদ্রাজে অনেক লোক খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, এ কথা মনে রাখলেও, চোখে যা পড়েছে সে সব হিন্দুদেরই কীর্তিকলাপ, হিন্দুর প্রাণের গভীরতম বিকাশ।

আমাদের দেশে যে সকল দেব দেবী আছেন, সে সকলের পূজা দক্ষিণ ভারতে বিশাল মন্দিরে সুন্দরভাবে আবহমান কাল থেকে চলে' আসছে। আমরা অনেক সময় শুনতে পাই যে, শিব ঠাকুর দ্রাবিড় দেশ থেকে এসে হঠাৎ আর্য সভ্যতার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। বস্তুত দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরে শিবই প্রধান দেবতা। কিন্তু তা বলে যে অন্য দেবদেবীর প্রভাব কম তা মনে হলো না। বহু মন্দিরে কার্তিকের মূর্তি দেখেছি। কার্তিকের নাম এদেশে সুব্রহ্মণ্য। এদিকে কোথায়ও ষড়ানন কার্তিকের মূর্তি দেখেছি বলে' মনে পড়ে না, কিন্তু দক্ষিণে দেখে এসেছি। গণেশের মূর্তিও কম নয়। প্রায় প্রত্যেক বড় মন্দিরেই গণপতির মূর্তি আছে। এবং পূজারও বেশ ঘটা। ত্রিচিনপলীর শৈল-শিখরে বিশাল গণেশের মূর্তি রয়েছে —শিবের মূর্তিও আছে। মাদ্রাজে এক মন্দিরে গণেশের মূর্তি আছে—তার শুঁড় উপরের দিকে। প্রবাদ এই যে ভক্তবৎসল-বিষয়ক এক ভক্তকে শুঁড়ের দ্বারা স্বর্গে তুলে দিয়েছিলেন। গণপতি ব্যতীত শ্রীরামচন্দ্র হনুমান প্রভৃতির মূর্তিও পূজিত হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শুচীন্দ্রম্‌ মন্দিরে এক হনুমানজির মূর্তি আছে, তার দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট। কষ্টিপাথরের বিরাট মূর্তি, কিন্তু শিল্পী তার মধ্যে যে ভক্তিভাব ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বিশেষ উপভোগ্য। রামেশ্বর মন্দিরে দুর্গার পূজা ও আরতি দেখে এসেছি। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থলীতে রঘুকুল-তিলকের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিয়ে দেবার মত অনেক সামগ্রী আছে। রামেশ্বরম্‌ দ্বীপে এক পাহাড়ের উপর শ্রীরামের চরণ-চিহ্ন আছে। মন্দিরটির নাম 'রামঝরোকা'। শ্রীরামচন্দ্রের সহকারী নলনীল গয়গবাক্ষ প্রভৃতির ২৪টি কুণ্ড আছে—তাহার তীরে যাত্রীরা স্নান করে' জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি ধুয়ে আসছেন। কুম্ভকোনমে শ্রীরামস্বামীর (রামচন্দ্রের) মন্দির আছে। এখানে রামের রাজবেশ। এই মন্দির ১৬শ শতাব্দীতে রঘুনাথ নায়ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মহাবলিপুরম্‌ মাদ্রাজের ৪৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে সমুদ্রকূলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে প্রতিষ্ঠিত যে শৈলশিলা মন্দিরগুলি আছে তাহা মহাভারতের
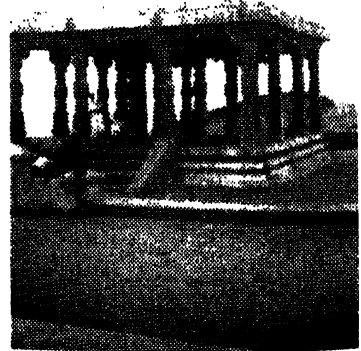
ভারতের শেষ স্থলবিন্দু, কন্যাকুমারী

আখ্যান স্মরণ করিয়ে দেয়। পল্লব রাজাদের সময়ে পাহাড় কেটে এই মন্দিরগুলি তৈরী হয়েছিল। পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর নামে এগুলির নামকরণ হয়েছে। এগুলিকে এখন 'রথ' বলা হয়; কোনওটি যুধিষ্ঠিরের রথ, কোনওটি ভীমের কোনওটি দ্রৌপদীর রথ। পাহাড় কেটে সে যুগে যাঁরা এই মন্দির প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁরা কি আমাদের মত মানুষ

ছিলেন! একটি মন্দিরের মধ্যে মহিষমর্দিনীর মূর্তি, বামনাবতারে বলিকে ছলনা করিবার মূর্তি, নন্দ মহারাজের গো-দোহন প্রভৃতি সুন্দর ও সজীবভাবে উৎকীর্ণ আছে। মহাবলিপুরম্ যাইবার পথে ত্রিকলিকুন্ড্রম তীর্থে (পক্ষিতীর্থে) উচ্চ পর্বতগাত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণুর মূর্তি আছে। একটি মন্দিরে বাঙলা দেশের কালী মূর্তিও দেখেছিলাম। মহীশূরে সুউচ্চ চামুণ্ডি পাহাড়ের উপর দশভুজা দুর্গার মূর্তি আছে। মহীশূরের রাজাদের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সন্ধ্যার সময় যখন আলোকমালায় চামুণ্ডি শৈলের আঁকা বাঁকা রাস্তা সজ্জিত হয়, তখন নীচে থেকে মনে হয় যেন স্বর্গের দেবতারা

মূর্তি কম নয়। শ্রীরঙ্গম্ বৈষ্ণবদের একটি প্রধান কেন্দ্র। সেখানে বিষ্ণুর অতলশয়ন মূর্তি যেমন বিশাল, তেমনই সুন্দর। এ দেশে এই সকল মূর্তিকে ও'রা অতলশয়ন বলেন। নামটি সুন্দর। নারায়ণ মহাসমুদ্রে শয়ান, নাগরাজ মস্তকে অনন্তফণা বিস্তার করে রয়েছেন, লক্ষ্মী পদসেবা করছেন নাভিপদ্মে ব্রহ্মা বিরাজিত। আরও অনেক স্থলে নারায়ণের এই অতলশয়ন মূর্তি আছে। মহীশূরের পথে শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপু সুলতানের দুর্গ মধ্যে যে রঙ্গনাথের মূর্তি আছে, তাও অতলশয়ন মূর্তি। মন্দিরটি পুরাতন বলেই শুনেছি। মহাবলিপুরমেও বিষ্ণু মন্দির আছে, তাতেও বেশ
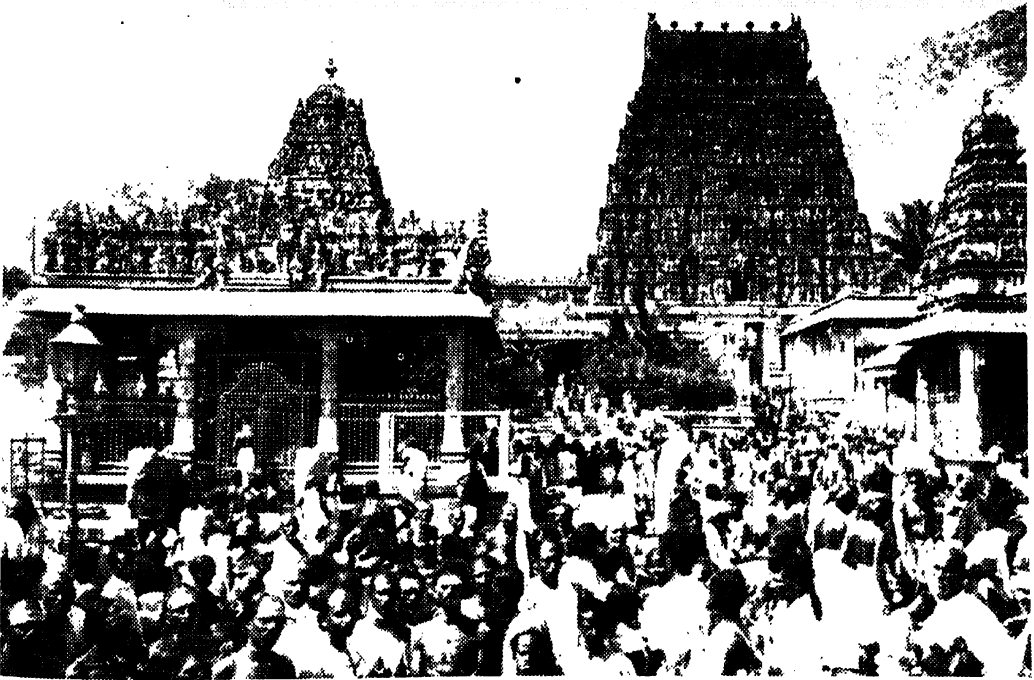
দক্ষিণাপথে উৎসবমুখরিত মন্দির প্রাঙ্গণ

দীপালী উৎসব করছেন। আবার উপরে উঠলে নীচেকার আলোকোজ্জ্বল নগরীটি যে কি সুন্দর দেখায়, তা বর্ণনাতীত। মনে হয়েছিল যেন মাইকেল এঞ্জেলো উদ্যান থেকে ফ্লোরেন্স শহর দেখছি। মহীশূরের নূতন সৃষ্টি বৃন্দাবন উদ্যানে কাবেরী দেবীর মূর্তিটি এখনও পূজিত হচ্ছেন। কাবেরী দেবীর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝর্নাধারা ঝরছে।

দক্ষিণাপথের মন্দিরগুলিতে একটি জিনিস বড় চোখে পড়ে—নন্দী বা বৃষের মূর্তি। রামেশ্বর মন্দিরের নন্দী, তাঞ্জোরের নন্দী এবং ব্যাঙ্গালোরের বাসভেশ্বর মন্দিরের নন্দী—এদের মধ্যে কোন্‌টি বড়, তা নিশ্চয় করে' বলা যায় না। এমন বিরাট বৃষ-মূর্তি উত্তর ভারতের কোথায়ও দেখি নি। তাঞ্জোরের বৃষটি ওজনে ২৫ টনের উপর! দক্ষিণাপথে বিষ্ণুর প্রকাণ্ড অতলশয়ন মূর্তি। কুম্ভকোণমে শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। চিদম্বরমে নটরাজ শিব-মন্দিরের পার্শ্বেই গোবিন্দ রাজের মূর্তি। চিদম্বরমে শিবের ব্যোম-মূর্তি—অর্থাৎ কিছুই দেখা যায় না। গর্ভমন্দিরে শুধু কতকগুলি সোনার মালা দুলছে কোনও বিগ্রহ নেই—পরদা সরিয়ে তাই দেখানো হয়। তার সামনেই নটরাজ মূর্তিতে শিব বিরাজিত। তারই পাশে গোবিন্দরাজের মন্দির। একজন সেবক বিষ্ণু উপাসনার বিরোধী হয়েছিলেন; তিনি এত গোঁড়া ছিলেন যে, গোবিন্দরাজের মূর্তি মন্দির হতে বিদায় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার কোনও ভক্ত ঐ মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্প্রতি সার অন্নমলয় চেট্টিয়ার এই মন্দিরের আমূল সংস্কার করছেন দেখলাম।

বিধাতার কৃপায় তাঁর অতুল ঐশ্বর্য আছে এবং সুখের বিষয় তিনি এই সকল সৎকার্যে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করছেন।

সে যাহা হউক, দক্ষিণাপথে শৈব এবং বৈষ্ণবের মধ্যে আগে যে বেশ রেষারেষি ছিল, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।
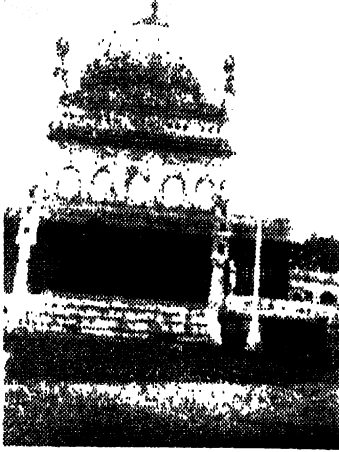
দেশপ্রাণ টিপু সুলতানের সমাধি—শ্রীরঙ্গপত্তন

এখনও কিছু কিছু আছে বলেই মনে হলো। দক্ষিণ ভারতের প্রধান সমস্যা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বন্দ্ব। বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে হয়ে ব্রাহ্মণেতর জাতি এখন তাদের প্রাধান্য আর অবনত মস্তকে স্বীকার করতে চায় না। শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা এখন উন্নত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে চেট্টিয়ার জাতি ধনশালী হয়ে উঠেছে; তাদের বিষয়বুদ্ধিও অসাধারণ। দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণরা আচারনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ এবং পণ্ডিত। সকলেরই সাত্ত্বিক আহার এবং জীবনযাত্রাও অত্যন্ত সরল। এঁরা প্রায়ই শৈব। বৈষ্ণবদের মধ্যেও সদাচার এবং পবিত্র জীবনযাত্রার প্রতি বিলক্ষণ পক্ষপাত দেখা যায়। বৈষ্ণবদের ললাটে তিলকমাটী ও রুলির বিশেষ চিহ্ন থাকায় তাঁদের চিনতে বিলম্ব হয় না। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীরামানুজাচার্য একদিন জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের পদতলে আপনাকে লুটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গমের মন্দির চত্বরে শ্রীরামানুজস্বামীর মন্দির ও তাঁর মূর্তি আছে। রঙ্গনাথের ভক্ত সাধিকাশিরোমণি আন্ডালের মূর্তিও এখানে রক্ষিত আছে। শ্রীরঙ্গনাথ তাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন।

বাঙলা দেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে কলহ বিদ্বেষ আছে, দক্ষিণাপথে তার মতো কিছু নেই। ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও সেটা তত তীব্র বা তিক্ত হতে পারে নি। আমার মনে হলো বাঙলা দেশের অশান্তিপূর্ণ জীবন অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের পর্ণশালায় বাস করা হিন্দুদের পক্ষে পরম বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ মিশন দক্ষিণ দেশে অনেক ভাল কাজ করছেন। মাদ্রাজে, মাদুরায় ও মহীশূরে তাঁদের আশ্রম রয়েছে। আর দেখলাম পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। সেখানে গিয়ে মনে হয়েছিল বাঙলা দেশের একটি টুকরো যেন কেউ তুলে নিয়ে সেখানে স্থাপন করেছে। সমুদ্রের উপকূলে ফরাসী অধিকৃত এই ছোট নগরটি হারিয়েছে তার বৈদেশিক আবহাওয়া। বাঙলার সংস্কৃতি আশ্রমের সেই ছায়াশীতল কুঞ্জবনে যেন আশ্রয় নিয়েছে অতি অন্তরঙ্গভাবে। আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনীটি অসাম্প্রদায়িক হলেও সর্বতোভাবে হিন্দুত্বেরই বিজয় তোরণ। বাঙালীর গৌরব যে একজন বাঙালী মহাপুরুষকে দর্শন করবার জন্য সেখানে শুধু ভারতের নয় অন্য দেশের লোকও আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে ভীড় করছেন।

পণ্ডিচেরী স্বভাবতই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; আশ্রমের অধিবাসীরা তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিষ্কৃত রেখেছেন। পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য যে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়, সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলে' মনে হলো। দক্ষিণের শহরগুলি সাধারণত খুব পরিষ্কার। তার কারণ শুধু এই নয় যে ও দেশে ধূলি ও ধূমের আধিক্য উত্তর ভারতের মত নেই, আরও কারণ এই যে, ও দেশের লোক বোধ হয় সৌন্দর্যের বিশেষ পক্ষপাতী। ফুল আমাদের দেশে স্টেশনে ফেরী করে না। ও দেশে প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে ফুলওয়ালা বা ফুলওয়ালী
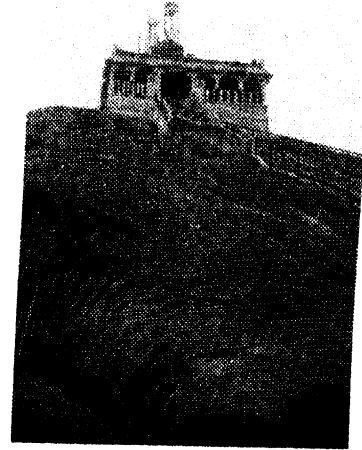
শৈল মন্দির ত্রিচিনপল্লী

পান বিড়ি দেশলাইয়ের মত হেঁকে যায়। দক্ষিণ অঞ্চলে সধবারা মাথায় ঘোমটা দেয় না। তাদের চুলের বিন্যাস খুব বেশী এবং তারা খোঁপায় ফুল পরবেই পরবে। মহীশূরে সিলক্ ফ্যাক্টরীতে মজুরনিরা কাজ করছে দু'আনা দশ পয়সা রোজ হিসেবে; কিন্তু মাথায় ফুল গুঁজতে ভুল হয়

(শেষাংশ ৪২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(১২)

প্রহেলিকা একখানা মাসিক পত্রে একটা গল্প পড়ছিল। তার দুচোখ বেয়ে জলের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছিল। শেষ হ'লে বইখানা বন্ধ ক'রে চোখ মুছে সে তার দিদিকে বললে, "মা গো, এত মিছেমিছি কাঁদাতে পারে লোকটা। অথচ লোকটা দেখতে এমন ঠাণ্ডা সুস্থির—কে বলবে যে সে এত বড় খুনে।"

মঞ্জুলিকা বল্‌লে, "কার কথা বলছিস?"

"আরে এই প্রমোদ ঘোষ—গল্প লিখেছে দেখনা, কাঁদিতে কাঁদিতে আমার চোখ ফুলে উঠেছে।"

"ও, ওই 'নিঃশেষ' গল্পটার কথা বলছিস, সত্যি ভাই, ভারী চমৎকার।"

"চমৎকার না হাতী। কি অধিকার আছে ওর আমার এতগুলো চোখের জল বাজে খরচ করাবার। রোসো ওকে শিক্ষা দিচ্ছি।"

"শিক্ষা দিবি কি রে? ওকে পাবি কোথায়?"

প্রহেলিকা তার বাঁ হাতের পাতাটা পেতে আস্তে আস্তে মুষ্টিবদ্ধ করতে করতে হেসে বল্‌লে, "এই আমার মুঠোর ভিতর।"

"মানে?"

"মানে বলবো, আগে জব্দ ক'রে নি।"

সে উঠে তার চুলটা বেশ ক'রে গুছিয়ে নিলে, শাড়িখানা বদলে, আধ ঘণ্টা আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বাগিয়ে পরলে। তারপর স্নো, পাউডার ঘ'সে কুঙ্কুমের টিপ প'রে মুচকি হেসে আরসীতে তার মুখ দেখে নিয়ে, বের হ'ল।"

রূপের তরঙ্গ তুলে ছুটতে ছুটতে সে ঢুকলো গিয়ে প্রমোদের দোকানে।

অন্য একটা লোক দোকানে ব'সে ছিল, সে ত্রস্তে ব্যস্তে বল্‌লে, "বসুন, কি চাই?"

লোকটার উপর প্রহেলিকা অযথা চ'টে উঠলো, সে বল্‌লে, "আপনি—আপনি কে?"

লোকটা বল্‌লে, "আমারই এ দোকান।"

"বা-রে! প্রমোদবাবুর দোকান নয় এটা?"

"আজ্ঞে হাঁ, তারই ছিল, এখন আমি কিনেছি।"

"কবে কিনেছেন?"

"দিন আষ্টেক।"

"তিনি আর আসেন না?"

"আজ্ঞে না।"

"কোথায় থাকেন তিনি।"

"তিনি এখন বোধ হয় ডায়মণ্ডহারবারে গেছেন ট্রেনিংএ।"

—"ট্রেনিংএ, কিসের ট্রেনিং?"

"তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন।"

"কি বলছেন আপনি?" প্রহেলিকা তীব্রকণ্ঠে তাকে ধমকে উঠলো, যেন সমস্ত অপরাধ ঐ লোকটিরই। সেই যেন চক্রান্ত ক'রে প্রমোদকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে।

লোকটি বল্‌লে, "আজ্ঞে হাঁ। তা' তাঁর কাছে কোনও দরকার ছিল কি আপনার? থাকে তো বলুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো—"

"ছাই করবেন!" ব'লে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো প্রহেলিকা। তার পরে সে সামলে নিয়ে বল্‌লে, "বেশ ভদ্রলোক তো, আমার পাওনা শোধ না ক'রে একেবারে চম্পট!"

বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে সে পড়বার ঘরে একলা ব'সে প্রমোদের লেখা সেই 'নিঃশেষ' গল্পটা প'ড়তে লাগলো। ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে তার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

বই বগলে ক'রে এমন সময় তার কাছে এলো ইলা ভট্টাচার্য। ইলা তার সমপাঠী, সেও ইকনমিক্স ও অঙ্কশাস্ত্র নিয়েছে। ফারপোর বাড়ির ডিনারের পর থেকেই সে আসে প্রহেলিকার সঙ্গে বাঁড়ুজ্যের কাছে পড়তে।

এখানে সংক্ষেপে ব'লে রাখা যাক যে ইলাও সুন্দরী—কিন্তু তার বেশভূষায় পারিপাট্য থাকলেও চটক নেই।

প্রহেলিকাকে কাঁদতে দেখে ইলা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "ও কি ভাই? কি হয়েছে?"

হাতের বইখানা ইলার সামনে ধ'রে প্রহেলিকা বল্‌লে, "প'ড়ে দেখ্‌।"

ইলা গল্পটা দেখে বল্‌লে, "ও! 'নিঃশেষ' ওটা পড়েছি ভাই। খাসা গল্প, ভারী ট্র্যাজিক। কিন্তু অবাক করলি তুই প্রহেলিকা। তুই এত সেণ্টিমেণ্টাল! তুই না আমাদের সেণ্টিমেণ্টাল ব'লে দিনরাত ঠাট্টা করিস!"

"বেশ করি। তোরা যে ন্যাকা, তা ঠাট্টা করবো না! কিন্তু এ গল্পটা কি ভয়ানক!" ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "এমন ক'রেই নিঃশেষ হ'য়ে গেল চারুব্রত!"

"আমার ভাই ভারী রাগ হয় সুচরিতার উপর, কি নিষ্ঠুর মেয়েটা! আমার কি মনে হয় জানিস, আমাদের জাতটাই বুঝি নিষ্ঠুর। বেচারা পুরুষেরা বোকার মত আমাদের ভালবেসে ফেলে ব'লে আমরা তাদের কি নাকালটা না করি!"

কিছুক্ষণ খুব গম্ভীর হ'য়ে থেকে প্রহেলিকা বল্‌লে, "পুরুষেরাও কম নিষ্ঠুর হ'তে জানে না।" ব'লে সে ফস্‌ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে, চোখ যে জলে ছাপিয়ে উঠলো তাই লুকোবার জন্যে।

বাঁড়ুজ্যে এসে পড়লো।

তারও মুখখানা যেন প্রকাণ্ড একটা কেলে হাঁড়ির মত হ'য়ে গেছে, সে ব'য়ে এনেছে যেন রাজ্যের ব্যথা তার বুকের ভিতর।

ইলাকে দেখে তার মুখ আরও কালো হ'য়ে গেল। প্রথম যেদিন ইলা এলো সেই দিন থেকেই বাঁড়ুজ্যে চ'টে আছে। সেদিন প্রহেলিকা বলেছিল, "মাষ্টার ম'শায়, এ ইলা, আজ থেকে আমার সঙ্গে আপনার কাছে পড়বে—" তারপর বাঁড়ুজ্যের কানে কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে—"আর পোনেরো টাকা বেশী পাবেন আপনি।"

বাঁড়ুজ্যে তার আর্থিক মানের এ বৃদ্ধিতে খুসী হবে কি, তাতে মনে মনে চ'টেই গিয়েছিল। এখন—এই আসন্ন শুভ মিলনের প্রাক্কালে তাদের পরস্পরের নির্জন সান্নিধ্য-সম্ভোগের পথে এই মূর্তিমতী বিঘ্নটিকে সে মোটেই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে পারে নি, আজও পারলে না।

সে চুপচাপ পড়িয়ে গেল। ইলা মেয়েটা এমন তীব্র মনোযোগ দিয়ে পড়ে, কোনও কথা বোঝালে এমন চট্‌পট বুঝে ফেলে আর এমন বুদ্ধিমতী শিক্ষাগ্রহী ছাত্রীর মত শান্তভাবে প্রশ্ন করে সব, যে বাঁড়ুজ্যে তার উপর চ'টেই গেল। তার মনে হ'ল যে মেয়েটা যেন ভারী হিংসুটে—সে যে প্রহেলিকার চেয়ে ভাল মেয়ে, কোনও ছ্যাবলামী নেই তার, এইটা জাহির করবার জন্যই যেন সে উঠে পড়ে লেগেছে। তার সামনে প'ড়ে প্রহেলিকাও যেন হঠাৎ নিভে গেল। ছ্যাবলামি করা দূরের কথা সে কথাই কয় না—একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। যখন বাঁড়ুজ্যে খুব আগ্রহ ক'রে কোনও কথা বোঝাতে যাচ্ছে, প্রহেলিকা তখন খুব সুস্পষ্টভাবে অন্যমনস্ক থেকেও সমানে ঘাড় নেড়ে যায়—যেন কতই সে বুঝছে! ভারী বিরক্ত লাগ্‌লো বাঁড়ুজ্যের!

সেদিন বাঁড়ুজ্যের টাকার মূল্যতত্ত্ব বোঝাবার কথা। সেইজন্য সে আজ পাঁচ দিন ধ'রে রাজ্যের বই ও প্রবন্ধ প'ড়ে এসেছে, দু'দিন নিখিলেশের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা ক'রে এসেছে। স্থির ক'রে এসেছে যে, আজকের এই আলোচনায় সে প্রহেলিকাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে।

মোটামুটিভাবে তথ্যটা ব'লে নিয়ে একটা equation লিখে সে যেই সেটা ব্যাখ্যা করতে যাবে, ইলা অমনি চট ক'রে ব'লে বসলো, "ও! এতো quantity theory!" ব'লে সে অম্লানবদনে দু চার ছত্র সাদা বাঙলায় থিওরীটাকে ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌লে, "এই তো?"

তাই তো বটে—কিন্তু এ সব কথা এ মেয়েটার এত জানবার কি দরকার ছিল? এখন বাঁড়ুজ্যে করে কি? সে ইলার উপর রীতিমত চ'টে গেল। বল্‌লে, "হাঁ এই বটে, কিন্তু আপনি বুঝেছেন জিনিসটা?"

ব'লে ব্যগ্র প্রতীক্ষায় প্রহেলিকার যে উত্তরে সে অভ্যস্ত, সেই "কিচ্ছু না" কথা দুটো শোনবার জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো।

কিন্তু প্রহেলিকা সুধু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "হাঁ"—এমন মৃদুস্বরে বল্‌লে যে কথাটা শোনাই যায় না।

—অথচ স্পষ্টই বোঝা গেল যে, বোঝা দূরে থাক, প্রহেলিকা এসব কথার একটু বর্ণও শোনে নি।

এ রকম ক'রে পড়াতে বাঁড়ুজ্যে অভ্যস্ত নয়। এমন ক'রে পড়াতে সে আসে নি। মনে মনে ভারী চ'টে সে বহু কষ্টে তার নির্দিষ্ট সময় যো সো ক'রে কাটিয়ে দিলে।

তারপর বই খাতা বন্ধ ক'রে সে আশা করতে লাগলে যে, ইলা এখনি চ'লে যাবে। কিন্তু সে গেল না।

শেষে ইলার সামনেই সে বল্‌লে, "দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকারী কয়েকটা কথা আছে।"

প্রহেলিকা যেন ঘুম থেকে উঠলো। সে বল্‌লে, "আচ্ছা, সে হবে এখন একদিন।"

"কবে আপনার শোনবার অবসর হবে?"

"পোনেরই ফাল্গুনের পর"—

একটু হেসে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "মানে ফাঁসিতে ঝোলবার পর আপীল শুনানী!—না, না, তখন হয় তো সে কথার কোনও সার্থকতা থাকবে না।"

"তবে সে অনর্থক কথা নিয়ে সময় নষ্ট ক'রে কিই বা হবে?"

"না, না, সে হবে না, তার আগেই কথা ক'টা বলা দরকার।"

"কিন্তু, আমার দরকার নেই—আর ১৫ই ফাল্গুনের আগে সুবিধেও হবে না আমার—মাত্র এই দশ বারোটা দিন বই তো নয়।"

ইলা এই কথার মাঝখানে একবার উঠেছিল যাবার জন্যে, প্রহেলিকা গোপনে তার হাতে চাপ দিয়ে তাকে টেনে বসালে।

হতাশ হ'য়ে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "তবে আজ থাক, আর একদিন ব'লবো।"

সে উঠলো। প্রহেলিকা হঠাৎ বল্‌লে, "দেখুন আপনার বন্ধু প্রমোদ ঘোষকে আমার গোটাকয়েক কথা বলবার আছে। শুনতে পেলাম তিনি তাঁর দোকান ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন আমার কাছে?"

বাঁড়ুজ্যে বল্‌বে, "প্রমোদ! শুনছিলাম সে নাকি যুদ্ধে গেছে।"

"গেছে!" এমনভাবে প্রহেলিকা কথাটা বল্‌লে, যে ঠিক একটা আর্তনাদের মত শোনালো।

বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "ঠিক গেছে কিনা এখনো বলতে পারি না। শুনেছি, পরশু তার medical examination ছিল। সে পরীক্ষায় পাশ হলেই তার join ক'রবার কথা।"

"একটু খোঁজ ক'রে খবরটা জানাবেন দয়া ক'রে—আর যদি তিনি থাকেন, তবে একবার দেখা ক'রতে বলবেন।"

এ কথাও বাঁড়ুজ্যের ভাল লাগলো না। সে সুধু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা।"

কি জানি কেন, সে প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষা ক'রতে লাগলো, যেন সে খবর পায় যে, সত্যি সত্যিই প্রমোদ চ'লে গিয়েছে।

তার সঙ্গে প্রহেলিকার কথা বলবার ফুরসুৎ নেই—অথচ প্রমোদের সঙ্গে কথা বলা তার চাই-ই—কথাটা মোটেই সুবিধের নয়—বিশেষ ১৫ই ফাল্গুন যেখানে আসন্ন। (ক্রমশ)

বেয়্‌র্গ্‌সঁর প্রাণপ্রবাহ

পুলকেশ দে সরকার

প্রাণপ্রবাহ যদি একমাত্র সৎ বস্তু হয়, তবে বেয়্‌র্গ্‌স'র ব্যবহারিক জগতের মৃত্যুসংবাদ দুঃখাতীত। কেননা, বেয়্‌র্গ্‌স'র মতে প্রাণপ্রবাহই 'সৃষ্টিকর বিবর্তনের' মূলীভূত কারণ—দৃশ্যমান জগৎ এই বিবর্তনের অপ্রতিহত পরিণাম মাত্র। প্রাণ ও প্রাণীর মধ্যে যে একটা নিতান্ত মাটীর গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা বার্কলের আধ্যাত্মিক মনোজগৎ হইতে পৃথক্‌ হইলেও বেয়্‌র্গ্‌স' সাংখ্যতত্ত্বের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই, অপরিণত দর্শন ভগবানে পরিসমাপ্তি টানিয়া দিয়াছে। তাই যেখানেই দার্শনিক যুক্তি ছাড়িয়া উপলব্ধির স্তরে দাঁড়াইতে হইয়াছে, সেখানেই বেয়্‌র্গ্‌স'র ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।"

আঁরি বেয়্‌র্গ্‌স'

প্রাণপ্রবাহের এই 'সৃষ্টিকর বিবর্তন' একান্ত জৈবিক নিয়ম; কিন্তু প্রাণ যেখানে শুধু কার্বন নহে, কাব্যসৃষ্টি এবং সে কাব্য কেবল প্রজনন প্রেরণা নহে, সত্যসুন্দর শিবের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সে কাব্যের মূলে রস সিঞ্চিত করে, সেখানেই হয় অসত্য অসুন্দর অশিব সংসারের ছাড়াছাড়ি; বেদান্তের মায়াবাদকেই সেখানে টানিয়া আনিতে হয়, মিথ্যা জগৎকে অবিদ্যার আভাস না বলিয়া উপায় নাই। তাহাতে অদ্বৈতবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজনাভাবে বিবর্তনের প্রাণপ্রবাহ শুকাইয়া যায়—নবসৃষ্টির উন্মেষ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই জৈবিক ক্ষেত্রে "সৃষ্টিকর বিবর্তনের" নবোদ্ভাবন সার্থক হইতে পারে না।
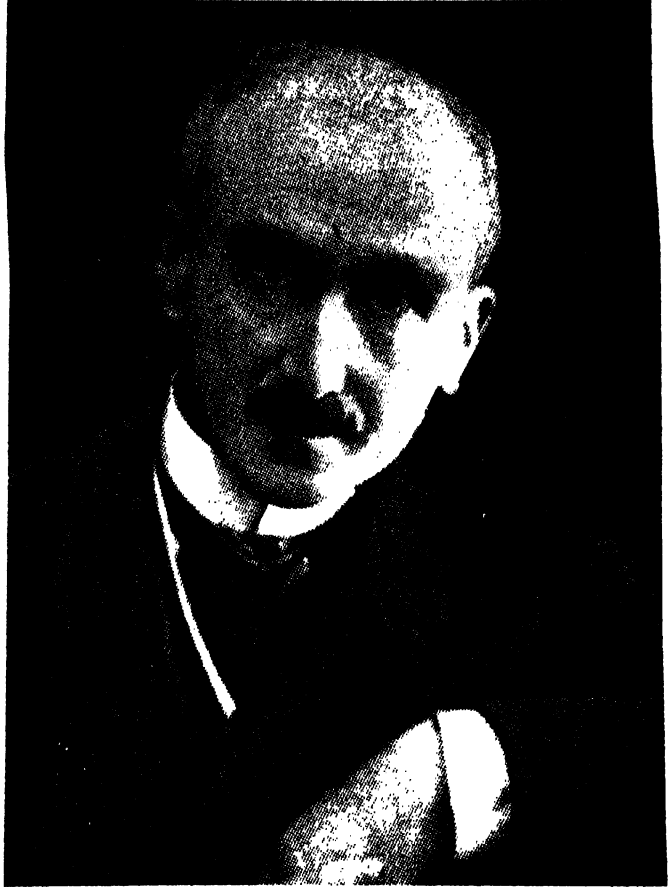
কিন্তু বেয়্‌র্গ্‌স' জীব ও জীবনেই ইহার সার্থকতা খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। জীব ও জীবনের এই চলার ছন্দ, আজিকার আইনস্টাইন হইতে অতি আদিম অ্যামিবা পর্যন্ত এই অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের যে ঠমক নাচ, বেয়্‌র্গ্‌স' সেই কাব্যই রচনা করিয়াছেন এবং অনন্ত অবিশ্রান্ত নদীপ্রবাহের ছন্দপতনেই মূর্তবাদ-বিরক্ত ফরাসী দার্শনিক জড়বস্তু স্তূপীকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। হিরাক্লিটাসের 'নিতুই নব' চঞ্চলা নদী বাধা পাইয়া বস্তুকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অবস্তুর নির্মল প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বিঘ্নই উপত্যকা-সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বেয়্‌র্গ্‌স'র প্রাণপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথের চঞ্চলায়—

> বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
> পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেণা উঠে জেগে......

আর—

> যদি তুমি মুহূর্তের তরে
> ক্লান্তিভরে
> দাঁড়াও থমকি,
> তখনি চমকি
> উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে

* * * *

> ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
> অলক্ষ্য-সুন্দরী,
> তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
> তুলিতেছে শুচি করি
> মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

ইহা কাব্য এবং জীবনকে যাঁহারা কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের রোগ-দুঃখ-জরাজীর্ণ এই অতি-পার্থিব কঠিন সংসার চোখে পড়ে নাই, কেন না ইহা দৃশ্যমান। যাহা দৃশ্যমান তাহা পরিণতি মাত্র। পরিণতি বর্তমান এবং পরিণতি অতীতের। বর্তমানে অতীতের অঙ্কুর, অতীতের অস্তিত্ব এবং এই অতীতের অস্তিত্বটাই

বর্তমানে নবরূপ পাইয়াছে। জীবনপ্রবাহের এই প্রেরণার ফলেই আজিকার মানুষ বানর নহে, বানরাতীত অথচ বানরাগত মানুষ। বিবর্তন মানিলে একথা মানিতে হয়, কিন্তু এ বিবর্তন জীবনপ্রবাহের, না, জীব ও জৈবিক পারিপার্শ্বিকের আন্তঃক্রিয়ার প্রসব 'সৃষ্টিকর বিবর্তনে' সে প্রশ্ন অবান্তর।

কিন্তু বেয়র্গ্সঁকে সাংখ্যের অহংকার মানিতে হইয়াছে। জড়বস্তু বুদ্ধির সৃষ্টি। এই বুদ্ধি বিবর্তনের গতিপথে ব্যবহারিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হইয়াছে। সংজ্ঞাহীন পরিবর্তনময় জগৎ বিঘ্নসংকুল। ইহারই জন্য বুদ্ধি; এই বুদ্ধিই জীবনপ্রবাহে ভাগাবিভাগের সৃষ্টি করে। যাহা মূলত অপ্রতিহতপ্রবাহ ছিল তাহাতে এই বৈচিত্র্যের আরোপ। এইরূপে জগতের সৃষ্টি—কঠিন জড়বস্তুর স্থান ব্যাপ্তি। ইহারা বুদ্ধির রচনা। ইহাদের স্বাধীন সত্তা নাই। কাজেই বুদ্ধির সাহায্যে সত্তায় পৌঁছান যায় না, সৎ-বস্তুর নাগাল পাওয়া যায় স্বজ্ঞার (intuition) কল্যাণে। দর্শনের এখানেই মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জীবনপ্রবাহের বেগবান সংকল্পে যদি বুদ্ধি-মান মানুষের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে মানুষের এই সর্বোত্তম প্রচেষ্টাও সফল হইতে বাধ্য। বার্নার্ড শ'র ভাষায়,—

If the weight lifter, under the trivial stimulus of an athlete competition, can 'put up a muscle', it seems reasonable to believe that an equally earnest and convinced philosopher could 'put up a brain.'

বেয়র্গ্সঁ'র মতে জীবনের এই বিবর্তন তিনটি বিভিন্ন পথে বাহিত হইয়াছে। পোষক (vegetative), সাহজিক (instinctive) ও প্রাজ্ঞিক (intelligent)। ইহার সরল উদাহরণ হইতেছে, উদ্ভিদ্, পশু ও মানুষ। আচার্য জগদীশ বসু উদ্ভিদের চেতনা যে স্তরে উন্নীত করিয়াছেন এবং বহু পূর্বেই চার্লস ডারুইন মানুষের আদিম পূর্বপুরুষের সহিত বর্তমান মানুষের যে সাহজিক সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, সেখানে এই শ্রেণীবিভাগ অতি সূক্ষ্ম তারতম্যে বিলীন হইয়া যায়।

বিবর্তনবাদী এই জীবতত্ত্ব ডারুইনের বিজ্ঞান নহে, বেয়র্গ্সঁ'র দর্শন। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যেখানে ডারুইন নির্বিকার ও নিরপেক্ষ থাকিতে পারিয়াছেন, বেয়র্গ্সঁকে সেখানে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। পরিবর্তন লইয়া কোথাও কাহারও সহিত বিরোধ নাই। ডারুইন বলিতেছেন, "আমার দৃঢ় ধারণা যে, প্রজাতিরা কেহই অমর নহে; শাখাপ্রশাখা যেমন কোন একটা প্রজাতি হইতে প্রসূত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে, ঠিক তেমনই যেগুলিকে একই বংশগত বলা হইতেছে, সেগুলি অন্য কোন একটি প্রজাতি, সাধারণত বিলুপ্ত প্রজাতিরই ধারা।"

ইহাতে বেয়র্গ্সঁ'র সেই interpenetration of the past in the present—বর্তমানে অতীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। বেয়র্গ্সঁ ইহাকেই বলিবেন, "আমরা শৈশবকাল হইতে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, ভাবিয়াছি বা ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা আজ বর্তমানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, উহা বর্তমানের সহিত যুক্ত হইতে চাহে। ......ইহা নিঃসন্দেহ যে, আমরা অতীতের কথা অতি সামান্যই ভাবি, কিন্তু আমরা আমাদের সমগ্র অতীত লইয়াই অভিলাষ করি, কামনা করি এবং কাজ করি।"

বেয়র্গ্সঁ'র 'স্মৃতি' বড় বেশী প্রশস্ত ও সর্বব্যাপী। এজন্য তাঁহাকে আসল স্মৃতি ও অভ্যাসগত স্মৃতি এই দুইটি ভাগ করিয়া স্মৃতির ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে আসল স্মৃতি অভ্যাসগত বা মুখস্থ নহে। যান্ত্রিক আচরণতত্ত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া ম্যাক্‌ডুগাল প্রগাঢ় উল্লাসে এই ভেদজ্ঞান সমর্থন করিয়াছেন। বেয়র্গ্সঁ বলেন,—

The past survives under two distinct forms: first in motor mechanisms; secondly, in independent recollections...... The memory of a lesson remembered in the sense of learned by heart has all the marks of a habit...; the memory of each successive reading has none of the marks of a habit...; of these two memories one is pure memory, the other is habit interpreted by memory.

বেয়র্গ্সঁ'র এই স্মৃতিতত্ত্ব একান্তই ভ্রান্ত। যদি অভ্যাসগত স্মৃতিকেই একমাত্র স্মৃতি নাও বলি, তবু এই ভেদবুদ্ধি একান্তই অসঙ্গত ও অসম্ভব। বার বার পড়িয়া মুখস্থ করা ও মনে রাখাকে অভ্যাসগত বলিব, আর একবার শুনিয়া মনে রাখাকে খাঁটি স্মৃতি বলিব, এমন কি কথা? একাধিকবার ছাড়া অভ্যাস হয় না, এমন নহে। একবারেই অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত হওয়া চলে, এমন উদাহরণও অনেক আছে। অধিকন্তু ঘটনা ও ঘটনার ভাষা মনে রাখার মধ্যে পার্থক্য আছে। ঘটনা মনে রাখা সত্ত্বেও প্রকাশ্য ভাষা ভিন্ন হইতে পারে। ঘটনার পারম্পর্য মনে নাই, কিন্তু ভাষা ঠিক আছে, এমনও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, বর্তমানে অতীতের যে অস্তিত্ব, তাহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? আমি রাজাকে দেখিয়াছি, আজ রাজার কথা মনে পড়িল, রাজা কি সেখানে বর্তমান—না, রাজার ছায়া সেখানে মনে পড়িল? স্বপ্নে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্পর্শ ও গন্ধ পর্যন্ত অনুভব করা যায়। সেখানে তাহাদের অস্তিত্বের অর্থ কি? রাসেল একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, এখন যাহাই ঘটুক না কেন, আমি যাহা স্মরণ করিতেছি, তাহা ঘটিতেছে না। আমার যাহা মনে পড়িতেছে, তাহা স্মরণীকৃত ঘটনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যাহারা অনাহারে ধুঁকিতেছে, তাহারা তাহাদের শেষ খাওয়ার কথাটা স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু এই স্মরণে তাহাদের বুভুক্ষার তৃপ্তি হয় না। যখন আমরা স্মরণ করি, তখন রহস্যজনকভাবে অতীতের পুনরুদ্ভব হয় না।

কিন্তু বেয়র্গ্সঁ'র জীবতাত্ত্বিক দর্শনে প্রাণপ্রবাহ অন্ধ প্রচেষ্টা নহে, সম্পূর্ণ সচেতন এবং এই চেতনার পক্ষে বস্তুর পাহাড় সর্বাংশে অকল্যাণকর নহে। ইহাই অহংকার এবং

(শেষাংশ ৪২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিনার্ভা—'নরসি ভগত'

প্রকাশ পিকচার্সের ভক্তিমূলক চিত্র 'নরসি ভগত' সাফল্যের সহিত পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। ছবিটি পরিচালনা করিয়াছেন বিজয় ভাট এবং প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন বিষ্ণুপন্থ পাগনীশ, দুর্গা খোটে, পাণ্ডে, কেশবরাও দাতে, রাম মারাঠে প্রভৃতি।

পাঁচশত বৎসর পূর্বে গুজরাটের এক নিভৃত পল্লীতে বৈষ্ণব কবি নরসি ভগতের আবির্ভাব হয় এবং এই জনপ্রিয় কবির ভগবৎ গাথাগুলি গুজরাটবাসীদের কণ্ঠে আজও গীত হইয়া থাকে। এই কবির রচিত 'বৈষ্ণব জনকো তেনে কহিয়ে—' গানটি মহাত্মা গান্ধীর অতি প্রিয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় উপাসনার সময় এই গানটি নাকি গাওয়া হইয়া থাকে। এহেন এক মহাপুরুষের জীবন কাহিনীসম্বলিত গীতিমুখর চিত্রখানি দেখিবার জন্য আগ্রহাকুল দর্শকের ভিড় যেমন হইতেছে, তেমনি ছবিখানি দেখার পর হতাশ অন্তরে অনেককে ফিরিতেও দেখা যাইতেছে। ছবিখানি পৌরাণিক নহে, পাঁচশত বৎসর পূর্বেকার যে মহাপুরুষের কাহিনী লইয়া ইহা রচিত, তিনি আমাদেরই মতন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, অলৌকিক ও আধিভৌতিক যুগের লোক তিনি ছিলেন না। নানা অলৌকিক ও উদ্ভট ঘটনাসমাবেশে কাহিনীর স্বাভাবিক গতি পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে, যাহা আধুনিক কালের দর্শকদের পক্ষে সুস্থচিত্তে দেখা সম্ভব নহে। ছবিখানি কোনো দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য হয় নাই—না কাহিনী, না পরিচালনায়। কিছুদিন ধরিয়া 'সন্ত' মার্কা ছবিগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করায় পরিচালক এই ধরনের চিত্র গ্রহণের লোভ সামলাইতে পারেন নাই, কিন্তু আধুনিক মনের খোরাক এ ছবিতে নাই, প্রাচীন মতাবলম্বীরাও এই ছবি দেখিয়া কোন দিক দিয়াই খুশী হইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

অভিনেতৃ সম্মেলন এ ছবিতে মন্দ নহে। 'তুকারাম' ও 'তুলসীদাস' চিত্রের পাগনীশ রহিয়াছেন, আর রহিয়াছেন দুর্গা খোটে। পরিচালনার দোষে এই দুইজন খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দানের কোনো সুবিধাই পান নাই। দুর্গা খোটের ন্যায় একজন প্রতিভাবান শিল্পীকে পাগনীশের স্ত্রীর নগণ্য ভূমিকায় অভিনয় করিতে দিবার মধ্যে আমরা কোনো যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। ছবিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একমাত্র গানগুলি। বিশেষভাবে সমবেত কণ্ঠে কয়েকটি ভজন গান সুর ও কথার দিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে।

বোম্বে টকীজের 'আজাদ' চিত্রে অশোককুমার ও লীলা চিট্‌নীশ্‌

নিউ থিয়েটার্সের পরবর্তী চিত্র 'পরিচয়ে' সাইগল ও রতীন বন্দ্যো

উত্তরা—'নিমাই সন্ন্যাস'

মতিমহল থিয়েটার্সের ভক্তিরসাশ্রিত চিত্র 'নিমাই সন্ন্যাস' গত ৪ঠা জানুয়ারী হইতে প্রদর্শিত হইতেছে। ছবিটি পরিচালনা করিয়াছেন—ফনী বর্মা এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন ছবি বিশ্বাস, মণিকা দেশাই, প্রমোদ গাঙ্গুলী, রবি রায়, নিভাননী, সন্তোষ সিংহ, উৎপল সেন প্রভৃতি। কাহিনী ও সংগীত রচনা করিয়াছেন অজয় ভট্টাচার্য। আগামী সপ্তাহে আমরা এই চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

চিত্রা—'নর্তকী'

নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা চিত্র 'নর্তকী' ১৮ই জানুয়ারী শনিবার হইতে প্রদর্শিত হইবে। 'নর্তকী'র হিন্দী সংস্করণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন-সমাদর লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবকী বোস পরিচালিত এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন লীলা দেশাই, ভানু বন্দ্যোঃ, উৎপল সেন, শৈলেন চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক, ইন্দু মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস, জ্যোতি প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন পঙ্কজ মল্লিক।

ছবিঘর—'মায়ামৃগ'

সরমা পিকচার্সের 'মায়ামৃগ' এবং শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী পরিচালিত 'ভালবাসা' ১৮ই জানুয়ারী ছবিঘরে মুক্তিলাভ করিবে। 'মায়ামৃগ' চিত্রের কাহিনী স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমুনাপুলিনে ভিখারিণী' অবলম্বনে গ্রথিত।

ওয়াদিয়া মুভিটোন

'রাজনর্তকী' চিত্রের রাজকীয় মিছিলের দৃশ্যটি জাকজমকের সহিত তুলিবার জন্য পরিচালক মধু বসু সদলবলে বরোদায় গিয়াছেন।

মুভি টেকনিক্

জয়দেবের জীবন-নাটক ও প্রণয়-সাধনার মূল কাহিনী লইয়া শ্রীহীরেন বসুর পরিচালনাধীনে মুভি টেকনিক্ সোসাইটি 'কবি জয়দেব' নামক একখানি ছবি তুলিতেছেন।

'কবি জয়দেব' চিত্রে নাম ভূমিকায় শ্রীহীরেন বসু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যো, জহর গাঙ্গুলী, শ্রীমতী চিত্রা, রাণীবালা, রেবা বসু, নিভাননী প্রভৃতি কুশলী ছায়া-নটনটীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।

বিজলীতে সাহায্য প্রদর্শনী

বীরভূমে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সাহায্যকল্পে বিশ্ব-ভারতীর উদ্যোগে আগামী ১৯শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতে সাড়ে নয়টায় 'বিজলী' ছায়াচিত্রগৃহে পল মুনি অভিনীত 'লাইফ অব এমিল জোলা' চিত্রখানি প্রদর্শিত হইবে। অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের ফলে বীরভূমবাসী কৃষকদের যে মর্মন্তুদ দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার উপশমের জন্য বিশ্ব-ভারতীর এই প্রচেষ্টা যাহাতে সফলকাম হয়, তজ্জন্য দেশবাসীর সহানুভূতি আশা করা যাইতেছে। টিকিট প্রাপ্তির স্থানঃ—বিশ্বভারতী কার্যালয়, ২১০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট; টি আশুমল এণ্ড কোম্পানী, ৭।১০, নিউ মার্কেট; বিজলী চিত্রগৃহ; বি এম সেন (কন্ট্রাক্টার), পি ১৬৪, ল্যান্সডাউন এক্সেটেনশন রোড।

'নিমাই সন্ন্যাস' চিত্রের একটি দৃশ্য। ছবিখানি 'উত্তরা'য় চলিতেছে
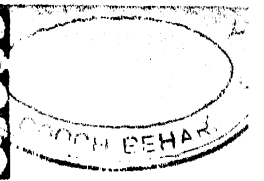
রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় খেলায় পুনরায় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। গুজরাট ক্রিকেট দল এই খেলায় মহারাষ্ট্র দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দল প্রথম খেলিয়া ৫১৮ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। দ্বিতীয় দিনের চা পান পর্যন্ত এই খেলা চলে। এস ডবলিউ সোহনী ১৩০ রাণ ও ভি এস হাজারী ১১৭ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। গুজরাট দলের বোলার বালুকের বলই এই খেলায় কার্যকরী হয়। তিনি এই খেলায় ১২৪ রাণে ৭টি উইকেট দখল করেন। মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়ক অধ্যাপক দেওধর বালুকের বোলিং সাফল্য লক্ষ্য করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া একটি রৌপ্য কাপ প্রদান করিয়াছেন।

অধ্যাপক দেওধরের তোড়া লাভ

গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশন অধ্যাপক দেওধরের পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় সম্মান প্রদর্শনার্থ একটি ১০১৲ টাকার তোড়া অধ্যাপক দেওধরকে প্রদান করেন। অধ্যাপক দেওধর ঐ তোড়ায় অতিরিক্ত ৫৲ টাকা দিয়া গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকে একটী কাপ প্রদান করিবার জন্য দান করেন। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপ খেলোয়াড়কে টাকার তোড়া প্রদান বোধ হয় প্রথম। অধ্যাপক দেওধর টাকাটি প্রত্যর্পণ করিয়া প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছেন।

মুস্তাক আলীর অপূর্ব ব্যাটিং

মহারাষ্ট্র দলের ৫১৮ রাণের প্রত্যুত্তরে গুজরাট দল ৩৩৫ রাণ করিতে সক্ষম হন। এই ইনিংস শেষ হয় তৃতীয় দিনের ৪টা ৩৫ মিনিটের সময়। ফলে কোন দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলিবার সুযোগ লাভ করে না। তিন দিনব্যাপী খেলার নিয়মানুসারে মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল প্রথম ইনিংসে ১৮৩ রাণে অগ্রগামী থাকায় এই খেলায় বিজয়ী হন। গুজরাট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মুস্তাক আলী একা ১৫৬ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি উক্ত রাণ করিতে মাত্র ১৩৭ মিনিট সময় লইয়াছেন। উক্ত রাণ সংখ্যার মধ্যে একটি ওভার বাউণ্ডারী ও ১৯টি বাউণ্ডারী হয়। দলের অপর কোন খেলোয়াড় মুস্তাক আলীকে উপযুক্ত সমর্থন করিতে সক্ষম না হওয়ায় মুস্তাক আলী বিরক্ত হইয়া বেপরোয়া খেলায় আউট হইয়া যান। নতুবা তিনি আরও অধিক রাণ করিতে পারিতেন বলিয়া অনেকেরই ধারণা। তাহা ছাড়া তিনি এই খেলায় দ্রুত রাণ সংগ্রহের এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি প্রথম ৫০ রাণ ৪২ মিনিটে, দ্বিতীয় ৫০ রাণ ৪০ মিনিটে ও তৃতীয় ৫০ রাণ ৪৩ মিনিটের মধ্যে করেন। এই বৎসর ভারতের কোন বিশিষ্ট খেলোয়াড় কোন খেলাতেই এইরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। দলের অধিনায়ক হইয়া দলের পতন মুখে এইরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা প্রদর্শন সত্যই প্রশংসনীয়।

মহারাষ্ট্র দলের কৃতিত্ব

মহারাষ্ট্র দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে ৬৭৫ রাণ করিতে সক্ষম হন। দলের অধিনায়ক অধ্যাপক ২৪৬ রাণ ও এস ডবলিউ সোহনী ১২০ রাণ করেন। দ্বিতীয় খেলায় গুজরাট দলের বিরুদ্ধে তাঁহারা ৫১৮ রাণ করিয়াছেন। এস ডবলিউ সোহনী ১৩৪ রাণ ও ভি এস হাজারী ১১৭ রাণ করিয়াছেন। প্রথম খেলাটি পুণায় ঘাসের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় খেলাটি আমেদাবাদে ম্যাটিংয়ের উপর খেলা হইয়াছে। ম্যাটিংয়ের উপর খেলা হওয়া সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র দল অধিক রাণ করিয়া ও দলের দুইজন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়া পূর্ব খেলার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। রণজি ক্রিকেট প্রতিজোগিতায় দুইটি খেলায় পর পর কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যলাভ করায় তাঁহারা যে এই বৎসর রণজি ক্রিকেট কাপ বিজয়ী হইবেন সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

খেলার বিবরণ

মহারাষ্ট্র দল খেলা আরম্ভ করিয়াই একটি উইকেট হারায়। আর নিম্বলকার ইহার পর খেলায় যোগদান করেন। তিনি সোহনীর সহযোগিতায় ১০৭ রাণ করিতে সক্ষম হন। তিনি দুই ঘণ্টা খেলিয়া একটি ওভার বাউণ্ডারী, ৫টি বাউণ্ডারীর সাহায্যে ৬৬ রাণ করিয়া আউট হন। অধ্যাপক দেওধর খেলায় যোগদান করেন। তিনিও মাত্র ১৯ রাণ করিয়া ১৫৩ রাণের সময় আউট হন। উহার পর হাজারী সোহনীর সহিত যোগদান করেন। প্রথম দিনের শেষে মহারাষ্ট্র দলের ৩ উইকেটে ২৯৫ রাণ হয়। সোহনী ১৩০ রাণ ও হাজারী ৬৭ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করিবার অল্প পরেই সোহনী ১৩৪ রাণ করিয়া আউট হন। হাজারী দৃঢ়তার সহিত খেলিতে থাকেন। হাজারী চারি ঘণ্টা খেলিয়া নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করেন। মহারাষ্ট্র দলের ৩৬৬ রাণে ৫টি উইকেট পড়িয়া যায়। হাজারী ৪০৪ রাণের সময় ১১৭ রাণ করিয়া আউট হন। ইহাতে সকলের ধারণা হয়, মহারাষ্ট্র দলের ইনিংস ৪৫০ রাণেই শেষ হইবে। কিন্তু দলের শেষ খেলোয়াড়গণ যাদব, উবাক আমেদ ও সারভাতে প্রত্যেকে পিটাইয়া খেলিয়া রাণ সংগ্রহ করেন। চা পানের পূর্বে মহারাষ্ট্র দল ৫১৭ রাণ করিয়া আউট হন।

গুজরাট দল পরে খেলা আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে ১ উইকেটে ৪৫ রাণ করে। আর প্যাটেল ২০ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের সূচনায় ৬৪ রাণে আরও দুইটি উইকেট পড়িয়া যায়। মুস্তাক আলী খেলায় যোগদান করিতেই দলের অবস্থা পরিবর্তন হয়। তিন ঘণ্টার খেলায় গুজরাট দলের ২০০ রাণ হয়। প্যাটেল ৬৪ রাণ করিয়া আউট হইলে পুনরায় গুজরাট দলের পতন দেখা দেয়। কিন্তু মুস্তাক আলী সমানে পিটাইয়া খেলিতে থাকেন। ১২৩ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ১৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ২৭৭ রাণে ৫টি উইকেটের পতন হয়। ইহার পরে একমাত্র খাম্বাটা ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে পারেন না। সারভাতের বোলিং বিপর্যয় সৃষ্টি করে। খাম্বাটা ৪২ রাণ করিয়া আউট হন। গুজরাট দলের প্রথম ইনিংস তৃতীয় দিনে বেলা ৪টা ৪৫ মিনিটে ৩৩৫ রাণে শেষ হয়। সারভাতে ৭১ রাণে ৫টি ও হাজারী ৭২ রাণে ৩টি উইকেট পান।

খেলার ফলাফল:—

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংস:—৫১৮ রাণ (এস ডবলিউ সোহনী ১৩৪, আর নিম্বলকার ৬৬, ভি এস হাজারী ১১৭, যাদব ৩৮, উবাক আমেদ ৩৮, সি সারভাতে ৩৬ রাণ নট আউট, বালুক ১২৪ রাণে ৭টি, সি প্যাটেল ৭০ রাণে ২টি ও ভগবান দাস ৮৪ রাণে ১টি উইকেট পান)।

গুজরাট প্রথম ইনিংস:—৩৩৫ রাণ (আর প্যাটেল ৬৪, মুস্তাক আলী ১৫৬, পি খাম্বাটা ৪২, বালুক নট আউট ২০,

ভি হাজারী ৭২ রাণে ৩টি, সি সারভাতে ৭১ রাণে ৫টি ও এস সোহনী ৬০ রাণে ২টি উইকেট পান)।

(মহারাষ্ট্র দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিজয়ী)

নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি বরোদায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সকল প্রদেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন। একমাত্র পাঞ্জাবের বিশিষ্ট খেলোয়াড় এস এল আর সোহানী কোন বিশেষ কারণে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন নাই। গউস মহম্মদ এই প্রতিযোগিতার সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস ফাইনালে স্ট্রেট সেটে বিজয়ী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন প্রতিযোগিতায় গউস মহম্মদ এইরূপ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। গউস মহম্মদের এই সাফল্য প্রশংসনীয়।

মহিলাদের বিভাগে কুমারী লীলারাও একমাত্র সিংগলসে বিজয়ী হইয়াছেন। ডাবলসের খেলায় তিনি মিস ডুবাসের সহ-যোগিতা লাভ করিয়াও অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিপক্ষ মিস হাজী ও মিস ম্যানসোনী অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন। বিজয়ী দুইটীর মধ্যে সিংহল-বাসিনী মিস ম্যানসোনীর খেলা সর্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য হয়।

পেশাদারদের বিভাগে সিংগলস ও ডাবলস উভয় ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। সিংগলসে সিরাজুল হক বিজয়ী হইয়াছেন। ডাবলসে তমাস খাঁ ও মুরাদ খাঁ, অভিজ্ঞ আল্লাবক্স ও রামসেবককে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা হিসাবে এই প্রতি-যোগিতাটিতে যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, সেইরূপ হয় নাই। সুব্যবস্থার অভাবের জন্যই এইরূপ হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

বাঙালী খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব

বাঙলার তরুণ টেনিস খেলোয়াড় দিলীপ বসু এই প্রতি-যোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরুষদের সিংগলসের খেলায় তিনি সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উপনীত হইতে সক্ষম হন। সেমি-ফাইনালে তাঁহাকে গউস মহম্মদের নিকট পরাজয় বরণ করিতে হইলেও যেরূপ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে সকলকে প্রশংসা করিতে হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে বিশেষ বেগ দিতে পারিবেন, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ক্রীড়াকৌশলের ক্রমোন্নতি হউক ইহাই আমাদের কামনা। নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল।

খেলার ফলাফল :—

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল

গউস মহম্মদ ৬—০, ৬—০, ৭—৫ গেমে ইফ্‌তিকার আমেদকে পরাজিত করে।

পেশাদারদের ডাবলস ফাইনাল

মুরাদ খাঁ ও তমাস খাঁ ৬—১, ৬—৪, ৬—৮, ৬—৩ গেমে রামসেবক ও আল্লাবক্সকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল

কুমারী লীলারাও ৬—৪, ৬—১ গেমে মিস এম ডুবাসকে পরাজিত করে।

ছোটদের সিংগলস ফাইনাল

জি বসন্ত ৬—৩, ২—৬, ৮—৬ গেমে সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করে।

পেশাদারদের ডাবলস ফাইনাল

গউস মহম্মদ ও যুধিষ্ঠির সিং ৬—৩, ৬—২, ৬—২ গেমে ইফ্‌তিকার আমেদ ও ডি এন কাপুরকে পরাজিত করে।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

গউস মহম্মদ ও মিস এম ডুবাস ৬—৪, ৬—৩ গেমে ইফ্‌তি-কার আমেদ ও মিস এল উওব্রিজকে পরাজিত করে।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিস কে হাজী ও মিস ডি ম্যানসনী ৬—১, ৬—৮, ৬—২ গেমে কুমারী লীলারাও ও মিস এম ডুবাসকে পরাজিত করে।

পেশাদারদের সিংগলস ফাইনাল

সিরাজুল হক ৬—২, ৫—৭, ৬—২, ৬—১ গেমে নুর মহম্মদকে পরাজিত করে।

মাদ্রাজে আন্তঃর্জাতিক ক্রিকেট খেলা

মাদ্রাজে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের আন্তঃর্জাতিক ক্রিকেট খেলা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলা তিন দিন ব্যাপী হয়। ভারতীয় দল খেলায় ৯৭ রাণে বিজয়ী হইয়াছে।

ভারতীয় দল প্রথমে খেলিয়া ২০৯ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। রামসিং ৪৪ রাণ ও এম গোপালন ৫১ রাণ করেন। ইউরোপীয় দলের ব্রাউন ৪৮ রাণে ৫টি, স্পিটলার ৮৭ রাণে ২টি ও ম্যাকহাটন ২৬ রাণে ২টি উইকেট পান। ইউরোপীয় দল পরে খেলিয়া ১৬৪ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। রীড ৫৯ রাণ ও জনস্টন ৩৯ রাণ করিতে সমর্থ হন। ভারতীয় দলের রামসিং ৫৭ রাণে ৪টি, রঙ্গচারী ৪১ রাণে ৪টি ও কৃষ্ণরাও ১৭ রাণে ২টি উইকেট পান।

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংস্ ১৬৮ রাণে শেষ করে। মাধব-রাও ৫৫ ও ভদ্রদ্রী ৫৪ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইউরোপীয় দলের ব্রাউন এই ইনিংসেও ৬৪ রাণে ৫টি উইকেট পান। সি পি জনস্টনও ১৭ রাণে ৩টি উইকেট দখল করেন।

ভারতীয় দলের ২১৩ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া ইউরোপীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এইচ ওআর্ড ব্যতীত কোন খেলোয়াড় অধিক রাণ করিতে সমর্থ হন না। রামসিং ও রঙ্গচারীর বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। ইউরোপীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১১৬ রাণ হয়। রামসিং ৫৯ রাণে ৬টি ও রঙ্গচারী ৩০ রাণে ৪টি উইকেট পান। ভারতীয় দল খেলায় ৯৭ রাণে বিজয়ী হন।

খেলার ফলাফল :—

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস :—২০৯ রাণ (রামসিং ৪৪, পার্থসারথী ৩২, এম গোপালন ৫১, ব্রাউন ৪৮ রাণে ৫টি, স্পিটলার ৮৭ রাণে ২টি, ম্যাকহাটন ২৬ রাণে ২টি ও সি জনস্টন ১৬ রাণে ১টি উইকেট পান)।

ইউরোপীয় দলের প্রথম ইনিংস :—১৬৪ রাণ (সি জনস্টন ৩৯, সি রীড ৫৯, এইচ ওআর্ড ২৪, রামসিং ৫৭ রাণে ৪টি, রঙ্গচারী ৪১ রাণে ৪টি, কৃষ্ণরাও ১৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—১৬৮ রাণ (ভি মাধবরাও ৫৫, বি ভদ্রদ্রী ৫৪, এম গোপালন ২৫, ব্রাউন ৬৪ রাণে ৫টি, সি জনস্টন ১৭ রাণে ৩টি, স্পিটলার ৪৩ রাণে ১টি উইকেট পান)।

ইউরোপীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—১১৬ রাণ (নেলার ২১, এইচ ওআর্ড ৩৯, রামসিং ৫৯ রাণে ৬টি ও রঙ্গচারী ৩০ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

(ভারতীয় দল ৯৭ রাণে বিজয়ী)
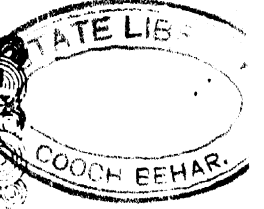
জীবজন্তুদের গতিবেগ

বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা মানুষ অতি অল্প সময়ে বহু দূরত্বপথ অতিক্রম করবার অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেছে। জীবজগতের বহু জীব মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিকাশের বহু পূর্বেই নিজেদের দ্রুতবেগের পরিচয় দিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে কোন কোন জন্তু আকারে অন্যান্য জীব অপেক্ষা ক্ষুদ্র হলেও, দৌড় প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর জীবকে অনায়াসে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। জল, স্থল এবং আকাশ সর্বত্রই নিকৃষ্ট জীবেরা নিজেদের আধিপত্য রক্ষা করে আসছে। মাটীর উপর তাদের গতিবিধি এতই দ্রুতবেগে চলে যে, আমরা তাদের এ কৌশলকে প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। Cheetah নামে এই জাতীয় জীব দ্রুতগামী বলে সুনাম অর্জন করেছে। এই জাতীয় জীব দেখতে অনেকখানি বড় বেড়ালের মত। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার জঙ্গলে এই সব জীবের বাসস্থান। এরা আবার Hunting-Leopard নামে পরিচিত। কোন কোন দেশে কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করবার জন্যে Hunting-Leopard'কে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে শিকারের কাজে লাগান হয়। শিকারের সময় এদের গরুর গাড়ী করে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শিকারের আবির্ভাব হলেই মুখের আবরণ খুলে ফেলা হয়। শিকারকে দেখা মাত্র তার দিকে অতি ধীর গতিতে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ শিকারের উপর তড়িৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় যে, শিকার কদাচিৎ শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়।

জিরাফের লম্বা লম্বা পাগুলি দ্রুত-বেগে দৌড়ানর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জিরাফ এতখানি দ্রুতগামী যে, প্রথম শ্রেণীর দ্রুতগামী ঘোড়াকেও সময়ে সময়ে দূরত্ব পথে পশ্চাতে রেখে যেতে পারে। কিন্তু এদের গলা শরীরের তুলনায় অনেকখানি লম্বা থাকায় অপরাপর দ্রুতগামী জন্তুদের পরাস্ত করতে পারে না।

দ্রুতবেগে দৌড়ান ছাড়া হরিণ এবং ঐ জাতীয় কয়েক শ্রেণীর জন্তুর আত্মরক্ষা করবার আর কোন উপায় নেই। কোন কোন জাতীয় হরিণ স্বজাতীয় ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জীব-দেরও অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারে।

উট খুব বেশী জোরে দৌড়তে পারে না। কিন্তু Dromedaries নামে এক শ্রেণীর উট ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতই দৌড় দেয়।

কয়েক জাতীয় জন্তুর পিছন দিকের পা দুটি সামনের পা দুটির থেকে অনেক বড় হয়। ক্যাঙ্গারু, জাম্পিং-হেয়ার, জারবোস, কানাডার জাম্পিং-মাউস এবং Elephant shrews এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় সকল জীবই উচ্চ লম্ফ দানে বিশেষ পারদর্শী। বেশীর ভাগ শ্রেণীর ক্যাঙ্গারু প্রতি লম্ফে প্রায় ত্রিশ ফিট দূরত্বপথ অতিক্রম করে। জাম্পিং-হেয়ার ও Springhas দেখতে সাধারণ খরগোসের মত। কিন্তু যখনই শত্রুর আক্রমণের চাপ পড়ে, তখনই দ্রুতগতিতে লম্ফ দিতে থাকে। জারবোস আকারে ইঁদুরের চেয়ে বেশী বড় নয়, কিন্তু প্রতি লাফে নয় ফিট পথ পার হয়ে যায়।

কানাডার জাম্পিং-মাউস আকারে তিন ইঞ্চির বেশী বড়

বেণীবদ্ধ অশ্বপুচ্ছ

বেণীবদ্ধ তরুণীর কেশভার

নয়। অথচ আট থেকে দশ ফিট পর্য্যন্ত লাফ দিয়ে যেতে এদের বেশী পরিশ্রম হয় না। কমন বা ব্রাউন-হেয়ার একটি নামজাদা দ্রুতগামী জীব বলে পরিচিত। এরা মাটী থেকে উপরে প্রায় পাঁচ ছয় ফিট লাফিয়ে পনের ফিট দূরত্ব পথ অতিক্রম করে।

জলচর এবং আধা-জলচর জীবের মধ্যে গটার, ভোঁদড়, সীল, সী-লায়ন এবং Dolphins ক্ষিপ্রগতিতে জলের মধ্যে সাঁতার দেয় বলে এদের 'Arrow of the sea' বলা হয়। ভোঁদড় বেশীর ভাগ সময় তার চ্যাপটা ল্যাজের সহযোগীতায় জলের চারি পাশে সাঁতার দিয়ে শিকারের সন্ধান নেয়, সঙ্গীদের সাথে লুকোচুরি খেলা করে। পশুশালায় এমন কি সাধারণ জলাশয়ের মধ্যেও ভোঁদড়দের গোল আকারের কোন বস্তুকে বল হিসাবে নিয়ে জলের মধ্যে তীব্র গতিতে খেলতে দেখা গেছে। বিপক্ষের মুখ থেকে লক্ষ্যবস্তুকে সংগ্রহ করবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকলের মধ্যেই লক্ষিত হয়। ফলে জলের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে অনেকেই বহু দূরত্ব পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতে যে বিশেষ পারদর্শী তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাখীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী হচ্ছে swift পাখী। প্রতি মিনিটে তিন মাইল এমন কি তারও বেশী পথ এরা উড়ে যায়। গরমকালে swift পাখীর দল প্রতিদিন ঊনিশ ঘণ্টা আকাশে উড়ে বেড়ায়।

Virginian Plover প্রতি ঘণ্টায় প্রায় দু'শ মাইল পথ উড়তে পারে। Peregrine Falcon এক'শ থেকে এক'শ পঞ্চাশ মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। ছোট ছোট পাখীদের মধ্যে যেমন ব্লাক বার্ড, ফিঙে এরা পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল পথ প্রতি ঘণ্টায় উড়ে যায়। গৃহ-পালিত সকল পাখীই অল্পবিস্তর উড়তে পারে। তবে সব চেয়ে দ্রুতগামী বলে Homing Pigeonএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্রুতগতিতে বহু দূরত্ব পথ অতিক্রম করবার ক্ষমতা এদের অদ্ভুত। প্রতি মিনিটে এরা এক মাইল পথ উড়ে যায় আর দু'শ মাইল পর্য্যন্ত এই গতিবেগ এরা ঠিক বজায় রেখে যেতে পারে। এই জাতীয় পায়রাকে সংবাদ বহনের কাজে লাগান হয়। বিশ্বস্ত বন্ধুর মত স্মরণাতীত যুগ থেকে পায়রা সংবাদ বহনের কাজে নিজেদের অটুট বিশ্বাস এবং সাহস দুই রক্ষা করে আসছে। গত মহাযুদ্ধে সংবাদ প্রেরণের বৈজ্ঞানিক কলকব্জা যখন একেবারে অচল হয়ে পড়ত অথবা গোপনীয় জরুরী সংবাদ পাঠান যখন খুবই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ত সে সময়ে Homing Pigeonএর সাহায্যে সংবাদ পাঠান ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আত্মরক্ষা, অতি অল্প সময়ে শিকারের সন্ধান এবং খাদ্যদ্রব্যের অভাব যাতে নিজেদের না আসে তার জন্য জীবজন্তুদের গতিবেগের অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোন কোন জীবের দ্রুত গতিতে দৌড়বার ক্ষমতা না থাক্‌লেও তারা অন্য উপায়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে আসছে। মানুষ বুদ্ধিমান জীব; যে সব জীবজন্তু দ্রুতগামী তাদের পোষ মানিয়ে নিজেদের নানা কাজে লাগিয়েছে। বুদ্ধি বিকাশের ফলে তারা আজ আর নিকৃষ্ট জীবজন্তুর উপর আগের মত নির্ভরশীল নয়। বৈজ্ঞানিক কলকব্জার আবিষ্কারে আজ মানুষ দ্রুতগামী যানবাহন নির্ম্মাণ করে তাদের পুরাতন বন্ধুদের পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে এসেছে। সেই সব দ্রুতগামী গৃহপালিত জীবজন্তুর করুণা দৃষ্টি, আমাদের বৈজ্ঞানিক চোখে ঝাপসা হয়ে গেছে, তাদের কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহের দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ুমণ্ডলের কোথায় মিলিয়ে গেছে সে সংবাদ রাখবার প্রয়োজন, আগ্রহ এবং সময়ও আমাদের নেই।

দক্ষিণাপথ ভ্রমণ

(৪০৬ পৃষ্ঠার পর)

নি। মাদ্রাজে যে সকল বাঙালী পরিবার বাস করেন, তাঁরাও মাদ্রাজী মহিলাদের এই বেশ-বিন্যাস হুবহু অনুকরণ করেছেন দেখলাম। যারা গরীব তাদের মধ্যে রুচিবিগর্হিত ভাব বড় একটা দেখ্‌তে পাই নি। লোক সাধারণত সরল, সহিষ্ণু ও মিতব্যয়ী। কুম্ভকোণামের ব্রাহ্মণরা তেমন সরল নয় বলে তাদের একটু অপবাদ আছে। কিন্তু সাধারণত সর্বত্রই সদ্‌ব্যবহার, মিষ্ট কথা এবং শিষ্টাচার পেয়েছি। কুলিরা বিরক্ত বেশী করে না, পাণ্ডারা অর্থগ্রাসী নয় এবং কোথাও গুণ্ডামির দৃশ্য চোখে পড়ে নি। তবে তীর্থস্থানে ভিখারীর ভীড় মন্দ নয়। রামেশ্বরে তাদের সংখ্যা ও পীড়াপীড়িতে ধৈর্য্যের সীমা রক্ষা করা দায় হয়ে ওঠে।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করে' কন্যা-কুমারী ও শুচীন্দ্রম্ পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। বহু দূর মোটরে যেতে হয়েছিল। ত্রিবাঙ্কুরের রাস্তা অতি সুন্দর। যেমন নৈসর্গিক শোভা তেমনই পথ সুরক্ষিত। কোথায়ও বে-মেরামত অবস্থার জন্য অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। আমাদের ত্রিবান্দ্রম্ যাবার খুব ইচ্ছা ছিল। সার নৃপেন্দ্র সরকার সেখানকার দেওয়ান সার সি পি রামস্বামীকে চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যখন কন্যা-কুমারীতে যাই, তখন সার সি পি ছিলেন দিল্লিতে এবং তার পর কলিকাতায় এসেছিলেন। সেইজন্য আমার আর ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী দেখা হয় নি। কন্যা-কুমারীর মন্দিরটি অতি যত্নে রক্ষিত হয়েছে। সেখানকার রাস্তাঘাটও অতি চমৎকার। সমুদ্রের উপরে পান্থশালা ও একটি সাহেবী হোটেল আছে। ভারতের শেষ প্রান্ত হ'তে কিছু দূরে সমুদ্রের মধ্যে দুইটি পাহাড় মাথা তুলে রয়েছে, তার একটিতে স্বামী বিবেকানন্দ তপস্যা করেছিলেন। ঐ পাহাড়ে যাবার জন্য তাঁকে সাঁতার দিতে হয়েছিল। নৌকায়ও যাওয়া যায়। সমুদ্রে তরঙ্গ নেই বল্‌লেই চলে। মন্দিরের নিকটে স্বামী বিবেকানন্দের নামে একটি পাঠাগার আছে। সেই সুদূর প্রান্তে স্বামীজীর স্মৃতির সৌরভটুকু বড় ভাল লেগেছিল। একজন গৈরিকধারী আমাকে সেই পাঠাগার দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পুস্তক পরিচয়

রণ ও রাষ্ট্র—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কমলা বুক ডিপো, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে, আমরা বাঙালী যুদ্ধের ঘটনাগুলিই সংবাদপত্রে পড়ি এবং তাহার ভীষণতাই শুধু উপলব্ধি করি; কিন্তু সমর-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। যুদ্ধ একটা পাশবিক ব্যাপার, আমরা শুধু ইহাই বুঝিতে শিখিয়াছি, কিন্তু ইহা যে নিছক অন্ধ পশুশক্তির প্রকোপ নয়, ইহার পিছনে নীতি আছে, শৃংখলা আছে, ত্যাগ আছে, মোট কথায় ইহার মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব আছে এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে এই বিদ্যাটাও যে জানা দরকার তাহা আমরা বুঝি না। শুধু তাহাই নহে, এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে যুদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদগুলি আমরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারি না। মানুষের আনন্দ লাভ হয় জানাতে, কিন্তু জানিবার মত জানিতে হইলে সে পথ বিদ্যার পথ। পরাধীনতার কল্যাণে সমরবিদ্যা আমাদের অনধিগত। জগতে থাকিয়াও যুদ্ধের ভিতর আধুনিক জগতের এই যে আত্মাভিব্যক্তি, তাহার সম্পর্ক হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের জীবন হইয়া পড়িয়াছে শুধু কতকগুলি দার্শনিকতার সূত্রগত, বাস্তবের সংগে বিজ্ঞানগত যোগে তাহা বলিষ্ঠ নয়। দুর্বলের এ জীবন, ভীরুর এ জীবন, পরনির্ভর দাসেরই এ জীবন। এ জীবন ঘটনাচক্রে গড়াইয়া চলিতেই জানে, ঘটনা ঘটাইবার মত আত্মপ্রতিষ্ঠ আনন্দরসের একান্ত সংযোগ হইতে এ জীবন বিচ্যুত। আত্মপ্রতিষ্ঠ এই বলিষ্ঠ জীবন যদি আমাদের গড়িয়া তুলিতে হয় এবং যাহাকে আমরা মানুষের প্রাথমিক অধিকার বলি, তাহা যদি অর্জন করিতে হয়, তবে সমর-বিজ্ঞান শিখিতে হইবে এবং সে বিজ্ঞানের যাহাতে সমাজে সম্প্রসারণ ঘটে সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

দিগিন্দ্রবাবু সে অভাব এই পুস্তকের দ্বারা অনেকটা পূরণ করিয়াছেন। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, সাময়িক ধারার সংগে রসের যোগ রাখিয়া বিজ্ঞানের কথা বলিতে পারেন, ঐতিহাসিক তথ্যের বিস্তার করিতে জানেন। সরকারী দপ্তরের শুষ্ক হিসাবপত্রও কেমন করিয়া সরস করিয়া তুলিতে হয়, শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকসুলভ লেখনীর সে কৌশল তাঁহার আছে। আলোচ্য গ্রন্থে সমরনীতির ব্যাপক আলোচনা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু শুষ্কতা কোথায়ও নাই। উপন্যাসের মতই ২৭২ পৃষ্ঠার এত বড় বইখানা এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। বইখানা পড়িয়া বর্তমান যুদ্ধের নীতি এবং কৌশল সম্বন্ধে পূর্ণভাবে একটা স্পষ্ট ধারণা তো পাওয়া যায়ই, তাহা ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগে সংগে লাভ করা যায়। এত অধিক সংখ্যক তথ্যকে গোছাইয়া লইয়া সরসভাবে ব্যক্ত করিবার যে কৌশল দিগিন্দ্রবাবুর লেখায় দেখা গেল, তাহাতে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থের 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক অধ্যায়টি 'ভারতে মোগল সেনা', 'ভারতে নৌযুদ্ধ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্য-সন্নিবেশে যেমন চিত্তাকর্ষক ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ ভারতের আধুনিক বল, 'সেনাদল ভারতীয়করণ' প্রভৃতি ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিন্যাসকৌশলের ভিতর দিয়া স্বদেশ প্রেমের উদ্বোধক ব্যঞ্জন ভংগীতেও লেখাটি হইয়াছে বিশেষ উপভোগ্য।

আকাশ-যুদ্ধই আধুনিক সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দিগিন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্লাডার, কনভয়, বিমান আক্রমণের রীতি, বিমানে ফটোগ্রাফী, প্যারাশুট বাহিনী সবই রহিয়াছে তাঁহার আলোচনায়। সুন্দর ফটোচিত্রের দ্বারা সে আলোচনা সরস করা হইয়াছে। প্রায় ৫০খানা ছবি আছে এই বইখানাতে।

এমন একখানা পুস্তক লিখিতে গ্রন্থকারকে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। আমরা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি যে, তাঁহার সে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহে, বিষয় নির্বাচন এবং বিশ্লেষণে ও তাহার পারিপাট্য সাধনে আলোচ্য পুস্তকখানা সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানা বাঙলা দেশের একটি প্রধান অভাব পূরণ করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থে প্রত্যেকের পক্ষে অনেক বিষয় জানিবার, বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার আছে। এ দেশের সর্বত্র, বিশেষভাবে যুবকদের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার হয়, আমরা ইহাই চাই।

শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত—(সচিত্র) শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী মহারাজ প্রণীত এবং ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড কোং লিমিটেড হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। ৫৩০ পৃষ্ঠা; মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

জীবন-চরিত প্রণয়ন কার্য অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহার উপর যদি কোন সাধু মহাপুরুষের জীবনী লিখিতে হয় এবং তাহা আবার যদি তাঁহারই কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যকেই লিখিতে হয়, তবে ইহা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কঠিন বলিতেছি এই জন্য যে, ভক্তের পক্ষে উচ্ছ্বাস ও ভাবালুতাবর্জিত মনোবৃত্তি লইয়া জীবনী রচনা করায় স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক থাকিবেই। অথচ অন্তরঙ্গ পাত্র ব্যতীত এ কার্য করাও চলে না। যাহা হউক, বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এ বিষয়ে কতকটা তাঁহার গুরুদেবেরই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ সন্তদাস বাবাজী যেভাবে তাঁহার মহান্ গুরুদেব কাঠিয়া বাবার একখানি জীবনী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, লেখকও ঠিক সেইভাবেই সন্তদাসের জীবন-চিত্রকে স্তরে স্তরে বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবার একটা আন্তরিক প্রয়াস পাইয়াছেন।

যে মহাপুরুষ সম্পর্কে এই সুবৃহৎ ও সুন্দর জীবন-চরিতখানি লিখিত হইয়াছে, তাঁহার সংগে আমার নিগূঢ় আত্মিক পরিচয় ছিল। যৌবনে তারাকিশোর উপবীত-ত্যাগী, সংস্কার-সমর্থক ব্রাহ্ম ছিলেন; পরিণত বয়সে সাত নদীর জল এক করিয়া আবার হইয়াছিলেন গোঁড়া হিন্দু। হিন্দু সমাজের কাছে বোধ করি তাঁহার এইটুকুই পরিচয়। কিন্তু তিনি ছিলেন কি, হইলেন কি ও করিলেন কি, এসব খোঁজ লইবার বোধ করি আমাদের (বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষিত যুবক-বৃন্দের) ইচ্ছা নাই, অধিকার নাই ও শক্তি নাই। যাহারা খুব-সরল সত্যপ্রিয় লোক, তাহারা অনেক সময়েই ঘরের ময়লা দেখিয়া, ঘর ছাড়িয়া নূতন পথ সন্ধান করিয়াছে; কিন্তু তাহার মধ্যে ঘরের প্রতি কোন অবজ্ঞা নাই। সেইখানেই বিদ্রোহ সার্থক, যেখানে সত্য মিলে। তারাকিশোর ছিলেন এমনি একজন অত্যাশ্চর্য বিদ্রোহী।

ব্রাহ্ম তারাকিশোরের অন্তর্জীবনের পরিণত মূর্তি হইল ভক্তশ্রেষ্ঠ সন্তদাস বাবাজী। ধর্ম আর ভগবান এক—এত বড় কথা বলিবার অধিকার যে মহাপুরুষদের থাকে, সন্তদাস বাবাজী সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ। তিনি তাঁহার তপস্যা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর্লোকের ভাবজীবনটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সেই আজীবনের সাধনায় সত্যলোকে যাত্রার ইতিহাসটি আপনা আপনি লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। গ্রন্থকার সরলভাবে খুঁটিনাটির সহিত তাহাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ভগবানের কথা ভক্তের মুখে, গুরুর কথা শিষ্যের মুখে যেভাবে শুনিলে উপকার হয়, ঠিক সেই-ভাবেই তিনি সন্তদাস-চরিত শুনাইয়াছেন—গ্রন্থকার তথা গ্রন্থের কৃতিত্ব এইখানেই। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সন্তদাস বাবাজী সমগ্র জাতির ও তাঁহার জীবন-মরণ পণ করা সত্যপ্রতিষ্ঠার বিরাট সাধনা—তাহাও এই হৃতসর্বস্ব জাতির জন্যই। এ সত্যপ্রতিষ্ঠা কর্মেরই প্রবর্তক। ভারতীয় সাধনার নিভৃত তপঃক্ষেত্র হইতে বিস্মৃত মহাপুরুষ-দের জীবনীগুলি এইভাবে একে একে আহরণ করিবারু দরকার হইয়া পড়িয়াছে—জাতির নিজস্ব ধর্ম ও কৃষ্টিকে পশ্চিমের সর্বগ্রাসী মোহ হইতে মুক্ত করিবার জন্য। প্রকৃত মহাপুরুষদের জীবন-চরিতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত তাই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন:—

"তুলয়ামলবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী—চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক; ৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। সম্পাদক কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী। সারগর্ভ এবং চিন্তাশীলতাপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনীর খ্যাতি আছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধে জানিবার এবং প্রতি গৃহস্থের বুঝিবার অনেক কাজের বিষয় থাকে। আলোচ্য সংখ্যায় কবিরাজ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী ষড়দর্শনাচার্য লিখিত আয়ুর্বেদে টর্লামিনিটিক রোগের চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদে জীবানুতত্ত্ব, চরকসংহিতার টিপ্পনী কবিরাজ শ্রীযুত বিধুভূষণ সেন, কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, ইঁহাদের লিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা উত্তরোত্তর এই পুস্তিকার সমৃদ্ধি কামনা করি।

সাহিত্য সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

আগামী ২৭শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১, ৪৯ বি নং কালি দত্ত ষ্ট্রীটস্থ ভগবতী ইনষ্টিটিউসনে জাগৃহি সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে বেলা ১ ঘটিকার সময় সর্বসাধারণের জন্য একটি রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হইবেন তাঁহাকে একটি চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একখানি রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে, যিনি দ্বিতীয় হইবেন তাঁহাকে একটি চ্যালেঞ্জ কাপ ও একখানি রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে এবং আরও চারখানি রৌপ্যপদক যোগ্যতানুসারে পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি হইতে কমিটির নির্ধারণ মত একটি অবলম্বন করিয়া রচনা লিখিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে কমিটির বিচারই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিষয়ঃ—১। শরৎ সাহিত্যে নারী, ২। যাহাই চকচক করে তাহাই সোনা নহে, ৩। পল্লী-সংস্কার। নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাম ও ঠিকানা ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ মল্লিক (প্রতিযোগিতা সম্পাদক) ৪৯ বি, কালি দত্ত ষ্ট্রীট।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

ভদ্রকালী সাহিত্য সমিতির "মিলনী" বিভাগের পক্ষ হইতে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা যাইতেছে। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—শরৎ-সাহিত্যে পুরুষ চরিত্র।

প্রথম স্থান অধিকারীকে একটি সুদৃশ্য রৌপ্য-পদক উপহার দেওয়া হইবে। অধিক প্রবন্ধ পাইলে দ্বিতীয় স্থান অধিকারীও জনৈক সাহিত্য-রসিক কর্তৃক পুরস্কৃত হইবেন। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ১লা ফাল্গুন। শ্রীতারকদাস মিত্র, সম্পাদক—মিলনী বিভাগ, ধর্মতলা লেন, ভদ্রকালী কোতরং (পোঃ), হুগলী।

বেয়র্গসঁর প্রাণপ্রবাহ

(৪১০ পৃষ্ঠার পর)

ইহারই ফলে প্রাণসাগর ব্যষ্টির খণ্ড অস্তিত্বে বিভক্ত হইয়া পড়ে—ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। ব্যক্তিত্বের এই চরম বিকাশ একই উদ্দেশ্যের অবিচ্ছিন্ন স্তর মাত্র। তাই নীৎসের "অতিক্রান্তির ইচ্ছা"ও বেয়র্গসঁর "সোনার তরী"তে ঠাঁই পায়; তাই সে মানুষের জীবনই সার্থক যাঁর "action, itself intense, is also capable of intensifying the action of other men, and, itself generous, can kindle fires on the hearths of generosity."

বেয়র্গসঁর জীবনে ইহা কি সত্য হইয়াছে? প্রাণপ্রবাহের মধ্যে ইহুদী বিতাড়নের কি প্রেরণা আছে বলা শক্ত, কিন্তু নাৎসী অতিক্রান্তির ইচ্ছা আজ বেয়র্গসঁর স্বদেশে যে বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, তাহা তিনি কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না এবং জীব ও জীবনের কি মহান্ উদ্দেশ্য হিট্‌লার-পেতাঁ সমন্বয়ে বা হিট্‌লার চার্চিল সংঘর্ষে সাধিত হইবে তাহা কেবলমাত্র প্রাণপ্রবাহ দিয়া বুঝা শক্ত। কিন্তু আজিকার এই একনায়কতন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্র বলিদানের যূপকাষ্ঠ-রচনার প্রেরণা কেবলমাত্র প্রাণপ্রবাহ দিয়া বুঝা যাইবে না। যাহা দিয়া বুঝা যাইবে তাহা যান্ত্রিক জড়বাদও নহে, জড়বাদ-বিরোধী প্রাণবাদও নহে। তাহা দ্বন্দ্বপ্রাগতিক মূর্তবাদ। এই সমাজ—আজিকার সমাজ—পুঁজিবাদী সমাজ দ্বন্দ্ব-প্রগতির নিয়মে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হইতে আসিয়াছে। তেমনি এই নিয়মেই আজিকার মানুষ, তাহার দৈহিক ও মানসিক গঠন, আজিকার মানুষের কেবল সামাজিক অবস্থিতি নহে, জৈবিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থিতি, অথবা আজিকার বিশ্বের এই অঞ্চলের বর্তমান রূপরস সকল কিছু এই দ্বন্দ্ব-প্রাগতিক নিয়মেই অবতীর্ণ হইয়াছে। আজিকার মানুষের প্রচেষ্টা যদি আজিকার পরিস্থিতিকে ডিঙাইয়া প্রাণপ্রবাহকে উত্তীর্ণ করিতে না পারে, আজিকার আইনস্টাইন, গতকল্যকার ফ্রয়েড, বেয়র্গসঁ যদি এই প্রাণপ্রবাহের বিঘ্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হন, তবে আবহমানকাল এই দুর্লঙ্ঘ্য পরিস্থিতি সমান সত্য হইয়া আছে। জীব ও জীবের পরিস্থিতি তেমনই অচ্ছেদ্যরূপে দ্বন্দ্বপ্রাগতিক নিয়মে চালিত—দ্বন্দ্বপ্রগতিই সেই অনন্ত প্রবাহ, প্রাণ নহে; প্রাণ এই দ্বন্দ্বপ্রগতিরই সংশ্লেষণ। জীবের অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীব ও জীবে দ্বন্দ্ব, ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন সকলই এই স্বীকার অস্বীকার, ধন ও ঋণের সংশ্লেষাত্মক বিবর্তন। বেয়র্গসঁ ঠিক এই তত্ত্বটি এড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "There is a close connection between a coat and the nail on which it hangs, for if the nail is pulled out, the coat falls to the ground. Shall we say, then, that the shape of the nail determines the shape of the coat or in any way corresponds to it?"

বুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে বলিব, হ্যাঁ যে পেরেকের উপর কোট টাঙাইব তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির উপর কোটটির কেবল উল্লম্বন নহে, কোটটির আকৃতি প্রকৃতিও নির্ধারিত হয়; পেরেকটি পড়িলে কোটটিও পড়ে—যেমন রেনোঁ গভর্নমেণ্টের পতনে ভিসি গভর্নমেণ্টের উদ্ভব হয়, কিন্তু বেয়র্গসঁ বিতাড়িত হন। ডারুইনও বলেন নূতন রূপের আবির্ভাবে পুরানো বিলুপ্তি অনিবার্যক্রমে অনুসৃত হইয়া থাকে। বেয়র্গসঁ তাই বুদ্ধিকে ভ্রমাত্মক জানিয়া স্বজ্ঞার আশ্রয় লইয়াছেন। অথচ এই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপরই তাঁহার দর্শন রচিত এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাও জীব ও জীবের পরিস্থিতির আন্তঃক্রিয়ার ফল। সেই আন্তঃক্রিয়াই জীবন। সেই জীবনকে যাঁহারা ভাবপ্রসূত করিতে তৎপর অথবা প্রাণপ্রবাহের কাব্য-নর্তনে আচ্ছন্ন করিতে প্রয়াসী তাঁহাদের সমস্ত যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া B. Zavadovsky এইভাবে উপসংহারের সূচনা করিয়াছেনঃ

The necessary consequence of the above is a conclusion as to the dialectical development of matter by leaps, bound up with qualitative revolutionary changes as a result of the accumulation of quantitative changes, and the idea of the 'relative autonomy' of the biological process, advancing not only in circumstances of interaction with the physical conditions of its surroundings, but also as a result of the development of the internal contradictions latent in the biological system itself.

৮ম বর্ষ] ১২ই মাঘ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল Saturday, 25th January, 1941. [১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস—

২৬শে জানুয়ারী নিকটবর্তী। এই দিবস সমগ্র জাতি স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য গ্রহণ করিয়াছে এবং যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতা দেশে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন এই সংকল্প গ্রহণও চলিবে; কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের এই ব্রতকে শুধু একটা মামুলী অনুষ্ঠানে পরিণত করিলে চলিবে না; স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রেরণা অন্তরে যদি আমরা একান্ত করিয়া লাভ করি এবং সেই স্বাধীনতা লাভে আমাদের সাধনা মৃত্যুঞ্জয়ী নিষ্ঠা লাভ করে, তবেই এই অনুষ্ঠান আমাদের পক্ষে প্রকৃতভাবে প্রতিপালন করা হইবে। জগৎময় আজ বিপুল পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উঠিয়াছে একটা তুমুল আলোড়ন —এই উত্থান-পতন ও আলোড়ন এবং বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া খেলিতেছে যে শক্তি, আমরা নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাহাতে কতটা কাজে লাগাইতে পারিতেছি, এ বিষয়ে গভীরভাবে আমাদিগকে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণের সংগে সংগে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, একান্ত করিয়া এই সত্যকে যে স্বাধীনতা কেহ কাহাকে দিতে পারে না। স্বাধীনতা নিজেদের অর্জন করিতে হয় এবং সেই অর্জনের কৃতিত্বের মধ্যে স্বাধীনতাকে উপভোগ করিবার যোগ্যতাও ফুটিয়া উঠে। পর-মুখাপেক্ষী না থাকিয়া শক্তি অর্জনের পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের কোন্ নীতি কতটা কার্যকর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার মানস-বিলাস ছাড়িয়া সেই দিকে দিতে হইবে দৃষ্টি। আমাদের অন্তরে সব ছাড়িয়া বড় করিয়া তুলিতে হইবে এই সত্যটিকে যে, নিজেরা যাহারা পতিত, অবনত এবং পরাধীন, বিশ্ব-প্রেম, বিশ্ব-শান্তি, মানব-মৈত্রী প্রভৃতি বড় বড় কথা তাহাদের মুখে শোভা পায় না। আমরা যদি কোনদিন স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, তবেই শুধু বিশ্বের কাছে আমাদের ঐ সব কথার কার্যত কোন মূল্য বর্তিবে। আপাতত, দেশের স্বাধীনতা, জাতির স্বাধীনতাই আমাদের চরম এবং পরম লক্ষ্য হউক। স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প সেই লক্ষ্য সাধনে আমাদিগকে সর্বস্বপণে প্রণোদিত করুক—তুচ্ছ মান-যশের ভিক্ষাবৃত্তির সমগ্র দীনতা হইতে আজ যেন মুক্ত হইতে পারি। আমরা যেন সত্যকার শক্তি লাভ করিতে পারি, এই দিবসে ভারতের যে সব সন্তান স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের ত্যাগময় স্মৃতির তপ্ততাকে অন্তরে ধারণ করিয়া। কীটের মত জীবন যাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি এবং জগতের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে; সেই কর্তব্য প্রতিপালনেই জীবনের সার্থকতা, তাহাতেই মনুষ্যত্ব। যদি বাঁচিতে হয়, তবে যেন আমরা মানুষের মতই বাঁচিতে পারি।

হক সাহেবের সাফাই—

কলিকাতা কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িক হারে বেলিফ নিয়োগের দাবী করিয়া মোসলেম লীগের নেতা ইস্পাহানী সাহেবের প্রস্তাব বাতিল হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে মেয়র মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর মাথা উষ্ণ হইয়া উঠে। তিনি উত্তেজিত অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ সভা ভাঙিয়া দেন এবং বলেন,—এই সমস্যাটি কর্পোরেশনের মুসলমান সদস্য-গণের অত্যন্ত ক্ষোভজনক। গত চার বৎসর কর্পোরেশনে কোন মুসলমান সদস্য ছিলেন না। এক্ষণে এই বিষয়টি যদি বিনা উত্তেজনায় মীমাংসিত না হয়, তাহা হইলে সেই মনোভাব পুনরায় দেখা দিবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মতলব যদি হাসিল না হইল, তবে উত্তেজনার কারণ আছে বই কি? এমন একটা গুরুতর ব্যাপার, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকও ইহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। চিত্তের বিক্ষোভ তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন, তবে একটু রকমফেরভাবে। তিনি বলেন, হিন্দুরা এই বলে যে, আমরা কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন ছাড়া

কর্পোরেশনে হিন্দুদিগকে সহায়হীন অবস্থায় পরিণত করিয়াছে। সম্প্রতি ভোটে দেখা গেল যে, হিন্দুরা মিলিত হইতে এবং মুসলিম লীগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। হক সাহেবের এই জবাবে বাস্তবিকপক্ষে মিউনিসিপ্যাল বিলের সংশোধনের প্রতিবাদের কারণ খণ্ডিত হয় না। কলিকাতা কর্পোরেশনে কলিকাতার পৌরজনগণের কর্তৃত্ব গভর্নমেণ্ট ক্ষুন্ন করিয়াছেন কি না, ইহাই হইল প্রধান কথা; দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, করদাতা যাঁহারা, যাঁহাদের পয়সায় প্রধানত কর্পোরেশন চলে, তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব অন্যায়ভাবে ব্যাহত করা হইয়াছে কি না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধনের দ্বারা এ সবই করা হইয়াছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার পৌরজনকে পৌরকার্য পরিচালনে দিয়াছিলেন স্বাধীনতা, হক মন্ত্রিমণ্ডল সেই কর্পোরেশনকে গভর্নমেণ্টেরই দপ্তরে পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছেন। কথায় আছে, ঝড়ে ঘর পড়ে ফকিরের কেরামত বাড়ে, হক সাহেবের সাফাই পড়িয়া আমাদের সেই কথাই মনে হইতেছে।

যুক্তির দৌড়—

কর্পোরেশনে মিঃ ইস্পাহানীর সংশোধন প্রস্তাবের ভোটাভুটিকে হক সাহেব প্রামাণিক দৃষ্টান্তস্বরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু ভোটাভুটি তত্ত্ব যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে আমরা কি দেখিতে পাই। ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ২৪ এবং বিপক্ষে ৩১ ভোট হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল, হওয়ার কোন সম্ভাবনাই অবশ্য ছিল না। বাঙলা দেশের গভর্নমেণ্ট বর্তমানে লীগ-প্রভাবিত এবং কর্পোরেশনের শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণ স্বভাবত গভর্নমেণ্টের পক্ষেই ভোট দিয়া থাকেন, কারণ তাহাতেই তাঁহাদের স্বার্থ সমধিক সংরক্ষিত। আলোচ্য প্রস্তাব একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সঙ্গে পৌরবাসীদের অধিকাংশের স্বার্থের মিল থাকিবে, ইহা মনে করা ঠিক নয় এবং হিন্দুরা কর্পোরেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও যদি তাহাদিগকে এমন অবস্থায় ফেলা হয় যে, তাঁহারা লীগ কিংবা শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের কাছে নিজেদের স্বার্থ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন, তাহা হইলে তেমন ব্যবস্থাকে কিছুতেই গণতান্ত্রিক বিধিবিহিত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। কর্পোরেশনের এলাকায় হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৭২ জনের কম নহে। সেখানে শতকরা ৪৪টি মাত্র আসন হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, সে ব্যবস্থা কিছুতেই সুবিচারমূলক হইতে পারে না। আকস্মিক একটা ব্যাপারকে নজীরস্বরূপে ধরিয়া সেই অছিলায় ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করা বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের, বিশেষভাবে হক সাহেবের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের একটা বিশিষ্ট স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা নিতান্ত ধৃষ্টতা এবং নির্লজ্জতারই পরিচায়ক।

উদারনীতিকদের যুক্তি—

কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নয়জন সদস্য ভারতের জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া একটি বাণী প্রেরণ করেন। উদারনীতিক দলের বারজন নেতা একটি যুক্ত বিবৃতিতে তাহার জবাব দিয়াছেন। ভারতের উদারনীতিক দলের বিশেষত্ব এই যে, এটি দল ছাড়া দল, অর্থাৎ এ দলে নেতাই আছে দল নাই এবং সেই দল বা নেতা বোধ হয় এই বারজনই। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন, বিশেষভাবে শ্রীযুত চন্দাবরকর, স্যার শিবস্বামী আয়ার, শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী স্যার সি ওয়াই চিন্তামণি, ডাক্তার পরাঞ্জপে—ইঁহারা ভারতের মডারেটী রাজনীতিতে মাতব্বর পুরুষ; সুতরাং সে হিসাবে ইঁহাদের মতেরও কিছু মূল্য আছে। ইঁহারা বলেন,—"আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, বর্তমানে কমন্স সভা ভারতবর্ষকে সমদৃষ্টিতে না দেখিবার কল্পনাও করিতে পারেন না।" ইহা আমাদের নিকট একটি মনোরম বিস্ময়ের মত ঠেকিয়াছে; কেন না, ভারতে যে নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে এই মনোবৃত্তির সামান্য আভাসও দেখিতে পাই না। এই প্রসঙ্গে ভারতে কার্যত কি নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহা তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথমত, ভারতবাসীদিগকে সমানাধিকার প্রদানের সম্বন্ধে কর্তারা কার্যত কি করিয়াছেন? উদারনীতিক নেতৃগণ বলেন, ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, এই কথারই বড়লাট শুধু পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রশ্ন তুলিলেই কর্তারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার অজুহাত তোলেন। উদারনীতিকগণ বলিতেছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণাবলী দ্বারা সাম্প্রদায়িক মীমাংসা-বিমুখতাকে এমনভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান বস্তুত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মনে হয়, গ্রেট ব্রিটেন তাহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে, এরূপ সংশয়ের কারণ ঘটিয়াছে। তারপর, বড় প্রলোভন যেটি, সেই বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণের প্রস্তাব সম্বন্ধে উদারনীতিকগণ বলেন, 'প্রভূত ক্ষমতা বড়লাটের হাতে সংহত করা হইয়াছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সম্বন্ধে প্রায়ই তিনি শাসন-পরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই কাজ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় কেবলমাত্র বিভাগীয় কর্তা সাজিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজনীতি দলের প্রতিনিধিদের শাসন-পরিষদে যোগদানের আগ্রহ আশা করা যায় না। এই সকল পরিষদ যত দূর সম্ভব দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার মত কাজ করিবে, এরূপ ভরসা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দিতে সক্ষম হন নাই। তাহা ছাড়া, সৈন্য বিভাগ ভারতীয়করণ, দেশরক্ষী সৈন্য ভর্তি এবং সরবরাহ বিভাগ সম্বন্ধে যে নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে এই সংশয়ই দৃঢ় হইয়াছে যে, ভারতে ব্রিটিশ নীতির কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই এবং দেশরক্ষা ও শিল্পোন্নতি বিভাগে ব্রিটিশ নীতি ভারতীয় অপেক্ষা

ব্রিটিশ স্বার্থেই পরিচালিত হয়।' বিবৃতি পাঠ করিলে দেখা যাইবে, উদারনীতিক নেতাগণ বলিয়াছেন সবই এবং তাঁহাদের একথাও ঠিক যে, তাঁহারা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, দেশের অনেকেই সেই মত পোষণ করিয়া থাকে; কিন্তু দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের মতের পার্থক্য হইল কাজের বেলায়। তাঁহাদের দৌড় বচনবাগীশতা পর্যন্ত, এইজন্যই কংগ্রেসের নাম শুনিলে এই সব অতি বুদ্ধিমান উদারনীতিকদের আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং ব্রিটিশ প্রভুদের পক্ষপুটের তলেই তখন তাঁহারা দৌড়াইয়া যান।

বিবৃতির প্রয়োজনীয়তা—

উদারনীতিক দল তাঁহাদের বিবৃতিতে গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষের মন টলিবে কি না, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। ইহাতে কর্তৃপক্ষের মতিগতির যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে, আমরা মনে করি না। বড় জোর ইহার ফলে পার্লামেণ্টে ভারতের পক্ষ হইতে যাঁহারা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই কিছু প্রেরণা লাভ করিতে পারেন এবং পুনরায় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তনের কোন গরজ বোধ করিবেন, এমন মনে হয় না; কারণ, তাঁহাদের ধারণা মত তাঁহাদের কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। এদেশ হইতে যে সব দ্রব্য এবং সাহায্য প্রয়োজন, তাঁহারা তাহা পাইতেছেন; সুতরাং তাঁহারা এই কথাই বলিবেন যে, দেশের লোক তাঁহাদের মত মানিয়া লইয়াছেন, ঐ সব রাজনীতিকরা ভারতের প্রকৃত কথা বলিতেছেন না। তাহা ছাড়া জিন্না সাহেবের পাকিস্থান প্রস্তাবের দৌলতে অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকারের দায়িত্ব এড়াইবার সুবিধা তো তাঁহাদের আছেই। সুতরাং পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তর বৃষ্টির পুনরভিনয় হইলেও, তাহাতে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ভারত সম্পর্কিত মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। বড়লাট এখানে যে কথা বলিতেছেন, ভারতসচিব ওখানে তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন এবং ভারতসচিব বিলাতে যে কথা বলিতেছেন, বড়লাট করিতেছেন ভারতে বিভিন্ন বক্তৃতায় তাহারই ভাষ্য, এমন অবস্থায় বড়লাটের উপর যে আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার জন্য কোন চাপ আসিবে, ইহা আশা করা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতের জনমত আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকতর দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত, এই ধরণের বিবৃতির ভাষা কড়াই হউক আর মধুরই হউক, ব্রিটিশ নীতির আশু পরিবর্তনের পক্ষে এগুলি ফলোপাধায়কতা আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট—

বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিমুদ্দীন গত ১৮ই তারিখ ময়মনসিংহের ভৈরব বন্দরে এক বক্তৃতায় ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের নূতন ভাষ্য দিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুদিন হইল আমরা এই কথা শুনিতেছিলাম যে, বড়লাটের শাসন-পরিষদে কয়েকটা চাকুরী এ দেশের কালা আদমীর জন্য বাড়াইয়া দিলেই ন্যাসনাল গভর্নমেণ্ট হয়। দেশের লোকের মতামতের বালাই কিছুই নাই। বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুস্লীম লীগের কবজীর জোরেই বাড়ান যাইবে, বাঙলা দেশে ন্যাসনাল গভর্নমেণ্ট এতই পাকাপোক্ত হইয়া উঠিবে। স্যার নাজিমউদ্দীন মুসলীম লীগের প্রভাবে পরিচালিত বাঙলা গভর্নমেণ্টকে ন্যাসনাল গভর্নমেণ্ট বলিতেছেন বোধ হয় এই হিসাবে যে, বাঙলা দেশে অন্য কোন জাতি আছে বা থাকিতে পারে, এই বিশ্বাসই তিনি করেন না। কিন্তু প্রশ্ন একটা থাকিয়া যায় এই যে, বাঙলা দেশকে 'মাতৃভূমি' বলিলে তাঁহার মোস্লেম লীগের শক্তি বাড়াইবার নীতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি? মোস্লেম লীগের যিনি মন্ত্রগুরু, সেই জিন্নাসাহেব পাকিস্থানী প্রস্তাবের সমর্থন করিতে গিয়া সেদিন তো প্রকাশ্যেই বলিয়াছেন যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলই হইল—আমরা মুসলমান, আমাদের খাঁটি দেশ। মোস্লেম প্রভাবিত বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলও কার্যত যে সেই নীতিই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিধি সংশোধনের ক্রম-পরিণতিই তাহার প্রমাণ। বাঙলা দেশে বাঙালী মুসলমানদের স্থানে বাঙলার বাহিরের পশ্চিমা মুসলমানদেরই কর্তৃত্ব সকল দিক হইতে বাড়ান হইতেছে। স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি এমনভাবে চালান হইতেছে যে, হিন্দু মন্ত্রীদের নিজেদের ক্ষমতা পরিচালনে ষোল আনা সুবিধা ঘটিয়াছে। হিন্দু মন্ত্রীরা তাঁহাদের অস্তিত্ব কার্যের দ্বারা বেশ সমঝাইয়া দিতে পারিতেছেন। আত্মমর্যাদাবোধে জলাঞ্জলি দিয়াও যে কয়েকজন তথাকথিত হিন্দু মন্ত্রী মন্ত্রিমণ্ডলে আছেন, স্বরাষ্ট্রসচিবের এই কৃপাকণা সিঞ্চনে তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন নিশ্চয়। মন্ত্রিমণ্ডলে তাঁহাদের উপস্থিতি দেশের লোককে সমঝাইবার কোন উপায়ই ছিল না; কারণ স্বাতন্ত্র্য মর্যাদাবুদ্ধি লইয়া কাজ করিবার মত কোন হিন্দু মন্ত্রী যদি মন্ত্রিমণ্ডলে থাকিতেন, তাহা হইলে কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন বিল আইনে পরিণত হইতে পারিত না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এমনভাবে সংকোচ করিয়া সেখানে সাম্প্রদায়িকতা আনিয়া ঢুকান সম্ভব হইত না, বাঙলা ভাষার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবিষ্ট করিয়া বাঙলা দেশে সংস্কৃতির সর্বনাশ করিবার সুবিধা চলিত না। তথাকথিত মেরুমজ্জাবিহীন হিন্দু মন্ত্রীদের প্রভাবশীলতা স্বরাষ্ট্র সচিবের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু সে প্রভাবশীলতার লভ্য জাতীয়তাবাদে জাগ্রত বাঙলার ধিক্কার ছাড়া অন্য কিছুই নয় এবং সেই ধিক্কার তাঁহারা মৌরসীস্বত্বে ভোগ করিতে থাকিবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—

গত ১৯শে জানুয়ারী, রবিবার বাঙলার বিভিন্ন স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বাঙলার নব জাতীয়তাবাদের মন্ত্রগুরু। এই ব্যুঢ়োরস্ক সন্ন্যাসীর বীর্যময়ী বাণী একদিন বাঙলা দেশে মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনার উদ্বোধন করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর ধ্যান-গম্ভীর মুখজ্যোতিতে বাঙলার যুবক ভবিষ্যৎ ভারতের দেখিত স্বপ্ন, তাঁহার প্রশান্ত ললাটতটে খুঁজিত সে আশার অরুণ আলোকের আভাষ। অভীষ্ট সাধনে অকুতোভয়তা, অবিচলতা এবং আত্মদানের একান্ত আনন্দ-সত্তার শিবময় বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঘৃণ্য পরানুকরণ-স্পৃহা ছাড়িয়া আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার ত্যাগময়ী উদ্দীপনা বাঙলার যুবক লাভ করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অনুধ্যান হইতে। স্বামীজীর উজ্জ্বলভাস্বর নেত্রযুগলের মধ্যে বাঙলার যুবক যে আশ্বস্তির সাড়া পাইত, তাহা তাহাকে সংকটময় জীবন আলিঙ্গনে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিত। স্বামীজী ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। যদি ভারতকে মুক্তিলাভ করিতে হয়, তবে গ্রহণ করিতে হইবে স্বামীজীর নির্দেশিত পথ—দেশবাসীর দুঃখে-দৈন্যে একাত্ম হইবার পথ, আত্মনিবেদনের আনন্দের স্পর্শে সকল সংশয় এবং অপ্রত্যয় হইতে নির্মুক্ত হইয়া সত্যসন্ধ হইবার পথ। স্বামীজীর ন্যায় সাধক জন্ম এবং কর্মবন্ধনের অতীত, তাঁহারা নিত্য অমরলোকের অধিবাসী। অমরধাম হইতে স্বামীজীর আশীষধারা আজও পরপদানত, অভিশপ্ত ভারতের উপর বর্ষিত হইতেছে। বাঙলার যুবক, একবার সেই আশীর্বাদ অন্তরে গ্রহণ কর। যে প্রেম প্রগাঢ়, যে ভালবাসা মৃত্যুর ভৈরব-ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ করে না, ভারতের মুক্তিসাধনায় পরম পুরুষার্থ-স্বরূপে তাহাই তোমার সম্বল হউক। স্বামীজীর বীরবাণীতে বুকে একবার বল লাভ কর, পোকামাকড়ের মত বাঁচার চেয়ে একবার মানুষের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও। 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতং'—প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনোময় এই অনুভূতির বলে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাও ; জগৎ তোমার পদানত হইবে। দুর্বলের স্থান নাই এ জগতে। 'ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল তোল শির, আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির—অমৃতময় লোক হইতে বাণীর ঝঙ্কার আসিতেছে, একটু শ্রদ্ধাযুক্ত হও, স্বামী বিবেকানন্দের সে বাণী শুনিতে পাইবে।

সদ্দৃষ্টান্ত—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙলা সাহিত্যে যে বাঙালী ছাত্রী প্রথম স্থান অধিকার করিবে, প্রতি বৎসর তাহাকে একখানা করিয়া সুবর্ণপদক পুরস্কার দিবার জন্য শ্রীমতী হেমলতা দেবী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এক হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই দানের দ্বারা শ্রীমতী হেমলতা দেবী যে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, এ দেশে যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহাদের সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ীভাবে বাঙলা ভাষাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। ছাত্রীদের জন্য এই দানের ব্যবস্থায় আমরা বিশেষ রকম সুখী হইয়াছি। বঙ্গ জননীর যে সব মেয়েরা প্রবাসে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এইভাবে শিক্ষার সম্প্রসারণের ভিতর দিয়া বাঙলা ভাষার প্রতি সেবাবুদ্ধি জাগে, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। বাঙলার সেবাক্ষেত্রে বঙ্গনারীর স্থান সামান্য নহে, তাঁহাদের সেই সেবা সর্বাধিক প্রসারতা লাভ করুক আব্রহ্ম-কন্যাকুমারী ভারতভূমির সর্বত্র।

বাঙালীর বিশেষত্ব—

কিছুদিন হয়, রেঙ্গুন শহরে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, 'বাঙালী জাতির প্রকৃতি কি, কে বলিয়া দিবে ? একথা আপনারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, বাঙালী জাতি হইয়াছে জাতীয়তাবাদের পুরোহিত। আমাদের দায়িত্ব হইতেছে নিজেদের মধ্যে সেই জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত রাখিয়া ভারতের অ-বাঙালী জাতির মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করা। ইহা আমাদের দায়; ইহাই আমাদের গৌরবময় অধিকার।" এই জাতীয়তা-বোধটা বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হইল কি করিয়া এবং ইহা বজায় রাখিয়া আত্মাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণতা বাঙালী লাভ করিবে কি উপায়ে, সেই সম্বন্ধে অধ্যাপক সেন তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—'আমরা বাঙালী, বঙ্গভাষার অনুশীলন আমাদের স্বাভাবিক, প্রথম ও প্রধান কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পরিবেশের প্রতি নির্লিপ্তও তো আমরা হইতে পারি না।" বাঙলা ভাষার অনুশীলন প্রভৃতির উপর জোর দিতে গেলে প্রাদেশিকতা আসিয়া পড়িতে পারে, এমন ধারণা হইতে পারে, ইহাই বোধ হয় কথাটির তাৎপর্য। কিন্তু বাঙলার সাহিত্যের প্রাণ-পদার্থই নয় সেই প্রাদেশিকতা. বাঙলা দেশের সাহিত্য যেটুকু বড় হইয়াছে, প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়াই বড় হইয়াছে। আমাদের মতে, বাঙলা ভাষার সেবাতে নিষ্ঠা থাকিলে বাঙালী জাতি কোন অবস্থাতেই প্রাদেশিক হইতে পারিবে না, বরং বাঙলা ভাষার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইলেই প্রতিবেশের প্রতিকূল-প্রভাবে সে জাতীয়তার বোধ হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারে। হঠাৎ নিজের বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়া অ-বাঙালী বনিয়া যাইবার সম্ভাবনা বাঙালীর যেখানে, সেখানেই তাহার প্রাদেশিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইবার আতঙ্ক রহিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে জার্ম্মান উদ্যম

ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মনির উড়োজাহাজ আক্রমণে এখন আর নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই, জার্ম্মনির পূর্ব্বাভিমুখী গতির পরিণতির দিকেই সকলের দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। মিশরে ইতালির দারুণ বিপর্যয়ে জার্ম্মনি কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? যুদ্ধে যদি তাহাকে কোনরূপ সুবিধা করিতে হয়, তবে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। আজই হউক আর কালই হউক, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই আক্রমণে তাহাকে জোর দিতে হইবে এবং জোর দিতে হইবে যথাসম্ভব সত্বর; কারণ তাহার এ চেষ্টা যতই বিলম্বিত হইবে, আমেরিকার সাহায্য পাইয়া প্রতিপক্ষ ততই প্রবল হইয়া উঠিবে। জার্ম্মনির পূর্ব্বগতিমুখীন প্রচেষ্টা সত্বরই আরম্ভ হইবে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু আরম্ভ হইবে কোনদিক হইতে ইহাই হইতেছে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বলকানের ভিতর দিয়াই জার্ম্মনি অগ্রসর হইবে, না স্পেনের ভিতর দিয়া সে ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে পৌঁছিতে চেষ্টা করিবে, অথবা সোজাসুজি ধাওয়া করিবে ইতালির ভিতর দিয়া, অনেকেই ইহা লইয়া গবেষণা চালাইতেছেন। বলকানের সম্পর্কে সম্প্রতি যে সব খবর আসিতেছে, সেগুলি এত গোলমেলে যে বিশেষ কিছু বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই, তবে এ কথা সত্য যে রুমেনিয়াতে প্রচুর পরিমাণে জার্ম্মন সৈন্য সমবেত হইতেছে। প্রকাশ যে, ফ্রান্স হইতে মোটর লরী যোগে এইসব সেনা আসিতেছে এবং এইসব জার্ম্মন সেনা চার দলে বিভক্ত হইয়া রুমেনিয়ার সীমান্ত দেশ এবং তেলের খনিগুলির চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। রুমেনিয়ার ভিতরে যে অন্তর্বিপ্লবের মত একটা কিছু চলিতেছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। আইরন গার্ডের দল এবং কমিউনিষ্টরা সেখানে জার্ম্মন প্রভুত্ব পছন্দ করিবে না ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু রুমেনিয়ার এই বিদ্রোহীর দল বিশেষ সুশৃঙ্খলিত নয় এবং সুসজ্জিতও তাহারা নয়। রুমেনিয়ার প্রধান মন্ত্রী আণ্টেনেস্কুকে বিদ্রোহীদলন কার্য্যে জার্ম্মনিরা কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে ইহা ঠিক, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য লক্ষ্যও যে না আছে এমন নহে এবং তাহা হইল বুলগেরিয়ার উপর চাপ দিয়া বুলগেরিয়াকে তাহাদের হাতে আনিতে চেষ্টা করা। বিলাতি সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মনবাহিনী রুমেনিয়ার ভিতর দিয়া দানিয়ুব নদীর উপকূলভাগে বুলগেরিয়ার বিপরীত দিকে সমবেত হইতেছে। এই স্থানের অনতিদূরে রাসচুক নামক স্থানে বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী সেদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বার্লিন হইতে ফিরিয়া এই বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি কি বলেন, ভাল করিয়া জানা যায় নাই, তবে তাঁহার বক্তৃতার সুর যে জার্ম্মনির প্রতিই কতকটা টানা ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। তিনি একথাও বলেন যে, বুলগেরিয়ার উপর অচিরেই একটা মহাসংকট দেখা দিতে পারে এবং বুলগেরিয়াকে যুদ্ধে নামিতে হইতে পারে। যদি বুলগেরিয়া যুদ্ধে নামেই, তবে নামিবে কাহার বিরুদ্ধে? জার্ম্মনির নিজের পক্ষে বুলগেরিয়ার এই হুমকির বিশেষ

কোন মূল্য নাই। তাহার লক্ষ্য হইল রুষিয়া এবং তুরস্কের দিকে। জার্ম্মনি যদি রুষিয়া এবং তুরস্ককে ঠাণ্ডা রাখিতে পারে, তাহা হইলে বুলগেরিয়ার কোন হুমকিকেই সে গ্রাহ্য করিবে না। রুষিয়া এবং তুরস্ককে যুদ্ধ হইতে দূরে রাখিবার দায়ে বুলগেরিয়াকে কোন রকমে খোঁচা জার্ম্মনি দিতে যাইবে না বা তাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না ইহা মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। স্পেনের বর্ত্তমান গভর্নমেণ্ট জার্ম্মনির নাৎসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্তর্বিপ্লবের পর স্পেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, স্পেন প্রত্যক্ষভাবে জার্ম্মনির সঙ্গে যোগ দিতে সাহস পাইতেছে না; অবশ্য ভূমধ্যসাগরের দিকে জার্ম্মনি যদি কোন দিন সুবিধা করিতে পারে, তবে স্পেন কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে ইহা বুঝা যায় না, সেক্ষেত্রে সে যে জার্ম্মনির দিকেই ঝুঁকিবে ইহা বলা বাহুল্য; কিন্তু গ্রীসের ব্যাপার, বিশেষভাবে মিশরের যুদ্ধের ফল তাঁহাকে সে উদ্যমে এখনও সাহস দিতেছে না।

তার পরের কথা হইল, ইতালির ভিতর দিয়া জার্মানির উদ্যম; এতদিন এ সম্বন্ধে পাকা খবর কিছুই পাওয়া যাইতেছিল না। জার্মান সেনাদল ব্রেনার গিরিবর্ত্ম দিয়া ইতালির মধ্যে ঢুকিতেছে এবং নেপলস এবং বারি বন্দরে সমবেত হইতেছে, নানা সূত্রে এমন খবর কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেইসব সংবাদ সমর্থিত হয় নাই। সম্প্রতি ঘটনার গতি হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঐসব খবর একেবারে মিথ্যা নহে। ভূমধ্যসাগরে ইতালির নৌবহর এতদিন এক রকম গা-ঢাকা দিয়া থাকিবারই চেষ্টা করিত এবং ইংরেজ নৌবহরের ভয়ে কাবু হইয়াই ছিল। ১০ই জানুয়ারী তারিখে সিসিলি দ্বীপের কাছে ব্রিটিশ রণতরীবহর ইতালীয় বিমানবহর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে ইংরেজের "ইলাস্ট্রিয়াস" নামক উড়োজাহাজবাহী একখানা নূতন ধরণের রণতরী জখম হইয়াছে। "সাউদাম্পটন" নামক ক্রুজারখানা উড়োজাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমায় আহত হয় এবং তাহার ফলে জাহাজে আগুন ধরিয়া যায়, জাহাজখানাকে কিছুতেই রক্ষা করা যায় নাই; ব্রিটিশ পক্ষ হইতেই জাহাজখানাকে ডুবাইয়া দিতে হইয়াছে। "গ্যালাণ্ট" নামক ইংরেজপক্ষের একখানা রণতরীও মাইন টর্পেডোর আঘাতে জখম হইয়াছে। এই খবরের সঙ্গে সঙ্গে সিসিলিতে জার্মানদের ঘাঁটী করার খবরটাও আসিয়াছে। সিসিলিতে জার্মান সেনারা যে পূর্বেই অবতরণ করিয়াছিল এবং ঘাঁটী বাঁধিয়াছিল এই খবর হইতেই বুঝা যাইতেছে। 'রয়টার' নিজেই বলিতেছেন যে, জার্মানি এবং ইতালির মিলিত বিমানবহর এই আক্রমণ চালায়। "টাইমস" পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা বলিয়াছেন, ইতালি তাহার বন্ধু জার্মানদের সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া ভূমধ্যসাগরের পথে আসিয়াছে; গতিবিধি ব্যাহত করিবার উদ্যমে কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই খবরে আর কিছু বুঝা যাউক, আর নাই যাউক, ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, এইবার জার্মানেরা প্রত্যক্ষভাবে ইতালিকে ভূমধ্যসাগরের দিকের লড়াইতে সাহায্য করিতে অবতীর্ণ হইতেছে। পরে এ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত খবর আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে ৮৭খানা জার্মানির উড়োজাহাজ, ইতালির বোমাবর্ষী বিমান-পোতের সঙ্গে যোগ দিয়া সিসিল প্রণালীতে ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করিয়াছিল। ১৫ই এবং ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ৮৮খানা জার্মানির জাঙ্কার উড়োজাহাজ এবং ৮৭খানা বোমা-বর্ষী উড়োজাহাজ ইতালির উড়োজাহাজের সঙ্গে যোগ দিয়া মাল্টার উপর আক্রমণ চালায়। ১৭ই জানুয়ারী তারিখে জার্মানির কতকগুলি ছোট উড়োজাহাজ রাত্রিযোগে সুয়েজ খালের অঞ্চল আক্রমণ করে। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে জার্মান ও ইতালির উড়োজাহাজ একযোগে পুনরায় মাল্টা আক্রমণ করিয়াছিল। বিমান হইতে রণতরীর উপর আক্রমণের সাধারণত তিনটি উপায় আছে—লেভেল বমিং, ডাইভ বমিং এবং উড়োজাহাজ হইতে টর্পেডো নিক্ষেপ করা। জার্মান বিমানবীরেরা সিসিলির কাছে ডাইভ বমিং পদ্ধতি অনুসারে আক্রমণ চালাইতেছে, ইতালির উড়োজাহাজ হইতে টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়া সাহায্য করা হইতেছে। জার্মানেরা 'ইলাষ্ট্রিয়াস' নামক ব্রিটিশ রণতরীকে হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা ফেলিয়া জখম করে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পদ্ধতিতেই নাকি জহাজ বেশী জখম হয়; কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, রণতরীর শক্তিকে খুব কমক্ষেত্রেই এভাবে ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হয়।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজঃ ইতালির বিমান আক্রমণে সম্প্রতি ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ইহার পরে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনীর দেখা সাক্ষাৎ হয়। এই দেখা সাক্ষাতের সময় ইতালির পক্ষ হইতে কাউণ্ট সিয়ানো এবং জার্মানির পক্ষ হইতে রিবেণ্ট্রপও উপস্থিত ছিলেন। এই দেখা সাক্ষাতের সময় ভূমধ্যসাগরের সমস্যা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়

এবং জার্মানি যে সেদিকে ইতালিকে সাহায্য করিবে, ইহাও স্থির করা হয়, এমন মনে করিবার কারণ আছে। জার্মানি যদি এইভাবে ভূমধ্যসাগরের মহড়া ইতালির হাত হইতে আগ্‌লাইয়া লয়, তবে কার্যত সে দিককার মহড়ার কর্তৃত্ব শক্তিপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী জার্মানদের হাতেই যাইবে। জার্মানির এই প্রভুত্বে ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলিনীর মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হইবে কি না এবং ব্রিটিশ বিমানসচিব স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার সেদিন যে কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য হইবে কি না ভবিষ্যতের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রিটেনের ভয় কিছু নাই, নাৎসীদের প্রভুত্বে আপতিত হইবে ইতালি। কিন্তু সে হয়ত কিঞ্চিৎ পরের কথা; আপাতত ইতালির সাহায্যে জার্মানির এই উদ্যমের ফলে জার্মানদের প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ বাঁধিয়া যাইবে এবং যুদ্ধের ব্যাপার এক চমকপ্রদ পরিণতির অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এদিকে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের মনোমালিন্যের ভাব ক্রমশ প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির কর্ণধার মিঃ কর্ডেল হাল—তিনি স্পষ্ট ভাষায় জাপানকে অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—জাপান, জার্মানি ও ইতালি সুসভ্য পৃথিবীর শৃংখলার ভিত্তি ধ্বংস করিয়া বাহুবলের সাহায্যে অন্যান্য দেশ জয় করিয়া তাহাদের উপর নিজেদের স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। পক্ষান্তরে জাপানের কর্তারাও আমেরিকার মতিগতিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। জাপানের সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছে, ইংরেজ এবং আমেরিকা জাপানকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার
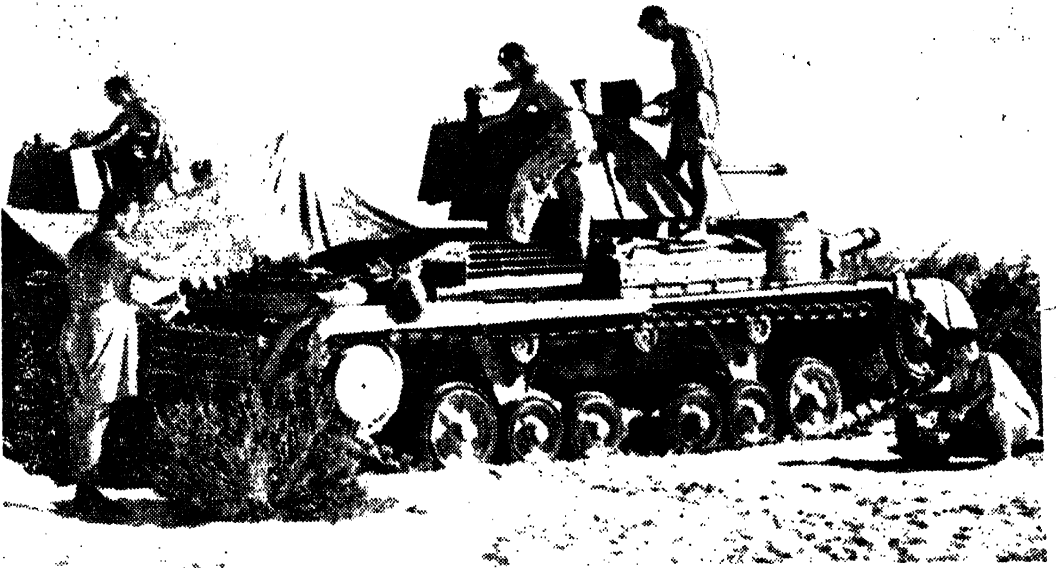
উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশের সমরায়োজন।

লড়াইয়ের নূতন পরিণতি ঘটিবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, স্যার সিনক্লেয়ার সে কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলেন, লিবিয়ায় আমাদের জয়লাভে উল্লাসে আত্মহারা হইলে চলিবে না; কারণ পরাজিত ইতালীয় বাহিনীর পিছনে জার্মানির বিপুল বাহিনী রহিয়াছে এবং সে বাহিনীকে অদ্যাপি পরাজিত করা যায় নাই। সেই যে আমাদের অতি প্রবল শত্রু একথা আপনারা বিস্মৃত হইবেন না।

ব্রিটিশ বিমানসচিবের এই বক্তৃতা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, জার্মানি আফ্রিকার রণাঙ্গনে অচিরেই অবতীর্ণ হইবে, এমন সম্ভাবনা বিশেষভাবেই রহিয়াছে। সিসিলি দ্বীপ হইতে লিবিয়া অনেক দূরে নহে। জার্মানেরা নরওয়েতে যেমন করিয়াছিল, এখানেও সেনাবাহী উড়োজাহাজযোগে সিসিলি হইতে লিবিয়ায় জার্মান সেনা চালান দিতে পারে এবং তেমন ক্ষেত্রে আফ্রিকার উপকূলভাগে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে

চেষ্টায় আছে, এখন আর জাপানের বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, তাহাকে আগাইয়া যাইতে হইবে। এই আগাইয়া যাইবার উদ্যমস্বরূপে এসিয়ার মুক্তিসঙ্ঘ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। জাপানের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে আনাম, কোচীন, চীন, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্ম এবং ভারত ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ৫০ কোটী অধিবাসীদের জন্য। অবিচারের চাপে এই সব দেশের লোকেরা যে আর্তনাদ করিতেছে, চীনের স্বাধীনতাহরণপ্রয়াসী জাপ সামরিক নেতাদের কঠিন প্রাণ তাহাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এশিয়ার পরাধীন জাতিসমূহের পক্ষে অবশ্য মার্কিন রাষ্ট্র-নীতিক কার্ডেল হলের স্বেচ্ছাতন্ত্রবিরোধী সওয়ালে কিংবা জাপানীদের এই অশ্রুপাতে আশ্বস্তি বোধ করিবার কোনই কারণ ঘটে নাই।

সুভাষচন্দ্রের সাধনা

গত ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি গিয়াছে। এই উপলক্ষে সভা-সমিতি করিবার যে আয়োজন হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র রোগশয্যায় শায়িত বলিয়া তাহা বন্ধ রাখা হয়, বাহিরের এই আনুষ্ঠানিক কাজটা বন্ধ হয়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, সুভাষচন্দ্র জাতিকে যে জিনিস দিয়াছেন, তাহার

উপলব্ধি যদি আমাদের মধ্যে একান্ত হইয়া উঠে। সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার সাধনায় ত্যাগসর্বস্ব বিপ্লবী বাঙলার মূর্ত প্রতীক। এই বিপ্লবী বাঙলা কোন দিন ভিক্ষার জন্য আতুর অঞ্জলী বাড়ায় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পরিপূর্ণতার তপস্যায় সে সর্বদা একান্ত আগ্রহে অতন্দ্রিত রহিয়াছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যাপক প্রেরণা যোগাইয়াছে বাঙলার এই অতন্দ্রিত এবং অপরাজেয় প্রাণবান সাধনা। প্রাদেশিকতার গণ্ডী কোন দিন স্বীকার করে নাই বাঙলার ত্যাগনিষ্ঠ সাধকদের দল। যেখানে আত্মত্যাগ ঐকান্ত, সেখানে তুচ্ছ সংকীর্ণতা টিকিতে পারে না, বাঙলার এই সাধনার বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রাখিতে গেলে, যাঁহারা প্রাদেশিকতা হয় বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা এই মর্ম কথাটি বুঝেন না। ভারতের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে দৈন্য, দুর্বলতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা যখনই আসিয়াছে, বাঙালী তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। দাস-মনোবৃত্তিতে সমাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে এ জিনিসটা আসে নানাভাবে, অনেক সময় সূক্ষ্মতত্ত্বের আকারে আসে, আসে উচ্চ দার্শনিকতার সাজে, কিন্তু বাঙালীর কাছে সে জিনিস গোপন থাকে নাই। সাধনার ঐকান্তিকতার আলোকে বাঙালী তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছে এবং আত্মনিষ্ঠ বলিষ্ঠতর পন্থার নির্দেশ করিয়াছে অসংমূঢ়ভাবে। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বাঙালীর সেই সাধনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে অকুতোভয়তার অপরিম্লান মহিমায়; সমগ্র ভারতের সঙ্গে সহানুভূতির সূত্রে তাহা সুদৃঢ় হইতে চলিয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে বাঙালী একান্ত করিয়া পাইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট এই জাতীয়তার ভিতর দিয়া এবং সেই বিশিষ্টতা বাঙালীর অন্তরকে সমগ্র ভারতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। স্বাধীনতা জাতির একমাত্র সাধ্য এবং সাধনা। রাষ্ট্রনীতির অনেক দুর্জ্ঞেয়বাদের অন্ধকারের মধ্যে সুভাষচন্দ্র শিবরাত্রির সলিতার মত প্রাণের অগ্নিশিখায় আদর্শের সেই প্রদীপটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। সত্যের সঙ্গে প্রাণের যেখানে ঐকান্তিক স্পর্শ, সেখানে তাহার প্রভাব সংস্কারান্ধ মনের বিচার-বিতর্কে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না, প্রাণের মহিমাই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিকতার অবদানও সেইরূপ অমোঘ হইয়া উঠিতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাণের হইতেছে জয় এবং হইবেও তাহাই।

বিধি-বিধান, হিসাব-নিকাশের আত্যান্তিক দুর্বলতায় যাঁহাদের চিত্ত আচ্ছন্ন, প্রাণবান সাধনার এই শক্তিকে উপলব্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাঁহাদের যুক্তি, বুদ্ধি ঘুরিয়া ফিরিয়া ধরাবাঁধা গতানুগতিকের পথ ধরিতে চায়, বিষয়-বিচারের ঊর্ধ্বে বলিষ্ঠ আশ্রয় তাহা পায় না। বাঙলার জাতীয়তাবাদ প্রাণরসের বলিষ্ঠ আশ্রয়ে এই বিষয়-বিচারকে তুচ্ছ করিয়া উদগ্র হইয়া চলিয়াছে। সুভাষচন্দ্রও সেই প্রাণ-ধর্মের বলে বলীয়ান। যেখানে প্রাণের টান সেইখানে শক্তি অপ্রতিহত এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সমগ্র বাঙলার তরুণ চিত্তের সংযোগ সুদৃঢ় রহিয়াছে সেই সূত্রে। এই প্রাণ-ধর্মের মর্ম না জানিয়া যাঁহারা ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের যুক্তি-তর্কে সে সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। বাঙলার জাতীয়তাবাদের স্বরূপ যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের এ ভ্রান্ত মত কিছুতেই টিকিতে পারিবে না যে, বাঙালীর এই জাতীয়তাবাদ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু। পক্ষান্তরে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের একান্ত অনুভবেই বাঙলার স্বাধীনতার উপাসকদের পরম সিদ্ধি বা আত্মোপলব্ধি। সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনাকে পর-নির্ভরতার দীনতা এবং কৃপণতা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্যই বাঙলার জাতীয়তাকে পরিস্ফুট রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর সাধনার একান্ততা ভেদ-দর্শনে নয়, অভেদ-দর্শনে। যেখানে ইতর স্বার্থের সংস্রব, ধন, মান, যশের ক্যাংলামী, ভেদ-দর্শন সেখানেই। মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পের বিকাশ হয়, সন্দেহ-সংশয়ের ক্ষেত্রে নয়, পরিপূর্ণ জ্ঞানে, প্রত্যক্ষলাভে এবং অনপেক্ষ স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমার মধ্যে। এই মহিমাই বাঙলার জাতীয়তার দান এবং সে দান সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে। সুভাষচন্দ্রের শক্তির প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে এইখানে, সে শক্তির ভিত্তি হইল সমগ্র জাতির অন্তরে; সেবা এবং আত্মোৎসর্গের পরম নিষ্ঠার প্রভাবে। পরম এবং চরম প্রয়াসের মহিমাতেই সকল মহৎ সিদ্ধি সম্ভব হয়। বাঙলার এই দুঃখব্রতী সাধক সন্তানের অবদান ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহৎ সিদ্ধিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিবে। সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে তাঁহার রোগমুক্তির কামনার ভিতর দিয়া দেশবাসীর অন্তরে এই আশাই সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১৯]

বিবাহ!...উৎসব, শাঁখ, বাঁশী, হাস্য, পরিহাস, লজ্জা আনন্দের সেই উচ্ছল প্রবাহ। এ সম্ভাবনা যে কোন দিন তাহার জীবনে উপস্থিত হইবে তাহা সে ভাবে নাই। সমস্ত জীবনটাই যেন দুস্তর মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে চলিতে হয় শুধু অভ্যাসবশে, কিন্তু মনের মধ্যে চলিবার প্রেরণা থাকে না। আবার কোথা হইতে এই সুবিপুল সম্ভাবনা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কী পারিবে তাহার অতীতের সব গ্লানি দূর করিতে? আবার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাসাদ কি তাহার গড়িয়া উঠিবে?

হরনাথবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অমলের কিছুতেই ঘুম আসিল না। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। বাহিরের বড় বেলগাছটার ফাঁক দিয়া যেখানে অস্তগামী চন্দ্রের একটুকরা আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে মাটির উপরই বসিয়া পড়িল। বাল্যকালের কত কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। কত আশাই ছিল প্রাণে, এম-এ পাস করিবে, ভাল চাকরী করিবে কিংবা ওকালতী। দেশের বাড়ি ভাঙিয়া এই-খানে গড়িয়া উঠিবে প্রাসাদ, বাবা-মা দেশেই থাকিবেন, সে ছুটির দিনগুলিতে মোটরে চড়িয়া দেশে আসিবে। তাহাকে অবশ্য কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে, সেখানেও একটা বড় বাড়ি করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া দেশের সঙ্গে সে সম্পর্ক লোপ করিবে না।...

কিন্তু সে সব কল্পনার কথা মনে পড়িলে আজ শুধু হাসিই পায়। সে আশার আয়ু আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। আজ নিঃশংসয়ে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে এই ত্রিশ টাকার চাকরীটা যদি বজায় থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট সৌভাগ্য বুঝিতে হইবে। এমন কি লটারীতে কিছু টাকা পাইয়া হঠাৎ কোন দিন যে বড়লোক হইতে পারে, সে কথাও সে ভাবে না। আশাও নাই, আশা ভঙ্গের দুঃখ অনুভব করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে।

তাহার চেয়ে এই দরিদ্র গৃহস্থ জীবনই ভাল। অভাব আছে কিন্তু সান্ত্বনাও আছে ঢের। আশা নাই কিন্তু শান্তি আছে। যে মেয়েটি আসিবে তাহার বধূরূপে, তাহার ভাল-বাসা ত আছে। অন্তত তাহার হৃদয়ে অমলই ত রাজা!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন কল্পনার জাল বুনিতে শুরু করিল। একটি তন্বী কিশোরী, নাইবা হইল সুন্দরী, কুৎসিৎ না হইলেই চলিবে—তাহারই বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহার যৌবনের দলগুলি মেলিবে, তাহার অন্তরটি অমলেরই প্রেমের আলোতে বিকশিত হইতে থাকিবে একটু একটু করিয়া। বাহিরের সমস্ত আঘাত, সমস্ত বেদনা ভুলিবে সে সেই কিশোরীর স্নিগ্ধ প্রেমের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া। প্রতি-দিনের সুখ-দুঃখ সেই সোনার কাটির স্পর্শে অমৃত হইয়া উঠিবে!

ভাবিতে ভাবিতে তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বহু-দিন আগেকার পড়া, রবি ঠাকুরের এক কবিতার দুটি লাইন—

'—প্রাণের গভীর ক্ষুধা,
পাবে তার শেষ সুধা
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালবাসা!'

সেই ভাল। যদি সে সেই শেষ সুধাই পায় ত আর তাহার কোন ক্ষোভ নাই। ধন-মান সব কিছুরই শোক সে ভুলিতে রাজি আছে।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে বহু দিনের শুষ্ক বনভূমির উপর দিয়া যেন এক ঝলক মিঠা দখিন হাওয়া বহিয়া গেল। সে ডাল-পালাগুলি চিরকালই শুষ্ক, চিরকাল নিষ্ফলা, তাহারই প্রতিটি লোমকূপ যেন ভাবী সুখস্বপ্নে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

সহসা চমক ভাঙিল তাহার পাখীর ডাকে। ভোরের আর বিলম্ব নাই, পূর্বাকাশ ইতিমধ্যেই ফরসা হইয়াছে, ভোরাই হাওয়াও দিতে শুরু করিয়াছে। অমল যেন নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিনই অমল নিজে গিয়া মেয়ে দেখিয়া আসিল। তাহার নিজের তত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবা জোর করিয়া পাঠাইলেন। আজকালকার ছেলে, নিজে দেখাই ভাল, বিশেষ তিনি যখন চোখে ভাল দেখিতে পান না।

মেয়েটি মন্দ নয়। নাম পারুল, রংটা ফর্সার দিকেই, মুখ-চোখও খুব খারাপ নয়। সুন্দরী না হইলেও আপত্তি করার মত কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে, অমলের মনে হইল, যেন একটু বেশী সপ্রতিভ। যে বস্তুটি কমলাকেও তাহার চোখে সুশ্রী করিয়া তুলিয়াছিল সেই একান্ত লজ্জা-নম্র ভঙ্গুর ভাবটির বড় অভাব। কিন্তু সে কথা ত আর বাবাকে বলা চলে না; বাবাকে কেন, যে কোন লোককে বলিলেই সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, সুতরাং তাহাকে বলিতেই হইল যে মেয়ে পছন্দ হইয়াছে।

ইহার পর হরিদাসবাবু মহাউৎসাহে কথাবার্তা চালাইতে শুরু করিলেন। পারুলের এক ভাই রেলে কাজ করে, অবশ্য সামান্য টাকা বেতন, তবু পাত্র হিসাবে লোভনীয়। হরিদাসবাবু সুযোগ বুঝিয়া পারুলের বাপকে চাপিয়া ধরিলেন যে, তিনি বিনা পয়সাতেই পারুলকে লইতে রাজী আছেন, যদি পারুলের বাবা তাঁহার পুটিকে গ্রহণ করেন। প্রথমটা পারুলের বাবা রাজী হন নাই, ছেলের বেশী মূল্য পাইবেন বোধ হয় এই আশাই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিদাসবাবুর জেদই বজায় রহিল।

খবরটা শুনিয়া অমল অবাক হইয়া গেল। একবার বাবাকে কহিল, থাক না বাবা এখন কমলার এমন কি বয়স হয়েছে?

কিন্তু হরিদাসবাবু যখন জবাব দিলেন, এমনিই হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাক্। তুমি আর খোকা পারবে দু-দুটো বোনকে পার করতে? ঐ ত তোমাদের সামান্য আয়!

তখন তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। হরিদাসবাবু বুঝাইয়া দিলেন, এ ভালই হল। আমি কেষ্টবাবুকে

বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমাদের যার যা দেয়, তত্ত্বতাবাস, কিছুই আমরা দেব না, শুধু নিয়মকর্ম করার মত করলেই হবে। উভয় পক্ষেরই তাতে সুবিধে।

অমল কহিল, কিন্তু খরচা ত আছে। তা ছাড়া একেবারে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে ত আর মেয়েকে পাঠানো যাবে না!

হরিদাসবাবু জবাব দিলেন, না, তা যাবে না। তাঁরাও চুড়ি হার দেবেন, আমরাও তাই দেব কথা আছে। আর ঘরখরচাও শ'খানেক লাগবে অন্তত।

তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কিছুই ছিল না তোমার মায়ের, শুধু গাছ কতক চুড়ি আর একটা বালা, তাই ভেঙ্গে যা হয় করে দেব। বাবুদের কাছ থেকেও হয়ত কিছু পাওয়া যাবে। একে ত পার করি, তার পর রইল বুড়ি, তোমরা যা হয় ক'রো।

অমল চুপ করিয়াই রহিল। কিন্তু এই দুই দিন তাহার মন যে বসন্ত বাতাসে মাতামাতি করিতেছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাকে হিম-শীতল বলিয়া বোধ হইল। বিবাহের সময় কিছু অর্থ সে হাতে পাইবে আশা ছিল, সামান্য কিছু উৎসব, দু-একটি দিন অন্তত আনন্দে কাটিবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু সে সম্ভাবনা আর একেবারেই রহিল না। কোন মতে টানাটানি করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে! অথচ কীই বা বলিবার আছে। সত্যই, দুইটি বোনের বিবাহের ভার লইবে সে কোন সাহসে? তাহার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল।...এইভাবেই সে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

কিন্তু তবু দিন পাঁচ-ছয় পরে সে একটা আশা ভঙ্গের বেদনা লইয়াই কলকাতায় ফিরিয়া আসিল। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে আগামী মাসে, সুতরাং এখন আর দেশে থাকবার প্রয়োজন নাই, কথা রহিল, তখনই সে দিন চারেকের ছুটি লইয়া কাজটা সারিয়া যাইবে।

বাসায় পৌঁছিয়াই ইন্দুর একখানা সুদীর্ঘ চিঠি হস্তগত হইল। দিন তিনেক হইতে আসিয়া পড়িয়া আছে। সে ইতিমধ্যেই সস্ত্রীক বিভাসবাবুর দেশে চলিয়া গিয়াছে। স্থানটি তাহাদের দুজনেরই পছন্দ হইয়াছে, কাজও এমন কিছু নয়—বাসা, লোকজন সব ব্যবস্থাই বিভাসবাবু করিয়া দিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করিয়া শেষে লিখিয়াছে—

> আমি নাকি হেড মাস্টার আর আপনার কমলা লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হেসে বাঁচি না। যাই হোক —এ যেন বেঁচে গেলাম অমলদা, এখানে খরচা কিছুই নেই, যা পাব দুজনে, সব খরচা চালিয়েও মামাকে মাসে মাসে দশ বার টাকা পাঠানো চলবে। তা ছাড়াও এখানকার পোস্ট অফিসে মাসে মাসে দু-এক টাকা ক'রে জমাবো। বিভাস বসু বলেছেন সামান্য কিছু জমলেই কিছু ধানজমি কিনে দেবেন। ব্যাস্—তাহ'লে আর ভাবনা কি?

ঠিক সেই ইন্দু! এতটুকু বদলায় নাই। সোনালীস্বপন সে দেখিবেই! চিঠির শেষে লিখিয়াছে—

> আসবার সময় শ্বশুর মশায়কে নিয়েই বিপদ বেধেছিল। তিনি এটাকে তাঁর প্রতি অপমান বলেই ধরে নিয়ে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন। কান্নাকাটি, সে ভয়ানক ব্যাপার। শেষে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গেলেছি যে, তিনি চাকরী ক'রে দিতে পারলেই আবার ফিরে যাব। অবশ্য, আমার আর যাবার ইচ্ছেও নেই, আর তিনিও পারবেন কিছু করতে কিনা সন্দেহ! —তবু, তাঁর ঐতেই সান্ত্বনা।

চিঠির মধ্যে দুই লাইন কমলারও লেখাছিল—

> আপনি কেমন আছেন? ওঁর মুখে শুনলুম, আপনার দয়াতেই এখানকার কাজ পাওয়া গেছে, আমাকে ধন্যবাদ জানাতে বলছেন। কী ধন্যবাদ জানাবো বলুন? আমাদের জীবন রক্ষা করলেন আপনি! সময় পেলে আসবেন একদিন। একটা রবিবার দেখে আসবেন না! বেশ জায়গা ভাল লাগবে খুব! নমস্কার নেবেন।
> ইতি— আপনার কমলা।

চিঠিখানা সে হাতে করিয়াই বসিয়া রহিল। থাক্— ইহারা বাসা বাঁধিতে পারিল শেষ পর্যন্ত! ভালই হউক আর মন্দই হউক, শেষের জন্য যাহাই তোলা থাক—এখনকার মত নিরাপদ বাসা ত পাইল। দুদিনের সুখ, এই যথেষ্ট। সে ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, তাহার অধিক আশা করিতে নাই।

সে কল্পনা নেত্রে দেখিতে লাগিল কমলা তাহার সেই নগণ্য এবং ক্ষুদ্র গৃহস্থালী পাতিতেই ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে। তারই মধ্যে ইন্দুর জন্য সহস্র ছোট ছোট স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন চলিতেছে—সেই ঈষৎ লজ্জিত অথচ প্রসন্ন আনত মুখখানি সে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখিতে পাইল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা যেন কোন্ এক গোপন ঈর্ষায় কাঁটা দিয়া উঠিল।

পরক্ষণেই মনে পড়িল নিজের বিবাহের কথা। তাহার স্ত্রীও কি অমনি করিয়া তাহার সেবা ও তাহার স্বাচ্ছন্দ্যকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইতে পারিবে? কে জানে। কমলার স্থানে সে যেন কিছুতেই পারুলকে কল্পনা করিতে পারে না, কোথায় একটা প্রতিনিয়ত বাধে।......

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হইল যে অফিসের আর বেশী দেরী নাই, খাওয়া আর হইয়া উঠিল না, কোন মতে স্নান সারিয়া সে ডালহাউসী স্কোয়ারের দিকে দৌড়াইল। দেশে গিয়া প্রায় কপর্দকশূন্য হইয়া আসিয়াছে, এই ক'দিন চালানোই শক্ত, সুতরাং একদিন ট্রাম ভাড়া দেওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব।

যতদূর সম্ভব দ্রুত চলিতেছে, এমন সময় সহসা ছানাপটির মোড়ে পিছন হইতে সজোরে কে জামাটা ধরিয়া টান্ দিল। এই আকস্মিক বাধায় বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। আরে, এযে কার্তিকবাবু!

কিন্তু একী অবস্থা। যৎপরোনাস্তি ময়লা একটা কাপড়, তাও বাঁ হাঁটুর কাছে অনেকখানিই ছেঁড়া, গায়ে একটা আরও জীর্ণ জিনের কোট, চক্ষু কোটরগত, চুলগুলিতে জট

(শেষাংশ ৪৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"তা বললেই ছাড়ছি আর কি।"

"সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।"

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ। সুলতা এক ফাঁকে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, স্বামী তাহাদের দিকে উদাস চোখে চাহিয়া আছে।

সে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া কহিল, "এ'কে আগে আর দেখ নি তুমি। মণিদি'র বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে ইনি এসেছিলেন। কি আমুদে লোক ছিলেন, আর কি চমৎকারই যে বাঁশি বাজাতে পারতেন ইনি। খোকা যে ঘুমিয়ে পড়ল গো......"

খোকা কোন্ সময় বেঞ্চির উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুলতা উঠিয়া তাহাকে নিচের বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তারপর যথাস্থানে আসিয়া বসিয়া বলিল, "বা-বা, সাতদিন থেকেই আপনি যে কান্ড করে গেছলেন, আপনাকে ভুলতে আমার অনেক দিন লেগেছিল।"

সমরেশ এবং সুলতার স্বামী দুইজনেই সুলতার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিল।

সুলতা তেমনি সপ্রতিভভাবেই মৃদু হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বিয়ের দশ দিন পরে দিদি-জামাইবাবু ফিরে এল জামাইবাবুর গ্রাম থেকে, সঙ্গে ইনি—সমরেশবাবু। এ'রা সাত দিন ছিলেন। কিন্তু সাত দিনেই এমন হল যে, অন্য লোকের সামনে আমরা দুজনে দুজনের দিকে তাকাতেই পারি না, যেন আমরা কি-একটা লুকোচুরি করছি, একটা মস্ত বড় অপরাধ করছি, এক্ষুণি ধরা পড়ে যাব। মনে পড়ে সমরেশবাবু?"

সুলতা আবেশমাখা দৃষ্টিতে সমরেশের দিকে চাহিল। সমরেশের মন তখন অতীতের সেই যৌবন-মধ্যাহ্নের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। সে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

সুলতার স্বামী সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "আপনি তো তাহলে আমার মস্তবড় ক্ষতি করে ফেলতেন মশাই। আপনার বন্ধুর বিয়ের মাস পাঁচেক পরেই আমাদের বিয়ে হয়। কে জানে, আর কিছুদিন দেরি হলে..."

সমরেশের ধ্যান ভাঙিল। শেষের কথা কয়টি শুনিয়া সে হাসিয়া বলিল, "তা হত না মিস্টার..."

"অরুণ গুহ।"—সুলতার স্বামী বলিল।

"তা হত না অরুণবাবু। একদিনের কথা মনে পড়ল, তাহলে বলি শুনুন। বিয়ের পরের দিন দুপুরবেলা। আমার বন্ধু জিতেশ একটা ঘরে তার শালীদের নিয়ে খেতে বসেছে। ঘরে বাইরে বারান্দায় নিমন্ত্রিতরা খেতে বসেছে। আমি বসেছি ঘরটার দরজার ঠিক সামনেই। জিতেশ ঘরের ভেতরে আমার দিকে পেছন ফিরে বসে খাচ্ছিল, তাই আমায় অনেকক্ষণ দেখতে পায় নি। কিন্তু হঠাৎ একবার দেখতে পেয়েই..."

সুলতা বলিয়া উঠিল, "আমিই তো আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম।"

"আমাকে দেখতে পেয়েই জিতেশ চাপা গলায় বলে উঠল, 'কিরে, নুকিয়ে নুকিয়ে বসে গেছিস বুঝি। দাঁড়াও, বলে দিচ্ছি, কায়স্থদের সঙ্গে খেতে বসা।' সুলতা তক্ষুনি জিজ্ঞেস করলেন জিতেশকে, 'বামুন বুঝি উনি?' জিতেশ 'হ্যাঁ' বলতেই মুখখানা তখন ওঁর..."

"তা বই কি, তা বই কি, উঃ কি মিথ্যেবাদী।"—সুলতার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস।

"সুতরাং বুঝতে পারছেন অরুণবাবু, আপনি বরবেশে যত দেরিতেই আসতেন না কেন, সুলতা দেবী আপনার জন্যেই বসে থাকতেন।"—বলিয়া হাসিতে লাগিল সমরেশ।

"আর আপনার কথা বলব?"—সুলতার চোখে কৌতুক মাখানো, স্বামীর দিকে চাহিয়া সে বলিতে লাগিল, "জানো, আমাদের আর মণি-দি'দের বাড়ির মাঝখানে যে মাঠটা, সেই মাঠটা থেকেই তো গলি বেরিয়ে গেছে একেবারে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত। উনি করতেন কি, ভোরবেলায় উঠে সেই মাঠে বেড়াতেন, আর মাঝে মাঝেই আমাদের গলিতে এসে ঢুকতেন। কৈফিয়ৎ কি, না ঝিঁটকি গাছের ডাল ভাঙতে এসেছি দাঁতনের জন্যে।"

"আর, আপনি তো একদিন ভোরবেলা নিজেই দাঁতন নিয়ে আসছিলেন আমার জন্যে। আমি গলিটায় ঢুকতে যাব, এমন সময় আপনার সঙ্গে দেখা। আপনি আমাকে দেখেই মুখে দাঁতন দিলেন, যেন আপনার নিজের জন্যেই সেটা ভেঙেছিলেন।"

"উঃ, না না, আপনি বড় মিথ্যেবাদী।" —সুলতা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

সমরেশ ও অরুণ দুইজনেই হাসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মিলের কাজ কেমন চলছে?"

সমরেশ উত্তর দিল, "মন্দ নয়।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার সমরেশই প্রথমে কথা কহিল, অরুণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করেন?"

"আমি?" —অরুণই উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া সুলতা জবাব দিল, "ঢাকাতেই একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন। উনিও বি-এস-সি কি না। তবে, অনেকদিন থেকেই কাজটা ছেড়ে দেবেন বলছেন। ল্যাবরেটরির প্রোপাইটার লোকটা বিশেষ ভাল নয়, বনিবনাও হচ্ছে না। দিন্ না আপনার মিলে একটা কাজ-টাজ, যদি লোকের দরকার হয়।"

"আমার মিল তো নয়, লিমিটেড কোম্পানি।" —বলিয়া একটু থামিল সমরেশ, তার পর বলিল, "আচ্ছা, পরে যদি দরকার হয় তো জানাব।"

এতদিন পরে প্রায় ভুলিয়া যাওয়া সুলতার মুখ হইতে এরূপ একটা অনুরোধ শুনিবার জন্য সমরেশ প্রস্তুত ছিল না। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি, কি-রকম একটু লজ্জা বোধ করিতে লাগিল সে।

কিছুক্ষণ পরে এদিক-ওদিক চাহিয়া সহসা সে বলিয়া উঠিল, "ওই যাঃ, তারপাশা ছাড়িয়ে এসেছি নাকি?"

অরুণ ও সুলতা দুইজনেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কেন, আপনি কি তারপাশায় নামতেন নাকি?"

"না, তবে...এই...কিছু খাবারের যোগাড় করলে হ'ত। স্টীমারের খাবার আমি কিছু খাই না কিনা।"

"কিছু যদি মনে না করেন", —সুলতা অনুরোধের সুরে বলিল, "আমাদের সঙ্গে ঘরের তৈরি ঢের খাবার রয়েছে। খাবেন?"

"এখনো অবশ্য বিশেষ ক্ষিদে পায় নি।" —সমরেশের সকুণ্ঠ স্বর চাপা রহিল না।

সুলতা যেন একটু অভিমান করিল, কহিল, "এ-রকম অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকও খেতে রাজি হ'ত সমরেশবাবু।" —তার পর একটু থামিয়াই বলিল, "বার করছি কিন্তু খাবার।"

.....খাইতে খাইতে সমরেশ বলিল, "আপনাকে প্রথমে একেবারেই চিনতে পারি নি, সুলতা দেবী। চেহারা কত বদলে গেছে আপনার। এখন আর সে রোগা মানুষটি নন। গায়ের রঙও যেন আগের থেকে আরও ফর্শা হয়েছে।"

"থামুন।" —সুলতার ভঙ্গিতে লাস্য, কানের দুল দুইটারও যেন তাহাই।

"ওই দেখুন," —হাসিতে হাসিতে অরুণ বলিল, "আমিও যদি একটু রূপের ব্যাখ্যান করি, অমনি যেন আমায় তেড়ে মারতে আসে। অথচ মেয়েরা—বিশেষ ক'রে এই ধরনের মেয়েরাই—তাঁদের রূপ সম্বন্ধে বেশি সচেতন।"

সুলতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আচ্ছা হয়েছে, থামো তো, কি আরম্ভ করেছ তোমরা।"

খাওয়ার শেষের দিকে সুলতা একটু সসঙ্কোচেই জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে করেছেন তো সমরেশবাবু?"

সমরেশ সহসা যেন একটু ম্লান হইয়া গেল, টপ্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "করেছিলুম।"

"মানে?"

"বলছি।" —বলিয়া সমরেশ খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া এক ধারে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিল। তার পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "বছর দুই হ'ল মারা গেছে।"

হঠাৎ যেন আবহাওয়াটা বদলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। তার পর সুলতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেপুলে কিছু হয় নি?"

"না।" —সমরেশ থামিল একটু, তার পর আপনমনেই বলিতে লাগিল, "শ্বশুরমশায়ের অবস্থা ভাল, ম্যাজিস্ট্রেট। ওই এক মেয়ে ছিল। বাপের থেকে হাজার দশেক টাকা এনে আমাকে এই কাজে নামিয়েছিল। আমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল কি না, স্বাধীন ব্যবসা করব। আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে গেল। একদিনও বেকার হয়ে বসে থাকতে দেয় নি। এখন একটু দাঁড়িয়েছি, দেখে যেতে পারল না।"

সমরেশের একটা গোপন ব্যথার স্থানে খোঁচা দিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া সুলতা-অরুণ মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার পরিসমাপ্তি করিল সমরেশ নিজেই। সে বলিয়া উঠিল, "যাই, বাইরে আবার মাল-পত্র সব পড়ে আছে। দেখি গে'। চললুম সুলতা। চললুম অরুণবাবু, নমস্কার।"

তারপাশা হইতে একটি যুবক উঠিয়া সমরেশের পাশেই স্থান লইয়াছিল, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া সমরেশ তাহারই সহিত গল্প করিতেছিল। কথায় কথায় মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকটির শিক্ষিত মনের পরিচয় পাইয়া সমরেশ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল।

যুবকটি তখন বলিতেছিল, "আমার এক পিসীমা, বেশ শিক্ষিতা, বুঝলেন। তাঁর চুরি করা অভ্যেস,—খাবার-দাবার নয়, টাকাকড়ি। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অণুমাত্রও কমে নি। কারণ, আমি জানি, এই চুরি করাটা তাঁর একরকম মানসিক রোগ—Psychopathy. রোগ তো মানুষ ইচ্ছে করে আনে না। আসলে কি জানেন, তাঁর brain-এ এবং মনে এমন কতকগুলো defects রয়ে গেছে, অপূরণ বা অভাব বলতে পারেন, যার ফলে....."

"সমরেশবাবু।" অরুণ আসিয়া ডাকিল।

সমরেশ মুখ ফিরাইয়া অরুণকে দেখিয়াই বলিল, "আসুন, বসুন।"

অরুণ কহিল, "না, বসব না। আপনাকে একটু দরকার আছে, আসুন না।"

নবাগত যুবকটিকে বসিতে বলিয়া সমরেশ অরুণের সহিত চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে নিজের বাক্স খুলিয়া কয়েকটা টাকা লইয়া আবার চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলে যুবকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি সমরেশবাবু? এতটা ব্যস্ত বিপদগ্রস্ত ভাব যে আপনার?"

"ভদ্রলোকটি তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে ঢাকা যাচ্ছেন। আমার পরিচিত। গোটা পঞ্চাশেক টাকা শুদ্ধ মণি-ব্যাগটি হারিয়ে ফেলেছেন। কি বিপদ বলুন ত? তাই, কুড়িটা টাকা ধার নিলেন।"

"আপনি বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন।" —যুবকটি একটু লজ্জিত হইয়াই বলিতে লাগিল, "কিন্তু কিছু মনে করবেন না, কয়েকটা কথা বলব। ওই যে Psychopathy'র কথা বলছিলাম, তার একটা দৃষ্টান্ত হাতে হাতে পাওয়া গেল। যে ভদ্রলোকটি আপনাকে ডাকতে এসেছিলেন, আপনি তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার আগেই, আমার সঙ্গে তাঁর চোখ-চাওয়া-চাওয়ি হয়। ভদ্রলোকটি আমাকে দেখেই মুষড়ে পড়লেন, অপরাধী মনের....."

"আপনি এ-সব কি বলছেন?"

"আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু আর একটু শুনুন। গত

বৎসর পুজোর সময় আমি আর এ'রা এই স্টীমারেই নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলাম। ও'দের সঙ্গে আগে থেকেই আমার আলাপ ছিল। বছর তিনেক আগে ঢাকাতে বেকার অবস্থায় ওই ভদ্রলোকটির বাড়ির পাশেই আমি মাসখানেক ছিলাম। সেই সূত্রে ও'দের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। গত বৎসর যাবার সময় ঠিক এই ধাপ্পা দিয়েই ও'রা আমার কাছ থেকে পনেরটা টাকা নেন। সে টাকা এখনো পাই নি।"

"আপনি এখন থাকেন কোথায়?"

"আমি নারায়ণগঞ্জেই একটা মিলের একাউন্ট্যান্ট। একটা ছুটিতে একবার......"

"ধাপ্পা দিয়ে চুরি করে ওদের লাভ?" —সমরেশ নরম হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোক বি-এস-সি পাশ, কি-একটা ল্যাবরেটরিতে ভাল কাজ করেন।"

"ঘোড়ার ডিম করেন।" —যুবকটির স্বরে উত্তেজনা, "তবে ভদ্রলোক বি-এস-সি, একথা ঠিক। শুনুন না, একবার একটা ছুটিতে ঢাকা গেলুম টাকা ক'টা আদায় করবার জন্যে। ভদ্রলোকের সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশত দেখা হয় নি। তবে আশে-পাশে খোঁজ নিয়ে জানলুম, কাজ-কর্ম কিছুই করেন না। দুটো-একটা টুইশন মাত্র করেন। তবে থাকেন অত্যন্ত চালে, যদি কোন বড় মক্কেল পাকড়ে কোন কাজ যোগাড় করা যায়। দেখুন না, আমাকে দেখে সুলতা দেবী দরজা বন্ধ করে দিলেন।"

সমরেশ তাকাইয়া দেখিল, সত্যই দরজা বন্ধ। তাছাড়া, যুবকটি যখন সুলতার নামও জানে, তখন ব্যাপার নিশ্চয়ই সত্য।

যুবকটি বলিয়া চলিল, "ভাবে মনে হচ্ছে, এ'দের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি। আপনি আছেন তাই, নইলে ওখানে গিয়ে অপমান করে ঠিক টাকা ক'টা আদায় করে নিতুম।"

সমরেশ আর কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার তখন মনে পড়িতেছিল আড়াই বৎসর আগেকার কথা। তাহার স্ত্রী সীতা যেদিন নিজ অঙ্গের গহনাগুলি ও দশ হাজার টাকার একখানি চেক আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া হাসি-মুখে বলিয়াছিল, "কালই তোমার ব্যবসা আরম্ভ করতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ। তুমি মুখ কালো করে বসে থাকবে, তা আমি চোখে দেখতে পারব না" সীতার সেদিনকার মুখখানি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। সে ভাবিল, সেই সীতা, সেই পতিব্রতা স্ত্রীর অন্য একটা রূপ বুঝি এই সুলতা।

তথাপি, কিছুক্ষণ পরে স্টীমার যখন নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে আসিয়া লাগিল, তখন সুলতাদের সহিত একবার দেখা করিবারও প্রবৃত্তি সমরেশের হইল না। কুলির মাথায় তাড়াতাড়ি মোট চাপাইয়া অদৃশ্য হইয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মনে ছিল আশা

(৪৩২ পৃষ্ঠার পর)

পড়িয়াছে, কতদিন যে স্নান হয় নাই, তাহা বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না!

—একী অবস্থা আপনার কার্তিক দা?

কার্তিকবাবু অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কী ভায়া, চিনতে পেরেছ তা হ'লে? কোথায় যাচ্ছ? অফিসে? যাও, যাও!......আমাকেও যেতে হবে এখুনি—

অমল প্রশ্ন করিল, কোথায় যেতে হবে?

কোথায়? কার্তিকবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। —কোথায়? দাঁড়াও, নোট করা আছে ডায়েরীতে, দেখে নিই।

তাহার পর ব্যস্তভাবে ছেঁড়া পকেটের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া কহিলেন, ঐ যা, কোথায় পড়ে গেছে নোট-বুকটা! আচ্ছা, যাও তুমি; আমি একবার লালবাজারে খোঁজ ক'রে আসি ডায়েরীটা পেয়েছে কিনা!

এযে একেবারে উন্মাদ অবস্থা!......অমলের চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে কোন মতে চোখের জল চাপিয়া কহিল, কার্তিকদা, আপনার শরীর মোটে ভাল নেই, কয়েকদিন দেশ থেকে ঘুরে আসুন। আর এখন একবার বাসায় যান—

কার্তিকবাবু আবারও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ভাবছ আমি পাগল হয়ে গেছি, না? তা তোমারই বা দোষ কি, সবাই ভাবছে। এখন টাকা হাতে নেই, সবাই পাগলই ভাববে। রোসো, টার্ফ ক্লাবের চেকখানা হাতে পাই আগে, আবার সবাই এসে পায়ে তেল দেবে—

বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে ধর্মতলার দিকে হাঁটিতে শুরু করিলেন। অমলও কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া অফিসের দিকে চলিল। সময় থাকিলে সে জোর করিয়া কার্তিক-বাবুকে মেসে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত, কিন্তু এখন যে এমনিই দেরী হইয়া গেছে।......এই লোকটি একদিন তাহার যে কী উপকার করিয়াছিল, তাহা কোন দিন সে ভুলিতে পারিবে না—

কিন্তু খানিকটা চলিবার পরই আবার পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল কার্তিকবাবুই দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছেন। কাছে আসিয়া চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, দু'টা টাকা দিতে পারিস্ ভাই, অনেকদিন মাঠে যাই নি, ঢোকার খরচ আর তিনটে টাকা টোট্—বেশী নয়!......পারবি না?......আচ্ছা যাক্—

বলিয়াই তিনি যেমনভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেলেন।

অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে আবার অফিসের পথ ধরিল। (ক্রমশ)

স্মরণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তোমারে স্মরণে আর আনিব না ভাবি মনে মনে,
বাঁধ-ভাঙা বন্যা জলে সে সঙ্কল্প কোথা ভেসে যায়,
স্মৃতির প্লাবন স্রোতে ডুবি ভাসি প্রেম দরিয়ায়,
উজানে বহে সে নদী অতীতের লুপ্ত নিলয়নে।
যে হ্রদ উবিয়া গেছে বাষ্পাকারে অসীম গগনে
তারি সূক্ষ্ম কণাগুলি কী বাতাসে বাদলে ঘনায়
আমার অম্বরে যেন কুণ্ডলিত জলদ মালায়,
শূন্য বক্ষে নেমে আসে অঝোরে শ্রাবণ বরিষণে।

ইন্দ্রিয়ের পার হ'তে অন্তরের অতীন্দ্রিয় তটে
ভাঙনের পলিমাটি স্তরে স্তরে রচে বালুচর,
রৌদ্রালোকে ঝলমল শুচিশুভ্র সিকতার পর
একাকী দাঁড়ায়ে আছ প্রতীক্ষায় স্বপনের পটে,
—বর্ণরেখালীলায়িত সমুজ্জ্বল মায়া মরীচিকা,
নয়নে ঘনায়মানা স্মরণের চারুচিত্রলিখা।

মধু মাস এল

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

ঋতুর চক্রান্তে পুনঃ মধুমাস এলো।
রক্তে আজ এলো নাকি বসন্তের দিন!
বাতাসে কিসের গন্ধ ভাসে?
বীজাণুর পদপাতে হাওয়ারা মলিন।

পৃথিবীর চেনা পথে
অনেক বসন্ত এসে গেছে—
মাটিফাটা পৃথিবীর হৃদয়েরে ছুঁয়ে।
মানুষের কামনারা বুঝি নাড়িতেছে,
জনতার এলো লাল বসন্তের দিন।

এখনো ঝরেনি সব পাতা
হাওয়া দিল—
হাওয়া সবে দিল।
শীতের তুষার শেষে দ্বার হলো খোলা।
আকাশের পারে শিশু আলোরা রঙিন।

পথের দুপাশে ভিড় বাড়ে,
এলো লাল বসন্তের দিন।

লাল সূর্য্য

গোপাল ভৌমিক

অতর্কে উদ্যত দিন
হানা দিল দুয়ারে আমার—
বাহিরে বিপুল বিশ্ব
এখনও আঁধারে একাকার!

একাকী আমিই জাগি—
আর সব সুষুপ্তি-বিলীন
অসীম বৈষম্য সব
অন্ধকারে হ'য়ে গেছে ক্ষীণ!

জীর্ণ কুটির মাঝে—
দরিদ্রের ক্ষুধার যন্ত্রণা,
তারই পাশে হর্ম্য মাঝে
আনে ঘুম সুরের মূর্চ্ছনা!

হঠাৎ দিনের আলো
এসে পড়ে গৃহাঙ্গন তলে
আমার মনের মাঝে
শত সূর্য লাল হ'য়ে জ্বলে।

প্রদীপ্ত দিনের ডাকে
সাড়া দেই আনন্দিত মনে—
দেখি লাল সূর্য জ্বলে
প্রতি পর্ণ কুটিরের কোণে!

বণিক

সুশীল রায়

অনেক ক্ষেত্র ছিল একদিন নানাবিধ শস্যের
ফসলে ফসলে সোনা।
বর্তমানের অনিবার্য সে বস্তুর লোকশানে
করিনে অনুশোচনা॥

বাণিজ্যে যদি লক্ষ্মী থাকেন, দেখি বন্দর তবে
কতখানি দূরে পথ।
সংসার থেকে বাস তুলে খুঁজি মাস্তুলে মাস্তুলে
স্বর্ণ-ভবিষ্যৎ॥

শৈশবে সেই যাত্রারম্ভ হ'য়েছে, বর্তমানে
যৌবন প্রায় শেষ।
মালিকী আসর কোথা পাই সেই সন্ধানে অদ্যাপি
র'য়েছি নিরুদ্দেশ॥

আমার অতীত পিছনে পিছনে ঘুরিছে ছায়ার মত
আমি যেন আততায়ী।
চিনিতে পারে না, যেহেতু এখন সেদিনের মত আর
নহি তো স্তন্যপায়ী॥

একদা-র শিশু যৌবনাগত পঙ্গু খর্বকায়
আজিকে নিরাত্মীয়।
বন্দর খুঁজে ফিরিছে হাজার বন্ধুর বিনিময়ে
লক্ষ্মীর প্রার্থী ও॥

পান্থপাদপ নিত্য আমায় জোটায় অন্নজল
আশ্রয় দেয় বট।
ভ্রূকুটি হেথায় এতটুকু নেই, দেখেও আরাম পাই
সকলেই অকপট॥

আমার ক্ষেত্রে এখন যাহারা লাঙ্গল-বলদ নিয়ে
ভাগ্য বদল করে
তারা যেন সবে পণ্য পাঠায় লক্ষ্মীর বিনিময়ে
বেনামীতে বন্দরে॥

"টিলার দেশের লীলাবতী"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

টিলার দেশের লীলাবতীর
কনক চাঁপার রঙ—
শিলার কোলে জল-উছলা
নির্ঝরিণীর ঢঙ্!
চায় না র'তে রুদ্ধ স্রোতে
বন্ধ গুহায় বাঁধা
নীল আকাশে নীল সায়রের
স্বপ্ন দেখে কাঁদা—
চায় সে যেতে ছন্দে মেতে
সেই সাগরের পানে
টিলার দেশের লীলাবতী
শিলায় নাহি মানে!
নাম-না-জানা কুড়ুক্ পাখী
উড়ুক সন্ধ্যাবেলা,
বনের ছোট ফুলটি লয়ে
জ্যোৎস্না করুক খেলা,
হরিণশিশু ছট্‌ফটিয়ে
ছুটুক মায়ের পাছে—
শিস্ দিয়ে দোল্ দিক্ ফিঙে ঐ
হিজল্ গাছে গাছে—
নীরব-গিরি-কান্তার-লীন
উৎস-তোয়া আলো
টিলার দেশের লীলাবতীর
লাগে না আর ভালো!
তাইতে সে যায় নাইতে সেথায়
উপল পথের কূলে
আকাশ-জোড়া মেঘের মত
বিশাল এলোচুলে!
তাই ত ছবি হয় সে জলে
বিম্ববতীর প্রায়
টিলার দেশের লীলাবতী
জল মাখে না গায়!

প্রহেলিকা

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[১৩]

পরের দিন বাঁড়ুজ্যে যখন পড়াতে এলো তখনও ইলা হাজির! বাঁড়ুজ্যে ভাবলে, এত ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'চ্ছে কলকাতায় এ মেয়েটার কেন হয় না। গোটা কয়েকদিন মাত্র—এই ১৫ই ফাল্গুন পর্যন্ত! কিন্তু ইলাকে এমন দুরন্ত রকম সুস্থ দেখাল যে, বাঁড়ুজ্যে তার দিকে চেয়ে মোটেই ভরসা পেলে না।

বরং প্রহেলিকারই আসতে একটু দেরী হ'ল। দণ্ড দুই একা ইলার সঙ্গেই বাঁড়ুজ্যের কথা কইতে হ'ল!

এ কেমন ধারা ঢং বাপু, ভাবলে বাঁড়ুজ্যে। ১৫ই ফাল্গুনে বিয়ে যখন ঠিক, তখন তার আগে নির্জনে দুটো কথা কইতে প্রহেলিকার এত ধোকা কেন? অবিশ্যি প্রহেলিকা বলেছে কথাটা গোপন রাখতে, বলেছে তার নাম যেন কিছুতেই প্রকাশ না হয়। যেকালে বাপ মাকে না জানিয়ে বিয়ে হচ্ছে তাতে একথা সে বলতে পারে। তাই ব'লে পড়াশুনার অবসরে সুযোগ ক'রে দুটো কথা বলা, তাতেও এত ভয় কিসের?

প্রহেলিকা এসেই ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে, "বেশ, মাষ্টার মশায় ইলার সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন যে?"

শোন কথা! প্রহেলিকা নিজেই গাফিলি ক'রে করলে দেরী, আবার সে দেয় এই উল্টো চাপ!

অন্যায়, ভারী অন্যায়, আর মিথ্যে তো বটেই। কিন্তু এমন প্রশান্ত নিশ্চয়তা ও সুস্পষ্ট ঈর্ষার সঙ্গে প্রহেলিকা কথাটা বল্‌লে, যে নির্দোষ হ'য়েও বাঁড়ুজ্যে একটু ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলো। আর ইলা তো লজ্জায় রাঙা হ'য়ে হাসতে লাগলো।

প্রহেলিকা তাদের এই ভাব দেখে চোখ দুটো টান ক'রে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করলে যে তাতে বাঁড়ুজ্যে বিশ্রীরকম মুশড়ে গেল। বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "দেখুন দোষ আপনার—আমাদের—"

গম্ভীরভাবে প্রহেলিকা তেমনি চোখ টান করেই বল্‌লে, "দোষ তো অবিশ্যি আমারই, চিরদিনই এমনি হ'য়ে থাকে, হবেও বরাবরই। যাক, দেখুন quantity theoryটা আমি কিচ্ছু বুঝিনি, ওটা আজ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।"

বই খুলে গম্ভীরভাবে এমন ক'রেই কথাটা বল্‌লে, যে এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় বাক্যের অবসর আছে বলে বাঁড়ুজ্যের মনে হ'ল না। কাজেই সে quantity theory বোঝাতে লাগলো।

গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে গেল সে। আজকে যেন সব কথা তার মনের ভিতর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ভুলের পর ভুল হ'চ্ছিল আর ইলা অনবরত সংশোধন করছিল। কোনও রকমে সে যখন দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা আঁক ক'ষে জিনিসটা মোটামুটি রকম বুঝিয়ে দিলে, তখন হঠাৎ প্রহেলিকা বল্‌লে,

"কিন্তু চেক—চেকগুলো এ হিসাবের কোনখানে গেল। টাকার চলতির হিসাব করছেন কিন্তু চেক বা হুণ্ডী দিয়ে ব্যাঙ্কের মারফৎ যে লেন দেন হয় তার কি কারেন্সীর ভ্যালুর উপর কোনও প্রভাব নেই?"

"অবশ্য আছে," ব'লে বাঁড়ুজ্যে বোঝাতে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রহেলিকা আবার প্রশ্ন ক'রে বসলো, "তাছাড়া গভর্নমেণ্টের ক্রেডিট যদি না থাকে, সোনার রিজার্ভ যদি না থাকে। আবার ধরুণ স্টার্লিং বা ডলার, যা সমস্ত পৃথিবীতে চলে। এসব বিষয়ের হিসাব কি রকম হবে?"

হাবুডুবু খেয়ে গেল বাঁড়ুজ্যে। ধীর স্থির হ'য়ে সে যদি ভাবতে পারতো তবে ক্রমে সে এসব সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে পারতো হয়তো। কিন্তু একে তার মানসিক সমতা সে সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারলে না কিছুতেই, তাতে প্রহেলিকা প্রশ্নের পর প্রশ্ন মেশিন গানের গোলার মত দ্রুতবেগে ছেড়ে তাকে এমন বিব্রত ক'রে দিলে যে বাঁড়ুজ্যে থই পেলো না।

ইলা তখন তার সাহায্য করতে এলো। দুটো একটা টাট্টি ডিঙিয়ে দিলে ব'লতে গেলে ইলাই! কিন্তু তাতে প্রহেলিকা এমন সাসূয় দৃষ্টিতে ইলার দিকে চাইলে আর এমন ভঙ্গী করলে যেন সে বলছে, "ঈস্‌, বড় যে দরদ!" তার সে দৃষ্টি আর ভঙ্গী দেখে বাঁড়ুজ্যে আরও হকচকিয়ে গেল।

সেদিনকার পড়ার মজলিসে বাঁড়ুজ্যে সুবিধা করতে পারলে না। সে একটু তাড়াতাড়িই উঠে গেল।

যাবার সময় প্রহেলিকা বল্‌লে, "প্রমোদবাবুর খোঁজ নিয়েছিলেন।"

বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "হাঁ মানে, সে বোধ হয়, ওর নাম কি গেছে—তার মেডিক্যাল এগজামিনেশন—"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "তার মানে তার খোঁজ নেন নি আপনি, কেবল আমাকে ভাঁড়াচ্ছেন।"

এত সুস্পষ্ট সত্য কথার জবাবে আর বলবার মত কথা পেলো না বাঁড়ুজ্যে। সে সোজা চম্পট দিলে।

ইলা বল্‌লে, "ধন্যি মেয়ে তুই পলি, পুরুষ মানুষদের এমন বাঁদর নাচ করাতে পারিস!"

"সে আমার গুণে নয়, ওদেরই গুণে। আমি যতই নেড়ে চেড়ে দেখছি ততই মনে হ'চ্ছে পুরুষ মানুষ মাত্রই প্রচ্ছন্ন বাঁদর। দড়ি ধরে বাগ মত টান দিতে পারলেই আপনি নেচে ওঠে।"

"না ভাই, কিন্তু মাষ্টার মশায় বেচারা ভালমানুষ, তাকে এমন ক'রে ক্ষেপাতে আছে! বেচারা একেবারে এলিয়ে গেল, আমার ভারী মায়া হচ্ছিল।"

"সেই কথাই তো আমি বলছিলাম।"

"হাঁ কিন্তু আমার সামনে অমনি ক'রে—"

"তবে কি করবো? ঢাক ঢাক গুড় গুড়ের মেয়ে আমি নই।"

"ওসব কথা রাখ। তোর কোনও কথার সোজা মানে ধরে নেওয়া অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি আমি। তোর মতলবখানা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"মতলব যদি কিছু থেকেই থাকে তবে অমনি অমনি তোকে ব'লে দেবো এমন হ্যাবলা পেয়েছিস আমায়।"

আর একটি মেয়ে এসে পড়লো। মেয়েটির নাম অশোকা। এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'য়েছিল লেকের ধারে যেদিন নিখিলেশের সঙ্গে প্রহেলিকার কথা হয়।

অশোকা এসেই বল্‌লে, "পোড়ারমুখী, এ করছিস কি?"

প্রহেলিকা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "চুপ! চুপ!—ষট্ কর্ণে মন্ত্রভেদ।"

"ষট্‌কর্ণ কোথায়? আমরা তো তিন জন।"

"কেন? আমাদের বুঝি একটা ক'রে কান?"

অশোকা বল্‌লে, "আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে ভাই। ধন্যি সাহস তোর—পারবি সামলাতে সব।"

"দ্রৌপদীর আশীর্বাদে পারবো। তুই কোনও ভয় পাস নে। ইলা, তুই বাঁদর নাচানটা একটু শিখে নিস আমার কাছে, কাজে লাগবে।"

ইলা বল্‌লে, "না ভাই, বড় ধাঁধা লাগছে আমার। আমাকে বল তুই—"

"চুপ।" ব'লে প্রহেলিকা দেখিয়ে দিলে সেই বুড়ো ভদ্রলোককে, যিনি আমাদের কাছে ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন নিশ্চয়।

তাঁকে দেখে ইলা ও অশোকা উঠে গেল। প্রহেলিকা তাঁকে সম্ভাষণ ক'রে বল্‌লে, "আসুন বিদূষক সাহেব।"

সে ভদ্রলোক বল্‌লেন, "জান Riddle আমার মনে হ'চ্ছে যে বিদূষক নামটা আমার ঠিক মানায় না। অবশ্য বিদূষক প্রণয় সহায়ক, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে কোথাও কোনও বিদূষক এক নারীর সঙ্গে গণ্ডাখানেক প্রণয়ীর মিলনে সহায়তা করেছেন এরকম দেখা যায় কি?"

"কেন শ্রীকৃষ্ণ?"

"শ্রীকৃষ্ণ—তিনি আবার বিদূষক হলেন কবে?"

"দ্রৌপদী স্বয়ম্বর নামক অলিখিত নাটকে। মহাভারতে তার স্পষ্ট পরিচয় আছে। দ্রৌপদীকে পাঁচ পাণ্ডবের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তিনি যে উপন্যাস রচনা করেছিলেন মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষকের সর্প দংশনের ভাণ তো তার কাছে ছেলেখেলা।"

"বটে? নজীর আছে তা' হ'লে। তা' বেশ, বিদূষকই সই।"

ব'লে বিদূষক ম'শায় একটা চেয়ারে বসতে যেতেই প্রহেলিকা উঠে বল্‌লে, "এইবারে চলুন।"

চেপে ব'সে বিদূষক বল্‌লেন, "কোথায়?"

অম্লানবদনে প্রহেলিকা বল্‌লে, "যেখানে আমি নিয়ে যাব।"

ঘাড় নেড়ে বিদূষক বল্‌লেন, "না তাতে আমার আপত্তি আছে।"

"কেন?"

"প্রথমতঃ আমি ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম ও এক পেয়ালা চা দরকার। দ্বিতীয়তঃ তুমি আমায় কিছু না ব'লে আমায় সুধু নাকে দাঁড় দিয়ে টেনে বেড়াবে সে চলবে না। জান, আমি পুরুষ মানুষ।"

সহৃদয়তায় গদগদ হ'য়ে প্রহেলিকা বল্‌লে, "আহা, বেচারা! কিন্তু ছোট জাতে জন্মেছেন, অদৃষ্টের দোষে তাতে এতটা"—

"ছোট জাত! কুলীন বোস কায়েতকে বল ছোট জাত!"

"তা' কেন বলবো? বলছি, পুরুষ জাতটার কথা। পুরুষ যে ছোট জাত, এভোল্যুশনে নারীর অনেক পিছনে প'ড়ে আছে সে তো ঠিক।"

"ঠিক! বা—"

"যাক এ নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? একথা আপনারা প্রতিমুহূর্তে পদে পদে অনুভব করেন এবং সেই inferiority complexএর জন্যই পুরুষ আদিকাল থেকে সময়ে অসময়ে চীৎকার ক'রে জাহির ক'রে আসছেন যে তারাই বড়, মেয়েরা ছোট। যে সত্যি সত্যি বড় সে তার বড়ত্ব নিয়ে অমন বড়াই করে না। কিন্তু ব'লছিলাম কি? ছোট জাতে জন্মেছেন ব'লেই অতটা হতাশ হবেন না। যত্ন ও অধ্যবসায়ে পুরুষ যোল আনা নারী হ'তে না পারলেও প্রায় কাছাকাছি আসতে পারে। শারীরিক ত্রুটি যে সব আছে আপনাদের দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, লম্বা চুল রেখে সেমিজ শাড়ীর নকলে জামা কাপড় প'রে তো অনেকটা সুধরে নিয়েইছেন। মানসিক জগতে চেষ্টা ও সাধনায় আপনারা এর চেয়েও অনেক বড়—প্রায় পরিপূর্ণ নারী হ'য়ে উঠতে পারেন,—যেমন মহাত্মা গান্ধী হয়েছেন।"

"গান্ধী নারী! তোমার আস্পর্ধা"—

"নন তিনি নারী? বলেন কি? দাড়ী গোঁফ বাদ দিলে পুরুষের বিশেষত্ব বা পুরুষত্ব কিসে? যুদ্ধে। নারী চিরদিনই অহিংসার পক্ষপাতী। যখন পুরুষ আদ্যোপান্ত অহিংস হ'য়ে ওঠে তখনই সে নারীর পদবীতে আরোহণ করতে পারে। তাই বলছিলাম, পুরুষ হ'য়ে জন্মেছেন ব'লেই যখন তখন তা নিয়ে আপশোষ করবেন না, সাধনায় কি না হয়? কাজেই 'ক্লৈব্যং মাস্মগম'—চলুন।"

"বটে! তা পুরুষত্ব না হয় বাতিল হ'য়ে গেল—কিন্তু চা?"

"সে পথে হবে।"

প্রহেলিকা বেরিয়ে পড়লো। (ক্রমশ)

রবীন্দ্র-দৈনিকী

(গদ্য কবিতার ছন্দ)

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

আজ ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শয়ন কক্ষ থেকে বারান্দায় এসে উপস্থিত হলেন কিছুক্ষণের জন্যে, সে সময় ডাঃ শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী এসে কবির কাছে বসতেই সামান্য একথা সে কথার পর গদ্য কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা সুরু হোলো। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে যা বললেন তার মর্ম এই যে, সাহিত্যে কবিত্বসম্পূর্ণ সৃষ্টি বিষয়ে সত্যিকার কবি এবং সাহিত্যিকদের বক্তব্য বিষয়ে বলবার অভিনবত্বে সব দিক থেকেই শেষ দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে একথা ভাবাটা অনুচিত। অনেক দিন ধরেই কতকটা চিরাচরিত ধারায় ছন্দের কতগুলো নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে কবিরা তাঁদের এক একটা ভাব বা বক্তব্যকে প্রকাশ করে এসেছেন। এরকম রীতির নিয়মটি হচ্ছে, ভাবকে এক একটি ছন্দের কাঠামোর আনুগত্য মেনে চলা। কিন্তু যেটিকে গদ্য কবিতা বলা হয় সেটার নিয়ম রীতি স্বতন্ত্র। তার বিশেষত্ব হচ্ছে ভাবের আনুগত্য স্বীকার করতে হয় ছন্দকে, ভাবের মধ্যে ছন্দের গতিবিধি, ভাবভঙ্গী দেয় ছন্দকে। যদি নতুন বলে এর প্রতি বিমুখ হও তাহলে এর মধ্যে যে ছন্দ আছে তার পরিচয় পাবে না। চলতি ছন্দের সম্বন্ধে ছন্দের বোধ না থাকলেও বিচার করা চলে, কেননা চলতি ছন্দের পরিচয় তার কাঠামো দিয়ে, কাজেই কাঠামোটায় শুধু যে ধ্বনি আছে তা নয় তার রূপও আছে, সেই রূপ দেখে বিচার করেই সহজে বলে দেওয়া চলে, কোন কবিতায় ছন্দ আছে কিম্বা নেই। কিন্তু যে কবিত্বময় সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাবের স্ফুরণের সঙ্গে বিষয়কে বলবার ভঙ্গীর সঙ্গে বিচিত্র হয়ে মিশে থাকে ছন্দ, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে নিঃসংস্কার চিত্ত হয়ে তার ছন্দের গতিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আসলে গোল বেধেছে এই শ্রেণীর রস সৃষ্টির সংগা নিয়ে। অর্থাৎ এই জাতীয় সাহিত্যকে কী নাম দেবে। বরাবর কবিতা বলতে যা বুঝে আসা হয়েছে, অবশ্য এ জিনিস তা যে নয় তা তো নিশ্চয় সত্য। কিন্তু একে কবিতা বলা ছাড়া আর কি বলা যায় তাও তো বলা কঠিন। একটা কথা অবিশ্যি মানতেই হবে যে, চিরাচরিত নিয়মে ছন্দের কাঠামোকে মেনে নিয়েও অনেকে এমন রচনাও করেন যার নাম আইনত কবিতা হলেও তা কবিতা হয় না, রসের অভাবে, ভাবের দৈন্যে এবং ছন্দ সম্বন্ধে কবির অজ্ঞতার জন্যে। এক্ষেত্রেও অনেক কবির কবিতায় সেই ত্রুটি ঘটে এবং যেখানে ত্রুটি ঘটেছে সেখানে সেটা ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিকার কাব্য বিচারের দিক থেকে দেখতে গেলে একথা মানতেই হয় যে, যাকে কবিতা বলে পরিবেশন করছ সেটা ভাব ও রসযোগে সত্যি কবিত্বময় কিনা—তা যদি হয় তাহলে তা পাঠককে আনন্দ দেবেই। সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্তর কবিতায় ছন্দ আছে, কিন্তু সেগুলো মিল করা কবিতা নয়, ছন্দের বিশেষত্বের জন্য সেগুলোর ধ্বনি কানে বাজে। কথা উঠেছে যা পড়ে মুখস্থ করা যায় না, তা আবার কবিতা হয় কেমন করে। এক দিক দিয়ে কথাটা ঠিক। আমরা যাকে গদ্য কবিতা বলচি তা মুখস্থ করা যায় না। সেই জন্যেই বলছি, এ সাহিত্যের বিচার এর ভাব, কবিত্ব এবং রস বস্তুর দিক থেকে হচ্ছে না, এর বিচারকে নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সে তর্কটা প্রধানত এর নামকরণ নিয়ে। এ নামের জন্য কোনো এক পক্ষের জিদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, কবিতা নাম দিয়ো না, অন্য কোনো নাম দাও তাতেই বা ক্ষতি কি? আসল বলবার কথা হচ্ছে, সাধারণত কবিতা পড়ে আমরা যে রস উপভোগ করি সেটা চলতি গদ্যে পরিবেশন করা সম্ভব নয় এবং এও ঠিক যে, ছন্দিত গদ্যে যাকে গদ্য কবিতা বলা হচ্ছে, তার বক্তব্য তার রসকেও চলতি গদ্যে কিছুতেই বলা চলে না। সত্যি কথা বলতে কি এই শ্রেণীর রচনায় যে ছন্দের পরিচয় পাই সেটা স্বাভাবিক কেননা তা ভাবের সম্পূর্ণ অনুবর্তী, এক সঙ্গে চলে নিঃসংকোচে, এদের মধ্যে ভাসুর ভাদ্দর-বউর সম্বন্ধ নেই, কেউ কারো ভয়ে তরস্ত নয়। যাই হোক এই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির ছন্দের বিশেষত্বের সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলার চেয়ে, পড়িয়ে শোনাতে পারলে হয় তো অনেকের কানে এর ছন্দ ধরা পড়তে পারে।

এরকমের রসসাহিত্যের বাহন বাইরের পেটেণ্ট ছন্দ হতে পারে না। দেবতাদের যেমন তাঁদের নিজস্ব বাহন থাকে, এ সাহিত্যের বাহন তেমনি ভাবুকের কিম্বা কবির নিজের ভাব ছন্দ। ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈশ্রবার সঙ্গে অন্য কোনো আস্ত বঙ্গের জীবের তুলনা হয় না, ইন্দ্র স্বয়ং যাকে পছন্দ করে নিয়েছেন সেই তাঁর বাহন, তেমনি কতকটা গদ্য কবিতার ছন্দেরও নির্বাচন। যারা বাঁধানিয়মে ঘরবাড়িতে বাস করে তাদের সঙ্গে যদি হা-ঘরের দলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে সে তুলনার বিচারে ভুল করা হবে। হা-ঘরের দল জায়গায় জায়গায় বাসা বাঁধে তাদের প্রয়োজনের অনুরূপে, তাই তাদের ঘরের সঙ্গে মামুলি গৃহস্থদের ঘরের তুলনা করা চলে না; তাদের ঘরের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাদের মধ্যে মিশতে হয়, সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে তাদের ঘর, বুঝতে হবে তাদের ভাব। তবেই জানা যাবে তাদের সত্যিকারের পরিচয়। এরা তো আর পৈতৃক ভিটেতে উত্তরাধিকারসূত্রে বাস করে না তাই এদের সঙ্গে সকলের পরিচয় চট করে ঘটে না, এরা এদের বিশেষ স্বভাবের জন্য সাধারণের পরিচয় ক্ষেত্রে তেমন অন্তরঙ্গ নয়। আমরা যাকে গদ্য কাব্য বলি তাঁরো অবস্থা কতকটা এই রকমের। এরা অফিসিয়াল পাশপোর্ট নিয়ে সাহিত্য রাজ্যে আসেনি বলে এদের গতি অবাধ নয়, মানুষ তাদের চিত্তরাজ্যে এদের প্রবেশের অধিকার সহজে দিতে প্রস্তুত নয়। কেননা এর ছন্দে প্রচলিত কোন ছন্দের বা তার কোন কাঠামোর ছাপ নেই। এরা যদি প্রচলিত ছন্দের পাশপোর্ট নিয়ে সাহিত্যে প্রবেশ করত তাহলে ভাব কিম্বা রসের দিক থেকে অপাংক্তেয় হলেও

এরা সাহিত্য রাজ্যে প্রবেশের অবাধ অধিকার পেত, কিন্তু এদের বিশেষত্ব হচ্ছে এরা পূর্ব হতে তৈরী করা পাশপোর্ট নিয়ে চলে না, এরা চলে নিজের ভাববিশেষের নিজস্ব ছন্দ নিয়ে অর্থাৎ এরা পরের দ্বারা পরিচিত হতে চায় না। এদের প্রকাশ হচ্ছে নিজের তৈরী ছন্দে, নিজের সৃষ্টি করা আনন্দে। এই সাহিত্যে প্রকাশ ছন্দ নিজস্ব এবং এর ছন্দ ভাব অনুপন্থী বলেই গদ্য কবিতার ভাবেও রচনার যোগ্যতায় এবং পটুত্বের অভাব ঘটলে সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। এইজন্য যাঁরা গদ্যকাব্য সৃষ্টি করবেন তাঁদের যথেষ্ট সাবধান হতে হবে, কারণ তাদের চলতে হবে নিজের রাস্তায় নিজের জোরে নিজের পরিচয়ে। গদ্যছন্দের গোড়ার কথা হচ্ছে, ছন্দকে ভাবের বাহন করতে হবে। সেই জন্যেই গদ্যকবিতা রচনাও সহজ নয়। বাঁধা নিয়মের ছন্দের অনুগামী হয়েই যে প্রচলিত কবিতার সব ভাব চলে তা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভাব বিশেষ ছন্দের উপর ভর করে, কেননা সেই ছন্দ সেই ভাবের অনেকটা অনুপন্থী, কিন্তু অনেকটা হ'লেও ঠিক অনুপন্থী হয় না। ঐ রকম কবিতায় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে একটা আপোষ-রফার সম্বন্ধ ঘটে। কিন্তু গদ্য কবিতায় সে রকমটি হবার উপায় নেই, এই কবিতায় ছন্দকে ভাবের হুকুম মানতেই হবে, তা না করলে গদ্য কবিতায় কবিতা বাদ পড়ে গদ্যই থেকে যাবে।

কাব্যের ধর্ম হচ্ছে রস সৃষ্টি করা। যদি এই শ্রেণীর অপ্রচলিত ছন্দের রচনায় কাব্য-রস থাকে তাহলে তাকে কবিতা বা কাব্য বলে গণ্য করায় ক্ষতি কি? সাহিত্যে এমন অনেক রচনার পরিচয় পাওয়া যায়—যা পাঠকের চিত্তে কাব্যরসের আনন্দ দেয় অথচ সেই ভাব ও রসের বাহন প্রচলিত ছন্দ নয়। সেই সব রচনার মধ্যে যে ছন্দ আছে তা প্রচলিত ছন্দের কোঠায় পড়ে না, তাই বলে যদি তার রসাস্বাদনে বিমুখ হও এবং তার ছন্দের বিশেষত্বের পরিচয় জানতে না চাও তাহলে, পাঠকদলই বঞ্চিত হবে উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ থেকে।

ছন্দ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলে কবি থামলেন। তার কিছু-ক্ষণ পরেই এলেন কবিকে প্রণাম করতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গেও কিছুক্ষণ ছন্দ সম্বন্ধেই আলোচনা করলেন। বেশিক্ষণ আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্য হেতু এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি।
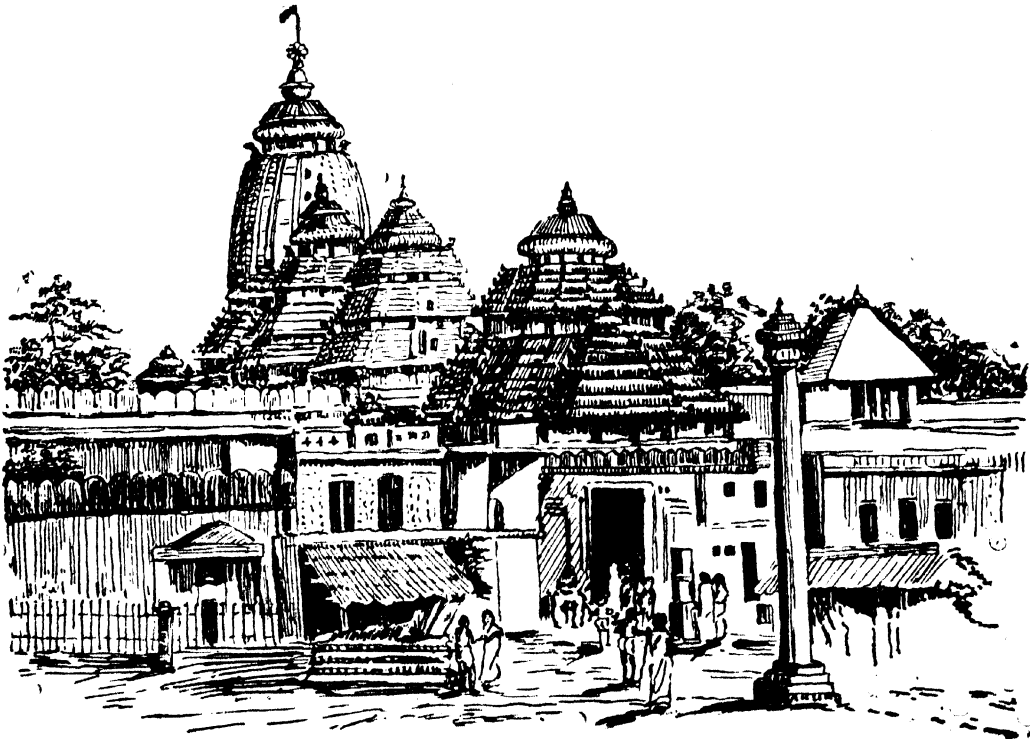
ছবিঘরে মায়ামৃগ ও ভাল বাসা

প্রডিউসার্স—সরমা পিকচার্স।

মায়ামৃগের শ্রেষ্ঠাংশে—কমলা দে, নটরাজ, ইন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

এক শিল্পী। অর্থাভাব নাই—অবস্থাপন্ন। বাড়িতেই ছিল এক মডেল। কেবল ছবি আঁকার জন্য নহে, সৌন্দর্যের পূজারী মডেলকে সমগ্রভাবে পাইতে চাহে। কিন্তু মডেল তাহাকে চাহে না। চাহে প্রতিবেশী ললিত বক্সীকে। তাই এই পর-পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই লীলা গৃহত্যাগ করিল।

গল্পাংশের ইহাই নেপথ্য।

ইহার পরের অংশই মূল কাহিনী। স্থান—এলাহাবাদ। ললিত একনিষ্ঠ নয়। লীলার স্ত্রী-জীবনে কাঁটার জঞ্জাল স্তূপী-কৃত হইতেছে। কোলে একটি শিশু—বালিকা। মদের তেষ্টা ললিতের লিভার অকর্মণ্য করিয়া তোলে। বিধবা নারীকে নির্জন পথের কঠিন মাটীতে দাঁড়াইতে হয়।

তারপর ভিক্ষান্ন। স্থান—আগ্রা। বহু বছর কাটিয়া যায়। বৃদ্ধা বিধবার একমাত্র সম্বল যুবতী মেয়ে, যমুনা পুলিনে ভিখারিণী। ভাগ্যযোগে—জমিদার-পুত্র ফণী নাগ ও তাহার সহপাঠী বিমল এই ভিখারিণীকে আবিষ্কার করে। সে ভিক্ষা চাহে—মুখ দেখায় না। ক্রমে প্রণয় জম্মায় —জমিদার-পুত্রের সঙ্গে নহে, বিমলের সঙ্গে। গরীবের প্রতি—কেবল গরীব নহে, যুবতী (এবং অনুমান—সুন্দরী) ভিক্ষার্থী বাঙালী মেয়ের প্রতি করুণা অনুকম্পা অনুরাগ পরে প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের এই চূড়ান্ত পরিণতির দিন মায়ের চিতা জ্বলিয়া উঠে।

এইবার কাহিনীর তৃতীয় স্তর। স্থান—নবদ্বীপ। মেয়েটি আগ্রা ছাড়িয়া যাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে তিনি জমিদার-পুত্র ফণী নাগের পিসিমা। এমনি দুর্দৈব। ফণী নাগ জমিদার-পুত্র হইতে জমিদার-এ উন্নীত এবং ঝিও হয় বৌও হয়, এমন একটি মেয়ের সন্ধানে নবদ্বীপে হাজির। যমুনা পুলিনে ভিখারিণী জমিদার ঘরণী হয়। বিমল দয়িতাকে আগ্রায় না পাইয়া বিবাগী হয়।

ঘটনা সংঘাত! বিমল এই জমিদার বাড়ীতেই আসিয়া হাজির। জানা যায় ইহারা সুখী নহে। পরিচয় পারম্পর্যে যে ঝড় উঠে, তাহাতে জমিদার-ঘরণী বিমলের আশ্রয়ে আসিয়া পড়ে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কেহই সুখী হয় না। নদী সাঁতরাইয়া জমিদার ফণী স্বামীদর্শনব্যাকুলা যূথির হৃদয়-দুয়ারে প্রবেশপথ পায়।

মিলনান্ত কাহিনী। বিয়োগবিধুর সমাজের আশাতরু। কাহিনী 'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চিত্রনাট্য কে রচনা করিয়াছেন **অথবা আদৌ চিত্রনাট্য করা হইয়াছে কি না জানি না। কথা ও** গান লিখিয়াছেন সুশীলকুমার। পরিচালনা করিয়াছেন কালীভূষণ।

কাহিনীর দিক দিয়া মন্দ নহে। সমস্যাও নাই, হাঙ্গামাও নাই। সামাজিক বিধিনিষেধের উত্তুঙ্গ পাহাড় ঠেলিয়া চলিবারও কোন প্রশ্ন নাই। অতি সহজ। কাজেই অসম্ভব সম্ভাবের কথা থাকুক। কিন্তু চিত্রনাট্য ছাড়া ছবি এবং আলোকচিত্র ছাড়াও যে সিনেমা "হইতে পারে" আলোচ্য চিত্রটি যেন তাহারই

'বিজয়িনী' চিত্রে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। পরিবেশক : এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স

নিদর্শন। পরিচালনরীতির জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ দিতে পারি না; যিনি চিত্রনাট্য লিখিয়াছেন, তাঁহাকেও ধন্যবাদ দিতে পারি না এবং সিনেমাচিত্র গ্রহণে যাঁহার দাবী পঞ্চাশ নম্বর, সেই আলোকচিত্রশিল্পীকে ধন্যবাদ দিতে লজ্জাবোধ করিতেছি। এই সমাবেশের মধ্যে সিনেমা অভিনেতা ও অভিনেত্রী কেহই স্বনাম-ধন্য নহে। অথচ সম্ভাবনা ছিল। উপন্যাস চিত্রনাট্য নহে, উপন্যাসের **উপজীব্যে চিত্রনাট্যের অঙ্কুর থাকিতে পারে। এই কাহিনীতে**

তাহা ছিল। প্রয়োজন ছিল সুষ্ঠু সংলাপের, ক্যামেরা টেকনিকাভিজ্ঞের, স্থিতধী পরিচালকের। আগ্রা, এলাহাবাদ পাইয়াও মঞ্চাভিনয় প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু এত ব্যর্থতার মধ্যেও কমলা দে অত্যাশ্চর্য অভিনয় করিয়াছেন। আমরা এই নবাগতার ভবিষ্যৎ কামনা করি। তাহার সচল ভঙ্গী, জড়িমাহীন প্রকাশনৈপুণ্য এবং সর্বোপরি ক্যামেরা সম্বন্ধে অকুণ্ঠ নির্ভাবনা সিনেমা ইতিহাসকে চিহ্নিত করিতে বাধ্য। মোট কথা কমলা দে'র মা ও মেয়ের ভূমিকা একটা রিলিফ। ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় ফণী নাগের ভূমিকায় নটরাজ(!)। উপসংহারের দৃশ্যটা অবশ্য একেবারেই অচল। এইটুকু এবং প্রথম দিককার প্রারম্ভিকটুকু বাদ দিলে, ফণী নাগের ভূমিকা সুঅভিনীত। বিমলের ভূমিকায় ইন্দ্রনাথ চলনসই। ললিতের ভূমিকায় বেচু দাস অত্যন্ত গতানুগতিক। বাঙালী মদও খায়, মাতাল না হইয়াও পারে না, আবার আনুষঙ্গিকও চাই—গয়নার জন্য স্ত্রীকেও ......যাক্, পুরানো গ্রন্থ, এই একঘেয়েমি বাদ দিবার বোধ করি কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বাঙলার এ বাস্তব চিত্র নয়। ভৃত্যদ্বয়ের অভিনয় মন্দ হয় নাই। স্থলে ভৃত্যের অভিনয়ে সামান্য আতিশয্য ঘটিয়াছে। পাকা ফোটোগ্রাফির হাত হইলে সিলুয়েট চিত্রগুলি আরও চিত্তাকর্ষক হইত। পরিচালকের একটি কৃতিত্ব আছে—তিনি বদরুচির পরিচয় দেন নাই। নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিরুৎসাহ করা হইবে, কিন্তু পরিচালক ও আলোকচিত্রগ্রাহীকে আমাদের কঠিন কথা না বলিয়া উপায় নাই; কেননা আজিকার দিনে নিম্নস্তরের আলোকচিত্র বা বোম্বে টকিজের একচ্ছত্র আধিপত্য ও সাফল্যের দিনে সতর্ক, অভিজ্ঞ, সূক্ষ্মদৃষ্টি পরিচালকের একান্ত প্রয়োজন আছে।

চিত্রায়—'নর্তকী'

পরিচালক—দেবকী বসু। প্রধান ভূমিকায় : লীলা দেশাই, ভানু বন্দ্যো, উৎপল সেন, শৈলেন চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখো প্রভৃতি।

এক নর্তকী। মন্দির প্রবেশপ্রার্থী রূপকুমারী। মন্দির পুরুষ সন্ন্যাসীর আশ্রম—নারীর প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু নর্তকী গৃহাবগুণ্ঠিতা সরমা নহে, নর্তকী পুরুষচিত্ত-বিক্ষোভের নগ্ন-চুম্বক। তাই নর্তকীর অপমান শেঠশ্রেষ্ঠীদের বাজে, রাজসিংহাসন পর্যন্ত বিচলিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল সন্ন্যাসাশ্রম অভ্যস্ত আদর্শনিষ্ঠ সুকঠিন জ্ঞানানন্দ অটল—নারীর প্রবেশ নিষেধ। এক আশ্রমবাসী ভিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী নগরে নারীর সহিত কথা বলায় প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত গ্রহণ করে। নর্তকী রাজাজ্ঞায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই অনিচ্ছুক ক্লান্ত সন্ন্যাসীকে আশ্রয় দেয়। আবার মোহান্তে রাজায় সংঘর্ষ বাধে। চূড়ান্ত মীমাংসা গুরু স্বামীজীর উপর ন্যস্ত হয়।

অপমানাহত দর্পিতা নর্তকী আপন দেহভুজঙ্গের ভঙ্গিমা সত্যসুন্দরের সম্মুখে দোলাইতে থাকে। সত্যসুন্দর জ্ঞানানন্দের ভবিষ্যৎ আদর্শপ্রতীক। নর্তকীর সংকল্প এই স্তম্ভটি গুড়াইয়া দিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর আদর্শদৌর্বল্য ও সহজবিশ্বাসের ফাঁকে নর্তকী রূপকুমারী সত্যসুন্দরকে মোহমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিক্ষুব্ধ জ্ঞানানন্দ সত্যসুন্দরকে আশ্রমচ্যুত করেন। সত্যসুন্দরের ব্যক্তিক অনুভূতি দিয়া আশ্রম আদর্শ আচ্ছন্ন হয় বটে, কিন্তু সত্যসুন্দরে সে সঙ্গীত সুপ্ত থাকে। তারপর অভিষেকের দিনে আবার সেই 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রের' বিবাগী মন সংসারকে উপেক্ষা করে—সত্যসুন্দরের সম্মুখে নর্তকীর অপরূপ ও দুরারোধ্য আকর্ষণ স্তিমিত হইয়া পড়ে। সত্যসুন্দর আশ্রম প্রত্যাশী হয়। জ্ঞানানন্দ গুরুর স্বপ্নাদেশে মন্দিরে নারীর প্রবেশাধিকার দেন বটে, কিন্তু পতিত সন্ন্যাসীকে স্থান দিতে পারেন না। যিনি দিতে পারেন সেই গুরুজী স্বয়ং আসিয়া হাজির। নর্তকীর মাথায়ও ফুলের আশীর্বাদ ছিটকাইয়া পড়ে। সত্যসুন্দর অভিষেক-ঔজ্জ্বল্যে সার্থক হয়।

কাহিনী, চিত্রনাট্য লিখিয়াছেন দেবকীকুমার, পরিচালনা করিয়াছেন দেবকীকুমার। এই রীতি ভাল কি মন্দ সে তর্ক থাকুক, কিন্তু ইহাতে মূল কাহিনীকারের বিকৃতির সম্ভাবনা নাই। কাজেই ভরসা করা যায়, পরিচালক খুশীমত পরিচালনা করিবার জন্য খুশীমত কাহিনী রচনা করিয়াছেন এবং খুশীমত চিত্রনাট্য দাঁড় করাইয়াছেন। হয়তো পরিচালক সর্বতোভাবে খুশী হইয়াছেন। কিন্তু চিত্রজগতে পরিচালকের এই অবাধ স্বাধীনতাই কি সব? আমরা—আমাদের সমাজ—আমাদের রুচি—আমাদের সম্ভব অসম্ভব জ্ঞান কি পরিচালকের সুবিধা ও খুশীর জন্য একেবারেই ভাসিয়া যাইবে? সমাজে নর্তকীর এক বিশেষ স্থান ছিল, হ্যাঁ, এমন সমাজ অনৈতিহাসিক নহে। শেঠেরা রাষ্ট্রশক্তি পায় নাই, কিন্তু সামন্ত রাজাকে রূপার নেশায় মাতাল করিয়া রাখিত এমন সমাজ ছিল। কিন্তু কই সে সমাজের পরিপূর্ণ রূপ? পুরুষাশ্রমে নারীর প্রবেশ নিষেধ ছিল সে ইতিহাস বৌদ্ধযুগের, কিন্তু বুদ্ধই নারীর প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। বৌদ্ধসমাজ মঠের সমাজ। দেবদাসীর সমাজ নহে। নর্তকীর সমাজ নহে। নর্তকীকে প্রতীক করিয়া নারী সমাজের প্রবেশাধিকার আন্দোলন ঐতিহাসিক কি না জানি না। কিন্তু এ কাহিনীর উপর বৌদ্ধসমাজ ও বৌদ্ধজাতকের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। নারীর প্রবেশাধিকার সামাজিক বিপ্লব। এ এক কথা, কিন্তু মঠের অসামঞ্জস্য নারীর প্রতি উপেক্ষা এ ভিন্ন কথা। অথবা হয়তো নারীর প্রবেশাধিকারের পর মঠাশ্রম উচ্ছন্নে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাই কড়াকড়ি অতি কঠিন মূর্তিতে পাহারা দিতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ায় হয়তো বাধ্য হইয়াই এই ভিক্ষাশ্রয়ী মঠগুলি সংসারচ্যুত হইয়াছিল। ইহাই স্বাভাবিক। কেননা, আজও দেখা যায় যে, কোন বিপ্লবী অনুষ্ঠানের পক্ষে নারী বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। নারীর দৃষ্টি অতিমাত্রায় গার্হস্থ্য—অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল। ইহাই ভারতীয় নারীর মনের গঠন। নারী যেখানে মাতা হইতে চাহে, সেখানে বিধ্বংসী বিপ্লবের মধ্যে ইহাদের টানিয়া আনিতে গেলে পুরুষের নিষ্ঠা স্খলিত হয়। নারীবর্জন তাই সন্ন্যাসাশ্রমের দুর্নিবার উপসংহার। কিন্তু সে কাহিনীতে নর্তকী কেন? নর্তকী কি নারীসমাজের সংহত সমাবেশ না সন্ন্যাসাশ্রমের বিপরীতধর্মী? কাহিনীতে সে প্রশ্নেরও জবাব নাই। দর্পিতা নর্তকীর পায়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসভা লুটাইয়া আছে এ কোন্ সমাজ—অথবা এ কোন্ সমাজ যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্রে হাত মিলাইতেছে? সে সমাজের আভাসও এই কাহিনীতে নাই।

'কিশোর' নগরে নারীর সহিত কথা কহিয়াছে। তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইহাই মঠের বিধান—মঠেও রাষ্ট্রের একনায়কত্বের প্রতিচ্ছায়া। ইহারই ভাঙ্গন রাষ্ট্র ও মঠে সুরু হইয়াছে। কিশোর বিধান মানিবে নতুবা বিতাড়িত হইবে। অক্ষম কিশোর বিতাড়িত হইল। মঠের এই ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্যটা বুঝি। কিন্তু নর্তকী? আর মঠের সেই অসামঞ্জস্যের অংকুর সত্যসুন্দরকে আশ্রয় করিয়া মহীরুহে পরিণত হইল তাহাও বুঝি, কিন্তু সেজন্য নর্তকী কেন?

আশ্রমের দিক হইতে নর্তকীর প্রাসঙ্গিকতা, নর্তকীর দিক হইতে মঠের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছে—তাই সমগ্র গল্পটা দূরবীক্ষণের কোন দিক দিয়াই সঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই। তাই গল্পে কোন বিপ্লবী বলিষ্ঠ ইঙ্গিতের অভাব। আদর্শভ্রষ্ট কিশোর নর্তকীর আশ্রয়ে থাকিয়া অসহ্য

উত্তেজনায় আত্মহত্যা করে, সত্যসুন্দর নর্তকীর কোমল স্পর্শ ও উষ্ণ নিশ্বাস সর্বাঙ্গে ও সর্বমনে উপলব্ধি করিয়াও মঠকে ভুলিতে পারে না—যে পথে সে আগাইয়া আসিয়াছিল, সে পথেই ফিরিয়া গেল (অথবা যে পথে সে পিছাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে পথেই সে আগাইয়া উঠিয়া আসিল)। গুরুর আদেশে নারীর প্রবেশাধিকার ও (আদর্শনিষ্ঠ অথবা আদর্শভ্রষ্ট) সত্যসুন্দরের অভিষেক হইল, ইহাই যদি বিপ্লব হয় তবে নর্তকী?—আপাতদৃষ্টিতে নর্তকীকে কেন্দ্র করিয়া এ ঘূর্ণি হইল কেন? নর্তকীর মাথায় গুরুজী প্রথমে সসংকোচে পরে উজাড় করিয়া ফুল ঢালিলেন—সমাজবিচ্ছিন্ন নর্তকীর ইহাই সর্বশেষ পাওনা।

যাহা হউক, চিত্রজগতে 'নর্তকী'কে ফাঁকি দিতে 'অভিনেত্রী', 'রাজনর্তকীকে' ফাঁকি দিতে 'নর্তকী' সমাজের কাছে তাহাদের আবেদন জানাইয়া গেল। ইহা কতখানি নর্তকীদের দাবী, সমাজের প্রয়োজন জানি না, কিন্তু সিনেমাজগতের বুঝিবা ইহাদের সমাজাশ্রয় দিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নর্তকীর ভূমিকায় লীলা দেশাই অভিনয় করিয়াছেন। যদি এই চরিত্রটি হাস্যকর কমিক হইয়া থাকে, তবে প্রথম দিকে সত্যসুন্দরের পরাজয় পর্যন্ত জমিয়াছে, শেষে জমে নাই; যদি চরিত্রটির মধ্যে কিছু দুঃখ ও গাম্ভীর্যই প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে প্রথমে জমে নাই, শেষে জমিয়াছে। কিন্তু চরিত্রটি যদি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিংসা ও প্রতিহিংসার বিচিত্র ক্ষেত্র হইয়া থাকে, তবে শেষাংশ ছলনা মাত্র। চরিত্রের তাৎপর্য যাহাই হউক, লীলা দেশাই তাহা ফুটাইতে পারেন নাই। ভূমিকা নর্তকীর—কিন্তু কোথায় নৃত্যসৌকর্য? বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করিয়াছিল নৃত্যশিল্পী মেনকা (লীলা দেশাই উচ্চারণ করিয়াছেন ম্যানকা!)—নর্তকী ভঙ্গ করিবে সত্যসুন্দরের সাধনা। নাচিয়া নহে—কটাক্ষে, গাহিয়া নহে, অবলার ছলনায়। এমনি সন্ন্যাসী এমনি নর্তকী। পরিচালককে ধন্যবাদ, লীলা দেশাইর ব্যর্থ অভিনয়েও সত্যসুন্দর (ভানু বন্দ্যো) অতি সহজে ধরা দিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা কঠিন বীর্যবান—পক্ষাঘাতগ্রস্ত নহেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় নিবীর্য—কথাগুলি কাকাতুয়ার। কোন সত্যোপলব্ধি নাই। যে নারীরূপে ব্রহ্মকে পাইতে চাহে নাই সে নারীর নিকট অনুভূতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। প্রথমাবধি বিকৃত সন্ন্যাসীর কাছে অভিনেত্রী—রূপকুমারীর বিকাশে লীলা দেশাই যে হাল্কা অভিনয় করিয়াছেন, তাহা কেবল পরিচালকের প্রয়োজনে ও তৃপ্তিতেই সফল হইয়াছে। এ নর্তকী মনমোহিনী নাচও জানে না, গাহিতেও জানে না যদিও সত্যসুন্দরের গৃহের (অবচেতন?) গোপন পথের নীচে গান গাহিয়াই ভৈরবী নর্তকী সত্যসুন্দরকে প্রথম বিষাক্ত করে—অতি সাধারণ বক্তৃতা ও অতি সাধারণ নারীসুলভ ছলাকলায়। ইহাতে অভিনয় সৌকর্যের প্রয়োজনও নাই, ভৈরবী বা সন্ন্যাসীর জটিল মনস্তত্ত্বের প্রশ্নও অবান্তর, লীলা দেশাইর প্রতিভা পরিচয়ও তাই পাই নাই। সত্যসুন্দর প্রথমাবধিই নিবীর্য, নিস্তেজ, মূঢ় ও আচ্ছন্ন। যদি পরিচালক এইরূপ চরিত্রই আঁকিয়া থাকেন, তবে ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানানন্দ যাহাকে অভিষেক করিবেন, সে ব্যক্তি এমন 'নারী' তাহা এক স্টুডিয়োতেই সম্ভব। আনাতোল ফ্রান্সের 'থেঈ' আলাদা জিনিস—সে মনস্তত্ত্ব কোথায়—কোথায় সে কলাকৌশল? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিনয় করিয়াছেন তাহাতে করুণা জাগে, লোকটার সহায়হীনতায় কৃপা করিতে ইচ্ছা যায়—সন্ন্যাসাশ্রমের দুর্বহ ভার এই মুমূর্ষু লোকটির মাথা হইতে নামাইয়া লইতে ইচ্ছা যায়। এ সন্ন্যাসী হাসে না, দুঃখময় তাহার জীবন। অথচ এ সন্ন্যাসীর 'সাহস' আছে, নর্তকীর বাড়িতে কিশোরের খোঁজ লইতে আসে। এ সন্ন্যাসী তখনই 'সন্ন্যাসী' হয়, যখন নর্তকী তাহার ভুল (মোহ?) ভাঙ্গিয়া দেয়—নর্তকী যখন হাতের বল্গা ঢিলা দিয়া আশ্রমের দিকে তাড়াইয়া দেয়। অতি সাধারণ গার্হস্থ্য আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। তবুও লীলা দেশাই অপেক্ষা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ভাল অভিনয় করিয়াছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় হইয়াছে উৎপল সেনের জ্ঞানানন্দের ভূমিকায়। পৌরুষ, কাঠিন্য, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও অনমনীয় দৃঢ়তা—সন্ন্যাসীজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তি এই জ্ঞানানন্দ। উৎপল সেন কোথাও ভাঙিয়া পড়েন নাই। বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনিকুসুমাদপি এই চরিত্রটির স্ফুরণে উৎপল সেনের কৃতিত্ব অবিমিশ্র। এই একটিমাত্র চরিত্র আমাদিগকে বরাবর আকৃষ্ট করিয়াছে। উৎপলের পদক্ষেপে কোথাও বিচ্যুতি নাই, কথনভঙ্গীতে জড়িমা নাই, দেহাবয়বে অস্বাভাবিকতা নাই; এই একটিমাত্র চরিত্র মঞ্চচেতনা বিস্মৃত করাইয়া দেয়। ইহার পরের স্থান ছবি বিশ্বাসের "স্বামীজীর"। অকুণ্ঠ গতি। তবুও পরিচালক ইঁহাকে কাহিনীর দিক দিয়া যত উর্ধ্বেই স্থান দিয়া থাকুন, আমাদের চক্ষে ইঁহার স্থান অতি সংকীর্ণ ও সামান্য। প্রতিভাবিকাশের অবসরও কম। শেঠ হীরালালের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় মোটামুটি ভালই হইয়াছে। নরেশ বসুর 'কিশোর' ভাল হইয়াছে। ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভূতনাথ ভাঁড়ামো মাত্র। শেঠদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিভ আর তালুতে শব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ব্যর্থ রসিকতাটুকু ছাঁটিয়া দিলে কি এমন ক্ষতি হইত? নারীচরিত্রের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার ভূমিকা যথাক্রমে কমলা ও জ্যোতির অভিনয় উপভোগ্য হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পঙ্কজ মল্লিকের গান কোনটাই সুগীত হয় নাই, সুর অতি সাধারণ। শব্দানুলেখন ভাল।
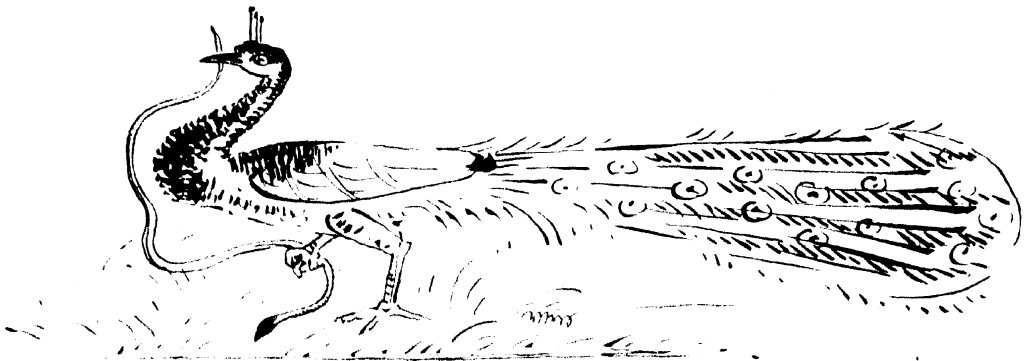
আজ-কাল

গান্ধী-সত্যাগ্রহ

গান্ধী-সত্যাগ্রহ যথারীতি চলছে। তবে গ্রেপ্তারের হার এখন কমেছে বলে' মনে হয়, বিশেষত বাঙলাদেশে। এ প্রদেশে অধিকাংশ সত্যাগ্রহীকে ধরা হয় নি। শ্রীসুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসীতারাম সাকসেরিয়া কলকাতার বাইরে গিয়ে সত্যাগ্রহ করেও ধরা পড়তে পারেন নি। সীমান্ত প্রদেশে কোন সত্যাগ্রহীকে ধরা হচ্ছে না, ধর্নার বদলে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করা সত্ত্বেও। গান্ধীজীর একনিষ্ঠ শিষ্য প্রথম সত্যাগ্রহী আশ্রমবাসী শ্রীবিনোবা ভাবে কারামুক্ত হয়ে আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছেন। তিনি পর পর কয়েকদিন যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করেছেন। এ সপ্তাহে আসামে শ্রীঅরুণকুমার চন্দ এবং অন্যান্য প্রদেশের কয়েকজন আইনসভার সদস্য কারাগারে গেছেন।

শোনা যাচ্ছে, গভর্নমেণ্ট গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করবার কথা নাকি চিন্তা করছেন, তবে এখনো কোন সিদ্ধান্ত করেন নি। যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে ভারতরক্ষা বিধানের বদলে ৩ আইনে নাকি করা হবে, কারণ শেষোক্ত বিধানে রাজবন্দী হ'লে তিনি বেশী সুখসুবিধে পাবেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে প্রদেশে প্রদেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গতি সম্বন্ধে বিবরণ পাঠাতে হবে। এখন আন্দোলনে নারী ও মুসলমানদের সংখ্যা আগের চেয়ে ক্রমশ বাড়ছে দেখা যাচ্ছে। অনেক মুসলমান অহ্‌রার দলের সত্যাগ্রহে যোগ দিচ্ছে।

সমাজতন্ত্রী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব এবং ডাঃ কে এম আশ্রফকে ভারতরক্ষা বিধানে যথাক্রমে লক্ষ্ণৌতে ও এলাহাবাদে আটক করা হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক সপ্তাহ

নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক-এর উদ্যোগে গত ১৯শে জানুয়ারী থেকে 'ফরওয়ার্ড ব্লক সপ্তাহ' আরম্ভ হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক ভারতের সর্বত্র সভা, শোভাযাত্রা, পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি দ্বারা এই সপ্তাহ প্রতিপালনের নির্দেশ দেন। কার্যক্রম দৈনন্দিন পর পর এই—যুব ও ছাত্র দিবস, শ্রমিক দিবস, কিষাণ দিবস, ঐক্য দিবস, সুভাষ দিবস, সদস্য সংগ্রহ দিবস, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস, স্বাধীনতা দিবস।

মানবেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা

ভূতপূর্ব বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় বৃটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করবার আবেদন জানিয়ে শ্রমিক মহলে বক্তৃতা করে' বেড়াচ্ছেন। এ সব সভায় শ্রোতা সমাগম কতটা কিভাবে হয় তা সাধারণের পক্ষে বলা মুশকিল; তবে কাঁকিনাড়ায় মানবেন্দ্রনাথকে একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে। সেখানে তাঁর সভায় হাজার তিনেক শ্রমিক এসে উপস্থিত হয় এবং তিনি যখন বক্তৃতা আরম্ভ করেন, তখন অবিলম্বে মাগ্‌গি ভাতা পাবার দাবী জানাতে থাকে। তারা সভায় বক্তৃতাও দিতে চায়। তখন মানবেন্দ্রনাথ সদলবলে চলে' যান এবং লাউডস্পীকার বন্ধ করে' দেওয়া হয়।

সরকারী আদেশ

প্রকাশ, বাঙলা গভর্নমেণ্ট বাঙলার শিক্ষায়তনের কোনো পাঠ্য-পুস্তকে বা উপহার-পুস্তকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ নিষিদ্ধ করেছেন।

ভারত গভর্নমেণ্ট নাকি নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রতি মাইল ৩২ ইঞ্চি বা তার বেশী মাপের সমস্ত কলকাতা নগরীর মানচিত্র গভর্নমেণ্টের কাছে ফেরৎ দিতে হবে। কলকাতা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর এই আদেশ প্রযোজ্য।

গভর্নমেণ্ট সমগ্র খাইবার এলাকাকে রক্ষিত অঞ্চল বলে' ঘোষণা করেছেন।

আন্তর্জাতিক

ভূমধ্যসাগর

ভূমধ্যসাগরে জার্মানদের আবির্ভাবে ইওরোপীয় যুদ্ধে নতুন চমক লেগেছে। জার্মান বিমানবহর সেখানে প্রথম আক্রমণেই কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সিসিলি ও আফ্রিকার মধ্যে সংকীর্ণ জলভাগ দিয়ে বৃটিশ রণতরীর পাহারায় যখন গ্রীসে কনভয় যাচ্ছিল তখন জার্মানরা হানা দেয়। মাঝে মাঝে বিরতি ধ'রে সাত ঘণ্টাকাল তাদের সঙ্গে বৃটিশ রণতরীর লড়াই চলে। জার্মান বিমান বৃটিশ তাদের সঙ্গে বৃটিশ রণতরীর লড়াই চলে। জার্মান বিমান বৃটিশ বিমানবাহী রণতরী "ইলাসট্রিয়াস" এবং বৃটিশ ক্রুজার "সাথহ্যামটন"কে লক্ষ্য করে' প্রবল ডাইভ-আক্রমণ চালায়; ফলে "সাথহ্যামটন"এ এমন আগুন লেগে যায় যে, বৃটিশ নৌ-সৈনিকরা তাকে ডুবিয়ে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। "ইলাসট্রিয়াস"ও খুব জখম হয়, কিন্তু সে কোনরকমে বন্দরে পেঁছায়। অনেকগুলো জার্মান বিমানও ধ্বংস হয়। বৃটিশ আক্রমণে একটা ইতালীয় ডেস্ট্রয়ার জলমগ্ন হয়।

জার্মান বিমান মল্টার উপর পাঁচদিন এবং সুয়েজ খাল এলাকার উপর একদিন আক্রমণ করে। তারা ১৫ই তারিখে ছ'বার এবং ১৯শে তারিখে পাঁচবার মল্টায় হানা দেয়। ইতালীয় বিমানও তাদের সঙ্গে ছিল। ৩৭টি জার্মান ও ইতালীয় বিমান নাকি ধ্বংস হয়েছে। মল্টায় বোমাবর্ষণ যে খুব তীব্র হয়েছে, সংবাদ থেকে তা অনুমান করা যায়।

বৃটিশ বিমানবহরও কয়েকদিন সিসিলিতে কাতানিয়া বিমান-ঘাঁটির উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। কাতানিয়াতেই নাকি জার্মান বিমানবহর ঘাঁটি করেছে।

শোনা যাচ্ছে, জার্মানরা সিসিলি সম্পূর্ণ তাদের দখলে নিয়েছে। সিসিলিকে তাদের প্রধান ঘাঁটি করবার উদ্দেশ্য দুটো। প্রথমত, সিসিলির নীচে পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের সংকীর্ণ যোগস্থল; এই কেন্দ্রভাগে ঘাঁটি করে' হিটলার বৃটিশ ভূমধ্যসাগরীয় শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করবার এবং ইচ্ছে হলে উত্তর আফ্রিকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার আশা রাখেন। দ্বিতীয়ত, ভিশির উপর এর ফলে হিটলারের কর্তৃত্ব আরো শক্ত হওয়ার সম্ভাবনা; কারণ যে উত্তর আফ্রিকান সাম্রাজ্য পেতাঁ গভর্নমেণ্টের কাছে জার্মান জবর-দস্তির বহিরবস্থিত শেষ আশ্রয়স্থল, সেই সাম্রাজ্যের প্রধান ঘাঁটি বিজেতা (টিউনিসিয়ায়) সিসিলি থেকে বেশী দূরে নয় এবং এখন থেকে তা জার্মান বিমানবহরের দ্বারা বিপন্ন হয়ে থাকল।

ভূমধ্যসাগরীয় সংগ্রাম সম্পর্কে জার্মানি যে একটা পরিকল্পনা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। হের হিটলার গত সোমবার এক অজ্ঞাত স্থানে সিনর মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সে বৈঠকে তাঁরা "দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে একমত" হয়েছেন। ভূমধ্যসাগর এলাকা ছাড়া তাঁদের মধ্যে আলোচনার এখন আর কি থাকতে পারে?

আলবেনিয়ায় গ্রীকরা ক্রিসুরা দখলের পর দক্ষিণ রণাঙ্গনে আরো অগ্রসর হচ্ছে। অন্যান্য রণক্ষেত্রেও তাদের সাফল্যের খবর আসছে। ভলোনা বন্দর নাকি গ্রীক ও ব্রিটিশ বিমানাক্রমণের ফলে অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

আফ্রিকা

লিবিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনী কয়েকদিন ধরে' আয়োজনের পর তোবুরুকের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ আরম্ভ করেছে। এখন পর্যন্ত যে সংবাদ আসছে, তাতে জানা যায়, তাদের আক্রমণে ইতালীয় সৈন্যেরা ক্রমাগত হটে যাচ্ছে।

ইংরেজরা এরিত্রিয়া সীমান্তের নিকট সুদানের অন্তর্গত কাসসালা ইতালীয়দের কাছ থেকে আবার দখল করে' নিয়েছে এবং এরিত্রিয়ার মধ্যে আক্রমণ চালাচ্ছে।

বিমান আক্রমণ

এ সপ্তাহে ব্রিটেনে দক্ষিণ ওয়েলসের উপরই জার্মান বিমানের আক্রমণ বেশী হয়। সোয়ানসী শহরেই আক্রমণ প্রবল হয়। লণ্ডনের উপরও জার্মান বিমান হানা দেয়; তবে আক্রমণের তীব্রতা আগের চেয়ে কম। ইস্ট অ্যাংলিয়াতে জার্মানরা এক ট্রেনের উপর মেশিনগান চালায়। ডোভার এলাকার উপর জার্মানরা গোলাবর্ষণ করে।

জার্মানি, জার্মান অধিকৃত রাজ্য এবং ইতালির বিভিন্ন ঘাঁটির উপর ব্রিটিশ বিমানবহর পাল্টা আক্রমণ চালায়।

আমেরিকার সাহায্য

আমেরিকার প্রেরিত সমরোপকরণ যাতে ব্রিটেনে না পেঁছিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জার্মান বিমান ও ইউবোট উত্তর আটলাণ্টিকে হানা দিয়ে ফিরছে। ইউবোটগুলি দিনের বদলে রাত্রে আক্রমণ চালানর পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ব্রিটেন এর প্রতি-ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করছে।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ যুদ্ধের আবর্তের মধ্যে এগিয়ে আসছে। ব্রিটেনকে সাহায্যদানকল্পে যে 'ইজারা ও ঋণ বিল' কংগ্রেসে পেশ করা হয়, সে সম্পর্কে প্রতিনিধি-সভার পররাষ্ট্র-কমিটির কাছে মার্কিন মন্ত্রীরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন। মিঃ কর্ডেল হাল, মিঃ ষ্টিমসন ও কর্ণেল নক্স যে বিবৃতি দিয়েছেন তা খুবই অর্থপূর্ণ। মিঃ হাল ও কর্ণেল নক্স যথাক্রমে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এক্সিস শক্তিবর্গকে খোলাখুলি আমেরিকার শত্রু হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। মিঃ হাল জাপানের কার্যকলাপের বিশেষ নিন্দে করেছেন; ফলে জাপানী পত্রিকাগুলি তাঁর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করেছে। কর্ণেল নক্স বলেছেন যে, ইংলণ্ড পরাজিত হলে আমেরিকার সর্বনাশ দেখা দেবে; কারণ জার্মানী, জাপান ও ইতালীর সম্মিলিত নৌবাহিনী ক্ষুদ্রতর মার্কিন নৌবাহিনীকে চারিদিক থেকে পযুদস্ত করে ফেলবে; সুতরাং ইংলণ্ডকে আমেরিকা হারতে দিতে পারে না। মিঃ ষ্টিমসন আভাষ দিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন নৌবাহিনীর একটা অংশ ব্রিটেনের কাছে হস্তান্তরিত করা হ'তে পারে। অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন নৌ-অফিসার এডমিরাল ষ্টার্লিং বলেছেন যে, এখনই মার্কিন নৌবহরের পাহারায় ব্রিটেনে সমরোপকরণ পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

জাপানের মনোভাব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মনোভাবে এক্সিসের মনে বেশ উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। জার্মানী একেবারে চুপ করে রয়েছে; জাপানের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুওকা আমেরিকার কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, সে যেন এইরকম মনোভাব অবলম্বন করে বিশ্ব-সমর বাধিয়ে না দেয়, কারণ তাহলে শান্তি ও সভ্যতা ধ্বংস হবে। মিঃ মাৎসুওকা পূর্ব এশিয়ায় জাপানের 'সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা' ব্রতেরও উল্লেখ করেন। সোভিয়েটের সঙ্গে জাপান যে মিতালি করবার খুব চেষ্টা করছে সে কথাও তিনি জানান।

শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য থেকে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, আনাম, কোচিন-চীন, ইস্ট ইণ্ডিজ, মালয় ও ফিলিপাইনের পঞ্চাশ কোটি অধিবাসীকে উদ্ধার করবার' জন্যে টোকিওতে এক জাপানী লীগ স্থাপিত হয়েছে। জাপানের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এর সদস্য হয়েছেন।

থাই ইন্দোচীন

থাই ও ফরাসী ইন্দোচীনের সঙ্ঘর্ষ এখনও চলছে। থাইরা উত্তরে মেকং অঞ্চলে ও দক্ষিণে কাম্বোডিয়ার মধ্যে খানিকটা প্রবেশ করেছে। শ্যাম উপসাগরে উভয়পক্ষের একটা নৌ-সংগ্রামও হয়ে গেছে। এখন ফরাসীরা মিটমাটের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করছে বলে' শীঘ্রির শান্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর পেছনে জাপানের হাত আছে মনে হয়; কারণ মিঃ মাৎসুওকা তাঁর বক্তৃতায় থাইল্যাণ্ডের দাবীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে' বলেছেন যে, এ বিরোধের মিটমাট জাপান চায়।

রুমেনিয়ায় বিদ্রোহ?

রুমেনিয়ায় নাকি সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছে এবং একদিকে বিদ্রোহী ও অন্যদিকে গবর্ণমেণ্ট ও জার্মানদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষে উভয়পক্ষের বহুলোক নাকি হতাহত হয়েছে। এ খবর কতটা বিশ্বাস্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ ইতিপূর্বে রুমেনিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে যত খবর এসেছে তার অধিকাংশই পরে অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। বুখারেস্টে জার্মান সামরিক মিশানের একজন সদস্য আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন বলে' সংবাদ পাওয়া গেছে।

পেতাঁ-লাভাল

মঃ লাভালের সঙ্গে মার্শাল পেতাঁর আলোচনা ও মিটমাট হয়ে গেছে। জার্মানদের চাপেই যে মার্শাল বিতাড়িত সহকর্মীর সঙ্গে মিতালি করতে বাধ্য হয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। বলা হয়েছে যে, মিটমাটটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার না দেখে সে কথা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না।

বৃটেনে সংবাদপত্র দমন

বৃটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ হার্বার্ট মরিসন (শ্রমিক দল)-এর আদেশে বৃটেনে কমিউনিষ্ট দলের দৈনিক সংবাদপত্র "ডেলী ওয়ার্কার" এবং বামপন্থী সাময়িকপত্র "দি উইক"-এর প্রকাশ বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে। ঐ দুই কাগজের প্রচারে বৃটিশ সমর-প্রচেষ্টায় নাকি বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছিল।

২১-১-৪১

—ওয়াকিবহাল

বাঙলা দেশের সাইকেল প্রতিযোগিতা পরিচালনা

বাঙলা দেশের সাইকেল প্রতিযোগিতা পরিচালকগণের নির্দেশ সাইকেল চালকগণকে এই বৎসর বিশেষভাবে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কোন পথ অবলম্বন করিলে "নোবেসের" কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন, তাহা তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অধীনস্থ দুই দুইটি বিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় সাইকেল চালনা বিষয় যোগদান করিয়া তাঁহাদের প্রতিযোগিতার শেষে শুনিতে হইয়াছে, পরিচালকগণ বলিতেছেন "নো রেস।" নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়ে তাঁহারা নাকি প্রতিযোগিতা শেষ করিয়াছেন। সাইকেল-চালকগণ ইহাতে অবাক হইয়া গেলেন। প্রথম প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান স্পোর্টসে "নো রেস" হওয়ায় সাইকেলচালকগণ ভাবিয়াছিলেন, দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় সিটি এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে তাঁহারা এই দুর্নাম দূর করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমূলে নির্মূল হইয়া গেল, যখন তাঁহাদের পুনরায় শুনিতে হইল "নো রেস"। এইরূপভাবে পর পর দুইটি প্রতিযোগিতায় "নো রেস" হওয়ায় সাইকেল-চালকগণের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী প্রতিযোগিতাসমূহে যোগদান করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড যখন খুবই খারাপ হইয়াছে, তখন আমাদের যোগদান করিয়া লাভ কি?" তবে দুঃখ এই যে, সাইকেল প্রতিযোগিতা পরিচালনার সময় যেরূপ কড়াকড়িভাবে নিয়ম পালন করা হয়, অন্য সকল প্রতিযোগিতার সময় সেইরূপ করা হয় না। সাইকেল আরোহীরাই বাঙলার এ্যাথলেটিক্সের সকল দুর্নামের জন্য দায়ী, ইহাই যেন পরিচালকগণের ধারণা এবং সেইজন্য তাঁহারা খড়্গহস্তে সকল সময়ে সাইকেল চালকগণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত। "বাঙলার এ্যাথলেটিক্সের দুর্নামের জন্য একমাত্র দায়ী যখন আমরা তখন আমাদের প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করাই উচিত।" এইরূপ উক্তি হইতে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, বাঙলার সাইকেল চালকগণ পরিচালকগণের বিচারের পেষণে বিশেষভাবেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। পরিচালকগণ সাইকেল চালনা বিষয়টির প্রতি এইরূপ কড়া দৃষ্টি যে এই বৎসরই প্রথম দিয়াছেন তাহা নয়, গত ৪।৫ বৎসর হইতেই তাঁহারা এইরূপভাবে কড়া নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়াছেন।

কড়াকড়ি করিবার কারণ

৭।৮ বৎসর পূর্বে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ লক্ষ্য করেন যে, বাঙলার এ্যাথলিটগণ প্রতিযোগিতার সকল বিষয়েই ক্রমশ অবনতির দিকে চালিত হইতেছেন। বাঙলার স্ট্যাণ্ডার্ড সকল বিভাগেই নিম্নস্তরের হইতেছে। এই নিম্নগামী পথ রোধ করিবার জন্য তাঁহারা সকল প্রতিযোগিতার বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দেন। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ না হইলে "নো রেস" বলা হইবে। এই নিয়ম প্রচলিত হইবার দুই এক বৎসরের মধ্যে দেখা যায় যে, স্পোর্টসের অধিকাংশ বিষয়েই স্ট্যাণ্ডার্ড উন্নততর হইয়াছে। নিয়ম প্রচলনের ফল ভাল হইল দেখিয়া পরিচালকগণ ঐ নিয়ম স্থায়ী-ভাবে সকল বিশিষ্ট স্পোর্টসে যাহাতে পালিত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি দেন। ইহার ফলেই সাইকেল চালকগণকেও এই বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে পড়িতে হয়। পরিচালকগণের শৈথিল্যের জন্যই হউক, অথবা পরিচালকগণের মধ্যে যাঁহারা এই সকল নিয়ম গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের অবর্তমানের জন্যই হউক, গত দুই বৎসর হইতে এই বাঁধাধরা নিয়ম সকল প্রতিযোগিতায় পালিত হয় নাই। কেবল সাইকেল প্রতিযোগিতার সময়েই ইহা অনুসরণ করা হয়, অন্য প্রতিযোগিতার সময় হয় না বলিয়া সাইকেল চালকগণ যে অনুযোগ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলা চলে না। সকল প্রতিযোগিতা বিষয়েই পরিচালকগণের শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা ৫।৬ বৎসর পূর্বে যে নিয়ম প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণভাবে পালন করেন নাই। গত বৎসর এই বিষয় কেহ কেহ পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে এই বৎসর পুনরায় পরিচালকগণ পূর্বের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাইকেল চালকগণের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা প্রথমেই এই কড়া নিয়মের কবলে পড়িয়াছেন। সকল প্রতিযোগিতার বিষয় এই নিয়ম যদি পালিত না হয়, তবে পরিচালকগণ শীঘ্রই দুর্নাম শুনিতে বাধ্য। সাইকেল চালকগণের হতাশ হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। এ্যাথলেটিক্সের সকল বিষয়েরই স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সাইকেল চালকগণ যে নির্দেশের ফলে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিতেছেন, সকল এ্যাথলীটকেই ইহার কবলে পড়িতে হইবে, যদি তাঁহারা এখন হইতেই সতর্ক দৃষ্টি না রাখেন।

মধ্যপ্রদেশ কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট

মধ্যপ্রদেশ কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতেই মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই প্রতিযোগিতাটি প্রচলন করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতাটি বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলারের ন্যায় ভারতের এক বিশিষ্ট প্রতিযোগিতা না হইলেও, ইহা মধ্যপ্রদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিয়া থাকে। এই প্রতিযোগিতাটি যাহাতে বিশিষ্টতা লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে পরিচালকগণ যোগদানকারী প্রত্যেক দলকে ভারতের যে কোন প্রদেশের দুইজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করিবার অধিকার দান করিয়াছেন। এই জন্য এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় হিন্দু দলের পক্ষে এস ব্যানার্জ্জি ও বিনু মানকড়, মুসলীম দলের পক্ষে এস এম কাদ্রি ও লতিফ, পার্শী দলের পক্ষে আইবরা ও খোট এবং ক্রিশ্চিয়ানদের পক্ষে ভি এস হাজারী ও ই আলেকজেণ্ডার যোগদান করিয়াছেন।

হিন্দু বনাম মুসলীম

মধ্যপ্রদেশ কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একটি মাত্র খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলায় হিন্দু দল মুসলীম দলকে ৫ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। হিন্দু দলের সাফল্য একরূপ বিনু মানকড় ও এস ব্যানার্জ্জির মারাত্মক বোলিংয়ের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। কোন দলের কোন খেলোয়াড়ই ব্যাটিংয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। দুইদিনেই এই খেলার শেষ মীমাংসা হইয়াছে।

খেলার বিবরণ

মুসলীম দল প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করেন। মাত্র ১২০ রাণ করিয়া এই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দলের তরুণ খেলোয়াড় ইসাক আলী ৬৫ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হিন্দু দলের পক্ষে বিনু মানকড় ৪০ রাণে ৪টি ও এস ব্যানার্জ্জি ৬৩ রাণে ৪টি উইকেট দখল করেন। পরে হিন্দু দল খেলা আরম্ভ করিয়া ১৮৩ রাণে ইনিংস শেষ করে। কোন্ড্রা ৪৩ রাণ ও বিনু মানকড় ৪০ রাণ করিতে সক্ষম হন। মুসলীম দলের মাসুদ আমেদ ৫৮ রাণে ৫টি ও লতিফ ৪০ রাণে ৪টি উইকেট পান। চা পানের অল্প পরেই হিন্দু দলের ইনিংস শেষ হয়। মুসলীম দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন ও প্রথম দিনের শেষে এক উইকেটে ৫ রাণ করে।

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করিয়া মুসলীম দলের পুনরায় বিপর্যয় দেখা দেয়। এস কাদ্রী, ইসাক আলী খেলার অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় ইনিংস ১৭০ রাণে শেষ হয়। এস ব্যানার্জি ৫৪ রাণে ২টি, বিনু মানকড় ৭০ রাণে ৪টি ও এইচ গাইকোয়ার ২৭ রাণে ৩টি উইকেট পান। হিন্দু দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া ৫ উইকেটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এস ব্যানার্জি ও মানকড় যথাক্রমে ২৪ রাণ ও ৩৯ রাণ করিয়া দলের রাণ সংখ্যা সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করেন। মুসলীম দলের হাকিমের বল এই ইনিংসে বিশেষ কার্যকরী হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

মুসলীম দল প্রথম ইনিংসঃ—১২০ রাণ (ইসাক আলী ৬৫, বিনু মানকড় ৪০ রাণে ৪টি ও এস ব্যানার্জ্জি ৬৩ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

হিন্দু দল প্রথম ইনিংসঃ—১৮৩ রাণ (কোন্ড্রা ৪৩, বিনু মানকড় ৪০, এইচ গাইকোয়ার ২৭, মাসুদ আমেদ ৫৮ রাণে ৫টি, লতিফ ৪০ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

মুসলীম দল দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৭০ রাণ (এস কাদ্রী ৩৫, ইসাক আলী ৩০, লতিফ ২৩; এস ব্যানার্জি ৫৪ রাণে ২টি, বিনু মানকড় ৭০ রাণে ৪টি ও গাইকোয়ার ২৭ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

হিন্দু দল দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৫ উইকেটে ১১১ রাণ (এস ব্যানার্জি ২৪, বি মানকড় ৩৯, সূর্য নাইডু ২৩, হাকিম ৪৩ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

(হিন্দু দল ৫ উইকেটে বিজয়ী)

জাতীয় খেলার প্রসার

সম্প্রতি ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য বাঙলার সকল জাতীয় খেলার প্রসার বৃদ্ধি করা। ইতিমধ্যেই এই এসোসিয়েশন দুইটি জাতীয় খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছে। বহুসংখ্যক দল এই দুইটি প্রতিযোগিতায় যোগদান না করিলেও সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ এই বিষয় ধীরে ধীরে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। আশা করা যায় দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই এসোসিয়েশন বাঙলার সকল ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। জাতীর উন্নতি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা জাতির সকল বিভাগের উন্নতি প্রার্থনা করেন ইহা বলাই বাহুল্য। জাতীয় খেলাধুলা প্রসারের যাঁহারা ভার লইয়াছেন, তাঁহারা সকল জাতীয় মনোভাবাপন্ন লোকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিতে যে আর্থিক অভাব অনুভব করিতেছেন, তাহা শীঘ্রই বিদূরিত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সকল ক্রীড়ামোদিগণ এইরূপ নিজ নিজ দেশের জাতীয় ক্রীড়া ও ব্যায়ামের উন্নতির জন্য প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের ন্যায় নানা বাধা অসুবিধার মধ্যে কার্য করিতে হইয়াছিল। অনেক সময় এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, পরিচালকগণকে প্রতিযোগিতা বা অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কেমন করিয়া তাঁহারা জানিতেই পারিলেন না, তাঁহারা দেখিলেন দেশের সকল ক্রীড়ামোদীই তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিপুল উৎসাহে অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙলার ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পরিচালকগণও এইরূপ এক সময়ের যে সম্মুখীন হইবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? বৈদেশিক ক্রীড়াসমূহ বর্তমানে আমাদের দেশের ক্রীড়ামোদিগণের যে প্রাণস্বরূপ হইয়া আছে, তাহা জাতীর সকলের পূর্ণ অনুভূতির প্রবল স্রোতের মুখে বিরাট বাধা সৃষ্টি করিতে কখনও পারে না। জাতির নিজের যাহা কিছু তখন সকল কিছুই বড় হইয়া দেখা দিবে। কথায় বলে "দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুরের চেয়েও বড়।" এই কথিত বাণী যদি সত্যই হয়, তবে ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনও একদিন দেশের সকলের সমাদর লাভ করিবে ইহা আশা করা কোনরূপেই অন্যায় হইবে না। ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ সেই দিনের আশায় মনে বল ধরুন, ইহাই আমাদের কামনা।

হাডুডু ও গাদী খেলা

ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন দুইটি জাতীয় খেলা হাডুডু ও গাদীর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হাডুডু খেলার প্রতিযোগিতা ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঐ সকল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন নিখিল বঙ্গ কপাটি সঙ্ঘ ও ক্যালকাটা হাডুডু এসোসিয়েশন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে সাহায্য করিবেন বলিয়া মনে হয়। গাদী খেলার প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে ইতিপূর্বে কখনও পরিচালিত হয় নাই। এই দিক দিয়া ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের দান দেশবাসী স্বীকার করিবেই। এই খেলাটি বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই একটি প্রতিযোগিতার নিম্নলিখিত নাম আমরা ইতিপূর্বে শুনিয়াছিঃ—শিরোগিজো, দাড়িয়াবান্ধা, নুন চোর, গিজো, ধাপসা প্রভৃতি। আমরা আশা করি এই সকল নাম পরিবর্তিত হইয়া একটি নাম গঠিত হইবে এবং ঐ সকল খেলায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে ঐ একই নামের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন। এক নাম প্রবর্তনের ভার ন্যাশনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণকে লইতে হইবে।

সমর বার্তা

১৫ই জানুয়ারী—

ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক মহলের সংবাদে প্রকাশ, সিসিলি দ্বীপটি এখন প্রকৃতপক্ষে জার্মান অধিকারে পরিণত হইয়াছে। জার্মান সৈন্যগণ, বৈমানিকগণ ও কারিকরগণ সম্প্রতি অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় দ্বীপটিতে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে। লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ মহলে উপরোক্ত সংবাদটি সমর্থিত হইয়াছে।

অদ্য রাত্রিতে ব্রিটেনের কোথায়ও বিমান আক্রমণ হয় নাই। গতকল্য রাত্রিতে দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডের এক শহরে হাজার হাজার অগ্নিবোমা এবং অতিবিস্ফোরক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিছু লোক হতাহত হয়। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিমানবহর গত রাত্রে অধিকৃত ফ্রান্সের বন্দরসমূহ আক্রমণ করে।

থাই সমর-পরিষদের এক ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, ফরাসীদের শ্যামদেশ আক্রমণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং ফরাসী ইন্দোচীনের বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রিটিশ বিমানবহর ক্যাটানিয়ার (সিসিলি) উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ফলে নয়টি শত্রু বিমান ধ্বংস হয়। সুদান-আবিসিনিয়ান রণক্ষেত্রের গালাবাট অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যগণ গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় ইতালীয় ঘাঁটিসমূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড হাতাহাতি সংগ্রামের পর ব্রিটিশ সৈন্যগণ তাহাদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়। ষাটজন ইতালীয় সৈন্য নিহত হয়। দ্বিতীয় কালকোর্তা ডিভিসনের অধ্যক্ষ জেনারেল আর্জেণ্টিনাকে তরুকের নিকট গ্রেপ্তার করা হয়।

১৬ই জানুয়ারী—

ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌবহরের উপর বিমান আক্রমণের সময় ব্রিটিশ ক্রুজার 'সাদাম্পটন' ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাহাজে আগুন ধরিয়া যায় এবং উহাকে বন্দরে লইয়া আসিতে না পারায় ব্রিটিশেরা উহাকে ডুবাইয়া দিতে বাধ্য হয়। জাহাজের অধিকাংশ নাবিকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ঐ সময় একটি ব্রিটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে মধ্য ভূমধ্যসাগরে দুইটি ইতালীয়ান জোগানদার জাহাজ জলমগ্ন হয়।

১৭ই জানুয়ারী—

এথেন্স রেডিওর এক সংবাদে প্রকাশ, আলবানিয়া যাওয়ার সময় ইতালীয় সৈন্যবাহী জাহাজ লিগুরিয়া (১৫ হাজার টন) এবং লোম্বার্ডিয়া (২০ হাজার টন) আদ্রিয়াতিক সাগরে টর্পেডোর আক্রমণে জলমগ্ন হয়। গ্রীকগণ বহু ইতালীয়ান সৈন্যকে বন্দী করে।

অদ্যকার ইতালীয়ান ইস্তাহারে উল্লিখিত হয় যে, লিবিয়ায় তরুক রণাঙ্গনে গোলন্দাজ ও রক্ষীবাহিনীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমানবহর দোদেকানিজে ইতালীয়ান ঘাঁটি ও পূর্ব আফ্রিকার জিজিগা প্রভৃতি কয়েকটি ঘাঁটিতে হানা দেয়।

পিকিং অবরোধ শেষ হইয়াছে। গত ২৯শে নবেম্বর একজন জাপ কর্মচারী নিহত হইবার পর এই অবরোধ আরম্ভ হয়।

১৮ই জানুয়ারী।—

ব্রিটিশ বিমানবহর পুনরায় ক্যাটানিয়ার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

জার্মান ও ইতালীয়ান বিমানবহরের একটি বিরাট দল মাল্টার উপর হানা দেয়। ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানবহরের আক্রমণে দশটি জার্মান ও ইতালীয়ান বিমান ধ্বংস হয়।

ফরাসী ইন্দোচীনের সরকারী এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ফরাসী ইন্দোচীনের সৈন্যগণের প্রবল বাধাদানের ফলে ফরাসী ইন্দোচীনে থাই বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত হয়। পক্ষান্তরে থাইল্যাণ্ডের এক ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, থাইল্যাণ্ডের বাহিনীর সহিত সংগ্রামে ইন্দোচীনে ছয়শত ফরাসী নিহত হয় এবং শ্যাম উপসাগরে নৌযুদ্ধে দুইখানি ফরাসী রণপোত' গুরুতরভাবে ঘায়েল হয়।

১৯শে জানুয়ারী—

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কূটনীতিক সমালোচক, পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ বিভারেল ব্যাকষ্টার 'সানডে গ্রাফিক' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর হিটলারের প্রবল আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ বাহিনী ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান ও ইতালি অধিকৃত এরিত্রিয়ার সীমান্তে অবস্থিত সুরক্ষিত ঘাঁটি কাসাল্লা পুনরায় দখল করিয়াছে। সমগ্র কাসাল্লা রণাঙ্গন হইতে ইতালীয়ান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে। ব্রিটিশ 'মবাইল বাহিনী' ইতালীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং তাহাদিগকে বিব্রত করিতেছে।

ফরাসী জাহাজ 'মেণ্ডোজ' ব্রিটিশ ক্রুজার 'অাস্টুরিয়াস' কর্তৃক ধৃত হয়। ফরাসী জাহাজটি ব্রেজিলের দরিয়ার বাহিরে ব্রিটিশ অবরোধ এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু উহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

২০শে জানুয়ারী—

হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎকার হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ সমর্থন করিয়া একটি জার্মান সরকারী ইস্তাহারে বলা হয় যে, এক্সিস সচিববর্গের পররাষ্ট্র সচিবদ্বয়ের উপস্থিতিতে ফুরার ও ডুচের মধ্যে আলোচনা হয়। জার্মান ও ইতালীয়ান উভয় জাতির মৈত্রী ও সামরিক বন্ধন দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনায়কদ্বয়ের মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা হয়। ফলে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে উভয়ে সম্পূর্ণ একমত হন।

শ্যাম উপসাগরে নৌযুদ্ধে ফরাসী নৌবহরের আক্রমণে দুইটি থাই যুদ্ধজাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া ফরাসী ইন্দোচীনের গভর্নর জেনারেলের এক ইস্তাহারে দাবী করা হয়। পক্ষান্তরে থাই বাণিজ্য দূতাবাস হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে 'লামতে পিকে' নামক একটি ফরসী ক্রুজারকে ঘায়েল করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

কেনিয়া-আবিসিনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত দুকানার উত্তরে এনিবো অঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যগণ বহু ইতালীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

আলবানিয়ার বেরাত নামক স্থানের উপর ব্রিটিশ বিমানবহর হানা দেয়। তিনদিনব্যাপী তুষারপাত ও ঝটিকা সত্ত্বেও আলবানিয়ায় গ্রীকরা কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরস্থিত ব্রিটিশ নৌবহর তরুকের উপর বোমা বর্ষণে ব্রিটিশ বিমানবহর সহযোগিতা করিতেছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয়ানরা কাসাল্লা রণাঙ্গন হইতে এখনও পশ্চাদপসরণ করিতেছে। গতকল্য ব্রিটিশ বাহিনী বিনা বাধায় স্যাবদারাত ও তেসেনেই-এর নিকটবর্তী কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে। ব্রিটিশ বাহিনী এক্ষণে পূর্বদিকে পশ্চাদপসরণ কারী ইতালীয়ান সৈন্যদলের সহিত সংঘর্ষে ব্যাপৃত আছে। কেনিয়ার মেটেম্মা অঞ্চলে ব্রিটিশ রক্ষীবাহিনীর কর্মতৎপরতা অক্ষুণ্ণ আছে। লিবিয়া রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই।

২১শে জানুয়ারী।—

বার্দিয়ার ৭৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইতালিয়ান বন্দর তরুকের উপর বৃটিশ বাহিনী আক্রমণ শুরু করিয়াছে। এই সম্পর্কে কাইরোর জেনারেল হেড কোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আক্রমণ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। কাসাল্লা রণাঙ্গনেও বৃটিশ বাহিনী প্রবলভাবে ইতালীয় সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং ইতালীয়ানরা পূর্ব সীমান্তের দিকে সরিয়া যাইতেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৫ই জানুয়ারী—

সত্যাগ্রহ সংবাদ—বাঙলা—মেদিনীপুরের বড়বাসুদেবপুরে ডাঃ হীরালাল মাইতি ধৃত হন। সিউড়ীতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, সত্যকিঙ্কর মুখার্জি ও অশ্বিনীকুমার দাস সত্যাগ্রহ করেন; কিন্তু কেহই ধৃত হন নাই। আসাম—কংগ্রেস পরিষদ দলের ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র চন্দ সত্যাগ্রহ করিয়া ধৃত হন। শ্রীহট্টে হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ধৃত হন।

প্রথম সত্যাগ্রহী আচার্য বিনোবা ভাবে তিনমাস কারাদণ্ড ভোগের পর নাগপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন।

চুচুঁড়ার সাহাগঞ্জে ডানলপ রবার কোম্পানির কারখানায় গতকল্য হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ২৫ জন আহত হয়।

কলিকাতা হইতে ১৮ মাইল দূরে বারুইপুর গ্রামে অদ্য এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐদিন প্রাতে বারুইপুর থানার পুলিশ দাহ করিবার জন্য শ্মশানঘাটে নীত শশী বেওয়া নাম্নী একজন হিন্দু বিধবাকে চিতার উপর হইতে জীবন্ত অবস্থায় নামাইয়া লইয়া পরে চিকিৎসার্থ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

দামাস্কাস বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি মিশরের রাজা ফারুকের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। এই ব্যক্তিই সৌদি আরবের রাজার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল।

১৬ই জানুয়ারী—

উড়িষ্যার পারলাকিমেদি তালুকের অন্তর্গত রায়গড় নামক স্থানে শবর এবং পানিদিগের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে পাঁচ ব্যক্তি নিহত ও বহু গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। গত ১০ই এবং ১১ই তারিখে দুইদিন এই দাঙ্গা ঘটে।

নেপাল সরকার গত ১লা জানুয়ারী হইতে আনন্দবাজার পত্রিকা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

শোলাপুরে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মোট সাতজন নিহত ও আটজন আহত হয়।

কোনরূপ মাগ্‌গী ভাতা না পাইয়া জি আই পি রেলওয়ের মাতুঙ্গা কারখানার প্রায় ৩০০০ শ্রমিক অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে।

১৭ই জানুয়ারী—

সত্যাগ্রহ সংবাদ—আচার্য বিনোবা ভাবে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করিয়া দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহ করেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কুমিল্লা জগন্নাথবাড়ি এলাকায় যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি করিয়া ছয়বার সত্যাগ্রহের অভিযোগে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিশ্বাসকে গত ১৩ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার করা হয়; তিনি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

১৮ই জানুয়ারী—

ঢাকায় বাঙলাবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে বস্তীর গোয়ালাদের বহু বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে।

দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অদিতি দেবীর সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখার্জির পুত্র শ্রীমান অধিপ মুখার্জির শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

আরামবাগের গোঘাট থানার অধীন শ্যামবল্লভপুরে অসিধারী তুতার বাড়িতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক গৃহস্বামী নিহত হইয়াছে।

ঢাকায় শ্রীযুক্ত জ্ঞান চক্রবর্তী, ফণীন্দ্র গুহ, প্রতুলেশ্বর দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ সেন, সুরেশচন্দ্র দে এবং কালীপদ ঘোষালকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হয়।

চীনের সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যের এবং বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নবগঠিত চতুর্থ কম্যুনিস্ট বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হয় এবং উহার অধ্যক্ষ ইয়াটিংকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯শে জানুয়ারী—

সত্যাগ্রহ সংবাদ—বাঙলা—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু গত ১৭ই জানুয়ারী নবদ্বীপে সত্যাগ্রহ করেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কৃষ্ণনগর লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি হুগলীর গুড়ুপ গ্রামে, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত ১৮নং লাট রায়পুর হাটে এবং ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি কলিকাতায় সত্যাগ্রহ করেন। ইঁহাদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। যুক্তপ্রদেশ—এলাহাবাদে বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ আসরফকে এবং লক্ষ্ণৌয়ে শ্রীযুক্ত মোহনলাল গৌতমকে ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্বর্গীয় লোকমান্য তিলকের পুত্র মিঃ আর বি তিলক কেশরী ও মারহাট্টা ট্রাস্টের ট্রাস্টিদিগকে 'আমরণ অনশনের' নোটিশ দিয়া গত আটদিন যাবৎ অনশন ধর্মঘট করিতেছেন। পুণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য মিঃ তিলকের উপর এক সমন জারী হইয়াছে।

অদ্য ফরোয়ার্ড ব্লকের সভ্য সংগ্রহ সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে।

ভিসিতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গতকল্য মঃ লাভাল ও মার্শাল পেতাঁর মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় এবং গত ১৩ই ডিসেম্বর মঃ লাভালের পদত্যাগের ফলে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, বর্তমানে তাহার অবসান হইয়াছে।

২০শে জানুয়ারী—

সত্যাগ্রহ সংবাদ—বাঙলা—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খরিয়াল বাজারে শ্রীযুক্ত অমূল্য কুশারী, ডায়মণ্ড হারবারের অধীন কুশারপুরে শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়া, কলিকাতায় ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার পিতা হীরালাল লোহিয়া সত্যাগ্রহ করেন, কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি এ পর্যন্ত কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে আটবার সত্যাগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আসাম—শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ দেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। যুক্তপ্রদেশ—আলমোড়ায় পণ্ডিত বদরিদত্ত পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ হইলে কলিকাতা ও শহরতলীর প্রায় ১৪ লক্ষ লোকের যাহাতে জলকষ্ট না ঘটে, তজ্জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশন বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, কর্পোরেশন শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৫০০০ নলকূপ বসাইয়া জলসরবরাহের এক নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

ভাওয়াল মামলার বাদী ডিক্রীদার কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়কে ঢাকার অতিরিক্ত জিলা জজ বাদীর আরজিতে উল্লিখিত সম্পত্তি ব্যতীত ভাওয়াল এস্টেটের যাবতীয় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দখল দিবার অনুকূলে যে রায় দিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে বিবাদী মেজরাণী বিভাবতী দেবী প্রমুখ হাইকোর্টে যে দরখাস্ত করিয়াছেন, অদ্য বিচারপতি মিত্র ও বিচারপতি খোন্দকারের এজলাসে তাহার আর এক দফা শুনানী হয়।

২১শে জানুয়ারী—

মরিশাস দ্বীপের প্রবাসী ভারতীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ কর্মবীর বাবু তিলক সিং পরলোকগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের গভর্নিং বডি ঐ কলেজের মহিলা শাখার ক্লাসসমূহ আগামী জুলাই মাস হইতে কলেজের মূল বাড়ির সহিত সংশ্লিষ্ট নবনির্মিত বাটীতে প্রাতঃকালে করার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে ঐ কলেজের প্রায় ৪ শত ছাত্রী ক্লাসে যোগ না দিয়া ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন।

জীবজন্তুর মুখের লালা

বিজ্ঞানের প্রসারতার সংগে সংগে প্রাচীনকালেও যেমন মানুষের ধারণার ভুল ভেঙেগেছে, একালে তেমনি এখনও বিজ্ঞান এসে আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দিচ্ছে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা জীবজন্তুর মুখ সম্বন্ধে আমাদের একটি ভুল ধারণাকে দূর করেছেন। এতদিন আমরা জানতাম যে, জীবজন্তুর মুখ ব্যাকটেরিয়ার বীজাণুতে ভরা, তাই কোনো কুকুর, বেড়াল কিংবা বাঁদর কামড়ালে আমরা সংকিত হয়ে উঠে ওষুধ-পত্তরে আর ইনজেকসনে নিজেদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলি। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায়, জীবজন্তুর মুখ নরনারীর মুখের তুলনায় অনেক বেশী পরিষ্কার। সাধারণ জীবজন্তুর মুখে যে লালা ঝরতে দেখা যায়, তা সোডিয়াম কারবোনেট-এ ভরা, অর্থাৎ যে সোডা দিয়ে আমরা কাপড় কাচি, সেই সোডা রয়েছে জীবজন্তুর মুখের লালায়। এই লালার জন্যে জীব-জন্তুর মুখে কোনো প্রকারের ব্যাকটেরিয়া জীবন্ত থাকতে পারে না। জীবজন্তুর মুখে যে সোডিয়াম কারবোনেট পাওয়া যায়, মানুষের মুখে তা পাওয়া যায় না, তার ফলে মানুষের মুখের অভ্যন্তরে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই বাসা বেঁধে আছে। পেন্সিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির একদল বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি এই অত্যাশ্চর্য সত্যটি আবিষ্কার করেছেন। ডাক্তাররা কুকুর, বেড়াল, শুয়োর, ঘোড়া, হাতী, সিংহশিশু, বাঁদর, এমনকি গন্ডার পর্যন্ত জন্তুর মুখের লালা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মানুষের মুখের তুলনায় এদের মুখে ব্যাকটেরিয়ার অংশ অনেক কম, কেবল তাই নয়, জীবজন্তুর মুখের লালার সোডিয়াম কারবোনেট অন্যান্য জীবাণু ধ্বংসের পক্ষে উপকারী। হয়ত একদিন দেখব যে, আমাদের শরীরের নানা জীবাণু দূর করবার জন্যে জীব-জন্তুর মুখের লালার ওষুধ আমাদের খেতে হচ্ছে।

মাথাধরা

আমাদের ধারণা যে, মাথাধরার সংগে শারীরিক অসুস্থতার যোগ আছে। কথাটা সত্যি হলেও সবক্ষেত্রে নয়। অনেক সময় দেখা গেছে, শরীর সুস্থই আছে, অথচ মানসিক দুশ্চিন্তার কারণে মাথা ধরেছে। সম্প্রতি বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের এক সম্মেলনে একদল ডাক্তার প্রতিপন্ন করেছেন যে, শরীরের অসুস্থতাই মাথাধরার কারণ নয়, অধিকাংশক্ষেত্রে মনের বিরক্তির জন্যই মাথা ধরে। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করেন না যে, যে সব লোকের সংগে দেখা করতে চাই না তারা যখন দেখা করতে আসে এবং কিছুক্ষণ বক্ বক্ করে চলে যায়, তখন দেখা গেল আমার মাথা ধরেছে। এ ছাড়া মাথা ধরার আরো কারণ আছে। কাণের কাছে জোরে চীৎকার করলে বা শব্দ করলে অথবা ইনসম্নিয়া হলে, অপ্রিয় কাজ করলে বা কোথাও অপমানিত হলেই মাথা ধরে।

উপরের কুকুরটার নাম খুদে টিক্সি। সিডনিতে এর থেকে ছোট জাতের কুকুর নাকি এ পর্যন্ত জন্মায় নি। টিক্সি ছ'মাসে পড়েছে কিন্তু লম্বায় বেড়েছে মাত্র আট ইঞ্চি। শরীরের ওজনও সেই অনুপাতে হয়েছে দু' পাউন্ড। প্রভুর মাথার টুপির মধ্যে, সময়ে সময়ে মাথার উপর চড়ে টিক্সি বেশ আরামে খেলা করে।

পুস্তক পরিচয়

তিন সঙ্গী—গল্পের বই। **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী** গ্রন্থালয়, কলিকাতা। **১৫১** পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা ও দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা, তিনটি ছোট গল্প এই সংগ্রহে পাশাপাশি বসিয়া 'তিন সঙ্গী' হইয়াছে। গল্পগুলি পরস্পর সম্পর্ক রহিত হইলেও সুরে এক, সেদিক দিয়া ইহাদের একত্র সমাবেশ ও নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পূজাসংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রথম গল্প 'রবিবার' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা ভবনে" গল্পটি স্বয়ং পড়িয়া কলিকাতার সুধী জনসমাজকে শোনান। সেই পাঠের স্মৃতি এখনও অনেকের মনে অক্ষুণ্ণ আছে। রবীন্দ্রনাথের বাচন-ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর নূতনত্বে সেদিন সকলেই অভিভূত হইয়াছিলেন, স্মরণ আছে। তার পর ১৩৪৬ সালের পৌষ মাসে দ্বিতীয় গল্প 'ছোট গল্প' নামে বিদ্যাসাগর সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের প্রথম খসড়াটি 'শেষ কথা' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হয়। দুইটি গল্পের পাঠে অনেক গরমিল আছে। 'তিন সঙ্গী'তে 'শনিবারের চিঠি'র পাঠই গৃহীত হইয়াছে। শেষ গল্প 'ল্যাবরেটরি' বর্তমান বর্ষের পূজাসংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

'ল্যাবরেটরি' প্রকাশিত হইবার পর বাঙলা দেশের সাহিত্যিক মহলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ গল্পত্রয়ে বাঙলা দেশের আধুনিকদেরও আধুনিকতায় পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা ও রচনাভঙ্গী দেখিয়া একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ স্টাইল অত্যন্ত সরাসরি (direct) এবং অভিনব।

কিন্তু যাঁহারা আর একটু তলাইয়া পড়িবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সে এই গল্পগুলি উৎকট অভিনবত্ব প্রচারের জন্য রচনা করেন নাই। বাঙলা দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এখানকার স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে যে হীনতা ও গ্লানি দেখিয়া তিনি মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছেন, গল্পচ্ছলে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ইহাই তাঁহার শেষ কথা।

তিনি ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর উপায়ে সেকথা বলিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের দেহ ছাড়াও আর একটা সত্তা আছে; সে শুধু সামাজিক সংস্কারগ্রস্ত জীবমাত্র নয়, প্রাণশক্তি এবং বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন গোটা মানুষ—রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি গল্পের সাহায্যে আমাদের এই বাঙলা দেশেই এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানকার মানুষের মনে এই জাতীয় ভাবনাও জাগ্রত হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি আমাদের চিরন্তন সংস্কার বা ধারণাকে আঘাত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; প্রশ্ন তুলিয়াছেন মাত্র। এবং শেষ পর্যন্ত আত্মত্যাগের মহান্‌ আদর্শে পুরুষের কর্মশক্তিকে সমাজের কল্যাণকর কাজে অব্যাহত রাখিবার জন্য নারীচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনটি গল্পের নায়িকা তিনজন—বিভা, অচিরা ও সোহিনী—এই চিরন্তন নারীসত্তার তিন রূপ; ইহারা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল কি না, কবি তাহা দেখান নাই, কিন্তু জয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। নায়ক অভীক এবং নবীনমাধব মোহগ্রস্ত এবং আত্মহারা হইতে হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল এবং নায়ক নন্দকিশোর মরিয়াও বিজয়ী হইয়া রহিল যে নারীশক্তির সহায়তায় আমরা তিনজনের মধ্যে তিনটি বিচিত্র মূর্তিতে তাহার প্রকাশ দেখিলাম। চরম পুরুষত্ব যে ভোগে নয় ত্যাগে এবং চরম নারীত্ব যে স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিগ্রহে, এই তিনটি গল্পের মধ্যে আমরা তাহার চকিত আভাস পাইয়া বিস্মিত হইলাম। যাঁহারা শুধু বাহিরের ভঙ্গী দেখিয়া এই তিনটি অপরূপ গল্পের বিচার করিবেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবেন।' এই কারণেই এই তিনটি গল্পের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অকারণ নিন্দা সহিতে হইতে পারে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তরুণ তুর্কী—ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। ১০।৪-এ মুসলমান-পাড়া লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ভূপর্যটক হিসাবে শ্রীযুত রামনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের নাম বাঙলা দেশের অনেকেই অবগত আছেন। ভ্রমণ অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু ভ্রমণ করিলেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখা যায় না এবং লিখিলেও তাহা সাহিত্য হিসাবে উপভোগ্য হয় না। দেখিবার মত দেখিতে জানা চাই। বিশ্বাস মহাশয়ের আছে এই অন্তর্দৃষ্টি এবং সেজন্য বিশিষ্ট একটা রস তাঁহার লেখা হইতে আদায় হয়। তাহার উপর তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া জ্যান্ত মানুষের প্রাণের ছাপ আমরা পাই; ইহাকে মানবতাই বলুন, আর আধুনিকতাই বলুন, সংকীর্ণতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সত্যকে সোজাসুজি দেখিবার একটা ভঙ্গী বিশ্বাস মহাশয়ের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার তুরস্ক ভ্রমণে এই তাজা মানুষের প্রাণের স্পন্দন পত্রে পত্রে রহিয়াছে। নবীন তুর্কীকে তিনি তরুণ প্রাণ লইয়া দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন বলিয়াই বুঝিয়াছেন, তাহার ফলে সরস করিয়া বুঝাইতেও পারিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙালীর এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া দেখা উচিত। ছাপা, বাঁধাই সবই সুন্দর।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু কৃত সংকীর্তন পদামৃত—মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ-সংঘ, ৫৯নং মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ভাষাকে ভাবরূপ দেওয়াতেই কবির কৃতিত্ব; কিন্তু এই রূপ দেওয়ার কাজটা অনুমানের দ্বারা হয় না, তাহা অনুভবের জিনিস; মাধুর্যের এইখানেই মূল। প্রভু জগদ্বন্ধুর পদকীর্তনগুলিতে এই প্রত্যক্ষানুভূতির রস আছে। ভাষা সেখানে ভাবে বিগাঢ় হইয়াছে এবং সেই বিগাঢ় ভাব স্ফুরিত হইয়াছে ধ্বনির ভিতর দিয়া। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রূপ যেন ঝঙ্কারে ছড়াইয়া পড়ে এবং তর্ক বিচারের অতীত এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধুর্যলোকে মনকে লইয়া যায়। পদগুলি প্রভুর রচিত বিভিন্ন পদ-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবদের আহ্নিককৃত্য অনুযায়ী সাজাইয়া বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী গ্রন্থের যে মুখবন্ধটি দিয়াছেন, তাহা এই সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, রসজ্ঞ পাঠক এই মুখবন্ধে অনেক নূতন বিষয় উপলব্ধি করিবেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সবই সুন্দর।

প্রদীপ—মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র ও সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের লিখিত পূর্ব ইউরোপের সমাজবিবর্তনের ইতিহাস ক্রমশ প্রকাশ্য ভাবে চলিতেছে। সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ লেখাটি পড়িলে সকলেই উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত বিনয় ঘোষের শ্রম ও যন্ত্রনৃত্য শীর্ষক সমালোচনাটি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ক্যানসার রোগের অর্থনীতি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। শ্রীযুত মন্মথনাথ সান্যাল মহাশয়ের সংঘাত নামক কবিতাটি আধুনিক ধাঁচের হইলেও অস্পষ্ট নয়; সংবেদনে ছন্দায়িত বলিয়া সুস্পষ্ট, কবিতায় রস আছে এবং সে রসে গাঢ়তা আছে। শ্রীযুত দক্ষিণা বসুর 'কিসমৎ' শীর্ষক আধুনিক কবিতাটিতে তেমন গাঢ়তা না থাকিলেও, কবিতাটি চলনসই হইয়াছে। 'প্রদীপে'র প্রবন্ধ ও কবিতা নির্বাচন সম্পাদকীয় কৃতিত্বের পরিচায়ক।

দ্বিধা: জীবন চৌধুরী ও অমিয় সেন রচিত কাব্যগ্রন্থ। দাম—এক টাকা। প্রথম কুড়িটি কবিতা জীবন চৌধুরীর লেখা এবং শেষের দশটি অমিয় সেন-এর। উভয় কবিই তরুণ এবং 'দ্বিধা'তেই রসিক-সমাজে ইঁহাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ, সেই কারণেই গ্রন্থটি প্রাথমিক জড়তা ও দোষত্রুটি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারে নাই। তবে ইঁহাদের চিন্তাধারা এবং প্রকাশভঙ্গী অনেক পরিমাণে সুস্থ এবং সাবলীল। কাব্যজগতে বর্তমান অসুস্থতার দিনে কবিদ্বয়ের সুস্থ আত্মপ্রকাশ দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। কবি জীবন চৌধুরী মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছেন, তা ছাড়া ইঁহার কয়েকটি কবিতা আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। 'উপহার', 'রঙিনমিনার', 'ছবি', 'একতারা' প্রভৃতি চমৎকার কবিতা আমরা একজন নূতন কবির নিকট হইতে বাস্তবিকই আশা করিতে পারি নাই। কবি অমিয় সেনের কবিতাগুলি প্রায় সবই মুখপাঠ্য হইয়াছে; ভাব এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়াও 'চাতকী' 'এমনি সন্ধ্যা হবে' প্রভৃতি কবিতা চমৎকার হইয়াছে। তবে অতিমাত্রায় সনাতনপন্থী হওয়াতে এঁর কবিতাগুলিতে একঘেয়েমি দোষ আসিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের মনে হয়, ভবিষ্যতে কবিদ্বয় নিষ্ঠাসহকারে অগ্রসর হইলে তাঁহারা কাব্যামোদীদের পিপাসা অনেকটা মিটাইতে পারিবেন।

বইখানির প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা নামকরণের সংগতি রক্ষা করিয়াছে এবং উভয়ে উভয়ের প্রয়োজনার সমর্থক বলা যাইতে পারে।

সাহিত্য সংবাদ

মধু-মিলন উৎসব

আবৃত্তি, কবিতা, প্রবন্ধ ও সংগীত প্রতিযোগিতা

আগামী ১৯শে মাঘ, শনিবার (ইং ১লা ফেব্রুয়ারী) শ্রীপঞ্চমী দিবসে কবিবর মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি খিদিরপুরবাসী কবিবৃন্দের পুণ্যস্মৃতিকল্পে দ্বাবিংশতি বার্ষিক মধুমিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন করা হইয়াছে। (১) রাধারাণী স্মৃতিপদক (স্বর্ণখচিত), (কেবলমাত্র ছাত্রীদিগের নিমিত্ত), বিষয়ঃ—মেঘনাদ বধ কাব্যে "সরমা" চরিত্র (কবিতা), নিয়মঃ—লেখিকাকে তাঁহার বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের নিকট হইতে স্বকীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া কবিতার সহিত পাঠাইতে হইবে। এই পরিচয়পত্র যেন প্রমাণ করে যে, লেখিকা বাস্তবিক একজন ছাত্রী।

(২) গৌরীরাণী স্মৃতি রৌপ্যপদক। (কেবলমাত্র বালিকাদিগের নিমিত্ত) বিষয়ঃ—আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নিয়মঃ—মধুসূদনের "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী" শীর্ষক কবিতাটি প্রতিযোগিনীদিগকে সভাস্থলে আবৃত্তি করিতে হইবে।

(৩) প্রমদাসুন্দরী স্মৃতি রৌপ্যপদক। (সকলের জন্য) বিষয়ঃ—হেমচন্দ্র রচিত বৃত্র সংহার কাব্যে "চপলা" চরিত্র। (প্রবন্ধ)।

(৪) প্রসাদ স্মৃতিপদক। (রৌপ্য) (সকলের জন্য) বিষয়ঃ—"কবিতীর্থ খিদিরপুর" নামের সার্থকতা। (প্রবন্ধ)।

৫। রামকমল স্মৃতি রৌপ্যপদক। (সকলের জন্য) বিষয়ঃ—সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। নিয়মঃ—গায়ক বা গায়িকাগণকে সভাস্থলে রঙ্গলাল রচিত সঙ্গীতের আলাপ করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীতের বিবরণ ও স্বরলিপি "রঙ্গলাল স্মৃতি সংঘ" ২নং রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে পাওয়া যায়।

(ক) উপরোক্ত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি ১৫ই মাঘ (ইং ২৭শে জানুয়ারী) তারিখের মধ্যে সম্পাদক, মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, খিদিরপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

(খ) আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পরীক্ষা ও নির্বাচনাদি আগামী ১৬ই মাঘ (ইং ২৮শে জানুয়ারী) সন্ধ্যা সাতটা হইতে ৯টার মধ্যে লাইব্রেরী ভবনে নিষ্পন্ন হইবে। প্রতিযোগিগণ তৎপূর্বে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানাদি মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে ভাল হয়। শ্রীশিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃ-সম্পাদক, মধুমিলন উৎসব সমিতি।

বালী সরস্বতী পাঠাগার

বালী সরস্বতী পাঠাগারের উদ্যোগে বালীতে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইতেছে। নরনারীনির্বিশেষে যে কেহ উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবেন ও বালিকাদিগের মধ্যে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে একটি করিয়া রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতায় কোনও প্রবেশ মূল্য নাই। নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ—৩০শে জানুয়ারী। প্রতিযোগিতায় প্রথিতযশা যে কোন লেখকলেখিকার রচিত অংশ আবৃত্তি করা চলিবে। আবৃত্তি নাতিদীর্ঘ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিযোগিতার তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারী, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা সাত ঘটিকার মধ্যে। গত আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার ঐদিনই প্রদত্ত হইবে। নাম পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি-এল, সম্পাদক, বালী সরস্বতী পাঠাগার, ১০৪, দাওনাগাজী রোড, পোঃ—বালী, জেলা হাওড়া।

আদর্শ ভ্রাতৃসমাজ, ভাটপাড়া

তৃতীয় বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী ১৯শে মাঘ সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় উক্ত সমাজগৃহে বাঙলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। চতুর্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য দুইটি বিভাগ হইবে।

পুরস্কারঃ—১ম বিভাগ—[চতুর্দশ বয়স্ক বালকদিগের জন্য] দুইটি রৌপ্যপদক। ২য় বিভাগ—[সকলের জন্য] রৌপ্য কাপ ও তিনটি রৌপ্যপদক।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ২৫শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে অনুসন্ধান করুন। সম্পাদক [পূজা-বিভাগ]—আদর্শ ভ্রাতৃসমাজ, ভাটপাড়া।

"দেশ"এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক **"দেশ"** প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মফস্বলের কাগজ ঐ দিন ডাকে দেওয়া হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাসুল সহ ৬৷৷০ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্য্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্য্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড **"দেশ"** নগদ ৵০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে **"দেশ"** কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	১ মাস	এক সংখ্যার জন্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে **"আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে"** পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে **"দেশ"** কথাটি উল্লেখ করিবেন।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্ম্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৮ম বর্ষ] ১৯শে মাঘ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল Saturday, 1st February, 1941 [১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগ—

সুভাষচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিকভাবে গৃহত্যাগে ভারতের সর্বত্র একটা বিষাদের ছায়া আপতিত হইয়াছে। একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র সম্বল করিয়া শীতের রাত্রিতে অনাবৃত দেহে নগ্নপদে এবং রিক্ত হস্তে কিসের উদ্দেশে তাঁহার এই নিরুদ্দেশ যাত্রা কেহই বলিতে পারিতেছেন না। সুভাষচন্দ্রের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারা জানেন তাঁহার চিত্ত আত্যন্তিকভাবে ধর্মপ্রবণ। দেশের দুঃখ, জাতির দুঃখের একান্ত অনুভূতি তাঁহাকে অনাসক্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মহান্ আদর্শের এই আকর্ষণ এবং তাহার ফলে পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনাসক্তিরই শক্তিতে তাঁহার কর্মময় জীবন উদ্দীপ্ত ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি নির্ভীক যোদ্ধারূপে এবং দুঃসাহসী নেতারূপে এই শক্তিরই প্রভাবে। সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন গীতায় উক্ত কর্ম-সন্ন্যাসের জীবন।

সুভাষচন্দ্র ভগবানের কৃপায় এবং ভগবৎ-শক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় যে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে মানুষ যখন পরিণত হইতে পারে, তখন, এমন একটা শক্তি তাহার ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হয়, যাহাকে পার্থিব কোন শক্তিই রুদ্ধ করিতে পারে না। সুভাষচন্দ্রের জীবনের মূল সূত্র একান্তভাবে বিধৃত ছিল এই আত্মনিবেদনের উপর।

সুভাষচন্দ্রের জীবন সন্ন্যাসীরই জীবন। অতি শৈশবে সন্ন্যাসের যে বীজ তাঁহার অন্তরে উপ্ত হইয়াছিল, নানা প্রতিকূল প্রভাবের মধ্যেও তাঁহার অন্তরে তাহা উপ্ত ছিল, ছিল ঐকান্তিকভাবে এবং গূঢ় ও গভীরভাবে। সন্ন্যাসের অনাসক্তি লইয়া যেখানে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তাহার শক্তি হয় দুর্নিবার। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক জীবনে সেই দুর্নিবার কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে। অহমিকার উপর যেখানে কর্মের প্রতিষ্ঠা, সেইখানে কর্মশক্তি দুর্বল, সতর্ক এবং আপেক্ষিক। আদর্শের নিষ্ঠাজনিত অনাসক্তির মধ্যে থাকে যে আত্মনিবেদনের আনন্দ, কর্মীকে তাহা অনপেক্ষ করে, দুর্জয় করিয়া তোলে। এমন কর্মীর কর্মোদ্যমের তোড়ের মুখে তাঁহার যে উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে প্রকৃতপক্ষে তাহার পশ্চাতে থাকে পরার্থপরতা বা প্রেম। সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছামান এবং শক্ত ব্যক্তিত্বেরও প্রকৃত শক্তি ছিল পরার্থতার উপলব্ধিতে। এমন শক্তি যে জীবনে জাগে, সে জীবন হয় বীরের জীবন, যোদ্ধার জীবন—দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের মধ্যে অবিচল আনন্দসত্তায় অধিষ্ঠিত থাকিবার জীবন। এ জীবন কর্মকে এড়ায় না, রাজনীতির ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না এমন জীবনে, এমন জীবনে যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে রাজনীতির বিরোধ আর তেমন থাকে না। রাজনীতিক সাধনা সেখানে ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বলিষ্ঠ এবং বৈরাগ্যময় এমন জীবনে ধর্মের সাধনাতেই লিপ্ত ছিলেন।

আজ তিনি গৃহত্যাগী; নূতন সন্ন্যাস মার্গের হয়ত তিনি যাত্রী। আমাদের পক্ষে উচ্চতর সেই আধ্যাত্মিক জীবনের সম্যক মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। প্রতীয়মান প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের মান যশ, সুভাষচন্দ্রের জীবনে এইগুলিই যাঁহারা বড় করিয়া দেখিতেছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে মানুষকে ভুল বুঝাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন সুভাষচন্দ্র যে, তাঁহারা নিজেরা যে জিনিসগুলিকে বড় মনে করেন, সেগুলিকে তিনি অন্তরের অপরিসীম বৈরাগ্যে কতখানি উপেক্ষা করিতেন। দেখাইয়া গেলেন, তিনি সেই সব মহতের অপভাষণে আগ্রহশীলদিগকে যে তিনি ঐ সব নিন্দাস্তুতির কিরূপ ঊর্ধ্বে ছিলেন।

যে মহতী ইচ্ছার প্রভাবে মানুষের সমগ্র ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, আমাদের সে সম্বন্ধে কোন উপলব্ধিই নাই। তাঁহারই ইচ্ছাতে সব হইতেছে এবং হইবে। আমরা শুধু এই প্রার্থনাই করিতে পারি যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়চেতা কর্মীর এখনও প্রয়োজন আছে। দ্বন্দ্বময়

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিয়া শক্তিময় বীর্যময় এবং আদর্শের অগ্নিময় প্রেরণা এই সুপ্ত জাতিকে এখনও দিতে হইবে। ভারতের মহাশ্মশানে ফেরুপালের চীৎকার উঠিতেছে; আজ আবশ্যক শব সাধনার। সুভাষচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া মাতৃনাম মহামন্ত্র জপিয়া বাঙালীর শব সাধনাকে সার্থক করুন, আমরা সেই প্রতীক্ষায় থাকিব।

হক মন্ত্রিমণ্ডলের মহিমা—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে উহার কর্মপরিষদের ডিরেক্টার শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি বিবৃতিতে দেশের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে হক মন্ত্রিমণ্ডলের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করা হইয়াছে। হক মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে সব কারণ আছে, দেশবাসীর নিকট সেগুলি অবিদিত নাই। শ্রীযুক্তা মজুমদার অকাট্য যুক্তি সহকারে সেগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। হক মন্ত্রিমণ্ডলের কেরামতি কি দেখা গেল এই কয়েক বৎসরে? জনমত-সমর্থিত মন্ত্রীগিরির দোহাই দিয়া জনমত দলন করাই হইয়াছে তাঁহাদের ব্যবসায়। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার সুযোগ গ্রহণ করিয়া একদিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জোট বাঁধা দল, অপর দিকে শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাদী দলের বলেই এই মন্ত্রিমণ্ডল দেশের বুকের উপর পাষাণের মত চাপিয়া রহিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী একদিন গরীবের ডালভাতের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, এখন গরীবকে কথায় কথায় হাঁকাইয়া দিতেই তিনি সমধিক তৎপর। এই মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে গরীবের কোন সুবিধা তো হয়ই নাই বরং গরীবের উপর করভার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির ফলে নিষ্পিষ্ট হইতে বসিয়াছে। বাঙলার রাজস্ব তিন কোটী টাকা বাড়িয়াছে, কিন্তু দেশের লোকের তাহাতে কোন দিক দিয়াই রেহাই পায় নাই। স্যার সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবাসীর যে অধিকার প্রতিষ্ঠান করেন, মন্ত্রিমণ্ডল তাহা নষ্ট করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইয়া তাহারা বাঙলার সংস্কৃতিকে সংহার করিতে উদ্যত। হাঁ, কেরামতির মধ্যে ইঁহাদের একটা কেরামতি আছে, শ্রীযুক্তা মজুমদার তাঁহার বিবৃতিতে সেটি অবশ্য উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। প্রধান মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"আপনার মন্ত্রিমণ্ডলীর কৃপায় অনেক মুসলমান ভাল চাকুরী বাগাইয়া লইয়াছেন বটে; কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। অধিকন্তু যে সকল মুসলমান ঐরূপ চাকুরী পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই গুণ বিচারে তাহা পান নাই; পাইয়াছেন মন্ত্রীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে। দরিদ্র অথবা কৃতী মুসলমানের পক্ষে চাকুরী সংগ্রহ করা এখন মোটেই সহজ নহে, বিশেষত যদি সে বাঙালী হয়।"

এই বিবৃতির ফলে মন্ত্রীদের মতিগতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে, আমাদের ইহা বিশ্বাস নাই। এই বিবৃতি মন্ত্রিমণ্ডলের স্বরূপ দেশের নিকট উন্মুক্ত করিয়া সবল এবং সুস্থ জনমতকে জাগাইতে সাহায্য করিবে, সেই দিক হইতেই ইহার যাহা কিছু মূল্য।

শিক্ষা সংস্কারের গরজ—

বাঙলা গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে বিলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বেশই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কমিটি প্রথমেই মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত বিলে পরিকল্পিত শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডটি সরকারী প্রভাবাধীন হইবে এবং সেই সরকারী প্রভাবের পরিণতি কি বিলের কয়েকটি সর্ত বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "এই বিলে সর্বত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত বিভাগগুলির উপর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ ব্যবস্থা এবং পাঠ্যবিধি ও পাঠ্য-তালিকা রচনার ভার ন্যস্ত থাকিবে, সেখানেও সাম্প্রদায়িক নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই বিলের দ্বারা বাঙলা সরকার বাঙলার জনমতকে পদদলিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কমিটি বলেন, যাঁহারা এই প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য এত করিয়াছে, সেই বিরাট জনসাধারণের সুদৃঢ় বিরোধিতা সত্ত্বেও বাঙলা সরকার এইরূপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের এমন অধিকার কোনমতেই নাই।" গত ১২ই মাঘ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বিপুল ভোটাধিক্যে কমিটির ঐ রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিমতের পর বাঙলা সরকার, যদি সুবুদ্ধি থাকে, এই বিল প্রত্যাহার করিবেন, আর অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও যদি তাঁহারা আইনসভার জোটবাঁধা ভোটের জোরে নিজেদের জিদ বজায় রাখিতে উদ্যত হন, তাঁহাদিগকে পরিশেষে ঠেকিয়া শিখিতে হইবে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইয়া বাঙালী নিশ্চয়ই নিজেদের সর্বনাশ টানিয়া আনা বরদাস্ত করিবে না।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-মন্দির—

বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অবদান কি, একথা বাঙালীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না এবং ইহাও সত্য যে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় স্মৃতি; তবু আমরা দেশবাসী, সেই হিসাবে আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। রবিবাসর গত ১৩ই মাঘ, রবিবার শরৎচন্দ্রের তৃতীয় স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার জন্মস্থান দেবানন্দপুরে বিশেষ অধিবেশন করিয়া রবিবাসরের সাহিত্যিকমণ্ডলী সেই কর্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার যে

পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সেই মন্দিরের একদিকে একটি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র খুলিবার কথা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সেদিনকার সভায় যে কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই কথার উপর জোর দিয়া বলিব—"এই প্রস্তাব খুবই উপযুক্ত প্রস্তাব। শরৎচন্দ্রের প্রাণের কথা ঐ মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবে। তাঁহার উপন্যাসাদির সর্বাপেক্ষা বড় ভাব হইতেছে অসহায়া নারীর প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত আন্তরিক সহানুভূতি। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় সৃষ্টি তাঁহার নারী-চরিত্র। নারীকে এমন মহীয়ান্ মূর্তি আর কোন লেখক দিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।" স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত তারকচন্দ্র মুখুজ্যে মহাশয় সেদিন সভায় যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, এই স্মৃতি-মন্দিরের জন্য এ পর্যন্ত সাড়ে নয়শত টাকা উঠিয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এজন্য দরকার সাড়ে চার হাজার টাকা। শরৎচন্দ্রের অবদানের তুলনায় সমগ্র বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতির পক্ষে এই টাকা কিছুই নয়। আমরা এই দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙলার পল্লীর প্রাণ-রস যিনি তাঁহা সাহিত্যের ভিতর দিয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মস্থান দেবানন্দপুর বাঙালীর পল্লীতীর্থে পরিণত হউক, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

আগের কাজ আগে—

একঘেয়ে এক কথা বলিতে ভাল লাগে না, তবু ক্ষোভে পড়িয়া বলিতে হয়। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন বর্তমানে বিলাতের 'গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড দি ইস্ট' পত্রের সম্পাদক। তাঁহার কাছে ভারতসচিব আমেরি সাহেব সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে নূতন কিছুই নাই, আছে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মনযোগান সেই মারাত্মক যুক্তি, পরোক্ষভাবে পাকিস্থানী দলের পিঠ-চাপড়ানী। ভারতসচিব বলিয়াছেন, ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা তো ছাড়িয়া দিতে রাজীই আছি; কিন্তু "ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম সর্ত হইতেছে এমন একটা ভারতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যে, ভারতীয় গভর্নমেণ্ট ক্ষমতা গ্রহণ করিলে অরাজকতা ও ভেদবিভেদ দেখা দিবে না। হাজার হোক, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অতীতের উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতের শান্তি ও মঙ্গলের দায়িত্ব লইয়াছেন এবং সে দায়িত্ব তাঁহারা এমন কোন শাসন-ব্যবস্থার উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন না, ভারতের প্রধান প্রধান সম্প্রদায় যে শাসন-ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করিবে।" কংগ্রেস-প্রভাবিত গভর্নমেণ্টের হাতে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিলে প্রধান প্রধান সম্প্রদায় তাহার বিরোধিতা করিবে, ভারতসচিব ইহা ধরিয়াই লইয়াছেন। এস্থলে যুক্তিও দরকার নাই, প্রমাণেরও আবশ্যকতা তিনি বোধ করেন নাই; অথচ প্রমাণ তাঁহাদের নিজেদের হাতেই ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কাজে নিজেরাই তাঁহারা প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সেই সব মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে প্রদেশে প্রদেশে যে বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা ঘটিয়াছে, একথা কেহই বলিতে পারিবেন না। প্রকৃত মতলব হইল ক্ষমতার হস্তান্তর না করা, বড়লাটের শাসন-পরিষদে কয়েকটি চাকুরী বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, তোমরা ভারতের নেতারা তাহা লইয়াই কৃতার্থ হও। ভারতসচিব তাঁহার উপদেশের ভিতর দিয়া আগের কাজ আগে, এই নীতির ঔচিত্য আমাদিগকে সমঝাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই কথার উত্তরে আমরাও বলি, জগতের গণতান্ত্রিকতার জন্য, বিশ্ববাসীর স্বাধীনতার জন্য তোমরা সর্বস্ব পণ করিতে বসিয়াছ, এই সব বড় কথা বলিবার আগে নিজেরা গণতান্ত্রিকতার মর্যাদা দেখাও নিজেদের কাজে। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের ছেঁদো যুক্তি অন্যের বিরুদ্ধে খাটিতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খাটে না। কংগ্রেস ভারতের সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। গণতন্ত্রের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি আমেরি সাহেব এবং তাঁহার সতীর্থ দলের যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্তত এই ধরণের বিরক্তিকর বিবৃতি হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতাম।

দুর্বলের সংস্কৃতির মূল্য—

গত ২৭শে জানুয়ারী কলিকাতার শিবনাথ মেমোরিয়াল হলে জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন,—"বর্তমান ইউরোপের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রকৃত সংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝায় সে বস্তু সেখানে নাই, যদি তাহাই থাকিত, তবে এমন লোকক্ষয়-কর সংগ্রাম সেখানে ঘটিত না। ভারতবর্ষ যেন তাহার অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতি না হারায়। আমাদের পক্ষে খুবই সঙ্কটময় কাল যাইতেছে সন্দেহ নাই। গুরুতর রকমের একটা চাপ আসিয়া পড়িতেছে আমাদের উপরে; কিন্তু আমরা যদি একটু আত্মপ্রত্যয়শীল হই, তাহা হইলে বৈদেশিকতার যে প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে বিচ্ছেদ এবং বিরোধের কারণ ঘটাইতেছে, আমরা এখনও তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইব, আমি ইহাই বিশ্বাস করি।" বিচারপতি বিশ্বাসের মত আমরাও সমর্থন করি। আমাদের কথা এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কৃতি না আছে, এমন নয়, কিন্তু দুর্বলের সহিত প্রবলের যেখানে সংস্পর্শ সেখানে প্রবলের ভিতরকার অনুদার এবং হীন বৃত্তিগুলিই ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায়, তাহার সংস্কৃতি সেখানে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। পরকীয় প্রভাবের অনিষ্টকারিতা হইতে ভারতকে যদি আত্মরক্ষা করিতে হয় এবং নিজের সংস্কৃতিকে বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে আগে তাহাকে সবল হইতে হইবে এবং স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ দুর্বল থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত পরকীয় প্রভাবের ভেদবিভেদজনক অনিষ্টকারিতা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় তাহার নাই। দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় পাপ, দুর্বলের সংস্কৃতির মূল্য শুধু অতীতের সূত্রগতই থাকিয়া যায়। শুধু ইহাই নয়, দুর্বল প্রবলের মধ্যে হীন প্রবৃত্তি জাগাইয়া তাহারও পাতিত্য ঘটাইয়া ছাড়ে।

বাণী বন্দনা

বাঙলার কবি গাহিয়াছেন,—"ছন্দে উঠে শশী রবি।" মানুষের জীবনে রসানুভূতি একটা ছন্দ রহিয়াছে এবং সেই ছন্দের সঙ্গে বিশ্বের ছন্দকে মিলাইয়া লওয়াই হইল বিদ্যা। এই বিদ্যা লাভ করিতে পারিলে মানুষ সকল সন্দেহ এবং সংশয়ের অতীত সত্যকার আনন্দময় পরম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষের জীবনে আর ভেদ বা বিরোধ থাকে না, সর্বত্র অবাধ এবং অখণ্ড আত্মীয়তাকে সে করে উপভোগ। ভারতের ঋষিদের মতে এই বিদ্যাই হইল পরমা মুক্তির হেতুভূতা এবং সনাতনী। তিনিই মেধা সরস্বতী এবং বরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানস্বরূপিণী।

ভারতের ঋষিরা মানব জীবনকে বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং ঝঙ্কৃত সেই ছন্দোময় এবং অমৃতময় সত্তার সঙ্গে যুক্ত করিবার পথ দেখাইয়াছেন এবং সেই গান গাহিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, চিত্তকে ছন্দায়িত করিয়া বিশ্বের সুরে মিশাইয়া দেওয়াতেই প্রেম এবং সেই প্রেমই পরমপুরুষার্থ। বাঙলার বৈষ্ণব কবি মাধুর্যের রসে বিগাঢ় করিয়া বলিলেন, তাহাই "মাধবিকা-মধু-মধুরিম-স্বারাজ্য" অর্থাৎ স্বাধীনতা।

বসন্তের প্রথম সমাগমে বাণী বন্দনায় বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবের অন্তর্নিহিত ছন্দেরই সংযোগের প্রয়াস রহিয়াছে। বাণীর অর্চনার ভিতর দিয়া রহিয়াছে আনন্দময় অমৃতলোকে যাইবারই ইঙ্গিত। বিদ্যারূপিণী বাণীর আরাধনা সেই স্বরাজ লাভেরই জন্য—যেখানে সর্বং আত্মবশং সুখং।

সেই যে স্বরাজ, আধ্যাত্মিক সে জিনিষ, ইহা সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক জিনিষ হইলেও পার্থিব স্বরাজ্য বা স্বাধীনতার সহিত তাহার যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। যাহারা এইখানে পার্থিব মুক্তির আস্বাদ পায় নাই, পরমা মুক্তির কল্পনাও তাহারা কোনদিন করিতে পারে না। যে অযোগ্যতা, যে দুর্বলতার জন্য জাতি পার্থিব অধীনতার মধ্যে পতিত রহিয়াছে, সেই অযোগ্যতা সেই দুর্বলতা অন্তরে লইয়া পরমা মুক্তির হেতুভূতা বাণীর বন্দনারও সে যোগ্যতা লাভে অধিকারী নহে। পরাধীন জাতির পক্ষে আধ্যাত্মিকতা বা বিশ্বপ্রেমের বড় বড় কথা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। পরাধীনতার হেতুভূত অবিদ্যা, সঙ্কীর্ণতা এবং ইতর আসক্তি অন্তরে লইয়া হে ভক্ত, তুমি ব্রহ্মবাদিনী বাণীর আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইবে ইহা মনেও স্থান দিও না। বিদ্যার আবহাওয়া পরাধীনতার আবহাওয়া নয়, স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসেই প্রকৃত বিদ্যার বিকাশ হইয়া থাকে। পরাধীন দেশে বিদ্যা নাই, পরা বিদ্যা ত দূরের কথা। দাসত্বের শৃঙ্খল কণ্ঠে জড়াইয়া বাণীর মন্দিরে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।

পরাধীনতায় হয় মানুষের আত্মার সর্বাঙ্গীন সঙ্কোচ এবং সেই সঙ্কুচিত এবং কুণ্ঠিত জীবন লইয়া মাধবিকা-মধু-মধুরিমা মাখা মায়ের পাদপদ্ম পূজা করা যায় না। আর সে পূজার প্রথম উপচার স্বাধীনতা যে জাতির জীবনে নাই, **মানুষের সকল মহিমা হইতে বঞ্চিত হইয়া সে** জাতিকে পশুর আড়ষ্ট জীবনই বহন করিতে হয়। পরাধীন ভারত আজ সেই পশুর জীবনই বহন করিয়া চলিয়াছে। এখানে বসন্তের বাতাস বহে না, ফুল ফুটে না, কোকিল ডাকে না। কোটী কোটী মানুষ জীবনের গোণা দিন কয়েকটা গতানুগতিকতার মধ্যে কাটাইয়া এদেশে মরে, মরে পোকা মাকড়েরই মত।

বসন্তও আছে বাসন্তী পঞ্চমীও আছে, কিন্তু পরাধীন আমরা আমাদের জীবনে পঞ্চমী আছে শুধু পাঁজিকায়। জীবনে বসন্তও যেমন নাই, তেমনই মাধবিকার মধু স্পর্শও নাই। ভারতবাসীর অন্তরের তারে আর বাসন্তী প্রকৃতির সুর বাজে না, ছন্দোময় অমৃতময় অক্ষরে পত্রে পুষ্পে পল্লবে প্রেমের ঊর্মিমালার উন্মিলন ঘটে না এখানে—নীরব রবাব বীণা মুরজ, মুরলী। পরাধীনতার পশুসুলভ সুখে অভিজাতের বিলাস-কক্ষে রাগিণীর যে কৃত্রিম আলাপ এখানে শুনি তাহাকে মর্মান্তিক আর্তনাদ ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া চলে না। মায়ের সাধনার রস যে একটু জীবনে লাভ করিয়াছে, সে আর্তনাদ তাহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়াই তোলে, তাহার তীব্রতা তাহাকে আঘাতই করে।

চির লাবণ্যময়ী বাণী। চির তরুণ তাঁহার উপাসকরা। তরুণের পূজাই তিনি চাহেন এবং তরুণের পূজাই গ্রহণ করেন। বাঙলার তরুণগণ, করিতে চাও কি তোমার মায়ের পূজা? যদি তাহাই চাও, শূন্য মন্দিরে আগে মাকে আনিয়া বসাও। আগে ঘুচাও জাতির পার্থিব পরাধীনতাকে। যদি সেজন্য তোমাদের প্রাণে আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়া না উঠে তাহা হইলে ভারতীর পূজার কথা বলিও না। স্বাধীনতার মুক্ত আকাশতলে মায়ের মহিমা লহর তোলে, তাঁহার চরণপদ্মে প্রেমোর্মি খেলে, আর সাধক সেই চরণ-পদ্মের মধুমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া গান গায়। সে গান ছড়ায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র, সে গীতি ধ্বনিত হয় গ্রহে নক্ষত্রে, পত্রে পুষ্পে এবং আড়ষ্টতা কাটিয়া সর্বত্র সঞ্চারিত হয় স্বচ্ছন্দতা। সঞ্জীবনী সেই সুরের ঝঙ্কারে জাতি আপনার সত্তাকে লাভ করিয়া বিশ্বের আনন্দমেলায় অংশীদারী করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। বিশ্বের দরবারে অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত হে আমার পতিত জাতি, আগে মায়ের পূজার অধিকার অর্জন কর স্বাধীনতার সাধনায় অতন্দ্রিত জীবনে একান্তভাবে নিষ্ঠিত হইয়া। বাসন্তী পঞ্চমীর এই পুণ্য তিথি, সেই স্বাধীনতার সাধনায় সর্বস্ব পণ করিতে যদি তোমাকে প্রণোদিত করে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে এই তিথি সার্থক হইবে। স্বাধীনতাই সরস্বতীর স্বরূপ। স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাবদানে যদি আজ প্রস্তুত হইতে পার তবে তোমার মঙ্গল ঘট বসান সার্থক হইবে, সার্থক হইবে পুষ্পে বিল্বদল এবং চন্দন চয়ন। যদি স্বাধীনতার জন্য সে তাপবোধ না পাও অন্তরে, পশুসুলভ জীবনই যদি ভাল লাগে 'তবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিছে মঙ্গল কলস।'

আবিসিনিয়ার স্বাধীনতার আশা

আবিসিনিয়ার রাজ্যচ্যুত সম্রাট হেল সেলাসী গত ১৫ই জানুয়ারী একখানা ব্রিটিশ বোমাবর্ষী উড়ো জাহাজযোগে পুনরায় আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন। হাবসী স্বদেশ প্রেমিকগণ সম্রাটকে সংবর্ধনা করেন এবং সম্রাট হাবসীদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ইতালির সঙ্গে আবিসিনিয়ার যখন সংগ্রাম হয়, তখন আবিসিনিয়া প্রকৃত পক্ষে লড়াই চালাইতে পারে নাই, সমরোপকরণ এবং তোড়-জোড়ে সকল দিক হইতে শত্রুপক্ষের অপেক্ষা হীন ছিল। অধিকন্তু ইউরোপের সাম্য, প্রেম এবং মৈত্রীর বড় বড় কথা যাহারা এখন বলিতেছেন তাঁহারা তখন কার্যতঃ আফ্রিকার এই কালা আদমীদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই; পক্ষান্তরে মুসোলিনীর মর্জিই মিটাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বর্তমান যুদ্ধ বাধিবার পর, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই কালা আদমীদের দিকে কিঞ্চিৎ পড়িয়াছে এবং কিছুদিন হইল তাঁহারা আবিসিনিয়ার সেনা বাহিনীকে সময় শিক্ষাদান করিতেছিলেন। ইতালি আবিসিনিয়া দখল করিবার পর যে সব স্বদেশ প্রেমিক আবিসিনিয়াবাসী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সুদান প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, প্রধানত তাহাদিগকে লইয়া এই বাহিনী গঠিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে সম্রাট হেল সেলাসি এই সৈন্যদলকে পরিদর্শন করেন এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট এই আশা প্রকাশ করেন যে, অচিরেই তিনি স্বদেশে প্রবেশ করিবেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবেন।

আবিসিনিয়ার সীমান্ত হইতে কিছু দূরে সুদানের সীমানায় ক্যাসালা দুর্গ অবস্থিত। ইতালী এই কেল্লাটি দখল করিয়াছিল এবং এই আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছিল যে, আবিসিনিয়া হইতে ইতালীয় বাহিনী এই ক্যাসালার পথে সুদানে প্রবেশ করিবে। ক্যাসালার সামরিক গুরুত্বের একটি কারণ বিশেষভাবে আছে। ক্যাসালা হইতে সুদান বন্দর পর্যন্ত একটি ছোট রেল লাইন আছে। এই রেল লাইন সুদানের রাজধানী খার্তুম পর্যন্ত গিয়াছে। ইতালি ক্যাসালা অধিকার করাতে সুদান বন্দর হইতে খার্তুমের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। মিশর এবং আরব সাগরের তীর হইতে খার্তুমে সাহায্য পাঠান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। মিশরের পথটা খোলা ছিল বটে ; কিন্তু সে পথ ছিল অনেকটা মরুভূমির ভিতর দিয়া একটু লম্বা রাস্তা। ব্রিটিশ সেনাদল ইতালীয় সেনাদিগকে হারাইয়া দিয়া ক্যাসালা দখল করিয়াছে, ইহার ফলে আবিসিনিয়ার উপকণ্ঠভাগে শত্রুর সহিত সম্মুখীন হইবার অনেক সুবিধা ইংরেজ সেনাদল পাইয়াছে। সুদান বন্দর হইতে সোজাসুজি রেল পথে সাহায্যার্থী সেনা এবং রসদপত্র এখন ঐ অঞ্চলে পাঠান চলিবে। ব্রিটিশ সেনাদল বর্তমানে এরিত্রিয়া এবং আবিসিনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে
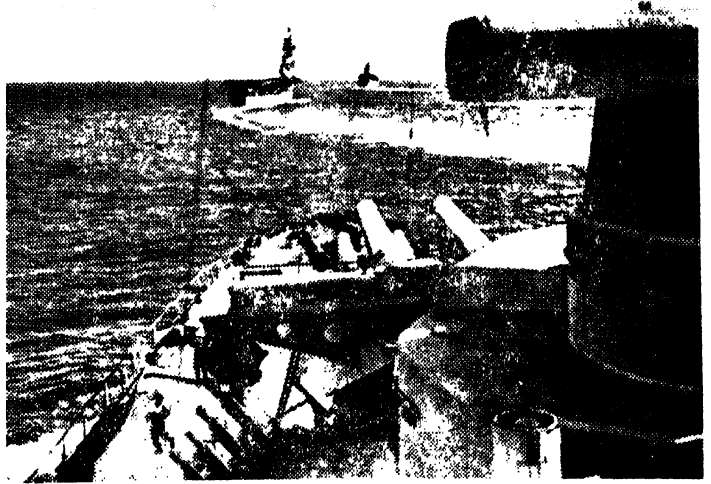
ভূমধ্যসাগরে বৃটীশ রণতরী

এবং ইতালীয় সেনাদিগকে হঠাইয়া দিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

ক্যাসালার পতনের সামরিক গুরুত্ব ইতালিও অস্বীকার করিতে পারিবে না। ক্যাসালা ছাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা যখন বাধ্য হইয়াছে; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আক্রমণাত্মক মতিগতি তাহাদের এখন আর নাই এবং তাহারা এরিত্রিয়া এবং আবিসিনিয়ার ঘাঁটীগুলি এইভাবে ব্রিটিশ আক্রমণের পক্ষে যে উন্মুক্ত করিয়াছে, ইহাতে তাহাদের উৎসাহহীনতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এরিত্রিয়া এবং আবিসিনিয়ার আন্দাজ ৫০ কি ৬০ হাজার সেনা আছে, আর আছে উহার দ্বিগুণ সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসীদিগকে লইয়া গঠিত সেনা। লিবিয়ায় ইতালীয়দের পরাজয়ের পর এরিত্রিয়া এবং আবি-সিনিয়ার ইতালীয় বাহিনীর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। প্রধানত আবিসিনিয়াস্থ ইতালীয় বাহিনীর ভরসা ছিল লিবিয়া হইতে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির সেনাদলের সাহায্য ; কিন্তু সেই সেনাদলের সাহায্য পাইবার সূত্র একপ্রকার ছিন্ন হইয়াছে বলা যায়। উড়োজাহাজের সাহায্যে চোরাগোপ্তা খবরাখবর পর্যন্ত কোন রকমে ইহাদের মধ্যে চলিতে পারে। তারপর লিবিয়ায় মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির সেনা-দলের অবস্থা বিপজ্জনক, ইংরেজের আক্রমণে তাহা-

দিগকে হটিয়া যাইতে হইতেছে। গ্রীসের লড়াইয়ের ধাক্কা সামলাইতেই মুসোলিনীর বাহিনী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ রণতরী বহরের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া এমন ক্ষেত্রে লিবিয়ায় সেনা সাহায্য পাঠান তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় আবিসিনিয়ায় ইতালির যে বাহিনী আছে, ক্রমেই তাদের উপর বেশী চাপ পড়িতে আরম্ভ করিবে। চাপ পড়িবে কয়েক দিক হইতে। সুদান হইতে ব্রিটিশ বাহিনী এরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ওদিকে দক্ষিণে ইতালির যে সেনাদল কেনিয়ার মধ্যে ঢুকিয়াছিল, তাহারাও দক্ষিণ আফ্রিকার সেনা বাহিনীর

হাইলে সেলাসী

চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কেনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত ময়েলের কেল্লার দিকে হটিয়া আসিতেছে। সুতরাং উত্তর এবং দক্ষিণ দুই দিক হইতেই আবিসিনিয়াস্থ ইতালীয় বাহিনীর উপর চাপ পড়িতেছে।

ইহা ছাড়া ইতালির বিরুদ্ধে আফ্রিকার সামরিক সঙ্কট আরও নানা দিক হইতে পাকিয়া উঠিতেছে। আবিসিনিয়ার দক্ষিণে হইল কেনিয়া এবং কেনিয়ারই পশ্চিম দিকে বেল-জিয়াম অধিকৃত কঙ্গো দেশ, কঙ্গোর পশ্চিম দিকে ফরাসী অধিকৃত ইকুইটোরিয়াল আফ্রিকা। পাঠকগণ মানচিত্রে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন, কেনিয়ার পাশে ভারত মহাসাগর, ওদিকে পশ্চিমে ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার পাশে দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর, এই যে প্রকান্ড অঞ্চল, এই প্রকান্ড অঞ্চল আজ ইতালির বিরুদ্ধে সাড়া দিয়া উঠিতেছে। ফরাসী অধিকৃত ইকুইটোরিয়াল আফ্রিকার পদ প্রদেশ বহু পূর্বে ডি গলের স্বাধীন ফরাসী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে এবং এই স্বাধীন ফরাসী বাহিনী লিবিয়ার মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়া এখন লড়াই করিতেছে। বেলজিয়াম আজ জার্মানির পদানত; কিন্তু স্বাধীনতার বেদনা কোন জাতিই সহজে ভুলিতে পারে না। বেলজিয়াম অধিকৃত কঙ্গোর ফরাসী রাজপুরুষ এবং সেনানীগণ এখনও দেশের স্বাধীনতাই সমর্থন করিতেছেন। কিছুদিন হইতে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবী শহরে বেলজিয়ামের উপনিবেশ সচিবের সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বৈঠক চলিতেছে। বেলজিয়াম অধিকৃত কঙ্গো আফ্রিকাতে জার্মান-ইতালীয় অগ্রগতিতে বাধাদানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। নাইরোবী বৈঠকের ফলে কঙ্গোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইংরেজের যদি চুক্তি বা কোন রকম মীমাংসা হয় তাহা হইলে দক্ষিণ দিক হইতে আবিসিনিয়ার ইতালীয় বাহিনীকে বিপন্ন হইতে বেশী দেরী লাগিবে না। অষ্ট্রেলিয়ার সেনাদল যেমন লিবিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে, সেইরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাদলও মিত্র রাজ্যসমূহের অনুকূলতা লাভ করিয়া আবিসিনিয়ার ভিতর গিয়া ঢুকিবে।

সম্রাট হেইল সেলাসীর শাসনাধীনে আবিসিনিয়ার হাবসীরা যে খুব ভাল ছিল, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু স্বাধীনতা হারাইবার ক্ষতি কোন জিনিসের দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না। স্বাধীনতার আবহাওয়ায় কু-শাসনও ভাল, কিন্তু পরাধীনতার তথাকথিত সু-শাসনও জাতির উন্নতির সহায়ক হইতে পারে না। আবিসিনিয়ায় হাবসীরা দীর্ঘ দিন হইতে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার নিরিখে তাহারা সভ্য খুব না হইলেও তাহারা স্বাধীতা-প্রিয় জাতি। ইতালি আবিসিনিয়া অধিকার করিবার পরও হাবসী দেশের দুরধিগম্য অঞ্চলসমূহে থাকিয়া স্বদেশপ্রেমিক হাবসীরা ইতালির বিরুদ্ধে চোরা গোপ্তা লড়াই চালাইয়া আসিতেছিল। হারার প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় শহর ছাড়া আবিসিনিয়ার অভ্যন্তর ভাগে ইতালি এ পর্যন্ত ষোল আনা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। একটা জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পরকীয় প্রভাবের মহিমা জাতির জনসাধারণের মধ্যে ঢুকান সহজ ব্যাপার নহে। হাবসীদের ন্যায় আধুনিকতার সংস্রব বিবর্জিত জাতির মধ্যে তো সে অসুবিধা বিশেষভাবে রহিয়াছে। আবিসিনিয়ার সর্দারগণ বিদ্রোহ অবলম্বন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই রহিয়াছে, একবার ইংরেজের অনুকূলতা যদি তাহারা পায়, তাহা হইলে হাবসী দেশের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। এ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা বিশেষভাবে কাবু ছিল অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে, এখন কেনিয়ার সীমান্ত হইতে এবং অন্য দিকে সুদান ও এরিত্রিয়ার সীমান্ত হইতে তাহারা ইংরেজ পক্ষের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য পাইবে এবং সাহায্য পাইবে সমর কৌশলের। আবিসিনিয়ার অভ্যন্তর ভাগে থাকিয়া এই সব চোরা গোপ্তা বাহিনী ইতালীয় বাহিনীর গতিবিধিকে সঙ্কটজনক করিয়া তুলিবে। রসদ-পত্র সরবরাহের সূত্রকে ছিন্ন করিয়া দিবে। সম্রাট হেইল সেলাসীর আবিসিনিয়া প্রবেশ হাবসী দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসীদিগকে যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়া তুলিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গত জুলাই মাসে কয়েকজন ইংরেজ সেনানী সুদানের সীমানা অতিক্রম করিয়া আবিসিনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেন। ইঁহারা খচ্চরের পিঠে করিয়া অস্ত্রশস্ত্রও লইয়া গিয়াছিলেন। এই সব ব্রিটিশ সেনা হাবসী দেশের ভাষা এবং রীতি-নীতিতে অভিজ্ঞ। ইঁহারা বহু দুর্গম পথ ধরিয়া ৪ শত

বা ৫ শত মাইল অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন এবং হাবসীদিগকে শিক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতালির কর্তৃপক্ষ এই দলের খবর না পাইয়াছিলেন ইহা নহে; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা এই গুপ্ত দলের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। টানা হ্রদের কাছে পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে এই সেনাদল যখন অবস্থান করিতেছিল, তখন ইতালির বিমান হইতে দলের গুপ্ত ঘাঁটির কাছে একবার একটা বোমা পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহাতে দলের কোন ক্ষতি হয় নাই। হাবসীদের সাহায্য পাওয়াতেও এই দল হাবসী দেশে গুপ্তভাবে বিদ্রোহ জাগাইবার কাজ চালাইতে সমর্থ হয়। এই সেনানী দল হাবসীদিগকে আধুনিক কেতায় সমর চালাইবার নীতি শিক্ষা দিতেছেন। বলা বাহুল্য, হাবসীদের স্বাধীনতার জন্য এই সব ইংরেজ সেনানীদের গরজ নয়, গরজ হইল শত্রুপক্ষ ইতালিকে কাবু করা। লড়াইয়ের সময় প্রত্যেক শক্তি যেমন নিজের প্রতিপক্ষের প্রভাব ক্ষুন্ন করিবার জন্য গুপ্ত নীতি অবলম্বন করে ইংরেজও এক্ষেত্রে সেই নীতিই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে হাবসীরা যদি অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয় এবং তাহার বলে এই সুযোগে নিজেদের স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তবে তাহাই হইবে তাহাদের পক্ষে লাভ। এইভাবে নিজেরা শক্ত হইয়া যদি তাহারা স্বাধীনতা পাকা করিতে একবার পারে, তাহা হইলে অপরের পক্ষে তাহাদের সে স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা তেমন সহজ হইবে না। অপর পক্ষ যদি দেশ অধিকার করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিত, তাহার বিশেষ কোন মূল্য থাকিত না; কিন্তু এই যে শিক্ষালাভ, এই যে সংগঠনের শক্তি এবং স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা ইহার যে মূল্য তাহাই প্রকৃত মূল্য। উদারতার বশে দেওয়া স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়, কারণ যাহারা কৃপা করিয়া দিতেছে তাহারা কাড়িয়াও লইতে পারে। আন্তর্জাতিক এমন অবসরে নিজদিগকে শক্ত করিবার সুবিধা হাবসীরা যদি পাইয়া থাকে, তাহাকেই আমরা বিশেষ মূল্য দিব।

ক্যাসালায় বৃটীশের হস্তে বন্দী ইতালীয় সৈন্যদল।

বহুদিন হইতে কৃষ্ণাঙ্গ জাতির দেশ এই আফ্রিকা সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণক্ষেত্র স্বরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ইতালি ছিল এই শোষণতন্ত্রের বড় একজন অংশীদার; আজ আফ্রিকায় ইতালির এই শোষণতন্ত্রের যদি বিপর্যয় ঘটে, তবে আফ্রিকায় আর একটা যুগ পরিবর্তনের সূচনা হইতে পারে। এবং ইহাও একরূপ সুনিশ্চিত যে, জার্মানি যদি ভূমধ্যসাগরে প্রভাব বিস্তার করিয়া আফ্রিকার উপকূলভাগে ইতালির সাহায্যার্থ আসিয়া না পড়িতে পারে, তাহা হইলে মুসোলিনীর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি আফ্রিকাতে একেবারে এলাইয়া পড়িবে।

মৃত্যু

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

শহরের রাজপথে কর্ম-কোলাহল,
দৌড়য় ট্যাক্সি ও বাস, ট্রাম যায় জোরে,
ধ্বনি প্রতিধ্বনি মিশে শহর চঞ্চল,
ধনী-দরিদ্রের গতি যন্ত্র নীতি ধ'রে।
ব্যাণ্ড বাজে, বাজে বাঁশি বিচিত্র আমোদে,
রেশমী পাঞ্জাবী প'রি কেহ চড়ে গাড়ি,
কেহ পথে-ত্যক্ত অন্ন নিয়ে খর রোদে
কষ্টে ক্ষুধা করে দূর, নাহি তার বাড়ি।

চলিতে পথের পাশে এ কী দেখি চেয়ে
জীবন-প্রবাহ তীরে স্তম্ভটির কাছে
বিশীর্ণ কঙ্কাল দেহ ভিক্ষুণীর মেয়ে,
পরিত্যক্ত দ্রব্যসম মরে' পড়ে আছে।

নগরের বক্ষে প্রাণ-কল্লোলের পারে,
শীর্ণ দেহ বাঁধিয়াছে মহাস্তব্ধতারে।

নদী ও চাঁদ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গভীর রাত্রি,
ঘুমায় যাত্রী,
ভাগীরথী চিকিমিকি;
জোয়ারের জল
ফুলে টলমল
তাই দেখি আর লিখি।
ওপারের আলো
লম্বা জোরালো,
জলে রচিয়াছে থাম;
সে আলোক মাঝে
শিশু ঢেউ নাচে,
লুটোপুটি অবিরাম।
ভাগীরথী-বুকে
ব'সে আছি সুখে,
জেগে থাকি হয় সাধ।
জাহাজের পাশে
ঝুঁকে এসে হাসে
চতুর্দশীর চাঁদ।
ঘুমের আবেশ
হ'য়ে গেল শেষ
চাঁদে হেরি আর হেরি।
চাঁদও নিথর
নয়ন উপর,
আলোকে আমারে ঘেরি'।

ও চাঁদ উজল
সুধা-উচ্ছল
কি কথা বলিবে যেন!
সে ভাষা অতুল
বুঝিতে ব্যাকুল
আমি তা বুঝি না কেন?
জল-মুখরতা,
চাঁদের এ কথা,
পরাণ কেমন করে!
শুয়ে থাকা দায়,
হিয়া উপচায়
দেহের আঁধার ঘরে।
বুঝি এ ধরার
প্রাণ দুর্বার
এই নীর এই নদী।
চাঁদের এ জ্যোতি
আকাশের প্রীতি
তোষে সবে নিরবধি।
নিথর নয়নে
জলের নাচনে
হেরি আর চাঁদে হেরি।
জলে শুয়ে থাকি,
চাঁদ-সুধা মাখি,

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[২০]

অমলের বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসিল। মধ্যে আর একটি রবিবার বাকী, তাহার পরের রবিবারই বিবাহ। ইন্দুকে সে চিঠি লিখিয়াছিল, ইন্দু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া জবাব দিয়াছে, কিন্তু সে বা কমলা আসিতে পারিবে না সে কথাও জানাইয়াছে। কারণ বিভাসবাবুর নাকি ভীষণ বাত বাড়িয়াছে, এখানে দ্বিতীয় লোক নাই, ইস্কুল ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব।

অর্থাৎ একমাত্র তাহার যে বন্ধু যাহার আগমন সে একান্ত-মনে চায়, সে-ও তাহার বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিবে না। বিবাহ সম্বন্ধে যত স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল তাহার সবগুলিই ত প্রায় বাস্তবের রূঢ় আলোকে মিলাইতে বসিয়াছে, শেষটা কি হইবে কে জানে!...ক্রমশ তাহার উৎসাহ যেন কমিয়া আসিতেছে।

শনিবার সে এই কথাগুলিই ভাবিতে ভাবিতে অফিস হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় আর একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। লালবাজারের কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল চীৎপুরের মোড়ের কাছে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন পাটনার ভুবনবাবু। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই ভুবনবাবু একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।—এই যে বাবা অমল। কেমন আছ, কি করছ আজকাল! তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। ইস্কুলে কাজকর্মের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই প্রায় তোমার কথা ভাবি। কি যে হ'ল, কেনই বা অমন হঠাৎ চলে এলে কিছুই বুঝতে পারলুম না, ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেও উনি কোন জবাব দেন না, খালি ঘাড় নাড়েন।...তা কি করছ আজকাল।

অমল অফিসের নাম করিয়া কহিল, ঐখানে চাকরী করছি। আপনাদের সব খবর কি? কোথায় এসেছিলেন?

ভুবনবাবু কহিলেন, আমাদের খবর ত মোটের ওপর ভালই ছিল—হঠাৎ—হ্যাঁ, ভাল কথা, জ্যোৎস্নার এই গত বৈশাখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। জামাই বর্ধমানে থাকেন, সরকারী ডাক্তার। ওকে আর উনি কিছুতেই ইস্কুলে যেতে দিলেন না, কাজেই বিয়ের চেষ্টা দেখতে হ'ল। মেয়েদের এমনি বাড়িতে বড় ক'রে রেখে দেওয়া ভাল নয়, বুঝলে না? তা জামাইটিও বেশ মনের মত পেয়েছি—

কথা কহিতে কহিতে যেন খেই হারাইয়া ফেলিয়া ভুবন-বাবু চুপ করিয়া গেলেন। তখন অমলই কহিল, কলকাতায় এসেছিলেন কি ওদের দেখতে?

হঠাৎ যেন আলো দেখিতে পাইয়া ভুবনবাবু কহিলেন, না, ঠিক ওদের দেখতে নয়, ইস্কুলের একটু কাজও ছিল। কতকগুলো সায়েণ্টিফিক্ এপারেটাস্ দরকার কিনা—নিজে দেখেশুনে কেনাই ভাল বুঝলে না, নইলে শুধু ক্যাটালগ দেখে অর্ডার দিলে বড় ঠকতে হয়। আমাদের ওখানকার অন্য সব হেডমাস্টাররা তাই যেন দেন বটে, কিন্তু আমি ও পছন্দ করি না।...হ্যাঁ, কি বলছিলুম, অর্ডার দেওয়া আমার হয়ে গেছে, যাবার সময় একবার বর্ধমানে নেমে মেয়েটাকে দেখে যাব সেই ইচ্ছেই ছিল। সেইজন্য একঘর বাজারও ক'রে ফেলেছি এমন সময় দেখ না এই বিপত্তি!

উদ্বিগ্নভাবে অমল কহিল, কী হয়েছে? কোন অসুখ-বিসুখ—

ভুবনবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, না না, অসুখবিসুখ কেন হবে। ইস্কুল থেকে আমাদের জয়েণ্ট হেডমাস্টার মশাই তার করেছেন যে ক্লাশ টেনের একটি ছেলের সঙ্গে আমাদের পণ্ডিত মশাই-এর নাকি মারামারি হয়ে গেছে।...ছি, ছি, দেখ দেখি বাবা কী কেলেঙ্কারী! পাটনায় আমি কি ক'রে মুখ দেখাব বল দেখি। আমার ইস্কুলে কখনও ত এরকম হয় না।...আমি যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছি!

নিশ্চিন্ত হইয়া অমল কহিল, ও, ইস্কুলের কাজ। তা সে-ত আপনার সোমবার পেঁছিলেই হবে। আপনি আজ বর্ধমানে নেমে কাল সকালেও ত রওনা হতে পারেন।

ভুবনবাবু কহিলেন, সোমবার পেঁছিব? কী বলছ তুমি। আমাকে এই মুহূর্তে যেতে হবে। সে ছেলের গার্জেনের সঙ্গে দেখা ক'রে, পণ্ডিতকে ডাকিয়ে কাল সকালের মধ্যে এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে চলে কখনও?...কালকের মধ্যে স্টেটমেণ্ট তৈরী ক'রে টাইপ করিয়ে মেম্বারদের কাছে পাঠাতে হবে। ছেলেটাকে দিয়ে এ্যাপলজি করাতে হবে, পণ্ডিতের স্টেটমেণ্ট চাই, ওদের আণ্ডারটেকিং চাই—এর ঝামেলা কি কম!...কত বড় দায়িত্ব আমার মাথার ওপর তা ভুলে যাচ্ছ?.. সোমবারের আগে আমাকে ক্লীন হতে হবে যে!

তা বটে! অমল বুঝিল যে একটি কেন, শত কন্যার আকর্ষণও আর তাঁহাকে ইস্কুল হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। সে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, তা বাজার হাটগুলো কি করবেন? সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন?

তাই ত ভাবছি!...সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া বড্ড ঝঞ্ঝাট, তা ছাড়া মেয়েটার জন্যে কিনলুম—

অকস্মাৎ তাঁহার চোখমুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অমলের হাত দুইটা ধরিয়া কহিলেন, একটা উপায় আছে বাবা, যদি তুমি রাজী হও! তোমার ত আজ শনিবার, একবার যদি বর্ধমানটা ঘুরে আসতে পার ত আমার বড্ড উপকার হয়।

কী সর্বনাশ!

অমল ঘামিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার সহিত সাক্ষাৎ করা! সে যে তাহার পক্ষে অসম্ভব! অথচ সে কথা ভুবনবাবুকে বলাই বা যায় কি করিয়া?...এ ধারে যে লোকটি একদিন তাহাকে নিরন্ন অবস্থায় আশ্রয় দিয়া আদর-যত্নেই রাখিয়াছিল তাহার বিশেষ উপকার হয় জানিয়াও চুপ করিয়া থাকা যায় না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সে এমনই বিহ্বল হইয়া গেল যে পাশ কাটাইবার মত একটা কৈফিয়ৎও খুঁজিয়া পাইল না।

ভুবনবাবু তাহাকে বিশেষ অবসরও দিলেন না, তাহার হাতটা ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিলেন, তাহলে সেই কথাই

ভাল। চল, একটা ট্যাক্সি নিই, আমার বাসা থেকে মালপত্র-গুলো তুলে নিয়ে এই চারটের এক্সপ্রেসেই রওনা দিই। কেমন?...তোমার বাসায় কেউ আছে কি, খবর দিতে হবে?

অমল শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পর কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই ভুবনবাবুর পিছু পিছু ট্যাক্সিতে চড়িল. তাঁহার হোটেলে গিয়া তদ্বির করিয়া মালপত্র নামাইল, তাহার পর সেই গাড়ীতেই শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনেও পেঁৗছিল; কিন্তু ভুবনবাবু এমনই প্রবলভাবে তাহার সম্মতিকে অনুমান করিয়া লইলেন যে সে এই সমস্ত সময়টার মধ্যে একবারও তাঁহাকে কথাটা জানাইবার অবকাশ পাইল না যে জ্যোৎস্নার কাছে যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া ঘটনাগুলি এতই দ্রুত ঘটিয়া গেল যে ইহার মধ্যে সে একটা ভাল কৈফিয়ৎও খুঁজিয়া পাইল না।

একেবারে ট্রেনে বসিয়া সে হাঁফ ছাড়িল। অবশ্য ভুবন-বাবু তখনও তাহাকে বিশেষ কিছু বলিবার মত ফাঁক দিলেন না, নিজেই অনর্গল স্কুলের কথা গল্প করিয়া যাইতে লাগিলেন তবে সে দিকে বিশেষ কান না দিয়া ব্যাপারটা একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল বটে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষকালে যখন বর্ধমানের কাছাকাছি গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে স্থির করিয়া ফেলিল যে দূর হইতে কুলীকে বাড়িটা দেখাইয়া দিয়া কুলীটা বাড়িতে ঢুকিয়াছে দেখিয়া সে সরিয়া পড়িবে, জ্যোৎস্নার সহিত দেখা করিবে না। ভুবনবাবুর চিঠিখানা সে কুলীর হাতেই দিয়া দিবে—সুতরাং জ্যোৎস্নার বুঝিতে কিছুই অসুবিধা হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছিয়া এতক্ষণে সে একটু সুস্থ হইল এবং বর্ধমানে গাড়ী পেঁৗছিতে বেশ প্রফুল্ল মুখেই ভুবনবাবুকে প্রণাম করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। মুটের মাথায় মাল চাপাইয়া সে স্টেশন হইতে হাঁটিয়াই চলিল, ভুবনবাবু বাসার ঠিকানা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বাসা কাছেই —খুঁজিয়া বাহির করিতেও দেরী হইল না।

তখন সন্ধ্যার বড় বেশী দেরী নাই, আলো ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সে সাহস করিয়া কাছে গিয়া কুলীকে বাড়িটা দেখাইয়া দিল এবং কি কি বলিবে সে, সে সম্বন্ধে ভাল রকম নির্দেশ দিয়া আবার স্টেশনের রাস্তা ধরিল। দূরে হইতে শুধু চাহিয়া দেখিল যে কুলীটা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়াছে।

কিন্তু একটু পরেই পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিতে হইল, দেখিল একটি ভদ্রলোক তাহাকেই ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়াছেন।

'মাস্টার মশাই! মাস্টার মশাই!'

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তখন জনবিরল, সুতরাং সে 'মাস্টার মশাই' যে অমলই, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র রহিল না। সে দাঁড়াইয়া গেল—এবং ঘামিয়া উঠিল। একটু পরেই ভদ্র-লোকটি হাঁফাইতে হাঁফাইতে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেশ সুশ্রী চেহারা, ঈষৎ স্থূল, বয়স ত্রিশের কাছেই। অমল অনুমানে বুঝিল যে, ইনিই ভুবনবাবুর ডাক্তার জামাতা।

ডাক্তারবাবু ঠান্ডাতেও ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন, ঘাম মুছিতে মুছিতে এবং দম লইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, বাঃ বেশ লোক ত আপনি! কুলীর হাতে মাল-গুলো পাঠিয়ে চুপিচুপি সরে পড়ছিলেন! চলুন, চলুন—

অমল একটা ঢোক গিলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এই জন্যে আপনি ছুটতে ছুটতে এলেন?

না এসে কি করি বলুন! যা কান্ড আপনার। আমি না ছুটলে আপনার ছাত্রীই ছুট্‌ত। সে জানলা দিয়ে আগেই আপনাকে দেখতে পেয়েছিল—

এই ঝাপ্‌সা আলোতেও সে চিনতে পারলে আমাকে? অমল প্রশ্ন করিল।

ডাক্তার সগর্বে জবাব দিলেন, পারবে না? ভারী সাফ চোখ মশাই! কিচ্ছুটি নজর এড়াবার জো নেই—

অগত্যা অমলকে ফিরিতে হইল। চলিতে চলিতে ডাক্তার-বাবু কহিলেন, বলতে নেই মশাই, কিন্তু ছাত্রী আপনার চৌখস্‌ একেবারে! বয়স ত বেশী নয়, কিন্তু একলা এখানে এসে আছে, সমস্ত সংসার ওর হাতে, একেবারে পাকা গিন্নীর মত চারদিকে নজর রেখে চালায়। আমাকে মশাই কিচ্ছুটি ভাবতে হয় না, শুধু টাকাটা এনেই খালাস—

বলিয়া অকস্মাৎ কি কারণে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অমল কহিল, এখানে আপনি একলাই থাকেন বুঝি?

ডাক্তার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কি করি বলুন, আমার আবার বদলীর চাকরী, বাবা-মা বুড়োমানুষ, ওঁদের ঘোরাঘুরি করা পোষায় না। তাছাড়া ছোট ভাইদেরও পড়াশুনোর অসুবিধে হয়। তাঁরা দেশেই থাকেন। ......তা মশাই, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমাদের দেশের অত পাজী লোক ত, কিন্তু যে কদিন ও শ্বশুর-ঘর করেছে তাইতেই সবাই ধন্যি-ধন্যি! বলতে নেই মশাই, স্ত্রীভাগ্যি আমার ভালই! হা-হা-হা!

ভদ্রলোক পত্নীগর্বের উল্লাসে যত স্ফীত হইয়া উঠিতে-ছিলেন, অমল ততই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল—তাহার দুই কান আগুন হইয়া উঠিতেছিল যত লজ্জা যেন তাহারই। শীতকালেও তাহার ভিতরের গেঞ্জি ঘামে ভিজিয়া সপ্‌সপে হইয়া উঠিল।

বেশী দূরে সে যাইতে পারে নাই, সুতরাং শীঘ্রই বাসার কাছে আসিয়া পড়িল। ডাক্তার গলা খাটো করিয়া কহিলেন, আপনি এলেন একরকম ভালই হ'ল, বুঝলেন মাস্টার মশাই! কেন না ভাল-মন্দ কিছু রান্না হবে। ......হা-হা-হা!...... বলতে নেই মশাই, রাঁধে-যা, এতখানি বয়সে আমি অমন চমৎকার রান্না খাইনি। আপনিও খাবেন ত, খেয়ে বলতে হবে যে ডাক্তার যা বলছিল তা ঠিক!

ততক্ষণে তাহারা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না দ্বারের কাছেই অপেক্ষা করিতেছিল, ভিতরে পা দিতেই সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া হেঁট

হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলো লইল। তাহার পর ঈষৎ নীচু গলায় অনুযোগের সুরে বলিল, ছি, ছি, কী লোক আপনি বলুন ত! অমন ক'রে চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলেন যে বড়!.....ভাগ্যিস্ আপনাকে ধরতে পারলে—

কিন্তু অমলের সেদিকে কান ছিল না। সে অবাক হইয়া, এমন কি বোধ হয় একটু অভদ্রভাবেই, জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়াছিল। মাত্র বছর-দুই আগে সে যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল তাহার কি কোন চিহ্নই নাই! এ যেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। যৌবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহাকে যে অধিকতর সুশ্রী দেখাইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, কিন্তু বিস্মিত হইল সে আরও অন্য কারণে। কোথায় গেল তাহার উগ্র ঔদ্ধত্য, কোথায় বা গেল তাহার চাপল্য, এমন একটি সুকুমার সলজ্জ ভাব তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া বিরাজ করিতেছে যে, সেই কল্যাণী মূর্তির দিকে চাহিয়া অমল চোখের নিমেষে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। ডাক্তারবাবু সত্যই বলিয়াছিলেন, যেন কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে রাতারাতি সে বালিকা হইতে নারীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, প্রেয়সী হইবারও পূর্বে সে গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। এই যে কমনীয় শ্রী, এ ত পরিপূর্ণ রমণীত্বেরই আভাস দিতেছে।

বোধ করি তাহার মুগ্ধনেত্রের দিকে চাহিয়াই জ্যোৎস্না সহসা লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।...কী কাণ্ড!

বাড়িটা ছোট এবং একতলা। কতকটা বাংলো মতন। ভিতরের বারান্দায় দুই-তিনটা বড় বড় বেতের চেয়ার পাতা ছিল, সেইগুলি দেখাইয়া সে তেমনি চাপা গলাতেই কহিল, বসুন ঐখানে লক্ষ্মীছেলের মত, আমি হাত-পা ধোবার জল আনছি। চায়ের জল চাপানো আছে, সে বোধ হয় এতক্ষণ ফুটে মরে গেল—সে ত্বরিতলঘু গতিতে নামিয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া প্রদীপ্তমুখে ডাক্তার কহিলেন দেখছেন ত মাস্টার মশাই, আপনার সে ছোট্ট ছাত্রীটি আর নেই—পাকা গিন্নী হয়ে গেছে একেবারে। বলতে নেই মশাই, আদর অভ্যর্থনা-লৌকিকতায় কোথাও এককোঁটা খুঁত পাবেন না।

একজন ঝি উঠানের কোণে কলতলায় বসিয়া কি কাজ করিতেছিল সে তাড়াতাড়ি গাড়ু ও গামছা লইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু জ্যোৎস্না তাহার হাত হইতে গাড়ুটা কাড়িয়া লইয়া কহিল, তুই যা, আলোগুলো সব জেলে দিয়ে চৌকাঠে জলটা দিয়ে দে। আর অমনি শাঁখটা বাজিয়ে দিস, আমার আজ আর সময় হবে না।

সে গাড়ুটা ও গামছাটা বারান্দার ধারে নামাইয়া কহিল, ও হরি, এখনও বুঝি জুতো খোলা হয় নি—

বলিয়াই বিদ্যুৎবেগে, অমল ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার কিম্বা বাধা দিবার পূর্বেই, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া জুতার ফিতা খুলিতে শুরু করিয়া দিল। অমল বিষম বিব্রত হইয়া বাধা দিতে গেল, কিন্তু বাধা দেওয়াও মুস্কিল। স্বামীর সামনে পরস্ত্রীর হাত ধরিয়া টানাটানি করা সঙ্গত হইবে কি না ভাবিয়া না পাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া নিজের পা টাই চাপিয়া ধরিতে গিয়া জ্যোৎস্নার সহিত গেল সজোরে মাথাটা ঠুকিয়া।

জ্যোৎস্না তিরস্কারের সুরে অথচ তেমনি চাপা গলাতেই কহিল, কেন মিছিমিছি ছেলেমানুষি করছেন বলুন ত, চুপ ক'রে বসে থাকুন। দিলেন ত আমার মাথাটা ঠুকে, তারপর শিঙ্ বেরোক্ আরকি!

অগত্যা অমলকে হার মানিতে হইল। ডাক্তারবাবু পরম-পুলকিত হইয়া কহিলেন, কেমন মশাই, জব্দ করেছে ত! হার মানতেই হবে, ও আমি জানতুম। তার চেয়ে চেপে যান্ মশাই, যা বলে শুনে যান্—

জ্যোৎস্না কোপ কটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে। এখন আর এক কাপ চা খেয়ে চট্ ক'রে একটু মাংস কিনে আন দিকি, আর ভাল মিহিদানার অর্ডার দিয়ে এস। 'খাস্-খাস্' তৈরি ক'রে দেয় যেন—

জুতো খোলা হইলে সে গাড়ুটা লইয়া আসিয়া সেইখানেই অমলের পা ধোয়াইয়া দিল, তাহার পর কপালে ঘাড়ে জল হাত বুলাইয়া দিয়া গামছা করিয়া মুখ হাত পা পর্যন্ত মুছাইয়া দিল। অমল বাধা দিতে পারিল না, মনের সঙ্কোচও তাহার যেন কতকটা কমিয়া আসিয়াছিল জ্যোৎস্নার এই মূর্তি দেখিয়া, সুতরাং সে বাধা দিবার আর চেষ্টাও করিল না।

ঘরের ভিতর হইতে স্বামীরই একটি ধোয়া গেঞ্জি আনিয়া অমলের হাতে দিয়া কহিল, যে রকম ঘেমেছেন, নিশ্চয়ই গেঞ্জি ভিজে গেছে, ভিজে জামা এখনকার দিনে পরে থাকলে অসুখ করবে। জামাটা খুলে ওটা ছেড়ে ফেলুন ততক্ষণ, আমি জলখাবার নিয়ে আসি—

এই বলিয়া সে রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ডাক্তার পত্নী-গর্বে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলিয়া অমলের পাঁজরায় একটা খোঁচা দিয়া কহিল, দেখছেন কী সাফ চোখ! নজরে কিচ্ছুটি এড়াবার জো নেই! বেশ আছি দাদা, বুঝলেন, বলতে নেই, আমি নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবিই না, যা করবার আপনার ঐ ছাত্রীই করে।

ঝি সন্ধ্যা দিয়া বোধ হয় জ্যোৎস্নারই নির্দেশ মত ছোট একটা টিপয় সামনে রাখিয়া গেল। একটু পরেই জ্যোৎস্না নিজে একটা ট্রেতে করিয়া দুই ডিস খাবার ও দুই কাপ চা লইয়া আসিয়া পরিপাটি করিয়া সামনে সাজাইয়া দিল। লুচি, হালুয়া, রসগোল্লা, আলু ভাজা, নিমকি আরও কত কি—

ডাক্তার প্রথমেই একটা আস্ত রসগোল্লা মুখে পুরিয়া কহিলেন, সব ঘরে তৈরি মশাই! একটিও বাজারের নয়।

বিস্মিত হইয়া অমল কহিল, কিন্তু এ সব কি যাদুমন্ত্রে হ'ল নাকি?

(শেষাংশ ৪৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সরকারী চাকরীতে বেতনের হার

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

সরকারী চাকরীতে বেতনের ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের গভর্নমেণ্টের পক্ষে অতি জটিল সমস্যা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বেতনের হার ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অল্প। যেখানে যতই দায়িত্বপূর্ণ পদ হউক না কেন, সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার জাতির ক্ষমতার অনুরূপ হয়, তদতিরিক্ত কখনও হয় না। স্বাধীন দেশের রীতিই আলাদা। যাহারা চাকরী করে, তাহারা লাভের জন্য করে না, সন্তানসন্ততি প্রতিপালন অথবা ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য করে না, দেশের সেবার জন্য তাহারা চাকরী করে, তাই তাহারা বেতনের বেলায় ত্যাগ স্বীকার করিতে কাতর হয় না। অল্প বেতনেই সুচারুরূপে কার্য করিতে থাকে। কারণ চাকরীগুলি ত দেশেরই কাজ। তাহারা না করিলে কে করিবে? বিদেশীকে ত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া যায় না। তাই ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বাধীন দেশের লোক প্রসন্ন মনে অল্প বেতনে চাকরী করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের অবস্থা স্বতন্ত্র। পরাধীন দেশে চাকরী অর্থ দাসত্ব। এখানে চাকরী প্রলোভনের সামগ্রী। দাসত্বই যদি স্বীকার করিব, তবে যত পারি আদায় করিয়া লই না কেন, এইরূপ মনোভাব দ্বারা অনেকে পরিচালিত। অধিক অর্থ লাভের আশা আছে সেইজন্য লোকে অন্যান্য কাজ ফেলিয়া চাকরীর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা আছে—উচ্চ বেতন আছে, উপরি পাওনা আছে, তদুপরি মান-মর্যাদা আছে। ভারতে চাকরীর সহিত সেবাবৃত্তির কোন সম্বন্ধ নাই। রাষ্ট্র টাকা দেয়, কিন্তু সেবাপরায়ণ ভৃত্য পায় না, পায় বেতনভোগী কর্মচারী। সেইজন্য ভারতে চাকরী সমস্যা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের বিদেশী শাসকগণ চাকরীকে উপলক্ষ্য করিয়া, উচ্চ নীচ কর্মচারী লইয়া এমন একটা সঙ্ঘ বা গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছে যাহা দুর্নীতি, অবিচার ও অসামঞ্জস্যের জন্য কুখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান চাকরী প্রথা এমন একটা অভিনব অভিজাততন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে যাহা এ দেশের জলবায়ুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। এই আভিজাত্য জন্ম ও শিল্প-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই,—সরকারী চাকরীর যে একটা মর্যাদা আছে তাহারই উপর এই অভিনব আভিজাত্যের ভিত্তি রচিত। ভারতীয় উপাদান লইয়া এমন একটা অদ্ভুত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা কোনও প্রকারেই নিজেদেরকে দেশের সাধারণ স্বার্থের সহিত জড়িত করিতে চাহে না। এই সব চাকরীজীবীরা নিজেদের সুবিধাটাই ভাল করিয়া বুঝে। আর নিজেদের সুবিধাকে যুগ যুগ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহারা সরকারের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে চাহে। তাই ইহাদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব উঠিলেই ইহারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে। এই অভিনব অভিজাত শ্রেণী দেশের স্বাধীনতার চরম পরিপন্থী। দেশের ও সমাজের গঠনমূলক কাজে ইহাঁরা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

প্রত্যেক দেশের গভর্নমেণ্টের ইহা একটা মূলনীতি যে, জনসাধারণের দিবার ক্ষমতা যত থাকে ঠিক তদনুরূপ অনুপাতেই সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার স্থির হইয়া থাকে। জনসাধারণের রাজস্বের একটা প্রধান নীতি এই যে, রাষ্ট্রের অর্থের এমনভাবে বণ্টন ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন তাহাতে সাধারণ করদাতাগণ অধিকমাত্রায় লাভবান হইতে পারে। সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন শাসনকার্যের ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত খরচ না হয়। ইহার জন্য যত কম খরচ হয় ততই দেশের মঙ্গল। এই নীতি পৃথিবীর সর্বত্র অনুসৃত হয়। রাজস্ব নীতির আর একটা মূল কথা এই যে যাহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া আয় করে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অন্য কোন আয় করে, তাহাদের চাকরীজীবীদের আয়ের ব্যবধান এত বেশী যেন না হয়, যাহার জন্য চাকরীজীবিগণ প্রলোভনজনক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। এইভাবে অতিরিক্ত বেতন পাওয়ার জন্য যদি দেশে একটা অভিজাততন্ত্র গড়িয়া উঠে তাহা হইলে তাহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে একটা প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। চাকরীর প্রলোভন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও মেধাবী যুবকদিগকে স্বাধীন ও লাভজনক কিন্তু কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক বৃত্তি হইতে সরাইয়া রাখে এবং অভিনব আভিজাত্যের ছাপ দিয়া চাকরী তাহাদিগকে গভর্নমেণ্টের নিরাপদ পক্ষপুটে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। আমাদের কর্তৃপক্ষ মনে করেন শাসনযন্ত্রগুলিই মূল গন্তব্য স্থান। এগুলি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথমাত্র তাহা তাঁহারা মনে করেন না। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের হার কম কারণ সেখানে ইংরেজগণ সিভিল সার্ভিসকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করিতে চাহেন না। ইংরেজগণ জানেন যে, রাজকর্মচারীদের বেতনের হার বৃদ্ধি করিলে, তাহাদের ও জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি হইবে যে, যাহা পরিশেষে দেশেরই ক্ষতির কারণ হইয়া যাইবে।

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতে রাজকর্মচারীদের বেতনের হার কেন এত বেশী। ভারতে যে সব ব্রিটিশ কর্মচারী আছেন, তাঁহাদের বেতন ভারতীয় কর্মচারী অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার কারণ অতি সাধারণ। সিভিল সার্ভিস চাকরীগুলি সচরাচর অধিক বেতনের পদ। পূর্বে কেবলমাত্র ইংরেজ যুবকগণের জন্যই এই সব পদ নির্ধারিত ছিল। তাঁহারা অল্প বেতনে কাজ করিতে সম্মত ছিলেন না। সুতরাং বেতনের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ যুগে ঐ পদগুলি ভারতীয়দের জন্য মুক্ত। কিন্তু তথাচ মূল পদগুলি, যাহার হাতে আছে চাবি কাঠি, সেগুলি এখনও ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত। সেযুগে সেই যে বেতনের হার বেশী করিয়া ধরা হইয়াছিল, তাহা আর কমান হয় নাই। বড় বড় পদ ব্যতীত অল্প বেতনেরও এমন বহু পদ আছে, যাহা অদ্যাবধি ইংরেজগণের দ্বারাই অধিকৃত হইয়া আছে। দেশী-শ্রম অপেক্ষা বিদেশী-শ্রমের মূল্য যে কিছু বেশী তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যেখানে স্বদেশী শ্রমিক অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের কি প্রয়োজন? রাজকর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয় অপরের পকেটের টাকা হইতে। সুতরাং বেতন কম বেশীর কথা সূক্ষ্মভাবে ভাবিবার কি আবশ্যক? লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন। ঘুষ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে যাহাতে টাকা না লইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পূর্বে সিভিল সার্ভিসদের বেতনের হার বেশী করিয়া ধরা হইয়াছিল। কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ কর্মচারিগণ অসম্ভবরূপ ঘুষ খাইত। তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বেশী বেতনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেযুগের ব্যবস্থা চলিতে পারে না। সেযুগের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, আজ উচ্চপদসমূহে ঘুষের আশংকা খুব কম। কারণ জনমত অবৈধ উপায়ের এত বিরোধী যে দেশময় আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। তাছাড়া ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, উচ্চপদের জন্য ভারতীয় কর্মচারিগণ ইংরেজ কর্মচারী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। আর ভারতীয় কর্মচারীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে উচ্চতর বেতন দিয়া বিদেশী কর্মচারী নিয়োগের কোন মূল্যই নাই। উচ্চবেতন হইলেই যে দুর্নীতি বন্ধ হইয়া যাইবে ইহা কোন কাজের কথা নয়। কারণ অনেক স্থলে তাহা কমে নাই। যে কোন গভর্নমেণ্টের সততা, কার্যক্ষমতা দুইটি সর্তের উপর নির্ভর করে।

(১) কি প্রকার লোককে কর্মচারী নিযুক্ত করা হয় (২) এবং তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয় কি না। সকল দেশেই মেধাবী ও সচ্চরিত্রের লোক রাজকার্যের জন্য সব সময় পাওয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় এই সব লোক সুন্দরভাবেই

সরকারী কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। ইহাদিগকে অনর্থক উচ্চ বেতন দিয়া জনসাধারণের কষ্টোপার্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করা কোন গভর্নমেণ্টেরই উচিত নয়।

বর্তমান জগতে কোথাও ভারতের মত রাজকর্মচারীদের বেতনের হার এত উচ্চ নাই। ভারতে যেমন অভিজাত শ্রেণীর সিভিলিয়ান আছে জগতের অন্য কোথাও সেরূপ নাই। ভারতের সিভিলিয়ানদের কত সুবিধা কত মর্যাদা কত জাঁকজমক—দেখিলে তাক্ লাগিয়া যায়। নিজেদের এলাকায় সিভিলিয়ানগণ ত এক একজন নবাব, অথবা তাহার চেয়েও অধিক। বর্তমানে একজন ব্রিটিশ-জাত আই-সি-এস কর্মচারী চাকরী আরম্ভ করে মাসিক পাঁচশত হইতে ছয়শত টাকা বেতনে। এই বেতন প্রতি বৎসরে হু হু করিয়া বাড়িতে থাকে এবং কুড়ি বৎসর পর দেখা যায় যে সেই পাঁচ-ছয়শত টাকার কর্মচারী মাসিক দুই হাজার ছয়শত পর্যন্ত বেতন পাইতেছেন। এগুলি প্রত্যেক আই-সি-এস'এর ভাগ্যে জুটিবে। এই বেতন ব্যতীত সে ফারলো পাইবে, পেনশান পাইবে, লম্বা ছুটি পাইবে। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানগণ চাকরীকালীন সপরিবারে স্বদেশ যাইবার জন্য চারিবার প্রথম শ্রেণীর যাতায়াতের খরচা পাইবে। পূর্বে নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক আই-সি-এস'কে এক হাজার পাউণ্ডের এ্যানুইটির জন্য তাহার বেতন হইতে শতকরা চারি টাকা দিতে হইবে। এই এ্যানুইটির টাকা অবসর গ্রহণের পর তাহার প্রাপ্য হইত। কিন্তু ইস্লিংটন কমিশন দেখিল যে শতকরা চারি টাকা করিয়া কাটিলে বেচারা আই-সি-এসদের উপর বড় অবিচার করা হইবে। তাই তাঁহারা এই নিয়ম উঠাইয়া দিলেন এবং এ্যানুইটির সমস্ত টাকা ভারতের উপর চাপাইয়া দিলেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, সাধারণ অবস্থায় আই-সি-এসদের বেতন দুই হাজার ছয়শত টাকা পর্যন্ত হয়। কিন্তু ইহাই শেষ সীমা নয়। তাঁহাদের আরও পদোন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ সিভিলিয়ানগণই প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারী হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের বেতন প্রতি মাসে হয়, দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা। ইহা আরও বাড়িতে পারে। বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রায় ৩২০০৲ টাকা বেতন পান। প্রধান সেক্রেটারী এবং রেভিনু বোর্ডের মেম্বরগণ পান ৩৭৫০৲। কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারীগণ প্রত্যেকে পান ৪০০০৲ এবং বড়লাটের কার্যকরী সদস্যগণ পান ৬৬৬৬৲। কোন কোন ভাগ্যবান সিভিলিয়ান আবার প্রাদেশিক গভর্নরের পদ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহাদের বেতন দশ হাজার টাকা হইয়া থাকে। ভারতীয় সিভিলিয়ানগণ এত শক্তিশালী সংঘবদ্ধ দল যে তাঁহারা এইসব সুবিধা ও উপরি পাওনা চিরস্থায়ীভাবে আদায় করিয়া লইয়াছেন। যুগে যুগে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ সরকার দয়া করিয়া শাসন সংস্কার দিতে পারেন, কিন্তু সুবিধাপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানগণ সমানভাবে তাঁহাদের সুবিধা ভোগ করিতে থাকিবেন। কি চাকরী অবস্থায় কি ছুটির অবস্থায়, কি বিদায় অবস্থায়—সকল সময় তাঁহাদের জন্য অশেষবিধ সুবিধা বরাদ্দ রহিয়াছে। কার সাধ্য তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে? ১৯৩৫ সালের ভারত আইনে আই সি এসদের সুবিধার শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পুরাতন সমস্ত সুবিধাগুলিতে আছেই, তাছাড়া আরও কতকগুলি নূতন সুবিধারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমান সুবিধাগুলি অত্যন্ত সুদৃঢ়, কারণ এগুলি পার্লামেণ্ট দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। পার্লামেণ্ট ব্যতীত আর কেহই এ গুলির পরিবর্তন করিতে পারিবে না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সরকারী কর্মচারীদের বেতন জনসাধারণের আর্থিক ক্ষমতার অনুরূপই হওয়া বাঞ্ছনীয়। জগতের অন্যান্য দেশে এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রাজকর্মচারীদের বেতন নির্ধারিত হয়। যদি আমরা ভারতের সহিত অন্য দেশের কর্মচারীদের বেতনের তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব ভারতের মত দরিদ্র দেশে বেতনের হার কত উচ্চ। স্বাধীন দেশে কম হারে বেতন দিয়াও কার্যদক্ষ ও বিশ্বাসী কর্মচারী পায়। আর ভারতে বেশী বেতন দিয়াও সেইরূপ লোক পাওয়া যায় না। কারণ সে সব দেশের কর্মচারিগণ ত আর চাকরী করেন না, করেন দেশের সেবা। আর ভারতের সিভিলিয়ানগণ সুবিধা পাইবার আশায় উচ্চপদ গ্রহণ করেন। জনসাধারণের সামর্থ্যের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? এইবার কয়েকটি স্বাধীন দেশের কর্মচারীদের বেতনের হার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমত ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক। ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অর্থশালী দেশ। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত ইংলণ্ডের তুলনাই হইতে পারে না। এখানে আর্থিক সচ্ছলতা অতুলনীয়। জনসাধারণের আয়ের পরিমাণও ভারত হইতে বহু গুণ বেশী। ব্রিটেনের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১২৪০৲ টাকা। আর ভারতে মাথাপিছু আয় কাহার মতে ৩০৲, আর কাহার মতে ৬০৲। না হয় আর একটু বেশী করিয়াই ধরিলাম ৮০৲। অর্থাৎ ভারতের আয় ব্রিটেনের আয়ের পনর ভাগের এক ভাগ। ব্রিটেনে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহাও ভারতের রাজস্ব হইতে ৮০০ গুণ অধিক। ব্রিটেনে জীবনযাত্রার মানদণ্ড যেমন উচ্চ আয়ও সেইরূপ উচ্চ। কিন্তু ইংলণ্ডের সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে অনেক অল্প। ব্রিটেনে সিভিল সার্ভিসদের সর্বোচ্চ বেতন বার্ষিক ৩০০০ পাউণ্ডের বেশী নয়। কিন্তু এইসব সর্বোচ্চ বেতনের চাকরীর সংখ্যা অতি নগণ্য। যাহারা কোন বিভাগের স্থায়ী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন তাঁহারাই এইসব পদ প্রাপ্ত হন। ব্রিটেনে শাসন বিভাগের পদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ১১৪০ জন। ইহাদের অধিকাংশই মাসিক ৭৭৭৲ টাকা হইতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হন। এত কম বেতন সত্ত্বেও ইংলণ্ডে কেহই অভিযোগ করে না যে, কম বেতন দিলে যোগ্যতম ব্যক্তিকে রাজকার্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতের বেলায় বলা হয় যে, উচ্চ বেতনের প্রলোভন না দেখাইলে যোগ্যতম লোক পাওয়া যাইবে না। জিজ্ঞাসা করি কেন পাওয়া যাইবে না? সেখানে যদি পাওয়া যায়, এখানেও পাওয়া যাইবে। চাই সেইরূপ মনোবৃত্তি। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী, যিনি সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন, অর্ধ জগতের সমস্ত ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত—তিনি বেতন পান আমাদের বড়লাটের বেতনেরও অর্ধেক টাকা। ভারতে রাজস্ব বাবত যে টাকা সংগৃহীত হয় তাহার মধ্যে বড়লাট পান প্রতি হাজারে এক টাকা, আর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পান তথাকার রাজস্বের প্রতি দশ হাজারে এক টাকা। ভারতের বড়লাট তাঁহারই উপরওয়ালা ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা দশ গুণ বেশী বেতন ভোগ করেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ ক্যাবিনেট মন্ত্রিগণ মাসিক বেতন পান ৫৫৫৫৲ টাকা। আর ভারতের বড়লাটের পরিষদের সদস্যগণ পান ৬৬৬৬৲ টাকা। অর্থাৎ ব্রিটিশ মন্ত্রীদের অপেক্ষা কুড়িগুণ বেশী বেতন পান।

অন্যান্য স্বাধীন দেশেও পদস্থ কর্মচারীদের বেতনের হার ভারত অপেক্ষা অনেক কম। ফ্রান্সে মন্ত্রীদের বেতন তুলনায় অনেক কম। সেখানে বিচার বিভাগ ও কার্যকরী বিভাগের বেতনও ভারতের তুলনায় অতি নগণ্য। ১৯২৯ সালে ফ্রান্সে সিভিল সার্ভিসদের বেতনের নূতন হার নির্ধারিত হয়। তদনুসারে বিভিন্ন বিভাগের সিভিল সার্ভিসের বেতন ৭৫৲ হইতে ১১০০৲ পর্যন্ত। জাপানেও বেতনের হার অতি অল্প। জাপানে মাথাপিছু প্রত্যেকের আয় বার্ষিক ১৪৩৲ টাকা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা জাপানের লোকের মাথা-

পিছু আয় শতকরা ৭৫ গুণ বেশী। সাধারণ অবস্থায় জাপানের রাজস্ব ভারত গভর্নমেণ্টের রাজস্ব অপেক্ষা শতকরা ৪০, বেশী। আয়ের ও রাজস্বের মধ্যে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বেতনের দিক দিয়া ভারতকেই অধিক টাকা দিতে হয়। জাপানে উচ্চ শ্রেণীর সিভিল সার্ভিস কর্মচারীর মাসিক বেতন ৬৪, হইতে ৩৩৪, টাকার বেশী নহে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী বেতন পান মাত্র ৬২২, টাকা। ভারতের বহু কাঁচা সিভিলিয়ান উহা হইতে বেশী বেতন পান। জাপানের অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রিগণের মাসিক বেতন ৩৭৫, হইতে ৪৪০, টাকার মধ্যে। উড়িষ্যার প্রধান সেকরেটারীর মাসিক বেতন ২১৫০, টাকা। আর বাঙলার প্রধান সেকরেটারীর বেতন ৫৫৩৩, টাকা। জাপানের অধীনস্থ কোরিয়ার জনসংখ্যা পাঞ্জাবের জনসংখ্যার সমান। কিন্তু কোরিয়ার গভর্নর জেনারেলের মাসিক বেতন মাত্র ৪৪০, টাকা, আর পাঞ্জাবের গভর্নর মাসিক বেতন পান ৮৩৩৩, টাকা, অর্থাৎ কোরিয়ার শাসনকর্তার বেতন অপেক্ষা ১৯ গুণ বেশী বেতন পান। সীমান্ত প্রদেশের গভর্নমেণ্টের প্রধান সেকরেটারীর বেতন বোধ হয় আই সি এস সেকরেটারীদের মধ্যে সবচেয়ে কম। তিনি মাসিক বেতন মাত্র ১৯০০,। কিন্তু তাঁহার বেতনও জাপানের সেকরেটারীদের বেতন অপেক্ষা অনেক বেশী।

এইবার ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মচারীদের বেতনের কথা আলোচনা করিব। ক্যানাডার মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৪০০, টাকা। ইহা ভারতের জনপ্রতি আয় অপেক্ষা ১৭ গুণ বেশী। ক্যানাডার লোকসংখ্যা আমাদের মধ্যপ্রদেশ হইতে কিছু কম। কিন্তু উহার রাজস্ব মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব অপেক্ষা প্রায় ১১ গুণ বেশী। ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী মাসিক বেতন পান ৩৩৭৫,। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে সেখানে গভর্নরের পরিষদের সদস্যদের বেতন উহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকসংখ্যা আসামের সমান। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজস্ব আসামের রাজস্ব অপেক্ষা কুড়ি গুণ বেশী। এই আসাম ভারতের মধ্যে দরিদ্রতম প্রদেশ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী বেতন লন ৩৪৪৪,। নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে আসামের কার্যকরী সদস্যদের বেতন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রীদের বেতন হইতে অনেক বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন কোন অবস্থাতেই মাসিক ১৭৭৭, টাকার বেশী নহে। কিন্তু আসামে দুই হাজার টাকা আড়াই হাজার টাকা বেতন পান এমন কর্মচারীর সংখ্যা অগণ্য।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধনসম্পত্তি ও অর্থগৌরবের কাহিনী বিশ্ববিদিত। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতি বার্ষিক আয় ১৮৪৫, টাকা। ইহা ভারতের আয় অপেক্ষা ২৩ গুণ বেশী। আমেরিকার লোকসংখ্যা ভারতের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। কিন্তু আমেরিকার রাজস্ব ভারত হইতে ৯ গুণ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির মর্যাদা, সম্মান ও আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি আমাদের বড়লাটের প্রতিপত্তি হইতে বহুগুণে অধিক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মাসিক বেতন পান ১৭০৬২, টাকা আর আমাদের বড়লাটের মাসিক বেতন ২১৩৩৩, টাকা। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির পরিষদের সদস্যদের বেতন ৩৪১২, টাকা আর বড়লাটের পরিষদের সদস্যদের বেতন ৬৬৬৬, টাকা। নিউ ইয়র্ক স্টেটের গভর্নরের বেতন ৫৬৮৭,। আর ভারতের মধ্যপ্রদেশের গভর্নর বেতন পান ৬০০০, টাকা। এই দুই প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায়ই সমান। দক্ষিণ ডাকোটা একটি ক্ষুদ্রতম অঞ্চল। ইহার আয়তন দিল্লী প্রদেশের মত। কিন্তু দক্ষিণ ডাকোটার গভর্নরের মাসিক বেতন মাত্র ৬৯২, টাকা আর দিল্লীর চীফ কমিশনারের মাসিক বেতন ৩০০০, টাকা। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন ৪৫৫০, টাকা আর বাঙলা দেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন ৬০০০,।

পৃথিবীর কতিপয় স্বাধীন দেশের রাজকর্মচারীদের বেতনের সহিত তুলনা করিয়া দেখা গেল যে, ভারতের মত দরিদ্রতম দেশের বেতনের হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। ভারতবাসীর সামর্থ্য অতি অল্প। অর্থাভাবে গঠনমূলক কার্যের কোন সুব্যবস্থা হয় না। সাধারণ লোকের আর্থিক দুর্দশার সীমা নাই। এরূপ দরিদ্র দেশে বেতনের হার অতি সামান্য হওয়া উচিত। এত অধিক বেতন দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখি না। কথা উঠিতে পারে, বহু দূরদেশ হইতে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোককে আনান হয়, বেশী বেতন না দিলে চলিবে কেন? উত্তরে আমরা বলিব, শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগে 'ভারতীয়করণ' নীতি অবলম্বন করিলে বিদেশ হইতে মোটা বেতনে বিশেষজ্ঞ আনিবার কোন দরকার হইবে না। উচ্চ উচ্চ পদে ভারতীয়গণকে নিযুক্ত করিলে বেতনের হার নিশ্চয় কমিয়া যাইবে। ১৯৩৯—৪০ সালে ভারতরক্ষার জন্য খরচের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ৫০৫৯৬জন ইউরোপীয়ান কর্মচারী ও সেনাপতিগণ মাসিক ভারতের আট কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন। আর ১৫১৫১২জন ভারতীয় সামরিক কর্মচারিগণ পাইয়াছেন মাসিক মাত্র তিন কোটি ছিয়াট্টি লক্ষ টাকা। এই সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক ইউরোপীয়ান সামরিক কর্মচারী গড়ে বেতন পায় ১৬৩৩, টাকা আর সেইস্থলে ভারতীয় সামরিক কর্মচারী পায় মাত্র ২৪২, টাকা। অথচ কার্যের বেলায় ভারতীয়গণ ইউরোপীয়ান হইতে কোন অংশে কম নহে। এদেশের সামরিক বিভাগকে যদি ভারতীয় করিয়া তুলা হয়, তাহা হইলে ভারতের সাত আট কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। আর সমস্ত বিভাগকে যদি ভারতীয় করা হয়, তাহা হইলে ভারতের পঁচিশ হইতে ত্রিশ কোটি পর্যন্ত টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কংগ্রেস সর্বোচ্চ বেতনের মান যে পাঁচ শত টাকা করিয়াছে, আমরা মনে করি তাহা এদেশের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার অধিক বেতন দিবার ক্ষমতা এদেশের নাই। গভর্নমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগের বেতনের হার কমাইয়া দেওয়া বর্তমান ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্তব্য। বেতন সম্বন্ধে দুইটিমাত্র মূলনীতি আছে। প্রথমত, বেতন এমন হওয়া উচিত, যাহার ভার দেশবাসী বহন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, বেতনের হার এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে কর্মচারিগণ অভাবের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। তাহাদিগকে বড়লোক, কোটিপতি অথবা নবতম আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার জন্য দেশের লোক উচ্চহারে বেতন দিতে পারে না। যাহারা বড়লোক হইতে চায়, তাহাদের প্রশস্ত ক্ষেত্র ব্যবসায়। চাকরী-বাকরী একটা জনসেবামাত্র। জনসেবার কার্যে যাহারা জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, তাহাদেরকেই চাকরী দিতে হইবে। সেইজন্য তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের মত বেতন পাইবে, তদরিক্ত এক পয়সাও ন্যায়ত পাইতে পারে না। আমরা জানি বর্তমান অবস্থায় বেতনের হার কমাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তবুও ইহার জন্য পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে হইবে। এসব বিষয়ে আন্দোলন না করিলে কোন ফল পাওয়া যাইবে না।

একাকী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

এ-শহরে নূতন আসিয়াছি। স্বেচ্ছায় নয়, রাজার ইচ্ছায়। রাজার অতিথি আমি এবং কতকটা সম্মানিত অতিথিই বলা চলে। কারণ, নির্দিষ্ট কোনো অপরাধের অভিযোগও নাই, অথচ স্বেচ্ছায় কোন জায়গায় যাইবার স্বাধীনতাটুকুও নাই। এই শহরের গণ্ডী পার হইয়া যাইতে হইলেই চাই রাজপুরুষের হুকুম।

ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি। একখানি মাত্র পাকা ঘর, তার ওপাশে একটা মাটির দোচালা, তাহাতেই রান্নার কাজ চলে। ভরসার মধ্যে বেহারী। রান্না হইতে সুরু করিয়া সব কাজই সে করিয়া দেয়।

এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিতে ঐ একটি নারিকেল গাছ!

বাড়ির একটু দূরেই খানিকটা প'ড়ো মাঠ। কবে হয়তো সেখানে লোকের বসতি ছিল, কিন্তু সে-সবের চিহ্ন-মাত্র নাই। কতকগুলো বুনো আগাছায় জায়গাটা ভরিয়া আছে, আর সেই আগাছার মাঝখান হইতে বহুদূর পর্যন্ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটিমাত্র নারিকেল গাছ।

আমার ছোট্ট আস্তানাটির যেখানেই দাঁড়াই, সেখান হইতেই ঐ গাছটা চোখে পড়ে। মনে হয়, ও বুঝি তার সজাগ দৃষ্টি লইয়া এই বাড়িটাকে দিনরাত নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

জানালার ধারে তক্তপোষখানিতে পড়িয়া পড়িয়া দিনরাত কেবল ঐ গাছটার পানেই চাহিয়া থাকি। আজকাল কাজের মধ্যে শুধু এইটুকুই। একেই তো বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ আমার একরকম নাই-ই, তার উপর আবার সম্প্রতি কার্বাঙ্কল্ কাটাইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছি। বেহারীর তত্ত্বাবধানের উপর নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে বিছানায় পড়িয়া আছি। আশে-পাশে এলোমেলো দু'চার-খানা বই ছড়ানো। কিন্তু পড়িতেও কেমন ভাল লাগে না। তার চেয়ে যেন ঢের বেশী আনন্দ পাই ঐ গাছটির পানে চাহিয়া থাকিয়া।

বন্ধুরা আমাকে কবি বলিয়া ঠাট্টা করিত, হয়তো আমার অকর্মণ্যতাকে লক্ষ্য করিয়াই। নাহিলে, কবিত্বের বাতিক আমার কোনদিনই তো ছিল না! কিন্তু আজ মনে হইতেছে, আমার শোণিতধারার মধ্যে কোথায় যেন একজন সত্যকার কবি ঘুমাইয়া আছে এবং তাহাকে নিরন্তর হাত-ছানি দিয়া জাগাইতে চাহিতেছে সুবিশাল ঋজুদেহ ঐ নারিকেল তরু।

দিবারাত্রির যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, ততক্ষণ এই জানালার ধারে পড়িয়া পড়িয়া ওর সঙ্গে চলে আমার অফুরন্ত ভাবুকতার দেওয়া-নেওয়া। কল্পনার পাখীটি উড়িয়া চলে কোন্ অজানার-সীমাহীনতার মাঝখান দিয়া।

আজ যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কি? আমি বলিব, ঐ নারিকেল গাছটি। মানুষকে আমরা দেখিয়াছি, সত্যকার সৌন্দর্য বলিতে তার মধ্যে একেবারেই কিছু নাই। কিন্তু ঐ গাছ, পৃথিবীর যত-কিছু সৌন্দর্য, যতকিছু অপরূপত্ব যেন উহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

সামনে নীল আকাশের যতখানি দেখা যায়, তার ভিতর আর একটি বস্তুও নজরে পড়ে না, পড়ে শুধু ঐ নিঃসঙ্গ বনস্পতি। আকাশের নিষ্কম্প নীলিমার বুকে ও তার বড় বড় পাতাগুলি মেলিয়া দিয়া অবিশ্রাম স্পন্দিত—সঞ্চালিত হইতেছে। সুবিশাল নীলসমুদ্রের মাঝখানে প্রকৃতি যেন একটা লাইট্‌পোস্ট খাড়া করিয়া রাখিয়াছে; কোন্ পথ-ভ্রান্তদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে, কে জানে!

ওর পানে চাহিয়া চাহিয়া এম্‌নি আরো কত এলোমেলো কথাই যে মনে আসে! মনে হয়, এই বিশাল সংসারের ভিতর আমিও যেমন নিঃসঙ্গ, বিশাল প্রকৃতির মাঝে গাছটিও তেম্‌নি। এই একাকীত্বই বোধ হয় আমাদের উভয়ের অজ্ঞাতে পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু আমার নিঃসঙ্গতার মাঝে যেমন একটা দৈন্য আছে, ওর নিঃসঙ্গতার মাঝে আছে কেমন যেন গৌরবের একটা সুস্পষ্ট চেতনা। সে যেন সংসারে কাহাকেও চায় না, অথচ সংসার-শুদ্ধ সকলেই যেন তাহার পানে উদ্গ্রীব দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এই উপলব্ধির আনন্দেই সে দিশাহারা।

বেহারী সেদিন বলিতেছিল,—আচ্ছা বাবু, আমাদের এ-সব দেশে নারকেল গাছ হয় না কেন বাবু? ঐ গাছটা দেখুন না কেন, আমরা তখন ছেলেমানুষ, গোবিন্দ খুড়ো ঐ গাছটা পুতেছিল, কত সখ, ভাল নারকেল ফল্‌বে। সে আজ কতদিন হবে? তিরিশ বছরেরও বেশী। তা গাছ অবিশ্যি হ'ল, কিন্তু কোনদিন এতটুকু একটা ডাবও ফল্‌লো না। গোবিন্দ খুড়ো তো কবে ফৌৎ হ'য়ে গেল, আজ তার সে দোচালার চিহ্ন পর্যন্ত নেই, গাছটা কিন্তু ঠিক রয়ে গেল। বরং তাদের মড়া-ভিটের নোনামাটি পেয়ে দশ হাত বাড়াল আকাশ পানে।

মুখে অনেক-কিছু জবাবই ঠেলিয়া আসিল। কিন্তু ও-সব কথা বেহারীকে বলিয়া লাভ কি? ফল দিতে না পারিলেই যে একটা গাছের আর কোন মূল্যে মূলাই থাকিল না, এ যুক্তি ওর কাছে এত প্রবল যে, তার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিকেই সে আমল দিতে পারিবে না। সংসারে কয়জনই বা পারে? নিষ্ফল যে সব দিক দিয়াই নিষ্ফল, ইহার মত অভ্রান্ত সত্য আর কি আছে?

বেহারীর গোবিন্দ খুড়োর ঐ পতিত ভিটার উপর যদি কেউ কোনদিন বাড়ি তুলিতে চায়, তাহা হইলে সর্বপ্রথমেই ঐ একান্ত অকেজো নিষ্ফল নারিকেল গাছটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া কাটিয়া ফেলিতে তার এতটুকু বাধিবে না। হয়তো বাধিত, যদি উহার ঐ ঝাঁকড়া মাথার নীচে কাঁদি কাঁদি হলদে-সবুজ ফল ধরিয়া থাকিত। প্রয়োজনের অতিরিক্তও যে একটা প্রয়োজন থাকিতে পারে, একথা কয়জন বুঝিবে?

কিন্তু, আমার এই জানালার ধারটিতে ঠিক এই জায়গায়

শুইয়া শুইয়া যদি কেহ ঐ গাছটির পানে তাকাইয়া দেখে, তাহা হইলেও ওর অনির্বচনীয় রূপটি চোখে পড়িবে। আকাশে আজ এতটুকু মেঘ নাই, চারিদিকে শুধু নীল আর নীল, গোধূলির শেষ স্বর্ণকণাগুলি ওর পাতায় পাতায় স্পন্দিত হইতেছে। দেখিলে মনে হয়, পশ্চিম আকাশের দিকচক্র-রেখা হইতে স্বর্ণসূর্য তার যা-কিছু গোপন বাণী ঐ বনস্পতির কাছেই গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছে। অনন্ত আকাশ এবং অনন্ত পৃথিবীর আর কোনখানে বুঝি পাত্র খুঁজিয়া মেলে নাই। মানুষের কাছে ঐ গাছটার প্রয়োজন হয়তো না থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির কাছে ও একান্ত প্রিয়। ওর ঐ সুবিশাল অপরূপতার পানে প্রকৃতি যেন দিনরাত চাহিয়া আছে একান্ত নির্ভরশীল একাগ্রতার দৃষ্টিতে, মা যেমন করিয়া চাহিয়া থাকে তার সুপরিণত সন্তানের পানে।

পায়ের ব্যথাটা কয়দিন হইল একটু কমিয়াছে। লাঠি ধরিয়া ধরিয়া রাস্তায় একটু করিয়া চলিতে পারি।

আজ ঘুরিতে ঘুরিতে সেই প'ড়ো মাঠটার উপর আসিয়া পড়িয়াছি। জায়গাটা কি জঘন্য রকমের নোঙরা হইয়া আছে! জায়গাটার চেহারা দেখিলে নারিকেল গাছটার উপরও যেন আর শ্রদ্ধা থাকে না। কিন্তু একবার মাথা উঁচু করিয়া তাকাইলেই মাথা যেন ঘুরিয়া যায়—বিস্ময়ে ও আনন্দে। এমন গাছ আমি জীবনে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কতদূর পর্যন্ত মাথা তুলিয়া আছে! ঠিক যেন আকাশকে স্পর্শ করিবার জন্য তার পল্লব-করগুলি উর্ধ্বে বাড়াইয়া দিয়াছে। আকাশকে স্পর্শ করার স্পর্ধাটাই কি কম? হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে উঠিতে গিয়া কত মানুষ তো মরিতেছে, তবু তাহাদের স্পর্ধাটাই তো অমরত্ব লাভ করিয়া রহিল!

কে দুইজন লোক গাছের নীচে দাঁড়াইয়া কি বলাবলি করিতেছে। তাহাদের কথার খানিকটা টুকরো আমার কানে গেল। শঙ্কিতপদে তাদের কাছে আসিলাম। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, অদূরের ঐ বড় লাল বাড়িখানার যিনি মালিক, বর্তমানে এই জায়গাটাও তাঁরই। তাঁহার হুকুম হইয়াছে, এই গাছটাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

হঠাৎ কেমন বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া গেলাম। একবার মনে হইল, জিজ্ঞাসা করি, এই একান্ত নিরীহ গাছটি সেই ধনীর কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছে যে—

কিন্তু, প্রশ্নটা অন্যভাবে ঘুরাইয়া করিলাম। লোকটা ভ্রূ কুঁচকাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির ভঙ্গীতে বলিল, বাবুর মেয়ের অসুখ। গাছটার পানে চেয়ে তার ভয় লাগে—

আর কিছু বলিবার প্রবৃত্তি হইল না, কারণ, বলিতে গেলে না জানি কি যে বলিয়া ফেলিতাম! শুধু আর একবার মাথা উঁচু করিয়া গাছটার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে ফিরিলাম।

নাঃ, উপায় নাই, কোন উপায়ই নাই। দু'জন লোক কুড়ুল আনিতে গিয়াছে, এখনি আসিয়া তাহারা ঐ গাছের গোড়ায় কোপ বসাইবে।

ইচ্ছা হয়, যদি আমার হাতে কোন ক্ষমতা থাকিত উহাকে বাঁচাইবার, কিন্তু কোন শক্তিই যে নাই। জায়গাটার সঙ্গে গাছটাও যে ঐ ধনীরই! সুতরাং সে যা-খুশি করিতেই পারে!

পিছন ফিরিয়া দেখিলাম। মনে হইল, গাছটা যেন স্তম্ভিত করুণ দৃষ্টিতে আমার সহিত চোখোচোখি নিষ্পলক হইয়া চাহিয়া আছে। একটা পাতাও তার নড়িতেছে না। আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, ফাঁসির আসামীকে তার মহাপ্রস্থানের মঞ্চের উপর দাঁড় করান' হইয়াছে, তার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেছে, চোখের পাতা পড়িতেছে না, পাথরের তৈরী দুটি চোখ দিয়া সে শুধু শেষবার এই বিশ্বের পানে দেখিয়া লইতেছে। অথচ কী যে তার অপরাধ, তাহা কেহই কিছু জানে না!

আমার বুকের ভিতরটা কি এক অনির্বচনীয় ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল। মনের ভিতর হইতে কে বলিল,—এ নিছক অত্যাচার! জগতে আজ পর্যন্ত মানুষ মানুষের প্রতি যত রকমের অত্যাচার করিয়াছে, তার চেয়ে কোন অংশে এ কম নিষ্ঠুর, কম করুণ নয়।

তবু আমার কোন ক্ষমতা নাই। একবার মনে হইল, ফিরিয়া গিয়া ধনীর ঐ কর্মচারীটিকে অনুরোধ করি, কিন্তু কী কুৎসিৎ ঐ লোকটার বক্রদৃষ্টি! আর তেমনি যমদূতের মত কালো চেহারা!

ধীরে ধীরে লাঠি ধরিয়া বাড়ি ফিরিলাম। ওখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চোখের সামনে ঐ নৃশংস ব্যাপার দেখা আমার অসাধ্য। তার চেয়ে বরং ওকে দেখিব, আমার জানালার ধারে তক্তপোষের উপর পড়িয়া পড়িয়া। সেখান হইতেই দেখিব, কেমন করিয়া বিশাল আকাশের বুক হইতে ও নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়।

আসিয়া সেই তক্তপোষের উপর বসিলাম। সামনে তাকাইয়া ঐ গাছটাকে বাদ দিয়া আকাশকে দেখিবার কল্পনা করিলাম, কিন্তু মনে হইল, সামনের সব-কিছুই যেন মুছিয়া গিয়াছে। আকাশ শুধু শূন্য, মহাশূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেহারী চা আনিয়া দিল। তাহাকে বলিলাম, চা থাক্, তুই একবার শীগ্‌গির যা তো বেহারী! ঐ লালবাড়ির লোকেরা ঐ গাছটাকে কেটে ফেলবে! দেখ্‌গে, কতটা কাটা হ'য়েছে। শিগ্‌গির যা, দাঁড়াস্‌নে—

আমার ব্যস্ততা দেখিয়া বেহারী হয়তো খানিকটা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মুহূর্তমাত্র আমার মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্নের সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ। চারিদিক যেন কেমন গুম হইয়া আছে। গাছটার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে ক'খানা পাতা উর্ধ্বে হাত বাড়াইয়া আছে, তাহার প্রত্যেক পাপড়িটি পর্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

ওদিকে, মাঠের ওপারে লালবাড়িটা তিনতলা পর্যন্ত মাথা উঁচু করিয়া আছে। ঝক্‌ঝকে ওর জানালা দরজা, চক্‌চকে ওর গায়ের রঙ, সব-কিছুই যেন ওর মালিকের

ঐশ্বর্যকে ব্যক্ত করিতেছে। এই বাড়ির কোন্‌খানে হয়তো অন্দরের দুলালী ধনী কন্যাটি বাস করে,—হয়তো ছোট্ট একটি কচি মেয়ে—একদিন হয়তো সামান্য জ্বরের ঝোঁকে ঐ গাছটার পানে চাহিয়া ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, ব্যস্‌, অমনি অন্দরের হুকুম গেল বহির্বাটিতে কর্তার কাছে, এবং কর্তা তাহা তামিল করিবার জন্য সসব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐশ্বর্যের কি উদ্দাম খেয়াল! ছোট্ট একটা কচি মেয়ের খেয়াল মিটাইবার জন্য এমন সুন্দর গরিমাময় একটা সৃষ্টিকে অতি নির্মমহাতে মুছিয়া ফেলিতে ওদের এতটুকু বাধে না। বাধিবে কেমন করিয়া? ঐশ্বর্যের বিপুলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভগবান যদি ওদের উপলব্ধিটুকুও বিপুলে করিয়া গড়িতেন!

কিন্তু...উপায় নাই, কোন উপায় নাই। গরীব তার জীর্ণশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া যত অভিসম্পাতই করুক, ধনীর প্রসারিত হস্ত সঙ্কুচিত হইবে না।

আমার মাথার ভিতর যেন আগুনে ছুটিতে থাকে। সমস্ত শরীর যেন ঝড়ের আলোড়নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

হঠাৎ বাহিরের পানে চাহিয়া চমক ভাঙ্গে। থম্‌থমে প্রকৃতিকে মথিত—বিপর্যস্ত করিয়া কখন ঝড় উঠিয়া পড়িয়াছে। গাছটা বিদ্রোহীর মত গুঁড়ি হইতে সুরু করিয়া লম্বা লম্বা পাতাগুলাকে দুলাইয়া আস্ফালন জুড়িয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে জোরে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। ঝড় এবং বৃষ্টি দুই-ই একসঙ্গে ও সমান তেজে। গাছটা যেন ঝড়বৃষ্টির তালে তালে প্রলয়-নৃত্য সুরু করিয়াছে।

জলে ভিজিয়া বেহারী বাড়ির ভিতর ঢুকিল। দুহাত দিয়া মাথার জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল,—লোকগুলোর কুড়ুল নিয়ে আসাই সার হ'ল। এ ঝড়-জলে দাঁড়ায় কার সাধ্যি! তার ওপর যে রাক্ষুসে গাছ! এই সব গাছের ওপরই বেশী বাজ পড়ে যে বাবু!

একটা সুগম্ভীর স্বস্তির নিশ্বাস আপনা আপনি বাহির হইয়া আসিল।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু আকাশ থম্‌থমে হইয়াই রহিল। রাত্রে হয়ত আরও জোরে বৃষ্টি নামিবে। বৃষ্টির ঝাপ্‌টার জন্য জানালাটা বন্ধ করিতে হইয়াছিল, আবার খুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু কালো আকাশের বুকে গাছটাকে আর খুঁজিয়া মেলে না। একবার সন্দেহ হইল, এতক্ষণে তাহারা কাটিয়াই ফেলিল বুঝি। কিন্তু একটু পরেই বিদ্যুৎপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিগর্ভ মেঘের বুকে সে বিকশিত হইয়া উঠিল। চোখ যেন জুড়াইয়া গেল তার অপরূপ সৌন্দর্যে!

রাত্রে আবার বৃষ্টি নামিল। একঘেয়ে ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি। জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় পড়িয়া কেবলি মনে হইতেছে, কাল সকালে হয়ত আমার এই নিঃসঙ্গ বন্দী-জীবনের প্রিয়তম সুহৃদটিকে আর দেখিতে পাইব না। ধনীর দুর্ধর্ষ খেয়ালের সঙ্গে প্রকৃতি আর কতক্ষণ যুঝিবে? বৃষ্টি দিয়া তাহাদের আর কতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখা চলিবে?

সারারাত ভাল ঘুম হয় নাই। মাঝে একবার জানালাটা খুলিয়া দেখি, মেঘ যদিও খানিকটা তরল হইয়া আসিয়াছে, তবু বৃষ্টি একেবারে থামে নাই। লালবাড়িটার দোতলার ঐ ঘরখানায় উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। রাত্রি বোধ হয় দুটা। এতরাত্রেও ওদের ঘরে আলো নিভে নাই! মনে হইতেছে, ঘরের ভিতর সকলেই যেন রীতিমত সজাগ হইয়া আছে।

শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বেহারীর ডাকা-ডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পূবের জানালা দিয়া বর্ষাস্নিগ্ধ সূর্যকিরণের খানিকটা আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছে। উঠিয়া সর্বপ্রথমেই দক্ষিণের জানলাটা খুলিয়া দিলাম।......কিন্তু, কৈ, কিছুই ত হয় নাই! গাছ তেমনি সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, ভিজা পাতার পাপড়িগুলিতে তরুণ সূর্যালোকের স্ফুলিঙ্গগুলি নাচিতেছে।

অপূর্ব তৃপ্তিতে অন্তর ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই মনে হইল, সকালে উঠিয়াই হয়ত ওরা গাছের তলায় জড়ো হইয়াছে এবং এতক্ষণে কুড়ুলের আঘাতে আঘাতে তার জীবনের সব গ্রন্থিগুলিই ছিঁড়িয়া পড়িল বুঝি!

কিন্তু, বেলা বাড়িয়া চলিল। অথচ, গাছটা ঠিক তেমনিই রহিয়া গেল।

বেহারী কোথায় বাহিরে গিয়াছিল। বাড়ি ফিরিয়া বলিল,—ও-বাড়ির বাবুদের দরজায় দু'তিনটে মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে, আর কত লোক যে জড়ো হ'য়েছে। বাবুর মেয়ের অসুখ নাকি বাড়াবাড়ি।

মনটা হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বাড়াবাড়ি অসুখ? মনে পড়িল, কাল সারারাত ওরা জাগিয়াছিল—হয়ত ঐ জন্যই!

বেহারীকে বলিলাম,—কি অসুখরে বেহারী, শুনলি?

সে বলিল,—না বাবু। কে কার কথা শুনছে?

বাহিরে চটপট করিয়া কার চটির শব্দ শুনা গেল। ও-বাড়ি হইতে কেহ আসিল নাকি এখানে?

ও, নীরেন। এস, এস।

নীরেন কম্পাউন্ডারি করে। আমার পায়ের ঘা'টা রোজ সকালে সে ড্রেস করিতে আসে। বসিয়া বলিল,—কেমন আছেন বলুন।

ঘায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা চীৎকার করিয়া কান্নার শব্দ কানে আসিল। নীরেন ব্যাণ্ডেজ খুলিতে খুলিতে বলিল,—প্রিয়বাবুর মেয়েটি তাহ'লে নিষ্কৃতি পেলে।

আমি তার মুখের পানে চাহিলাম। সে বলিল,—প্রিয়বাবুকে আপনি চেনেন না? রায় বাহাদুর প্রিয়লাল চৌধুরী? তারই একমাত্র মেয়ে। যথেষ্ট চিকিৎসা করালেন ভদ্রলোক, অনেক জায়গায় নিয়ে ঘুরলেনও, কিন্তু হবে কি? অম্বলের অসুখ ত নয়, আসলে যে থাইসিস!

—বল কি হে? থাইসিস?

—তাই ত শুনছি। কাল রাত থেকেই অবস্থা হঠাৎ খারাপ হ'য়ে পড়ে। রাত্রি দশটার পর আমাদের ডিস্পেন্সারী থেকে অক্সিজেন নিয়ে এলেন। একটিমাত্র মেয়ে। প্রিয়বাবুর ছিল মেয়ে-অন্ত প্রাণ! জামাই কিন্তু নাকি ইদানিং একটা চিঠি দিয়েও খবর নেয় নি। একটি ছোট ছেলে, মাস দুই হ'ল, তাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেছে।

আরও অনেক কথা জানিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কি যে বলিব, হঠাৎ মাথায় আসিল না। নীরেনও নিতান্ত অবান্তর প্রসঙ্গের মত ঐখানেই ওটা চাপা দিয়া নীরবে ঘা ড্রেস করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। যাইবার আগে বলিল,—নড়াচড়া আপনি বোধ হয় বেশী করছেন! করবেন না. এখনও দিনকতক এইভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকা দরকার। ঘা-টা এখনও রয়েছে যে!

ও-বাড়ির কান্নার শব্দ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল। একটা গলাই শুধু শুনিতেছিলাম, মেয়েটির মা-ই হইবে বোধ হয়। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয়ত এতক্ষণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, গলার স্বরও তাই বুজিয়া আসিতেছে।

নীরেনের কথাগুলো কেবলি মনে পড়িতেছিল। জামাই নাকি ইদানীং আর খোঁজ-খবর কিছুই লয় নাই। তা, বিচিত্র কি? এখানেও ত সেই প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সমস্যা! হয়ত এই দুর্বার ব্যাধির বজ্রপেষণে শীর্ণায়মান মেয়েটি কতদিন কতভাবে চাহিয়াছে তার দেখা, কিন্তু দেখা ত দূরের কথা, অত্যন্ত মামুলী একখানা চিঠির মামুলী স্নেহসম্ভাষণটুকুও তার শুষ্ক কণ্ঠনালীকে সিক্ত করিয়া দেয় নাই। শেষ মুহূর্তটিতে সে হয়ত বারম্বার তার বিশীর্ণ বাহু দুখানি বাড়াইয়া দিয়াছে তার ছেলেটিকে শেষবার বুকে লইবার জন্য, কিন্তু ছেলে তখন তার কাছ হইতে বহু যোজন দূরে এবং এইভাবেই ছাড়িয়াছে সে তার শেষ নিশ্বাস!

বাড়িটা একেবারে নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে, যেন একটা প্রেতপুরী! সেদিকে তাকাইতে গিয়া প্রথমেই গাছটার দিকে নজর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, তাহা হইলে নিশ্চয় এইজন্যই গাছ কাটার আর প্রয়োজন হয় নাই। লোকটা বলিয়াছিল,—বাবুর মেয়ের ভয় লাগে ঐ গাছটার পানে তাকিয়ে। কথাটা শুনিয়া কাল সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আজ কিন্তু যেন একটা অপরিসীম অনুশোচনার অনুভূতি কিছুতেই আমাকে স্বস্তি দিল না।

মেয়েটি তাহা হইলে দোতলার ঐ ঘরখানাতেই থাকিত। সামনেই মস্তবড় জানালা। ডাক্তারের হুকুমে জানালাটা নিশ্চয় খোলা থাকিত তাজা বাতাসের প্রত্যাশায়। আর জানালার ঠিক সামনেই ঐ বিশাল গাছ। দোতলার ঘর হইতে ওর ঐ ঝাঁকড়া মাথাটা—ঐ বিশাল পাতাগুলা সর্বদাই চোখে পড়ে। সত্যই ত! এক-একখানা পাতা যেন কোন্ রাক্ষুসে পাখীর ডানার মত। ঐ পাতাগুলা যখন বাতাসে এপাশ ওপাশ দুলিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত সর সর শব্দ হয়,......ভয় খাওয়াই ত স্বাভাবিক! বিশেষ করিয়া এমনি একটি মেয়ে, ভাগ্য যাহাকে সকল সুখের অধিকারিণী করিয়াও নিষ্করুণ শোষণে নিরন্তর নিঃশেষ করিয়া আনিতেছিল, তাহার সেই দৃষ্টি-সর্বস্ব কোটরগত চক্ষু দুটির সম্মুখে ঐ একটা গাছ—

না, বেহারী যে ওকে রাক্ষুসে গাছ বলে, হয়ত তা মিথ্যা নয়। ওর পানে চাহিয়া চাহিয়া মানুষের মাথার গোলযোগ হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

আবার সেই চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকি। কিন্তু দৃষ্টি আর বাহিরের দিকে চলে না। জানালার বাহিরে চাহিতে গেলেই চোখে পড়ে ঐ বাড়িটার দোতলার জানালাটা এবং ঐ গাছটি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ যেন আপনা আপনি নামিয়া আসে। এক একবার মনে হয়, গাছটাকে কাটিয়া ফেলিলেই হয়ত ওরা ভাল করিত। ওর পানে চোখ পড়িলেই ওদের এখন এই কথাই ত মনে হইতে পারে যে, ঐ গাছটার জন্যই অভাগিনীর মৃত্যু এমন আসন্ন হইয়া আসিল। নহিলে হয়ত—অন্তত আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারিত সে।

মনের কম্পাস হঠাৎ কেন যে এমন করিয়া ঘুরিয়া গেল, তা কে বলিবে!

অত্যন্ত অনির্বচনীয় একটা অস্বস্তির মধ্যে সে দিনটা কাটিয়া গেল। ক্ষতস্থানের ব্যথাটাও যেন আজ অকারণেই অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে। দেহে-মনে দুরপনেয় একটা জড়তার ভাব।

রাত্রেও দুস্বপ্নে জড়িত অত্যন্ত ক্লেশকর নিদ্রা। মনে হইল, আমার অসুখ হঠাৎ খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের একবার দেখিবার জন্য বুকের ভিতর আকুলি-বিকুলি করিতেছে, কিন্তু কেহই আসিয়া পৌঁছিল না। বেহারীও যেন কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। একা বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছি। নিকটেই কোথা হইতে একটা গোঙরান কান্নার শব্দ উঠিতেছে। সে কান্নায় আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি, পাশের জানালাটা খোলা। মনে হইল, চীৎকার করিয়া বেহারীকে ডাকি। কিন্তু কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। নিষ্পলক চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মাঝে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। কিন্তু সে জ্যোৎস্নার পিছনে যেন কার বহুদিনের সঞ্চিত অশ্রু জমাট বাঁধিয়া আছে! সে জ্যোৎস্নায় যেন মুমূর্ষুর বিবর্ণতা! সর্বোপরি, বিকট গাছটার পানে যেন আর তাকান যায় না। কী বীভৎস দেখাইতেছে ঐ গাছটা! ওযেন আজ হঠাৎ আরও বেশী ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, কোন্ বিকটাকার দৈত্যের মত!

টলিতে টলিতে কোনরকমে উঠিয়া জানালাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, কাল সকালেই বেহারীকে বলিয়া তক্তপোষটা এমন জায়গায় সরাইয়া লইতে হইবে, যেখান হইতে ঐ গাছটা আর একেবারেই নজরে না পড়ে।

বাঙলা নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায় এম-এ

বাঙলা নাটকের আধুনিক অভ্যুদয়ের মূলে রহিয়াছে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণা। ইংরেজ সমাজের অনুকরণে বাঙালী সমাজে রঙ্গমঞ্চ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের নবীনা রাজধানী কলিকাতায় আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপকরণ ছিল কবির গান, পাঁচালি, যাত্রা, আখড়াই, হাফ আখড়াই প্রভৃতি। ইহারা অনেক স্থলে কুরুচিপূর্ণ ছিল বলিয়া শিক্ষিত সমাজে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। ১৭৫৮ খ্রীঃ পলাশী যুদ্ধবিজয়ের বৎসরে কলিকাতায় প্রথম ইংরেজি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর Calcutta Theatre (১৭৭৬—১৮০৮), Chowringhee Theatre (১৮১৩—৩৯) এবং Sans Sauci Theatre (১৮৪১-৪৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলি ইংরেজদের থিয়েটার। সেকালের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালিগণ এই সকল থিয়েটারে গিয়া ইংরেজি নাটকের রস আস্বাদন করিতেন।

প্রথম বাঙলা নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীঃ। হেরাশিম লেবেডফ্ (Herasim Lebedoff) নামক একজন রুশীয় যুবক একটি নাট্য সমিতি খোলেন। সেখানে Disguise এবং Love is the best doctor নামক দুখানি ইংরেজি নাটকের বাঙলা অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী নামানো হইয়াছিল। দুইটি নাটকের অভিনয়ের পর হঠাৎ এই সমিতিটি উঠিয়া যায়। ১৮৩১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বেলেঘাটায় Hindu Theatre খোলেন। সেখানে উত্তররামচরিতের উইলসন সাহেব-কৃত ইংরেজি অনুবাদ অভিনীত হয়। হিন্দু থিয়েটার এক বৎসর পরে উঠিয়া যায়। শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে একটি সখের রঙ্গমঞ্চ ছিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ সেখানে বিদ্যাসুন্দর নাট্যাকারে অভিনীত হয়। অভিনয়ে বহু টাকা খরচ হইয়াছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২৩-১৮৮৫) বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার বলিয়া পরিচিত। ইঁহার প্রথম নাটক কুলীনকুলসর্বস্ব ১৮৫৭ খ্রীঃ রচিত ও প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসর মার্চ মাসে চড়কডাঙায় অভিনীত হয়। নাটকখানি সামাজিক ও হাস্যরস-প্রধান। ইহা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধরণে রচিত। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, ইহার পূর্বেও বাঙলা ভাষায় কয়েকটি নাটক ছিল, যথা—নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান শকুন্তলা; আত্মতত্ত্ব কৌমুদী, হাস্যার্ণব, কৌতুকসর্বস্ব, কীর্তিবিলাস; তারাচাঁদ শিকদারের ভদ্রার্জুন; হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতী চিত্তবিলাস (Merchant of Veniceএর অনুবাদ), ও কালীপ্রসন্ন সিংহের বাবু নাটক প্রভৃতি।

তর্করত্ন-রচিত নবনাটকও সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। ইহা বিয়োগান্ত নাটক, সুতরাং প্রাচ্য-রীতির বিরোধী। রামনারায়ণের আরও কয়েকটি নাটক আছে,—রুক্মিণী হরণ, স্বপ্নধন, রত্নাবলী (অনুবাদ), মালতী-মাধব (অনুবাদ), বেণীসংহার (অনুবাদ) ইত্যাদি।

ইহার পর আসিলেন মধুসূদন (১৮২৪-৭৩)। মধুসূদন নাটক রচনা করিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পরিচিত হইলেন। শর্মিষ্ঠা নাটক ১৮৫৮ খ্রীঃ রচিত হয় এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া থিয়েটারে ১৮৫৯ খ্রীঃ অভিনীত হয়। শর্মিষ্ঠার পর মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করেন—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। প্রথমখানিতে সেকালের ইয়ংবেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দ্বিতীয়টিতে প্রাচীনপন্থীদের ভণ্ডামি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের চতুর্থ দান পদ্মাবতী। ১৮৬৫ খ্রীঃ ইহা প্রথম অভিনীত হয়। পদ্মাবতী গ্রীক সাহিত্যের জুনো-প্যালাস-ভেনাস ও সুবর্ণ আপেলের গল্প অবলম্বনে রচিত তবে মধুসূদন গ্রীক নাম বদলাইয়া হিন্দু নাম বসাইয়াছেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ শেষভাগে কৃষ্ণকুমারী নাটক রচিত হয়। ইহা ঐতিহাসিক ও বিয়োগান্ত। জীবনকালের শেষদিকে মধুসূদন মায়াকানন এবং বিস না ধনুর্গুণে নামক দুইখানি নাটক লিখিতে সুরু করেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মধুসূদনের নাটকগুলি পাশ্চাত্য ছাঁদে লিখিত।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে বাঙলা দেশে নাটকের অভাব অনেকটা দূর হইল। বেলগাছিয়া থিয়েটারের সহিত প্রতি-যোগিতা করিয়া চোরবাগান, বৌবাজার, জোড়াসাঁকো, বাগবাজার, পাথুরিয়াঘাটা ও বড়বাজারে য়্যামেচার নাটমঞ্চ গড়িয়া উঠিল। বড়বাজারের নাট্য সমিতির সহিত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাঁহারই উৎসাহে সেখানে বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয় হয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটারের মূল্য খুব বেশি। এখানে অভিনীত কয়েকটি নাটকের তালিকাঃ—

(১) মালবিকাগ্নিমিত্র—অনুবাদক মহারাজ যতীন্দ্রমোহন —১৮৬৫ খ্রীঃ অভিনীত। (২) বিদ্যাসুন্দর—মহারাজ কর্তৃক নাট্যাকারে রূপান্তরিত—১৮৬৫ খ্রীঃ। (৩) যেমন কর্ম তেমন ফল—মহারাজ রচিত কমেডি—১৮৬৬ খ্রীঃ। (৪) মালতীমাধব—রামনারায়ণ কর্তৃক অনূদিত—১৮৬৯ খ্রীঃ। (৫) রুক্মিণীহরণ—রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত—১৮৬৭ খ্রীঃ। (৬) উভয়সংকট—কমেডি, মহারাজ রচিত।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন রচিত 'বুঝলে কিনা' প্রহসন কলিকাতার সমাজে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার জবাবস্বরূপ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসন জোড়াসাঁকো থিয়েটারে অভিনীত হয়। নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এই অভিনয়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন।

বৌবাজারের "অবৈতনিক নাট্যসমাজ" ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা এক সময় বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যসমাজ ছিল। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন ঘোষের নাটকগুলি এখানে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মনোমোহন ঘোষ রচিত নাটকের তালিকাঃ—

(১) রামাভিষেক, (২) প্রণয় পরীক্ষা, (৩) সতী নাটক (১৮৭২)—বিয়োগান্ত, (৪) হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৪), (৫) পার্থ-

পরাজয়, (৬) আনন্দময়, (৭) রাসলীলা—গীতিনাট্য (১৮৮৯ খ্রীঃ)।

বাঙলা নাটকের ইতিহাসে মনোমোহন ঘোষ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে ইনিই প্রথম কলিকাতার বাহিরে সারা বাঙলা দেশ জুড়িয়া প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ইঁহার রামাভিষেক ও হরিশ্চন্দ্র নাটক বহু বৎসর ধরিয়া বাঙলার বহু রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। পৌরাণিক আদর্শকে নাটকে রূপ দিবার অসামান্য ক্ষমতা মনোমোহনবাবুর ছিল।

বাঙলা সাহিত্যের আর এক বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)। দীনবন্ধু হুগলি ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ইংরেজি সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছিল। ছাত্রাবস্থায় সুকবি বলিয়া দীনবন্ধু বাঙলা দেশে পরিচিত হন, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত "সংবাদ-প্রভাকরে" তাঁহার 'কবিতা-যুদ্ধ' চলিত। নীলদর্পণ ১৮৬০ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইহা একটি যুগান্তকারী নাটক। সেকালের নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনীই ইহার মূল বিষয়। প্রকাশিত হইবার পরই নাটকখানি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রেভাঃ জেমস্ লঙ্ ইহা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া ইংলন্ডে পাঠাইয়া দেন। ফলে, সুপ্রীম কোর্টে নাটকখানির বিরুদ্ধে মামলা সুরু হয়। অভিযুক্ত হইয়াছিলেন জেমস্ লঙ্ এবং প্রকাশক। জেমস্ লঙ্ নীলকরদিগের মানহানির অপরাধে এক মাস কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হন। ইহার ফলে নাটকখানির নাম দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। নীলদর্পণ নাটকখানি আগাগোড়া অতি করুণ। নীলকরদিগের অত্যাচারে গোলোক বসু নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্বনাশ অতি মর্মস্পর্শীভাবে দেখানো হইয়াছে। নীলকর মিঃ উড এবং মিঃ রোগ্ এবং তাঁহাদিগের দেওয়ান ও কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতা নিখুঁতভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও নাটকখানি সাহিত্য হিসাবে বিশেষ ভাল নয়। বীভৎস দৃশ্যসমূহের অতিরিক্ত সমাবেশই এই নাটকখানির প্রধান দোষ।

দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক নবীন তপস্বিনী ১৮৬৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। লীলাবতী প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীঃ। নীলদর্পণের মত এই দুইটিও সামাজিক। আগাগোড়া সরস ও হাস্যরসপ্রধান হইলেও নীলদর্পণের মত সমাদর ইহারা পায় নাই।

কমেডি-রচয়িতারূপে দীনবন্ধু মিত্রের নাম বাঙলা সাহিত্যে চিরদিন অমর হইয়া রহিবে। হাস্যরস সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। প্রথম প্রহসন বিয়ে-পাগলা বুড়ো ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ জামাইবারিক এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ সধবার একাদশী প্রকাশিত হয়। সধবার একাদশীর অভিনয়ে 'নিমচাঁদের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া গিরিশচন্দ্র যৌবনে অভিনেতারূপে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন।

দীনবন্ধু মিত্র প্রতিভাশালী নাট্যকার ছিলেন, সন্দেহ নাই। নিম্নশ্রেণীর লোকের, বিশেষত স্ত্রীলোকের চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। নাটকের সর্বত্র অবিমিশ্র কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়া দীনবন্ধু বাঙলায় সামাজিক নাটক রচনা করিবার প্রকৃত রীতিটি দেখাইয়া দিলেন।

দীনবন্ধু মিত্রের পর সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষের যুগ। গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪—১৯১২) একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি কাব্যে ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি Atkinson, Tilton & Co.তে বুককিপারের পদে নিযুক্ত হন। যৌবনকালে তিনি অভিনেতারূপেই বাঙলা দেশে পরিচিত হন। ১৮৬৭ খ্রীঃ বাগবাজারে একটি যাত্রার দল খুলিয়া 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ "সধবার একাদশীর" নিমচাঁদের ভূমিকার অভিনয়ে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শেষে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া গিরিশচন্দ্র বাগবাজারে ন্যাশনেল থিয়েটার খুলিলেন। এখানে ১৮৭১ খ্রীঃ দীনবন্ধুর "লীলাবতী" নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার সহকারিগণ "নীলদর্পণ" অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। এমন সময় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু অভিনয়ের খরচ তুলিবার জন্য টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব তোলেন। গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। মতবিরোধের ফলে ন্যাশনেল থিয়েটারের সহিত সকল সম্পর্ক ছাড়িয়া গিরিশচন্দ্র আবার যাত্রার দলে ফিরিয়া গেলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ পূর্বোক্ত বন্ধুগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে আবার তিনি ন্যাশনেল থিয়েটারে যোগদান করেন। আবার মতভেদের ফলে ঐ বৎসরই ন্যাশনেল থিয়েটার উঠিয়া যায়। পুনরায় বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া ১৮৭৩ খ্রীঃ গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন সুরু হইল।

গিরিশচন্দ্র প্রথমে সে যুগের প্রসিদ্ধ উপন্যাস ও কাব্যগুলিকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করিতেন। ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ খ্রীঃ মধ্যে মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, পলাশীর যুদ্ধ, দুর্গেশনন্দিনী, মেঘনাদ বধ এবং কপালকুন্ডলা নাট্যরূপ লাভ করিল। ইহার পর গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটারের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ লাভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার মৌলিক রচনার যুগ আসিল। গিরিশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক সৃষ্টিঃ—রাবণ বধ (১৮৮১ খ্রীঃ), মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা, সীতার বনবাস, রামের বনবাস, সীতার বিবাহ, সীতাহরণ, লক্ষ্মণবর্জন, অভিমন্যু বধ, মলিনমালা, আনন্দরহো (ঐতিহাসিক), ভোটমঙ্গল (প্রহসন), ব্রজবিহার (গীতিনাট্য) এবং পান্ডবের অজ্ঞাতবাস। (পান্ডবের অজ্ঞাতবাস পরবর্তীকালে পান্ডব গৌরব নামে নূতন রূপ লাভ করে।)

১৮৮৩ খ্রীঃ গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন।

এই সময় হইতে ১৮৮৭ খ্রীঃ মধ্যে রচিত নাটকের তালিকাঃ—দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, নলদময়ন্তী, বৃষকেতু (একাঙ্ক নাটিকা), কমলে কামিনী, শ্রীবৎসচিন্তা, প্রহ্লাদ চরিত্র, প্রভাসযজ্ঞ, হীরারফুল (গীতিনাট্য), বেল্লিকবাজার (প্রহসন), রূপ-সনাতন, বুদ্ধদেব-চরিত, চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। এই সময়কার শ্রেষ্ঠরচনা বুদ্ধদেব চরিত ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। দুইখানিই সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'বিল্বমঙ্গলে'র সমাদর সিনেমা কোম্পানিতে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটক ১৮৮৮ খ্রীঃ পর রচিত হয়ঃ—প্রফুল্ল (সামাজিক, বিয়োগান্ত, ১৮৮৯ খ্রীঃ), হারানিধি (সামাজিক, ১৮৮৯ খ্রীঃ), মহাপূজা ও চণ্ড (১৮৯০ খ্রীঃ)। অনেকের মতে "প্রফুল্ল" গিরিশপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

১৮৯২ খ্রীঃ মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র ইহাতে যোগদান করেন। এই সময় সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ বাঙলায় অনুবাদ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের উৎকৃষ্ট কমেডিগুলি এই সময়ের পর রচিত হয়ঃ—আবুহোসেন (সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নাটক), মুকুল মুঞ্জরা (পঞ্চাঙ্ক কমেডি, ১৮৯৩), জনা (বিয়োগান্ত পৌরাণিক নাটক)। ১৮৯৪—১৮৯৫ খ্রীঃ মধ্যে সপ্তমীতে বিসর্জন, বড়দিনের বকশিশ, সভ্যতার পাণ্ডা এবং স্বপ্নের ফুল, পাঁচ কনে, ফণীর মণি তিনটি গীতিনাট্য রচিত হয়। করমেতি বাই এই সময়কার সৃষ্টি, ইহা ধর্ম ও নীতিবিষয়ক উৎকৃষ্ট দার্শনিক রচনা। ইহার পর আবার স্টার থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া গিরিশচন্দ্র কালাপাহাড় (ঐতিহাসিক), পারস্যপ্রসূন (গীতিনাট্য, ১৮৯৮ খ্রীঃ) এবং হীরক জুবিলি (একাঙ্ক গীতিনাট্য), মায়াবসান নামক সামাজিক নাটক রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে অভিনয় ক্ষেত্রে 'কালাপাহাড়' বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

১৮৯৮ খ্রীঃ গিরিশচন্দ্রের অলৌকিক নাট্যপ্রতিভা মন্দীভূত হইয়া আসে। তিনি ক্ল্যাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯১২ খ্রীঃ মধ্যে রচিত নাটকের তালিকাঃ—দেলদার (গীতিনাট্য), পাণ্ডব গৌরব (১৮৯৯ খ্রীঃ), সীতা-রাম (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ), মণিহরণ (রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক, ১৯০১ খ্রীঃ, নন্দদুলাল (কৃষ্ণলীলাবিষয়ক), মনের মতন, অশ্রুধারা, শান্তি (ঐতিহাসিক, বুওর যুদ্ধবিষয়ক), অভিশাপ, ভ্রান্তি, আয়না (কমেডি), সৎনাম, বলিদান (সামাজিক, বিয়োগান্ত, ১৯০৪), হরগৌরী, সিরাজ-উদ্দৌলা (ঐতিহাসিক), মীরকাশিম (ঐতিহাসিক, ১৯০৭), শান্তি কি শান্তি (বিধবা বিবাহবিষয়ক, ১৯০৯), শঙ্করাচার্য (ধর্ম-বিষয়ক, ১৯১০), অশোক (ঐতিহাসিক, ১৯১১), তপোবল (পৌরাণিক—১৯১২, ভগিনী নিবেদিতাকে উৎসৃষ্ট)। এই সময়কার কয়েকটি নাটক বড়, যেমন—তপোবল, শঙ্করাচার্য, অশোক। ভাব ও ভাষার দিক দিয়া উৎকৃষ্ট রচনা, কিন্তু নাটক হিসাবে তেমন মূল্যবান নয়। বাঙলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট বিয়োগান্ত নাটকগুলির মধ্যে "বলিদান" স্থানলাভ করিয়াছে।

গিরিশ ঘোষের প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। গান ও কবিতা রচনায় তিনি সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার গীতিনাট্য-গুলি বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ট্রাজেডি, কমেডি, ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক, অত্যন্ত লঘু ধরণের প্রহসন এবং অতি উচ্চস্তরের দার্শনিক রচনা—সকলপ্রকার সৃষ্টিতেই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। এরূপ বিচিত্র ধরণের রচনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙলা সাহিত্যে আর কাহারও লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস গিরিশচন্দ্র রচিত প্রায় সব কয়টি নাটকেই দেখা যায় এবং ইহাই গিরিশ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। অপরিসীম অসংযত আবেগ অনেক স্থলে তাঁহার নাটকের রস ও শিল্পের গুরুতর ক্ষতিসাধন করিয়াছে। ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, গিরিশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন না, কালিদাস, সেক্সপীয়ার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সহিত এক পঙক্তিতে স্থানলাভের তিনি অযোগ্য। তবে তিনি যে জাতির ও যুগের শিক্ষক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি শিক্ষা ও আনন্দ একসঙ্গে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আদর্শের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাবপ্লাবিত যুগে সেই পৌরাণিক আদর্শকে প্রাণময়, সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার কম গৌরবের বিষয় নহে।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তগণের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমৃতলাল বসু নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। অমৃতলাল (১৮৫০—১৯৩০) বাঙলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা। তাঁহার কমেডিগুলির মধ্যে বিবাহ বিভ্রাট, খাসদখল, নবযৌবন, সাবাস আঠাশ, বাহাবাবাতিক ও চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে প্রসিদ্ধ। চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে ইংরেজি প্রহসন Cox and Boxএর অনুকরণে রচিত। ইংরেজি শিক্ষিত নব্যদের নানাবিধ দোষগুলির তীব্র সমালোচনাই তাঁহার কমেডিগুলির মূল বিষয় বস্তু। অমৃতলালের দুইখানি সুলিখিত পৌরাণিক নাটক হরিশ্চন্দ্র ও যাজ্ঞসেনী। হাস্যরস সৃষ্টিতে অসামান্য দক্ষতার জন্য তিনি "রসরাজ অমৃতলাল" নামে সুপরিচিত। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত নাটকগুলি এখনও পর্যন্ত বাঙলার সর্বত্র অভিনীত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনা—রামানুজ (১৯১৬), শুভদৃষ্টি (১৯১৫), শ্রীকৃষ্ণ (১৯১৮), অযোধ্যার বেগম (১৯২০), ইরাণের রাণী (১৯২২), শ্রীরামচন্দ্র (১৯২৩), কর্ণার্জুন (১৯২৭), চণ্ডীদাস (১৯২৮)। শেষের চারখানিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত নাটক-গুলির মধ্যে দলিতা ফণিনী (১৯০৮), জীবনে মরণে (১৯১১), প্রেমের জেপলিন (১৯১৫) প্রধান।

গিরিশচন্দ্রের পর বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্বে বাঙালীর চিন্তায় ও কর্মে এক নূতন যুগ আসিয়াছিল। দেশের সর্বত্র জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে সুরু হয়। তাহার অব্যবহিত পরে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয়তাবাদী কবি ও নাট্যকাররূপে বাঙলা দেশে সুপরিচিত

হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তিনখানি বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক—দুর্গাদাস, মেবার পতন ও রাণাপ্রতাপ মুক্তিসাধনার করুণ কাহিনী। ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান। দুইখানি পৌরাণিক নাটক ভীষ্ম ও সীতা এক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বঙ্গনারী ও পরপারে, দুইখানি সামাজিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত দুইখানি বঙ্গ-নাট্য আনন্দবিদায় ও কল্কি অবতার সুপ্রসিদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ দান সিংহল বিজয় (১৯১৩)।

বিংশ শতকের প্রথম ভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাটকের ভাষা চলতি গদ্য হইলেও আগাগোড়া আবেগময়ী ও অলঙ্কারমণ্ডিত। চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। সে বিষয়ে তাঁহার স্থান গিরিশচন্দ্রের বহু ঊর্দ্ধে। দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসিক ছিলেন এবং নির্মল হাস্যরস তাঁহার নাটকে প্রচুর। তাঁহার নাটকগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ-গান।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩—১৯২৭) দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর বাঙলা দেশের রঙ্গমঞ্চে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ লেখনী সংযম, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় যাহার একান্ত অভাব ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ কলাভিজ্ঞ নাট্যকার, তাঁহার ভাষা ওজস্বিনী ও কল্পনাশক্তি চমৎকার। তাঁহার লেখা ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব কমেডি রচনায়। ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাঙলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আলিবাবা ও কিন্নরী বহুশত রাত্রি ধরিয়া লক্ষ লক্ষ দর্শককে আনন্দ দিয়াছে। নরনারায়ণ বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যধরণে রচিত সর্বোৎকৃষ্ট ট্রাজেডি। ক্ষীরোদবাবুর প্রধান প্রধান রচনা—আলিবাবা, কিন্নরী, ফুলশয্যা (ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত), আহেরিয়া, বাঙলার মসনদ, আলমগীর, পদ্মিনী, চাঁদবিবি, বঙ্গে রাঠোর (ঐতিহাসিক); সাবিত্রী ও ভীষ্ম (পৌরাণিক); দৌলতে দুনিয়া, প্রমোদরঞ্জন, অশোক, নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতাপাদিত্য (ঐতিহাসিক) নরনারায়ণ (পৌরাণিক) ইত্যাদি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে প্রতাপাদিত্য বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক ছিল। ক্ষীরোদবাবুর লেখা সবকয়টি নাটকই সুপ্রসিদ্ধ ও অভিনয় সাফল্যে অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নাটক সৃষ্টি করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যে ও যৌবনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রায়ই নাটকাভিনয় হইত। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ে যোগদান করিতেন। তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫) নাট্যামোদী ও নাট্যকার ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই অনুবাদ। মৌলিক রচনার মধ্যে অশ্রুমতী, পুরুবিক্রম, সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ ও স্বপ্নময়ী প্রসিদ্ধ। জুলিয়াস সিজার, কর্পূর মঞ্জরী, মালতী মাধব, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি অনুবাদগুলিও বড় চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক বাল্মীকি প্রতিভা বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদা মঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত। তাহার পর কাল মৃগয়া, মায়ার খেলা, প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং রাজা ও রাণী ১৮৯০ খৃঃ মধ্যে রচিত হয়। বাল্মীকি প্রতিভা ও কাল মৃগয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্পদ গান। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে তান-লয়বিষয়ক প্রাচীন আইনকানুনের কঠোর বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছেন, তাহার প্রথম সূচনা এই দুইখানি নাটকে। সাধারণত নাটকে বক্তৃতার ভাগই বেশি, গান মাঝে মাঝে দুই চারিটা থাকে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের এই দুইখানি নাটকে গানই বেশি, বক্তৃতার মূল্য বিশেষ কিছু নাই। সুতরাং এই দুইখানি নাটককে বাঙলা সাহিত্যের আদি অপেরা বলা যাইতে পারে। কাল মৃগয়া বিয়োগান্ত পৌরাণিক, মায়ার খেলা গীতিনাট্য রোমাণ্টিক ধরণে রচিত। প্রকৃতির প্রতিশোধ রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। ইহা আগাগোড়া করুণরসাত্মক বিয়োগান্ত নাটক। রবীন্দ্রনাথের Philosophy of life ইহার মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে। ১৮৯০—৯০ খৃঃ মধ্যে বিসর্জন, মালিনী, চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ। বিসর্জন ও মালিনী আংশিকভাবে সামাজিক। চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিণত অবস্থার সৃষ্টি এবং আগাগোড়া কাব্যধর্মী। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কমেডিও রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ ও চিরকুমার সভা প্রধান। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে রচিত কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলি নাটকীয় রীতিতে রচিত। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও চমৎকারিত্বে এবং রচনা কৌশলের গুণে নাটকের ধর্ম ইহাদের মধ্যে বেশ ভালভাবে ফুটিয়াছে। এ ধরণের নাট্য-কাব্য বাঙলা সাহিত্যে নূতন। ইহাদের মধ্যে গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যগুলি ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সৃষ্টি। কেহ কেহ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর মেটারলিঙ্কের প্রভাব অনুমান করিয়া থাকেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্কের নিকট হইতে এ জাতীয় নাটক রচনার প্রেরণা মাত্র পাইয়াছিলেন, নাটকের বিষয়বস্তু, ভাব ও রচনারীতি সবই তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার প্রধান প্রধান রূপক নাট্য—শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুণী, রক্তকরবী। রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকগুলির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাদের মধ্যে action কম, idea বেশি। টমসনের মতে—His dramas are vehicles of ideas rather than expressions of action.

তৃষ্ণা

শ্রীসরোজকুমার নন্দী

'তোমাকে নিয়ে আর ত আমি পারি না মা,' তীর্থপতি বলল।

'তোকে নিয়ে আর ত আমি পারি না খোকা,' আমোদিনী বললেন।

দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ক'রে একটা আওয়াজ হল। রাত্রি একটা। ইস্, এত রাত হল, তবু তীর্থর চোখে ঘুম নেই, আমোদিনী ভাবলেন। তীর্থপতি খস্ খস্ ক'রে কী যেন লিখছিল। বহুক্ষণ কেউ-ই আর কোন কথা বলল না। ঘড়ির টিক্‌টিক্, তীর্থপতির লেখার খস্‌খসানি আর নিস্তব্ধতার—গভীর রাতের নিস্তব্ধতার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। আমোদিনীকে কেমন যেন একটা নেশায় পেয়ে বসল। আরাম চেয়ারে এঁকে বেঁকে তিনি শুয়ে আছেন। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় সত্যিকারের আরাম বোন কিছুতে পাওয়া কঠিন,—সব কিছু পর্যাপ্ত থাকলেও। আমোদিনীর জীবনে অভাব রয়ে গেছে অনেক কিছুর। অনেক রাত অবধি জেগে তীর্থপতি যখন লেখে বা পড়ে, আমোদিনী তখন আরাম চেয়ারে শুয়ে সেই অভাবের কথা ভাবেন। কত অভাব! অর্থের অভাবকে তিনি ভয় করেন না, হয়ত' প্রচুর আছে বলেই। হায়, সেই অভাবগুলি যদি না থাকত! যদি থাকত আজ তীর্থর বাবা বেঁচে। কত বছর হয়ে গেল সে নেই, আমোদিনী তবু ভোলেন নি, নিঃশব্দে তাঁর পাইপ খাওয়ার ভঙ্গীটি। এমনি হয়। আরও কতশত খুঁটিনাটি যে মনে পড়ে এই গভীর রাতে—তীর্থ যখন খস্‌খস্ ক'রে লেখে বা মনে মনে পড়ে,—তীর্থ তাঁর ছেলে। ভাগ্যি, তীর্থ এসেছিল। আমোদিনী ভেবে দেখলেন, তীর্থ না থাকলে, না আসলে তিনি কেমন ক'রে বাঁচতেন, কেমন ক'রে এই পৃথিবীর বাতাস বুক ভরে নিতেন, নিশ্বাস নিতে ভুল হয়ে যেত না? তবু, আমোদিনী একথাও না ভেবে থাকতে পারেন না, একটা ছেলে না থাকলে কী হয়? কেন আসে ওরা কষ্ট দিতে? সমস্ত শৈশবটা জ্বালিয়েছে। অসংখ্য আব্‌দার আর অজস্র আদরে তিলে তিলে তাঁকে শুষে নিয়েছে। কৈশোর। উঃ, ভাবা যায় না যেন। আমোদিনী চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রাখলেন তীর্থর মুখখানাকে আড়ালে রাখবার জন্য। তীর্থর কৈশোর। আমোদিনী তখন বুঝতে পারতেন না, তীর্থকে কোথায় রাখবেন, কোথায় তাকে রাখলে মানায়। এমনি সময় প্রভাকর মারা গেলেন। আমোদিনী যতখানি কাঁদবেন ভেবেছিলেন, ততখানি কাঁদতে পারলেন না স্বামীর জন্য। প্রভাকরের বিয়োগে প্রচুর অশ্রুর উপঢৌকন তিনি দিতে পারলেন না অপরলোকে তাঁর আত্মার প্রশান্তির জন্য। কী ক'রে কাঁদবেন তিনি, তীর্থ যে তখনও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে,—কৈশোরের তীর্থ। আমোদিনী তীর্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন আর ভাবলেন, মানুষ কী এত সুন্দর হয়! আর মনে মনে বললেন, ভগবান তুমি ওকে কেড়ে নিয়ো না! তার পর এতগুলি বছর যখন ক্রমে ক্রমে অতিবাহিত হয়েছে আর তীর্থ যখন ক্রমেই তাঁর কোল ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়েছে, যখন তীর্থর কপাল, চুল আর তিনি তাঁর ঠোঁটের নাগালের মধ্যে পান্ না, তখন তাঁর দু'চোখ ভরে অশ্রু এসেছে আর ভগবানে বিশ্বাস বেড়েছে। তীর্থকে তিনি কেড়ে নেন নি। হয়ত' কিছুক্ষণ তিনি তীর্থকে দেখেন নি। একটা ছল ক'রে ছুটে এলেন।

'খোকা বিন্দেকে এই অবেলায় তুই আবার চা আনতে বলেছিস। তোকে নিয়ে আর ত আমি পারি না তীর্থ!' তীর্থপতি বিস্মিত হয়ে বলেছে, 'আমি আবার কখন চা আনতে বললাম। সারা সকাল তার মুখখানা একবার দেখতেই পেলাম না। পাঠিয়ে দিয়ো একবার এখানে।' তীর্থপতি আবার বইয়ের উপর উপুড় হয়ে পড়েছে। আমোদিনী খুশীতে ভরে উঠেছেন। এমন ছেলেকে দু'চোখ ভরে দেখতে পাওয়াতে এত সুখ। দেখতে দেখতে তীর্থ কেমন লম্বা হয়ে উঠেছে। আর কিছুদিন পর হয়ত' তিনি হাত তুলেও তার মাথার নাগাল পাবেন না। তবু এত ভয়, এত শঙ্কে থাকতে হয়। সকালে ঘুম ভাঙবার পর থেকেই শঙ্কা জাগে, তীর্থ ভাল আছে ত'! পৃথিবীতে কত যে ব্যাধি!

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা আওয়াজ হল।

আমোদিনী চম্‌কে উঠে বললেন, 'তুই ঘুমোবি না তীর্থ!'

'দ্যাখ মা', তীর্থপতি ঋজুগলায় বলে, 'যা হয় একটা কিছু বলে ডাক। হয় তীর্থ, নয় খোকা। খোকাটা বাদ দিতে পার। লোকজনের সামনে আমাকে খোকা বললে, আমার লজ্জা করে। আজ আর আমার চোখে ঘুম নেই। ওঠ তুমি, যাও শীগ্‌গির। আশ্চর্য! আমি রাত জেগে লেখাপড়া করব আর তুমি রাত জেগে আমাকে পাহারা দেবে। তোমাকে নিয়ে সত্যিই আমি আর পারি না মা!' তীর্থপতি আবার কলম তুলে নিল।

আমোদিনী একটা ঢোঁক গিলে স্মিত হেসে বললেন, 'ভাবছি, এবার তোর বিয়ে দেব। তোর এত অশান্তপনা আমার এই বুড়ো হাড়ে আর সয় না। রাত জাগবি রোজ, শরীর খারাপ হচ্ছে কত।'

'হ্যাঁ, খারাপই বটে!' তীর্থপতি কাগজ কলম একপাশে সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসল। 'এর থেকে ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে কুস্তিগীর হওয়া যায়, সাহিত্যিক হওয়া যায় না। তীক্ষ্ণ ইন্‌টেলেক্‌টের কারবার করা যায় না। শারীরিক অস্বাস্থ্য বাইরের জগত থেকে প্রেরণাকে অতি সহজে অন্তরে গ্রহণ করতে পারে। আর সেইটাই আমাদের মনের খোরাক, সৃষ্টির কলকাঠি। লেখাপড়া ত' করলে না কোনদিন, কী তোমাকে বোঝাব!'

আমোদিনী স্তিমিত দৃষ্টিতে তীর্থপতির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসেন। বলেন, 'ভারি ভুল হয়ে গেছে খোকা। তোকে এত শেখালাম, তুই আমাকে একটু একটু ক'রে পড়াবি? তুই আমাকে পড়ালে, দেখবি দুদিনে আমি সব শিখে ফেলেছি।'

তীর্থপতি আড় চোখে আমোদিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হা হা ক'রে সশব্দে হেসে ওঠে।

'হাসিস যে বড় !'

'হাসব না ?'

'না, এত রাতে অমন ক'রে হাসিস না তুই তীর্থ !' আমোদিনীর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ভারি শোনায়। আমোদিনী উঠে তীর্থর চেয়ারের পিছনে এসে তীর্থর মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে গ্রহণ ক'রে আর্দ্রস্বরে বলেন, 'এই গভীর রাতে অমন ক'রে আর কখনও তুই হাসিস না, তীর্থ ! আমার ভয় করে।'

তীর্থর হাসি নিভে গেল। তীর্থ দেখল আমোদিনীর সরু আঙুলগুলির প্রান্ত তখনও মৃদু মৃদু কাঁপছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হবার পর তীর্থ হঠাৎ বলল, 'তোমাকে নিয়ে সত্যিই আমি আর পারি না মা ! কিসে যে তোমার কী হয়, আমি আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। কখনও এসে বলবে, তীর্থ একটু হাস ত', আমি দেখি আবার কখনও বলবে, অমন ক'রে হাসিস না, আমার ভয় করে। তুমি শুতে যাও মা ! আর রাত ক'রো না।'

'তোকে ঘুম না পাড়িয়ে আমি কোনদিন শুতে গেছি ?'

'মা, আজও কী আমি তেমনি খোকাটি আছি যে, আমাকে ঘুম পাড়াতে হবে।'

আমারও তাই মনে হয়। বড় ভয় হয় খোকা, কখন আমার অধিকারটুকু তুই কেড়ে নিস। যা অশান্ত তুই !'

'বুঝেছি, আমাকে ঘুম না পাড়িয়ে তুমি যাবে না। ভাবছি, তোমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখব। এই পৃথিবীতে তোমার মত এমন অদ্ভুত মা আর আছে কিনা, জানি না। থাকলেও আমার গল্প পড়ে তাদের শিক্ষা হবে। কারণ, গল্পে থাকবে ভীষণ খোঁচা, ব্যঙ্গভরে তোমাকে চিত্রিত করব।'

তীর্থপতি শয্যায় এল।

আমোদিনী বললেন, 'বাজে বকিস না খোকা ! তোকে আমি চিনি।'

তীর্থপতি চোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগল।

আমোদিনী তীর্থর চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করতে করতে বললেন, 'ঘরে একটা বৌ না এলে আর মানায় না। কবে মরে যাই ঠিক কী ! আমাকে নিজে দেখে আনতে হবে।'

তীর্থপতি চোখ বুজে বলে, 'তোমার ঐ রাঙা টুকটুকে খুকী বৌ নিয়ে আমার চলবে না। আমি লেখাপড়া করেছি অনেক, অনেক বড় হয়েছি। আমার মত ও পথ বুঝতে পারে, আমার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে এমন মেয়ে আমার দরকার। টুকটুকে একটি মাকাল ফল বিয়ে করায় আমার ভীষণ আপত্তি আছে।'

আমোদিনী তবু হাসেন। বলেন, 'তোর বাপ যে এত বড় পণ্ডিতলোক ছিলেন আর আমি যে নিজের নামটাও ভাল ক'রে লিখতে পারি না, তাতে হয়েছে কী ! আমি কী তোর খারাপ মা ? তোর মা কি রকম হলে, তুই তাকে আরও বেশী ভালবাসতিস, বলবি তীর্থ !'

তীর্থপতি বালিশ থেকে মাথাটা তুলে আমোদিনীর কোলে মাথা রাখল। 'তোমার থেকে ভাল আবার কেউ হয় নাকি মা !'

'জানি, তুই ঐ কথা বলবি। মেয়েদের যা কাজ তাতে পড়তে হয় না। তোদের কর্তব্য পথ এবং মেয়েদের কর্তব্য আর পথ, এক নয়। কলেজে-পড়া একটা রুগ্ন মেয়ে না এনে যদি স্বাস্থ্যেভরা টুকটুকে অশিক্ষিত একটি মেয়েকে আনি, তাতে তোর দুঃখ করবার কিছু নেই। তাকে আমি তৈরি করতে পারব, তোর মত ক'রে। সে কত নরম,— কয়েকখানা বই পড়ে কতকগুলি বিদ্ঘুটে ধারণা নিয়ে সংসার করতে আসবে না। আমি দেখলেই বুঝতে পারব, কে তোর উপযুক্ত। বলেছি ত তীর্থ তোদের আর আমাদের পথ এক নয়। তোরা তোদের কর্তব্য করবার পথে কর্মের পথে, কোন বাধা না পাস, কোন প্রতিবন্ধক তোদের পথকে না আটকে রাখে, সেই পথকে প্রশস্ত আর মসৃণ ক'রে রাখাই আমাদের কাজ। বাধা আসে। দুঃখ আছে মানুষ জন্মের। কিন্তু তাকে জয় করবার শক্তি যোগাই আমরা, প্রেরণা বয়ে আনি আমরা যাতে তোদের চলার পথে সংসারের অজস্র খুঁটি-নাটি, ভুল ত্রুটি, শান্তি অশান্তি তোদের দূরপ্রসারী দৃষ্টিকে পিছনে না টানে। সংসার আমাদের, সেখানকার যত কাজ তাও আমাদের, তোরা সেখানে নিমন্ত্রিত অতিথি। আমা-দের যা কাজ তা শিখতে আমাদের মাস্টারের প্রয়োজন হয় না। আমাদের শরীরের রক্ত আমাদের শেখায়। আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি,—এক কথায় প্রকৃতি থেকে আমরা যতটা নিতে পারি তোরা ততটা পারিস না। মেয়েদের শিক্ষার প্রকৃতি পুরুষরা বরাবরই ভুল বুঝেছে, তাই চিরটা কাল চেষ্টার নামে অপচেষ্টা চলে এসেছে। মেয়েরা কথা বলে না, তার কারণ, খানিকটা নূতনত্বের মোহ তাদের বিব্রত করে। আমি যথেষ্ট শিক্ষিতা নই বলে কী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা'দের সঙ্গে এক আসনে বসবার যোগ্য নই ! আমি কী তোকে মানুষের মত মানুষ ক'রে গড়ে তুলি নি ? আমার সংসারে আমার উপস্থিতিতে কোন বড় ত্রুটি কখনও ঘটেছে কী ? এইখানেই আমি সার্থক খোকা ! আমার কর্তব্য আমি করেছি। ক'পাতা বই পড়িনি বলে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। তোর লেখা ত' পড়তে পারি, বাঙলায় যা লিখিস ! এই-ই আমার যথেষ্ট। কিন্তু খোকা, আর একটু সহজ ক'রে লিখতে পারিস না তুই, আমার বুঝতে বড় কষ্ট হয়।'

তীর্থপতি অনুভব করল আমোদিনীর আঙ্গুলগুলি আর নড়ছে না তার চুলের মধ্যে। তীর্থপথি হঠাৎ বললে, 'দেখি তোমার পা দু'খানা।'

'সে কী রে ! আমার পায়ে আবার কী হল ?'

'একটু ধুলো লাগবে যে মা ! কিছুই জানি না অথচ কত গর্ব আমার মনে।'

তীর্থপতি হাত বাড়িয়ে আমোদিনীর পাদস্পর্শ করল। আমোদিনী স্মিত হেসে বললেন, 'পাগল'। নীচু হয়ে আল-গোছে তীর্থর কপালে ঠোঁট দু'খানি স্পর্শ করলেন আর অমনি আমোদিনীর দু'চোখ ভরে জল এল।

তীর্থ ঘুমিয়েছে, নিভে গেছে সমস্ত অশান্তপনা আর

চঞ্চলতা। আমোদিনী ভাবলেন, কত দীর্ঘ সময় পরে তীর্থ আবার চোখ মেলে চাইবে, মৃদু হেসে তাঁকে ডাকবে, আর তাঁকে রাগানোর জন্য বলবে যত সব বড় বড় কথা। কেন মা'দের কাছে এমন সব ছেলেরা আসে, তীর্থর মত যারা। কেন আসে তারা কষ্ট দিতে ? কষ্ট ছাড়া আর কী ! এত যে ভালবাসা, সমস্ত দেহমনে তীব্র যন্ত্রণার মত এই যে অনুভূতি, এ কষ্ট ছাড়া আর কী ! জীবনটাকে বিস্তৃত ক'রে উদার দৃষ্টিতে তিনি দেখতে শিখলেন না। তীর্থকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে তাঁর সব কিছু।

আমোদিনী অতৃপ্ত নয়নে বহুক্ষণ তীর্থর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কবে তীর্থ এত বড় হল ? এমন সুন্দর মুখ, এমন বলিষ্ঠ দেহ, আর এমন কোঁকড়ানো কালো চুলের গুচ্ছ কবে তাকে এমন ক'রে সাজাল ?

আমোদিনী নিজের ঘরে এলেন। প্রভাকরের প্রকাণ্ড তৈলচিত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে বললেন, 'কিছুই তুমি দেখে গেলে না, কিছুই তুমি পেলে না। আমাদের দিয়েছ অনেক, পাও নি কিছুই। আমার ক্ষোভ শুধু এই, তুমি আজকের তীর্থকে দেখতে পেলে না।'

তীর্থপতি ঘুমোয় নি। ঘুমোনোর ভাণ না করলে আমোদিনী উঠবেন না জেনে তীর্থপতি চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে ছিল। তীর্থপতির হঠাৎ মনে হল, সত্যিই সুন্দরী একটি স্ত্রী থাকলে মন্দ হয় না। তীর্থপতির ভাবনাটা নেহাত গদ্যময়, ছন্দহীন। একটু কবিত্ব ক'রে ভাবলে দোষ কি ছিল ! তীর্থপতির কান দুটো গরম হয়ে উঠল, সমস্ত মুখে এক ঝলক উষ্ণ রক্তস্রোত ছড়িয়ে পড়ল। এ কী হল তীর্থর ! তীর্থপতি হঠাৎ তীব্রভাবে কোন নারীকে কামনা করল, অজানা, অচেনা, অদেখা কোন কুমারী। ফুলের মত কোমল আর সৌরভময় যার যৌবন, আকাশের মত উদার যার মন, এমন কোন কুমারীকে সে কামনা করল। জেগে স্বপ্ন দেখে বিনিদ্র রজনী যাপনের ক্লান্তি যে এত মধুর তা তীর্থ কোনদিন কল্পনাতেও আনে নি।

ঢং ক'রে দেওয়াল ঘড়িতে একটা আওয়াজ হল। রাত্রি একটা। তীর্থপতির মস্তিষ্ক যখন শব্দটাকে গ্রহণ করল তখন হঠাৎ তার হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। নিবটা ভেঙেছে বোধ হয়, সোনার নিব। ক্লান্ত একটা ভঙ্গী ক'রে তীর্থপতি সামনে তাকাল। অদূরে আরাম চেয়ারটা খালি পড়ে রয়েছে। কালই ওটাকে অন্য কোথাও রাখতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতেও পারে, তীর্থ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—তিন বৎসর ধরে এই একই প্রতিজ্ঞা তীর্থ ক'রে আসছে।

ডান দিকে মুখ ঘুরাল তীর্থপতি। প্রশস্ত পালঙ্কে নীরা ঘুমুচ্ছে। শেডের আড়াল থেকে কেমন ক'রে যেন এক ফালতে আলো ওর মুখের ওপর পড়েছে, দেহের একাংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তীর্থপতি রোজ রাতে এমনি ক'রে, চোরের ভীরুতা নিয়ে লুকিয়ে, নীরাকে দেখে,—নীরা যখন ঘুমোয়, নীরা যখন কথা বলে না। আর যখনই নীরা কথা বলে, তখনই তীর্থপতির ভয় হয়, নীরা আজ তাকে কি ভাবে আঘাত করবে। তীর্থপতি সাধারণত নীরার মুখের দিকে তাকায় না, অন্তত নীরা যখন কথা বলে, তখন ত' নয়ই। প্রতি ফোঁটা অশ্রুর পিছনে ইতিহাস আছে, নীরা তার খবর রাখে না। যে অশ্রু উপাধান সিক্ত করে সেইটাই যে সত্য, তা নয়।

বাস্তবিক নীরা কত সুন্দর। তীর্থপতি ভেবে পায় না, পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে নীরা তার কাছে কেন এল। চোখ, নাক, কপোলের নরম রেখা, বঙ্কিম, কোমল ঠোঁটের রক্তাভায়, দেহাবয়বে তার কোন খুঁৎ নেই। একটা শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য। কিন্তু প্রাণ নেই, নেই যৌবনসুলভ ভাবপ্রবণতা। নীরা বলে, 'কেমন ক'রে দিনের পর দিন তুমি এই 'কোল্ড লিটারেচার,' সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছ, আমি ভেবে পাই না'। তীর্থপতি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিকৃত হেসে অস্ফুটে বলল, শীতল সাহিত্য, 'কোল্ড লিটারেচার'। অনুবাদটা বেশ। তীর্থপতি মনে মনে কয়েকবার বলল, 'শীতল সাহিত্য', 'শীতল সাহিত্য'। এই শীতল সাহিত্য বছরের পর বছর তীর্থপতি সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে আর পাঠকরা সমাদরে তাই গ্রহণ করছে। দেশের মানুষগুলোকে সে ঠকাচ্ছে নাকি? সাহিত্যটা কী তার ফাঁকির ব্যবসা। এত লোকে তার যে প্রশংসা করছে অযাচিতভাবে, এর কী কোন মূল্য নেই।

তীর্থপতি আবার আরাম চেয়ারটার দিকে তাকাল। কেমন এক ধরণের হাসিতে ওর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁর তীর্থর জন্য একটা টুকটুকে বৌ আনার কল্পনা ছিল মা'র। বৌ সুন্দরী, এত সুন্দরী যে তীর্থর সময়ে সময়ে অসহ্য লাগে, মনে হয় এ বুঝি মাটির মানুষ নয়। সংসারটাকে গুছিয়ে কারও হাতে সঁপে দিয়ে ধীরে সুস্থে যাবার একটা লোভ ছিল মা'র মনে। কিন্তু তা কী হয় ? মানুষের শ্রেষ্ঠ ইচ্ছার ওপর ভগবানের অভিসম্পাত আছে। ফলপ্রসূ হয় না কখনও। হয়ত' মানুষের শ্রেষ্ঠ ইচ্ছাটাই ফলপ্রসূ হবার জন্য নয়,—মিশে যাওয়া, লোপ পাওয়াতেই তার সার্থকতা।

নীরা আশ্চর্য রকম দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মেনে চলে। দশটা বাজলেই শুয়ে পড়ে, এক কাপ ওভালটিন খেয়ে। বলে, এতে ঘুম হয় ভাল, আর 'মর্নিং সিকনেসে' ভুগতে হয় না কখনও। যাবতীয় প্রকার দামী সাবান, স্নো, ক্রীম, এককথায় 'স্কিন্ ফুড' খেয়ে (মেখে) নীরার দেহের চামড়া সাটিনের মত উজ্জ্বল, আর রেশমের মত কোমল। নীরা বি এ পাশ করেছে, কত ইংরেজী বই পড়েছে, কিছুদিন ফ্রেঞ্চও শিখেছিল—বাড়িতে গবর্নেস রেখে। বাস্তবিক, নীরার গুণ অনেক। তীর্থপতির মত এমন নিছক আগাগোড়া বাঙালী স্বামী, যে শুধু শীতল সাহিত্য রচনা করে, যে গত দশ বছরের সাহিত্যে 'নোবল প্রাইজ উইনারদের' তিনজনের নামও নির্ভুল বলতে পারে না, নীরা তার জন্য কী ক'রে রাত্রি দশটায় না ঘুমিয়ে 'মর্ণিং সিক্‌নেসে' ভুগতে রাজি হতে পারে!

তীর্থপতি দেখল, নীরা ঘুমিয়েও কী যে চিন্তা করছে, হয়ত স্বপ্নের ঘোরে মনে মনে বলছে, পার না লুসির মত একটা চরিত্র সৃষ্টি করতে, তুমি কখনও হাক্সলির মত একটা 'সেণ্টেন্স' লিখেছ, লরেন্স বহু বছর আগেও তোমাদের থেকে অনেক ভাল লিখে গেছে।

তীর্থপতি একটা সিগ্রেট ধরাল, আর ঠিক সেই সময়েই দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা আওয়াজ হল। তীর্থপতি আজকাল সিগ্রেট ধরেছে। কিছুদিন ধরে ভাবছে মদটাও ধরবে নাকি! যথেষ্ট টাকা আছে তার। টাকাগুলো এক জায়গায় থেকে পচবে, তার থেকে মাঝে মাঝে হাত বদ্‌লানো ভাল। কার জন্য রেখে যাবে সে? ঘড়ির এই দুটো আওয়াজ তীব্র মধুর নেশার মত তীর্থপতিকে পেয়ে বসেছে। এই শব্দ দুটো শুনবার জন্য তীর্থ অনেক সময় কাজ না থাকলেও বসে থাকে। নিস্তব্ধতার বুক চিরে এই গম্ভীর শব্দ তার কাছে অনেক অর্থ প্রকাশ করে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির ছবি অস্পষ্ট হতে পারে না, মুছে যেতে পারে না মন থেকে। তীর্থপতি সিগ্রেট ধরিয়ে তীব্র আলোর দিকে তাকিয়ে একা প্রেতের মত বসে কী যেন ভাবে।

সুখসুপ্তিতে ডুবে গেলে নারীর আঁখি পল্লবে, সমস্ত মুখে, দেহের বিবশ এলোমেলো রেখাগুলিতে, দু'বাহুর ভীরু সঙ্কোচনে যে শ্রী ফুটে ওঠে, নীরার তা নেই। নেই সে শ্রী। তীর্থপতি বহু বিনিদ্র রাত জেগে স্পষ্ট তা জানতে পেরেছে। ও ঘুমিয়েও কী যেন চিন্তা করে গভীরভাবে, নারীজাগরণ সম্বন্ধে চেস্টারটনের প্রবন্ধটা বোধ হয়, বা অন্য কিছু।

তীর্থপতি এক গ্লাস জল খেল। ধীর পদক্ষেপে সমস্ত ঘরটায় কয়েকবার পায়চারী করল। শূন্য আরাম চেয়ারটা কয়েকবার অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করল। তারপর হঠাৎ আয়নার বুকে নিজেকে দেখে থমকে দাঁড়াল। এ কী শ্রী হয়েছে তার? দু'চোখের নীচে এমন গভীর কালো রেখা পড়ল কবে? মাথার সামনের চুলগুলি দুটো একটা ক'রে সব উঠে গেছে। কপালটা তাই অসম্ভব রকম চওড়া দেখাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে যেন মাথার মধ্য থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। শুষ্ক, খস্‌খসে দু'খানি ঠোঁট, আর রক্তাভ দুটি চোখ।

তীর্থপতি নিজেকে দেখে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে হাসল।

নীরার সমস্ত মুখে অন্ধকারের মত কালো, কুটিল কতকগুলি রেখা। কী ও চায়? তীর্থপতি মনে মনে অনেকদিন জিজ্ঞেস করেছে, কী ও চায়। আর কিছু কী দেবার আছে? তীর্থপতির আর কিছুই নেই। তীর্থপতি ভেবে দেখল সে পশুর মত ভীরু। বোবা পশুর মত দৃষ্টি দিয়ে নীরার সর্বাঙ্গ সে লেহন করছে।

তীর্থপতি মাঝের দরজাটা খুলে ও ঘরে গেল। আমোদিনীর প্রকাণ্ড তৈলচিত্রখানা প্রভাকরের পাশে রাখা হয়েছে। অমন কঠিন অসুখের মধ্যেও মা'র কিছু ভুল হয় না, তীর্থপতি ভাবল। 'খোকা, আমাকে নিয়ে তুই একখানা বই লিখিস। শুধু তুই আর আমি আর—আর—আচ্ছা তোর বৌও থাকতে পারে। আমাকেই উৎসর্গ করবি বইখানা। আমাকে তুই কিছুই দিলি না তীর্থ!'

বাস্তবিক সেই ক'টা দিন মা যেন ক্রমেই সাংঘাতিক রকমে ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছিল, তীর্থ মনে ক'রে দেখল। তীর্থ কতবার যে বলেছে, 'তোমাকে নিয়ে আর ত পারি না মা!'

তীর্থপতি শয্যাগ্রহণ করল। সত্যি কিছুই দিইনি মাকে, তীর্থপতি বলল মনে মনে, ছবির দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ ঘড়িটা শব্দ ক'রে বেজে উঠল। তীর্থপতি সচেতন হয়ে দেখল তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কেমন ক'রে জিভ যেন এক ফোঁটা গ্রহণ করল। তীর্থপতি হেসে ফেলল, আর বলল অস্ফুটে, 'অশ্রুর আস্বাদ নোনতা।'

মনে ছিল আশা

(৪৭৭ পৃষ্ঠার পর)

হা হা করিয়া ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। জ্যোৎস্না ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, কী আধিখ্যেতা করা!.....মন্তরে হবে কেন, উনিও ত এই এলেন। জলখাবার তৈরিই ছিল। আর রসগোল্লাত আপনিই নিয়ে এলেন!

সে অমলের ভিজা গেঞ্জিটা লইয়া নিজেই কলঘরে চলিয়া গেল এবং নিজেই কাচিয়া আনিয়া দালানের আলনাতে শুকাইতে দিয়া কহিল, তুমি চট্ ক'রে বাজারটা ঘুরে এস, আবার যেন কোথাও গল্প করতে ব'স না।......আর আপনি জল খেয়ে নিয়ে আসুন ঐ রান্নাঘরের সামনে বসবেন, আমি কাজ করতে করতে বাবার গল্প শুনব।

ডাক্তার আদেশ পাইবা মাত্র তাড়াতাড়ি চা শেষ করিয়া বাজারের দিকে ছুটিলেন। একটা চাকরও আছে, সে বোধ হয় বাহিরে কোথাও আড্ডা দিতেছিল, এখন গৃহিণীর ধমক খাইয়া ব্যস্ত হইয়া ঝাড়ন লইয়া বাবুর সহিত বাজারে ছুটিল। আর অমলও জলযোগ শেষ করিয়া রান্নাঘরের সম্মুখের দাওয়ায় একটা ছোট চৌকীতে গিয়া বসিল।

(ক্রমশ)

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[১৪]

১৩ই ফাল্গুন।

বাঁড়ুজ্যে পড়াতে এসে দেখে ইলা ব'সে আছে, প্রহেলিকা নেই। এমনি গাফিলি তার রোজ হয় আজকাল, কিন্তু আজ একটু বাড়াবাড়ি। ইলা বল্‌লে প্রহেলিকা আজ পড়তে আসবেই না, ইলা একাই পড়বে।

পড়াবার মত মনের অবস্থা বাঁড়ুজ্যেরও ছিল না। ১৫ই ফাল্গুনের মহামুহূর্তের আয়োজনে সে হন্তদন্ত হ'য়ে রয়েছে।

তাই বইখানা সামনে খুলে রেখে সে ইলার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা কইলে তার ভিতর বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যবিষয় নেই বল্‌লেই চলে।

বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "আপনার বন্ধুটির পড়াশুনায় মন বড্ড কম, কি বলেন?"

ইলা বল্‌লে, "আমি কি বলবো বলুন, আমারই যা মন!"

"আপনার পড়ায় মন নেই? বলেন কি? আপনার মতন যদি আমার সব ছাত্র-ছাত্রী হ'ত তবে ব'র্তে যেতাম।"

"জানেন প্রহেলিকার পড়ায় মন নেই তা নয়, ও ভারী খামখেয়ালী। যখন যেটা খেয়াল হবে তা ক'রে তবে ছাড়বে। নিয়ম ক'রে কিছু করতে হলেই ওর বিপদ।"

একটু চিন্তাযুক্তভাবে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "হুঁ, তা বটে। এমন লোক নিয়ে সংসার করার মানে যে সংসার করবে তার হাঙ্গামা আছে।"

ইলা হেসে বল্‌লে, "ও বলে কি জানেন? বেটাছেলে দেখলেই ওর তাকে নাকি দাঁড় দিয়ে ঘোরাতে বা বাঁদর নাচাতে ইচ্ছে করে।"

"হুঁ, তাই বোধ হ'চ্ছে।"—একটু চিন্তাকুলভাবে বাঁড়ুজ্যে একথা ব'লে ভাবতে লাগলো। এ কথায় তার নাকের ডগাটা অযথা টন্‌টন্ ক'রে উঠলো, যেন সেখানে দড়ি বেঁধে সত্যিই কেউ টানছে।

"আচ্ছা আজ উনি গেলেন কোথায়? কারও নাকে দড়ি পরাতে নাকি?"

"জানি না তো। বল্‌লে, কি একটা বিয়ের উজ্জুগ"—

বাঁড়ুজ্যের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো। কথাটা আশার ও আনন্দের, কিন্তু ওই নাকের ডগায় যেন কিসের টান লাগতে লাগলো।

"আচ্ছা, আপনি বিয়ে করবেন না?"

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো ইলা; সুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"মানে, বিয়ে কি ঠিক হ'য়ে গেছে আপনার?"

সস্মিত হাস্যের সহিত ইলা বল্‌লে, "হাঁ"।

"বেশ, বেশ, নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে তা' হ'লে। হাঁ কবে বিয়ে হবে আপনার?"

"পরশু"।

"বটে? পরশু—অ্যাঁ—তা আপনার নিশ্চয় খুব আহ্লাদ হচ্ছে।"

"না, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে—যাঁর সঙ্গে বিয়ে তিনি আমাকে জানেন না, তাই বড্ড ভয় হচ্ছে।"

"ও কিছু ভয় পাবেন না।। আপনার মত স্ত্রী যে পাবে, সে যত বড় হতভাগাই হোক, তার আপনার পায় প'ড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ওই আপনার বন্ধু যা বলেন নাকের দড়ি ধ'রে টানলেই নাচবে সে, যত বড় ভালুকই হোক।"

আবার ইলা লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল। সে বল্‌লে, "যান, কি যে বলেন।"

"আমি জানি তাই ব'লছি। আমাদের জাতকে জানি, তার ভিতর এমন মর্দ কেউ নেই যে আপনার মত এতখানি রূপ আর এত গুণ দেখে আবার টাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করবে। জানেন, আমরা"—

"খুব ক্যালকুলাস পড়া হচ্ছে যে দুজনে," বলে প্রহেলিকা এক পাঁজা কাগজের বাণ্ডিল হাতে ক'রে তীব্র কুটিল দৃষ্টিতে দুজনের দিকে চাইতে চাইতে প্রবেশ করলে।

বাঁড়ুজ্যে একেবারে নিভে গেল। কি বলবে ভেবে পেলো না।

প্রহেলিকা বল্‌লে, "ছি, মাস্টার ম'শায়, আপনার এই চরিত্র। পরশু আপনার বিয়ে আর আজ ওর 'এতখানি রূপ—এতো গুণের' প্রশস্তি গাইছেন? ছিঃ! বেটাছেলেকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই!"

"না দেখুন, আমি সে রকম কিছু বলি নি, বলেছি কি?" প্রশ্নটা করা হ'ল ইলাকে।

ইলা ঘাড় নীচু ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো শুধু।

প্রহেলিকা আর কিছু না ব'লে, বোঁ ক'রে ঘুরে বাড়ির ভিতর যায় দেখে বাঁড়ুজ্যে দাঁড়িয়ে উঠে আকুল কণ্ঠে বল্‌লে, "না দেখুন, ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে—আর দোষ হবে না। বিশ্বাস না করেন, এ দুদিন না হয় আর পড়াতে আসবোই না।"

প্রহেলিকা ফিরে বল্‌লে, "আচ্ছা, তবে এখন যান আপনি, আর আসবেন না। পরশুর engagement ঠিক থাকে যেন। এই ঠিকানাটা মনে রাখবেন।" ব'লে সে একখানা কাগজে ঠিকানা লিখে বাঁড়ুজ্যের হাতে দিলে।

বাঁড়ুজ্যে নিতান্ত অপরাধীর মত মাথা গুঁজে পায় পায় বেরিয়ে গেল।

প্রহেলিকা তারপর তার প্যাকেটগুলো খুলে ইলাকে দেখাতে লাগলো। চমৎকার চমৎকার শাড়ী জামা গয়না। দুই বন্ধুতে মিলে ঝাড়া এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে কেবল সেগুলোর রূপে উপভোগ ক'রে।

তাদের এই সম্ভোগের মধ্যস্থলে এলেন বিদূষক ম'শায়। এসেই তিনি বল্‌লেন, "মেয়েছেলের লেখাপড়া শেখা মিথ্যে—ওতে কিছুই হয় না তাদের।"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "তা ঠিক। লেখাপড়া শিখে উন্নতি হ'তে পারে পুরুষের, মেয়েদের হ'তে পারে না। পিতলকে গিল্টী ক'রে সুন্দর করা যায়, সোনার তাতে কোনও পরিবর্তন হয় না।"

"বটে! যাই হোক একথায় আমরা একমত, যে তোমাদের লেখাপড়া শেখাটা নেহাৎ বাজে খরচ। যতই পড় যতই লেখ, শাড়ী আর গয়নার মোহ তোমাদের বদলায় না, তাই ঐ শাড়ী গয়না দেখিয়েই পুরুষেরা তোমাদের গলায় অনায়াসে বঁড়শী বিঁধে দেয় তা' সে তোমরা নিরক্ষরই হও, আর বি-এই পাশ কর!"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "ভুল, বিদূষক ম'শায়, ভুল। শাড়ীই দিক গয়নাই পরাক, আসুক দেখি মরদ যে আমার গলায় বঁড়শী বিঁধাবে?"

"অন্ততঃ একজন তো হালফিল পরাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এখন সে সুতো ছাড়ছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ডাঙ্গায় তুলতে দেরী নেই।"

"ফোঃ" ব'লে প্রহেলিকা অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলে ইলার জিম্বা ক'রে দিলে।

ইলা চ'লে গেলে সে বল্‌লে, "বাজে কথা থাক। যে কাজে গিয়েছিলেন তার কি হ'ল? সন্ধান পেলেন?"

"পেয়েছি। আজ সন্ধেবেলা চাটগাঁ মেলে—"

"চাটগাঁ মেল তো আটটায় আসে। তবে আপনি এখনো এখানে কেন? যান।"

"এখানে এসেছি এক পেয়ালা চায়ের আশায়। না—আজ আর রাস্তায় গিয়ে চা খাবো না। আজকে, Polly put the kettle on."

"আচ্ছা দিচ্ছি চা", বলে প্রহেলিকা ভিতরে গেল। খানিক পরে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে এসে সে বল্‌লে, "এদিককার বন্দোবস্ত সব ঠিক তো?"

"হাঁ ঠিক সব।"

[১৫]

১৫ই ফাল্গুন।

প্রহেলিকার বাড়িতে জোর সানাই বাজতে লাগলো ভোর বেলা থেকে। মেড়াপ উঠলো, ইলেক্‌ট্রিক লাইটের মালা জ্বলে উঠলো, লোকজনের আনাগোনায় বাড়ি সরগরম হ'য়ে উঠলো, বাড়ির লোকের গলা ভাঙলো, ছাদের উপর ভিয়েন বসলো, ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি সন্দেশ ও হাঁড়ি হাঁড়ি দই যথানিয়মে গোপনে স্থানান্তরিত হ'ল, রাজ্যের লোক চুরি ক'রে ভাঁড়িয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে গেল—ক'লকাতার বিয়ের আনুষঙ্গিক সব অঙ্গই যথানিয়মে হ'ল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বেলা থাকতেই শ্রীবিলাস সদল-বলে এসে হাজির।

তার মনটা একটু উদ্বিগ্ন। ঠিক এই সময় আর এক বাড়িতে শশির যাবার কথা তার স্থলবর্তী হ'য়ে বিয়ে করতে। সেখানে ব্যাপারটা ঠিক কি রকম দাঁড়াল সে সম্বন্ধে কাল থেকে কোনও খবর না পাওয়ায় তার মনে খানিকটা সন্দেহ ও প্রচুর আতঙ্ক ছিল। তাই সেখানকার খবর পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সে প্রতিনিয়তই এদিক ওদিক চাইছিল।

বিয়ে হ'তে থাকলো। সেদিকে সে মোটেই মনোযোগ দিতে পারলে না। কি কতকগুলো মন্ত্র পড়া হ'ল, ফুল চন্দন, মালাটালা নিয়ে কি সব হ'ল। কতকগুলো লোক বোধ হয় ঘুরপাক খেলে। একবার বোধ হয় মেয়ের মুখ খোলা হ'ল, কিছুই তার খেয়াল হ'ল না। সে বার বার খোঁজ করতে লাগলো তারিণী এসেছে কি না।

বিয়ের সর্বাঙ্গ যখন সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল তখন বাসর ঘরে যাবার পথে তারিণী এসে তার কানে কানে ব'লে গেল, সব মিটে গেছে। প্রথমে মেয়ের বাপ একটু গোলমাল করেছিলেন, কিন্তু শশির পরিচয় পেয়ে আর কিছু বলেন নি। পাঁচ হাজার টাকার নোট তারিণী শশির কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে শ্রীবিলাস, বিশেষ ক'রে এই শেষ কথায়। এতক্ষণে তার কুঞ্চিত ভ্রূযুগ সোজা হ'লো, ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো।

তারিণী তার কানে কানে বল্‌লে, "কিন্তু ঠ'কেছ দাদা! আমি বউ দেখে এসেছি, খাসা দেখতে। এ বউদির চেয়ে ভাল। আর যৌতুক যা দিয়েছে পঁচিশ হাজারের কম নয়।"

অ্যাঁ! বলে কি? শ্রীবিলাস একেবারে যেন স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লো।

লোকসানের উপর লোকসান। একে তো সুন্দরী স্ত্রী হাতছাড়া হ'ল তার উপর নগদ পাঁচ হাজার টাকা। এখানে, শেষে যেচে বিয়ে করেছে ব'লে এঁ'রা নগদ টাকা কিছুই দেন নি, গয়না, দান যা দিয়েছেন বড় জোর হাজার চারেক টাকা। কি দুর্মতি তার হয়েছিল! যাক গে—

বাসর ঘরে এসে শালী শালজরা ঘিরে ধ'রে তাকে যথোচিত নাকাল ক'রে শেষে ক'নের মুখের ঘোমটা খুলে বল্‌লে, "ওগো চাও, একবার চেয়ে দেখ তোমার এত সাধনার ধন!"

দেখলে চেয়ে শ্রীবিলাস, একটু অপ্রসন্ন মুখেই। তারপর চোখ দুটো ডেলা ডেলা ক'রে মুখের কাছে নিয়ে দেখলে, দেখে সে ভিরমি খেয়ে প'ড়লো।

এ কে?—প্রহেলিকা তো নয়।

শ্রীবিলাস দাঁড়িয়ে উঠলো, "জুচ্চুরী, জুচ্চুরী, স্রেফ জুচ্চুরী। Cheating case করবো।" ব'লে সে চীৎকার ক'রে উঠলো।

তার রকম সকম দেখে মেয়ের দল টেনে ছুট মারলে

জামাই পাগল হ'য়ে গেছে স্থির ক'রে। ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে মেয়ের বাপ ভাইরা ছুটে এলো।

"কি হে কি ব্যাপার কি?" বল্‌লে বেচু চৌধুরী।

"ব্যাপার জুচ্চুরী। ফৌজদারী করবো, এ মেয়ের সঙ্গে তো আমার বিয়ের কথা হয় নি।"

"কী রকম" তেড়ে উঠলে বেচু চৌধুরী, "চোয়াড় শালা! এ মেয়ে নয় তো কোন্ মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল রে শালা?"

গোলমাল দেখে বরযাত্রীরাও এলেন।

খুড়ো বল্‌লেন, "কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?"

বেচু বল্‌লে, "শালার কথা শুনুন। যেচে এসে বিয়ে ক'রলে, মেয়ে দেখলে না, এখন বলে এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয় নি। ভেবেছে, এই কথা ব'লে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় ক'রবে? শালা ছুঁচো"—

খুড়ো কনের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ছি বাবাজী, এ কি কথা? এই মেয়েই তো আমি তোমার কথায় আশীর্বাদ ক'রে গেছি। চৌধুরী ম'শায়ের তো আর মেয়ে নেই। এসব কি করছ?"

শ্রীবিলাসের মাথা একটু ঠাণ্ডা হ'তেই সে বুঝতে পারলে যে, দোষ তারই। লেকের ধারে প্রহেলিকাকে দেখেই সে বিয়ে করতে এসেছিল বটে, কিন্তু প্রহেলিকা যে কর্তার মেয়ে এটা সে সুধু ধ'রেই নিয়েছিল, কোনও প্রমাণ না পেয়েই। তাই কর্তার মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাবই সে করেছিল, তাকেই বিয়ে করেওছে। সে যে প্রহেলিকা নয়, সেটা কর্তার বা তাঁর ছেলের দোষ নয়। সে চুপ মেরে গেল।—আসল কথা সে আর খুলে বল্‌লে না। তাই সবাই অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলে এ কাণ্ডটা কেন ক'রলে সে!

তারপরে বাসরে তার লাঞ্ছনার আর অবধি রইলো না। কান দুটো প্রায় ছিঁড়েই গেল। যারা সুযোগ পেল তারা সে সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে কান টানলে পরিহাসের ভাণ ক'রে, কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে।

পরিশেষে শ্রীবিলাস আর একবার তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখে আশ্বস্ত হ'ল। সে নেহাৎ ঠকে নি। এখন মনে হ'ল বউটি দেখতে দিব্যি। কিন্তু তাহ'লে—সে কে?

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ২৫নং গোল্লাপাড়া লেনের বিবাহ আসরে ব'সে নিখিলেশ যখন সপ্তম স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্যে পা বাড়াচ্ছে তখন সে ধপ ক'রে আছাড় খেয়ে প'ড়লো।

শুভদৃষ্টির সময় তার চোখের দৃষ্টিতে অশেষ প্রেম মাখিয়ে প্রহেলিকাকে সম্ভাষণ ক'রতে গিয়ে সে দেখলে—আর একজন!

ভয়ানক চমকে গেল সে কিন্তু বুদ্ধিমানের মত চুপ মেরে গেল। সেই যে মুখ বুজলে, সে মুখ খুললো প্রায় শেষ রাত্রে, বাসরের হাঙ্গামা যখন মিটে গেল।

নববধূর দিকে চেয়ে সে দেখলে, প্রহেলিকা না হ'লেও সে সুন্দরী। সে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম কি?"

বধূ মাথা নীচু ক'রে বল্‌লে, "অশোকা।"

বেশ মিষ্টি গলা মেয়েটির।

"তুমি কি পড়?"

"থার্ড ইয়ারে পড়ি।"

তার হাতখানা নিখিলেশ হাতের ভিতর টেনে নিলে। ভারী নরম, ভারী মিষ্টি হাতখানা।

যা'ক সে ঠকেনি।

কিন্তু বড় লজ্জা পেয়েছে সে! সেই দুরন্ত মেয়েটা তাকে এমনি ক'রে ঠকিয়ে আচ্ছা নাকাল করেছে। যাহ'ক সে ঠকামির কথা এরা যখন কেউ জানে না তখন চেপে গেলেই হবে। কে আর লজ্জা দেবে তাকে?

বেশ খুসী হয়েই সে আলাপ সুরু করলে।

কথায় কথায় অশোকা বল্‌লে, সে নিখিলেশকে দেখেছে বিয়ের আগে।

"কবে? কোথায়?"

"কেন সেই সেদিন, লেকের ধারে যখন প্রহেলিকা আপনার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করলে—আমি তো তখন সঙ্গেই ছিলাম।" ব'লে অশোকা হাসতে লাগলো।

"যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যে হয়।" নিখিলেশ ভেবেছিল লজ্জার হাত থেকে সে রক্ষে পাবে, কিন্তু সে জন্য যার না জানাটা সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল সেই সব জানে!

নিখিলেশ একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

বাঁড়ুজ্যে যখন বিয়ে ক'রতে গেল তখন সে খুব উৎফুল্ল মেজাজে ছিল না। বরং তার ভাবটা অনেকটা হাড়ি কাঠে যাবার পথে পাঁঠার মত হয়েছিল। ইদানীং দু চার দিন প্রহেলিকার যে মেজাজ ও যে ঈর্ষার পরিচয় সে পেয়েছে তাতে তার মনে হ'চ্ছিল ঠিক সে যে কথা ইলাকে বলেছিল—এমন মেয়ের সঙ্গে ঘর করতে লেঠা আছে।

গোপনে বিয়ে হ'চ্ছে, তাই "পরিমেয় পুরঃসর" হ'য়ে মাত্র দু'চারটি বন্ধু নিয়ে সে গেল বিয়ে করতে। যে বাড়িতে বিয়ে সেখানে কিন্তু অতটা ঢাক ঢাক গুড় গুড় দেখলে না। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরে বিয়ের আয়োজন যেমন হ'য়ে থাকে তেমনি হয়েছে।

যতই গোধূলি ঘনিয়ে এলো ততই তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। কেবলি মনে হ'ল "কাজটা ভাল হচ্ছে না।"

যাক্, উপায় যে কালে নেই আর, সেখানে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়া ছাড়া সে আর কি করবে।

বাঁড়ুজ্যে ভেবেছিল বিয়েটা হবে ব্রাহ্ম মতে। কিন্তু আয়োজন উজ্জুগ দেখলে সব হিন্দু বিবাহের। ভাবলে, কালে কালে কতই হবে। বামুন কায়েতে বিয়ে হবে, কিন্তু অনুষ্ঠানে হিঁদুয়ানী বজায় থাকবে! হাসি পেল তার।

সম্প্রদানের সময় সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবছিল শুধু ইলার সেই কথা। ভাবছিল আজ রাত থেকেই তার নাকে দড়ি দিয়ে প্রহেলিকা কি টানাটানিটাই লাগাবে! সে কিছুই শুনতে পেলো না।

(শেষাংশ ৪৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তিস্তা নদীর তীরে

(ভ্রমণ কাহিনী)

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার

গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী। আর সিকিমরাজ্য আমাদের বাঙলার প্রতিবেশী। এই সিকিম ও বাঙলার মধ্যে ব্যবধান শুধু দার্জিলিং জেলার পাহাড়গুলি। সিকিমের প্রধান নদী তিস্তা। এই তিস্তা নদীর তীর ধরে অগ্রসর হওয়াই সিকিম প্রবেশের সবচেয়ে সুগম উপায়।

বাঙলার সীমান্ত অঞ্চলে তিস্তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল জলপাইগুড়ির কাছে। সেখানে তিস্তা খুব প্রশস্ত, খরস্রোতা স্রোতস্বিনী। তার মাঝখানে প্রায় ১ মাইল প্রশস্ত একটি চর পড়েছে। এর একটু উত্তরে পশ্চিম তটে বৈকুণ্ঠপুরের বনভূমি। এই বনভূমিমাঝে ভবানী পাঠকের গুপ্ত আস্তানা ছিল। তার পোড়া ইটের ধ্বংসাবশেষ সেখানে আজও আছে। বাঙলার বিগত রাজনৈতিক ডাকাতি আন্দোলন ভবানী পাঠকের কার্যকলাপ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীতে ভবানী পাঠকের একটু উল্লেখ করেছেন।

আরও উত্তরে হিমালয়ের ঠিক পাদমূলে সুকনা স্টেশন, দার্জিলিং যাত্রীর সুপরিচিত। এই সুকনা থেকে বারো মাইল পূবে সিবোক। সিবোকের কাছে তিস্তা হঠাৎ হিমালয় ফুঁড়ে সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে। ঐ সুকনা থেকে সিবোক পর্যন্ত সমতল তরাইস্থিত অরণ্যভূমির মাঝখান দিয়ে বন বিভাগের একটি পাদচারী বা অশ্বচারী পথ গিয়েছে। এই পথ ধরে গেলে মহানদী পার হয়ে তিস্তাকূলে পেঁৗছান যায়। পথিমধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের (অর্থাৎ মহানদী ও তিস্তার) জল বিভাগ রেখা (Water Parting) অতিক্রম করতে হয়। এই জলবিভাগ রেখা সমগ্র উত্তর ভারতে একটি ভৌগোলিক গুরুত্ববিশিষ্ট স্থান। শিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, কালিমপঙ প্রভৃতি স্থানের পাহাড়পূজারী তরুণ উড়োপাখী (Wonder Vogel) দলের কাছে ওই স্থানটি বেশ সহজগম্য এবং তাদের যৌবনপূজার একটি তীর্থস্থান হওয়া উচিত।

সে প্রায় ২০ বৎসর পূর্বেকার কথা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এমনি সময়ে শৈশবের ক্রীড়াসহচর এক আত্মীয়ের নিকট হ'তে সিকিম ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেলাম। যথাসময়ে পরীক্ষার পর কঠোর অধ্যয়নজীর্ণ শরীর নিয়েই মধ্য হিমালয়ের ক্রোড়স্থ সিকিম রাজ্য অভিমুখে ছুটলাম।

রাত্রির গাড়িতে কলকাতা ছেড়ে পরদিন সকালে শিলিগুড়ি পেঁৗছলাম। তারপর কালিমপঙ অভিমুখী ছোট রেলগাড়িতে আবার আমার যাত্রা সুরু হ'ল। সমতল মাঠ, ধানের ক্ষেত ও বনভূমির উপর দিয়ে বারো মাইল যাবার পর বন বিভাগের এক কর্মচারীর আহ্বানে সিবোকে অবতরণ করলাম। কর্মচারীটি আমার আত্মীয়। এখানে নেপালী অধিবাসীদের ৮।১০খানি পর্ণকুটীর আছে। সাপ্তাহিক এক হাটও বসে। পারাপারের জন্য তিস্তার উপর দিয়ে একটি ছিপ নৌকার খেয়া আছে। অচিরেই খেয়ার পরিবর্তে একটি পাকা লোহার পুল নির্মিত হবে খবর পাওয়া গেল। যদি তাই হয় তবে তিস্তার উপরকার এই সেতুস্থিত মোটর রাস্তাটি পশ্চিম ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের মোটর পথগুলির একটানা যোগাযোগ সাধন করবে। তখন এই জায়গাটি একটি বড় গঞ্জে পরিণত হবে। বাঙালী বেকারদের মধ্যে হয়তো দু-একজন উদ্যোগী এখানে দোকানও খুলতে পারেন। বর্তমানে নিকটস্থ বন হ'তে বেত ও তেজপাতা আহরণ করা হয়।

তিস্তা-রংগীত সঙ্গম

এই জায়গাটি নিরন্তর মহা কল্লোলিনী তিস্তার তুমুল কলরবে মুখরিত। সামনে উত্তরে উঁচু গিরিরাজি। তাদের শেষ প্রান্ত নদীর ভাঙ্গা উঁচু পাড়ের মত খাড়া দাঁড়িয়ে। তার ঠিক পাদমূলে সিবোক। সিবোকের কাছে চারিদিকে পাতলা ও দূরে গাঢ় সবুজ রঙের ছড়াছড়ি। সবুজ লতাপাতা ও দ্রুমদলে ঢাকা পাহাড়গুলির মাঝে তিস্তার গভীর খাদ অল্পদূর মাত্র প্রসারিত দেখা যায়। সেই খাদের মধ্যে বিরাট বিরাট নগ্ন শিলা। তিস্তার জল সেই সব শিলা হ'তে শিলান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। তারপর এখান থেকে অদূরে কল্লোল কোলাহলহীন স্রোতস্বিনীতে পরিণত হ'য়ে ঈষৎ তরঙ্গভঙ্গে কুল কুল শব্দে বহে চলেছে।

ভূমিতে পাদচারণা করতে গেলাম। ক্রমে শুষ্ক, তারপর সিক্ত উপলরাশি পার হয়ে জলের কিনারে উপনীত হ'লাম। তিস্তার স্রোত অত্যন্ত প্রবল। অল্প একটু জলে পা ডুবাতে গিয়ে বড় অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা বোধ ক'রলাম। এর কারণ এখান থেকে প্রায় ১২৫ মাইল দূরে তিস্তা তুষার ও বরফ-গলা জল থেকে চুঁয়িয়ে আসছে। সেজন্য পাহাড়ীরা তিস্তা প্রভৃতির আদি উৎসগুলিকে 'চু' বলে। শুনলাম তিস্তায় ছোটবড় অসংখ্য মাছ আছে। সেগুলি নাকি ভারি সুস্বাদু। জাল ফেললেই মাছ ওঠে, তবে ছাড়পত্র ছাড়া মাছ ধরার নিয়ম নেই।

পরদিন দুইজন শিকারী সাহেবের আহ্বানে তাদের সঙ্গে শিকারে গেলাম। দিনে দুপুরে কদাচিৎ ২।১টি সূর্যরশ্মি ঢুকতে পারে এমন সব নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হ'ল। অল্পক্ষণ চলার পর একজোড়া ধূর্ত হরিণ অদৃশ্য হ'তে মাঝে মাঝে ডেকে সারাটি দুপুর আমাদের হয়রাণ ক'রে নিয়ে বেড়াল, কিন্তু ধরা দিল না। তারপর নিঃশব্দে কোন সন্ধান না রেখে স'রে পড়ল। বনের মাঝে আমরা কয়েকটি গতরাত্রির সদ্য পদচিহ্ন দেখলাম; সেগুলি একটা ৮।১০ ফুট লম্বা বাঘের পায়ের চিহ্ন বলে ধারণা হ'ল। তারপর পাহাড়ের সানুদেশে জঙ্গলাকীর্ণ একটি প্রশস্ত ভাঙ্গা পথ দেখলাম। এগুলি শীতকালে এতদঞ্চলে বন্য হাতীর দল বেঁধে চলা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এইভাবে সৃষ্ট পথ মানুষ পরে এই বিজন বিপিনে আপনার ব্যবহারে নিয়ে আসে।

সেবার তৃতীয় দিবসে রেলে চেপে তিস্তা ব্রীজে উপনীত হই। রেলপথটি তিস্তার সৈকতভূমির দুইশো ফুট উপরে পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে গিয়েছে। এ যাত্রার ৩।৪ বৎসর পূর্বে এ সমস্ত পথই কয়েকবার পদব্রজে গমন করেছি। সিংতাম অবধি তিস্তা উপত্যকার একখানি অস্পষ্ট আলেখ্য সেই অভিজ্ঞতাবলেই ফুটিয়ে তুলতে এখানে চেষ্টা করছি।

তিস্তার এই খাদ খুব গভীর। দুই পাশে স্তবকে স্তবকে পাহাড়ের চূড়াগুলি ২।৩ হাজার ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উঠেছে। তাদের গায়ে কোন বস্তী নেই। কেবল জঙ্গল, এটা দার্জিলিং জেলার সামিল। দুধারে তাই বন বিভাগের সংরক্ষিত রিজার্ভ অরণ্য। খাদের গর্ভে তিস্তার জলধারা শত পাষাণ নুড়িতে আহত হয়ে তীব্র বেগে ভীষণ শব্দে দক্ষিণমুখে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে দুই তীরে এক একটা পার্বত্য নির্ঝর এসে যুক্ত হয়েছে। ওখানকার বাসিন্দারা এই জায়গাটিকে বলে 'ঝোরা'। এখান থেকে তিস্তায় পারাপারের জন্য খেয়া নৌকাও চলে না। অথচ বহু নির্ঝর এখানে মিলিত হয়েছে। এই অঞ্চলে তিস্তাকে বৈজ্ঞানিকের পরিভাষায় 'নির্ঝরিণী' বলা যেত যদি বারিরাশির ভিতর দিয়ে তলদেশ দেখা যেত। কিন্তু তিস্তার জল স্বচ্ছ ও নির্মল হলেও গভীরতা হেতু তার তলদেশ এ অঞ্চলে দেখা যায় না, আর কল্লোল ও তার কলরব আছে। তাই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হিসাবে একে 'কল্লোলিনী' বলেছি। নির্ঝরিণী অপেক্ষা ছোট উপনদীগুলিকে স্থানীয় নেপালী ভাষায় 'ঝোরা' আর আমরা নির্ঝর বলতে পারি। উৎস হ'তে নির্গত সর্বাপেক্ষা ছোট বহমান জলধারাকে ঝরণা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত।

তিস্তার পশ্চিম তীর ধ'রে রেল মোটর-পথ খাদের প্রায় তলদেশ দিয়ে গিয়েছে। মোটর-পথটি স্থানবিশেষে একটু উপর দিয়ে প্রসারিত। এই সব পথে বর্ষায় বহু ধ্বস প'ড়ে সাময়িকভাবে আবদ্ধ হয়।

সিবোক হ'তে প্রায় ৬।৭ মাইল দূরে কালিঝোরা। এখানে কালি নামে একটি নির্ঝর এসে তিস্তায় পড়েছে। তার উত্তর পাড়ে অতি মনোরমভাবে স্থাপিত পূর্ত বিভাগের এক ডাকবাংলো অবস্থিত। বাংলো থেকে কয়েক শ' গজ উত্তরে একটি ছোট্ট কুলিবস্তী ও বাজার আছে। বস্তীর আশে পাশে খোলা সমতল জায়গায় দরিদ্র নেপালী শ্রমিকদের ছোট ছোট ফসলের ক্ষেত আছে। ভুট্টা, স্কোয়াস, আলু, লঙ্কা, রাইশাখ প্রভৃতির আবাদ সেখানে হয়। নেপালীদের মোরগগুলি ক্ষেতের বেড়ার বাইরে গাঁদাফুলের গাছগুলির মধ্যে চলাফেরা করছে।

একবার এখানে বাস করবার সময় স্থানীয় পার্বত্য শ্রমিকদের মধ্যে মেলামেশা করে কাটিয়েছিলাম। আর সকাল বিকাল তিস্তার তীরে বসে তার শত তরঙ্গের ভঙ্গলীলা, তাদের তীব্র কল্লোলধ্বনি শুনতাম, আর রাস্তা দিয়ে যখন চলতাম, তখন হরিণ, বনকুক্কুট ও ময়ূর আমাদের দেখে সভয়ে সচকিতে পথ ছেড়ে পালাত।

মধ্য সিকিমের এক বাজারে নেপালীদের মেলা

এখানকার কুলিবস্তীতে তখন একজন নেপালী শ্রমিকের বোধ হয় নিউমোনিয়া ব্যারাম হয়। সে মাস খানেক ভুগে সেরে উঠল। চিকিৎসা তার হ'ল এক ওঝা ডেকে নিয়ে এসে। এখান থেকে দশ মাইল দূরে এক পাহাড়ের মাথায় সে থাকত। জাতিতে সে লেপচা লামা। তিন দিন ধরে ঘট সাজিয়ে নৈবদ্য ইত্যাদি উপচার দিয়ে পূজা হল। ওঝা মন্ত্র পড়ল, গান করল, সারা রাত্রি জেগে একটা গাছের ডাল নিয়ে নেচে নেচে গান করল। রোগীর ভূত তাড়ানোর এইটিই তাদের প্রচলিত প্রথা। এসব জড়োপাসকরা পরব্রহ্ম হতে সম্পর্কশূন্য নিছক ভিন্ন ভিন্ন ভূত পূজা করে না। তারা যেমন হিন্দুর ঘট, নৈবদ্য দিয়ে পূজা করে, তেমনি ভূত, দেবতা প্রভৃতিকে এক সর্বশক্তিমান ভগবানের বিভিন্ন অংশ মনে করে। আবহমানকাল থেকে তীর্থ ও মেলায় গমনাগমন ও সাধু সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসেই এই শিক্ষা তারা লাভ করেছে।

কালিঝোরা হতে এইরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে ৫ মাইল যাবার পর একবার বিরিকের ডাকবাংলোর সানুদেশে উপনীত হই। রাস্তা হতে সামান্য উচুঁতে একটা টিলার উপরে সুন্দর তরু

বীথিকার মাঝে নির্জন স্থানে এই বাংলোটি স্থাপিত। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে এই বাংলোটিই সর্বাপেক্ষা মনোরম ও বৃহৎ। আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা রাস্তার উপরে সমতল খোলা এক টুকরা জমিতে ২।৩ খানি পর্ণকুটির দেখলাম। কেমন পরিষ্কার ঝকঝকে বাড়িখানি; তার অদূরে সবুজ লতা-পাতায় ঢাকা চারি দিককার পাহাড়গুলি, বাড়ির আঙিনা হতে একটু দূরে কলাগাছের ঝাড় কয়েকটি, আঙিনার দুই পাশে কয়েকটি শনখড়ের ছাওয়া পর্ণ কুটির, আর এক পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কমলা লেবুর গাছ। ডাল সমেত সমস্ত গাছগুলি অজস্র সবুজ ও ঈষৎ লাল লেবুর ভারে নুয়ে পড়েছে। মাথার উপরে সূর্য। বাঙলায় চিরপরিচিত ও উজ্জ্বল ঝলমল করা তার কিরণ। গৃহস্বামী নেপালী সর্দারের সৌন্দর্য জ্ঞান আছে। বাঙালী গৃহস্থ এরূপ সৌন্দর্যপ্রিয় গৃহস্বামীর প্রতিবেশীরূপে বেশ বসবাস করতে পারে। কিন্তু সে পার্বত্য বাঙালী কোথায়?

বিরিক ছাড়িয়ে ৬ মাইল যাবার পর রিয়াঙ স্টেশন। এখানকার বাজার ও স্টেশনও বেশ বড়। এখান থেকে পশ্চিমে খুব চড়াই পথে মংপু সিঙ্কোনা বাগান, মহাল্‌দিরাম, চাকমান প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। সিবোক থেকে রিয়াঙ পর্যন্ত অঞ্চল সিঙ্কল-মহাল্‌দিরাম পাহাড়ের পূর্বভাগস্থ তলদেশ।

রিয়াঙ থেকে আরও ৬ মাইল উত্তরে কালিমপঙ রোড স্টেশন, এবং এই পথের এইটিই শেস স্টেশন। এখন এ জায়গাটির নাম গেল-খোলা। কোন স্থানে নির্ঝরগর্ভে চওড়া ও সমতল হলে সে স্থানটির নাম হয় খোলা। সিকিম ও কালিমপঙের কমলা, বড় এলাচ, তিব্বতের পশম এখানেই রেলে চাপে ইং ১৯০৪ সালের 'তিব্বত মিশন' নামক অভিযানের সময় শিলিগুড়ি, রিয়াঙ, তিস্তাব্রীজ, রংপু প্রভৃতি স্থান রণসম্ভার সরবরাহের কেন্দ্র হয়েছিল।

গেলখোলা স্টেশনের ২ মাইল উত্তরে তিস্তা তীরে তিস্তাব্রীজ বাজার। সেখানে ডাক, তার ও বনবিভাগের অফিস আছে। এখান থেকে একটা তারের ঝোলাপুল তিস্তার পরপারে গিয়েছিল। এখন সেখানে লোহা ও কনক্রীটের সেতু হয়েছে। মোটর রাস্তাটি এই সেতু পার হয়ে এবারে তিস্তার পূর্ব পার্শ্ব ধরে উত্তরে গিয়েছে। আর অল্প একটু দূরে এই থেকে অপর একটা মোটর পথ পূর্বে দশ মাইল উপরে কালিমপঙ শহরে পৌঁছিয়েছে।

তিস্তা ব্রীজের উনিশ মাইল পশ্চিমে চড়াই পথে ঘুম স্টেশন। এজন্য এটা খুব কেন্দ্রীয় স্থান। এখানে তালি নামে এক তিব্বতীয় ভদ্রলোক একটা জলস্রোত চালিত চামড়ার কারখানা চালাতেন। তাঁকে সভাপতি করে বাজারের বাঙালী ও নেপালী বাবুরা বাঙলা ও ইংরাজী পুস্তকের একটি লাইব্রেরী চালাতেন। কিছুকাল হল তালিবাবু দেহত্যাগ করেছেন। যখন ১৯১১ সালের চীন বিপ্লবের পর তিব্বতের দলাই লামা পালিয়ে কালিমপঙে বাস করেন, তখন তালিবাবু দলাই লামার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর রংপু যাত্রা করলাম। পদব্রজেই যাচ্ছি। প্রায় ৩ মাইল যাবার পর পশ্চিম থেকে বড়রংগীত উপনদী এসে তিস্তায় পড়েছে। রংগীতে জলে একটু ফিকে লালিমা আছে। আর তিস্তার জল গভীর, শীতল, স্বচ্ছ ও গাঢ় নীল। এজন্য সঙ্গমের পরও অনেকটা দূর পর্যন্ত দুইটা জলরাশির পার্থক্য দূর হতে চোখে পড়ে। উষ্ণতা, দ্রবীভূত পার্বত্য লবণ প্রভৃতির তারতম্যে বোধ হয় জলের এই পার্থক্য হয়েছে। কালিমপঙ শহর হতে প্রায় ৩ মাইল নীচে 'হাওয়া ঘর'এ বসে দু'হাজার ফুট নীচেকার এই সঙ্গমের যে দৃশ্য দেখা যায়, তা জগতে অতুলনীয়।

আমাদের পথের দুপাশে পাহাড়। তিস্তার খাদ ধরেই পথ অগ্রসর হচ্ছে। পূর্বে কালিমপঙ পাহাড়। আমরা তিস্তার পূর্বতীর ধরে চলেছি। এটা এখনও দার্জিলিং জেলার সামিল। পশ্চিমে প্রায় দুশ গজ দূরে তিস্তার অপর পাড়ে সিকিম রাজ্য আরম্ভ। সিকিম সীমানার মাঝখান দিয়ে তিস্তার কুলে কুলে একটি অশ্বচারী পথ দেখা যায়। সেটা মাঞ্জিটরের ঝুলান সেতু হতে আরম্ভ হয়ে সিকিমে প্রবেশ করেছে।

আমাদের পূর্বে যে কালিমপঙ পাহাড়, তার পাদদেশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। কালিমপঙ পূর্বে ভুটানের অধীন ছিল। ইংরেজেরা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই কালিমপঙ মহকুমা অধিকার করে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নেপালীরা তিস্তা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ভুটান আক্রমণে উদ্যোগ করে। ১৮১৭ খৃঃ জেনারেল অকটারলোনী নেপালকে পরাজিত করে ও শিংলীলার পশ্চিম পাড় পর্যন্ত নেপালের সীমানা আবদ্ধ করে। তারপর বিগত ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর নেপালীরা ভুটান আক্রমণের জন্য ইংরেজের অনুমতি চেয়ে বিফল হয়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দেও নেপালীরা সিকিম অধিকার করে। আর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করে।

তিস্তা-রংগীতের সঙ্গমের নিকট একটি বড় রবারের আবাদ পার হয়ে মল্লী পৌঁছলাম। কিন্তু আবাদে এখন আর রবার আহরিত হয় না। মল্লীতে বড় বাজার ও ভাল ডাকবাংলো আছে। তিস্তা পার হয়ে সিকিমে প্রবেশ করবার জন্য লোহার তারের ছোট একটি ঝোলা সেতু আছে। বাজারে বিহারী ও মারোয়াড়ী মুদিদের দোকানও ২।১টি আছে।

অতঃপর রাস্তার এক বাঁকের উপর এক নেপালী চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। শ্রমিক, কমলার ব্যাপারী ইত্যাদি দরিদ্র শ্রেণীর লোকরাই এর খরিদ্দার। দোকানে উঠতেই তারা সসম্ভ্রমে উঠে আমাদের জন্য একখানা বেঞ্চ খালি করে দিল। খানিক তাদের সঙ্গে গল্প করা গেল। আমি ভাঙা ভাঙা নেপালীতে আলাপ করলাম। তারা বেশীর ভাগই চিড়া, ভুট্টার খই বা তেলে-ভাজা ময়দার পিঠে দিয়ে চায়ের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করছে। আমাদের জন্য সিদ্ধ ডিম ও চা এল। সেখানে একজন সর্দার আমাদের জিজ্ঞাসা করল—"যখন বাংলোতে বসে আপনারা চা খেতে পারেন, তখন এই নোংরা দোকানে কেন?' আমি বললাম—"তোমাদের পাহাড় দেখতে এসেছি।"

আমরা তিস্তার উজানপথেই চলেছি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিস্তাব্রীজ হতে ১৫ মাইল দূরবর্তী রংপুতে উপস্থিত হলাম। রংপু নামক নির্ঝরিণীর পরপারে আমাদের পথ সিকিম রাজ্যে পদার্পণ করেছে। একটা তারের ও কাঠের ঝুলান পুল পার হতে হয়। রংপু একটি বেশ বড় বাজার। সেবার পূজার ছুটীর অধিকাংশটা এখানে প্রবাস যাপন করি। মাঝে কয়েক দিনের জন্য যোগাড়যন্ত্র করে গ্যাংটক বেড়িয়ে আসি।

প্রহেলিকা

(৪৯৫ পৃষ্ঠার পর)

শুভদৃষ্টির সময় মুখ তুলে চাইতেই হয়, কিন্তু চেয়ে দেখে তার প্রাণে জল এলো!

বাপ! প্রহেলিকা নয়, ইলার সঙ্গে হ'ল তার বিয়ে।

তার পর তার চেহারা ফিরে গেল।

কথার ফোয়ারা ছুটলো তার।

বাসর ঘরে কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলো না। রসিকতার লড়াইয়ে সবাই পরাজয় স্বীকার করলো।

যখন সে অবসর পেলো তখন ইলাকে চট ক'রে বুকের ভিতর চেপে নিয়ে বল্‌লে, "বাঁচালে আমায়—ওঃ! ইলা তুমি স্বর্গের দূত!" **(ক্রমশ)**

আজ-কাল

সুভাষচন্দ্র

এ সপ্তাহে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে। সে ঘটনা শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর গৃহত্যাগ। মানুষের অভিজ্ঞতায় এরকম চাঞ্চল্যকর ঘটনা বিরল। গত সোমবার সকালে সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে, সুভাষচন্দ্রকে তাঁর গৃহে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি অলক্ষিতভাবে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। ঠিক কবে কোন্ সময় তিনি চলে' গেছেন তাহা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও তাঁর বাড়ির লোকেদের ধারণা, রবিবার ভোর রাত্রে তিনি বাড়ি ছেড়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে আরো জানা যায় যে, গত ১৬ই জানুয়োরী থেকে সুভাষচন্দ্র মৌনাবলম্বন করেছিলেন এবং নিজের ঘরে পর্দা ঘেরাও করে নিয়ে বাঘছাল বিছিয়ে গীতা, চণ্ডী ও অন্য সব ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং ধ্যান ধারণা আরম্ভ করেছিলেন। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেত না। তিনি শুধু একবেলা ফল ও দুধ খাচ্ছিলেন। রবিবার সকালে খাবারের পাত্র আনতে গিয়ে দেখা যায় যে, তিনি আগের দিন কিছু খান নি। তখন আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ করে' দেখেন তিনি অদৃশ্য হয়েছেন; পরনের কাপড় আর চশমা ছাড়া কিছুই নিয়ে যান নি।

তাঁর বিগত কয়েক দিনের আচরণ লক্ষ্য করে' তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব মনে করছেন যে, ধর্মোন্মাদনাই অকস্মাৎ তাঁকে চরম বৈরাগ্যের পথে চালিত করেছে। দুর্জয়-সংকল্প কর্মবীর সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গৃহত্যাগের আর কি কারণ থাকতে পারে?

তাঁর এই গৃহত্যাগ এমন অপ্রত্যাশিত, এমন অভাবনীয় যে, প্রথম সংবাদে লোকে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে বিহ্বলতা কাটার পর এখন সর্বসাধারণের মনে তাঁর জন্যে, বিশেষ করে' যে অবস্থায় তিনি বাড়ি থেকে বেড়িয়েছেন সে কথা ভেবে, গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হয়েছে। সম্প্রতি অনশনের ফলে তিনি যে রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেটাও একটা চিন্তার কথা। কখন্ তাঁর কুশল-সংবাদ পাওয়া যাবে, সকলে তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে।

যেদিন সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের সংবাদ প্রকাশ পায় সেদিন আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা আইনের মামলার তারিখ ছিল। তিনি নিখোঁজ হয়েছেন জেনে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ৩রা ফেব্রুয়ারী হাজির করাবার জন্যে তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। ঐ দিন বিকেলে গোয়েন্দা পুলিশ সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁর ঘর তন্ন তন্ন করে' খানাতল্লাস করে এবং বাড়ির লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তারা কাউকে গ্রেপ্তার করে নি বা কোন জিনিস নিয়ে যায় নি।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের দাবী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার গত ১৮ই জানুয়ারী বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ-ফজলুল হকের কাছে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতির সমালোচনা করে' আসন্ন সংকটের হাতে থেকে এই প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত জনগণকে বাঁচাবার জন্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ১০টি জরুরী দাবী উপস্থিত করেন এবং বলেন যে, ঐ সংস্কার কার্যে পরিণত করবার জন্যে অবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর জায়গায় প্রধান মন্ত্রী একটা জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল ও কর্মকুশল মন্ত্রিসভা গঠন করুন।

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার প্রধান মন্ত্রীকে সাত দিনের মধ্যে তাঁর পত্রের উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসে এক বক্তৃতায় তিনি জানান যে, প্রধান মন্ত্রী কোনো উত্তর দেন নি। তিনি বলেন যে, এর ফলে তাঁদের দাবী আদায়ের জন্যে সংগ্রাম অনিবার্য হবে।

২৬শে জানুয়ারী বাংলার সর্বত্র বিপুল উৎসাহে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশেও স্বাধীনতা দিবস যথারীতি প্রতিপালিত হয়েছে।

সত্যাগ্রহ

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্বানুরূপ চলছে। বিনোবা ভাবে তিনদিন যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করার পর গ্রেপ্তার হন। তাঁকে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আরো কিছু কংগ্রেসকর্মী বিভিন্ন জায়গায় ধৃত ও দণ্ডিত হয়েছেন। সত্যাগ্রহী কয়েকজন অহ্‌রের কর্মীরও দণ্ড হয়েছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের, যেমন মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদির কংগ্রেসী সদস্যদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেস নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলে তাঁরা যেন পদত্যাগ করেন।

ভারত সচিব মিঃ এমেরী এক বিবৃতিতে পুরনো কথারই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি করে' বলেছেন যে, ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ভারতীয়দেরই; বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যতখানি করবার করেছেন, বড়লাটের প্রস্তাবই তার পরিচায়ক এবং সে প্রস্তাব এখনো ভারতীয়রা গ্রহণ করতে পারে; তবে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এখন ভারতীয় বিভিন্ন দলীয় নেতাদের মিলেমিশে একটা ফয়শালা করা।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট নিযুক্ত কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা বিল অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে বলে' যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেনেট তা ৩৬—২১ ভোটে গ্রহণ করেছেন। রিপোর্টের বিরুদ্ধে যাঁরা ভোট দেন তাঁদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী এবং আইন সভার মুসলমান সদস্য। এঁদের দলপতি হয়েছিলেন বাঙলা গভর্নমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসার ডাঃ ডব্লিউ এ জেঙ্কিন্স।

আন্তর্জাতিক

পূর্ব ভূমধ্যসাগর

চূড়ান্ত আক্রমণ আরম্ভের ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বৃটিশ বাহিনী তোব্রুক দখল করেছে। সেখানে ২৫ হাজার ইতালীয় বন্দী হয়েছে। বৃটিশ সৈন্য তোব্রুকের পর আরও পশ্চিমে দার্ণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের অগ্রবর্তী দল নাকি দার্ণায় প্রবেশও করেছে।

ইংরেজেরা এখন আফ্রিকার ইতালির সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। পশ্চিমে লিবিয়ার পর পূবে এরিট্রিয়া, আবিসিনিয়া ও ইতালীয় সোমালিল্যান্ডের বৃটিশ অভিযান আরম্ভ হয়েছে। সব জায়গাতেই বৃটিশ সৈন্য সাফল্যলাভ করছে বলে' সংবাদ আসছে। হাবসী সম্রাট ইতিমধ্যে আবিসিনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেছেন; তাঁর নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক হাবসীরা দেশ থেকে ইতালীয়দের বিতাড়িত করবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে।

আলবেনিয়াতেও গত তিন দিন লড়াই খুব জোর আরম্ভ হয়েছে। ইতালীয়রা পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে।

আফ্রিকা ও আলবেনিয়ার খবর থেকে মনে হয়, ভূমধ্যসাগরে ইতালির অবস্থা সঙ্গীণ হয়ে উঠেছে। তুরিন ও মিলানে সরকার পক্ষের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নাকি দাঙ্গাহাঙ্গামাও বাধিয়েছে। এ অবস্থায় জার্মানীকে ভূমধ্যসাগরীয় সংগ্রামের ভার নিতেই হবে। জার্মানী যে সে কাজে হাত দিয়েছে, তার আভাষ পরিস্ফুট। ইতিপূর্বেই সিসিলিকে দখলে নিয়ে জার্মান বিমানের তৎপরতার খবর বেরিয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, জার্মান সমরনায়কেরা ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেছেন এবং প্রচুর জার্মান সৈন্য ইতালির মধ্যে প্রবেশ করছে। জার্মানী নাকি এই সঙ্গে ফ্রান্সের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী ঘাঁটি বিজের্তা ও ওরান দাবী করেছে।

খাস বৃটেনের উপর জার্মান অভিযানের অচল অবস্থা এবং ইতালির বিপর্যয় সমগ্র যুদ্ধকে মোড় ঘুরিয়ে যেন পূর্ব ভূমধ্যসাগরেই কেন্দ্রীভূত করছে। পূর্ব ভূমধ্যসাগর বৃটিশ সাম্রাজ্যের জীবনমরণ কেন্দ্র; সাম্রাজ্যের প্রধান যোগাযোগ পথ এবং তেলের প্রধান উৎস এই অঞ্চলে। এখানকার সংঘর্ষের ফলাফল দ্বারা সমস্ত যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়াকে বাগে আনতে না পারায় জার্মানীর পক্ষে এ অঞ্চলে আসার অত্যন্ত অসুবিধে হয়েছে। ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে তার অগ্রসর হওয়া প্রধানত নির্ভর করছে সোভিয়েটের মনোভাবের উপর।

রুমেনিয়ায় বিদ্রোহ দমন

রুমেনিয়াতে যে বিদ্রোহ হয়েছে, তার পাণ্ডা আয়রণ গার্ড দল। রাষ্ট্রচালনায় আন্টোনেস্কুর সামরিক দলের জন্যে অবাধ ক্ষমতা না পাওয়াতেই তারা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে বলে' মনে হয়। পাঁচদিন সংঘর্ষের পর সৈন্যবাহিনী আয়রণ গার্ড দলকে দমন করেছে এবং জেনারেল আন্টোনেস্কু একটা পুরোপুরি সামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তিনি তাঁর রক্ষাকর্তা হিসেবে হিটলার-মুসোলিনীর প্রতি উচ্ছ্বসিত আনুগত্য জানিয়েছেন। আয়রণ গার্ড নেতা মঃ হোরিয়া সিমা এবং সম্প্রতি পদচ্যুত স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল পেট্রোভিসেস্কু নাকি গ্রেপ্তার হয়েছেন।

প্রাচ্যে সংঘর্ষ ?

ওদিকে প্রাচ্যে জাপানের মেজাজ ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছে। পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুওকা এবং নৌসচিব এডমিরাল ওইকাওয়া বলেছেন যে, আমেরিকা যে রকম মনোভাব দেখাচ্ছে, তাতে তার সঙ্গে জাপানের সংঘর্ষ বাধতে পারে। এডমিরাল ওইকাওয়া জানিয়েছেন যে, জাপান যে কোনো অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। জাপানী পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, মার্কিন নৌ-ব্যবস্থায় ফিলিপাইন ও গুয়ামকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার যে প্ল্যান ছিল, তা সম্প্রসারিত করে' সিঙ্গাপুর, হংকং, ডারুইন ও ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সোভিয়েট মারফৎ খবর পাওয়া গেল যে, জাপান ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিজের কাছে নতুন কতকগুলো দাবী জানিয়েছে। অপর পক্ষে মিঃ কর্ডেল হাল মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্র-কমিটির কাছে গোপন সাক্ষ্যে নাকি বলেছেন যে, জাপানের সঙ্গে আমেরিকার একটা আপোষ নিষ্পত্তির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আমেরিকা সোভিয়েটে বিমান ও বিমান-সরঞ্জাম প্রেরণের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে বন্ধুত্ব প্রকাশ করেছে। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সম্ভাব্য সংঘর্ষের দিক থেকে আমেরিকার এই মিতালির চেষ্টা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নিষেধাজ্ঞাটা জারী হয়েছিল ফিনিশ যুদ্ধের সময়।

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের মধ্যে সংঘর্ষের মিটমাট হচ্ছে জাপানের মধ্যস্থতায়। উভয় পক্ষই এই সালিশ মেনে নিয়েছে। লড়াই থামার খবর এখনো পাকাপাকি পাওয়া যায় নি, দু এক দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে মনে হয়।

আমেরিকা-বৃটেন-জার্মানী-সোভিয়েট

সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকার কাছ থেকে পণ্য আমদানী করে' জার্মানীকে সাহায্য দিচ্ছে বলে' বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অনুযোগ করা হয়েছে।

বৃটিশ রাজদূত লর্ড হালিফাক্স ওয়াশিংটনে পৌঁচেছেন। প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট স্বয়ং অনেক দূর পর্যন্ত জাহাজে করে' গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে' আনেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট রোজভেল্টের বাণী নিয়ে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কি লণ্ডনে গেছেন।

লণ্ডনে পর পর গত আট দিন ও আট রাত বিমান হানা হয় নি। বৃটেনের অন্যান্য স্থানে সামান্য আক্রমণ হয়েছে। বৃটিশ বিমানবহরও প্রতিপক্ষের এলাকায় যে আক্রমণ চালায়, পূর্বের তুলনায় তা কম। আবহাওয়ার অবস্থাই বিমান-তৎপরতা হ্রাসের জন্যে দায়ী।

২৮-১-৪১

—ওয়াকিবহাল
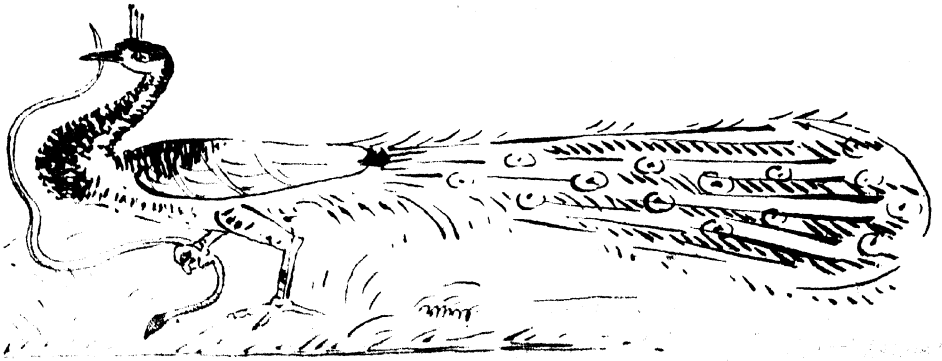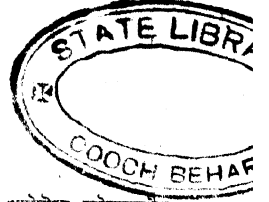
উত্তরায় 'নিমাই সন্ন্যাস'

ছবিখানি তুলিয়াছেন মতিমহল থিয়েটার্স এবং পরিচালনা করিয়াছেন ফণি বর্মা। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন ছবি বিশ্বাস, মণিকা দেশাই, প্রমোদ গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, নিভাননী, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

যে সকল মহাত্মা ব্যক্তির অভ্যুদয়ে বাঙলা দেশ জগতের কাছে একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়া উঠিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পাঁচশত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিলেও আজো তাঁহার প্রভাব সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যেই যে বিরাজ করিতেছে তাহার কারণ একমাত্র ইহাই যে, তৎকালে বাঙলার কৃষ্টির ধারা, সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও রাজনীতির রূপ বদলাইয়া বাঙলা দেশকে এমন এক পথে চালিত হইবার নির্দেশ তিনি দিয়া গিয়াছেন, বাঙলা দেশ আজো সে পথ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথ ধরিতে সক্ষম হয় নাই। চৈতন্যের এই যে মানবিক রূপ, তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, কৃষ্টি প্রবর্তক ও রাজনীতিক, আলোচ্য ছবিখানিতে তাঁর সেই রূপই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই কারণে ছবিখানি ধর্মমূলক হইলেও আধুনিক রুচীকে আঘাত দেয় না। ছবিখানিতে দেখানো হইয়াছে নিমাইয়ের বাল্য জীবন হইতে আর্তমানবের সেবায় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ পর্যন্ত। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে নিমাই কর্তৃক হরিজন উন্নয়ন ও অহিংসনীতি প্রচার, অর্থাৎ একদিক হইতে বলিতে গেলে ছবিখানি যেন গান্ধীজীর মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই তোলা হইয়াছে।

'নিমাই সন্ন্যাস'-এর কাহিনীটি চিত্রোপযোগী করিয়া সাজাইয়াছেন অজয় ভট্টাচার্য। ইহাতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত নিমাইয়ের জীবনের মোটামুটি সমস্ত ঘটনাই উপস্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছু থাকিত না যদি পরিচালক একটু বুদ্ধি খাটাইয়া ঘটনাবলীর প্রয়োজনানুযায়ী মাত্রা নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। তাহা না হওয়ায় ছবিখানি দেখিতে দেখিতে দর্শককে বহুস্থানে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে এবং ছবিখানিও অনর্থক খুব বেশীরকম দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এই দীর্ঘতা হ্রাস করিবার উপায় যথেষ্টই ছিল এবং তাহাতে এই দুর্দিনে চিত্রনির্মাতার অর্থ-

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী চিত্র 'লগন'-এ সায়গল ও নেমো। পরিচালক: নীতিন বসু।

ব্যয়ও কিছু কম হইতে পারিত। অজয় ভট্টাচার্য রচিত সংলাপ ও গানগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসকে প্রশংসা করিতে হয়—নিমাইয়ের মর্যাদা তিনি

যথাযথই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন মণিকা দেশাই; তাঁর অভিনয় ক্ষমতা কত প্রখর জানি না কিন্তু আলোচ্য ভূমিকায় তাঁর অংশ এমন কিছু নয় যাহা হইতে সে ক্ষমতা বিচার করিতে পারা যায়, তাঁহাকে ভূমিকাটিতে মানাইয়াছে এইমাত্রই বলা চলে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় মন্দ হয় নাই কিন্তু বড় মণ্ডঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছে।

যে সমস্ত অভিনয় শিল্পীকে এই ছবিতে দেখা গিয়াছে তাঁহাদের কেহই কণ্ঠসংগীতে পারদর্শী বলিয়া মনে হয় না, কারণ ছবিতে সকলের সমস্ত গানই প্লে-ব্যাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু স্বরনিক্ষেপ ও ওষ্ঠসঞ্চালনে সংগীত রক্ষিত না হওয়ায় দেখিতে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কীর্তনের উপর পরিচালকের বীতরাগের কারণও বোঝা গেল না—ছবিখানিতে কীর্তন একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গই বাঙলাদেশে কীর্তনের ঢেউ বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ছবিখানির অন্যান্য দিক মাঝামাঝি শ্রেণীর।

ছবিঘরে—'ভালবাসা'

ছবিঘর ছায়াচিত্র গৃহে মায়ামৃগ ও ভালবাসা প্রদর্শিত হইতেছে। 'মায়ামৃগ'র সমালোচনা আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। 'ভালবাসা'র আলোচনা গত সপ্তাহে স্থানাভাবে সম্ভব হয় নাই বলিয়া এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল।

শ্রেষ্ঠাংশে তুলসী লাহিড়ী, শ্রীমতী প্রভা, সত্য মুখার্জি ইত্যাদি।

খ্যাঁদা মামা আর ক্ষ্যান্ত মামী। দাম্পত্যকলহচৈব লাগিয়াই আছে, কিন্তু এবার আড়ম্বরটা বেশী। খ্যাঁদা মামা প্রবাসী হইবেন। বন নহে—কলিকাতায় আসেন। সেখানে ভাগ্নে ফ্লাট ভাড়া করিয়া সস্ত্রীক "ভাল বাসা" গড়িয়াছে। একখানি ঘর—বারান্দায় মামার আশ্রয় জোটে—অগত্যা। কিন্তু নবদম্পতির অবাধ ভালবাসায় ইহাই কি কম বাধা? মাতাল বন্ধু ভাগ্নে ভবতারণকে বুদ্ধি জোগায়। মামী আসিতেছে। শুনিয়া মামা পলায়নপর হন। কিন্তু মামী পূর্বাহ্নেই আসিয়া হাজির। আর একদফা কলহ, কিন্তু এবার মিলন। মিলন তো বটে, কিন্তু নবদম্পতি হাঁফাইয়া উঠে—এই প্রাচীন প্রাচীনার সহিত একই ঘরে...........

ভবতারণ স্ত্রীর হাত ধরিয়া এই "ভাল বাসা" ত্যাগ করে।

কথা, কাহিনী ও পরিচালনা তুলসী লাহিড়ীর; খ্যাঁদা মামার ভূমিকায়ও তিনি স্বয়ং। তুলসী লাহিড়ী যেন বাঙলার চার্লি চ্যাপলিন। একাধারে এত গুণ সমাবেশের এই আত্মকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা চার্লির বেলায় সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু আমরা তুলসী লাহিড়ীকে উহার অনুকরণ না করিতে অনুরোধ করি। কথা-সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্প এই দুই শ্রেণীর বস্তু আছে। তুলসী লাহিড়ী চিত্রজগতে সেরূপ "গল্পের" অবতারণা করিয়াছেন। উপন্যাস লেখা শক্ত, কি গল্প লেখা শক্ত, এক্ষেত্রে সে তর্ক নিষ্ফল। কিন্তু ছোট গল্প লেখা যে শক্ত এবং তাহা চলমান চিত্রে পরিণত করা যে আরও শক্ত, ইহাতে তর্কের অবসর নাই। তুলসী লাহিড়ীর "ফিভার মিক্‌শ্চারের" শ্লেষটা বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু এই "ভাল বাসা" বুঝিতে মাথায় ঝড় তুলিয়াও বিষয়টা বোধগম্য করিতে পারি নাই। নবদম্পতী "ভাল বাসা" অনুরাগে ও রাগে ত্যাগ করিল, কিন্তু "ভাল বাসা" প্ল্যাকার্ডটি ভাঙিয়া ফেলার ইঙ্গিতটা ধরা শক্ত। দাম্পত্যকলহচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াটাও খানিকটা বুঝা যায়; কিন্তু ইহার প্রসঙ্গে মদ ও মাতালের দৃশ্যের অহেতুক আরোপ গল্পকে আরও ঘুলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু গণিতের ভাষায় একথাটা যদি জিজ্ঞাসা না করি যে, what does it prove? তবু বলিতে হয় "ভাল বাসায়" এক অবোধ্য বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যায় নাই।

অভিনয় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তুলসী লাহিড়ী নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও দেন নাই এবং এই শ্রেণীর অভিনয় লাহিড়ী ভালই করেন, সে বিষয়ে আমাদের দ্বিমত নাই। গল্পের প্রথমাংশে গোবরাকে শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া শ্রীমতী প্রভা ওরফে ক্ষ্যান্তর সহিত তুলসী লাহিড়ী ওরফে খ্যাঁদা মামার যে কলহ, তাহা সত্যিই বেশ জমিয়াছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাঙলার ঠিক কোন্ অঞ্চলের ভাষা লাহিড়ী বলিয়াছেন, তাহাতে খটকা লাগে। সত্য মুখার্জি ওরফে ভবতারণ, মীরা দত্ত ওরফে শোভনার অভিনয় অনুল্লেখ-যোগ্য। রঞ্জিৎ রায়ের মাতালের অভিনয় সাধারণ অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আলোক চিত্রগ্রহণ ভাল। শব্দগ্রহণে অসংগতি আছে। সংলাপ ভাল। গানের যেন অবনতি ঘটিতেছে। এত অর্কেস্ট্রার তাল ঠুকিয়াও গান জমে না।

প্রি-ভিউর ব্যবস্থা কাহাদের তত্ত্বাবধানে হইয়াছে জানি না, কিন্তু ব্যবস্থাপনার ত্রুটি আছে। নিমন্ত্রিতদের সময়ের মূল্য আছে। ৯টায় সময় দিয়া ১০টার সময় আরম্ভ কোনরকমেই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

বাঙলাদেশে খালিহাতে ব্যায়াম

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়ামই খালিহাতে ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের অনুসরণে দেশের সর্বসাধারণ, শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বৃদ্ধ পর্যন্ত সুফললাভ করিতে পারে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। জার্মানি, আমেরিকা, ইটালি, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সকল স্বাধীন দেশে এই জন্যই এই ব্যায়াম এত সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইতেছে যে বাঙলা দেশ তথা ভারতবর্ষে এই ব্যায়াম বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। এই ব্যায়াম প্রসারের জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই একবাক্যে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, দেশের লোক এই ব্যায়াম পছন্দ করে না। যন্ত্রপাতি শূন্যে আড়ম্বরহীন এই ব্যায়াম প্রণালী সাধারণের মন আকৃষ্ট করিতে পারে না। অনেক স্থানে প্রচারকারীদের শুনিতে হইয়াছে, "শুধু শুধু হাত পা নেড়ে যদি শরীর বলিষ্ঠ হতো তবে ব্যায়ামের জন্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রয়োজন হতো না।" এই উক্তির পর প্রচারকগণের হতাশ হইবারই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের এই প্রচার প্রচেষ্টা বন্ধ করা উচিত নহে। এইরূপ উক্তি তাঁহাদের ন্যায় বৈদেশিক ব্যায়ামকারীদেরও একদিন শুনিতে হইয়াছিল। বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকায় এই ব্যায়ামের যেরূপ সমাদর দেখিতেছেন ৫০ বৎসর পূর্বে এই সকল দেশে সেইরূপ ছিল। খালিহাতে ব্যায়াম বিষয় লইয়া যাঁহারা ব্যস্ত থাকিতেন বা জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের ঐ সকল ব্যায়াম বিশারদগণ হীনচক্ষেই দেখিতেন। অনেক সময় ব্যায়াম বিশারদগণ নানারূপ কটুক্তিও করিতে ছাড়িতেন না। "পাগলের স্বপ্ন" রচনার সহিতও প্রচারকগণের প্রচেষ্টাকে তুলনা করিতেন। এই কটুক্তির প্রকৃত প্রত্যুত্তর আসিল তখন যখন চেকোশ্লাভাকিয়ায় "সোকল" আন্দোলন দেখা দিল। সোকলগণ এই ব্যায়াম অনুসরণ করিয়া দেশের অভাবনীয় উন্নতি করিলেন। তাঁহাদের সেই উন্নতি জার্মানির ব্যায়াম বিশারদগণের চক্ষু খুলিয়া দিল। তখন তাঁহারা পরীক্ষামূলকভাবে ঐ ব্যায়াম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আশা ছিল না যে, ঐ ব্যায়াম অনুসরণে দেশের সর্বসাধারণের দৈহিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি হইতে পারে। পাঁচ বৎসরের পরীক্ষার ফল সকলকে চমৎকৃত করিল। তখন জার্মন দেশ ঐ ব্যায়াম বাধ্যতামূলক করিয়া যন্ত্রপাতির ব্যায়াম তুলিয়া দিলেন। ফল ভালই হইল। জার্মন জাতি একটা শক্তিশালী জাতি বলিয়া গর্ব করিতে পারিল। গত মহাযুদ্ধে সে তাহার জনাই নিজ শক্তির প্রকৃত পরিচয় দিতে পারিল। ইহার পর মহাযুদ্ধের অবসানের পর ইউরোপের সকল দেশের ব্যায়ামবিদদের জ্ঞানসঞ্চার হইল। তাহারা তখন সকলেই এই ব্যায়াম প্রণালী গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে ২০ বৎসরের মধ্যে সারা পৃথিবীময় এই ব্যায়ামের সমাদর দেখা দিল। বিভিন্ন দেশের এই উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াই ভারতের কয়েকজন ব্যায়ামবিদ এই ব্যায়াম প্রণালী প্রচলনের চেষ্টা করিলেন। এই বিষয় সর্বপ্রথম যিনি অগ্রসর হন তিনি হইতেছেন মাদ্রাজ ফিজিক্যাল ট্রেনিং কেন্দ্রের ব্যায়াম পরিচালক মিঃ এইচ সি বাক। ১৯২৩ সালে ইনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে খালিহাতে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলেন। মিঃ বাকের এই কেন্দ্রে যে ইহারা খালি হাতে ব্যায়াম যে কি এবং কেন যে ইহা সকলের অনুসরণ করা উচিত ইহা বুঝাইতে সক্ষম না হওয়ার ফলেই

ধীরে এই ব্যায়াম সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যায়াম উৎসাহিগণ জানিতে পারেন। প্রচারকগণের প্রচার দোষের জনাই হউক অথবা দেশবাসীর ব্যায়াম উৎসাহের অভাবেই হউক এই ব্যায়াম প্রণালী গত ১৭ বৎসরের মধ্যে যেরূপ পরিমাণে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল সেইরূপ করিতে পারে

গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন পরিচালিত খালিহাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় ভারত স্ত্রী শিক্ষা সদনের বালিকাগণ প্রদর্শিত "পিরামিডের" দৃশ্য। ফটো:—কাঞ্চন

নাই। বাঙলাদেশে এই ব্যায়াম প্রণালী প্রচারের প্রথম ভার গ্রহণ করেন ওয়াই এম সি এর ব্যায়াম পরিচালকগণ। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থা সুপরিচালিত না হওয়ায় তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহার পরে বাঙলা সরকার এক ব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া এই ব্যায়াম প্রচলনের চেষ্টা করেন। সরকারের প্রতিষ্ঠিত এই ব্যায়াম কেন্দ্র হইতে প্রতি বৎসর ৪০।৫০টি ছাত্র বাহির হয়। কিন্তু খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, কি এবং কেন যে ইহা সকলের অনুসরণ করা উচিত ইহা বুঝাইতে সক্ষম না হওয়ার ফলেই বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

নববর্ষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা

বাঙলাদেশের ব্যায়ামকারীদের অজানিতে এই দিকে দ্রুত

এই অনুষ্ঠানের সময় সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। একটি নির্দিষ্ট ব্যায়াম তালিকা সমবেত ব্যায়ামকারীদের একজন ব্যায়াম পরিচালকের নির্দেশে করিতে হয়। অনুষ্ঠানের হুজুককে পড়িয়া বাঙলাদেশের ব্যায়াম উৎসাহী বালকবালিকা, যুবকযুবতীগণ এই খালিহাতে ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা করিতেছেন। তবে ইহা বলা অন্যায় হইবে না যে, ব্যায়ামের প্রণালীর সামান্য কিছুই এই সকল অনুষ্ঠানের যোগদানকারী বা কারিণীগণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। প্রকৃত তথ্য অর্থাৎ শিশুদের কিরূপ করিতে হইবে, যুবকদের কিরূপ করিতে হইবে অথবা বয়োবৃদ্ধদের কিরূপ করিতে হইবে সেই জ্ঞান এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার ফলেই তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না। এইজন্য প্রয়োজন নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করা। বাঙলার দুর্ভাগ্য যে সেইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শীঘ্র যে হইবে তাহারও এখনও পর্যন্ত কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

খালিহাতে ব্যায়ামের জ্ঞান দিবার প্রচেষ্টা

খালিহাতে ব্যায়ামের প্রকৃত জ্ঞান দিবার প্রচেষ্টা একটি প্রতিষ্ঠান গত তিন বৎসর করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশন গত তিন বৎসর হইতে খালিহাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে কখনও হয় নাই। এই এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ তিনটি বিভাগের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। দুইটি বালকদের জন্য ও একটি বালিকাদের জন্য। এইরূপে তিনটি বিভাগের প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্য ব্যায়ামকারীদের বুঝাইয়া দেওয়া যে, খালিহাতে ব্যায়াম প্রণালী বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন প্রকার। এই প্রতিযোগিতায় যে সকল দল যোগদান করে তাহাদের পরিচালকগণ খালিহাতে ব্যায়াম কি ও বিভিন্ন বয়সের জন্য কিরূপ প্রণালী তাহা বুঝাইয়া দেন। এমন কি এই ব্যায়াম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠ না উচিত তাহাও পরিচালকগণ বলিতে দ্বিধা করেন নাই। সম্ভব হইলে পরিচালকগণ এই ব্যায়ামের পূর্ণ জ্ঞান দিবার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবেন বলিয়াও মনস্থ করিয়াছেন। দেশবাসীর সাহায্য ছাড়া এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। পরিচালকগণ দেশবাসীর যে সাহায্য একদিন পাইবেন ইহা আশা রাখেন। গত তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা বাঙলাদেশের অনেক ব্যায়াম উৎসাহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছে, নূতন নূতন দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার ফলেই পরিচালকগণ জানিতে পারিয়াছেন। পরিচালকগণের মধ্যে কয়েকজন খালিহাতে ব্যায়ামের সকল জ্ঞান রাখেন। সেইজন্য আশা হয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য শীঘ্রই সাফল্যলাভ করিবে।

নিম্নে এই বৎসরের খালিহাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় যে সকল দল সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—

বড়দের বিভাগ

বিজয়ী দল:—আদর্শ বাণীমন্দির (খিদিরপুর)।

রাণার্স আপ:—তরুণ সাধনা সমিতি (হাওড়া)। (গত বৎসর তরুণ সাধনা সমিতি এই বিভাগে বিজয়ী হইয়াছিলেন।)

ছোটদের বিভাগ

বিজয়ী দল:—সিটি ক্যাম্প (এই দল গত দুই বৎসর সিটি কলেজ স্কুল নাম দিয়া এই বিভাগে বিজয়ী হইয়াছিলেন। পর পর তিন বৎসর একই বিভাগে বিজয়ী হইয়া তাঁহারা ইহাই প্রমাণিত

রাণার্স আপ:—নবজীবন ইউনিয়ন ক্লাব।

বালিকাদের বিভাগ

বিজয়ী দল:—জাতীয় যুব সঙ্ঘ (ইঁহারা গত বৎসরও এই বিভাগে বিজয়ী হইয়াছিলেন।)

রাণার্স আপ:—ভারত স্ত্রী শিক্ষা সদন।

শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম পরিচালকের পুরস্কার পাইয়াছেন আদর্শ বাণী মন্দির ও ভারত স্ত্রী শিক্ষা সদনের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীযুত জগন্নাথ ব্যানার্জি। শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম পরিচালিকার পুরস্কার পাইয়াছেন জাতীয় যুব সঙ্ঘের কুমারী শোভনা দাস।

কুচবিহার ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতা

বাঙলা দেশের ক্রিকেট খেলার উন্নতিকল্পে কুচবিহারের তরুণ মহারাজা কুচবিহার ক্রিকেট কাপটি প্রদান করিয়াছেন। এই কাপ প্রদানের উদ্দেশ্য যে এখনও সাফল্যলাভ করে নাই তাহা এই বৎসরের প্রতিযোগিতা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় কাপ বিজয়ী হইয়াছে অধিকাংশ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত কাষ্টমস ক্রিকেট দল। এই দলে দুইজন বাঙালী খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের দুইজনের খেলার কৃতিত্ব এই দলের সাফল্যে বিশেষ সাহায্য করে নাই। সুতরাং ইহা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের কৃতিত্বে অর্জিত হইয়াছে ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। বাঙলা দেশে বাঙালী খেলোয়াড়দের উপর ক্রিকেট খেলায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের প্রাধান্যলাভ এই বৎসরই প্রথম হইল। ইতিপূর্বে বাঙালী খেলোয়াড়দের সহিত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যতবার প্রতিযোগিতা হইয়াছে ততবারই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়গণ শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছেন। বাঙলার দুর্ভাগ্য তথা বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দুর্ভাগ্য যে সেই সুনাম এতদিন পরে নষ্ট হইল। বাঙালী খেলোয়াড়গণ ক্রিকেট খেলার দিকে বিশেষ যত্ন যে লইতেছেন না এই প্রতিযোগিতা হইতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া গেল। বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ কি ইহা অবনত মস্তকে মানিয়া লইবেন? তাঁহাদের কি এই অপমান অন্তরে আঘাত করিবে না? কুচবিহার ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে যে এরিয়ান্স ক্লাবের খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় তিনবার গৌরব অর্জন করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কি সেই গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না? নিম্নে এই বৎসরের ফাইনাল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

ট্রপিক্যাল স্কুল প্রথম ইনিংস:—১৮৭ রাণ।

(এস গাঙ্গুলী ৪৮, পি মুখার্জি ৪০, বি মিত্র ২৮; হজেস ৫৭ রাণে ২টি, এ কে দাস ৩২ রাণে ২টি ও কঙ্কোয়েষ্ট ২৯ রাণে ৫টি উইকেট পান।)

কাষ্টমস দল প্রথম ইনিংস:—২৫৮ রাণ।

(ই হার্ভে ৮৩, এ কে দাস ৬৩, সি হজেস ৩২; বি মিত্র ৮২ রাণে ৩টি, এস গাঙ্গুলী ৪২ রাণে ৩টি, কে ভট্টাচার্য ৮২ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

ট্রপিক্যাল স্কুল দ্বিতীয় ইনিংস:—৮০ রাণ।

(এস গাঙ্গুলী রাণ আউট ৪৪; সি হজেস ৩৬ রাণে ৫টি, ডবলিউ ৫ রাণে ২টি ও এন কঙ্কোয়েষ্ট ১০ রাণে ১টি উইকেট পান।)

কাষ্টমস দল দ্বিতীয় ইনিংস:—কেহ আউট না হইয়া ১১ রাণ।

সমর বার্তা

২২শে জানুয়ারী।—

তব্রুকের পতন হইয়াছে। কায়রোর বৃটিশ হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে। আক্রমণের ৩৬ ঘণ্টা পর বৃটিশবাহিনী তব্রুকে প্রবেশ করে। অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যগণ দুই ঘণ্টার মধ্যে তব্রুক অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে কামান ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া ফেলে। তব্রুক বন্দরে দুইটি বড় জাহাজে আগুন জ্বলিতেছে। বৃটিশ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা খুব কম।

বৃটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনী কাসালা হইতে পশ্চাদপসরণকারী ইতালীয় বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে ব্যাপৃত আছে। আবিসিনিয়ায় কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। মেটাম্মার পূর্বে ইতালীয়দের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। কেনিয়ার সংবাদে প্রকাশ, তথায় সাম্রাজ্যিক বাহিনীর কর্মতৎপরতা অক্ষুণ্ণ আছে।

আবিসিনিয়ার সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গ্রীসে ইতালীয়ানরা ব্যাপকভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইবার আয়োজন উদ্যোগ করিতেছে। আলবানিয়ার সীমান্ত হইতে রয়টারের সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, যুগোস্লাভিয়া সীমান্তে বহু ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য আসিয়া পৌঁছিতেছে। তদুপরি উক্ত সংবাদদাতা ইহাও বলিয়াছেন যে, বিমানবহর দলে দলে দুর্ধর্ষ ইতালীয়ান আল্পাইন সৈন্যও আমদানী করা হইতেছে।

এরিত্রিয়ায় ইতালীয়ান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে। বৃটিশরা ইতালীয়ানদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

রুমানিয়ায় আয়রণ গার্ড দল কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় রাজধানী বুখারেস্টে অবরোধকালীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী।—

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, তব্রুকে চতুর্দশ সহস্রাধিক সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বন্দীদের মধ্যে একজন কোর কম্যান্ডার, একজন ডিভিসন কম্যান্ডার, দুইজন জেনারেল, একজন এডমিরাল এবং সৈন্য ও নৌবিভাগের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছে। তদুপরি রণসম্ভার সহ বিভিন্ন আকারের দুইশত কামানও হস্তগত করা হইয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী।—

নিউইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ যে, রুমানিয়ান সরকার অবিলম্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ না হইলে জার্মানি সম্ভবত কালবিলম্ব না করিয়া রুমানিয়ায় একটা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। প্রকাশ, জার্মান কর্তৃপক্ষ রুমানিয়াকে "আশ্রিত রাষ্ট্রে" পরিণত করার ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, রুমানিয়ায় বর্তমানে দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষের মধ্যে জার্মান সৈন্য আছে এবং প্রত্যহ বহু জার্মান সৈন্য হাঙ্গারী অতিক্রম করিয়া রুমানিয়ায় যাইতেছে।

ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে এক নৌযুদ্ধে বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে একটি সাত হাজার টন ইতালীয়ান জোগানদার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। উক্ত জোগানদার জাহাজে উত্তর আফ্রিকার জন্য প্রচুর রসদ সম্ভার ছিল।

হাবসী সম্রাট হাইলে সেলাসী আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছেন। খার্টুমের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হাইলে সেলাসী ১৫ই জানুয়ারী সুদান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করেন। বৃটিশ জঙ্গী বিমান রক্ষিত একটি বোমারু বিমানে করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ করেন। হাবসী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ সম্রাটকে অভিনন্দিত করিয়া বাণী প্রেরণ করেন এবং সুদানস্থিত বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির প্রতিনিধিরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন।

জার্মান নিউজ এজেন্সী কর্তৃক উধৃত ব্যাংককের এক বিবরণে প্রকাশ, থাইল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোচীনের সংঘর্ষ থামিয়াছে এবং যুদ্ধ বিরতির এক চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হইতেছে।

২৫শে জানুয়ারী।—

সুইস সূত্রে প্রাপ্ত নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের জন্য হের হিটলার মার্শাল পেত্যাঁর নিকট টিউনিসিয়া দাবী করিয়াছেন।

রুমানিয়ায় অন্তর্বিপ্লবের নায়ক বলিয়া বর্ণিত আয়রণ গার্ড দলের নেতা হোরিয়া সিমা এবং তৎসহ জেনারেল পেট্রোভিসেস্কু (প্রাক্তণ পররাষ্ট্র সচিব) প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জেনারেল আন্টোনেস্কু রুমানিয়ার অবস্থা এখন অনেকটা আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রায় সর্বত্রই শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। রাজধানী বুখারেস্টের চতুর্দিকে জার্মান সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখা হইয়াছে।

২৬শে জানুয়ারী।—

আনকারা রেডিওর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বহুসংখ্যক জার্মান সৈন্যদল দক্ষিণ ইতালিতে প্রবেশ করিয়া ইতালীয় বাহিনীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিতেছে। ইতালীয় বাহিনীর প্রত্যেক ডিভিসনে ইতালীয় উচ্চ সামরিক কর্মচারীদের পরিবর্তে জার্মান অফিসারদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। ইহার ফলে ইতালির দেশরক্ষার সমুদয় ব্যবস্থা অচিরে জার্মানদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

২৭শে জানুয়ারী।—

বৃটিশ সৈন্যগণ এরিত্রিয়ার মধ্যে প্রায় একশত মাইল প্রবেশ করিয়াছে। এরিত্রিয়ায় ইতালীয়ান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

আনকারা রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইতালীয় সমরনায়ক মার্শাল গ্রাৎসিয়াণীকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

ভিসি হইতে জার্মান নিউজ এজেন্সীর খবরে প্রকাশ যে, আগামীকল্য হইতে থাইল্যান্ড ও ফরাসী ইন্দোচীনের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি বলবৎ হইবে। উভয় পক্ষ জাপানের মধ্যস্থতা মানিয়া লওয়ার পর এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

আজও রাত্রিতে লণ্ডনে কোন বিমানহানার সংকেতধ্বনি হয় নাই। আজ লইয়া পর পর আটদিন বৃটিশ রাজধানীতে নৈশ বিমান হানা হইল না।

২৮শে জানুয়ারী।—

আনকারা হইতে বেতারে প্রচারিত এক সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইতালিতে অন্তর্বিপ্লব ও মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলিতেছে। সেখানে এখন ব্যাপকভাবে ধরপাকড় চলিতেছে। জার্মান গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় ইতালীয় পুলিশ বহু লোককে গ্রেপ্তার করিতেছে। মিলানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রায় ১০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত মঙ্গলবার হইতে শুক্রবারের মধ্যে প্রত্যহই "সিনর মুসোলিনী কেন আত্মহত্যা করিতেছেন না," "জার্মানি নিপাত যাউক।" "রাজা ও মার্শাল বাদাগলিও তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন"—ইত্যাদি শীর্ষক বিবৃতি সম্বলিত ইস্তাহার মিলানের সর্বত্র বিতরণ করা হয়।

ফ্যাসিস্টবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিনর বোটাই কাউণ্ট সিয়ানোর ন্যায় রণাঙ্গনে গিয়াছেন। সিনর গোরলাও রণাঙ্গনে গিয়াছেন। সিনর বোটাই ও সিনর গোরলা রণাঙ্গনে আলপাইন বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

আলবানিয়া রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইয়া গ্রীকরা আরও কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২২শে জানুয়ারী—

প্রথম সত্যাগ্রহী আচার্য বিনোবা ভাবেকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে জাতির জনবল সম্পর্কিত আলোচনার উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, আত্মরক্ষার্থে বৃটেন আধুনিক সমরোপকরণে সুসজ্জিত ৪০ লক্ষ লোকের যোগান দিতে সমর্থ।

লেনিনের সপ্তদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মস্কো কমিউনিষ্ট দলের সম্পাদক গতকল্য বেতারযোগে প্রচারিত এক বক্তৃতায় যুদ্ধ হইতে রাশিয়ার দূরে থাকিবার সংকল্প জ্ঞাপন করেন।

ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৩শে জানুয়ারী—

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর চতুঃচত্বারিংশ বার্ষিকী জন্ম-দিবসে কলিকাতার নানাস্থানে সুভাষ দিবস প্রতিপালিত হয়। ঐ উপলক্ষে কংগ্রেসকর্মী ও ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মিগণ বিভিন্ন সভায় উপস্থিত হইয়া অদ্যাপি রোগশয্যায় শায়িত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের সত্বর রোগমুক্তির কামনা করিয়া প্রার্থনা অনুষ্ঠান করেন।

"গ্রেট বৃটেন এন্ড দি ইষ্ট" পত্রিকার সম্পাদক ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ভারত সচিব মিঃ আমেরিকে প্রশ্ন করিলে ভারত সচিব উত্তরে মামুলী কথাই বলিয়াছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রকৃত সমস্যাটি আজ একমাত্র ভারতীয়েরা নিজেরাই সমাধান করিতে পারেন।

বোম্বাই সেণ্টিনেল পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, মস্কো হইতে প্রকাশিত ১৭ই জানুয়ারী তারিখের 'প্রাভদা' পত্রিকায় গান্ধজীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে রুশীয় পত্রিকায় এই সর্বপ্রথম মন্তব্য প্রকাশিত হইল।

২৪শে জানুয়ারী—

সত্যাগ্রহ সংবাদ—শ্রীযুত বিনোবা ভাবে পুনরায় ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম এল একে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়।

নয়াদিল্লী হইতে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' সংবাদ দিতেছেন যে, ৩৮ হাজার ইতালীয় যুদ্ধবন্দীকে ভারতে আনিয়া রাখিবার উদ্যোগ আয়োজন করা হইতেছে। তন্মধ্যে ৭ হইতে ৮ হাজার বন্দী ইতিমধ্যেই ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এরূপ বলা হইয়াছে যে, ভারতে যে সব ইতালীয় যুদ্ধবন্দীকে রাখা হইবে, তাহাদের সকলেরই ব্যয়ভার বৃটিশ সরকার বহন করিবেন।

২৫শে জানুয়ারী—

কুমারী সুপ্রভা দাশগুপ্তার সদ্যোজাত মৃত শিশুকে গোপনে অপসারিত করার অভিযোগে ক্রীক রো'য়ের পরলোকগতা ডাঃ মিস সরোজিনী দত্ত ও তাঁহার সহকারিণী দুইজন নার্স ঊষারাণী দেবী ও সুবাসিনী গুইয়ের বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, অদ্য কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর গুপ্ত তাহার রায় দিয়াছেন। নার্স দুইজন অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে ও তাহাদের প্রতি ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড অনাদায় এক মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন বৃটিশ দূত লর্ড হ্যালিফাক্স ওয়াশিংটনে গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

২৬শে জানুয়ারী—

অদ্য অপরাহ্ন হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ৫ই ডিসেম্বর কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবারাত্র ঐ কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। গত কয়েক দিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত, এমন কি, আত্মীয়স্বজনের সহিতও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্মচর্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন।

কলিকাতা ও শহরতলীর সর্বত্র বিপুল উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শ্রীযুত হেমপ্রভা মজুমদার এম এল এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কর্মপরিষদের ডিরেক্টর হিসাবে গত ১৮ই জানুয়ারী বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেবকে গত চার বৎসরের ঘটনার জন্য দায়ী করিয়া চৌদ্দ দফা অভিযোগ সম্বলিত এক চিঠি প্রেরণ করেন। উহাতে শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের দাবীসমূহ পূরণের এবং অবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের স্থলে এক প্রগতিশীল ও কর্মকুশল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের দাবী জানান হয়।

অপরাজেয় কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় মৃত্যুস্মৃতি-বার্ষিকী সভানুষ্ঠান অদ্য অপরাহ্ণে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল জংশন স্টেশনের নিকটবর্তী শরৎচন্দ্রের জন্ম-স্থান দেবানন্দপুর গ্রামে সম্পন্ন হয়। কলিকাতার 'রবিবাসর', দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র স্মৃতি সমিতি ও দেবানন্দপুর পল্লীসেবক সমিতি এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতা সেনেট গৃহে নিখিল ভারত আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবার ট্রোফি লাভ করিয়াছে।

২৭শে জানুয়ারী—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক গৃহত্যাগের সংবাদে বাঙলার সর্বত্র বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে। অদ্য শেষ রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে অদ্য অপরাহ্ণে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন। টেলিগ্রামে বলা হইয়াছে—সেখানে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদই পায় নাই।

হাঙ্গারীর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট সাকি গতকল্য পরলোকগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের সর্বাপেক্ষা সিনিয়র উকিল যোগেশ-চন্দ্র রায় তদীয় ভবানীপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে বার-লাইব্রেরীতে তাঁহার স্বর্ণ-জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৮শে জানুয়ারী।—

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ হোস্টেলের ৬ জন ছাত্র উক্ত হোস্টেলের মাঠে 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে হোস্টেল হইতে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। ফলে গতকল্য হইতে উক্ত হোস্টেলের ৭২ জন সদস্য অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রীদের ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার এলগিন রোডস্থ বাটি হইতে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর এ পর্যন্ত নানাস্থানে অনুসন্ধান করা হইতেছে বটে, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। তথাপি অনুসন্ধান স্থগিত রাখা হয় নাই, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীযুক্ত বসুর আকস্মিক এবং রহস্যজনক অন্তর্ধানে তাঁহার আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং গুণগ্রাহীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে নানা প্রকার গুজব ও জল্পনাকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে।

জীবজন্তুর খেলাধুলো

চিত্তবিনোদনের জন্য এবং কর্মক্লান্ত দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্যই মানুষকে অবসর সময় বেছে নিতে হয়। এই অবসর সময়ে মানুষ অন্য কোন সমস্যার কথা না ভেবে নানা আমোদ প্রমোদে মেতে যায়। বেশীর ভাগ মানুষই এই অবসর সময়টা কাটায় খেলাধুলোর মধ্যে। যারা খেলাধুলোর পক্ষপাতী নয় তারা খোস গল্পে অথবা অন্য কোনভাবে দেহের ক্লান্তি দূর করে। জীবজগতের কেবল মানুষই খেলাধুলোয় আমোদ পায় না, আরও বহু নিকৃষ্ট জীব খেলাধুলো ক'রে নিজেরা যেমন আমোদ পায়, আমাদেরও সে রকম আমোদ দেয়। খাদ্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত থেকেও জীবজন্তুরা সময় পেলেই, এমন কি কোন কোন শ্রেণীর জীবজন্তু ব্যস্ততার মধ্যেই ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেয়। নদীর কিনারায়, ঝর্ণার ধারে জীবজন্তুদের সুখের নীড়ের সন্ধান নিয়ে বেড়ায়। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল, বুনো জন্তুদের পাল অনুসন্ধিৎসু দর্শকদের উপস্থিতিতে কোন রকম ভয় পায় না। জীবজগত সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণায় ব্যস্ত আছেন, তাঁরা দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে, সমুদ্রের জংলী লতা গুল্মের অন্ধকারে, গিরিকন্দরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে অসীম আগ্রহে জীবজন্তুদের ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় সংগ্রহ করেন। জীবজন্তুদের খেলাধুলোর মধ্যে মাদকতা এতখানি বেশী যে, বিপদের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও অভিযানকারীর দল ধীর সংকল্পে অভিযানে যোগদান করে।

সাধারণত সব রকম জীবের খেলাধুলো আমরা পশু-শালায় গিয়ে দেখতে পাই। সেখানে খেলার মেলা বসে যায়, দর্শকরাও কম উল্লসিত হয় না। ছোট ছোট ছেলেরা

এক জাতীয় গিরগিটি তার লম্বা জিহ্বা দ্বারা কিভাবে শিকারকে আকর্ষণ করে তা চিত্রে দেখান হয়েছে

শিকারকে হত্যা করা এবং শিকারকে নিজের আয়ত্তে আনবার পূর্বে কয়েক শ্রেণীর জন্তু অনেক রকম ছল-চাতুরী অবলম্বন করে। শিকারের পক্ষে এই রকম খেলাধুলো একটা অপরিহার্য অনুষ্ঠান মনে করায় তারা কোনদিনই এটাকে বাদ দেয় না। জাতির জন্ম থেকেই তারা নিজেদের এই বিশিষ্টতা রক্ষা করে আসছে। কয়েক শ্রেণীর জীবজন্তু জীবিকা উপার্জনের কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, খেলাধুলোয় মন দিতেও পারে না। মৌমাছি তার সারাক্ষণের ব্যস্ততার মধ্যে খেলাধুলোর অবসর সময়ও পায় না। মধু সংগ্রহের সময়ে ফুলে ফুলে নেচে বেড়ানোর মধ্যেই মৌমাছির চিত্তবিনোদনের যা একটু নমুনা পাওয়া যায়।

জলে ক্রীড়ারত মাছের গতিবিধির মধ্যে তাদের দেহ-পুষ্টতা ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন উল্লাসের কারণ হয়, তেমনি কারণ হয় তাদের যারা মাছধরার সময় ফাতনার দিকে দীর্ঘ সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে কোন রকম বিরক্তি বোধ করে না।

জীবজন্তুদের খেলাধুলোয় আমরা খুব বেশী আগ্রহ দেখাই না। এর একটা কারণ আমাদের সময়ের অভাব, সুযোগের অভাব এবং রুচির অভাব। পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েরা এবং বড়রা অবসর সময়ে পাহাড়ে পাহাড়ে, হাততালি দিয়ে তাদের খেলায় উৎসাহ যোগায়। ইঁদুরের উপর বেড়ালের স্নেহ এতটুকুও নেই। কিন্তু তাকে হত্যা করবার পূর্বে অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে বেড়াল খেলা করে। সারা দেহে আনন্দ ছুটে বেড়ায়—শরীরের অর্ধেক লোম পুলকে দাঁড়িয়ে উঠে। খেলতে খেলতে বিড়ালের অতিরিক্ত উল্লাসের ভারে এক সময় ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণবায়ু হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে।

কুকুর তার শিকারের সঙ্গে কোন রকম ভদ্রতা দেখায় না। ধরার সঙ্গে সঙ্গেই শিকারকে সে হত্যা করে ফেলে। গোলাকার নির্জীব বস্তুর উপর কুকুরের লোভ সব থেকে বেশী। নিরস কাঠের কিংবা রবারের বল কিন্তু গতিশীল বলের পিছনে ছুটে গিয়ে ধরার আগ্রহ কুকুর খুব বেশী দেখায়। বহুবারের পরিশ্রমেও কুকুর সহজে কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। প্রভুর হাতের নিক্ষিপ্ত বলের জন্য সর্বক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। বার বার বল সংগ্রহ ক'রে আনাতে কুকুর বিরক্তি প্রকাশ পর্যন্ত করে না।

দূরত্বপথ অল্প সময়ে অতিক্রম করবার চেষ্টা, উচ্চ স্থান থেকে লম্ফপ্রদান, উচ্চ লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন এমন ধারা অনেক খেলাধুলো আমরা জীবজন্তুদের খেলাধুলো অনুকরণ ক'রে নিজেদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করছি, ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয়

দিচ্ছি। কোন কোন খেলাধূলার নামের সঙ্গে জীবজন্তুদের নামও ঢুকে গেছে। জীবজন্তুরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখের সামনে যে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে, সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নত করে সভ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ খেলাধূলার পর্যায়ে ফেলেছি। জীবজন্তুরা খেলাধূলার Model দিয়েছে, আমরা বুদ্ধি দিয়ে তা গড়েছি। বক্সিং আজ সভ্য সমাজের একটি বিশিষ্ট খেলা, অনেকদিন ধরে এই ব্যায়াম কৌশলের চর্চা রেখে বহু মুষ্টিযোদ্ধা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বক্সিং খেলার পুরান ইতিহাসের খোঁজ নিতে গিয়ে প্রথমেই চোখে আসে দুইজন মুষ্টিযুদ্ধ রত কাঙ্গারুর নির্ভুল হস্তচালনা, সময়োপযোগী আত্মরক্ষার কৌশল, আক্রমণের প্রচণ্ডতা এবং তা প্রতিরোধ করবার দক্ষতা। আদিম মানুষ বন্যপশুর আক্রমণের ভয়ে পর্বতগুহার এক গোপন স্থান থেকে কবে হয়ত একদিন কাঙ্গারুর এই যুদ্ধ রীতি ভয়বিহ্বল চোখে অভ্যাস করেছিল, তারপর একদিন ক্রোধের উগ্রতায় পরম আত্মীয়ের মারাত্মক স্থানে প্রচণ্ড ঘুঁসি বসিয়ে দিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। আক্রমণ প্রতিরোধ করতে যারা সক্ষম হয়েছে তারাই রক্ষা পেয়েছে, অন্যথা পরাজয়ের কালিমা, মৃত্যুর হীম কুয়াসার মধ্যে ডুবে মরেছে। শক্তির পরীক্ষা দিতে, শত্রুকে পরাস্ত করতে এবং দুর্বৃত্তের আক্রমণ ব্যর্থ করতে বর্তমান যুগে বক্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

জলচর জীবজন্তু এবং পাখীদের কাছ থেকেই আমরা জলপথ সাঁতার দিয়ে অতিক্রম করবার প্রেরণা পেয়েছি, ডুব সাঁতার, চীৎ সাঁতার, ঝাঁপাঝাঁপি এমনি আরও কত কৌশল অভ্যাস করেছি। বিপদের সময়ে এ সবের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পশুরাজ সিংহ সঙ্গীদের সঙ্গে গোলাকার পাথরের চাঁই নিয়ে উন্মুক্ত ময়দানে খেলাধূলায় মেতে উঠে। সে সময়ে তাদের মধ্যে অদ্ভুত খেলোয়াড়সুলভ উৎসাহ দেখা যায়। অনুসন্ধিৎসু মানুষ দুর্গম গিরিপথ লঙ্ঘন ক'রে শত বিপদের বেড়াজাল ভেঙে সেই মল্লভূমির ছবি তুলে আনে—আমরা সে খেলার দৃশ্য অসীম উৎসাহে অবলোকন করি। পশুশালায় মেরুদেশের ভালুকেরা তাদের ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে দর্শকদের যতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অন্য কোন জন্তু ততখানি খুব কম সময়ে দর্শকদের আনন্দ দিতে পারে না।

বাঁদর, ওরাং ওটা, সিম্পাঞ্জী এদের খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম এবং কলা কৌশল দেখে তাক লাগে। খেলার ফাঁকে মাঝে মাঝে অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে যায়, যেন কোন একটা মহাসমস্যার সমাধানে সমস্ত চিন্তার জাল বিস্তার করেছে। দর্শককুল যখন আকুল হয়ে পড়েছে তার খেলা দেখবার জন্যে, তখন তারা হঠাৎ কোন ঘটনার অবতারণা ক'রে তাদের উল্লসিত করে তুলে। বিদ্রূপ বা দর্শকদের আনন্দ এরা বেশ ভাল করে বুঝতে পারে এবং তার সমুচিত জবাব দেয়। কোন কিছুর নকল করবার ক্ষমতা এদের অদ্ভুত। চাল চলন হাব ভাব সমস্তই মানুষের মতন। দুষ্টামিটুকু পুরামাত্রায় থাকায় ছেলের দলের কাছে এদের আদর বেশী হলেও বড়রা তাদের অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আনন্দ পান। বুদ্ধির মাপ একেবারে সীমাবদ্ধ না থাকায় এরা সময়ে সময়ে এমন সব কাজের নমুনা দেখায় যে, এদের প্রশংসা উল্লেখযোগ্য বলে সকলেই মনে করেন। জীবজন্তুদের কাছে আমরা বহু বিষয়ে ঋণী। আজ আমরা যে সভ্যতার মধ্যে এসে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দিচ্ছি, তার মূলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবজন্তুদের কার্যকলাপের ছাপ যথেষ্ট রয়ে গেছে। কোন দিক থেকে তা মুছে ফেলবার উপায় নেই। শিক্ষিত মানুষ তাদের মনের কথা বার করবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করছে। তাদের সাথে বাস ক'রে মানুষ কোন পরশ পাথরের খোঁজে পাগল হয়েছে! বিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে নিরালায় বসে জীবজন্তুদের সঙ্গে খেলাধূলা করতে অথবা সিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটার হাত ধরে একজন অশীতি বর্ষের কেশপক্ক বৈজ্ঞানিককে পথ হাঁটতে দেখলে আমাদের অনেকের কাছে বিসদৃশ লাগে, বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বেশ আরামের আমেজ পান।

গির্জার ঘণ্টাধ্বনি বুড়ো বৈজ্ঞানিকের মন যতখানি আকৃষ্ট করে, ততখানি আকৃষ্ট করে অবুঝ সিম্পাঞ্জী শিশুর মনকে। আনন্দ সমস্ত শরীরের রক্তবিন্দুতে বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হয়ে যায়। শক্ত করে বৈজ্ঞানিকের একটা হাত ধরে সিম্পাঞ্জী শিশুকে গির্জার দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেছে। ঘণ্টার পাদধ্বনির তালে তালে সিম্পাঞ্জী নৃত্য ক'রতে ক'রতে রাস্তার দু'পাশের ধুলো উড়িয়ে হাঁটে। দৈনন্দিন জীবনে অনেক খেলাধূলার মধ্যে এটাও তার একটা আনন্দের খেলা।

পুস্তক পরিচয়

নতুন পত্র—২য় বর্ষ : ২য় সংখ্যা : পৌষ ১৩৪৭।

প্রথমেই প্রথম সংখ্যা হইতে দ্বিতীয় সংখ্যার আশ্চর্য উন্নতিতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। কেননা আমরা আগ্রহ সহকারে প্রথম ও আলোচ্য সংখ্যাখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। ইহা সাধারণ মাসিকীগুলি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নশ্রেণীর এবং স্পষ্টতই ট্রটস্কীপন্থী। প্রচারপত্রে লেখা হইয়াছে ইহা আদর্শবাদী। কথাটা অর্থহীন। ট্রটস্কীপন্থীদের সহিত স্টালিনপন্থী বা চতুর্থ ইণ্টারন্যাশন্যালের সহিত তৃতীয় ইণ্টারন্যাশান্যালের বিরোধ আছে। এই বিরোধ দৃষ্টিপার্থক্যে বিভিন্ন রীতি অনুসরণে। আপাতদৃষ্টিতে স্টালিনপন্থীরা আজ জয়ী ও অভ্রান্ত, ট্রটস্কীপন্থীরা আজ বিতাড়িত ও বিতাড়িত বলিয়াই ভ্রান্ত। এই পটভূমিকার দৃষ্টিতে এই 'নতুন পত্র' বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে মার্ক্সবাদ পাওয়া যাইবে, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে, শ্রমিক আন্দোলনের গতি জানা যাইবে। কিন্তু স্বভাবতই যে কারণে অ্যানার্কিস্ট বাকুনিন ও সাম্যবাদী মার্ক্সের বিবাদ মতানৈক্যে পরিণত ও একটির ধৈর্যচ্যুতি ও অপরটির সংযমখ্যাতি লাভ হইয়াছে, ঠিক সেই কারণে শাশ্বত বিপ্লবের চশমা পরিয়া ট্রটস্কীপন্থীদের যে দৃষ্টি হইবে, স্টালিনপন্থীদের নিকট তাহা অতিবাম অতএব প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া ঠেকিবে। এই মতবাদের বিরোধ যাহাই হউক, আমরা এই নতুন পত্রের অভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানাই, ইহার দীর্ঘায়ু কামনা করি। কেননা, প্রথমত হুমায়ুন কবিরের 'সমাজ ও প্রাথমিক শিক্ষক' প্রবন্ধটি যেকোন 'পত্রের' পক্ষে গৌরবের। আমাদের স্থানাভাব নতুবা এই প্রবন্ধটির কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম। আমরা শিক্ষিত জ্ঞানপ্রত্যাশীমাত্রকেই ইহা পাঠ করিতে বলি। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'প্রারব্ধ বিপ্লব'-এ বস্তুর চাইতে ভাষার ফেনাই বেশী; ...লে ভাবকে ভাষার অলঙ্কার স্তিমিত করিয়া দিয়াছে। দেবেশ দত্তের 'শাশ্বত বিপ্লব' ট্রটস্কীর মতবাদের ব্যাখ্যান। পড়িয়া মনে হয় কোন দেশী ভাষায় লিখিত ইস্তাহারের অনুবাদ। তেমনি আড়ষ্ট, তেমনি অস্পষ্ট এবং স্থানীয় রাজনীতির কোন যোগাযোগ ইহার নাই। ঠিক এই ধরণের প্রবন্ধের সার্থকতা সামান্যই। পুস্তক সমালোচনায় ...স্কী লিখিত কার্ল-মার্ক্সের বিজ্ঞপ্তি আছে। চিঠিপত্রে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'লিয়' ট্রটস্কীর প্রতিবাদ আছে। 'নতুন পত্রের' ...সম্পদ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটির মধ্যে চাতুর্য ও অভিনবত্ব ...মাদের আকৃষ্ট করিয়াছে। অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের 'অভিষেক'-এ ...বোধ ঘোষ লিখিত 'ফসিল'-এর সামান্য গন্ধ পাই; জ্যোতিরিন্দ্র ...নীর 'প্রেত'-এ শহরতলীর কিঞ্চিৎ আঁচ পাই; অমল দত্তের 'চাকীতে'তে ...অবশ্যক রকমে শ্লীলতার উপেক্ষা ঘটিয়াছে। এ যেন গল্পচ্ছলে ...থকের বিকৃত যৌনতৃপ্তি। এ নোংরামি ঘাঁটিবার কাজ 'শনিবারের চিঠি'র, আমাদের নহে, নতুবা উদ্ধৃত করিতাম। কবিতার মধ্যে ...সমেন্দ্র মিত্রের 'মরা চাঁদ' কবির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অন্যান্য কবিতার মধ্যে দিনেশ দাসের 'ঘড়ি' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বাসুদেব রায়ের দুইখানি যে উডকাট তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

পরিচয়—১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৪৭; সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল। প্রতি সংখ্যা আট আনা মাত্র।

পরিচয়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ত্রৈমাসিক অবস্থায় থাকিতে ইহার যে সম্পদসম্ভার ছিল তাহা মাসিক রূপান্তরের পর স্বভাবতই কিছু ক্ষুন্ন হইয়াছে; কিন্তু পরিচয় শ্রেষ্ঠ মাসিকগুলির অন্যতম এবং অন্যান্য পত্রিকার মত বাণিজ্যিক চটক ইহার বক্তব্য বস্তুকে আচ্ছন্ন করে না। পরিচয়ে যাঁহারা লেখেন তাঁহারা অধিকাংশই কেবল খ্যাতনামা নহেন সুলেখক মাত্রেই ইহাতে স্থান পায়। আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের যথাক্রমে ক্রমশ প্রবন্ধ 'স্বরাজ্য সিন্ধি' ও 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস' আছে। পরিচয়ের পুস্তক সমালোচনা সাধারণ গতানুগতিক সমালোচনার বহির্ভূত।

রূপ ও রীতি—২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৭; সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথবাবু ইহার সম্পাদনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি অলকায় ছিলেন। এই বয়সে সম্পাদনা কঠিন। কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। প্রমথবাবুর পক্ষে যদি সম্পাদনা সত্যই সম্ভব হয়, তবে আমরা ভাল প্রবন্ধের আশা করিতে পারি। কেননা বাঙলা সাহিত্য গল্প ও উপন্যাসে ভারাক্রান্ত বটে, কিন্তু প্রবন্ধের একান্তই অভাব। প্রমথবাবুর সম্পাদনার 'রূপ ও রীতি'তে আমরা এরূপ প্রত্যাশা করি। কাগজখানি ছোট, পরিসর সঙ্কীর্ণ, কিন্তু প্রচেষ্টাটি উল্লেখযোগ্য।

হিটলারের পতন—প্রভাস দাস, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

গল্প সংকলন। কোন সূচী নাই। বার তেরটি গল্প। শেষ গল্পটির নামে বইয়ের নাম। গল্পের টেকনিক, উপজীব্য প্রভৃতির মাপকাঠিতে মাপিলে ইহার অনেকগুলিই গল্প নহে এবং বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের মত একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি বিভিন্ন গল্পে ঘটিয়াছে। প্রথম গল্প 'এই তো জীবন' পড়িবার পর আমাদের মনে গল্প লেখক সম্বন্ধে যে সামান্য আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ইহার পরবর্তীগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

বাঙলার ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু—শ্রীনলিনীরঞ্জন চক্রবর্তী, জঙ্গলবাড়ী, হিন্দুসভা। পোঃ জঙ্গলবাড়ী, ময়মনসিংহ। মূল্য তিন আনা।

ভারত সরকারের লোকগণনা রিপোর্ট হইতে লেখক দেখাইয়াছেন যে, "বিধবা বিবাহের অপ্রচলনেই হিন্দু এত দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। হিন্দু যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া লেখক বলিয়াছেন, অচলায়তন সমাজের বিধিনিষেধ ও কল্পিত শাস্ত্রের নিষ্ঠুর অনুশাসনের বিরুদ্ধে আপনারা অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হউন।" ঘরে ঘরে এই পুস্তিকার প্রচার হওয়া দরকার।

সাহিত্য সংবাদ

প্রয়াগ সাহিত্য সম্মেলন

বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারকামী এলাহাবাদের ...প্রবাসী বাঙালী মিলিত হইয়া আগামী ১৭ই ও ১৮ই ফাল্গুন (ইং ১লা ও ২রা মার্চ) প্রয়াগ সংগীত সমিতির হিউম হলে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতেছেন। "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"-এর সুখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হইবার জন্য "বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য" এই বিষয়ে প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য:—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ চক্রবর্তী, ...লাউদার রোড, এলাহাবাদ।—শ্রীশশধর দত্ত, সম্পাদক, প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্য সভা।

* * * *

"আনন্দ সাহিত্য মন্দিরের কবিতা প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ...শে পৌষের পরিবর্তে ৫ই ফাল্গুন কয়েকটি পত্রের একান্ত অনুরোধে ...করা যাইতেছে। প্রবেশ ফি নাই। কবিতার বিষয়:—প্রকৃত ভালবাসার ... সাম্প্রতিক বাঙালীর আদর্শ। ঠিকানা—সম্পাদক, কাশ্মীর দত্ত; ...কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

উদয় সাহিত্য সংসদের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে আগামী ১৬ই ...য়ারী ১৭নং রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ...যোগদান করিতে পারিবেন। নাম দিবার শেষ তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারী। কোনরূপ প্রবেশ মূল্য নাই। আবৃত্তির বিষয়—রবীন্দ্রনাথের "সামান্য ক্ষতি" (কথা ও কাহিনী)। বিশেষ বিবরণ জানিবার এবং নাম দিবার ঠিকানা : শ্রীঅজিত বক্সী, অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেল, ৪৩নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।

'সাজি'র তৃতীয় গল্প প্রতিযোগিতা
রৌপ্য পদক পুরস্কার

এই প্রতিযোগিতার জন্য আগামী ২৫শে মাঘ পর্যন্ত নিম্নলিখিত সর্তে গল্প লওয়া হইবে:—

(১) কেবলমাত্র নবীন লেখক লেখিকাগণের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ। 'নবীন' বলিতে তাঁহাদেরই বুঝাইবে, যাঁহারা তাঁহাদের লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক লয়েন না এবং যাঁহাদের কোন পুস্তক বাজারে নাই। (২) ফুলস্কেপ কাগজের ৬ পৃষ্ঠা হইতে ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে গল্প সম্পূর্ণ করিতে হইবে। (৩) সম্পাদক 'সাজি', ৩৫নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় গল্প পাঠাইতে হইবে। (৪) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিঃ দ্রঃ—পুরস্কারযোগ্য গল্পটি আগামী মাঘ মাসের 'সাজি'তে প্রকাশ করা হইবে। অপরাপর গল্পগুলির মধ্যে প্রকাশযোগ্য গল্পগুলি সাধারণভাবে 'সাজি'তে প্রকাশের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইবে, তাহা আর ফেরৎ দেওয়া হইবে না এবং অমনোনীত গল্পগুলি ডাকটিকিট দেওয়া

৮ম বর্ষ । ২৬শে মাঘ শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 8th February, 1941 । ১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাষচন্দ্রের জন্য উদ্বেগ—

যতই দিন যাইতেছে, সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দিষ্ট অবস্থার ্য দেশের সর্বত্র উদ্বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকের খ ঐ এক কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই নাই। মহাত্মা গান্ধী, ীন্দ্রনাথ, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শ্রীযুত ৎচন্দ্র বসুর নিকট তার করিয়াছেন সুভাষচন্দ্রের সংবাদ নবার জন্য। বিশিষ্ট জননায়কগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সকলেই আজ সমানভাবে উদ্বিগ্ন। সুভাষচন্দ্রের ত্বশক্তি, তাহার এই লোকপ্রিয়তার মধ্যে নিহিত করিয়া- । এবং এই যে একান্ত এবং অনন্যসাধারণ লোকপ্রিয়তা, র মূলে রহিয়াছে সুভাষচন্দ্রের অপরিমেয় দেশপ্রেম এবং ণর জনসাধারণের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। ভালবাসার এই ই রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত শক্তি এবং এই শক্তিকে য় করিয়াই যুগান্তকারী যতকিছু বড় কাজ ঘটে। াষচন্দ্র যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, দেশবাসীর ন্তিক শুভেচ্ছা তিনি লাভ করিবেন এবং সেই শুভেচ্ছা াকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। দেশকে তিনি তে পারেন নাই, ভুলিতে পারিবেন না। গভীর ্যাত্মিক আকর্ষণও দেশের স্বাধীনতা এবং রাস্ট্রীয় ত্র পথেই তাঁহার প্রচণ্ড কর্মশক্তিকে উদ্বোধিত করিবে। ই আমরা আশা করিতেছি।

ট অধিবেশন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ াছে। এই অধিবেশনে নূতনত্ব কিছু থাকিবে বলিয়া আশা যায় না। বাজেটে থাড়া বড়ি থোড়ের গতানুগতিক অভিনয়ই হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলের সিলেক্ট কমিটির কাজ এখনও শেষ হয় নাই। সিলেক্ট কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট কি হইবে এবং কি হওয়া উচিত, এই বিষয় লইয়া গবেষণা করিবারও আমরা কোন প্রয়োজন বোধ করি না; কারণ ঐ বিল একেবারে নাকচ করিয়া দেওয়া হয়, আমরা ইহাই চাই। এ সম্বন্ধে মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না, কিন্তু মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য হয়ত চেষ্টা হইবে, না হয়, নূতন আকারে অপর একটি বিল উপস্থিত করিবার জন্যও চেষ্টা হইতে পারে। চেষ্টা যেদিক দিয়াই হউক, কলিকাতার পৌরজনগণের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়া কর্পোরেশনে সরকারী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা হইবে এবং তেমন প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়াই হইবে, দেশের প্রকৃত স্বার্থ যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের কর্তব্য; কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দেশের স্বার্থ যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের মতের কোন মূল্য এখনও নাই। বাঙালী হইয়াও যাঁহারা বাঙলা দেশের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের জন্য বিসর্জন দিতে বসিয়াছেন, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের বর্তমান নীতির ফলে বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থ কিভাবে পদদলিত হইতেছে, সে চিন্তা তাঁহাদের মনে এখনও জাগিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য। দেশবাসীর কর্তব্য হইবে ইঁহাদের মধ্যে সেই চিন্তাটা জাগাইয়া দেওয়া। বাজেটে বিতর্কের প্রকৃত মূল্যও বর্তিবে তখন, যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া দেশের এই স্বার্থ-বোধ কিয়ৎপরিমাণে জাগ্রত হইবে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া লইবার ব্যবসাই যেখানে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে বাজেট সম্বন্ধীয় বিতর্কের মূল্য শুধু কথা কাটাকাটি।

বড়াইর কথা—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের আপোষ করিবার আগ্রহে উত্তেজিত হইয়া জিন্না সাহেবের কাছে মনের খেদে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বর্তমান শাসন সংস্কারের কিছুই মূল্য নাই। ইহাতে মন্ত্রীদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কাজ করিবার সকল ক্ষমতা রহিয়াছে লাট এবং বড়লাটের হাতে। জিন্না সাহেব যেই চোখ গরম করিলেন অমনিই বাঙলার লীগ শার্দুল সুর ঘুরাইয়া লইয়াছেন। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে গিয়া তিনি সেদিন মুসলমান-দিগকে তাহাদের প্রাচীন প্রভুত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি পাকিস্থান পরিকল্পনা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন, তবে এই নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার হইতে পারে। এই নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া কি, আমরা বাঙলাদেশেই লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের কৃপায় কিঞ্চিৎ তাহার পরিচয় পাইতেছি। দেশের সংহতি শক্তি এই জাতীয়তামূলক সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করাতেই বোধ হয় সে নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের মহিমা সৃষ্টি পাকিস্থানী প্রান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খুটার জোর বাড়াইয়া লীগ সিংহব্যাঘ্রগণ সে ফুরসৎ পাইবেন, এবং তাঁহাদের নিজেদের ডাল ভাতের পাকা ব্যবস্থাও করিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু দরিদ্র এবং মুসলমান জনসাধারণের দুঃখ তাহাতে ঘুচিবে না; কারণ জাতীয় সংহতি ব্যতীত বিদেশীর শোষণক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না। বিপন্ন ইসলামের জিগীরে মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি ভাঙ্গাইয়া মজা লুটিবার এই ব্যবসা আর কতদিন চলিবে?

ভারতরক্ষা আইনে সংবাদপত্র—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দিল্লী শহরে নিখিল ভারত সংবাদ-পত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী ব্যাখ্যাকারক-দের দ্বারা ভারতরক্ষা আইনের ধারাসমূহের যে প্রকার ব্যাখ্যা হইতেছে, তাহার নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্পাদকমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা ও সেই সঙ্গে স্বাধীনতার সেবায় সংঘবদ্ধ হইবার জন্য দেশের সাংবাদিকদিগকে আহ্বান করিয়া-ছেন। পরাধীন দেশে সংবাদপত্রসেবা কিরূপ কঠিন কাজ, সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, বাঙলা দেশে জাতীয়তা-বাদী সংবাদপত্রসেবিগণ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঘাড়ের উপর সরকারী দমন নীতির খাঁড়া লইয়াই এই ব্রত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও করিবেন। জনমত গঠনে সংবাদপত্রের উপযোগিতা এবং শাসন নীতিতে জনমতের মর্যাদা রক্ষার বুদ্ধি এদেশের কর্তা-দের যতই পরিপুষ্ট হইবে, সংবাদপত্রের উপর অকারণ উৎকট বিধিব্যবস্থা জারীর বাতিক তাঁহাদের ততই বন্ধ হইবে, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এ পর্যন্ত তাঁহাদের তাহা হয় নাই। দিল্লী-চুক্তি অনুসারে প্রেস পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে শাখাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু তদনুযায়ী কাজ হইতেছে না। বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী উপদেষ্টাগণ নিজেদের মতকেই বড় বলিয়া বুঝিতেছেন এবং তদনুযায়ী ভারতরক্ষা আইনের ধারাসমূহ সংবাদপত্রসমূহের উপর প্রয়োগ করিতেছেন। দিল্লীর অধি-বেশনের সিদ্ধান্তে কর্তাদের জ্ঞাননেত্র কিঞ্চিৎ উন্মীলিত হইলেই মঙ্গল।

এম এন রায়ের উদ্দেশ্য—

প্রচণ্ড বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বিবৃতি দিতে একজন অতিবড় ওস্তাদ ব্যক্তি। যাঁহারা নিজের বুঝকেই বড় বুঝেন এবং পরের দেখেন কেবল দোষ, শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। রায় মহাশয় মহাত্মা গান্ধীকে অহিংস নীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। রায় মহাশয়ের বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করা হইয়া-ছিল, এইজন্যই তাঁহার এই বিক্ষোভ। রাজনীতি করিতে গেলে এইরূপ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইবেই, রায় মহাশয় অত বড় একজন বিপ্লবী, তখন তাঁহার ইহা বুঝা উচিত ছিল; এবং ইহাও সত্য যে, জনসাধারণকে লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে জনমতের বিরুদ্ধতা করিয়া কথা বলিতে গেলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের জাতীয়তার যাঁহারা বিরোধী, সেই পাকিস্থানী দলের সংগে মিতালি এবং প্রদেশে প্রদেশে সরকারী কর্তাদের উমেদারী করাই হইয়া পড়িয়াছে পরম বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথের একমাত্র কাজ। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সমবেত হয়, এমন কথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না এবং যদি সহস্র সহস্র লোকের সেইরূপ সমাবেশ সত্যই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও রায় মহাশয়ের অবস্থার পক্ষে তাহা সুবিধার কথা বলিয়া তো আমাদের মনে হয় না।

বিবৃতিতে বৈরাগ্য—

পার্লামেন্টের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেন্সেন গত ৩০শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন করেন। এই উপলক্ষে ভারত সচিব আমেরীর আর এক দফা উপদেশ-বৃষ্টি হইবে, আমরা এই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, তিনি সংক্ষেপেই বক্তব্য শেষ করিয়া বলেন যে, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে নূতন কোন বক্তব্য নাই। ভারত সচিব বলেন, মহাত্মা গান্ধীর

সত্যাগ্রহ আরম্ভের পর হইতে ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত ৯৫৭ জনের দণ্ড হয়। এই সকল লোকের অধিকাংশই স্বেচ্ছায় এবং কারাদণ্ডলাভের চেষ্টার ফলেই কারাগারে রহিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের কারাদণ্ডের পর ভারতের জেলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যে মধুর চিত্র ভারত সচিব পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে যে সে বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাই সুখের বিষয় বলিতে হইবে। ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসার প্রয়োজনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব বলেন যে, ঐ সম্বন্ধে কোন বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের দোহাই দিয়া পরোক্ষ-ভাবে পাকিস্থানওয়ালাদের পিঠ চাপড়ানোর সঙ্গে একাজ যে সম্ভব নহে, আমরাও ইহা স্বীকার করি। ব্রিটিশ রাজ-নীতিকদের এইরূপ মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে ইংলণ্ড হইতে হাজার শুভেচ্ছা মিশন আসিলেও যে কোন কাজ হইবে না ইহাও সকলেই স্বীকার করিবেন; কারণ শুভেচ্ছার কর্মীত কোনদিনই ঘটে নাই, দরকার কাজের। কর্তাদের কাছে দরবার করিয়া ভারতের অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, ভারত সচিবের এই সংক্ষিপ্ত উক্তি তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আত্মস্থ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

লুকানো রতন—

মদ্রদেশে একজন অতিরিক্ত রাজনীতিক প্রতিভাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের আবির্ভাব হইয়াছে। ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলাম, ইনি সত্যাগ্রহী বন্দীদের বিচার করিবার সময় চরকা লইয়া বসেন এবং অহিংস তত্ত্বের আধ্যাত্মিকতার অধিকারী আসামী কতটা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা লইয়া থাকেন। এই প্রতিভা-বান্ পুরুষটি হইলেন মাদ্রাজের গুদুরে জেলার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সম্প্রতি ইনি সত্যাগ্রহীদের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে গিয়া ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন কিভাবে চালান উচিত, সেই সম্বন্ধে এক প্রস্থ উপদেশ প্রদান করিয়া-ছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের কাজের জন্যই ভারতবাসীরা স্বরাজ পাইতেছে না; কংগ্রেসের আন্দোলন যদি ভারতবর্ষে না থাকিত, তাহা হইলে ১৯২০ সাল হইতে দশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইয়া যাইত। গুদুরের এই হাকিম সাহেবের মতে কংগ্রেসের আন্দোলনের মূলে কোন রকম যুক্তিবুদ্ধি নাই। যে সব সত্যাগ্রহী আসামীদের উপর হাকিম সাহেব এই অযাচিত রাজনীতিক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ-বৃষ্টি করেন, তাঁহার মতে তাহারা 'মেষজাতীয়' সত্যাগ্রহী। হাকিমের আসনে বসিয়া ইঁহাদের উপর এই শ্রেণীর বক্তৃতা ঝাড়িতে অসুবিধা কিছুই নাই। কিন্তু আমাদের এই দুঃখ হইতেছে যে, এমন একটা রাজনীতিক প্রতিভা 'মেষজাতীয়' সত্যাগ্রহীদের বেণুবনে মুক্তা ছড়াইয়া নষ্ট হইতেছে। বিলাতের ভারত হিতৈষী প্রভুরা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন, স্বরাজ একটা কিছু দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু ভারত-বাসীদিগের শুভবুদ্ধিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের উচিত ভারতীয় সমস্যার সুরাহা করিবার জন্য গুদুরের এই হাকিম সাহেবটির স্মরণ গ্রহণ করা। ১৯২০ সাল হইতে ১৯৪০ সাল এই কুড়িটা বৎসর না হয় বৃথাই গিয়াছে, কিন্তু আর কুড়ি বৎসরের মধ্যেও যে ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেওয়া যাইবে, এমন কথাও তো বিলাতের কর্তারা বলিতে পারিতেছেন না। এমন লুকানো রতনের যদি কদর না হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতির ভারত শাসনে রাজ-নীতিক প্রতিভাই যে হতাদর হইবে!

ন্যায় বিচারের নমুনা—

চট্টগ্রামে একজন ভূতপূর্ব অন্তরীণ এবং ভারতরক্ষা আইন অনুসারে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি পাঁচ মিনিটের জন্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া অপর একজন ভূতপূর্ব অন্তরীণের সঙ্গে কথা বলিয়াছিল, এই অপরাধে চট্টগ্রাম জেলার সদর মহকুমা হাকিম মিঃ করিম তাহাকে এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আপীলে দায়রা জজ মিঃ এম এন গুহ এক বৎসর হইতে দণ্ডকাল কমাইয়া এক মাস করিয়াছেন। সেই সঙ্গে বিচারকারী হাকিমের বিচারের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। দায়রা জজ তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন,—"আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই শ্রেণীর দণ্ডাদেশ ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগকেই নিন্দার্হ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ আদেশ দেওয়ার নির্বুদ্ধিতা বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণ যত শীঘ্র উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।" রাজনীতির সহিত সংস্রব আছে তেমন কোন রকম মামলা হাতে পড়িলেই এদেশের একশ্রেণীর হাকিমদের মাথা অতিরিক্ত আগ্রহে অস্বাভাবিক রকমে গরম হইয়া উঠে। চট্টগ্রামের দায়রা জজের মন্তব্যে গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি হাকিম সাহেবদের এ শ্রেণীর মনোভাব সংযত রাখিবার দিকে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইবে কি? আশা অবশ্যই খুব কম; কারণ এই শ্রেণীর উৎকট দণ্ডাদেশ রাজনীতিক অভিযোগের ক্ষেত্রে এদেশে একেবারেই নূতন নহে।

উদাসীনতার কারণ কি—

বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় মোসাহেব খাঁ নামক একজন কনেষ্টবল মহিতন বিবি নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের চেষ্টা করায় দণ্ডিত হইয়াছে। বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ে জানা যায়, স্ত্রীলোকটি পূর্বস্থলী থানার দারোগা মিঃ ইউসুফের নিকট এজাহার দিতে গেলে সে কোন

আমলই পায় নাই। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র ভট্টাচার্য এই ব্যাপারের প্রতীকারের উদ্যোগী না হইলে এইখানে ব্যাপারটি চাপা পড়িয়া যাইত। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাহসী লোকের অভাবে তাহার প্রতীকার হয় না। পুলিশ যিনি তিনিই পল্লী অঞ্চলে এক একজন প্রভু, এই সব ক্ষুদে কর্তাদের মেজাজ চটাইতে যাইবে কে? খুব কম লোকেই সে সাহস পায়। রামেন্দ্রবাবুকে এজন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। যে অপরাধ করিয়াছিল, রামেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় তাহার সাজা হইয়াছে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পূর্বস্থলী থানার দারোগা অভিযোগের প্রতীকারে উদাসীনতা দেখাইয়াছিল কেন? তাহার বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ ইহাও গুরুতর অভিযোগ, গভর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, আমরা তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিলাম।

হিটলারের হুমকি—

হিটলার সেদিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা লইয়া মার্কিন মুল্লুকে খুব গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে; কারণ এবারকার বক্তৃতায় আমেরিকাকে প্রত্যক্ষভাবে খোঁচা দিয়া তিনি যেমন করিয়া কথা বলিয়াছেন, এমন করিয়া ইহার আগে কোনদিনই কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"যাঁহারা ইংরেজকে সাহায্য করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন সাবধানে থাকেন; কারণ তাঁহাদের প্রত্যেকটি জাহাজ আমরা টর্পেডো মারিয়া শেষ করিয়া দিব। ইউরোপের ব্যাপারে আমরা আমেরিকাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।" এদিকে এশিয়ায় জাপান যেমন সমগ্র এশিয়ার অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হিটলার তেমনই ইউরোপের অবিসংবাদিত অভিভাবকত্বের দাবী করিয়াছেন। ইতালি যে বিশেষ বেকায়দার ভিতরই পড়িয়াছে, হিটলার তাঁহার বক্তৃতায় সে কথাটা স্বীকার করিয়াছেন, তবে তিনি জোর দিয়া শুনাইয়াছেন, ইতালির সংগে তাঁহাদের মিতালির বাঁধন একটুও শিথিল হয় নাই। হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের হুমকীও শুনাইয়াছেন এবং এ কথাও জানাইয়াছেন, ডুবো-জাহাজের তৎপরতার উপর তাঁহারা জোর দিবেন। ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা সমরনীতিজ্ঞ, তাঁহারাও এই সংগে বলিতেছেন যে, শীতের আবহাওয়ার জন্য অসুবিধা কাটিয়া গেলেই হিটলার পূর্বে এবং পশ্চিমে নূতন উদ্যমে আর একবার আক্রমণ আরম্ভ করিবেন। হিটলারের হুমকি এই নূতন নহে; কিন্তু সে হুমকি কার্যে পরিণত করিবার সুবিধা তিনি এ পর্যন্ত পান নাই, বর্তমানে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের আনুকূল্যে অগ্রসর হওয়াতে হিটলারের পক্ষে অসুবিধা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিটলারের এই সব হুমকিতে আমরা বিশেষ কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান করি না, আমাদের পক্ষে গুরুতর সত্য এই যে, যুদ্ধ আরও দীর্ঘ দিন চলিবে এবং তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপে দেশের গরীব-দের করভার অধিক হইয়া উঠিবে, বিনিময়ে লাভ হইবে এই পরাধীন জাতির পক্ষে শুধু হয়ত বিড়ম্বনা। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিবার নাই।

রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ছড়া

(১)
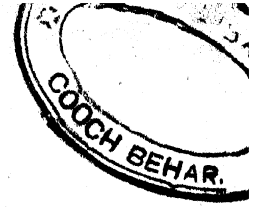
লাগছে বড়ো আলিশ
মাথার কাছে সাজিয়ে দাও গো বালিস
এবড়ো খেবড়ো ঘুমটা আমার হয়নি করা পালিশ
দেহটা এই কার কাছে তাই করছে যেন নালিশ।

শয্যা-ব্যবস্থার দোষে কবির মধ্যাহ্নে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল, তাই সন্ধ্যায় নাতনীকে ঠাট্টা করিয়া কবির এই ছন্দময় নালিশ।

(২)

রোগের তাপে মিল লাগানো বাক্য অবিরত
মনের মধ্যে ওঠে ফেনার মত
পাগলামিটার কারণ পাই না খুঁজি
বন্ধুদে সেই তাপটাকে মন বের ক'রে দেয় বুঝি।

১৯।১।৪১ রাত্রে কবির সামান্য জ্বর হইয়াছিল, সেই বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়াই এই ছড়া। তারপর দিন সকালে থারমমিটারে দেখা গেল, তখন জ্বর নাই। কবি খুসি হইয়া অমনি নাতনী দিদিমণিকে বলিলেন—

(৩)

দিদিমণি মুখের মধ্যে থার্মোমিটার ধরল
নাইন্‌টিসেভেন টু হয়েছে,—পড়তে কি ভুল করল!
সকাল বেলায় টেম্‌পারেচার কেন এত কম থাকে
জানিনে তো চুপটি মেরে কোথায় এখন যম থাকে,
রাতের খাটন খেটে কি তার দূতগুলি সব ঢুলছে
হতভাগার দেহের পরে দৃষ্টি দিতে ভুলছে।

(৪)

সুধীর যখন কর্ম করেন সু-ধীর করক্ষেপে
ধৈর্য হারা কবি যান যে ক্ষেপে
রেগে মেগে কানুরামকে বলেন "সুধীর করকে
বোলাও জলদি করকে"
মাথা চুলকে বাঙাল যখন সামনে এসে দাঁড়ায়
তখন তাহার মুখের ভাবটা উষ্মা তাঁহার তাড়ায়।

১৯।১।৪১, মধ্যাহ্নে কবি তাঁহার কবিতার অনুলিপিকার শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান কী কাজে। তিনি আসিতে যেটুকুমাত্র বিলম্ব ঘটিয়াছিল, সেই সময়টুকুর মধ্যেই কবির মুখে এই ছড়ার সৃষ্টি।

(৫)

আশে পাশে কৌতূহলী উঁকি মারে কোন দিকে
হঠাৎ কখন দেখে চেয়ে বন্দীকে,
দুর্বল পা সাধ্য যে নেই পালিয়ে পাবে রক্ষে
আট পৌরে কবি পড়েন সাধারণের চক্ষে।

১৯।১।৪১, রোগগৃহে কবি কি রকমভাবে দিন যাপন করেন, সে বিষয় অনেকেরই কৌতূহল হয়। একদিন জনৈক কৌতূহলী যখন তাঁহার ঘরের বারান্দার পরদাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উঁকি দিতেছিল, কবি তাহা টের পান। তার কিছুক্ষণ পরেই উপযুক্ত ছড়াটি বলেন।

(৬)

ভাইপো তোমার ওজনে যায় বেড়ে
শীঘ্র তাকে দেয় না যেন ছেড়ে।
পলে পলে শুকিয়ে মরি, ঘিরেছে ডাক্তার
দেহটা যে সুস্থ হবে পায় না যে ফাঁক তার—
বাইরে গিয়ে অসহযোগ করতে যদি পারি
এই একটা পন্থা আছে ওজন করতে ভারি।

১৯।১।৪১, আমার ভাইপো শ্রীমান সত্যেন্দ্রকুমার রায় সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে গিয়া ওজনে বাড়িয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া, কবি সহাস্যে উপযুক্ত ছড়া কাটিলেন।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।
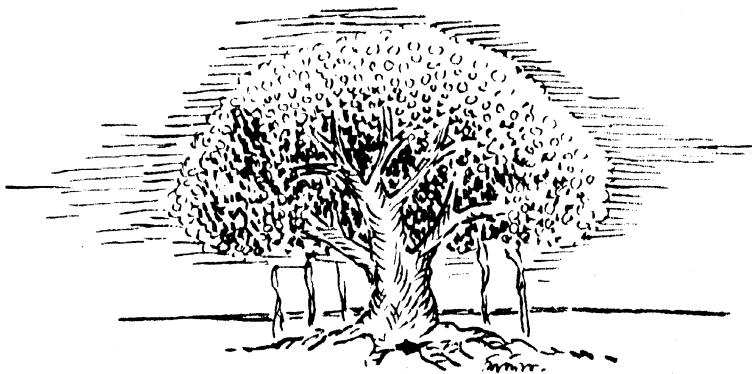
শরৎ স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য

দেবানন্দপুর গ্রামে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের তৃতীয় মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হোলো। দেবানন্দপুর কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ মাইল দূরে। এই পল্লীতেই সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন; এটা তাঁর বাল্যের লীলাভূমি।

সে আজ অর্ধশতাব্দীর পূর্বেকার কথা। শীর্ণ দেহ কিশোর এক ব্রাহ্মণ বালক; মাথায় তাঁর অবিন্যস্ত চুলের রাশি। চঞ্চলমতি বালকের দুষ্টামিতে গ্রামের সকলে অস্থির। না আছে বালকের জাতি অজাতি ভেদজ্ঞান; না আছে তার সামাজিক বন্ধন ও রীতি-নীতির বাছবিচার। বালক এর বাগানে চুরি করে আম পাড়ছে; ওর বাগানে জাম পেড়ে নিচ্ছে। একদিন হয়ত দেখা গেল 'গলায় দ'ড়ের বাগানের ফল চুরি গিয়েছে। অন্যদিন হয়ত দেখা গেল ব্রাহ্মণ বালক পাশের গ্রামের 'গহরের' সাথে বসে আছে। একদিন হয়ত নিরুদ্দিষ্ট বালকের বহু সন্ধান করে 'শ্রীশ্রীরঘুনাথ বাবাজীর' আখড়া বাড়িতে বোষ্টমীদের মাঝে পাওয়া গেল। আবার হয়ত দেখা গেল বালক দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নশ্রেণীর নরনারীর বাড়ি যেয়ে তাদেরকে চুরি করা ফল বিক্রীর পয়সা দিয়ে আসছে। গ্রামবাসীদের কেউ কেউ বললেন, "ছেলেটা বয়ে গেছে?;" কেউ বা বলে 'ওর আর কিছু হবে না।' কিন্তু সেদিন কে জানত যে, ঐ 'বয়াটে' (?) ছেলেটাই একদিন সারা বাঙালীর প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠবে! কে জানত, সেদিন যে ছেলেটির সব আশাই সকলে ত্যাগ করেছিল একদিন সেই 'দুষ্টু, লক্ষ্মীছাড়া' বালককেই সমগ্র বাঙলার সুধী, সাহিত্যিকমণ্ডলী ও জনসাধারণ এত ভালবেসে এমনি করে সজলচক্ষে তাঁর স্মৃতিপূজা করবে!

বস্তুত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন তাঁর রহস্যঘন বাল্য-জীবনের মতই বিস্ময়কর ও আকস্মিক ঘটনাবহুল। বাল্যের সেই দুঃসাহসিক, উদ্দাম ও বন্ধনহীন জীবন প্রবাহ পরিণত বয়সে কিছু নিরুদ্ধ হলেও শরৎচন্দ্রকে একেবারে পরিত্যাগ করে নি। তাঁর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারাটি শরৎচন্দ্র নিজে কোনরূপ লিপিবদ্ধ করে যান নি; যদি করে যেতেন তাঁর সেই আত্মজীবনী তাঁর সাবলীল নিজস্ব বিশিষ্ট প্রাঞ্জল লিখন ভঙ্গিমায় যে আর একটি অদ্ভুত উপন্যাসে পরিণত হত তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অভাব সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসগুলির মাঝ দিয়ে আমরা তাঁর মনের যে দিকটার পরিচয় পাই তা সত্যই অদ্ভুত ও যুগপ্লাবী। শরৎচন্দ্রকে অনেকে 'বিপ্লবী' বলে থাকেন। তার কারণ হয়ত বা এই যে, তিনি প্রপীড়িত, নির্যাতিত সমাজের অতি-শাসনে রুদ্ধবাক্ নরনারীর মুখে ভাষা ফুটিয়েছেন। আজিকার নারী তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর পূর্বেকার মূক নারীর মুখে আজ যদি কোথায়ও আত্মপ্রতিষ্ঠার
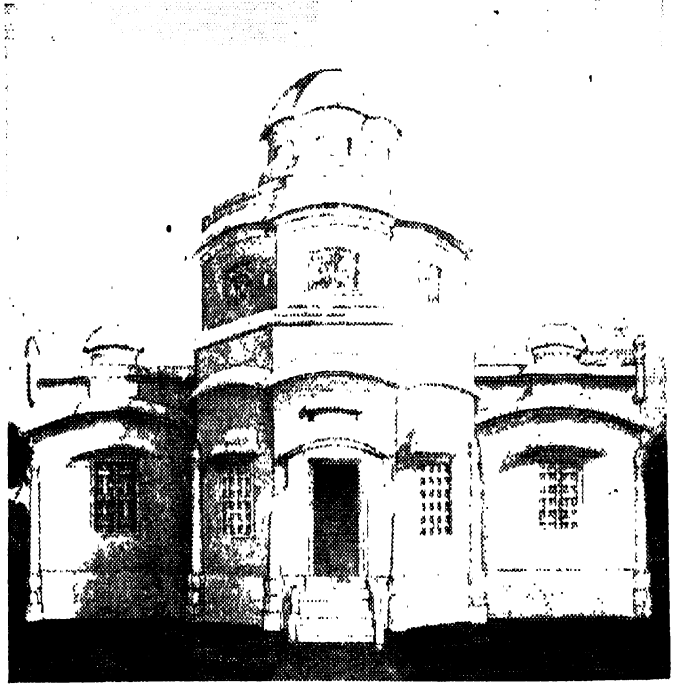
শরৎ স্মৃতি মন্দির—দেবানন্দপুর

দাবী ধ্বনিত হয়, তবে তা শরৎচন্দ্রেরই বিশেষ দান। 'গলায় দ'ড়ের' বাগান, 'কুঞ্জ বোষ্টমী'র আখড়া, 'বুড়ো অশ্বত্থতলা' বালক শরৎচন্দ্রের শুধু দুষ্টামি বা ফলমূল চুরি করারই ক্ষেত্র ছিল না। পরন্তু সেই ছোটবেলায় ঐগুলির সংস্পর্শে শরৎ-চন্দ্রের শিশু অন্তরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাপাত করেছিল সেকালে লোকচক্ষে তা প্রকাশ পায় নি বটে; কিন্তু উত্তরকালে শিশুমনের সেই সব অভিজ্ঞতাই জীবন মধ্যাহ্নে শরৎচন্দ্রের সংবেদনশীল মনকে বাঙলার পল্লী-চিত্রের, বাঙলার 'পল্লী সমাজে'র অমন বাস্তব ও রূঢ় সত্যের রূপ দান করতে বহুলাংশ সাহায্য করেছিল।

আমাদের এই ঘুণধরা জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাটি সব দিক দিয়েই শরৎচন্দ্রের চক্ষে যেমন পরিপূর্ণরূপে প্রকট হয়েছিল, এমন খুব কম সাহিত্যিকেরই হয়েছে। তাই বালক শরৎ সেই কালেও 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' গ্রহণের সংবাদে গভীর বেদনায় অনেক সময় কেঁদে ফেলতেন। তাই সেই ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করে আজীবন শিবমন্দির ও দুর্গা, ভদ্র গৃহাঙ্গনা ও নিপীড়িত, বেদনায় নিরুক্ত নারী, সমাজের অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন দাম্ভিকের দল ও দারিদ্র্যপীড়িত শোষিত তথাকথিত নিম্ন-

শ্রেণীর নরনারীতে শরৎচন্দ্র ভেদ দেখতেন না; সত্য ও মনুষ্যত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রবল বাসনা তাঁকে সর্বত্রই নিঃসংকোচে টেনে নিয়ে যেত।

দেবানন্দপুরে স্মৃতি-তর্পণবাসরে (গত ২৬শে জানুয়ারী) ক্রমে ক্রমে শরৎচন্দ্রের বাল্যসংগী শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত তারকনাথ ব্যানার্জি, শ্রীযুত শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু, কবি গোলাম মুস্তাফা, চন্দননগরের শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সুধীজন এবং সর্বশেষে সভাপতি রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্র-

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র স্মৃতিবার্ষিকী সভার অধিবেশন। সভাপতি অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার বক্তৃতা দিতেছেন।

নাথ মিত্র মহাশয় শরৎচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষ করলেন। তাঁরা প্রসংগক্রমে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান এই দেবানন্দপুর গ্রামে একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপনে যথাসাধ্য সাহায্য করতে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানালেন। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সকলে অপরাজেয় কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ সভার কার্য সম্পন্ন করে উঠে দাঁড়ালেন।

সভার কার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ও সভান্তে আমরা শরৎচন্দ্রের এই বাল্য নিকেতনটি ঘুরে ফিরে দেখলাম। সময় অল্প ছিল। দ্বিপ্রহরে কলকাতা থেকে আমরা অনেকে পল্লীটিতে যেয়ে উপস্থিত হয়েছি; আবার রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরতে হবে। তাই এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই যতদূর পারি পল্লীটির কিছু কিছু দেখে নিলাম। প্রথমে আমরা শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। দেখলাম অতীতে বালক শরৎচন্দ্রের দুষ্টামির স্মৃতি নিয়ে কয়েকখানি জীর্ণ কোঠাবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই একটি শরৎ-স্মৃতি ফলক নির্মিত হয়েছে; তার গায়ে শরৎচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মধুময় ছত্র খোদিত রয়েছে। বাড়িটির সামনে একটি গ্রাম্যপথ বেরিয়ে সরস্বতী নদীর দিকে চলে গেছে; এবং রাস্তার ওপারেই একটি পুকুর। সরস্বতী নদীটি 'হেজে মজে' গেছে; পূর্বের স্ফীতবক্ষ খরস্রোতা সরস্বতী নদীটির জীর্ণ কঙ্কাল যেন! পুষ্করিণীটি বহু পুরাতন। বাঁধানো ঘাটটির কালের গ্রাসে চুণবালি খসে গেছে। পুষ্করিণীর পাড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম; অনতিদূরেই শরৎচন্দ্রের গৃহটি ও তার পার্শ্বের প্রাচীন আমগাছটি দেখা যায়! মনে হল, কতকাল পূর্বে বালক শরৎচন্দ্রের দৌরাত্ম্যে এই পুষ্করিণীর বক্ষ, ঐ আমগাছের শাখা প্রশাখা আলোড়িত ও আন্দোলিত হত। আর আজ সে বালকটি কোথায়? মহাকাল আজ শরৎচন্দ্রকে কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে। একদিন হয়ত তাঁর জীবনেতিহাসের সাক্ষ্য স্বরূপ এই স্মৃতিচিহ্নগুলিও মহাকালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জনচিত্তজয়ী

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি সেদিন জনমনেই তার আসন রচনা করে নেবে।

শরৎচন্দ্রের বাটী থেকে কিছু দূরেই কবি ভারতচন্দ্রের স্মারক ফলক নির্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থানে ভারতচন্দ্র আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা সমাপন করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র

স্বচক্ষে দেখে এবং স্থানীয় লোকমুখে শুনে যতদূর বুঝলাম অতীতের সমৃদ্ধশালী এই দেবানন্দপুর গ্রামটি এক্ষণে ধ্বংসোন্মুখ। সঙ্ঘের সাহিত্যিক ও সুধীজনগণের অনেকে বললেন ম্যালেরিয়াই এর কারণ। আমার কিন্তু মনে হয় গ্রামটির অবনতি ও ক্রমবিলুপ্তমান অবস্থার জন্য শুধু ম্যালেরিয়াকেই দোষী করাটায় সত্যের সবখানি বিবৃত হয় না। আজ যে এই গ্রামখানি এবং এরূপ আরও অনেক পল্লী জনমনুষ্যহীন হয়ে পড়েছে তারজন্য আমাদের নাগরিক সভ্যতা ও নাগরিক বিলাসব্যসনপূর্ণ জীবনের প্রতি মোহটাও কম দায়ী নয়। শুনলাম এই গ্রামটিরই এবং পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করছেন; তাঁদের অনেকেই বৎসরান্তেও একবার গ্রামে আসেন না। আমাদের মধ্যে যাঁরা অবস্থাপন্ন জমিদার শ্রেণীর তাঁরা তাঁদের পল্লীমা-টিকে এইরূপ একেবারে পরিত্যাগ না করে অন্তত বৎসরেও একবার যদি সেখানে যেতেন, তবে আর শত ম্যালেরিয়া সত্ত্বেও পল্লীমায়ের এরূপ দীনহীন বেশ হত না।

সন্ধ্যায় মোটরে করে প্রায় মাইল দুই দূরে বাণ্ডেল রেল স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। এই স্টেশন থেকেই বি এন রেলওয়ের ট্রেনে করে কলকাতায় যেতে হবে। অতি অল্পক্ষণই দেবানন্দপুর গ্রামে ছিলাম। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই পল্লীটিকে বড় আপন বলে অনুভব করলাম। ওর মাঠ, ঘাট-বাট, বন-বাদাড় যেটুকু দেখলাম তাতেই মনে হল ওসব যেন আমাদের কত পরিচিত; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ওদের সাথে বহুবারই যেন পরিচয় হয়েছে। তাই ওদের ছেড়ে আসতে মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠলো। স্টেশনে আমার সঙ্গী প্রবীন সাহিত্যিকবৃন্দ নানা আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। আমার মন কিন্তু অতীত দিনের একটি নির্জন রাত্রের কল্পনায় ডুবে গেল। কে জানে এই স্টেশনটি থেকেই হয়ত বা একদিন এক জনবিরল রাত্রের সম্পান্ধকারে শ্রীকান্তের 'কমলিলতার' হাত ধরে স্নেহনীড়চ্যুত শরৎচন্দ্রের মন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছিল!

আমাদের সকলকে নিয়ে সুতীব্র হুইসিল দিয়ে ট্রেনটি ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম ত্যাগ করল। কামরার জানলা পথে বাইরে চেয়ে আমি 'শরৎচন্দ্র' তথা বাঙালী সাধারণের পল্লীমাকে আমার সশ্রদ্ধ নতি জানালাম।
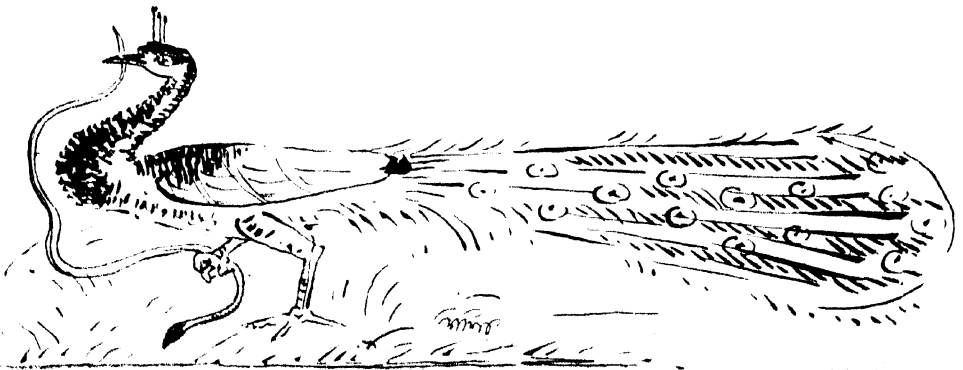
পরিস্থিতি

(অনুবাদ-গল্প)

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারের পার্টিটা রীতিমত জ'মে উঠেছিলো। কিছুদিন আগে পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে, ছেলেরা এবং মেয়েরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে পারছিলো, লীনা গ্লান-এর বড়ো হল ঘরটার মধ্যে তাদের নাচ গান আর স্ফূর্তির একটা শ্রোত ব'য়ে চ'লেছিলো সেদিন।

পার্টির মাঝামাঝি কে যেন ঘণ্টাটা হঠাৎ বাজালো। লীনা বাইরে গিয়ে দরজা খুললো, কিন্তু যখন ফিরে এলো তখন তার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে যে, যে এলো সে যেন না এলেই পারতো—নেহাৎই অবাঞ্ছিত অতিথি যেন সে, মূর্তিমান একটি ছন্দপতন বলা যায়!

ছেলেটির নাম ভিক্টর জোরিন্। স্কুলেই লীনার সঙ্গে ওর পরিচয়, কিন্তু তা হ'লেও সে যেন ভিক্টরকে সহ্য করতে পারতো না, তার বিশ্রী একটা লাজুক ভাব, সকলের আনন্দে তার যোগ দেওয়ার অক্ষমতা, যখন সকলে মিলে-মিশে হাসছে, আনন্দ করছে তখন তার পেঁচার মতো গম্ভীর মুখ লীনাকে একরকম সত্যিই বিপর্যস্ত করতো। লীনা জানতো ভিক্টর বুদ্ধিমান, সুশ্রী এবং বিশ্বাসী এবং এসব দিক থেকে সে সত্যিই ভালো ছেলে, কিন্তু হ'লে কি হ'বে, এতোগুলি গুণের একটিও লীনাকে আকর্ষণ করতে পারেনি কোনোদিন।

ভিক্টর ঘরে ঢুকেই তার সেই সহজ নম্র ভঙ্গীতে সকলকেই অভিবাদন করলো; তারপরে সাইমন গ্রলস্কির কি একটা হাসির কথার ঠিক জবাব না দিতে পেরে গম্ভীরভাবে ঘরের কোণে এক ধারে গিয়ে বস্‌লো। তারপর নিজের মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিলো।

লীনা তার কাছেও গেলো না, আগের মত যেমন সে হাসাহাসি করছিলো, সেইভাবেই হাস্‌লো খানিকটা, তারপরে খানিকটা নাচলো, অবশেষে একটা সোফার ওপরে ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে প'ড়ে রুমাল দিয়ে বাতাস খেতে লাগ্‌লো।

ভিক্টরকে ও যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না, তার সেই নীরব, নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখ মনে হ'লেই ভারী বিরক্ত লাগ্‌তো লীনার।

সাইমন্ গ্রলস্কি, ওদিকে কিন্তু এক্ষেণে খুব জমিয়ে তুলেছে, তার স্ত্রী লিজাও এক একবার উচ্ছ্বসিত হাসিতে উথলে পড়ছিলো, ঘরটায় যেন অবিরত আনন্দের শ্রোত ব'য়ে চ'লেছে।

লীনা সমস্ত সন্ধ্যাটা বেশ অনুভব করতে পারছিলো যে ভিক্টর তাকে সব সময়ই লক্ষ্য রাখছে—সব সময়! কিন্তু লীনা যে সেটা বুঝতে পারছে এমনভাব সে মোটেই দেখালো না, বরং এমন ভাব দেখাতে লাগ্‌লো যেন সে গ্রলস্কিকেই বেশী পছন্দ করে, তারপর এক সময়ে গ্রলস্কিরই একটা হাত ধ'রে বাইরে করিডোরের ওপরে এসে দাঁড়ালো, আর সেখান থেকে তার পরই ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো প্রচুর হাসির শব্দ, যেন লীনা সেই হাসির মধ্যে দিয়ে ভিক্টরকে বোঝাতে চায় যে, তার সেই গম্ভীর আর পেঁচার মতো মুখ ক'রে ব'সে থাকাতেও তাদের উৎসব সন্ধ্যা ম্লান হ'য়ে যায় নি।

তারপরে আস্তে আস্তে সেই হাসির শব্দটা ক'মে এলো, অন্য লোকেরা সকলেই এক একবার ভিক্টরের ম্লান বিবর্ণ মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌লো, ভিক্টর তখনো সেইভাবে ব'সে আছে।

একজন লিজার দিকে চেয়ে বল্‌লে, ওগো শুনছো, স্বামীর দিকে একটু নজর টজর রাখো, বুঝলে?

সে ভয় নেই, আমরা নিজেদেরকে খুব ভালোরকমই চিনি জানো? লিজা বল্‌লে।

আহা, তা হ'লেতো—তা হ'লেতো ভালোই। সেই ভদ্রমহিলাটি উত্তর দিলেন। ঘরে মুহূর্তের জন্যে খানিকটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো, সকলেই যেন অনেকক্ষণ থেকে একটু অস্বস্তি বোধ করছে, গ্রলস্কি আর লীনা অনেকক্ষণ বাইরে গেছে, অথচ এখনো ফিরছে না, কেমন যেন একটা অ-স্বাচ্ছন্দ—

হঠাৎ ভিক্টর উঠে দাঁড়ালো এবং নিঃশব্দ পাদ-নিক্ষেপে গম্ভীরভাবেই বাইরে করিডোরের দিকে চ'লে গেলো।

ঘরের মধ্যে আবার সেই আগের ঘন নিস্তব্ধতা নেমে এলো, সকলেই সকলের মুখের দিকে চাইলো কয়েকবার, তারপর চাইলো দরজার দিকে।

হঠাৎ লীনা গ্রলস্কিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আহা, কি লম্বা লেক্‌চারই দিতে শিখেছিলেন ভদ্রলোক, গেছে না বাঁচা গেছে, লীনা বল্‌লে, আমি রীতিমত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি সত্যি।

এতে তোমার নিজেরি দোষ লীনা, ওকে তোমার এতোটা প্রশ্রয় দেওয়াই উচিত হয় নি। লিজা বল্‌লে।

কিন্তু দেখ, লীনা বল্‌লে, এটা আমি কখনোই ভাব্‌তে পারি নি, একবার হঠাৎই যে প্রশ্রয় পেয়েছে সে আমার ওপর একটা বরাবরের দাবীর সুর আন্‌বে, আর আমাকে অনুসরণ করবে প্রতি পাদক্ষেপে—

আচ্ছা, তুমিই বা ওকে পছন্দ করো না কেন, ওতো বেশ গম্ভীর এবং বুদ্ধিমান, আমার মনে হয়, আমার সাইমন তো তার আদ্দেকও নয়।

সাইমন গ্রলস্কি একবার চোখ তুলে সকলের দিকে তাকালো, তারপরে একবার কেশে এক ঢোকে খানিকটা ভড্‌কা খেলো।

ও আমাকে চেনে না, আমাকে বুঝতে পারে নি, লীনা গ্লান বল্‌লে।

কিভাবে তোমাকে বোঝা যায়, শুনতে পারি?

আমি সেই লোককে পছন্দ করতেই পারি না, যে সব সময় আমার স্বাধীন ইচ্ছাকে বাধা দিতে আসে, আর সব সময় আমার ওপরে যে তার দাবী আছে, একথা জানায়, এ আমি সহ্যই করতে পারি না, এদিক থেকে—লীনা একটু থেমে হেসে বল্‌লে, সাইমন আমাদের আদর্শ।

সাইমন এ কথায় নিজেকে একবার আঙ্গুল দিয়ে দেখালে, তারপর আর এক গ্লাশ ভড্‌কা খেল।

ওঃ খুব যে! লীজা স্বামীর দিকে চেয়ে বল্‌লে, আচ্ছা, বলো তো, আমিও আদর্শ নই এ দিক থেকে?

ওঃ নিশ্চয়ই!

দেখেছো কতো সুন্দরভাবে তোমাকে আমি আদর করি? একথায় লীনা এগিয়ে এলো, তারপরে লিজাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো, তা আর বল্‌তে!

আচ্ছা, এই থেকে ধ'রে নিতে পারি, কোন স্ত্রীলোকেরই গভীর ভালোবাসা থাকা উচিত নয়? এক কোণ্‌ থেকে একটি মেয়ে কথা কইলো। বলেই সে খানিকটা লজ্জিত বোধ করলো নিজেকে, ভাবলে, কেউ বুঝি এইবার তাকে বল্‌বে, কেন আবার এ-সব তর্ক তুল্‌লেন? কিন্তু কেউ কিছু বল্‌লো না, সকলে একটু হাস্‌লো শুধু।

ওঃ আপনারটা বুঝি খুব গভীর? গ্রলস্কি খানিকটা উপহাসের ভঙ্গীতে উচ্চারণ করলো এবং এতে যারা অল্প অল্প হাস্‌ছিলো, তারা জোরেই হেসে উঠ্‌লো।

আমার কথা ঠিক সেরকম নয়, লীনা বল্‌লে, যদিও আমি যখন শিশু ছিলাম, মা আমাকে খুব ভালোবাস্‌তেন, কিন্তু এখন আর আমার সে ভালোবাসা প্রয়োজন নেই।

কিন্তু উনি যে চ'লে গেলেন তাতে আপনার মনে কি একটুও দোলা লাগে নি? সেই মেয়েটি এক কোণ্‌ থেকে আবার প্রশ্ন করলো।

না, লীনা বল্‌লে, ও সব সময়েই আমাকে বিরক্ত করে, সব সময়েই আমার স্বাধীনতার ওপরে করতে চায় হস্তক্ষেপ, এ অসহ্য! কেউ যে সব সময়েই আমার ওপরে শাসনের তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে এ আমি চাই না।

কিন্তু দেখুন, সেই মেয়েটি আবার কথা কইলে, ভালোবাসার ব্যাপারে একজনকে আর একজনের কাছে সমর্পিত হ'তেই হয়, বলেই মেয়েটি একটু আরক্ত হ'য়ে উঠলো, ভাবলে এখুনি বুঝি কেউ বলবে, তুমি বুঝি সর্বদাই যে কোনো লোকের কাছে সমর্পিতা হ'তে প্রস্তুত, কারণ কেউ তো আর তোমার দিকে চেয়েও দেখে না!

আচ্ছা আসুন এবার, লীনা উঠে দাঁড়ালো, চুলোয় যাক্‌ আমাদের ভালোবাসার মনস্তত্ব, আসুন বরং তার থেকে খনিকটা আনন্দ করা যাক।

কিন্তু ঘরের মধ্যে আগের সেই আনন্দ-ঘন আবহাওয়া আর কিছুতেই ফিরে এলো না, ভিক্টর চ'লে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ছায়া সমস্ত ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়েছিলো, সকলেই এটা লক্ষ্য করলো।

দুটো বেজে গেছে, একে একে এবারে সকলেই উঠ্‌তে লাগ্‌লো, লীনাও উঠ্‌লো। সকলের সঙ্গে গল্প করতে করতে সে নীচে নেমে এলো, তারপরে তাদেরকে সে কাছাকাছি চৌরাস্তায় ক'রে হাসি মুখে বিদায় দিয়ে লীনা ফিরলো।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে আস্‌তেই হঠাৎ সে লক্ষ্য করলে, সামনে ভিক্টর দাঁড়িয়ে র'য়েছে।

লীনা একটু ভয়ই পেলে, থমকে সে পথের একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লো কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপরে তার দিকে এগিয়ে গেলো।

এখানে যে, কি ব্যাপার? লীনা একটু বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলো।

তোমার সঙ্গে কথা ছিলো।

কি বিষয়ে?

তুমি জানো।

না, আমি জানি না।

বেশ, আমি তাহ'লে বোলবো, এসো আমার সঙ্গে। ভিক্টর বল্‌লে।

লীনা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে এবং অনিচ্ছা সত্বেও একটু এগিয়ে গেলো।

তুমি জানো, আমি তোমায় ভালোবাসি। ভিক্টর বল্‌লে। লীনা একটা রাগের তীব্র ভঙ্গী করলে।

তুমি জানো, ভিক্টর তার নিজের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে, আমি কতো গভীরভাবে কথা বলি এ-সব বিষয়ে, তোমার গ্রলস্কির মতো নয়, ওতো একটা ভাঁড় বিশেষ।

তাতে তোমার কি? লীনা রীতিমত রেগে উঠ্‌লো, সেটা তার খারাপ গুণ নয়।

তাহ'লে তুমি এই ভাঁড়ামিই বেশী পছন্দ করো?

আমি কি পছন্দ করি আর না করি তা আমি তোমার কাছে বল্‌তে বাধ্য নই, আর তোমারো তা জান্‌বার কোনো অধিকার নেই।

হ্যাঁ, আছে।

আহা—! কে তোমাকে এ অধিকার দিলে শুনি?

আমার গভীর ভালোবাসা!

থামো! ও সব গভীরতা টভিরতা আমি বুঝি না, ওসব আমার বিরক্তিকর লাগে, বুঝ্‌লে?

ও, তাহ'লে তোমার নতুন নতুন লোকের সঙ্গে প্রেম করতেই ভালো লাগে? ভিক্টর বল্‌লে।

হ্যাঁ। কারণ, একটা গম্ভীর আর পেঁচার মতো লোকের সঙ্গে ব'সে থাকার থেকে এটাই আমার কাছে প্রিয়।

ও, তাহ'লে তুমি গভীর জিনিষ চাও না, যে কেবল ভাঁড়ামি করতে পারে, হাসাতে পারে, ইয়ার্কি করতে পারে, আর—

বাইরে থেকে দেখেই লোক চেনা যায় না, মনে রেখো, ভেতরে যে—

ভেতরে? কিরকম? ভিক্টর শান্তভাবে প্রশ্ন করলো, তার মুখ ম্লান হয়ে উঠ্‌লো।

কিছু না—লীনা বল্‌লে।

আমি জানতুম না যে তুমি তার সঙ্গে গোপনে দেখা করো, এটা আমার কাছে একটা খবর বটে!

লীনা বল্‌তে চেয়েছিলো যে আজকের রাত্তির ছাড়া সে আর গ্রলস্কির সঙ্গে দাঁড়িয়ে কোনো দিন কথা বলেনি, কোনো দিনও না—কিন্তু রাগে সে কিছুই বল্‌তে পারলো না, বরং

মন একটা ভাব দেখালে যাতে ভিক্টর ভাবলো যে গ্রলস্কির বং লীনার সঙ্গে করিডোরে দাঁড়িয়ে কিছু ঘটেছে ন দিন।

ও, করিডোরে দাঁড়িয়ে তোমার আর গ্রলস্কির কথাবার্তা কটা আকস্মিক ঘটনা নয় তাহ'লে, রাগের সুরে ভিক্টর ল্‌লে।

না! লীনাও রাগের সঙ্গে বল্‌লে।

আমার চ'লে যাওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করতে পারলে না?

আবার পুরোনো কথা? তোমাকে তো আমি কতোবারই লেছি, কতো সোজা ক'রে যে আমি তোমাকে চাই না, চাই না। আমি তোমাকে ভালোবাসি না, আমার মন তুমি জানো না।

কেন? নিষ্প্রভ কণ্ঠে পেইভ্‌মেণ্টের দিকে চেয়ে ভিক্টর বল্‌লে।

কেন? লীনা বিরক্তিপূর্ণ গলায় কোন রকমে বল্‌লে, তুমি সব সময়ে আমাকে সন্দেহ করো, অনুসরণ করো, লীনা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, মানুষ হিসেবে—মানুষ হিসেবে আমি তোমাকে ঘৃণা করি, বুঝলে?

ভিক্টর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। আর তার সমস্ত মুখ যেন আস্তে আস্তে শাদা হ'য়ে গেলো। তারা দুজনে একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলো, লীনা নদীর দিকে পিছন ক'রে, আর ভিক্টর নদীর দিকে মুখ ক'রে।

এই তাহ'লে শেষ কথা?

এখনো জলের মতো এটা সহজ লাগ্‌ছে না তোমার কাছে? লীনা বল্‌লে।

ভিক্টর শান্তভাবে তার চোখের দিকে চেয়ে রইলো, মনে হলো লীনার চোখে তার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, মাথাটা কেমন ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'রে উঠলো ভিক্টরের, সে আবার তার সেই ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির দিকে চাইলে, ইচ্ছে হোল সে তাকে খুন করে, তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তাকে হত্যা করে, কিন্তু সে কিছুই করলো না, শুধু তার বুকের ওপরে সামান্য একটু ঠেলা দিলে, বল্‌লে, তাহ'লে মরো এবার।

লীনা একেবারে ধারেই দাঁড়িয়েছিলো, ঠেলা খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো, কিন্তু আবার তখনি সামনে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ভিক্টরের মাথায় তখন যেন খুন চেপেছে, সে সামনে আরো এগিয়ে এলো বল্‌লে, না, তারপরে আর একটু জোরে আবার ঠেলা দিলে।

লীনা প্রায় প'ড়ে যেতে যেতে ভিক্টরের জামা চেপে ধরলো।

আমি তোমার কাছে খুব ঘৃণ্য না? তার সামনের জ্যাকেটটা ধ'রে ভিক্টর চীৎকার ক'রে উঠলো।

হ্যাঁ, তোমায় আমি ঘৃণা করি, তোমায় আমি—ভয়ে লীনার মুখ সাদা হ'য়ে উঠলো। রাগে ভিক্টর আবার তার বুকে জোরে ঠেলা দিলে, লীনা নীচের দিকে অনেকটা ঝুলে পড়লো। তার চোখে মৃত্যুর আশঙ্কা দুলে উঠলো, ভিক্টর ততক্ষণে রাগে অন্ধ হ'য়ে লীনার হাতের ওপরে অনবরত আঘাত ক'রে চ'লেছে।

পরমুহূর্তে ভিক্টর দেখলে সে একা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর নীচে জলের মধ্যে ভারী একটা কিছু পড়ার যেন শব্দ শোনা গেলো।

ভোরের ট্রেনেই ভিক্টর তার নিজের গ্রামে ফিরলো। কমপার্টমেণ্টের মধ্যে ব'সে সে ভারী অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। পিস্তলধারী পুলিশ। ব্যস্ত জনতা। সব যেন ভীষণ ভীতিকর লাগতে লাগলো। ভিক্টরকে ধরার জন্যেই তারা যেন ইতস্তত ছোটাছুটি করছে। ট্রেন ছাড়লো। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন দৃশ্য দেখছে এইভাবে বসে রইলো।

হঠাৎ তার মনে হোল যদি এরা তাকে ধরে তাহ'লে কি হ'বে? যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসতো, নিজের হাতেই সে তাকে ডুবিয়েছে; এখন তার বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? কিন্তু এখন সে কি ক'রে, ভয়ে ভিক্টরের বুক শুকিয়ে উঠতে লাগ্‌লো।

ভিক্টর বাড়ি পেঁৗছলো।

এক এক ক'রে তিনটি সপ্তাহ পার হোল। মা, বোন, ভাই সকলেই ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন কি হ'য়েছে? ওরকম চুপ-চাপ সে ব'সে থাকে কেন?

ভিক্টর নীরব।

একদিন চার্চ থেকে ফিরে মা তার মস্তক চুম্বন করলেন, বল্‌লেন, কোনো অসুখ-টসুখ হ'য়েছে নাকি তোর? ভিক্টর মাথা নাড়লো, আর কিছু বল্‌লো না।

রোজ সকালবেলা ভিক্টর খবরের কাগজ দেখতো, আর নতুন যা খবর আছে তা আগ্রহের সঙ্গে পড়তো, একদিন একটা খবর প'ড়ে তার মাথার চুল খাড়া হ'য়ে উঠলো।

ভিক্টর পড়লো যে মস্কোর নদীতে একটি স্ত্রীলোকের বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মাথটা চূর্ণ হ'য়ে গেছে, কিছু নেই। ভিক্টরের সমস্ত শরীর ভয়ে শির-শির ক'রে উঠলো। এ লীনা—লীনা ছাড়া আর কেউ নয়। ভিক্টরের সেই সেদিনের সন্ধ্যার কথা মনে পড়লো—সেই করিডোর, সেই লীনা গ্লান, সেই গ্রলস্কি!

সমস্ত রাত্তির ভিক্টর ঘুমুতে পারলো না। কেবলি তার চোখে লীনার সেই ভয় কাতর মুখ ভেসে উঠতে লাগলো।

পরের দিন আয়নার মধ্যে তাকিয়ে ভিক্টর দেখলে যে, তার মাথার খানিকটা চুল সাদা হ'য়ে গেছে।

মা, বোন, সকলেই সন্দেহ ক'রতে লাগলো, যে ভিক্টর তাদের কাছে কিছু গোপন করছে, কিন্তু কেউ কিছু জান্‌তে পারলো না।

জীবন অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। ভিক্টরের মনে তার সমস্ত জীবনের ওপরে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা এলো। একদিন ঠিক করলো যে সে সেই নদীর ধারে আবার ফিরে যাবে,

তারপরে সেই রেলিংএর ধারে যেখান থেকে সে তাকে ঠেলে দিয়েছিলো, সেইখানে দাঁড়িয়ে বিষ খেয়ে মরবে।

পরের দিন ভিক্টর মস্কো এসে পৌঁছল। সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। সবই সেই আগের মতো, যেন কিছু হয় নি। কিছুই ঘটেনি এর মধ্যে। জেলেরা নদীতে জাল ফেলতে চ'লেছে, ধোপারা কাপড় আছড়াচ্ছে, কাছাকাছি চার্চে ঘণ্টা বাজছে—সবই আগের মতো।

ভিক্টর নদীর ধারে এসে সেই জায়গায় দাঁড়ালো। বুকটা তার টিপ্ টিপ্ করছে। অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরে নীচের দিকে চেয়ে সেই পাথরটাকে দেখতে চেষ্টা করলো। সেই পাথরটা,—যেটার ওপরে প'ড়ে লীনার মাথা গুঁড়ো হ'য়ে গিয়েছিলো একদিন।

হঠাৎ একবার কি মনে ক'রে ভিক্টর পিছনের দিকে চাইলে, অমনি—আশ্চর্য, একটা চলন্ত ট্রামগাড়ীর মধ্যে, সে অবাক হ'য়ে দেখলে—লীনা ম্লান ব'সে র'য়েছে।

লীনার মুখ ম্লান, অনেকটা বিষণ্ন।

ভিক্টর প্রথমে খানিকটা হতবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রামের দিকে ছুটে গেলো। তারপরে আবার থমকে দাঁড়ালো। ভাবলো, এ অন্য কেউ, লীনা নয়।

তারপর ভিক্টর ঘরে এসে সমস্ত রাত পায়চারি ক'রে কাটিয়ে দিলে। পরের দিন লীনা যেখানে থাকতো, সেইখানে সে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য, দেখলে লীনাই বটে! এগিয়ে আসছে তার দিকে, তারপরে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে কোন কথা না বলেই সে পথের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো।

ভিক্টর লীনাকে ফেলে দেওয়ার পরে একটা পাহারাওয়ালা তাকে সেখান থেকে সেদিন তুলে এনেছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে লীনা বলেছিলো যে, নদীর ধারে সেদিন সে দাঁড়িয়েছিলো, হঠাৎ পা পিছলে প'ড়ে গেছে। অথচ কেন যে সে এই মিথ্যে কথাটা বল্‌লে, তা নিজে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না, বন্ধুদের বলেছিলো, জলে সাঁতার কাটতে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছে।

অনেকটা পরিবর্তনও এসেছিলো লীনার মধ্যে। যে প্রায়ই হাসতো একদিন, আজকাল প্রায়ই সে গম্ভীর। নিজের মনে কতোদিন সে ইচ্ছে ক'রে এই সত্যি ঘটনাটা ঢাকা দেওয়ার কথা ভেবেছে, কিন্তু কিছুই সে ঠিক ক'রে উঠতে পারে নি। যে লোক তাকে হত্যা করতে পারে তাকে তো শাস্তিই দেওয়া উচিত। কেন যে—লীনা কিছু ভেবে ঠিক করতে পারে নি।

কয়েকটা দিন গেল।

লীনা বুঝলে, কেমন যেন একটা মোহও আসছে ভিক্টরের ওপরে, এমন কি একদিন লীনা চুপচাপ তার বাড়িতেও এলো। কিন্তু ভেতরে ঢুকলো না, বাইরে থেকেই আবার ফিরে গেল।

আবার আরেক দিন যখন সে রাস্তায় ভিক্টরকে দেখ্‌লে, তখন মনে যেন খানিকটা দোলা অনুভব করলো, ভিক্টর চ'লে গেলে তার মনে হোলো, ছি ছি, তার মুখের ভাবটাও সে ভালো ক'রে লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ!

সেই দেখা হওয়ার পর ভিক্টরও প্রায়ই আসতো, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লীনার জান্‌লার দিকে চেয়ে থাকতো, কিন্তু ভেতরে ঢুকতো না, কেমন একটা সঙ্কোচ অনুভব করতো, কেমন একটু বাধা।

একদিন সাইমন গ্রলস্কির সঙ্গে ওর দেখা হোল

কি খবর? ভিক্টর বল্‌লে

এই চলছে আর কি, গ্রলস্কি উত্তর দিলে, বলার মতো বিশেষ কিছু ছিলোও না তার।

লীনার সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?

হ্যাঁ, ও বড়ো অসুস্থ, কিছুদিন আগে স্নান করতে গিয়ে খুব ঘা খেয়েছে, এখন খুব কমই বাইরে বেরোয়।

ভিক্টর বুঝতে পারলো, লীনা ভিক্টরের সমস্ত দোষকে চাপা দিয়েছে!

পরের দিন।

ভিক্টর দেখ্‌লে লীনা ওদিক থেকে আসছে। ভিক্টর মাথার টুপিটা তুল্‌লে। লীনার ম্লান বিবর্ণ মুখে খানিকটা যেন রক্তের আভা লাগলো। তারপরে তার দিকে চাইলে, তারপরে আরো কাছাকাছি এসে তারা এক সঙ্গে হাঁটতে লাগ্‌লো।

মস্কো থেকে চ'লে গিয়েছিলে নাকি? লীনা বল্‌লে।

হ্যাঁ—গিয়েছিলাম—

দুজনে হাঁটতে লাগলো, ছোট ছোট কথা হ'তে লাগলো তাদের। যেন অনেক দিন তাদের মোটেই দেখা হয় নি। খুব ছোট ছোট কথা। কিন্তু পুরোনো কোনো কথা নয়—তাদের সেই পুরোনো অতীতের!

তবু কথার মধ্যে যেন কিরকম ফাঁক থেকে যাচ্ছে মনে হ'চ্ছে। কেমন একটা শূন্যতা। পরস্পর পরস্পরকে যেন সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টি-কোণ্ থেকে দেখছে। ভিক্টর একটা বাজে প্রশ্ন করলো। লীনার মুখ খানিকটা লাল হ'য়ে উঠলো এবং ভিক্টরও সেইভাবে তার দিকে চাইলে।

সিমেট্রীর কাছাকাছি এসে তারা পৌঁছলো। ভিক্টরের তখন কেবলি সেই রাত্তিরের ঘটনাটা মনে পড়ছে।

ভিক্টরের মনে হ'ল যদি লীনা গ্রলস্কির সম্বন্ধে আবার সেদিনের মতো কিছু বলে, তাহ'লে সে নিজে কি সেদিনের মতো চটবে?

না, রাগ সে আর করবে না। এ বিষয়ে সে স্থির-নিশ্চয়।

কিন্তু তাহ'লে—তাহ'লে তো সবই হোল, তবু এ অস্বাচ্ছন্দ কেন?

লীনা বেড়ার ধার থেকে ফুল কুড়িয়ে নেবার জন্যে থাম্‌লো। ভিক্টর লীনার সেই আনত ভংগীর দিকে তাকিয়ে রইলো। পিছনে তার কতগুলি কবর। কবরের পাথর দেখা যাচ্ছে। আর তারি ফাঁক দিয়ে একফালি সূর্য কিরণ এসে প'ড়ছে তার মুখে।

(শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

[১৬]

পুজোর ছুটির পর যেদিন কলেজ খুললো সেদিন প্রথম যে মেয়েটির সঙ্গে প্রহেলিকার দেখা হ'ল তাকে সে বললে, "কিরে তোর বিয়ে হয়নি এখনও? সারা ছুটিটা ব'সে তবে কি করলি?"

ইলা ভট্টাচার্য বললে, "তুই-ই বা কি করলি তাই শুনি?"

প্রহেলিকা বললে, "আমি? আমার ভাই ওসব সুবিধে হবে না। কি জানিস, বিয়ে যদি করি আমি তবে দ্রৌপদীর মত পাইকেরি হিসাবে করতে হয়।"

"তাই নাকি? কেন বলতো?"

"কারণ, বেটাছেলে কিনা কুকুরের জাত, ওদের একটাকে যদি একটু 'তু' বলি অমনি পালে পালে এসে তারা ল্যাজ নাড়তে থাকবে। কাজেই—"

অশোকা বললে, "কাজেই বিয়ে না ক'রে ঝাঁক শুদ্ধ রাখতে চাস, কেমন?"

ভ্রূকুটি করে প্রহেলিকা বললে, "না ভাই আমার কুকুরের সখ নেই।"

সুজাতা চোখ টেনে বললে, "বাবু মুগের ডাল খান না—পান না তাই খান না।"

প্রহেলিকা বললে, "ঈস্! দেখিবি তবে? দেখাব?"

অশোকা বললে, "কি দেখাবি?"

"'তু' ব'লে ডাকলে এক সঙ্গে কটা আমি জোটাতে পারি।"

অশোকা বললে, "অত দেমাক করিস নে পলি"—(কলেজে তার ডাক নাম পলি) এই বাঙলাদেশে, রূপে, গুণে, ধনে, মানে তোর চেয়ে খাটো নয় এমন ঢের মেয়ে বিয়ের পিত্যেশে হাঁ ক'রে বসে রয়েছে জানিস?"

"যাদের হাঁ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুর মুরোদ নেই তারা বসে থাকুক গে, বিয়ের জন্য যারা হেদিয়ে মরে তারা মরুক গে, কিন্তু আমি পুরুষ মানুষকে তুচ্ছ করি, তাদের দিয়ে কোনও প্রয়োজন নেই আমার। তাই আমার বিন্দুমাত্র ইসারা পেলে তারা গন্ডায় গন্ডায় ছুটে আসবে আমার কাছে। এই পুরুষদের স্বভাব।"

ইলা বললে, "তা' আসতেও পারে। দেশে গুন্ডা বদমায়েসের অভাব নেই, তারা মেয়েদের দেখলে ঝাঁকে ঝাঁকেই আসতে চায়। কিন্তু তুই যদি মনে ক'রে থাকিস পলি যে তাদের কেউ বিয়ে করতে আসবে, তবে বড়ই ভুল বুঝেছিস।"

"ঈস্, ভারী বুড়ী ঠানদিদির মত বক্তৃতা শিখেছেন। গুন্ডা বদমায়েসের কথা বলছি না, এমন সব ছেলে, যাদের দেখলে তোদের নোলায় জল পড়বে, তারাই এসে আমার পায় লুটিয়ে পড়বে।"

"বিয়ে করতে চাইবে?"

"নিশ্চয়।"

"কি ভুল তোর পলি—"

"ভুল, আচ্ছা দেখে নিস্—দেখিয়ে দেবো তোদের।"

অশোকা বললে, "তার মানে, তুই ছোঁড়াদের সঙ্গে ইয়ারকী সুরু করবি এই জন্যে?"

"দরকার হ'লে করবো, দেখাব তোদের।"

ইলা বললে, "সাবধান পলি, ও দুরন্ত খেলা খেলতে যাস নে, শেষে কিসের ভিতর জড়িয়ে পড়বি তুই তা জানতেও পারবি না।"

"ফোঃ, আমি তোদের মত অপদার্থ কিনা?"

প্রহেলিকা পুরুষ জাতকে এমনি কথা অনেক জায়গায় বলতো। একদিন সে ঐ কথাই বলছিল তার এক বয়োজ্যেষ্ঠা পিশতুতো বোনের বাড়িতে। সে বোনটির স্বামীর নাম বিধায়ক বসু। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁকে দেখে কেউ ভাবতো বুড়ো কেউ মনে করতো নেহাৎ ছোকরা। তাঁর সামনের চুল প্রায় চৌদ্দ আনা সাদা, কিন্তু পিছনে সব চুল কালো কুচ কুচে। মুখের উপর বার্ধক্যের রেখা বেশ পড়েছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি যুবকের মত স্বচ্ছ ও কৌতুকোজ্জ্বল, আর সমস্ত দেহের গঠন ঋজু দৃঢ় শক্ত সুগঠিত। পিছন থেকে যারা তাঁকে চলতে দেখতো তারা ভাবতো একটি যুবক যাচ্ছে। সামনে থেকে যারা মুখের দিকে চাইতো তারা ভাবতো বুড়ো, কিন্তু যারা মুখের নীচে চাইতো তারা যুবা ছাড়া আর কিছু মনে করতো না।

প্রহেলিকা তাঁকে বলতো দোমুখো দেবতা Janus—যার একটা মুখ বুড়োর আর একটা মুখ ছোকরার। কিন্তু সুধু এই এক নামেই সে তাকে চিরদিন ডাকতো না। বার দুই তাঁর দুর্বুদ্ধি হয়েছিল তিনি প্রহেলিকার বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন এবং যোগাযোগ করে প্রহেলিকাকে না জানিয়ে নিজের বাড়িতে তাকে এই প্রস্তাবিত বরের সঙ্গে দেখাও করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রস্তাব বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। প্রহেলিকা বিয়ে করতে এত পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করলে যে তাঁর এ দৌত্যের কোনও ফল হল না।

তখন প্রহেলিকা তাঁর নাম দিলে বিদূষক, কেন না সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের একটা লক্ষণ এই যে, তারা নায়ক নায়িকার প্রণয়ের সহায়ক।

বিধায়কের বাড়িতে প্রহেলিকা সেদিন বললে, "মেয়েরা যে কোন্ দুঃখে যেচে ঐ বিশ্রী নোংরা পুরুষগুলোকে বিয়ে করতে চায় তাই আমি ভাবি। বাপ মা ধরে বিয়ে দিতে পারে, কিন্তু নিজে আপন খুসীতে তারা বিয়ে করতে যায় কি দেখে?"

বিধায়ক বললে, "ঠিক ঐ প্রশ্নই আমরা—যারা মুখ

পড়িয়েছি—পুরুষদের সম্বন্ধেও জিগেস করে থাকি? আসল কথা কি জান, কি পুরুষ, কি নারী কারও অপরকে বিয়ে করতে চাইবার পক্ষে কোন টেঁক সই যুক্তি নেই। যেমন আগুনের আঁচ লাগলে মোমের গলে যাবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু এই অহেতুক অযৌক্তিক এবং সম্পূর্ণ লজিক নিরপেক্ষ কান্ডই দিন রাত জগতে হচ্ছে। আগুনের পাশে গেলেই মোম গলে যাচ্ছে, আর পুরুষের সামনা সামনি মেয়েরা এলেই অমনি সব যুক্তি তুচ্ছ করে তারা গলে যাচ্ছে। অন্যায় এসব—লজিকের কোনও কোটায় পড়ে না এসব কিন্তু তবু হয়।"

"আপনি যে পুরুষ তা আপনার এ কথার ভিতরকার স্পষ্ট পক্ষপাত থেকেই ধরা যায়।"

বিধায়ক বাধা দিয়ে বললে, "আমি যে পুরুষ সেটা প্রমাণ করবার জন্য অমন ঘোরালো যুক্তির কোনও দরকার আছে কি? এর চেয়ে সোজা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই কি?"

"না নেই। গোঁপ দাড়ী যদি নাও কামাতেন আপনি তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতো না; কেন না মেয়েদের মধ্যেও যে তা একেবারে না দেখা যায় তা' নয়। কিন্তু এই কথাতেই ধরা পড়ে গেছেন। আপনি বললেন, মেয়েরা পুরুষের কাছে এলেই গলে যায়। যদিও আপনি অবশ্যই জানেন যে খাঁটি সত্যটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"আমার তো বিশ্বাস তা নয়।"

"নয়? একটা মেয়েকে পথে দেখলে হাজার পুরুষ অমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলতে পারেন কটা মেয়ে পথে হঠাৎ পুরুষ দেখলে তেমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে?"

"এ বিষয়ে statistics নেওয়া হয়নি কখনও—কেন না, তাতে অনেক বিঘ্ন আছে। ছেলেদের চাঞ্চল্য নেহাৎ বাহ্যিক ব্যাপার, সেটা চট করে ধরা যায়, মেয়েদের যেটা হয় সেটা সম্পূর্ণ মনের ভিতর হয়, ধরা ভারী শক্ত—ফল্গুর ধারা কিনা!"

"চান আপনি statistics? আমি দেখিয়ে দেবো। আসবেন মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বেড়াতে। যারা আমাকে দেখে চঞ্চল হয় সে পুরুষদের সংখ্যা নেবেন। আর কোনও পুরুষ দেখে আমাকে চঞ্চল হতে দেখেন তবে—"

বিদূষক বললেন, "এটা খুব fair comparison হবে না। তুমি হলে রূপসী যুবতী, আর বিশেষ করে রসবতী। পক্ষান্তরে, তুমি যাদের দেখবে তাদের শতকরা নিরানব্বইজন হয়তো কদাকার—"

হেসে প্রহেলিকা বললে, "পুরুষ আবার কদাকার ছাড়া কখনও হয় নাকি?"

"কি জান, এর উত্তর দিতে গেলে নিজের মুখে বড়াই করতে হয়, কিন্তু নিরপেক্ষ মত চাও তো তোমার দিদির কাছে—"

"ঈস্ ভারী দেমাক দেখছি আপনার, বিদূষক মশায়। আচ্ছা বেশ, আপনি পুরুষদের মধ্যে যাকে আমার সমান রূপবান, গুণবান আর রসবান মনে করেন তাদের নিয়েই আপনার আদম সুমারী করবেন। আসবেন আমার সঙ্গে standing invitation রইল।

এর পরে একদিন প্রহেলিকা বিধায়কের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল, সেদিন সে দেখতে পেলে দূর থেকে নিখিলেশ তাকে যেন চোখ দিয়ে গিলতে চাইছে।

বিদূষককে সে বললে, "ঐ দেখছেন? ও বোধ হয় সাধারণ পুরুষের চেয়ে বেশী কদাকার নয়, কি বলেন?"

বিদূষক বললেন, "না রূপের দিক দিয়ে ওর ত্রুটি নেই—যদিও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অনেক কিছুই বলা যায়।"

"দেখলেন তো?"

তার পর দিন প্রহেলিকা তার ছোট এক বোনঝিকে নিয়ে লেকে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন নিখিলেশ খামকা এসে তার বোনঝিকে কতকগুলো বেলুন, চকলেট প্রভৃতি কিনে দিলে।

তা' দেখে প্রহেলিকা হেসে আকুল হয়ে গেল।

দুটো একটা কথা কইতেই নিখিলেশ কৃতার্থ হয়ে তার সঙ্গ নিলে। কথায় কথায় সে তার পরিচয় গোপন করতে পারলে না, সে যে সেকেন্ড ক্লাশে এম এ পাস করেছে সে কথা পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে গেল।

এ খবরটা যখন জানা হয়ে গেল তখন প্রহেলিকা হেসে বললে, "তবে এখন আমি পালাই"—বলে সে উড়ে যেন চলে গেল।

বাড়ি ফিরবার পথে তার দেখা হল বিধায়কের সঙ্গে। সে তাকে জানালে যে সুধু রূপে নয়, গুণেও নিখিলেশ তুচ্ছ নয়।

বিদূষক বললেন, "তা' হলে চিন্তার বিষয়!"

"মানে? কার জন্যে চিন্তা?"

"তোমার জন্যেই।"

"বটে, আচ্ছা দেখুন, আমি কি করি ওকে।"

তার পর নিখিলেশ যখন বেশ স্পষ্টভাবে আহত হয়েছে দেখা গেল তখন সে একদিন অশোকাকে সঙ্গে নিয়ে গেল সেই মনিহারী দোকানে। সেখানে নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু কোনও কথা হল না।

অশোকাকে প্রহেলিকা বললে, "ঐ ছোকরাকে দেখলি? কেমন? সুপুরুষ নয়?"

অশোকা বল্লে, "হাঁ ভাই খাসা চেহারাখানা।"

"শুধু চেহারা নয়, ও সেকেন্ড ক্লাশ এম এ, আর বোধ হয় বেশ বড় লোক।"

অশোকার এবার একটু সন্দেহ হ'ল, সে বল্লে, "তাই কি? নাচতে থাকবো?"

হেসে প্রহেলিকা বল্লে, "ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না। তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে, নাচতেই লেগেছিস তুই। আচ্ছা বেশ, দুদিন আয় তুই আমার সঙ্গে, মজাও দেখবি আর—বাঁদর নাচ শেষ হ'লে ওকে বগল-দাবা ক'রে ঘরেও নিয়ে যাবি।"

"পোড়ারমুখী!" ব'লে অশোকা তাকে চিমটি কাটলে, কিন্তু এলো সে প্রহেলিকার সঙ্গে।

এমনি দুই একদিন গেলে সে একদিন অশোকাকে নিয়ে নকের ধারে নিখিলেশের উপর চড়াও ক'রে তার কাছে যেমনভাবে বিয়ের প্রস্তাব আদায় করলে, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি।

প্রমোদের সঙ্গে যখন তার প্রথম দেখা হ'ল, তখন প্রহেলিকা তাকে সামান্য দোকানদার ব'লে অগ্রাহ্য করেছিল। কিন্তু যখন সে জানতে পারলে যে, সেও এম এ এবং শুধু এম এ নয়, স্বয়ং "উড়োজাহাজের" লেখক, তখন সে স্থির করলে যে, এটিকে তার দ্বিতীয় শীকার করবে। তারপর একে সুজাতার হাতে গছিয়ে দেওয়া যাবে।

বিধায়ক সে প্রস্তাব শুনে বল্‌লেন, "বারে বারে যে ছাগল ধান খেয়ে যায়, একদিন না একদিন মারা পড়তে হয়।"

"আচ্ছা দেখুন পরখ ক'রে," ব'লে সে তার অভিযান চালিয়ে যখন প্রমোদকে গেঁথে এনেছে, তখন সে যে হঠাৎ কেন সুতো ছিঁড়ে উধাও হ'য়ে গেল, তা' সে বুঝতে না পারলেও, কতকটা আঁচ করলে তার 'নিঃশেষ' গল্পটা পড়ে।

যা বুঝলে সে, তাতে তার মনে আঘাত লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবলে, "এ কি ছিঁচ কাঁদুনে বাপু?" তা' ছাড়া, প্রমোদ সুচরিতার নাম ক'রে স্পষ্টত তাকেই যে দারুণ খোঁচা লাগিয়েছে, তাতেও তার মনে ভারী অস্বস্তি আর রাগ হ'ল।

বিধায়ককে সে তখন বল্‌লে, "দেখুন এর একটা হিল্লে করতে হবে! ওর খোঁজ আমার চাই।"

বিধায়ক বল্‌লেন, "তথাস্তু! কিন্তু এবার যেন টোপ গেলা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"—প্রহেলিকা বল্‌লে, "ছাই!"

বাঁড়ুজ্যে যখন তাকে পড়াতে এসেছিল, তখন প্রহেলিকা একদিনও ভাবে নি যে, এই ব্রাহ্মণ যুবকটিও তার বেড়াজালে মাথা গলিয়ে দেবে। কিন্তু যখন শ্রীবিলাস প্রহেলিকাকে বিয়ে করবার চেষ্টা ক'রছে, এই ভুল বিশ্বাসে মাস্টার মশায়ের মনের কথাটা টোকা দিতেই বেরিয়ে পড়লো, তখন সে ভাবলে যে, একে জব্দ করবার উপায় ইলা। যখন ইলার তাতে আপত্তি নেই বোঝা গেল, তখন সে বাঁড়ুজ্যেকে কৌশলে ইলার হাতে সমর্পণ করলে।

প্রহেলিকার প্রথম মতলব ছিল শুধু পুরুষজাতি সম্বন্ধে তার প্রচুর অশ্রদ্ধাটা হাতে কলমে প্রমাণ ক'রে দেওয়া। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সে এই যুবকদের নিয়ে যে খেলা সুরু করলে, ক্রমে সে এই খেলায় প্রচুর আনন্দের সন্ধান পেলে। তার একটা রোখ চ'ড়ে গেল পুরুষদের বোকা বানাবার এই খেলা খেলতে।

তার রকম সকম দেখে বিধায়ক একদিন বল্‌লেন, "পলি এইবার সাবধান! আর সামলাতে পারবে না।"

তাঁর স্ত্রী প্রহেলিকাকে বল্‌লেন, "এ কি সব ছিষ্টিছাড়া কান্ড তুই করছিস? বাপ-মার নাম হাসাবি?"

পলি বল্‌লে, "না দিদি, নাম হাসাব না, উজ্জ্বল করবো। সাতকাল পুরুষবাবুরা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। আমি তাঁদের একবার দেখে নেবো। সবগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে নাচাব।"

বিধায়ক বল্‌লেন, "Bravo! আমি পুরুষবাবুদের পক্ষে তোমার এ চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করছি, কেননা আজ হোক, কাল হোক, এতে নাকে দড়ি পড়বে তোমারই।"

"ফোঃ! দেখে নেবেন।"

শ্রীবিলাস তার হাতে এসে পড়লো আচমকা। তার দিদির সঙ্গে বিয়ের কথা কইতে এসে সে যে কান্ডটা করলে, তাতে প্রহেলিকা রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগলো। তাকে জব্দ করবার কথা মনে হ'ল।

তার সঙ্গে ওর দিদির বিয়ে হয়, এটা তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ভাবতে ভাবতে তার মনে হ'ল তার এক দূর সম্পর্কের বোন অলকার কথা। অলকার বাপ বিশ্রীরকম বড়লোক, অর্থাৎ এত বড়লোক যে, রোজ দুনিয়া সুদ্ধ লোককে অপমান ক'রে কথা না কইলে তাঁর ভাত হজম হয় না। আর বাপের দেমাক যদি হয় রোদ তবে তার মার দেমাক তপ্তবালি—আরও অসহ্য! অলকার দেমাকের কথাই প্রহেলিকা ব'লতো তিন ছয় আঠার—অর্থাৎ তার বাপের ও মায়ের দেমাকের যোগফল নয়, গুণফল।

সুধু দেমাক নয়, মেজাজ তার বিষম তিরিক্ষি। বাড়ির বা বাইরের সবার উপর সে চটেই আছে দিন রাত, আর যাকে নিতান্তই সে চড় চাপড় না মারে তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'রতেই থাকে সে।

প্রহেলিকার জানা ছিল যে এহেন অলকার বিয়ের একটা কথা হয়েছিল। ছেলের পক্ষে মেয়ে দেখবার প্রস্তাব শুনে তার বাপ বলেছিলেন, "আমার মেয়ে—তার উপর নগদ দশ হাজার টাকা পাচ্ছে। আবার মেয়ে যাচাই করতে চান!—ওসব মেয়ে দেখা ফেখা হবে না।"—এর কারণ এমন নয় যে অলকা দেখতে কিছু মন্দ। দেখতে শুনতে সে চলনসই রকম, আর রূপ তার যা আছে তার উপর রং মেখে আর কাপড় চোপড় গয়নার চটকে সে বরং তাক লাগিয়ে দেয় দশগুণ। তবু দেখাবেন না তা বাপ,—এটা তাঁর দেমাক!

সর্বদিক ভেবে দেখলে প্রহেলিকা, এই অলকাই শ্রীবিলাসের উপযুক্ত শাস্তি। তাই সে প্রথমে শ্রীবিলাসকে বাঁড়ুজ্যের মারফৎ অলকার খবর দিলে।

তার পর হ'ল তার আরও দুষ্টবুদ্ধি, তাকে আর খানিকটা নাকাল করবার। তাই সে করলে সেই swimming poolএর কান্ড।—তাতে যে শ্রীবিলাস শেষে তার দিদিকেই বিয়ে ক'রে বসবে তা সে আঁচ করেনি। সে ভেবেছিল যে অলকার বাপের হাত থেকে শ্রীবিলাস ছাড়ান পাবে না কিছুতেই।

শ্রীবিলাসও ভেবেছিল যে ছাড়ান পাওয়া তার হয় তো শক্ত হবে—চাই কি একটা মামলা ফ্যাসাদ হ'তে পারে। কিন্তু বিপদ হওয়া দূরের কথা সে এ থেকে বেশ একহাত মেরে নিলে, শশীর উপর বাণিজ্য ক'রে।

নিখিলেশ, বাঁড়ুজ্যে ও শ্রীবিলাস তিনজনের বিয়ের

(শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন ভারতের প্রাচীর-চিত্র

শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী কাচাডোরিয়ান কোলকাতার চিত্রামোদিদের কাছে নিতান্ত নবাগত নন। প্রায় এক বছর হল প্রাচ্য শিল্পের ভারতীয় সংসদের উদ্যোগে সংসদের অধুনা পরিত্যক্ত ভবনে কাচাডোরিয়ানের অঙ্কিত ইরাণীয় প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতির প্রায় এক শত চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। বাঙলার শিল্প রসিকেরা তখন সেসব ছবির ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন। তখনি রং আর রেখার উপর শিল্পীর প্রভূত ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তখন তাঁর পরিচয় ছিল স্বল্পজ্ঞাত আর ছবিগুলির বিষয়বস্তু ছিল বৈদেশিক—প্রায় অপরিচিত আবেষ্টনীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে প্রমাণ হয়েছে যে খাঁটি শিল্পীর কোন দেশ নাই, কোন জাতি নাই, কোন বন্ধন নাই—সকল সীমার তিনি অতীত, তিনিই প্রকৃত International. আর অধিক প্রশংসা না করে এবার আমরা তার ছবিগুলির কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের বহু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান রয়েছে—এদের কিছু কিছু পরিচয় শিল্প রসিকদের কাছে উপস্থিতও করা হয়েছে—অবশ্যই ইংরেজী ভাষার মারফৎ! এই প্রচেষ্টায় কতটা শিল্প রসগ্রাহী আমরা হয়েছি তা আমি আজ বলব না; কিন্তু

সখী পরিবৃতা রাজমহিষী—পোল্লোনারুভা।

মধ্যে তাদের পরিকল্পনা। জনসাধারণ রেখা ও বর্ণের বিদেশীয় আবেষ্টনীকে হয়ত তখন খুব সহজভাবে গ্রহণ কর্তে পারেনি।

ঐ সংসদের উদ্যোগেই যে প্রদর্শনীটি গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে খোলা হয়েছে তাতে প্রায় ন্যূনাধিক পঞ্চাশখানা ছবি নিয়ে কাচাডোরিয়ানের শিল্প আর এক নূতন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাচাডোরিয়ান জাতিতে ইরাণী; শিক্ষা তাঁর প্যারিসে; জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি পাশ্চাত্যেই অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু আজ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশালাগুলি পরিক্রম করে, সুদূর সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের অখ্যাত আর স্বল্পখ্যাত গুহা মন্দিরের প্রাচীরের গা থেকে যে মণিমঞ্জুষা তিনি আহরণ করে এনেছেন, আর এ আহরণ কার্যে তিনি যে রসোত্তীর্ণ আমরা দেখেছি যে সেই প্রাচীন শিল্পের অনুসৃত পথ ধরে কিছু কিছু শিল্প সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের দেশে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। কিন্তু শিল্পের যা মূল প্রাণ সেই রেখা আর রং এ দুটোর ওপর আমাদের শিল্পীদের কতটা অধিকার আজ অবধি জন্মেছে সে নিয়ে খুব বেশী আলোচনা বোধ হয় না করাই ভাল। দেশীয় বহু শিল্পীও ভারতের চিত্রশালাগুলি ঘুরে এসেছেন—বড়ো বড়ো বইও দু'একখানা তাঁদের লেখা বেরিয়েছে। শিল্পী কাচাডোরিয়ানও তীর্থ পর্যটকের মত এগুলির দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন, আর যা নিয়ে এসেছেন তা পুঁথি নয়, সেই সব ছবির জীবন্ত অনুকৃতি—যত দূর এবং বোধ হয় প্রায় ততদূরই সম্ভব জীবন্ত—রং ও রেখায় ভঙ্গি ও বৈচিত্র্যে।

প্রাচীন ভারতে চিত্রশিল্পের ভান্ডার, আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি, আবিস্কৃত হয়েছে এলোরায় আর অজন্তায় সিংহলের বাগ আর সিগিরিয়ায়। এসব জায়গায় ছবি আছে পাহাড়কেটে করা গুহার প্রাচীরে, সারিতে সারিতে, অসংখ্য। অনুসন্ধানে বেরিয়েছে,

রাণী ও পরিচারিকা—সিগিরিয়া

আরো অনেক গুহা, দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দির—এরাও চিত্র-শিল্পে সমৃদ্ধ। দক্ষিণ ভারত আর সিংহলের এই লোক পরিত্যক্ত স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে অপূর্ব অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাচাডোরিয়ান বহু ছবি নকল করে এনেছেন, অনেক জায়গায় অনেক নূতন চিত্রের সন্ধান তিনি বার করেছেন অনেক দেওয়াল থেকে যে লেপের ওপর ছবি আঁকা হয়েছিল তা খসে খসে যাচ্ছিল, তার পতন ও ধ্বংস রোধ করবার প্রয়াস তিনি করেছেন। যে ছবি তিনি এনেছেন গুণের পরীক্ষায় ও আমাদের আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠির ঈর্ষণীয় মূল্যে তা বিক্রয় করে প্রভূত উপার্জনও তিনি করবেন কিন্তু ভারতীয় শিল্পের যে সেবা তিনি করে গেলেন একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যাবে না।

দ্বারভাঙ্গা হলের প্রদর্শনীতে যে ছবিগুলি দেখান হচ্ছে তার অধিকাংশই এসেছে সিংহলের পলুন্নোরোআ আর সিগিরিয়া থেকে। বাগ গুহায় এরই আবিস্কৃত একটি, দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলির দুটি কয়েক, আর কএকটি খুচরো ছবিও রয়েছে। এদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পলুন্নোরোআ থেকে আনা যে ছবি-গুলি—উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে আমরা সিংহলের চিত্র সম্পদের কথা জানতাম, সিগিরিয়ার আর বাগের বহু ছবির নকল আমরা দেখেওছি; কিন্তু পলুন্নোরোআর কথা শুধু বই-এই পড়া ছিল, এছবিগুলি দেখে আমরা যেন একটা নূতন জগতের সন্ধান পেলাম। চিত্রশিল্পের পরিণতির ইতিহাস নিয়ে যারা আলোচনা করেন, তাদের প্রথমেই আকৃষ্ট করে পলুন্নোরোআর সঙ্গে অজন্তার Classical phase-এর নৈকট্য। এটা বাস্তবিকই আশ্চর্য যে অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি অঙ্কিত হবার ন্যূনাধিক দু'শ বছর পরে সিগিরিয়ার যে চিত্রধারার উদ্ভবের পরিচয় আমরা পাই, তুলনায় অজন্তা থেকে তাদের অনুৎকর্ষ ও দূরত্ব দৃষ্টিগোচর না হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আরও তিন শত বর্ষ পরে, অজন্তার সার্ধ পাঁচশ' বছর পেছনে থেকেও পলুন্নোরোআয় কি করে আবার সেই রেখার লালিত্য বর্ণের সুষমা ও সংস্থানের সঙ্গতি ফিরে এল তা ভাবতে বাস্তবিকই আশ্চর্য হতে হয়। পলুন্নোরোআ থেকে যেসব ছবি এসেছে তাদের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ জাতক আদি থেকে নেওয়া। হলে ঢুকেই বাঁদিকের প্রাচীরে এক সারিতে ১৫খানি ছবির প্রত্যেক-খানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার ৬ষ্ঠখানি সংস্থানের সঙ্গতি, ভারসাম্য, দেহ লালিত্যের প্রকাশ ও কারু সজ্জার গুণে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিখুঁত সৃষ্টির একখানি অনবদ্য পরিচয়। ৭ম চিত্রখানিতে নীল রংয়ের সামান্য ছোঁয়ায় এক অপূর্ব সৌন্দর্য লোকের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, শিল্পী তার অনুসরণে মূলের রংই যতদূর সম্ভব অক্ষুন্ন রেখে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রচুর—অঙ্কনের ক্ষেত্র হচ্ছে তার কাগজ—এরই ওপর, স্বাভাবিক রঙের যে বর্ণবৈচিত্র্য বিশেষ যত্নে গড়া আস্তরণের ওপর গুহাগাত্রে ব্যবহৃত হত তাকে ফিরিয়ে আনা বড় অল্প সাফল্যের পরিচয় নয়। পলুন্নোরোআয় ব্যবহৃত মূল রং সংখ্যায় অল্প—যেটা খুবই চোখে লাগে সেটা হচ্ছে একটা নরম গেরুয়া—মাটির থেকেই তৈরী। রেখাঙ্কনের জন্য ব্যবহার হয়েছে আরও গভীর গেরুয়া—যেটা শিল্পীদের পরিভাষায় Indian red এরই মধ্যে অত্যন্ত

নৃত্যরতা তরুণী—পোলোনারুভা

সাবধানে এখানে ওখানে নিপুণ হাতে ব্যবহার হয়েছে ফিকে নরম থেকে একটু চড়া নীল। এই কটি রঙের খেলায় যে অপূর্ব শিল্প-লোকের সৃষ্টি হয়েছে তাকে এক কথায় বলব অনতিক্রমনীয়।

এরই পরে ধীর গতিতে সিগিরিয়ার ছবিগুলির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াতে হয় বাগ গুহা থেকে আহৃত একটি অপূর্ব নারী মূর্তির সম্মুখে। ঈষন্নীল বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত চামর-ধারিণীর মূর্তি, অর্ধনত হয়ে পদ্ম আহরণে রত—পৃষ্ঠদেশের

বঙ্কিম রেখাটি দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ে উদ্বেলতার সৃষ্টি করে। সির্গিরিয়ার চিত্রগুলিতে দেহের গঠনে যেন একটু আড়ষ্টতা, রেখায় যেন একটু রূঢ়তা বর্ণের যেন একটু অধিক জ্বালা, আভরণের যেন একটু অনাবশ্যক আধিক্য—। বস্তুত পলুন্নোরোআর শক্তিমান গঠনের চিত্রগুলির পর, তাদের রেখার নমনীয়তা, বর্ণের কোমলতা ও দেহ গঠনের উৎকর্ষের এত নিকটে সির্গিরিয়ার ছবিগুলি যেন নিজেদের ঠিক আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। তাদের ভেতরেও যে দেখবার, উপভোগ করবার গুণ রয়েছে, আঙ্গুলগুলির অপূর্ব অনুভূতিশীলতা, আঁখির প্রকাশ ক্ষমতা সেগুলি যেন উপেক্ষিতই থেকে গেল। এর পরই আসতে হয় দক্ষিণ ভারতের মন্দির গাত্রের অধিকাংশ অসম্পূর্ণ ছবিগুলির সামনে। ভাস্কর্যসুলভ গুণে বস্তুকে প্রেক্ষাপট থেকে টেনে বাইরে এনে দেখাবার কৌশলে রং ও রেখার অপূর্ব চাতুর্যে বিষ্ণু আর শিব, গণেশ আর দেবী, এগুলির ভেতর থেকে অতি পরিচিতের মতই যেন বেরিয়ে আসছেন—উপবেশনের ভঙ্গীতে, নৃত্যের লাস্যে, বরাভয় দানের অভিব্যক্তিতে। মনে হয়, বাস্তবিকই মনে হয় শিল্পীর সাথে কি এদের অতি আপনার জনের মতই এত নিকট পরিচয় ছিল, যাতে হাত একটু কাঁপল না, রেখা একটু বাঁকল না যেখানকার যেমন রংটি তেমনিভাবে প্রলিপ্ত করবার একটু বিচ্যুতি ঘটল না!

আবার কয়েকখানা পলুন্নোরোআ আবার সেই রং রেখা সংস্থান আর কারুসজ্জার প্রশান্তি। এই পর্যায়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পশ্চাৎদিকে সামান্য হেলানো প্রভুবুদ্ধের আবক্ষ মূর্তি—সুদূর জাপান দ্বীপের হরিউজির বিখ্যাত বুদ্ধ মূর্তিকে নিমেষে মনে পড়িয়ে দেয়।

এই প্রাচীরের কোণে দুখানি নৃত্যপরা অপ্সরীর মূর্তি, মন্দির গাত্র থেকে আহৃত ছবির ফটো চিত্র—সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিও এদের দিকে না তাকিয়ে যেতে পারে না।

আমরা ছবিগুলির কিছু পরিচয় দিলাম। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের আধুনিক দীর্ঘাঙ্গুলী লীলায়িত দেহ সংস্করণ দর্শনে যাদের বিরক্তি এসেছে—তাদের কাছে এই প্রদর্শনীর আকর্ষণ দুর্নিবার। ভারতীয় মন, যে মন ইন্দ্রিয় হতে অতীন্দ্রিয়কে একটু বেশী গ্রাহ্য করেছে, বাস্তব সৌন্দর্য থেকেও যে মন বস্তুর অতীব সৌন্দর্যের সন্ধান করেছে, সহস্র দলের সৌন্দর্যে যে বিশ্বসৌন্দর্যের লীলাকে প্রতিফলিত দেখেছে এচিত্র প্রদর্শনীর আহ্বান সে মনের কাছে নটরাজের নৃত্যোৎসবের মতই বাজবে। এ শিল্পে না বুঝবার কিছু নাই, সবই আমাদের ঘরের কথা, আমাদের সাহিত্যের চিত্র, আমাদের অতি পরিচিত মানুষকেই অতি পরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে দেখিয়েছে।

অনুসরণে সাফল্য অর্জন করা কত দুরূহ, শিল্পী আর শিল্প সন্ধানী মাত্রেরই তা সুপরিজ্ঞাত। শিল্পের এই পথে, প্রাচীন ভারতের সাফল্য ও সাধনাকে গুহার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টাও অনেক হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মন নিয়ে, সম্পূর্ণ বিপরীত পারিপার্শ্বিককে পঙ্গু শিক্ষা নিয়ে কাচাডোরিয়ান যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা অভূতপূর্ব। যে সাধনা, যে দরদ, যে অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এটা সম্ভব, এই প্রৌঢ় ইরাণীয় শিল্পীটিতে তা কোথা থেকে এল ভাবতে বিস্মিত হতে হয়। আর মনে হয় যে সভ্যতা এই চিত্রকে সম্ভব করে তুলেছিল, জনসাধারণ তো তার স্পর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েইছে; কিন্তু এতেই আশ্চর্য হতে হয় যে, আমরা এতই দূরে চলে এসেছি যে স্বপ্নে, অন্তর্লোকে যারা রূপকে দর্শন করেন আমাদের সেই শিল্পীগোষ্ঠীর কুহক কল্পনায়ও সে অপূর্বরূপ আর ধরা দেয় না। এ সম্বন্ধে ইরাণীর একটি কথা বারেবারেই মনে পড়ে, তিনি বলেছেন—Great sorrow—great suffering এ অপূর্ব রূপ যা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার সঙ্গে অন্তরের নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে তার বেদনার মধ্য দিয়ে। বিপুল সে বেদনা। মনে হয় নাকি যে আজ আমাদের অভাব এই বেদনানুভূতির সাধনার।

প্রহেলিকা

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ ঠিক হ'য়ে গেল তখন প্রহেলিকা বিধায়ককে বুক ফুলিয়ে বল্‌লে, "কেমন? পুরুষ ম'শায় চ্যালেঞ্জ ক'রেছিলেন বড়? হার মানলেন তো? তিন তিনটি যুবকের নাকে দড়ি পড়েছে তো?"

বিধায়ক বল্‌লেন, "বার বার চার বার। এখনো তো বাজী শেষ হয়নি, আর এক দান আছে। আর আমার বিশ্বাস এই দানেই তুমি কাত হবে।"

অপরূপ একটা ভ্রূকুটি ক'রে পলি বল্‌লে, "এ না হ'লে পুরুষ? বার বার ঠকছেন তবু গোঁ ছাড়বেন না কিছুতেই।" ব'লে সে চ'লে গেল।

১৫ই ফাল্গুনের আর দুদিন মাত্র বাকী, বন্দোবস্ত সব পাকা হ'য়ে গেছে। বাঁড়ুজ্যে ও নিখিলেশকে বেকুব বানিয়ে প্রহেলিকা বিমল আনন্দে ভরপুর। শ্রীবিলাসকে ঠিক মনের মত জব্দ করতে না পারলেও সেও যে ঠকছে তাতে তার আনন্দ অন্তত চোদ্দ আনা খাঁটি।

প্রহেলিকা বিজয় গৌরবে উল্লসিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

তার এই বিমল আনন্দের ভিতর খাঁক্তি ছিল সুধু এক জায়গায়। প্রমোদ পালিয়েছে।

যেমন ক'রে সে পালিয়েছে তাতে যেন প্রহেলিকার গালে যেন চড় মেরে গেছে।

"নিঃশেষ" গল্পটা লিখে সে যেন প্রহেলিকার প্রাণের ভিতর বিষ ছড়িয়ে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।

সে বিষের জ্বালা তার বিজয়ের আনন্দ থেকে থেকে তিক্ত ক'রে দিচ্ছে!

এর প্রতিকার কি হবে না? ভাবে সে।

(ক্রমশ)

পদ্মবিড়ি

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

পদুয়ার সংগে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা আমার অনেক দিনের। শুধু অনেক দিনের বললেও সবটা বলা হয় না—বলতে হয় জন্মাবধি। অর্থাৎ আমার শৈশবের গোড়া-পত্তনের আরম্ভ থেকেই পদুয়াকে ভাল করে চিনি। ওর আসল নামটা পদ্মনাথ। সেটার-ই সংক্ষিপ্ত রূপান্তর হলো পদুয়া।

পাঠশালায় পড়েছি ওর সংগে। ওর কানের সংগেও পরিচয় হয়েছে সেই সূত্রে পাঠাভ্যাসে উদাসীনতার জন্যে পণ্ডিতমশাই-এর আদেশে কান মলতে গিয়ে। এক বছরের মধ্যে ওর কানটা গেল দ্বিগুণ বড় হয়ে, পাঠশালায় খতম দিয়ে বাড়ির খড়ের ঘরটায় খুললো একটা বিড়ির ফ্যাক্টরি। ওর সংগে যোগাযোগের সূত্রটা ছিন্ন হলো না তখনও।

সেই একান্ত শৈশবে স্টীমারের চলৎশক্তির ক্ষিপ্রতা দেখে সাধ হয়েছিল নিজের দেহটাকে নিয়ে একটি গমনশীল স্টীমারের নিখুঁত অভিনয় করবার। হুইসেলের শব্দটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল দু'চার দিনের মধ্যে। সমস্যাটা দাঁড়ালো চোঙার ধূম নির্গত হবে কি করে। পদুয়া জটিল সমস্যাটাকে দিল জল করে, উপদেশ দিল, "অভ্যেস কর বিড়ি টানবার।" গোপনে গোপনে অভ্যাসটা সুরু হলো খুড়ো-মশাই-এর হাতবাক্স থেকে দু' একখানা করে পয়সা চুরি করে। চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলেম পদুয়ার কাছে। সুতরাং ওর বিড়ির ফ্যাক্টরির প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের নামের লিস্টিতে আমার নামটাও নেওয়া হলো ভর্তি করে।

পনর বছর পরে।

চলেছিলাম কোলকাতায়। গাড়ি ভিড়ের বিষটা হজম করতে হচ্ছিল নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। ক্যানভাসারের তারস্বরে আমার পাশের ভদ্রলোক হারালেন ধৈর্য। জামার আস্তিনটা গুটিয়ে ছুটে চললেন তেড়ে। ক্যানভাসার বেচারার সকাতর দৃষ্টি দেখে কেমন একটু করুণা জাগলো মনে। ভদ্রলোকের সার্টের পিছনদিক ধরে টেনে সানুনয়ে বলল, "থাক্। এ যাত্রা মাপ করুন। ও এক্ষুনি চলে যাবে।" ভদ্রলোক ফোঁস করে উঠলেন পিছন ফিরে। গলাটা যথা-সম্ভব চড়িয়ে বললে, "আপনি আচ্ছা লোক তো যা হোক। আপনার শালা না সম্বন্ধী যে করুণায় একেবারে গদগদ হয়ে উঠছেন?"

আমি বললাম, "সে কথাটা জেনে আপনার বিশেষ লাভ হবে না। আপাতত একটু শান্ত হলে আশ্বস্তি বোধ করবো।"

ব্যাপারটার হয়তো যবনিকাপাত হতো এখানেই। আমার এই অপ্রত্যাশিত করুণায় অজ্ঞ ক্যানভাসার ঠাওরে নিল যে, অবশ্যই আমি একজন বিড়ির ভক্ত। কাছে এসে চিরকালের অভ্যস্ত গলাটাকে খাটো করবার বৃথা চেষ্টা করে বলল, "পদ্ম বিড়ি—সস্তা অথচ ভাল জিনিস।" এবার ভদ্রলোক উঠলেন সপ্তমে চড়ে—মুখ বিকৃত করে চীৎকার করে বললেন, —"পদ্মবিড়ি! আহা হা হা! মরে যাই আর কি! বেটা থামবি তো ভালোয় ভালোয় থাম, তা না হলে গলা টিপে পগার পার করে দেব।" বিড়ির ক্যানভাসার বাক্-শক্তিরহিত হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ভদ্রলোকের ক্রোধাগ্নির আঁচে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আমার মনটা। পকেট থেকে পয়সা বের করে দিয়ে কিনে নিলাম এক প্যাকেট বিড়ি। ভদ্রলোক চক্ষু চড়কগাছ করে চেঁচাতে লাগলো নিষ্ফল আক্রোশে। পুরো প্যাকেটটা পুরে রাখলাম পকেটে। আমার উদ্দেশ্যটা হয়তো গোপন রইল না ভদ্রলোকের কাছে।

শিয়ালদহ স্টেশনে থামলো গাড়ি। বিড়ির ক্যানভাসার কখন যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল অলক্ষিতে। আমার কাহিনীটা হয়তো চাপা পড়ে থাকতো এই জায়গাতেই জীবনের আর দশটা অসম্পূর্ণ কাহিনীর মতো। তা নিয়ে গল্প রচনার প্রয়াসী হতেও হয়তো করতেম না দুঃসাহস। বাসায় এসে জামাটা খুলে রাখতে গিয়ে হাত পড়লো বিড়ির পকেটটায়। পকেট থেকে তুলে আনতেই বিশেষ করে দৃষ্টি পড়লো বিড়ির নামটার 'পরে। মনে পড়লো, গাড়িতে ক্যানভাসার চেঁচিয়ে বলেছিল, "পদ্মবিড়ি।" তখন মনে আসেনি, "পদ্ম" নামটার সংগে আমি পরিচিত বহুদিনের। "পদ্ম মার্কা" বিড়ির সংগেও ছিল এক সময়ে পরিচয়। পদ্মনাথ ওরফে পদুয়াকে হারিয়েছি আজ বহুদিন। খোঁজ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি একটি দিনের জন্যও। পদুয়ার সংগে ছিল শৈশবের বন্ধুত্ব। সেই সূত্র ধরে সেই যুগে ওর বিড়ির ফ্যাক্টরিতে বসে দিয়েছিল আমাকে ভবিষ্যৎ-বাণী—"তুমি দেখো, আমার বিড়ির ফ্যাক্টরির হেড অফিস খুলবো কোলকাতায়। বিড়ির নামটা হবে আমার আসল নামে। পদুয়া নামটা যে করেই হোক ঘোচাতে হবে। বড্ড নোংরা নাম।" সেদিন বুঝেছিলাম, পদুয়া নামটা ও যে কোন রকমেই হোক লোপ করে দিতে চায় প্রচণ্ড শক্তিতে। ওর ঐ ছোট্ট বিড়ির ফ্যাক্টরীটির পিছনে ভবিষ্যতে যে সম্ভাবনার স্বপ্নটি লুকিয়ে রয়েছে—সেদিন বুঝেছিলাম তার মূল রহস্য কোথায়।

দুদিন পরে। মির্জাপুর স্ট্রীট পেরিয়ে যাচ্ছিলাম নির্বিকারভাবে। তেরো নম্বরের বাড়িটা চোখে পড়লো আচম্কা, আর সেই সংগে মনে পড়লো, পদ্মবিড়ির উপরের বাদামী রঙের লেভেলটায় দেখেছিলেম এই বিশেষ নম্বরটি। কৌতূহল হলো পদুয়ার সেই শৈশবকালের স্বপনটার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করবার। জিজ্ঞেস করলেম গলির মোড়ের একটি ভদ্রলোককে, "তেরো নম্বরের বাড়িটায় কোন বিড়ির ফ্যাক্টরি আছে কিনা বলতে পারেন, মশাই?" প্রশ্নটার উত্তরে ভদ্রলোক কুঞ্চিত করলেন নাসিকা। নিজের প্রশ্নটার গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজের-ই যেন সন্দেহ জাগলো ভদ্রলোকের

বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করে। ভদ্রলোক বললেন, "আপনার প্রয়োজন থাকে খোঁজ নিয়ে জানুন। বিড়ির ফ্যাক্টরির খোঁজ রাখার মত প্রয়োজন হয়নি কোনদিন।" ভদ্রলোকের সদুত্তরে প্রতিবাদ না করে সটান সদর দরজার কাছে এসে হাঁক দিলেম, "পদ্মনাথ আছ নাকি হে?" উত্তর এলো সংক্ষিপ্ত "না। প্রয়োজন থাকলে ভিতরে আসুন।" প্রয়োজন বিশেষ কিছু না থাকলেও মনের কৌতূহলটা এড়াতে পারলাম না। ভিতরে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নিজের চোখটাকেও যেন বিশ্বাস করতে সাহস হয় না কিছুতেই। ভেবে স্থির করতে পারলাম না, সেদিনকার সেই ট্রেনের ভদ্রলোক এখানে এলেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে কি ভদ্রলোক উৎক্ষিপ্ত হয়ে ক্যানভাসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে এসেছেন?

ভদ্রলোক বললেন, "বসুন। আপনাকে যেন কোথাও দেখেছিলাম মনে হয়?"

আমি আমতা-আমতা করে আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম। ভদ্রলোক বলনেন, "বুড়োমানুষ—ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়। আমি হাতের কাজটা সেরে নিচ্ছি—আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।" যন্ত্রচালিতের মতো চেয়ারটা টেনে বসে পড়লাম।

দু' এক মিনিট পরে কালো ছিপছিপে লম্বা চেহারার একটি লোক প্রবেশ করলো সেখানে। ভদ্রলোক বললেন, "একটি আকারের ভুলের জন্যে কী মুস্কিলেই পড়তে হয়েছে জানো হরিনাথ? ট্রেনে নিজেদের ক্যানভাসারকে তাড়িয়ে দিয়েছি অন্য ফ্যাক্টরির মনে করে। কোলকাতায় এসে আজ গালাগাল খেয়েছি নিজের স্ত্রীর কাছে, 'এইজন্যে এত-গুলো টাকা হরিনাথকে দিয়েছ বিড়ির ফ্যাক্টরি খুলতে, আমার অমন সুন্দর পদ্মা নামটাকে কিনা করে দিয়ে পদ্ম? পদ্ম ও-পাড়ার হীরে ডোমের ছেলের নাম। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।"

হরিনাথ বিনীতভাবে বললে, "আজই প্রেসে গিয়ে ভুলটা এবার থেকে শুধরে দিতে বলে আসবো, বাবু।"

চিকাগোর পথে

(ভ্রমণ কাহিনী পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

মোহিতবাবু আমাকে নিয়ে মোটরে করে পথে বেরিয়ে পড়লেন চিকাগোর পথঘাটগুলি একবার ভাল করে দেখে নেবার জন্যে। দীর্ঘ সময় ঘুরে বেড়াবার পর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন মোহিতবাবু আমাকে একটা International Hostel'এ রেখে বিদায় নিলেন। হস্টেলের হলে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইহুদী, চীনা, জাপানী, ফিলিপাইনো, মালয়, থাই এসবের সংখ্যাই বেশি। যে কয়জন আমেরিকান ছিলেন তাঁদের সকলেই মিশনারী।

যিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি একজন মহিলা। তাঁরই সংগে মোহিতবাবু আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দু একটা কথা বলেই যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে আমাকে তিনি যা ভেবেছিলেন আমি তা নই, তখনিই আমাকে একাকী বসিয়ে রেখে তিনি অন্যত্র সরে পড়লেন। পাশেই একজন চীনা ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁকে চীনা ভাষায় আহ্বান জানালাম আলাপ করবার জন্যে। ভদ্রলোক আমার অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত না হয়ে এগিয়ে আসতেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,

"এ নরকে কি করে বসে আছেন?"

"চুপ, চুপ, এসব কিছু বলবেন না, আপনাদের কথা শুনেছি, আপনি যে কে বুঝেছি। দয়া করে এখন কথা বলবেন না, আমরা সমূহ বিপদে পড়েছি, আমাদের বাঁচতে হবে।"

এক লাফে ভদ্রলোক নিজের চেয়ারে গিয়ে ব'সে এমন একটা ভাব দেখালেন যে, তাঁর সংগে আমার যেন কোন কথাই হয়নি। আমি মনে মনে হাসলাম। চীনা প্রকৃতি আমি বেশ ভাল করেই জানি। লোক মুখে শুনেছি, আমাদের দেশের অনেক নবাব নাকি পালাতে গিয়ে পালাতে পারেন নি, কারণ পালাবার সময় নবাবের পায়ে জুতো পরিয়ে দেবার লোক ছিল না। কিন্তু নানকিন পাপেট গভর্নমেণ্টের যিনি আজ কর্ণধার মিঃ ওয়াংচি ওয়াই, তিনি মজুরের সংগে থেকে মজুরের মত কাজ ক'রে, ইউনান প্রদেশের ভিতর দিয়ে ইন্দোচীনে প্রবেশ করেছিলেন। ডাক্তার স্যান-ইয়াত-সেন হ'তে আরম্ভ করে বর্তমানের একনিষ্ঠ দলপতি মিঃ চুতের জীবনেও সেরূপ অনেক ঘটনা ঘটেছে। চীনা চরিত্র চিরদিনই রহস্যময়।

সময় তখন সন্ধ্যা সাতটা। কয়েকজন ভদ্রলোক এসে হলঘরের অপরিপূর্ণ চেয়ারগুলি দখল করে বসলেন। দু'একজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। তারপরই আমেরিকান মহিলাটি এসে সেদিনকার মত বিষয় নির্বাচন করে দিয়ে একপাশে বসে পড়লেন। ধর্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতাদি চললো বহুক্ষণ ধরে। অনেকেই দেখলাম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আমি নবাগত। সভার নিয়ম মতে নবাগতকেও কিছু বলতে দেওয়া হয়। সভার যখন শেষ, তখন আমাকে কিছু বলতে বলা হলো। আমার কথা শুনে অনেকেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতে লাগলেন, কথা সমাপ্তির পূর্বেই অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি হলো, কারণ ধর্ম আর ভগবান ছাড়া আমার বক্তৃতায় আর সবই ছিল। সভানেত্রী বললেন, "আজ সর্বপ্রথম আমরা একজন হিন্দুর মুখে আমাদের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে নূতন কিছু শুনতে পেয়ে বাস্তবিকই পৃথিবী যে ক্রমশ জাহান্নামে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। ভগবান নাস্তিকদেরও প্রাণ দিয়েছেন, প্রতিপালন করছেন, আবার নিজের কাছে সময় মত ডেকেও নিচ্ছেন।" ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা ভংগ হলো। আমি মাথা নত করে পথে এসে গাড়ি খুঁজে নিয়ে তাতে চেপে বসলাম। মিঃ মোহিত ফিরে এসে আমাকে দু'চারটা কড়া কথা শোনাতে ছাড়লেন না। কড়াকথার জবাব দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা হলো না, কারণ মোহিত ঘোষ এখনও ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম বেশ ভাল করেই মেনে থাকেন। রাত দশটার সময় আমাকে Y. M. C. A'তে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমি নৈশ বিহারে বের হয়ে পড়লাম, চিকাগোর কয়েকটি নাইট ক্লাবের অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্যে। নাইট ক্লাব কোথায় জানি না, অনির্দিষ্ট ভাবেই পথ চলতে লাগলাম। চিকাগো ছোট শহর নয়, কোথায় কি আছে জানা না থাকলে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। নিকটবর্তী একটা পার্কে গিয়ে সেখানকার এক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলাম,

"নাইট ক্লাব এখানে কোথায় জানেন?"

"নিশ্চয়ই জানি।"

"কোনদিকে যেতে হবে?"

"কোন্ রকম নাইটক্লাব আপনার চাই?"

"সব চেয়ে খারাপ যেটি।"

"তাই নাকি? কোন দেশ হতে আসছেন?"

পাসপোর্টখানা বের করে দেখিয়ে বললাম, "নাম ধাম টুকে নিন, আর বলে দিন কোনদিকে যেতে হবে।"

পুলিশ আমার নাম ধাম টুকে নিয়ে পাশেরই একজন লোককে ইংগিত করল এবং সে আসামাত্র তাকে বলল আমাকে নাইটক্লাবে নিয়ে যাবার জন্য। সে লোকটি গোয়েন্দা, নিজেই তার পরিচয় দিল। তখনও আমার হাতে কয়েকখানা বাজে সংবাদপত্র ছিল। খবরের কাগজের নাম দেখে গোয়েন্দাটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

"এসব সংবাদপত্র আপনি দেখছি বেশ পছন্দ করেন?"

"নিশ্চয়ই, আমেরিকাকে জানতে হলে কিছু পড়তেও হয়।"

"আমেরিকার সত্য সংবাদ আপনি মোটেই পাচ্ছেন না বলে মনে হয়।"

"আমার মনে হয় আপনারা আমেরিকার প্রকৃত সংবাদ গোপন করতে চান। ডাইস কমিটিকে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র নিন্দা করছে, একথা কি মিথ্যা? অথচ হার্টসের সংবাদপত্রগুলি এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী সংবাদপত্র সদা সর্বদা ডাইস কমিটিকে বেশ সাহায্য করে আসছে। হাতের সংবাদপত্রগুলি কি এক শ্রেণীর লোকের মতবাদ নয়? যা ইচ্ছা তা বলতে পারেন, কিন্তু ডাইস কমিটি আমেরিকাকে কোন মতেই সাহায্য করবে না, বরং আমেরিকার সর্বনাশ করবে বলেই আমার মনে হয়।"

গোয়েন্দা আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর কি ভেবে আমাকে নিয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল।

আমেরিকার বাস হাত দেখালে থামে না, ট্রামও না। নির্ধারিত স্থানে গিয়ে থামে। বাস যে লোকটি চালায় সেই লোকটিই কনডাকটরের কাজ করে। তারই কাছ দিয়ে উঠতে হয় এবং ভাড়া দিয়ে যেতে হয়। যেখানেই যাও, আর যতদূর যাও ভাড়া পাঁচ সেণ্ট। নামবার বেলা পিছনের দরজা দিয়ে নামতে হয়, পিছন দিক থেকে উঠবার সুবিধা নেই। যদি কেউ উঠতে চায়, ড্রাইভার আয়নায় সেই অপরাধীকে দেখে ফেলে এবং কলটিপে দিলেই দরজা আপনা হতে বন্ধ হয়। কিন্তু পিছনদিক দিয়ে উঠবার মত অপরাধী আমেরিকাতে বড় দেখা যায় না। ড্রাইভারের কাছ হতে লুঠ করে অনেকে বেশ মোটা টাকা নিয়ে যেত, সেই পথ বন্ধ করার জন্য এমনই একটি সুন্দর যন্ত্রের আবিষ্কার করা হয়েছে যে, সেই যন্ত্রের চাবি থাকে শুধু ডিপোগুলিতেই। ড্রাইভার কিম্বা ডাকাত কেউ সেই বাক্স খুলতে পারে না। আর সেজনাই বোধ হয় আজকাল বাস ড্রাইভারের উপর লুঠপাট কমে গেছে।

দুজনের জন্যে দশ সেণ্ট ভাড়া দিয়ে বাসের একধারে জায়গা করে নেওয়া গেল। প্রত্যেক রোতে যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আধ ঘণ্টা পর আমরা একটা রাস্তার মোড়ে এসে নামলাম। রাস্তাটি নাইট ক্লাবের জন্য বিখ্যাত। কয়েকটি নাইট ক্লাব দেখে মনে হলো, "আঙ্কেল সাম" নামক পুস্তকখানায় যা লেখা হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর; তাতে আরও অনেক কিছু জুড়ে দেবার ছিল। আঙ্কেল সামের লেখক ভারতবাসী বলেই তিনি বিশেষ কিছু লিখতে পারেন নি। গোয়েন্দাকে বললাম, "এটা কি ধনী দরিদ্রের মিলন ক্ষেত্র নয়? যাকে ঘৃণা করা হয়, পদদলিত করা হয়, এমন কি lineh করা হয়, তাকে এখানকার এই ভোগ বিলাসের মধ্যে আনার অর্থ কি? আর সেই বা এখানে আসে কেন? সে আসে অভাবের তাড়নায় না ভোগের সহজ পথের নির্দেশে? আপনার দেশবাসী আমি নই, আপনাদের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি পর্যটক, এসেছি দেখতে এবং দেখে গেলাম। তবে আপনারা স্বাধীন, আপনাদের দোষ সারাবার পথ আছে আমাদের তা নেই এইমাত্র প্রভেদ।"

আমার কথাগুলি শুনে যেন গোয়েন্দার দিল খুলে গেল। সে অনর্গল বলে যেতে লাগল আমেরিকার দোষের কথা, জগতের পুঁজিবাদীদের কথা, আর বল্‌ল পৃথিবীর বর্তমান আর্থিক অবস্থার স্তর শেষ হয়েছে, নূতন কিছু করতেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে লোকটি আপন শরীর বিক্রী করে অর্থ সঞ্চয় করল, সেই আবার ভাগ্য এবং ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে সংসারের চিরন্তন প্রথা মতে গা ভাসিয়ে দিল।

সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দুজনেই Y. M. C. A'তে ফিরে এলাম। তখনও বেশ জনসমাগম হয়নি। গোয়েন্দাকে বললাম একটু অপেক্ষা করতে এবং দেখে যেতে Y. M. C. A'র আসল রূপকে। চীনদেশের সম্বন্ধে সাংহাই শহরের "মারকিউরি" এবং চায়না প্রেস প্রায়ই "Boy prostitution"এর কথা প্রকাশ্যে লিখে থাকেন, পূর্বদেশ বলেই আমেরিকানদের মুখে এসব কথা বেশ ফুটে ওঠে, কিন্তু আমেরিকার Y. M. C. A'গুলি কি সেই পাপের আড্ডা নয়? অথচ সেসব কথা আমেরিকানরা কখনো মুখেও আনেন না। পুঁজিবাদীর ধর্মই হলো অপরের দোষ খুঁজে বেড়ান; আর উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেওয়া। গোয়েন্দা অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না আর। আমারও তখন নিদ্রার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যে আমেরিকা শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি বলে জগতের কাছে বগল বাজিয়ে বেড়ায়, অপরকে অজস্র অর্থ ধার দেয়, সেই আমেরিকার বুকের উপর যুবকগণ কাজ না পেয়ে, যে গৃহে যীশুর মূর্তি রাখা হয় সেই গৃহের উপরে বসেই আপন শরীর অর্থের বিনিময়ে বিক্রী করতে বাধ্য হয়। এসব কি আমাদের দেশের লোকের কাছে "আজব খবর" নয়?

কিন্তু তা বলে আমেরিকার নৈতিক জীবনের উপর কটাক্ষপাত করা আমার ইচ্ছা নয়। আমি বেশ ভাল করেই জানি, অর্থের অভাবেই এসব পাপ কর্ম যুবকরা করে থাকে। যেদিন তাদের দেশ হতে অর্থের অভাব চলে যাবে, পুঁজিবাদীরা জাহান্নামে যাবে সেদিন থেকেই এসব পাপ কার্যের লোপ হবে। লোভী পুঁজিবাদী নিজের রচিত ধর্মকে, নিজের তৈরী ভগবানকে নিজেই অবহেলা করে থাকে এবং মুখে মুখে পাপ পুণ্যের কথা বলে থাকে।

পরদিন দুপুর বেলায় নিগ্রো পল্লীতে একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে চলে গেলাম। নিগ্রোপল্লী এখানে হারলামের অনুরূপ নয়। এখানে সকলেই কিছু কিছু কাজ পায় বলে এখানকার নিগ্রো পল্লীর নাম হারলামের মত হয়ে ওঠেনি। সেদিনই বিকালবেলা কয়েকজন হিন্দু ডেণ্টিষ্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের দুর্গতির কথা শুনলাম। তাদের শরীরের রং ফর্সা নয় বলেই শ্বেতকায়রা তাদের কাছে দাঁত তোলাতে আসে না। ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম এঁদের প্রতিভার অভাব। এরা চায় শুধু টাকা, দেশের সম্মান কিসে বাড়ে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। ডাক্তার তারক দাসের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি সাদা কালো সকলকে সমান চোখে দেখতেন বলেই তাকে আজও অনেকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকে। তিনি সাদা পাড়ায় সাদা Y. M. C. A'তে থাকতেন। এখানে বলে রাখা ভাল, ডাক্তার টি দাস যে Y. M. C. A'তে থাকতেন সেখানকার আবহাওয়া ভাল ছিল। ডাক্তার হও, নেতা হও, যে হও সে হও, যেই মাথা নত করেছ অমনি মাথায় পাদুকাঘাত এসে পড়বেই। ডাক্তার তারকচন্দ্র দাস নিজের ও দেশের সম্মানের জন্য সব সময় মাথা উঁচু করে রাখতেন বলেই ভারতবর্ষ হতে আমেরিকাতে যত শিক্ষার্থী গিয়েছেন তাদের মাঝে ডাক্তার দাসই অগ্রগণ্য। যারা শুধু টাকার দিকেই চেয়ে থাকে সম্মানের দিকে মোটেই তাকায় না, ডাক্তার দাস সেরূপ লোক নন বলেই তাঁর নাম ভারতবাসীর কাছে এখনও স্মরণীয়।

(শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্ত)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

(২২)

ঝি ওধারে কাজে ব্যস্ত, রান্নাঘরের ভিতরে জ্যোৎস্না এবং বাহিরে সে। নির্জনে দেখা তাহাদের এই প্রথম! কিসের একটা সঙ্কোচে অমল আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার বুকেও যেন একটু একটু কাঁপিতে লাগিল।

জ্যোৎস্না ভিতর হইতে তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বোধ হয় অনুমান করিতে পারিল, সে তাড়াতাড়ি কতকটা সহজ হইবার জন্য কহিল, তারপর, বাবার সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল?

অমল আনুপূর্বিক সমস্ত খুলিয়া বলিল। কথা কহিতে কহিতে সত্যই সে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। সঙ্কোচ এবং সেই অজ্ঞাত ভয়, দুটাই কাটিয়া গেল।

জ্যোৎস্না হাসিয়া কহিল, বাবাকে ত চেনেনই। চিরকালই ওঁর ঐ একরকম গেল। ইস্কুল আর ইস্কুল। ইস্কুলের কাছে ওঁর ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল তাই, নইলে জিনিসপত্রগুলো ফেলে দিতেন সেও ভাল, তবু এখানে নামবার কথা ভাবতেও পারতেন না।

ইহার পর উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। জ্যোৎস্না হেঁট হইয়া কি একটা রান্না চাপাইতেছিল, মিনিট কয়েক কথা কহিবার অবসরই পাইল না। অমল বেতের মোড়াটার উপর নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। কিন্তু উঠিয়া যাইবে কি না ঠিক বুঝিতে পারিল না। উঠিয়াই বা কোথায় যাইবে! অগত্যা বসিয়াই রহিল।

রান্নাঘরের দাওয়ায়, ছাদে, ওধারের গা আলমারীটায় চোখ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার একসময় জ্যোৎস্নার দিকেই ফিরিয়া আসিল। তখন উনানের গন্‌গনে আঁচ, তাহারই একটা জোর আভা আসিয়া পড়িয়াছে জ্যোৎস্নার মুখে। সেই লাল আলোতে জ্যোৎস্নার আতপ্ত মুখের যতটুকু দেখা গেল সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল যেন অকস্মাৎ মুগ্ধ হইয়া গেল। নাক, চোখ, ওষ্ঠ, কপোল যতটা তাহার দিকে ফেরা ছিল সবগুলিই যেন অত্যন্ত সুকুমার এবং সুশ্রী। সুন্দর ললাটের সমস্তটাই ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত জড়াইয়া কয়েকটি অবাধ্য চুল আর তাহারই মধ্যে রক্তবিন্দুর মত শোভা পাইতেছে একটি ছোট্ট সিন্দুরের টিপ—সবটা জড়াইয়া তাহার চোখে কেমন একটা মোহের সৃষ্টি করিল।... সুগোল, যৌবনপুষ্ট শুভ্র হাতখানা ব্যস্ত হইয়া নড়িতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের আভা ও বিদ্যুতের আলো ছুটাছুটি করিয়া যেন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যোৎস্না যে সুন্দরী, সত্যকার রূপসী, তাহা এই সে প্রথম সহসা উপলব্ধি করিল!

অথচ একদিন, একদিন কেন বোধ হয় আজিকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই মেয়েটিকে সে বরাবর অবহেলাই করিয়া আসিয়াছে। তাহার স্বভাবকে ত সে ঘৃণা করিয়াছেই, রূপটার কথা কোনদিন চিন্তা পর্যন্ত করিয়া দেখে নাই। অথচ আজ সেই মেয়েটিই তাহার রূপে ও ব্যবহারে এমন মোহের সৃষ্টি করিল কেমন করিয়া। এ কি শুধু বিবাহেরই ফল? বিবাহের পরে কি এমনি করিয়া সব মেয়েরাই বদ্‌লাইয়া যায়? একি সেই বৈদিক জাদুমন্ত্রেরই প্রভাব, না পুরুষের বাসনার সোনার কাঠির স্পর্শ?

মিনিট কয়েক পরে কড়ায় জল ঢালিয়া জ্যোৎস্না অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেই অমলের মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়িয়া আরও লাল হইয়া উঠিল। বাঁ হাতে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া অকারণে আবার কড়া-খুন্তী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার পর কণ্ঠস্বরকে প্রাণপণ চেষ্টায় সহজ করিয়া লইয়া কহিল, আপনি এখন কি করেন মাষ্টার মশাই? কিছু মনে করবেন না, বাবা চিঠিতে আপনাকে নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস করেছেন বটে কিন্তু কাজের কথা কিছুই লেখেন নি!

অমল আগেই লজ্জিত হইয়া চোখ নামাইয়া ছিল। এখন কথা কহিতে গিয়া যেন গলাটাও কাঁপিয়া গেল। সে সেইভাবেই জবাব দিল, তার কারণ যে তিনি আমার সম্বন্ধে নিজেই বিশেষ কিছু জানেন না। জিগ্যেস করবার সময় কোথায় পেলেন বলো।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি অনেক চেষ্টায় এই মাস কতক হ'ল একটা বিলিতি অফিসে চাকরী পেয়েছি।

জ্যোৎস্না বোধ হয় প্রশ্নটা করিয়া ফেলিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিল, সেও নতমুখে কহিল, দেশ থেকেই যাওয়া আসা করেন, না কলকাতাতে থাকেন?

অমল জবাব দিল, না, দেশ থেকে আনাগোনা করা চলে না। অনেক খরচা, সময়ও লাগে বেশী। কলকাতাতেই একটা ছোট্ট ঘর-ভাড়া ক'রে থাকি।

জ্যোৎস্না কহিল, আর কে থাকেন সেখানে?

ম্লান হাসিয়া অমল কহিল, আর কেউই থাকেন না। আমার একজন বন্ধু থাকতেন আগে, এখন তিনিও থাকেন না।

জ্যোৎস্না সব ভুলিয়া মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তাহ'লে খাওয়া দাওয়া?

নিজে রেঁধে খাই। যেদিন পারি না, সেদিন হয় বাজার, নয় উপোষ ভরসা!

ইস্!.........ব্যথিত নেত্রে জ্যোৎস্না কহিল, তাহ'লে ত বড্ড কষ্ট হয় আপনার!

অমল শুধু একটু মুখ টিপিয়া হাসিল, জবাব দিল না।

এই সময়ে ডাক্তারবাবু সোরগোল করিতে করিতে ঢুকিলেন। পিছনে চাকরের হাতে মাংস, আরও মাছ, বাজার। নিজের হাতে দই, মিষ্টান্ন। সবগুলি উঠানে নামাইয়া কহিলেন, অর্ডারি মাল কিছু ছিল, মানে মিহিদানা—নিয়ে এসেছি, বুঝেছ? আর কিছু অর্ডারও দিয়েছি।......আর দেখ, তুমি রান্না-বান্না সারো ততক্ষণ, মাষ্টার মশাইকেও দেখতে হবে তোমাকেই—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি!

জ্যোৎস্না কহিল, তার মানে, এখন আবার কোথায় চললে?

ডাক্তার পাঞ্জাবীটা খুলিয়া কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে কহিলেন, কী করব বল দেখি, "এস-ডি-ও"র মেয়ের অসুখ ডেকে পাঠিয়েছে, না গেলেই নয়।.........আপনি কিছু মনে

করবেন না মাষ্টার মশাই, আমি যাব আর আসব—ঘণ্টাখানেকও লাগবে না। ওরে, ব্যাগটা নে—

চাকরের হাতে ব্যাগটা দিয়া ব্যস্তভাবে তিনি বাহির হইয়া গেলেন, দ্বারের কাছাকাছি গিয়াও একবার মুখটা বাড়াইয়া কহিলেন, কিছু মনে করবেন না, বুঝলেন? অবিশ্যি উনি যখন আছেন, সামনে বলতে নেই, অতিথি সৎকারের ত্রুটি হবে না। তবে আমারও বড় অন্যায় হ'লো। কিন্তু চাকরী করি সরকারী, বোঝেন ত?...

এত দ্রুত হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি কথাগুলি কহিয়া গেলেন যে, অমলের আর অভয় দিবার অবসর হইল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। একটু পরে জ্যোৎস্না কহিল, মেয়েটা আজ তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগ্‌ছে। বোধ হয় বাঁকাই দাঁড়াবে, উনি কালকেই বলছিলেন।

অমল প্রশ্ন করিল, এসব ব্যাগার ত?

ঠিক ব্যাগার নয়, টাকা দেয়, তবে এসব জায়গায় খাটুনী বেশী। যতই উনি বলে যান যাব আর আসব, দুটি ঘণ্টার আগে ছাড়া পাবেন না। এই এক অসুবিধে এ কাজের, রাত নেই, দুপুর নেই, ডাকলেই যেতে হবে।

অমল কহিল, তাহ'লে তোমার ত বড় কষ্ট হয়! রাত-বিরেতে একলা থাকতে হয় ত?

কি আর করছি বলুন! একটু হাসিয়া জ্যোৎস্না জবাব দিল, তবে ঐ ঝিটা থাকে বাড়িতেই, তা ও যা হাবা-গোবা থাকাও যা, না থাকাও তা!

ইহার পর মাংস বাছা, ঝিকে বাটনা দেখাইয়া দেওয়া, কুটনা কোটা প্রভৃতি কাজে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা খুচরা প্রশ্ন দুজনেই করে, অপর পক্ষ জবাব দেয়। অমল প্রশ্ন করে জ্যোৎস্নার ভাই বোনের কথা। জ্যোৎস্না প্রশ্ন করে তাহার কলিকাতার বাসা সম্বন্ধে। হঠাৎ এক ফাঁকে সে কহিল, বিয়ে করেছেন আপনি?

অমল সংক্ষেপে কহিল, না। আসন্ন বিবাহের সংবাদটা দিতে কে জানে কেন, কোথায় যেন বাধিল।

সে মুগ্ধ নেত্রে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল জ্যোৎস্নার গৃহিণীরূপ। কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি আগ্রহের সহিতই না এই কাজগুলি সে করিয়া যাইতেছে! এত নৈপুণ্যই বা তাহার আসিল কোথা হইতে! রাজবালার সেই ক্লান্ত সুর ও অবসন্ন অবস্থার কথা আজও মনে পড়িলে অমলের হাসি পায়। অথচ এ মেয়েটি যেন একসঙ্গে দশটি হাত বাহির করিয়া খাটিতেছে—কোথাও তাহাতে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকেই দৃষ্টি, প্রত্যেকটি কাজ যাহাতে নিপুণভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে কত সতর্কতা!

শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে কহিল, এত সব কোথা থেকে শিখ্‌লে? ওখানে ত কিছুই করতে না!

ঝি তখন কলঘরে, তবুও গলা খাটো করিয়া জ্যোৎস্না জবাব দিল, এসব কি আর আলাদা ক'রে শিখতে হয়, করতে করতেই শেখা হয়ে যায়। আমার সংসার; আমারই স্বামী, তাঁর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব খাবে, সেটা যদি আমি ভাল ক'রে না করি তাহ'লে কে করবে বলুন ত!

পাটনায় থাকতে দেখেছি ত, কোনদিন যদি মা নিজে হাতে কিছু করেন ত বাবার আহ্লাদের সীমা থাকে না। অত ভুলো মানুষ, কিন্তু খেতে বসলে মায়ের হাতের রান্না কোনোটা মুখে পড়লেই ঠিক টের পান।

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, ওখানে আমার শাশুড়ীও কোন দিন কিছু করতে দেন নি, এখানেও ইনি বামুন চাকর ঠিক ক'রে তবে আমাকে এনেছিলেন। কিন্তু দুদিন থেকেই দেখলুম যে সে রান্না কেউ মুখে দিতে পারে না। একে উনি একটু খেতে বেশী ভালবাসেন, তায় ঐ অখাদ্য ব্যাপার, অর্ধেক দিন ওঁকে উপোষ ক'রে থাকতে হ'ত। হপ্তাখানেক দেখে একদিন দিলুম ঠাকুরকে জবাব দিয়ে—উনি ত শুনে ভেবে অস্থির, আমারও একটু ভয় হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু দেখলুম যে সব ঠিকই চলল, কোন অসুবিধা হ'ল না। আর তা ছাড়া কি নিয়ে থাকি বলুন ত, এই একলা একলা। সবই যদি ঝি চাকরে করবে ত আমি করব কি? হয় বই নিয়ে বসে থাকতে হয়, নইলে বোনা। আমি আমার ঐ ছাইভস্ম বোনা দুচোখে দেখতে পারি না। এখানে সব দেখি বড় অফিসারদের বৌ-রা, খালি বসে বসে মোটা আর কদাকার হচ্ছেন এবং কেউ নড়ে ঘাস খাবেন না। কাজের মধ্যে কার্পেটের ওপর আঁকাবাঁকা জোবড়া ছবি তোলা, সেগুলোর নীচে বড় বড় ক'রে "Dog" কিংবা "কালীয় দমন" লেখা না থাকলে বোঝবার যো নেই, কোন্‌টা কুকুর আর কোন্‌টা "কালীয় দমন"!

কথার ফাঁকে ঝি আসিয়া পড়িয়াছিল, সে কহিল, বৌদির আমার কি হাতে পায়ে কাজ লাগে দাদাবাবু, নিজের পঞ্চাশ রকমের খাটুনী ত আছেই, তার ওপর যদি আমার একটু শরীর খারাপ হ'ল ত আমার সব কাজগুলো নিজে করবে, আমাকে নড়তে দেবে না—বৌদি আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ!

বাধা দিয়া জ্যোৎস্না কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে হরির মা, তোমাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

তাহার পর কহিল, এবারে উনুনে কয়লা দেব যে মাষ্টার মশাই, এখানে ধোঁওয়া হবে। আপনি দালানে গিয়ে একটু বসুন, আমি মাংসটা চড়িয়েই আস্‌ছি। কিংবা দালানে বসে আর দরকার নেই, ঠাণ্ডা লাগবে, আপনি একেবারে ঘরে গিয়েই বসুন—

অমল উঠিয়া পড়িল। কিন্তু ভিতরের দালানে বা ঘরে কোনখানেই বসিল না, ঘরের মধ্য দিয়া একেবারে বাহিরের বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানেই কয়েকটি বেতের চেয়ার পাতা, বেশ নির্জন এবং অন্ধকার—সামনে দুই একটা ফুলের গাছও আছে। একটা পুষ্পিতা রজনীগন্ধার শীর্ষ হইতে চমৎকার গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—চমৎকার স্নিগ্ধ নির্জনতা, সমস্ত শরীর তাহার যেন জুড়াইয়া গেল। তাহার সমস্ত চৈতন্যকে যেন জ্যোৎস্না ইতিমধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে সে মোহ কাটাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে গেলে এমনি নির্জনতাই দরকার! সে ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চোখ বুজিল।

কিন্তু এখানে আসিয়াও সে জ্যোৎস্নার কথাই ভাবিতে

লাগিল। আশ্চর্য অদ্ভুত মেয়েটি! তাহার সমস্ত মন শ্রদ্ধায় বার বার এই মেয়েটির পায়ের কাছে অবনত হইতে লাগিল। এই মেয়েটিকে সে ইতিপূর্বে মনে মনে কতই না গালি দিয়াছে, কত অশ্রদ্ধাই না করিয়াছে। অথচ আজ, বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কায় তাহার মন যেন আজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্বেকার অশ্রদ্ধা যেন সমস্ত এক সঙ্গে ভীড় করিয়া অনুশোচনার রূপে তাহার মনে ফিরিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। কিছু পূর্বে স্ত্রী সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুর উচ্ছ্বাস শুনিয়া সে হাসিয়াছিল, এখন সে বুঝিতে পারিল যে এক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস না করাই অসম্ভব।...

জ্যোৎস্নার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন চলিয়া গেল নিজের বিবাহে। মনে হইল, পারুল সম্বন্ধে তাহার মনে যে খুঁত আছে সেটা হয়ত নিতান্তই তাহার নিজের অজ্ঞতা, বিবাহের পূর্বে মেয়েরা যেমনই থাক্—বিবাহের পরে সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া যায় নিশ্চয়ই!

বিবাহের পরে পারুল কেমন হইবে, কল্পনা করিতে করিতে এক সময় দেখিল যে তাহার সে ধ্যানমূর্তির মধ্যে কখন পারুল অন্তর্হিত হইয়াছে—সেখানে কমলা ও জ্যোৎস্নায় মিলিয়া এমন একটা স্বপ্ন রচিত হইয়াছে যে, তাহাকে মনে মনেও ভালো করিয়া দেখিতে গেলে সে মিলাইয়া যায়, অথচ অনুভব করিতে বাধে না। হাওয়ার মতই অধর, হাওয়ার মতই লঘু, দখিনা হাওয়ার মতই মিষ্ট সে স্বপ্ন!

তাহার এই অর্ধজাগ্রত অবস্থাতে কতটা সময় কাটিয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না, মনের অনেকখানি আশা ও বাসনা দিয়া রচিত এক মধুর স্বপ্ন হইতে যখন সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল যে জ্যোৎস্না ঠিক তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে সে সমস্ত রান্না শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; আগেকার কাপড়টা বদলাইয়া কিছু কিছু প্রসাধনও করিয়া আসিয়াছে বোধ হয় কারণ তাহারই একটা মৃদু সুগন্ধ অকস্মাৎ নাকে আসিয়া অমলকে পূর্ণজাগ্রত করিয়া তুলিল।

জ্যোৎস্না প্রশ্ন করিল, অমন করে নিঃশ্বাস ফেললেন যে?

তাহার পরই তাহার একখানা ঠাণ্ডা হাত অমলের ললাটের উপর রাখিয়া কহিল, ইস্, মাথা আপনার কি গরম! যেন আগুন ছুটছে, জ্বর-টর হয়নি ত?

অমল হাত বাড়াইয়া তাহার দুইখানা হাতই মাথার উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না। ও আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে, একমনে বসে কিছু ভাবলেই কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু তুমি কি আবার এত রাত্রে গা ধুয়ে এলে?

জ্যোৎস্না জবাব দিল, হ্যাঁ, রান্নার পর গা না ধুলে বিশ্রী লাগে।...কিন্তু আপনি একমনে এত কি ভাবছিলেন বলুন ত? জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন একটু ক্ষীণ আগ্রহের সুর ফুটিয়া উঠিল।

অমল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিল, কে জানে হয়ত তোমার কথাই ভাবছিলুম।...বোস।

জ্যোৎস্না তাহার পাশের চেয়ার খানাতেই আসিয়া বসিল। সে একখানা আশ্‌মানী রঙের ঢাকাই শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, তাহারই নূতন জরিগুলার উপর দূরে রাস্তার আলো আসিয়া পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল। সেই দিকে চাহিয়া অমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাছে নূতন করিয়া নেশা লাগে এই ভয়ে সে কিছুতেই ভালো করিয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসিয়া থাকিবার পর অমল আস্তে আস্তে কহিল, তোমার কাছে আমার একটা মাপ চাইবার আছে জ্যোৎস্না—

ঠিক তেমনিই মৃদুকণ্ঠে, যেন স্বপ্নজড়িত সুরে জ্যোৎস্না জবাব দিল, কী বলুন ত?

অমল আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার প্রতি আমি বড় অবিচার করেছিলুম, মনে মনে তোমাকে বড়ই অবজ্ঞা করতুম। তুমি আমাকে মাপ করো।

জবাব দিতে গিয়া জ্যোৎস্নার গলা কাঁপিয়া গেল। সে প্রাণপণে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু কিছু দোষ ত আপনি করেন নি। আমি বাস্তবিকই বড় ছোট ছিলুম যে! আপনিই ত আমার গুরু, আমাকে অপমানের চাবুক মেরে বুঝিয়ে দিলেন মানুষের কি হওয়া উচিত!

এই বলিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া অমলকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। তাহার পর কহিল, যেদিন আপনি বাঁকীপুর থেকে চলে গেলেন, সেদিন যে আমার কি করে কেটেছে তা বলতে পারব না। আমার জন্যই আপনাকে পথে বেরোতে হল—হয়ত পথে পথেই ঘুরতে হচ্ছে, হয়ত বা কোথাও আশ্রয় পান নি একথা যতই মনে পড়ে, ততই যেন বুকের ভেতরটা কে মুচড়ে ধরে। সেদিন সারারাত কেঁদে কেঁদেই কেটেছে!... যদি কোন দিন পারেন ত আপনিই আমাকে ক্ষমা করবেন।

অমল তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল, ওকথা এখন থাক—

তাহার পর তেমনি করিয়াই দুজনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। জ্যোৎস্নার হাতখানা অমলের দৃঢ়বদ্ধ মুঠির মধ্যে ঘামিতে লাগিল, সে হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টাও করিল না, কিংবা আর কথাও কহিল না। নির্জন, নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত শুধু দুইজন দুইজনের সঙ্গ অনুভব করিতে লাগিল—যতক্ষণ না ডাক্তারবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমশ

কস্মৈ দেবায়

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কোন্ দেবতারে জানাই নমস্কার?
মাঠ হতে ধান নিয়েছিল যারা আর
মুকুটে যাদের অনেক ধানের রঙ
সন্ধ্যার গায়ে তাদের ছায়ার সার।

নরমেদ যারা নিতে এল তারপর
লৌহ-বর্মে যাদের বুক পাথর
অপরাহ্নের আকাশে তাদের ভীড়
ভেঙে গেছে বুঝি নিরাপদ খেলাঘর।

কোন্ দেবতারা বাজায় রুদ্রবীণ
আগুন ছড়ায় তাদের মধ্যদিন,
সূর্যের ক্ষত অবিরত ঢালে বিষ—
আছে আমাদের মৃত্যুর মহাঋণ!

এখনও তবু উষার আকাশ লাল
জীবনের যেন নূতন রশ্মি-জাল!
কোনো দেবতার ধ্বনি কি শুনতে পাই?—
আমাদের হবি চায় কোন্ মহাকাল॥

নির্বাসিতের স্বপ্ন

শ্রীকরুণাময় বসু

সাগরের চরে বালুকণা জ্বলে, কোথায় পথ?
আমাদের চোখে নহে উর্বর এই জগৎ।
শৃঙ্খল ঘেরা হাতের আঘাতে ভাঙি পাথর,
পিঠের উপরে চাবুকের ভয়ে নহি কাতর;
মাথার উপরে অজানা পাখীর পাখার ঢেউ,
বারতা কি আনে সাগর পারের? জানে না কেউ।

কতদিন ভাবি পার হয়ে যাব বাঁধিয়া ভেলা,
পিছনে রহিবে জীবন-মরণ জুয়ার খেলা।
পৃথিবীর শেষে রচনা করিব নিরালা নীড়,
পাহাড়ের কোলে নদীটির পাশে, রবে না ভিড়।
স্বপ্ন ফুরায়, রাত্রি গভীর অন্ধকার;
বুটের শব্দে টহল দিতেছে ওয়ার্ডার।

প্রণাম নিও

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

আগামী কালের কবিরা আজের প্রণাম নিও,
আমাদের মতো তোমাদের দিন ঘোলাটে নয়;
আজের পৃথিবী আমাদের চোখে নয়ত প্রিয়,
আমরা পারিনি তোমরা ইহারে ভালবাসিও।

সূর্য আকাশে আসে বটে আজো, ফ্যাকাশে রোদ
তোমাদের দিনে প্রভাত হয়তো অনেক লাল!
রাতের আকাশে আজিকার চাঁদ মলিন মরা,
জোছনায় নেয়ে তোমরা লইও আজের শোধ।

জীবনের দাম বেড়ে যাবে জানি,—জনতা নয়,
তোমাদের দিনে অনেক সহজ কবিতা লেখা।
আমরা উপোসী শিথিল মুঠোয় কলম কাঁপে,
আগুপিছু খাড়া প্রহরীর মতো মরণ ভয়।

আমরা সেদিন মুছে যাবো জানি তবুও দিও;
মাটী চাপা পড়া হারাণো কবরে চোখের জল।
তোমরা আসনি তোমরাই তবু মোদের প্রিয়,
আগামী কালের কবিরা আজের প্রণাম নিও।

বাঘ

শ্রীসুরেশ্বর শর্মা

বাঘের যবে পড়িল দাঁত খসিল বাঁকা নখ,
নয়ন দুটি আঁধারে জ্বলে হীরক অপলক,
বনহরিণী ভীরুতা জিনি আসিল কাছে তার,
নিমিক্‌হারা নয়ন দুটি ভাবে সে চমৎকার!

বিবাগী বাঘ মৃগীর পানে রাখে করুণ আঁখি,
করাল নখদশন ভরে' রসনা দিয়া চাখি'
লভেনি কভু যে পরিচয়, মৃদুল বিলোকনে
চিনিল তার সুধার সার রয়েছে দুনয়নে!

বন্যজন্তুর বাৎসল্যপ্রীতি

বন্য জীবজন্তুরা মনুষ্য শাবককে যে কি পরিমাণ যত্নের সঙ্গে লালন পালন করে, তার কয়েকটি পরিচয় আমরা পেয়েছি। একমাত্র স্নেহের আতিশয্যেই তারা হিংসা ভুলে গিয়ে সারাদিনের বহু শ্রমঅর্জিত মুখের গ্রাস নররক্ত শিশুকে স্বেচ্ছায় লালন পালন করবার ভার গ্রহণ করে। বন্যপশুর সঙ্গে বাস করার ফলে মানব শিশু কি পরিমাণ জনোয়ারের সমস্ত গুণ পেয়ে বসে, তা নীচের ঘটনা থেকেই বুঝা যায়।

১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে রেভারেণ্ড জে এল সিংহ নামে জনৈক খৃষ্টান মিশনারী মেদিনীপুরে অবস্থানকালে দুটি অদ্ভুত রকমের মানুষের কথা শুনতে পান। মিঃ সিংহ সদলবলে তাদের দেখবার জন্যে রওনা হন। রাত্রিতে তাঁরা দেখলেন, একটা সুড়ঙ্গ পথ থেকে তিনটে পূর্ণবয়স্ক নেকড়ে বাঘ, তাদের পিছনে দুটি বাচ্চা এবং সর্বশেষে দুটি মনুষ্যাকৃতি জীব বের হয়ে আসছে। একদিন দিনের বেলায় ঐ সুড়ঙ্গপথ অনুসন্ধান করে নেকড়ের বাচ্চা দুটি এবং ঐ শিশু দুটি উদ্ধার করা হয়। মানব শিশু দুজনেই বালিকা। সে সময়ে তাদের মধ্যে একজনের বয়স অনুমান আট আর অপরটির দেড় বৎসর ছিল। মানব শিশু দুটিকে নেকড়ের বাচ্চাদের চেয়ে বেশী হিংস্র বলে মনে হয়েছিল।

মিশনারীরা বালিকা দুটির নাম দেন কমলা ও অমলা। মিঃ সিংহ বালিকা দুটিকে মনুষ্য জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলাবার কঠিন কার্যভার গ্রহণ করেন। বালিকা দুটি দেহে কোন রকম আবরণ রাখত না। তাদের কাঁধের দুপাশে অধিক পরিমাণে লোম দেখা দিয়েছিল।

দাঁতের গঠন এবং তীক্ষ্ণতা, ঠিক নেকড়ে বাঘের অনুরূপ ছিল। শাকসব্জি গ্রহণ করত না এবং অনেক দূর থেকেই মাংসের গন্ধ পেয়ে সজাগ হয়ে উঠত। মানুষের মত সোজা দাঁড়াতে তারা মোটেই অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু হাতের ও পায়ের সাহায্যে খুব ক্ষিপ্রগতিতে অন্যান্য জীবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় দিত। দিনের বেলায় তারা সারাক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকত, নয়ত ঝিমুতো। রাত্রির অন্ধকারে তারা সজাগ হয়ে উঠত, কোন কিছুর পিছনে তাদের অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটি যেন ঘুরে বেড়াবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ত। প্রথমে তারা মানুষের সংসর্গ পছন্দ করত না। খুব ধীরে ধীরে তারা শ্রীমতী সিংহের স্নেহের প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল। শ্রীমতী সিংহও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার শিক্ষা দিতে লাগলেন। উক্ত ঘটনার এগার মাস পরে হঠাৎ অমলা মারা যায়। অমলার মৃত্যুতে কমলার (বড়) চোখে প্রথমে জলবিন্দু দেখা দিল। অমলার মৃত্যুর পর যেখানে সে শুয়ে থাকত, সেখানে কয়েক সপ্তাহ ধরে কমলা কুকুরের মত মাটী শুঁকে বেড়াত। শিক্ষার ফলে কমলা পশুর মত খাদ্য ভক্ষণের রীতি পরিবর্তন করলে, কাপে চুমুক দিয়ে পানীয় বস্তু বেশ আরামে গ্রহণ করতে সক্ষম হল। মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটা, কাপড় পরা প্রভৃতি সবেতেই সে একে একে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুদিনের মধ্যে তার শরীরে সুশ্রী মানব শিশুর সকল লাবণ্য দেখা দিল। সঙ্কেত-চিহ্ন পরিত্যাগ করে কমলা প্রায় বিশটি শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়। ১৯২৯ সালে ১৪ই নবেম্বর কমলা মারা যায়।

গ্রাহামস্ টাউনের জনৈক ডাক্তার একবার বেদুনদের দল থেকে একটি মানব শিশুকে উদ্ধার করেন। সে সময়ে বালকটি মানুষের কোন কথা বুঝত না। শাকসব্জী এবং এবং শস্যের দানা ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করত না। অনেক চেষ্টা করেও বালকটিকে যখন কেউ সনাক্ত করতে পারলে না, তখন এইচ স্মিথ নামক এক ভদ্রলোক বালকটির লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। বালকটির নাম রাখা হয় লুকাস। লুকাসের বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ। লুকাস ইংরেজীতে কথা বলতে শিখলে, কিভাবে বেদুনেরা অস্ট্রিচ পাখীর বাসা আক্রমণ করে ডিম চুরি করে নিয়ে আসত, তা পরিষ্কারভাবে লুকাস বর্ণনা করে যেত। একবার কি করে অস্ট্রিচের বাসা থেকে ডিম চুরি করতে গিয়ে অস্ট্রিচ পাখীর প্রচণ্ড লাথির আঘাতে লুকাস মাথা ভেঙ্গে ফেলে। এমনি আরও অনেক সত্য ঘটনা থেকে মানব শিশুর বিচিত্র জীবনের কথা শুনতে পাওয়া গেছে।

দাড়ির ট্যাক্স

আজকাল 'ট্যাক্স' কথাটার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে এসেছে। অমুক বস্তুর উপর যে ট্যাক্স বসতে পারে না এ কথা কেউ আর হলফ করে বলতে সাহস করবেন না। কর্তার ইচ্ছায় যেখানে কর্ম সেখানে অপর লোক হৈ চৈ করলেও আমি চুপচাপ দাড়িতে হাত বুলাব; এটাই আমার সান্ত্বনা নয় কি? পুরুষের সৌন্দর্য এ হেন দাড়ি রাখার জন্যই রাণী এলিজাবেথের সময়ে পনের দিনের ট্যাক্স দিতে হত ৩ শিলিং ৪ পেন্স। ১৭০৫ সালে রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট দাড়ি রাখার জন্য ট্যাক্সের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য এ নিয়ম দ্বিতীয় ক্যাথারিন ১৭৬২ সালে তুলে দিয়ে বহু দাড়িবাবার শ্রদ্ধা কুড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেশে এই ট্যাক্সের যদি কোন দিন চলন হয়, তা হলে দেশের মধ্যে কি হিড়িক লাগবে তাই ভাবছি। যুদ্ধের বাজারে বিদেশী ব্লেডের চাহিদা পড়েছে, একদল ফেঁপে ফুলে ঢোল হবে। বাজাবার এবং নাচবার লোকের এদেশে অভাব নেই।

কম সময়ের সাজা

যার শাস্তি বেশী পাওয়া উচিত সেও বিচারকের মর্জিতে কম পেয়ে যায় আবার কেও কেও কমের পরিবর্তে বেশী পায়। সব থেকে কে বেশী সময় সাজা ভোগ করেছে তার খবর অবশ্য চেষ্টা করলে পাওয়া যায়। তবে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে কম সময় সাজা ভোগ করেছে এমন একজন আসামী পাওয়া গেছে। ১৮৮৭ সাল জাস্টিস হাকিম সাহেব একজন

স্ত্রী আসামীকে শাস্তি দিয়েছিলেন পাঁচ মিনিটের জন্যে। অনেকের ধারণা এটাই নাকি কম সাজা পাওয়ার মেয়াদ।

ডানাকাটা পাখী

পাখী বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যারা আকাশে উড়ে, ডিম পাড়ে ইত্যাদি। তবে অনেক পাখীর ডানা আছে, কিন্তু শরীরের ওজন বেশী থাকায় বেশী দূর উড়তে পারে না, কেউ কেউ আবার ডানা থাকা সত্ত্বেও উড়তে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু ডানা একেবারে নেই অথচ তারা পাখী এ রকম কোন জীবের সন্ধানও আছে। নিউজিল্যাণ্ডের Apteryx নামে এক জাতীয় পাখীর ডানা একেবারেই নেই।

বুনো ডুমুর

ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের বোটানিক্যাল গার্ডেনে একশ্রেণীর বুনো ডুমুরের গাছ আছে। এই বুনো ডুমুর বর্মা দেশ থেকে আনা হয়েছে। এই শ্রেণীর গাছে যে ডুমুর ফলে, তার পরিধি তিন-চার ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এই ধরণের ডুমুরের আবির্ভাব কেবল গাছের ডালেই হয় না, গাছের কান্ডতেও হয়।

বড় জাতের গুবরে পোকা

পৃথিবীর মধ্যে বড় আকারের গুবরে পোকা পাওয়া যায় গিয়ানা ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে। দৈহিক আকার এদের ৯ ইঞ্চি, সময়ে সময়ে তার থেকেও কিছু বড় আকারের পোকার সন্ধান মেলে। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র আকারের এক গুবরের আবির্ভাবেই আমরা মাঝে মাঝে যেভাবে চঞ্চল হয়ে পড়ি, ভেবে একবার দেখুন সেখানের একটা বড় জাতের গুবরে যদি ঘটনাচক্রে এদেশে এসে পড়ে তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হয়!

গন্ধ

কোন কিছুর গন্ধ জীবজন্তুরা যতখানি টের পায় মানুষ ততখানি পায় না। জীবজন্তুদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর থাকায় কোন গন্ধযুক্ত বস্তুর আবির্ভাব অনেকখানি দূর থেকেও তারা বুঝতে পারে। সাধারণত মানুষ নীচের তেরটি গন্ধের সঙ্গেই বিশেষ পরিচিত। (১) ফুলের গন্ধ, (২) ফলের গন্ধ, (৩) কস্তুরী গন্ধ, (৪) কর্পূরের গন্ধ, (৫) টক গন্ধ, (৬) পিঁয়াজ গন্ধ, (৭) উগ্রজ্বালাকর গন্ধ, (৮) পোড়া গন্ধ, (৯) আঁসটে গন্ধ, (১০) বোটকা গন্ধ, (১১) সোঁদা গন্ধ, (১২) তিক্ত গন্ধ, (১৩) পচা গন্ধ। যে সব জীবের ঘ্রাণশক্তি আছে তারা সকলেই নাক দিয়ে গন্ধের উপস্থিতি বুঝতে পারে। কোন কোন গন্ধের প্রখরতা এত বেশী থাকে যে, আমাদের মধ্যে অনেকে আবার তার কোন রকম গন্ধই বুঝতে পারে না। অনেক সময় একটা গন্ধবস্তু অনেকক্ষণ নাকে ধরে রাখার ফলে আমরা তার আর কোন গন্ধের টের পাই না। কিন্তু কয়েক মিনিটের জন্যে নাকের কাছ থেকে গন্ধদ্রব্যটি সরিয়ে রাখার পর যদি পুনরায় সেটি নাকের কাছে আনি তাহলে আবার নতুন করে আমরা সেই গন্ধের উপস্থিতি উপভোগ করতে পারি। একটা গন্ধের সঙ্গে বহুক্ষণ অভ্যস্ত হয়ে পড়ার জন্যই আমরা গন্ধের রূপকে ধরতে পারি না। কোন কোন গন্ধ বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না, খুব কম সময়ের মধ্যেই উবে যায়। আবার কস্তুরীর গন্ধের এক কণাও অনেক বছর ধরে থেকে যায়। কোন কোন গন্ধের তেজ এত বেশী থাকে যে, আমরা অন্য বস্তুর সঙ্গে তাদের মিশিয়ে নিয়ে নানা কাজে লাগাই। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকরা এমন বহু বস্তু আবিষ্কার করেছেন যাদের আমরা আসল বস্তুর সঙ্গে তুলনা করেও কোন দোষ সন্ধান করতে পারি না। কোন্ কোন্ গন্ধ কোন বস্তুর সঙ্গে কি পরিমাণ মিশালেও আমরা তাদের ধরতে পারি তা নীচে দেওয়া হল।

গন্ধ	অন্য বস্তুর ভাগ
১ ভাগ কর্পূর	৪০০,০০০
১ ভাগ কস্তুরী	৮০০,০০০
১ ভাগ ভ্যানিলিন	১০,০০০,০০০

বৈজ্ঞানিক তার রসায়নাগারে যে গন্ধের আবিষ্কার করেছেন তার তেজই সকল গন্ধের চেয়ে বেশী, নাম Mercaptan. এই গন্ধের ১ আউন্সের ৩০,০০০ ভাগের এক ভাগ অন্য বস্তুর ৪৬০,০০০,০০০ ভাগ মিশিয়ে দিলেও আমরা এই রসায়ন গন্ধের উপস্থিতি ঘ্রাণশক্তি দ্বারা অনায়াসেই বুঝতে পারব।

চিকাগোর পথে

(২৬ পৃষ্ঠার পর)

আমেরিকাতে দুই শ্রেণীর ভারতবাসী দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক হলো, তারা ভারতের সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে আমেরিকায় থেকেই ভারতে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। তারা ভাবে ভারতে নাম অর্জন করলেই বেশ হলো, বিদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেশের লোকত দেখছে না? ভারতের আমেরিকাবাসী শিক্ষিত হিন্দুদের রীতি অনেকটা তাই, কিন্তু বিদেশে গিয়ে দেশের সম্বন্ধে কিছু বলে দেশের এবং জগতের কিছু করতে মোটেই তাদের ইচ্ছা নেই, পাছে আমেরিকার ইমিগ্রেসন তাদের তাড়িয়ে দেয়। আর এক শ্রেণীর লোক, তারা শিক্ষিত নয়, তারা নেহাৎ মূর্খ, খালাসী এবং পাঞ্জাবের মজুর। এরা যখন সামান্য লেখাপড়া শিখে ভারতের অবস্থা বুঝতে পারে, তখনই তারা মুখ খুলে কথা বলে, আমেরিকার জনসমাজের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের বলার মত ভাষা না থাকায়, তাদের কথা অল্প লোকেই বুঝতে চেষ্টা করে। তাদের মুসলিম লিগ অথবা মহাসভা কুপথে নিয়ে যেতে পারে না, পারবেও না।

ডাক্তার দাস শিক্ষিত। তিনি যদিও ভারতের কথা কা'রো কাছে বলতে যাননি, তবুও তাঁর নিজস্ব গুণে অনেকেই বুঝতে পেরেছিল ভারতেও শিক্ষা দীক্ষা আছে। North Western Universityতে কজনা ভারতবাসী পাঠ নিতে যায় এবং তথায় কজনাই বা প্রবেশ করতে পারে? ভারতের হাতুড়ে ডাক্তার যেমন আসল ডাক্তারের পথ বন্ধ করে থাকে, শুনে সুখী হলাম অর্থ-পিচাশী আমেরিকার হিন্দু ডাক্তারগণ ডাক্তার দাসের সেরূপ কিছু করতে পারেন নি।

রঙমহলে রত্নদীপ

গৃহপরিত্যাগী জমিদার ভবতারণ একবার সন্ন্যাসধর্ম ছাড়িয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশোদ্দেশ্যে আসিতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে কে কি মতলবে যেন তাঁহাকে হত্যা করিল। স্টেশনে সন্ন্যাসীর মৃতদেহ নামান হইল। সহকারী স্টেশন মাস্টার সেদিন কর্মচ্যুত হইয়াছে। নাম রাখাল। রাখাল সন্ন্যাসীর তোরঙ্গে কিছু কাঁচা টাকা এবং একখানা রোজনামচা পাইল। রোজনামচায় ভবতারণের জীবনী ছিল। কর্মচ্যুত স্টেশন মাস্টার রাখাল গৃহগামী ভবতারণের ভূমিকা গ্রহণ করিল।

ভবতারণের গৃহে স্ত্রী আছেন। বহুদিন অপেক্ষা করিয়া শাস্ত্রমতে বৈধব্য গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গী নাই, তাই সহচারিণীর প্রত্যাশায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনদৃষ্টে সোনার হরিণ তাহার পরিচিতা অভিনেত্রী কণককে এই কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহার মারফৎ সুন্দরী বিধবা ও তৎসংশ্লিষ্ট জমিদারী আয়ত্ত করিবার কল্পনা ফাঁদিয়া বসে। কণক সহচারিণীরূপে যখন নিযুক্তা তখন লীলাবতী নামে এক সধবা এখানে আশ্রয় পায়। ভবতারণের স্ত্রী বৌরাণীর একমাত্র অভিভাবক বৃদ্ধ দেওয়ানজী। তিনি ভবতারণের আগমন সংবাদ পান এবং বৌরাণীর সধবা প্রাপ্তির উৎসব সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভবতারণের ব্রত আরও ছয় মাসকাল চলিবে। এ ব্যক্তি ভবতারণ নহে বলিয়া অনেকের সংশয় থাকিল। কণক এই সংশয়ীদের মধ্যে অন্যতম। সোনার হরিণ রীতিমত গোয়েন্দাগিরি সুরু করিল, আশ্রিতা মেয়েমানুষটি যে জাল ভবতারণ রাখালের স্ত্রী তাহা আবিষ্কার করিল। কিন্তু রাখাল নিজেই নিজের জালিয়াতির কথা ব্রতান্তে স্ত্রীসহ ফুলবাসরে যাইবার রাতে উদ্ঘাটিত করিল। সকলেই ইহার সাধুতায় সাধুবাদ করিল এবং বৌরাণী স্বয়ং ইহারই পায়ে মাথা খুঁড়িয়া বলিল, তাহার যেন মৃত্যু হয়।

ইহাই কাহিনী এবং এইখানেই ইহার উপসংহার বা সংহার। কাহিনীর জন্যই ঘটনা, ঘটনা সমাবেশে কাহিনী নহে। তাই প্রথমাবধিই কাহিনীটি স্পষ্ট। একটা জানা গল্পের ক্রমোদ্ঘাটন মাত্র। অথবা কোন কাহিনী, নাটক বা চলচ্চিত্র শোনা, পড়া বা দেখা থাকিলে পুনরাবৃত্তি ঠিক যতখানি আকৃষ্ট করে আলোচ্য কাহিনী তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। অর্থাৎ কাহিনী আর্টের দিক দিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ কাহিনীর ঘটনা দর্শকেরা জানে, জানে না কেবল অভিনেতারা। কবিতাটা জানা আছে, কেবল আবৃত্তিকার কিভাবে আবৃত্তি করিবে তাহাই শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য। 'এই ঘটনা সমাবেশেও লেখকের অকৃতিত্বের অবধি নাই। রাখালের স্ত্রীর এই বাড়িতে আশ্রয় প্রাপ্তিটা খাপছাড়া। শেষের দিকে তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত ঘটনাপরম্পরায় সমগ্র কাহিনীকে কাহিনী হিসাবে বিদ্রূপ করিয়াছে, ছেলেমানুষের মতো রঙের উপর রঙ ফলাইতে গিয়া বদরঙ হইয়া পড়িয়াছে। লেখক নীতিবাদের বেদীমূলে যত খুশী মাথা খুঁড়ুন কিন্তু সে কি এইভাবে? নিজে মাথা কুটিতে গিয়া পরকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলিদান! যে মানুষ লোভে পড়িয়া কর্মচ্যুত অবস্থায় মৃতদেহ হইতে চাবি লইয়া অর্থ ও ডায়েরী চুরি করে ও দিনের পর দিন জালিয়াত ভবতারণের অভিনয় করে সে একদিন ভাঙিয়া পড়ে; এই ভাঙিয়া পড়াটাই নাকি মহত্ত্ব! অথচ

প্রভাতের 'পড়োসী' চিত্রের মজাহার খাঁ সংগীত পরিচালক কৃষ্ণরাও ভোলেকে বিরক্ত করিতেছেন

পাপ মন প্রথমাবধিই মিথ্যা ব্রতের ফাঁক ও ফাঁকি খুঁজিয়াছে। দুর্বল বিবেককেই মহৎ বলিয়া প্রচার করা হইল। এমন কি এই দুর্বল নার্ভের কাছে এতদিনকার পাকা অভিনেত্রী কণকও মাথা নোয়াইল। আদর্শ প্রতিষ্ঠার এত বড় জাল ও ভাঁওতা আর হইতে পারে না। মূল কাহিনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়। ইহাকে নাট্যরূপ দিয়াছেন শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য। বিধায়কবাবুর কৃতিত্বকে ধন্যবাদ যে তিনি এমন একটা কাহিনীকেও অদ্ভুত রকমে উন্নীত করিয়াছেন। অমন একটা ব্যর্থ কাহিনী বিধায়কবাবুর হাতে পড়িয়া রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা বিধায়কবাবুর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। প্রযোজক শ্রীপ্রভাত সিংহ সেখানে হাত বাড়াইয়াছেন। কাহিনীর বরাত ভাল যে সৎসঙ্গে পড়িয়া তাহারও ক্রমশ যেন স্বর্গলাভ হইতে চলিয়াছে। নাটকের উদ্ঘাটনটা রীতিমত মৌলিক এবং প্রথমেই দর্শকের মনে কৌতূহলের সঞ্চার করে। নাটককে একেবারে বাস্তবভূমিতে নামাইয়া আনিবার ও দর্শককে সেই বাস্তব ঘটনার মাঝে নিক্ষেপ করিয়া নাট্যকারের নেপথ্যে চলিয়া যাওয়ার যে টেকনিক তাহা লক্ষ প্রশংসার যোগ্য। ইহার পর হইতে নাটক অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। কিন্তু গতি মন্থর। প্রথমত ছোট ঘটনাকে ফাঁপাইয়া তুলিতে হইবে অথবা ছোট বস্তুকে খণ্ড করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত শ্লথ মঞ্চ ব্যবস্থা।

প্রতিযোগিতায় ভারতের যতগুলি বিশিষ্ট মল্লযোদ্ধা একত্র হইয়াছিলেন ইতিপূর্বে ভারতের কোন স্থানে এইরূপ একত্র করা কখনও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনুষ্ঠানটি যেরূপ দর্শনযোগ্য ও আকর্ষনীয় হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল সেইরূপ হয় নাই। ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে একটা প্রহসনের ন্যায়। দর্শকগণ যাঁহারা দলে দলে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া এই প্রতিযোগিতা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরিসমাপ্তির শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে তাঁহারা মল্লযুদ্ধ দেখেন নাই। কেবল দেখিয়াছেন মল্লযোদ্ধাদের বিরাট বিরাট দেহ, অহেতুক হুংকার, মারামারি, গালাগালি, ধ্বস্তাধ্বস্তি। কয়েকজন অখ্যাতনামা মল্লযোদ্ধা ছাড়া কোন বিশিষ্ট মল্লযোদ্ধা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই। দুইটি মাত্র দর্শনযোগ্য মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও মল্লযোদ্ধাগণের অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির জন্য শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ছোট গামা ও প্রিন্স রণজির মল্লযুদ্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা দুইজনেই খ্যাতনামা মল্লযোদ্ধা। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন দর্শকগণও বিশেষ উৎসাহ লাভ করিলেন। দুইজনের মধ্যে ধস্তাধ্বস্তি চলিল প্রায় ১২ মিনিট। এই সময় বিচারকগণ লক্ষ্য করিলেন ছোট গামা অবৈধ উপায়ে প্রিন্স রণজির শ্বাসরোধ করিয়া চিৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একবার দুইবার তিনবার বিচারকগণ ছোট গামাকে সতর্ক করিলেন। কিন্তু ছোট গামা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন বিচারকগণ বাধ্য হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন। এই সময় হঠাৎ দেখা গেল, একজন মল্লযোদ্ধা দর্শকগণের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বিচারকগণের নির্দেশের প্রতিবাদ করিতেছেন। বিচারকগণের সহিত বচসা করিতেছেন। তাঁহার এই আচরণ ছোট গামার সমর্থক অপর মল্লযোদ্ধাগণকে উৎসাহ দান করিল। তাঁহারাও তখন দলবদ্ধ হইয়া ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেন। ছোটা গামা সমর্থকগণের চিৎকারে উত্তেজিত হইয়া কাণ্ডজ্ঞানহীনের ন্যায় অহেতুক প্রিন্স রণজিকে আঘাত করিলেন। অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা দেখিয়া পরিচালকগণ মল্লযুদ্ধটি বন্ধ করিয়া দেন। গণ্ডগোলকারী মল্লযোদ্ধার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তিনি তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন পরিচালকগণ উক্ত মল্লযুদ্ধটি পরদিন হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু পরদিন ঐ প্রতিযোগিতা হইল না। প্রিন্স রণজির আঙ্গুলে আঘাত লাগায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে রাজি হন না। তবে তিনি মল্লক্ষেত্রে ঘোষণা করেন যে, তিনি পরে যে কোন সময় যে কোন স্থানে লড়িতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা নির্বাচন প্রতিযোগিতা

ইহার পর শেষ দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা নির্বাচন উপলক্ষে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইল। বড় গামা ও ইমাম বক্সকে এই প্রতিযোগিতা হইতে বাদ দেওয়া হইল। হামিদা, ছোট গামা, গোলাম ঘোষা, বংশী সিং, সোহন সিং, পূরণ সিং, ফিরোজ গোঙ্গাকে এই প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত করা হইল। পরিচালকগণ তাঁহাদের ইচ্ছা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইল যে উক্ত মল্লযোদ্ধাদের মধ্যে কেহ লড়িতে রাজি হইলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়ীর সুনাম অর্জন করা অপেক্ষা অর্থটাই হইল সর্বাপেক্ষা বড়। এই পর্যন্ত যতগুলি স্থানে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে লড়িয়াছেন, ততগুলি স্থানে অর্থ পাইয়া লড়িয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা সে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি তখন তাঁহারা ভুলিলেন। পরিচালকগণ দেড় ঘণ্টা ধরিয়া নানারূপে অবতীর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হইলেন। তখন তাঁহারা গোঙ্গার বৃদ্ধ পিতার স্মরণাপন্ন হইলেন। দর্শকগণের নিকট মুখ রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদের এইরূপ সাধ্যসাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কালা হাবা ফিরোজ গোঙ্গা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আসরে অবতীর্ণ হইলেন। অন্য কোন মল্লযোদ্ধা তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেন না। পরিচালকগণ গোঙ্গাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দর্শকগণ প্রতিযোগিতার শেষ দিনে বিশিষ্ট মল্লযোদ্ধাগণের আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মল্লযোদ্ধাগণ সম্বন্ধে তাঁহারা পূর্বে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নিখিল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতার পরিচালকগণকেও নিন্দাবাদ হইতে অব্যাহতি দিলেন না। ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধাদের মনে যে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির স্থান নাই ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়গণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে

গউস মহম্মদ, ইফতিকার আমেদ, যুধিষ্ঠির সিং, ওয়াই আর বাবুর, সোহনলাল, আনওয়ার হোসেন প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়গণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে পড়িয়াছেন। নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশন তাঁহাদিগকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর পর হইতে ভারতের কোন বিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে না দিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কুনওয়ার যশবীর সিং, পণ্ডিত অমরনাথ ঝা ও এন রুক এডওয়ার্ডস প্রভৃতিকে লইয়া একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান কমিটি উক্ত খেলোয়াড়গণের আচরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশনের পরিচালিত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পরিচালকগণকে না জানাইয়া হঠাৎ প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করার ফলেই উক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে খেলোয়াড়গণকে পড়িতে হইয়াছে। বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন উক্ত খেলোয়াড়গণের আচরণ সম্বন্ধে নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের নিকট অভিযোগ করেন এবং সেই অভিযোগ ক্রমেই নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অপর খেলোয়াড়গণের কথা ছাড়িয়া দিলেও গউস মহম্মদের এইরূপ আচরণ সর্বপ্রথম নহে। তিনি ইতিপূর্বেই দুই দুইবার কলিকাতার সাউথ ক্লাবের পরিচালকগণকে এইরূপভাবে অপদস্থ করিয়াছেন। সাউথ ক্লাবের পরিচালকগণ নেহাৎ দয়া করিয়াই ঐ বিষয় লইয়া কোনরূপ আন্দোলন করেন নাই। কিন্তু বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন তাহা করেন নাই। আশা করা যায়, ইহার পর হইতে উক্ত খেলোয়াড়গণ ঐরূপ প্রতিযোগিতায় নাম দিয়া ইচ্ছামত ত্যাগ করিয়া প্রতিযোগিতা পরিচালকগণকে দর্শকগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইবেন।

সমর বার্ত্তা

২৯শে জানুয়ারী—

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, দের্না এলাকায় ইতালীয়ানদের উপর বৃটিশ বাহিনীর চাপ বৃদ্ধি পায়। এরিত্রিয়ার এগরডাট ও বারেণ্টু এলাকায় প্রবল সংগ্রাম হয়। ৭৩ জন ইতালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হয়। বৃটিশ বিমানবহর ক্যাটানিয়া বিমান ঘাঁটির উপর প্রবল বোমা বর্ষণ করে।

আলবানিয়া রণাঙ্গনে দোভালি নদী হইতে অকরিডা হ্রদের তীরবর্তী এলাকায় ইতালীয়রা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তবে সর্বত্রই তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়।

গ্রীকদের ইস্তাহারে বলা হয় যে, বিভিন্ন স্থানের সংগ্রামে আরও বহু ইতালীয়ান সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। সালোনিকায় ইতালীয়ানরা একটি সামরিক হাসপাতালের উপর বোমা বর্ষণ করে, ফলে দশজন নিহত হয়।

বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ গতকল্য ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা, আলবানিয়া ও লিবিয়ায় আক্রমণ চালায়। আলবানিয়ায় এলবাসান শহরে সামরিক ঘাঁটির উপর বৃটিশ বিমানসমূহ বোমা বর্ষণ করে এবং ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকায় কেরেন ও থাইসার উপর হানা দেয়। লিবিয়ায় এপোলোনিথার উপর ২৬শে জানুয়ারী বোমাবর্ষণ করা হয়।

জাপ নিম্ন পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুওকা এই দাবী জানান যে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েটের চীনকে সাহায্য দান বন্ধ করা উচিত। তিনি আশা করেন যে, সোভিয়েট চিয়াংকাইসেককে সাহায্য দান বন্ধ করিবে। "ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদানের ফলে মানব জাতির পক্ষে সর্বনাশ দেখা দিতে পারে", তৎপ্রতি তিনি মার্কিন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গতকল্য মাল্টায় প্রতিপক্ষের বিমান হানার ফলে বৃটিশ বিমান বাহিনীতে নিযুক্ত চারজন নিহত ও নয়জন আহত হয়।

৩০শে জানুয়ারী—

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনী দের্না দখল করিয়াছে। দুই তিন দিন যাবৎ উপর্যুপরি সংঘর্ষের পর দের্না অধিকৃত হয়। দের্নায় অনুমান দশ সহস্র ইতালীয়ান সৈন্য ছিল এবং উহার অধিকাংশই পলায়ন করিয়াছে। দের্না অধিকার করার পর লিবিয়ার পশ্চিম দিকে অগ্রসরমান বৃটিশ বাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য হইতেছে বেনগাজী। বেনগাজীর পতনও আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকায় ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চালান হইতেছে।

অদ্য হিটলার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন যে, "যাহারা বৃটেনকে সাহায্য করিতে চায়, তাহাদের ইহা জানা উচিত যে, যে জাহাজই আমাদের টর্পেডো টিউবের পাল্লায় আসিবে, সেই জাহাজের উপরই আমরা টর্পেডো আক্রমণ চালাইব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউরোপের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে, তন্মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য আমরা পরিবর্তন করিব। সমগ্র ইউরোপ এইরূপ প্রচেষ্টা বাধা দিবে।" বসন্তকালে সাবমেরিন আক্রমণের আভাস ছাড়া ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে হের হিটলার আর কোন আভাস দেন নাই।

৩১শে জানুয়ারী—

মার্কিন নৌসচিব কর্নেল নক্স ঘোষণা করেন যে, নাৎসীরা এক্ষণে বৃটেন আক্রমণের জন্য উত্তম আবহাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্ট এরূপ সংবাদ পাইয়াছে। তিনি আরও জানান যে, এরূপ কতকগুলি আশংকাজনক ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহাতে অনুমান হয়, আগামী ৬০ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে বিষম সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে।

বৃটিশ বাহিনী ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। সুদান রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে এবং বৃটিশ বাহিনী এগরডাট ও বারাণ্টুর উপর চাপ দিতেছে। বৃটিশ বাহিনী উপকূল ভাগ দিয়া দের্না হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী এপোলোনিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কেনিয়ার ময়েলে ইতালীয়ানরা বাধা দিতেছে এবং উক্ত স্থানের কেনিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চল এখনও তাহাদের অধিকারে রহিয়াছে।

লণ্ডনের সরকারী অভিমত এই যে, এই বৎসরের মধ্যেই জার্মানি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করিবে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার ভিসিস্থ সংবাদদাতা জানান যে, ভিসির অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই যে, ফেব্রুয়ারী মাসেই বৃটেনের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

এথেন্স রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, গ্রীক প্রচার বিভাগ হইতে আলবানিয়ান রণাঙ্গনে গ্রীকদের নূতন সাফল্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, আলবানিয়ায় ইতিমধ্যেই ৬০ হাজারের অধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী—

অদ্য দিনের বেলায় জার্মান বিমানের বেপরোয়া বোমা বর্ষণের ফলে লণ্ডনের তিনটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গত ২৮শে জানুয়ারী বৃন্দিসীর অদূরে গ্রীক সাবমেরিনের আক্রমণে একখানি ইতালীয় জাহাজ (১০ হাজার টন) জলমগ্ন হয়।

২রা ফেব্রুয়ারী—

বৃটিশ সৈন্যেরা ইতালীয় অধিকৃত এরিত্রিয়ার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর এগরডাট দখল করিয়াছে। বহু কামান ও গাড়ীসহ শত শত ইতালীয়ান সৈন্য বন্দী হয়।

এগরডাট দখলের পর এরিত্রিয়ায় বৃটিশ বাহিনী কেরেনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য চাপ দিতেছে। কেরেন মাসোয়াগামী রেলপথের আরও ৫০ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

৩রা ফেব্রুয়ারী—

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য বৃটিশ বাহিনী এরিত্রিয়ার বারেণ্টু শহর দখল করে। বারেণ্টুতে এক ডিভিসন ইতালীয়ান সৈন্য আটক পড়িয়াছে। অদ্যকার একটি ইস্তাহারে আবিসিনিয়ায় ইতালীয়ানদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃটিশ নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর হইতে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৩১শে জানুয়ারী জার্মান কিম্বা ইতালীয় বিমানের কর্মতৎপরতার ফলে বহু সংখ্যক ইতালীয়ান বন্দী প্রাণ হারাইয়াছে। লিবিয়া হইতে ইতালীয়ান বন্দিবাহী একটি বাণিজ্য জাহাজ জার্মান বলিয়া অনুমিত দুইটি বিমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। জাহাজটির উপর সোজাসুজি আঘাত লাগে এবং বহু সংখ্যক ইতালীয়ান বন্দী হতাহত হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—

ভিসি হইতে নিউইয়র্ক প্রেরিত সংবাদে বলা হইতেছে যে, মঃ লাভালকে ভিসি মন্ত্রিসভায় আবার লওয়া হইবে এবং মঃ লাভাল মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য অদ্য এডমিরাল দারলাঁর সহিত সম্ভবত ভিসিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ভিসি গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, মঃ ফ্লাদাঁ যিনি মঃ লাভালের স্থলে পররাষ্ট্র সচিব পদে নিযুক্ত হন, মন্ত্রিসভা হইতে তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইবে।

বৃটিশ বাহিনী কেনিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া মুসোলিনীর পূর্ব আফ্রিকার সাম্রাজ্যের মধ্যে ৬০ মাইল প্রবেশ করিয়াছে। অদ্য প্রকাশিত এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী সমরাঙ্গনের সর্বত্রই বেশ অগ্রসর হইতেছে। অনেক ইতালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইতেছে এবং কামান ও গোলাবারুদ দখল করা হইতেছে। বৃটেনের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা খুবই অল্প।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৯শে জানুয়ারী

মার্শাল চিয়াং কাইশেক তাঁহার দুইটি কম্যুনিষ্ট বাহিনীর অন্যতম 'চতুর্থ রুট আর্মি' ভাঙিয়া দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি ঐ বাহিনীর বিরুদ্ধে অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের অভিযোগ করেন।

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাস পরলোকগমন করিয়াছেন। আলেকজেন্ডার কোরিজোর জেনারেল মেটাক্সাসের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক গৃহত্যাগে দেশব্যাপী গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হয়। মহাত্মা গান্ধী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট তার প্রেরণ করেন।

৩০শে জানুয়ারী—

নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণকে যুক্তপ্রদেশ সরকারের ওয়ারেণ্ট বলে বোম্বাইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক গৃহত্যাগে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট তার প্রেরণ করেন। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নূতন সংবাদ জানিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিল চন্দকেও শ্রীযুক্ত বসুর নিকট প্রেরণ করেন।

কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে ভারত সচিব মিঃ আমেরী জানান যে, কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত ৯৫৭ জন উক্ত আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছে।

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহত্যাগ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কলিকাতা হাজরা পার্কে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা হয়। সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধানে ভীষণ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার সাধনাকে কার্যে পরিণত করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করা হয়। এইরূপ সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিককে উদ্দেশ করিয়া অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা যে কটূক্তি বর্ষণ করিতেছে, তাহার প্রত্যুত্তরে উক্ত পত্রিকা দুইটি বর্জন করিতে সমবেত জনতা দৃঢ়সংকল্প জ্ঞাপন করে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৩১শে জানুয়ারী—

সত্যাগ্রহ সংবাদ—বাঙলা-হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখার্জি আরামবাগে সত্যাগ্রহ করেন। তিনি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা কেশর দেবী, রাজনারায়ণ এবং রামঅচল উপাধ্যায় পুনরায় কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে সত্যাগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মধ্যপ্রদেশ—নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ রুইকর আর কালাপ্পা নয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অন্যান্য প্রদেশেও সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড হয়।

১লা ফেব্রুয়ারী—

রুমানিয়ার ডিক্টেটর জেনারেল আন্টোনেস্কু এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যাহারা বেআইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া চলাফেরা করিবে, তাহাদিগকে সরাসরি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। জেনারেল আন্টোনেস্কু সৈন্যবাহিনীকে বেআইনী জনসাধারণের উপর গুলী চালাইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

কাশীতে নিখিল ভারত ছাত্র কনভেনশনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজকুমারী অমৃতকুমারী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

২রা ফেব্রুয়ারী—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা জানাইতেছেন যে, গত ২০শে জানুয়ারী দিনের বেলায় যশোহর জিলার ঝিনাইদহ থানার অধীন রামচন্দ্রপুর গ্রামের সাতজন ঋষির উপর প্রায় দুই শত মুসলমান সমবেতভাবে আক্রমণ করে; ফলে দুইজন হিন্দু নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং তাহাদের বাড়িঘর ভূমিসাৎ ও জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হয়।

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে কলিকাতা এবং বাঙলার জেলাগুলিতে লোকগণনার কার্য আরম্ভ হইবে এবং ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত লোকগণনা করা হইবে।

দিল্লীতে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাব দুইটির একটিতে গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, মহাত্মাজীর বিবৃতি প্রকাশে যেন সাধারণত নিষেধাজ্ঞা জারী না করা হয় এবং কোন ক্ষেত্রে যদি গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা জারী অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পূর্বাহ্ণে বেসরকারী কেন্দ্রীয় প্রেস এডভাইসরী কমিটির পরামর্শ না লইয়া যেন কিছু না করা হয়।

কলিকাতা ছিদাম মুদি লেনের কোন এক বাড়িতে কমলকৃষ্ণ পাল (২৩) নামক জনৈক যুবক এবং শান্তিবালা বসুমল্লিক (১৬) নাম্নী একটি কুমারীকে মৃত অবস্থায় ঘরের কড়িকাষ্ঠের সহিত ঝুলিতে দেখা যায়। মৃতদেহ দুইটি পরস্পর সংবদ্ধ ছিল। এই জোড়া আত্মহত্যা সম্বন্ধে জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী—

কলিকাতার অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর ওয়ালীউল ইসলামের এজলাসে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মামলার শুনানী উঠে। সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছিল, তাহা জারী না হওয়ার দরুণ ফেরৎ আসায় ম্যাজিষ্ট্রেট সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে পুনরায় পরোয়ানা জারী করিয়াছেন এবং খুঁজিয়া বাহির করিবার ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক দিবার আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় ব্যাপক খানাতল্লাস ও ধরপাকড় হয়। পুলিস কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে কতিপয় ছাপাখানা ও বাসগৃহে খানাতল্লাসী করে। খানাতল্লাসীর পর তাহারা কিছু কম্যুনিষ্ট পুস্তিকা হস্তগত করে এবং ১০।১২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং বাঙলার অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দী চলতি বৎসরে (১৯৪০-৪১) বাঙলা গভর্নমেণ্টের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের বাজেট উপস্থিত করেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

সত্যাগ্রহ সংবাদ—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়া ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার নুরপুর গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

লাহোরে আপত্তিজনক বক্তৃতা করার অভিযোগে সিন্ধু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী ভারত রক্ষা বিধানানুযায়ী দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মোটর স্পিরিট বিল গৃহীত হইয়াছে।

কটক কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মহান্তী এবং গণেশ্বর মহান্তী নিম্ন আদালতের বিচারে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আপীলে দায়রা জজ তাঁহাদের মুক্তি দিয়াছেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র

(দেশ ৮ম বর্ষ—১ম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত)

দেশ

চলো
চন্দ্রগ্রহণ
চাঙ্কু
চিকাগোর
৩০৩,
চীনে গ
ছবি দে
ছেলেদের
ছোট ন
জোসেফ
জননায়
জলপ্লাব
জীবন

'দেশ'এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মফস্বলের কাগজ ঐ দিন ডাকে দেওয়া হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাসুল সহ ৬৸৹ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩।৹ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৸৹ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্য্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পেঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মুল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵৹ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ :—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	১ মাস	এক সংখ্যার জন্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পেঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।